CU14-H0195-17-244471

সূচীপত্র

156.3 / 003/3 / V.69 / 710.13

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ম্পাদকীয়	...	৭৭১
াজকের মানুষ	...	৭৭২
াহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৭৭৩
ারতদর্শন	...	৭৭৭
ান্তর্জাতিক	...	৭৮২
ুম্ভমেলা	জয়ন্তী সেন	৭৮৭
াণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৭৮৮
কুহেলী বিলীন (রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৭৯০
বঙ্গদর্শন	...	৭৯৪
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৭৯৭

বঙ্গযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, ানফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমাম মস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, াধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

প্রভাতভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

হাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩৲ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩৲ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্মের উদ্ভব : ম্যাজিক (প্রবন্ধ)	নরেন ভট্টাচার্য	৮০১
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৮০৬
শাখা-কণ্টক (গল্প)	মিহির মুখোপাধ্যায়	৮০৯
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮১৪
গ্রন্থভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর (প্রবন্ধ)	প্রদ্যোত সেনগুপ্ত	৮১৮
একটি রোমান্সের অপমৃত্যু (গল্প)	উজ্জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	৮২০
রঙ্গজগৎ	...	৮২৩
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৮২৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৮২৯
পাঠক মন	...	৮৩০
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৮৩১

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কা
বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাট
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে
একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী না
শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-স
কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশ
কবিতাবলী, বিবিধ
মায়া কানন, হেক্টর বধ ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দা
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবল

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৬১ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ভাদ্র ১৩৭১

25 Paise
Thursday, 20th August 1964

যুগন্ধর রামেন্দ্রসুন্দর

বর্তমান বাঙালী-জীবন আঘাত-জর্জরিত হলেও, সেই জীবনের মূলে যে রস আজো সঞ্চিত রয়েছে, তা-ই তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল হবার হাত থেকে রক্ষা করেছে। এই রস-সম্পদ এখনো কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে বাঙালী-জীবনকে পূর্ণাঙ্গতা দান করতে পারে। কিন্তু কিভাবে তা করবে সে প্রশ্নটাই আজ বিবেচ্য।

একথা স্বীকৃত যে, বাংলা দেশে আধুনিক জীবনচর্যার সুরু হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ঐ শতাব্দীর যে সব বরেণ্য পুরুষের অবদানে বাঙালী-জীবনমূল রসসমৃদ্ধ হয়েছিল, তাঁদের সেই অবদান স্মরণে রেখে, তাঁদের অসমাপ্ত কর্মে আত্মনিয়োগ করেই নিজেদের পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যাসঙ্কুল বাঙালী-জীবন এখন আত্মরক্ষার তাগিদেই ব্যস্ত, [illegible] ঊনবিংশ শতকের সাধকেরা [illegible] অন্তর্হিত। [illegible] মুমূর্ষু বাঙালী জাতি একটা নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে।

রামেন্দ্রসুন্দর অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম ও তাঁর কর্মপদ্ধতি আমরা কতটা অনুসরণ করতে পেরেছি? যে ছেলে স্কুল-জীবনে কবিতা রচনা করতো, সেই ছেলে বাঙালী-মানসের উন্নতি-প্রকল্পে কিভাবে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, প্রত্নতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, সঙ্গীত, গণিত, এমন কি ছোটদের উপযোগী অ, আ, ক, খ-এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তির দিকে ও অনুপম জীবন-চরিত রচনার প্রতি আত্মনিয়োগ করলেন। সেই ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন অসাধারণ তেমনি সামগ্রিক বাঙালী-জীবনে বিস্ময়জনক।

রামেন্দ্রসুন্দরই বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় প্রথমে দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনা দান করেন। আবার কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে অধ্যাপক সংগঠনের তিনিই আদি প্রেরণাদাতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বাধীনচিত্ত রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী নারীদের বঙ্গলক্ষ্মীর [illegible]িত করেন। ঐ সময় অরন্ধন [illegible] বিকল্পক ছিলেন [illegible] বিষয়ের সঙ্গে [illegible] জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ প্রচেষ্টায় প্রথম পথিকৃৎ তিনিই। আবার বৈজ্ঞানিক মানমন্দির প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ উদ্যমশীল উদ্যোক্তা। পরিভাষা রচনায় তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি আজও দুর্লভ।

অথচ এই মহাপুরুষের জন্মশত-বার্ষিকীর আয়োজন ক'জনই বা করেছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার ত' নিশ্চুপ, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও নির্বাক। তাঁর নামে একটা গবেষণার কিংবা পরিভাষা-পরিষদ আজো গড়ে উঠল না। তাঁর রচনাবলীর সুলভ বিক্রির ব্যবস্থা আমাদের সরকার করেন নি, সাহিত্য আকাদেমিও তাঁর কথা কোনোদিন ভাবেন নি। আমাদের জীবনকে যিনি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কথিত সেই সুন্দর রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কে ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা জাতীয় অবমাননারই নামান্তর।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ে ধ্বসে যায় সৈকত। (উপসাগর) 'টংকিং' কেঁপে ওঠে যুদ্ধের উন্মাদনায়। ঠিক এই মুহূর্তে তাই ভাবনার কূল পাই না।—আমরা কি যুদ্ধের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছি? পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ কি সভ্যতার নগ্নতম প্রহসন সহ্য করবার অপেক্ষায় আছে? এর উত্তর যাই হোক না কেন, একটি মাত্র শব্দে তার হদিস পেলে অন্তত একটা অনুসিদ্ধান্তে আসা যেত। কিন্তু এর তেমন কোনও উত্তর নেই। অথবা আমরা তা জানি না। কেন না এ প্রশ্ন মানবিক সভ্যতার সংকট উত্তীর্ণ হবার সব চেয়ে জটিল প্রশ্ন। এ প্রশ্ন শুধু স্থানবিশেষকেই নয়, সারা পৃথিবীর অগ্রগতিকে চরম প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে; আর এক পা এগুলেই—কোথায়? তার ঠিকানা মাত্র যে কয়েকজনের কাছে আমরা আশা করব, তাঁদেরই একজনের কথা আজ তাই আমরা শুনব।

পরণে সামরিক পোষাক আর জামার কলারে ওই তিন তারার সারি না থাকলে হয়ত, তাঁকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হত। হৃষ্টপুষ্ট ছোটখাট চেহারার সৌখীন মানুষ জেনারেল নেগুয়েন খান। অনেক ভাঙা-গড়া, বিচিত্র কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় আজ তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সর্বময় নেতা।

মাত্র ৩৫ বছরের তরুণ। স্বচ্ছলঘরের ছেলে। জন্ম—মেকং ব'দ্বীপে চাউংয়াম গ্রামে—সায়গন থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণে। ধর্মে বৌদ্ধ, কর্মে পরিশ্রমী, সুযোগসন্ধানী রাষ্ট্রনেতা। জীবনের প্রথম তালিম নিয়েছেন কমিউনিস্টদের কাছে—হো-চি-মিনের গেরিলা দলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের প্রথম রোমাঞ্চ। কিন্তু তার পরে চাকা ঘুরেছে অন্য দিকে। ডালাতের ফরাসী সামরিক স্কুলে শিক্ষা নিতে গিয়েছেন নেগুয়েন। সেখান থেকে 'সেকেণ্ড লেপটেনেণ্ট' হিসেবে ফ্রান্সে। তখন তাঁর ২০ বছরের তাজা প্রাণ। তিন বছর পরে ফিরে এসে তিনি ভিয়েৎনামের প্রথম বিমানবহরের সেনাধ্যক্ষ হলেন। এখান থেকেই তাঁর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুরু। ভিয়েৎনাম দ্বিখণ্ডিত হ'ল। নেগুয়েন যোগ দিলেন দক্ষিণ বিমানবহরে। এরপর আবার '৫৭ সালে আমেরিকা[illegible] শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে তিনি হলেন জয়েণ্[illegible]

সুহৃদ: '৬০ সালে দিয়েম-বিরোধী ষড়যন্ত্র থেকে নেগুয়েন আর তাঁর সহকর্মীরাই বাঁচিয়েছিলেন দিয়েমকে।

লোকধর্ম আর রাজধর্মের তফাৎটা যিনি যত নিখুঁতভাবে অনুধাবন করতে পারবেন তিনিই তত চতুর রাজনীতিক। আর এদিক থেকে নেগুয়েনের যোগ্যতায় কোনও সংশয় নেই। দিয়েম ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হ'লে তাই তাঁকে আমরা দেখেছি অন্য চেহারায়। তখন আশ্চর্য কৌশলে নিজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বেঁধে দিয়েছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভবিতব্যকে।

এই সেদিন, জেনেভা চুক্তির দশম বার্ষিক দিবসে (যার নাম নেগুয়েন দিয়েছেন 'জাতীয় লজ্জা দিবস') উত্তেজিত জেনারেল খান ঘোষণা করেছেন: আসন্ন যুদ্ধের হাওয়ার মোড় ফেরাতে গেলে আমাদের পা বাড়াতে হবে উত্তরের পথে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল টেলরের অনুনয়কে উপেক্ষা করেও তাঁর এ অভিসন্ধি অটুট থেকেছে। আর তার পরেই গর্জে উঠেছে মার্কিন বোমা; ছুটে এসেছে রণতরী। উত্তর উপকূল উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। ঘটনার ওপর নজর পড়েছে স্বস্তিপরিষদের। দক্ষিণে যুদ্ধের হুঙ্কার,—সামরিক আইন বসেছে দেশে, সায়গনে বিমানমহড়া।

জেনারেল নেগুয়েন খান

ভিয়েৎ কংদের দাপট, হো-চি-মিনের আস্তানা[illegible] বিমানের অভিসার—এমনি নানান[illegible] ভিয়েৎনামের আবহা[illegible]

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

সেদিনও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাই আমার মনে এসেছিল। সমকালের দেশ-দেশান্তরে আমাদের জাতি-মানসের পরিক্রমার প্রসঙ্গ থেকে আমি আবার ফিরেছিলুম ব্যক্তিমনের প্রসঙ্গে। হঠাৎ বেদনা জেগেছিল। ব্যক্তিমনের এককালের অভিজ্ঞতাও তো সত্যিই অন্যকালে ফেরে না। আমাদের প্রত্যেকটি ক্ষণই ভঙ্গুর। সময় কি থামে ? ১৩৪৫-এর আশ্বিনে প্রকাশিত তাঁর 'খসড়া'র 'কালান্তর' মনে পড়েছিল। তাতে অমিয়বাবু লিখেছিলেন—

সময় কি থামে ?
আঙুলের ফাঁক দিয়ে
দণ্ড পল মুহূর্তের জল বয়ে যায়,
থামাই ঘড়ির কাঁটা।

তবু দেখো স্রোতোবেগে
চেতনা-বিদ্যুৎ নাসে ;
মর্মঘরে জ্বালি অন্যকাল।
দণ্ড পল মুহূর্তের স্তব্ধতায়।

জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা মনে মনে কতোবার যে অতীতের দিকে ফিরে দাঁড়াই। আমরা কেবলই—'মর্মঘরে জ্বালি অন্যকাল।'

অমিয়বাবু সেই মন নিয়েই লিখেছিলেন—

ট্রেন চ'ড়ে কালের জগৎ
মধ্য-এশিয়ায় ছোটে

দলে দলে যাত্রী আনে,
থামি এসে বামিয়ানে।

অনেক ঘুরেছেন অমিয়বাবু। তাই আমাদের অনেকের চেয়ে বিস্ময়ে বিশ্বাসী তিনি। তিনি আমাদের এই বহুব্যস্ততাও চেনেন,—আবার, এরোপ্লেন, সিনেমা, স্টীমার, গড়ের মাঠ,— ইত্যাদি পরিবেশের বিবরণ দিতে-দিতেও ভোলেন না যে, আশ্চর্য এই পৃথিবী। তাই তাঁর প্রথম কবিতার বই 'খসড়া'তে লিখেছিলেন—

আজকে গড়ের মাঠে
হাঁটব রাত্রে, ধীর পায়ে
হয়তো দক্ষিণে হাওয়া লাগবে গায়ে,
স্টীমারের বংশী, গঙ্গার (অতি পবিত্র)
জল,
ঘাটেই আছি, তবু বলবে,
ঘাটে চল্—
বাড়ি ফিরব, যেটা আমার বাড়ি,
গলিতে (তিন নম্বর)
আলো-জ্বালা আপন লোকের ঘর।
জানি না (নিজেকেও) তবু ভালবাসি,
বুক ওঠে ভরি'—
আশ্চর্য এই পৃথিবী স্বীকার করি।

কালের রেখা ধরে তিনিও অতীতে হেঁটেছেন অনেক। ভারতবর্ষের পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ের পথে পথে অনেক কালের অনেক স্মৃতির ধুলোর আঁধি উড়তে দেখেছেন তিনি। বলেছেন—'ধুলো যায় ভ'রে—অদৃষ্টের চাকা ঘোরে—আঁধি দিয়ে দৃষ্টি দিল ঘিরে।' সেই ধুলো সরে যাক। আসুক বৃষ্টি। আসুক তাঁরই উক্তির সেই 'মানুষ সেনানী'। তারা নতুন করে গড়ুক,—তারা সমস্ত পৃথিবীতে—'সূর্যতলে তারা সমস্ত ভিত্তি' বেঁধে দিক।

কবিদের মধ্যে একদিকে যেমন এই দূর-ভ্রমণের মর্জি, অন্যদিকে তেমনি বিশেষ কালের ঘটনা মেজাজ রুচি খুঁটিয়ে দেখবার অভ্যাসও চোখে পড়ে। সেই ১৯৪৫-এর নভেম্বরে, অর্থাৎ ১৩৫২র কার্তিকে বেরিয়েছিল অজিত দত্তের 'নষ্টচাঁদ'। ছোটো ভূমিকায় অজিতবাবু লিখেছিলেন—'এ-বইয়ের সবগুলি কবিতাই যুদ্ধের মধ্যে লেখা। পাঠককে একথা মনে রাখতে অনুরোধ করি।

কবিমনের সেই বদ্ধ-তিক্ত ভাবটা দেখা দিয়েছিল 'নষ্টচাঁদ'-এর নানান কবিতায়। ছড়ার ছাঁদে,—কখনো বা গম্ভীর সুরে অনেক প্রদাহের যন্ত্রণা বেজে উঠেছিল তাঁর সে-বইয়ে। মানুষের বে-আব্রুতার দুর্দশা দেখে সরকার-কে বলেছিলেন—

কতোই কিছু স্বপ্ন ছিল
মনের মধ্যে বন্দী,
নতুন জীবন, নতুন জগৎ
গড়ার অভিসন্ধি ;—
হুজুর তুমি চোখ ফোটালে,
হাজার যুগের পুণ্য।
সকল জমা আজকে খারিজ
মনের খাতা শূন্য।

সেলাম করি সরকার।
মনের আব্রু ঘুচলো, এবার
দেহের আব্রু দরকার।

বইয়ের নাম-কবিতা 'নষ্টচাঁদ'-এ সে-পর্বের সেই রোমান্টিক-বিমুখ পরিবেশেরই প্রভাবে বোধ হয় জীবনের অনিবার্য ব্যবহারবাদের উচ্চকিষ্ট স্বীকৃতি ছিল—

এ-আষাঢ়ে শেষ হোক্ কান্নার বন্যা
ও-আষাঢ়ে লেখা যাবে মেঘদূত
ক'বছর মন দিয়ে করো ঘরকন্না
বুড়োকালে প্রেম হবে অদ্ভুত
মুখোমুখি বসে শুধু সকালে ও সন্ধ্যায়
দম্পতি-সুখ বলো হয় কার ?
সংসার-ধর্মেতে যে মেয়েরা মন দ্যায়
পৃথিবীতে তাদেরি তো জয়কার।

এই শতাব্দের দ্বিতীয় যুদ্ধ-কালের সেই পিত্তজ্বালার কথা ভোলবার নয়। তবু, অজিত দত্তের সেই 'নষ্টচাঁদ'-এর একটি কবিতাতেই কালের রেখা ধরে অতীতে ছাঁটিবার ব্যর্থতার ওপর তীব্র এক ব্যঙ্গোক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। অমিয় চক্রবর্তীর 'মর্মঘরে জ্বালি অন্যকাল' উক্তিটির পাশাপাশি মনে পড়ে অজিত দত্তের সেই 'ভোর হল মহেঞ্জোদারোতে' কবিতা। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, শতাব্দীর শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে গিরীভূত কঙ্কাল যা কিছু পাওয়া যাচ্ছে, সারারাত্রি-নিদ্রাহীন পণ্ডিতেরা ক্যাম্পে ক্যাম্পে জেগে জেগে তারই ওপর মোটা মোটা কেতাব লিখছেন! কিন্তু তাতেই কি সময় ফিরে আসে? এক কাল কি অন্যকালে ফেরবার? সময় ফেরে না। সময় ফেরবার নয়। সে তো—'পুরোনো কবর থেকে মহেঞ্জো-দারোর নির্বাসন নতুন কবরে।' মানুষ কি সময়ের প্রবাহরেখা ধরে অতীতে ফিরতে পারে কখনো? না, তা হয় না,—তা সম্ভব নয়।

হাস্যকর! ও বিবর্ণ পাণ্ডুলিপি,
ব্যবচ্ছিন্ন ওই আত্মা,
এমন কি কীটভুক্ত আবর্জনা,
সবই যেন চেনা মনে হয়
বহু শতাব্দী পরেও
মনে হয় কোন্ প্রেসে ছাপা
তাও জানি।

সেই 'নষ্টচাঁদ'-এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বলা হয়েছিল—'নিরর্থক'-এর অন্তর্গত ছড়াগুলির মধ্যে কয়েকটি বিদেশী কবিতার ছায়া অবলম্বনে রচিত।' অনেকদিন ভেবেছি, নিশ্চয় এই নীচের ছড়া-দু'টি তা নয়। এক নম্বর—

আগে ছিল শুধু পকেট মারার
পেট-চলা কারবার,
কালো বাজারের স্বদেশী দাপটে
বিস্তার হল তার
বটতলাতেই জন্মের মতো
যদিও শিক্ষা শেষ,
হতে পারি যাতে শিক্ষা-মন্ত্রী
আজি করেছি পেশ।

আর দু'নম্বর—

ঠিকাদার-গিন্নিরা আশ্রিত ঠাকুরের
উপ্‌রিটা বেঁচে থাক সরকারি চাকুরের
দোকানির বৌ পরে জড়োয়ার গয়না,
হিংসুক বাকি লোক তবু খুশি হয় না।

মনে পড়ে তাঁর আগেকার বই 'পাতালকন্যা'র ছড়া—'পদ্য' নামে সেই লেখাটি যাতে তিনি পদ্যলেখক বদ্যিনাথের শব্দসন্ধানের ওপর কটাক্ষ করে লিখেছিলেন—

এই তো সেদিন
বদ্যি বলে, 'মিল খুঁজে দিন
'নিসনি 'সনে' ; অমনি তারা
কাগজ ঘেঁটে একশো তাড়া
বার করে দেয় 'ধৃষ্ণি', তবে
বদ্যি মেলায় সগৌরবে।

সে ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারির রচনা। 'নষ্টচাঁদ'-এর 'নইলে' এ-লেখার পাঁচ-ছ' বছর পরের সৃষ্টি। তাতে তিনি বলেন—

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে

ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে

আবার,

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

আজ চল্লিশের দশকের এইসব বাংলা কবিতার টুকরো দেখতে দেখতে একথা মনেই হয় না যে ইতিমধ্যে আমরা এই ষাটের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছেছি। মনে হয়, সময় যেন ফিরে এসেছে। যেন আমাদের ভাতের থালা আর পথের বাধা ঠিক একই জায়গায় ঠেকে আছে। আজও কষ্টের ভাত গিলে কষ্টের যানবাহন ধরতে হয়। যেন চল্লিশের দশকে এই কবি যা বলে গেছেন, আজও জগৎ সেই রকমই দেখাচ্ছে। আর, দেশের ইতিহাসের এই বিশ-পঁচিশ বছরের ঘটনার স্রোত সম্বন্ধে তিনি যাই ভেবে থাকুন, এ-কথা ঠিকই যে আশ্বিন ১৩৭০এ কবি অজিত দত্তই লিখেছেন 'কালো পাহাড়'। সে-কবিতায় তিনি কোনো বড়ো আশার কথা স্পষ্ট করে লিখতে চেয়েছিলেন বলে আমার মনে হয় নি। তিনি বরং আরো পরবর্তী একটি কবিতায় (তারিখহীন সেটি) লিখেছেন—

আমি মৃত্যুকে জয় করেছি,
কিন্তু জীবনের কাছে হেরে গেলাম।

কবিদের এই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ হার-জিতের কথা এখানে নিতান্তই আনুষঙ্গিক ভাবে মনে এলো। সময়ের স্রোত ফেরে কি ফেরে না, সে-কথাও প্রত্যেকটি মানুষের অভিজ্ঞতার এলাকা-ধীন। অমিয়বাবু নানা-ভ্রমণের কথাসূত্রে অজিতবাবুর 'নষ্টচাঁদ'-এর সাম্প্রতিকতার মেজাজটুকু আমার এ-আলোচনায় ঈষৎ ছুঁয়ে যাওয়া গেল মাত্র। এসব কথা সমালোচনা নয়। কথায় কথায় শুধু এগিয়ে যাবার চেষ্টা এসব।

সম্প্রতি অজিত দত্তের কবিতা-সংগ্রহ বেরিয়েছে এ-বছর বৈশাখ মাসে। তাতে 'পুনর্নবা'র 'বুড়ির ঝুড়ি' কবিতাটি নতুন করে দেখবার সুযোগ হোলো। সাহিত্যে জীবনের চিরন্তন সত্যই যুগে যুগে দেখা দিয়ে যায়, অজিতবাবুর সে-সব কথা ভারি সহজ সরল আড়ম্বর-বর্জিত।

আজ আমি সেই 'বুড়ির ঝুড়ি'র গভীর ইঙ্গিতটি অনুভব করছি—

সব রকমের গল্পে বুড়ি
ভর্তি রাখে ঝুড়ি
যখন তখন গল্প বিলোয়
দু'দশ হাজার কুড়ি।

ছোট ছেলের পছন্দসই
মিষ্টি-মাখা গল্প,
পণ্ডিতেরও মনের মতো
হরেক পুরাকল্প,
একটু বড়োর স্বপ্ন-মাফিক
গল্প অসম্ভাব্য,
তরুণ জনের ফরমাশি সে
গল্প তো নয় কাব্য,
চিন্তাশীলের গল্প আছে
তত্ত্বকথায় পূরতি,
হাল্কা-কথার খরিদ্দারের
গল্পে গাঁথা ফূর্তি;
যার যেমনই পছন্দ আর
যার যতটা চাই
আদ্যিকালের বুড়ির কাছে
মিলবে হামেশাই।
এই তো জীবনের গল্পবিচিত্রা!

সময় ফেরে কি ফেরে না, এ-প্রশ্নের চেয়ে বরং আর-এক প্রশ্নই তাই আরো তীব্রভাবে মনের মধ্যে দেখা দিয়ে যায়।—লেখকরা লেখেন কেন? তাঁরা কখনো তরুণের গল্প লেখেন, কখনো বা প্রবীণের,—কখনো মিষ্টি-মাখা, কখনো বা অসম্ভাব্য। তাঁরা দেশ-দেশান্তরের পথিক। কিন্তু তাঁদের সেই পথে-চলার কাজটা কি প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত? অমিয়বাবুর জবাব মনে পড়ছে। তিনি জবাব দিয়েচেন—

'খুব স্পষ্ট লেখবার তাগিদ নিয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে বসি না তা তো নয়। কিন্তু সেই তাগিদকেও জোর করে জাগানো যায় না। হঠাৎ জাগে। প্রবণতা তৈরি করতে পারি মাত্র, মনকে বাঁধতে পারি, চরিত্রশক্তিকে সমাজের শ্রেষ্ঠ কাজের ধ্রুবস্থরে বেঁধে তুলি, মানুষের বড়ো অধিকারে সকলকে সমান জেনে সংহত সাম্যচিত্তে যখন কলম নিয়ে লিখতে বসি তখনো আয়োজন চলছে। এই আয়োজনকে প্রত্যহ সত্য করে তোলবার সাধনা লেখকের।'

লেখকের সজ্ঞান মনের এই কর্তৃত্বের দিকটি স্বীকার করেও তিনি কিন্তু অদৃশ্য অন্য এক মনোনায়কের কথাও লিখেছেন—

'কিন্তু আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, বা সম্পূর্ণ অবস্থাতেও যখন হঠাৎ ঠিক কথা, স্পষ্ট যুক্তি, সুভাষিত

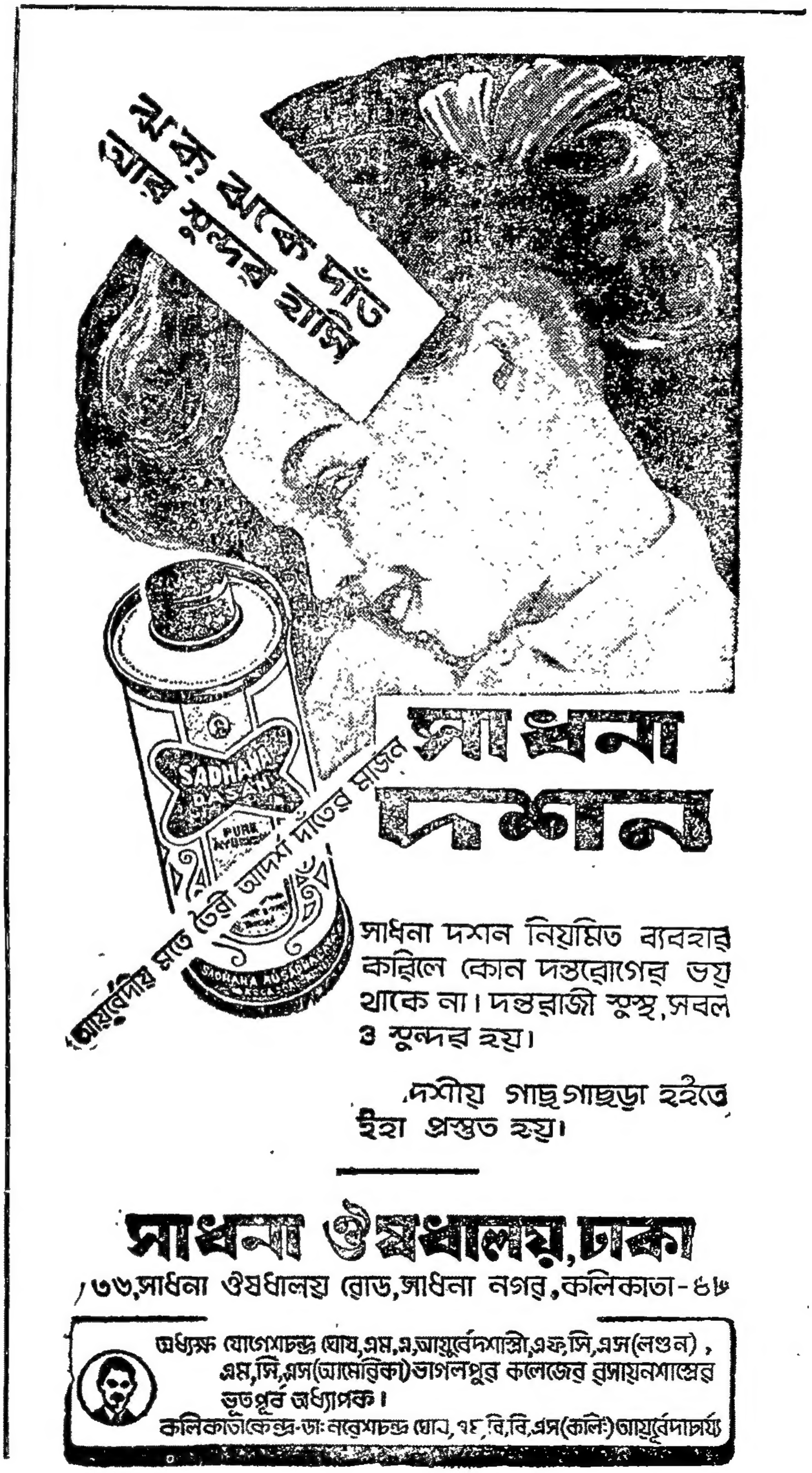

মনোভাব এসে পৌঁছুতে থাকে তখন জানি আমার চেষ্টায় অতীত একটি আত্মশক্তির ক্রিয়া চলেছে। লেখকের সেই আত্মশক্তি তার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, যার যতটা আয়ত্তাধীন লেখক হিসাবে তার শক্তির পরিচয় ততো বড়ো।'

বলেছেন—

'অনেক সময় মনে হয় নিজের মধ্যে সমস্ত মানসিক কারখানার কোন একজন বড়ো কর্তা আছে, তাকে বাদ দিয়ে যথাবিধি লেখা, ভাবা, যুক্তিতর্ক, হৃদয়াবেগের প্রাত্যহিক নানাবিধ নিয়মিত কাজকর্ম চলতে থাকে, কিন্তু সবটা চালনা করা, কী তৈরি হচ্ছে তার তদারক করা, এবং সমস্ত আয়োজনকে হঠাৎ অন্য পথে নিযুক্ত করার কাজ লেখকের মনের কোন এক মনোনায়কের হাতে। হঠাৎ দেখি যে-উপমা ব্যবহার করেছি তার মানে গেছে বদলে, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে কোমর বেঁধে লিখছি তারও গভীরে আমার সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্য বা আমার কালের উদ্দেশ্য, দেশ বা জাতির উদ্দেশ্য ধরা পড়ে গেছে।'

আমাদের এই আধুনিক কালের লেখকদের মনের এই দুটি দিকই বিবেচ্য। বিশাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের সজ্ঞান আয়োজনই বা কতোটুকু,—আর তাঁদের গভীর মনোনায়কের অভিপ্রায়ই বা কী? আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিশাল ভারতবর্ষের কতোটুকুই বা দেখতে পাই? অমিয়বাবু লিখেছেন—

'কাল আমাকে লেখায়, স্বভাবও আমাকে লেখায়, এই দ্বৈত সত্যকে স্বীকার করব। আমি যদি জাত-লিখিয়ে হই তাহলে আমার লেখার ক্রিয়া আমার অস্তিত্বের সঙ্গেই গূঢ়যোগে একক—আমি কেন লিখি,—আর-একজন কেন ছবি আঁকে বা বীণ বাজায় তার মূলে যে অস্তিত্ব এবং প্রকাশের যুগ্মতা আছে তাকে সৃষ্টিব্যাপারের মূলে নেমে অনুসরণ করতে হয়।'

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে হাঁটতে হাঁটতে এইভাবেই শিল্পের নানা নায়কের কথা ওঠে। মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা সেই জেবুন্নিসার ছবি—যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'veiled poetess'। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর'-এর মধ্যে সেকথা লেখা হয়েছে। পিতার সম্বন্ধে অলোকেন্দ্রনাথ ঠিক আসল কথাটাই সোজাসুজি লিখেছেন। লিখেছেন যে, তাঁর কোনো অহঙ্কার ছিল না। লিখেছেন যে, অবনীন্দ্রনাথের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে যখন, সেই সময়ে এক ওলন্দাজ অধ্যাপক এসে তাঁর সেই veiled poetess ছবিটি কিনে ভক্তিভরে বলেন—'মিস্টার টেগোর, আপনি একজন মহান শিল্পী।'

অবনীন্দ্রনাথ তখনি জবাব দেন—'আপনি ভুল করছেন প্রফেসার, আমি তো এখনো শিক্ষা করছি।'

এই ছবিরই ইতিহাস দিয়েছেন অলোকেন্দ্রনাথ—

'আমার জাঠতুতো ভাই নবেন্দ্রনাথের ছবি আঁকায় ভালোই হাত ছিল। তিনি একবার একটি ছবি আঁকতে আরম্ভ করে একটু মুস্কিলে পড়েছিলেন। একটু আরম্ভ করে আর এগোতে পারছেন না। ছবিটি ঘোমটা দেওয়া একটি মেয়ের। ছবি কোলে হতাশ-মুখে বসে আছেন। কি ভাবে রঙ চাপাবেন, তুলি চালাবেন সাহস হচ্ছে না, সেই সময় বাবামশায়ের হাতে পড়ল সেই অপরিণত চিত্রটি। বাবামশায় পাকা কারিগরের মতো তাকে কয়েকটা আঁচড়েই একটা কিছুতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর ছবিটা নবেন্দ্রের ফিরে পাবার কথা, কিন্তু বাবামশায়ের ছবিটার উপর বেশ একটা টান এসে গিয়েছিল। তাই ছাড়লেন না।—জলে ভিজিয়ে রঙ চাপিয়ে আবার জলে ভিজিয়ে তাকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করতে লাগলেন। নবেন্দ্রনাথ খুবই খুশি। চন্দ্রের কলার মতো ছবি আস্তে আস্তে ফুটছে। নবেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেন আর ভাবেন—এইবার হয়তো ছোট কাকা ছবিটা আমায় দেবেন।'

কিন্তু সে-ছবি আর নবেন্দ্রনাথ ঠিক ফেরৎ পান নি। অবনীন্দ্রনাথের মনোনায়ক এসে নবেন্দ্রনাথের সেই অবগুণ্ঠিতাকেই জেবুন্নিসায় পরিণত করেন।

আমাদের সময় যদিই বা কখনো ফেরে, সেও ঠিক এই রকমই—আমাদের সজ্ঞান আয়োজনের অতিশায়ী কোনো মনোনায়কের ইচ্ছার ইশারাতেই সম্ভব। অমিয়বাবুর ঐ প্রশ্নের কথা ভাবতে ভাবতে এই জবাবটা সহসা মনে দেখা দিল।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বসাহিত্যের সম্রাট—মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে শারদ-জ্যোৎস্না—চরিত্র-সৃষ্টির ইন্দ্রধনু—অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বর
চার্লস ডিকেন্সের
ডিকেন্স গ্রন্থাবলী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী—সর্ব্বরসের অনন্ত নির্ঝর—বিশ্বসাহিত্যগৌরব ঔপন্যাসিকের পরিচয় প্রদান অসম্ভব।
২য় ভাগ—নিকোলাস নিকলবি ও বারনাবি রজ, চরিত্র-চিত্র। সাহিত্য জগতের এই পুণ্যপ্রভা মাত্র ১৷৷০ টাকা
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

● প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী নয়াদিল্লীতে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করছেন

রাজধানী ঃ

পনেরোই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের সপ্তদশবার্ষিকী দেশের সর্বত্র অনাড়ম্বর ও জাঁকজমকহীনভাবে উদ্‌যাপিত হয়। রাজধানী দিল্লীর লালকেল্লার দুর্গপ্রাকারে প্রতিটি স্বাধীনতা দিবসে যাঁর উপস্থিতি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে উল্লাস তুলত, এই বৎসর তাঁকে ছাড়াই স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠান পালিত হয়। নেহরুহীন ভারতবর্ষে এটাই প্রথম স্বাধীনতা-উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী লালকেল্লার প্রাকার থেকে ভাষণে দেশবাসীকে ভেদাভেদ ভুলে অখণ্ড জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার উদাত্ত আহ্বান জানান। জাতির উদ্দেশ্যে তিনি এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, মূল্যমান যাতে স্থিতি লাভ করে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হবে। সাধারণ মানুষকে খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দেওয়া হবে।

* * *

ভারত আজ দারুণ এক বিপদের সম্মুখীন। এই বিপদ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়, চীন বা পাকিস্তানের সীমানা অতিক্রমের ঘটনা নয়, অথচ তার চেয়ে কম বিপজ্জনক নয়। চীন, পাকিস্তান, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সমস্যার উপরে খাদ্য সঙ্কট আজ এত বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছে। বড় বড় শহরে রেশন ব্যবস্থায় কোনরকমে ঠেকা দেবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু মফস্বল শহর ও গ্রামাঞ্চলে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অসহায়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কথা আমরা জানি। তখন ছিল বিদেশীদের রাজত্ব। আজ আমরা স্বাধীন। স্বাধীন ভারতে ব্যবসায়ীরা খাদ্য নিয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে, এ যে অচিন্তনীয় ছিল। খাদ্যের ব্যবসায়ীরা আইন, সরকারী নির্দেশ, সরকারী পরামর্শ সব কিছুকে অমান্য করে সৎ-ন্যায়-নীতির মত মধ্যযুগীয় এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছে। মুনাফার লোভ কত ভয়ঙ্কর! দেশ, জাতি, দেশের মর্যাদা কিছুরই কোন মূল্য এই মুনাফাবাজ মজুতদারদের কাছে নেই।

● শ্রীগুলজারীলাল নন্দ

কিন্তু ক্ষুধাকে নিয়ে হঠকারিতা চলে না। মানুষ এতদিন সয়ে থাকলেও বেশিদিন সইবে না। ক্ষুধাই দেশে দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়েছে। মানুষের পেটের আগুন আজ মনেও আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এই মনের আগুন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে সামান্য মাত্র স্ফুলিঙ্গস্পর্শে। সারাদেশে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ বিরোধী দলগুলিকে খাদ্যের দাবীতে আন্দোলন না করার জন্য বলেছেন। বাস্তবিকপক্ষে জনগণের আন্দোলন এখনো সুরু হয় নি, কিছুসংখ্যক নাম-যশলোভী তথাকথিত নেতা ও দল জনমনে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য সভা ও মিছিলের রিহার্সাল সুরু করেছে মাত্র। সকলেরই জানা আছে---এদের দৌড় কতদূর! বড় জোর এসেম্বলী, পার্লামেন্টের রাস্তা পর্যন্ত; অথবা অনশন-সত্যাগ্রহের নামে ভণ্ডামী। তবে নন্দজী এত বিচলিত হচ্ছেন

কেন? বরঞ্চ এদের নাবর কৌস-ফোসানি নন্দজীর কাজে লাগবে।

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন, চোরাকারবারী, মজুতদার ও ফাটকাবাজরা সমাজের নিকৃষ্টতম শত্রু। তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুবা জনগণ আমাদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলবে। রাষ্ট্রপতির এই বাণী প্রতিটি রাজ্যে মন্ত্রিমণ্ডলীকে কঠোর হবার প্রেরণা দিক।

* * *

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে মিলিত আলোচনার জন্য এক সম্মেলনে হয়েছিলেন। কিন্তু এই সম্মেলনের ফলাফল পর্বতের মুষিক প্রসবের মত ব্যাপার হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বা খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রাহ্মণিয়ম এমন কোন প্রস্তাব উপস্থিত করতে পারেন নি, যার উপর ভিত্তি করে সরকার ও বিরোধী দল খাদ্য-সমস্যা সমাধানে একযোগে কাজ করতে পারে। মজুত-বিরোধী অভিযানে বিরোধী দলের সহযোগিতার প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করে নি। সম্মেলনে খাদ্যমন্ত্রী সমস্যা সমাধানে তাঁরা কি করেছেন, তার ফিরিস্তি দিয়েছেন, আর প্রধানমন্ত্রী খাদ্যকে নিয়ে আন্দোলন না করার জন্য বারবার আবেদন করেছেন।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর এই আবেদন বিরোধী নেতাদের মনে রেখাপাত করতে পারে নি। তাঁরা পূর্বের সিদ্ধান্তমত আন্দোলন করার কথা প্রকাশ করেছেন। উপরন্তু বামপন্থী কমিউনিস্ট দলের নেতা শ্রী এ কে গোপালন লোকসভার সেপ্টেম্বর অধিবেশনে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অন্যান্য বিরোধী দলও অনাস্থা প্রস্তাব আনবার পক্ষে; অবশ্য অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যাপারে বিরোধী দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সম্মেলনে বিরোধী দলগুলির মধ্যে একমাত্র স্বতন্ত্র পার্টি ছাড়া সকলেই খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসার দাবী জানায়।

* * *

শ্রীমননারায়ণ শীঘ্রই প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য-পদে ইস্তফা দিচ্ছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে তাঁর মন্ত্রি-সভায় স্থান লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। হয়তো তিনি কৃষিদপ্তরের দায়িত্ব

● ভাষণরত ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

পাবেন। কারণ, প্ল্যানিং কমিশনে কৃষিবিষয়ক বিভাগে তিনি সদস্য ছিলেন; কৃষি বিষয়ে এদিক থেকে তাঁর কিছুটা অভিজ্ঞতা রয়েছে।

শ্রীমননারায়ণের পদত্যাগের ফলে প্ল্যানিং কমিশনে চারটি সদস্য-পদ খালি হবে। এই পদগুলিতে অবিলম্বে লোক নেওয়া হবে না। সম্ভবত টেকনিক্যাল দিক থেকে অভিজ্ঞ লোক নেওয়া হবে।

রাজস্থান :

রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে দুর্বল রাজ্য রাজস্থানের জনগণও আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ওরা তো বহুকাল থেকে সয়ে আসছে। আর কত সইবে!

রাজস্থান এখন মজুতদার, চোরা-কারবারীদের স্বর্গে পরিণত হয়েছে। গমের দাম উঠেছে সত্তর টাকা প্রতি কুইণ্টল্, কোন কোন স্থানে ৭৫৲ টাকা। ডালের দাম আরো চড়া। মুগ বিক্রি হচ্ছে ১০০৲ টাকা কুইণ্টল দরে। রান্নার তেল ৪৲ টাকা কিলো। সব্জীর দর এমন চড়েছে যে, মানুষ স্মরণকালে এমন দরের কথা মনে করতে পারছে না।

কিন্তু দরের এই ঊর্ধ্বগতি ও ও চোরাকারবারের দমন ব্যাপারে রাজস্থান সরকারের অবস্থা শোচনীয়। অসহায়ভাবে সরকার আজ মজুত-দারদের মুঠোর মধ্যে। দিল্লীতে যখন মজুতদার বিরোধী অভিযান চলছে, গুদাম তল্লাসী চলছে, মজুত খাদ্য উদ্ধার চলছে, রাজস্থানে তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। অথবা বলা যেতে পারে—সরকার আর মজুতদাররা কানামাছি খেলছে। সেক্রেটারিয়েট প্রাঙ্গণে খাদ্য-ব্যবসায়ীরা এক সভায় সমবেত হয়ে খাদ্য কমিশনারের কাছে প্রতিজ্ঞা করে তারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয় করবে, এবং নিয়ন্ত্রণ-দরটা নিজেরাই ঠিক করবে। সুতরাং সরকারের আর কিছু করণীয় নেই বলেই কর্তৃপক্ষ মনে করে।

তারপরে যে ঘটনাগুলি ঘটছে, তাতে আমাদের হিতোপদেশের 'বৃদ্ধ নখদন্তহীন ব্যাঘ্র ও ব্রাহ্মণ উপাখ্যানে'র কথা মনে পড়ছে। উপাখ্যানের বাঘের নখদন্ত ছিল না, তবু ব্রাহ্মণ রক্ষা পায় নি। আর এই মানুষখেকো বাঘগুলি নখদন্তহীন তো নয়ই, তার উপর লোকালয়ে বাস করে। হিংস্রতায় এরা বনের বাঘের চেয়েও অনেক বেশি।

সভা-ফেরত ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রিত দর ঘোষণা করলো—প্রতি কুইণ্টল ৬৫৲ টাকা। সরকারের সঙ্গে যেন রসিকতা করার মত শোনালো! জয়পুরে একটিমাত্র আটার কল আছে, এই কল থেকে আটা বিক্রি হচ্ছে—কিলো এক টাকা দরে। অথচ সরকার-নিয়ন্ত্রিত দরে এই কলকে গম সরবরাহ দিচ্ছে। আরো বিস্ময়ের কথা যে, রাজ্যের বাইরে আটা চালান দেবার সময় এই মিল ধরা পড়ে। কিন্তু মিলের বিরুদ্ধে কিছু করা হয় না, পরিবর্তে এক ক্ষুদে কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকারের দিক থেকেও এ যেন একটা লোকদেখানো তামাসা। আর একটি ঘটনা আরো চমৎকার! কোটার কালেক্টর দর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগী হলেন। চড়া দামে বিক্রয় করার জন্য তিনি কয়েকজন ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ডিলাররা একযোগে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের শরণাপন্ন হয়। দক্ষিণপন্থী নেতারা সরকারের উপর চাপ দেয়, ব্যস। সরকার তৎক্ষণাৎ ডিলারদের ছেড়ে তো দিলই, উপরন্তু কালেক্টরের কৈফিয়ৎ তলব করলো। ডিলারদের মত মহাশয় ব্যক্তিদের লালসার পথে বাধা দিয়ে কালেক্টর যেন মহা অপরাধ করেছে!

এদিকে জনসাধারন নীরব থেকে ক্রমে সরব হচ্ছে। তাদের দাবীর চাপে সরকার মজুত-বিরোধী অভিযানে নামতে রাজী হয়। সরকার আদেশ জারী করে—প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে তার ষ্টক জানাতে হবে এবং নির্দিষ্ট ষ্টকের বেশি রাখতে পারবে না। কিন্তু লাইসেন্সধারী ষ্টকিষ্টরা সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই নির্দেশের আওতায় আসে না।

রাজস্থানের ব্যাপার আরো ঘোরালো, এবং এখানকার রাজনৈতিক ব্যাপারটা ভারতের অন্য রাজ্যের উল্টো। অন্যান্য রাজ্যে বামপন্থীরা সরকার বিরোধী। এখানে দক্ষিণপন্থী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ এবং সরকার বিরোধী, এরাই আবার খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ী অথবা তাদের চাঁদায় দল চালায়। সুতরাং তারা খাদ্য-সমস্যার সমাধানের জন্য কাজ করার পরিবর্তে সমস্যা-সৃষ্টিকারীদের পক্ষে কাজ করছে।

এই চরম সংকটের দিনে স্বতন্ত্র পার্টি যেন ছুটি ভোগ করছে। মহারাজা এবং মহারাণী ভিলওয়ারা নির্বাচনের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে এখন লণ্ডনে প্রমোদবিহার করছেন। সুতরাং স্বতন্ত্র পার্টির দিক থেকে একটা বিবৃতি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। জয়পুর পৌরসভা স্বতন্ত্র পার্টির দখলে। এখানে একজনমাত্র কমিউনিস্ট সদস্য খাদ্য আলোচনার জন্য মুলতুবী প্রস্তাব আনতে চাইলে তা বাতিল করে দেওয়া হয়।

জনসঙ্ঘের কার্যকলাপ বেশ রহস্যজনক। প্রথমে তারা খাদ্য-সমস্যা নিয়ে বেশ হৈ-চৈ করে। বলা যেতে পারে, অন্য দলের চেয়ে তাদের কার্যাবলী জনসাধারণের বেশি নজরে পড়ছিল। কাওলাতে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিলে জনসঙ্ঘের চাপে সেখানে গম আমদানী করা হয়। কিন্তু গমের দাম ওঠে ৭০৲ টাকা। জনসঙ্ঘ তখনো আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা দেখলো এভাবে আন্দোলন চললে দর কমাবার জন্য লোকে দাবি তুলবে। সুতরাং তারা জনসঙ্ঘের সঙ্গে কথা চালালো এবং চাপও দিল। হঠাৎ দেখা গেল জনসঙ্ঘ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। ব্যক্তিগত মুচলেখা দিয়ে জনসঙ্ঘের কর্মীরা জেল থেকে বার হয়ে এলো। আন্দোলন এখানে শেষ হলো বটে, জনসাধারণ কিন্তু এ থেকে একটা শিক্ষা গ্রহণ করলো।

অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি এখন নিজেদের দলাদলি এবং কি ভাবে এবং কাদের নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হবে, এ নিয়ে বিচার-আলোচনায় ব্যস্ত আছে। কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী দল দেশব্যাপী গণ-সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি করছে। ২৪শে আগস্ট থেকে এই সত্যাগ্রহ সুরু হবে। প্রতীক অনশন-ধর্মঘটে তাদের প্রথম দল অংশগ্রহণ করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে দুটি উপদল এখন প্রায় যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে। এই দুই উপদলের কুম্ভরম আর্য এবং দামোদরলাল ব্যাসকে বিধান-সভায় আনতে চেয়েছে উপ-নির্বাচনে জিতিয়ে। কিন্তু অন্য কংগ্রেস-সদস্যরা এতে রাজী নয়। সুতরাং কংগ্রেস এখন খাদ্য-সমস্যা অপেক্ষা দলীয় সমস্যায় বেশি ব্যস্ত।

কেরালা :

কেরালায় যখন খাদ্য-সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠছে; বিরোধী দল খাদ্য-আন্দোলনে নেমে পড়েছে, কংগ্রেস তখন দলীয় দ্বন্দ্বে রত। দ্বন্দ্বরত দুই দল এই খাদ্য-আন্দোলনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু, আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের দিক থেকে বিচার করলে কংগ্রেসের পক্ষে এই মনোভাব যেন আগুন নিয়ে খেলা। কংগ্রেসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কমিউনিস্ট পার্টি যদিও দ্বিধাবিভক্ত, কিন্তু নির্বাচন-মুহূর্তে তাদের যুক্তফ্রণ্ট কংগ্রেসকে খড়কুটার মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। খাদ্য-সমস্যা মেটাতে কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং

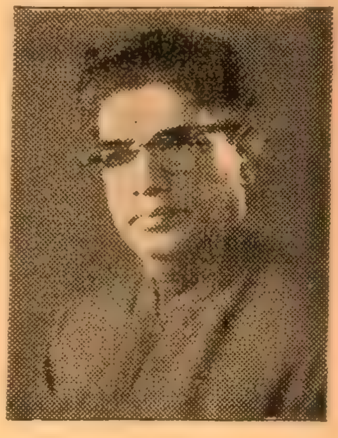

শ্রীশঙ্কর

খাদ্যের দাবিতে আন্দোলন সেই পটভূমি তৈরি করছে।

চাকো-গ্রুপের চারজনের এক প্রতিনিধিদল দিল্লী গিয়েছে। তাদের দাবি অবিলম্বে শঙ্কর-মন্ত্রিত্বের অবসান চাই। এই প্রতিনিধিদল প্রেরণে দলাদলি আরো প্রবল হয়ে সম্পূর্ণ নতুন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীচেরিয়ান কাপ্পান এম-পি। শঙ্কর-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এরা বহুরকমের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে গেছে।

অপর দিকে শঙ্কর-মন্ত্রিসভা থেকে কেন্দ্রকে বলা হচ্ছে যদি এই অসন্তুষ্ট দলের কথায় কর্ণপাত করা হয়, তবে মন্ত্রিসভার মর্যাদাহানি ঘটবে, এবং তার ফলে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে কেন্দ্র এই ব্যাপারে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। যাতে শঙ্কর-মন্ত্রিসভা বহাল থাকে এবং বিরোধী পক্ষ কিছু বলার সুযোগ না পায়, আবার 'চাকো-গ্রুপ'ও অসন্তুষ্ট না হয়; অর্থাৎ আগামী নির্বাচনে ওদের পক্ষে 'সিকা ছিঁড়বে' এমন আশা করতে পারে। সুতরাং আপাতত দুই পক্ষকে বুঝিয়ে রাখার নীতিই কেন্দ্র অবলম্বন করবে।

একদিকে যখন এই দলীয় দ্বন্দ্ব চলেছে, অন্যদিকে মন্ত্রিসভা খাদ্যের জন্য জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষের সম্মুখীন হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য-ব্যাপী খাদ্যের দাবীতে হরতাল হয়ে গেছে। গ্রামাঞ্চলে এবং শহরে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। কেরালা খাদ্যের দিক থেকে ঘাটতি রাজ্য; সুতরাং উচ্চ মূল্যের আঘাত কেরালাকে যে বেশি চঞ্চল করে তুলবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি যে হরতাল ও ধর্মঘট হয়ে গেল, তার আহ্বান জানিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি, পি-এস-পি এবং আর-এস-পি। জনসাধারণ এই হরতালে বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছে। কেবলমাত্র শহরের জরুরী প্রয়োজনের শিল্প ছাড়া প্রত্যেকটি বড় কারখানা থেকে চা ও রবার বাগিচায় পর্যন্ত হরতাল সার্থকভাবে হয়েছে। সমগ্র রাজ্য যেন জীবনহীন হয়ে পড়েছিল। কেবলমাত্র ত্রিচুর এবং তেল্লিচেরিতে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। এই দুই জায়গায় পুলিশ লাঠি চার্জ করে।

এই হরতাল ও বিক্ষোভ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে বিপদসঙ্কেত

● শ্রী ডি পি মিশ্র

এবং বিরোধীদের পক্ষে 'সবুজ আলো' বলে জনসাধারণ মনে করছে।

এই হরতালের ফলেই রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী সংবাদপত্রসমূহের তীব্র আক্রমণের পাত্র হয়েছেন। এমন কি কংগ্রেসের ভিতরেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ ফেটে পড়েছে। ঘটনাটি এই: আলেপ্পির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক 'কনফেকশনারের গুদাম তল্লাসী করে প্রচুর চিনি উদ্ধার করেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই চিনি মজুত করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাময়িকভাবে তার চিনির লাইসেন্স বাতিল করে দেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ জারীর পরমুহূর্তে মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে একটি ইনজাংশন জারী করে পূর্বোক্ত আদেশ বাতিল করা হয়। এবং উপরোক্ত ব্যবসায়ীকে চিনির লাইসেন্স ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এই নাটকীয় ঘটনার ভেতরের রহস্য হলো এই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটি বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার মিসেস নাফিসৎ বিবির স্বামী। সুতরাং দলীয় লোকের মর্যাদা রক্ষার জন্য খাদ্যমন্ত্রী ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর আদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্যবোধ এবং সততাবোধ থাকায় তিনি মন্ত্রীর অনুরোধ রাখতে অক্ষমতা জানান। তার পরবর্তী ঘটনা—মন্ত্রিসভার ইনজাংশন জারী।

মধ্যপ্রদেশ:

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীখাদিওয়ালার পদত্যাগের জের-স্বরূপ রাজ্যের কংগ্রেস রাজনীতিতেও মন্ত্রিসভায় দারুণ এক ঝড় ওঠবার উপক্রম হয়েছে। এই ঝড়ে মন্ত্রিসভায় বিরাট রকমের পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। আর একজন মন্ত্রী শ্রীরাই সম্ভবত মতানৈক্যের দরুণ পদত্যাগ করবেন। এ-কারণে মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের সম্ভাবনা আরো বেশি দেখা যাচ্ছে।

শ্রীখাদিওয়ালার পদত্যাগে শ্রীদেশলেহরা দলের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। দেশলেহরা দল এখন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র তৈরির জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এই অভিযোগপত্র কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের নিকট পেশ করা হবে। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে খাদ্যের ব্যাপারে যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। এই অনাস্থা-প্রস্তাব দেশলেহরা দলের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র এবং মন্ত্রিসভার অনেক

মনে করছেন—বিরোধী পক্ষের আক্রমণ ঠেকাবার জন্য কংগ্রেসের দুই গ্রুপের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত; এবং দেশলেহরা গ্রুপের কয়েকজনকে অন্তিভুক্ত নিয়ে মন্ত্রিসভাকে আরো

● শ্রীঅশোক মেহতা

দৃঢ় করা প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী অপর দিকে চেষ্টা করছেন পি-এস-পির সদস্যদের স্বপক্ষে টেনে আনার জন্য। এই কারণে শ্রীঅশোক মেহতাকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানান হয়েছে ভূপালে আসবার জন্য। তিনি যাতে পি-এস-পির বিধানসভা-সদস্যদের বুঝিয়ে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

এদিকে বিরোধী পক্ষ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেছে। শ্রীখাদিওয়ালার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায় বিরোধীদলের কাছে একটা হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

মহারাষ্ট্র :

খাদ্য সঙ্কট দেশের সাধারণ মানুষের মনে কি প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে, মহারাষ্ট্রে একদিনের সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘট তারই নিদর্শন। মহারাষ্ট্রের স্বতন্ত্র পার্টি ছাড়া অন্যান্য বিরোধী দলগুলির 'মহারাষ্ট্র বন্ধ' বা একদিনের নমুনা ধর্মঘটের ডাকে গত ১২ই আগস্ট সারা মহারাষ্ট্র অচল হয়ে গিয়েছিল। সারা মহারাষ্ট্রে ত্রিশ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ঐ দিন কাজে হাত দেয় নি। ডকে খাদ্য বোঝাই জাহাজ খালাস করা ছাড়া আর সব কাজ বন্ধ, কল-কারখানা বন্ধ, ট্যাক্সি ও বাস বন্ধ, এমন কি হোটেল-রেস্টুরেণ্ট পর্যন্ত বন্ধ। সারা বোম্বাই শহর সরকারী খাদ্য-নীতির প্রতিবাদে যেন একেবারে খাঁ খাঁ করছিল। বিরোধী দলগুলির মুখপাত্র হিসাবে শ্রীডাঙ্গে এবং শ্রী এস এম যোশী বলেছেন, এত বড় সার্থক ধর্মঘট বোম্বাই-এ ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নি। সরকারী হিসাবেও বলা হয়েছে, বোম্বাই শহরে শতকরা ৮৫ ভাগ এবং পুণায় শতকরা ৭৫ ভাগ কাজকর্ম অচল হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি বলা যায়, সরকারী খাদ্য-নীতির প্রতিবাদ জানাবার জন্য বিরোধী দলগুলি যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, মহারাষ্ট্রে শ্রমিক কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ তাতে সাড়া দিয়েছে। সাড়া দিয়েছে এই বিশ্বাসে নয় যে, একদিন কাজকর্ম বন্ধ রাখলেই খাদ্য সঙ্কটের সুরাহা হয়ে যাবে কিম্বা খাদ্যশস্যের চড়া দর হু হু করে

● শ্রী এস এম যোশী

নেমে যাবে। একদিনের এই প্রতীক ধর্মঘটের ভেতর দিয়ে মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ এই কথাটাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, খাদ্য সঙ্কট সমাধানে এ পর্যন্ত সরকারী কর্তারা যা কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা লোকের মনে বিশেষ কোন আস্থার ভাব আনতে পারে নি। জনসাধারণের এই বিক্ষোভের অভিব্যক্তিতে বিরোধী দলদের মুখপাত্ররা স্বভাবতই উল্লসিত হয়েছেন। শ্রীডাঙ্গে বলেছেন—'আমরা গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করে দিতে চাই যে, গভর্নমেণ্টের খাদ্য ও মূল্য-নীতি যদি না বদলায়, তবে সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট সংগঠিত করা হবে'। শ্রী এস এম যোশীও বলেছেন, গভর্নমেণ্টের নীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের রায়ের প্রকৃত তাৎপর্য যদি সরকারী কর্তারা বুঝতে না চান, তবে 'সংগ্রাম আরও জোরদার' করা হবে।

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায়ণ

মূল্য ৩ই টাকা

"অমূল্য গ্রন্থ হয়েছে"—স্বামী অপূর্বানন্দ।
"বইখানি নতুন ধরণেরই হয়েছে।"
—স্বামী সদাত্মানন্দ।

"বইখানি দেখিতে সুন্দর, বিষয়বস্তু অমূল্য ও অতুলনীয়। একখানি গ্রন্থে এত মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ পূর্বে আর হয় নাই।" —স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী।

নূতন উপন্যাস—নূতন সৃষ্টি
বর্তমান সময়ের সমস্যা ও
তাহার সমাধান

শ্যাম-সোহাগিনী

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত

মানুষ ভুল করে কিন্তু মানুষের মন যদি পবিত্র থাকে, তবে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না মূল্য ১।।০ টাকা

স্বনামধন্য কথাশিল্পী

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

স্বর্গাদপি গরীয়সী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড), দৈনন্দিন ও বসন্তে। মূল্য—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

আন্তর্জাতিক

● জর্জ গ্রিভাস নিকোসিয়া শহরের আশেপাশের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিদর্শন করছেন।

সাইপ্রাস ঃ

সাইপ্রাসের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে তুর্কীপ্রধান কোক্কিনা গ্রামে অতর্কিত তুর্কী বোমারু বিমানের আক্রমণের ফলে যে গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল, রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে আপাতত তা দূর হয়েছে। তুরস্ক আক্রমণ বন্ধ করতে স্বীকৃত হয়েছে।

সাইপ্রাস দ্বীপে গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ এখনও পুরোপুরি থামে নি। রাষ্ট্রসংঘ তদারকি-বাহিনীর উপস্থিতিতে ব্যাপক গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু ইতস্তত ঘটনা প্রায় লেগেই আছে। কয়েকদিন ধরে গ্রীকরা তুর্কী-অধ্যুষিত কোক্কিনা গ্রাম অবরোধ করে থাকায়, তুর্কী অধিবাসীদের রক্ষা করার জন্য তুরস্ক জেট বিমান থেকে এখানে আক্রমণ চালিয়েছে। তুরস্কের বিমান থেকে ভয়ঙ্কর নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া মানসুরা অঞ্চলে তুর্কী যুদ্ধ-জাহাজ থেকেও গুলীবর্ষণ করা হয়েছে।

সাইপ্রাসের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তুরস্কের এই হস্তক্ষেপ এবং জেট বিমান ও যুদ্ধ-জাহাজ থেকে বেপরোয়া বোমাবর্ষণকে সাইপ্রাস ও গ্রীস 'নগ্ন আক্রমণ' বলে অভিহিত করেছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই ঘটনায় বিচলিত বোধ করেছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জনসন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনুর কাছে আক্রমণ বন্ধ করার জন্য আবেদন করেছেন; সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তিনি গ্রীক প্রধানমন্ত্রী পপিনড্রিউকে সংযত থাকতে অনুরোধ করেছেন।

তুর্কী আক্রমণের হাত থেকে সাইপ্রাসকে রক্ষা করার জন্য সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স সোভিয়েট ইউনিয়নকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন। ম্যাকারিয়স সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নাসেরের কাছেও সামরিক সাহায্য চেয়েছেন। ক্রুশ্চেভ ও নাসের উভয়েই সাইপ্রাসকে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সাইপ্রাসের ওপর তুরস্কের 'জলদস্যুসুলভ হামলা'র তীব্র নিন্দা করেছেন।

ইতিমধ্যে এই ঘটনা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ওঠে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট সাইপ্রাস-পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। নিরাপত্তা পরিষদ তুরস্ককে আক্রমণ বন্ধ করতে অনুরোধ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সাইপ্রাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রসংঘ তদারকি-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কে এস থিমায়াকে তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেয়া হয়।

তুরস্ক সরকার নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী সাইপ্রাসের ওপর আক্রমণ বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে। কিন্তু এই সঙ্গে তারা ঘোষণা করেছে, যদি সাইপ্রাসের তুর্কী অধিবাসীদের ওপর গ্রীকদের হামলা বন্ধ করা সম্ভব না হয়, তবে তুরস্ক 'সর্বপ্রকার আইনসম্মত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা' (full legal retaliatary measures) গ্রহণ করবে।

নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় সাইপ্রাসের ওপর তুরস্কের বিমান পর্যবেক্ষণের দাবী বৃটেন ও মার্কিন

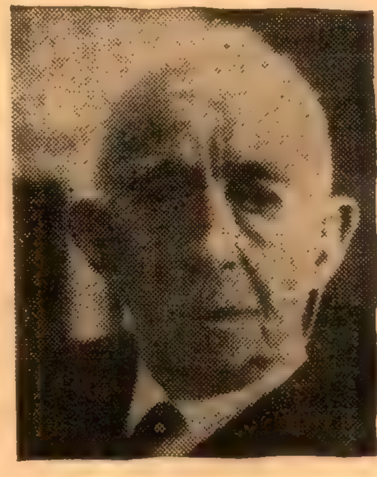

* ইসমেট ইনোনু

যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করায় গ্রীস ও সাইপ্রাস অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছে। গ্রীক প্রতিনিধি ডিমিট্রি বিটসয়েস ও আইভরি কোস্টের প্রতিনিধি উসের এইরূপ বিমান পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরোধী বলে এর তীব্র বিরোধিতা করেন। তুরস্কের প্রতিনিধি ওরহান এরালফের বক্তব্য, সাইপ্রাসের সংখ্যা-লঘু তুর্কীদের রক্ষার ব্যাপারে তুরস্কের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

এদিকে তুর্কী আক্রমণের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীরা তাদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে দৃঢ় করার জন্য চেষ্টা করছে। জাতীয় মুক্তি-ফৌজের সর্বাধিনায়ক লে: জে: জর্জ করায়ান্নিস পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় সর্বাধিনায়ক হয়েছেন সাইপ্রাস মুক্তি-সংগ্রামের বিখ্যাত নেতা, প্রাক্তন 'ইয়োকা' প্রধান জেনারেল জর্জ গ্রিভাস। গ্রিভাস সাইপ্রাসের তুর্কী সংখ্যালঘুদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে এবং তুরস্কের ভবিষ্যৎ কোন আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সকল গ্রীক সাইপ্রাসবাসীকে সর্বপ্রকার আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘ-বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল থিমায়া সাইপ্রাসের উপদ্রুত অঞ্চলগুলি সফরের পর নিকোসিয়ায় ফিরে এসে বলেছেন, বর্তমানে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে, তবে এ যেন অনেকটা 'হাঁফ ছাড়ার সময়', যে-কোন মুহূর্তে নতুন করে আক্রমণ সুরু হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

এবার খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সুরু হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্ল্যাক মুসলীম' আন্দোলনের নেতা এলিজা মুহম্মদ গত ৯ই আগস্ট লস এঞ্জেলসের অলিম্পিক অডিটোরিয়ামে পাঁচ হাজার নিগ্রো মুসলমানদের এক সভায় বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিগ্রোরা পৃথক জাতি, সুতরাং তাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পৃথক ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের অধিকার মেনে নিতে হবে। এলিজা মুহম্মদ এই সভাতেই ঘোষণা করেন, 'আল্লার ইচ্ছায়' ১৯৭০ সালের মধ্যেই নিগ্রোদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

নিগ্রোদের মধ্যে বেশ কিছু-সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এলিজা মুহম্মদ এদের নেতা। এরা নানা স্থানে ফ্যাসিস্টদের মত সংগঠন গড়ে তুলেছে। এখনও এদের আন্দোলন খুব জোরদার হয় নি। কিন্তু সত্যি-সত্যি যদি অনেকেই এই দাবীর পেছনে এসে দাঁড়ায়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রীতিমত ফাঁপরে পড়তে হবে।

বৃটেনেও মুসলমান ধর্মাবলম্বী ও নিগ্রোদের সংখ্যা কম নয়। কোন কোন অঞ্চলে এরা বিপুল সংখ্যায় বাসও করে। সেখানে এ রকম একটা পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী যদি মুসলমানরা উত্থাপন করে তবে বেশ হয়, ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তানের দাবী সমর্থনের উচিত শিক্ষা দেয়া যায় বৃটেনকে।

বৃটেন :

বৃটেনের পথে-ঘাটে বর্তমানে এক নতুন উপদ্রব সুরু হয়েছে। 'মড্‌স ও রকার' বলে পরিচিত একদল ছেলেমেয়ে চরম গুণ্ডামী আরম্ভ করেছে।

এলিজা মুহম্মদ

• পুলিশ 'মড ও রকার'দের সংযত রাখার চেষ্টা করছে

ছুটির দিনে বিশেষ করে এদের গুণ্ডামী বৃদ্ধি পায়। পরস্পরের মাথা ফাটিয়ে রক্ত বের করে, জামা-কাপড় ছিঁড়ে এরা আনন্দ পায়। ছুটির সময় অবসর যাপনের ঘাঁটিগুলিতে এরা দলে দলে গিয়ে উৎপাত সুরু করে। এর ফলে কেবল মাথা ফাটাফাটিই হচ্ছে না, সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে ও ছুটির দিনের আনন্দ মাটি হচ্ছে। সর্বত্র এদের সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা যাচ্ছে।

পুলিশ নানাভাবে চেষ্টা করেও এদের সামলাতে পারছে না। জেল বা জরিমানায় এদের কিছু হচ্ছে না। এদের বাপ-মাকে জরিমানার অর্থ দিতে হচ্ছে। দু'চার দিন জেলে থেকে, বেরিয়ে এসে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে হামলা সুরু করে। অনেকে মনে করছেন, দীর্ঘদিন এদের জেলে আটকে রেখে পরিবর্তনের চেষ্টা করলে কিছু ফল হতে পারে।

সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদরা বলছেন, উপযুক্ত জীবনধারণ ব্যবস্থার অভাব, শহরে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের স্থানাভাব, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ও বাপ-মায়ের উদাসীনতাই এই সব 'মড' ও 'রকার' সৃষ্টির কারণ। জনসাধারণের নির্লিপ্ত মনোভাবও এদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এদের গুণ্ডামীকে প্রতিরোধ না করে অধিকাংশই এড়িয়ে যেতে চায় এবং তার ফলে এরা প্রশ্রয় পাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ভারত সর্বত্র আজ যুবজীবনে একই রকমের হতাশা ও তজ্জনিত উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রবণতা।

ভিয়েৎনাম •

টংকিং উপসাগরে মার্কিন ডেস্ট্রয়ার-এর ওপর উত্তর ভিয়েৎনামের টর্পেডো বোটের আক্রমণের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশোধমূলক-ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও যুদ্ধের বিস্তার হয় নি। উত্তর ভিয়েৎনামের কয়েকটি টর্পেডো কেন্দ্র ও পেট্রোলিয়াম-ঘাঁটির ওপর মার্কিন বোমারু বিমানের বোমাবর্ষণকে উত্তর ভিয়েৎনাম, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন সকলেই 'নির্লজ্জ আক্রমণ' বলে বর্ণনা করেছে এবং এর পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মার্কিন হামলার কোন পাল্টা আক্রমণ উত্তর ভিয়েৎনাম বা চীনের পক্ষ থেকে করা হয় নি।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন আবার ঘোষণা করেছেন, এই অঞ্চলে যুদ্ধকে বিস্তৃত করার কোন উদ্দেশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। মার্কিন ডেস্ট্রয়ারের ওপর অন্যায়ভাবে হামলা করা হয়েছে বলে কমিউনিস্ট-আক্রমণ প্রতিরোধ ও মার্কিন-মর্যাদা রক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পাল্টা আক্রমণ করতে হয়েছে। তবে, এই ঘটনার থেকে যদি বড় রকমের কোন সংঘর্ষ সুরু হয়, তার জন্যও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত। সপ্তম নৌ-বহর তৈরি হয়েই আছে। মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষ প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে জনসনকে এই বিষয়ে যে-কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর সায়গনে সাংবাদিকদের বলেছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ না-করতে পারলে সর্বত্র স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন ও তার তাঁবেদার উত্তর ভিয়েৎনামের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নেগুইন খান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের

• ম্যাক্সওয়েল টেলর

সর্বত্র জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন। তিনি দেশের উত্তরাঞ্চল সফর করে এসে বলেছেন, উত্তর ভিয়েৎনামে ব্যাপক চীনা সৈন্য সমাবেশ হয়েছে এবং যে-কোন মুহূর্তে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ওপর উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের যুক্ত আক্রমণ সুরু হতে পারে। নেগুইন খান আশংকা করছেন, দানাং ও হিউ অঞ্চলে প্রথম আক্রমণ আরম্ভ হবে। পিকিং রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, চীনে ব্যাপকভাবে গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এবং মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জনগণ প্রস্তুত হচ্ছে।

ভিয়েৎনামে মার্কিন বিমান-বাহিনীর প্রতিশোধমূলক আচরণ কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। চীন ও সোভিয়েট সমর্থকরা তো এই ঘটনার নিন্দা করবেই, জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিরও অধিকাংশের মনোভাব, মার্কিন কার্যের ফলে যুদ্ধের আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি বৃটেনের উদারনৈতিক পত্রিকা 'গার্ডিয়ান' পর্যন্ত এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনা করেছেন। ভারত সরকারও পরিস্থিতির অবনতিতে অত্যন্ত বিচলিত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং ১৯৫৪ সালের অবস্থায় ফিরে যাবার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন। ইন্দো-চীন এলাকা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি ভারত। মার্কিন-আক্রমণের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ জানিয়ে উত্তর ভিয়েৎনাম আবেদন করবে শোনা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভারতকে এই সংকটে মধ্যস্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েৎনামে যে-কোন অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। চীনও সারা দেশে ব্যাপক সমরপ্রস্তুতি সুরু করেছে। তবুও টংকিং উপসাগরের ঘটনার পর আর কোন বড় রকমের ঘটনা ঘটে নি। এর কারণ কি? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সত্যিই ঠিক এই মুহূর্তে বড় রকমের কোন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে চায় না। আর চীন যতই ধমকাক, শেষ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মুখ সমরে সে নামবে না। কারণ চীন যতই যুদ্ধবাজ হোক না কেন, এ কথা চীনের বেশ ভাল রকমই জানা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

কঙ্গো :

ময়সে টি শোম্বে কি তাহলে ব্যর্থ হলেন? দেশে ফিরে যখন টি শোম্বে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করলেন তখন অনেকেই আশা করেছিলেন, তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করতে পারবেন, বিদ্রোহ দমন করতে পারবেন এবং কঙ্গোর বিবদমান সকল পক্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করে

• সুমালিয়ত

জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। কিন্তু এর কোনটাই তিনি করতে পারেন নি।

বিদ্রোহীদের সঙ্গে টি শোম্বে যে আপোষের চেষ্টা করেছিলেন, তা ব্যর্থ হয়েছে। লুমুম্বাপন্থী বিদ্রোহী-দের নেতা পিয়েরে মুলেলে ও এমিল সুমালিয়ত টি শোম্বে বা জোসেফ কাসাভুভুর সঙ্গে কোনরূপ আপোষ করতে সম্মত হন নি।

গত তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে বিদ্রোহীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছে। কঙ্গোর তৃতীয় বৃহত্তম শহর স্ট্যানলিভিল তারা দখল করেছে। জাতীয় মুক্তি কমিটির গণবাহিনীর সৈন্যদের তীর-ধনুকের কাছে মবুটুর মার্কিন অস্ত্রসমৃদ্ধ কঙ্গোলীজ সৈন্য-বাহিনীর সৈন্যরা পিছু হঠেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই বিদ্রোহীদের হাতে। নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও লিওপোল্ডভিল সরকারের কোন অস্তিত্ব নেই।

স্ট্যানলিভিল দখলের ফলে বিদ্রোহীদের পক্ষে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ করা সহজ হবে। বিমান-পথেই তারা এখন চীন তো বটেই, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র থেকেও সাহায্য আনতে পারবে।

টি শোম্বের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় নেই। ইতি-মধ্যেই তিনি বেলজিয়াম সরকারের সঙ্গে আলোচনা সুরু করেছেন। বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য তিনি বেলজিয়ান সৈন্য চান। কঙ্গোর বেলজিয়ান রাষ্ট্রদূত এই সাহায্য সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রাসেলস গিয়েছেন। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও সম্মতি আছে এ ব্যাপারে। ইতিমধ্যেই মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রসচিব এ্যাভেরাল হ্যারিম্যান ব্রাসেলসে গিয়ে বেলজিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল হেনরী স্পাকের সঙ্গে কথা বলেছেন।

কঙ্গোর ঘরোয়া ব্যাপারে আবার যদি বিদেশী সৈন্য আসে, তবে সংকটের সমাধানের পরিবর্তে সংকট আরও তীব্র হবে।

মালয়েশিয়া ঃ

বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দীর্ঘ সফরের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে দমদম বিমান-ঘাঁটিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

টুঙ্কু আবদুল রহমান সাংবাদিকদের বলেন, মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাবের পেছনে চীনের হাত আছে। চীনই ইন্দোনেশিয়াকে ক্রমাগত উত্তেজিত করছে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে । চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়াই (মালয়) প্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতকে সমর্থন করে। এই রাগেই চীন মালয়েশিয়ার শত্রুতা করছে।

টুঙ্কু আরও বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, উভয় রাষ্ট্রই মালয়েশিয়ার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং তারা মালয়েশিয়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া চীনের খুব বড় দোস্ত হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যথেষ্ট দুর্বলতা আছে ইন্দোনেশিয়ার ওপর। তাই যদি সত্যিই মার্কিন কর্তারা টুঙ্কু আবদুল রহমানকে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়াকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে টুঙ্কু আবদুল রহমানের এ এক বড় রকমের কূটনৈতিক জয়।

পাকিস্তান ঃ

পাকিস্তানের সপ্তদশ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের স্রষ্টা কায়েদে আজম জিন্নার ভগ্নী মিস ফতেমা জিন্না পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আয়ুব শাসনের তীব্র সমালোচনা করে মিস জিন্না বলেন, আয়ুব খাঁর তৈরি সংবিধানে দেশের ১০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার লোক ভোটের অধিকারী এবং তাও আবার পরোক্ষ নির্বাচন। এখানে আয়ুবই সর্বেসর্বা।

• আয়ুব খাঁ

গণতন্ত্রের নামগন্ধ এর মধ্যে কোথাও নেই।

সার্বজনীন ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মিস জিন্না পাকিস্তানের অধিবাসীদের দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানে আজ চক্রান্ত, কারসাজি ও স্বার্থপরতার যে পাপচক্র সৃষ্টি হয়েছে তা ভাঙতে না পারলে কায়েদে আজমের স্বপ্ন সফল হবে না।

•   •   •

লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা আয়ুব খাঁকে প্রাচ্যের দ্য গল বলে অভিহিত করেছেন এবং আয়ুবের নবতম 'গ্যলবাদ' সম্পর্কে সাবধান হবার জন্য বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

পাকিস্তান সম্প্রতি ইরান ও তুরস্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অর্থ-নৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার যে চেষ্টা করেছে, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'ইকনমিস্ট' বলেছেন, দ্য গলের মতই আয়ুব খাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। আয়ুব খাঁ নিজেই এই অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে ইউরোপীয় 'কমন মার্কেটের' সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মার্কিন কর্তৃত্বমুক্ত স্বাধীন নীতি গ্রহণের নাম করে পাকিস্তান পশ্চিম এশিয়ায় নিজের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

লাওস

আগামী ২৪শে আগস্ট লাওসের তিন বিবদমান পক্ষের প্রতিনিধিরা প্যারিসে এক বৈঠকে মিলিত হতে সম্মত হয়েছেন। নিরপেক্ষতাবাদীদের নেতা প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভান্না ফুমা, কমিউনিস্টপন্থী প্যাথেট লাও-এর নেতা প্রিন্স সুফানো ভং ও দক্ষিণপন্থী নেতা জেনারেল ফুমি নোসাভান প্যারিস বৈঠকে মিলিত হয়ে চেষ্টা করে দেখবেন, তিন পক্ষ একযোগে লাওস সংকটের সমাধান করতে পারেন কিনা—এদের পক্ষে আবার একত্র সরকার পরিচালনা করা সম্ভব হয় কিনা।

পোল্যাণ্ডের আপোষ প্রচেষ্টার ফলেই শেষ পর্যন্ত তিন পক্ষ এই বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। পোল্যাণ্ড প্রথমে প্রস্তাব করেছিল, তিন পক্ষের এই সম্মেলনে পর্যবেক্ষক-রূপে জেনেভা সম্মেলনের দুই সভাপতি বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সভাপতি ভারত ও দুই সদস্য কানাডা ও পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু শেষে ঠিক হয়েছে কেবলমাত্র লাওসের তিন পক্ষই এই বৈঠকে যোগ দেবে। অন্য কেউ থাকবে না। বৈঠকের বিস্তৃত কর্মসূচী বর্তমানে লাওসে ঠিক করা হচ্ছে।

গ্রন্থ মেলা

ইতশ্চেতঃ—এককলমী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২।
পৃষ্ঠা—২০০, নিবন্ধ সংখ্যা—প্রায় ৮০০
দাম : ৬'০০।

চলতি খবর ও সাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রের একটি 'কলমে'র পরিসরে এককলমীর পরিহাসতীক্ষ্ণ কলমের খোঁচায় হাস্যরসের যে সব বুদ্বুদ উঠেছিল, তাদের ধরে রাখার চেষ্টা এই ইতশ্চেতঃ। এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন—মুহূর্তের বিলীয়মান তীব্র অনুভূতির শাশ্বতরূপও সাহিত্য। সংবাদ—সংবাদই, সাময়িক প্রসঙ্গ সমকালে যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তাও সাময়িক। কিন্তু এরাই যখন রসের ভাটিখানায় চোলাই হয়ে বিন্দুর আকারে দেখা দেয়, তখন এরাই হয়ে দাঁড়ায় রসসাহিত্যবিন্দু—আপন অধিকারেই তারা রসের হাটের স্থায়ী মাল হয়ে থাকার দাবী রাখে।

বঙ্গসাহিত্যের জীবন-রস-রসিক অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক শ্রীপরিমল গোস্বামী-সম্ভূত এককলমীর রসের ভিয়ান যেন জীবন-সায়রের গভীর তলে আলোড়ন, যেন জীবন-সায়রের ওপরের তলায় তির্যক আলোকপাত। একটি পরিপূর্ণ জীবনবোধই আছে এর মূলে। তাই এই রসায়ন এককলমেও এত ব্যাপক, এত ঘন ও এত গভীর।

রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য—অরবিন্দ পোদ্দার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ানা, ২।১; শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২।
দাম : ২'৫০।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার অন্ত নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য নিয়ে কেউ গ্রন্থ রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য উক্ত বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, কিন্তু সে সব প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকা থেকে

জয়শ্রী সেন

খুঁজে পাওয়াই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের কিশোর-সাহিত্য নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁরা উপরোক্ত গ্রন্থটি হাতে পেয়ে নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবেন। গ্রন্থকারদ্বয়ের মধ্যে একজন প্রতিষ্ঠিত গবেষক, অন্য জন খ্যাতিমান কবি। উভয়ের চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধগুলি তাই বহন করে যেমন অনুসন্ধিৎসুর মৌলিকতা তেমনি অক্ষুণ্ণ কাব্যগৌরব। কিন্তু, প্রবন্ধগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—শিশু মনস্তত্ত্বের আলোকে 'কথা ও কাহিনী', 'মুকুট ও রাজর্ষি', 'ডাকঘর', 'শিশু', 'খাপছাড়া, সে, ছড়ার ছবি', 'ছুটির পড়া' ও 'সহজ পাঠের' বিচার। ঐ বিচার কবি সৃষ্টির পটভূমিকায় সুনিপুণ বিচারের মধ্য দিয়ে হওয়ায়—তার রস গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। সহজপাঠ প্রবন্ধটি তথ্য হলেও তার বক্তব্য সম্পর্কে আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। গ্রন্থটিতে শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দুই ঠাকুরের স্বপ্ন' পৃথক প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য চিন্তার মূলানুভূতির যে বিচার করা হয়েছে, তা যেমন সরল তেমনি অনবদ্য।

দোয়েল ফিঙে চন্দনা—শ্যামাপ্রসাদ সরকার। এভারেস্ট বুক হাউস; এ ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২।
দাম : ১'২৫।

ছোট ছেলেদের হাতে তুলে দেবার মত মজার বই এ যুগে প্রায় অচল হয়ে আসছে। দোষটা ছেলেদের নয়, আমাদেরই। কেন না, সমস্যার জালে সেই সব ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, রাজপুত্তুর, রাক্ষসদের গল্প নাকি আটকে গিয়ে খাবি খাচ্ছে। তা ছাড়া আর একটা সমস্যাও আছে। ছেলেদের মন খুশি করার মতো ছবি দিয়ে বই বের করা অনেক খরচের ব্যাপার। অথচ সস্তায় বই বাজারে ছাড়তে হলে খরচ পোষায় না। তবু, এমনি আশ্চর্যের ব্যাপার 'দোয়েল ফিঙে চন্দনায়' এ যুগেও আছে বলার মতো হরেক রকম গল্প, 'আবিষ্কারে'র গল্পটা পড়লে মনে হবে, এ ধরণের আবিষ্কার কি সকল ছেলেই করতে পারে? 'কেন এমন হয়' পড়লে মনে হবে — সত্যি কেন হয়! 'কুমির গল্পে'র সেই কঙ্করনাথ ড্যাং, জবরজং কেমন তা না পড়লে বোঝাই দুঃসাধ্য। সত্যি কথা বলতে কি, 'মামুনের কথা', 'কান্তিকুমারের উপাখ্যান', 'রিঙ্কুর মন', '২৫শে বৈশাখ', 'অবন ঠাকুর', 'বাপুন বাপুন'—সব ছবিতে ভরা মজার মজার গল্প। ছেলে-মেয়েরা এ বই শুধু পেয়েই নয়, দেখেও হবে খুশি।

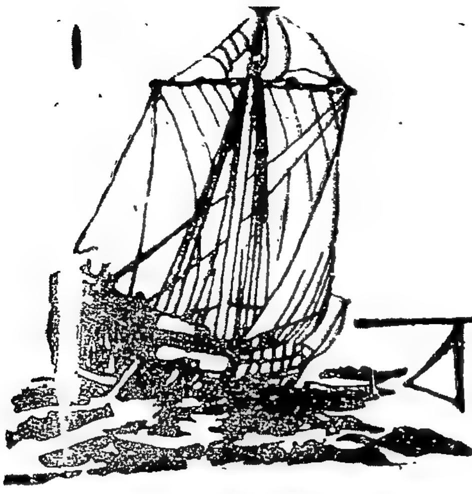

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সপ্তম প্রবাহ ॥

"বুদ্ধজাতকেও আছে
বাঙালীর বাণিজ্যের কথা।"

কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে যে এদেশের সওদাগররা দূরদেশে বাণিজ্য করতে সুরু করেছিল, তার সঠিক হিসাব পাওয়া খুব শক্ত।

বেদ মনুসংহিতার কালে মহর্ষি বশিষ্ঠ সমুদ্রযাত্রা করেছিল। নৌ-বিদ্যা শিক্ষা দিতেন প্রস্কণ্ব ঋষি। এসব কথা আগে বলা হয়েছে।

সুদূর অতীতের স্মৃতির অন্ধকারে যত খোঁজা যাবে ততই বিস্মিত হতে হবে আমাদের পূর্বসূরীদের বিচিত্র কর্মদক্ষতা আর অমিতবীর্য ও সাহস দেখে।

সৃষ্টির প্রাগূষায় মানবসভ্যতার যখন শৈশব, তখন থেকেই মানুষের মনে এসেছে বাণিজ্যের প্রবৃত্তি। ধন-সম্পদের প্রতি লোভ মানুষের সহজাত। আদিম মানুষের যেদিন সমাজবন্ধন ছিল না, পরিবার ছিল না, ছিল না গোষ্ঠী সেদিন হয়তো বাণিজ্য করে দুপয়সা লাভের চেষ্টা তারা করতো না। তারপর যুগের পর যুগ কেটে গেল। যেই পরিবার গোষ্ঠী আর নানা জটিল আইন-কানুনের বন্ধনে সমাজের ভেতরে আবদ্ধ হলো মানুষ, তখুনি প্রয়োজন হলো তার অর্থের। প্রয়োজন হলো তার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততিদের জন্য। সুরু হলো অর্থ উপার্জনের চেষ্টা।

আমাদের দেশের পুরাণে, ইতিহাসে, গল্পে ছড়িয়ে আছে কড়ি দিয়ে লেন-দেনের ইতিবৃত্ত। রূপকথায় তো সওদাগরদের বাণিজ্যযাত্রার ছড়াছড়ি। আরব্যোপন্যাসের নাবিক সিন্ধুবাদ সাতবার সমুদ্রযাত্রা করেছিল।

বণিক সিন্ধুবাদের জবানীতেই বলেছে, I sold all my household goods by public auction, and joined a company of merchants who traded by sea----We set sail and took our course towards the East Indies by the Persian Gulf, having the coast of Persia upon our left hand and upon our right the shores of Arabia Felix.

আমি বাড়ির যাবতীয় জিনিষপত্র ও আসবাব নীলামে বিক্রি করে দিলাম। সমুদ্রে যারা বাণিজ্য করে সেই সওদাগরদের সঙ্গে যোগ দিলাম।-----

একদিন সমুদ্রযাত্রা করলাম। পারস্য উপসাগরের ভেতর দিয়ে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করলাম। বাঁ দিকে থাকল পারস্যের উপকূল আর ডানদিকে পড়ে রইল আরবের উপকূল।

আরব্যোপন্যাস গল্প না কাহিনী না বাস্তবানুগ কোন সত্যঘটনা, সে বিচার পরের কথা। কিন্তু রূপকথা কি কাহিনী গল্প উপন্যাসের ভেতরে সব সময়ই কিছু সত্যবস্তু থেকেই যায়। পাত্র-পাত্রী বা নায়ক-নায়িকা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু তারা যে পটভূমিতে চলাফেরা করে—যে ক্রিয়াকলাপ করে, তার ভিত্তি থাকে সত্যের ওপরে।

সেই সুপ্রাচীন কালে যে পারস্য উপসাগরের নীল জলে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গ্রামে নগরে যে দূরদেশের বণিকদের পদচিহ্ন যে পড়তো—সেই ঐতিহাসিক-সত্যের আভাস আছে আরব্যোপন্যাসের আরও অনেক কাহিনীতে।

আরব্যোপন্যাস কেন, বুদ্ধজাতকও এদেশের সুদূর অতীতের বাণিজ্যের ইতিহাসের অন্ধকারে ফেলে ম্লান মশালের আলো। ভারতের ব্যবসায়ীরা সেকালের ব্যাবিলনের পথে পথে যে তাদের

সওদা ফেরি করে ঘুরতো—বুদ্ধজাতক সেকথাও বলে।

বেভারুজাতক ("বেভারু" কথাটা প্রাচীন ভারতীয় বণিকরা ব্যবহার করতো। ব্যবিলনকে তারা বেভারু বলতো) বলছে, এদেশের ব্যবসায়ীদের অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গল্প।

কাক আর ময়ূর, এই দু'টি পাখী ভারতীয় এবং বাঙালী বণিকরা সঙ্গে নিয়ে বিদেশ যেত। জাতকের পাতায় পাতায় লেখা আছে ভারতীয় পণ্যের অভূতপূর্ব প্রশস্তি।

সমুদ্রবাণিজ্যজাতকে আভাস আছে যে, করাচীর বন্দরে সারি সারি এসে দাঁড়াতো সিন্ধু উপত্যকার তেজস্বী বলশালী অশ্ব। এই অশ্বের খুব আদর ছিল আরবে, পারস্যের নগরে নগরে।

ভারতের পশ্চিম উপকূল নয়; পূর্ব উপকূলেও যে অবাধ বাণিজ্য চলতো, সেকথা আছে কুণ্ডুকাকুচ্চি সিন্ধবজাতকে।

চম্পা।

তাম্রলিপ্ত।

সিংহল।

সুবর্ণভূমি।

এই চারটি প্রাচীন বন্দরের বিবরণ আছে কুণ্ডুকাকুচ্চি সিন্ধবজাতকে। সুবর্ণভূমি মানে নিম্নব্রহ্মদেশ আর সেকালের মালাক্কা। এই দেশে বাঙালী বণিকেরা যেত দলে দলে। ও'দেশের মানুষের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। আর খৃস্টের জন্মের পঞ্চ শতাব্দী পূর্বে ভারত মহাসমুদ্র পার হয়ে গিয়েছিল অমিতবীর্য এক বাঙালীর ছেলে। প্রশস্ত বক্ষদেশ। উন্নত ললাট। আর স্বপ্নাচ্ছন্ন দু'টো বড় বড় চোখ।

মাত্র সাতশো মাল্লা নিয়ে সে সমুদ্র পার হয়ে দূর অজানা দেশে যাত্রা করেছিল। শুধু বাণিজ্য বিস্তার নয়, জয় করেছিল অর্থাৎ 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়'। বৌদ্ধধর্মের এই জাতক-কাহিনীতে আছে—বাঙালীর ছেলে বিজয়সিংহ সিংহলের রাজা হয়েছিল।

দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে আরব সমুদ্র, পূর্বে ব্রহ্মদেশ আর উত্তরে দিগ্‌বিস্তীর্ণ হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী। বাঙালী বণিকের সর্বত্র ছিল অবাধ গতি। হিমালয় পার হয়ে তিব্বত, তিব্বত ছাড়িয়ে মহাচীন—বিদ্যায় সংস্কৃতিতে বাণিজ্যে উন্নত সুপ্রাচীন কালের দেশ। এই চীনের সঙ্গেও বাংলা দেশের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল। চীন থেকে বাংলা দেশে আসতো চিনি আর সিল্কের কাপড়। আর এখান থেকে যেত সোনা, এলাচ, দারুচিনি, আর লবঙ্গ।

চীন ও এ্যাসিরিয়ার বাণিজ্যে বাঙালী সওদাগররা মধ্যস্থতাও করতো। বুদ্ধজাতকে একথাও বলে।

জাতকের পরেই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের কথা মনে হয়। এই মহাগ্রন্থে সেকালের সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৌর্যযুগে জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য বিপুলভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল। আছে নৌ-অধ্যক্ষ, আছে শুল্ক পরিদর্শক ও বাজার পরিদর্শকের কথা। সেই সুদূর কালেও বর্তমানের বাণিজ্যবিমুখ এই দেশের মানুষের ব্যবসার সমৃদ্ধি কত সুদূরপ্রসারী ছিল, তা আমরা আজ বুঝতে পারছি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে আরো আলোচনা পরে করা যাবে।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্যের কথা বলা হচ্ছিল। সেই সুদূর অতীতে চীন আর এই বাংলা দেশের ভেতরে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ এত নিবিড় হয়েছিল যে, কর্নেল বলেছেন—খৃস্টের জন্মের শত শত বছর আগে বাঙালী বণিকরা হিমালয় ডিঙিয়ে দক্ষিণ চীনে পৌঁছতো আবার কোন কোন দল প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরে চীনসাগর পার হয়ে চীনে যেত। আর চীনের সিল্কের বস্ত্র আসতো খচ্চরের পিঠে করে সুউচ্চ হিমালয় ডিঙিয়ে, আসতো বঙ্গোপসাগরের বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্ত।

(ক্রমশঃ)

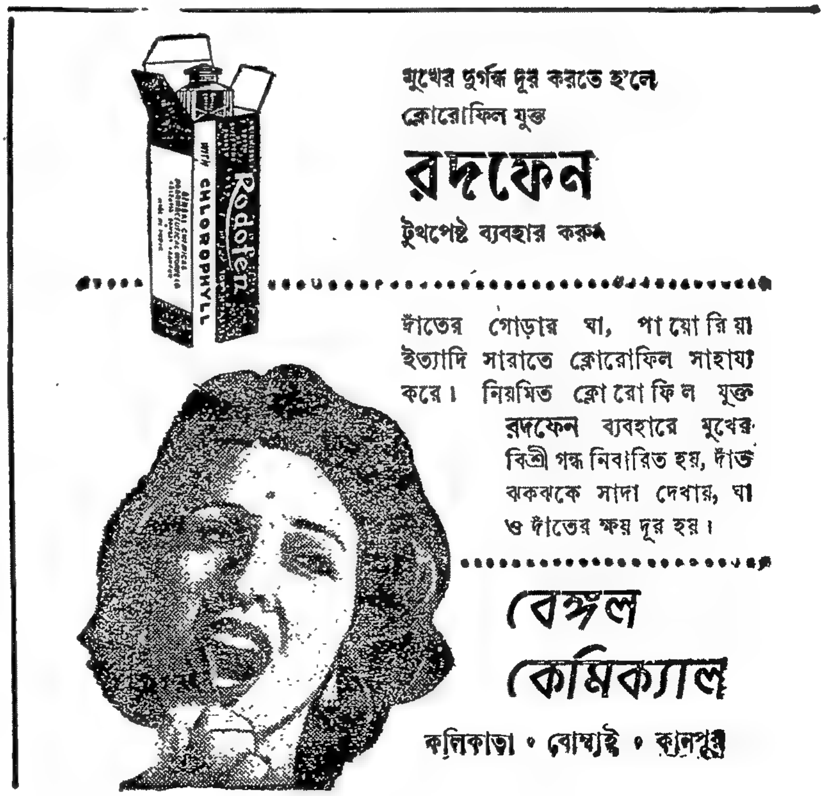

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রামদুলাল দত্ত একসঙ্গে দুটো অ্যাসপিরিনের বড়ি খেলেন। কিন্তু মাথাধরা ছাড়ল না। ঠিক মাথাধরা নয়, মনে হয় মাথার উপর কেউ আধমণ পাথর চাপিয়ে রেখেছে। একটা সাধারণ সুইসাইডের কেস মনে করে সেদিন তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে রওনা হয়েছিলেন। বড়লোক হলেই যত ঝামেলা। সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসারে অভাব-অনটনের ডামাডোলে মানুষ মন নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা নেই ওটা নেই বলে হাজার আক্ষেপ থাকলেও, শেষ পর্যন্ত তারাই দিব্যি হেসে খেলে দিন কাটিয়ে যায়। 'ধুত্তোর' বলে হিজিবিজি কাটা কাগজটার দিকে চোখ ফেরালেন ভদ্রলোক।

সমরেশ সরকার আর মাধবী, মাঝখানে ডাঃ সুনন্দ মিত্র বলে সেই 'মিনমিনে' স্বভাবের লোকটি। শুধু কি একটা ত্রিভুজ, সেই সঙ্গে ডালপালা ও শাখা-প্রশাখারও অন্ত নেই। অথচ গোড়াতে মনে হয়েছিলো জমিদারবাড়ির ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গণ্ডগোল হওয়াতে বৌটি বিষ খেয়ে মরেছে। একটু-আধটু এনকোয়ারি করে বাড়ির সকলকে বিবৃত করে আত্মহত্যার কেস হিসেবে একটা নোট দিলেই ঝামেলা চুকে যাবে। এখন যতই এগোচ্ছেন, ততই যেন জটিলতার জাল আঁকে মাকড়সার মত ঘিরে ফেলছে। দার্জিলিংয়ে শীতকালের কুয়াশার কথাও মনে হোল একবার। কয়েক বছর আগে আট মাসের জন্য সেখানে পোস্টিং হয়েছিলেন। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, শরীরে রক্ত নয়, বরফজল চলাচল করছে—এমনি হাড়-কাঁপানো অবস্থা। আর সে সঙ্গে কুয়াশা। ঘন মেঘের মত অন্ধকার চোখ-ধাঁধানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। একহাত দূরের মানুষকেও চেনা যায় না। দার্জিলিং ছেড়ে আসবার সময় হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন রামদুলাল দত্ত।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডায়েরীর পাতা খুলে বসলেন ভদ্রলোক। অপর্ণা লাহিড়ী। বয়স একত্রিশ। ঠিকানা পার্ক স্ট্রীটের একটি নামজাদা ম্যানশনের ফ্ল্যাট। একাই থাকে, স্বামীর সঙ্গে বহুদিন ছাড়াছাড়ি। অতি আধুনিক সাজপোষাক ও ভাবভঙ্গী। স্বভাব-চরিত্র সন্দেহজনক। বিলিতি কোম্পানীতে স্টেনো টাইপিস্টের কাজ করে।

মোটিভ—মাধবী সরকারের উপর ঈর্ষা ও আক্রোশ ও সমরেশ সরকারের প্রতি দুর্বলতা। মাধবী না থাকলে পথ পরিষ্কার—লাইন ক্লিয়ার।

সুযোগ—ঘটনার দিন সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিল। মাধবী শরবতের গ্লাস হাতে ড্রইংরুম ছেড়ে লাইব্রেরীতে যাওয়ার আগে প্রথমে অপর্ণাকে অর্কিড দেখাতে বারান্দায় নিয়ে যায়। সেখানে তাদের কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। 'তুমি নিজেও ভোগ করবে না, অপরকেও করতে দেবে না'—অপর্ণার বেশ উঁচু গলায় বলে ফেলা এই কথাটা অন্তত দুজনের কানে গেছে। শরবতের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে দেওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসুবিধাজনক ছিলো না।

প্রমাণ—ঘটনার পনের দিন আগে কোনো এক বিদেশী কেমিস্টের দোকান থেকে ইঁদুর মারার নাম করে কিছু হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড সে জোগাড় করেছে।

রামদুলাল দত্ত এবারে ডায়েরীর দ্বিতীয় পাতায় চোখ ফেরালেন। কমলেশ বসু। বয়স পঁয়তাল্লিশ। ধরাবাঁধা পেশা কিছু তেমন নেই। বিদেশী পাবলিশারের বই অনুবাদ করে এবং বে-সরকারী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের টিউটোরিয়াল ক্লাশ খুলে, অবশ্য রোজগারের অসুবিধা হয় না। অবিবাহিত এবং স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে লোকের মুখে কিছু কিছু দুর্নাম শুনতে পাওয়া যায়।

মোটিভ—অস্পষ্ট। মাধবী সরকারের সঙ্গে বহু বছরের ঘনিষ্ঠতা। অতীতের রাগ পুষে রাখা অসম্ভব নয়। ঘটনার দিন বিকেলে মাধবী সরকারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিলো। (পুলিশের কাছে যা বেমালুম গোপন করা হয়েছে!) নীচের ঘরে এক্সটেনশন্ থাকাতে সেক্রেটারী অনিল বিশ্বাস ওদের কথাবার্তার শেষ অংশটুকু শুনেছিলো। মাধবী খুব উত্তেজিত গলায় বলছিলো—'না, না—এ হতেই পারে না। অসম্ভব।'

'অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।' কমলেশ বসুর উত্তর বেশ ঠাণ্ডা ও নিরুত্তাপ।

'তুমি সাংঘাতিক লোক—

মানুষকে বোধ হয় বিষও খাওয়াতো আরো দরকার হলে।

• 'কেন পারবো না?' আমাকে কি তুমি সমরেশের মত অপদার্থ মনে কর নাকি? এ তো আর ডুয়েল লড়ার যুগ নয়—এখন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছলে বলে কৌশলে যে করেই হোক'—ব্যস্, বাকিটুকু আর শুনতে পারা যায় নি।

সুযোগ—ঘটনার দিন কমলেশ বসু অন্য অতিথি-অভ্যাগতদের আগেই এসেছিলো। মাধবী অপর্ণা লাহিড়ীর সঙ্গে অর্কিডঘর থেকে ঘুরে আসার পরে লাইব্রেরীতে যায় এবং সাড়ে দশটায় কমলেশ বসুই শেষবার তাকে জীবিত অবস্থায় দেখে। বিষ মিশিয়ে দেওয়া তার পক্ষে খুবই সহজ ছিলো।

প্রমাণ—ঠিক পাওয়া যায় নি।

রামদুলাল দত্ত কমলেশ বসুর পরে সুনন্দ মিত্র, সমরেশ সরকারের নাম দুটো লাল কালি দিয়ে চিহ্নিত করে কপালটা টিপে ধরলেন। রগের কাছে শির দুটো দপ্‌দপ্‌ করছে। দুটো অ্যাসপিরিনের কর্ম নয়, আরও কড়া ওষুধের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হোত।

এ ছাড়াও অনিল বিশ্বাসের নাম তখন থেকে মনে কাঁটার মত বিঁধছে। সমরেশ সরকারের সেক্রেটারী —খুব কর্মঠ, বিশ্বাসী, কর্তব্যপরায়ণ ছেলেটি। সায়েন্সের ছাত্র হিসেবে নাম ছিলো এককালে, ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ফার্মেসীর প্রোপাইটার সদানন্দ ভৌমিক 'ওকে এককথায় চারশ' টাকা মাইনে দিয়ে কাজে ঢোকাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে কেন যে তার নিজের লাইন ছেড়ে এখানে এসে ঢুকল, সেটাই কুয়াশার মত আবছা ঠেকছে।

তাছাড়া ছেলেটির কেমন যেন হেঁয়ালীভরা হাবভাব। বরুণেন্দ্র বসাক জোর গলায় বলছেন মাধবী সরকারকে একেবারে অজ্ঞান অবস্থায় দেখার কথাটা সত্যি নয়। বিষ খেয়ে লোকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, অজ্ঞান হয় না। তাছাড়া ছেলেটি গোড়ায় 'আত্মহত্যা' বলে প্রমাণিত করার জন্যে কেমন উঠে পড়ে লেগেছিল। তারপর পুলিশের সন্দেহ ক্রমশ বাড়ছে টের পেয়ে ক্রমাগত অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেই চলেছে। লোকটি যেন স্পাই। সারাক্ষণ কে কোথায় কি করছে বা বলছে, সবই ওর নখদর্পণে। যে কটি পজিটিভ প্রমাণ পাওয়া গেছে, সবই ওর কল্যাণে।

কিন্তু এভাবে ও যে নিজেকেও পুলিশের সন্দেহের পাত্র করে তুলেছে, অনিল বিশ্বাস সে কথাটা নিশ্চয়ই তলিয়ে দেখে নি। মোটিভ ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু সুযোগ-সুবিধার অভাব ওর ছিল না। যে অপরাধী, তার সাইকোলজি হোল অপরের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটানো। কেন্দ্র থেকে দূরে মনকে সরিয়ে নেওয়া। অনিল বিশ্বাসের এলোমেলো অভিযোগের ফলে এখন এক-একবার এক-একজনকে প্রায় নিশ্চিত হয়ে অপরাধী বলে চিহ্নিত করতে ইচ্ছে হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণাও বেড়ে চলেছে। তার উপর বরুণেন্দ্র বসাকের বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলো আরও ভীতিজনক।

ঘড়িতে দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বরুণেন্দ্র বসাকের মৃদু করধ্বনির শব্দ পাওয়া গেল দরজার গায়ে।

'আসুন, আসুন'—জোর করে হাসলেন রামদুলাল দত্ত। হাসি তাঁর একটুও পায় নি। এমন কি সৌজন্য জানাতেও উৎসাহ ছিল না। এখনই আবার একরাশ নতুন আবিষ্কৃত তথ্য শুনে গোলমেলে কেসটা আরও অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠবে। উপসংহারের ক্ষীণতম রেখাটুকুও মিলিয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে।

'আপনার কি শরীর ভাল নেই?' বরুণেন্দ্র বসাক সহানুভূতি জানালেন মৃদু গলায়—'অবশ্য শরীরের আর দোষ কি? যেভাবে একনাগাড়ে খেটে চলেছেন।'

'খাটতে আমাদের আপত্তি নেই মশাই'—রামদুলাল দত্ত ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—'তবে এই রকম বেয়াড়া কেস জন্মে দেখি নি। সবগুলো লোক কি আগাগোড়া থিয়েটার করছে, আর মুখস্থ করা মিথ্যা কথাগুলো বলে চলেছে। কলিযুগে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির মেলে না স্বীকার করি। তা বলে মিথ্যা বলারও একটা সীমা আছে।'

'আপনি ভুল করছেন মিঃ দত্ত'—বরুণেন্দ্র বসাক হাসলেন—'আমরা বেশির ভাগ সময়ে মিথ্যাকেই আশ্রয় করি। নিজেকে পর্যন্ত মিথ্যার ছলনায় ভুলিয়ে রাখি নানাভাবে। আমার কাছে এমন রুগীও এসেছে, ছলনায় অভ্যস্ত যার মন মিথ্যাকে সত্যি বলে অক্লেশে মেনে নেয়। যাই হোক, আমি যে কেন আপনাদের কাজের মধ্যে ঢুকে অনধিকার চর্চা করছি, সেই কথাটিই খুলে বলতে ছুটে এলাম। আপাতদৃষ্টিতে হয় স্বামী, নয় প্রণয়ী কেউ একজন মেয়েটিকে খুন করেছে। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অত সোজা নয়। এর পেছনে রয়েছে একটি অসাধারণ ক্রিমিনালের ব্রেন। খুব ইনটারেস্টিং কেস—তাই তাকে ধরার জন্যে আপনাকে এত তাগাদা দিচ্ছি।'

'আরে মশাই, কথায় বলে—যে যার তালে আছে। আপনি তো আপনার 'কেস' নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে খুনীটাকে ধরতে না পারলে এই প্রমোশনের যুগে আমাকে একেবারে বেইজ্জৎ হতে হবে না!'—রামদুলাল দত্ত সজোরে দাগ কাটতে গিয়ে পেনসিলের শিষ মট্‌ করে ভাঙলেন। —'ওসব কথা রেখে এবারে কাজের কথায় আসুন। কাকে কাকে গ্রেপ্তার করা যায়, সেই লিস্টিটাই বরং করে

ফেলা যাক। আমি তো দেখছি ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।'

'কেবল একটি মানুষ ছাড়া'—ডাঃ বসাক কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলেন হাল্কা করে—'সত্যজিৎ সামন্ত। বেচারীর নাকি হার্টের অসুখ। চলুন না, তাঁর বাড়িতে যাওয়া যাক। ভদ্রলোকের সঙ্গে একলা কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলে হয়তো নতুন কোন ফ্যাক্ট আমরা পেয়ে যেতেও পারি।'

'পড়েছি মোগলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে'—রামদুলাল দত্ত অসহায়ভাবে তাকালেন।

বরুণেন্দ্র বসাক বয়সে বড়, কিন্তু শরীরটাকে ঠিক লোহার মত শক্ত রেখেছেন। কোনো সময়ে ক্লান্ত হতে তাঁকে দেখা যায় নি আজ পর্যন্ত।

'আমার কেবল একটি ভয় আছে'—যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন বরুণেন্দ্র—'মানুষ একবার খুন করে যদি সকলের চোখে ধোঁকা দিতে পারে, তাহলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকখানি বেড়ে যায়। তার ফলে সামান্য কারণেও দ্বিতীয়বার হত্যা করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। সেই কারণেই সমরেশ সরকার আর সুনন্দ মিত্রকে আপনাদের একটু নজরবন্দী করে রাখা দরকার।'

'বাঁচালেন মশাই'—রামদুলাল দত্ত আশ্বস্ত সুরে বললেন—'তার মানে ঐ দুজনের একজনকে খুনী বলে সন্দেহ করছেন তাহলে। পুলিশ তো যাকে সন্দেহ করবার, তাকেই করে। গোলমাল বাধায় এই শখের গোয়েন্দারা। আজগুবী ডিটেকটিভ গল্পের মত এমন একজনকে হয়তো ফস্ করে খুনী বলে প্রমাণিত করে বসে, যার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। অথচ রিয়েল লাইফ-এ কখনও তা হয় না। এই যে আপনি সেদিন অপর্ণা লাহিড়ী, কমলেশ বসু, অনিল বিশ্বাস—এই তিনজনের বিরুদ্ধে নানা কথা লাগিয়ে গেলেন, তারপরে আমি তো আর মন থেকে ওদের কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছি না। পাঁচ-পাঁচটা সাস্পেক্ট হলে কি করে শেষরক্ষা হবে মশাই। এর ওপরে ভাগ্যিস আবার বসন্ত মল্লিক অথবা সত্যজিৎ সামন্তকে ঢোকান নি। তাহলে আমাকেই সায়ানাইড খেতে হোত।'

'বসন্ত মল্লিককে অত ভালো মানুষ মনে করবেন না মিঃ দত্ত।' গাড়িতে উঠে বরুণেন্দ্র বসাক চাপা সুরে বললেন—'লোকটা এখনও মিথ্যা কথা বলছে। মাধবী সেদিন ওর অফিসে শুধু একটা চিঠির প্যাকেট রাখতে যায় নি। ওর হাতে একটা চৌকো বড় বাক্সও ছিলো। সম্ভবত ওর গয়নার বাক্স। যে গয়না ও ওর পালিকা মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিলো। তাছাড়া টাকার অঙ্কটাও ভদ্রলোক কমিয়ে বলেছেন। মাধবীর নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে প্রায় সতেরো হাজার টাকা ছিলো। মারা যাওয়ার দু-তিনদিন আগে ও সমস্ত টাকাটা উইথড্র করে বসন্ত মল্লিকের অফিসে গচ্ছিত রাখতে যায়। কনভেণ্টে যাওয়ার সময় টাকাটা নিশ্চয় সে আবার চেয়ে নিয়ে যেতো।'

'আপনি এত কথা কি করে জানলেন'— ভুরু কুঁচকে তাকালেন রামদুলাল দত্ত—'এসব কথা কি অনেকটা গল্পের বইয়ের মতো শোনাচ্ছে না?'

'আজ্ঞে না। মিলিয়ে নিন প্রমাণগুলো। কুমুদ বড়ুয়া বলে ছেলেটিকে ডেকে কথাবার্তা বলছিলাম। মাধবী যখন বসন্ত মল্লিকের ঘরে কথাবার্তা বলছিলো, না জেনে একটা জরুরী ফাইলে সই করাতে ও ঢুকে পড়ে। টেবিলে একটি বাদামী কাগজ মোড়া ছোট প্যাকেট ও একটি বাক্স ছিলো। সাধারণ মার্কেটের কেনা একটি গয়নার বাক্স বলেই মনে হয়েছিল তার। মাধবী সেটা খুলে কি যেন দেখছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে তাড়াতাড়ি ডালাটা বন্ধ করে চাবি এঁটে দেয়। পরে পুলিশ আসবে শুনে বসন্ত মল্লিক তাকে ডেকে বলেন যে, মাধবী তাদের ফ্যামিলী সিক্রেটস্ ভরা কাগজপত্র রেখে গেছে এবং সে কথা কুমুদ যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে না বলে ফেলে।'

'গয়নার বাক্স না হয় বুঝলাম, কিন্তু টাকার অঙ্কটা শুনলেন কেমন করে?—'রামদুলাল দত্ত এখনও অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে তাকালেন।

'টাকা মাধবী ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলো তার ডেফিনিট প্রুফ আছে। সত্যজিৎ সামন্তকে নিজেই বলেছিলো সেই টাকা কনভেণ্টে গিফ্ট হিসেবে ও দান করবে। বাড়িতে সার্চ করে কিন্তু টাকার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় নি। কাজেই আমার সন্দেহ---'

বরুণেন্দ্র বসাকের কথা শেষ হওয়ার আগেই রামদুলাল দত্ত অস্ফুট আর্তনাদ করে গাড়ির সিটে এলিয়ে পড়লেন।—'তার মানে পাঁচজনের জায়গায় ছ'জন হোল। বসন্ত মল্লিকও সায়ানাইড মেশাতে পারে মাধবীর গ্লাসে। মোটিভ—সতেরো হাজার টাকা আর গয়নাগুলো। কেউ জানবে না, কেউ দাবী করতে আসবে না। সুযোগও তার ছিলো। এক ফাঁকে যদি লাইব্রেরীতে সে গিয়েও থাকে সাড়ে দশটার পরে কমলেশ বসুর সেই সিঁড়িতে শোনা পায়ের শব্দের বর্ণনা অনুযায়ী, তাহলে কে টের পাবে? পার্টিতে কখন কে কোথায় আসছে যাচ্ছে, তা কেউই খেয়াল করে না। আর নয় ডাঃ বসাক, ঢের হয়েছে। এবারে জিজ্ঞাসাবাদ ছেড়ে ঐ সুনন্দ মিত্রকেই ধরে চালান করে দিই। তারপরে জজ জুরী সামলাক, আমার আর আকাশ-পাতাল চিন্তা করে মরতে হবে না।'

সমরেশ বারান্দায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো। আজ সত্যজিৎ সামন্ত এসে এতক্ষণ ওকে নানা উপদেশ দিয়ে গেছেন। জীবন মৃত্যু কারো হাতে নয়, তা নিয়ে

অত বিচলিত হওয়া সাজে না। এখন সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। শরীর সারিয়ে তুলতে হবে। যতদিন মানুষ বাঁচে, ততদিন সুস্থ থাকাই তার কাম্য।

'কিন্তু কাকাবাবু, মাধবীর তো কোন দিন কোন অসুখ হয় নি। ও কেন বাঁচল না? ওকে কে মেরে ফেলল এমন করে?' সমরেশ তখন আকুল হয়ে প্রশ্ন করেছিল। উত্তর দিতে পারেন নি সত্যজিৎ সামন্ত। প্রশ্নটা এখনও যেন তার চোখের সামনে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্রের মত দুলে উঠছিলো। সে নিজেই কি এ জন্যে দায়ী? কিন্তু কই, একবারও মাধবীর মৃত্যু তো সে চায় নি।

'কে?'—পেছনে একটা পায়ের শব্দ শুনে চমকে উঠল সমরেশ।

'আমি। আমি সুনন্দ। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি সমরেশ। তোমাদের জীবনে শুধু অশান্তির সৃষ্টি করতেই যেন এসেছিলাম। আজ বুঝেছি মানুষ না বুঝে অপরিণামদর্শীর মত কত ভুলই না জীবনে করে।'

'তুমি না এলেও মাধবী আমাকে ছেড়ে চলে যেতো। আমাকে নিয়ে ও কোনদিনও সুখী হয় নি'—সমরেশ সান্ত্বনার স্বরে বলল—'তা ছাড়া তুমি তো ওকে বিষ দাও নি সুনন্দ। সে তুমি দিতেই পার না। কিন্তু মজা কি জানো, পুলিশ হয়তো আমাদের বিশ্বাস করবে না। বিষ আমিও দিই নি। তা হলে—'

'আমারও মনে হয় মাধবী নিজেই বিষ খেয়েছে'—সুনন্দ নীচু গলায় বলল—'কিন্তু পুলিশ সে কথা মানছে না। ওরা আমাকেই শেষ পর্যন্ত ধরবে। তোমার কাছে আজ আমার জবানবন্দী দিতে এসেছি সমরেশ। কি জানি, পরে যদি আর কোনদিন সময় না পাই। হ্যাঁ, আমি বন্ধুত্বের ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে ভীষণভাবে ঠকিয়েছি। মাধবী তোমাকে ছেড়ে যেতে চায় শুনে ওকে নিয়ে মিথ্যা খেলাও খেলেছি। হয়তো আমার ছলনাটুকু ওর চোখে ধরা পড়ে যাওয়াতেই ও এভাবে বিষ খেয়ে নিজের জীবনকে শেষ করে দিলো। এই কপটতার জন্যে, ভণ্ডামীর জন্যে যে শাস্তি আমার পাওনা আমি নিশ্চয় তা নেব। কিন্তু বিশ্বাস কর সমরেশ—আমি ওকে বিষ দিই নি। আই এ্যাম নট এ মার্ডারার। তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘৃণা কর, কিন্তু খুনী বলে মিথ্যা অপরাধে জড়িও না।'

'আমাকে এভাবে কেন বলছ সুনন্দ'—সমরেশ ক্লান্ত স্বরে বলল—'আমি শাস্তি দেবার কে? তোমার ভবিষ্যৎ জীবন আমার চাইতে অনেক আকর্ষণীয়। এ সব ভুলে তুমি আবার সুখী হবে—দেখো, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না।'

'ভুলতে আমাকে দিলে তো!' সুনন্দ ফ্যাকাশে মুখে তাকালো—'সেদিন আমি বৃষ্টিতে ভিজে কেন বেরিয়েছিলাম জানো? মাধবীর কাছে আমার কতকগুলো চিঠি ছিলো। আমি ওকে বললাম—ভুল স্বীকার করছি মাধবী, এখন ছাড়াছাড়ির মুখে যদি ওগুলো ফেরত দিয়ে দাও—তাহলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে'—মাধবী বলল—'ডিনারের আগে গেটের পাশে হাসনুহানার ঝোপের পেছনে অপেক্ষা কোর। আমি আসব।'

'অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম সমরেশ, কিন্তু ও এল না। তারপর—তারপর তুমি তো সবই জানো।'

'আচ্ছা, আমি পুলিশকে সব কথা খুলে বলব'—সমরেশ ওর পিঠে হাত রাখলো।

'একটু জল খাওয়াতে পারো'—হঠাৎ সুনন্দ সহজ হয়ে উঠল—'গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠছে।'

সমরেশ ঘর থেকে লেসের ঢাকনি তুলে কেওড়ার গন্ধ মেশানো জলভরা গ্লাসটা নিয়ে এলো। আগ্রহে টেনে নিয়ে এক চুমুকে ঢক্ ঢক করে খেলো সুনন্দ। অনেকক্ষণ ধরেই তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

'এ তুমি আমাকে কি খাওয়ালে সমরেশ'—বলেই তারপর যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে বসে পড়ল মাটিতে। বুকের ভেতরে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। 'ডাক্তার—একজন ডাক্তারকে খবর দাও। বিষ—সায়ানাইড।

ছটফট্ করতে করতে শরীরটা একসময়ে নিথর হয়ে গেল। সমরেশ তখন নীচে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরছে। বাড়িতে কেউ কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল বিজনেস কোম্পানী

কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি নং পি ২/৮/৬৪

নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। **সেলস সুপারভাইজার**—৫টি পদ বেতনক্রম ১৫০—৭—১৮৫—৮—২২৫৲ টাকা।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ হইতে হইবে। কোনো ব্যবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অন্তত এক বৎসর হাতে কলমে কাজ করিবার অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

২। **সেলস ম্যান**—১৫টি পদ বেতনক্রম ৬০—৩—৮১—৪—১২৫—৫—১৩০৲ টাকা।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত অবশ্যই পড়াশুনা হইতে হইবে। কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অন্তত ছয় মাস হাতে কলমে কাজ করিবার অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

বয়স ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০ বৎসরের নিম্নে নয় এবং ৩৫ বৎসরের উপরে নয়।

সরাসরি নিজ হাতে অভিজ্ঞতা সার্টিফিকেটের নকল সহ ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখের ভিতর ডাকযোগে, ডাইরেক্টার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল বিজনেস কোম্পানী, ৩৯, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬-এ পৌঁছান চাই। দরখাস্তর সঙ্গে দরখাস্তর ফি বাবদ ডাইরেক্টার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল বিজনেস কোম্পানীকে প্রদেয় ২৲ টাকা মূল্যের একটি রেখিত পোষ্টাল অর্ডার থাকা চাই। ফি ফেরৎ যোগ্য নহে।

উৎসবে সমবেত নেতৃবৃন্দ ঃ

রাজধানী ঃ

পনেরোই আগস্ট কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে গতানুগতিকভাবে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও প্রভাতফেরী, গৃহে গৃহে পতাকা উত্তোলন, স্থানে স্থানে সূত্রযজ্ঞ ও প্রার্থনাসভা, শহীদ বেদিতে মাল্যদান এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষার শপথ গ্রহণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। এই পুণ্যদিবসে স্বাভাবিকভাবেই গান্ধীজীকে মনে পড়ে। তাই সকালে ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীসহ অনেকে উপস্থিত থেকে প্রার্থনাসভায় অংশগ্রহণ করেছেন। বিকালে যথারীতি কংগ্রেসের উদ্যোগে ময়দানে সভাও হয়েছে। সেই সভায় লোক হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে একটা সংখ্যা এসেছিল শিল্পাঞ্চল থেকে ট্রাকে করে। সারা দিনটাই ছিল ছুটির পরিবেশ।

বাস্তবিক এবার ছুটির পরিবেশে অনাড়ম্বরভাবে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়েছে। পাড়াগুলি নিষ্প্রাণ। ষোলটি বছর স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণের পরে, সপ্তদশ বছরে মানুষ যেন সমস্ত উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছে। এবার এই পুণ্যদিন পালনে উৎসাহের অভাব, কেবলমাত্র জাতির প্রিয়তম নেতা জহরলালজীর অনুপস্থিতির কারণে নয়—তাঁর জীবনাবসানের কথা ভেবে সকলেই জাঁকজমক ও আলোকসজ্জা পরিহারের কথা ভেবেছেন ঠিকই।

কিন্তু, তার চেয়ে বড় কারণ—এবার স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে এমন এক সময়ে, যখন সমস্ত দেশ চরম খাদ্যাভাবে অসহায়বোধ করছে, মুনাফালোলুপ একদল মানুষের দ্বারা খাদ্যশস্য অবরুদ্ধ হয়েছে। দেশের কর্ণধারদের কাছে সাধারণ মানুষ অনেক আশা করেছিল, কিন্তু তাঁরা সেই আশা বিন্দুমাত্রও পূরণ করতে পারেন নি। উপরন্তু দফায় দফায় সংকট-সৃষ্টিকারীদের কাছে হার স্বীকার করেছেন। তাই তাঁদের সতর বছরের স্বাধীনতার স্বাদ কিছু পরিমাণে তিক্ত করে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই জনসাধারণ তাই তেমন সাড়া দেয় নি; পাড়ায় পাড়ায় পতাকা-সমারোহ তেমন চোখে পড়ে নি; বিকালে এক দিকে ময়দানে যখন কংগ্রেসের সভা চলছিল, অন্য দিকে তখন বিভিন্ন বামপন্থী দলের উদ্যোগে 'গণপ্রতিবাদ দিবস' পালন করছিল। এ সব সভায় জনসমাবেশ নেহাৎ কম ছিল না। এক সভায় যখন স্বাধীন ভারতের জয়যাত্রার কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল, অপর সভায় তখন অন্নসংকটে অস্থির দেশবাসীর পক্ষ থেকে কংগ্রেসের শাসন-ব্যবস্থাকে ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করা হচ্ছিল।

* * *

প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত থাকার পর, সোমবার দশই আগস্ট থেকে পুনরধিবেশন বসে এবং মন্ত্রিমণ্ডলী অনাস্থা-প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে দেশের মানুষের স্বার্থ অপেক্ষা বড়, সেখানে অনাস্থা-প্রস্তাব পাশ হবে না জেনেও, এই প্রস্তাব উপস্থিত করা রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। অনাস্থা-প্রস্তাবের আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই খাদ্যবিতর্কে পরিণত হয়েছে। বিরোধীপক্ষ খাদ্য-সংকট সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে দায়ী করার সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতির অভিযোগও উপস্থাপিত করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বিরোধীদের আক্রমণ করে বলেন, বিরোধীরা বিপ্লব করতে পারে না বলে বিপ্লবের থিয়েটার করে।

যাদের ডাকে পূর্বে হাজার হাজার লোক জমায়েত হতো, আজ তাদের কথায় পাঁচশত লোকও বিক্ষোভ জানাতে আসে না। তা' হলে খাদ্য-সংকট তীব্র হয়েছে কি ভাবে? বিপ্লবের থিয়েটার কথাটা মুখ্যমন্ত্রী বেশ ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করেছেন এবং কথাটা সম্পর্কে চিন্তা করার আছে। উত্তরে শ্রীজ্যোতি বসু যে কথা বলেন, তা সেই পুরাণো মুখস্থ বুলি: এই সরকার একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পদলেহনকারী। জনসাধারণের আন্দোলন দুর্বার না হলে এরা কোন কিছু মানবে না। ইত্যাদি।

বিরোধী দলগুলির আহ্বানে জনসাধারণ আজ আর বিশেষ সাড়া দেয় না—একথা হয়তো সত্য, কিন্তু এর দরুণ যদি মনে করা হয় যে, খাদ্যাভাব ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য সাধারণ মানুষের মনে কোনো বিক্ষোভ নেই, তবে

● পনেরোই আগস্ট সরকারী খাদ্যনীতির প্রতিবাদে মনুমেণ্টের পাদদেশে বিরাট জনসমাবেশের একাংশ।

তার চেয়ে মারাত্মক ভুল খুব কমই করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলগুলি আজ নানা কারণে বিপর্যস্ত, দেশের মানুষের সামনে কোনো সঠিক পথ তাঁরা তুলে ধরতে পারেন নি। ফলে দেশের লোক তাঁদের ওপর বিশেষ কোনো ভরসা ও আস্থা রাখতে পারছে না। কিন্তু তাই বলে সরকারী খাদ্যনীতি সাধারণ মানুষ সমর্থন করে—একথা কি প্রমাণ হয়? পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, বাজারে সাধারণ মানুষের কথা সরকারী কর্তারা কখনো কান পেতে শোনবার চেষ্টা করেছেন কি? করেন নি, করলে তাঁরা খাদ্যনীতি সম্বন্ধে এতটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবার আগে অন্তত একবার থমকে দাঁড়াতেন। কিন্তু আত্মপ্রসাদের নেশায় মেতে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলেও বাস্তব সত্যটা মিথ্যে হয়ে যায় না।

যা হোক বিধানসভায় অনাস্থা-প্রস্তাব ভোটের জোরে অগ্রাহ্য হলেও, শহরের রাজপথ অনাস্থা-প্রস্তাবের সমর্থক ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে। মিছিলের শহর কলকাতা, আবার মিছিলে মিছিলে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছুদিন আগে পুলিশ বলেছিল কলকাতাকে এখন আর মিছিলের শহর বলা যায় না। এতে কিন্তু নাগরিকদের স্বস্তির কিছু নেই। কারণ, সভা-মিছিল বন্ধ হবার পরই দেখা গেছে—কালোবাজারীদের দাপট। সেই দাপটে আজ নাগরিকদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

* * *

বাংলার সংবাদপত্র-জগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব পালন। বৃটিশ শাসনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল একটি সংবাদপত্রের বেঁচে থাকা যে কত গৌরবের কথা, সেটা বসুমতী প্রমাণ করলো। একদিন স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণের সেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে বসুমতী যাত্রা সুরু করেছিল, আজো সেই বসুমতী শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এইবসুমতীতেই বাংলার জ্ঞানী-গুণী সাংবাদিকরা তাঁদের চিন্তাধারা প্রকাশ করেছেন।

৬ই আগস্ট সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে বসুমতী সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন ও নতুন রোটারী মেশিন উদ্বোধন করেন। সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে বসুমতীর দীর্ঘজীবন ও সাফল্য জানিয়ে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ এবং দেশের বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানী-গুণীজনেরা শুভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছেন। সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি বাংলার সংবাদপত্র ইতিহাসে একটি মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। বসুমতী কার্যালয়ে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসবে যে ভাষণ দেন, তা সাংবাদিকের জীবনকথা হিসাবে বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে গণ্য হবে।

১২ই ও ১৩ই আগস্ট মহাজাতি সদনে দুইদিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে শ্রী এন সি চ্যাটার্জী, এম পি সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, শ্রীঅশোককুমার সরকার, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন, শ্রম ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখার্জী এবং বামপন্থী নেতা শ্রীহেমন্ত বসু ও শ্রীযতীন চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তারা বসুমতীর ঐতিহ্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অবদানের কথা উল্লেখ করে পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

* * *

মিছিলে যতই গর্জন ধ্বনিত হোক, বিধানসভায় বিরোধীরা যতই মন্ত্রি-মণ্ডলীকে ব্যর্থতার জন্য দায়ী করুক; রাষ্ট্রপতির ভাষায় সমাজের নিকৃষ্টতম শত্রু অসৎ ব্যবসায়ীরা একটুও নড়ে নি। এখনো এই কলকাতার বুকের উপর ব্যবসায়ীরা গোপনে ১·১২ থেকে ১·২৫ পয়সা কিলো দরে চাল বিক্রি করছে। ভেজাল জেনেও মানুষ যে-কোন দরে তেল কিনছে। মাছের বাজার

গ্রাম খালি; বিক্রেতারা বসে বসে তাস খেলছে, এক পাশে দু-একজন নোনা মাছ আর মাছের নোনা ডিম বিক্রি করছে।

মুর্শিদাবাদ ঃ

খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কিত বিতর্কে বিরোধীদের অনাস্থা-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু সংকটের তীব্রতার আর এক দৃষ্টান্ত হয়ে হাজির হয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার এক অখ্যাত কুলবধূ মালতী গোস্বামী। ক্ষুধিত চারটি সন্তানের জননী দিনের পর দিন অনাহারে-অর্ধাহারে আজ বিকৃতমস্তিষ্কা। দেড় বছরের কোলের শিশুর ক্ষুধার জ্বালায় বুক-ফাটা ক্রন্দন সহ্য করতে না পেরে নিজের সন্তানকে ফেলে দেয় ভাগীরথীর কোলে। আজ বদ্ধ উন্মাদ হয়ে জেলহাজতে আবদ্ধ। এমনি কত মা, কত বাবা যে আজ সন্তানদের খেতে দিতে না পেরে উন্মাদ ও অর্ধ উন্মাদ হয়েছেন সে খবর হয়তো সরকারী অফিসে এসে পৌছয় না।

বর্ধমান ঃ

বর্ধমান জেলা পশ্চিমবঙ্গের শস্য-ভাণ্ডার বলে পরিচিত। এই শস্য-ভাণ্ডারের দেশে আজ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বাগবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ জানিয়েছেন—ভেদিয়া অঞ্চলের বাগবাটি গ্রামের একজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশুর অনাহারে মৃত্যু হয়েছে।

রায়না, খণ্ডঘোষ, পূর্বস্থলী, আউস-গ্রাম, জামুরিয়া, কাঁকসা থানার বিভিন্ন স্থানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ জনসাধারণ চরম সংকটের সম্মুখীন। সাধারণ চাষীরা ঋণ ও বাড়ি ধান না পাওয়ায় জমি সময়মত আবাদ করতে পারছে না। চাষীরা ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য থালা-বাটি, তৈজসপত্র, এমন কি সামান্য জমিটুকু ও ভিটা পর্যন্ত সাফকোবলায় বিক্রি করে দিচ্ছে বা বন্ধক দিচ্ছে। এবার দেরিতে বর্ষা হওয়ায় এবং ক্যানেল থেকে সময়মত জল না পাওয়ায় সময়মত চাষ হতে পারে নি। চাষ প্রায় একমাস পিছিয়ে গেছে। আবাদ যা হয়েছে তাতেও অগ্নিমূল্যে সার কিনে দেওয়া চাষীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে আগামী ফসল সম্পর্কে হতাশা দেখা দিয়েছে।

জলপাইগুড়ি ঃ

একে চাল, তেল, মাছ নেই, ঘরে ঘরে উপবাস। র‍্যাশন ও ন্যায্যমূল্যের দোকানের সামনে পুরুষ ও নারী লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে চারদিকে জল জমে গেছে। তিস্তা, করলা, জলঢাকা, তোরসা প্রভৃতি পার্বত্য নদীতে জলোচ্ছ্বাসের ফলে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স তথা শহর অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। শ্রমজীবী মানুষের দুর্গতির সীমা নেই। চাল ও তেলের পাইকারী ব্যবসায়ীরা সংগঠিতভাবে শিলিগুড়িতে ঐ সব জিনিষ মজুত করেছে। ফলে বাজারে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। ধূপগুড়ি, বীরপাড়া, গয়েরকাটা, ফালাকাটা প্রভৃতি অঞ্চলে ৫ টাকা কে-জি দরে সর্ষের তেল বিক্রি হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ারের শোভাবাড়ি, বকরীবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে নদীর জল প্রবেশ করায় কয়েক হাজার পরিবার বিপন্ন হয়েছে। সোনাপুর অঞ্চলেও বন্যায় প্রায় ৪শত পরিবার স্থানীয় বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

একে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার উপর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে জনসাধারণ এখানে বিপন্ন। শহরে যে র‍্যাশনিং ব্যবস্থা আছে তা মাত্র দশভাগের দুইভাগ লোক পাচ্ছে। আউস ধান ওঠবার আরো দেরি আছে, এ সময় কৃষকদের দুর্দশা চরম হয়। ধান বুনবার আগেই মহাজনদের নিকট দাদন নেওয়া হয়েছে সুতরাং মাঠের ধান আর কৃষকের ঘরে আসবে না।

বাঁকুড়া ঃ

গত ৪ঠা আগস্ট থেকে ৯ই আগস্ট পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে পাঁচদিনব্যাপী অনশন সত্যাগ্রহ করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিদিন এক এক দল সত্যাগ্রহী প্রাতঃকালে হিন্দু মহাসভার অফিস থেকে মিছিল করে আদালতে গিয়ে নির্মিত প্যাণ্ডেলে ২৪ ঘণ্টা অনশন করতো। এই সত্যাগ্রহ উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অস্বাভাবিকভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ এখানে বহু দিনমজুর ভিক্ষায় বার হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুর ঃ

বর্ষার প্রবল বারিপাতে বালুরঘাটের পথঘাটের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। যেসব পথঘাট দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে—সেসব রাস্তার মাঝে মাঝে খাল-খন্দর হয়ে জায়গায় জায়গায় জলকাদা জমে যানবাহন—রিক্সা, সাইকেল এবং জন-সাধারণের যাতায়াত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বালুরঘাট বাজারে হিলি রোডের যে রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন বিশাল বিশাল ট্রাক, স্টেটবাস, প্রাইভেট গাড়ি, রিক্সা চলাফেরা করে—বড় বড় গাড়িগুলোকে ঘোরানো হয়—সেই প্রাচ্যভারতী রোডের মোড়ের কাছে রাস্তার মাঝখানে গর্ত হয়ে জলকাদা সবসময় জমে থাকে। কয়েকবার এই জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। পৌরকর্তৃপক্ষ, পূর্তবিভাগ, নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন জায়গায় আবেদন-নিবেদন করেও বাজার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোন প্রতিকার পায় নি। মাড়োয়ারী পট্টির সামনে এই রাস্তাটায় সব সময় বড় বড় ট্রাক, স্টেশন ওয়াগন, ট্যাক্সি, জিপ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়—ফলে ছোট ছোট দোকানদার এবং জন-সাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু পৌরকর্তৃপক্ষ এবং ট্রাফিক পুলিশ নির্বিকার—তাঁরা এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না।

বালুরঘাটের প্রতিটি পথই জনসাধারণ এবং যানবাহন চলাচলের পক্ষে অযোগ্য। এই রাস্তাগুলোর মধ্যে মোক্তারপাড়া রোড, প্রাচ্যভারতী রোড এবং পি-ডব্লু-ডি অধীনস্থ হিলি রোডের সংস্কার আশু প্রয়োজন. এই ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের দাবী ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

॥ সূর্য সেন ষ্ট্রীটের একাল-সেকালের কথা ॥

শ্রীপদাতিক

কবে, কোন্‌কালে ছিল সেই গ্রাম —নাম যার মীর্জামহল্লা। আজ তার ছায়া নেই, ছবি নেই, হিজলঝরা পুকুর নেই, সুফলা মাঠ নেই। আজ আর ধান ভানার গান কেউ গায় না, ঢেঁকিও নাচে না। বাঁশবনে ঘুঘুর ডাক শুনে উদাস হয় না কেউ, বকুলবনের ঘ্রাণের মাদক তুলে মাতাল হয় না প্রজাপতি। মাউলতার কাঁথা জড়ানো কুটির নেই কোথাও ; তার পূব-দুয়ারে নদীর মতো পরিখায় ভাসে না ময়ূরপঙ্ক্ষী। পরিখার তীরে জোড়া অশ্বত্থতলার সেই কানা ফকিরও আজ নেই—যে-ফকির ভিক্ষা চাইতো ছায়ায় বসে, গান গাইতো হাঁড়ি বাজিয়ে এবং ভাগ্য গুণে ভবিষ্যৎ বলতো নানাজনের। তার এই ভাগ্য-বিচারের উপপেশায় আয় ছিল না কিছুই। সম্ভবত এ-ব্যাপারে কিছু গ্রহণ করার বাতিক তার ছিল না। তাই নিখরচায় নিজ-ভাগ্যের আদি-অন্ত জানার আগ্রহে ভিড় জমতো অনেকেরই। কেবল পুরুষরাই নয়, ফকিরের চারপাশ ঘিরে যথারীতি আসর জমতো সেকালের মেয়ে-বউদেরও। এই মেয়ে-বউদেরই একজন ছিল আয়েষা। কী-এক অজ্ঞাত কারণে আয়েষার স্বামী পালিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। দিনের পর দিন কাটে, রাতের পর রাত আসে। তবু আয়েষার স্বামী আর ফেরে না। তাই ক্লান্ত আয়েষাও শেষে কানা ফকিরের কাছে এসেই জানতে চায় স্বামী তার কবে ফিরবে। ফকির মন দিয়ে সব কথাই শোনে আয়েষার। তারপর বলে : "পনেরো দিন পরে এসো, বলবো।"

আয়েষা ফিরে যায়। ঠিক পনেরো দিন পর আবার সে যথারীতি আসে। কিন্তু ফকির তখনো বলে : "এখনও সময় হয় নি। আরও সাতদিন পরে এসো, বলবো।"

আবার ফিরে যায় আয়েষা। ঘরে বসেই গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে কাটিয়ে দেয় আরও সাতদিন। তারপর আবার সে আসে। কিন্তু সেদিন এসেই দেখে : ফকির তার মলিন দেহ ঘষে-মেজে সাফ করেছে অনেকটা। মাথার উশ্‌কো বাবরি চুলেও তার তেল পড়েছে। তা ছাড়া অনেক কালের কালো আলখাল্লাটাও পাল্টে, গায়ে জড়িয়েছে একখণ্ড রেশমের চাদর। আয়েষা এসেছে বুঝতে পেরেই, অন্য দু' একজন যারা ছিল, তাদের বিদায় করে ফকির। তারপর আয়েষাকে কাছে ডাকে। আয়েষা কাছে আসতেই কানা ফকির হাত রাখে তার মাথায়। তার এলোচুলে হাত বুলোতে বুলোতেই ফকির তাকে টেনে নেয় আরও কাছে। তারপর এক সময় হঠাৎ আয়েষাকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরে ফকির। চিৎকার ক'রে ওঠে আয়েষা। ফকিরকে সে ঝট্‌কা মেরে ফেলে দেয় দূরে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ফকিরের কাছ থেকে স'রে আসে তফাতে। উঠে দাঁড়ায়। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে ওভাবেই আরও চিৎকার ক'রে সে বলে : "বেটা বেয়াক্কেল, তুই হারামীর বাচ্চা।"

আয়েষার এই ব্যবহারে ফকিরও চ'টে যায়। কিন্তু ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি টেনে সে বলে : "স্বামীকে তুমি সত্যই ভালোবাসো কিনা আমি পরীক্ষা করছিলাম। এবার বুঝতে পারছি, তুমি প্রকৃতই পতিপ্রাণা। কিন্তু তাকে তো এত সহজেই ফিরে পাওয়া যাবে না। তোমার স্বামীকে জিনে আটকে রেখেছে চিৎপুরের জঙ্গলে। তাকে ফিরে পেতে হলে মাঝগঙ্গার গভীর তলদেশের মাটি চাই। এক নিঃশ্বাসে মাঝগঙ্গায় ডুব দিয়ে সে-মাটি সংগ্রহ করতে হবে তোমাকেই। তুমি কি তা পারবে?"

দৃঢ়স্বরে উত্তর দেয় আয়েষা :

"পারবো।"

ফকির বলে : "তাহলে যাও। এক নিঃশ্বাসে মাঝগঙ্গায় ডুব দিয়ে মাটি তুলে নিয়ে এসো আমার কাছে। আমি খোদার কালাম প'ড়ে দেওয়ার পর, সে-মাটি তুমি চিৎপুরের জঙ্গলে ছড়িয়ে দিলেই সমস্ত জিন পালিয়ে যাবে এবং তোমার স্বামী ফিরে আসবে।"

ফকিরের এই কথা শুনে আয়েষা চ'লে যায়। তারপর সত্যই নাকি এক-দিন সে ঝাঁপ দেয় গঙ্গায়। কিন্তু মাঝগঙ্গার মাটি তুলে আনতে সে পারে নি। কারণ জোয়ার-ভাঁটার লীলা-উন্মত্তা গঙ্গা আর তাকে ফিরে আসতে দেয় নি মর্ত্যে। তবে দু'দিন পরে হঠাৎ রক্তবমন করতে করতেই ফকিরও ...

● সূর্য সেন ষ্ট্রীটের একটি দৃশ্য

লোকের ধারণা : মৃতা আয়েষার প্রেতাত্মাই প্রতিশোধ নি[illegible] ওপর।

মৃত ফকির এবং মৃতা আয়েষা, তাদের উভয় প্রেতাত্মারই নাকি দীর্ঘ অধিবাস ছিল জোড়া অশ্বত্থতলায়। তাই সেকালের সাধারণ লোকের কাছে সেই জোড়া অশ্বত্থতলা এক ভৌতিক অঞ্চল বলেই অভিহিত ছিল অনেক-কাল।

এই জোড়া অশ্বত্থতলার অবস্থিতি ছিল মীর্জামহল্লারই কোনো এক বিশেষ অংশে। কালে কালে জোড়া অশ্বত্থতলার সেই ভৌতিক সংস্কার কাটিয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ। তারপর সেখানে তাদের বসতিরও সংস্থাপন ঘটায় তারা। সম্ভবত ধীরে ধীরে এভাবেই পরিধি বাড়ে মীর্জা মহল্লার। তারপর এক সময়, ঠিক কী সূত্রে জানি না, 'মীর্জামহল্লা' নামটিরও বিলোপ-সাধন ঘটে। তার পরিবর্তে সমগ্র অঞ্চলের নামকরণ হয় মীর্জাপুর। অনেকে অনুমান করেন : মুর্শিদাবাদের নবাব মীরজাফরের নাম থেকেই 'মীর্জাপুর' নামের উৎপত্তি। মীর্জাপুর অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী যে-উপরাস্তার নাম বর্তমানে কলেজ রো—এককালে তা'ও 'মীরজাফর গলি' নামেই অভিহিত ছিল। কিন্তু এ-অনুমান সম্পূর্ণ সত্য নয়। বর্তমান কলেজ রো কোনো এক সময় মীরজাফরের নামেই নামাঙ্কিত ছিল—এ-কথা হয়তো সত্য, কিন্তু মীর্জাপুর নামটি ঠিক সেই সূত্রে আসে নি। তার সঠিক উৎপত্তি 'মীর্জামহল্লা' থেকেই। আর এই 'মীর্জামহল্লা' নামটির প্রচলন ঘটে নবাব মীরজাফরের প্রতিষ্ঠালাভের অনেককাল আগে থেকেই।

কখনো ক্ষয়িষ্ণু, কখনো বা বর্ধিষ্ণু গ্রাম রূপে যুগে যুগে মীর্জাপুরের উত্থান-পতন ঘটে অজস্রবার। তারপর সম্পূর্ণ উন্নত গ্রাম রূপে সে শহরের সংস্পর্শে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে। অবশ্য শহরের সংস্পর্শ পেলেও, শহরের প্রকৃত রূপায়ণ তার সর্বাংশে তখনো বিরল। কেবল তার পশ্চিমাঞ্চলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সম্মুখবর্তী সুশোভন কলেজ স্কোয়ারের প্রতিষ্ঠা ঘটায়, নগর-দৃশ্যের সঠিক সংস্থাপন ঘটে সেদিকেই। কিন্তু পূর্বাঞ্চল তখনো উপেক্ষিত। তার অধিকাংশই তখন আকীর্ণ একাধিক বস্তির বিপর্যস্ত বিন্যাসে। অবশ্য কোঠাবাড়িরও অভাব নেই। কিন্তু এ-সমস্ত কোঠাবাড়ির পরিবেশ শহরের সঠিক মর্যাদার বিভূষণ থেকে যেমন বঞ্চিত ছিল, তেমনই মীর্জাপুর ষ্ট্রীট নামে যে-রাস্তা পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমাঞ্চলের কলেজ ষ্ট্রীটে যতিলব্ধ—তা'ও ছিল বিশেষভাবেই সংস্কারহীন। তবে বিংশ শতাব্দীর উন্মেষলগ্নেই তার যথাযথ সংস্কার সুরু হয় এবং উপেক্ষিত পূর্বাঞ্চলও ধীরে ধীরে অর্জন করে মহানগরীর খানিকটা মনোহারী পরিবেশ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল মীর্জাপুর অঞ্চলের এক জ্বালাময়ী পরিচ্ছেদ। এই সময় মীর্জাপুরের অলিতে-গলিতে, মেসে-বস্তিতে, এমন কি প্রকাশ্য মাঠে-ময়দানেও অনুশীলন-সংঘের ইংরেজ-বিরোধী বিপ্লবের কার্যক্রম ছিল অব্যাহত। বিভিন্ন বস্তি এবং মেস থেকে বিপ্লবীদল প্রায় প্রত্যহই এসে মিলিত হতো মীর্জাপুর-সংলগ্ন কলেজ স্কোয়ারে। তাদের কর্ম-পন্থার প্রাত্যহিক সিদ্ধান্ত নানা সংকেতের মাধ্যমে গৃহীত হতো সেখানেই। অবশ্য সব কাজ তাদের নির্বাধায় সম্পন্ন হতো—তা বলা যায় না। কারণ তাদের প্রতি সতর্কদৃষ্টি ছিল ইংরেজ পরিচালিত পুলিশ-বাহিনীর। এই পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীদলের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে অজস্রবার। পুলিশের গুলীতে বিপ্লবীদের অনেকেই যেমন শহীদ হয়েছেন, বিপ্লবীদের বোমার আঘাতে এবং পিস্তলের গুলীতে তেমনই মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে পুলিশদেরও। সম্ভবত ১৯১৫ খৃস্টাব্দের কোনো এক সায়াহ্নে কলেজ স্কোয়ারে বিপ্লবীদলের গোপন কার্যক্রম গোপনেই অনুধাবন করতে আসে হরিপদ দে নামে এক ধূর্ত আই-বি। বিপ্লবীদলের কেউ একজন তাকে চিনতে পেরেই গুলী ছোড়ে। ফলে সেদিন কলেজ স্কোয়ারের মাটিতেই নিষ্প্রাণ দেহে লুটিয়ে পড়ে হরিপদ দে। এই ঘটনার ঠিক দু'দিন পরেই আবার বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়কে গ্রেফ্‌তার করার অপরাধে সাব-ইন্সপেক্টর সুরেশ ব্যানার্জীও নিহত হন বিপ্লবীদলের ক্ষমাহীন বোমার আঘাতে।

মীর্জাপুরের পূর্বাঞ্চলেও একটি ঘটনা ঘটে ১৯১৬ খৃস্টাব্দে। পুলিশ-কমিশনার এস এন চ্যাটার্জীর কুখ্যাত পিতা বসন্ত চ্যাটার্জীও ছিলেন পুলিশ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। সেকালের স্বদেশী আন্দোলন বানচাল করার পক্ষে তিনিই ছিলেন তৎকালীন ইংরেজ সরকারের এক প্রধান যন্ত্র। বিশেষ ক'রে তাঁর কোপদৃষ্টি ছিল বিপ্লবীদলের প্রতি। সুযোগ পেলেই তিনি সদলবলে আক্রমণ করতেন বিপ্লবীদলের ঘাঁটি এবং বিপ্লবীদের কেউ ধরা পড়লেই তার ওপর তিনি নির্যাতন চালাতেন অমানবিকরূপে। শোনা যায় : এই অত্যাচারের প্রতিশোধ-কল্পেই বসন্ত চ্যাটার্জীকে একদিন প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে জন-কয়েক বিপ্লবী। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই এবার আগুন জ্বলে ওঠে সমগ্র কলকাতায়। ইংরেজ পরিচালিত বিশাল পুলিশ-বাহিনী মীর্জাপুরের সমগ্র অঞ্চলের অলিতে-গলিতে এবং মেসে-বস্তিতে এসে হানা দেয় বেপরোয়া গতিতে। ঠিক এই সময়ে ভয়েই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, বিপ্লবীদলের শিশির ঘোষ—যিনি বসন্ত চ্যাটার্জী হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তিনি হঠাৎ আত্মসমর্পণ করেন পুলিশের কাছে। আত্মসমর্পণ করেই তিনি ফাঁস ক'রে দেন অনুশীলন-সংঘের গোপন কর্মপন্থার

কথা। একে একে তাদের ঘাঁটিগুলিরও সঠিক সন্ধান পেশ করেন পুলিশের দরবারে। সুতরাং শিশির ঘোষের এই আকস্মিক বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই একে একে ধরা পড়ে অজস্র বিপ্লবী। পুলিশ-বাহিনীর অমানবিক অত্যাচারে কেউ মরে, আর কেউ বা ক্ষতবিক্ষত হয়ে কারাবরণ করে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

একমাত্র শিশির ঘোষের সাহায্যেই বিপ্লবীদলকে খানিকটা সায়েস্তা করা সম্ভব হওয়ায়, তার প্রতি স্বার্থের খাতিরেই বেশ সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে ইংরেজ সরকার। সরকার তাকে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের এক যোগ্যতম পদে বহাল ক'রে প্রেরণ করে সীমান্তে।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে যায় পাঁচটি বছর। পাঁচ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২১ খৃস্টাব্দে বাংলার তথা ভারতের ঘরে-বাইরে ইংরেজের বিরুদ্ধে সুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। শহর-কলকাতায় আবার বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পায় বিপ্লবীদলের তৎপরতা। সুতরাং ইংরেজ সরকার এবারও শিশির ঘোষের আশু সাহায্যেরই প্রত্যাশী হয়ে ওঠে বিশেষভাবে। সরকার তাকে সীমান্ত থেকে নিয়ে আসে কলকাতায়। তারপর ছদ্মবেশে বিপ্লবীদলের গোপন কর্ম-পদ্ধতি অনুসরণ করার জন্যে সরকার শিশিরকে দিয়েই মীর্জাপুরের পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করায় এক খদ্দরের দোকান। উক্ত দোকানের কৃত্রিম মালিকরূপে এবার সেখানেই স্থায়ী গদী নির্বাচন করেন বিশ্বাসঘাতক শিশির ঘোষ।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে যায় আরও প্রায় তিনটি বছর। তিন বছর পর, অর্থাৎ ১৯২৪ খৃস্টাব্দের কোনো এক মধ্যাহ্নে শিশির ঘোষকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বিপ্লবীদল বোমা নিক্ষেপ করে তাঁর খদ্দরের দোকানে। কিন্তু শিশির ঘোষের সৌভাগ্য, তিনি তখন দোকানে ছিলেন না। তাঁর পরিবর্তে বোমার নির্মম আঘাতে মৃত্যু বরণ করে বণিক নামে দোকানের এক নিরীহ কর্মচারী। তবে শিশির ঘোষ বোমা নিক্ষেপের সংবাদ পেয়ে সম্ভবত বিপ্লবীদের ভয়ে সেদিনই দেশান্তরী হন। সেই পলাতক শিশির ঘোষ আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও আর দেশে ফিরে আসেন নি।

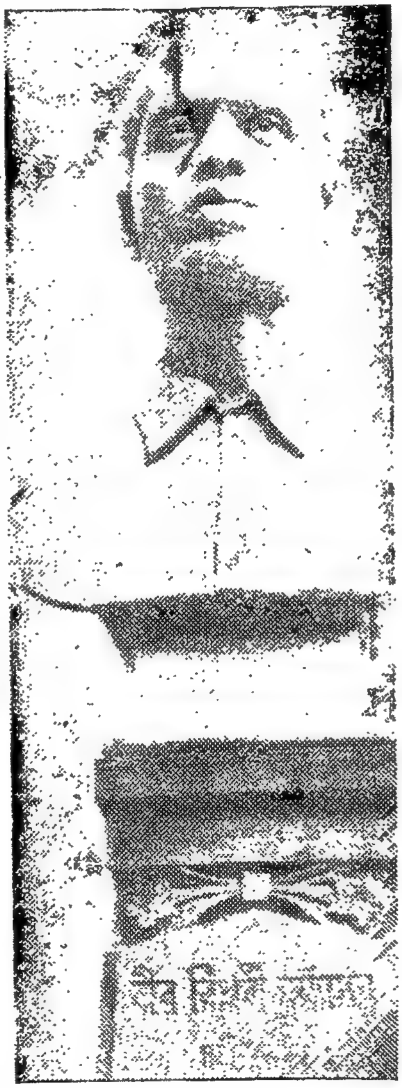

● কলেজ স্কোয়ারে অবহেলিত অবস্থায় সূর্য সেনের মর্মর মূর্তি।

শিশির ঘোষের খদ্দরের দোকানে বোমা নিক্ষেপ করার পরমুহূর্তেই বিশাল পুলিশ-বাহিনীর অভিযান সুরু হয় মীর্জাপুর পল্লীতে। বিপ্লবীদের প্রায় প্রত্যেকেই এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে এবং এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ির দর-দালানে লাফিয়ে প'ড়ে পালিয়ে যায়। তবে তাদের একজন বিশিষ্ট নায়ক পালাতে গিয়েই কোনো এক বাড়ির সরু জানালা টপকে প্রবেশ করেন স্নানাগারে। উক্ত স্নানাগারে তখন অসম্বৃত অবস্থায় স্নান করছিল এক তন্বী যুবতী। সে হঠাৎ এক অপরিচিত পুরুষের আবির্ভাবে চিৎকার ক'রে ওঠার আগেই বিপ্লবী-নায়ক তার বুকের কাছে তুলে ধরেন পিস্তল। দারুণ আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায় যুবতী। বিপ্লবী-নায়ক তখন যুবতীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেন: "ভয় নেই। আমি মাতৃমুক্তির সৈনিক। তোমার এই অসম্বৃত অবস্থার জন্য তুমি লজ্জা করো না। কারণ আমি তোমার সন্তান। পুলিশ আমার পিছু ধাওয়া করেছে। তুমি আমাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ ক'রে দাও।"

বিপ্লবী-নায়কের এই কথা শুনে, এমন এক অসম্বৃত অবস্থাতেও অভূতপূর্ব আনন্দের উল্লাস ফুটে ওঠে যুবতীর চোখে, মুখে এবং কপোলে। নায়ককে সে স্নানাগারেই লুকিয়ে রাখে খানিকক্ষণ। তারপর এক সময় শ্বেতচন্দনের জয়-তিলক পরিয়ে, সে তার নায়ক-সন্তানকে মীর্জাপুর পল্লী থেকে অন্যত্র নিরাপদে স'রে পড়ার সুযোগ ক'রে দেয় সজলনেত্রে।

মীর্জাপুর অঞ্চলের সেই অগ্নিযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে অনেককাল আগেই। আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পেরিয়ে এসে, উল্লেখযোগ্য এক উপ-সরণীরূপে বেশ পরিমার্জিত হয়ে উঠেছে মীর্জাপুর স্ট্রীট। আজ তার উভয়-বাহুতে ঘন-বসতির বিন্যাস অনিয়ন্ত্রিত হলেও খুব একটা বেমানান নয়। তার পূর্বাঞ্চলে আমজাদিয়া হোটেল, টাওয়ার লজ, নজরুল পাঠাগার এবং বিভিন্ন শিক্ষায়তনের মধ্যে জুবিলী স্কুল, মিত্র স্কুল প্রভৃতি যেমন স্বকীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত, তেমনই তার মধ্যভাগে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক এবং পশ্চিমাঞ্চলে

স্ট্রীট কলেজ অব কমার্স ও কলেজ স্কোয়ার তার পরিবেশগত লাবণ্যের বিকাশ ঘটিয়েছে যথেষ্ট। এককালে বিপ্লবীদলের প্রধান কেন্দ্র ছিল মীর্জাপুর। তাই বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রের পৌরসভা মীর্জাপুর ষ্ট্রীটের নামকরণ করেছেন সূর্য সেন ষ্ট্রীট। কারণ সূর্য সেন ছিলেন তৎকালীন বিপ্লবেরই এক অবিস্মরণীয় মহানায়ক। কার্যক্রম তাঁর চট্টগ্রামে সীমাবদ্ধ থাকলেও, প্রভাব ছিল তাঁর সমগ্র ভারতে। তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবার জন্যেই, তাঁর গুণমুগ্ধ শহর-কলকাতার নাগরিকবৃন্দ বর্তমানে তাঁর একটি মর্মরমূর্তিও স্থাপন করেছে কলেজ স্কোয়ারে।

সূর্য সেনের জন্ম চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায়। পৈতৃক বসতবাটীও তাঁর সেখানেই। যৌবনকালে তিনি একজন সাধারণ শিক্ষকতার পদে নিযুক্ত হন স্থানীয় ন্যাশনাল হাই স্কুলে। শিক্ষকতার কাজে বহাল থাকার কালেই তিনি একবার চট্টগ্রাম জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। তারপর দিনে দিনে তিনি ওভাবেই গঠন করেন একটি বিপ্লবীদল। এই বিপ্লবীদলটিকে নিয়েই, ১৯২৩ খৃস্টাব্দে তিনি নিজাম-পল্টনের কাছে মাতৃমুক্তির মহান প্রয়োজনেই লুট করেন রেলের টাকা। টাকা লুট করেই তিনি দলবলসহ এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন নাগরকাটা পাহাড়ে। কিন্তু পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী খবর পেয়েই নাগরকাটা পাহাড় ঘেরাও করে যথাসময়ে। সূর্য সেন ওরফে মাস্টারদা তখন তাঁর দলবলসহ পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নানা কৌশলে সংগ্রাম করেন বেশ খানিকক্ষণ। তারপর যখন বুঝতে পারেন এঁটে ওঠা সম্ভব নয় এবং গুলীও তাঁদের ফুরিয়ে এসেছে তখন তিনি পটাশিয়াম সায়ানাইড-যোগে সহকর্মীদের আত্মহত্যা করার নির্দেশ দেন। সহকর্মীরা যথারীতি নির্দেশ পালন করেন এবং তিনি নিজেও তাঁদের অনুগামী হন। কিন্তু তাঁদের সেই পটাশিয়াম সায়ানাইড সম্ভবত খাঁটি ছিল না বলেই মৃত্যু এসে স্পর্শ করলো না তাঁদের একজনকেও। সুতরাং তাঁরা পুলিশের হাতেই ধরা পড়লেন সদলবলে।

প্রায় বছর-পাঁচেক জেলে আটক থাকার পর, ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মুক্তিলাভ করেন মাস্টারদা। মুক্তি পেয়েই তিনি গঠন করেন 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি'। সম্ভবত মাস্টারদার বিপুল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই উক্ত সংগঠনে দলে দলে এসে যোগদান করেন অজস্র নির্ভীক প্রাণ। তাঁদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, তারকেশ্বর দস্তিদার, টেগরা বল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয়। তাঁদের সহায়তায় 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি' যখন বিশেষভাবেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন মাস্টারদার নেতৃত্বে হঠাৎ একদিন এই রিপাবলিকান আর্মিই লুণ্ঠন করেন চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর অস্ত্রাগার। সম্মুখ সমরে পরাভূত হয় ইংরেজ-বাহিনী। রিপাবলিকান আর্মি সমস্ত অস্ত্রসম্ভার হস্তগত ক'রে স'রে আসেন জালালাবাদ পাহাড়ে। পাহাড়ের উচ্চতম শৃঙ্গে তাঁরা উত্তোলন করেন জাতীয় পতাকা।

এদিকে ইংরেজ সরকার এই বিদ্রোহীদের দমন করার উদ্দেশ্যে কলকাতার দুর্গ থেকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করে আরও অধিকসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য। এই সুশিক্ষিত সৈন্যদের মধ্যে গুর্খা রেজিমেন্টের বিপুল প্রাধান্যই উল্লেখযোগ্য। তারা ত্বরিতগতিতে এসে ঘেরাও করে জালালাবাদ পাহাড়। সেখানে বিপ্লবীদের সঙ্গে গুর্খা সৈন্য-বাহিনীর অবিরাম যুদ্ধ চলে একাধিক দিবস। এই যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর পক্ষে নিহত হয় প্রায় ষাট থেকে সত্তর জন। আর বিপ্লবীদের পক্ষে মৃত্যুর শীতল ছায়া আলিঙ্গন করে তেরো জন। এই তেরো জনের মধ্যে কনিষ্ঠতম টেগরা বলও ছিল।

ইংরেজ পরিচালিত বিপুল সৈন্য-বাহিনীর মুখোমুখি, ওভাবে খুব বেশিদিন আর টিকে থাকা সম্ভব হবে না জেনেই, জীবিত বিপ্লবীদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড় থেকে কৌশলে স'রে পড়েন মাস্টারদা। তারপর ফেরারী অবস্থাতেও তিনি তাঁর সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান আর্মির কার্যক্রম পরিচালনা করেন দেশের প্রান্তরে প্রান্তরে। তাঁকে গ্রেফ্‌তার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন ইংরেজ সরকার। তাঁকে ধ'রে দেওয়ার বিনিময়ে ইংরেজ সরকার পুরস্কারও ঘোষণা করে দশ হাজার টাকা। কিন্তু কোনো-কিছুতেই মাস্টারদাকে ধরা সম্ভব ছিল না—যদি তাঁর স্বগ্রামেরই কোনো এক ব্যক্তি হঠাৎ টাকার লোভে বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে না বসতো। তাঁর আত্মীয়-প্রতিম সেই ব্যক্তির বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলেই একদিন আকস্মিক-ভাবেই ধরা পড়লেন তিনি। অবশ্য ধরা পড়ার সময় তিনি তাঁর সহকর্মীদের অন্যত্র সরিয়ে দেন নিরাপদেই।

সূর্য সেন, অর্থাৎ মাস্টারদা ধরা পড়ার পর, তাঁর প্রতি যে অমানবিক নির্যাতন সুরু করে ইংরেজ সরকার—সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। তবু তার মধ্যেও তিনি অনাগত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে রচনা করেন "Bijay" নামে এক অবি-স্মরণীয় নিবন্ধ—পরে যা জেলের বাইরে প্রকাশলাভ করে পুস্তিকাকারে। ইংরেজ সরকার মাস্টারদার চৈতন্যহীন দেহকে ফাঁসির রজ্জুতে স্থাপন করে তাদের নির্ধারিত সময়ে। ফাঁসির পর তাঁর পবিত্র দেহ শ্রদ্ধার সঙ্গে সৎকার করার সুযোগ পায় নি দেশবাসী। কারণ সারমেয় সৈন্যবাহিনী ফাঁসির পরমুহূর্তেই তা সকলের অগোচরে ভাসিয়ে দেয় বঙ্গোপসাগরে।

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে, চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অভি-শাপের স্ফুলিঙ্গ নেচেছিল সেই দিন—যেদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেন চৈতন্যহীন মাস্টারদা। সেদিনের কথা স্মরণ ক'রে আজও যেমন চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড় কেঁপে ওঠে বার বার, তেমনই এপারে শহর-কলকাতার পাষাণ-বিধ্বস্ত বক্ষেও স্মৃতির দৃপ্ত পদধ্বনিতে ঘুম ভেঙে যায় মহাকালের। শহর-কলকাতার সূর্য সেন ষ্ট্রীট মহাকালের সেই সূর্যের উত্তাপ নিয়েই আজ চিরবিনিদ্র, পূর্ব থেকে পশ্চিমে।

নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্মের উদ্ভব : ম্যাজিক

॥ ১ ॥

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৬৮তম বর্ষের ৪৮তম সংখ্যায় (১০ই বৈশাখ ১৩৭১) 'নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে ধর্মের উদ্ভব' শিরোনামায় অ্যানিমিজম নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান প্রবন্ধে ধর্মের উদ্ভব সংক্রান্ত আরও একটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব, পণ্ডিতেরা যার নামকরণ করেছেন ম্যাজিক, বাংলায় যাকে বলা চলে যাদুবিশ্বাস। অ্যানিমিজম তত্ত্বের সঙ্গে যেমন ই বি টাইলরের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, তেমনই ম্যাজিক বলতেই আমাদের সামনে যাঁর মূর্তি ভেসে ওঠে তিনি হচ্ছেন স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার। অবশ্য ফ্রেজার ম্যাজিক-তত্ত্বের উদ্গাতা নন, কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি সারা জগতের বিভিন্ন ধর্মব্যবস্থা, সমাজ সংগঠন, ব্রত-পার্বণ, আচার-আচরণাদি নিখুঁতভাবে তদন্ত করে ম্যাজিক-বিশ্বাসের মূলসূত্রগুলির স্থাপনা করেছিলেন।

সাধারণত ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল বলতে আমরা যা মনে করে থাকি, নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ম্যাজিক কথাটি সে অর্থে প্রযুক্ত হয় না। ম্যাজিকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্যার জেমস ফ্রেজার লিখছেন: Magic rose before religion in the evolution of our race, and man essayed to bend nature to his wishes by the sheer force of spells and enchantments before he strove to coax and mollify a coy, capricious or irascible deity by the soft insinuation of prayer and sacrifice. অর্থাৎ ম্যাজিক-বিশ্বাসের মূলে আছে প্রকৃতিকে মানুষের নিজ ইচ্ছার অনুবর্তী করার প্রয়াস।

Ancient Art and Ritual গ্রন্থে জেন হ্যারিসন ব্যাপারটিকে উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, আদিম মানুষ কোন প্রয়োজন উপস্থিত হলে সেই প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্য কোন দেবতার আশ্রয় না নিয়ে নিজেই কাজটা সারবার চেষ্টা করে কাজটির একটি কৃত্রিম অনুকরণ মারফৎ। রৌদ্র বা বৃষ্টির প্রয়োজনে তারা রৌদ্রের দেবতা বা বৃষ্টির দেবতাকে আহ্বান না করে নিজেরাই রৌদ্রের নাচ বা বৃষ্টির নাচ নেচে নেয়। আদিম মানুষের অভিধানে প্রার্থনা বলে কোন কথা নেই, আছে মন্ত্রোচ্চারণ; তথাকথিত অর্থহীন কয়েকটি ধ্বনির সাহায্যে প্রকৃতিকে নিজ আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা।

॥ ২ ॥

কয়েকটি উদাহরণ দিলে ম্যাজিক বিষয়টি আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারব, ফ্রেজার ম্যাজিককে বলছেন association of ideas বা ধারণার সামঞ্জস্য যার ভিত্তি হচ্ছে অ্যানিমিজমের মতই সাদৃশ্য জ্ঞান। পণ্ডিতমহলে ম্যাজিককে অবশ্য একদা মানুষের প্রাক-যুক্তিশীল মনোভাবের প্রকাশ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান ও মনোবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার অবসান হয়েছে। ম্যাজিকের উদাহরণ দেবার আগে আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। মানসিক গঠনের দিক দিয়ে সভ্য ও আদিম মানুষের প্রভেদ সামান্য। Crawby তাঁর **Idea of the Soul** গ্রন্থে বলছেন: There is no reason to think that the primitive mind was rudimentary, infantile or in a state of dream. It was merely undifferentiated. আদিম মন ব্যক্তি ও বিষয়ের মধ্যে কোন ভেদ করতে সক্ষম ছিল না। আদিম মানুষ নিজেকে দৃশ্যমান জগতের অংশ বলেই মনে করত, এবং তার কাছে পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল তারই মত জীবন্ত। আদিম মানুষের ম্যাজিক আচরণগুলি তাই তাদের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্য জীবন্ত প্রকৃতির নিকট আবেদন—আবেদন না বলে দাবী বলাই ভাল।

নরেন ভট্টাচার্য

ম্যাজিক বহু রকম; গুণের দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত—ইমিটেটিভ বা অনুকরণমূলক এবং কণ্টাজিয়াস বা সংস্পর্শমূলক। অনুকরণমূলক ম্যাজিকের মূল নিয়ম হচ্ছে যে, আপনি যদি আপনার স্বার্থের অনুকূলে প্রকৃতিতে কোন ঘটনা ঘটাতে চান, তাহলে আপনি ঘটনাটির অনুকরণ করুন। অর্থাৎ, যদি আপনার বৃষ্টির প্রয়োজন থাকে তাহলে আপনি একটি পাত্র ফুটো করে তার মধ্যে জল ভরে একটি ছোট গাছের মাথায় টাঙিয়ে দিয়ে বৃষ্টি ঘটার অনুকরণ করুন। বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে বৈশাখ মাসে গাছের মাথায় ঝারি দেবার যে প্রথা আছে তা অনুকরণমূলক ম্যাজিকের নিদর্শন। আপনারা হয়ত অনেকে বাণ-মারা দেখেছেন বা তার কথা শুনেছেন, বাণ-মারা ব্যাপারটা কি? ধরুন, আপনি আপনার শত্রুকে মারবেন। আপনি আপনার শত্রুর একটি ছবি আঁকুন, তারপর একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে ছবিটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিন এবং বিশ্বাস করুন যে, তাকে হত্যা করার এই অনুকরণের দ্বারাই আপনার আসল উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে, অর্থাৎ আপনার শত্রু নিহত হবে। কুশপুত্তলিকা-দাহ করার যে রীতি বর্তমানকালের রাজনৈতিক দলগুলি একচেটে করে ফেলেছে, তার মূলেও অনুকরণমূলক যাদু-বিশ্বাসের প্রভাব বর্তমান। কণ্টাজিয়াস ম্যাজিকের মূলসূত্র হোল অংশকে প্রভাবিত করলে সমগ্রও প্রভাবিত হতে বাধ্য। আপনি আপনার শত্রুকে

যদি হত্যা করতে চান, তাহলে তার পরিধেয় বসনের কোন অংশ বা তার মাথার চুল, হাতের নখ বা কোন দেহের অংশ সংগ্রহ করে সেটাকে নষ্ট করে দিন।

ম্যাজিক বা যাদুবিশ্বাসের প্রয়োগ যে কোন প্রয়োজনেই করা চলতে পারে। বৃষ্টি আনার জন্য, ফসলের জন্য, শিকার পাওয়ার জন্য, রোগমুক্তির জন্য, প্রেমাস্পদকে লাভ করার জন্য ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ম্যাজিক আচরণ জগতের সকল জাতির লোকের মধ্যে, সকল ধর্মের লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে। ম্যাজিক-বিশ্বাসের অজস্র নিদর্শন জগতের সকল ধর্মের আচরণবিধির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ ও সূত্রগ্রন্থগুলি ম্যাজিক-বিশ্বাসের নিদর্শনে ভরপুর। বাঙালী মেয়েদের ব্রত-পার্বণগুলিও ম্যাজিক-বিশ্বাসের নিদর্শন। মেয়েদের ব্রতগুলির আচরণের দিকগুলি সযত্নে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সচরাচর ধর্মবিশ্বাস বলতে যা বোঝায়, তার সঙ্গে এই ব্রতগুলির কোন সম্পর্ক নেই। ব্রতগুলির মূল কথা হচ্ছে কামনা-পূরণ, যা ম্যাজিক-বিশ্বাসেরও মূলকথা। কিন্তু ধর্মের ব্যাপার হচ্ছে, কোন অতি-প্রাকৃত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ, যার সঙ্গে ম্যাজিকের কোন সাদৃশ্য আপাতদৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

॥ ৩ ॥

সম্ভবত উপরোক্ত কারণেই ফ্রেজার বলেছিলেন যে, ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্পর্ক তেলের সঙ্গে জলের মত। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফ্রেজার বলছেন: Propiation or conciliation of powers superior to man, which are believed to direct and control the course of nature and human life. কিন্তু ম্যাজিকের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র, অন্তত এ পর্যন্ত তাই মনে হয়। ম্যাজিকের মূলে রয়েছে প্রথমত একটি সপ্রাণ প্রকৃতির ধারণা, যে সপ্রাণতা গুণগত দিক থেকে মানুষের সপ্রাণতার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়, এমন কি কোন অংশে শ্রেষ্ঠও নয়। দ্বিতীয়ত, ম্যাজিকের আচরণগত দিক থেকে বিচার করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এখানকার সমস্ত ব্যাপারটাই ইঙ্গিতমূলক, মানুষ নিজের প্রয়োজনটা সপ্রাণ প্রকৃতির কাছে আকারে-ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে নিজ পাওনার প্রত্যাশা করে। এখানে ভয়-ভক্তির কোন স্থান নেই। কাজেই ধর্মের চরিত্র আর ম্যাজিকের চরিত্র এক হতে পারে না।

এই কারণেই ফ্রেজার ম্যাজিকের সঙ্গে ধর্মের পরিবর্তে বিজ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক। এই সম্পর্ক স্থাপন করার কিছুটা হেতুও আছে। ফ্রেজার দেখাচ্ছেন যে, জগৎ সম্পর্কে বিজ্ঞান ও ম্যাজিক উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। একটি নিয়মশাসিত প্রকৃতির ধারণা উভয় ক্ষেত্রেই বর্তমান এবং এই নিয়মশাসিত প্রকৃতিতে অতিপ্রাকৃতের কোন স্থান নেই। ফ্রেজার লিখছেন: It (magic) assumes that in nature one event follows another necessarily and invariably without intervention of any spiritual or personal agency. Thus, its fundamental conception is identical with that of modern science; underlying the whole system is a faith, implicit but real and firm, in the order and uniformity of nature. The magician does not doubt, that the same causes always produce the same effects. অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের মূল সূত্রগুলি ম্যাজিকে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু বিজ্ঞানে তা ব্যক্ত।

॥ ৪ ॥

কিন্তু বিজ্ঞান ও ম্যাজিকের এই আপাত-সাদৃশ্য থেকে যদি হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলা হয় যে, ম্যাজিক থেকেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে তাহলে সেটা 'Fallacy of over-simplification বা অতিসারল্য-দোষে দুষ্ট হয়ে পড়বে। ম্যাজিকের আচরণগত দিকগুলি লক্ষ্য করে আমরা ধরে নিয়েছি যে, গুণগত দিক থেকে ম্যাজিক ধর্মের সঙ্গে পৃথক, কেন না প্রথমটিতে অতিপ্রাকৃতের কোন স্থান নেই এবং অতিপ্রাকৃত বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টির কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই ধারণাগুলি সর্বাংশে সত্য কিনা সে বিষয় সন্দেহাতীতভাবে কিছু বলা যায় না। দ্বিতীয়ত ধর্মের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ম্যাজিক-বিশ্বাসের এত অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যে উভয়ের মধ্যে কোন না কোন সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনও ক্ষেত্রবিশেষে অনিবার্য হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত অতিপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস রেখেও কোন কোন ম্যাজিক-আচরণকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সব কারণে অনেকেই মনে করেন ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিকের কিছুটা অনিবার্য যোগ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদগুলি আমি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

জেভনস (Jevons) তাঁর **Introduction to the History of Religion** গ্রন্থে বলছেন যে, ধর্ম ম্যাজিকের পূর্ববর্তী। তাঁর নিজের ভাষায়: that belief in the supernatural (religion) was prior to the belief in magic, and that the latter whenever it sprang up was a degradation or a relapse in the evolution of religion. নৃতত্ত্ববিদ-মহলে Jevons-এর মতের সমর্থক অতি অল্প। এণ্ড্রু ল্যাঙ্গ (Andrew Lang) তাঁর **Making of Religion** গ্রন্থে কতকাংশে Jevons-এর মত সমর্থন করেছেন; অধুনা ডীন ইঙ্গে (Dean Inge) বলছেন যে, বিবর্তন কেবলমাত্র যে উত্তরোত্তর প্রগতিমুখী হবে তার কোন মানে নেই। বিবর্তনের পথে আগাছা জন্মাতেও কোন বাধা নেই; ম্যাজিককে অনায়াসে ধর্মের আগাছা বলা চলে। কিন্তু Jevons-এর মতটিকে সত্য বলে মনে করা চলে না, পদ্ধতিগত দিক থেকে বিচার

করলে দেখা যায় যে, ম্যাজিক ও ধর্মের মধ্যে কোন Common Connotation বা সাধারণ সারধর্ম বিদ্যমান নেই। উভয়ের মধ্যে কোন উদ্দেশ্যের অভিন্নতাও নেই, এই কারণে Jevons নিজেও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, Religion and magic had different origins, and were always essentially distinct from one another. জেভনসের যে দুটি বাক্য আমি উদ্ধৃত করেছি সে দুটির দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, উভয়ের মধ্যে কোন logical consistency বা নৈয়ায়িক সামঞ্জস্য নেই।

॥ ৫ ॥

অতঃপর দ্বিতীয় মতবাদে আসা যাক, যে মতবাদ অনুযায়ী বলা হয় ম্যাজিক ধর্মের পূর্ববর্তী এবং ধর্মের মূল উৎস ম্যাজিকের মধ্যে নিহিত। এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবে স্যার জেমস ফ্রেজারের কথা চলে আসে। তাঁর **The Magic Art** গ্রন্থে স্যার ফ্রেজার বলছেন যে, ম্যাজিক অনিবার্যভাবে ধর্মের পূর্ববর্তী। "In the evolution of thought, magic as representing a lower intellectual stratum, has probably everywhere preceded religion." ম্যাজিকের মূল কথা ধারণাসমূহের সামঞ্জস্য—association of ideas, বিশেষ করে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাদৃশ্যবিধি ও সংস্পর্শ বিধির যথাযোগ্য প্রয়োগ; এবং এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানে সার্থক কিন্তু ম্যাজিকে অসার্থক। ফ্রেজার বলছেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ম্যাজিকের অসাফল্য আদিম দার্শনিকদের অন্য পথ অনুসন্ধানে বাধ্য করেছিল, কেন না বৃষ্টির নাচ নাচলেই বৃষ্টি হয় না, শিকারের মহড়া দিলেই শিকার জোটে না, তন্ত্রমন্ত্র আওড়ালেই প্রেমিকার হৃদয় জয় করা যায় না। তাই ফ্রেজার বলছেন, a tardy recognition of the inherent falsehood and barrenness of magic set the more thoughtful part of mankind to cast about for a truer theory of nature and a more fruitful method of turning her resources to account. কাজেই মানুষের কাছে ম্যাজিকের বাস্তব বিফলতা তাকে ভিন্নপথ অবলম্বনে বাধ্য করেছিল, প্রাকৃতিক শক্তির পরিবর্তে অতিপ্রাকৃতিক শক্তির আশ্রয়লাভের প্রেরণা তার কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে জন্মলাভ করলেন অতিলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন দেবদেবীরা, আর আদিম মানুষ, ফ্রেজারের ভাষায়: humbly confessing his dependence on their (of the Gods) invisible power, and beseeching them of their mercy to furnish him with all good things. এইভাবেই Age of Religion ক্রমে ক্রমে Age of Magic-এর স্থান গ্রহণ করল।

উপস্থাপনার বৈচিত্র্যে ফ্রেজারের মতবাদ খুবই চিত্তাকর্ষক এবং তাঁর মতবাদের মধ্যে সত্যতার পরিমাণও অনেকখানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সমালোচকের অভাব নেই। তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে সমালোচকেরা বলেন: It seems to represent early man (of the more "sagacious" type) as almost a full-blown arm-chair philosopher in search of a working theory of life and the world, and ignores the spontaneous emotional response to environment which played a much greater part in the life of primitive man than reflective thought did. আদিম মানুষের মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল অদ্বয়বোধ। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সে নিজেকে ভেদ করতে সক্ষম ছিল না। আর তা ছিল না বলেই তার মনোগত ইচ্ছার প্রকাশ সে ঘটাত অনুকরণের মধ্য দিয়ে। এই অনুকরণবোধের মূল ভিত্তি সাদৃশ্য জ্ঞান। যে সপ্রাণ বাহ্য প্রকৃতিকে সে নিজের থেকে অভিন্ন মনে করে, তাকে অগ্রাহ্য করে অতিপ্রাকৃতরূপ একটি তৃতীয় শক্তিতে সে কি করে আস্থা স্থাপন করতে পারে? এ প্রশ্নের জবাব ফ্রেজার দেন নি। ম্যাজিক ও ধর্মের প্রকট পার্থক্যটি ফ্রেজারের বিংশ শতাব্দীর চোখে মনে হয়েছে তেল ও জলের মত। তাই যদি হয় তাহলে ম্যাজিক-শাসিত সমাজে ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি নূতন আগন্তুক যার প্রকৃতি সম্বন্ধে আদিম সমাজ একেবারেই অজ্ঞ। এটা কি করে সম্ভব যে, আদিম মানুষ ম্যাজিক-শাসিত সমাজের দোষ-ত্রুটি বিচারকের মত উদ্‌ঘাটন করে তাকে এককথায় খারিজ করে দিয়ে ধর্মকে অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসকে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করল? কাজেই দেখা যাচ্ছে ম্যাজিক ও ধর্মের সমস্যা সহজে মেটবার নয়।

॥ ৬ ॥

ফ্রেজারকে মার্কসপন্থীরাও সমালোচনা করেছেন, অবশ্য ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। মনে রাখতে হবে ধর্ম ও ধর্মের উদ্ভব সম্বন্ধে মার্কসপন্থীদেরও একটা মত আছে। ম্যাজিককেও তাঁরা হিসাবের মধ্যে ধরেছেন এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তারও একটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। ম্যাজিকের মৃত্যু এবং ধর্মের উদ্ভবকে তাঁরা ধর্ম-সম্পর্কিত তাঁদের নিজস্ব মতবাদ ও আদি সাম্যাবস্থার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁদের মতে ধর্ম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবদান। আদি সাম্যাবস্থার যুগে প্রত্যেকটি মানুষকে সমান পরিশ্রম করতে হত এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদন সম্ভব ছিল না। তখনো ধর্ম গড়ে ওঠে নি, কেন না ধর্ম শোষকশ্রেণীর হাতিয়ার, আর আদি সাম্যাবস্থার যুগে শোষকশ্রেণীর সৃষ্টি হয় নি। এই কারণেই আদি সাম্যাবস্থার যুগে মানুষ ধর্মের পরিবর্তে ম্যাজিকে বিশ্বাসী ছিল, যে বিশ্বাসের মূলে আছে কামনা পূরণের সংকল্প, আছে সমবেতভাবে প্রাণধারণের তাগিদ, আছে প্রকৃতিকে জয় করার বাস্তব বিফলতাকে কল্পনার জয় দিয়ে বা জয়ের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা, যা ম্যাজিকের মূল কথা। যেদিন মানুষ তার

প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদন করতে শিখল, এবং যেদিন সেই বাড়তি উৎপাদন সকলের ভোগে না লেগে মুষ্টিমেয়ের ভাণ্ডারে জমা হল সেদিনই আদিম সাম্যাবস্থার মৃত্যু হয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের জন্ম হল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পরশ্রমফলভোগী শোষক-সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসাবেই দেবতাদের ধারণা গঠিত হল, যাদের কাছে প্রার্থনা করলে কিছুটা সিদ্ধি মিলতে পারে, কিন্তু কোন দাবী-দাওয়ার কথা তোলা চলে না। শোষকশ্রেণীর চরিত্রের সঙ্গে প্রাচীন দেবদেবীর চরিত্রের কোন পার্থক্য নেই। এই কারণেই মার্কসপন্থীদের বক্তব্য: আদি সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিকের মৃত্যু হয়েছে এবং শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের উদ্ভব হয়েছে।

মার্কসপন্থীদের বক্তব্যে যথেষ্ট অভিনবত্ব আছে, কিন্তু এ বক্তব্যও সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না। প্রথমত Age of Primitive Communism বা আদি সাম্যাবস্থার যুগের ধারণা এখনো কল্পনা মাত্র, এবং এর যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য আরও বহু তথ্যের প্রয়োজন যা বর্তমানে আমাদের হাতে নেই। দ্বিতীয়ত ধর্মকে শোষকসমাজের হাতিয়ার বলে ঘোষণা করাটাও অসমীচীন, কেন না ধর্মের উদ্ভব একটি জটিল প্রসঙ্গ এবং এক কথায় তার ব্যাখ্যা করতে গেলে তা অতিসারল্য দোষে দুষ্ট হবে। ধর্মবিশ্বাসের মূলে প্রকৃতির রহস্য জানবার একটি বৈজ্ঞানিক প্রবণতাও বর্তমান, যার গুরুত্ব কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়ত দেবদেবীদের শোষকসমাজের হুবহু প্রতিচ্ছবি বলে মনে করার মূলে একটা ছেলেমানুষী প্রবণতা বর্তমান। বর্তমানের চলতি ধর্মগুলিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—Natural Religion এবং Revealed Religion. যে ধর্মবিশ্বাসে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করা হয় সেই ধর্মবিশ্বাসকে আমরা Natural religion বলতে পারি। বৈদিক ধর্ম Natural religion-এর পর্যায়ে পড়ে। এখানে যাঁরা দেবতা তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন। ঊষা, অগ্নি, পৃথিবী, সূর্য, সবিতা, মরুৎ, পর্জন্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণ কি কোন শোষকসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, না প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন? প্রাচীন মিশরীয় বা গ্রীক ধর্মের ক্ষেত্রেও এই প্রাকৃতিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটিই প্রধান। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সব দেবতাগণ ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিত্ব আরোপণের (anthropomorphism) প্রলেপে তাঁদের মৌলিক তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের শোষক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে মনে করবার কোন হেতু নেই।

যেগুলিকে Revealed Religion বলা হয় যেমন বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টধর্ম, ইসলাম ধর্ম ইত্যাদি, সেই ধর্মসমূহের উদ্‌গাতারা যে শোষকশ্রেণীর স্বার্থ কায়েম রাখার জন্য ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন একথা বলাও বাতুলতা। অর্থনৈতিক সাম্যের কথা ইসলামধর্মে খুব জোরের সঙ্গেই বলা হয়েছে, খৃষ্টধর্মেও তার নিদর্শনের অভাব নেই। তবে দীর্ঘকাল ধরে কোন ধর্মব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সেখানে কতকগুলি বিশেষ কারণে টোটালিটারিয়ানিজম এসে পড়ে, ফলে অনাচারের উদ্ভব হয়। তদানীন্তন খৃষ্টধর্মের অনাচার দেখে মার্কসের মত মানবতাবাদীও ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন এবং এই কারণেই তিনি ধর্মকে প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। কতকগুলি বিশেষ কারণে exploitation-এর উদ্ভব হয়। এবং যে কোন সৎ আদর্শই exploitation-এর victim হতে পারে, এমন কি মার্কসবাদও বাদ যায় না। মার্কসের শ্রেণীহীন সমাজের কল্পনার সঙ্গে কি স্ট্যালিন যুগের রাশিয়ার কোন মিল ছিল? মার্কসবাদকেও একটা Revealed Religion বলতে আপত্তি নেই, যার বাইবেল হচ্ছে ক্যাপিটাল, চার্চ হচ্ছে পার্টি, যাজক হচ্ছে পার্টি নেতা, এবং ধর্মের মতই যেখানে doctrine of predestination-কে স্বীকার করে নেওয়া হয়। যে কোন ধর্মের মতই মার্কসবাদেও ঘোষণা করা হয় যে, মানুষের ভাগ্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, অবশ্য এখানে ঈশ্বর বলতে ইতিহাসকে বোঝায় যার গতি নির্ধারিত হয় উৎপাদনসম্বন্ধ এবং সম্পত্তিসম্বন্ধের টানাপোড়েন মারফৎ।

॥ ৭ ॥

ম্যাজিক সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলি আর এক দফা আঘাত পেয়েছে ম্যারেটের (Marett) কাছ থেকে। ম্যারেটের বক্তব্য হচ্ছে যে, একই শিকড় থেকে ধর্ম ও ম্যাজিকের উৎপত্তি এবং সেই শিকড়টি হচ্ছে অতিপ্রাকৃত সত্তায় আস্থা। তাঁর Threshold of Religion গ্রন্থে ম্যারেট বলছেন, Magic and religion are differentiated out from a common plasm of crude beliefs about the awful and the occult এবং Supernaturalism provides a raw material common to both. ম্যারেটের প্রথম বাক্যটির মধ্যে কিছু সত্য যে থাকতে পারে না তা নয়। ম্যাজিক ও ধর্মের উদ্ভবের কোন সাধারণ উৎস থাকা বিচিত্র নয়। হার্টল্যাণ্ডও (Hartland) তাঁর Ritual and Belief গ্রন্থে বলছেন: In the lowest societies of which we have evidence, practices usually regarded as magical are indistinguishable from those regarded as religious. আমাদের হিন্দুধর্মেও ক্ষেত্র বিশেষে ম্যাজিক ও ধর্ম এমনভাবে মিশে গেছে যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব। উদাহরণ দুর্গা পূজা।

কিন্তু ম্যারেটের দ্বিতীয় বাক্যটি,

যেখানে বলা হয়েছে, Supernaturalism provides a raw material common to both, ম্যাজিক সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত সকল ধারণার বিরোধী। ম্যাজিক-তত্ত্বে রহস্য যতই থাক না কেন, আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, একটা বিষয় খুবই স্পষ্ট যে ম্যাজিক-বিশ্বাস অনুযায়ী প্রকৃতিতে কোন বাহ্যশক্তির হস্তক্ষেপ নেই; একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার সঙ্গে অনিবার্যভাবে গ্রথিত। পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে ফ্রেজারের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু এটা তিনি সঠিকভাবেই বলছেন যে, ধর্মের মনোভাব বলতে আমরা বুঝি অতিলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব এবং তার নিকট মানুষের বশ্যতা ও আত্মসমর্পণ; কিন্তু ম্যাজিকে আছে একটি উত্তপ্ত আত্মনির্ভরতা, প্রকৃতিকে নিজ আয়ত্তে আনার প্রয়াস, নিজ ইচ্ছাশক্তির নিকট প্রকৃতিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা। যেখানে এই বিশ্বাস নিয়ে ম্যাজিক চলছে সেখানে অতিপ্রাকৃতের স্থান কোথায়? ধর্মের একটি সামাজিক দিক আছে, সমাজের বিভিন্ন element-এর মধ্যে তা বন্ধনের সূত্র। কিন্তু ম্যাজিক একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, অসামাজিক কখনো বা সমাজ-বিরোধী। Emele Durkheim তাঁর Elementary Forms of the Religious Life গ্রন্থে যা বলছেন: There is no church of magic - - - The magician has a clientele and not a church..Religion on the other hand, is inseparable from the idea of a church. ফ্রেজার যতই ভুল করুন না কেন, এ কথাটি তিনি অতি সঠিক বলেছেন যে, ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিকের সম্পর্ক তেলের সঙ্গে জলের সম্পর্ক। তবে এও ঠিক যে, ধর্মের সঙ্গে ম্যাজিক মিশে যেতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় mechanical mixture, কৃচিৎ কখনো দু'একটি ক্ষেত্রেও chemical compoundও হতে পারে, তবে সেগুলি ব্যতিক্রম এবং ব্যতিক্রম কোথায় না নেই।

॥ ৮ ॥

কোন্ মনস্তাত্ত্বিক কারণে আদিম মানুষ ম্যাজিকে বিশ্বাসী হয়েছিল সে বিষয় নির্দিষ্ট করে এখনো পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়, উপরোক্ত বক্তব্যগুলি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। একজনকার ভাষ্যের সঙ্গে আর একজনকার ভাষ্য নাও মিলতে পারে। কাজেই জোর করে কোন সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার কোন অর্থ হয় না। সুজান ল্যাঙ্গার তাঁর Philosophy in a new Key গ্রন্থে যা বলছেন, কোন ঘটনা সম্যকভাবে বোঝা, বা তা সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তোলাই আমাদের কর্তব্য, ভাষ্যটা কোন বড় কথা নয়।

তবে একটি জিনিষ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। সভ্য মানুষের যুগার্জিত প্রেজুডিস যেন আদিম মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝার পক্ষে প্রতিকূল না হয়ে ওঠে। আদিম মানুষকে স্বপ্নবিলাসী, অপরিণত মস্তিষ্ক ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করার কোন অর্থ হয় না। আজ থেকে শতবর্ষ আগে টাইলর তাঁর Primitive Culture পুস্তকে প্রমাণ করেছেন যে, আদিম মানুষ যুক্তিধর্মী ও অভিজ্ঞতাবাদী ছিল। পরবর্তী গবেষণাসমূহে টাইলরের বক্তব্য মোটামুটি সমর্থিত হয়েছে। ম্যাজিক আচরণগুলির সর্বজাগতিক ঐক্য একথাই প্রমাণ করে যে, এই প্রথাগুলির পিছনে একটি সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক যুক্তিবোধ কাজ করেছিল, যার ফলে বিভিন্ন দেশের প্রথাগুলির মধ্যে একই ঐক্যবোধ, একই চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়, সবগুলিই একই অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতিরই প্রতিক্রিয়া। আমার মতে সভ্য মানুষ ও আদিম মানুষের মনোভাবের পদ্ধতিগত পার্থক্যটি বুঝতে পারলে ম্যাজিক ও অনুরূপ অপরাপর প্রথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য বোঝা যাবে, যে পদ্ধতিগত পার্থক্যটি বোঝাতে গিয়ে ফ্রাংকফোর্ট তাঁর Before Philosophy গ্রন্থে বলছেন: 'To a scientific civilized man the phenomenal world is nothing but an "It"; but to a savage it is a "Thou."

যদি আমি একজন আদিম মানুষ হই, এবং হে 'পরিদৃশ্যমান জগৎ, তুমি যদি আমারই মত সম অনুভূতিসম্পন্ন একটি জীবন্ত সত্তারূপে আমার সম্মুখে প্রতিভাত হও, তাহলে, আমার বৃষ্টির প্রয়োজন থাকলে, আমি যদি তুলসীগাছের মাথায় ঝারি দিয়ে তোমাকে ইঙ্গিত করি যে, অনুরূপ ধারাবর্ষণ আমার মস্তকে তোমার দ্বারা সাধিত হোক—তাহলে আমার এই আচরণ কি অযৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন হবে?

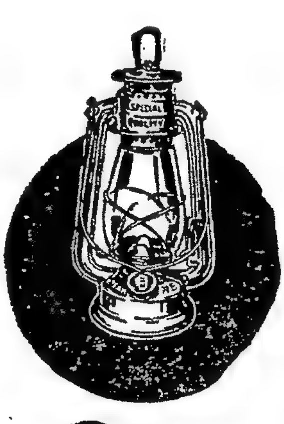

ক্রিস্মান
লন্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট

গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৬৬,৩নং চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৬৫৮০

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূব-প্রকাশিতের পর)

অনেক রাত হয়েছে। আনন্দীরাম খেতে বসেছেন ও ছোট সামনে বসে মৃদুস্বরে কথা কইছেন। আনন্দীরামের বয়স বছর আটাশ হবে। ছোট হয়ত তাঁর চেয়ে বড়জোর সাত-আট বছরের বড়। এ সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি না কি ছোটর পেছন পেছন এসেছে, তাই ছোটর প্রতিপত্তির শেষ নেই।

ঘরে পরে অনেকে অনেক কথা বলে। কিন্তু আনন্দীরাম জানেন, বিমাতার কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই।

দীপাধারে দীপ। সামনে ছোট গালে হাত রেখে বসে আছেন।

আনন্দীরাম সক্ষোভে বললেন, 'বাড়ি আসি শুধু তোমার জন্যে। নইলে নিত্যি নিত্যি এ মেয়ে কোন্দল আর সহ্য হয় না।'

ছোট কি ভাবছিলেন। একটু হেসে বললেন, 'কি করবে বল, তোমার বাড়ির উপর দিয়েই নারদ-ঠাকুরের যাওয়া আসার পথ।'

'তোমার প্রশ্রয়েই এঁরা এমন হয়েছেন।'

'কি রকম?'

মা ও ছেলের সম্পর্কটা অনেকটা বন্ধুর মত। এক কারণ বয়সের নৈকট্য, আর কারণ ছোটর স্বভাব। ছোট প্রতিদানের অপেক্ষা না রেখে ভালবাসতে জানেন।

'সংসারের সব দায়িত্ব নিজে তুলে নিয়েছে, ওঁদের কিছু করতে দেবে না, বুঝতেও দেবে না।'

'গোপাল, কার 'পরে দায়িত্ব দেব বল? তোমার মা অসুস্থ, পিসীমা চিরকাল অবুঝ। আড়বুঝো লোককে সংসারের কাজে জড়ালে চিরকাল হিতে বিপরীত হয়।'

'তা হয় বটে।' আনন্দীরাম একটি ছোট নিশ্বাস ফেললেন। দুজনেরই মনে পড়েছে সকলে যাকে ভালবেসে সংসারের ভার তুলে দিতে চেয়েছিল সেই বড়বউ এ-সুখকে দুঃখ মনে ক'রে মিছে ভয় পেয়ে বংশের একমাত্র শিশুকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে। অথচ প্রথম বউ, স্বামী এবং শাশুড়ির কাছ থেকে সে অজস্র ভালবাসা পেয়েছিল।

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে আনন্দীরাম একটু হেসে বললেন, 'তুমি যে কেন কাশিমবাজারে থাক না আমি তাই ভাবি, এখানে কি সুখে পড়ে থাক। অমন দাদা---।'

ছোট কি ভাবছিলেন, আনন্দীরামের কথার পিঠে জবাব না দিয়ে বললেন, 'গোপাল, তুমি আমার দাদার কাছে যাও।'

'কেন?'

'আমাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন তোমার ভাল যাতে হয়, তা দেখবেন। তুমি তাঁর একটিমাত্র ভাগ্না।'

আনন্দীরাম পাতের দিকে চোখ রেখে বললেন, 'তিনি আমার জন্যে করবেন কেন?'

'তা করবেন।'

ছোটর মুখ স্মৃতিতে প্রসন্ন হ'ল। যে নারী জানে সংসারে সকল প্রিয়জনের ওপর তার স্নেহের অধিকার আছে, সে সকলের কথা মনে ক'রেই প্রসন্ন হয়। তাঁর কথা শিবকালী বাঁড়ুয্যে ঠেলবেন এমন মনে হয় না। মৃদুস্বরে বললেন, 'আমি তাঁর একটিমাত্র বোন।'

'একমাত্তর বোন হ'লেই কি ভাই তার-জন্যে করে?'

ছোট যেন বুঝলেন কার কথা মনে রেখে আনন্দীরাম এখন কথা কইলেন। বললেন, 'সব মানুষ এক ধাতে গড়া নয় গোপাল।'

'কি জানি।'

আনন্দীরাম খাওয়া শেষ ক'রে দুধের বাটি টানলেন। ছোট আরো ধীরে বললেন, 'দেখ, দাদার বুদ্ধি আছে।'

'নইলে আর ফিরিঙ্গী কুঠিয়ালের পেস্কারী করেন?'

'বিষয়-আশয় যা করেছেন নিজের চেষ্টায়, মামারা ওঁকে এক খাবলা লবণ আর পাঁচ পো চিঁড়ে গামছায় বেঁধে বড়গাঙে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল জান বোধ হয়।'

'তখন মানুষের কপাল ছিল অন্যরকম। পড়বি ত' পড় নাটোরের মায়ের সামনে। আমাদের এমন কপাল, কাছে-পিঠে তেমন একটা ডাকসই রাজাও নেই। এখন রাজার চে' মহাজনের গরম বেশি। হক না হক টাকা ধার দিতে তারাই দেয়।'

'গোপাল, তুমি কোন রাজাকে দেখেছ মহাজনের কাছে হাত পাততে?'

'আহা ঐ হল।' মহাজন না হক, কুঠির পেস্কার। যে টাকা দেয় সে-ই মহাজন। তা আমাদের কপাল কি আর মামার মত হবে ছোট?'

ছোট একটু হাসলেন। তাঁর দাদার জীবনে ওই কথাটি আশ্চর্য। প্রায় গল্পকথার মত। নাটোরের রাজার কথায় তাঁদের রাজসাহী-আস্নুয়ার কাছারীতে দাদুর কাজ হয়। রাজা বলতেন, বাঘের মধ্যে বেঁড়ে আর বামুন জাতের রেঁড়ে, এদের উন্নতি হয়। শিবকালী উন্নতি করবে।'

উন্নতি হয়েছিল। শিবকালী ব্যতীত সেরেস্তায় কেউই কাজ করত না, সম্ভবত সে-কারণেই উন্নতি। রাজার দেহান্তে রাণীর কাছেও ছিলেন। কুশলী কর্মচারীর দাম তখন অনেক, অতএব রাণী ভবানী শিবকালীকে বড়নগরে বসত জমিও ব্রহ্মত্র ক'রে দেন, তবু শিবকালী থাকলেন না।

'মামা নাটোরে থাকলেন না কেন ছোট?'

হঠাৎ আনন্দীরাম সেই কথাটি জানতে চাইলেন।

'শুনেছি, ইদানীং শোকে তাপে আর রাণীর মন-মেজাজ থির থাকে না। তা ছাড়া, দাদা যদিও বলেন মায়ের অনুমতি নিয়ে এসেছি, আমার মনে হয়---

'কি মনে হয়?'

ছোট'র জবাব শুনে আনন্দীরাম অবাক হ'লেন। দাদার বোন বটে, বুঝতে পারে সব। ছোট বললেন, 'তাঁর 'পরে জমিদারী আগলাবে কে, তেমন কেউ নেই, এ জেনেই যেন রাণী সর্বস্ব দান করতে বসেছেন। এমন সেরেস্তায় অসাধু কর্মচারীর লাভ হয়, লাভের কড়ি গুছিয়ে নেয়। দাদা তা-ও পারবেন না, অথচ জানেন যে মালিকেরই যদি মন ভেঙে যায়, কি ধরে বাঁচব, সেই আশাটা যদি না থাকে, তাহলে আর জমিদারীর উন্নতিতে মন থাকবার কথা নয়। বিষয় তখন বোঝা মনে হয়। এমন ঠাঁইয়ে থাকলে উন্নতি নেই সে জন্যেই হয়ত সরে এলেন।'

'শেষ অবধি কুঠিয়ালের কর্মচারী? এদিকে নদে, বর্ধমান, ওদিকে নিজামত, সর্বত্র তাঁর আদর হ'ত।'

'তা হ'ত। তবে দাদা বলেন ফিরিঙ্গীরা জেতে বেনে। ওদের উন্নতি ঠেকায় কে। ওদের ওখানে নাকি---'

'উন্নতি?' আনন্দীরাম কথার যোগান দিলেন।

'তাই।'

ছেলের মনের ভাব বুঝে ছোট বললেন, 'ওদের সঙ্গে চালাকী করলে দোষ নেই, দাদা বলেন। ওরা ত' আর এদেশের লোক নয়। সে-কথা থাকগে গোপাল, তুমি আর অমত ক'রো না।'

'কিসে?'

'দাদার কাছে যেতে।'

'আমার মন চায় না ছোট।'

'তা বললে কি তোমার চলে? সর্বদা নিজের কথা ভাবতে আছে? তোমার বাপ তেমন রেখে যান নি, যদি বল চাকরী করা মন্দ, তবে বলি আজকাল কাজ করে খাচ্ছে ত' অনেকেই। এ-ও নতুন নয়, গোবিন্দপুর তুমি কুঠির চাকরীর সন্ধানেই গেছলে।'

'তা গেছলাম।'

'তা ছাড়া, গোপাল, তোমার আশ্রয় করে আমরা এতগুলো প্রাণী বেঁচে আছি, আমাদের কথাও ভাব।'

আনন্দীরাম সহাস্যে চাইলেন। বিমাতা তাঁর কাছে অনেকটা মা দুর্গার মত সর্বশক্তিময়ী। ছোটবেলা থেকেই তাই মনে হয়। কারণটা অবশ্য স্বার্থজড়িত। তিন সংসার করেও শিবকালী নিঃসন্তান। নেব নেব ক'রে দত্তক নেওয়া এখনো হয় নি, যদিও সে পথ একেবারে বন্ধ নয়। বোনকে তিনি দিয়ে থাকেন প্রচুর, বোন আবার সে-সব এ সংসারে ঢালেন। আনন্দীরামকে আদর-আবদার যা দেবার তিনিই দিয়েছেন।

'আমার ভরসা তুমি ভারি কর কি না।'

'করি বই কি,' ছোটর কণ্ঠ গম্ভীর, বিষণ্ণ। 'ছেলের ভরসা করব না গোপাল? আমার আর আছে কে?'

'সে সব জালা পোয়াও যদি।'

'নইলে এই পাগল-ছাগল সব যায় কোথায় বল? কেউ একজন আপনার বলে থাকা চাই। আমারও ত' আপন বলতে এরাই। কাকে ফেলব কাকে রাখব বল?'

আনন্দীরাম সঙ্কোচে বললেন, 'যেমন মেয়েমানুষগুলো, তেমনি মামা, কিছুই বোঝেন না।'

'অমন কথা ব'ল না, দাদা আছেন বলে আমি বাঁচি।' বলতে বলতে ছোট হাসলেন, কেন না আনন্দীর মামাকে দিয়ে সংসারের কুটোগাছটি ভাঙার উপকার হয় এমন কথা ক্ষ্যাপাও বিশ্বাস করবে না।

'হ্যাঁ, আমি আর দেখছি না। হবে না কেন? মামা আর মা একই ঝাড়ের বাঁশ ত', ব্যাবুঝ।'

'ছিঃ গোপাল, তিনি গর্ভধারিণী হন।'

ছোট হাঁড়িকুঁড়ি তুলে এঁটো পাড়তে থাকেন। বলেন, 'কার ওপর রাগ করব বল? এদের কোনটির জ্ঞান নেই। আমি খেলাম কি খেলাম না, তা অবধি খোঁজ নেন না দিদি বা ঠাকুরঝি।'

'নিরোলের মেয়ে কি করে?'

'সে ত' একপায়ে খাড়া, কিন্তু আমি বলি যতদূর পারি ওকে রেহাই দিই। তাও ত' শাশুড়ি পিসশাশুড়ির দাপটে বাছা---'

কথা শেষ করেন না ছোট। বেরিয়ে এসে আনন্দীরাম দাওয়ায় আঁচান। ছোট শেকল দেন হেঁসেলে, রান্নার দালানের কপাটে হুড়কো। তারপর দালানের নীচে পা ধুয়ে ওপরে ওঠেন। ছেলের ঘরের দু'খানা ঘর বাদে বড় ঘরখানা তাঁর। ঢুকে হুড়কো দিলেন। এত বড় ঘরে একা শোয়া এটি তাঁর বিলাসিতা। ভিজে গামছায় হাত পা গা মুছলেন। তাতে যেন জ্বলছে গা। ব্যবহারের কাপড় ছেড়ে পুরনো অথচ ফর্সা নরম একখানা কাপড় পরলেন। সযত্নে চুল আঁচড়ান। নানা বিষয়ে তাঁর ব্যবহার বিধবার মত নয়। বিধবাকে শোয়া-বসার আরাম ভুলতে হয়, ছোট কিন্তু পালঙ্কে শোন, পরিষ্কার বিছানায়।

পিদীম নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে তিনি অভ্যেসমত হাতপাখা নাড়তে নাড়তে পাশ ফিরে আঁধারের দিকে চাইলেন। এ জানলার পর অবারিত আকাশ, চাইলেও কেউ তাঁকে দেখতে পাবে না।

দূরে, অনেক দূর থেকে কোলাহল আসছে। ধীরে বিশালাক্ষীর চোখ স্থির হল, মন দিয়ে শোনবার ভঙ্গীতে শরীর যেন একাগ্র হ'ল। নাকের ডগা স্ফুরিত হচ্ছে, চোখ জল বিনেই চকচক করছে, চড়কের গোলমাল। আজ রাতে যেন বড্ড বেশি গোলমাল। শ্মশানতলার মাঠে তিনি জীবনেও যান নি, কিন্তু এ গাঁয়ের বউ হয়ে আসবার পর থেকে জানেন, সংক্রান্তি যত এগিয়ে আসে, শ্মশানতলার মাঠে ততই তাণ্ডব বাড়তে থাকে। রাজ্যের সন্ন্যেসী, পিশাচসিদ্ধ, তান্ত্রিক সবাই আসে। শিবের সন্ন্যেসী হয় যারা তারা ওঁদের সঙ্গে মিলে শ্মশান থেকে মড়া তুলে মড়া নাচায়, মুণ্ড হাতে নাচে। সেই সঙ্গে কি বিকট 'শিব! শিব!' ধ্বনি। যতজন আসে সকলেই কি জাত সন্ন্যাসী?

বিশালাক্ষী হাতপাখা নামিয়ে রাখলেন। কালো মশারী দিয়ে দেখতে থাকলেন বাইরের আকাশ। মেয়েমানুষের এমন ক'রে তারা দেখতে নেই, আকাশে যত তারা তত অমঙ্গল হয়, কিন্তু সব কিছু কি মানতে পারেন তিনি? 'ভাত পাতে গোপাল কথা কইলে, জাত গেল কি?' কথাটি অস্ফুটে বলে একটু হাসলেনও আবার। ও কথা ত' বলতে চান নি, বলতে চেয়েছিলেন আর কেউ দেখলে বলত, ভাত পাতে কথা কয়েছে, ওর জাত গেছে।

কান পেতে শুনতে থাকলেন চড়কের গোলমাল। কি হট্টগোল, দক্ষযজ্ঞ যেন। এবার যেন নতুন বুলি শুনছেন? 'হরহর মহাদেব, হরহর মহাদেব', পষ্ট কানে আসছে। 'বাব্বা, ডাকাত পড়েছে যেন,' বিশালাক্ষী পাশ বদলে শুলেন।

তবু বুকের ভেতর গুরগুর ক'রে বাজতে থাকল। এমন আজকাল ঘনঘন হয়। ভাঁড় ভাঁড় সালসা খেয়ে তবু ত' কমল না। একটু শব্দ শুনলে, একটু উত্তেজনা হলে বুকের ভেতর ঢেঁকির পাড় পড়ে।

চড়কের বাজনা শুনলে আর স্থির থাকে না বুক। দশ বছর আগে, একমাত্র সন্তানকে বিশালাক্ষী এই চড়কের মেলায় হারিয়েছেন। পাঁচ বছরের ছেলে, তায় ন্যাটা, মুখের বোল আধো অস্পষ্ট, হাবা বললেই হয়, থাকবার মধ্যে ছিল বাড়ন্ত গড়ন, অমন ছেলেদের বোধ হয় গড়ন একটু বাড়ন্ত-ভরন্তই হয়। চাকরের কোল হতে ছিনিয়ে তাকেই কে নিয়ে গেল, মেলার শেষে তখন সন্ন্যেসীদের ডেরাডাণ্ডা তুলবার পালা। তারাই নিলে, না ঐ ভবঘুরে বাজীকর, পাখমারা, না সেই কটকী নটুয়ারা, যারা মুখোস পরে রামসীতার পালা নেচে দেখালে, শত চেষ্টাতে আর হদিশ মিলল না।

চড়কের বাজনা শুনলে আজও বিশালাক্ষীর বুকের ভেতর কোথায় যেন বাজে। তাঁর দুঃখ কেউ বোঝে না, গোপালও না, জানে না কিসের আশায় তিনি আঁধারমাণিকের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। আবার পাশ বদলে শুলেন।

ঠিক সেই সময় পশ্চিমের ঘরে আনন্দীরাম নিরোলের মেয়ে, ছোট বউ কুন্দকে সাক্ষী মেনে মন খুলে কথা কইছিলেন।

'ছোটর মন কে বোঝে? এখনো ছোট কানায়ের আশায় বাঁচেন, নইলে কি আর তোমাদের সংসারে পড়ে থাকেন? মানী লোকের বোন।'

কুন্দ ঘোমটার ফাঁক দিয়ে চেয়ে বসে ছিল। হঠাৎ উঠে গিয়ে গরাদ চেপে দাঁড়ায়।

আনন্দীরাম বিরক্ত হলেন। বউ-এর এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়, আর যতই তিনি নিজের মনে বকুন, হুঁ হাঁ আশা করেন বইকি। বললেন, 'ও কি?'

কুন্দ সবেগে মুখ ফেরালে। মাথায় ঘোমটা নেই, ঠোঁট কাঁপছে, নোলকের মুক্তো নড়ছে। আনন্দীরাম হতবাক। পিদীম না নেভা অবধি বউ-এর ঘোমটা তোলার কথা নয়। একজনকে আঁটতে পারেন নি বলেই যে আরেক জনকে ছেড়ে দেবেন, তার কি যুক্তি আছে?

(ক্রমশঃ)।

শাখা-কঙ্কণ

মিহির মুখোপাধ্যায়

হেনাফুলের গন্ধে নাকি সাপ আসে। ছোটবেলার শোনা কথা। চোখে পড়ে নি কোনদিন। কথাটা একদিন বলেছিল হেনাকে। প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলেছিল।

বেণীটা সামনে ঘুরিয়ে, প্রথমে ভুরু কুঁচকে, তারপরে একটু হেসে জবাব দিয়েছিল হেনা—তা'হলে তুমি সাপ, গন্ধে গন্ধে এসেছ।

—হ্যাঁ, সাপই তো, সাপের মত জড়িয়ে থাকব তোমাকে আর ছাড়ব না। —দমকা হাওয়ার মত হেসেছিল প্রশান্ত।

হেনাফুলের গন্ধটা বড় মিষ্টি। এত কাল পরে কোথাও কখনো সেই মিষ্টি গন্ধটা নাকে এলে পুরনো দিনগুলির কথা মনে পড়ে।

এখন এই দুপুরের রেলগাড়ি ছুটেছে। জানলার কাছে বসে ছিল প্রশান্ত। বাইরে শীতের শূন্য মাঠ; কখনো দু-একটা পুকুর, বাগান, বাঁশ-ঝাড়, মানুষের ঘর-গেরস্থালি, আবার মাঠ, মাঠের শেষে আকাশ। টেলিগ্রাফের তার সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। একটা কালো রঙের লেজ-ঝোলা পাখী, দেখতে দেখতে পেছনে পড়ে গেল। কি নাম যেন পাখীটার। ছোটবেলার চেনা পাখী।

মনে পড়েছে, ফিঙে, হ্যাঁ ফিঙে পাখী। কখনো হয়তো চোখে পড়ে, কিন্তু নাম মনে পড়ে না। আজকাল কি যেন হয়েছে, মাঝে মাঝে নাম ভুলে যায়, চেনা লোকের নাম, চেনা পাখীর নাম, চেনা ফুল কিম্বা গাছের নাম।

অফিসের কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় প্রশান্তর। মেসের দরজায় তালাবন্ধ থাকে। এবার মেসে ফিরে এই চিঠিটা পেয়েছে। হেনার চিঠি।

কত বছর পরে চিঠি লিখেছে হেনা। চার না পাঁচ। হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ বছর পরে লিখেছে। প্রয়োজনের চিঠি। পরিচ্ছন্ন গোটা গোটা অক্ষরে খুব দরকারী কথা কয়েকটা। একটা কথা বেশি নেই, কমও নেই। এত কম কথায় চিঠি লিখতে পারে হেনা, জানা ছিল না।

জামার বুকপকেটে বুকের কাছে কাঁটার মত খচখচ করছিল চিঠিটা। জানলা দিয়ে হাওয়া আসছে। সঙ্গে সঙ্গে কয়লার গুড়ো। হাওয়ার হাসলা আটকাবার জন্য কাচের পাল্লাটা নামিয়ে দিল প্রশান্ত। সাবধানে বার করল চিঠিটা।

আড়চোখে একবার দেখল, ওধারের ভদ্রলোকটি সামনে খবরের কাগজ খুলে বসে আছেন। এই সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় যাত্রী বেশি নেই। দু'চারজন এদিক-ওদিক ক কেউ ঝিমচ্ছে, কেউ বাইরে তাকিয়ে---

কেউবা কিছু পড়ছে। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, এই চিঠির খবরটা সবাই জানে। সবাই যেন প্রশান্তকে দেখে মনে মনে ঠাট্টার কথা ভাবছে। চিঠিটা আবার পড়ল প্রশান্ত।

সবিনয় নিবেদন,

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল। পিণ্টুর টাইফয়েড হয়েছিল। এখন ভালোর দিকে। দেখার ইচ্ছে হলে, এখানে আসার কোন বাধা নেই। উপরে ঠিকানা দিলাম। বরাকর স্টেশনে নেমে ধাতুরি ড্রাইভারের ট্যাক্সিতে উঠে ওই ঠিকানা বললে এখানে নিয়ে আসবে। ধাতুরি আমাদের চেনা লোক।

নমস্কারান্তে, ইতি—

হেনা।

নামের শেষে ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা, পিণ্টুর মা। যেন ওই পরিচয় না থাকলে চিনতে পারবে না প্রশান্ত। হেনা নামের অন্য কাউকে ভাববে।

সম্বোধনে আপনি তুমি কিছু নেই। সে দিকটা সাবধানে এড়িয়ে গেছে।

কাউকে কথার প্যাঁচে জব্দ করার পর একটু ঘাড় কাৎ করে মুখ টিপে যেমন হাসত হেনা, তেমনি হয়তো এই চিঠিটা লেখার পরও হেসেছে। আপনি কিম্বা তুমি কোন সম্বোধন না করে যেন জব্দ করেছে প্রশান্তকে। চিঠিটা গিয়েছিল বাড়ির ঠিকানায়। ঠিকানা বদল হয়ে মেসে এসেছে।

বাবা-মা, দাদা-বৌদির সংসারে আর থাকে না প্রশান্ত। তাদের অমতে বিয়ে করে আলাদা হয়েছিল। আলাদা-ভাবে ঘর বেঁধেছিল। তারপর পাঁচটা বছর না যেতেই মন ভাঙল, ঘর ভাঙল। কেন যে ভাঙল দুজনের কেউ হয়তো আজ আর গুছিয়ে বলতে পারবে না। ছুতোনাতা অনেক কারণ ছিল। ছোট-খাট ব্যাপারগুলোই বড় হয়ে উঠেছিল।

অনেক চেষ্টা করেও ভাল চাকরি জোটাতে পারে নি প্রশান্ত। সামান্য সেলস্‌ম্যানের কাজে তাকে বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতে হত। এখনো সেই ঘুরে বেড়াবার চাকরি। হেনা সুখী হয় নি। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে সুখী করার ক্ষমতা ছিল না প্রশান্তর।

সাধ আর সাধ্যের ব্যবধানটা ক্রমেই যেন বেড়ে গিয়েছিল। শেষে আইনের ঘর থেকে ছাড়পত্র এনে দুজনের ছাড়াছাড়ি হ'ল। তিন বছরের পিণ্টু রয়ে গেল মায়ের সঙ্গে।

গাড়িটা হঠাৎ থামল। দুর্গাপুর স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর এসে। কাছেই কারখানা।

চিমনির মুখে ধোঁয়া, মশালের মতো আগুন। গাড়িটা থামল কেন? বোধহয় লাইন ক্লিয়ার নেই।

পিণ্টু আজকাল কতবড় হয়েছে, কেমন হয়েছে, কার মত দেখতে হয়েছে। কিছুতেই সেই তিন বছরের ছেলেটার মুখ স্পষ্ট মনে আনতে পারল না প্রশান্ত। আশ্চর্য, এতদিন সে ভুলে থাকতে পারল কি করে। হেনার সঙ্গে সব কিছু ফুরিয়ে গেলেও পিণ্টুর সঙ্গে তো যায় নি, যেতে পারে না।

আবার দুলে উঠল গাড়িটা। ধীরে ধীরে চলতে সুরু করল। দুর্গাপুরের কারখানা পেছনে পড়ে রইল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। পিঠে হেলান দিয়ে চোখ বুজল প্রশান্ত।

পিণ্টু, পিণ্টু তার ছেলে, একমাত্র ছেলে। পিণ্টুর বাবার নাম প্রশান্ত চৌধুরী।

হেনা কিন্তু আর চৌধুরী নেই, মিত্র হয়েছে। কোন এক কয়লাকুঠির ম্যানেজার বিলেতফেরৎ মিত্র সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর নাম হেনা মিত্র। বিলেতে থাকার সময় নাকি মেম বিয়ে করেছিলেন মিত্র সাহেব। সেই মেম-সাহেবের কি হয়েছে, কে জানে; আবার হেনার সঙ্গেই বা মিত্র সাহেবের আলাপ হ'ল কি করে জানে না প্রশান্ত। অতশত খবর রাখার মত মন-মেজাজ ছিল না তার। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুমহল থেকে উড়ো খবর দু'একটা যা কানে এসেছে ওই পর্যন্ত।

শীতের ম্লান অপরাহ্নে বরাকর স্টেশনে নামল প্রশান্ত। একটু খোঁজা-খুঁজির পর ধাতুরি ড্রাইভারের দেখা পাওয়া গেল। একটা পুরনো ফোর্ড গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছিল।

নাম-ঠিকানা শুনে বললো—ও—আপনি মিত্র সাহেবের কুঠিতে যাবেন, তা আসুন, আপনি একা নাকি, মাল-পত্তর আর কিছু নেই?

পেছনের গদি-ছেঁড়া সিটে বসল প্রশান্ত। ট্যাক্সি চলল। পেছনে ধুলোর কুণ্ডলী।

বাঁয়ে বরাকর নদী, ডাইনে দূরে দূরে কয়লাখনির আলো। সামনের রাস্তাটা এক-একবার শূন্যে উঠছে আবার যেন পাতালে নামছে।

মিত্র সাহেবের কুঠিতে যাচ্ছে সে, কিন্তু মিত্র সাহেব তো তাকে যেতে বলেন নি। হেনার চিঠি পেয়ে হুট করে চলে আসাটা বোধ হয় ঠিক হয় নি, না এলেই ভালো হতো। মিত্র সাহেবকে সে চেনে না, কেমন মানুষ কে জানে। হেনা মিত্রকেও সে চেনে না, চেনার কোন দরকার নেই। আর কোন দিন দরকারও হবে না। কিন্তু পিণ্টু রয়েছে সেখানে। পিণ্টুর জন্য যাচ্ছে সে। পিণ্টু এখন বড় হয়েছে। কেমন হয়েছে, কার মত দেখতে হবে? এবার সে পিণ্টুকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে, লেখাপড়া শেখাবে, মানুষ করবে। তার ছেলে, তাদের বংশের ছেলে—কেন অন্যের আশ্রয়ে থাকবে। পিণ্টুকে তার চাই, সে বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে। পিণ্টু ছাড়া তার তো আর কেউ নেই।

প্রশান্ত একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল। হাওয়ার জন্য লাইটার নিভে যাচ্ছে।

ড্রাইভারের পেছনে মুখ নীচু করে, দু'হাত মুখের কাছে জড়ো করে সাবধানে সিগারেট ধরাল। বেশ শীত করছে। এদিকটায় বেশ শীত। ধাতুরি ড্রাইভারের গলায় একটা

লাল মাফলার জড়ানো। গাড়িটা এবার ডাইনে ঘুরে কাঁচা রাস্তায় নামল।

পীচের পাকা রাস্তা আর বরাকর নদী পেছনে রইল।

—বড় রাস্তাটা কোনদিকে গেছে ড্রাইভার ? —একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

—মাইথন। সামনে চোখ রেখে জবাব দিল ধাতুরি।

অন্ধকার হয়ে আসছে। খুব ঝাঁকুনি খেতে খেতে উঁচু-নীচু একটা পাথুরে জমির মাঠের উপর দিয়ে যাচ্ছে গাড়িটা। রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই।

দু'পাশে ছোট ছোট আগাছার ঝোপ, শুকনো খাদ। ঝাঁকড়া মাথা রোগা রোগা একটা-দুটো খেজুর গাছ কেমন ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। একটা হেডলাইট জেলে দিয়েছে ধাতুরি, আর একটা বোধ হয় খারাপ।

একচোখ জন্তুর মত গোঙাতে গোঙাতে যাচ্ছে গাড়িটা। আবছা কুয়াশার একটা পর্দা ঝুলছে সামনে।

মিত্র সাহেব কেমন মানুষ কে জানে। পিণ্টুকে কি চোখে দেখেন, কেমন ব্যবহার করেন।

হয়তো খুব ভাল মানুষ, উদার-চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাক হতে হয়—হেনার কথা ভাবলে। ঈশ্বর পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বলতেন—পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র, মানুষ তো দূরের কথা, দেবতারাও জানেন না।

এতকাল পরে হঠাৎ খাপছাড়া-ভাবে পণ্ডিতমশাইয়ের কথা মনে হওয়ায় হাসি পেল প্রশান্তর।

হেনার চরিত্র কি সে বুঝতে পেরেছিল। এতদিন পরে কি হেনা সত্যি সুখী হয়েছে।

সেই সুখের চেহারা কেমন। এক-একজনের চোখে সুখ-দুঃখের ছবি এক-এক রকম। কারো সঙ্গেই কারো পুরোপুরি মিল হয় না। কে যে কিসে সুখী হবে কিম্বা কোথায় দুঃখ পাবে, অন্য কেউ তার হদিস পায় না। সারাজীবন মানুষ নাম-না-জানা সুখের জন্য ঘোরে, কেউ কি তার খোঁজ পায়। প্রশান্ত নিজে পায় নি, হেনা পায় নি, এমন কি বোধ হয় মিত্র সাহেবও পান নি।

ধাতুরি মুখ ফিরিয়ে বলল—এই যে আমরা এসে গেছি বাবু।

পেছনে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছিল প্রশান্ত। সোজা হয়ে উঠে বসল। পাশাপাশি কয়েকটা একতলা পাকাবাড়ি। একরকম দেখতে। বোধ হয় অফিসারদের কোয়ার্টার্স। গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। একফালি মরাঘাসের উঠোন কাঁকরের রাস্তাটা সিঁড়ির মুখে শেষ হয়েছে। বন্ধ কাচের জানালায় আলো। অন্ধকার বারান্দা।

গাড়ির হর্নটা একবার বাজাল ধাতুরি। প্রশান্ত ততক্ষণে নেমে এসেছে। ভাড়া মিটিয়ে দেবার সময় বারান্দার আলোটা জ্বলে উঠল। ধাতুরি ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। গাড়ির শব্দটা ক্রমে দূরে চলে যেতে চারদিক নির্জন হয়ে এল।

একটু ইতস্তত করে ব্যাগটা হাতে নিয়ে গেটের ভেতর যাবার সময় শেষবারের মত ভাবল প্রশান্ত—এখন আর ফিরে যাওয়া যায় না, বোধ হয় না এলেই—

নিজের জুতোর শব্দে নিজেরই কেমন অস্বস্তি লাগছিল। বারান্দার মাঝামাঝি বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। পর্দা সরিয়ে সামনে এল, না মিত্র সাহেব নন, হেনা নিজেই এসেছে। প্রশান্ত ভেবেছিল প্রথমেই বোধ হয় মিত্র সাহেবের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু হেনাকে দেখে সে যেন স্বস্তি পেল। সিঁড়ির শেষ ধাপে একটু দাঁড়াল।

হেনার গায়ে একটা সাদা আলোয়ান জড়ান, সিঁথিতে এক চিলতে সিঁদুর।

নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটো চিবুকের কাছাকাছি তুলে বেশ সহজ গলায় বলল—'আসুন।' কোন কথা না বলে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল প্রশান্ত। হেনা চোখ নামাল, হাত নামাল।

—পিণ্টু কেমন আছে ?—প্রশান্তর

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

জিজ্ঞাসার জবাবে মাটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—এখন অনেকটা ভাল, এসো ভেতরে এসো।—পেছনে সরে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরল হেনা। ভেতরে এল প্রশান্ত। ছিমছাম সাজানো বসবার ঘর।

তিনটে সোফা মাঝখানে গোল নীচু টেবিল। একটা ছাইদান। ওপাশের দেয়াল ঘেঁষে একটা ছোট টেবিলের ওপর রেডিও। পাশে একটা ফুলদানী, কোন ফুল নেই। দেয়ালের গায়ে হেনার কুমারী বয়সের সেই পুরনো ফটোটা, যেটা এককালে প্রশান্তর বসবার ঘরে ঝোলানো থাকতো। বাইরে যাবার দরজাটা ভেজিয়ে পর্দা টেনে দিল হেনা। পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললো—বসো এখানে, আমি আসছি।

মস্ত ভারী চামড়ার ব্যাগটা গোল টেবিলের ওপর রেখে সোফার এককোণে বসল প্রশান্ত। ছাইদান দেখে সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু এখুনি হয়তো মিত্র-সাহেব আসবেন। এই বসবার ঘরের দু'পাশে দুটো ঘর। পেছনে বোধ হয় বারান্দা। চারদিকের চারটে দরজায় ঘননীল রঙের পর্দা। অন্য তিন-দিকের যে কোন একটা পর্দা ঠেলে মিত্রসাহেব আসতে পারেন। কিন্তু এখন না এলেই ভাল হয়। পিণ্টুর সম্বন্ধে হেনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার দরকার। সে সময় অন্য কেউ না থাকাই ভাল। পেছনের বারান্দার ওদিকে কোথায় স্টোভের শব্দ হচ্ছে। মাঝে মাঝে বাসন-পত্র নাড়াচাড়ার আওয়াজ। বাড়িটা কেমন চুপচাপ। অন্য কেউ কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না। প্রশান্ত সিগারেট ধরাল। এখানে হাওয়া নেই। সহজেই লাইটার জ্বলল। হাওয়া নেই, কথা নেই। স্টোভের একঘেয়ে শব্দ সমস্ত পরি-বেশটাকে আরো নিঝুম, আরো বিষণ্ণ করে তুলেছে। সিগারেটের ধোঁয়া খানিকদূর সোজা সরলরেখায় উঠে তারপর ভেঙে ভেঙে কুণ্ডলী পাকিয়ে শেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। কেমন ক্লান্তি, অবসাদ। বোধ হয় না-এলেই ভাল হ'ত। শুধু ছেলেটার কথা ভেবেই কেমন যেন হয়ে গেল। আর এতদিন বাদে হেনাই বা কেন ছেলের খবর দিয়ে চিঠি লিখল। না লিখলে কার কি ক্ষতি হ'ত। সে তো সব কিছু ভুলে গিয়েছিল, ভুলতে চেয়েছিল। ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল এই পাঁচটা বছর। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য হেনাই দায়ী। হেনাকেই পুরোপুরি দায়ী করা চলে। শুধু এই চিঠি লেখার জন্যই নয়, হেনা তার সমস্ত জীবনটাকেই ছন্ন-ছাড়া করে দিয়েছে। তার আনন্দ-উৎসব, তার ঘর-সংসার, তার সুখ-শান্তি, প্রেম—সমস্ত কিছু আজ অর্থহীন এবং এর জন্য একজনকেই দায়ী করা চলে, সে হেনা।

এখন পিণ্টুকে নিয়েই হয়তো বাকী জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। পিণ্টুকে সে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে হেনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার দরকার। কিন্তু—কি ভাবে সুরু করা যায়। এই প্রায় দমবন্ধ অস্বস্তিকর অবস্থা আরো কতক্ষণ চলবে কে জানে। ঘড়ি দেখল, মোটে এগার মিনিট। কিন্তু মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা। আরো কিছুক্ষণ কাটল এবং আর একটা সিগারেট ধরাবার সময় ভেতর দিকের দরজার পর্দা সরিয়ে চায়ের ট্রে হাতে ঢুকল চাকর, পেছনে হেনা। গোল টেবিলের ওপর ট্রে-টা রেখে, টেবিলটা একটু কাছে টেনে দিয়ে চলে গেল চাকরটা। হেনা বসল দূরের একটা সোফায়। চায়ের সঙ্গে ওমলেট, দুটো সন্দেশ। শুধু চায়ের কাপটা টেনে নিল প্রশান্ত। গলা শুকিয়ে কাঠ। এক কাপ চায়ের দরকার ছিল অনেকক্ষণ। কাপটা তুলে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত—মিত্র বাবুকে দেখছি না যে—

—উনি বাইরে গেছেন।—জবাব দেবার সময় চোখাচোখিতেই আবার চোখ নামাল হেনা। মনে মনে স্বস্তি পেল প্রশান্ত। একটু নড়েচড়ে বসল। চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দেবার সময় হেনাকে দেখল দু-একবার। অন্যদিকে তাকিয়ে কেমন চুপচাপ বসে আছে। সাদা পাথরের পুতুলের মত মুখ। গম্ভীর বিষণ্ণ।

পাশের ঘরে বোধ হয় দেয়াল-ঘড়ি আছে, টং টং করে সাতটা বাজল। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল প্রশান্ত। এবার মুখ ফেরাল হেনা, আস্তে আস্তে বলল—খাবার-গুলো পড়ে রইল—

—না আর কিছু খাব না—প্রশান্তর গলা কেমন কঠিন হ'ল এবং কোন ভণিতা না করে সোজা-সুজি বলল—আমি ভেবেছি পিণ্টুকে এবার এখান থেকে নিয়ে যাব, আমার কাছে নিয়ে রাখব।

হেনা চমকে চোখ ফেরাল—কেন কিসের জন্য?

—লেখাপড়া শেখাব, মানুষ করব, আর তাছাড়া ওকে আমার দরকার, ভীষণ দরকার।

হেনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, ঠোঁটের কোণে দাঁত কামড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। এই ঠোঁট কামড়ান অভ্যাসটা জানে প্রশান্ত। হেনা ভয় পেয়েছে, আঘাত পেয়েছে। একটা হিংস্র আনন্দের হাসি ফুটল প্রশান্তর চোখে। রুমালে মুখ মুছে আবার সিগারেট ধরাল। একটু-কাল হেনার কঠিন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—পিণ্টু কোথায় আছে। আমি একবার দেখতে চাই।

একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল হেনা, তারপর প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এই পাশের ঘরে।

পাশের ঘরের পর্দা সরিয়ে

ভেতরে গেল হেনা, পেছনে পেছনে প্রশান্ত।

খাটের ওপর রোগা, ফ্যাকাশে, সাত-আট বছরের পিণ্টু। শুকনো মুখ, বড় বড় চোখ, রুক্ষ এলোমেলো চুল। খাটের পাশে একটা টেবিলে কিছু ফল, খেলনা মোটরগাড়ি, রবারের ইঁদুর, খরগোস। ওপাশে একটা চেয়ারে একজন নার্স। খবরের কাগজে চোখ রেখে বসে-ছিল, ওদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

হেনাকে দেখে কান্নার সুরে বলল পিণ্টু—এত দেরি করলে কেন মা-মণি, আমি তখন—বলতে বলতে নতুন মানুষ দেখে থেমে গেল। দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিল প্রশান্ত। হেনা গিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াতে তার হাত দুটো আঁকড়ে ধরে প্রশান্তর দিকে কেমন ভয়ের চোখে তাকিয়ে বললো, পিণ্টু—উনি কে মা-মণি, ডাক্তারবাবু, আমি তো ভাল হয়ে গেছি, আমি আর ওষুধ খাব না, ওকে চলে যেতে বলো তুমি, হ্যাঁ মা-মণি বলে দাও, আমি আর ওষুধ খাব না, কক্ষনো না।

আচমকা যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খেল প্রশান্ত। চমকে উঠে বিস্ময়ে সে বোবা হয়ে গেল। তাকে চিনতে পারে নি পিণ্টু, একদম ভুলে গেছে। হেনা কিন্তু ভুল ভাঙাবার চেষ্টা করল না। ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে আদরের সুরে বললো—ছিঃ অমন বলে না ছিঃ। তারপর নার্সের দিকে তাকিয়ে দুএকটা কি কথা বললো। সে সব কথা কানে ঢুকল না প্রশান্তর। মাথা ঝিমঝিম করছে, কেমন ক্লান্ত, অবসন্ন। সমস্ত কিছু অর্থহীন ফাঁকা মনে হল। আচ্ছন্নের মতো নিঃশব্দে আবার বসবার ঘরে ফিরে এল। পিণ্টুর স্মৃতিতে তার কোন চিহ্ন নেই। তিন বছরের যে মোটা সোটা ছেলেটা তাকে দেখলে হাসিমুখে ঝাঁপিয়ে কোলে আসত, সেই পিণ্টুকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। পিণ্টু তাকে চেনে না, চিনবে না। এই মারাত্মক সম্ভাবনার কথা একবারও তার মনে হয় নি, আশ্চর্য। তিন বছরের পিণ্টুর ছবিই তার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়েছিল। সেই উজ্জ্বল ছবিটা এই মুহূর্তে ভেঙে গেল। এখন বড় অন্ধকার। একটা দমবন্ধ অন্ধকারের মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে।

হেনা এঘরে ফিরে এল, একটু পেছনে দাঁড়িয়ে যেন একটা সুখবর দেবার মত তৃপ্তির ভঙ্গিতে থেমে থেমে বললো—পিণ্টু ভুলে গেছে, তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে, বোধ হয় কোনদিন তোমার কাছে যেতে চাইবে না।

তারপর একটু থেমে আবার বললো—এজন্য ওর তো কোন দোষ নেই।

অন্যদিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল প্রশান্ত। ইচ্ছে হ'ল চেঁচিয়ে বলে, এজন্য দায়ী তুমি, সম্পূর্ণ দোষ তোমার। কিন্তু গলা দিয়ে এক ফোঁটাও শব্দ হ'ল না। হাতে তখনো সিগারেটটা ধরা ছিল। সেটাকে মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে ঘষে ঘষে থেতলে পিষে নিভিয়ে দিল। ভারী চামড়ার ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে মুখ নীচু করে বারান্দায় বেরিয়ে এল। হেনার দিকে আর চোখ তুলে তাকাল না, তাকাতে পারবে না, তাকালে হয়তো দেখবে, একটু ঘাড় কাৎ করে মুখ টিপে হাসছে হেনা। কাউকে জব্দ করার পর, হারিয়ে দেবার পর যেমন ভাবে হাসা তার স্বভাব।

পেছন থেকে একটা কথা শুধু কানে এল—একি, এক্ষুণি চলে যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ আমি স্টেশনেই ফিরে যাচ্ছি—সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে সামনে চোখ রেখে জবাব দিল প্রশান্ত। বারান্দার আলোটা আবছা হয়ে গেট পর্যন্ত এসেছে।

তারপর কুয়াশা-কঠিন অন্ধকার, বহুদূর বিস্তৃত শুধু অন্ধকার। দূরে দূরে দু-একটা ম্লান আলো। সে আলোর পথ চেনা যায় না। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেওয়া ভুল হয়েছে। কি যেন নাম সেই ড্রাইভারের, মনে মনে খুঁজল প্রশান্ত। নামটা মনে নেই, একেবারে ভুলে গেছে। আজকাল কি যেন হয়েছে। মাঝে মাঝে নাম ভুলে যায়, চেনা লোকের নাম, চেনা পাখীর নাম, চেনা ফুল কিম্বা গাছের নাম।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক রচিত কয়েকখানি ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী

৬ষ্ঠ ভাগ—।।০

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে ৸০

সরসীবালা বসুর—
শিবানী ।।০

বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ।।০

চারুবালা বসুর—
পতিব্রতা ।।০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ উনিশ ॥

একটা কাগজ থেকে গল্প লেখবার জন্যে জোরালো তাগিদ আছে, গোটা পঞ্চাশেক টাকারও দরকার আছে। সকাল বেলাতেই কাগজ-কলম নিয়ে গল্প লিখতে বসে গিয়েছিল কিরণ।

ঝাপসা একটা চিন্তা মাথার ভেতরে ঘুরছিল, কাগজে কয়েক লাইন লিখতে না লিখতেই কিরণ চকিত হয়ে উঠল, অস্বস্তিতে নামিয়ে রাখল কলমটা। আজ দশ বছরের ভেতরেও যা সে করে নি, ঠিক সেই কাণ্ডটিই ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রথমেই এমন একটি প্রকৃতি-বর্ণনা দিয়ে সে আরম্ভ করেছে, যার বিরুদ্ধে এতকাল মনটাকে সে সজাগ প্রহরীর মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

সেই বর্ণনায় একটি সন্ধ্যার নদী। ওপারের শালবনে সোনা বৃষ্টি শেষ হয়ে এল, নদীর জলে তার শেষ রেশটুকু এখনো কাঁপছে। হাওয়ায় অল্প অল্প বালি উড়ছে বক-গাংশালিক-স্নাইপের ঝরা পালক; ওদিকে পাহাড়ের মাথায় চাঁদের আভাস পড়ল, ঠিক মনে হল যেন কোনো অরণ্য-কিরাতের কপালে কে যেন শ্বেত আর রক্তচন্দন মাখিয়ে—

প্রকৃতির সেই আত্মাটা। এখনো তার সঙ্গ ছাড়ে নি, চলন্ত ট্রেনের ছায়ার সঙ্গে ছায়া মিলিয়ে, মাঠ-নদী-বন পেরিয়ে ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছে। আশ্চর্য।

না—এ লেখা নিয়ে আর এগোনো চলে না। শেষ পর্যন্ত জোলো একটা রোমাণ্টিক গল্প দাঁড়িয়ে যাবে।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে প্রথমে কলমটা মুখে পুরল। তারপর সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখল একটাও নেই। এখন সিগারেট আনাতে হলে হয় গলা ফাটিয়ে চাকরটাকে ডাকাডাকি করতে হয়, না হলে তেতলা ভেঙে নেমে যেতে হয় রাস্তায়। দুটোর একটাতেও উৎসাহ এল না। কিছুক্ষণ মাথার ওপরকার একটা মোটা-সোটা টিকটিকিকে অকারণেই চোখের হিংস্রতা দিয়ে বিদ্ধ করল, একে একে দু-হাতের দশটা আঙুল মটকালো, শেষ পর্যন্ত টেবিলের ওপর আবার ফিরে এল দৃষ্টিটা।

একখানা খাম। কাল এসেছিল। ডাক্তার রায়চৌধুরীর চিঠি।

প্রত্যেকটা লাইন মনে গাঁথা হয়ে আছে। 'অমন করে হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আপনাকে বেশ লেগেছিল মশাই। এখানে আমাদের মন-টন এখন খারাপ, বাসব আর লেখা হাজারীবাগে চলে গেল, ওদের স্কুল খুলে গেছে। শর্মিলাও নেই, ভারি ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। আপনি কিন্তু আমাদের ভুলবেন না, সময় পেলেই দু-দশ দিন বেড়িয়ে যাবেন এখানে। রাজেনবাবুর বাংলোতে আর ওঠবার দরকার নেই, এবার এলে কিন্তু গরীবের আতিথ্যই নিতে হবে।'

কিরণের মুখে স্বাদহীন হাসি ফুটে উঠল খানিকটা। কেন সে হঠাৎ পালিয়ে এল, তার সত্যিকারের কারণটা জানতে পারলে রায়চৌধুরী কি এমন করে আমন্ত্রণ করতে পারবেন তাকে? শর্মিলা হয়তো এখনো কিছু বলেন নি,

কিন্তু তাঁর মুখ থেকে যখন তার দুর্বলতার খবর তাঁরা জানতে পারবেন, সেদিনও কি এই বিশ্বাস-ভালোবাসা তাঁদের থাকবে ?

আজ আর কোনো সন্দেহ নেই, কৃষ্ণচূড়া সেদিন তাকে আর শর্মিলাকে ঘিরে যে বৃত্ত রচনা করছিল, তা আরণ্যক; মহাকাল যাওয়ার পথে ডাক্তার বলেছিলেন, আগে এ অঞ্চলে বসন্তের সময় শিমুল ফুল খেতে আসত হরিণের পাল, আর হরিণের লোভে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ঝলমলিয়ে উঠত বাঘের চোখ। সে ইতিহাস শেষ হয়ে গেছে। যে ইতিহাস শেষ হয় নি। সেই হরিণের চোখ ছিল শর্মিলার, সেই বাঘের সত্তা কিরণের রক্তে দোলা দিয়েছিল। শুকনো পাতার ওপর সতর্ক পায়ের শব্দ শুনেই হরিণ পালিয়েছে, কিন্তু বাঘের আত্মা এখনো তো তার সঙ্গ ছাড়ল না।

কলকাতাও অরণ্য। এখানেও আদিম আগুন। কিন্তু তার ওপর কৃষ্ণচূড়ার প্রচ্ছদপট নেই। এখানকার জ্বালা কোনো দিনান্তের শালবনে সোনা হয়ে ঝরে না। আলো এখানে নগ্ন-নির্লজ্জ, দ্বিতীয় যুদ্ধের রাঙা ধুলোর ঝড়ে এখানকার হরিণেরা অদৃশ্য। এখন বাঘ আর বাঘিনী পরস্পরকে খুঁজে বেড়ায়। কে শিকারী, কে শিকার —কেউ জানে না।

আমি তার কথা নিষ্ঠুরভাবে লিখতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার দেশে আমি হরিণ শিকার করতে চেয়েছিলুম। ডাক্তার রায়চৌধুরী আমাকে আর একটি আশ্রমমৃগের বেশি কিছু ভাবতে পারেন নি। কিন্তু আমার মনের চেহারাটা যদি তাঁদের কাছে ধরা পড়ে যায়, তখন—তখন ?

ক্ষতি আমার নয়। নিজের সম্পর্কে আমি ইল্যুশন রাখি না। কিন্তু বিশ্বাস করে যাঁরা ঠকেছেন, তাঁদের বেদনাটাই অত্যন্ত অরুচিকর।

—আসতে পারি কিরণদা ?

কিরণ ফিরে তাকাল দরজার দিকে। তার একটি মুগ্ধ ভক্ত। বাণীব্রত চট্টোপাধ্যায়।

তার মানে, লেখাটা গেল। এমনিতেও যে হচ্ছিল তা নয়, তবু অন্তত চেষ্টা করা যেত।

কিন্তু ফোর্থ ইয়ারের এই মুগ্ধ সরল ভক্তটিকে কেন যেন ফেরানো যায় না। নিজে কিছু কিছু লিখতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনোদিন যে লেখক হতে পারবে এমন আশা করা শক্ত। তা সত্ত্বেও ছেলেটি আন্তরিক, ভক্তি তার যুক্তিহীন, পয়সা দিয়ে কিরণের বই কিনে তাতে সই করিয়ে নিয়ে যায়। কলকাতার শহরতলী থেকে আসে, বাড়িতে বোধ হয় বাগান আছে, তা থেকে রুমালে বেঁধে আনে কখনো কিছু কনকচাঁপা, কখনো দু'টি যূঁই ফুল। বাণীব্রতের জন্যে কিরণের মায়া হয়।

—এসো।

বাণীব্রত কিন্তু তখনই ভেতরে ঢুকল না। লজ্জিত মিষ্টি হাসি হাসল একটুখানি।

—আমি কিন্তু একা নই কিরণদা, আমার দিদিও এসেছে সঙ্গে।

—দিদি! কী আশ্চর্য—কিরণ বিব্রত হল: বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছ ? এসো—এসো—ডাকো তোমার দিদিকে—

বাণীব্রতের সঙ্গে তার দিদিও ঘরে ঢুকল। এই মেয়েটিকে এর আগে সে কখনো দেখে নি। কিন্তু বাণীব্রতের কল্যাণে দিদির সম্পর্কে তার কিছুই জানতে বাকী নেই। ভাইয়ের চাইতেও নাকি দিদিটি বেশি ভক্তিমতী, কিরণের কোনো কোনো লেখা নিয়ে বাণীব্রতের যদি বা কিছু সংশয় থাকে, দিদি নিঃসন্দেহ। তার ধারণা কিরণ বসুর সব লেখাই 'মাস্টারপিস।' সমালোচনার শরশয্যায় এ-রকম আঙুলে গোনা দু'চার জনই পাতালগঙ্গার ধারা।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই কিরণের পায়ের ধুলো নিলে।

—আরে, আরে, করেন কি। ছি-ছি।

মেয়েটি হাসল: কেন, অন্যায় কী হয়েছে ?

—মানুষকে এমনিতেই অনেক ছোট হতে হয়—প্রণামটা বাজে খরচ করে নিজেকে আরো নামানো উচিত নয়।

—আপনার সঙ্গে আমার লজিক মিলবে না—মেয়েটি আবার হাসল: কিন্তু তুমি বলেই ডাকবেন আমাকে। আমার নাম কৃষ্ণা।

নামটা বেমানান নয়—রোগা কালো রঙের চেহারা। সুন্দরী বলে মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। শুধু ঐশ্বর্য আছে তার চোখে। সে দুটি বড়ো। কালো এবং নিবিড়। সে চোখে আকাশের ছায়া পড়ে, সমুদ্র দোলে।

কিরণ বললে, আচ্ছা তাই হবে না হয়। কিন্তু বোসো তোমরা। ঘরের

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

মার্কনী ফ্যান
১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে
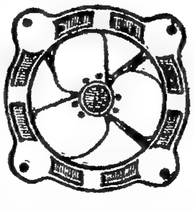
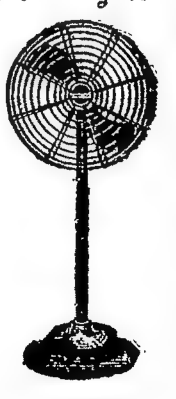

অবস্থা তো দেখছো। বসবার জায়গা নিজেরাই করে নাও।

বাণীব্রত উৎসাহভরে বললে, সে আপনাকে ভারতে হবে না। কোথায় বসতে হবে আমি জানি।

তক্তপোষের ওপর থেকে খবরের কাগজ আর একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা সরিয়ে দিয়ে দু'জনে বসল। তারপর কৃষ্ণা দেখতে লাগল ঘরখানাকে। দেওয়ালে কোনো আর্টিস্ট বন্ধুর উপহার দেওয়া একখানা কিউবিস্ট ধরণের ছবি, বাঁকা হয়ে ঝুলছে, একটা বড়ো শেল্‌ফ থেকে উপচে পড়ছে বই আর মাসিকপত্র। লেখার টেবিলটা যথাসাধ্য অগোছালো, কোনো কালে একটা ব্লটিং প্যাড ছিল, এখন সেটা কালি-ঝুলি আর নানারকম রেখাচিত্রে একাকার। ঘরে নিশ্চয় কাল থেকে ঝাঁট পড়ে নি, ধুলো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি, সিগারেটের অসংখ্য টুকরো, ছেঁড়া কাগজ। টেবিলের নীচে দেওয়াল ঘেঁষে রাখা কাদের একখানা অভিনন্দন-পত্র, সেটা ফাটা কাচ নিয়ে ধূসর হয়ে মহাকালের প্রতীক্ষা করছে। একটা ছোট ব্র্যাকেটে এলোপাতাড়ি কয়েকটা জামা-কাপড়, স্যুটকেসের ডালার ওপর দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম ছড়ানো।

আর তক্তপোষ।

এটি বোধহয় শোবার জন্য। কিন্তু চাদরটা দিন পনেরোর মধ্যেও বদলানো হয়েছে বলে মনে হয় না। ময়লা তোয়ালের নীচে একটা কালচে বালিশ। চাদরটার দু'তিন জায়গায় পোড়া দাগ, নিশ্চয় সিগারেটের কীর্তি। বালিশটার দু'পাশে একরাশ বই—কখনো কখনো হয়তো বালিশের কাজ বইগুলো দিয়েই চালান হয়।

কৃষ্ণা বললে, এই ঘরেই থাকেন আপনি?

কিরণ হাসল: খুব নিরাশ হলে তো? সাজানো-গোছানো সাহিত্য-সাধনার ঘর দেখতে হলে—দু'তিন জন দিক্‌পালের নাম করে বললে, ওঁদের ওখানে যেয়ো। দেখবে, সরস্বতীর জন্যে ধূপ-ধুনো জ্বালানো পদ্মাসন সেখানে সাজানোই রয়েছে।

—কিন্তু আপনার এ ঘরেও তো সরস্বতী আসেন—যান।

—না, এ পথ তিনি মাড়ান না। ছেলেবেলায় একবার রাজহাঁসের পালক খুঁজতে বেরিয়েছিলুম, পাই নি। হাঁসের দেখা পর্যন্ত যখন মিলল না, তখন হাঁসের মালিক ধরা দেবেন এ-আশা বিড়ম্বনা। তাই রাবণের মতো বিরোধী সাধনা সুরু করেছি, দেখি দর্শন মেলে কিনা।

বাণীব্রত অভিভূত হয়ে বললে: কী চমৎকার করে বললেন, দেখলি দিদি?

কৃষ্ণা বললে, চমৎকার করে হয়তো বললেন, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। রাবণের পথ ওঁর নয়, তার জন্যে আলাদা লোক আছে। সে যাক। একটা কথা জিজ্ঞেস করব কিরণদা?

—স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে।

—আপনাদের মেসে কি একটা চাকর-বাকরও নেই যে, ঘরটরগুলো একটু ঝাঁট দিয়ে দিতে পারে?

—থাকবে না কেন, নিশ্চয় আছে। কাল গোটা বিকেল আমি ছিলুম না, ফিরেছি রাত এগারোটায়, ঘর তালাবন্ধ ছিল। চাকর ঝাঁট দিতে এসে ফিরে গেছে। সকালে সকলকে চা-জলখাবার দিয়ে আসতে একটু দেরি হয়।

—তা হোক।—কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো: ঝাঁটা আছে আপনার ঘরে? আমিই বরং একটু—

—দোহাই তোমার, তুমি স্থির হয়ে বোসো।—কিরণ বিব্রত হল: প্রথম দিনেই আর অতখানি লজ্জা দিয়ো না। চাকরটা আসবে একটু পরেই, সেই সাফ করে দিয়ে যাবে এখন।

কৃষ্ণা বললে, তা হলে বিছানার চাদরটা অন্তত বদলে দেওয়া দরকার। যতদূর মনে হচ্ছে, ও কাজটা নিশ্চয় চাকরে করে দেয় না।

—না, তা দেয় না।—কিরণ আরো বিপন্ন হল: তুমি বোসো, আমিই ঠিক করে নেব।

কৃষ্ণা হাসল: নিলে—সাত দিন আগেই নিতেন। তা যখন করেন নি, তখন হাত আমাকেই লাগাতে হবে। দিন—চাদর বের করে দিন একটা। না কি তাও নেই? কিনে আনতে হবে দোকান থেকে?

কিরণ কিছুক্ষণ আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে। প্রথম দিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—হয় তো সাহিত্যিকের কাছ থেকে কিছু ভালো কথা শোনবার ইচ্ছে নিয়েই এসেছিল। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই গৃহিণীপনা জেগে উঠেছে তার মনে, এই অগোছালো শ্রীহীন পরিবেশটার সংস্কার করাটাই এখন তার কাছে সব চাইতে বেশি জরুরি। একটু সংকোচ নেই, প্রথম পরিচয়ের বিন্দুমাত্র আড়াল নেই কোনোখানে। এই হল সত্যিকারের বাংলা দেশের মেয়ে!

—কী ভাবছেন? চাদর আর নেই না কি?

বাণীব্রত বোধহয় লজ্জা পাচ্ছিল। বললে, দিদি, থাক না এখন এসব। উনি বরং পরেই—

কৃষ্ণা ভ্রূকুটি করল: তুই থাম্‌। চেয়ে দেখ তো বিছানাটার দিকে। মানুষে শুতে পারে এর ভেতরে?

কিরণ হাসল: আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

—অসুবিধে হয় না সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু অসুখ করলে কী হবে? চাদর নেই?

—আছে একটা ওই স্যুটকেসটায়। বের করে নাও।

—আমি আপনার স্যুটকেসে হাত দেব?—কৃষ্ণা একটু কুণ্ঠিত হল।

—এসেই তো শাসন সুরু করেছ—স্যুটকেসে হাত দিতে আর আপত্তি কী? খোলাই রয়েছে, বের করে আনো।

কৃষ্ণার কালো মুখে লজ্জার আভা পড়ল একটুখানি, নিবিড় গভীর চোখে ছায়া নামল।

—আপনারা শিল্পী-সাহিত্যিক, আপনাদের এ-ভাবে দেখলে আমাদের ভারি খারাপ লাগে। কেন এত কষ্ট করে থাকেন? বৌদিকে নিয়ে এলেই তো পারেন এখানে।

সেই এক কথা। কিরণ একটুখানি চুপ করে রইল, তারপর স্যুটকেস খুলে ধোয়া একটা বেড্-কভার বের করে দিয়ে বললে, এই নাও।

ভাই-বোন চলে গেল ঘণ্টা দেড়েক পরে। আর এরই ভেতরে ঘরের শ্রী বদলে দিয়ে গেল কৃষ্ণা। বিছানার রূপ পাল্টে গেল, লেখার টেবিলটা সাজানো হল, দেওয়ালের ছবিটা সোজা হল, ব্র্যাকেটের জামা-কাপড়গুলো একটু ভদ্ররূপ ধরল। আর টেবিলের ওপর একটি কাচের গ্লাসে রইল ম্যাগ্নোলিয়ার একটা কুঁড়ি—আজকে সেইটেই কিরণকে দেবার জন্যে নিয়ে এসেছিল বাণীব্রত।

কৃষ্ণার কৌতূহল অনেক।

'কখন লেখেন? কতক্ষণ লেখেন? কী ভাবে লেখেন?'

'কখনো টেবিলে বসে, কখনো বিছানায় বালিশ নিয়ে লিখি। যখন ইচ্ছে হয় তখন লিখি। কোনো-কোনো দিন রাত দু'টো-তিনটেও বেজে যায় লিখতে লিখতে।'

'এত রাত পর্যন্ত?'—কৃষ্ণা শিউরে উঠল: 'শরীর খারাপ করে না?'

'অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'খুব খারাপ অভ্যেস।' —কৃষ্ণা গম্ভীর হল: 'এই তো মেসে একা একা থাকেন, যদি হঠাৎ অসুখ-বিসুখে পড়ে যান, কে দেখবে তখন? না—না, এসব কখনো করা উচিত নয়।'

কিরণ সকৌতুকে বললে, 'এতদিন সে ভাবনা ছিল, এখন আর নেই। তখন তোমাকেই ডেকে পাঠাব। আজ থেকে তুমিই তো আমার লোকাল গার্জেন হয়ে গেলে মনে হচ্ছে।'

কৃষ্ণার মুখে আর একবার লজ্জার ছায়া পড়ল। বললে, 'বাণী, চল আজকে যাই। ওঁর আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়।'

'এ রকম মাঝে মাঝে এসে আমার সময় নষ্ট করে ঘর গুছিয়ে যেয়ো, খুশিই হবো।'

কৃষ্ণার চোখ আলো হয়ে উঠল: 'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি বলছি।'

'একদিন যাবেন আমাদের বাড়িতে?'

বাণীব্রত কলরব করে উঠল: 'আমি তো কতদিন বলেছি, কিরণদার সময়ই হয় না।'

কিরণ আস্তে আস্তে বলল, 'না, এই-বার যাব একদিন, নিশ্চয় যাব।'

ওরা প্রণাম করে বিদায় নিলে। আর কিরণের আজ বার বার মনে পড়তে লাগল প্রতিমাকে। সেই দু'টো বছর। প্রতিমা তাকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিল। সে দিন বিছানার চাদর নোংরা থাকত না, লেখার টেবিল ঝকঝক করত, মেস ছেড়ে দিয়ে কিরণ থাকত দেশের বাড়িতে—কলকাতায় যাওয়া-আসা করত। তারপর কোথা থেকে কী ঘটে গেল—

বিকেলে আবার সেই অ্যাসাইলামে।

ডাক্তার ঘোষাল ছিলেন না, তাঁর কম্পাউণ্ডারই ডেকে নিয়ে গেল প্রতিমার কাছে।

প্রতিমা বসে বসে একটা পুরোনো খবরের কাগজ ছিঁড়ছিল। চোখের দৃষ্টি সামনের বিবর্ণ আকাশের দিকে। মুমূর্ষু মেঘের কোল ঘেঁষে শকুন উড়ছে যেখানে। কিরণকে সে দেখতেও পেলো না।

'প্রতিমা, তুমি কি জাগবে না, তুমি কি কিছুতেই জাগবে না?' একটা অদ্ভুত রুদ্ধ আবেগে থরথর করতে লাগল কিরণের গলার শিরায়: 'তা হলে যে জীবনের অনেক জট একসঙ্গে খুলে যায়।'

প্রতিমা জবাব দিল না। সেই মুমূর্ষু মেঘ, উড়ন্ত শকুন আর কয়েকটা ছেঁড়া কাগজের টুকরোয় তার সব চেতনা এখনো একাকার।

(ক্রমশঃ)

কেশের পরিচর্য্যায় সিংহ মার্কা নারিকেল তৈল

বাজারে সুগন্ধি এবং গন্ধছাড়াও বহু তেল পাবেন, কিন্তু কেশ-চর্চ্চায় অপরিহার্য্য বিশুদ্ধ তৈল বলতে বুঝায় বহু পরীক্ষিত "সিংহ মার্কা" নারিকেল তৈল।

হিন্দুস্থান
কোকোনাট অয়েল মিল
সাঁইথিয়া, বীরভূম

গ্রন্থভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

উনিশ শতকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব—রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিভা। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ মনীষার পরিচয় রেখে গেছেন। বিষয়নিষ্ঠা এবং মননশীলতায় তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের উপস্থাপনের মাধ্যমে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে উন্নীত করেছেন। মনোধর্মের দিক দিয়ে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নের ভাব-চিন্তানায়ক তিনি। তাঁর বিভিন্ন রচনায় মনোধর্মে সেই প্রবণতার সচেতন প্রক্ষেপ আছে। স্থূল বস্তুজগৎ ও সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম-জগতের মধ্যে সম্পর্ক ও স্বরূপ বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞানের অনুশীলন যেমন করেছেন—'ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের' উপরে অসংশয়িত অধিকার বিস্তার করে দুই যুগ সীমার মধ্যে সমন্বয় সম্ভবপর করে তুলেছিলেন।

বিপুল জ্ঞান ও অদম্য কর্মৈষণার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবনে সংগঠন-মূলক অনেক কাজও সাধন করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নানামুখী কর্মধারার মধ্য দিয়ে তাঁর গঠনশীল ও কর্মবীর মন নিজেকে শতধারায় উৎসারিত ও উচ্ছলিত করে দিয়েছে। দুঃসাধ্য গবেষণাকে তিনি কর্মব্রতরূপে গ্রহণ করে তাকে 'নির্ধূম আলোক-রেখায় উদ্ভাসিত করে' তুলেছিলেন। সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে এই 'আলোক-রেখায় উদ্ভাসনা' বৃত্তিটি তাঁর স্বভাব-বৈচিত্র্যের একটি পরমতম পাঠ। এরই পরিচয়-বিধৃত হয়ে আছে অপরের গ্রন্থে তাঁর অসংখ্য ভূমিকা রচনার মধ্যে। গ্রন্থনিহিত বক্তব্যকে সামনে রেখে তিনি যে ভূমিকা প্রণয়ন করেছেন—মৌলিক স্বভাবের বৈশিষ্ট্য তাকেও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে। গ্রন্থ ভূমিকাগুলি গবেষণায়, চিন্তা ও মননের স্পর্শে, রসবোধের সান্নিধ্যে ও কুশলী বিশ্লেষণের আশ্রয়ে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। রামেন্দ্রপ্রতিভা বিচারণার এই অপ্রধান দিকটিও তাই নগণ্য নয়।

দুই

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭৯৫ শকাব্দে জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে-ছিলেন—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূলমর্ম'। রচিত হবার প্রায় চব্বিশ বছর পরে রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা লেখককে যে জাতীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তারই অসংকোচ বিবৃতি তিনি প্রথমেই দিয়েছেন :

> "একটা কারণ পরলোকগত লেখকের রচনায় হস্তক্ষেপে অপরের কতটা অধিকার আছে, তাহার নিরূপণ দুরূহ। আর একটা কারণ আমার কৃতকার্য বা অকার্যের জন্য পাঠক হয়ত লেখককে দায়ী করিতে পারেন, এই আশঙ্কা।"

এই গ্রন্থেরই ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর একটি বাস্তব সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী ভাষার মানদণ্ড সৃষ্টি হয় নি। বিজ্ঞানের ভাষাকে গড়ে তুলতে পারলেই যে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রসার সম্ভব—সে বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিচারকালে বিজ্ঞানশাস্ত্র যে দ্রুত উন্নতিশীল সেই মৌলিক বিষয়ের প্রতিও তিনি আলোকপাত করেছেন। চিন্তাপ্রণালীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে সংগত করে তুলবার যে নির্দেশ দিয়েছেন—সাহিত্য চিন্তায় রামেন্দ্রসুন্দরের আপন স্রষ্টা-সত্তার পরিচয়ই তার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' একদা বাংলা দেশের সকল প্রকার আঞ্চলিক সম্পদের সংরক্ষণ-প্রয়াস গৃহীত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার বালকমনের চিত্তাকর্ষক যে 'খুকুমণির ছড়া' প্রণয়ন করেছিলেন, সেই অভিনব প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দর, গ্রন্থখানির ভূমিকা রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই জাতীয় ছড়ার সংগ্রহকার্যে আত্মনিয়োগ করে বাংলার লোক-সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই প্রয়াসের ফল যে দূরতর ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হবে—এ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর নিঃসংশয় ছিলেন।

শিশুজনপ্রিয় এই ধারার সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে নিষ্কাশন করতে চান নি। কিংবা এর মধ্যে ইতিহাসের কোন দূর-বিস্তৃত অধ্যায় আবিষ্কারেও তিনি সমর্থ নন। তবে এ-জাতীয় জাতির সম্পদকে রক্ষা করবার দায়িত্ব, তিনি উচ্চারণ করেছেন। লুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্ন-গুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতেই হবে। এই বিষয়ে অবহেলা করলে 'ভবিষ্যতের নিকট মার্জনার অধিকারী হইব না।' ইতিহাসের প্রতি আমরা যে অনুরাগসম্পন্ন নই—তার কারণ-রূপে তিনি বৈজ্ঞানিকতার অভাবকেই নির্দেশ করেছেন। বিজ্ঞানের প্রতি বিকর্ষণ, সত্যের প্রতি বিরাগকেই প্রমাণ করে।

ভারহীন সহজ রসের সঞ্চার এই ছড়াগুলিতে মানুষের জীবনের একটা বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে। মানুষের শৈশবজীবনের মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতির পর্যালোচনায় এ-জাতীয় ছড়ার গুরুত্ব অত্যধিক। এ-কথা ঠিক, আমাদের কার্যাবলী যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করে—আমাদের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক সাফল্য সেই পরিমাণেই আসে। পূর্ণবয়স্কদের মন-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নিয়ম ও শৃঙখলার এই অস্তিত্ব থাকলেও শিশুর জগতে এ-সব কিছুরই বৈপরীত্য। শিশুমনস্তত্ত্বের উপর রামেন্দ্রসুন্দর যে মন্তব্য করেছেন—তা তাঁর সাহিত্যিক-সত্তা ও রসবোধের সমন্বয়েই সম্ভব হয়েছে :

"প্রকৃতির কারখানা হইতে নির্মিত হইয়া মানবশিশু সদ্য সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও প্রকৃতির শাসন, নিয়মের শাসন তাহাকে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই ; যে নিয়মের প্রভাবে সেই কারখানা পরিচালিত হইতেছে, সেই নিয়মের অস্তিত্বে তাহার একেবারে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই।"

শৃঙ্খলাহীন, নিয়মরহিত, বিপর্যস্ত জগতের মধ্যে শিশুমনস্তত্ব পরিপূর্ণ আন্তরিক উল্লাস অনুভব করে। বয়স্ক মানবের চরিত্র বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। কিন্তু পৃথিবীর শিশুচরিত্র সর্বকালে সর্বদেশে একই রকম। স্নেহ-বিবশা জননীর অপত্যস্নেহ যেমন মানব-চরিত্রের কৃত্রিমতার অন্তরাল সরিয়ে আপন স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময় মূর্তিকে প্রকাশ করে—'চীন হইতে পেরু' পর্যন্ত এ চরিত্র সর্বকালেই একরকম।

এই সমস্ত অসংলগ্ন ছড়ার ভগ্নাংশ-গুলির মধ্যে কোথাও কোথাও হয়তো গৃহস্থ-বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের রূপ-কল্পের সন্ধানও পাওয়া যায়। বাঙালীর স্বভাবের ভাণ্ডার থেকে রং ঘনিয়ে উঠেছে। এগুলিতে—কৃত্রিমতার অনেক ঊর্ধ্বে তাই এ সাহিত্য। শিশু সংসারের সকল কিছুই কৌতুকময় ও বিশৃঙ্খলার আনন্দে ও কলরবে পরিপূর্ণ। এ-দিক দিয়ে 'খুকুমণির ছড়া'র কৃতকার্যতার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

'ছড়া ও গল্পের' ভূমিকায় রামেন্দ্র-সুন্দর বলেছেন—পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এ দেশে অতি প্রাচীনকালে ছেলেদের জন্যেই রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষার্থী বালকদের জন্যে কয়েকটি 'গল্প' 'ঋজুপাঠ' প্রথম ভাগে সংকলন করেছিলেন। কথামালা গ্রন্থে বিদেশী গল্পের সংকলন করলেন—কিন্তু স্বদেশী গল্পগুলিতে বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি কেন পড়ে নি—এ বিষয়ে রামেন্দ্র-সুন্দরের মনে বিস্মিত জিজ্ঞাসা জেগেছে। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'অধ্যাপকোচিত গাম্ভীর্যের অবকাশ হওয়া সত্ত্বেও সরল ও তরল ভাষার আশ্রয়ে যে 'ছেলে ভুলাইতে প্রবৃত্ত' তা দেখে রামেন্দ্রসুন্দর বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

৩

অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের জন্যে বিজ্ঞান পরিচিতির টুকরা সংকলন—'প্রকৃতি-পরিচয়' গ্রন্থের একখানি ভূমিকাও রামেন্দ্রসুন্দর প্রণয়ন করে-ছিলেন। গ্রন্থখানির লেখক জগদানন্দ রায়। বিজ্ঞানের উচ্চ তত্ত্বকে জনমনের দ্বারে পৌঁছে দেবার যে দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন—তার জন্যে রামেন্দ্র-সুন্দর তাঁকে সর্বতোভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বিনয়কুমার সরকার লিখিত 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধে'র ভূমিকায় রামেন্দ্র-সুন্দরের ইতিহাসের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের সংগেই তিনি উল্লেখ করেছেন :

"অন্য দেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এদেশে তাহা নাই। অতীতের তত্ত্ব এদেশ রাখিতে চাহে না। স্বদেশের অতীতকেই ভুলিয়া গিয়াছে ; বিদেশের ত' কথাই নাই।"

অথচ এই অতীতের কথা আলো-চনায় ভাবুকের মন স্তম্ভিত হয়, দার্শনিকের চিত্ত দিশেহারা হয়। গ্রন্থ-খানির মধ্যে অতীত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধে ও তার বিবৃতিতে বিনয়কুমার যে আকাঙক্ষার ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন—তার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর।

'সংগীত রাগকল্পদ্রুম' নামীয় গ্রন্থখানির পুনঃ প্রচারের জন্য লাল-গোলারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় রামেন্দ্র-সুন্দরের কাছে এক আবেদন জানান। গানগুলি সাধ্যমত সংশোধন করে সংগীতজ্ঞের সাহায্যে স্বরলিপি প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সহায়তায় একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। গ্রন্থখানির গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণানন্দ ব্যাস। গ্রীয়াসন হিন্দী-সাহিত্যের বিবরণ লিখতে বসে এই গ্রন্থ থেকেই আনুকূল্য পেয়েছিলেন। রাজা বাহাদুর ঐ গ্রন্থের সমুদয় স্বত্ব সাহিত্য পরিষদকে দিয়েছেন। গ্রন্থ-বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরিষদ কর্তৃক সংগীত সাহিত্য প্রচারের জন্যে ব্যয়িত হবে—এ বিষয়েরও উল্লেখ রামেন্দ্রসুন্দর করেছেন।

'আদর্শ জীবনী' নামে একখানি গ্রন্থ ১৩১৬ সালে রচনা করেছিলেন। বাংলা দেশের কতিপয় মহাপুরুষের জীবনচরিত এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মনস্বী যে সমস্ত মহাজন বাংলার জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করেছেন—তাঁদের চরিত্র যে আমাদের সম্মুখে নতুন আদর্শ স্থাপন করে আমাদের গন্তব্যপথকে নির্ধারিত করে দেবে—এই আশাই রামেন্দ্রসুন্দর পোষণ করেছেন।

বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' একটি মুখবন্ধ রচনা করে রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা সাহিত্যের তদানীন্তনকালের বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গটির উপর আলোক-পাত করেন। পুরাতন পুঁথির বানান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা প্রভৃতি প্রসঙ্গ গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। তিনি প্রকৃত গবেষকের মতো আলোচনা করেছেন :

"চতুর্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম বাংলার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত-ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপর হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই।"

কিন্তু সর্বোপরি রামেন্দ্রসুন্দরের যে বক্তব্য তা সূক্ষ্মদর্শী রসজ্ঞেরই মন্তব্য। তত্ত্বকথার কুটিল তর্কের সীমা পেরিয়ে চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্যকেই তিনি বড় বলে বিবেচনা করেছেন। এই মাহাত্ম্যেই গ্রন্থখানির আবেদন মানবসাহিত্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছয়—সমস্ত প্রাদেশিক-তার প্রশ্ন সেখানে অর্থহীন হয়ে পড়ে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থভূমিকাতেও রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-সমালোচনার ও রসপ্রমাতার একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখেছেন।

কাজেই দেখা যায়—'গ্রন্থভূমিকা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয়ও তাঁর বিদগ্ধ মননশীলতারই একটি পর্যায়ক্রমিক ভেদ মাত্র। এই অপ্রধান অংশটির মধ্যেও তাঁর প্রতিভার দীপ্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

হ্যাঁ, তা কুড়ি বছর হবে বৈকি। সেই যে ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই ঢুকল এই ব্যাংকে—আজও জগবন্ধু সেখানেই আছে। এমন কি সেই একই চেয়ার, একই টেবিল। ব্যাঙ্কের কত কি পরিবর্তন হ'ল, কত লোক এল গেল, কিন্তু জগবন্ধু যেখানে বসত আজও সেখানেই বসে। অন্ধকার কানাগলির পাশে সেই একই জানলা। একফালি ধোঁয়াটে আকাশ যে চোখে পড়ে না তা নয়, কিন্তু জগবন্ধু ভুলেও সেদিকে কখন তাকায় নি ; তাকাবার কোন প্রয়োজনই হয় নি। টেবিল আর একরাশ ফাইল—এ ছাড়া জগবন্ধু আর কিছুই জানে না। জানতে চায়ও না। সবার চেয়ে আগে সে অফিসে আসে, সবার শেষে যায়। আজ কুড়ি বছরে একদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তার সমস্ত ইচ্ছা, শক্তি, শরীর, মন—সবই তার অফিসের কাজে নিয়োজিত ক'রেছে। আসলে এত ভাল কেরাণী পৃথিবীতে বোধহয় আর হয় নি—হবেও না। ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা নতুন নতুন এসে কাজে তার এত অস্বাভাবিক আগ্রহ, এত অমানুষিক পরিশ্রম দেখে প্রথমে আশ্চর্য হত, পরে সন্দেহ করত। তারপরে তারাও অভ্যস্ত হ'য়ে যেত।

এই কুড়ি বছরের মধ্যে জগবন্ধু একটি দিন মাত্র ছুটি নিয়েছিল। ছুটি নিয়ে দূর থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, কেরাণীরা কেমন সব নিজের নিজের টেবিলে বসে মাথা নীচু ক'রে কাজ করে যাচ্ছে। এই মানুষ মেসিনগুলো যখন কাজ করে তখন তাদের কেমন দেখায়, তাই দেখার জন্যই জগবন্ধু মাত্র একদিন ছুটি নিয়েছিল। তাও বিকালের দিকে এসে কাগজপত্রগুলো যথাযথভাবে পরের দিনের জন্য সাজিয়ে রেখে গেছে। জগবন্ধু যেন এই কাজের জন্য, এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছে। যতটুকু অবসর কুড়িয়ে পায়, সকালে, সন্ধ্যায় চলায়-ফেরায়—জগবন্ধুর এক চিন্তা—অফিসের কাজ, ব্যাঙ্কের লাভ-লোকসান, উন্নতি-অবনতি। ঘুমোবার পূর্ব মুহূর্তে জগবন্ধুর মনে পড়ে—না ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের কোন উত্তাপহীন হাহাকার নয়—মনে পড়ে আগামী কালের স্তূপীকৃত ফাইলের রাশি। কি আনন্দ, কি নেশা। অসংখ্য বন্ধন মাঝে অবর্ণনীয় মুক্তির স্বাদ। সময়মত কাজ ক'রে, ভালভাবে কাজ করে কি স্বর্গীয় তৃপ্তি, কি তপস্যাহীন নির্বাণ!---

ব্যাঙ্কের অন্য কেরাণীদের কাছে সে যেন এক বিস্ময়কর বিচিত্র জীব। সকলেরই আলোচ্য বস্তু, কৌতুক-মজার শিকার। বি-এ পাশ ছোকরা পার্থপ্রতিম মন্তব্য করে: লোকটা মরবিড, নিউরটিক। অফিসের পক্ষ থেকে ওকে কোন সাইকোলজিস্টকে দেখান উচিত।

অধিকাংশ উত্তর-তিরিশ কেরাণীরা frustrated---মৃত স্বপ্নের বোঝার সমাধিস্থ---আদ্দির পাঞ্জাবী আর চওড়া পাড় ধুতি, খদ্দরের কুর্তা আর পায়জামা অথবা টেরিলিন ও ট্রপিক্যালের আড়ালে এরা সবাই বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। তবু তো এদের ভুলে থাকার অনেক কিছুই আছে। আছে রাজনীতি, সাহিত্য, আছে সিনেমা, ফুটবল, আছে আড্ডা রোমান্স। জগবন্ধুর কি আছে?

—হৃদয়হীন, প্রায় ভেজিটেবল: ফিল্ম পত্রিকা থেকে মুখ তুলে মন্তব্য করে কৃষ্ণেন্দু।

—না না কিছু একটা আছে এর পেছনে। মানুষকে এত সহজে বুঝে ফেলার চেষ্টা করিস নে—there are more things in heaven and earth---: স্ট্যানিস্লাভস্কি-পড়া অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চের শক্তিমান অভিনেতা সুর্দদা বললেন।

চাউস লেজারের ফাঁক থেকে, নাকের চশমা ঠিক ক'রে, একমুঠো নস্যি নাকে গুঁজে, হেঁ-হেঁ করতে করতে এবার বড়বাবু ভবেন চাটুজ্যে পুকুরে ঢিল ছুঁড়লেন: আসল কথাটাই আপনারা বোঝেন না। আরে একটা বিয়ে দিন, দেখুন সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যে বয়সের যা তা না হলে পাঁচরকম ভড়ঙের দরকার হয়—আসে পাঁচরকম রোগ। হেঁহেঁ ক'রে বড়বাবু শুধু নিজেই হাসতে লাগলেন আর হাসির ধাক্কায় তাঁর ভুঁড়িটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল।

—বিয়ে। সবাই যেন একসঙ্গে চমকে উঠল। জগবন্ধুর বিয়ে? জগবন্ধু যে বিয়ে করতে পারে, ঘর-সংসারে মন দিতে পারে এ সম্ভাবনা এতই অচিন্তনীয়, এতই সুদূর যে সবাই বড়বাবুর কথাটা নেহাৎ ঠাট্টা ব'লে ভেবে নিল। তার জন্ম-মৃত্যু, সাধ-সাধনা সবই তো ঘিরে রয়েছে ঐ টেবিল, ঐ চেয়ার, ঐ ডেবিট-ক্রেডিটের দৈত্যাকার খাতাগুলো। এর মধ্যে স্ত্রী-সন্তান ইত্যাদি তুচ্ছ ঘটনার ফাঁক কোথায়?

—আর তাছাড়া, স্পষ্টবক্তা মণ্টু মণ্ডল বলেই ফেলল: ঐ অপদার্থ জন্তুটার হাতে কে মেয়ে দেবে?

প্রায় সকলেই নিঃশব্দ সম্মতি জানিয়ে কাজে মন দিল। শুধু মনে হল যেন কোণে-বসা টাইপিস্ট মিনতি মল্লিক

ভাবলেশহীন মুখে জগবন্ধুকে এক-ঝলক দেখে নিল।

শীর্ণ, ছোটখাট, নিরীহ, স্বল্প-বাক, আত্মীয়হীন একটা ছত্রিশ বছরের মানুষ। পৃথিবীতে তার কতটুকু জায়গারই বা দরকার—অফিসের টেবিল চেয়ার আর অন্নপূর্ণা মেসের ভাঙা তক্তা---এতটুকু স্থানের মধ্যেই তার অস্তিত্ব। কুঁজো হয়ে যেন বিনয়ে বিগলিত হ'য়ে, রোগা গলাটা একপাশে নীচু ক'রে জগবন্ধু কাজ করে যায়।---

এইভাবেই কুড়ি বছর কেটে গেছে অনলস মনোযোগিতায়, নিস্তরঙ্গ মানসিকতায় ---শুধু কাজ---শুধু অফিস। ডালহৌসীর ভুখ মিছিল, রাজনৈতিক হত্যা, মহতের মৃত্যু—কিছুই জগবন্ধুকে টলাতে পারে নি। এমনিভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিন, কেটেও যেত, যদি না---এই 'যদি না' যা 'কিন্তু' শুধু গল্পে উপন্যাসে নয়, জীবনেও সব ওলটপালট ক'রে দেয়---দীর্ঘ যুগের তপশ্চর্যাকে নামিয়ে আনে সাধারণের ধুলো-মাটিতে—এতদিন যে জীবনে নিশ্চিন্তে অভ্যস্ত থাকা যায় তাকে বিস্বাদ লাগে, অপচয় মনে হয়। কোন্ সুদূর অচেনা জগতের সুগন্ধি বাতাস আচমকা এসে অন্ধকারকে জালিয়ে দিয়ে যায়। প্রশান্তি চলে যায়, ভেসে যায় সীমিত আনন্দ-সুখের সুরক্ষিত দুর্গ। ফোটে ফুল, ওঠে ঝড়, আসে অস্থিরতা, যন্ত্রণা। নক্ষত্রলোকের ওপারে কি আছে? জগৎ কত বড়, কত সুন্দর, কত বিচিত্র। জগবন্ধুর জীবনে তেমন কিছু হ'ল নাকি? পাথরে ফুল? মরুভূতে স্রোতধারা? সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। পার্থপ্রতিম, কৃষ্ণেন্দু, সূর্যদা, বড়বাবু, মণ্টু এমন কি মিনতি মল্লিকও।

সেদিন অসময়ে শ্রাবণের অন্ধকার ঘনিয়ে এল। জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হঠাৎ জগবন্ধু চমকে উঠল। কোথা থেকে বেশ একটি মিষ্টি ফুলের গন্ধ সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিচ্ছে। কাছে পিঠে কোথাও তো কোন ফুলগাছ নেই। সেণ্ট কে মেখেছে? তবে? কাজ ভুলে এই প্রথম জগবন্ধু ভাবতে লাগল—কোথা থেকে আসছে এই মনোহর সুরভি? পাওয়া গেল সন্ধান। এক বাণ্ডিল চেকের মধ্যে একটি গোলাপী রঙের চেক—চাঁপাফুলের সুগন্ধি মাখানো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল চেকটি জগবন্ধু বসাক, তারপরে পিওনের হাতে যথারীতি কেশিয়ারের ঘরে পাঠিয়ে দিল। ছুটি হ'তে আর কতক্ষণ বাকি। এই প্রথম জগবন্ধু ঘড়ির দিকে তাকাল। এই প্রথম তার কাছে ছুটি এল মুক্তির দূত হ'য়ে।----

আজ রাত্রে জগবন্ধুর সহজে ঘুম এল না। সেই পুষ্পসুরভিত চেকের স্মৃতি এক অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্য নিয়ে ক্লান্ত তন্দ্রাকে ব্যথাতব ক'রে তুলল।---

কার সেই চেক, কি তার ঠিকানা? সারাটা দিন জগবন্ধু হাতড়াল—এ ফাইল, সে ফাইল। অবশেষে আবার মুঠো ভ'রে তুলে ধরল সেই গোলাপী চেকটি। সযত্নে হাত বুলিয়ে দেখল মিহি মেয়েলি টানে সই করা 'মনোলতা সেন'। সহসা জগবন্ধুর ঘুমন্ত অনুভূতিগুলো গান গেয়ে উঠল—'মনোলতা সেন, মনোলতা সেন'। চেকটি ঠোঁটে লাগিয়ে আবৃত্তি করল—'মনোলতা, মনোলতা—মনু।' চাঁপাফুলের দামী সেণ্ট মাখান একটি চেক কুড়ি বছরের পুরনো ব্যাঙ্কের এক নিরীহ কেরাণীর শান্ত আকাশে নিয়ে এল সর্বনাশী ঝড়। যে সব স্বপ্ন মরে গিয়েছিল বা যারা কখন জন্মায় নি তারা সব গভীর সমুদ্র থেকে কামনার রাঙা পদ্ম হ'য়ে দলে দলে ভেসে উঠল। সেই সব বিমূর্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যারা চাপা পড়েছিল এতদিন কঠিন যান্ত্রিক জীবনের চাপে তারা সংগ্রামী হ'য়ে উঠল। সেই নামও লেখা যেন অতীন্দ্রিয়, প্রায় মিস্টিক এক বেদনা-চৈতন্যের দ্যোতক, যেন পেয়ে হারাবার রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার দূত হ'য়ে এল ঐ নাম।

অফিসের জানলা গলিয়ে, নানা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে একফালি আকাশে বোধহয় এই প্রথম চোখ রাখল জগবন্ধু। ভেসে উঠল নারীমূর্তি—ছায়া-ছায়া---লাবণ্য রেখা---যাকে চিন্তা করলে চেতনায় স্পর্শ আনে চাঁপা-ফুলের কোমল সুরভি। অনেকক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল জগবন্ধু বসাক, এণ্ট্রি করতে ভুলে গেল, ভুলে গেল সে বসে আছে অনেকগুলো অকরুণ দৃষ্টির লক্ষ্য হ'য়ে। তার ঐ উদাস অন্যমনস্কতা, ঠোঁটের চাপা হাসি, স্বগতোক্তির গুঞ্জন সকলেই দেখল আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে যেন সবাই ফেটে পড়ল অফিসের ঘরে ঘরে। জগবন্ধু বসাক বোধহয় সত্যিই পাগল হ'ল এতদিনে—মরবিড, আনসোশ্যাল, নিউরটিক জগবন্ধু।---

রাস্তায় বেরিয়ে জগবন্ধু চেয়ে থাকে ফটোর দোকানের শো-কেশে রাখা ছবিগুলোর দিকে। মনোলতা সেন কোন্ ছবিটির মত? জগবন্ধু দেখে নেয় পথ-চলতি মেয়েদের। এদের মধ্যে কেউ কি মনোলতার মত? মনোলতা কি সুন্দরী? সে কি যৌবনবতী? হয়ত সে ধনীঘরের কোন স্বামী-সোহাগিনী কিম্বা---। জগবন্ধু চৌরঙ্গীর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল। চা খেতে খেতে জনতার প্রবাহে চোখ রেখে ভাবতে লাগল---কিম্বা হয়ত মনোলতা এখনও কুমারী। বাগ্‌দত্তাও ত' হ'তে পারে। তার ভাবী স্বামী হয়ত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে রিসার্চ করতে আমেরিকা গেছে। কিম্বা---চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভাবল সে—হয়ত মনোলতা এখনও কারুরই নয়। হয়ত হঠাৎ আলোর ঝলকানির সলজ্জ প্রতীক্ষায় কাতর সেই মেয়ে। তাই হবে, না হ'লে বিধিলিপি কাকে বলে? পথে নেমে এল জগবন্ধু। ঘরমুখো জনতার দলে অন্যদিনের মতই মিশে গেল।

পরদিনই ব্যাঙ্কের বই থেকে ঠিকানা যোগাড় ক'রে অদ্ভুত কাজ ক'রে

বসল জগবন্ধু। দামী একটা শাড়ি কিনে পাঠিয়ে দিল মনোলতার ঠিকানায়। নিজের ঠিকানা জানাল না। শুধু কিছুদিনের জন্য এক সুখময় অস্বস্তিতে আবিষ্ট রইল। তার দেওয়া শাড়ি মনোলতার দেহকে স্পর্শ ক'রেছে এই চিন্তার উষ্ণ তৃপ্তিতে অভিভূত রইল জগবন্ধু। তার এই পরিবর্তন কারুর দৃষ্টি এড়াল না। কাজে স্পষ্ট অবহেলা দেখা গেল। ম্যানেজার একদিন ডেকে বকুনি দিলেন। অফিসের লোকেরা এখন আর শুধু কৌতুক করে না। জগবন্ধু এখন তাদের গম্ভীর গবেষণার পাত্র, এমন কি মুখরোচক আলোচনার বিষয়। কিন্তু জগবন্ধু নির্বিকার। তার সমগ্র সত্তা এখন একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত। একটি নাম, একটি অদেখা মুখ, চাঁপাফুলের সুরভি-মাখানো একটি গোলাপী চেক।—

পরের দিন অফিসে এসে জগবন্ধুর প্রথম কাজ হ'ল চিঠি লেখা। না চিঠি তাকে লিখতে হবে। পরিচয় নিতে হবে, দিতে হবে। না হ'লে বাঁচতে পারে না জগবন্ধু। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরা চিঠি। বিনীত ভাষা, ভদ্র ভঙ্গী। তবু মূল সুরটি ধরা যায়। প্রেম ও কামনার রাঙা আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করতে লাগল অক্ষরগুলো। কিছুদিন পরেই উত্তর এল সে চিঠির। নম্র ভাষায় মৃদু ভর্ৎসনা। আর যেন কখন সে চিঠি না লেখে। এবার যদি চিঠি বা কোন উপহার আসে ম্যানেজারকে জানান হবে। শাড়ির প্যাকেটও ফিরে এল। কিন্তু এই ভর্ৎসনা, সতর্কবাণী, এই ফেরৎ-উপহার জগবন্ধুকে দমাতে পারল না। এ যেন তার মহৎ গৌরবময় ভালবাসার কাছে কিছুই নয়। ভালবাসা অনেক বড়। তার অনেক প্রতীক্ষা, অনেক তিতিক্ষা। তাই উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার চিঠি লিখল সে। এবার কিন্তু রাখা-ঢাকা নয়---এবার নিলাজ অন্তর উন্মুক্তি। মনোলতা তোমায় চাই। আমার জীবনে তুমি অপরিহার্য, অনিবার্য। তুমি বহুবল্লভা সুন্দরী হও বা মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে হও! তুমি বিদুষী হও, চাকুরে হও, তুমি যেই হও, যেমনি হও। জগবন্ধু বসাকের জীবনে তুমি অজান্তে জড়িয়ে গেছ। তুমি যা-তা নও। তুমি চাঁপাফুলের সুরভি-মাখানো অশরীরী আইডিয়া, যাকে কাছাকাছি চাই—অনেক কাছে।

জগবন্ধুর চাকরী গেল। কিন্তু এতটুকু ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, ভাবনা নেই। ভালই হ'ল। এবার দিনরাত নিজেকে কাছে পাওয়া যাবে। মনোলতার কথা ভাবা যাবে সব সময়। ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে যা কিছু জগবন্ধুর জমেছিল সব ধীরে ধীরে তুলে নিল। ঐ টাকায় হ্যামিলটন থেকে কিনল বহুমূল্য উপহার। তারপর একদিন সন্ধ্যার দিকে বেরিয়ে পড়ল মনোলতার ঠিকানায়—শেয়ালদা থেকে ভবানীপুর। এতদিনের অযত্ন-মলিন দেহে প্রসাধনের পালিশ পড়েছে। চুলে তেল, পরণে নতুন ধুতি পাঞ্জাবী, জগবন্ধু ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়ল।—

আজ সে মনোলতার মুখোমুখি হবে। কত পরিচিত সে মেয়ে। তার মুখের রেখা, চোখের চাহনি, হাসির ভঙ্গিমা সবই জগবন্ধুর পরিচিত। বলবে—আমি এসেছি, আমাকে বিমুখ ক'র না। তোমার দুটি হাত ধ'রে বলছি আমি তোমায় অন্তর দিয়ে ভালবাসি। এর থেকে বড় আর কি আছে, আর কি চাই। রূপ, অর্থ, শিক্ষা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবার থেকে বড় প্রেম। এবার কি বলবে। ফেলতে পারবে এই প্রেমকে। ট্যাক্সির মধ্যে রেড রোড দিয়ে যেতে যেতে আলো-অন্ধকারে কারা যেন ব্যঙ্গ ক'রে উঠল—

: সবার চেয়ে বড় প্রেম। হাঃ হাঃ হাঃ—পার্থপ্রতিম, কৃষ্ণেন্দু, সূর্যদা, বড়বাবু, মণ্টু এমন কি মিনতি মল্লিক —সবাই যেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। হাঃ হাঃ হাঃ---বিশালদেহ ট্যাক্সিচালক। কয়েক বছর আগে কোথায় খুন ক'রে কলকাতায় পালিয়ে এসে ছদ্মবেশে ট্যাক্সি চালাচ্ছে। জগবন্ধুকে চিনতে তার দেরি হল না। হাঃ হাঃ হাঃ ক'রে পৈশাচিক হাসি দিয়ে সে জগবন্ধুর রেশমী স্বপ্নকে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে ভেঙে দিল---তারপর---

---জগবন্ধু যখন নিজেকে আবিষ্কার করল রাত্রি তখন গভীর। ময়দানের ঘাসে রক্তাক্ত ঘায়েল শরীর এলিয়ে পড়েছে। মৃত্যু আসন্ন। কোমল শান্ত রাত্রি। দূরে মাঝে মাঝে চলন্ত গাড়ির হর্ণের আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে আরো গভীর ক'রে তুলছে। জগবন্ধু বুঝল এবার সত্যি সব শেষ হ'য়ে এল। প্রতি পলে জীবন হারিয়ে যাচ্ছে। সামনে জ্বালাহীন অনন্ত প্রশান্তি। আকাশের তারাদের দিকে তাকিয়ে রইল জগবন্ধু। নক্ষত্রলোকের ওপারে কি আছে? মৃত্যু এখন অনেক কাছে। শেষবারের মত চোখ চেয়ে দেখল জগবন্ধু—আকাশের একটি তারা খসে পড়ছে, যেন তার কাঁধে এসে মাথা রাখল—চাঁপাফুলের সুরভি-মাখা একটি তারার নিশ্বাস জগবন্ধুকে মূর্ছিত ক'রে দিল।—জগবন্ধু মারা গেল।

(George Moore লিখিত 'The clerk's Quest শীর্ষক গল্পের ভাবানুবাদ।)

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রঙ্গজগৎ

● 'প্রথম প্রেম' ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

সিনে টেকনিশিয়ানদের বিক্ষোভ কেন ?

সিনে টেকনিশিয়ানরা আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বসু টেকনিশিয়ানদের পক্ষে ঘোষণা করেছেন, ৮ই আগস্ট থেকে স্টুডিও কর্মীরা দাবী ব্যাজ ধারণ করছেন। ১৭ই আগস্ট থেকে স্টুডিও ও ল্যাবরেটরীতে অনশন ধর্মঘট ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হওয়ার কথা। স্টুডিও কর্মীদের এই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য এক সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছে ; এবং ৮ই আগস্ট টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় টেকনিশিয়ান, শিল্পী ও পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং টেকনিশিয়ানদের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

কেন এই অসন্তোষ? কেন এই আন্দোলন? সে কথা বড় মর্মান্তিক। আমরা রুপালী পর্দায় ছবি দেখি। কিন্তু এই ছবি যারা তৈরি করে, তাদের কথা জানি না। জানি না পর্দার হাজার আলোর রোশনাইয়ের অন্তরালে কত অন্ধকার, কত কান্না আছে। যে ইলেকট্রেশিয়ানের উপর ছবির প্রাণপ্রতিষ্ঠা নির্ভর করছে, তার বেতন যে মাসিক মাত্র ১১০৲ টাকা সে কথা কে জানে? যারা দৃশ্য সাজায় সেই সেটিং কর্মীদের যে ৫০৲ থেকে ৭০৲ টাকায় সংসার চালাতে হয়, সে কথা তো কারো জানবার কথা নয়। আর্ট ডিরেক্টরের আমরা কত প্রশংসা করি, কিন্তু এমন কুশলী শিল্পীরা ১৪০৲ টাকায় প্রতিভা বিকিয়ে দিচ্ছে সে খবর তো আমরা জানি না। এখানে অন্ধকার, ধুলি আর বিদ্যুতের কড়া আলোতে ঘর্মাক্ত কলেবরে যারা কাজ করে, তাদের হাত দিয়ে এমন ছবি বার হচ্ছে, যে ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে আসছে। দেশের মানুষ ধন্য ধন্য করছে। কিন্তু যারা সে ছবির জন্য প্রাণপাত করেছে তারা শুধু সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে বেঁচে আছে। ওরা শিল্পকে ভালবাসে, তাই ওরা কাজ করে।

অনেক আন্দোলনের পরে পঃ বঙ্গ সরকার ১৯৬০ সালে চলচ্চিত্র কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৬২ সালে এই আইনকে সরকারী গেজেটে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোন কোন স্টুডিও মালিক এবং পরিবেশক এই আইনকে স্বীকার করে না। নতুন হারে কর্মীদের বেতন দিতে অস্বীকার করছে। এই অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে টেকনিশিয়ানদের এই আন্দোলন। টেকনিশিয়ানদের এই আন্দোলনে আমাদের আন্তরিক সমর্থন আছে, প্রত্যেক চলচ্চিত্রামোদীর সমর্থন থাকবে।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

দুটি বাংলা ছবি

আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। একটির নাম 'দীপ নেভে নাই,' অপরটি 'কাঁটাতার'।

দীপ নেভে নাই

জালান পিকচার্সের 'দীপ নেভে নাই' নামে যেমন 'গুরুচণ্ডালী' দোষ, ছবিটির গঠনরীতিতেও একই দোষ দৃষ্ট হয়। সুরুতে কাহিনী বাস্তবধর্মী মনে হলেও, আসলে কাল্পনিক। চিত্রনাট্যকারের কল্পনা সামঞ্জস্যহীন। উদ্ভট। এই কাল্পনিক কাহিনীর নায়ক আপন ভগ্নীপতির মৃত্যুর পর বোন ও ভাগ্নে-ভাগ্নীর দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং জেলে যায়। জেল থেকে পালিয়ে সে এক রাধাকৃষ্ণের সেবায়েতের

সান্নিধ্যে আসে। সেখানে ঠাকুরের কাছে তার জিজ্ঞাসা, তুমি যদি সত্যিই ভগবান তবে এত অন্যায়, এত অবিচার কেন? মানুষ খেতে পাচ্ছে না, কিন্তু নিষ্প্রাণ ঠাকুরের গায়ে এত গয়না কেন? সেই অলঙ্কার নিয়ে পালাতে গিয়ে সে ধরা পড়ে। কিন্তু সেবায়েত তাকে সব গয়না দিয়ে ঠাকুরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাসে চলতে নির্দেশ দেয়। রাতারাতি তার অবস্থা ফিরে যায় এবং এক অঞ্চলে দয়া-দাক্ষিণ্যে সে এক মহৎ মানুষরূপে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে। তারপরে দেখা গেল, যে জেল থেকে সে পালিয়েছিল সেই জেলার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার পিছে ধাওয়া করেছে, আর সেও ধরা না দিয়ে পারে নি?

এই কাহিনী এক সাধারণ শ্রমিকের বাস্তব জীবন দিয়ে সুরু হয়ে, পরে জেল থেকে আরম্ভ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল্পনিক কাহিনী পর্যন্ত যেভাবে বিস্তারলাভ করেছে, সেই অতি পল্লবিত অবাস্তব কাহিনী মানুষের মনে কোনরকম দাগ কাটে না। বরঞ্চ অতিদৈর্ঘ্যে ও একঘেয়েমিতে ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। কোন চরিত্র এখানে ঠিকভাবে গঠিত হবার সুযোগ পায় নি। সুতরাং কোন অভিনেতা দর্শকমনে রেখাপাত করে না। এরকম ছবি যে আজকের দিনেও হতে পারে এটাই বিস্ময়ের কথা।

● সিনে টেকনিশিয়ানদের অনশন ধর্মঘট ও আন্দোলন-সম্পর্কে ভোট গ্রহণকেন্দ্রের দৃশ্য।

ছবিটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছে তরুণকুমার। অন্যান্য ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী, বিকাশ রায়, জহর রায়, পাহাড়ী সান্যাল, লিলি চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, দীপ্তি রায়, বাসবী নন্দী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, গুরুদাস ব্যানার্জী ও নবাগত দেবজিৎ প্রমুখ।

ছবিটির চিত্রনাট্য নাকি কোন বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে। সেই গল্প যদি ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল' হয়ে থাকে তবে তার এই শোচনীয় বাংলা রূপান্তর ও ভাষ্য দেখে বিদগ্ধ দর্শকরা বেদনাবোধ করবেন। পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার কনক মুখার্জী বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি চিরায়ত কাহিনীকে নিয়ে এমন প্রগল্ভতা না দেখালেই পারতেন।

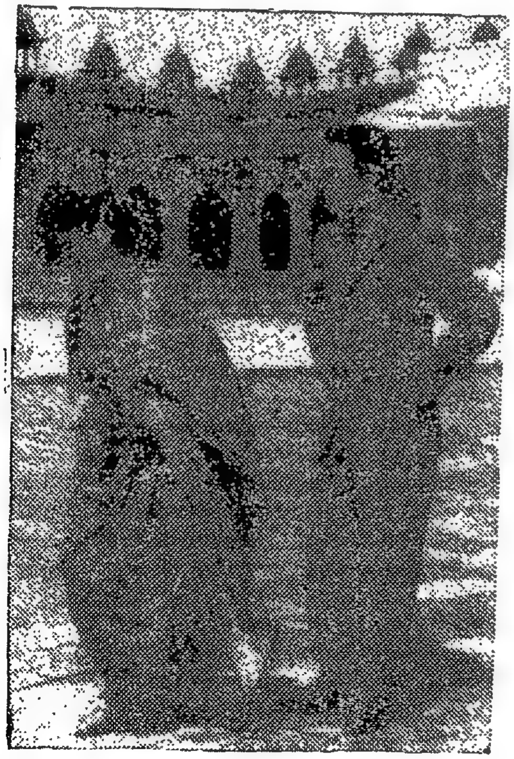

● সুশীল মজুমদার পরিচালিত 'লাল পাথর' ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও উত্তমকুমার।

কাঁটাতার

বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচিত এবং

পরিচালিত 'কাঁটাতার'-এর নির্মাণপর্ব সুরু হয়েছিল বহু পূর্বে। ছবির নির্মাণ পর্যায়ের মধ্যে দুজন শিল্পীর জীবন অবসান হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে নতুন-ভাবে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদিত হয়ে ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে। ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক উন্মাদ আরোগ্যশালাকে অবলম্বন করে। নায়ক সমরেশের সঙ্গে ছিল নমিতার ভালবাসা। উভয় পক্ষের অভিভাবকের পূর্ণ সম্মতিতে তারা মিলনের স্বপ্ন দেখছিল। উচ্চতর শিক্ষার জন্য সমরেশ বিলাত চলে গেলে নমিতাদের বাড়িতে উপস্থিত হয় বীরেন নামক এক কুচক্রী ও কামকাতর শিল্পমালিক। সে তার কামবাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে নমিতাদের সংসার এবং তার স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। এক দুর্ঘটনায় স্মৃতিশক্তি হারিয়ে উন্মাদ নমিতা ডাঃ সান্যালের আরোগ্যশালায় ভর্তি হয়। সমরেশ বিলাত থেকে ফিরে এসে নমিতাকে রোগমুক্ত করে।

কাহিনী মামুলী। এতে যদি সমাজ-পরিবেশ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হতো এবং সমাজচেতনা নিয়ে পরিচালক অগ্রসর হতে পারতেন, তবে এই ছবি যথেষ্ট রেখাপাত করতে পারতো। ছবির গঠন পর্যায়ে কিছু কিছু অসামঞ্জস্য চোখে পড়ে। আরো চিন্তা করে সম্পাদনা করলে হয়তো ছবির গতি কিছুটা দ্রুততর হতে পারতো। চরিত্র রূপায়ণে কালী ব্যানার্জী ডাঃ সান্যালের ভূমিকায় এবং মঞ্জুলা সরকার নমিতার চরিত্রে যথাযোগ্য অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে অসীমকুমার, দীপক মুখার্জী, জহর রায়, গীতা মুখার্জী, স্বাগতা চক্রবর্তী, সত্য ব্যানার্জী প্রমুখ অভিনয় করেছেন। একটি চরিত্রে বহুদিন পরে চন্দ্রাবতী দেবীকে দেখা গেছে। দুটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাসকে দেখেও দর্শকরা আনন্দলাভ করবেন।

নেপাল সম্পর্কে প্রামাণিক চিত্র

বৃটিশ অভিনেত্রী অ্যানটড নেপালে পাঁচ সপ্তাহ অবস্থান করে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেছেন। চিত্রটির নাম 'থাণ্ডার ইন হেভেন'। চিত্রটি সম্পর্কে শ্রীমতী টড বলেন, 'নেপালে অমরলাল নামে এক বালকের সাক্ষাৎ পাই। অমরলাল আমাকে অর্থাৎ পশ্চিমজগতের মানুষকে দেখিয়েছে নেপালের সৌন্দর্যময় স্থানগুলি। ছবির

ভারতীয় চিত্রজগতে এই প্রথম !

কালকাতার সহিত একযোগে লণ্ডনেও চালবে

১৪ই আগষ্ট শুভারম্ভে

ক্যাপস্ রিলিজ

নতুন তীর্থ

সঙ্গীত : হেমন্তকুমার
কাহিনী : বিধায়ক ভট্টাচার্য
চিত্রনাট্য : নীলিমা মুখার্জি

রূপায়ণে : উত্তমকুমার
সুলতা, মলিনা, ছায়া, তপতী
সুব্রতা, রেণুকা, প্রতিমা, তরুণকুমার, রবি ঘোষ
জহর, অমিত, পিণ্টু, দিলীপ, মন্মথ, রতন, সাধন
শিশির, চন্দ্রশেখর, অজিত, অরুণ, সুনীলেশ, ভানু, অমূল্য ও মাঃ শঙ্কর

ক্ল্যাসিক • উত্তরা • পূরবী • উজ্জ্বলা

(লণ্ডন) : প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টায়

পদ্মশ্রী • সুচিত্রা • যোগমায়া • অলকা • লীলা • জয়শ্রী
উদয়ন • কল্যাণী • শ্রীদুর্গা • গৌরী • মীনা

প্রধান অভিনেতা অমরনাথ এবং আশা।

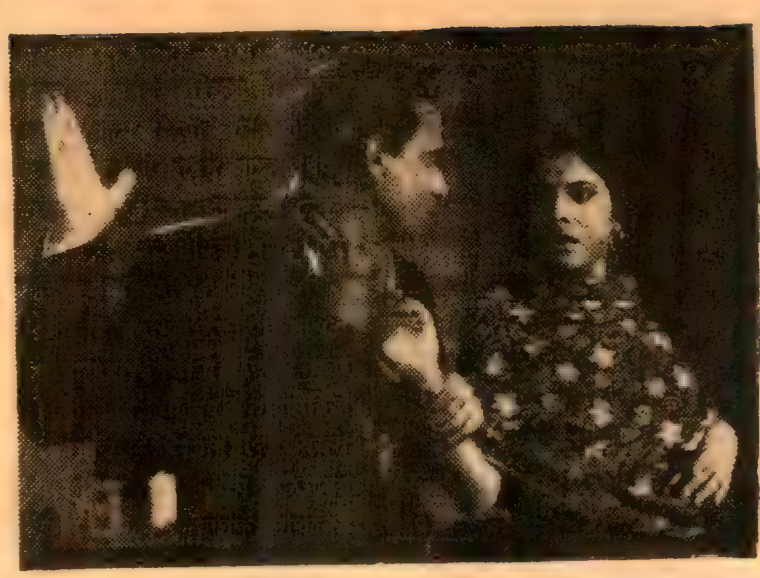

● 'নতুন তীর্থ' ছবিতে অসিত দে ও সুলতা চৌধুরী

নাটকের কথা

ইউরোপে সেক্সপীয়র নাটক

গত ১০ই আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটারে এক অনুষ্ঠানে অভিনেতা-পরিচালক উৎপল দত্ত ইউরোপে সেক্সপীয়র নাটক সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সম্প্রতি তিনি ও শ্রীমতী শোভা সেন বৃটেন ও পূর্ব জার্মানী পরিভ্রমণ করেছেন। শ্রীদত্ত বলেন, আজ সেক্সপীয়র নাটক যোগ্য মর্যাদার সাথে কোথাও যদি অভিনীত হয়ে থাকে, তবে তা বৃটেন ছাড়া ইউরোপের অন্যত্র। পূর্ব জার্মানী এবং বার্লিন ব্রেখট-এর থিয়েটার এ ব্যাপারে অগ্রগণ্য। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ইংল্যাণ্ডে বিট-নিকদের উৎপাত এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয়বাদের শোচনীয় চিত্র প্রকাশ করেন। বক্তৃতার পরে সেক্সপীয়রের 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' অভিনীত হয়। এই নাটক অভিনয়ে লিটল থিয়েটার গ্রুপের শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন' একটি সার্থক অভিনীত উপভোগ্য নাটক। বিশেষত অনুবাদের সারল্যে ও উপযুক্ত শব্দচয়নে নাটকটি দর্শকদের মাতিয়ে রাখে। রূপময় দৃশ্যসজ্জা এবং আলোর মায়ায় রচিত এক স্বপ্নলোকের পরিবেশ যে কোন বয়সের দর্শকের পক্ষে উপভোগ্য।

পাঠকরা সুযোগ পেলে নাটকটি দেখতে পারেন।

● বর্ধমান সঙ্গীত সম্মেলনে শিল্পী ও শ্রোতাদের সমাবেশ করছেন

স্টুডিও খবর

বিমল মিত্রের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' বৃহৎ উপন্যাসটিকে চিত্ররূপ দেবার জন্য অগ্রসর হয়েছেন পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী। তিনি চিত্র-নাট্য রচনার কাজে হাত দিয়েছেন। শীঘ্রই চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হবে। শ্রীগাঙ্গুলী ইতিপূর্বে 'সন্ধ্যারাগ' ও 'দুই নারী' পরিচালনা করেছেন।

• বিমল মিত্রের আর একটি গল্প 'রঙ বদলায়' চিত্ররূপ লাভ করবে। এই গল্পটির চিত্ররূপায়ণে অগ্রসর হয়েছেন মঙ্গল চক্রবর্তী।

• স্টার থিয়েটারে অভিনীত 'তাপসী'কে চিত্ররূপ দেবার কথা চিন্তা করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের প্রযোজনায় নাটকটি নাকি চিত্ররূপ লাভ করবে।

• মঞ্জু দে 'অভিশপ্ত চম্বল'কে চিত্ররূপ দেবেন শোনা গিয়েছিল। এখন জানা যাচ্ছে 'অভিশপ্ত চম্বল' ছাড়াও তিনি রাজকুমার মৈত্রের 'রক্তজবা'র চিত্ররূপ দেবেন।

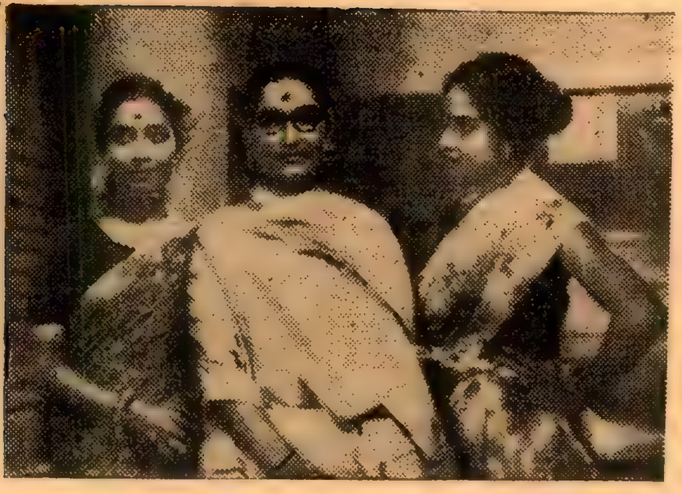

● 'বিংশতি জননী' ছবিতে লতিকা দাশগুপ্ত, গীতা চ্যাটার্জী, মাধবী মুখার্জী

• আশাপূর্ণা দেবীর 'দোলনা'র চিত্রগ্রহণের কাজ সুরু হয়েছে পম্পি ফিল্মসের প্রযোজনায়। পরিচালনা করছেন পার্থপ্রতিম চৌধুরী

সংবাদবরনা

জাগতে রহো

রাজকাপুরের 'জাগতে রহো' ছবিটি সোভিয়েট ইউনিয়ন পাঁচ বছরের জন্য কিনে নিয়েছেন। ছবিটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রদর্শিত হবে। রাজকাপুরের সাথে আর একটি চুক্তিতে 'আওয়ারা' ও 'শ্রী ৪২০' সোভিয়েটে পুন: প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে।

'এ নেশন ইজ মার্চিং' নামক ভারত সম্পর্কিত একটি ছবি নিউ-ইয়র্কে প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্রেস ক্লাবে ছবিটি প্রদর্শনের পূর্বে মহাত্মা গান্ধীজীর পৌত্র শ্রীরাজমোহন গান্ধী ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দেবেন। শ্রীরাজ-মোহন স্বর্গীয় দেবদাস গান্ধীর পুত্র।

● 'নিশাচর' ছবিতে স্মিতা মজুমদার

চলচ্চিত্রে সিংহল

এক আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানী সিংহল সম্পর্কে একটি প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করছে। এই ছবিতে সিংহলের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হবে।

দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মহাজাতি সদনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। দুই দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকগণ শুভেচ্ছাজ্ঞাপক ভাষণ দান করেন এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন: সর্বশ্রী গিরীন চক্রবর্তী, মায়া সেন, রাধারাণী দেবী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নির্মলেন্দু চৌধুরী, সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়। কাজী সব্যসাচী বিদ্রোহী কবি নজরুলের রচনা 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' পাঠ করেন।

এম জি এণ্টারপ্রাইজের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটকে খ্যাতা অভিনেত্রী মলিনা দেবী অংশ গ্রহণ করেন। সর্বশেষে মৃণাল রায়ের বাদু নাটক 'মায়ামহল' অভিনীত হয়।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ চুয়াল্লিশ ॥

অবিস্মরণীয় অভিনয়

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কেবলমাত্র সে-যুগের একজন নামকরা অভিনেতাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহু গুণের অধিকারী। একাধারে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতারূপে তিনি যেমন দর্শকদের আস্থাভাজন ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে দর্শকদের মধ্যে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রাচীর-পত্র ও হ্যাণ্ডবিলে নিত্য-নতুন ভাষার চটক, সাধারণ মানুষকে থিয়েটারের প্রতি অনুরাগী করে তোলার জন্যে 'রঙ্গালয়', 'নাট্য-মন্দির' পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যে-সব কাজ তিনি করে গেছেন, তার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, থিয়েটারকে শুধু তিনি সেই দুর্দিনে বাঁচিয়েই রাখতে চান নি, সেই সঙ্গে জনপ্রিয়ও করে তুলতে চেয়েছিলেন।

আর এই সব কাজের জন্যে তাঁকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থায় প্রচুর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তাঁকে নীরবে সইতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিচলিত চিত্তে তিনি তাঁর কর্তব্য করে গেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ ২৭ বছর বয়সে রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং ৪০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মাত্র ১৩ বছর তিনি রঙ্গালয়ের সেবা করে গেছেন। এই অল্পকালের মধ্যে অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকাররূপে তিনি যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তেমনি রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য তাঁর সর্বপ্রকার প্রযত্ন নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

অমরেন্দ্রনাথের সেদিনের সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই যে আজকের নাট্যশালা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের অপরিসীম নিষ্ঠা ছিল। কেবলমাত্র শিল্পের প্রতিই তাঁর দরদ ছিল না। সেই সঙ্গে শিল্পকে যাঁরা বাঁচিয়ে রাখেন, অর্থাৎ দর্শক; তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

১৯১৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ষ্টার থিয়েটারে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার কিছুদিন আগে থেকেই তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত মহলা দেওয়ার কাজে তাঁর শরীর আরো ভেঙে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু সকলের সব অনুরোধ উপেক্ষা করেই তিনি যথারীতি কাজ করতে থাকেন। ভাঙা শরীরে শুধু নাটক পরিচালনার দায়িত্বই তিনি বহন করেন নি, সেই সঙ্গে 'সওদাগর' নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করেন।

যাই হোক, ৪ঠা ডিসেম্বর নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর তাঁর শরীর আরও ভেঙে পড়ে।

১১ই ও ১২ই ডিসেম্বরের প্রাচীরপত্র ও হ্যাণ্ডবিলে ঘোষণা করা হয় যে, ১১ই 'সওদাগর' নাটকে অমরেন্দ্রনাথ কুনীরকের ভূমিকায় এবং ১২ই ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু ১১ই তারিখে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে রক্তবমি করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও তিনি বাড়ি গেলেন না। থিয়েটারেই শুয়ে রইলেন। অমরেন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—কুঞ্জ চক্রবর্তী মশাই।

কিন্তু দর্শকেরা কুঞ্জবাবু মঞ্চাবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হট্টগোল শুরু করে দিলেন। দর্শকদের কিছুতেই বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না যে, সত্যিই অমরেন্দ্রবাবু অসুস্থ।

অমরেন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই আঁচ করেছিলেন যে, দর্শকেরা গোলমাল করতে পারে। আর সেই কারণেই তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে থিয়েটারে পড়েছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ শয্যা ছেড়ে, মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর অসুস্থতার কথা দর্শকদের কাছে নিবেদন করলেন এবং সেই সঙ্গে জানালেন—দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্যে তিনি একটি অঙ্ক অভিনয় করবেন। দর্শকেরা অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। অমরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে একটি মাত্র অঙ্ক অভিনয় করে শয্যা নিলেন।

পরের দিন ১২ই ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে তাঁকে সকলেই অভিনয় করতে বারণ করলেন। কিন্তু আগের দিন রাত্রের ঐ ঘটনার পর তিনি আর কারুর কথা শুনলেন না। ঔরঙ্গজেবের 'মেক-আপ' নিয়ে সাজপোষাক পরে, মঞ্চে এসে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। প্রথম অঙ্ক কোন রকমে অভিনয় করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন রক্তবমি শুরু হোল যে, তিনি আর উঠতে পারলেন না। দর্শক-দরদী শিল্পীর ঔরঙ্গজেবের অসমাপ্ত অভিনয়ই—শেষ অভিনয়।

এর পঁচিশ দিন পরে অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে অমরেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুর দিন দুই আগে থেকেই তাঁর অবস্থা খারাপ হয়। আত্মীয়-বন্ধুরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অমরেন্দ্রনাথের বাড়ির নীচের তলায় বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন। সহসা মৃত্যুর দিন সকালে বাড়ির সদর দরজার দিক থেকে সমবেত কণ্ঠের কান্না ভেসে এলো। সকলেই মনে করলেন অমরেন্দ্রনাথের জীবন-দীপ বুঝি নির্বাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন বোঝা গেল, কান্নার রোল ওপরতলা থেকে আসছে না, তখন সকলে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল, কতকগুলি অন্ধ ও পঙ্গু ভিখিরির দল কাঁদছে আর বলছে, আমাদের কি গতি হবে? আমরা যে বাবুর দয়ায় বেঁচে আছি। এরপর কে আমাদের খেতে দেবে?

তাদের কথা শুনে, সকলে বিস্মিত। স্তম্ভিত।

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের যবনিকা নেমে আসার কিছুক্ষণ আগে জানা গেল, মঞ্চের বাইরে তিনি কি মহৎ অভিনয় করে চলেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

মঞ্চের আলোকসম্পাতের কথা উঠলেই Adolphe Appia-র (1862-1928 জাতে Swiss) সম্বন্ধে দু'এক কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ওয়াগনারের অপেরার স্টেজ-সেটিং-সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে এপিয়া শুধু স্টেজ ডিজাইনের মূল কথা বলেই ক্ষান্ত হন নি—সঙ্গে সঙ্গে আলোকনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে সব সারগর্ভ কথা বলে গেছেন তারই বিবর্তিত রূপ আমরা দেখতে পাই আজকের দিনের ইউরোপের স্টেজ-লাইটিং-এ। এপিয়াই প্রথম দেখিয়ে দেন যে, মঞ্চাভিনয়ে আলোর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার আবশ্যকতাও কম নয়। ছায়াকে তিনি আলোর complement হিসাবেই দেখতেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি একটি অপেশাদারী দল—সন্ধ্যানীড় সংস্থা থেকে আমি কয়েকবার মঞ্চস্থ করিয়েছি। 'রাজা' একটি সব দিক দিয়ে সার্থক সাঙ্কেতিক নাটক। প্রচুর খরচ পড়বে বলে মঞ্চসজ্জার দিকটায়

শিলালি

আমরা নজর দিতে পারি নি—black curtain পেছনে রেখে অভিনয় করতে হয়েছে। কিন্তু এ-কথা আমার বার বার মনে হয়েছে, ঠিকভাবে যদি মঞ্চসজ্জা করতে পারতাম নাটকটির বক্তব্য অনেক বেশি সুস্পষ্ট করা যেত।

ধরুন—অন্ধকার ঘরে রাজা, রাণী সুদর্শনার সঙ্গে মিলিত হন। এ নাটকের রাজা বলতে ঈশ্বরকেই বোঝায়—আর সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক। যে ঘরে তাঁদের মিলন, সেই অন্ধকার ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। অর্থাৎ পৃথিবীর জড়-সত্তাকে অতিক্রম করে তার ভেতরের রহস্যের উৎসস্থলে যেতে পারলেই মানবাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য প্রস্তুত হতে পারবে। আমার বার বার মনে হয়েছে ঘরটিকে যদি খুব high ceilinged হিসাবে দেখানো যায় এবং তলা থেকে খুব লম্বা কয়েকটি থাম বসিয়ে দেওয়া যায়—থামগুলো মোড়া থাকবে চক্‌চকে কালো কাপড়ে এবং face-টা হবে সোনালী রং-এর—সুদর্শনা এবং সুরঙ্গমা যখনই অন্ধকার ঘরে আসবেন তখন আলোর খেলায় যেমন তাঁদের মাধুর্যকে ফুটিয়ে তোলা হবে চোখের সামনে, তেমনি তাঁদের ছায়াগুলোও এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে একটা রহস্যময়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয় মঞ্চের উপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অপেশাদারী দলের পক্ষে এ-ধরণের মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, যদি ভবিষ্যতে কোন পেশাদারী মঞ্চ কবিগুরুর 'রাজা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন তাঁদের পক্ষেই সম্ভব হবে সাঙ্কেতিক মঞ্চরীতি অনুসারে নাটকটিকে ঠিকভাবে produce করা।

অভিনয়ে আলো-ছায়ার খেলা

পাঠক মন

প্রথমেই আপনার সুসম্পাদনার জন্য জানাই ধন্যবাদ। অনেক পত্রিকাতেই দেখেছি বাজারে সুনাম অর্জন করার জন্যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাতে। কিন্তু বেশিরভাগই সাফল্য-লাভ করতে না পেরে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এ বিষয়ে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সাফল্যলাভ করেছে এবং সেটা নিঃসন্দেহে সম্ভব হয়েছে মাননীয়া সম্পাদিকার সুসম্পাদনায়। যাই হোক, একটু প্রশংসা করে পত্রিকায় নাম ছাপান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বহুদিনকার বাসনা তাঁকে (সম্পাদিকাকে) জানাব আমার অন্তরের শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ। কিন্তু সেটা সম্ভব হত না—যদি না আপনি 'পাঠকমন' নামক একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করতেন। হ্যাঁ, সত্যি কথা। অন্যান্য পাঠকের মত আমিও বিশ্বাস করি যে, এটার প্রয়োজন আছে। আমি একজন বাণিজ্যের ছাত্র। সুতরাং আমার চেষ্টা হচ্ছে কি করে দেশ-বিদেশের খবর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায়, এ-সম্পর্কে আমি বহুদিন চেষ্টা করেও এমন কোন স্বল্পমূল্যের পত্রিকা পাই নি, যা থেকে আমার জ্ঞানের পরিধি বাড়তে পারে। ইংরাজী ভাষায় পুস্তিকা বা পত্রিকা আছে বটে, তবে তা আমার মত একজন ছাত্রের পক্ষে—যার কোন source of income নেই—কিনে পড়া সম্ভব নয়। তাই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশের দিন থেকে আমি একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছি। অবশ্য বাণিজ্যের ছাত্র হলেও আমার মনটা নিশ্চয়ই নীরস নয়। সাহিত্যও আমি ভালবাসি। সেইজন্যই বোধহয় আগরপাড়ার রবীন্দ্র পাঠাগারের স্থাপনা বিষয়ে আমি যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছি এবং তাতে সাপ্তাহিক বসুমতী নিয়মিত সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছি। এইবার পত্রিকার কিছু গুণাগুণ আপনাকে জানাব, যা আমার ভাল লেগেছে বা খারাপ লেগেছে। আমি বিশ্বাস করি—কাজ করতে গেলেই তাতে ভুল থাকবেই, তবে ক্রমশ সেই ভুল সংশোধনের চেষ্টাই হচ্ছে মহৎ প্রচেষ্টা। এ বিষয়ে সাপ্তাহিক বসুমতী অপূর্ব নজির স্থাপন করেছে। আর বর্তমানের ভেজালের দিনে, ভেজালের অবাধ গতিবিধিতে আপনার সুদৃঢ় বক্তব্য মনের মধ্যে আলোড়ন তোলে। তবু ভয় হয়, হয়ত বা আপনার বক্তব্যেও ভেজাল ঢুকে পড়তে পারে। বিশ্বাস নেই। কারণ, আমাদের মনের মধ্যেও যে ভেজাল আছে—আমাদের সরকারের সুপরিচালনায়। যাই হোক, আমি যদি বেশি মাত্রায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে ফেলি তবে মাননীয়া সম্পাদিকা নিশ্চয়ই নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।

পত্রিকাটি বৃহস্পতিবার সকালে আমার হাতে পৌঁছান মাত্র আমি অন্য সব কিছু কাজ ভুলে যাই। যতক্ষণ না সমস্ত পত্রিকাটি নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ অন্য কাজে মন বসে না। পত্রিকা দেরিতে এলে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠি। শুধু আমি নয়, আমার বাড়ির প্রত্যেকেই। যাই হোক, এবার আমার কিছু দাবীর কথা জানাই। প্রথমত ভ্রমণকাহিনী মাঝে মাঝে দু-একটা দেন। কিন্তু ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী যদি দিতে পারেন ভাল হয়। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নোত্তরের আসরের ব্যবস্থা করলে আনন্দিত হব। তৃতীয়ত, শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা (বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদদের দ্বারা) ইত্যাদি। তবে পত্রিকার ছাপার দিকে একটু নজর রাখা আবশ্যক বলে মনে করি। মাঝে মাঝে ছবিগুলো একেবারেই বোঝা যায় না। তবে, এখন পত্রিকা আগের থেকে আরও উন্নত। মাঝে মাঝে আমি পূর্ব-প্রকাশিত পত্রিকার সঙ্গে বর্তমানের পত্রিকার তুলনা করে দেখি, দেখে সত্যিই বিস্মিত হই যে, কি করে এত স্বল্পমূল্যে এ রকম উন্নতি সম্ভব? ইতি—

শ্রীপ্রতাপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বাদামতলা রোড, আগরপাড়া
পো: কামারহাটি, ২৪ পরগণা

• • •

'সাপ্তাহিক বসুমতী' আমার ভাল লাগে। কারণ:

(ক) এর সম্পাদকীয় বক্তব্য ঋজু, বলিষ্ঠ নির্ভীক ও সত্যনিষ্ঠ;

(খ) এর কয়েকটি বিভাগ 'আজকের মানুষ' 'ভারত দর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', প্রভৃতি অভিনব প্রথায় সাংবাদিক তথ্য পরিবেশনের প্রশংসনীয় উদ্যম;

(গ) এর বিশেষ সংখ্যাগুলো—যা বিশেষ বিশেষ মনীষীর সৃষ্টি ও জীবনবেদকে পরিস্ফুট করে তোলার সার্থক প্রচেষ্টা—পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও জ্ঞানান্বেষা চরিতার্থ করে;

(ঘ) এতে নতুন ও অচেনা লেখক-লেখিকার হৃদয়গ্রাহী রচনা স্থান পায়;

(ঙ) এর 'রঙ্গজগৎ', 'খেলাধুলা' প্রভৃতি বিভাগ মনের বিভিন্ন রুচির চাহিদা মেটায়;

(চ) এর কলেবরে বিজ্ঞাপনের ক্ষতচিহ্ন অসহনীয় নয়;

(ছ) অন্যান্য সমগোত্রীয় পত্রিকার তুলনায় এর দক্ষিণা কম (প্রায় অর্ধেক)।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' আমার আরও ভাল লাগবে, যদি:

(ক) এর ছাপা ও কাগজ আর একটু উন্নত ধরণের হয় (ইতিমধ্যে অবশ্যই কিছুটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে);

(খ) ধারাবাহিক রচনার সংখ্যা কমিয়ে (বর্তমানে সাতটি চলছে), গল্প ও কবিতার সংখ্যা বাড়ানো হয়;

(গ) প্রতি সংখ্যায় না হলেও মাঝে মাঝে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

শ্রীমণীন্দ্রকুমার সরকার,
অডিট অফিস, আদ্রা, পুরুলিয়া।

খেলা ধুলা

সংক্রামক ব্যাং

পয়েন্ট ম্যানেজের নোংরা ব্যাধি বর্তমানে সংক্রামিত হয়েছে কলকাতা ময়দানের আনাচে-কানাচে, তাঁবুতে-তাঁবুতে। প্রথম ডিভিসন থেকে স্বরু করে চতুর্থ ডিভিসন পর্যন্ত লীগের ওঠানামার ব্যাপারে পয়েন্ট ম্যানেজের জঘন্য খেলা আজ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। কলকাতা ময়দানে গড়াপেটা খেলা আজকে নতুন নয়; আই-এফ-এর একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তার স্নেহধন্য প্রথম ডিভিসনের একটি ক্লাবই এই নোংরামির স্রষ্টা বলা চলে। পয়েন্ট ম্যানেজের ব্যাপারে এই ক্লাবটি বর্তমানে যথেষ্ট দুর্নাম অর্জন করেছে। আর এই ক্লাবটির পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করছে ময়দানের আরও কয়েকটি দল। অবনমনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এরা কখনও বা অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে, কখনও বা ভিক্ষা করে পয়েন্ট সংগ্রহ করছেন। মনে তাই প্রশ্ন জাগে যে, প্রথম ডিভিসনে টিকে থাকার জন্য শেষ পর্যন্ত যদি এই নীচ এবং জঘন্য পন্থা অবলম্বন করতে হয় তবে এত করে খেলোয়াড় সংগ্রহ করাই বা কেন, আর কোচ রেখে অনুশীলন করাই বা কেন, প্রথম থেকেই ম্যানেজ করার অভিনব পন্থাগুলি শিক্ষাদান করলেই হয়। এই মরশুমে, একটি ম্যানেজ গেম বা গড়াপেটা খেলা দেখার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল। পয়েন্ট ভাগাভাগি আগে থেকেই ঠিক ছিল। এরই একটি দলের সেন্টার ফরোয়ার্ড একটি গোল করে কপাল চাপড়ে এমন একটি বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করলেন যার নজীর বোধহয় খেলার ইতিহাসে নেই, মনে হল তিনি যেন একটা বিরাট অন্যায়, মারাত্মক ভুল করেছেন। এই ধরণের নোংরামি যদি কলকাতা ময়দানে অবাধে চলতে থাকে, তবে ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতা ময়দানের খেলার মান যে কোথায় নামবে তা ভাবতেও শঙ্কা লাগে। ক্ষমতালোলুপ, স্বার্থপর কয়েকজন ক্রীড়াপরিচালক এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের দুরভিসন্ধি-মূলক কার্যকলাপের ফলে নষ্ট হতে চলেছে খেলাধূলার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নষ্ট হতে চলেছে খেলার মান, কলঙ্কিত হতে চলেছে কলকাতা ময়দানের সুনাম।

ময়দান ফুটবলের তরুণ প্রতিভা

কথায় আছে গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। কলকাতা ময়দানে দল গঠনের ব্যাপারে বড় বড় দলগুলি সব সময়ই এই নীতি অনুসরণ করছেন। বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড়দের দাবী তাঁরা উপেক্ষা করে মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লীর আমদানী করা খেলোয়াড়দের দলে ভেড়াবার চেষ্টা করেন। এর জন্যে বড় বড় দলগুলির মধ্যে বেশ রেষারেষি চলে এবং একে অন্যের ওপর টেক্কা দিতে গিয়ে জলের মত পয়সা খরচ করেন। তাঁরা দেশের স্বার্থের চেয়ে ক্লাবের স্বার্থ বড় করে দেখেন। তাঁদের এই কার্যকলাপের সমালোচনা করার কিছুই থাকত না যদি আমরা দেখতাম বাইরের ভালো খেলোয়াড়ের খেলা দেখে বাংলার ছেলেরা ভাল খেলা শিখছে। কিন্তু সেদিকে এঁদের কোন প্রচেষ্টাই নেই। বরং ছোট ছোট দলগুলি বাংলার ছেলেদের নিয়ে দল গঠন করেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, হ্যাঁ বাঙালী তরুণরাও কম যায় না। বর্তমানে কলকাতা ময়দানে বহু তরুণ প্রতিভা আছেন, যাঁরা আজ উপেক্ষিত। আমরা এই তরুণদের মধ্যে থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের কথা পাঠকদের জানাব।

এরিয়ানের উদীয়মান রাইটব্যাক আলেখ্য ঘোষালের জীবন আলেখ্য দিয়েই স্বরু করছি। আলেখ্যর জন্ম এই কলকাতাতেই ১৯৪৩ সালে। ছেলেবেলা থেকেই খেলাধূলার দুর্বার আকর্ষণ আর খোলা মাঠের হাতছানি তাঁকে পাগল করে তুলত। পার্কে ছেলের দলের সঙ্গে ভিড়ে ফুটবল খেলতেন, আর সুযোগ মত চলত ব্যাটবল

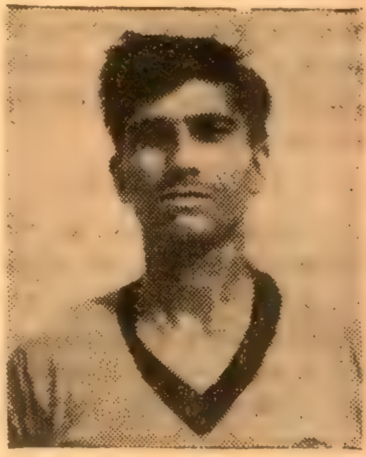

আলেখ্য ঘোষাল

নিয়ে ক্রিকেট আর হকির মহড়া। দক্ষিণ কলকাতার তীর্থপতিতেই কেটেছে তাঁর স্কুল জীবন। স্কুলের ক্রিকেট আর হকি দলের তিনি ছিলেন নিয়মিত খেলোয়াড়, ফুটবলে যদিও স্কুল-জীবনে তিনি ততটা সুযোগ পান নি। স্কুল-জীবন সাঙ্গ করে এলেন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। ফুটবল নিয়ে এই সময় উঠে পড়ে লাগলেন, আর ফলও পেলেন হাতে হাতে। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ দলে ফুটবলে স্থান জুটে গেল। তিনি যে শুধু খেলাধূলার সাধনায় মত্ত ছিলেন তা নয়

সাথে সাথে সরস্বতীর আরাধনাও এক-নিষ্ঠভাবে করে গিয়েছেন। গোয়েঙ্কা কলেজ থেকে বাণিজ্যে স্নাতক হয়ে এলেন ল' কলেজে। ল' কলেজেও ফুটবল হকি ক্রিকেটে কলেজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করলেন।

ময়দান ফুটবলে তাঁর যাত্রা সুরু ১৯৫৯ সালে ইয়ংবেঙ্গলের পক্ষে। পরের বছরই প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ ঘটল খিদিরপুরের হয়ে। ১৯৬০-৬২ সাল পর্যন্ত এখানেই কাটালেন। এই সময়ে একবার হাঙ্গেরিয়ান কোচ ভার্গা আসেন কলকাতায়, তাঁর কাছে আলেখ্যর কিছুদিন শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে। ডাক এল এরিয়ান্স থেকে, ১৯৬৩ সালে নতুন আশা নতুন স্বপ্ন নিয়ে যোগ দিলেন এরিয়ান্সে। এই মরশুমে তিনি এরিয়ান্সের পক্ষে নিয়মিত খেলছেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন এবং উচ্চাঙ্গের খেলা উচ্ছ্বাসতভাবে প্রশংসিত হয়েছে কলকাতা ক্রীড়ামোদী মহলে। এরিয়ান্সের কোচ শচীন হালদারের আন্তরিক সহযোগিতা এবং নিজের নিরলস সাধনা, সংযম এবং অধ্যবসায়ের জোরে তিনি আজ এগিয়ে চলেছেন। তাঁর খেলোয়াড়ী জীবন সাফল্যমণ্ডিত হোক, সফল হোক তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের স্বপ্ন।

চ্যারিটির সমাচার

দুই প্রধান মোহনবাগান আর ইষ্ট-বেঙ্গলের ফুটবল যুদ্ধ কলকাতার সাধারণ মানুষের মনেও জাগায় সাড়া, আনে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে একটা নতুনত্বের স্বাদ। সমর্থক মহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত থাকে না; এই ফুটবল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই তার উত্তেজনার আগুন পোহায়। বাংলা বীণের দোলাতে এই খেলাও বর্তমানে আমাদের গৃহের অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করেছে। দুই প্রধানের চ্যারিটির পর বহুবার একটি বিচিত্র দৃশ্য আমার চোখে পড়েছে। মোহনবাগানের পরাজয়ে রাস্তার মোড়ে দ্রষ্টব্য স্থানে অথবা ল্যাম্প পোষ্টের সঙ্গে ঝুটো ঘটি আর চিংড়ি মাছ ঝুলতে দেখেছি; কিন্তু আশ্চর্য মোহনবাগানের জয়ে কোথাও ইলিশ মাছ ঝুলতে দেখলাম না—অবশ্য বর্তমানে তা সম্ভব নয়, কারণ মাছের যা আকাল। চিরশত্রু মোহনবাগানের হাতে এই শোচনীয় পরাজয় ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থকদের বুকে খুবই বেজেছিল, নইলে

● দুই অধিনায়কের করমর্দন

শেষ মুহূর্তে দেওয়া দাসচৌধুরীর গোলটির স্বাদ তাদের কাছে বড়ই তিক্ত লেগেছিল, উল্লাসধ্বনি গলা দিয়ে বেরোয় নি বেরিয়েছিল ৩—১ গোলে পরাজয়ের একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস।

চ্যারিটির ফুটবল যুদ্ধে এত সহজে ইষ্টবেঙ্গলকে নাস্তানাবুদ করে মোহনবাগান বাজীমাৎ করে দেবে এটা বোধ হয় ইষ্টবেঙ্গলের অতিবড় শত্রুও কল্পনা করতে পারে নি।

ইষ্টবেঙ্গলের পরাজয়ের জন্য অনেকেই গোলরক্ষক কমল সরকারকে দায়ী করছেন বটে, কিন্তু তাঁদের এই ধারণা একেবারেই ভুল এবং বলতে গেলে পরাজয়ের কোন্তপ্রসূত। কমল সরকার এই মরশুমে তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারছেন না, অবশ্য তাঁর এই ব্যর্থতার জন্য উগ্র সমর্থক এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষও পরোক্ষভাবে কতকাংশে দায়ী। ষ্টপারের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ক্লাব কর্তৃপক্ষ তিনজন খেলোয়াড়কে বদলে বদলে খেলাচ্ছেন, ফলে কোন খেলোয়াড়ই নিজেকে ঠিক খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না এবং ইষ্টবেঙ্গলের রক্ষণ-ভাগ দুর্বল হয়ে পড়ছে। চ্যারিটির দিন বর্ষণসিক্ত মাঠে মোহনবাগানের আক্রমণ-ভাগের দুর্বার গতিবেগের কাছে নতি স্বীকার করেছে ইষ্টবেঙ্গলের সংহতিহীন রক্ষণভাগ। প্রশান্ত সিনহা, রামবাহাদুর, মুস্তাক আমেদ, চন্দন ব্যানার্জী কেউই খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি।

মোহনবাগানের পুরোভাগে অধিনায়ক চুনী ছিলেন অপ্রতিরোধ্য; অশোক চ্যাটার্জী এবং অরুময়ও অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। খেলার সূচনায় অশোক চ্যাটার্জীর প্রথম গোল, সপ্তম মিনিটে চুনীর দ্বিতীয় গোল ইষ্ট-বেঙ্গলের মনোবল একেবারে ভগ্ন করে। দ্বিতীয়ার্ধে অরুময় তৃতীয় গোল করে দলের জয়লাভ নিশ্চিত করেন। খেলার শেষ মিনিটে জোরালো সটে শম্ভু দাস-চৌধুরী বর্মনকে পরাস্ত করেন। লীগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় লীগের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ৩—১ গোলে পরাজিত করে মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান-শীপের পথ সুগম করল। পরবর্তী দুইটি খেলায় মোহনবাগান উয়াড়ীকে ১—০ গোলে এবং বাটাকে ২—০ গোলে পরাজিত করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ইষ্টবেঙ্গল স্পোর্টিং ইউনিয়নকে ৪—০ গোলে এবং পোর্ট কমিশনার্সকে ২—১ গোলে পরাজিত করে অপেক্ষা করছে শেষ খেলায় ইষ্টার্নরেলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। ইষ্টবেঙ্গলের শেষ আশা যদি মোহনবাগান বি-এন রেলের কাছে পরাজিত হয় শেষ খেলায়।

—শ্রীঅমিতাভ

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শুভমুক্তি ২৮শে আগষ্ট !

BAHAR FILMS
PRESENT

নন্দা
ধর্মেন্দ্র
শশীকলা
বাবলু
ওমপ্রকাশ

মেরা কসুর ক্যা হ্যায়

পরিচালনা
কৃষ্ণন পাঞ্জু

গীত রচনা
রাজেন্দ্র কৃষ্ণ

সঙ্গীত
চিত্রগুপ্ত

॥ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশনা ॥

হিন্দ - বীণা - বসুশ্রী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

21 AUG 19[illegible]

সাপ্তাহিক
বসুমতী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

এবার নুনের পালা

বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 27th August, 1964 • Vol. 69, No. 1

ত্বকের মসৃণতা ও কোমলতায়

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

756.3
005/3
V.69
No. 14

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৮৩৫
আজকের মানুষ	...	৮৩৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৮৩৭
ভারতদর্শন	...	৮৪১
আজকের আমেরিকা	মিনু ভট্ট	৮৪৭
আন্তর্জাতিক	...	৮৫০
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮৫৫
বঙ্গদর্শন	...	৮৫৯
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৮৬২
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৮৬৩
স্বপ্ন আমার (কবিতা)	রঞ্জিত সিংহ	৮৬৪
অন্দরে জলের শব্দ (কবিতা)	পরেশ মণ্ডল	৮৬৪

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৮৬৫
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৮৬৮
"চিঠি" (কবিতা)	অশোক দাশগুপ্ত	৮৬৯
বিনিদ্রিত (কবিতা)	গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৬৯
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৮৭০
অন্য তরঙ্গ	সুব্রত	৮৭৪
হারিয়ে পাওয়া (গল্প)	দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত	৮৭৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৮৭৯
অভিসারিকা (গল্প)	সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮৮৩
রঙ্গজগৎ	...	৮৮৬
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৮৯১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	৮৯২
পাঠক মন	...	৮৯৪
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৮৯৫

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০

৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র ১৩৭১ Thursday, 27th August 1964

এবারে নুন

কথায় আছে : 'যার যতো নুন খাই, তার ততো গুণ গাই ।' এই নুনও এবার বাজার থেকে উধাও হতে চলেছে। নুনের দাম ইতিমধ্যে তিন-চার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খুচরো বাজারে নুনের পরিমাণ প্রায় শূন্যাঙ্কে পৌঁচেছে। চাল, গম, আটা, মাছ, ডাল, তেল ও তরিতরকারী যখন দুষ্প্রাপ্য—তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, নুনের প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? এতোদিন পর্যন্ত অবশ্য নুনের সরবরাহে কোনো রকম ঘাটতি হয় নি। এই ঘাটতি না হওয়ার কারণে কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন—কিছুদিন আগেও ব্যবসায়ীদের গুণ-কীর্তন যথা-নিয়মিত প্রচারিত হোত বলেই, ঐ বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করা হয় নি। কিন্তু অসৎ মজুতদারদের বিরুদ্ধে যেভাবে নিন্দাবাদ সুরু হয়েছে, তাতে নিমকহারাম জনসাধারণের জন্য নুন বন্ধ করা ছাড়া দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের গত্যন্তর নেই। জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই ধরণের অসহযোগিতার ফলে, কিছু সুফল লাভ করা যেতে পারে। অবশ্য যারা রসিক্ ব্যক্তি—তাদেরই মস্তিষ্ক-প্রসূত এই গবেষণা, এতে আমাদের কিছু বলার নেই। আমরা শুধু বলতে চাই, স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ মানুষ নুনের পর নতুন আর কি আশা করতে পারে ?

অথচ ইংরেজ শাসনের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে যে 'লবণ আন্দোলন' হয়েছিল—তা আজ ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন আন্দোলনের কথা মনে রেখেই স্বাধীন ভারতে সাধারণ মানুষকে সস্তায় লবণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে এমন কী অবস্থা ঘটলো যাতে সমুদ্রের জল আজ লবণশূন্য, লবণ হ্রদের পরিকল্পনাও শুধু কল্পনারই ব্যাপার ? তাহলে জনসাধারণ এখন কিভাবেই বা লবণ সংগ্রহ করবে ? আমাদের রাজ্য সরকার খাদ্যের অভ্যাস বদলের ন্যায় একটা বিধান নিশ্চয়ই দান করবেন। কিন্তু আমরা জানি, একমাত্র চোখের জল থেকেই কিছুটা লবণ আপাতত সংগ্রহ করা যেতে পারে। বস্তুত হতভাগ্য দৃষ্টিও যে আজ শূন্য, সেখানে চোখের জলও গড়ায় না। নয়তো শিশিভর্তি চোখের জলের জন্য ন্যায্যদরের দোকানে এতক্ষণ লাইন পড়ে যেতো।

মহাত্মা গান্ধী আজ যদি বেঁচে থেকে দেখতেন, তাঁর সাধের মানুষ—স্বাধীন ভারতে কোন্ দুর্বিপাকে মজুতদারদের হাতে তৈরি ফাঁসির মঞ্চে চলেছে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই অবস্থায় হয়তো আত্মহত্যা করতেন। আর নন্দজী ? তিনি আজ কোন্ দুর্নীতি দূর করবেন ? নীতিবাগীশের ফরমূলার সূত্রে জড়িয়ে পড়ে তিনি নিজেই এখন হাঁসফাস করছেন। আর, কালোবাজারীর দল অবাধে লুণ্ঠন করছে স্বাধীন ভারত।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

খবরটা শুনে খুব একটা বিচলিত না হ'লেও আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে বোধহয় এই প্রথম—বিধানসভার প্রস্তাবে অধিকাংশের সম্মতিক্রমে একজন সদস্যের অপসারণ। মহারাষ্ট্রের বিধানসভার কনিষ্ঠতম সদস্য শ্রী জে বি ধোতে সভাকে ও অধ্যক্ষকে অবমাননার অভিযোগে সভার প্রস্তাবক্রমে তাঁর পদাধিকার থেকে এবারের মত বিদায় নিতে বাধ্য হ'য়েছেন। 'মহারাষ্ট্র-বন্ধের' আন্দোলনে শ্রীধোতে সারা দেশে বিপুল সাড়া এনেছিলেন। গত নির্বাচনে তিনি রাজ্যের ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তাঁর নিকটতম কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীকে আড়াই হাজার ভোটে হারিয়ে রাজ্যের বিধানসভায় নির্বাচিত হ'য়েছিলেন।

ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করবার পর যখন মানুষটার দিকে নজর পড়ল তখন চমৎকৃত না হ'য়ে পারলাম না। কেন না, এমন অনেক মানুষ থাকেন যাঁদের সম্বন্ধে নিশ্চিত নিন্দা বা প্রশংসা কোনটাই চলে না—যাঁরা নিজেরাই নিজেদের একমাত্র পরিচয়। তেমনই এক বিতর্কিত মানুষ শ্রীধোতে।—বলিষ্ঠ শরীরের আড়ালে একটা ইস্পাতের মত মন নিয়ে এখনও অবিচল বিশ্বাসে যিনি বলছেন—'পরের নির্বাচনে আবার তিনি ফিরে আসবেন বিধানসভায়; বিপুল সমর্থন নিয়ে।'—এটা যদি তাঁর ফাঁকা আওয়াজ হয় তবে নিশ্চয়ই নিন্দার। কিন্তু যদি অব্যর্থ বিশ্বাস হ'য়?—ভাবতে হ'বে। তবে তাঁকে দেখলেই যোদ্ধা মনে হ'য়। ওই চাপ চাপ দাড়ি আর তীক্ষ্ণ চোখ তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রম নয়। সবচেয়ে অবাক হ'বার কথা তাঁকে বহিষ্কৃত করায় তাঁর পরোয়া নেই। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে জনৈক কর্মরত সরকারী কর্মচারীকে হত্যার অভিযোগও তাঁকে টলাতে পারে নি। কেন না, এ ধরণের ঘটনার সঙ্গে তাঁর অনেকদিনকার মোকাবিলা—(অথবা) এ সবের সঙ্গে তিনি অভ্যাসবশত জড়িতও।

পাঠ্যজীবনেও তিনি দু'বার বহিষ্কৃত হ'য়েছিলেন—শিবাজী হাই স্কুল আর ইয়তমালের গভর্নমেণ্ট হাই স্কুল থেকে। এরপর উচ্চতর শিক্ষার্থে গিয়েছেন অমরাবতীর কিং এডওয়ার্ড কলেজে। লাঞ্ছনাও যে গৌরবের হ'য়—শাস্তি যে সম্মানের স্বীকৃতি একথা তিনি প্রমাণ করলেন তাঁর ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ঠিক আগে। গোয়ার মুক্তি চাই। মেতে উঠলেন তরুণ ছাত্র ধোতে। সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট, আন্দোলন জাগালেন—কিন্তু গোয়ার হ'য়ে লড়তে গিয়ে সেদিন তাঁর শিক্ষার্থী জীবনের ইতি টানতে হয়েছিল তাঁকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বহিষ্কার করেছিলেন।

এরপর ব্যাপক রাজনীতির জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু যখন জীবনে পড়লই না—তখন দুর্ধর্ষ সাহস, অফুরন্ত উৎসাহই সব সম্বল। তাই সংহার দিয়ে সুরু। সমাজের ত্রাস স্বরূপ কুখ্যাত এক স্থানীয় ব্যক্তিকে ঘায়েল করলেন তিনি। এর পুরস্কার স্বরূপ তিনি জনতার অভিনন্দিত সমর্থনে পৌরসভার সভাপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত হ'লেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হ'য়—তিনি সে সময়ে একটা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। নির্বাচনী সাফল্যের পর তাতে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি রাজনীতিতে যোগ দিলেন।

কৈশোর থেকেই শ্রীধোতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গুণমুগ্ধ। চূড়ান্ত সমাজতন্ত্রের চরম সমর্থক। '৬১ সাল পর্যন্তও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। এর দু'বছর পরে যোগ দিয়েছেন ফরওয়ার্ড ব্লকে।

তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বলেন—'এ পারপিচুয়াল এ্যাজিটেটর', তাঁর জেলার লোকেরা তাঁকে অগাধ শ্রদ্ধা করেন। তিন বছর আগে কর্মকর্তারা তাঁকে বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন বিদর্ভ থেকে। এর বিরুদ্ধে জনতার বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জেগেছিল। শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্র হ'তে হ'য়েছিল কর্মকর্তাদের।

বয়স মাত্র সাতাশ। আর্ত নিপীড়িতের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়ে অপেক্ষায় আছেন কবে এই সমাজের চেহারা বদলাবে।

শ্রী জে বি ধোতে

প্রতিজ্ঞা করেছেন সেদিন না আসা পর্যন্ত বিয়ে করবেন না—কোন সুখ, আরাম নয়, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

বস্তুত শ্রীধোতে আজ আমাদের নতুন করে ভাববার প্রেরণা দিয়েছেন। তাই তাঁকে নিয়ে যত সমালোচনাই উঠুক তাঁর মনের ওই নিখাদ আগুনে আমাদের প্রত্যেকের ক্লিষ্ট মনটাকে সেঁকে নিতে হ'বে। আজকের সমাজের জঞ্জাল পোড়াতে তাঁর একার মনের আগুনটুকুই হয়ত যথেষ্ট নয়।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

জীবনের তীক্ষ্ণ, মধুর উজ্জ্বল মুহূর্তেরা সত্যিই ফেরে না। কেউ ফেরে না, কিছুই ফেরে না। সুখও নয়, দুঃখও নয়। আমরা অভিভূত হই, হাহাকার করি,—তৃপ্তি-অতৃপ্তির দোলনায় দুলতে-দুলতে নিশ্চিত অবসানের দিকে এগিয়ে যাই।

সেই নিশ্চিত নিয়তিতে বাস করেও অপ্রত্যাশিতকে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ বাতিল করতে পারি না। তাই জীবনের উজ্জ্বল সময়কে কখনো বা ফেরাতে চাই, অতীতকে ফিরতে বলি।

কিন্তু ক্রমশ বুঝতে হয় যে, ইতিহাসের পূর্ণ পুনরাবৃত্তি কখনোই ঘটে না। তখন অভ্যাসে-আবিষ্কারে মিলিয়ে ভবিষ্যৎকে মেনে নেবার মেজাজ দেখা দেয়। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের একটি প্রবন্ধের স্মৃতি জেগে ওঠে এই সূত্রে। ১৩৪৮এর ভাদ্র মাসে তাঁর সেই 'বিচিত্রা' বইখানি বেরিয়েছিল। আজ তাঁর অন্যান্য বইয়ের মতন 'বিচিত্রা'ও একালের নবীন পাঠকমনে অনুপস্থিত বলে আশঙ্কা হয়। তাঁর অনুবাদ-কাব্য 'জাপানী ঝিনুক', 'ব্রাউনিঙ-পঞ্চাশিকা', 'শেলী-সংগ্রহ', 'পোল্যাণ্ডের কবি-পরিচিতি' ইত্যাদি মনে রাখবার মতন বই। কিন্তু ক'জন পাঠক মনে রেখেছেন তাঁকে?

শ্রীযুক্ত অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল সুরেন্দ্রনাথের। অবনীবাবু যখন শ্রীরামপুরের মহকুমা-শাসক, তখন তাঁরই বাসভবনে মৈত্র-মশায়ের প্রবীণ বয়সের সাহিত্য-প্রীতির অনেক আলাপ-আলোচনা শুনেছি। আজ তাঁর 'বিচিত্রা'র 'গতানুদর্শন' প্রবন্ধটি তাই মনে এলো। আই-সি-এস অবনীভূষণের নামেই সে-বই উৎসর্গ করেন তিনি। বই খুঁজে নিয়ে প্রবন্ধটি দেখছি। তিনি লিখে গেছেন—

'পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন কিশোর বা যুবক আজ তাঁরা বৃদ্ধ। আমি সেই দলের একজন। পূর্ব ও পাশ্চমের নানা ভাব ও চিন্তার পুঞ্জমেঘে ভরা ছিল আমাদের আকাশ, তার উপর পড়েছিল নবরবির অরুণরাগ আমাদের পূর্বাশায়। আমাদের আশার অন্ত ছিল না। সেটা ছিল রোমাণ্টিক যুগ, অর্থাৎ যখন তুরীয় লোকের স্বপ্নটা জীবনের চেয়ে অধিকতর সত্য মনে হয়।'

বলেছিলেন—

'চিরন্তন সত্য কি, সে তাত্ত্বিক বিচারে এখানে প্রয়োজন নেই। সব দেশে সব সময়েই মানুষের মনে বদ্ধমূল সংস্কার কিছু কিছু থাকে। সেই সংস্কারের বনেদের উপর সমাজসংসার গড়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনযাত্রা মোটা-মুটি নির্বিঘ্নেই চলে। কোনো একটি ধারার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই তার জন্যে একটি পয়ঃপ্রণালী। আমাদের দেহে যে রক্ত চলাচল হচ্ছে, শিরা-উপশিরা তার অলিগলি। এই ধমনীগুলি যদি ফাটে তবে সর্বাঙ্গের অন্তস্তলে হয় রক্তপ্লাবন। প্রাচীন আচারমার্গ কালধর্মে যখন অচল হয়ে আসে তখন সময়োপযোগী নতুন রাস্তা যদি প্রস্তুত না হয় সামাজিক ক্ষেত্রে, তবে বিপ্লবের চলে জলমগ্ন হবার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে।'

১৩৪৮এর আরো পঞ্চাশ বছর আগেকার বাঙালী তরুণ-মনের আত্ম-বিশ্লেষণ আর পরিবেশ-চিন্তা এসব। অর্থাৎ সে আমাদের আঠার শ' নব্বুইয়ের দশকের সংকোচ-ভাবনা। জানি না তাঁর এই ব্যক্তিগত ধারণার সঙ্গে তখনকার জাতিগত জীবনসত্যের ধর্তব্য কোনো মিল ছিল কিনা। ইতিহাসের বড়ো বড়ো ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দেশব্যাপী জনসাধারণের দিকে আমাদের কতোটুকুই বা নজরে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ফরাসী-বিপ্লবের নজীর তুলেছিলেন। বলেছিলেন—'ফরাসী বিপ্লবের সময় রাস্তার এপারে ওপারে নোটের দামে ঘটেছিল মূল্য-বিভ্রাট, নিরিখ বেঁধে দেবার কর্তৃপক্ষের অভাবে।'

বলেছিলেন—

'ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সমতা যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঐক্যলাভ করে, সে আনুকূল্য পঞ্চাশ বছর আগে আমরা পাই নি। স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, বন্ধনবেদনার অসহনীয়তা এসেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিতিক্ষা ও দায়িত্ব-বোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। নিজের কর্মফলে যে দুর্গতি মানুষ আপনার জীবনে টেনে আনে, তার জন্যে যখন সে অভিসম্পাত করে সমাগত আপদকে, তখন তার আত্মাপরাধের স্মৃতি হয় বিলুপ্ত। এই স্মৃতিভ্রংশই বিনষ্টির অগ্রদূত।'

কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'মর্মঘরে জানি অন্যকাল' উক্তিটি আমি সুরেন্দ্র-নাথ মৈত্রের এই স্মৃতিভ্রংশ-বিমুখতার গদ্যাংশের সঙ্গে পুরোপুরি বন্ধনীভুক্ত করে, দুটিকে একই বাণী বলে চিহ্নিত করতে চাই নি। আমি শুধু এইটুকুই

বলতে চাই যে, সময় ফেরে না বটে, কিন্তু স্মৃতি থাকে। স্মৃতি থাকাটাই নিয়ম।

স্বরেন্দ্রনাথের এই 'গতানুদর্শন' প্রথম বেরিয়েছিল ১৩৪৫এর আশ্বিনের 'বঙ্গশ্রীতে।' উনিশ শ' তিরিশের দশকের শেষ তখন। রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে আছেন। তখনকার বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল ভয়ঙ্কর। ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা গেছে। অথচ বাংলা দেশের কথা বলতে গিয়ে সেই তিরিশের দশকের শেষদিকের কথাপ্রসঙ্গে প্রবীণ স্বুরেন্দ্রনাথ বলে গেছেন—

'রোমাণ্টিক যুগের আকাশকুসুম আজ হয়েছে সর্ষের ফুল। আশা-প্রবণ মনে জেগেছে সিনিসিজম্ বা সব-ঝুঠ্‌ঠাবাদ।'

সেই 'বিচিত্রা'তেই ছিল 'শান্তিনিকেতনের স্মৃতি' আর 'শান্তিনিকেতনে'—পর পর শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ; প্রথমটি ১৩৪৬এর 'বিশ্বভারতী সাহিত্যিকা'র সাধারণ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, দ্বিতীয়টি প্রথম ছাপা হয় ১৩৪৭এর শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে'। সেই দ্বিতীয় প্রবন্ধে ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ ছিল। স্বুরেন্দ্রনাথের কথাই তুলে দিচ্ছি—

'দিব্যি রসালাপ জমে উঠেছে এমন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কবি যখন আমাদের বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থার বিষয়ে উপনীত হলেন তাঁর সহাস্য মুখে হঠাৎ একটা ভাবান্তর হল। অত্যন্ত বেদনা ও নৈরাশ্যের সঙ্গে তীব্রকণ্ঠে বললেন, আমাদের আত্মঘাতী দুর্মতির দিকে কটাক্ষপাত করে—কোনো আশা নেই, কিছু করবার নেই—deteatism defeatism, হার মানতে হবে, লোপ পেতে হবে আমাদের। দেখলাম শুধু তাঁর আরক্ত মুখমণ্ডল এবং দ্রুতনিঃশ্বাস-কম্পিত বক্ষস্থল।'

এসব ভাবতে ভাবতে মনে হয়, অন্য দেশে যাই হোক, আমাদের সুস্থ, প্রবীণ সাহিত্যিকদের মধ্যে, যাঁরা দেশের মধ্যেই বাস করছেন,—যেমন কবি অজিত দত্ত,—যাঁর 'নষ্টচাঁদ' সম্বন্ধে কয়েকটি ধারণায় পৌঁছোনো গেছে ইতিপূর্বে,—তাঁরা প্রবল কোনো আশার কথা বলতে পারছেন না। অমিয়বাবু দূরে দূরে থাকেন। দূর থেকে দেশকে দেখেন। বৃহৎ মানব-সভ্যতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তাঁর অনুভূতির বিষয়। তাই তাঁর মেজাজ অন্যরকম। কিন্তু দেশের সাধারণ অধিবাসী হিসেবে আজ এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি এসে আমরা মর্মঘরে জ্বালবো কোন্ আলো—কোন্ অতীত বা অনাগত কালের আলো?

মন যে কোন্ কথা থেকে কোন্ কান্নায় এসে পৌঁছোয়। তাই বলছিলুম লেখা অনেক ক্ষেত্রেই কেমন যেন ঘটে-যাওয়া, হয়ে-ওঠা ব্যাপার। এসব গম্ভীর ভাবনা-চিন্তার ভারী জল আমার ডুবজল। আমি দুঃখবাদী নই। সিনিসিজম্ আমার ধাতে সয় না। অতএব স্বুরেন্দ্রনাথের ঐ শান্তিনিকেতন সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটি ধরে একটু অন্য মর্জিতে সরে যাওয়া যাক।

সে ১৯০৩এর কথা। নববিবাহিত, নবীন অধ্যাপক স্বুরেন্দ্রনাথ সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তিনিকেতনে গেছেন। পুরোন বড়কুঠির অদূরে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয়। দুপুরে দুঃসহ গরম। যেখানে লাইব্রেরি হয়েছে, সেইখানে ছিল পাকা একতলা বাড়ি। ডানদিকের ঘরে সতীশচন্দ্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী এবং আরো কেউ কেউ সেই দুপুরগুলি কাব্যালোচনার বৈঠকে ভরিয়ে তুলতেন। স্বুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সকালবেলা আমি ছিলাম বিজ্ঞানের উপাধ্যায় এবং দুপুরবেলা কাব্যালোচনায় ছেলেদের সতীর্থ।' বিকেলে দেখা দিত কালবৈশাখী। সেই ধুলোর ঝড় খেয়ে, কুয়োতলায় স্নান করতেন তাঁরা। তারপর বসতেন মাঠে ফেলে-রাখা এক তক্তাপোষে।

একদিন দুপুরে দিনু ঠাকুর বললেন—আজ পড়া নয়,—শুরু হোক বারোয়ারি কাব্যচর্চা।

দিনু ঠাকুরই প্রথম দু'ছত্র শুরু করে দিলেন—

এস্রাজ, শোনা আজ সুমধুর তান,
মধুর সংগীতে তোর ভরে যাক কান।

সতীশচন্দ্র বললেন—

কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া
এ গরমে গান কি রে, ও রে লক্ষ্মীছাড়া।

তারপর স্বুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের পালা।

তিনি বললেন—

তবে যদি শালী বলি মলি দাও কান,
গান বাহিরিতে পারে দুই চারিখান।

আজ দেশের কোথাও কোনো প্রান্তে প্রসিদ্ধ সব সাহিত্য-ভাবুকদের মধ্যে এ-মেজাজ আছে কিনা জানি না। মাঝে মাঝে একালের লোক-সাহিত্যের কোথাও কোথাও কতকটা সহজ ফুর্তি বা খুশির মেজাজ ধরা দেয় বটে। তরুণ নাগরিক কোনো কোনো কবি—ভবিষ্যতে সাহিত্য-খ্যাতিমান হবেন যাঁরা, তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, অসংযতভাষী। তাই আজ বার বার মনে প্রশ্ন ওঠে—আমরা আমাদের মর্মঘরে কোন্ কালের কোন্ আলো জ্বালবো?

সিনিসিজম্ আমার ধাতে সয় না। দেশের মধ্যে এইসব পূর্বগামী সাহিত্যিকদের মন-মেজাজের সঙ্গে একালের মর্জি তুলনা করলে বরং এই কথাই মনে হয় যে, স্বাধীনতার মতন বৃহৎ সত্যের শিখাতেও যদি নবীনের সিনিসিজম্ না পোড়ে, তাহলে কি স্বুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের সেই Defeatism Defeatism খেদোক্তির ইশারাই

অকাট্য মনে করতে হবে,—নাকি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বন্ধু রসময় লাহার 'আরাম' কবিতার যে কয়েকছত্র দিলীপকুমার তাঁর 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' বইখানির 'তৃতীয় উল্লাসে' তুলে দিয়েছেন, সেই ছত্রগুলির শেষদিকের ইঙ্গিতটাই ধর্তব্য? সেই—'সারারাত ধরে ঘুম নাহি চোখে, করিয়াছি হা হুতাশ',—কিন্তু কেন? কেন হা-হুতাশ? রসময় লিখেছিলেন—

কেন পাইতেছি আজি এ বাতনা
প্রভু কী বলিব আহা!
খেয়েছিনু কাল আস্ত কাঁঠাল,
হজম হয় নি তাহা।

বলা বাহুল্য, একালের মন জটিল, দুঃখও বিপুল। কাঁঠাল হজম করতে না-পারার যন্ত্রণা ঠিক এ দুঃখের যোগ্য উপমান নয়।

তবু সুরেন্দ্রনাথের উক্তির আলোকে পরিস্থিতিটি ভেবে দেখতে গিয়েই এ উপমান মনে এলো। সুরেন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—'স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ বন্ধনবেদনার অসহনীয়তা এনেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে তিতিক্ষা ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে পারে নি।'

সুরেন্দ্রনাথের আর-একটি প্রবন্ধের কথাও এখানেই উল্লেখ করি। সেটিও রবীন্দ্র-সম্পর্কিত। সেটির নাম 'রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে'—সেও ঐ 'বিচিত্রা'রই অন্তর্ভুক্ত,—১৩৪৭এর 'ভারতবর্ষে' বেরিয়েছিল। তাতে সুরেন্দ্রনাথের কিশোর বয়সে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখবার স্মৃতিকথা আছে। —'দীর্ঘ ঋজু দেহ আস্কন্ধবিলম্বিত কুণ্ডলায়িত অলকদাম। পরিধানে ছিল ইজের ও আজানুবিলম্বিত আচকান, বুকের ওপর বোতামের সারি। উত্তরকালে যখন Goethe in Weimer-এর ছবি দেখেছিলাম তখন আমার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়েছিল।'

তারপর আর এক দৃশ্য। সেই প্রথম দর্শনের রূপবর্ণনার পরে তিনি ১৯১২র একটি ছবি দিয়ে গেছেন। তখন ছাত্রাবস্থায় এক লম্বা ছুটিতে সুরেন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ থেকে লণ্ডনে আসেন। রবীন্দ্রনাথ তখন এক অস্ত্রোপচারের পরে চেলসিতে বিশ্রামরত। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখতে যান।

লম্বা এক আরাম-কেদারায় অর্ধ-শায়িত ছিলেন কবি। সুরেন্দ্রনাথ জিগেস করেন—কেম্ব্রিজ কেমন লাগলো? অতঃপর—

'স্মিতমুখে আমার দিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন: হ্যাঁ, ভালই লাগল। দেখা হল অনেকের সঙ্গে, কিন্তু একটি লোকের কথা মনে হচ্ছে কেবল—আপনাদের বার্টি রাসেল—রাসেলের নাম উচ্চারণ করবামাত্র হঠাৎ যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ তাঁর সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে গেল। তড়াক করে উঠে বসলেন সোজা হয়ে এবং উৎসাহদৃপ্ত মুখে বললেন 'এক একটা কথা বলে যেন বুকে ঘুঁষি মারে', —বলেই সেই সঙ্গে সজোরে মারলেন নিজের বুকে এক ঘুঁষি। ছোট্ট বদ্ধ শয়নকক্ষ, জানালার সার্শী আঁটা। সেই ঘুঁষির দমকে কাচের সার্শীগুলি ঝন্ ঝন্ করে উঠল।'

মৈত্র-মশায় মন্তব্য দিয়েছেন—'ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতা ভীরুতা হিংসা দ্বেষ দলাদলির মধ্যে যারা শতপাকে জড়িয়ে আছে, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার অবকাশ কোথায়? ইউরোপে মনস্বী ও মহাপ্রাণ লোকের সংস্পর্শে আসার আনন্দ তাঁকে যে প্রতীচ্যের তীর্থযাত্রায় বারবার আকর্ষণ করেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।'

রবীন্দ্রনাথ যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, সে তো স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর ক্ষুধা এবং খাদ্য তাঁরই উপযুক্ত। আমরা সাধারণের কথা ভাবতে গেলেও আর-একভাবে এই একই সত্য সে-অঞ্চলেও দেখতে পাই। চাই বড়ো আকাশ, বড়ো বিশ্ব। সেটা না পেলেই রসময়ের কাঁঠাল-ঘটিত যন্ত্রণাটাই চূড়ান্ত বলে মনে হয়। তাই আজ আমার মোট কথাটা এই দাঁড়াচ্ছে যে—ভারতবর্ষের নানা সাহিত্যের হাজারমুখী স্রোত চলেছে বর্তমানে। সেই দেশ-দেশান্তর আমাদের দেখা দরকার। এই হোলো প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা,—কেবলমাত্র অতীতের স্বপ্ন-কল্পনা-বস্তুধারণার জগতে নিজেদের বেঁধে রাখা বা তাতেই সম্পূর্ণ মগ্ন থাকা

সুবিবেচনা নয়। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ব-সাহিত্যের যোগ যেখানে, সেই সংযোগভূমির দিকেও নজর রাখতে হবে। মানুষের অতীতও বিশ্বব্যাপী,—বর্তমানও বিশ্বব্যাপী,—ভবিষ্যৎও বিশ্বব্যাপী। দেশ তো কালে-কালে পরিব্যাপ্ত; কাল তো দেশে দেশে প্রবাহিত।

হয়তো, একথাও ঠিক যে, এভাবে মনকে ছড়িয়ে পড়তে দেওয়া বা উধাও হতে দেওয়া সুবিবেচনা নয়। কালের ক্রম ধরে এক-একটি দেশ দেখতে-দেখতে এগিয়ে যাওয়াই ভালো হয়তো। তাতে এক-একটি দেশকে আলাদা করে চিনে নেবার সময় পাওয়া যায়।

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসি নি আমি। সাহিত্যের পথে পথে বিশেষ বিশেষ মর্জির ওপর চোখ পড়ছে। জীবনের স্বাভাবিক গতির কথাও মনে পড়ছে, অস্বাভাবিকের কথাও দেখা দিচ্ছে। অস্বাভাবিকের প্রসঙ্গ উঠলেই মনে আসে ব্যালজাকের কথা, ডি-কুইন্সির কথা। মনে পড়ে মধ্যযুগের বাংলার ধর্মমঙ্গল-মনসামঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নানা অলৌকিকতা।

অমিয় চক্রবর্তীর প্রসঙ্গ থেকে সে-প্রসঙ্গ দূরস্থিত বটে। কিন্তু জীবনের সব দূরত্বই স্থানে এবং কালে যতো সুদীর্ঘ বলে মনে হয়, মনে বা মেজাজে আদৌ তা নয়,—মোটেই ততো নয়। মনের অনুষঙ্গধর্ম আশ্চর্য। যেমন আজ এই উনিশ শ' চৌষট্টিতে এসব কথা ভাবতে গিয়েই এখান থেকে অবলীলাক্রমে এই মুহূর্তেই মন চলে যাচ্ছে চব্বিশ বছর আগেকার দিল্লিতে। এড্‌ওয়ার্ড পার্ক থেকে বেরিয়ে, হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়েছি শিখ-ধর্মমন্দিরে। মাথায় আচ্ছাদন দিয়ে বসে বসে শুনছি গান। গান শেষ হলে, গুরু নানককে স্মরণ করে আবার পথে নেমেছি।

চাঁদনী-চক আর দরিবাবাজার। রাস্তায় অজস্র মানুষ। দোকানে বিপুল ভিড়। আলো, আলো। শব্দ। সুর। বেসুর। টাঙার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। অনুভব করছি যে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। ঢেউয়ের মতন সময় আমাকে এক বিকেল থেকে আর-এক দুপুরে নিয়ে এলো। প্রকাণ্ড দিল্লি-দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে। আওরঙ্গজেবের মতি-মসজিদ দেখছি। নমাজের মঞ্চ শ্বেতপাথরে তৈরি। পাথরের জাফরির কাজ দেখছি। সেখান থেকে আবার অন্য ঘরে। অন্য ইতিহাস সে-সব। ভেতরে সম্রাট শাজাহানের তলোয়ার আর আলবোলা—তাকিয়া আর কার্পেট। সেখান থেকে সরে গিয়ে আর এক মহলে দাঁড়িয়েছি।

রঙমহাল। বাইরে যমুনা সরে গেছে। নদীর বুকে আগাছা গজিয়েছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের ঢেউ একসঙ্গে উঠছে পড়ছে ভাঙছে হারাচ্ছে।

মনের গতিই এই রকম। সে তো কেবল সুবিন্যাস মেনে চলা নয়,—শুধুই পরম্পরা বজায় রেখে চলা নয়। সে তো লালকেল্লা দেখা শেষ করে, টাঙায় চড়ে যন্তরমন্তর-রোডে জয়সিংহের মান-মন্দির দেখতে যাওয়া নয়। কিংবা কেবল জয়সিংহের কীর্তির দিকেই চোখ রেখে আজমীর, জয়পুর ঘুরে দিল্লীতে নামাও নয়।

মন এক-লহমায় এক দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। কাল থেকে কালান্তরে চলে।

সেই মনকে আমি ছেড়ে দিয়েছি আনন্দের খোলা রাস্তায়। সাহিত্যের নানা মেজাজে ঘুরতে-ঘুরতে সে শুধু কথা বলুক। তাকে এমন কোনো শপথে আবদ্ধ করি নি যাতে তার এই স্বাধীন ভ্রমণে বাধা ঘটে। তাই তাকে এ-প্রশ্ন জিগেস করি না যে দিল্লির মান-মন্দির সত্যিই কি ১৭২৪ খৃীস্টাব্দে তৈরি হয়েছিল? জিগেস করি না—জয়সিংহ কি পলাশীর তিন বছর পরে মারা গেছেন? সে-সব তথ্য ইতিহাসে লেখা আছে। ইতিহাস খুললেই পাওয়া যাবে।

সাহিত্য আস্বাদনের মন প্রধানত ভ্রমণসুখী। কবি অমিয় চক্রবর্তীর নানা ভ্রমণের সুখ তাই আমার ভাল লাগে। আবার, অজিতবাবুর মালতী-সম্পর্কিত পরমাশ্চর্য আবেগ আর কুহকের অনুরাগী হয়েও আমার সেই মনই তাঁর 'নষ্টচাঁদ'-এর ছড়ার মধ্য দিয়ে আমাদের নিকট-বর্তমানের স্থূল, কঠোর, বস্তুসংকটের চেতনাকে আমাদের অন্যান্য চেতনার পাশে রেখে দেখবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণ। কিন্তু অতঃপর, ঠিক এই মুহূর্তেই, আর ওসব কথা নয়। অনেক কথা বলতে চায় সে। আগ্রায় কবে একদিন ভোর হয়েছিল। হোটেলের খোলা দরজা দিয়ে দেখা শহরের বহুদূর বিস্তারের দৃশ্য,—গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ছোটো-বড়ো বাড়ির ভিড়,—মাঠ,—পথের চড়াই-উৎরাই,—তারই মধ্যে ছুটির বিছানায় টাটকা 'পায়নিয়র' কাগজে আবার নজর ফিরিয়ে আনা এবং কোনো খবরেই চোখকে-মনকে-চেতনাকে সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকতে না-দেবার মেজাজ। চব্বিশ বছর যেন কোনো অপসরণ নয়, অতিক্রান্তি নয়, অতীতও নয়। কী আশ্চর্য এই মন,—আশ্চর্য তার সময়চেতনা।

(ক্রমশঃ)

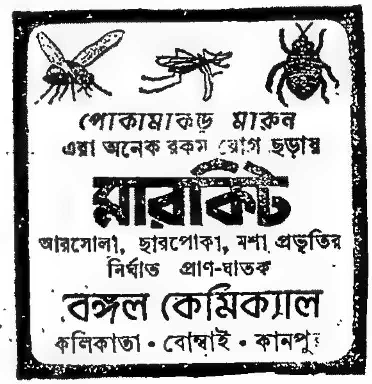

ভারত দর্শন

● জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের বৈঠক

রাজধানী:

এ সপ্তাহে নয়াদিল্লীর দিনগুলো কেটেছে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে। নেহরু স্মারক কমিটির অধিবেশন থেকে সুরু করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়ে গেল রাজধানীতে। দেশের সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির সমাধানে নয়া নীতির উদ্ভাবন, দুর্নীতির দুষ্টগ্রহের গ্রাস থেকে মুক্তির পন্থা নির্ধারণ, সদাচার সমিতির জন্মের বৈধতা বিচার প্রভৃতি হরেক রকম বিষয় নিয়ে নেতারা পুরো সপ্তাহটাই খুব ব্যস্ত ছিলেন। ওপর-নীচ প্রায় সব সারির নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সমাগমে দিল্লীর দরবারের চেহারাটাই গিয়েছিল পাল্টে।

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের আকসাই চীন দান করে ভূদান যজ্ঞ মহিমামণ্ডিত করবার প্রস্তাবে তো দিল্লীর অন্দরমহলে পর্যন্ত তোলপাড়ের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে বাহবা দিচ্ছেন। স্পষ্টোক্তি ও সাহসিকতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে তাঁর ভক্তদল। অযাচিত উপদেশের জন্য সাধারণ মানুষের ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে আবার চারদিক থেকে।

সর্বোদয় নেতা সহজে মাথা নোয়াবার পাত্র নন। তিনি অনেক ঝড়ঝাপ্টা অতিক্রম করেছেন জীবনে—এ সব তাঁর একেবারে গা-সওয়া হয়ে গেছে। তিনি তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে অভিনব যুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে ভারতের চাইতে আকসাই চীনের প্রয়োজনটা চীনেরই বেশি। চীনকে ভারতের এই এলাকা ইজারা দিলেই সীমান্ত সমস্যার মীমাংসার পথ হবে সুগম।

তাঁর এই অভাবনীয় ওকালতীতে বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীশরণ সিং পর্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আমেরিকার মাটিতে কমিউনিজমে দীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীজয়প্রকাশ অনেক ভোল পাল্টে এখন রাজনীতি ছেড়ে মোহন্ত সেজে বসলেও, মাঝে মাঝে যে ধরণের বিবৃতি দিচ্ছেন তা আর কেউ দিলে—দেশদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পেতেন না। তিনি এমন কথাও বলেছেন যে, চীনের সঙ্গে ভারতের বিরোধটা আসলে জমি-জায়গা নিয়ে নয়—বিরোধটা হল আদর্শগত।

সর্বোদয় নেতার প্রতি আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অনুকম্পা থাকা বিচিত্র নয়। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী

. শ্রীশরণ সিং

জওহরলাল নেহরু তাঁকে এক সময় ভারতের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনের যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্তমান রাষ্ট্রনায়কদের অনেকেই জয়প্রকাশের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। সেদিনের সম্পর্ক স্মরণ করে জয়প্রকাশের বর্তমান কার্যকলাপের প্রশ্রয় দিলে ভুলই করা হবে। সর্বোদয় নেতা যে নজীর সৃষ্টি করছেন, তার সুদূরপ্রসারী পরিণামের কথাটা ভুললে চলবে না। তা ছাড়া চীনের সাথে আলাপ-আলোচনা আগেও কম হয় নি। কোন সময়েই চীন তার দাবীর ফিরিস্তি বৃদ্ধি ছাড়া মীমাংসার দিকে ঝোঁকে নি। শ্রীশরণ সিং জানিয়েছেন, কলম্বো প্রস্তাব মেনে নিয়ে লাডাকে সৈন্য-মুক্ত এলাকা থেকে ঘাঁটি তুলে নেবার কোন প্রস্তাবই চীনের কাছ থেকে আসে নি। আশা করি, এর পর শ্রীনারায়ণের মতের পরিবর্তন হবে।

* * *

সদাচার সমিতির জন্মের পর থেকেই তাকে সায়েস্তা করা এবং সম্ভব হলে তার গলা টিপে মারবার তোড়জোড় চলেছিল বললে অন্যায় হবে না। উড়িষ্যার শক্তিশালী নেতা শ্রীবিজু পট্টনায়ক যে সুরে

দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানের সমালোচনা সুরু করেছিলেন তাতেই জনমনে প্রবল ধাক্কা লেগেছিল।

উড়িষ্যার কংগ্রেসকর্মীদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণটা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ বুঝিয়ে দেবার পর মানুষের মনে শ্রীনন্দের দুর্নীতি-বিরোধী অভিযান ও তাঁর সদাচার সমিতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহটা দেখা দেয় বেশি করে।

এবারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শ্রীঘোষ স্বয়ং অগ্রণী হয়ে প্রশ্নটি তুলেছিলেন। শ্রীঘোষ সদাচার সমিতির বিরোধিতা না করেও তার বৈধ সত্তা সম্পর্কে যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন—তাতে সমিতির অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীনন্দ সমিতিকে বাঁচাবার জন্য যে-কটি প্রস্তাব

● শ্রীবিজু পট্টনায়ক

তুলেছিলেন তার কোনোটিই ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কৌশলে পাশ কাটিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত স্থির হয়েছে, দুর্নীতি সম্পর্কে শান্তনম কমিটির রিপোর্ট নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্য সহ আলোচনাকালে সদাচার সমিতির বিষয়টিও আলোচনা করা হবে।

দুর্নীতি আজ দুষ্ট ব্যাধির মত সমাজদেহকে কাহিল করে তুলেছে। সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানে সদাচার সমিতিকে সমর্থন না করার নীতি গ্রহণ করলে সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে। দুর্নীতি দমনের জন্য কংগ্রেসের নেতারা সাধারণ মানুষের সহযোগিতার যে আহ্বান জানিয়েছেন—তাতে সাড়া পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। নেতাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে জনচিত্তের সন্দেহটা বরং আরও শিকড় ছড়াবে বেশি করে।

* * *

গত ১৯শে আগস্ট দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের ত্রয়োদশ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুর মৃত্যুর পর পরিষদের এই প্রথম বৈঠক। শ্রীশাস্ত্রীকে সভাপতি করে পরিষদ পুনর্গঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী, ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরী, বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল অর্জন সিং প্রমুখ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

বিহার ঃ

বিহার কংগ্রেসের উপদলীয় সংঘাত আবার তীব্র হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায় এতে কিছুটা অসহায় বোধ করছেন। লড়াইটা সরাসরি তাঁরই বিরুদ্ধে। নেতৃত্ব তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁকে গদীচ্যুত করাই বিরুদ্ধ-পক্ষের লক্ষ্য। তিনি নাকি দলের ও সাধারণ মানুষের আস্থাভঙ্গ করেছেন।

সপ্তাহ-দুই আগে শ্রীসহায় আইন-সভার বিরোধী দলের অনাস্থা প্রস্তাবের মোকাবিলা করেছেন। এবারে মোকাবিলা করতে হবে তাঁকে নিজের দলের সঙ্গে। আইনসভার কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য নতৃত্বের আসন ছেড়ে দেবার নোটিশও তাঁকে দিয়েছেন। বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রশাসনে নৈতিক মানের হ্রাস এবং বিহারের উন্নতির পথে বিঘ্নসৃষ্টির গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ যাচাই করে দেখার জন্য বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানিয়েছেন শ্রীসহায়ের বিরোধীরা।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা থেকে সুরু করে বিহারের বড় নেতারা এই কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছেন। কাজেই এ কোন্দল সহজে মিটমাট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। শ্রীঝা বিহার কংগ্রেসের বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কংগ্রেস

● শ্রীকৃষ্ণবল্লভ সহায়

সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের কাছে চিঠিও পাঠিয়েছেন।

প্রকাশ, চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, শ্রীসহায়ের নেতৃত্বে নেহরু-প্রবর্তিত জনপ্রিয় সকল নীতি নাকচ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের কাছে বিহার কংগ্রেসের কি বক্তব্য তা' প্রবীণ কংগ্রেস নেতারা কেউ জানতে পারছেন না।

● শ্রীবিনোদানন্দ ঝা

শ্রীজগজীবন রামের উপস্থিতির ওপরও রাজনৈতিকমহল অনেকটা গুরুত্ব আরোপ করছেন। শ্রীসহায়ের বিপক্ষ দল নাকি তাঁর আশীর্বাদধন্য। তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতা থেকেও মনে হচ্ছে—শ্রীসহায়ের বিরোধী দলের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি বেশি।

শ্রীসহায়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগপত্রে যাঁরা স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীদীপনারায়ণ সিং, শ্রী এস সি জুবিত, শ্রীদারোগা রায়, শ্রী এন এন ঝা, দলের চীফ হুইপ শ্রীসকুর আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বরপ্রসাদ সিংহের মত নেতৃবর্গ।

সংবিধান উপেক্ষা করে চলা, নিজের দলের স্বার্থে জনসম্পদ ও

● শ্রীজগজীবন রাম

ক্ষমতার অপব্যবহার, কংগ্রেসের সামগ্রিক স্বার্থে ও দলের স্বার্থে নেতা হিসেবে কাজ না করে নিজের গ্রুপের স্বার্থে কাজ করা, রাজ্যের উন্নতির গতিরোধ এবং সকল সরকারী দপ্তরকে উপদলীয় কোন্দল ও বর্ণ-বৈষম্যের ভিত্তিগত রাজনীতির পীঠস্থানে পরিণত করার অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে।

বিহারের কংগ্রেসে উপদলীয় লড়াই বহুদিনের। মাঝে মাঝে হাই-কমাণ্ডের হস্তক্ষেপের পর একটু ছাই-চাপা পড়লেও কোন পক্ষই মনের আগুন নেভাতে পারেন নি। এবারে সে আগুন নতুন ইন্ধন পেয়ে জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে। তাতে ক'জন জ্বলে-পুড়ে মরবেন—বলা খুবই শক্ত। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড অচিরে শান্তি-বারি নিক্ষেপ করতে না পারলে দাবানলের সৃষ্টি হতে পারে।

উত্তর প্রদেশ ঃ

উত্তর প্রদেশের বিধানসভা একের পর এক ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে। ক'মাস আগে বিধানসভা ও হাই-কোর্টের ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে উত্তর প্রদেশ সৃষ্টি করেছিল বিরাট আলোড়নের। সে প্রসঙ্গের জের এখনও মেটে নি। বিষয়টি এখন সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনাধীন। এবারে পাইকারী হারে বিরোধী সদস্যদের ওপর বহিষ্কারের নোটিশ জারী হওয়ায় নতুন করে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে।

বিধানসভার বিরোধী দলগুলোর সকল সদস্য এর প্রতিবাদে একযোগে সভার বর্তমান বর্ষাকালীন অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তাঁরা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিরোধীদের ন্যায়সঙ্গত ও সংবিধানসম্মত অধিকারের প্রতি সরকারের মনোভাবে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁরা মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে বিধানসভার অধিবেশনে যোগদান অর্থহীন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যে ব্যাপার নিয়ে গোলযোগের সূত্রপাত, তা হল, ডেপুটি স্পীকার একজন সদস্যকে বৈধতার প্রশ্ন তুলতে দেন নি : উপরন্তু তিনি ২৭ জন সদস্যকে তিরিশ দিনের জন্য এবং একজন সদস্যকে পনেরো দিনের জন্য সভা থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর স্পীকারের সামনেই একটা আপোষের কথা হয়। তার ফলে, ৫৮ জন সদস্যকে একদিনের জন্য বহিষ্কার করা হয়। এখন আবার বিরোধী সদস্যদের নানারকম হুমকী দেওয়া হচ্ছে।

সরকার পক্ষ থেকে বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বিধানসভার কার্য

● শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

পরিচালনায় বাধা সৃষ্টির অভিযোগ তোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন, এ রাজ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র একেবারেই চলতে পারে কিনা, বাইরের সকলেই এ বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন।

আইনসভা বিতর্কেরই স্থান। গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টের ইতিহাসের পাতায় পাতায় সরকার পক্ষ ও বিরোধী দলের ভূমিকার নজীর রয়েছে। এক সঙ্গে বিরোধী পক্ষের ৭০ জন সদস্যের মধ্যে ৫৮ জনকে বহিষ্কারের

নজীর অ কিনা আমাদের জানা নেই। বি বী দলের বিরুদ্ধে সভার মর্যাদাহানি অভিযোগও তুলেছেন রাজ্য মুখ্য ী। অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগে পালা সাঙ্গ করে ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি কিয়ে ফেললেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বিধানসভায় এমনি ধারা লড়াই চলতে থাকলে যাঁদের ভোটে সদস্যগণ বিধানসভায় আসন পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—তাও উভয় পক্ষকেই ভেবে দেখতে হবে। তা' ছাড়া, বিরোধী দল অধিবেশন বর্জন করে চুপচাপ বসে থাকলে খণ্ডিত বিধানসভায় সম্পাদিত কার্যাবলীর বৈধতার প্রশ্ন আসতে পারে।

নাগাভূমিঃ

আত্মগোপনকারী নাগাদের শেষ পর্যন্ত কিছুটা শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। ভারত সরকারের শর্তাবলী মেনে নিয়ে তারা নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত্রসম্বরণ করতে সম্মত হয়েছে। সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৫ই-৬ই সেপ্টেম্বরের মধ্যরাত্রি থেকে নাগাভূমির সর্বত্র অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি কার্যকর হবে।

দীর্ঘ আট বছর আত্মঘাতী, নাশকতামূলক সংগ্রাম চালিয়ে যাবার পর বিপথগামী নাগা নেতারা নাগারাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনায় বসতে রাজী হয়েছে। খুবই আশার কথা। ভারত সরকার দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই নাগাভূমির সমস্যা সমাধানের জন্য বারবার চেষ্টা করেছেন। আত্মগোপনকারী নাগারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নাগাভূমির উগ্র দাবী নিয়ে যেদিন সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু করে সেদিনও সরকার নাগাদের ওপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের নিরাপত্তার তাগিদেই সরকারকে বিদ্রোহী নাগাদের দমনের জন্য অভিযান চালাতে হয়েছিল। নাগাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অধিনায়ক ফিজোর হাতে নিহত হয়েছেন

● শ্রীশিলু আও

উদারপন্থী নেতা সাখরি। নাগাভূমির প্রথম চীফ কমিশনার ও তাঁর ৩৫ জন দেহরক্ষীও ফিজোর অনুগামীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। ভারত সরকার এর পর বাধ্য হন নাগাভূমিকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সৈন্যবাহিনীর হাতে ন্যস্ত করতে।

ফিজো বিপদ দেখে পাড়ি জমালেন বিলাতে। সেখানে বসে তাঁর স্বপ্ন-রাজ্য 'নাগা ফেডারেল সরকার' কতটা অলীক তা' বুঝতে পারলেন, যেদিন বিদেশের কোন রাষ্ট্রই তাঁর দাবীতে সায় দিতে সম্মত হ'ল না। নবভারতের জন্মলগ্নের প্রধান দুষমন পাকিস্তানের কাছ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে শেষ চেষ্টাও ফিজোর অনুগামীরা করে দেখেছে। সম্ভবত আজ তারা ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তাই এত সহজে শান্তি-কমিশনের ডাকে নাগা ফেডারেল সরকারের অস্তিত্ব স্বীকৃতি ও সীমান্ত এলাকা থেকে টহলদার বাহিনী তুলে নেবার দাবী নিয়ে আর টালবাহানা না করেই শান্তি প্রতিষ্ঠার আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছে।

আলোচনার প্রারম্ভেই তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত হবে নাগাভূমি এখন ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষই শান্তিপ্রিয়। এই শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের ভোটেই নির্বাচিত ডঃ শিলু আওয়ের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে নতুন সরকার। কাজেই গণতান্ত্রিক বিধানকে চ্যালেঞ্জ করবার অধিকার কারো নেই। সেই সঙ্গে নেতাদের একথাও মনে রাখতে হবে, নাগাভূমির সর্বত্র এখনও বাইরের জগতের আলো গিয়ে পৌঁছতে পারে নি—অধিকাংশ নাগাই নিরক্ষর। রাজনৈতিক চেতনা তাদের জাগ্রত হয় নি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাগাদের মধ্যে যে-কোন জিগির তুলে উন্মাদনা সৃষ্টি খুবই সহজ।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি নাগাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সুরু হবে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা, রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণু সহায়, রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট এবং ভূদান নেতা শ্রীজয়প্রকাশ আত্মগোপনকারী নাগা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা পরিচালনায় অসীম ধৈর্য ও কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। এখানকার রাজনৈতিক মহল ও সরকারী কর্মচারীরা শান্তি মিশনের প্রচেষ্টা সফল হবে বলেই আশা করেন।

পাঁগুচেরাঃ

ভারতের যে ক'জন মুখ্যমন্ত্রীর কাজে গণমানসের বিক্ষোভ ছিল শ্রীএডওয়ার্ড গুবার্ট তাঁদেরই একজন।

● শ্রীএডওয়ার্ড গুবার্ট

আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মুখে অতীতের কাহিনীকে মুছে দিয়ে গণসমর্থন লাভের জন্য তিনি অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছেন। গেল এক পক্ষকাল ধরে তিনি পণ্ডিচেরীকে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্তির খোয়াব দেখছেন এবং এ নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মহড়া দিয়ে চলেছেন। কংগ্রেসমহলের মতে তিনি বিবৃতিতে কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের নেতৃত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন।

শ্রীগুবার্টের দুঃখের কারণ নেই, এমন কথা আমরা বলবো না। তিনি পণ্ডিচেরীর দোর্দণ্ড প্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাপটে পণ্ডিচেরীতে উঠেছিল থরহরি কম্প। তিনি একাধারে মুখ্যমন্ত্রী ও মেয়র ছিলেন। এ হেন ব্যক্তির চেলা-চামুণ্ডা সকলকে কংগ্রেস মনোনয়ন-পত্র দিতে পারেন নি। তাঁর অভিযোগ—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের হস্তক্ষেপের ফলেই আজ তিনি দল হারাতে বসেছেন। তাঁর নেতৃত্বের সমর্থক প্রার্থীরা মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এমনি করে নাকি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটাবার চক্রান্ত চলেছে।

পণ্ডিচেরীর বিবদমান দুই নেতা শ্রীগুবার্ট এবং পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীভেঙ্কটসুব্বা রেড্ডিয়ারের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনের জন্য মাদ্রাজের মন্ত্রী শ্রী আর. ভেঙ্কটরমণ এখানে এসেছিলেন। তাঁকে কোন পাত্তাই দেন নি শ্রীগুবার্ট। সরাসরি তাঁকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন—'ভারতীয় রাজনীতিকগণ' পণ্ডিচেরীর ব্যাপারে হাত না দিলে কোন অসুবিধারই সৃষ্টি হত না। গুবার্টের অনুগামীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াবার অনুরোধও তিনি বারবার করেছেন। কিন্তু কোন ফলই হয় নি। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের প্রতিনিধি হিসেবেই তিনি এখানে এসেছিলেন। শ্রীভেঙ্কটরমণ বাধ্য হয়ে দলের

● শ্রীকামরাজ নাদার

নির্দেশ অমান্যকারী পণ্ডিচেরীর ডেপুটি মেয়র সহ এগারজন কংগ্রেস সদস্যকে 'সাসপেণ্ড' করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা এখন স্বতন্ত্রপ্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।

এরপরই মুখ্যমন্ত্রী একেবারে ক্ষেপে ওঠেন। তিনি জনসভায় ঘোষণা করে বসেছেন, রাজ্য কংগ্রেসের 'বিদ্রোহীরা' কমিউনিস্ট দেশদ্রোহীদের সঙ্গে চক্রান্ত করে পণ্ডিচেরীকে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছে। নেতার এই অমোঘ অস্ত্র হাতে পেয়ে তাঁর অনচরেরা, আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেস সভাপতিকে দোষী সাব্যস্ত করে পুস্তিকা ছাপিয়ে ফেলেছেন। তাতে বলা হয়েছে, 'এক কালের কমিউনিস্ট' শ্রী ভেঙ্কটরমণকে পাঠিয়ে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসুব্বিয়ার সঙ্গে গোপন বোঝাপড়ার চেষ্টাই কংগ্রেস সভাপতি করেছেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, নির্বাচনের মুখে পণ্ডিচেরীর মাদ্রাজ-ভুক্তির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু গুবার্ট নাছোড়বান্দা। তিনি জোর গলায় বলে চলেছেন, কোন খেলাতেই তিনি হার মানতে রাজী নন। কংগ্রেসকে তিনি এবার এমন 'খেলা' নাকি দেখাবেন, যা ভোলা সহজ হবে না।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ এখানে এসে পৌঁচেছেন ২০শে আগস্ট। তিনি সভা-সমিতিতে গুবার্টের অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দেবার চেষ্টাও করছেন।

মাদ্রাজ ঃ

হিন্দুধর্মের জাগরণপ্রবণ প্রচার চালিয়ে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে আকাশবাণীর বিরুদ্ধে। কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য বিষয়টির প্রতি কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রাক্তন দ্রাবিড় কাজাগাম নেতা শ্রী এস গুরুস্বামী হলেন এর উদ্যোক্তা। তাঁরই

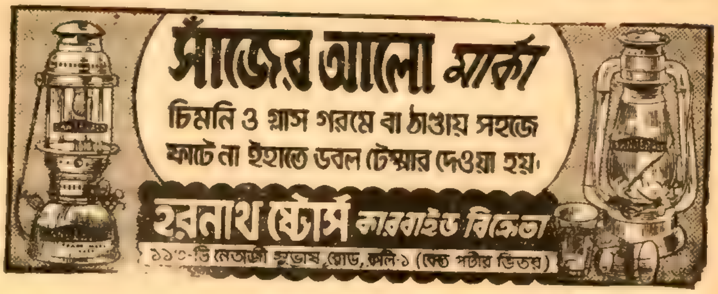

উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদ-পত্র পেশ করা হয়েছে। তিনি সম্প্রতি দু'হাজার অনুগামীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। প্রতিবাদপত্রে শ্রীগুরুস্বামী বলেছেন—আকাশবাণী অতি দ্রুতগতিতে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার যন্ত্রে পর্যবসিত হতে চলেছে। নেহরু-প্রবর্তিত সমাজবাদের আদর্শ ও সমস্যাদির সমাধানে তাঁর বাস্তবধর্মী মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচারের ঝোঁক দেখা দিয়েছে।

শ্রীগুরুস্বামী আরও বলেছেন—আকাশবাণীর একঘেয়ে সুরে এবং ধর্মোপদেশ প্রচারে চিত্তে অবসাদেরই সৃষ্টি করে। সংবাদ প্রচারেও নেহরু-আদর্শ বিরোধী নীতির দিকেই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এদেশ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মিলন-তীর্থ। ধর্মোপদেশ প্রচারে শ্রীগুরুস্বামীর বিরূপতার কারণ থাকা উচিত নয়। তবে, অন্য ধর্মের বাণী প্রচার না করে কেবল হিন্দুধর্মের কথা প্রচার করা নিশ্চয়ই অন্যায়। আকাশবাণী গ্রাহকদের চাহিদা মাফিক চলতে বাধ্য। যে-দেশে অশিক্ষিত, বিশেষ করে নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক, সেখানে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মোপদেশের আবেদনও অধিক। ধর্মকে অবলম্বন করেই ভারতে সৃষ্টি হয়েছে বিভেদের মধ্যে বিরাট ঐক্যবোধ। এইটিই ভারতের প্রধান সম্পদ। কাজেই ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলেই ধর্মের প্রচার ভারতীয় সংবিধানে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নি। ভারতের জাতীয় প্রতীকও অশোকচক্র। এসব কথা কি করে প্রাক্তন কাজাগামপন্থী নেতা ভুলে গেলেন, আমরা বুঝতে পারছি নে।

নেহরু-আদর্শ, তাঁর সমাজতন্ত্রী নীতির বিরোধিতার অভিযোগ সম্পর্কে অচিরে তথ্য ও বেতার দপ্তরের পক্ষে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা-অবলম্বন উচিত হবে।

মহারাষ্ট্র :

এখানকার রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সাম্প্রতিক মনোভাবে মহারাষ্ট্র-মহীশূর সীমানা বিরোধের মীমাংসার পথ আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। প্রকাশ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়েক পটাশকর ফরমূলার পক্ষপাতী হলেও, সীমান্ত এলাকার অধিবাসীদের আশা-আকাঙক্ষা পূরণের উপযুক্ত ভিন্ন কোন সমাধানেও তাঁর আপত্তি থাকবে না। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা নাকি একেবারে বেঁকে বসেছেন। সীমান্ত-প্রশ্ন নিয়ে নতুন কোন প্রস্তাব তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

তিনি ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে নাকি জানিয়েও দিয়েছেন যে, সীমান্ত বিরোধের মীমাংসায় সামান্য রদবদলে তাঁর কোন আপত্তি নেই ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই বেলগাঁও,

● শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা

কারোয়ার এবং নিপানি মহারাষ্ট্রকে তুলে দেওয়া মহীশূরের মানুষ বরদাস্ত করবে না। পটাশকর ফরমূলা মেনে নিলে এই তিনটি শহরই মহারাষ্ট্রে চলে আসবে, এই ভয় নিজলিঙ্গাপ্পার রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। শ্রীবসন্তরাও নায়েক সমগ্র ব্যাপারটি ছেড়ে দিয়েছেন শ্রীনন্দের হাতে এবং তিনি যে-কোন সম্মানজনক মীমাংসা মেনে নিতে রাজীও আছেন।

* * *

মহারাষ্ট্রের সাধারণ ধর্মঘটের প্রশ্ন নিয়ে কিছুসংখ্যক কংগ্রেস নেতা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাও নায়েকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

ধর্মঘটের প্রস্তুতিপর্বের সুরু থেকেই প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান এবং কয়েকটি জেলা কংগ্রেস কমিটী ধর্মঘটের প্রতিরোধের জন্য কংগ্রেসকর্মীদের সচেষ্ট হতে বলেছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্য প্রশাসনযন্ত্রও কাজে লাগাবেন। বিদর্ভ ও মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারা কিন্তু এ ব্যাপারে আগাগোড়া নীরব ছিলেন।

লোকসভার সদস্য শ্রী আর কে খাদিলকার প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীবিনায়ক রাও পাতিলের বিবৃতির সমালোচনা করে বলেছিলেন, গণমনের বিক্ষোভ প্রকাশের শেষ হাতিয়ারই হল ধর্মঘট। গণতান্ত্রিক নীতিকে অনুসরণ করে চলতে গেলে ধর্মঘটের বিরোধিতার সমর্থন করা যায় না। শ্রী এন ভি গ্যাডগিলও শ্রীপাতিলের বিবৃতির সুরকে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মতে, ধর্মঘট প্রতিরোধের চেষ্টায় অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারতো।

মুখ্যমন্ত্রী ধর্মঘটের সময় যেরূপ দূরদর্শিতা ও বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা' অনেকেরই শেষ পর্যন্ত মনঃপূত হয় নি। তাই সেদিনের দলীয় সভায় মুখ্যমন্ত্রীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা হয়েছিল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশান্তিলাল শা এবং কৃষি দপ্তরের ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীযশোবন্ত রাও মোহাইত বিরোধী দলগুলিকে মাথা তুলে দাঁড়াবার আস্কারা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। শেষ অবধি অবিশ্যি তাঁরা সমর্থনের অভাবে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অধিকাংশ সদস্যই স্বীকার করেছেন, শ্রীনায়েক ভিন্ন-পন্থা অবলম্বন করলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারতো।

ছাত্রদের অধ্যয়নই তপস্যা—ধ্যান, জ্ঞান। এ সত্য সব দেশের সব সমাজের সমাজপতিরা স্বীকার করে নিয়েছেন। আজকের আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় এর অর্থ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হতে চলেছে। কোন কোন সময় 'স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রনায়করা হয়তো বলেন—ছাত্রদের বেলায় তাদের একমাত্র করণীয় অধ্যয়ন—অর্থাৎ স্কুল-কলেজের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে তাদের কর্মতৎপরতা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সে 'পুরোহিতের পাতি' কত যে মিথ্যা বা গাল্পা তা প্রমাণিত হয়েছে। 'সব শিশুরই অন্তরে' ঘুমিয়ে রয়েছে দায়িত্বপূর্ণ এক নাগরিকসত্তা। তাই ছাত্রজীবনেই প্রত্যেককে অধ্যয়ন করতে হবে জীবন-জিজ্ঞাসার। বর্তমানে উন্নত আমেরিকা-সমাজে ব্যাপক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে সমাজকীটের দৌরাত্ম্য। তাই সমাজপতিরা সমাজ গঠনের মূল মশলা ছাত্রদের নৈতিক ও সামাজিক বোধকে সচেতন করবার জন্য পরিকল্পিত পথ ধরেছেন।

শিল্প-সংস্কৃতি যে মানুষের উন্নতমানের মুকুর এ সত্যকে ভিত্তি ক'রে গোটা ছাত্রসমাজে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টি ক'রবার জন্যে প্রকৃষ্ট পথনির্ণয়ে অগ্রণী। আজকের আমেরিকায় লক্ষণীয় বস্তু যে, বিকৃত সাংস্কৃতিক তৃষ্ণায় সমাজের কোন কোন দিক কীটদষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশ যতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে, ততই সমাজে দেখা দিচ্ছে জটিলতা। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এসেছে জঞ্জাল। তাই সৃষ্টিধর্মী শিল্পের সাধনায় ছাত্রাবস্থায় যাতে প্রকৃত সাধনা করতে পারে, যাতে যথাযথ সে শিল্পর প্রয়োগ সম্ভব হয়, সেজন্য সম্প্রতি নিউইয়র্কে বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হতে চলেছে একটি আদর্শ 'সৃষ্টিধর্মী শিল্পসাধনা ও প্রয়োগ কেন্দ্র'। এই পরিকল্পনাকে সার্থক রূপদানের জন্যে ইতিমধ্যেই দুই লক্ষ ডলার আর্থিক সাহায্য দিতে স্বীকৃত হয়েছে

● 'রাজনৈতিক অভিযানে' আমেরিকার ছাত্রদের শিক্ষাপর্ব চলে নিজেদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংস্থা নির্বাচন উপলক্ষে। ছবিতে একজন আমেরিকান ছাত্র মাইক্রোফোনে নির্বাচনী-বক্তৃতা দিচ্ছে পার্শ্ববর্তী প্রার্থী ছাত্রটির সমর্থনে।

রকফেলার ফাউণ্ডেশান। এই প্রকল্পে কুড়িটি সৃষ্টিধর্মী শিল্পী-সহযোগী যেমন প্রয়োগকর্তা, সঙ্গীত-নাটক রচয়িতা, গুণী শিল্পী সমগ্র সঙ্গীত,

মিনু ভট্ট

নাট্য প্রযোজনা ও শিক্ষার ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করবেন।

এই সর্বোচ্চ সংগঠন ছাড়াও আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে আদর্শ তেরোটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেণ্ট অফ এডুকেশান একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক সূচী গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটির নামকরণই গোটা প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করছে। অনুশীলন, বোধলাভ, সমৃদ্ধ হওয়া (কালচার, আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, এনরিচমেণ্ট) এই তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পটির নামকরণ হয়েছে সি-ইউ-ই (CUE). এ উদ্দেশ্য সকলের পরিকল্পিত কার্যক্রম হ'ল বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের মতো 'ক্লাশরুমে'ই নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিল্পসাধনার অনুশীলন করবে। সম্প্রতি নিউইয়র্ক সিটি ব্যালের একটি দল কর্তৃক ডেমোন্‌স্ট্রেশান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাল্ল সংক্রান্ত বিভিন্ন দিকের বক্তৃতা

বিভিন্ন রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাদের ছাত্রদের উপার্জিত অর্থে নিউইয়র্কের একাধিক মিউজিয়াম, থিয়েটারে ছাত্রদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছে। অবসর সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা মোটরগাড়ি ধুয়ে এবং হাল্কা কেক-রুটি বিক্রি করে, এই ভ্রমণের অর্থ সংগ্রহ ক'রে থাকে।

সংস্কৃতিসাধনায় আমেরিকার আজ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। গত সেক্সপীয়র চারশততম বার্ষিকীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গোটা দেশে সেক্সপীয়র সম্পর্কে যতটুকু দাগ কাটতে পেরেছে—তার চেয়ে বহুগুণে সিদ্ধিলাভ করেছে নিউইয়র্কের পাঁচটি সুবার্বন কমিটির মাধ্যমে একমাসকালীন পাবলিক স্কুল সেক্সপীয়র অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যোগদান করেছে। এইসব অনুষ্ঠান তারা তাদের নিয়মিত ক্লাশরুমে শিক্ষালাভ ক'রেছে। মাধ্যমিক ছাত্ররা আরও একটু বেশি সেয়ানা। তারা অবসর সময়ে মহলা দিয়ে এই ফেস্টিভ্যালে তাদের নাটক প্রযোজন করেছে। মানের দিক দিয়ে যা সত্যিই অতুলনীয়।

নিউইয়র্কের একটি বিদ্যালয়ের উৎসাহী শিক্ষক এলবার্ট ক্যালাম গত আট বছর ধরে তাঁর ক্লাশে সেক্সপীয়র পড়িয়েছেন অভিনয়ের মাধ্যমে। তাঁর ধারণা, ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে, কেমন করে নিজের দুটি পায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে জানবে তা শেখবার জন্যে। এবং সেক্সপীয়রই একমাত্র এই শিক্ষার বাহক। শ্রীক্যালামের পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি গোটা দেশের শিক্ষকসমিতি ও ছাত্র-উন্নয়নসমিতি কর্তৃক সানন্দে গ্রহণ ক'রেছে।

শুধু নাচ গান নাটকের নরম প্রলেপ দিয়ে সুকুমারমতি তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনকে আবদ্ধ করে রাখলেই ছাত্রদের অধ্যয়নপর্ব শেষ হবে তা নয়। আজকের জগতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ও রাজনীতির স্থান সবার উপর। তাই অধ্যয়নপর্বে ছাত্রদের এই রাজনীতিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বাতুলতা।

আজকের আমেরিকায় বিদ্যালয়ের, কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কেবল ব্যালেনৃত্য, টুইস্ট-নৃত্য বা গলাছাড়া সঙ্গীতেই বিভোর বললে ভুল বলা হবে। গোটা পৃথিবী আজ আমেরিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। আমেরিকার রাষ্ট্রনীতিও অন্তর্মুখী নয়। বিশ্ব-রাজনীতিতে আমেরিকার ভূমিকা প্রথম সারিতে। তাই আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরাও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো তাদের ছাত্রজীবনেই হাতে-কলমে রাজনীতি শিক্ষা করছে। প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বাধীনতা সংগ্রামে, রাষ্ট্রবিপ্লবে কিম্বা উন্নত সমাজ গঠনে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকার রাজনীতিতেও ছাত্রদের বাস্তব আগ্রহ যথেষ্ট।

অল্পবয়স থেকেই আমেরিকার ছাত্ররা রাজনীতি-সচেতন হ'য়ে ওঠে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একেবারে সুরুতেই তারা রাজনীতি চর্চা আরম্ভ করে। রাজনৈতিক ক্লাবের মাধ্যমে তারা যৌথভাবে রাজনৈতিক আলোচনা করে, বিতর্ক করে। ছাত্রসংগঠন মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুখ-সুবিধা আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করে, সংগঠনের নির্বাচন পরিচালনা করে।

আমেরিকার ছাত্রদের মধ্যে অনেক রাজনৈতিক ক্লাব রয়েছে। প্রধানত এই ক্লাবগুলি দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের ক্ষুদ্র সংস্করণ। অনেকটা আমাদের দেশের ছাত্রফেডারেশন, ছাত্রকংগ্রেস প্রভৃতির মতো এই সব ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান মারফৎ তারা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজের নির্বাচনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। বিভিন্ন ছাত্রসংগঠন কর্তৃক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হয়ে থাকে। আমেরিকায় একটি বহুলপ্রচারিত দৈনিক পত্রিকা রয়েছে, যার প্রকাশনা, সম্পাদনার ভার কোন ছাত্রসংগঠনের। ছাত্র-রাজনীতিতে এই সমস্ত কার্যকলাপের গুরুত্ব অসাধারণ। পত্র-পত্রিকা মাধ্যমে ছাত্ররা চলতি সমস্যা বিশ্লেষণ করে, বিশ্ব-রাজনীতির পর্যালোচনায় তারা তাদের বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করে।

আমেরিকার জর্জিয়া, কেনটাকী, আলাস্কা ও হাওয়াই রাজ্যে ১৮ থেকে ২০ বছর হলেই আইনত ভোটদানের অধিকারী। অন্য সব অঞ্চলে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত। তাই বলে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত দেশের তরুণপ্রাণ ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখতে চায় না। রাজনৈতিক কৌতূহল তাদের সীমাহীন। একটি ষোড়শী ছাত্রী স্বভাবগত চপলতা মিশিয়ে তার বক্তব্য শোনাচ্ছিল: বয়স নাই বা হ'ল। বয়সগত যোগ্যতা অর্জন না করার জন্য ভোট দানে অধিকার না পাওয়ায় আমরা তরুণ-তরুণীর দল কি বোবা হয়ে থাকবো? ভোটদানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও, এ ব্যাপারে আমরা এমন সহায়ক যে, আমাদের এ ব্যাপারে এমন ওয়াকিবহাল হতে হয় যে, ভোটদানের যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারি পূর্ণ যোগ্যতার সঙ্গে।

একজন আমেরিকান ছাত্রকে জিগ্যেস করা হ'ল: তোমার অবসর সময় কাটে কি করে?

উত্তর এলো: আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। ছাত্রাবস্থায় সব সময়েই তারই প্রস্তুতির কাজ করছি। রাজনৈতিকজীবনে প্রবেশের আগ্রহ আমার যথেষ্ট। তাই ছাত্রজীবনে এই রাজনীতি চর্চায় আমি অভিজ্ঞতা গড়ে তুলছি। এটাকে আমার উত্তরজীবনের প্রস্তুতি বলা চলে।

গোটা আমেরিকা-ছাত্রসমাজে রাজনীতি সম্পর্কিত ধারণা—'আমি এখনই একটা কিছু করতে চাই।'

এই 'একটা কিছু করার' অত্যাগ্রহে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রী ছাত্রাবস্থা থেকে রাজনৈতিক বক্তৃতায় পার্ক, হল,

বিশ্ববিদ্যালয় মুখরিত করছে। রাজনৈতিক পোস্টার-প্যামপ্লেট লিখছে, প্রচার করছে। ভোটদাতাদের নাম তালিকাভুক্তির কাজে অগ্রণী হচ্ছে। অন্যান্য কাজে সহকারীর ভূমিকায় সর্বত্র ছাত্র-ছাত্রীরা অতিব্যস্ত।

রাজনীতি ওদের চিন্তা থেকে দূর করা যাবে না। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই তাই কোন না কোন ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনৈতিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। এই সব সংস্থার কোনটি সর্ব-আমেরিকা সংস্থা, কোনটি বা স্থানীয় সংস্থা।

এরকম সংস্থার মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে ন্যাশনাল স্টুডেণ্ট অ্যাসোসিয়েশান। সংস্থাটি সারা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের যুক্ত করেছে একটি মাত্র রাজনৈতিক লক্ষ্যে।

এটি কোন রাজনৈতিক দলযুক্ত নয়। এই ধরণের ছাত্রসংস্থার মধ্যে এই সংস্থাটিই বৃহত্তম। চারশত-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থায় উদার ও রক্ষণশীল উভয় মতাবলম্বীই রয়েছে। যুব-কর্মসংস্থান আইন, ম্যানপাওয়ার ডেভেলাপমেণ্ট এ্যাণ্ড ট্রেনিং অ্যাক্ট নিয়ে এরা গোটা দেশে বিতর্কের স্থষ্টি করেছে এবং এদের যুক্তি সমর্থিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিনিময় পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক পরীক্ষা, যুদ্ধ ও শান্তির উপর বিতর্ক, গবেষণা ও আন্দোলন সৃষ্টি করা, সম্ভাব্য নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনার বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং উপনিবেশ ও পূর্বতন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসমস্যা পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সুযোগ-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে এই ন্যাশনাল স্টুডেণ্ট অ্যাসোসিয়েশান বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই ছাত্র-সমিতি বিশ্ব-মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে একটি 'রাষ্ট্রসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের আন্দোলন করছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব বৃদ্ধির সহায়ক হবে বলে এই সংস্থা মনে করে। সংস্থার সুপারিশে উল্লেখ আছে, এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নতিশীল অঞ্চলগুলির জরুরী প্রয়োজন মেটাবার জন্য অনুশীলন ও পন্থা উদ্ভাবন করা সহজসাধ্য হবে। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ছাত্রসংস্থা আজ পৃথিবীর সত্তরটিরও বেশি দেশের জাতীয় ছাত্রসংস্থাগুলির সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে আর যেসব ছাত্রসংস্থা আমেরিকায় রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—'ইয়ং রিপাবলিক ন্যাশনাল ফেডারেশান', 'ইয়ং ডেমোক্রাটিক ক্লাবস অব আমেরিকা', 'ইয়ং আমেরিকানস ফর ফ্রিডম' এবং 'স্টুডেণ্টস্ ফর ডেমোক্রাটিক অ্যাকশান'। এই ছাত্র-রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আমেরিকার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত।

আমেরিকার উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল রিপাবলিকান পার্টির স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে ইয়ং রিপাবলিকান ন্যাশনাল ফেডারেশান। তরুণ ছাত্রের দল যাতে ভবিষ্যতে যোগ্য রাষ্ট্রনায়কের প্রার্থী হতে পারে, দলের নেতা ও প্রকৃত নাগরিক হ'য়ে উঠতে পারে সেইভাবেই এই ছাত্র-সংস্থাটি তরুণদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

'বাস্তব অবস্থা ও মার্কিন গণতন্ত্রের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদার, ঘরোয়া এবং বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের' উদ্দেশ্যে 'স্টুডেণ্টস ফর ডেমোক্রাটিক অ্যাকশান' সংস্থা আমেরিকার অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'আমেরিকান্স ফর ডেমোক্রাটিক অ্যাকশান'-এর অনুমোদিত ছাত্রসংস্থা হিসাবে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্য দিয়ে নিজেদের মনোনীত নীতিকে কার্যকর করার চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যুক্ত নেই এমন রাজনৈতিক ছাত্রসংস্থা থাকা সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, যেসব ছাত্রসংস্থা রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে জড়িত সে সব সংস্থার সঙ্গেই আমেরিকার ছাত্ররা বেশি যুক্ত। একটি রাজনীতির ছাত্র এর কারণ সম্বন্ধে বলেছে: যে সব ক্লাবের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের যোগ নেই সেখানে ছাত্ররা সাধারণত ঘরে বসে মতবাদ নিয়ে আলোচনা করে, তর্ক-বিতর্ক করে। কিন্তু ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে সেগুলি প্রয়োগ করার কথা চিন্তাই করে না।

এই ছাত্রটির কথা যে কতখানি সত্য, তা আমাদের দেশের দৃশ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়। নিছক বিলাসিতার খাতিরেই ড্রইংরুম রাজনীতিচক্র বা চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা যা আমাদের দেশে সর্বত্র দৃষ্টি হয়, তা আর কিছু না হোক কার্যকরী প্রয়োগের সহযোগী নয়। বরং ট্রামে-বাসে, রেলের কামরায়; রাজনীতির তর্ক জীবনীশক্তির অপচয়মাত্র।

ছাত্রসংগঠনের প্রশাসন পরিচালনা, ছাত্র সমিতির প্রেসিডেণ্ট, সিনেট প্রভৃতি নির্বাচন, শান্তিমূলক ব্যবস্থার তদারকিতে সাহায্যের জন্য আদালত গঠন ও তার পরিচালনা—এই সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে। পূর্ণাঙ্গ সাধারণ নির্বাচনের মতো এই সব নির্বাচনে ছাত্ররা রাজনৈতিক সচেতনতায় নির্বাচন অভিযান চালিয়ে থাকে। প্রশাসনের কাজকর্ম পরিচালনা পদ্ধতি শেখবার জন্য ওয়াশিংটনে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা-শিবিরে কংগ্রেসের দপ্তরসমূহে শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় এবং এজন্য বহু বৃত্তিদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

আজকের আমেরিকায় সমাজের বিভিন্ন জটিলতার মধ্যে গোটা ছাত্র-সমাজকে আগামীকালের প্রকৃত গুণ-সম্পন্ন নাগরিকে পরিণত করবার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলেছে। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে এক একটা প্রাণপ্রাচুর্যের পূর্ণকুম্ভ হ'য়ে থাকতে পারে; শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতিতে যাতে প্রকৃত শিক্ষালাভ ক'রতে পারে; শিল্পের মূল রীতি, সংস্কৃতির গোড়ার কথা, রাজনীতির নীতিকার্যক্রমের পদ্ধতি সম্বন্ধে যাতে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী তাদের অধ্যয়ন-পর্বেই প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আজ গোটা দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের সৃষ্টি।

• বরিস সিন্ড্রনি (মাঝখানে) ও আইগর বেরুখ্টিস (দক্ষিণে) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

মালয়েশিয়া ঃ

গত ১৭ই আগস্ট অতর্কিতভাবে ইন্দোনেশীয় গেরিলা বাহিনী মালয়েশিয়ার ওপর আক্রমণ সুরু করেছে। সিঙ্গাপুর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে পোণ্টিয়ান অঞ্চলে ইন্দোনেশীয় গেরিলারা মর্টার, হাতবোমা প্রভৃতি নিয়ে আক্রমণ করে। প্রথমে প্রায় ৪০ জন সশস্ত্র লোক এই আক্রমণ সুরু করে, পরে এদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

পরবর্তী সংবাদে জানা যায়, পোণ্টিয়ান অঞ্চলে ইন্দোনেশীয় আক্রমণ অব্যাহত আছে। মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী টুন আবদুল রেজ্জাক এই ঘটনাকে 'প্রকৃত আক্রমণ' (real invasion) বলে অভিহিত করেছেন। নিকটবর্তী জোহোর, মালাক্কা ও নেগরি-সেম্বিলান অঞ্চলে নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মালয়েশীয় সৈন্যবাহিনীর হাতে পোণ্টিয়ান অঞ্চলে যে সব ইন্দোনেশীয় গেরিলা ধরা পড়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার নিয়মিত নৌবাহিনীর সৈন্য, মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে এই দাবী করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার ওপর ইন্দোনেশিয়ার এই আক্রমণ অতর্কিত হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল" মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করার কথা ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো অনেকদিন ধরেই বলে আসছেন। যেদিন পোণ্টিয়ানে গেরিলা আক্রমণ সুরু হয়, সেদিন ১৭ই আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার ঊনবিংশ বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে জাকার্তায় মারডেকা স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সোয়েকার্নো 'মালয়েশিয়া ধ্বংসের' (Crush Malayasia) ধ্বনি দেন। 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল' টুঙ্কু আবদুল রহমান ও তার সাধের মালয়েশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সোয়েকার্নো সকল ইন্দোনশিয়াবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

টুঙ্কু আবদুল রহমানের সাম্প্রতিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিন্‌ডন জনসন ও অন্যান্য নেতারা মালয়েশিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন বলে 'মারডেকা স্কোয়ারের' সভায় সোয়েকার্নো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও এক হাত নিয়েছেন।

সোয়েকার্নো মালয়েশিয়াকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না, এবং যে কোন উপায়ে একে ধ্বংস করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল নেগুইন খান এবার রাষ্ট্রপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রায় সাড়ে ছয় মাস পূর্বে ক্ষমতা দখলের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে নেগুইন খানই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসক। মেজর জেনারেল দুয়ং ভন্‌ মিন্‌ (বড় মিন্‌) নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, সকল ক্ষমতাই ছিল নেগুইন খানের হাতে।

• সোয়েকার্নো

• টুঙ্কু আবদুল রহমান

গত ১৬ই আগস্ট ৫৮ জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে নিয়ে গঠিত 'সামরিক পরিষদে'র সভায় নেগুইন খান রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এই পদে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ত্রান

* নেগুইন খান

থিয়েন খিয়েন। এই সামরিক পরিষদ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জন্য একটি রাষ্ট্রপতি-প্রধান সংবিধানও রচনা করেছেন।

নতুন সংবিধান অনুযায়ী সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। নেগুইন খান এখন রাষ্ট্রপতিরূপে মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। দুয়ং ভন্ মিন্ রাষ্ট্রপ্রধান পদ থেকে অপসারিত হলেও, তিনি সামরিক পরিষদের পরামর্শদাতা থাকবেন, নেগুইন খান একথা ঘোষণা করেছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেগুইন খান বলেছেন, বর্তমানে এদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব নয়। তবে প্রধানত বেসামরিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী জাতীয় সভা গঠন হবে এবং মোট ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ হবেন নির্বাচিত।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন মার্কিন কর্তাদের পরামর্শ ছাড়া নিশ্চয়ই হয় নি। বিশেষ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের সম্মতি এতে আছে। নেগুইন খান রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার পরই বলেছেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু তাঁরা করেন না।' এমনিতেই সকল ক্ষমতা নেগুইন খানের হাতে ছিল, রাষ্ট্রপতি-প্রধান বর্তমান সংবিধানের দ্বারা এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হয়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন কর্তারা একজনের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন অনুভব করছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে:

২৪শে আগস্ট থেকে নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ডেমোক্রাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সানফ্রানসিসকোর কাউ প্যালেসে রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে যে হৈ-হুল্লোড় হয়ে গেল, আটলান্টিক সিটিতে ডেমোক্রাটিক পার্টির এই সম্মেলনে তা না হলেও, সম্মেলনের গুরুত্ব যথেষ্টই আছে।

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ যে, বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিন্ডন জনসন সর্বসম্মতিক্রমে ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত হবেন। একমাত্র প্রশ্ন: উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য কাকে বাছা হবে। জনসন পছন্দ না করলেও ববি কেনেডি এখনও একেবারে হাল ছাড়েন নি। উপরাষ্ট্রপতি না হলেও অন্তত সেনেটে ঢোকার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য জনসনের পছন্দ মনে হচ্ছে—হুবার্ট হামফ্রে।

আটলান্টিক সিটি সম্মেলনে সাধারণ নির্বাচনের জন্য ডেমোক্রাটিক পার্টির বক্তব্য স্থির করতে হবে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি যখন পুনরায় প্রার্থী হচ্ছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই মন্ত্রী ও উচ্চ কর্মচারীরাই প্রধানত এই নীতি স্থির করবেন, তবু দলের নেতারাও এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবেন।

গোল্ডওয়াটার রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থীরূপে যেভাবে উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে ভোট সংগ্রহের প্রয়োজনে ডেমোক্রাটিক পার্টিও কিছুটা দক্ষিণপন্থী মনোভাব গ্রহণ করবে কিনা, তা লক্ষ্য করার বিষয়।

ডেমোক্রাটিক পার্টির কিছু কিছু দক্ষিণপন্থী গোল্ডওয়াটারকে সমর্থন করছেন, এই বিষয়ে আটলান্টিক

* ববি কেনেডি

সিটি সম্মেলনে তীব্র বাদানুবাদ হবে বলে মনে হচ্ছে। মিসিসিপির নিগ্রো প্রতিনিধিরা স্পষ্টভাবেই সেখানকার শ্বেতাঙ্গ ডেমোক্রাটিক

পার্টির নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছেন। উগ্র বর্ণবিদ্বেষী মিসিসিপির নেতারা, নাগরিক অধিকার আইন পাশ করার অপরাধে জনসনকে সমর্থন না করে, গোল্ডওয়াটারকে সমর্থন করছেন। কেবল মিসিসিপি নয়, আলাবামা, এরিজোনা ও আরও কোন কোন্ রাজ্যের নেতৃত্ব সম্পর্কেও একই প্রশ্ন উঠবে।

রিপাবলিকান পার্টিতে যেমন একদল উদারনৈতিক ব্যক্তি গোল্ডওয়াটারকে সমর্থন করবেন না, ডেমোক্রাটিক পার্টিতেও একদল গোঁড়া দক্ষিণপন্থী জনসনের বিরোধিতা করবেন।

বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশেরই

* গোল্ডওয়াটার

ধারণা, জনসন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়লাভ করবেন। তবু গোল্ডওয়াটার যেরূপ দক্ষ সংগঠক ও প্রচারকুশলী তাতে গোল্ডওয়াটারকে পরাজিত করার জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী নির্বাচনী সংগঠন চাই। ডেমোক্রাটিক পার্টিকে জয়ের জন্য তাই সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন:

সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় (asylum) গ্রহণ কোন নতুন ঘটনা নয়। তবে সাধারণত রাজনৈতিক কর্মে যাঁরা নিযুক্ত থাকেন, তাঁরাই এরূপ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এবার দুজন গায়ক এই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

বলশয় ভ্যারাইটি ট্রুপের দুজন গায়ক বরিস মিনডনি ও আইগর বেরুখটিস্ টোকিও বিমান বন্দরে বলশয় গ্রুপের সঙ্গে ইউরোপ যাত্রার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাগ্রহে এদের আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হয়েছে। এই দুজন শিল্পী তাঁদের বিবৃতিতে বলেছেন, 'সোভিয়েট ইউনিয়নে গায়কদের কোন স্বাধীনতা নেই', তাই তাঁরা 'স্বাধীন দুনিয়ায়' বাস করার জন্যই সোভিয়েট ইউনিয়ন ত্যাগ করছেন।

সাইপ্রাস:

সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়সের সঙ্গে কি গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী জর্জ পপিনড্রিউ-এর মতভেদ হয়েছে? শোনা যাচ্ছে, কোক্কিনা গ্রামে তুর্কী সাইপ্রাসবাসীদের বিরুদ্ধে ম্যাকারিয়স যে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, পপিনড্রিউ তা সমর্থন করেন নি। কথা ছিল, তুর্কীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে গ্রীসের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয় নি। এর প্রতিবাদে সাইপ্রাস মুক্তিফৌজের সর্বাধিনায়ক কারামিয়াস পদত্যাগ করে এথেন্স চলে যান। ম্যাকারিয়স জেনারেল জর্জ গ্রিভাসকে তাঁর জায়গায় সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেছেন।

কোক্কিনায় তুর্কী বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে পপিনড্রিউ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলেও, ম্যাকারিয়সের হঠকারিতায় পপিনড্রিউ খুবই ক্ষুব্ধ। তাছাড়া ম্যাকারিয়সের সোভিয়েট ঘেঁষা কথাবার্তাও তিনি পছন্দ করছেন না।

এদিকে সাইপ্রাসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কে এস থিমায়া রাষ্ট্রসংঘ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বর্তমানে এখানে ৬,০০০ সৈন্য আছে। থিমায়ার মতে গ্রীক-তুর্কী বিরোধ দমনে এই সৈন্যসংখ্যা যথেষ্ট নয়।

কিন্তু সৈন্য আসবে কোথা থেকে? রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট তো স্পষ্টই বলেছেন, বর্তমান কার্যকাল (সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) শেষ

* ম্যাকারিয়স

হলে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীকে আর সাইপ্রাসে রাখা যাবে না। কারণ, অর্থের অভাব। এই সৈন্যবাহিনীর জন্য কেউ অর্থ দিতে চাচ্ছে না। বৃটেনও জানিয়ে দিয়েছে, আর অর্থ সে দেবে না।

সাইপ্রাস থেকে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী চলে গেলে যে অবস্থার আরও অবনতি হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইতালী:

ইতালী তথা বিশ্বের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা পালমিরো তোগলিয়ত্তি

৭১ বৎসর বয়সে মারা গিয়েছেন। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে ইয়াল্টায় তিনি মারা যান। অপারেশন করে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি।

কমিউনিস্ট জগতের বাইরে সব চেয়ে সংগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির অবিসংবাদী নেতা তোগলিয়ত্তি ইতালীর রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, বিপ্লব প্রভৃতি প্রশ্নে তোগলিয়ত্তি ক্রুশ্চেভের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিলেন, তবে তিনি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বড্ড বেশি সচেতন ছিলেন। ইতালীর কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন নিয়ন্ত্রণ তিনি সহ্য করতেন না।

সামান্য এক কৃষক পরিবারের সন্তান তোগলিয়ত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ইতালিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। পরে ১৯২১ সালে গ্রামিক্সির সঙ্গে তিনি একযোগে ইতালীতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটানা তিনি এই দলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তোগলিয়ত্তি মস্কোতে ছিলেন। ১৯৪৩ সালে সোভিয়েট সাহায্যে আবার ইতালীতে ফিরে আসেন।

পালমিরো তোগলিয়ত্তির মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন একজন প্রবীণ, উদারচেতা ও প্রভাবশালী নেতা হারাল।

ক্যানাডা:

অটোয়ায় ২১শে আগস্ট থেকে তৃতীয় কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলন সুরু হয়েছে। গত মাসে যখন লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তখনই স্থির হয়েছিল, অটোয়ায় কমনওয়েলথ শিক্ষা সম্মেলনে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে সহযোগিতা প্রসারের বিষয় আলোচনা করা হবে।

ক্যানাডার ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল ভিনসেণ্ট মাকে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছেন। ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ারসন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে

লিস্টার পিয়ারসন

কমনওয়েলথের অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলিকে অনুন্নত দেশে শিক্ষা প্রসারের কাজে অগ্রসর হতে অনুরোধ করেন। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য না পেলে কোন অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নতি করা সম্ভব নয়। এই সব দেশে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য এখনই ব্যাপক অভিযান সুরু করা প্রয়োজন। কমনওয়েলথের সর্বত্র উচ্চশিক্ষা ইংরেজী ভাষায় হচ্ছে, সুতরাং এই সব দেশের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

মাল্টা:

আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর মাল্টা স্বাধীন হবে. লণ্ডনে বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর থেকে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র বৃটিশ উপনিবেশ স্বাধীনতার জন্য অনেক দিন ধরেই দাবী জানিয়ে আসছে। গত মাসে মাল্টার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বর্গ ওলিভিয়ারের সঙ্গে বৃটিশ উপনিবেশ-সচিব ডানকান স্যাণ্ডসের দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয়েছে, মাল্টাকে স্বাধীনতা দেয়া হবে। স্বাধীনতা প্রদানের নির্দিষ্ট দিন স্থির করার জন্য মাল্টার অন্যান্য দলের সঙ্গেও আলোচনা করতে হয়েছে।

ঠিক হয়েছে, মাল্টা কমনওয়েলথের সদস্য থাকবে। মাল্টার যোগদানের ফলে কমনওয়েলথের সদস্য সংখ্যা ১৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১৯। মাল্টা স্বাধীন হলেও প্রজাতন্ত্র হবে না, ক্যানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত বৃটেনের রাজা-রাণীকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে স্বীকার করে নেবে। আরও স্থির হয়েছে, স্বাধীনতা লাভের পর ১০ বৎসর মাল্টায় বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি থাকবে। তারপরও এই ঘাঁটি থাকবে কিনা, তা দুই সরকার আলোচনা করে স্থির করবেন।

২১শে সেপ্টেম্বর মাল্টায় ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরূপে ডিউক অফ এডিনবরা উপস্থিত থাকবেন।

রুমানিয়া:

রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠার বিংশ বার্ষিকী উৎসবে যাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তাঁদের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের নাম নেই। ক্রুশ্চেভের সঙ্গে রুমানিয়ার কমিউনিস্ট নেতা ঝর্গে ঝর্গেউদেজের

যে মনকষাকষি চলছিল, তা কি তা হলে এবার চরমে এসে পৌঁছল?

আদর্শগত বিরোধের ব্যাপারে আলবেনিয়ার মত একেবারে পিকিংপন্থী না হলেও রুমানিয়া সোভিয়েটের কঠোর সমালোচক। রুমানিয়ার ওপর সোভিয়েট নিয়ন্ত্রণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই মনোভাব গড়ে উঠেছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের প্রস্তুতি স্বরূপ সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ১৫ই ডিসেম্বর মস্কোতে যে সম্মেলন আহ্বান করেছে, রুমানিয়া তাতেও যোগ দেবে না বলে জানা গেছে।

চীন ঃ

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতবিরোধ দূর করার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন যে সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, চীন তার ঘোরতর বিরোধী। এতদিন ধরে চীনের নেতারা এই সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এরূপ সম্মেলন আহ্বান করা হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে দলাদলি বৃদ্ধি পাবে। যেন এতদিন দলাদলি কম ছিল।

যাই হোক, এখন যখন সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্মেলন ডাকার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, এবং তার প্রস্তুতি বৈঠক ১৫ই ডিসেম্বর মস্কোতে ডাকা হয়েছে, তখন চীন কি করবে? চীন এই প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

তবে কি চীন তার সমর্থকদের নিয়ে পাল্টা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলন ডাকবে? নিউজিল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মাইক উইলিয়ামের কথা থেকে তাই মনে হচ্ছে। মাইক উইলিয়াম বর্তমানে পিকিং-এ রয়েছেন। তিনি এরূপ একটি সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। অনেকেরই ধারণা, চীনা নেতাদের পরামর্শেই তিনি এই কথা বলেছেন। নিউজিল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি চীনের গোঁড়া সমর্থক, এবং প্রায়ই দেখা গেছে চীনের বক্তব্য আগেভাগে নিউজিল্যাণ্ড কমিউনিস্ট পার্টি মহল থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

পাকিস্তান ঃ

বেরুবাড়ী নিয়ে আয়ুব সরকারের আর তর সইছে না। পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলীতে সেদিন এক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে, পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জলফিকার আলি ভুট্টো বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত সরকার নানারকম টালবাহানা করে বেরুবাড়ী হস্তান্তরে দেরি করছেন। বেরুবাড়ীতে জরিপের কাজ

* ভুট্টো

শেষ করে সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য পাকিস্তান সরকার বারে বারে চাপ দেওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছেন না।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ভুট্টোর এই মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে। বেরুবাড়ীর কয়েক-জন অধিবাসী বেরুবাড়ীতে সীমানা-নির্ধারণ জরিপ ও হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য হাইকোর্টে মামলা করেছেন, এবং হাইকোর্টের নির্দেশে তা বর্তমানে বন্ধ আছে। এ অবস্থায় মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হস্তান্তরের কাজে হাত দেওয়া সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। একথা পাকিস্তান সরকার খুব ভাল করেই জানেন—তাঁদের বহুবার সে কথা সরকারীভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও এভাবে ন্যাশনাল এসেম্বলীতে একথা বলার উদ্দেশ্য নেহাৎই ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো ছাড়া আর কি?

বেরুবাড়ীর ব্যাপারে মামলা চলছে বলেই মুশকিল, না হলে এই অঞ্চল পাকিস্তানকে অর্পণ করতে ভারত সরকার খুবই আগ্রহী। কিন্তু আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্তে যে সব অঞ্চল পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার কথা, সে ব্যাপারে পাকিস্তান চপ্ করে আছে কেন?

* * *

'আজাদ কাশ্মীর' অঞ্চলে ব্যাপক বিদ্রোহের নানারকম খবর আসছে। পাকিস্তান-অধিকৃত এই অঞ্চলে গণতন্ত্রের কোন বালাই নেই, এবং জনসাধারণ চরম দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটায়। মাঝে মাঝেই খবর পাওয়া যায়, এখানকার মানুষ পাকিস্তানী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেষ্টা করছে।

খুরশীদকে 'আজাদ কাশ্মীরের' রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারিত করার পর থেকেই রাওয়ালকোট অঞ্চলের অধিবাসীরা নানাভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে আসছে। গত মাসে এই অঞ্চলে প্রায় ৪00 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য গুলীবর্ষণ করতে হয়েছে, এবং অনেকে গুলীতে মারা গিয়েছেন। সিন্ধুর মচ্ছ জেল বিদ্রোহীতে ভরে গেছে। বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে চলে আসার চেষ্টা করেছে, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী তাদের গুলী করে হত্যা করেছে।

আজাদ কাশ্মীরের সর্বত্র আজ সন্ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কতদিন আটকে রাখা যাবে?

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ কুড়ি ॥

অতএব, গায়ত্রীর সঙ্গে আবার একদিন গুরুদেবের সাথে দেখা করতে গেলেন শর্মিলা। অনেক আলোচনা শুনলেন তাঁর কাছে।

দেখলেন, মানুষটি পণ্ডিত। ইংরেজি জানেন, কোরাণ পড়েছেন, বাইবেলের উদ্ধৃতি দিলেন। শেষে বললেন, আসল কথাই হল মন। সেইখানেই অযোধ্যা, সেইখানেই রামের অধিষ্ঠান। লঙ্কাকাণ্ড তো আর কিছুই নয়, নিজের প্রবৃত্তিগুলোর সঙ্গে শুভ-শক্তির সংগ্রাম। আত্মস্থ হয়ে, সদাচারী হয়ে, প্রাণের ভেতরে এই রামকে জাগিয়ে তোলো—'ব্যস, সব ঠিক হো জায়গা।'

সেদিন অনেক ভক্ত আর উৎসবের সমারোহের ভেতরে গুরুদেবকে অনেকখানি কৃত্রিম বলে মনে হয়েছিল—যেন মানুষকে বশীভূত করার জন্যে রঙ্গমঞ্চের মতো একটা দৃশ্যপট আর পরিবেশ ইচ্ছে করে গড়ে তোলা হয়েছিল। আজ সহজ, স্বাভাবিক, বুদ্ধিমান এবং প্রসন্ন এই লোকটিকে শর্মিলার ভালো লাগল। ধর্মের সম্পর্কে শর্মিলার কৌতূহল বেশি নয়, সে আবহাওয়ায় তিনি বড়ো হয়ে ওঠেন নি; কিন্তু একটি মানুষ নিজের দিক থেকে খাঁটি, চরিত্রে শক্তি আছে, ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথাটাই বলেন অথচ জোর করে কারো ওপরে নিজেকে চাপিয়ে দিতে চান না—এই সততা আর ঔদার্যই শর্মিলাকে খুশি করল।

গায়ত্রীর চোখে অন্য দৃষ্টি। তিনি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর এতদিন ধরে যে মানস-বৈরাগ্যের সাধনা করে প্রায় একটা নিস্পৃহ উদাসীনতার জগতে পৌঁছে গিয়েছিলেন, শর্মিলা বুঝেছেন সেখানেও কোথায় একটা রন্ধ্ররেখা আছে গায়ত্রীর। আজ উপেক্ষা আর কৌতুক দিয়ে সিস্টার শর্মার আহ্বানকে তিনি যতই ঠেলে সরিয়ে দিন, বুকের মধ্যে নিশ্চয় টান পড়েছে তাঁর। আর সেইটেকে প্রাণপণে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যই তাঁর এত বেশি জোর দিয়ে অস্বীকৃতির পালা, এমনভাবে গুরুদেবের কাছে বারে বারে ছুটে ছুটে আসা, এমনি করে মগ্ন হয়ে পুণ্যানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা।

গায়ত্রীর কতটা লাভ হয়েছে, শর্মিলা জানেন না। কিন্তু নিজে তিনি যেন একটু একটু করে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলেন। একসময় মনে হয়েছিল, যে অন্ধ জীবনবন্যা কূলে এসে ঘা দিয়েছে, তার কাছ থেকে পরিত্রাণের বুঝি কোনো পথ নেই কোথাও; শুধু রাঁচীতে এসে কেন, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পালিয়ে গিয়েও তাঁর নিস্তার মিলবে না—পাহাড়ের চূড়োয় উঠে দাঁড়ালেও সেই বন্যা একটা টাইফুনের মতো মুঠি বাড়িয়ে তাঁকে সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এখন যেন দেখতে পাচ্ছেন—বন্যা বন্যাই, তার শক্তির একটা সীমা আছে; শুধু পাহাড়ের চূড়ো নয়—দূরে-দূরান্তেও খোঁজবার দরকার নেই—মনের ভেতরেই মাথা তুলে রয়েছে হিমালয়ের শিখর। কোনো সদ্‌গুরু যদি একবার সেই শিখর-শীর্ষের পথ দেখিয়ে দেয় তা হলে আর ভাবনা থাকে না।

সেখানে কোলাহলহীন চিরকালের স্তব্ধতা; সেখানে বাতাসে দেবধূপের গন্ধ; সেখানে চোখের সামনে একটিমাত্র নক্ষত্রের মতো অমিতাভর স্মৃতি।

সুতরাং শর্মিলাই দিন দুই পরে গায়ত্রীকে বললেন, আজ একবার যাবেন গুরুদেবের কাছে?

গায়ত্রীকে অনুরোধ করবার দরকার ছিল না। তিনি তখনই তৈরি।

পথে যেতে যেতে গায়ত্রী বললেন, আচ্ছা, মিসেস রায়চৌধুরী—

শর্মিলা বাধা দিয়ে বললেন, একটু ছোট করে নাম ধরে বলুন না। শুনতে ভারি খারাপ লাগে কানে।

—আচ্ছা তবে শর্মিলাজী।

—আবার জী কেন?

গায়ত্রী শর্মিলার একখানা হাত নিজের মুঠোর ভেতরে টেনে নিলেন: তাই হবে, নাম ধরেই ডাকব। শর্মিলা।

—বলো বহিন।

—তোমার আমার তো একই দশা। তোমার স্বামী নেই, আমার থেকেও নেই। তোমারও কোনো দায় বইতে হয় না, আমারও কারও জন্যে ভাববার নেই। শুধু মিথ্যে এভাবে খেটে মরছি কেন?

শর্মিলা হাসলেন: কিন্তু গায়ত্রী, একটা কিছু নিয়ে তো আমাদের বাঁচতে হবে।

—ঠিক কথা। কিন্তু এমন করে বেঁচে লাভ কী? চলো—এসব পাট মিটিয়ে দিয়ে চলে যাই এখান থেকে।

শর্মিলা চমকে উঠলেন: কোথায় যাব?

—গুরুজীর আশ্রমে। সেবিকা হয়ে থাকব, আশ্রমের কাজকর্ম করব, সাধন-ভজন করব।

—ওঁর আশ্রমে মেয়েদের থাকবার ব্যবস্থা আছে?

—আছে।—একটা নতুন উৎসাহে গায়ত্রীর চোখ জ্বলে উঠল: জানো, অনেকবার মনে মনে কথাটা আমি ভেবেছি। কিন্তু কেমন একটা অভ্যাসের মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছি। তা ছাড়া গুরুদেবের কাছে কথাটা বলতেও যেন কেমন সংকোচ লাগে। তুমি যদি রাজী হও, তা হলে বলে দেখতে পারি। মনে হয় অনুমতি দেবেন।

—কিন্তু আমি তো তোমার মতো তৈরি হতে পারি নি, গায়ত্রী।

—বহিন, তৈরি হওয়া কি এত সহজ? আমিই কি পেরেছি? সারা জীবনেও কেউ কি পারে? তবু চেষ্টা করতে হয়।

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ভেবে দেখব।

—ভেবে তো দেখতেই হবে। আমারও কি নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়েছে?—গায়ত্রী একটা নিঃশ্বাস ফেললেন: সত্যের 'কষ্টি'তে বিশ্বাসকে যাচাই করতে যাই, কই এখনো তো সোনার দাগ পড়ল না। তাই মধ্যে মধ্যে বড়ো খারাপ লাগে। ইচ্ছে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণপণে আত্মস্থ হই একবার।

শর্মিলা চুপ করেই রইলেন, বিষণ্ণ ক্লান্ত মুখে কী ভাবতে লাগলেন গায়ত্রী। পুরুলিয়া রোডের ওপর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়া খেলে বেড়াতে লাগল। একটা রাধাচূড়ার গাছে অজস্র ফুল ধরেছে, সেই দিকে চোখ পড়তেই শর্মিলার মন চলে গেল মহাকাল পাহাড়ের চূড়োর ওপর; গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুল, বাতাসে কষায় গন্ধ, একটা ঝর্ণার কলধ্বনি—হাজার হাজার প্রজাপতি—

চকিত হয়ে উঠলেন শর্মিলা।

—তোমার কাছে রামচরিত মানস আছে গায়ত্রী?

—আছে। পড়বে?

—আমার হিন্দীর বিদ্যেতে তুলসী-দাস পড়া চলবে না বহিন। 'অওধী' আমি বুঝতে পারব না। তুমি পড়াবে আমাকে?

গায়ত্রী খুশি হয়ে বললেন, নিশ্চয় পড়াব। চমৎকার বই, শর্মিলা। আমার বাবা অত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজির ছাত্রী হলেও ছেলেবেলা থেকে ধর্মশাস্ত্রই আমি পড়ে আসছি। কিন্তু 'রামচরিত মানসের' মতো বই আর দেখি নি, ওর প্রত্যেকটা লাইন যেন ভক্তি আর বিশ্বাসের চন্দন দিয়ে মাখা। এত শান্তি, এত আনন্দ আর কোনো বই থেকে পাওয়া যায় না।

রিক্সাটা বাড়ির সামনে এসে থামল।

ভেতরে পা দিতেই মনে হল, বাড়ির সে আবহাওয়াটা যেন নেই। কোথায় কী ফাঁকা হয়ে গেছে, গুরুদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের সেই চেনা মুখগুলোও আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কম্পাউণ্ডে ঢুকতেই চাকরটা খবর দিল: গুরুদেব এখানে নেই।

গায়ত্রী আশ্চর্য হয়ে বললেন, কিন্তু তাঁর তো আরো ক'দিন থাকবার কথা ছিল।

চাকরটা বললে, হঠাৎ কাল সকালে এক শিষ্যের টেলিগ্রাম এসেছিল এলাহাবাদ থেকে। তারপরে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন। শিষ্য মৃত্যুশয্যায়। পৃথিবী থেকে চলে যাবার আগে তিনি একবার গুরুদেবের চরণ দর্শন করতে চান, শেষবার তাঁর মুখে শুনতে চান রামকথা। তাই গুরুদেব আর থাকতে পারলেন না, কাল রাতেই রওনা হয়ে গেছেন এলাহাবাদে।

—এলাহাবাদ? এলাহাবাদের শিষ্য? —গায়ত্রী একবার ভুরু কোঁচকালেন: মহেন্দ্রপ্রসাদ বর্মা?

—জী হাঁ। ওই নামটাই যেন শুনেছিলুম।

—গুরুজীর একজন প্রধান ভক্ত।—স্বগতোক্তির মতো গায়ত্রী বললেন, অনেক টাকা দিয়েছিলেন আশ্রমের মন্দিরের জন্যে। বর্মাজীও চললেন তা হলে!

'জাই জীওন আঁজুলিকে পানি'—

চাকরটা গায়ত্রীকে ভালো করেই চিনত। বললে, আইয়ে, অন্দর আইয়ে। বাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।

অন্যমনস্কভাবে গায়ত্রী বললেন, আজ থাক, আর একদিন আসব। চলো শর্মিলা।

নিরাশ, ভারী মন নিয়ে দুজনেই গেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। শর্মিলা ভাবছিলেন, মিথ্যেই সকালে এতটা পথ এলেন, কোনো কাজ হল না; এর চাইতে বটানির সেই টেক্সট্ বইটা লেখার চেষ্টা করলে লাভ ছিল। আর গায়ত্রী বোধহয় ভাবছিলেন, এই জীবন। এমনি করেই মৃত্যু আসে—

'ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াল বজাওয়ি'

—আমরা শুনেও শুনতে পাই না।

গেটের বাইরে বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছেন, প্রায় পাশেই একটা ট্যাক্সি থামল। নামলেন মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে, হাঁটু পর্যন্ত শাদা পাঞ্জাবী আর ঢোলা পায়জামা পরা, বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশের বেশি নয়, বেঁটে ধরণের বলিষ্ঠ চেহারা, চওড়া কপালে আর ওলটানো চুলে বুদ্ধির একটা সহজ উজ্জ্বলতা।

ভদ্রলোক হেসে নমস্কার করলেন গায়ত্রীকে।

—এই যে প্রফেসার শর্মা।

—নমস্তে ডক্টর ভৌমিক।

—আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

ম্লানভাবে গায়ত্রী হাসলেন: হাঁ। কিন্তু গুরুজী চলে গেছেন, দেখা হল না।

—তাই বলে ধুলো-পায়ে ফিরে যাবেন—তাও কি হয়? চলুন—চলুন, চা না খাইয়ে ছাড়ব না।—ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে ডক্টর ভৌমিক বললেন, গুরুদেব না-ই রইলেন, আমরা দু-চারজন তো আছি। আমাদেরও একেবারে ভুলে যাবেন না।

গায়ত্রী যেন একটু দ্বিধায় পড়লেন। তারপর হঠাৎ শর্মিলার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল।

—ডক্টর ভৌমিক, ইনি আমার কলিগ মিসেস রায়চৌধুরী। আপনার সাবজেক্টই পড়ান। আর শর্মিলা, ইনি ভৌমিকজীর বড়ো ছেলে ডক্টর প্রভাকর ভৌমিক—বটানির ডক্টরেট, বিহার গভর্নমেণ্টের ফরেস্ট রিসার্চে আছেন।

প্রভাকর বললেন, নমস্কার—নমস্কার। আপনিও বটানির লোক? তা হলে মিসেস শর্মা, ওঁর অনারেও একটু বসে যাওয়া উচিত আপনাদের।

শর্মিলা লক্ষ্য করলেন, গায়ত্রী তবুও যেন সহজ হতে পারছেন না, কোথায় কী একটা তাঁর বাধছে। বললেন, আজ তা হলে থাক ডক্টর ভৌমিক, আমরা বরং আর একদিন—

গায়ত্রী অনুভব করলেন, কেমন যেন অসৌজন্য ঘটছে তাঁদের দিক থেকে। জোর করে হাসলেন একটু।

বললেন, আপনার সেই স্পেশ্যাল লেমন-টী যদি খাওয়ান, তা হলে বসতে রাজী আছি কিছুক্ষণ।

—ওহো, লেমন-টী! হা-হা করে হাসলেন প্রভাকর: দেন ইউ হ্যাভ চেঞ্জড্ ইয়োর টেস্টস্ এ বিট? সেবার কিন্তু খেয়ে একদম খুশি হন নি।

—কী করে বুঝলেন খুশি হই নি?

—আপনার মুখ দেখে।

—আপনার অনুমান যে সত্যি নয়, সেটা প্রমাণ করব। চলুন।

সুতরাং আবার ফিরতে হল দুজনকে।

বাড়ির কর্তা তখন একদল মক্কেল আর একরাশ নথিপত্র নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। সাত-আট দিন ধরে গুরুর সেবা নিয়ে বিব্রত ছিলেন, এখন স্তূপাকার কাজের নীচে চাপা পড়েছেন। সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে।

—আসুন, আসুন। গুরুদেব কাল হঠাৎ—

গায়ত্রী বললেন, শুনেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না, কাজ করুন। আমরা ডক্টর ভৌমিকের সঙ্গে গল্প করব।

—আচ্ছা—আচ্ছা—কিন্তু মনে করবেন না—আমি—কয়েকটা জরুরি কেস—খোকা, এঁদের একটু চা-টা—

খোকা অর্থাৎ প্রভাকর বললেন, সব হবে বাবা, তুমি ভেবো না।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার ফাইলের স্তূপে বিলীন হলেন ভদ্রলোক।

টানা বারান্দার ডান দিকে উকিলবাবুর ঘর, বাঁয়ে ড্রয়িংরুম। মাঝখানে বড়ো হলটা খালি, শুধু কয়েকটা ফরাস পড়ে আছে এখনো। সাজানো রয়েছে গুরুদেবের বেদীটা। সেদিকে তাকিয়ে গায়ত্রী নিঃশ্বাস ফেললেন।

ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকলেন তিনজনে। প্রভাকর বললেন, বসুন এক মিনিট, চায়ের কথা বলে আমি এখুনি আসছি।

সাজানো বসবার ঘর, যেমন হতে হয়। কিন্তু সোফায় বসতে গিয়েও শর্মিলা অন্যদিকে আকৃষ্ট হলেন। কাচের সারি সারি জানলার পাশে পাশে নানারকমের পাত্রে বিচিত্রবর্ণ পাথরের টুকরোর ওপর বিভিন্ন জাতের

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

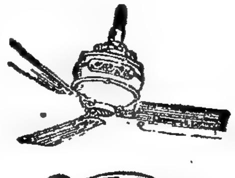

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

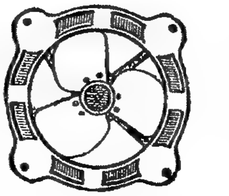

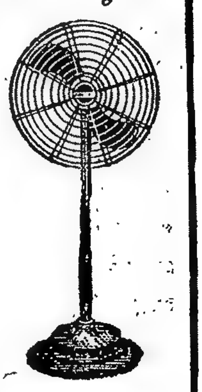

ক্যাক্টাস সাজানো। তাদের একটিতে কমলারঙের একটি ফুল দীর্ঘ বৃন্তের ওপর শিখার মতো ফুটে উঠেছে।

ক্যাক্টাস!—তাঁর নেশা। সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন শর্মিলা।

গায়ত্রী বসে পড়েছিলেন। হেসে বললেন, বটানিকাল ইণ্টারেস্ট?

শর্মিলা বললেন, হ্যাঁ। কয়েকটা রেয়ার স্পেশিমেন দেখছি ক্যাক্টাসের। বাড়িতে যে বটানিস্ট আছেন, সে বুঝতে পারা যায়।

একটু পরেই ফিরে এলেন প্রভাকর।

—কী দেখছেন? ক্যাক্টাস?

শর্মিলা প্রভাকরের দিকে তাকালেন: কয়েকটা একেবারে নতুন ধরণের। দু-একটার ছবি যেন কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু—

প্রভাকর হাসলেন: এখানকার নয়, বাইরে থেকে আনানো। তবে মরুভূমির মাটিতে রোদে আর শীতে যে-ভাবে আনন্দে বাড়তে পারত, এখানে আর সে সুযোগ কোথায় পাবে। জাপানী 'বোন-সাই'য়ের মতো অস্তিত্ব রক্ষা করে টিকে আছে—এই যা।—প্রভাকর একটা পোসিলেন ভাসের দিকে আঙুল বাড়ালেন: এই যে একে দেখছেন—লম্বা একটা ল্যাটিন নাম উচ্চারণ করে বললেন, দশ-বারো ফুট পর্যন্ত ওঠে। তারপর মাথার ওপর তুলে ধরে আরো দশফুট একটা স্টক—তার মাথায় ছাতার মতো ফুল ধরে—কী তার রঙ! এদেশেও দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে এর একটা গ্রুপ দেখা যায়, কিন্তু এর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

শর্মিলা বললেন, আমার অদ্ভুত লাগে এদের।

প্রভাকর মাথা নাড়লেন: অদ্ভুতই বটে। বাইরে রুক্ষ নিষ্ঠুর, কাঁটায় সশস্ত্র হয়ে রয়েছে, মরা মাটিতে যেখানে একফোঁটা জল মেলে না—আশ্চর্য শক্তিতে সেখানেও প্রাণ সংগ্রহ করছে। নুড়ি ছড়ানো তামাটে মরুভূমি, জানোয়ারের শুকনো পাঁজরা রোদে শুকিয়ে আছে, আর সেখানে কয়েকটা ক্যাক্টাস দাঁড়িয়ে—এই হল মৃত্যুর ছবি। কিন্তু হঠাৎ একদিন ওদের বুক চিরে যখন উজ্জ্বল রঙের একটা ফুল ফুটে ওঠে—তখন বোঝা যায়, আসলে এতদিন দুঃখের তপস্যা করছিল, এইবারে সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। তখন চেনা যায়, ওরা মৃত্যুর প্রহরী নয়, মরণের ভেতরে জীবনের তপস্যা করছে।

শর্মিলা বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি সাহিত্যচর্চা করেন নাকি ডক্টর ভৌমিক?

—ক্ষেপেছেন। ও-সব রোগ আসে ইনডাইজেশন আর ইনসোমনিয়া থেকে। ক্যাক্টাস আমার প্রিয় জিনিস, তাই তাকে নিয়ে একটু কাব্য করে ফেললুম। কিন্তু দোহাই আপনার, এ থেকে আমার সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুবেন না।

শর্মিলা বললেন, কিছু মনে করবেন না, আমিও ক্যাক্টাস নিয়ে একটা পেপার তৈরি করবার কথা ভাবছি কিছুদিন থেকে। আপনার কি কোনো হেল্প পেতে পারি না ডক্টর ভৌমিক?

—তার মানে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাবে?—প্রভাকর হেসে উঠলেন: না, ওটা অন্যায় বলা হল, আপনাকে অন্ধ বলব আমি কোন্ সাহসে?

—ঠাট্টা নয়।—শর্মিলা গম্ভীর হলেন: আমি সত্যিই আপনার সাহায্য চাইছি।

—আমি কী সাহায্য করব—কী জানি? তবে বিদ্যের ফাঁকিটা ধরে ফেলবার জন্যে সত্যিই যদি আপনার কৌতূহল হয়ে থাকে, আপনাকে সে সুযোগ দিতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু আমি তো পাটনায় পোস্টেড্—মাঝে মাঝে আসি এখানে।

—তখন এসে খবর আপনাকে। পাটনা পর্যন্তও তাড়া করতে পারি—সেটা কিছু অসাধ্য হবে না।

এবার গলা-খাঁকারি দিলেন গায়ত্রী।

—ডক্টর ভৌমিক, লেমন-টী খাওয়ানোর কথা ছিল—আমাকে চুপ-চাপ বসিয়ে রেখে বটানিক্যাল ডিস্কাশনের নয়।

শর্মিলা আর প্রভাকর দুজনেই লজ্জা পেলেন। এতক্ষণ যেন গায়ত্রীর অস্তিত্বের কথা তাঁদের খেয়ালই ছিল না।

প্রভাকর জিভ কেটে বললেন, সরি মিসেস শর্মা, এক্সট্রিমলি সরি। আন্-কনডিসন্যাল অ্যাপলজী চাইছি। একজন দলের লোক পেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলুন। নো মোর ক্যাক্টাস—আসুন মিসেস রায়চৌধুরী, বসা যাক।

মৃদু স্বরে শর্মিলা বললেন, আমার নাম শর্মিলা।

প্রভাকর বললেন, রবীন্দ্রনাথের একটা উপন্যাসে নামটা পেয়েছিলুম মনে হচ্ছে—আই লাইক ইট। আসুন শর্মিলা দেবী। মিসেস শর্মা—হিয়ার ইজ্ ইয়োর লেমন-টী।

চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল চাকরটা।

তারপর চা খাওয়া, এলোমেলো গল্প, সাঁওতাল পরগণা—হাজারীবাগ—গয়া ডিস্ট্রিক্টের বন-বাদাড়ের কাহিনী। বিহারের বনভূমি যে কত সমৃদ্ধ, এ নিয়ে প্রপার রিসার্চ কিছু হয় নি, এ নিয়ে প্রভাকরের আক্ষেপ, তার সঙ্গে গায়ত্রীর সৌজন্যের খাতিরে সায় দিয়ে চলা।

এবার চুপ করে বসে রইলেন শর্মিলাই। কমলারঙের একটা ঝুমকোর মতো ক্যাক্টাসের মঞ্জরীটি হাওয়ায় দুলছে। ঠিক যেন কৃষ্ণচূড়ার রং। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া রাশি রাশি ফোটে, রাশি রাশি ঝরে, আর ক্যাক্টাসের একটিমাত্র ফুল ফোটানোর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর। সে শুধু ফুল নয়, মৃত্যুর বুকে জীবনের তপস্যা।

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ দর্শন

● ঝাঁটা, লাঠি, চাবুক নিয়ে শোভাযাত্রা

রাজধানী :

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একদিন কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের শহর, মিছিল নগরী' বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেদিন সত্যি কলকাতা মিছিল নগরী ছিল কিনা আমরা তা নিয়ে কোন দর্শনতত্ত্ব আপনাদের সম্মুখে রাখছি না। কিন্তু আজ কলকাতা বোধহয় শুধু মিছিল নগরী নয়—লাইনের শহর।

লাইন ই যেন আজকের কলকাতার প্রাণ;, আজকের কলকাতার মর্মবোধি। চাল, চিনি, মাছ তার জন্ত লাইন তো আছেই, রেশন কার্ডের জন্তও লাইন। সন্ত কলকাতায় আবার সর্ষের ভূতের পর নেমকের হারামি সুরু হয়েছে। লবণ সত্যাগ্রহ আমরা ইতিহাসে পড়েছি, কেউ কেউ হয়তো লবণ সত্যাগ্রহে অংশও গ্রহণ করেছিলেন, সেদিন কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতা শহরে লবণের জন্তও লাইন দিতে হবে একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিলেন।

লবণ এখন আর ভাববার কথা নয়, ভাবনার কথা। যদিও নেতৃবৃন্দ আকাশ-বাণীর ভাষায় আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, কিন্তু সে আশ্বাসে জীবনের শ্বাস নেই—তাতে জনসাধারণের বিশ্বাস আছে কিনা তা কে বোঝাবে তাঁদের। মাছের আশ্বাস, তেলের আশ্বাস, চালের আশ্বাস সবই তো হ'ল তবু জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এগুলো এসেছে কি? আসে নি। এ কথা নতুন করে বলার কিছু নেই। এবং সমস্যা বেড়েছে। মাছের বাজার ফাঁকা হয়ে শহরের অলি-গলির আনাচে-কানাচে রুই-কাৎলাদের দেখা মিলছে চড়া দরে। অগ্নিমূল্যে।

অগ্নিমূল্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বর্তমানে বাড়লেও এই 'অগ্নিমূল্য' শব্দটি আজকের নতুন নয়। কিন্তু এত সব পরিচিত জিনিসের মধ্যে মাঝে মাঝে আমাদের নতুন শব্দের সাথে পরিচয় ঘটে। আগমার্ক বুলি এমনি একটি শব্দ। সরকারের ভাষায় বিশুদ্ধতা, পবিত্রতার প্রতীক আগমার্ক। যদিচ এই 'আগমার্ক' কথাটি ভারত সরকারের বহুদিনকার একটি লালিত শব্দ। তবু ইদানীং এই আগমার্ক যেন আমাদের কাছে নতুন সত্যের মতই এসেছিল।

ব্যবসাজগতের রাঘব বোয়ালরা যখন সর্ষের তেলের মধ্যে শিয়ালকাঁটা, বাদাম তেল, তিসির তেল, এমন কি সায়ানাইড বিষ মিশিয়ে আমাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত করছিল—তখন সদাশয় সরকার আমাদের প্রাণ রক্ষার মহান দায়িত্ববোধে সর্ষের তেলকে আগমার্ক চিহ্নিত করবার প্রস্তাব নিলেন। শোনা যায় এর মধ্যেই এ-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত দপ্তরে বিশেষ কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের সঙ্গে আমরাও ভেবে-ছিলাম—এবার বুঝি তেলের ভেজাল থেকে বাঁচবো।

কিন্তু বাদ-সাধলো আগমার্ক সম্পর্কে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌরাষ্ট্র ঘি সম্পর্কে রায়। আগমার্ক চিহ্নিত ঘিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষায় জান্তব চর্বি আবিষ্কৃত হয়েছে। আগমার্ক পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার প্রতীক সরকারী এই প্রদর্শনীপত্র এর পরেও জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবে কিনা তা সত্যি ভাববার বিষয়। স্বভাবতই জনসাধারণের মনে আগমার্ক ঘিয়ের মতো আগমার্ক তেলও সন্দেহের প্রশ্ন তুলবে।

আমরা এ বিষয়ে সরকারের কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই—আপনারা স্বদেশী যুগে পরাধীন ভারতবর্ষে এক-শ্রেণীর ব্যবসায়ীমহলকে দেখেছিলেন, যারা স্বদেশী শিল্পকে চুরমার করতে সেদিন ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে-ছিল, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেদিন এই ব্যবসায়ীমহলকে ভারত-আত্মা লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা সতর্ক করেছিলেন। আজ আবার সেদিন এসেছে, যেদিন লুব্ধ ঘৃণ্য স্বদেশদ্রোহী ব্যবসায়ীমহলকে আবার সতর্ক করে দেওয়া দরকার।

আগমার্ক সততার প্রতীক—এই বললেই যথেষ্ট হবে না, আমরা কাকের মতো চোখ বুজে এই সততার প্রতীককে একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীমহলের হাতে যেন তুলে না দিই। কেন না সৌরাষ্ট্রের ঘৃত ব্যবসায়ীদের হাতে আগমার্ক

প্রত্যাকের যে পরিণতি লাভ হ'ল তারপর নিশ্চয়ই আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। আমাদের হাতকে এ বিষয়ে সবল করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে, এই সব অসাধু ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই সায়েস্তা হবে।

কিন্তু এ বিষয়ে সরকার শুধু সবল পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে আগমার্কের সততাই শুধু বিনষ্ট হবে না—আগমার্ক প্রথার প্রধান উদ্দেশ্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিশ্চিত বাজার সৃষ্টি করাও অসম্ভব হবে। সরকার যদি আগমার্ক সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে আনতে চান, তবে যাতে আগমার্কের মধ্যে ভেজাল ব্যাধির বীজ প্রবেশ করতে না পারে কঠোরভাবে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

• • •

সেদিন শিয়ালদা বুঝি একটি গল্প হয়েছিল। করুণরসের একটি গল্প। দু'টি অল্পবয়স্ক শিশুর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল শিয়ালদা। একদিন এদের সবই ছিল, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন সব। আজ বুঝি কেউ নেই। শিয়ালদার ভিড়ের মধ্যেও ওরা একা। কয়েকদিন ধরেই ওরা কাঁদছিল ক্ষুধার জ্বালায়। সেই ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে না পেরে ওদের বাবা ওদের প্রকাশ্য পথে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল শিয়ালদার ভিড়ের মধ্যে। এ গল্প আগে হয় তো অকল্পনীয় ছিল—কিন্তু আজ এ ঘটনা বাস্তব সত্য। জিনিসপত্রের দুর্মূল্যে মানুষের জীবন-ধারণের শক্তি যে ক্রমশ ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে তা দেশের নেতৃবৃন্দের নজরে না পড়লে কালপুরুষের চোখ বুঝি তা এড়ায় না। প্রাসাদপুরী কলকাতাই শুধু আসল কলকাতা নয়—কলকাতার বস্তি, এঁদো গলিও কলকাতাই। সেখানের মানুষের পেটের জ্বালা, খাদ্যদ্রব্যের আকাশ-ছোঁয়া দর জীবনের আর এক সত্য। ক্ষুধার আগুনে হাত পোড়ে না সত্য কিন্তু রাজ্য জ্বলে যায়। বিগত ইতিহাস বহুবার একথা আমাদের বলেছে। পিতামাতা হারানো সেই শিশু দুটির চোখের জলে সেই ইতিহাসই যেন আবার দেখলো কলকাতা। এ প্রসঙ্গে দেশের ভাগ্যবিধাতাদের কাছে বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতার একটি কলি—'ক্ষুধাতুর ছেলে চায় না স্বরাজ' তুলে ধরে এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করতে চাই, তাঁরা যেন এই জ্বালাময়ী কবিতার সত্য উপলব্ধি করেন। তাঁরা যেন আর ক্ষুধার আগুন নিয়ে খেলা না করেন।

• • •

কলকাতায় রঙ বেরঙ-এর মিছিল বেরিয়েছে; অভিনব মিছিলও কলকাতায় নতুন নয়, কিন্তু তবু সেদিন কলকাতা ঝাঁটা লাঠি চাবুক হাতে কয়েক শত পুরুষ ও মহিলাদের যে মিছিল প্রত্যক্ষ করল তা শুধু অভিনব নয়—সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন ধর্মের। পৌরকর্মচারীদের অবহেলায় কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল যেভাবে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে জীবনধারণের গ্লানিতে প্রতিমুহূর্তে অবগাহন করছে কিংবা নিত্য সঞ্চিত আবর্জনার নরকে শহরের দরিদ্র অঞ্চল পর্যুদস্ত হচ্ছে, এ মিছিল তারই জীবন্ত প্রতিবাদ, তারই চলমান বিক্ষোভের ঊর্মিমালা।

কলকাতা পৌরসভার দায়িত্বহীনতা ও কর্তব্যকার্যে অবহেলার বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কর্তব্যকার্যে অবহেলা না হলে কলের জলের পাইপে সাপ, কিংবা সামান্য বৃষ্টিপাতে কলকাতায় বন্যা হতে পারতো না। কলকাতার বস্তী অঞ্চলে কলকাতা পৌরসভার কোন কাজ আছে কিনা তা জলকল, বাতি কিংবা পায়খানার অব্যবস্থা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। বৃষ্টির দিনের কথা বাদ দিয়ে বছরের অন্যান্য সময়ের কথা ধরলেও সেখানে কোন পৌরসভার অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। এই ঝাঁটা লাঠি চাবুক হাতে আজ যাঁরা কলকাতার রাজপথে বেরিয়েছেন তাঁরা যে কলকাতার সেই সব দরিদ্র অঞ্চলের লোক তা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা পৌরপিতাদের উদ্দেশ্যে বলবো···সময় থাকতেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে যাতে এই অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দিন। কেন না শঙ্করমাছের চাবুক হাতে নাগরিকরা যদি পৌরসভা ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হন তখন নিশ্চয়ই আমাদের ভেবে দেখতে হবে সমস্যার গভীরতা কতো, বিক্ষোভের মূর্তি কতো জ্বালাময়ী! শঙ্করমাছের চাবুকের আঘাত গায়ে লাগে নি সত্য, কিন্তু তাই বলে আঘাত যে আসবে না তা কে বলতে পারে। যন্ত্রণা সইতে সইতে কলকাতা নগরবাসীর মন এখন সম্প্রতি

● চাল, তেল বা মাছের জন্য নয়, রেশন কার্ডের দরখাস্ত-ফরম সংগ্রহের জন্য লাইন।

স্রবণ হয়ে গেছে, কর্তৃপক্ষকে এ-কথাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

* * *

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর শততম জন্মদিবস কলকাতায় পালিত হয়েছে। যিনি বিজ্ঞানের কঠিন জিজ্ঞাসাকে বাংলা সাহিত্যের রসচিন্তায় সরলীভূত করে, দর্শনের মননশীলতাকে জীবন-চেতনায় প্রোজ্জ্বল করে সাহিত্যের ভাণ্ডারকে নবরূপে বিকশিত করেছেন,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সেই রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালী সংস্কৃতির এক মহৎ সেতু। বাঙালীর অতীতকে তিনি তাঁর আজীবন সাধনায় বাংলা দেশের কাছে মূর্ত করেছেন। জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, আবেগের সঙ্গে যুক্তির মহৎ চেতনায় শাণিত জীবনবোধে রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সৃজনশীল বৈদগ্ধ্যের সুষম প্রকাশে ভাস্বর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে ভারতীয় দর্শনের পটভূমিতে তিনিই বোধহয় প্রথম বাংলা সাহিত্যে মূর্ত করেন। আজ জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বসু যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার আলোড়ন শুরু করেছেন, যা ইতিমধ্যেই দেশের বিদগ্ধজনের চিন্তার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে—তার সুরু বোধহয় করেছিলেন সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাধক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। আজ আমরা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো তেজস্বী বাঙালী—মাতৃভাষার অক্লান্ত সাধকের শততম জন্মবার্ষিকী পালন করে যেন অতীত বাংলার ঐতিহ্যকে বাংলার এই দুর্দিনে নতুনভাবে উপলব্ধি করছি। চিরসুন্দর রামেন্দ্রসুন্দরের তেজস্বিতা, স্বাজাত্যবোধ বাঙালীর জীবন-মানসকে নতুনভাবে গঠন করুক—তাঁর শততম জন্মবৎসরে আমরা এই কামনা করছি এবং তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

চব্বিশ পরগণা:

হাড়োয়া থানার রাণীগাছিতে বিদ্যাধরী নদীর সামান্য বাঁধ ভেঙে প্রায় আট হাজার বিঘা উর্বরা চাষের জমি আজ দীর্ঘ চার বছর ধরে লোনাজলে ডুবে আছে। বলা বাহুল্য, এই আট হাজার বিঘা জমির ফসল খাদ্য-ঘাটতি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপেক্ষণীয় নয়। এই বাঁধ ভাঙার প্রথম বছরে সরকার জনৈক কন্ট্রাক্টার দ্বারা বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেটুকুও মেরামত করা হয়েছিল, সেটুকুও নাকি অজ্ঞাত কারণে ভেঙে যায়। কাজেই সরকার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এ বাঁধ আর মেরামত করা হবে না। সরকারী এই সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে একান্ত দুর্জ্ঞেয় মনে হচ্ছে। যেখানে দেশে বড় বড় বহু দুরন্ত নদীকে সুউচ্চ বাঁধ দিয়ে জব্দ করা হচ্ছে, সেখানে বিদ্যাধরীর মতন একটি ছোট নদীর বাঁধ মেরামত করা যায় না—একথা কি বিশ্বাস্য। বর্তমান খাদ্যসংকটের দিনে এরূপ আট হাজার বিঘা উর্বরা জমির ফসল থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করে সরকার কি কৃত্রিম খাদ্যসংকট সৃষ্টিতে সাহায্য করছেন না।

পুরুলিয়া:

পুরুলিয়া জে কে কলেজটি প্রায় চোদ্দ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিদের দ্বারা কলেজটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। মাস সাতেক আগে আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় তদানীন্তন জেলা শাসকের বিশেষ প্রচেষ্টায় কলেজটি স্পনসার্ড কলেজে পরিবর্তিত হয়। সুরু থেকে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসরুমের অভাব ছিল। নানা অসুবিধের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে আসছিল।

ক্রমে কলেজে ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে, কিন্তু কলেজ-গৃহের কোন পরিবর্ধন উন্নতি হয় নি। কলেজে আটটি ক্লাস আছে, কিন্তু ঘর মাত্র চারটি। কলেজে কোন কমনরুম নেই, কলেজ লাইব্রেরীতে কলেজের গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের পড়বার মত বই নেই। কলেজে ছাত্রীদের জন্য আলাদা কোন পড়ার ঘর বা বসবার ঘর নেই, একটি ভাঙা জল পড়া গ্যারেজ মেয়েদের বসবার জন্য দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ভাল ল্যাবরেটরী বা নিত্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। বিজ্ঞানচর্চার জন্য গ্যাস-এর কোনরূপ ব্যবস্থা নেই, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের জন্য ছাত্রদের স্পিরিট ল্যাম্প দেওয়া হয়, কিন্তু প্রায়ই স্পিরিটের অভাবে ছাত্ররা ল্যাম্প জ্বালাতে পারে না। কলেজে প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস নেই, বিদ্যুৎও নেই এবং ল্যাবরেটরীটি এত ছোট ও সংকীর্ণ যে ছাত্ররা নড়াচড়া করতে পারে না। ডার্করুম নামে যে ঘরটি আছে, তাতে অন্ধকারের বদলে আলোই বেশি আসে। চোদ্দ বছরের পুরানো কলেজে অনার্স নেই। কমার্স ও বায়ওবিজ্ঞানে ডিগ্রি পর্যন্ত পড়বার জন্য কোন অনুমোদন লাভ করে নি। কলেজে সাইকেল রাখবার কোন চালা বা ঘর নেই। বেশির ভাগ ছাত্র দূর থেকে সাইকেলে করে কলেজে পড়বার জন্য আসে।

কোন খেলাধূলার ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের জলযোগ করবার জন্য কোন ক্যান্টিন নেই বা তাদের ব্যবহারের জন্য কোন ঘরও নেই। নামেমাত্র দু-একটি সংবাদপত্র নেওয়া হয়, তাও আবার সময়মত পাওয়া যায় না। কলেজের যে হোস্টেলটি আছে তাতে মাত্র কয়েকটি সিট আছে। বেশির ভাগ ছেলে গ্রামাঞ্চল থেকে পড়বার জন্য আসে, কিন্তু তাদের সকলের থাকবার জন্য হোস্টেল নেই। কলেজ ইউনিয়ন আইনসঙ্গতভাবে পরিচালিত হয় না বা তার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করা নেই। কলেজের ঘরগুলিতে জল পড়ে, তা মেরামত করার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব-অভিযোগগুলির প্রতি অবিলম্বে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে বলে আশা করি।

গ্রন্থমেলা

অজিত দত্তের কবিতা-সংগ্রহ ঃ শ্রীআশুতোষ ঘোষ কর্তৃক ৩।১ অক্রূর দত্ত লেন, কলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। দাম ঃ সাত টাকা।

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি শ্রীঅজিত দত্তের একটি কবিতা-সংগ্রহের গ্রন্থাভাব দীর্ঘকাল ধরে আমাদের পীড়া দিচ্ছিল। বোধহয় অজিত দত্তই কল্লোলযুগীয় একমাত্র কবি, যিনি প্রবন্ধ ও ছদ্মনামে কিছু স্মরণীয় রচনা ছাড়া গল্প উপন্যাসের মোহে আকৃষ্ট হন নি। গল্প বা উপন্যাস রচনায় শ্রীদত্তের যে শক্তি ছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায় ; সেই প্রমাণ তাঁর কবিতার শরীরেই বর্তমান রয়েছে। এই কারণে মনে হয়, অজিত দত্তের কবিতাসমূহের পাঠকগোষ্ঠী এমন ব্যাপক। তাঁর কবিতা পড়ে মানব-চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন, সমাজের সুখ-দু:খের প্রতি একটা জিজ্ঞাসা ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে একটা অভিনব চেতনার সৃষ্টি হয়। অতি অল্প পরিসরে অজিত দত্তের কাব্যপ্রতিভার সামান্যতম পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব ব্যাপার। সেই হেতু বর্তমান কবিতা-সংগ্রহটি সম্পর্কে মাত্র দু-চার কথা বলার চেষ্টা করা হোল। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের কাব্যসাধনায় শ্রীঅজিত দত্ত মেজর পোয়েট হিসেবে পরিগণিত। কিন্তু যে সাধনার বলে আজ তিনি কাব্যরসিকদের সমস্ত অন্তর জয় করতে পেরেছেন, তার ধারাবাহিক ইতিহাস এই সংকলন-গ্রন্থেই বিধৃত রয়েছে। একদা প্রথম যে কাব্যগ্রন্থ 'কুসুমের মাস' প্রকাশিত হওয়ার পর অজিত দত্তের প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছিল, সেখান থেকে করে বর্তমান সংগ্রহে রয়েছে 'পাতালকন্যা,' 'নষ্টচাঁদ', 'পুনর্ণবা', 'ছড়ার বই', 'ছায়ার আলপনা', 'জানালা' কাব্য-গ্রন্থগুলি থেকে গৃহীত অসংখ্য কবিতা। তৎপরবর্তীকালে রচিত কিছু কবিতাও (যা অন্য কোনো কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নি) রয়েছে। অভিজাত কবিদের কবিতার ধারাবাহিকতা বোঝার জন্যও

জয়ন্তী সেন

এই সংগ্রহ আদর্শস্বরূপ। যেমন 'কুসুমের মাস-এ' দেখেছি 'মালতী ঘুমায়', 'মালতী' 'পাতালকন্যা' কাব্যগ্রন্থেও রয়েছে :

> 'মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের
> মত চঞ্চল উদ্দাম,
> মালতী, সেখানে আমি আমার
> স্বাক্ষর রাখিলাম।'

দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাঁর কাব্য-সাধনা, তাঁর কাব্যে সহজেই সচেতন মনের প্রবেশাধিকার লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মানুষের বাদুড়ঝোলা অবস্থা সবকিছুই কবি লক্ষ্য করেছেন—কিন্তু সবকিছুতেই রয়েছে কবির অখণ্ড জীবনবোধ। তাই বাস্তবধর্মী চিন্তা কাব্যরসসিক্ত হয়ে পাঠকচিত্তে পরম পরিতৃপ্তি দান করে। কিছু সার্থক অনুবাদ-কবিতার সমাবেশে সংগ্রহটি সবদিক দিয়েই মূল্যবান। বিশেষত একটা কথা মনে রাখা দরকার, অজিত দত্তের খণ্ড খণ্ড কাব্য-গ্রন্থ প্রায় দুর্লভ, তাই উপযুক্ত কবিতা-সংগ্রহ সকলের কাছে সানন্দে অভিনন্দিত হবে। কবি-লিখিত ভূমিকাটিও কবির কবিতা রচনার ইতিহাসরূপে বিশেষ-ভাবে স্মরণীয়।

সংকলিত কবিতা ঃ মণীন্দ্র রায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ চার টাকা।

পূর্বে প্রকাশিত ন'টি কাব্যগ্রন্থের ও কিছু নতুন কবিতার সংযোজনে মণীন্দ্র রায়ের সংকলিত কবিতা। শ্রীমণীন্দ্র রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু-মদন' ১৯৩৯-এ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্বেই তিনি যে কবিতার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। দীর্ঘকালের অখণ্ড সাধনার মধ্য দিয়ে আজ তিনি কবি-জীবনের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। 'ত্রিশঙ্কু মদন' থেকে সুরু করে 'একচক্ষু (১৯৪২)', 'ছায়াসহচর (১৯৪৪)', 'সেতুবন্ধের গান (১৯৪৮),' 'অন্য পথ (১৯৫১),' 'কৃষ্ণচূড়া (১৯৫৫)', 'অমিল থেকে মিলে (১৯৫৮)', 'মুখের মেলা (১৯৫৯)', 'অতিদূর আলোরেখা (১৯৬২)',-এর ভিতর দিয়ে নতুন কবিতার মধ্যে এলে দেখা যায় যে, কবি একটা গভীর জীবন-দর্শনের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য রেখে সাধনার উচ্চতর স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আনন্দের ব্যাপার, লক্ষ্য ভেদ করে যেভাবে তিনি পাঠক-চিত্তে অলৌকিক আনন্দ সম্প্রসারিত করেছেন—তা তাঁর সমসাময়িক কবিদের নিকট একান্তই ঈর্ষার যোগ্য।

কবিতার অবয়ব রচনাতে তিনি শুধু সিদ্ধহস্ত ন'ন,—তার বৈচিত্র্য একালের অনেক কবির অনুকরণীয়। 'নীরজার ইতিহাস', 'পাইলট অজিত নাগ', 'ইয়াসিন মিয়া' প্রভৃতি কবিতা রচনা করে একদা শ্রীরায় আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন—কিন্তু তাদের রচনার ইতিহাস শুধু 'মুখের মেলা'তেই নয়, পূর্ববর্তী কাব্যেও তার বীজ লক্ষ্য করা যায়। ঐ সঙ্গে জাগতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় হয় আমাদের। মণীন্দ্র রায়ের 'সংকলিত কবিতা' শুধু পড়ার জন্য নয়, যথার্থ কাব্যের সঙ্গে অপরকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যও সমাদৃত হবে।

বাণিজ্যে সেকাল ও একাল

ধনপতি সওদাগর

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অষ্টম প্রবাহ

"বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে চীনদেশীয় সম্রাটদের অবদান শুকতারার মত জল জল করছে।"

আজকের কথা নয়।

খৃস্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগে মহাচীনের সম্রাট ছিলেন সিন-চি-হোয়াংটি। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। কালের ব্যবধানকে এড়িয়েও ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম সোনার লেখার মত জল জল করছে। অদ্ভুত ছিল তাঁর দূরদৃষ্টি।

পূর্বভারত অর্থাৎ বঙ্গদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পারলে ধীরে ধীরে তাঁর দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু মধ্য এশিয়া থেকে, তুরস্ক থেকে, এশিয়া মাইনর থেকে আসে বিদেশী বণিকরা। চীনের বাণিজ্যসম্ভার ভারে ভারে নিয়ে যায় তারা। অর্থ দেয় প্রচুর। কিন্তু—

অর্থই কি সব? তাদের দেশ রুক্ষ ঊষর মরুভূমির দেশ। তারা আসে দিগবিস্তীর্ণ মরুভূমি পার হয়ে। উটের পিঠে চড়ে মন্থর গতিতে। আসে সারি বেঁধে। সম্রাট চি-হোয়াংটির নজরে পড়ল একদিন, মধ্য এশিয়া অঞ্চলের বণিকদের সঙ্গে নিজেদের আবশ্যকীয় জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই! চীনের হাটে বন্দরে তারা কিছু বিক্রি করবে না?

এ কী রকম! সম্রাটের চোখে চিন্তার ছায়া নামে। পূর্বভারতে তাঁর দেশের বণিকরা নিয়ে যায় সিল্কের কাপড়। তাম্রলিপ্তের বন্দর থেকে বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিল্কের সেই অপূর্ব বস্ত্র-সম্ভার চলে যায় সুদূর ইউরোপে। তারপর চীনদেশীয় সওদাগররা কি পকেটে তাদের জিনিস বিক্রির টাকা ফেলে রওনা হয় দেশে?

না। বাণিজ্য কোনদিন এরকম ভাবে হয় না। হতে পারে না। চীনা বণিকরা বাংলার নগরে নগরে ঘোরে, ঘোরে বিভিন্ন শহরের হাটে বাজারে। তাদের চোখে থাকে খরদৃষ্টি। কোথায় পাওয়া যায় সেই বিখ্যাত বঙ্গদেশীয় মসলিন—কোথায় পাওয়া যায় সুগন্ধি মশলা—এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ? যে টাকা সে বঙ্গদেশের বাজার থেকে উপার্জন করেছে, সেই টাকা দিয়ে কেনে এমন বস্তু, যা তাদের দেশে পাওয়া যায় না। একেই তো বলে বাণিজ্য। কিন্তু—

রাক্ষুসে উত্তুরে হাওয়ার আর মরুভূমির সেই দেশের সঙ্গে ব্যবসা করে কী লাভ? অতএব—

সম্রাট হোয়াংটি পরোয়ানা জারী করলেন। মধ্য এশিয়া থেকে কেউ বাণিজ্য করার জন্য আসতে পারবে না। কিন্তু—

পরোয়ানা দিয়ে মানুষের প্রয়োজনকে কখনো ঠেকানো যায়? তারা আসতে লাগল রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে নিঃশব্দে সরীসৃপের মত, আসতে লাগল লুকিয়ে ছদ্মবেশ ধরে। আর দেয় বড় চড়া দাম। চীনা দোকানীরাও লোভ সামলাতে পারে না। সম্রাট দেখলেন তাঁর আদেশ কার্যকরী হচ্ছে না।

কি করা যায়—কি করলে সেই পোড়া দেশের লোকগুলো

স্বপ্ন আমার

রঞ্জিত সিংহ

আজকে তুমি বোধ্য হ'লে কেন
আঘাত কোনো পেলে কি প্রবীণ প্রেমে
এসব হাসি বাল্যপ্রেমে যেন
আষাঢ় এনে হঠাৎ ছিল থেমে।

ঝড়ের রাত দোলাত মন, প্রিয়
তুমি যবে বাহির হ'লে পথে
কিন্তু বৃথা যায় নি অঙ্গুরীয়
অভিজ্ঞানের শরম আছে ক্ষতে।

এখন তুমি মৃত আমার কাছে
প্রতিটি দিন পত্রঝরা মাস
মেঘের 'পরে মেঘ কি জমে আছে
মুকুর কি সে-স্মৃতির প্রতিভাস?

তোমার যে-পথ সহজ ক্রমায়ত
আমি তাতে স্মৃতির অভিলাষী
অভিজ্ঞানে শুকোয় না যে-ক্ষত
সেই ত প্রেম। সাক্ষী পৌর্ণমাসী।

অনেক রাতে হিমের ঝড়ে জেগে
স্বপ্নে শুনি ব্যাকুল করাঘাত
লোলচর্ম প্রহত আবেগে
রটায় সে কে স্পষ্ট অপবাদ?

অদূরে জলের শব্দ

পরেশ মণ্ডল

কে এঁকেছে রাধা-অঙ্গে তরঙ্গের অনুরাগলিপি
কার হাসি বসন্তের এ-বাতাসে মাধুরী ছড়ায়,
সমুদ্রের স্ফীত বক্ষে ডুবে যায় মানসী প্রতিমা,
অজগর মগ্নচরে জলযান লগ্ন অসহায়
শেষবার মোহাবেশমুক্ত মনে দিগন্তের সীমা.

অধীর আগ্রহে ছোটে, পায়ে ছেঁড়ে শিকল-বন্ধন।
কোথা কবে শাখানদী তাতে নিয়ে বিদায়ের রাখী
জলভরা ছলনায় হাসিকে করেছে সকরুণ
অথবা কোথায় পটে আঁকা আছে সরমা বৈশাখী
ইতিকথা বেনোজলে ধুয়ে নিল কৌতুকী প্রদ্যুন।

সারাদিন মনে হয় সঙ্গীহীন অকরুণ আমি,
কে আমায় ডাকে আজ শ্রাবণের বিষাদে বিরলে,
অদূরে জলের শব্দ, শীর্ণ আলোরেখা অনুগামী,
কাঁপন লেগেছে শান্ত উপবনে লাজুক পল্লবে।

আর আসতে পারবে না। দিন যায়। রাত্রি যায়। বছরের পর বছর কেটে যায়, সম্রাট হোয়াংটি শুধু ভাবেন—আর ভাবেন।

ডাকেন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের, ডাকেন মন্ত্রীদের। সর্বসমক্ষে সম্রাট প্রস্তাব দিলেন। আর পরিষদ চমকে উঠল। সকলের চোখে বিস্ময়ের ছায়া। একটা প্রশ্নই প্রত্যেকের চোখের তারায় ঘন হয়ে নেমেছে—এ কী করে সম্ভব? সম্রাটের কি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে? কিন্তু তরুণ, আদর্শবাদী সম্রাট অবিচল স্থির। তাঁর ইচ্ছা থেকে, মনের ভেতরের বাসনা থেকে কেউ তাঁকে এক চুল নড়াতে পারে না। কখনো পারবে না।

দেশজুড়ে যেখানে যত রাজমিস্ত্রী আছে তাদের ডাক পড়ল, —সরু সরু ইটের ব্যবসাদারের। তাদের ওপর রাজকীয় হুকুম হলো —তোমাদের সরকারের প্রয়োজনে দীর্ঘদিন পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্যই ন্যায্য মজুরী মিলবে। কিন্তু সরকারী কাজ ছাড়া আর অন্য কিছু করা হবে না।

সেই সুরু হলো—সেই সুরু হলো পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের ভিতরের একটা আশ্চর্যের গোড়াপত্তন। দেশের দূর দূর অঞ্চল থেকে এল লক্ষ লক্ষ কুলী। এল গাড়ি গাড়ি ইট। সুরু হলো গোবি মরুভূমির ওপরে বিখ্যাত প্রাচীর নির্মাণের কাজ। এই বিশাল প্রাচীর তৈরি হতে বহু বছর লেগেছিল। ইতিহাস বলে, Tsin-Chi-Hwangti (221-209 B.C.) the great Emperor of China began great wall across Gobi desert. He directed the trade route towards Bengal---

তারপর এলেন সম্রাট হান (১৪০-৮৬ খৃঃ পূর্ব) তিনি আবিষ্কার করলেন আর এক নতুন পথ। খোটান পর্বতমালা পার হয়ে উত্তুঙ্গ হিমালয় ডিঙিয়ে কাশ্মীরের দিকে চীনা সওদাগরের বাণিজ্য করতে যেতে উদ্বুদ্ধ করলেন। কাশ্মীর, গান্ধার, কাবুলের বাজারে বাজারে চীনদেশীয় জিনিস পাওয়া যেতে লাগল। আর একটা দল গেল খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে তক্ষশিলার দিকে। সেখান থেকে এল গঙ্গার গতিপথ ধরে বঙ্গদেশে।

বাংলার বাণিজ্যের ইতিহাসে চীনদেশীয় এই সম্রাটদের অবদান শুকতারার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে।

(ক্রমশঃ)

আঁধার মাণিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

বললেন, 'হচ্ছে কি?'

কুন্দ একলাফে ঘরের মাঝে এল, আর সব ভুলে গলা তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'শীগ্‌গির আলো নেভাও গো, জানলা দিয়ে দেখে নিলে আমায়।'

'কে দেখলে?'

'তুরুক সওয়ার। পগ্‌গ মাথায় তুরুক সওয়ার।'

আঁধারমাণিক গ্রামে বর্গী এসেছে। হঠাৎ কানের কাছে বেজে উঠল 'হরহর মহাদেব'.

গাঁজার নেশা ভেঙে কে যেন ঢাকে কাঠি দিলে শ্মশানতলার মাঠে। সঙ্গে সঙ্গে বেধে গেল হই-হই, রই-রই। তখনো অনেকে ভাবছে চড়কের ধূম লেগেছে।

॥ ছয় ॥

।। আঁধারমাণিক আইলা বরগী ।।

আসলে চৈত্রমাসে বড় বেশি মহাদেবের নাম নেওয়া হচ্ছিল।

রাঢ়বঙ্গের সর্বত্র শুধু চড়কের ধূমধাম, সকাল থেকে দুপুর অবধি শিবের নামে ভিক্ষা, সন্ধ্যে থেকে রাত অবধি সন্ন্যেসীদের আড্ডায় ঘন ঘন গাঁজার দম এবং 'শিব শিব মহাদেব' ধ্বনি। পেতলের ত্রিশূল আর বাঘছালপরা সন্ন্যেসী শিবকে ডাকেন, জিভে পেতলের ত্রিশূল বেঁধানো শিবায়েভী বালক সন্ন্যেসীরা শিবনাম শুনে নাচে, শ্মশানের উলঙ্গ সন্ন্যেসীও ছাই-এ গড়াগড়ি দিয়ে 'ভোলানাথ। ভোলানাথ। বলে কাঁদেন। ভিখারী বৈরাগীও এ-সময়ে কৃষ্ণনাম তুলে রেখে 'কত ভুলে রৈবে ভোলা' ইত্যাদি কুস্বরে গেয়ে যতক্ষণ না মালসাভরা সিধে পায় ততক্ষণ গৃহস্থ বউ-ঝি'কে অতিষ্ঠ করে।

অতএব ভোলানাথ জাগ্রত হলেন।

সম্ভবত এদিক-ওদিক নজর ফেলে দেখলেন, নেড়ামাথা পাগজাঁটা বর্গীশিলাদারের কণ্ঠেও তাঁর নামে হুহুঙ্কার।

বাংলা দেশের পথ দেখিয়ে দিয়ে মহাদেব আবার নিদ্রা গেলেন। আর কিছু মনে রইল না তাঁর। গ্রামে গ্রামে, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, হুগলীতে চড়ক পূজোর ধূমধাম তাঁর নামে বক্রেশ্বরে অগণন ব্রতীসন্ন্যেসীর সমাবেশ, বাংলার অন্ত্যজ নরনারীর হলদে সূতো বেঁধে গেরুয়া কাপড় পরে চড়কের সন্ন্যেসী হওয়া, কিছুই মনে রইল না তাঁর। দেবতাদের পলকে স্মরণ, পলকে বিস্মরণ। তাঁদের চোখের পলক ফেলতে যে-সময় যায় তার মধ্যেই মানুষের সংসারে লেগে যায় প্রলয়।

প্রলয় বাধিয়ে দিয়ে দেবতা গেলেন শয়নে।

কুন্দর কথায় বিশ্বাস করলেন না আনন্দীরাম। 'হুঁ, তুরুক সওয়ার? কি দেখতে কি দেখেছ!'

কিন্তু কুন্দ পলকে ঢলে পড়ল।

কি মুস্কিল, আনন্দীরাম দেখেন দাঁতে দাঁত লেগে মূর্চ্ছা গেছে। এখন তিনি কি করেন?

তাড়াতাড়ি কুন্দর চোখেমুখে জল ঝাপটা দিলেন। ওদিকে এখন শুনতে পাচ্ছেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ। আসছে ত' আসছেই, শব্দের বিরাম নেই। দোর খুলে এগিয়ে গিয়ে ছোটর দোরে ঘা দিলেন, 'ছোট। ওঠ, ওঠ।'

দোর খুলে বেরিয়ে এলেন বিশালাক্ষী। আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি হয়েছে?'

'চুপ।' সব ভুলে আনন্দীরাম ছোটর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন জানলার দিকে। বললেন, 'কান পেতে শোন। কিছু শুনছ?'

ছোট কান পেতে রইলেন।

'শুনলে কিছু?'

'ঘোড়ার পায়ের শব্দ।'

'আর কিছু বোঝ?'

'ভীষণ চীৎকার। অনেক মানুষে একসাথে জিগীর তোলে মনে হয়।'

'বুঝলে কিছু?'

'কি বুঝব? ডাকাত?'

ছোট চোখ তুললেন। তারপর বললেন, 'শোন, রও। বাড়ির সকলকে তোল।'

'তারপর?'

'ওপরে আন। এনে চাপা দরজা ফেল।'

'কিন্তু ছোট-...'

'যা বলি শোন। নির্ঘাৎ ডাকাত পড়েছে।'

আনন্দীরাম করুণ চোখে তাকালেন। ছোটর ঘরে সিন্দুকের মধ্যে লোহার পাত দেওয়া কাঠের পেটি। তার মধ্যে এ সংসারের সোনাদানা টাকাকড়ি সব।

ছোট তাঁর হাত ধরে নিজের ঘরে আনলেন। বললেন, 'তুমি এক মুড়ো ধর, আমি এক মুড়ো ধরি। পচা পুকুরে ফেলব, সেখানে জেয়াদা ঘাসের জঙ্গল।'

আনন্দীরাম বুঝলেন তাই ভাল। ত্রস্তে তাঁরা সিন্দুকের ওপর থেকে পাটি মাদুরের বোঝা নামালেন, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী সরিয়ে বের করলেন পেটি। ডাকাত পড়লে এ ছাড়া উপায় থাকে না, দুজনে নিয়ে গেলেন নীচে।

তারপর সোরগোল কমিয়ে সকলকে তোলা হল। ভারী বাসন-কোসন যত দূর যা সম্ভব ফেলা হল পুকুরে। ওদিকে ব্রাম গ্রামের সীমানায় আগুন দেখা যায়। শুকনো মুখে আনন্দীরামের পিসী গোয়ালে গিয়ে গরুর দড়ি কেটে দরজা দিয়ে তাড়িয়ে দেন। পিসীর দু'মেয়ে সরুগলায় বিলাপ করতে করতে—ঠাকুরঘরের বাসন বের করে। সন্ধ্যেবেলা আনন্দীরামের মামা 'কালীয়দমন' পালা-র গান ভাঁজতে ব্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁকে বোন বললেন, 'দাদা, চুপসাড়ে একবার বাবুরালিকে ডাক দিলে পাত্তে, সড়কি নিয়ে দাঁড়াত।'

ভাই কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'সে বেটা বর্শেলেঠেলেদের সর্দার, এসেই হয়ত এক হাঁকুনি দেবে। আমি হইহল্লায় বড় ডরাই।'

সবাই এলেন ওপরে। সিঁড়ির মুখে চাপা দরজা দেওয়া হল। তারপর আনন্দীরাম ওপরে গেলেন। ছাতের ওপর চিলেকোঠা। তার ছাতে উঠলেন। দূরে দূরে দেখা যায় আগুনের আভা। অনেক লোকের গলায় কোলাহল। ভাবতে লাগলেন এ কেমন ডাকাত, যারা পাগসাথায় ডাকাতি করতে আসে? তিনি গতিক ভাল বুঝলেন না, নেমে এলেন। ততক্ষণে ওদিকে কায়েত পাড়ায় ঘন ঘন শাঁখ বাজছে। শাঁখ বাজছে, কাঁসরে লাঠি পড়ছে, বিপদ জানাবার উপায়।

নেমে এলেন। ততক্ষণে পিদীম ধরে ছোট নেকড়া পুড়িয়ে কুন্দর নাকে গন্ধ দিয়েছেন। কাপড় পোড়ার দুর্গন্ধ বন্ধ দালানে। কুন্দ একপাশে ঘোমটা টেনে কাঁদছেন। মামা আর আনন্দীরাম দূরে অন্য ঘরে বসলেন।

সব চুপচাপ। কোন পাড়া থেকে কান্নাকাটি আগে আগে সেটি শোনবার জন্যে সবাই ব্যস্ত।

'কি, তোমরা সব ঠিক আছ ত'?' আনন্দীরামের কণ্ঠ মৃদু।

ছোট জবাব দিলেন না। তাঁর গায়ে ঠেলা দিয়ে বড় সতীন বললেন, 'একটা পান আনলি না, গলা বুক আমার শুকিয়ে উঠেছে।'

ননদ ফিকফিক করে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি তখন থেকে বাইরে শুধু কচরমচর শুনছি। মনে হয় এঁড়েটা ছোলাশাক চিবিয়ে শেষ করলে।'

'আঃ, কথা কও কেন?' মামা ও-ঘর থেকে বললেন, 'সাধে কি বলে মেয়েছেলের দশহাতে কাছা নেই। এখন একটা বলে বিপদের সময়!'

হঠাৎ ও-পাশের বহুদূরে শ্মশান-তলার মাঠের দিক থেকে কোলাহল আসতে থাকে। সবাই সচকিত হয়ে সভয়ে নিশ্চুপ হলেন।

রামাই বাগ্‌দী ভিনগাঁয়ের কাজ সেরে ঠিক সময়ে গ্রামে ফেরে। আত্মীয় বাড়িতে রাত্রিবাসের কথা ছিল, কিন্তু দু'তিন পাত্র সেবার পর রামাই-এর মেজাজ বিলক্ষণ স্ফীত হয়, এবং সবিস্তারে সে নিজানতে চাকরীর মর্যাদা কি, প্যায়দারা রামাইকে দেখলে কেমন 'ভয়ে কোথা সেঁধুবে, ভেবে পায় না, মাসান্তে সে কেমন খাঁটি একটি মোহর পারীকে পাঠিয়ে দেয় ইত্যাদি সফেন গল্প ভাঁজতে থাকে।

তার ভায়রাভাই-ও তর্কাতর্কি গল্প চালায়। আমি বড় কি তুমি বড় এই গোছের গল্প থেকে বাদানুবাদ, তারপর তর্কাতর্কি। সে তর্কাতর্কি লাঠালাঠিতে সম্ভবত পৌঁছত

কিন্তু রামাই-এর বড়শালী গরম হয়ে বলে, 'দুজনে যে বালীসুগ্রীবের লড়াই বেধিয়েছ তা খাওয়াদাওয়া করবে কখন?'

'চুপ কর্ মাগী।'

উষ্ণ হয়ে বাগ্দিনী বলে, 'খুব যে মাগী ছাগী করছ, ঘরের বউ-এর ওপর চোপা চালাতে সবাই পারে।'

'কেন, একথা বললি কেন?'

'আর বললি কেন! এই যে সনধে থেকে বলতেছি লাল গাইটা পালমশায় আগড়া গাছে বেঁধে রেখেছে, আনতে পারলে?'

'কাল ভোরে তোরে দেখাব পালমশায়রে আমার উঠানে বেঁধে রেখেছি।'

তখন উঠোনে অবতীর্ণ হয়ে রক্তচক্ষু বাগ্দিনী বলে, 'আজ নেশা করে শোরের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে, কাল ভোরে উনি পালমশায়কে এনে দিচ্ছে। মুরোদ ক'কড়ির তা কি আমার অজানা? উনি একজন নবাবের চৌকিদার, হুড়ো খেয়ে এখানে এসে বসে আছে। তুমি একজন মাতব্বর তাই গতরজলকরা কড়ি-গুলো নিতাই শুঁড়িকে ঢেলে দে আসছ। তোমরা যদি মানুষ হবে তা'হলে আর বোনে বোনে আমাদের খোয়ার হবে কেন!'

এ-কথায় তৎক্ষণাৎ পুরুষ দুজন ভেদাভেদ ভুলে একপক্ষ হয় এবং 'তো' মাগীর মুখদর্শন করি যদি তা'লে আমি আমঅতনের বেটা নই' আস্ফালন করে বেরিয়ে পড়ে।

আঁধারমাণিক গ্রামে এসে তারা সন্ন্যাসীদের আড্ডায় বসে প্রচুর গাঁজা ডলে দেয়, নিজেরা প্রসাদ পায় এবং জীবন অনিত্য, সংসার যে করে সে বেটা মহামূর্খ, বাবার চ[illegible]ড়া গতি নেই ইত্যাদি তত্ত্ব আলোচনায় সময় কাটায়।

ঘোড়ার খুরের শব্দ এবং সোরগোল শুনে তবে রামাই-এর চৈতন্য হয় এবং ব্যাপারটা বোধগম্য হতে না হতে সে ধরে নেয় ডাকাত পড়েছে।

ঢাকে কাঠি দিয়ে সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোমরা সব চেতন হও গো, ডাকাত পড়েছে।'

তারপর ঢাকে কাঠি, হট্টগোল। রামাই বললে, 'এ গাঁয়ের বাগদীরা কি মরেছে নাকি যে রাত-বিরেতে ডাকাত আসে?'

তখনো রামাই গ্রামের প্রান্তে বর্গীদের সমাবেশ দেখে নি।

শুধু আনন্দীরামের বাড়ি নয়, সুখসুপ্ত গ্রামের অনেকেই হুড়োহুড়ি করে সাবধান হলেন।

বাগদীপাড়া থেকে শতখানেক বাগদী পুরুষ লাঠি হাতে বেরিয়ে এল।

'হ্যা রামাই, তোর ডাকাত কোথা?' একজন সবিস্ময়ে শুধোলে।

'ঘোড়ার পিঠে নেড়া বেটা আমি, নিচ্চয় দেখেছি।'

'সেঁধুল কোথা?'

'হুই খড়ের টালে আগুন দে। এমন চুপচাপ ত' ভাল নয়।'

চৈত্রের গরমে খড়ের গাদা খটখটে শুকনো। ধুনীর কয়লা ছুঁড়ে দিতেই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

'হা তোর ডাকাতকে শুওর মারা করি' বলে বাগদীরা চেঁচিয়ে উঠেই ভয়ে সশঙ্কিত হল।

হাজার হাজার ঘোড়া। অগণিত সওয়ার। মাথায় পেঁচ পাগড়ী, কারো কানে আংটা। নিষ্ঠুর এবং ভয়াল তাদের অভিব্যক্তি। হাসতে হাসতে তারা ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল।

'মার শালাদের মার, জাতবাগদী দাঁড়িয়ে মার খায় না।'

মরিয়া হয়ে রামাই সাথীদের ডাক দিলে।

(ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

দিল্লী থেকে—

আর কিছুতেই রুখে রাখা গেল না! দিল্লীর আধুনিকা নিপুণিকার দল 'টপলেসের' ঝাণ্ডা নিয়ে দুনিয়ার সেরা আধুনিকা ফরাসী রমণীদের সাথে পাল্লা দিতে চলেছেন।

যতই আমোদপ্রিয় হোন না কেন, সৌন্দর্যচর্চায় যতই যত্নশীলা হোন না কেন, রসিকতায় দুনিয়ার নারীদের নেতৃস্থানীয়া হোন না কেন, টপলেসের ব্যাপারে এক্ষেত্রে দিল্লীবাসিনী ফরাসী রমণীর এককাঠি ওপরেই আছেন। এক হাত নিয়েছেন বললেও দোষ হত না। ফরাসী ভাষা ও ফরাসী রমণী এতই কোমল যে, 'এক হাত নেবার' এক্সপ্রেশনটা একটু কর্কশ লাগবে বই-কি। দিল্লীর উর্বশী, মেনকা, রম্ভার দল ফরাসী রমণীর নাইট ক্লাবের চিত্র না দেখে থাকলেও ধীরে ধীরে যেরকমভাবে অগ্রসর হতে চলেছেন; মনে হচ্ছে—সৌন্দর্যচর্চার কেন্দ্রস্থল এবার 'পারি' শহর সাগর পাড়ি দিয়ে সুবে হিন্দুস্থানের রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে স্থানান্তরিত না হয়ে পড়ে।

নিছক বানানো মনগড়া কাহিনী নয়, স্বপ্নের ঘোর নয়, দিল্লীর অভিজাত কেন্দ্রের দু-দুটি বিশিষ্ট ড্রেসারের কাছে টপলেসের অর্ডার আসছে কিনা খবরটুকু নেওয়া মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। একেবারে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলেই এ নতুন পোষাক তৈরি হচ্ছে। বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

আধুনিকা একাধিকা বান্ধবী একই কথা বলে আসছেন, 'দোষ কি?'

আমি বললাম, 'দোষ তো বলি নি। টপলেসের যে নতুন ডিজাইন বেরিয়েছে সেটা সত্যি বলতে আমার ভালোই লাগে। নগ্ন নারীদেহ এতদিন শুধু রাজা-বাদশার ইউজের জলক্রীড়ারতা সুন্দরীদের ভিতরই

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

সীমাবদ্ধ ছিল; আর ছিল চিত্রকরদের তুলির সামনে। সেটা এখন সরাসরি সমাজের সকলের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। তাতে আপত্তির কি থাকতে পারে। তাছাড়া বিলেতের ধর্মযাজকদের চেয়ে আমি বেশি পিউরিটান্ বলে নিশ্চয়ই ভণ্ডামি করবার ভাণ করব না। যখন ধর্মযাজক (অকৃতদার, নিশ্চয়ই সৌন্দর্যের উপাসক) এ টপলেসের সমর্থক, তখন ধর্মজ্ঞানহীন আমার মন্তব্যের প্রশ্নই ওঠে না।'

দিল্লীতে 'চোলি ড্রাইভ' দুনিয়ার 'টপলেস'কেও হার মানিয়েছিল। শরীরের মধ্যাঙ্গে খানিকটা খোলা, ফাঁকা হাওয়াটুকু অন্তত দিল্লীর দুঃসহ গ্রীষ্মতাপের সময় আরামদায়কই ছিল। চোখের পক্ষে নিশ্চয়ই ততটা মিঠেকড়া ছিল না। আমি চোলি ড্রাইভের পক্ষপাতী। যতই স্থূলাঙ্গী হোন না কেন ('চোলিতে' বিপুলা, তন্বী সবাইকে একটা যেন রোমাণ্টিক ধরণের যুবতীর স্পর্শ দিয়ে থাকে।) এক গজ কাপড়ে কমসে কম দুটো (স্থানে স্থানে তিনটেও) ব্লাউজ হয়ে যাবে। তাছাড়া রঙচঙে 'চোলি'তে ছিল সুন্দরীদের একটা বৃন্দাবনের গোপিনীদের স্নেহস্পর্শ। মথুরার প্রেমলীলার উদাস স্মৃতিভার। চোলি দিল্লীতে জনপ্রিয় হল না।

তার একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত, সুন্দরীদের আসল রঙটুকু ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া স্থানীয়া পাঞ্জাবিনীরা দেখলেন, তাঁদের সোনার বরণ রৌদ্রতাপে তামা হতে চলেছে। দ্বিতীয়ত, দিল্লীর যুবকদের শিভ্যাল্‌রির অভাব।

টপলেস চালু হতে চলেছে। তার সাথে ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট—মেয়েদের কাউণ্টারপার্ট হলো টাইট শালওয়ার আর ঠিক তেমনি টাইট কামিজ (এককথায় দিল্লীর সাংবাদিকরা যার নাম দিয়েছেন টাইটি!) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস স্ট্যাণ্ডে, কনট সার্কাসের মোড়ে, আনারকলি মার্কেটে, পথে-ঘাটে-মাঠে দিল্লীতে মিঃ ও মিস টাইটিদের ঘোরাফেরা চলছে। এরা ভীরু। প্রেমালাপ করার সাহসটুকুও নেই। তাই একটা শিস্, একটা চোখের ভীরু চাহনিতেই এদের রোমান্সের অবসান ঘটছে। রোমিওদের দল ধীরে ধীরে হতাশ প্রেমিকের পর্যায়ে পর্যবসিত হচ্ছে।

টপলেসটা জনসাধারণের পর্যায়ে এখনও নামে নি। এ্যারিস্টোক্র্যাটিব ক্লাবের সুইমিং ড্রেস বলেই সেটা চালু হতে চলেছে।

টপলেস্ তৈরি দেখতে গিয়ে হতাশ হলাম। আমি তো প্রায় বলেই ফেলেছিলাম এ তো ছেলেদের নিকারবোকারের নিকার শুধু।

"চিঠি"

অশোক দাশগুপ্ত

ফুলের শুভ্রতা নিয়ে সেদিন যে দিয়েছি অর্ঘ্য,
আমার প্রেমের রাজ্যে আমি শা-জাহান,
কীর্তি তুমি মোর। গোধূলির রক্তরাগে,
সীমন্তে আমারি দেয়া ঐ জয়টিকা ;
মহলের স্বপ্ন নয়, প্রকৃতির অঙ্গরাজ্যে—
মহত্ত্বের প্রথম তুলিকা।
বিশাল সমুদ্রবক্ষে ঊর্মির ঝাঁক নিয়ে
রুদ্ধবাক আমি :
দেখি, শুধু দেখি, দেখি বারে বার,
তোমার আঁখির কোণে আমাদের তৃষ্ণার পেয়ালা;
স্বপনের অফুরন্ত মেলা।
তবুও মেটে না তৃষা, দিকে দিকে হেরি দীপান্বিতা,
আমার প্রথম প্রেমে, প্রেয়সীর স্বর নিয়ে—
পৃথিবীতে তুমি সমর্পিতা ;

বিনিদ্রিত

সংপ্রীত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিদ্রাহীন বিছানায় সারা রাত চরে
বাসনার ছারপোকা অন্ধকার ঘরে ;
জীর্ণতা-সঙ্কোচে দেহ-মন
অক্ষম অসাড় অচেতন ;
দৃষ্টিহীন পড়ে থাকি নৈরাজ্য-নগরে
ছাই-মুখ শ্রাবণে ভাদ্দরে।

সহ্য করি বাসনার নীরব দংশন,
কেন না আমি তো জানি—কান্না-ধোয়া মন
ফিরে পাবে আনন্দ-উচ্ছ্বাস—
স্বর-ভরা অমৃত-আশ্বাস,
আলোর দরজা যদি খুলে দেয়
আশিস-আকাশ।

ভাগ্যিস বলি নি। ড্রেসার কট্টর বাঙাল ভেবে হয়তো দোকান থেকেই তাড়িয়ে দিত। টপলেস্ ইংরিজীতে যে বানান, পোষাকটা দেখে মনে হল সেটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। যার টপে একটা মাত্র ভি শেপ লেস্ আছে (বহুব্রীহি সমাস?) সেটা ইংরিজীতে গিয়ে যে নতুন বানান নিয়েছে সে বানান নিশ্চয়ই ভুল।

বিলেতের ধর্মযাজকের এ বেশ ভাল লেগেছে, ফরাসী জননায়ক ডি গল্ সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলে গেছে, আমার ধারণা ছিল, ফরাসী-মাত্রই রসিক। টপলেস্ ব্যান্ করে গ্রীক কালচার পুরোনো পিউরিট্যানিস্‌ম্-এর পরিচয় দিয়েছে। ফ্রান্স টপলেস্ ব্যান্ করে দুনিয়া থেকে রসিকতার সাথে সৌন্দর্যচর্চার নির্বাসন দিতে চলেছে কি?

আমার শুধু ভয় দিল্লীর ছোকরাদের পকেট প্রায়ই গড়ের মাঠ (দিল্লীতে সেটা হবে প্যারেড গ্রাউণ্ড)। এখনও দিল্লী শহরে টপলেস্ সম্বন্ধে কোনো আইন জারী হয় নি। তবুও পাঁচ আইন বলে একটা কি যেন আছে শুনেছি। তার দোহাই দিয়ে যদি কোনো টপলেস্ সুন্দরীকে কারাদণ্ড বা জরিমানা করা হয়, তাহলে কারা তাকে বাঁচাবে?

সম্প্রতি এক সুন্দরীকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার টপলেস্ পরিহিতা অবস্থায় সাগর উপকূলে গ্রেপ্তার করেন। টপলেস্ পরে থাকার জন্য তাঁর জরিমানা হল আড়াই হাজার টাকা। শুধু তাই নয়, পাবলিক ইনডিসেন্সির জন্য আরও এক হাজার। শুধু তাই নয়, আর ছয় মাসের জেল।

সুন্দরীটির নাম শুনবেন? টনি লী শেলী।

সাথে সাথে পঞ্চাশজন যুবক এগিয়ে এলেন সুন্দরীর জরিমানার টাকা জোগাতে।

দিল্লীর মথুরা রোডের ভারত-বিখ্যাত ক্লাবের সুইমিংপুলেই নয়, সমগ্র নগরে এ নতুন সুন্দরীর বেশকে স্বাগত জানাই। যেটা দেখা যায় না সেটাতেই কৌতূহল বাড়ায়, যার নাগাল পাওয়া যায় না সেটাই আমাদের মনে দেয় দোলা। এ সত্য তো চির সত্য।

দিল্লীতে আসুক টপলেস্।

জরিমানার এখনও প্রশ্ন উঠছে না। দিল্লীর রোমিওরা তৈরি থাকুন। জরিমানার টাকার ভয়ে কেউ যেন ভীত না হন।

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

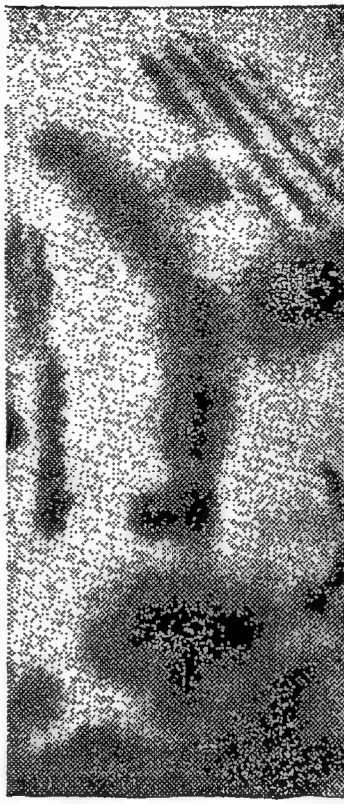

কুহেলী বিলীন

বিশু বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কতক্ষণ ঘুরেছিল খেয়াল নেই। হঠাৎ মানুষের গলার সাড়া পেয়ে চমকে উঠলো সমরেশ। সে যা চেয়েছিলো তাই হয়েছে। মাধবী—তারপরে সুনন্দ। ওদের দুজনকেই অন্ধের মত বিশ্বাস করতে তার এতটুকু দ্বিধা ছিল না। কিন্তু সে বিশ্বাসের মর্যাদা ওরা রাখে নি। মনের আয়নার দিকে মুখ ফিরিয়ে কালো কালো ছায়ার মিছিল দেখে সমরেশের বুক কেঁপে উঠল। বন্ধুত্বের বদলে সাপের বিষের জ্বালা, ভালোবাসার বদলে ঘৃণা, বিশ্বাসের বদলে কুটিল ছলনার যন্ত্রণা।

'এই ভালো হোল'—সমরেশ নিজের মনেই বলল—'আমি মনে মনে এই কামনাই করছিলাম। এবারে আমার নিজের পালা।'

'আপনি নীচে নেমে এসেছেন কেন?'—অনিল ব্যস্ত হয়ে উঠল—'একটু আগেই ডাঃ মিত্রকে রিপোর্ট-গুলো দেখাচ্ছিলাম। প্রেসার খুব বেশি, তাছাড়া হার্টের অবস্থাও দুর্বল। পেটে কলিক পেইনের ব্যাপারটাও ডাক্তার বসাক খুব ভালো চোখে দেখছেন না বলে আপনাকে হয়তো নার্সিংহোমে রিমুভ করতে হবে আজকালের মধ্যে।'

'আচ্ছা অনিল—একটা কথা তোমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করছি'—সমরেশ ওকে কাছে ডাকলো হাতের ইশারায়—'তুমি তো মাধবীর উপর মনে মনে খুব বিরক্ত ছিলে। বিষ কি তুমিই ওকে দিয়েছিলে? দাও নি। সুনন্দও দেয় নি। ও এইমাত্র আমার কাছে স্বীকার করল সে কথা। তাহলে কে দিল?'

'আপনি ওকথা নিয়ে মিছি-মিছি বিচলিত হচ্ছেন কেন?'—অনিল দৃঢ় স্বরে বলল—'তার জন্যে পুলিশ আছে, গোয়েন্দা আছে। প্রেসারের রুগীর পক্ষে যে কোন ভাবনা-চিন্তাই ক্ষতিকর। চলুন, আপনার ডিনারের সময় হয়ে এলো।'

'না, না। তুমি যতটা হালকা সুরে কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছ, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। হয় আমি বিষ দিয়েছিলাম, নয় সুনন্দ। পুলিশ সুনন্দকেই সন্দেহ করছিল। আমি নিজেই অসুস্থ, রুগীর মত যত্নে শাসনে ঘিরে রাখা হয়েছে আমাকে। কাজেই বাইরে বেরিয়ে সায়ানাইড যোগাড় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সুনন্দর সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা ছিলো না। তাছাড়া আমার মত সেও মাধবীর মৃত্যু কামনা করেছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি স্যার?'—অনিল ভুরু কুঁচকে ধমকের সুরে বলল—'সুনন্দ মিত্র যদি এ কাজ করে থাকে, তাকে ফল ভোগ করতেই হবে।'

'ঠিক বলেছ। যে যার কর্মফল অনুযায়ী ভুগবে। তুমি আমি কি করতে পারি। কিন্তু সুনন্দকে কে বিষ দিলো। আমি তো দিই নি। আমি শুধু ওর হাতে জলের গ্লাস এনে দিয়েছিলাম।'

'কি বলছেন আপনি?'—অনিলের গলা কেঁপে উঠল কথা বলার সময়ে—'আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে? ব্রোমাইড পাউডারটা এনে দেব?'

সমরেশের কানে কোনো কথাই ঢুকল না। বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের হাতের দুর্বোধ্য কাটাকুটি-গুলো দেখতে দেখতে সে আবিষ্ট হয়ে বসেছিলো পাথরের মূর্তির মতো।

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে আমার স্মৃতি আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে, অথবা আমার মধ্যে আমি ছাড়াও অন্য আর একটা শয়তান-সত্তা আছে যার কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। মাধবীকে প্রথমে ও তারপরে সুনন্দকে সেই অন্য আমিই হয়তো বিষ দিয়েছি, আর এখন এই ব্যর্থ জীবনকেও সেই একইভাবে শেষ করে দেব।'

'কি বলছেন আপনি'—অনিল আবার নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করল—'সুনন্দ মিত্রকে কেউ বিষ দিয়েছে, একথা আপনি জানলেন কেমন করে?'

'আমি তো নিজের চোখে ওকে ঐ বারান্দার মাটিতে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখেছি। সুনন্দ শেষ মুহূর্তে ভাবছিল আমিই জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়েছি। ওর চোখের দৃষ্টিতে আতঙ্ক আর অবিশ্বাস আমাকে ছুরির মত বিঁধছিল—কিন্তু প্রতিবাদ আমি করি নি। কারণ—'

সমরেশের কথা শেষ হওয়ার আগেই অনিল বিশ্বাস পাগলের মত ছুটে গেল দোতলার দক্ষিণের বারান্দায়। সুনন্দ মিত্রের নিথর-নিস্পন্দ শরীরটা বাঁকাচোরা অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। কাচের গ্লাসটা এখনও শক্ত মুঠিতে ধরা। আছড়ে পড়ার সময় কিভাবে যেন গ্লাসটাকে উঁচু করে ধরেছিল, সেটা হাত থেকে নড়ে নি। তলায় জলটা পর্যন্ত স্থির কাচের মত স্বচ্ছ, নীচু হয়ে শুঁকে মনে হোল কি একটা অস্পষ্ট গন্ধ রয়েছে। জলটাও যেন কি রকম ঘোলা ঘোলা। হাত থেকে গ্লাসটা বেশ জোর দিয়েই ছাড়িয়ে নিয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে পেতলের বড় ফুলদানীর মধ্যে তখনকার মত ভরে দিলো অনিল। সিড়িতে বোধহয় রামবিলাসের পায়ের শব্দ। গ্লাস—আর একটা গ্লাস তাকে যে করেই হোক যোগাড় করতে হবে।

পাশের ঘরে জানলার তাকে একটা সবুজ আভা মেশানো শরবতের গ্লাস ছিলো। সেটা তুলে এনে সুনন্দর হাতের কাছে আছড়ে ফেলল অনিল। কি সামান্য আওয়াজ। পাথরের মেজের উপর হাল্কা একটা শব্দের রেশ। কিন্তু শব্দটা একটা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত বিকেলের নিস্তব্ধতাকে যেন খান খান করে ভেঙে ফেলল। টুকরো টুকরো কাচ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল নিমেষে। একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে হতবুদ্ধি রামবিলাসকে ঠেলা মেরে সরিয়ে অনিল বিশ্বাস টেলিফোনের সামনে এসে দাঁড়ালো। ফোন করতে হবে—কিন্তু কাকে? ডাক্তার অথবা পুলিশ? সুনন্দর প্রাণহীন চোখের দৃষ্টি যেন এখনও বিস্ফারিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এবারে বোধহয় শেষরক্ষা হোল না। পুলিশ আর কারো কথাই মানবে না। এখানে এটুকু সময়ের মধ্যে আর কেউ আসে নি। না, ওরা কেউ নয়, অপর্ণা লাহিড়ী, বসন্ত মল্লিক! গতবারে দোষটা সম্পূর্ণ এসে পড়েছিলো সুনন্দ মিত্রের ঘাড়ে। নিজের প্রাণ দিয়েই বোধহয় সে নির্দোষ এই কথাটি প্রমাণ করে গেল। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী যেমন মরে গিয়ে প্রমাণ করল সে মরে নি। কিন্তু সুনন্দ যদি নির্দোষ হয় তাহলে দোষী সে কাকে বলবে?

ডাক্তারের চেম্বারে প্রথম ফোন করে জানা গেল তিনি একটু আগে রামদুলাল দত্তর কাছে গেছেন। সেখানে অনেকবার খবর নিয়ে অবশেষে হদিস পাওয়া গেল। সত্যজিৎ সামন্তের টেলিফোন নম্বর ডায়াল করতে বসল অনিল।

বাড়িটা প্রায় মান্ধাতা আমলের, তবু অভিজাতপাড়ার ঠিকানা দেখানোর গর্ববোধ সত্যজিৎ সামন্ত ছাড়তে পারেন নি। ফাটলধরা নোনা-লাগা দরজার পাল্লায় কলিংবেল এবং পেতলের ফলকে ইংরাজী আদ্য অক্ষরে নাম লেখা।

দরজা খুলে দুজন অপ্রত্যাশিত অতিথিকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য কেমন অস্বস্তিকরভাবে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সত্যজিৎ সামন্ত। তারপরে অবশ্য গৃহস্বামীর ভূমিকা নিতে দেরি হোল না। মুখ থেকে সিগার নামিয়ে হাসিমুখে অতি বিনয় ও ভদ্রতা সহকারে তিনি এগিয়ে এলেন।

'এই যে—আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য আমার।'

হলঘরটির আয়তন খুব ছোট নয়, আর নানারকম আসবাবপত্রে রুচিসম্মতভাবেই সাজানো। দেওয়ালে পুরোন ফ্রেমে ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর অথবা সবুজ বনবীথির ছবি। ম্যাণ্টলপিসে ফটোফ্রেমে স্যার উইনস্টন চার্চিলের একটি পরিচিত ভঙ্গিমা।

'ঐ একটি দুর্বলতা এখনও মন থেকে তাড়াতে পারি নি। কি একটা জাত, তার পাশে আমরা কোনদিনও দাঁড়াতে পারব ভেবেছেন। এত মেথডিকাল, ডিসিপ্লিন্‌ড, স্থিরবুদ্ধি আর পৃথিবীতে কোথাও পাবেন না।'

শুধু ছবি নয়, বই-এর তাকেও ইংরাজী বইয়ের রীতিমত একটি সংগ্রহ।

'কি অফার করতে পারি আপনাদের—চা, কফি না হুইস্কি।'

'কিচ্ছু নয়—কিচ্ছু নয়'—রামদুলাল দত্ত বেরসিকের মত ঘাড় দোলালেন।

'কড়া করে কয়েক পেয়ালা কফি বানালে মন্দ হয় না'—ডাঃ বসাক সত্যজিৎ সামন্তের অস্বস্তির ভাবটুকু লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। রূপোর ছোট ঘণ্টা ঠুং ঠুং করে নাড়াতেই একটি রোগা গোছের লোক এসে সেলাম করে দাঁড়ালো। ঠাট-ঠমক সবই বজায় আছে, কিন্তু কোথায় যেন কিসের একটা অভাব। লোকটির পরণে পেতলের বোতাম বসানো গলাবন্ধ কোটের বাঁ দিকের পকেটের কাছে অন্য কাপড়ের তালি। সাদা রং ও মলিন ধূসরের প্রলেপে নিষ্প্রভ।

'আমরা এখানে নিছক সামাজিক মেলামেশার উদ্দেশ্য নিয়ে আসি নি মিঃ সামন্ত'—ঈষৎ হাসলেন ডাঃ বসাক কথা বলতে বলতে—'আপনি সমরেশবাবুর শুভানুধ্যায়ী। ছোটবেলা থেকেই ওঁকে চেনেন। ওঁর বিষয়ে এবং মাধবী দেবীর সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে এলাম।'

'এখনও কি আরও কথা জানতে বাকি আছে আপনাদের।'—সত্যজিৎ বিব্রত হয়ে উঠলেন যেন—'গত কয়েকদিন আমরা জেরার চোটে একেবারে নাজেহাল হয়ে গেছি মশাই। আপনাদের সোজাসুজি বলছি—ব্যাপারটা প্রণয়-ঘটিত। ওদের দুজনকেই গ্রেপ্তার করে বেশ চাপ দিন, সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়বে। তা না করে কেবল আগড়ম-বাগড়ম কথা বলে কি লাভ?'

'সমরেশ সরকারের বিষয়-সম্পত্তি বোধহয় সব মাধবী দেবীর নামে উইলে লেখা ছিল—তাই না?'

উইলের কথা এর আগে অন্তত বারপাঁচেক নানাভাবে আলোচনা হয়ে গেছে, সে কথা মনে করে সত্যজিৎ সামন্তের কপালে পর পর তিন-চারটে ভাঁজ পড়ল। তবু ধৈর্য না হারিয়ে শান্তভাবেই তিনি সব বলে গেলেন। জমি-জমা ও নগদ টাকার পরিমাণ প্রায় তিন-চার লাখ টাকার মত ছিলো, এ ছাড়াও শেয়ারে প্রায় দু'লক্ষ টাকা বাবা ত্রিদিব সরকার। সমরেশ ছেলেবেলা থেকেই অসুস্থ এবং দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, হয়তো বিষয়-সম্পত্তির ঝামেলায় ওকে বিব্রত করা ঠিক হবে না ভেবে সত্যজিৎ সামন্তের হাতে সবকিছুর ভার ছেড়ে দিয়ে ত্রিদিব সরকার নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

'অর্থাৎ আপনিই সমরেশবাবুর সম্পত্তির সোল ট্রাস্টি—তাই না? আপনার অনুমতি ছাড়া তিনি এ ব্যাপারে কোন কিছু ডিসিশন নিতে পারেন না। আচ্ছা, ম্যাকেঞ্জি এণ্ড মিত্র নামে সলিসিটর্স ফার্মে আপনিই তো এককালে পার্টনার হয়েছিলেন?'—এবারে রামদুলাল দত্ত ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ'—সত্যজিৎ সামন্ত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'আর কেন যে আমি চাকরী ছেড়ে দিলাম, সে কথাও বলেছি। বুড়ো ম্যাকেঞ্জি যতদিন বেঁচেছিল, অভিযোগ করার সুযোগ পাই নি। কিন্তু বুড়োর ছেলে রবার্ট সব ছেড়ে-ছুড়ে বিলেতে চলে যাওয়ার পরে দিশী আবহাওয়ার মধ্যে আমার কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সমরেশও তখন ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে, আমাকে ডেকে বলল—'কাকাবাবু, আমিও বেকার, আপনারও ওখানে বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না। আসুন, যা হোক একটা কিছু করা যাক।' কি জানি কেন যে ওর কথায় সায় দিয়ে শেয়ার মার্কেটের ফাট্কাবাজীর খেলায় নেমেছিলাম। ফলে আমাদের দুজনের ক্যাপিটালে হাত পড়ল। তারপরে সমরেশ কিছু দিন মাইকা মাইন কিনে তার পেছনে বেশ কিছু টাকা ঢালল। এর পরে আবার কাচের ব্যবসায় নামার কথাও তুলেছিলো, সে আমি হতে দিই নি।'

'আচ্ছা, সমরেশবাবু একটা উইল করেছিলেন বোধহয়'—বরুণেন্দ্র বসাক প্রশ্ন করলেন।

'উইল করার কথা হালে ওর মাথায় ঢুকল। যেদিন থেকে সন্দেহ হোল বিষ খাওয়ানো হচ্ছে ওকে। দস্তুরমতো সাক্ষী-সাবুদ ডেকে মাধবীকে সমস্ত সম্পত্তি ও লিখে দিলো। বোধহয় মাধবীই তখন বলেছিলো হাসতে হাসতে—'যদি আমিই আগে মারা যাই।' কথাটা ভাববার মতো। আমি শেষে বুদ্ধি দিলাম যখন আর কোন উত্তরাধিকারী এক্ষেত্রে নেই, একটা ট্রাস্ট করে চ্যারিটির জন্য রেখে গেলে ভালই হয়।'

'ট্রাস্টি কে হোল?'

'সমরেশ আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না'—সত্যজিৎ সামন্ত পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে—'যতই হোক, অল্প বয়স থেকে আমাকেই গার্জিয়ানের মত দেখছে তো। আমার পরামর্শ নইলে একপাও ও চলতে চাইত না। জীবনে একটি যে ভুল করেছিলো, সে ওর বিয়ের ব্যাপারে। অনেক নিষেধ করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। একটা বয়সে মানুষ এমন অন্ধ হয়ে পড়ে, কি বলব।'

'চ্যারিটি বলতে ঠিক কি বোঝাচ্ছেন মিঃ সামন্ত?'—বরুণেন্দ্র বসাক আবার একটা প্রশ্ন করলেন কথার মাঝখানেই—'কোনো স্পেশাল কোথাও কি টাকাটা উনি দেবার কথা ভাবছিলেন? আপনি বোধহয় ভাবছেন এ ধরণের প্রশ্ন কেন আপনাকে বার বার করছি। সমরেশ সরকার আমার পেসেণ্ট, ওর সাইকোলজি আমাকে স্টাডি করতেই হবে। ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন ধরেই নিজেকে প্রস্তুত করছেন। না, বেঁচে থাকার প্রস্তুতি নয়, জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা। কাজেই নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোথায় কিভাবে উনি দিয়ে যেতে চান সেটা আমার মতে খুবই ইন্টারেস্টিং।'

সত্যজিৎ সামন্ত উঠে চাবি ঘুরিয়ে রাইটিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা মোটা খাম বার করে টেবিলের উপর রেখে বললেন—'উইলের একটা রাফ কপি আমি হাতের কাছেই রেখে দিয়েছি। সমরেশের খামখেয়ালী মন তো,

কখন এসে ফস করে বলবে আবার বদলাতে হবে।'

'উইলটা বেশ মন দিয়েই দেখলেন বরুণেন্দ্র বসাক। রামদুলাল দত্ত সুযোগ পেয়ে এতক্ষণ অপর্ণা লাহিড়ীর সঙ্গে সমরেশ সরকারের সম্পর্ক ঠিক কি, সেই সব গোপন তথ্য আবিষ্কারের আশায় সত্যজিৎ সামন্তকে উত্যক্ত করে তুললেন। বসন্ত মল্লিক লোকটিই বা কি প্রকৃতির মানুষ? কমলেশ বসু সম্পর্কে তাঁর ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা যে সব খবর আনছে, তাতে বিশেষ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ইন্টার-ন্যাশনাল স্ম্যাগলিং-এর একটা গ্যাং-এর সঙ্গে কি বসন্ত মল্লিক ও কমলেশ বসু দুজনের নামই কিছুটা জড়ানো? এ ছাড়া অনিল বিশ্বাসকেও সহজ-সরল মানুষ বলে মনে হয় না। সব সময়েই ও একটা কিছু গোপন করছে। একটা খুবই আশ্চর্য পরিস্থিতি, যেখানে সব ক'টি চরিত্রকেই দোষী বলে ধরা যায়।

'আমি কিন্তু ফোকাস সুনন্দ মিত্রের উপরেই রাখতে বলব'—সত্যজিৎ সামন্ত মাথা নাড়লেন—'আপনি জানেন না, ওকে সমরেশ আর মাধবীর জীবন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যে আমি কত চেষ্টা করেছি। এমন কি দেশের বাইরে পাঠানোর কথাও আমার মনে হয়েছিল। কিন্তু সবই বিফল হোল।'

উইলের দিকে চোখ, তবু কাটা কাটা কথাগুলো বরুণেন্দ্র বসাকের কানে যাচ্ছিল। আশ্চর্য, বোধহয় পঁচিশটা কি আরও বেশি অখ্যাত অজানা ইনস্টিটিউট-এর নাম টাইপ করে লেখা। প্রত্যেকটি জায়গায় দশ হাজার, বিশ হাজার ডোনেশান করা হয়েছে সত্যজিৎ সামন্তের মারফতে। লোকে সাধারণত হাসপাতালে অথবা মিশনে যথাসর্বস্ব দান করে যায়।

কথাটা না তুলে পারলেন না ডাঃ বসাক।

সত্যজিত সামন্ত মাথা দুলিয়ে ঘাড় ঝাকুনি দিয়ে বললেন—'সমরেশকে আপনি নর্মাল মানুষ ভাবছেন নাকি? তবু তো আরও গোটা কুড়ি নাম ছেঁটে বাদ দিয়েছি। যেখানে যখন কেউ এসে টাকা চেয়েছে, ফস করে তাকে প্রমিস করে বসেছে।'

রামদুলাল দত্ত খালি কফির পেয়ালাটা এতক্ষণে টেবিলের উপর ঠক করে নামিয়ে রেখে সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মতে সারা সন্ধ্যাটাই শুধু শুধু নষ্ট হোল। টেলিফোনের কর্কশ শব্দ সেই মুহূর্তে বেজে ওঠাতে বিরক্তি প্রকাশ করার আর অবসর পেলেন না।

'মিঃ দত্ত—ফোনটা আপনার। সমরেশ সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটারী কথা বলতে চাইছে।'

'হ্যাঁ—কি খবর।' রূঢ় ঠাণ্ডা গলায় বললেন রামদুলাল দত্ত। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সমস্ত শরীর যেন ইলেকট্রিক শক খেয়ে কেঁপে উঠল—'বলেন কি? কখন? কি করে। আচ্ছা, আমরা এখুনি যাচ্ছি। কাউকে কোনো জিনিস ছুঁতে দেবেন না।'

'কি, কি হোল?'—আগ্রহে দু' চোখের পলক পড়ছিল না দুজনের।

থেমে থেমে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠলেন রামদুলাল দত্ত—'আর একটা মার্ডার। এবারে ভিক্টিম সুনন্দ মিত্র নিজে।'

'মাই গড্'—বরুণেন্দ্র বসাক অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন—'অ্যারেস্ট হিম ইমিডিয়েটলি—বিফোর ইট ইজ টু লেট।'

'কাকে অ্যারেস্ট করব?' রামদুলাল দত্তের কপালে মোটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন পড়ল।

'সমরেশ সরকারকে। আর দেরি করা চলবে না।'

(ক্রমশঃ)

বঙ্গ-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক

মূল্য—তিন টাকা

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অন্য তরঙ্গ

শ্রীনেহরু গত হয়েছেন, এবং ভারতবর্ষের সিংহাসন ইতিহাসের ধারায় আবার অলঙ্কৃত হয়েছে। বস্তুত, ইতিহাস কালের মত সতত সঞ্চরমান, সে কখনো কোথাও মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করে না। এবং মানুষ কালপ্রবাহের উৎক্ষেপে ও অবরোহে যেমন নিয়ত আন্দোলিত হয়, তেমনি ইতিহাসের এক একটি তরঙ্গে দোল খেতে খেতে আমরা অববাহিত হয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি তরঙ্গই আমাদের ওপর তার অস্তিত্বের সত্যটি মুদ্রিত করে দিয়ে যায়, কিন্তু এত দ্রুত তার উৎক্ষেপ ও লয় যে পরবর্তী তরঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে পূর্ববর্তীর উপলব্ধিগুলি নবীন অভিজ্ঞতায় প্রায়শই ফিকে হয়ে যেতে থাকে।

কিন্তু কোন কোন তরঙ্গ অত্যন্ত বিশাল ও তার রোমাঞ্চ অত্যন্ত ত্বরিত; আর মানুষ যেহেতু সনাতন অভিযাত্রী, সেই জন্য তার বিবেচনা সেই বিরল মহার্ঘকে মনের মধ্যে লালন করতে ভালবাসে। নেহরু ও তাঁর ভারতবর্ষ ইতিহাসের এমনি এক তরঙ্গ, যা ইতিহাসের মানুষের কাছে অব্যবহিত এক স্মৃতি। নিকটতম অভিজ্ঞতা। বর্তমানই সবার কাছে সবচেয়ে জীবন্ত, কিন্তু যে বর্তমান এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কোন আকার গ্রহণ করতে পারে নি, সেখানে অব্যবহিত অতীত বোধহয় উজ্জ্বলতম। কিন্তু ইতিহাসের জগৎ এত বড় যে এত কাছের মাপে তার কোন অংশ বিবেচিত হতে পারে না, ইতিহাস-সন্ধিৎসায় সমর্পিত-জীবন শ্রীনেহরুও সম্ভবত এই শিক্ষাকে কখনো অস্বীকার করেন নি।

সত্যি করে বলতে কি, ইতিহাস এখনো ঐতিহাসিকের প্রবণতায় 'নেহরু-যুগ' লেখার আয়োজন সুরু করে নি, সেটা কখনো সম্ভবপরও নয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শ্রীনেহরুর কলম অনেকগুলি অক্ষর বসিয়ে গেছে, সেই বিক্ষিপ্ত অক্ষরগুলিকে নিয়ে শব্দ প্রস্তুত করা বা সেই শব্দগুলিকে নিয়ে বাক্য-অন্বয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সময়ের প্রয়োজন। এবং এই সমস্ত প্রাথমিকক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেলে তখন বিবেচনার প্রসঙ্গ। কেন না ইতিহাস শুধু অক্ষর, শব্দ বা বাক্য নয়, তা সমান ভাবে বিবেচনাও বটে; এবং এই নৈতিক অংশটি আছে বলেই তা উপকরণ-মাত্রতাকে অতিক্রম করে মহাকালের সমমান শিল্প হয়ে উঠতে পারে। এই বিবেচনাকে অর্জন করতে হয় বটে, কিন্তু একই সঙ্গে তাকে স্বতঃস্ফূর্তও বলা যায়, কিন্তু তার প্রয়োগের জন্য ক্ষেত্র-প্রস্তুতি দরকার। বন্যার জল যতক্ষণ পর্যন্ত না নেমে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেমন 'কি পেলেম'-এর হিসেব সম্ভব নয়, তেমনি উপকরণকেও বিশুদ্ধ উপকরণরূপে পেতে হলে দীর্ঘ প্রতীক্ষা প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই নেহরু-যুগের যথার্থ ইতিহাস এখনই রচিত হতে পারে না। বন্যা বয়ে গেছে। কিন্তু জল এখনো নামে নি; এই মুহূর্তটি বস্তুত উচ্ছ্বাসের, স্মরণের ও শ্রদ্ধা নিবেদনের। যাঁরা এখনই নেহরু-যুগ-এর গৌরব-ইতিহাস রচনায় অত্যুৎসাহী, তাঁরা কাহিনীকার মাত্র এবং তাঁরা ইতিহাসের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করবার অবকাশ এখনো পান নি।

তার চেয়ে এই মুহূর্ত ঢের বিশুদ্ধ শ্রীনেহরুর অন্তরঙ্গ জীবনকে অনুসরণ করা; যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর রোম্যাণ্টিক চেতনার স্পর্শে আলোকদীপ্ত, যে চেতনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম তাঁর আদর্শবাদ। তাঁর আত্মচরিত বা শেষ ইচ্ছাপত্র দলিল হিসেবে আমাদের কাছে আছে। জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণার সাক্ষ্য নিয়ে আছে বিভিন্ন সময় উচ্চারিত তাঁর অভিভাষণগুলি।

রবীন্দ্রনাথ একবার নোগুচিকে লিখেছিলেন, 'Foolish Idealist as I am'; এই উক্তি পক্ষান্তরে কবির মহনীয়তাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছিল। তার কারণ, মানুষ ছিল তাঁর চৈতন্যে প্রথম প্রসঙ্গ, যার কাছে অন্যান্য যে কোন প্রসঙ্গ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়। আদর্শবাদ সেইজন্য চিরদিনই এক গুণ, এবং যে কোন আদর্শের ভিত্তিভূমি মনুষ্যত্ব। জওহরলাল নেহরুর মধ্যে এই মনুষ্যত্ববোধে নির্মল উত্তরাধিকার বর্তেছিল, এবং তাঁর সার্থকতা এই যে তিনি আমাদের আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এই কাজ সচরাচর কবিরা করেন, আর আমরা তো ইতিমধ্যে একথা সুস্পষ্টভাবে জানি যে, সামাজিক চেতনার শীর্ষবিন্দুতে কবিদের অধিষ্ঠান। একজন রাষ্ট্রনেতার পক্ষে এই বিরল কৃতিত্বে অধিষ্ঠিত হওয়া কোনদিন হয়তো প্রবাদের মত শোনাতে পারে, যেহেতু, সমরসেট মমের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনেতাদের তালিকায় প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা প্রায় অনুপস্থিত।

—সুব্রত

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

হারিয়ে পাওয়া

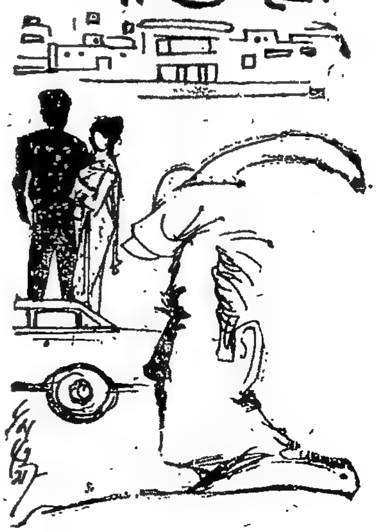

ছোট্ট গলিটার ঐপারে মিস্টার চৌধুরীদের বাড়ি, আর আমরা থাকি এই পারে। নতুন এসেছেন ওঁরা এ-পাড়ায়। পশ্চিমের জানালাটা খুললেই চোখে পড়ে দোতলা বাড়িটা। ওপরের তিন কামরার ফ্ল্যাটটায় থাকতেন উনি সপরিবারে।

পাড়াপড়শীর খোঁজ রাখা অসম্ভব কলকাতা শহরে। কে কার খোঁজ রাখে। যে যার ধান্দায় অস্থির। একেবারেই চোখের সামনে ছিলেন তাই মাঝে মাঝে চোখে পড়তো। কখন হাওয়ায় হয়তো সবুজ পর্দাগুলি একটু উড়ছে, ফাঁক দিয়ে ঘরখানাকে পরিষ্কার নজরে পড়তো। ছোট্ট ঘরখানা। একপাশে নতুন তৈরি জোড়া খাট, সুন্দর একটি ড্রেসিং টেবিল, ছোট্ট একটি টি-পয়, আর ফুলদানিতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। ফিটফাট পরিষ্কার ঘরখানা। আর পাশের ঘরখানাতে থাকতেন চৌধুরীবাবুর বৃদ্ধা মা। একেবারে আমাদের বসবার ঘরটার উল্টোদিকে। ছোট্ট একখানা খাট পাতা। কোণে তাঁর রান্নার সরঞ্জাম, বাড়ির যত কালো ট্রাঙ্ক, ভাঙা তোরঙ্গ আর গুচ্ছের জিনিষ দিয়ে ঠাসা। ঘরখানায় যেন পা ফেলবার পর্যন্ত জায়গা নেই। বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম একা উনিই করতেন। ঠিকা ঝি মর্জিমাফিক বাসন-পত্তর মেজে দিয়ে যায়, আর বাকি সব কাজটুকু ত' উনি নিজের হাতেই করতেন।

সন্ধ্যার পরই চৌধুরীবাবুর গাড়িটা এসে থামতো দরজায়। বাড়ির সমস্ত আলোগুলো জ্বলে উঠতো। অফিস থেকে এসেই স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, আর ফিরতেন বেশ রাত করে। রান্না সেরে রোজ বৃদ্ধা মহিলা সেই কত রাত অবধি একা একা জানলার ফাঁক দিয়ে ওঁদের পথ চেয়ে তাকিয়ে থাকতেন। আমার ভারি খারাপ লাগতো।

মাঝে মাঝে দেখতাম—ঠাকুরের আসনের কাছে একান্ত হয়ে বসে আছেন। ঠাকুরের ছবি চন্দন আর ফুল দিয়ে সাজাতেন, গুন্‌গুন্‌ করে গান করতেন। সব যেন ভুলে আছেন। পূজার শেষে ছোট্ট একটি চন্দনের টিপ পরে খোলা জানলাটার পাশে এসে দাঁড়াতেন, সূর্যপ্রণাম সেরে, সংসারের নিত্যকাজে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। তোলা উনানে আগুন দিয়ে ময়দা মাখতে বসতেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঘরখানা অন্ধকার হয়ে যেত। চায়ের জল চড়িয়ে একা একা কত কি যে ভাবতেন বসে বসে।

একরাশ সাদা চুল। ময়লা গায়ের রঙ। হাসি হাসি মুখখানা এখনও যেন চোখে ভাসে। এত বয়সেও কি কাজটাই না করতে পারতেন। দূর থেকেই দেখতাম আর আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে মনগড়া কত আলোচনাই না করতাম।

একদিন রবিবার দুপুরবেলায় হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে মনটা যেন বিরক্তিতে ভরে উঠেছিল। কে এল এমন ভরদুপুরবেলায়। দরজা খুলেই দেখি উনি দাঁড়িয়ে আছেন—মিস্টার চৌধুরীর বৃদ্ধা মা।

—তোমরা নিশ্চয়ই একটু আরাম করছিলে—তাই না। আর আমি এমন অসময়ে এলাম তোমাদের বিরক্ত করতে। দুপুরটুকু ছাড়া যে আমার আর ফুরসুৎ নেই—বাবা। একা একা বড় হাঁপিয়ে উঠেছি। আমরা গ্রামদেশের

মানুষ—লোকজন ছাড়া বাঁচি কেমন করে। তাই ত' এলাম তোমাদের দুজনের সঙ্গে চেনা করতে।

তারপর থেকে প্রায়ই উনি আসতেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে। পাশের কামরা থেকে মাঝে মাঝে ওদের কথোপকথনও কানে আসতো।

—আর বোলো না---এখানকার মানুষগুলো সবাই যেন দম দেওয়া কলের পুতুল। কেউ কারো খোঁজও রাখে না। কলকাতা আমার যেন কেমন অসহ্য লাগে। এসেছি কি আর সাধে মা! ছেলে ছাড়বে না, আমি কাছে না এলে সংসারী হবে না। বিয়ে করবে না। কী ছেলে-মানুষ যে আমার বিশু—সে না দেখলে বিশ্বাস পর্যন্ত করতে পারবে না। দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার মা-মা বলে জড়িয়ে ধরবে। কী বলে জানো মা। বিশু বলে—বিয়ের পর এখন আর বৌয়ের সামনে মারধর করো না যেন—বলতে বলতে উচ্ছল হাসিতে বৃদ্ধা মহিলা যেন উথ্‌লে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন—সত্যি বলতে কি মা। এই ত' সেদিন অবধিও ছেলেকে শাসন করেছি। এমন ছেলে কারো হয় না। বিয়ে করবে না।—মা নাকি পর হয়ে যাবে।

—কতদিন ছেলের বিয়ে দিয়েছেন?—স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

—এই ত' সেদিন—গত বোশেখ মাসে। কত মেয়ের বাবা যে ধন্না দিয়েছেন এই দোরে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে। আমিও তেমনি দেখেশুনে মেয়ে এনেছি। চন্দননগরের মুখুজ্যে বাড়ির মেয়ে—পাল্টা ঘর। যেমন রূপ তেমনি গুণ। বড় ঘরের একটি মাত্র মেয়ে হলে যা হয়—আদরে আব্দারে মানুষ হয়েছে। আমিও মেয়ের মতই দেখি। হেসে-খেলে দিন কাটানোর সময় ত' এটাই, সময় হলে নিজেরটা নিজেই দেখে-শুনে নেবে।

—রান্নাবান্নার সব কাজ ত' আপনাকেই করতে হয়—তাই না। রান্নার একটা লোক রেখে নিলেই ত' পারেন, তবে আর এত কষ্ট হয় না।

—কি যে বল মা। কষ্ট কোথায়? এতে যে আমার কত আনন্দ সেকথা কেমন করে বোঝাই বল। নিজের হাতে পেটের ছেলেটাকে রেঁধে খাওয়াবো—সেই আশাতেই ত' গ্রাম থেকে ছুটে এলাম কলকাতায়। কতকাল বিশু আমার বুকছাড়া। মেসে-বোর্ডিং-এ খেয়ে খেয়ে ছেলেটার কি চেহারা হয়েছে। এখন নিজের হাতে দুটো ভাত ফুটিয়ে দিতে পেরে যেন নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর সত্যি বলতে কি—রান্নার লোক ত' আমিই রাখতে দিই না। ছেলে-বৌ দুজনেই এ নিয়ে কত বকাবকি করে। যা নোংরা লোক-গুলো---আমার ত' ঘেন্নাই করে। তার উপর বিশুর এখন টাকার কত দরকার। নতুন বাড়ি করছে। আর দুটো টাকা যদি বাঁচে, সে ত' আমারই লাভ মা।---বিশ্বাস কর কাজ করতে আমার একটু কষ্টও নেই। দুবেলা ছেলেটাকে চোখের সামনে দেখি, বৌটাকে দেখি, পাশের ঘর থেকে দুজনার হাসির আওয়াজ শুনি—এই ত' আমার সবচেয়ে সুখ। সেই এতটুকু ছেলে বিশুকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলাম। আমি ছাড়া ওরই বা আছে কে!

দেখতে দেখতেই উনি আমাদের বড় আপন হয়ে গেলেন। সময় পেলেই উনি ছুটে আসতেন। কত যে ঘরোয়া গল্প করতেন।

সেদিন দুপুরবেলা। একা একা নিজের পড়ার ঘরে বসে আগামী গল্পের পটভূমিকা নিয়ে ভাবছিলাম। গ্রীষ্মের দারুণ মধ্যাহ্ন-বেলা। ক্লান্ত অবসাদ জড়ানো যেন। নীল আকাশ দারুণ গ্রীষ্মের তাপ-দহনে যেন ঝল্‌সে গেছে। একটুকরো সাদা মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোনখানে। খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। দূরে-বহুদূরে আকাশের এক কোণে—ঐ সুদূর দিগন্তের সীমানা ঘেঁষে চলেছে উদ্‌ভ্রান্ত দুটো চিল। কোথায় কে জানে।

পাশের বাড়ির কলতলা থেকে ঘষ্ ঘষ্ বাসনমাজার আওয়াজ আসছে। একা একা আপনমনে ঝি যে কার শ্রাদ্ধ করে চলেছে—তা সম্ভব সে নিজেও ঠিক জানে না। ভরা বালতিতে কলের জল পড়ছে ত' পড়ছেই। জল উপছে পড়ে, কিন্তু তার কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

পথ-ঘাট জনশূন্য, ছায়াহীন। সবে কেবল দরদালানের ছায়া পথে নামতে সুরু করেছে। সারি বেঁধে গোটা কয়েক রিক্সা পথের কিনারায় পড়ে আছে। রিক্সার ঘোমটা টেনে টানা লম্বা ঘুম দিয়েছে রিক্সাওলা। আঙুলে জড়ানো ঘণ্টিটা মাঝে মাঝে আপন অভ্যাস মতই বেজে চলে---টুং—টুং—টুং। রিক্সার নীচে একটু ছায়া দেখে পাড়ার নেড়িকুত্তাটাও লেজ গুটিয়ে নিদ্রার আয়োজন করছে সেখানে।

বাসনওলা ঢং—ঢং—ঢং বাসন পিটিয়ে সজাগ করে যায় গৃহিণীদের। কাঁসারীর পর আসে শাঁখারী। কিন্তু যাদের জন্য ব্যবসায়ীদের এমন দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন তারা ত' ততক্ষণে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছেন। মাথার উপর বন্‌বন্ পাখা ঘুরছে, কানের কাছে মহিলা মহলের বেলাদি হয়ত কত কথা বলে চলেছেন কিংবা সমস্বরে বেজে চলেছে অনুরোধের আসর, কিন্তু তাঁরা সবাই তখন ঘুমে অচেতন। সেই সুযোগে ছোট্ট শিশুটি বিছানা ছেড়ে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সরাসরি কলঘরের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছে। অবাধ স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল হয়ে কলের নীচে বিবস্ত্র ধারাস্নানে ব্যাপৃত। পাশের বাড়ির একতলার খানিকটাই আমার জানলা থেকে পরিষ্কার নজরে আসে।

পাশেই অসময়ে অর্ধাঙ্গিনী গভীর নিদ্রায় শায়িতা। বাড়ির পোষা মেনি

বেড়ালটা পর্যন্ত রৌদ্রের ভয়ে ঘরের কোণেই আশ্রয় নিয়েছে। খুকুর দুধটুকু সাবাড় করে এসে গোঁফজোড়া এখন সাফ করছে।

এমনি সময় মাসীমা এলেন আমাদের বাড়ি। এমন অসময়ে আসেন বলে গৃহিণী আমার প্রায়ই বিরক্ত হতেন। মাঝে মাঝে একটু-আধটু অসন্তোষও বুঝি প্রকাশ করে ফেলতেন। তাই তাঁর দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বললাম—চলুন মাসীমা আমরা পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করি। ওঁর শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

—দুপুর ছাড়া সময়ও পাই না নয় অন্য সময়ে একটু আসবো। সময় পেলেই মনে হয় তোমাদের গিয়ে একটু দেখে আসি। তা তোমরা সবাই ভালো আছো ত'।

—কি এনেছেন ওটা। প্রশ্ন করলাম।

—একটু তেঁতুলের আচার বাবা। আজকালকার মেয়েরা আচার-কাসুন্দিও দেয় না। কলকাতায় এসব জিনিষও নাকি সবাই কিনে খায়। লুকিয়ে-চুরিয়েই আচারটুকু দিয়েছিলাম, জানতে পারলে ছেলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না। এ সময়ে মেয়েদের একটু টক্ ঝাল খেতে ইচ্ছে করবেই, তা পুরুষেরা কি আর অত শত বোঝে। আমার বৌমা বড় লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে বাবা।—বলেই অজানা আনন্দে মাসীমা যেন আনমনা হয়ে উঠলেন। বললেন—আর ত' মাত্র কটা দিন। সংসারে আমার নতুন মানুষ আসছে। আমি ত' একরকম বলেই রেখেছি ওদের—রান্নাঘরে আর পা বাড়াবো না। আমার কত কাজ বাড়বে। দাদু ত' আমার কাছেই থাকবে সারাক্ষণ। ছেলেমানুষ বৌটার কাঁধে অত শত ঝঞ্ঝাট আর দায়িত্ব আমি সাত-তাড়াতাড়ি কিছুতেই চাপাবো না। দাদুকে আমি বিশুর মত করেই বড় করবো। মানুষ করবো। আমার শ্বশুরকুলের বাতি, আমাদের একমাত্র বংশধর।—বলতে বলতে চোখ দুটো মাসীমার ছল্ ছল্ করে উঠলো। আঁচলের খুঁটে জলটুকু মুছে বললেন—কত আশায় আশায় দিন ঠেলেছি, এতটুকু বিশু আমার কবে বড় হবে—মানুষ হবে, বিয়ে হবে, ছোট্ট টুকটুকে বৌ আসবে—কত স্বপ্ন দেখেছি রাত্রিদিন। আমার সব সাধই ঠাকুর আজ পূর্ণ করেছেন। ঠাকুরকে সেদিন কত প্রার্থনা জানিয়েছি---বিশুকে সংসারী দেখেই যেন চোখ বুজতে পারি। কিন্তু আজ আর আমার সে সাধ নেই—বলেই মাসীমা হেসে উঠলেন।

একটু থেমে হাসতে হাসতেই মাসীমা বললেন—দাদুকে মানুষ না করে কোথায়ও যাবার আমার এতটুকুও আকাঙ্ক্ষা নেই। আমার বিশুর সন্তান—সেই যে আমার সব, আমার পূজার ঠাকুর আমার নাড়ু-গোপাল।---আজকাল আমার যে কি ভিমরতিই হয়েছে, তা কি আর বোলবো। গোপালকে সাজাতে সাজাতে চোখের সামনে যেন আমার দাদুকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাই। সে যেন হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকেই আসছে। স্পষ্ট যেন শুনতে পাই গোপাল আমাকে বলছেন—কই আমাকে নাড়ু দাও।---এসব কথা শুনে বিশু ত' হেসেই কুটোপাটি, বৌ বলে—আদিখ্যেতা। লেখাপড়া জানা মেয়ে—সে এসব বিশ্বাসই করে না। বলে—কুসংস্কার। শুনে আমার কিন্তু কখ্খনো রাগ হয় না।

শুনলাম বিশুবাবুর নতুন বাড়ি প্রায় হয়ে এল। বালীগঞ্জ এলাকায় মস্ত বাড়ি করছেন। পুজোর পরই শুভদিন দেখে ওঁরা নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। মাসীমার আনন্দ আর ধরে না।

—ছেলে আমার কি বলে জানো বাবা, শুনে ত' আমি হেসেই মরি। আমার নাকি এই ছোট্ট ঘরে খুব কষ্ট হয়। আমি নাকি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছি।—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—বাড়িটা যে কি সুন্দর হচ্ছে তা কি বলবো। একেবারে দক্ষিণ খোলা। সামনে ছোট্ট একটুকরো সবুজ বাগান। তিন-তিনটে নারকেল গাছ, দুটো কাঁঠালিচাঁপার গাছ, একটা মস্ত কৃষ্ণচূড়ার গাছ।---উপরতলায় চারখানা আর নীচে পাঁচখানা ঘর। আমার ঘরখানা হয়েছে—সবচয়ে সুন্দর---চারিদিক খোলামেলা। পাশেই ঠাকুরঘর আর খোলা একফালি বারান্দা। ছেলে আমার কি বলে জানো। বলে—তোমার জন্যেই ত' বারান্দাটা করেছি মা। শীতের দিনে তুমি ঐ বারান্দায় বসে কলার পাতায় পাতায় ডালের বড়ি শুকোতে দেবে। কাসুন্দির হাঁড়ি রৌদ্রে দেবে। আমি বলি, না বাপু, আমার দ্বারা ও সব আর চলবে না। শীতের দিনে রৌদ্রে পিঠ দিয়ে ঐ বারান্দায় বসে বসে আমি কেবল দাদুকে তেল মাখাবো আর ঘোড়া ঘোড়া খেলবো।

ক্রিম্যান
লণ্ঠন সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
২৩৩,৩৬ চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন-২২-৩৫৮০

মাসীমার চোখে মুখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়। সারাটা বুক যেন তাঁর অনাগত আসন্ন সুখের আনন্দে ভরে আছে।

দেখতে দেখতে দিন চলে যায়। সেদিন সন্ধ্যার পর সবে বসেছি খাতা আর কলম নিয়ে। গৃহিণী সেজেগুজে পাশে এসে দাঁড়ালেন। অভিপ্রায় বুঝতে পেরেই বললাম—বাড়ির চৌহদ্দি পেরুনো ছাড়া আর যাই বলবে—আমি রাজী।

হেসে বললেন—ছাতে চল। টবে মামার কি সুন্দর ফুল ফুটেছে, দেখবে চল না।

সত্যি বাহাদুরি আছে। ফুলের মেলা বসেছে যেন। হাস্নাহেনার লতায় লতায় গুঁড়ি গুঁড়ি সাদা সাদা ফুল ফুটেছে। সন্ধ্যামালতীর গাছগুলো ফুলে ফুলে রঙীন হয়ে আছে। রজনীগন্ধার আকুলগন্ধে আকাশ যেন মাতাল হয়ে আছে। নীল আকাশে তারার দল দলছাড়া হয়ে ছড়িয়ে আছে। রাতের শহরটা যেন আলো আর অন্ধকারে মিশে আছে। বিজলী আলোর প্রভা যেখানে শেষ হয়েছে—সেখান থেকেই সুরু হয়েছে রাতের নিঃসীমতা। কেমন যেন এক লালচে আভায় সারাটা আকাশ ছেয়ে আছে। ছাতের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলাম। শহরেরও যে এমন একটা নিঃসঙ্গ রূপ রয়েছে—চোখ মেলে আগে ত' কখন দেখি নি। বড় ভাল লাগছিল সন্ধ্যাটিকে। এমনি সময় চৌধুরীবাবুর গাড়িটা ওঁদের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

ছাত থেকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম গাড়ির আওয়াজ পেয়েই মিসেস চৌধুরী সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন, আর পাশের ঘরে মাসীমা ঠাকুরের ছবির সামনে চোখ বুজে পূজায় বসেছেন। চোখে তাঁর জল, কপোল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে।

পরিষ্কার শুনতে পেলাম মিসেস চৌধুরী রেগে স্বামীকে বলছেন—তোমাকে রোজ রোজ একটা কথা আর বলতে পারবো না। হয় আমাকে নিয়ে ঘর কর—মাকে দেশে পাঠাও, নয়তো মাকে নিয়েই থাকো আমাকে ছাড়ো। আমি আর পারি না। তোমার মা, তোমার না হয় সম্মান বলে কিছু নেই—আমার ত' আছে।

বিশুবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন আর ভদ্রমহিলা তারস্বরে বিষোদ্গার করছেন—তুমি জানো আমার বাপের বাড়ির লোকরা কত বড়লোক, কত সম্মানী ঘরের মানুষ ওরা—তাদের সামনে অমন ময়লা কাপড় পরে আসার প্রয়োজনটাই বা কি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজের ঘরে থাকলেই ত পারেন---তা নয়, কেবল মিনিটে মিনিটে বৌমা বৌমা করে পাগল করে ছাড়লেন আমাকে। এমনভাবে এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না।

ছাতের উপরে আমরা দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক। চোরের মত আড়াল থেকে পরের কথা শোনার এমন তিক্ত অভিজ্ঞতায় মনটা বিষিয়ে উঠল সেই মুহূর্তে। সন্ধ্যার সেই আবেশটুকু ভেঙে যেন খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম নীচে।

তারপর থেকে ওদিকে ওদের বাড়িটার দিকে চাইতেই যেন কোন একটা সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সঙ্কোচটুকুও একদিন মুছে গেল। ভুলেই গেলাম সেদিনের কথা।

সামনেই পূজার দীর্ঘ অবকাশ। মাসখানেকের জন্য স্ত্রী কন্যা নিয়ে হাওয়া বদলাতে পশ্চিমে চলে গেলাম এবং যথাসময়ে ফিরেও এলাম। কলকাতার বাতাসে তখন শীতের আমেজ।

কাজে কর্মে ব্যস্ততায় কটা দিন যে কেমন করে পার হয়ে গেল, টেরও পাই নি। সব কিছুই তেমনি আছে—যেমন ছিল একটা মাস আগে। সন্ধ্যার পর চৌধুরীবাবুর গাড়ি ঠিক সময়েই এসে দরজায় দাঁড়ায়। শোবার ঘরের নীল বালবটা তেমনি করেই জ্বলে। হাওয়ায় ঘরের পর্দাগুলি তেমনি করেই উড়তে থাকে। মাঝে মাঝে সব কিছুই আবার চোখে পড়ে, তবে আগের মতন আর তেমন কৌতূহল নেই।

মোড়ের মাথার সেই পানওলা আজও তেমনি ক্রেতার ভিড়ে বেসামাল হয়ে পড়ে। ভোজপুরী গোয়ালাটা আজও তেমনি করেই গরু আর নকল বাছুর নিয়ে রাস্তার মাঝখানেই দিব্যি আসর জমায়। আলুকাবলি-ওলা, কুলফিমালাইওলা তেমনি করেই মিষ্টি সুরে অবোধ্য ভাষায় ডাক দিয়ে যায়। তাজা বেলফুলের খবর পৌঁছে দেয় ফুলওলা। সবই তেমনি আছে।

হঠাৎ একদিন সকালবেলায় দেখি বিরাট একটা লরী এসে থামলো চৌধুরীবাবুদের দরজায়। যথাসময়ে গাড়ি—সংসারের খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিষে একেবারে ভরে উঠলো। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, চেয়ার টেবিল, বাসনপত্তর, শিলনোড়া, উনান, ফুলের টব --কি নেই। লরী চলে গেল। যথাসময়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি বেরুলো। ... ভাল লাগলো। নতুন রা... চলেছেন ওঁরা। যাক মাসীমা এবার নিশ্চিন্তে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন। বাকি দিনগুলি তাঁর আনন্দে ভরে উঠুক—মনটা বেশ সত্যি খুশি হয়েছিল।

—মাসীমা নিশ্চয় আজ ভীষণ খুশি—তাই না। স্ত্রীকে বললাম। কই যাবার আগে আমাদের সঙ্গে ত' একবার দেখাও করে গেলেন না।

—ওমা। তুমি জানো না। পূজার তিন দিন পরে হঠাৎ দু'দিনের জ্বরে হাসপাতালে মাসীমা মারা গেছেন। কাউকে একটু কষ্টও দেন নি। —বলতে বলতে চোখ দুটো ওঁর জলে ভরে এলো।

ততক্ষণে চৌধুরীবাবুর গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। মাসীমার বিশু তখনও পিছনের কাচের জানালাটা দিয়ে তাকিয়ে আছে আঠারো নম্বর বাড়িটার দিকে।

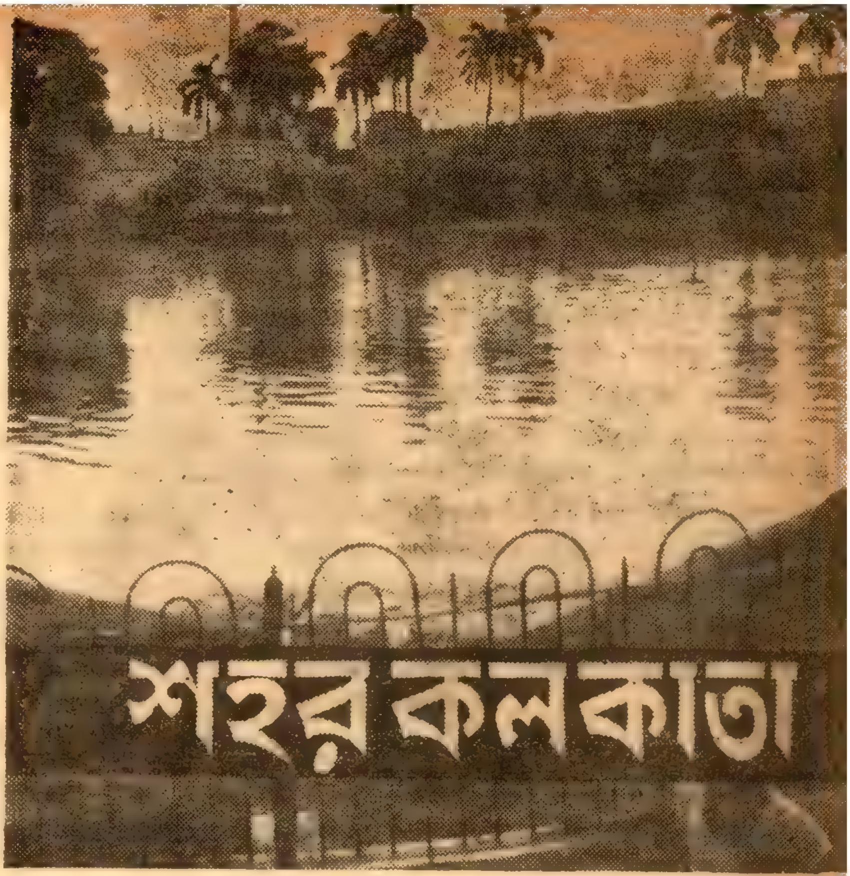

● ওয়েলেসলি স্কোয়ারের পল্বল-খচিত দৃশ্য

॥ যুগ-যুগান্তরের ওয়েলেসলি অঞ্চল ॥

সমগ্র ওয়েলেসলি অঞ্চল তার পূর্ব নাম থেকে বিচ্যুত বর্তমানে। তার সেই অসপিল সরণী— যা উত্তর থেকে দক্ষিণের পার্ক ষ্ট্রীটে লাভ করেছে পূর্ণচ্ছেদ—আজ তা নামধারণ করেছে রফী আমেদ কিদোয়াই রোড। রফী আমেদ কিদোয়াই ছিলেন যুক্ত-প্রদেশের বরেণ্য জন-নায়ক। রাজ-নীতির সঙ্গে তাঁর জীবনের সংযোজন ঘটে কৈশোরকাল থেকেই। সেই থেকে আমৃত্যুকাল রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে তাঁর যে-সার্বিক অবদান—তা স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করেছে নিঃসন্দেহে। তিনি ছিলেন কৃতী সদস্য মুক্ত ভারতের প্রথম মন্ত্রিসভায়। নেহরুর সুযোগ্য সহকর্মীরূপে তাঁর উত্তরণ ঘটে সার্থকতার তীর্থে। বহু জটিল সমস্যার সুন্দর সমাধানের বেদীমূলে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তাঁর একক সত্তার বিগ্রহ। তাই যুক্তপ্রদেশ তাঁর অধিবাস-ক্ষেত্র হলেও, সমগ্র ভারতের তিনি অবিস্মরণীয় সন্তান। সুতরাং সেই সূত্রেই শহর-কলকাতার এক বিশেষ সরণী—যা অনেককাল অবধি আত্ম-প্রতিষ্ঠ ছিল ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটরূপে—আজ তা সেই মহান ব্যক্তিত্বেরই স্মৃতির বাহকরূপে নামধারণ করেছে রফী আমেদ কিদোয়াই রোড।

রাস্তার পূর্বভাগে প্রাচীন পল্বল-খচিত যে-উদ্যান—যার ত্রি-উপান্তে বিন্যস্ত নাতিদীর্ঘ উপপথ, আজ তারও নামকরণ হয়েছে হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্কোয়ার। হাজী মোহসীন ছিলেন মুসলিম শিয়া সমাজের উল্লেখ-যোগ্য যুগ-পুরুষ। উনবিংশ শতাব্দীর এক অনন্যচরিত্র তিনি। পূর্বপুরুষ তাঁর বহির্বঙ্গীয় হলেও, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বাঙালী এবং বাংলার সহজাত আদর্শেই তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর উপেক্ষিত সমাজের। ঐশ্বর্যের অপ্রাতুল্য তাঁর ছিল না। তবে বলা বাহুল্য, তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই সমস্ত ঐশ্বর্যের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন বিভিন্ন সৎকার্যে। তাঁর যাবতীয় সৎ-কার্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হুগলীর ইমামবাড়া এবং মোহসীন কলেজ। সুতরাং, এমন এক মহৎ ব্যক্তি-সত্তার স্মৃতির বিস্মরণ ঠিক সমুচিত নয় ব'লে

শ্রীপদাতিক

শহর-কলকাতার এই বিশেষ উদ্যান এবং তার ত্রি-উপান্তের উপপথ আজ তাঁর নামেই নামাঙ্কিত।

আজ যদিও রফী আমেদ কিদোয়াই রোড এবং হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্কোয়ার নামেই এ-অঞ্চল বিস্তার করেছে তার নবীন পরিচিতি, সাধারণের কাছে তবু সে ওয়েলেসলি অঞ্চলরূপেই আজও সুপরিচয়ের অধিকারী। তাই আজ ওয়েলেসলি অঞ্চল নামেই বর্তমান নিবন্ধের শীর্ষ-বিন্যাস ঘটায় কোনো সচেতন নাগরিক-সমীপে অপরাধী সাব্যস্ত হবো না আশা করি।

এ-অঞ্চলের চিরকালের ইতিবৃত্তে ওয়াকিফহাল থাকার দাবি করে না বর্তমান নিবন্ধকার। তবে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন শ' বৎসরের পশ্চাৎপটে এ-অঞ্চলের যে-প্রকৃত রূপের পরিগ্রহণ ছিল—তার যৎকিঞ্চিৎ আজ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয় একাধিক বিশ্বস্ত এবং প্রামাণ্য স্মৃতির মাধ্যমে। বহু বিদগ্ধ চিন্তাবিদের অভিমত: সপ্তদশ শতাব্দীতে সমগ্র ওয়েলেসলি অঞ্চল ছিল বিক্ষিপ্ত গ্রামের পরিবেশে বিধৃত। সেকালের গ্রাম্য অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম পাটোয়ার। আর তাদের পাশা-পাশি একই সমাজভুক্ত হয়ে বসবাস করতো কিছু পর্তুগীজ পরিবার। আজ যে পল্বল-খচিত উদ্যান এবং তার তিন দিকের নাতিদীর্ঘ উপপথ ওয়েলেসলি স্কোয়ার বা হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্কোয়ার নামে অভিহিত,

সেকালে তা আত্মলীন ছিল এক বিস্তীর্ণ তাল-বনানীর ছায়ায়। এই তাল-বনানীর নির্লিপ্ত বিস্তার ছিল আরও পূর্বে, বর্তমান লোয়ার সার্কুলার রোড পর্যন্ত। সম্ভবত সেই সূত্রে তালতলা নামেরও উৎপত্তি। কারণ, ওয়েলেসলি অঞ্চলের পূর্ব পার্শ্ববর্তী বর্ধিষ্ণু লোকালয় আজও তালতলা নামেই অভিহিত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেই বিস্তীর্ণ তাল-বনানীর সঠিক স্বত্বাধিকারী কেউ ছিলেন কিনা জানি না, তবে উক্ত শতাব্দীরই অন্তিম অঙ্কে তাল-বনানীর বিস্তৃত ভূ-ভাগের অস্থায়ী মালিকানা লাভ করেন যোশেফ হিউবার্ড নামে একজন পর্তুগীজ ব্যবসায়ী। তিনি তাল-বনানীর পশ্চিম পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ড অজস্র তালবৃক্ষের ঘন ছায়ান্তরাল থেকে মুক্ত ক'রে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন একটি পুকুর। তারপর পুকুরের উত্তর তটে সুদৃশ্য একটি গৃহ নির্মাণ ক'রে বসবাস করতে থাকেন সস্ত্রীক। কিংবদন্তী আছে: যোশেফ হিউবার্ডের গৃহে প্রায় প্রত্যহই নাকি যাতায়াত করতো জাফর মোল্লা নামে এক তরুণ পাটোয়ার। তার তরুণ বয়সের সুদর্শন স্বাস্থ্য নাকি সেকালের সবার চোখেই ছিল সবিশেষ আকর্ষণীয়। তাছাড়া তার দৈনন্দিন ব্যবহারেও প্রসাদগুণ ছিল অপরিমেয়। হয়তো এই কারণেই দিনে দিনে সে আত্মীয়-প্রতিম হয়ে ওঠে হিউবার্ড পরিবারের। মাঝে মাঝে হিউবার্ড তাঁর গৃহে অনুপস্থিত থাকলেও সে আসে এবং নির্বিবাদেই মেলামেশা করে—হিউবার্ডের নিটোল-যৌবনা পত্নীর সঙ্গে। এ-ব্যাপারে সে কোনদিন সন্দেহভাজন হয় নি হিউবার্ডের।

কিন্তু তারপর? গুড়িমেরে পাশ কাটিয়ে যায় সময়। বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেন হিউবার্ড-পত্নী। শুভ্রবর্ণ পিতা-মাতার শ্যামবর্ণ সন্তান। মুখাবয়ব তার জাফর মোল্লার মতো। এই নবজাতককে দর্শন করেই শান্ত হিউবার্ড হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ঝড়ো-হাওয়ায় বিভ্রান্ত অগ্নিশিখার মতো। সেদিন রাত্রেই তিনি উক্ত পুত্র-সন্তানকে স্ত্রীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বিসর্জন দেন পুকুরে। তারপর স্ত্রীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে অমানবিক অত্যাচার করেন সমস্ত রাত। পরদিন প্রাত্যহিক নিয়ম অথবা অভ্যাস অনুসারে যখন জাফর মোল্লাও আসে তাঁর দ্বারদেশে, তখন এক ক্ষ্যাপা শার্দুলের মতো তিনি আক্রমণ করেন তাকেও। জাফরকে তিনি ক্ষতবিক্ষত ক'রে দ্বারদেশ থেকেই তাড়িয়ে দেন।

তারপর প্রায় মাস-ছয়েক আর কোনো ঘটনা ঘটে নি এবং ইতিমধ্যে জাফর মোল্লাও আর আসে নি হিউবার্ডের গৃহে। কিন্তু মাস-ছয়েক পরের এক পূর্বাহ্নে অনেকেরই দৃষ্টিগোচরে এলো: পুকুরের নিস্তরঙ্গ জলে ভেসে উঠেছে যোশেফ হিউবার্ডের শবদেহ। তাঁর ভাসমান শবদেহ পরিদর্শন ক'রে সে-অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেকেই যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তা হলো এই: মনের অপরিসীম দুঃখে আত্মহত্যা করেছেন যোশেফ হিউবার্ড। - - - কিন্তু হিউবার্ডের মৃত্যুর ঠিক মাস-তিনেক বাদে জাফর মোল্লাই যখন অধিকর্তা হয়ে বসে হিউবার্ড-গৃহের এবং হিউবার্ড-পত্নীও মুসলিম মতে পাণিদান করেন জাফর মোল্লাকে, তখন হিউবার্ডের মৃত্যুর ঘটনা সন্দেহের উদ্রেক করে অনেকেরই। তবে, এ নিয়ে কেউ নাকি আর বাড়াবাড়ি করে নি। সকলের স্বীকৃতির অনুকূলেই পরবর্তী সুখের সংসার-যাত্রায় বলিষ্ঠ হাতে হাল ধরে জাফর মোল্লা।

এই আখ্যানভাগ নিছক কিংবদন্তীই। এখানে ইতিহাসের কোনো সঠিক উপকরণ আছে কি নেই—তা বিচার করবেন বিদগ্ধ পাঠকসমাজ। যদি কোনো পুরাতত্ত্ববিদ এই কিংবদন্তীর সূত্রে সেকালের কোনো সত্যোদ্‌ঘাটনে সক্ষম হন, তাহলে ধন্য হবে বর্তমান নিবন্ধকারও।

যাই হোক, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর যবনিকাপাতের

● ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটের দৃশ্য

দণ্ড পর্যন্ত বহু-বিচিত্ররূপে উত্থান-পতন ঘটেছে ওয়েলেসলি অঞ্চলের। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকেই তার গ্রামীণ পরিবেশের বিলয়সাধন সুরু হয় এবং তখন থেকেই শহরের বিলম্বিত সংস্পর্শে রূপ বদলাবার পালা আসে তার। তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সরকার। সরকার-পরিচালিত লটারী কমিটী এবং পৌরসভার নিয়ন্ত্রণাধীনেই ওয়েলেসলি অঞ্চলে আত্মপ্রকাশ করে পরিমার্জিত বসতি, চলাচলযোগ্য রাস্তা, এবং এদিকে-ওদিকে সমাহার ঘটে কিছু সুদৃশ্য বিপণির। তবে পাশাপাশি অপরিমার্জিত বস্তিরও সমাবেশ ঘটে অসংখ্য—যার আলোবর্জিত অন্তরাল অনিকেতদের নিকেতনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে সুদীর্ঘ সময়ের অনিশ্চিত সেতুবন্ধে।

সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা তার কিছু আগেই উত্তরের ওয়েলিংটন থেকে দক্ষিণের পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা ঘটে এক সুদৃশ্য রাজপথের। এই রাজপথের নির্মাণকার্য সমাধা করেন তৎকালীন লটারী কমিটী। রাস্তার পূর্ব-পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডের যে-অংশে ছিল যোশেফ হিউবার্ডের বসতবাটী এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত পুকুর—সেখানেও আত্ম-প্রকাশ করে পল্লব-খচিত এক নয়নাভিরাম উদ্যান। উদ্যানের ত্রি-উপান্তে তিনটি উপরাস্তারও আত্মবিকাশ ঘটে পৌরসভার প্রচেষ্টায়। পরে ইংরেজ সরকার ওয়েলিংটন থেকে পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত উল্লেখিত রাজপথের নামকরণ করেন ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট এবং তার পূর্ব-পার্শ্ববর্তী ত্রি-উপান্তের উপরাস্তা সহ সেই পল্লব-খচিত উদ্যানের নামকরণ করেন ওয়েলেসলি স্কোয়ার। এই রাজপথ এবং উদ্যানের মাধ্যমে ইংরেজ সরকার অম্লান রাখার চেষ্টা করেন যাঁর স্মৃতি—নাম তাঁর রিচার্ড মার্কুই ওয়েলেসলি।

মার্কুই ওয়েলেসলি মাদ্রাজের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন ১৭৯৭ খৃস্টাব্দে। ইংরেজ রাজপুরুষদের মধ্যে অন্যতম কৃতী পুরুষ তিনি। সুযোগ্যতার শিখরে তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর উল্লেখযোগ্য আসন। তাই মাত্র এক বৎসর পরেই, অর্থাৎ ১৭৯৮ খৃস্টাব্দেই ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর জেনারেলের পদে উন্নীত হন তিনি। এ-দেশে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বিস্তারে তাঁর যে-অবদান—তা তৎকালীন অবস্থায় সত্যই অনুপমেয় সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে। তিনি ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে তাঁর চতুর্থ ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহায়তায় অন্যায় রণে নিহত করেন মহীশূরপতি টিপু সুলতানকে। তারপর নানা কৌশলে দমন করেন বিদ্রোহী মারাঠাদের। আজ্ঞাবহ দাসানুদাসে পরিণত করেন হায়দ্রাবাদের ব্যক্তিত্বহীন নিজামকে এবং কর্ণাটের নবাবকেও পদানত করেন সামান্য কিছু মাসিক বৃত্তি বা ভাতার বিনিময়ে। কর্ণাট রাজ্যকে তিনি তাঞ্জোর রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে স্বহস্তে গ্রহণ করেন তার শাসনদণ্ড। এইভাবে তৎকালীন ভারতের সমগ্র ভূ-ভাগেই তিনি তাঁর কর্তৃত্বের লৌহজাল বিস্তার ক'রে সুদৃঢ় করেন ইংরেজ-সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

বর্তমান গভর্নর হাউস বা রাজভবন শহর-কলকাতার শোভা এবং মহিমাকে আরও উদ্ধত করার প্রয়াস পায় রিচার্ড মার্কুই ওয়েলেসলির আমলেই। সম্ভবত ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী উক্ত ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনিই। তাছাড়া ১৮০০ খৃস্টাব্দে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—যার ফলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সুরু হয় সমগ্র ভারতে।

এ-সমস্ত নানা কারণেই তৎকালীন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কাছে এক অনন্য মহানায়করূপে গণ্য ছিলেন মার্কুই ওয়েলেসলি। তাই সমগ্র ওয়েলেসলি অঞ্চল এতকাল সাড়ম্বরে বহন ক'রে আসছিল তাঁরই স্মৃতি। কিন্তু আজ আর নয়। বর্তমান স্বাধীন রাষ্ট্রের পৌর-প্রতিষ্ঠান সঙ্গত কারণেই তাঁর স্মৃতির চিরমৃত্যু ঘটিয়েছে এতদঞ্চলে। আজ রফী আমেদ কিদোয়াই রোড এবং হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্কোয়াররূপে, সমগ্র ওয়েলেসলি অঞ্চল শহর-কলকাতায় বিস্তার করেছে তার নবীন পরিচয়।

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট বা রফী আমেদ কিদোয়াই রোড শহর-কলকাতার বিভিন্ন রাজপথসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ-পথেই অবস্থিত মৌলানা আজাদ কলেজ। কলেজ হিসেবে বৃহদায়তন নয়। কিন্তু বেশ সুদৃশ্য। প্রাঙ্গণ তার অপ্রশস্ত হলেও, হরিৎ-বিন্যাসে তার ফুলের জলসা বসায় ষড়ঋতু। এ-কলেজের প্রতিষ্ঠা ঘটে ইংরেজ আমলেই। ইংরেজ আমলের মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার অন্যতম চূড়ামণি শেরে বঙ্গাল ফজলুল হক তার প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম দিকে তার নামকরণ হয় 'ইসলামিয়া কলেজ'। দেশ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ 'ইসলামিয়া' শব্দের বিলোপ সাধন ক'রে, এই শিক্ষায়তনের নামকরণ করেন 'সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ'। তারপর অনমনীয় চরিত্রের উজ্জ্বল প্রতীক মৌলানা আজাদের মহাপ্রয়াণের পর 'সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা' শব্দদ্বয়ও বর্জন ক'রে, এই মহাবিদ্যালয় আবার নামধারণ করে 'মৌলানা আজাদ কলেজ'।

এ-পথে একটি প্রাচীন গীর্জার অতি উদ্ধত শৃঙ্গ দূর থেকেও দৃষ্টিগোচরে আসে নাগরিকবৃন্দের। এই গীর্জার প্রতিষ্ঠাকল্পে বেণ্টিক ষ্ট্রীটের ক্রীস্যাসনুর হলে ধর্ম-যাজকদের একটি সভা আহূত হয় ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে। উক্ত সভারই প্রস্তাবিত এই গীর্জার নক্সা তৈরি করেন ক্যাপ্টেন গুডউইন। তারপর ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় গীর্জা—যার নামকরণ হয় 'ফ্রীচার্চ'। কিন্তু দিন-কয়েক পরেই কী-এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ ধ্বংসে পড়ে সমগ্র গীর্জা-গৃহ। তাই পুনরায় আরও ত্রিশ হাজার টাকার বরাদ্দে গীর্জা নির্মাণের দায়িত্ব

● মৌলানা আজাদ কলেজ

গ্রহণ করে সেকালের সুদক্ষ রাজ-মিস্ত্রীর দল। তাদেরই নিপুণ হস্তের অবদান স্বরূপ 'ক্রীচার্চ' আবার সমুন্নত হওয়ার প্রয়াস পায় ১৮৪৬ খৃস্টাব্দেরই অন্তিম পর্বে। এই গীর্জা তৎকালীন কলকাতার এক সুবৃহৎ এবং সুদৃশ্য উপাসনালয়রূপে গণ্য ছিল সগৌরবে। তখন তার পরিবেশও ছিল সবিশেষ মনোহারী। কিন্তু বর্তমানে তার আর সেদিন নেই। এখন সে জরাজীর্ণ এবং তৎকালীন পরিবেশ থেকে নির্বাসিত কালের নিষ্করুণ অভিশাপে। আজ তামিল এবং তেলেগু খৃস্টান-সমাজের দুর্বল তত্ত্বাবধানে সে দাঁড়িয়ে আছে অশক্ত পায়ে। সম্ভবতঃ তার পরপার যাত্রার মহালগ্নের প্রত্যাশী।

এ-পথে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আরেকটি কীর্তি 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'। যদিও এই সংস্থা এবং তার বিশাল ভবন আজ জনসাধারণের দায়িত্বেই সমর্পিত, তবু তার প্রতিষ্ঠার মূলে যে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাই ছিলেন—আজ তা উল্লেখ করা হয়তো অন্যায় হবে না। এই ভবনে আজকাল রাজনৈতিক সম্মেলন থেকে সুরু ক'রে নানাবিধ সংস্কৃতিমূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে হামেশাই।

ওয়েলেসলি স্ট্রীট বা রফী আমেদ কিদোয়াই রোড অজস্র ফ্ল্যাটবাড়ির সমাহারে বেশ সুশোভন রূপ ধারণ করেছে অংশ বিশেষে। তাছাড়া একাধিক হোটেল, বার, প্রেক্ষাগৃহ এবং বহু-বিচিত্র বিপণির সন্নিবেশে পরিবেশ-গত মর্যাদা তার সুপ্রতিষ্ঠই বলা চলে।

ওয়েলেসলি স্কোয়ার বা হাজী মোহাম্মদ মোহসীন স্কোয়ার আজ কাব্যিক-নিসর্গে বিধৃত। অজস্র পাম ট্রী এবং প্রাত্যহিক যত্নে বিকাশ-প্রাপ্ত সঘন লতাপাতার শ্যামল চিত্র এখানে অশেষ। মধ্যবর্তী পল্বল বা সরোবরের দৃশ্যও চমৎকার। তবে চমৎকার হলেও এ-অঞ্চলের সাধারণ লোকের কাছে তা অনেকাংশেই বিপজ্জনক। কারণ স্নান করতে এসে, প্রতি বছরেই একাধিক জনের সলিল সমাধি ঘটে এখানে। এমন কি, সাঁতারে সুদক্ষ, এমন একাধিক যুবককেও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে জলের গভীরেই। এর প্রকৃত কারণ জনসাধারণ বা পৌরসভার পক্ষে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নি আজও। তবে অনেকে আবার স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করতেও আসে। এই আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে পিয়ারু মস্তানকে আজও ভুলতে পারে নি এ-অঞ্চলের কেউ। পিয়ারু মস্তান ছিল নিঃসঙ্গ। বিভিন্ন হোটেলের বাসন-পত্র মেজে যা রোজগার হতো—তা দিয়েই সে পেট চালাতো এবং রাত কাটাতো ফুটপাথে। দিন তার কেটে যেতো এভাবেই। কিন্তু একদিন, হঠাৎ এসে তার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করে এক যৌবনবতী ভিখারিণী। ভিখারিণীর নাম ময়নামতী। ময়নামতীর সেবায় এবং ভালোবাসায় সরস হয়ে ওঠে পিয়ারু। সে তার রোজগার বাড়ায় এবং ফুটপাথেই ছেঁড়া চটের ছাউনি তুলে সংসার পাতে ময়নামতীর সঙ্গে। তাদের সংসারের ছায়াপথ মাড়িয়েই বিচিত্র চালে হেঁটে যেতে থাকে দিনগুলি। কিন্তু হায় রে! পিয়ারু মস্তানের এমন সংসার একদিন ঝড়ো হাওয়ায় কক্ষচ্যুত হলো হঠাৎ। অর্থাৎ পিয়ারুর অগোচরেই একদিন অন্য এক যুবক ভিখারীর সঙ্গে পালিয়ে যায় ময়নামতী। পিয়ারু দিন-কয়েক অকাতরেই অনুসন্ধান করে তার। কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান না পেয়ে, শেষে সেই ফুটপাথেই ফিরে এসে ঠায় ব'সে থাকে আহার-নিদ্রাহীন। সম্ভবত এভাবে দিন-কয়েক কেটে যাবার পরই সে তার নিস্তেজ দেহভার নিক্ষেপ করে ওয়েলেসলি স্কোয়ারের বিপজ্জনক পুকুরে। যেদিন তার শবদেহ ভেসে ওঠে, সেদিন পুকুরের চতুর্তীরে এ-অঞ্চলের অজস্র লোকের সমাগম ঘটেছিল কেবল কৌতূহলবশতই।

সেই যে সপ্তদশ শতাব্দীর যোশেফ হিউবার্ড—যিনি তাঁর স্ত্রীর অবৈধ সন্তানকে নিক্ষেপ করেছিলেন পুকুরে এবং যাঁর নিজ শবদেহকে ভাসমান অবস্থায় উক্ত পুকুরেই পরিদর্শন করে সেকালের জনসাধারণ, কে জানে—আজও তাঁরই প্রেতাত্মা ওয়েলেসলি স্কোয়ারের এই প্রাচীনতম পল্বলে সেই অবাঞ্ছিত সলিল-সমাধির জের টেনে রেখেছেন কিনা।

অভিসারিকা

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে ভাবি, মুহূর্তের ভুলে মানুষের কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। একটি মাত্র বেফাঁস কথা বলার ফলে তাদের সারা জীবনটাই হয়ত নষ্ট হয়ে গেল। ভেঙে গেল সব আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি। যে কথা বলা হয়ে গেছে, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।

আমি তিনজন লোকের কথা জানি যাদের জীবনে এ-ধরণের ঘটনা ঘটেছে, আর এর ফলে সারা জীবন ধরে তাদের তার জের টেনে চলতে হচ্ছে। তাদের একজন হলাম আমি নিজে, আমি এর ফলে নিজের চাকরীই হারিয়েছি। দ্বিতীয়জন তার জীবনের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়েছে---আর সেই মেয়েটি, মনে হয় তাকে খুব বেশি ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। কারণ, তার হারাবার মত বোধহয় কিছুই ছিল না। একমাত্র ক্ষণিক আশ্রয়ের সুযোগ ছাড়া। ওদের বহুদিন দেখি নি। ঐ লোকটির কাছ থেকে এক সপ্তাহ বাদে চিঠি পাই। আমাকে আর ওঁর অফিসে দরকার নেই। তখনই আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে লণ্ডন ছেড়ে চলে আসি। তিনমাসের আগেই একটা মাসিকপত্রের পাতায় দেখতে পেলাম—সেই লোকটি বিবাহ-বিচ্ছেদের আপীল করেছে। অথচ ব্যাপারটার উৎপত্তি কত সামান্য ঘটনা থেকে। আমার মুখের একটি সামান্য কথা, আর সেই মেয়েটির ছোট্ট জবাব, ব্যস দুজনের জীবনের মোড়ই ঘুরে গেল যেন।

অফিসের দরজায় আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই লোকটি আর আমি। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, ডিসেম্বর মাস। আমার ভয়ানক সর্দি হয়েছিল। কিছুই ভাল লাগছিল না, বড়দিনের কথাও ভাবতে পারছিলাম না। নিজের ঘর থেকে বাইরে এসে উনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, চল কিছু খাওয়া যাক।'

আমি ধন্যবাদ জানালাম। কারণ জানতাম কারও ওপরওয়ালা রোজ রোজ বা প্রত্যেক বড়দিনে এ-ধরণের আহ্বান জানান না। ওঁর প্রিয় রেস্তোরাঁয় আম[illegible]ই রেস্তোরাঁটা ওঁর খুব প্রিয়, বহুদিন থেকেই। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। কিছু আহারের পর যদিও মনটা একটু প্রফুল্ল হল, তবুও ওঁর কথাবার্তা বা হাসি মাঝে মাঝেই আমার বিরক্তি ধরিয়ে দিতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বললাম,

'কি ব্যাপা আপনার ? আজকে আপনাকে খু খুশি খুশি মনে হচ্ছে।'

খুব হাসতে লাগলেন উনি। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, 'শুনবে কারণটা ? তবে শোন বলছি, আমি বিয়ে করতে চলেছি।'

অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে আমি ওঁর দিকে তাকালাম। উনি সেটা বুঝতে পেরেই তাই আবার বললেন, 'না হে ঠাট্টা নয়। সত্যি কথাই বলছি। অফিসের অন্য সকলেই জানে। আজকেই তাদের বলেছি। আগে জানিয়ে হাট বসাতে চাই নি। কি হে আমাকে অভিনন্দন জানালে না ?'

খানিকক্ষণ ওঁর দিকে শূন্য-দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম। তারপর নীরস শুষ্ক স্বরে বললাম, 'আপনার ধারণা নেই মেয়েদের সম্বন্ধে আমি কি ধারণা পোষণ করি।'

উনি আবার হাসতে সুরু করলেন। তারপর বললেন, 'শোন তোমাকে আমি পছন্দ করি। তাই বলছি—আমি তার দেখা পেয়েছি। সেই মেয়েটির। ও বোধহয় আমার জন্যই জন্মেছে। আজকে লাঞ্চে আমার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

আমি কোন কথা বললাম না।

তিনি আবার বললেন, 'ব্যাপারটা একটু হঠাৎই হয়ে গেল। এই রকম ঘটনাই আমার খুব পছন্দ। আজ সন্ধ্যাতেই আমরা প্যারী রওনা হচ্ছি। আজ সন্ধ্যার আগে তাই রেজেস্ট্রি অফিসে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান হবে। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি বিবাহিত বলে নিজের পরিচয় দিতে পারব।'

'আপনার কনে কোথায় ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'এখন বোধহয় সে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। কারণ, খুব তাড়াতাড়ি আমরা এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছি।' তারপর প্রায় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, 'তোমার ওপর আমার অনেক আশা। তোমাকে ভাল করে লক্ষ্য করেছি বেশ কিছুদিন ধরে। তুমি পারবে। উন্নতি নিশ্চয়ই চাও ? বিয়ে করতেও চাও নিশ্চয়ই ?'

ওঁর গলায় যেন সত্যিকারের বন্ধুত্বের সুর পেলাম। তবুও একটু নির্বিকারভাবে বললাম, 'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, তবে বিয়ে আমি কখনই করব না।'

'তুমি একটি অদ্ভুত জীব'—উনি বলতে লাগলেন, 'তোমার কোন উদ্দেশ্যই নেই জীবনের। সব মেয়েকেই তুমি একরকম দেখ। আমার বয়স তোমার চেয়ে প্রায় দুগুণ বেশি, তবু আমার দিকে চেয়ে দেখ—আমি সবচেয়ে সুখী মানুষ।'

'হয়ত এটা আমার ভাগ্যেরই দোষ। খারাপ মেয়েরাই কেবল আমার নজরে পড়ে।' আমি বললাম।

'তোমার ভাগ্য সত্যিই খারাপ। তারপর তোমরা সব তরুণ। তোমাদের জীবনে কোন রোমান্সই নেই'—এই বলে তিনি একখণ্ড মাংস মুখে পুরে দিলেন।

রোমান্স। কথাটা শুনেই আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল একটি ঘটনার ছবি : বৃষ্টি পড়ছে। অশ্রুসিক্ত একখানি ছোট্ট মুখ আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাথার টুপীটা নামান। এম্পায়ার সিনেমা থেকে শেষ ট্যাক্সিটাও চলে গেছে। সান্ধ্য পোষাকে পথচারীরা ছাতা মাথায় দিয়ে চলেছে।

'রোমান্স'—আমি বললাম, 'আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড ঠাট্টা। হয়ত কোনদিনই ভুলব না কথাটার তাৎপর্য।' তারপর, একটু থেমে আবার বললাম, 'শেষবার একটি মেয়ের মুখ থেকে কথাটা শুনেছিলাম। ঘটনাটা সহজে ভুলব না।'

আমার গলার সুরে উনি একটু অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর বললেন—আশাভঙ্গের কাহিনী ? বল না হে। ঘটনাটার কথা। সহজে ত' তুমি কোন কথাই বলতে চাও না।'

'সে কি আপনার ভাল লাগবে ? আর তাছাড়া আপনি একটু পরেই বিয়ে করতে চলেছেন।' আমি বললাম।

'বাজে কথা ছাড়। বল শুনি তোমার গল্প।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে সুরু করলাম।

'ওকে আমি প্রথমে দেখি ওয়ারডুর স্ট্রীটে। কোন রোমান্স সৃষ্টির মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার স্বভাব একটু অন্যরকম সাধারণ লোকের চেয়ে। বেশি লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আমার ভাল লাগে না। সিনেমা থিয়েটারেও যাই না। কোন নিমন্ত্রণেও যাই না। সহ্য হয় না মোটে। আমার বেশির ভাগ সময় কাটে শহরের অফিসে আর কেনসিংটনে আমার বাড়িতে। পড়াতে আমার খুব আগ্রহ। তাই শনিবার হলেই কোন পাঠাগারে যাই। প্রায় ছ'মাস আগে একদিন ভয়ানক বিরক্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম। ভয়ানক খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম—কখন আবার বাড়িওয়ালী এসে বিরক্ত করে। তাই টিউবে চড়ে পশ্চিম অঞ্চলে চলে গেলাম একটু ঘুরে বেড়াতে। তারপর ঢুকলাম ছবি দেখতে সিনেমায়।

এক এক সময় আসে, যখন মনটা আবার আনন্দে ভরে ওঠে। ঐ ছবি দেখতে দেখতে আমার তাই হল। এক প্রেমের কাহিনী। নায়ক-নায়িকা আর তাদের জীবনের এক শনি। নানা শত্রুতা আর বাধা-বিপত্তির পর তাদের মিলন।

যখন বাইরে এলাম—বৃষ্টি পড়ছে। বহু লোক ছাতার তলায় কোনরকমে চলাফেরা করছে। ছবির রেশ তখনও আমার মনে লেগেছিল। আস্তে আস্তে আমি হাঁটতে সুরু করলাম। ক্রমে এসে পৌঁছলাম ওয়ারডুর স্ট্রীটে। হঠাৎ কার সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগল। দেখলাম ছোটখাট চেহারার একটি মেয়ে। হাতে কোন ছাতা নেই।

আমি বলে উঠলাম 'ক্ষমা করবেন দেখতে পাই নি।' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি কেঁদে ফেলল।

আমি আবার বললাম, 'অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাকে কি আঘাত দিয়েছি কোনরকম ?'

মেয়েটি চোখের জল মুছে বলল, 'না না, আমার কিছুই লাগে নি।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। তখন বৃষ্টিও বেশ জোরেই পড়ছে। মেয়েটার চোখ দিয়েও জল পড়ছে।

হঠাৎ মেয়েটার হাত ধরে বলে ফেললাম কেন জানি না, 'দেখুন, যদিও আমার কিছু প্রশ্ন করা অন্যায়, তবু বলছি—কি হয়েছে আমাকে যদি বলেন। হয়ত কোন উপকার করতে পারি।'

মেয়েটি একটা ছোট্ট রুমাল বের করে নাক মুছল তারপর বলল,

'বুঝতে পারছি না কি করব। লণ্ডনে আগে কখনও আসি নি। আমি সুপসায়ারে থাকি। ও আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমাদের বিয়ের কথা ছিল। এখানকার কোন ঠিকানাও আমি জানি না। কোথায় যাব জানি না। একটা লোক তার ওপর আমাকে অনেকক্ষণ থেকে অনুসরণ করছে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এখানে আপনার কেউ পরিচিত নেই ?'

'না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

ওর কথায় কান না দিয়ে বললাম, 'শুনুন, আমাকে যদি বিশ্বাস করতে পারেন তাহলে আমার সঙ্গে চলুন, কিছু খাওয়া যাক আগে।'

'আপনাকে বিশ্বাস করি'—মেয়েটি আবেগের সঙ্গে বলল।

'বেশ, তাহলে চলুন'—বলে ওর হাত ধরে চললাম এগিয়ে। তারপর একটা রেস্তোরাঁয় বসে খাবারের হুকুম করলাম। খাবার এলে ওর খাওয়া দেখে বললাম, 'আজ বোধহয় এই আপনার প্রথম খাওয়া। তাই না ?'

'হ্যা'—মেয়েটি করুণ হেসে বলল। ভয়ানক লজ্জিত হলাম প্রশ্নটা করে।

'এবার যদি বলেন—কি ব্যাপার ঘটেছে'—আমি বললাম।

'বলছি'—মেয়েটি বলতে সুরু করে। ওর লজ্জার জড়তা অনেক কেটে গেছে। 'আমার বিয়ের কথা ছিল। সুপসায়ারে ও আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। ওকে ভদ্রলোক বলেই জানতাম। একটা ছোট্ট বাড়িতে মা আর আমার বোনের সঙ্গে আমি থাকি। ও লণ্ডনের একটা অফিসে কাজ করে। ওর একটা ছোট গাড়িও আছে। ওকে খুবই সুন্দর মনে হত। মা'র মত ওই আদায় করেছে। তখনই তারিখ ঠিক হয়। গত রবিবার সব ঠিক হয়। ও বলে লণ্ডনে বিয়ে হবে। গতকাল আমাদের বিয়ের দিন ছিল। ও সঙ্গে গাড়ি. এখা আমরা আ.সি একটা হা.লে ঘর ভা.া করেছি।' মেয়েটি একটু থামল। বোধহয় কান্না চাপতে

তারপর ও আ. বলল, 'ও আজ সকালে কোথায় চলে গেল। হোটেলের লোকগুলো ভয়ানক বদ। ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। জানি না কি করে বাড়ি ফিরব। কি বলব মাকে ?'

'আপনার কাছে কোন টাকা-পয়সা আছে ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'সাত-আট পেনি আছে'—মেয়েটি বলল।

বুঝতে পারলাম খুব অসুবিধার মধ্যেই পড়েছি। একটু ভেবে বললাম, 'আজকের রাত্রির মত আমার বাড়িতেই চলুন। কালকে সুপসায়ারের টিকিট আপনাকে কিনে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু আপনাকে চিনি না'—মেয়েটি বলে।

'ও কথা রাখুন। এছাড়া আর উপায় নেই। চলুন।'

অবশেষে দুজনে আমার বাড়িতে পৌঁছলাম। একাকী থাকি, কেউ তাই দেখতে পেল না আমাদের। মেয়েটার ভয় কেটে গেছে দেখলাম। হঠাৎ ও বলল, 'বেশ রোমান্স হল আজ তাই না ?'

'আপনার রোমান্সের কথা শুনেই গল্পটা আমার মনে পড়ল আজ।' ওপরওয়ালাকে বললাম।

'গল্পটা এখনও কিন্তু শেষ কর নি তুমি'—তিনি বললেন।

'রোমান্সের ঐখানেই শেষ'—বললাম।

'কি বলতে চাও ? ও সুপসায়ারে ফিরে গেল ?'

হেসে উঠলাম। বললাম, 'ও জীবনে সুপসায়ারে যায় নি। পরদিন সকালে উঠে দেখলাম সে চলে গেছে। অবশ্য সঙ্গে আমার সব টাকাকড়ি ও নিয়ে যেতে ভোলে নি।'

'ওরে বাবা। তার মানে বলতে চাও, আগাগোড়াই ও অভিনয় করেছে'—তিনি বললেন।

'হ্যাঁ সারাক্ষণ'—আমি বলি।

'পুলিশে খবর দিয়েছিলে ?'

'কোন লাভ হত না'—আমি বললাম। তারপর দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আমি আবার বললাম, 'ব্যাপারটা কি ছিল জানেন, আমাকে রাস্তায় রাত কাটাতে হয় নি সেদিন।'

তিনি চুপ করে শুনলেন, তারপর বললেন, 'আর কোনদিন ওয়ারডুর স্ট্রীটে যাও নি ?'

'না। সেই প্রথম আর সেই শেষ'—বললাম।

'ভাবছি কেমন করে তুমি ও ভুল করলে। ও ধরণের মেয়ে দূর থেকে দেখলেই আমি চিনতে পারি। তবে ও ধরণের সত্যি ঘটনাও ঘটে। যেমন আমার হয়েছে। যে আমার স্ত্রী হবে, তার সঙ্গে ঐভাবে ছ' সপ্তাহ আগে দেখা হয়। ওর বাবা-মা কেউ নেই। ও টাইপিস্টের কাজ করত। আর মালিক ওকে প্রেম নিবেদন করে বিরক্ত করত। ও পালিয়ে বাঁচে। পিকাডি নদীর কাছে ওর দেখা পাই,, ওর পা মচকে গিয়েছিল। যাক, আসল ব্যাপার তাই নয়। ওকে দেখলে বুঝবে কত সুন্দর ও। আমি সবচেয়ে সুখী মানুষ। আজকে ৪টার সময় ভিক্টোরিয়া স্টেশনে এসে ওকে দেখো, কেমন ?'—উনি বললেন।

'বেশ যাব'—আমি বললাম। যদিও জানি না কেমন করে রাজী হলাম।

তারপর কখন ভিক্টোরিয়া স্টেশনে উপস্থিত হয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটলাম। আর ভিতরে ঢুকে প্রতিটি কামরা দেখতে লাগলাম। হঠাৎ একটা প্রথমশ্রেণীর কামরায় নজর পড়ল তার দিকে।

তিনি বলে উঠলেন, 'এই যে এসেছ। বাঃ খুব খুশি হলাম। ভেবেছিলাম, বোধহয় আসবে না।' তারপর ভিতর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এস একবার এদিকে।' আমি টুপী হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ওঁর স্ত্রীকে দেখে বললাম, 'শুভ বড়দিন'—তারপর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওঁর স্ত্রীও আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ভদ্রলোক বুঝতে না পেরে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'তোমরা কি পরস্পর পরিচিত ?'

ওঁর স্ত্রী হঠাৎ হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, 'ওঃ হ্যাঁ, আপনাকে ত' চেনা মনে হচ্ছে। একবার ওয়ারডুর স্ট্রীটে আমাদের ধাক্কা লেগেছিল না ?' *

---

* Daphne Du Mauier-এর Indiscretion কাহিনীর অনবাদ।

রঙ্গজগৎ

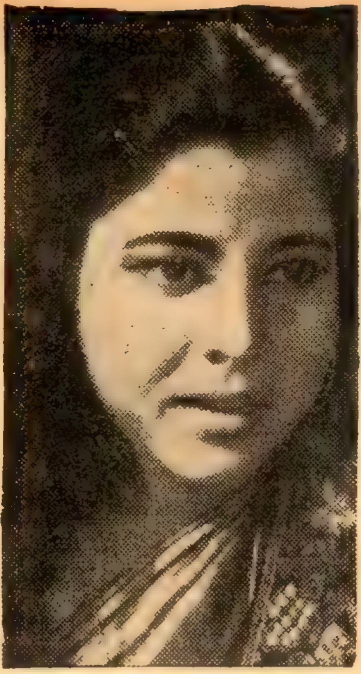

● নতুন তীর্থ ছবির নায়িকা সুলতা চৌধুরী।

চলচ্চিত্র-শিল্পের সৌভাগ্যের প্রতাক নয় !

বেণ্টিক ষ্ট্রীটের রাস্তায় বিরাট কিউ। এত বড় কিউ দীর্ঘদিন লোকের চোখে পড়ে নি। একজন ট্রামযাত্রী বললেন, রেশন কার্ডের অথবা চালের জন্য কিউ। ভুল ভাঙতে দেরি হলো না,—'সঙ্গম' হিন্দী ছবির জন্য এই বিরাট লাইন। আর-এক যাত্রী বললেন, দেশে নাকি খাদ্যাভাব, তবে লোকে সিনেমার জন্য এত বড় লাইন দেয় কি করে ?

যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের যে ঘরে চাল আছে এমন নয়, তাঁরা বিত্তবানদের কেউ নন। কিন্তু প্রচারের এমনই মহিমা যে, এ ছবি দেখার জন্য একটা কাজের দিন নষ্ট করতেও তাঁরা রাজী হয়েছেন। সিনেমার ব্যাপারে ছবির চেয়েও প্রচারের দাম বেশি। তাই এখানে ছবি তৈরির বাজেটের মধ্যে প্রচারের বাজেটটা যুক্ত হয়, ওটা নির্মাণব্যয়ের অঙ্গ হয়ে পড়ে।

'সঙ্গম'-এর ব্যাপারে দীর্ঘদিনব্যাপী প্রচার হয়েছে। ইউরোপে গিয়ে ছবি তোলার কাজ যা হয়েছে তার চেয়ে বেশি শিল্পীদের ভ্রমণ এবং ঢাক পেটানো হয়েছে। ছবিটির নির্মাণব্যয় ৮০ লক্ষ টাকা—এটাও একটা মস্ত বড় প্রচার ; এবং তা ছবিটির গুণে পরিণত হয়েছে। সাধারণ দর্শকরা ভাবে—৮০ লক্ষ টাকা দিয়ে যে ছবি নির্মিত হয়েছে, না-জানি সে ছবি কি রকম !

ছবি দেখার পরে একদল মুচ্‌কি হাসে ; আর যারা কমবয়সী, তারা আদিরসের গন্ধ শোঁকে। ছবি-ফেরৎ দর্শকদের দেখে গ্রামের মেলার স্মৃতি মনে পড়ে। শহরের ম্যাজিক এসেছে, আসলে ম্যাজিক নয়—ভাঁওতাবাজী। কৃষকরা দল বেঁধে যায়, কিন্তু ফিরে এসে পরস্পরের মুখ চেয়ে হাসে। মনের ইচ্ছা—আমি যেমন ঠকেছি, তোমরাও ঠকে শেখ।

বোম্বাইয়ের একদল প্রযোজক হলিউডের অনুকরণে ব্যয়বহুল ছবির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। গল্প বা টেকনিক্যাল দিক থেকে কল্পনা যত দুর্বল হচ্ছে, ভাল ছবি করে দর্শকদের মুগ্ধ করার ক্ষমতা যত কমে আসছে, ততই এই প্রযোজকরা ব্যয়বহুল ছবির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। জাঁক-জমকে দর্শক ভুলিয়ে এঁরা পার পেতে চান। চলচ্চিত্র-শিল্পে এটা একটা জুয়াখেলা। এই জুয়াখেলায় জিতলে—পৌষমাস, নয়ত সর্বনাশ। এই হঠকারিতায় ছোট প্রযোজকদের সর্বনাশ হয় বেশি। বড়দের ধাক্কায় ছোটরা শিল্প থেকে বিদায় নিলে ছবির সংখ্যা কমে যায়, গল্পের বৈচিত্র্য থাকে না, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে না, মুষ্টিমেয় কয়েকজন চলচ্চিত্র-শিল্পে একচেটিয়া কারবারী হয়। এইভাবে চলচ্চিত্র-শিল্পে একচেটিয়া কারবারের জন্ম হয়। সুতরাং, ৮০ লক্ষ টাকার ছবি চলচ্চিত্র-শিল্পের সৌভাগ্যের প্রতীক নয় ; দর্শকদের এই লাইন শিল্প-বিকাশের অনুকূলে নয়। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

নতুন তীর্থ

(প্রোডাকসন সিণ্ডিকেট)

সুধীর মুখার্জী পরিচালিত ছবি-গুলির মধ্যে 'নতুন তীর্থ' ছবিতে এমন এক বক্তব্য রয়েছে যা দর্শকদের হৃদয় স্পর্শ করে। হাস্যরসের মধ্য দিয়ে হাল্কা পরিবেশে ভারতের কয়েকটি তীর্থের পটভূমিকায় প্রণয়রসে গঠিত এই ছবি দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হবে আশা করা যায়। একই আদর্শে ইতোপূর্বে 'যাত্রী' নামক একটি ছবি নির্মিত হয়েছিল, 'নতুন তীর্থ' দৃশ্যের দিক থেকে তার সমতুল না হলেও প্রণয়রসের উপভোগ্যতায় সরস হয়ে উঠেছে।

প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্ম ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এই ব্যস্ততার মধ্যে বাড়ির লোকের বাইরে আমাদের চেনবার জানবার

উপায় থাকে না। ফলে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। স্বার্থপরতায় অন্ধ হয়ে থাকে বলে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে চেতনা থাকে না। এত বড়, এত সুন্দর-প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ আমাদের দেশ। এই দেশের কণামাত্রও আমরা জানি না। অথচ এই জানাজানিটা হলে দৃষ্টিভঙ্গি যেমন উদার হয়, কর্মক্ষেত্রও প্রসার লাভ করে। অতীতকাল থেকে তাই আমাদের দেশে তীর্থ দর্শনে পুণ্য অর্জনের নির্দেশ রয়েছে। যুগ পরিবর্তনে এই তীর্থ দর্শন মন্দির থেকে ঐতিহাসিক স্থান এবং ভারতের নবরূপায়ণের স্থানগুলি পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া উচিত।

আলোচ্য ছবিতে আমরা দেখতে পাই বিচিত্র মানসিকতার কয়েকটি পরিবার একটা মোটর-বাসে করে চলেছে। কলকাতা থেকে রওনা হয়ে হরিদ্বার, আর একদিকে আগ্রার তাজমহল পর্যন্ত এই যাত্রীদের আমরা দেখেছি। যাত্রীদের মধ্যে রয়েছে দুই বন্ধু অমল আর বিষাণ, ভারতীদেবী ও তার অনূঢ়া মেয়ে তনুজা, বৃদ্ধা রোগগিন্নী, মাঝবয়সী বিধবা মিসেস ধর, কুমারী মেয়েকে নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং এক দায়দায়িত্বহীন বড়লোকের ছেলে, ভদ্রলোকের মুখোসপরা দুই চোর, এক নারী-ব্যবসায়ী, আর এক সাধুবেশী গোয়েন্দা। প্রথমে যখন যাত্রা সুরু করে, তখন কারো সাথে কারো জানা নেই, বরঞ্চ একটা উপেক্ষার ভাব; কিন্তু কলকাতা থেকে পথ যতই দূর হতে লাগলো, তাদের অন্তরও তত নিকট হয়ে এলো। যাত্রাশেষে দেখা গেল—তারা সবাই একপরিবারভুক্ত মানুষের মত হয়ে গেছে। -এই যাত্রী-কাহিনীতে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে—তনুজার প্রণয়ী অপরূপ ও তার দুই বন্ধুর উপস্থিতিতে। তারা নিজেদের মোটরে করে বাসের পিছু পিছু চলেছে। বিন্ধ্যাচলে গিয়ে এই নাটকীয়তা এক নতুন রঙ লাভ করলো,—তনুজার মত দেখতে এক ভোজপুরী মেয়ের উপস্থিতিতে। পরিসমাপ্তিতে জানা গেল—এই মেয়ে ভারতীদেবীরই কন্যা অর্থাৎ তনুজার যমজ বোন। জন্মের পরে চুরি হয়েছিল।

কাহিনীর নাম 'নতুন তীর্থ' হলেও ছবিতে প্রণয়রসের উপাখ্যান যত বড় হয়ে উঠেছে, বিভিন্ন তীর্থের

● শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত 'কে তুমি'র একটি দৃশ্যে কালীপদ চক্রবর্তী ও সন্ধ্যা রায়।

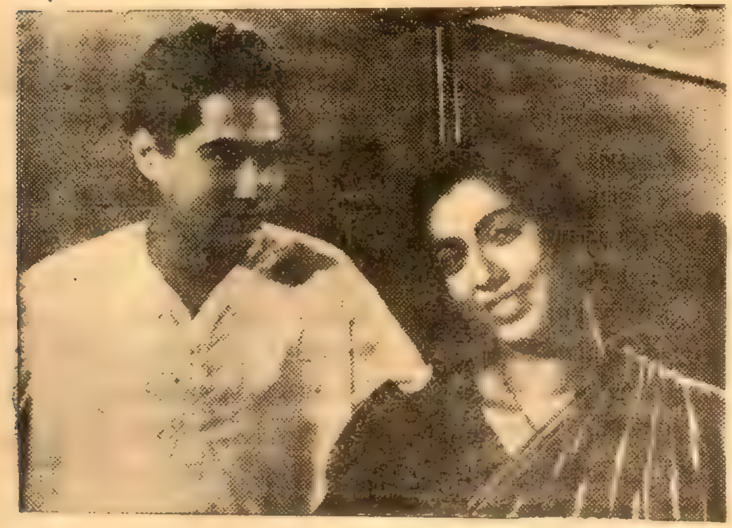

● কনক মুখার্জী পরিচালিত 'মহালগ্ন' ছবিতে দেবজিৎ ও কল্যাণী ঘোষ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সেখানের মানুষ সমভাবে উপস্থিত হতে পারে নি। যাত্রীরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, স্থানীয় মানুষের সাথে তাদের পরিচয় হয় নি। বহু লোকের সান্নিধ্যে এসে তারা বিরাট ভারতের রূপ দর্শন করতে পারে নি। এদিক থেকে 'নতুন তীর্থ' নাম কাহিনীর সাথে তুলনায় যথার্থ তাৎপর্য রক্ষা করতে পারে নি। একটা বাসে করে ভারততীর্থ পরিক্রমার বিশালত্ব ও গতিবেগ এই ছবিতে অনুভব করা যায় না। কিছুটা পেশাদারী মনোরঞ্জনী রঙ্ লেগে বাস্তববোধ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা এরূপ ভাবাদর্শপূর্ণ ছবির প্রশংসা করবো; এরূপ আমুদে ছবি দর্শকদের নির্মল আনন্দ দান করবে। 'নতুন তীর্থ' ছবির মধ্যে আরো কয়েকটি উপকাহিনী ও লোক-চরিত্রের ছবি রয়েছে, যা মনে রেখাপাত করে। তার মধ্যে এক নারী-ব্যবসায়ীর চক্রান্তে বিভ্রান্ত প্রেমিকার ঘটনা এবং স্কুল-শিক্ষকের শেষ তীর্থ দর্শন উল্লেখযোগ্য।

উত্তমকুমার (অয়ন) এবং সুলতা চৌধুরী (দ্বৈত ভূমিকায়) প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, তপতী ঘোষ, সুব্রতা চ্যাটার্জী, রেণুকা রায়, প্রতিমা চক্রবর্তী, জহর গাঙ্গুলী, তরুণকুমার, অমিত দে, রবি ঘোষ, পিণ্টু দাশগুপ্ত, দিলীপ রায়, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, অজিত চ্যাটার্জী, মাঃ শঙ্কর প্রমুখ যথাযোগ্যভাবে চরিত্রগুলির রূপদান করেছেন।

হেমন্ত মুখার্জী পরিচালিত সঙ্গীত ভাল লাগে। তবে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের লোকসঙ্গীত ও তীর্থস্থানগুলির তাৎপর্যপূর্ণ সঙ্গীতে যথাযোগ্য পরিবেশ রচিত হবে, আশা করেছিলাম।

ছবিটি দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হবে আশা করা যায়। গতানুগতিক ছবির তুলনায় 'নতুন তীর্থ' দর্শনীয় ছবি।

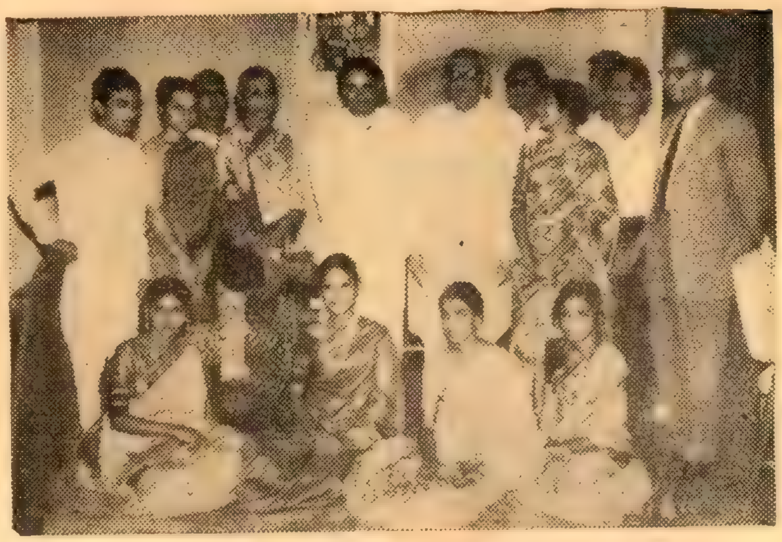

● কলকাতা থেকে ১৬ জন শিল্পীর একটা দল তুরস্কের ইস্তাম্বুল লোকসঙ্গীত উৎসবে গিয়েছে। যাত্রার মুহূর্তে তাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার সাথে দেখা যাচ্ছে।

নাটকের কথা

পদ্মা নদীর মাঝি

উত্তরী গ্রুপ থিয়েটার নির্মল ঘোষের পরিচালনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'র নাট্যরূপ অভিনয় করছে। এই সংবাদ স্বভাবতই নাটক-রসিকমহলে কৌতূহল সৃষ্টি করবে। প্রমত্তা পদ্মার ভাঙাগড়ার সাথে পদ্মা-পাড়ের জেলেদের জীবন ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। পদ্মার মত তাদের জীবনেও অবিরাম ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। এই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্যে এসেছে হোসেন মিঞার মত আফিমের ব্যবসায়ীর কুটিল চক্রান্ত-জাল। এই চক্রান্ত-জালে একে একে মানুষগুলি জড়িয়ে পড়ছে। জেলেদেরই একজন কুবের, এক হৃদয়বান জীবন-সংগ্রামী। সেই কুবেরেরই শ্যালিকা কপিলা, বর্ষায় ভরা নদীর মত তার যৌবনের চঞ্চলতা, খিল খিল হাসিতে যার নদীর উচ্ছ্বাস, নদী ভাঙে দেশের কূল, এই নারী ভেঙেছে মনের কূল।

সেদিনের পদ্মা আজ আমাদের কাছে বিদেশ এবং সেই কুবের-কপিলারা আজ কলকাতার রাজপথে উদ্বাস্তু-ভিখারী হলেও, আজো আমাদের অন্তর ভরে বেঁচে আছে পদ্মাপাড়ের সেই সংগ্রামী মানুষগুলি। যারা কুটিলগতি নদীর জলে আর মাটিতে ততোধিক কুটিল এক ধরণের মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের অপরাজেয়তা ঘোষণা করেছে।

এই সুবৃহৎ উপন্যাসের নির্দিষ্ট সময়ের বাঁধনে নাট্যরূপ দেওয়া অতি কঠিন কাজ। এদিক থেকে বিবেচনা করলে, উত্তরীর এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এইরূপ দুরূহ কাজের জন্য নাট্যরূপদাতা ধন্যবাদভাজন। তথাপি একথা বলা প্রয়োজন যে, নাটক দেখে আমাদের মনে হয়েছে দেশ-বিভাগের প্রায় দুই দশক কাল পরে যখন পূর্ব-বাংলার ধীবরদের জীবন দেখি, তখন সেখানে প্রকৃত জীবন দেখি না কেন?

কুবেরের প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে কাপলার জন্য, রাসু হাত বাড়িয়েছে গোপীর জন্য, শীতলবাবু জেলেমেয়ের ঘরে রাত্রিবাস করে, অথচ তাদের জীবনের শরিক নয়। এই নাট্যরূপে জীবন অপেক্ষা তাদের যৌন-জীবনটাই কি আমরা বেশি দেখি না? এছাড়া পূজামণ্ডপে সিম্বলিক প্রতিমা বা প্রতিমার সামনে মাতলামি ইত্যাদিও সেকালের জীবনের যথাযথ পরিচয় প্রকাশে সাহায্য করে না। বিবাহ-বাসরে বর-কনেকে ঘিরে ধামাইল নাচের অনুকরণে নাচটারও আমরা প্রয়োজন বুঝি না। উপরন্ত, আফিমের ব্যবসায়ী হোসেন মিঞা এখানে উদারপ্রাণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন, ময়নাদ্বীপের সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন বিতর্কমূলক।

নাটকে দৃশ্য পরিবর্তনের সময় পূর্ব বাংলার লোকসঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সঙ্গীত পরিবেশ প্রকাশের সহায়ক হয় নি।

অভিনয়ের দিক বিবেচনা করলে এইরূপ নাটকে অভিনয় করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। প্রত্যেকটি চরিত্রকে এখানে পদ্মাপাড়ের ভাষায় অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে হয়েছে। কি ভাব, কি ভাষায় সার্থক শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন—চারুপ্রকাশ ঘোষ। তাঁর অভিনীত হোসেন মিঞা বা নাব মঞ্চে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টি। তারপরেই সার্থক যুগীর ভূমিকায় উমা পালচৌধুরী এবং কপিলার চরিত্রে স্বপ্না গুহ। গোপীর চরিত্রে দীপ্তি সেনও প্রশংসনীয়। তুলনামূলকভাবে পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা অভিনেত্রীরা বিস্ময়জনকভাবে সার্থক হয়েছেন। কুবেরের চরিত্র প্রকাশে নির্মল ঘোষের ভাষা প্রধান অন্তরায় হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে অভিনেতারা পরিচালকের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন।

সমালোচকের দৃষ্টিতে ত্রুটি সত্ত্বেও 'পদ্মা নদীর মাঝি' একটি আকর্ষণীয় নাটক হিসাবে সমাদৃত হবার যোগ্য। এই জীবনধর্মী নাটক দর্শকদের এক বিস্মৃত জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।

দিল্লীতে সঙ্গীত নাটক একাডেমির পক্ষ থেকে তেহেরাণের জাতীয় সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ মি: এম এম বারকেচেলিকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে মি: বারকেচেলি ইরাণের সঙ্গীত সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছেন।

বাংলা দেশে প্রথম নাট্যমেলা

শিল্পিমন প্রযোজিত নাট্যমেলা আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ১২ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভারতী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। বাংলা দেশে এরূপ প্রচেষ্টা এই প্রথম। মেলা উপলক্ষে সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট', গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন', রবীন্দ্রনাথের 'সে', ক্ষীরোদ প্রসাদের 'দাদা ও দিদি', মন্মথ রায়ের 'একটি রাজকীয় মৃত্যু', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জগন্নাথের রথ' (গল্সওয়াদির 'জাস্টিস' অনুপ্রাণিত) 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস', উৎপল দত্তের 'ঘুম নেই', রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ', 'রাজকীয় পদশব্দগুলি' এবং মাণিক সরকারের 'কালপুরুষ' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করা হবে। এ ছাড়া অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, রাজলক্ষ্মী দেবী, সত্যু সেন, বিজন ভট্টাচার্য এবং কান্তি মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন দিনে সম্বর্ধিত করা হবে। অনুষ্ঠানসূচীতে আরও থাকবে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী

সম্মেলন—এই সম্মেলনে যোগদান ক'রবেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট খ্যাতনামা নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও নাট্যশাস্ত্রিগণ। পুরোন নাটকের গান শোনাবেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, কমলা ঝরিয়া এবং মঞ্চের অন্যান্য সঙ্গীতশিল্পী। নাট্য-মেলার অন্যতম আকর্ষণ—রবীন্দ্র দিবস। সেদিন সঙ্গীতে অংশ নেবেন রবি-তীর্থের শিল্পিবৃন্দ। মেলায় বৈচিত্র্য সৃষ্টি ক'রবে একটি প্রদর্শনী—যাতে প্রদর্শিত হবে বাংলা নাটকের ইতিহাসের ধারা; বিভিন্ন সময়ের নাট্যানুষ্ঠানের আলোকচিত্র, নাট্যপুস্তক ও নাট্যপত্র ইত্যাদি।

নাট্যমেলার মূল সভাপতি শ্রীমন্মথ রায়। উদ্বোধন ক'রবেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ন'টায়।

মেলা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌজন্যে রবীন্দ্র প্রদর্শনশালা প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য খোলা রাখা হবে।

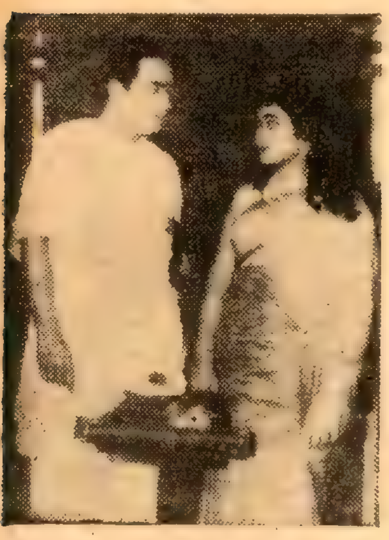

● বিশ্বরূপা থিয়েটারে 'লগ্ন' নাটকে জয়শ্রী সেন ও অসিতবরণ।

স্টুডিও খবর

● সত্যজিৎ রায় তাঁর নতুন প্রচেষ্টা 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবির কাজ গত ২১শে আগস্ট থেকে সুরু করেছেন। কাজ সুরু হয়েছে ২নং নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' এবং পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' গল্প অবলম্বনে চিত্র-নাট্য রচিত হয়েছে। ছবিটির পরিচালনা, চিত্রনাট্য রচনা এবং সঙ্গীত পরিচালনা শ্রীরায় নিজেই করছেন। 'কাপুরুষ'-এ অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, হারাধন ব্যানার্জী, মাধবী মুখার্জী। 'মহাপুরুষ'-এ অভিনয় করছেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ। আলোকচিত্রগ্রহণ করছেন সৌমেন্দু রায়।

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ছবি নিয়ে অনেক কথা শোনা গিয়েছিল। তিনিও নানা দিক বিবেচনা করেছেন। অবশেষে তিনি হাত দিলেন—'কাপুরুষ আর মহাপুরুষ'কে নিয়ে।

● হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত 'সন্ধ্যাদীপের শিখা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শিল্পীদের নিয়ে পরিচালক কাশ্মীর গেছেন। কাশ্মীরের ডালহ্রদে কয়েকটি দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুচিত্রা সেন, অনিল চ্যাটার্জী, বিকাশ রায়। তরুণ ভাদুড়ী রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন পবিত্র চ্যাটার্জী।

● সমরেশ বসুর 'আলোয়ফেরা' গল্পের চিত্ররূপ দিচ্ছেন বলাই সেন। তপন সিংহের সহকারীরূপে অভিজ্ঞতা লাভের পর বলাই সেনের এই নিজস্ব প্রচেষ্টা। ছবিটির জন্য সম্প্রতি সঙ্গীত গ্রহণের কাজ হয়েছে। সুর দিয়েছেন কালীপদ সেন।

● দীপ নেভে নাই' 'মহালগ্ন'-এর পরিচালক কনক মুখার্জীর পরবর্তী ছবির নাম হবে 'মায়াবিনী লেন'। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এই ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে।

● বিখ্যাত গায়িকা রাধারাণীদেবী বসুমতীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে ইনি গান গেয়েছেন।

সংবাদ বন্যা

নিউইয়র্কে 'মহানগর'

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' ছবিটি নিউইয়র্কে দ্বিতীয় বার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

বোম্বাইতে 'চারুলতা'

'চারুলতা' আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই শহরে মুক্তিলাভ করবে। ছবিটি দেখার জন্য সেখানে দারুণ উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত মন্ত্রিদপ্তরের চেয়ারম্যান মিঃ রোমানভের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়নে ১৯৬৪ সালে গত ছ'মাসে দু' হাজার মিলিয়নের অধিক লোক সিনেমা দেখেছে। গত বছরের তুলনায় দর্শকসংখ্যা বেড়েছে। প্রদর্শন স্থানের সংখ্যা বেড়েছে আরো তিন হাজার।

সোভিয়েট ইউনিয়নে দ্বি-বার্ষিক জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে নির্মিত ছবিগুলি মাত্র এই উৎসবে প্রদর্শনযোগ্য বিবেচিত হবে।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

একটি অবিস্মরণীয় শিক্ষাদান

গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ১৩০০ সালের ৯ই পৌষ, বড়দিন উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

'জনা' নাটকে যুগ্ম-শিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র ও নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি নট-নটীদের শিক্ষাদান করেন।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে 'জনা' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ :

জনা—তিনকড়ি, প্রবীর—দানীবাবু, বিদূষক—অর্দ্ধেন্দুশেখর, নীলধ্বজ—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—শরৎ বন্দ্যো: (ণুবাবুর), মহাদেব ও ভীম—দাশুবাবু, অর্জুন—চুণীলাল দেব, বৃষকেতু—কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মদনমঞ্জরী—ভূষণকুমারী, নায়িকা—ভবতারিণী, রুক্মিণী ও গঙ্গা—হরিমতী (গুলফম্)। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগে নামভূমিকায় প্রমদা সুন্দরীকে নামানো হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনকড়িকেই শেষ পর্যন্ত 'জনা'র ভূমিকায় নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তিনকড়ি 'জনার' মত কঠিন চরিত্রের রূপদানে সক্ষম হবেন কিনা, এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রকে রাজী করান এবং তিনকড়িকে শিক্ষাদানের ভার নিজেই গ্রহণ করেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখর তিনকড়ির জন্য পৃথক মহলার বন্দোবস্ত করে শিক্ষা দিতে থাকেন।

'জনা'র ভূমিকায় অভিনয় করার পূর্বে, তিনকড়ি অবশ্য বীণা থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 'জনা'র মত দুরূহ চরিত্রের তুলনায় 'মীরাবাঈ' কতকটা হাল্কা চরিত্র। তাই, তিনকড়িকে নির্বাচন করার পর গিরিশচন্দ্রের ভয়-ভাবনার অন্ত ছিল না। ওদিকে অর্দ্ধেন্দুশেখর তিনকড়ির শিক্ষাদান ব্যাপারে অপরিসীম পরিশ্রম করতে লাগলেন।

তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'জনা'র মস্তিষ্ক-বিকৃতির আগে যেখানে জনা প্রবেশ করে বলেন :

'ওই ওই ওই যে কুমার বাপধন
পড়েছে সংগ্রামে, তাই যাদুমণি,
এস নাই মার কাছে? হা পুত্র,
হা প্রবীর আমার' ইত্যাদি,

উপরোক্ত কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠা দরকার, তার একান্ত অভাব হতে লাগলো তিনকড়ির। অর্দ্ধেন্দুশেখর নানাভাবে চেষ্টা করেও—তা তিনকড়ির কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন না। শেষে অর্দ্ধেন্দুশেখর কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

তিনকড়ির কোন সন্তানাদি ছিল না। পারিবারিক জীবনে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন তাঁর ভাইপোকে।

অর্দ্ধেন্দুশেখর একদিন তিনকড়িকে মহলা দেওয়াবার জন্য থিয়েটারে আসছেন, রাস্তায় তিনকড়ির ভাইপোর সঙ্গে দেখা। তিনি তিনকড়ির ভাইপোকে সস্নেহে নিজের কাছে ডাকলেন, তারপর তার সঙ্গে একথা-সেকথা বলতে বলতে থিয়েটারে এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনকড়ির ভাইপোকে ঘরে বসিয়ে রেখে, অর্দ্ধেন্দুশেখর হন্তদন্ত হয়ে স্টেজে গিয়ে তিনকড়িকে জানালেন—সর্বনাশ হয়েছে তিনকড়ি। তোর ভাইপো গাড়িচাপা পড়েছে।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের কথা শুনে তিনকড়ি 'এঁ্যা!' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর তিনকড়িকে হাত ধরে তুলে বললেন—'কিছু হয় নি তোর ভাইপোর, বহাল তবিয়তেই আমার ঘরে বসে আছে।' ইতিমধ্যে অর্দ্ধেন্দুশেখর লোক পাঠিয়ে তিনকড়ির ভাইপোকে ডেকে আনালেন। ভাইপোকে দেখে তিনকড়ি শান্ত হলে, অর্দ্ধেন্দুশেখর বললেন—'ভাইপোর দুর্ঘটনার কথা শুনে, যে এঁ্যা-টা তোর মুখ দিয়ে এখন বেরুলো—সেই এঁ্যা-টা মনে রাখিস। কদিন ধরে এইটাই আমি আদায় করতে চাইছিলাম তোর কাছে। শোন, 'ওই ওই ওই যে কুমার' ঐ সংলাপ বলার আগে, এখন থেকে ঐ আগের দুটো 'ওই' আর বলিস না। বল—'এঁ্যা! ওই যে কুমার বাপধন পড়েছে সংগ্রামে', তাহলেই দেখবি তোর চোখেমুখে বিস্ময় আর বেদনা একসঙ্গে ফুটে উঠবে।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই সুকৌশলে শিক্ষাদান সার্থক হয়েছিল। জনার ভূমিকায় অভিনয় করে, তিনকড়ি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরও জনা নাটক রচনাও সার্থক হয়ে উঠেছিল।

● নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

বাংলার রঙ্গমঞ্চ—গিরিশচন্দ্র থেকে শিশিরকুমার অবধি

শিশিরকুমারের মুখে বহুবার গিরিশচন্দ্র এবং অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। এমন কি অমর দত্ত এবং দানীবাবুর কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধেও তিনি উচ্চ ধারণাই পোষণ করতেন। আসল কথা হোল, সত্যিকার গুণীই গুণের কদর বোঝেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অযথা নিন্দা করে নিজেকে প্রকট করে তোলবার চেষ্টাটা নীচমনেরই পরিচায়ক। শিশিরোত্তর যুগের একটি আত্মপ্রচারশীল অভিনেতার এই ধরণের প্রচেষ্টা বারবার লক্ষ্য করেছি। এক সময়ে তিনি শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি দিক্‌পাল অভিনেতাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বিষোদ্‌গার করেছিলেন—সম্প্রতি প্রশংসাচ্ছলে ভূমেন রায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট আজেবাজে কথা বলেছেন। গিরিশবাবুর বা শিশিরযুগের অভিনেতাদের অন্যের সার্টিফিকেট আবশ্যক হোত না নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। তাহলে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, দেশবন্ধু প্রভৃতি অনেকের প্রশংসাপত্রই এঁরা প্রচারপত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন সত্যিকার জাতশিল্পী—সার্টিফিকেটের সাহায্যে শিল্পকে জাতে তুলতে যাওয়ার প্রয়াসটাকেই এঁরা ঘৃণ্য মনে করতেন।

এই নব নাট্যাচার্যটি শিশিরকুমারের জীবিতকালেই একবার শিশিরকুমারকে প্রায় বুর্জোয়া বলে অভিহিত করেছিলেন তাঁর একটি লেখায়। কমিউনিজম সম্বন্ধে এঁর প্রগাঢ় জ্ঞান উপলব্ধি করে মনে হয়েছিল স্বয়ং লেনিন বোধহয় নবকলেবরে বাংলার রঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন। সুবিধাবাদী এই ভদ্রলোকটি কখনও বামপন্থী, আবার দরকার হলে ঘোর দক্ষিণপন্থী।

অবশ্য জনমনকে এভাবে বেশি দিন ভুলিয়ে রাখা যায় না। কাচ-

শিলালি

কাঞ্চনের তফাৎটা তারা নিজেরাই সময়ে বুঝতে পারে। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃত ঘোষ বা শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ, নির্মলেন্দু, দুর্গাদাস প্রভৃতিকে কুৎসা দ্বারা ছোট করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। জনসাধারণ এক সময় তাঁদের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছে এবং এই প্রতিভাই তাঁদের চিরকাল রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমর করে রাখবে।

গিরিশচন্দ্রের আগে থিয়েটার ব্যাপারটা বড়লোকদের অন্তঃপুরেই আবদ্ধ ছিল। গিরিশবাবুই প্রথম নাট্যমঞ্চ এবং নাট্যাভিনয়কে জনসাধারণের মাঝে নিয়ে এলেন। তিনি ছিলেন একাধারে নট এবং নাট্যশিক্ষক। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র (তাঁর উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ অনেক দিন মঞ্চের চাহিদা মিটিয়েছে) এবং দীনবন্ধুর নাটক অভিনয় করে তো আর চিরকাল কাটানো যায় না। অথচ শক্তিশালী নতুন নাট্যকার কোথায়। একমাত্র মঞ্চের প্রয়োজনেই গিরিশচন্দ্র নাটক লিখতে প্রবৃত্ত হন।

এখানে শ্রীকুমুদবন্ধু সেনের 'গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য' থেকে প্রাসঙ্গিক কিছুটা আলোচনা তুলে দিচ্ছি:

'গিরিশবাবু—দেখ বাজারে আমার একটা বদনাম আছে যে, আমি পরের বই নিতে চাই নি। এর চেয়ে মিছেকথা আর কিছু হতে পারে না।

কুমুদবন্ধু—আমিও তাই শুনেছি।

গিরিশবাবু—শুনেছ—না? সত্যি বলছি, আমার dramatist হবার কোন কালে ambition ছিল না। গুপ্তকবির সম্মান প্রতিপত্তি দেখে একবার কবি হবার সাধ হয়েছিল।

কুমুদবন্ধু—আশ্চর্য্য! আপনি বলছেন dramatist হবার উচ্চাশা আপনার কোনও কালে ছিল না—তবে dramatist হলেন কিরূপে?

গিরিশচন্দ্র—দায়ে পড়ে—Out of sheer necessity. যখন মাইকেল বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হল, স্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিললো না, তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হোল। একটা নাটক লিখতে কত দিকে নজর রাখতে হয়। সাহিত্যিক আর্টের চরম আদর্শ—নাটক।

কুমুদবন্ধু—কেন নাটকের চেয়ে কি উপন্যাসে কম art?

গিরিশচন্দ্র—Sir Walter Scott আর Shakespeare পাশাপাশি রেখে পড়লেই বুঝতে পারবে। নভেলে তুমি সব কথা খুলে বলতে পার, বোঝাতে পার, প্রত্যেক চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ইঙ্গিত করতে পার: কিন্তু

নাটকে তার অবসর কোথায়? খাঁটি novelist or dramatist একটা central truth-এর উপর ভিত্তি করে সমুদায় plot-টি গড়ে তোলেন। Dramatist-কে সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্যপটের ভিতর through action কথাবার্তায় সমুদয় রস ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যেক চরিত্রকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার করতে হয়। নাটকে সর্বাপেক্ষা কঠিন অঙ্গ dialogue. একটা সামান্য উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। ধর, স্ত্রী-পুরুষের ভাষা। দুঃখ-দুর্দশায় সুখে-আনন্দে, বীরত্বে-লজ্জায় পুরুষের ভিতর যে ভাষায় ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশ হবে—স্ত্রীলোকের ভিতর ঠিক সেই ভাব বা উচ্ছ্বাস স্বতন্ত্র ভাষায় প্রকাশ পাবে। Emotion, feeling একই স্তরের, কিন্তু ভাষা ও বিকাশ স্বতন্ত্র আকারের। আর বেশির ভাগ সাহিত্যিক এটা আদৌ লক্ষ্য করেন না—যদি তাঁদের লেখায় স্ত্রী-পুরুষের নাম মুছে দাও তাহলে নির্ধারণ করা কঠিন হবে—কোনটা পুরুষের বা কোনটা স্ত্রীলোকের উক্তি।'

ঐ বইতেই গিরিশবাবুর নাটকে সেক্সপীয়ারের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধরণের কথাবার্তা হয়:

'কুমুদবন্ধু—বোধ হয় ইংরাজী নাটকাদির সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মহাকবি সেক্সপীর, Ben Jonson Marlowe, Green প্রভৃতি Elizabethan যুগের নাটকের সঙ্গে বাংলা নাটক—বিশেষ আপনার নাটকগুলি যেন এক ছাঁচে গড়া, এটাই আমার মনে হয়। তবে সে যুগে সে দেশে প্রাচীন ইতিহাসগাথা থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করেছে, কিন্তু আপনি রামায়ণ-মহাভারতের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে তা আহরণ করেছেন।

গিরিশবাবু—তুমি ঠিক বলেছ। মহাকবি সেক্সপীরই আমার আদর্শ।

● প্রফুল্ল নাটকে 'যোগেশের' ভূমিকায় বঙ্গের নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ

তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি। তবে জেন, আমার নিজেরও একটা স্বাধীন ভাব আছে। কি জান—প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতের সাহিত্য সেই দেশের ভাব-রসে পুষ্ট ও বর্ধিত হয়। এটা স্বাভাবিক। বিয়োগান্ত মিলনান্ত নাটক ইউরোপীয় সাহিত্যে যে রকম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, মহাকবির প্রতিভাদীপ্ত তুলিকায় নাট্যকলার যে অপূর্ব শ্রী পরিস্ফুট হয়েছে, তা ভবিষ্যতে যিনিই নাটক করুন, তাঁর আদর্শকে তাঁর অনুকরণ করতেই হবে। তবে, মহাকবি কালিদাস, ভবভূতি এঁদেরও আমি অনাদর করি না। কিন্তু আমি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্রবেই বেশি এসেছি। কিন্তু মহাকবি কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস আমার ভাষার বনিয়াদ। আমার লেখায় তাঁদের প্রভাবও বিদ্যমান দেখতে পাবে।'

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বলতেন—বাংলা দেশে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল ছাড়া রঙ্গমঞ্চের ভেতর দিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই। সেই জন্যই অন্যদের নাটক অভিনয় করতে গেলে ভালভাবে edit করে নেবার দরকার হয়।

বাংলা সাহিত্যের নাটকের দিকটা একা গিরিশচন্দ্র যে কতোটা সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন, সে কথা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ভক্তিরসাত্মক, কমেডি, ট্র্যাজেডি, ফার্স প্রভৃতি বহু ধরণের নাটকই তিনি লিখেছেন। তাছাড়া মঞ্চের উপযোগী করে মৌলিক ধরণের অমিত্রাক্ষর ছন্দও তিনি আবিষ্কার করেন এবং পরে এই ছন্দের নামকরণ হয় গৈরিশ-ছন্দ। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ভারতীতে এই গৈরিশ-ছন্দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার সময় এবং কিছু পরেই গিরিশচন্দ্রের চারপাশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন আরও অনেক প্রতিভাশালী নট-নটী—যথা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, অমৃত মিত্র, বেলবাবু, উপেন্দ্র মিত্র, গঙ্গামণি, বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। (ক্রমশঃ)

পাঠক মন

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক। শুধু সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক নই, দৈনিক ও মাসিক বসুমতীর পাঠকও বটে। অনেক দিন ভেবেছি 'পাঠকমন' বিভাগে আমার মতামত জানাব। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে সময় হয়ে ওঠে নি। আজ সময় পেয়েছি, তাই লিখতে বসলুম।

আজ একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সাপ্তাহিক বসুমতী অন্যান্য সাহিত্য সাপ্তাহিক থেকে অনেক উংর্ধে। আমি গর্বভরে বলব, প্রত্যহ দেশ-বিদেশের যে সব সংবাদ দৈনিক পত্র-পত্রিকায় পেয়ে থাকি; তা কয়েকদিন ধৈর্য ধরে থেকে, সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় পেয়ে যাই। তাই কেমন সুন্দর সংবাদ পরিবেশন—এর, ভারতদর্শন, বঙ্গদর্শন, আন্তর্জাতিক, রঙ্গজগৎ, খেলাধুলা, আরো কত কী, যা লিখতে গেলে শেষ নেই।

সাপ্তাহিক বসুমতী শুধু আমার মন জয় করে নি, সে জয় করেছে বাংলা দেশের পাঠকের মন। তাই সাপ্তাহিক বসুমতীর 'সম্পাদিকা' নূতন বিভাগ খুলেছেন 'পাঠকমন'। ভারি মজা লেগেছে এই বিভাগটি পেয়ে, কারণ, পাঠক তার মনের কথা প্রকাশ করবার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। বাংলা দেশে তো আরো সাহিত্য সাপ্তাহিক রয়েছে, কিন্তু এমনটি আর নেই।

এবার নিজের বক্তব্য পেশ করছি। সত্যি সত্যি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিকট আমি ঋণী, এ ঋণ হয়তো শোধ করতে পারব না। সাপ্তাহিক বসুমতীতে বেশ ভালো লাগছে কবি হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর। এই বিভাগটিতে দেশ-বিদেশের কবি-মনের সন্ধান পেয়েছি। তাই হরপ্রসাদ-বাবুকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ, তিনি যে সব অজানা তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন, তা খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। ঐ সব তথ্য জানতে হলে, অনেক গ্রন্থ ঘাঁটতে হয়। সাপ্তাহিক বসুমতী সে-সুযোগটুকু আমাদের দিয়েছে। তারপর উল্লেখ করতে হয়—বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের দিল্লী থেকে, এ বিভাগটিতে দিল্লীর আদি-অন্তের ইতিহাস বেশ ভালোভাবে জানা যায়। তারপর 'পদাতিকের' শহর কলকাতা। এছাড়া হালে ভালো লাগছে, 'সওদাগর' লিখিত বাণিজ্যে সেকাল ও একাল।

সাপ্তাহিক বসুমতী মাঝে মাঝে এত আনন্দ দেয়, তা লিখেও শেষ করা যায় না। তবুও তার দু-একটি উল্লেখ করছি, যেমন নেতাজী বিশেষ সংখ্যা, রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা, সেক্সপীয়র বিশেষ সংখ্যা, নেহরু বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাগুলিতে সত্যিই সাপ্তাহিক বসুমতী তার পাঠকের মন জয় করেছে।

আর মাত্র দু-একটি কথা বলেই, আমার মতামত শেষ করব। অনেক সময় ছাপাগুলি ভালোভাবে ধরা যায় না, তারপর ছবিগুলি কেমন যেন আবছায়া, আবছায়া; সেইদিকে কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এখন এ কথাটি বলেই ইতি টানব। কর্তৃপক্ষ যদি মাঝে মাঝে আমাদের (পাঠকদের) দু-একটি কবিতা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমনে আরো উৎসাহ আসবে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর বহুল প্রচার-কামনা জানিয়ে মতামত শেষ করলুম।

ইতি—
'ভীমরুল'

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন গ্রাহক ও পাঠক। এই 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার বিশেষত্ব প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাই এর সম্পর্কে আমাকে কিছু লিখতে হচ্ছে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় কলমটি বেশ বলিষ্ঠ। 'আজকের মানুষ' শিরোনামায় যে খবর পরিবেশন করা হয়, তার মূল্য অপরিসীম। এই অল্প-পরিসরে এত সুন্দরভাবে পারচিতি দান এর আগে দেখি নি। হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' নামক ধারাবাহিক আলোচনাটি বর্তমানে এই পত্রিকার বিশেষ সম্পদ। এছাড়া ভারতদর্শন, আন্তর্জাতিক, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বিভাগ-গুলির মাধ্যমে সাম্প্রতিক কালের সকল ঘটনা আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে।

'শহর কলকাতা' বিভাগটি শুধু যে ইতিহাসভিত্তিক, তা নয়; এমন সহজ সরল বলার ভঙ্গি, এমন রোমাণ্টিক রচনা সত্যই দুর্লভ। এ ছাড়া ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা, রঙ্গ-জগৎ, রঙ্গমঞ্চ, খেলাধুলা, গ্রন্থমেলা সবই আছে—যা একটা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় থাকা উচিত।

গল্প যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ হওয়াই ভাল। গল্পে ধারাবাহিকতা অস্বস্তিকর। অনেক সময় রস-গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। কবিতার স্থান ক্রমশ কমে আসছে। কবিতার জন্য অন্তত একটা পৃষ্ঠা রাখা উচিত। নতুন লেখকদের আর একটু সুযোগ দিলে ভাল হয়।

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের একান্ত অভাব। দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের রচনা প্রকাশের ব্যবস্থা অবশ্যই করা উচিত। 'গ্রন্থমেলা'র গ্রন্থ পরিচিতি আরও বিস্তৃতভাবে করার জন্য সম্পাদিকাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পত্রিকাটি সম্বন্ধে বড় অভিযোগ হল—এর প্রচ্ছদপট; এত পাতলা কাগজের পরিবর্তে মোটা কাগজের ব্যবহার আশু প্রয়োজন। মুদ্রণ, আলোকচিত্র প্রভৃতির উন্নতি হওয়া প্রয়োজন।

নমস্কারান্তে—হিরণ্ময় ভাদুড়ী,
বেলুড় মঠ, হাওড়া

খেলা ধুলা

অপরাজিত লীগ বিজয়ী

বাজল কাঁসর-ঘণ্টা, ফাটল পটকা, রঙ-বেরঙয়ের বাজী আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল, আর আকাশে উড়ল তুবড়ি—জানিয়ে দিল মোহনবাগানের লীগ বিজয়ের বার্তা। ১৯৬৪ সাল মোহনবাগানের ইতিহাসে স্মরণীয়, কারণ এবার মোহনবাগান পদার্পণ করল ৭৫ বৎসরে। এবারের লীগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ানের আখ্যা মোহনবাগানের 'প্লাটিনাম-জয়ন্তী' উৎসবকে করে তুলল আরও সজীব এবং উৎসবমুখর। ১৯১৫ সালে প্রথম ডিভিসন লীগে মোহনবাগানের প্রথম যাত্রা সুরু। আজ পর্যন্ত মোহনবাগান মোট বারোবার লীগের মুকুট মাথায় পরেছে। কিন্তু, ১৯৬৪ সালের পূর্বে কোনবার অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ানের দুর্লভ সম্মান ভাগ্যে জোটে নি। বাঙালী দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল প্রথম ১৯৫০ সালে অপরাজিত লীগ চ্যাম্পিয়ানের আখ্যা লাভ করে। সাহেব আর গোরা টিমের আমলে শ্বেতাঙ্গদের ছল, বল এবং কৌশলের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল টপকে এসেও মোহনবাগানের হাতের মুঠো থেকে বহুবার লীগ ফস্কে গিয়েছে। লীগে মহামেডানের স্বর্ণযুগের ঠিক পরে ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান প্রথম লীগ বিজয় করে, অবশ্য তখন শ্বেতাঙ্গদলগুলি অতীতের ছায়ামাত্র। স্বাধীনতার পর থেকে সুরু হয়েছে দুই প্রধান মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের একচ্ছত্র প্রাধান্য। ১৯৬৪-র লীগ বিজয়ের ফলে মোহনবাগান উপর্যুপরি তিনবার লীগ লাভ করল এবং মাত্র এক পয়েণ্ট পশ্চাতে থেকে ইস্টবেঙ্গল পেল রানার্সের সম্মান। কলকাতা ফুটবল লীগ ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং লাভ করেছে মোট নয় বার, ইস্টবেঙ্গল সাতবার এবং মোহনবাগানের কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান এবং রানার্স ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়দের জানাই আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। লীগ বিজয়ের পশ্চাতে মোহনবাগানের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের ছিল আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং প্রায় সমান অবদান। তবুও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন গ্রহণ করেছিলেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তাঁরা হলেন জার্নাল সিং, চুণী গোস্বামী, অশোক চ্যাটার্জী, বিমল চক্রবর্তী, দেবনাথ এবং বিদ্যুৎ মজুমদার। প্রধান দলগুলির অতি সাধারণ স্তরের খেলা ক্রীড়ামোদীদের হতাশ করেছে। বর্তমানে খেলা দেখে মনে হয় যে, খেলার মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং ভাল খেলোয়াড় গঠনের চাইতে ট্রফি জেতার দিকেই বড় ক্লাবের লক্ষ্য বেশি। দলগত স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে যেদিন তারা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য এগিয়ে আসবেন, সেদিনই হবে আমাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

শ্রীঅমিতাভ

ময়দান ফুটবলের তরুণ প্রতিভা

কলকাতা ময়দানে প্রথম আবির্ভাবে ক্রীড়ামোদীদের মন জয় করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। প্রতিবারই কলকাতা ময়দানে ফুটবল মরশুমে খেলোয়াড়ের মেলা বসে যায়, দেশ-বিদেশের বাছাইকরা খেলোয়াড়েরা সমবেত হয় ভারতীয় ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতা ময়দানে। ময়দানের বাঘা বাঘা দলগুলির নামী এবং দামী খেলোয়াড়দের চটকদারী খেলায় ময়দানের ফুটবল-রসিকরা বিভোর থাকেন। তাই তাঁদের চোখে ভাল খেলে বাহবা কুড়ান আনকোরা খেলোয়াড়দের কাছে সত্যই ভাগ্যের কথা।

আমি আজ এখানে যে খেলোয়াড়টির কথা উল্লেখ করতে যাচ্ছি, স্টপারের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খেলে, প্রথম ডিভিসন লীগে প্রথম আবির্ভাবেই তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। প্রথম ডিভিসনে নবোন্নীত কালীঘাট দলের স্টপার শিবেন্দ্রনাথ রুদ্রের কথাই আমি বলছি। রুদ্রের উচ্চাঙ্গের খেলার মধ্যে আছে সম্ভাবনার ইঙ্গিত, আছে জাত-খেলোয়াড়ের প্রয়োজনীয় গুণ। এই মরশুমে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে খেলায় রুদ্র কালীঘাটের পক্ষে স্টপারের স্থানে যে অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা সকলেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, কলকাতা ময়দানের অভিজ্ঞতা তাঁর মাত্র দুবছরের।

জন্ম তাঁর ১৯৪৫ সালে এবং জন্মের পর থেকেই তিনি ইছাপুরের বাসিন্দা। লেখাপড়ায় হাতেখড়ি ইচ্ছাপুরের শ্রীধর বংশীধর হাইস্কুলে আর তাঁর ফুটবল খেলার হাতেখড়ি হয়েছে স্থানীয় জলি ক্লাবে। স্কুলজীবনে তিনি বরাবর স্কুলদলের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁরই অধিনায়কত্বে শ্রীধর

ংশীধর স্কুল বহুস্থানে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। চব্বিশ পরগণা জেলা স্কুলদলের পক্ষেও নিয়মিত খেলার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে। তাঁর খেলা দেখে কালীঘাট ক্লাব তাঁকে আহ্বান জানান। এবং তিনি ১৯৬৩ সালে এসে কালীঘাটে যোগ দেন। ১৯৬৩ সালে কালীঘাট দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ান হয়ে, ১৯৬৪ সালে প্রথম ডিভিসনে খেলার সুযোগ পান এবং শিবেন রুদ্রের ওপর এসে পড়ল স্টপারের গুরুদায়িত্ব। পূর্বে তিনি কোন কোচের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান নি। স্বীয় সহজাত ক্রীড়া-প্রতিভার বলেই এগিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য এবং শ্রীহবিবুর রহমান শ্রীরুদ্রের খেলাকে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সার্থক রূপ দেবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করছেন। বয়সে নবীন হলে কি হবে ক্রীড়াচাতুর্যে মনে হয় তিনি যথেষ্ট প্রবীণ এবং পরিণত। ভবিষ্যতে আরও বড় খেলার আসরে তাঁকে দেখার আশা আমরা রাখি।

এ্যাসেজ কাহিনী

ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ বুঝতে পেরে প্রকৃতিদেবী টেস্ট সিরিজে সুরুতেই ফেলেছিলেন চোখের জল, আবার এ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা করছে দেখে শেষ টেস্টের শেষদিন তিনি বর্ষণ করলেন বিদায়-অশ্রু। পঞ্চম টেস্টে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ডেক্সটারের ব্যাট ভেঙে গেল, ইংলণ্ডের মনোবল ভেঙেছে অনেকদিন আগেই হেডিংলের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই।

পঞ্চম এবং শেষ টেস্টে ইংলণ্ড আশায় বুক বেঁধে মাঠে নেমেছিল, যদি শেষরক্ষা করতে পারা যায়। কিন্তু প্রথম ইনিংসে ১৮২ রান সংগ্রহ করার পরই ইংলণ্ডের ক্ষীণ আশাও অন্তর্হিত হল। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা হক এবং ম্যাকেঞ্জির বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়েছেন। একমাত্র পারফিট ৪৭ রান এবং বয়কট ৩০ রান করে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছিলেন। ৪৭ রানে হক দখল করেন ৬টি উইকেট এবং ৮৭ রানে ম্যাকেঞ্জি লাভ করেন ৩টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা সাবলীল ভঙ্গিতে খেলা সুরু করেন। বিল লরী মাত্র ৪ রানের জন্য শতরান লাভের গৌরব থেকে বঞ্চিত হন।

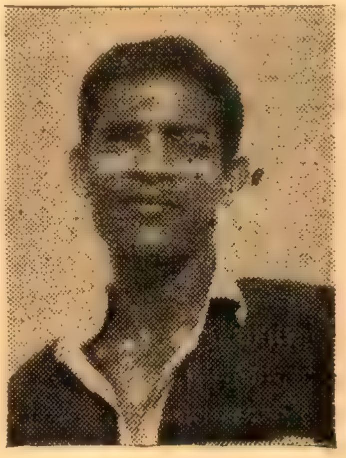

● এস রুদ্র

এই ইনিংস ট্রুম্যানের জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ইনিংস। ফ্রেডি ট্রুম্যানের ৩০০টি টেস্ট উইকেট পূর্ণ হল, সফল হল তাঁর বহুদিনের আশা, বহু দিনের স্বপ্ন, সৃষ্টি হল একটি নতুন ইতিহাস। টেস্টের অঙ্গন থেকে বিদায় নেবার আগেই তিনি বোলার হিসাবে যে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেলেন, তা স্পর্শ করাও বোধহয় কোন ক্রিকেট খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হবে না। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৩৭৯ রানে।

ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতে ব্যাটস্‌ম্যানরা স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। তরুণ ব্যাটস্‌ম্যান বয়কট শতরান করে ১১৩ রানে বিদায় নেন এবং কাউড্রে মাত্র তিন রানের জন্য সেঞ্চুরীর গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। ব্যারিংটন এবং টিটমাসও প্রশংসনীয় ব্যাটিং-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বৃষ্টি এসে বাধা সৃষ্টি করার ফলে খেলার সময় অতিক্রম করে যায়—ইংলণ্ড তখন ৪ উইকেটে ৩৮১ রানের কোঠায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াই 'এ্যাসেজ' নিয়ে দেশে ফিরবে, পথে তারা ভারতের সঙ্গে রাবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এখন দেখা যাক, রাবারও অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা করে কিনা।

সমাচার দর্পণ

ডেভিস কাপের খেলায় চিলিকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়া এবার শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে বাস্টাডে সুইডেনের সঙ্গে। এই খেলায় বিজয়ী দলের জন্য অপেক্ষা করছে গত বছরের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা। তবে খেলার গতি এবং ফলাফল দেখে মনে হয় অস্ট্রেলিয়া এবার ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

• • •

কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত মার্ডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারত এবার যোগদান করেছে। ভারত, বার্মা, কম্বোডিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড, সাউথ কোরিয়া, সাউথ ভিয়েৎনাম এবং তাইওয়ান, মোট নয়টি দেশ এবারের প্রতিযোগিতায়। গতবার তাইওয়ান মার্ডেকায় বিজয়ী হয়। প্রাথমিক রাউণ্ড ছাড়া মোট পঁচিশটি খেলা এবার হবে। ভারতীয় দল ভাল ফলাফল প্রদর্শন করবে বলে আমরা আশা করি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

27 AUG 1954
কুন্তল কেশদাম নারীদের
নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
কলিকাতা কেন্দ্র—
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য্য।

বসুমতী

আজ আবার
ফিরে এসেছে তাঁর জীবনের প্রথম দিন ;
এ-দিনের প্রাণহিত সত্তায়
আমাদের সত্যমেব আনন্দের অর্ঘ্যরাজি
তাঁর দীর্ঘায়ুর তীর্থপথে সতর্ক অনুচর।

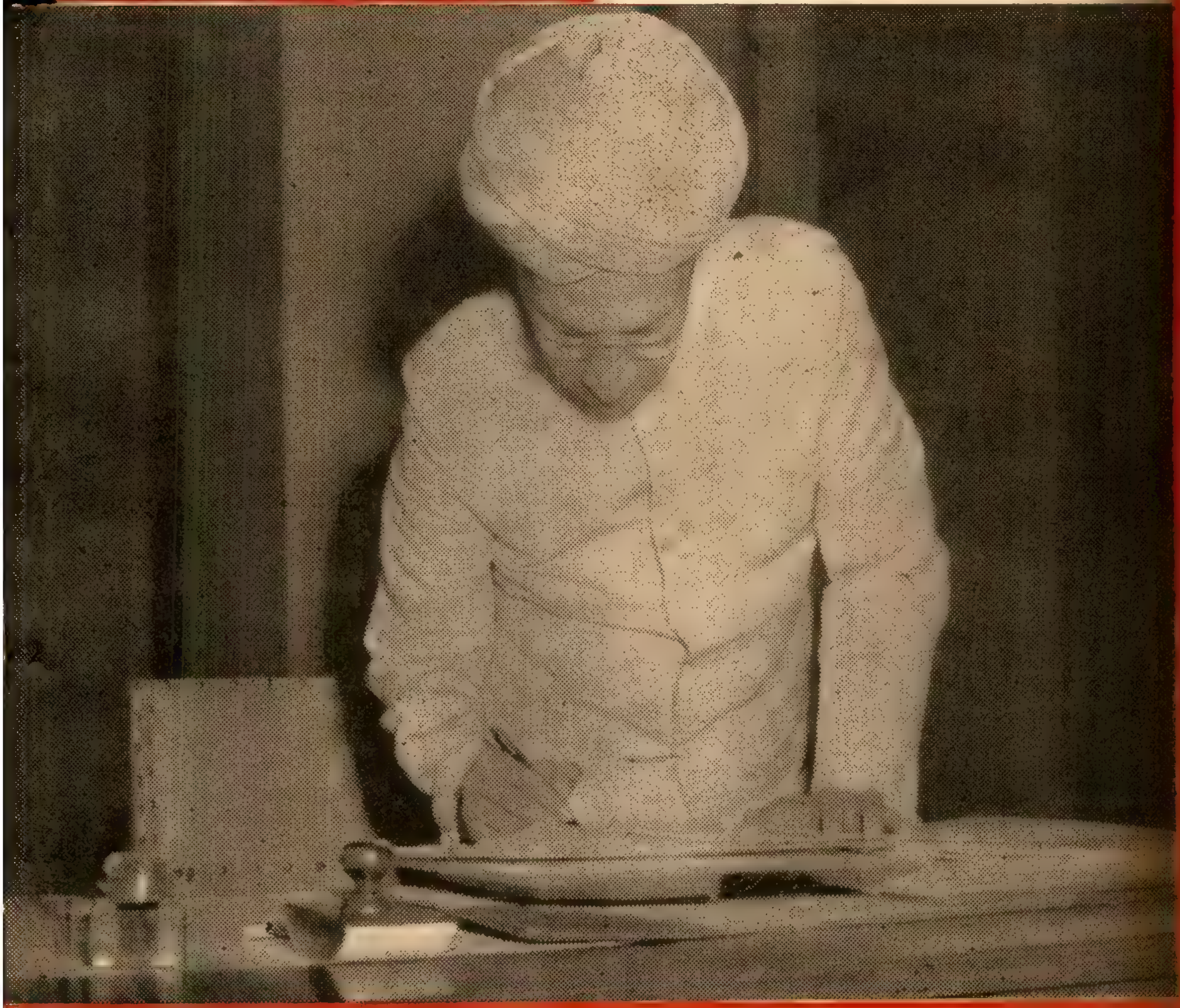

বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 3rd September, 1964 • Vol. 69, No. 1

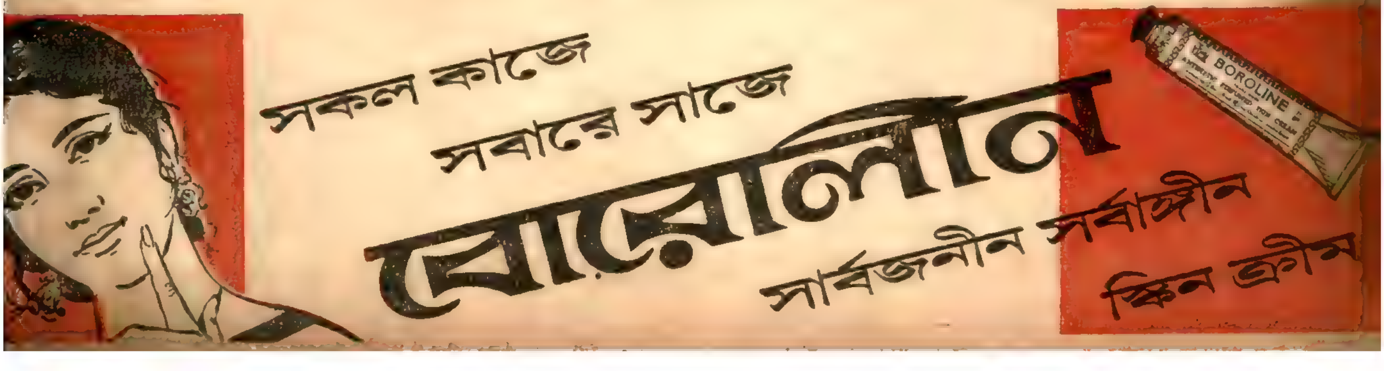

সূচীপত্র

756.3
·003/3
V.69
No.15

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৮৯৯
আজকের মানুষ	..	৯০০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৯০১
বিলুপ্ত (কবিতা)	সমীর ঘোষ	৯০৪
ভারতদর্শন		৯০৫
আন্তর্জাতিক		৯১২
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৯১৭
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯১৮
লখীন্দরের ভেলা (গল্প)	ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়	৯২১

ভিন্ন জাতের ভিন্ন স্বাদের

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

(১৩৭১)

প্রিয় লেখকদের প্রিয় গল্প

লিখেছেন :

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, সুশীল রায়, লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আশা দেবী, উশীনর ও আরো অনেকে।

'জরাসন্ধে'র
কারাগারের বৃহত্তম অজানা কাহিনী
"রাজাবাহাদুর"

রণজিৎ রায়ের
চমকপ্রদ শিকার-কাহিনী
"শিকার প্রসঙ্গে"

বাণী রায়ের খণ্ড উপন্যাস
"জল"

প্রাণতোষ ঘটকের
"শহর কলকাতা"

মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসু, অশোক সেন এবং আরো অনেকে।

এছাড়া রয়েছে—
খ্যাতিমান শিল্পীদের আঙ্গিক চিত্র ও অলংকরণ।

মূল্য—আড়াই টাকা

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৯২৫
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৯২৯
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	৯৩৩
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	৯৩৫
আশ্রয় (অনুবাদ-গল্প)	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	৯৩৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৯৪৩
উত্তরঙ্গ মুক্তি (কবিতা)	শ্যাম রায়	৯৪৪
বঙ্গদর্শন	...	৯৪৫
রঙ্গজগৎ	...	৯৫০
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	৯৫৪
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	৯৫৬
পাঠক মন	...	৯৫৮
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	৯৫৯

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

নাট্য-সাহিত্যের সেই গৌরব-জ্যোতি
ঐতিহাসিক নাট্য প্রতিভার বরপুত্র
অমর নাট্যমহাকবি—গীতিনাট্য-সম্রাট
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে :—প্রতাপাদিত্য, কিন্নরী, দুর্গে রাঠোর, মিডিয়া, প্রমোদরঞ্জন।

২য় ভাগে :—ভীষ্ম, বাঙ্গালার মসনদ, পদ্মিনী, গুহামুখে, ভূতের বেগার, চাঁদের আলো।

৪র্থ ভাগে :—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদিন, জয়শ্রী, কুন্তী।

৫ম ভাগে :—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদী, পুনরাগমন, বৃন্দাবন বিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে :—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভঙ্গ, খাঁজাহান, বিরামকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে :—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদৌরা, কুমারী, বরুণা ; কবি-কাননিকা রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৩১ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ	25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৮ই ভাদ্র ১৩৭১	Thursday, 3rd September 1964

শ্রীরাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস ৫ই সেপ্টেম্বর। যদিও রাষ্ট্রপতি হিসেবে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভারতীয় নাগরিকের মনে মর্যাদার উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, তথাপি একথা সত্য যে, তিনিই তাদের একান্ত আপন জন। মোটের ওপর ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রতি তাদের সানুরাগ শ্রদ্ধা কোনোদিন বিচলিত হয় নি, এমন কি, তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে দেখে তারা এই কারণে গর্বপ্রকাশ করেছে ও আনন্দিত হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি আসনে যিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই প্রত্যক্ষ প্রতীক। আচারে ব্যবহারে, অনাড়ম্বর জীবন যাপনে, প্রাণের সরলতায় তিনি যেমন আদর্শস্থানীয়—তেমনি শিক্ষা-দীক্ষায় ন্যায়নিষ্ঠ, জীবন-দর্শনে, চিন্তা-প্রকাশে ও সত্য-বাচনে তিনি ঋষিতুল্য। এ-হেন ব্যক্তির জন্মদিনে সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ আবেগ স্ফূর্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমান বৎসরে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবসের প্রাক্কালে জনচিত্ত আর একটি কারণে তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য প্রকাশ করবে। জনচিত্ত অস্বাভাবিক বিত্ত-লোভী নয়। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি, ব্যাধির হাত থেকে ত্রাণ, শিক্ষালাভের কামনা ও সহজভাবে জীবনযাপনই তাদের কাম্য। স্বাধীনতা লাভের পর এই আশা যতো বেশি উদগ্র হয়ে উঠেছিল, আশাভঙ্গজনিত বেদনায়, অভাবের তাড়নায় ততো বেশি তারা বিপন্ন বোধ করছে। তারা দেখছে, একদা যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জনসাধারণ্যে থেকে বড় বড় কথা বলেছেন তাঁরাই আবার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়েছেন কিংবা আরো কিছুদিন ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন। অথচ দেখতে দেখতে চোখের সামনে একের পর এক পরিকল্পনার 'চূড়ান্ত' হল, শুধু অভাবই আর ঘুচলো না। এই অভাব না ঘোচার মৌলিক সত্যটা আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের কথায় এবার প্রকাশ পেয়েছে ঠিক স্বাধীনতা দিবসেই। সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি সহজ সত্যটা যেন চোখ মেলে দেখেছেন। রাজনীতিজ্ঞরা যা চোখে দেখেও বলতে চান না, দার্শনিক সেই সত্যকে সাহস করে জানিয়েছেন। বর্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করেছেন। যাঁরা আজ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁদের দেখা উচিত যে, সেই রাধাকৃষ্ণণ অত উঁচুতে থেকেও একটুও পাল্টান নি কিংবা জনসাধারণের কাছ থেকে সরে যান নি। এমন ব্যক্তির জন্মদিনে তাই তাদের আনন্দ। আনন্দ একজন সাধারণ শিক্ষকেরও—যিনি সমাজ গঠনের ভার গ্রহণ করেছেন, যাঁর হোমাগ্নিতে ভারতচিত্ত শুদ্ধ হবে, বর্তমান কাল শুদ্ধ হবে, ভবিষ্যৎ রাজনীতিজ্ঞেরা যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সত্যের পথে চলবেন। ৫ই সেপ্টেম্বর রাধাকৃষ্ণণের মতো একজন শিক্ষানায়কেরই জন্মদিবস, তাই এ দিবস শিক্ষক দিবস, যুগে যুগে জাতিগঠনেরই দিন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

পরিত্রাতা তো তাকেই বলে—যে বিপর্যয়ের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে বিপদগ্রস্তকে ?—শুধুমাত্র একজন নয়—একটা গোটা দেশের মানুষকে ? অন্যথায় দেশকেই ? —বলে তাকেই। তবে এ ক্ষেত্রে পরিত্রাতা কোন মানুষ নয়—প্রতিষ্ঠান। —বিশ্বব্যাঙ্ক। আর এ প্রতিষ্ঠান যুদ্ধোত্তর যুগে অর্থনৈতিক বা সামাজিক অনটনের দিনে দেশে দেশে সাহায্যের ডালি যে মানুষটির সক্রিয় শুভেচ্ছার সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় তিনি এর সম্মানিত সভাপতি—বর্তমানে জর্জ উড্স্।

অগ্রসরমান যে কোনও দেশের পক্ষেই এই প্রতিষ্ঠানটির মত এই মানুষটিও অপরিহার্য। কেন না, ব্যক্তিত্বের হেরফেরে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতিও বদলায়। —বিশেষত ক্ষমতা যেখানে সীমিত নয়। সেদিক থেকে আদর্শ সভাপতি জর্জ উড্স্। উদার শুভানুধ্যায়ী মন নিয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণদান সংক্রান্ত নীতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর বিশাল মনের মতই বিশ্বব্যাঙ্কের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। উন্নতির পথে শরণাপন্ন দেশকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যেতে বিশ্বব্যাঙ্ক নিয়ত পাঠাচ্ছে তার আগ্রহ ও সানুগ্রহ সাহায্য। জর্জ উড্সও অর্জন করছেন নানা দেশমানের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা।

কৃষ্ণ ঘনভ্রুর নীচে গাঢ় উজ্জ্বল একজোড়া চোখ তাঁর বিচক্ষণতার ইশারায় তাকিয়ে আছে। মাথার চুল অনেক হাল্কা হ'য়ে গেছে বয়স আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে। তাঁর মধুর ব্যবহার সহজেই মনকে টানে সম্প্রীতিতে; কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় তাঁর হাসি—যে হাসি আশ্বাসের, আনন্দের, আশার। তাঁর হাসি তাঁর অনেক কাছে টেনে নিয়ে যায় আমাদের—কিংবা আমাদের কাছে তাঁকে। মোট কথা তাঁকে দেখতে মোটেই চিরাচরিত ব্যাঙ্কারদের মত নয়। অথচ ওই পদে তিনি সত্যি সার্থক ব্যক্তিত্ব।

টোকিওর ইণ্টার-ন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডের বিশ্বব্যাঙ্ক সম্মেলনে যাবার পথে সম্প্রতি ভারতের রাজধানীতে এসেছেন শ্রীজর্জ উড্স্। ভারতের অর্থমন্ত্রী, যোজনা কমিশনের সহকারী চেয়ারম্যান, ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী—এঁদের সকলের সঙ্গেই ভারতের উন্নতিকল্পে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা আলাপ করবেন তিনি। আসন্ন চতুর্থ পরিকল্পনায় বিদেশী মুদ্রা-সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা, ভারতের ক্রমশ বর্ধিত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত আলোচনাও। তিনি একই সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্ক ও 'এইড ইণ্ডিয়া কনসরটিয়াম'-এর সভাপতি। তাঁর কথাতে তাই ভারতের সাহায্যদাতা পশ্চিমী দেশগুলোর মনোভাব অনেকটাই প্রকাশ পাবে। বিশেষত তিনি এসেছেন শুধু নিছক ভ্রমণের সূত্রেই নয়—যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে এ পর্যন্ত ভারতের উন্নতির পথ এবং ভবিষ্যতে তার সুদূর-প্রসারতায় পরামর্শদানের জন্য। ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী পরিকল্পনা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় উৎসাহী। শ্রীউড্স্ ভারতের অর্থমন্ত্রীর অনেকদিনকার বন্ধু। পশ্চিমী বেসরকারী মূলধন ভারতে নিয়োগের প্রসঙ্গে শ্রীউড্স্ ভাবছেন। ভারতও বিদেশী সাহচর্য ও মূলধনের ওপর অনেক ভরসা রাখে। সেইটেই শ্রীউড্সের এই সফরের সাফল্যের দিকচিহ্ন—ভারতের উন্নতি, স্বল্পগতি আর ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনায়

জর্জ উড্স্

তিনি পরিতুষ্ট। তবে ভারত বিদেশী বেসরকারী মূলধন আহরণে বর্তমানে যথার্থ উদগ্রীব নয়। সমাজতন্ত্র তার পথ। তার আদর্শ, লক্ষ্য। আবার বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যাপকভাবে সমাজতন্ত্রের উৎকর্ষে সন্দিহান।—তাই এই মনোমালিন্যের অবকাশে একমাত্র ভরসা শ্রীউড্সের ব্যক্তিগত প্রয়াস এবং বন্ধুত্বের ওপর। প্রতিষ্ঠান অনেক বড়—সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরিচালক কি তার থেকে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ? হয়ত না। তাই রাজধানীতে শ্রীউড্সের আগমনকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাতে কুণ্ঠা নেই। নেই অনাদর।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

মানুষ সময়-রহস্যের দার্শনিক হতে চায় বটে, কিন্তু জীবন বড়োই অল্পমেয়াদী। তাই সময়তত্ত্ব আমাদের আর পাঁচটা তত্ত্বের মতোই মনে দেখা দেয়,—কিঞ্চিৎ ভাবায়ও,—তবু দিন কাটাবার সাংসারিক বুদ্ধির ওপরেই আমাদের প্রতিদিনের নির্ভর।

আমরা ব্যবহারিক মানুষ। প্রধানত সেই ব্যবহারিকতার কল্যাণবোধই আমাদের নীতি। মনে পড়ে 'আধ্যাত্মিক খুড়োর' ব্যবহার। 'বনফুলের' 'ব্যঙ্গ কবিতায়' সে-লেখা অনেকেরই চোখে পড়ে থাকবে। 'বনফুল' লিখেছেন—

ফুল ফুটে ঝরে যায় দুনিয়ার রীতি
আজ যার শুরু হয় কাল তার ইতি
বিয়ে হল অগ্‌ঘানে রায়েদের মেয়ে
বিধবা সে হয়ে গেছে দেখলাম যেয়ে
হরি ঘোষ গাইটিকে দিত খোল খুদ
বাছুরটি মারা গেল হল নাক দুধ।

সময়ের এই চিরচপল স্বভাবের উল্লেখ করে 'বনফুল' তাঁর আধ্যাত্মিক খুড়োর ব্যবহারটা দেখিয়ে দিয়েছেন—

এইরূপ নানা কথা আধ্যাত্মিক
ভেবে ভেবে শেষে খুড়ো করলেন ঠিক
সুদ যতো বাকি আছে এই বেলা হায়
তাগাদার তাড়া দিয়ে করে নি আদায়।
সোজায় না দেয় যদি আদালতে যাই
দেখি যদি তাতে তবু তাড়াতাড়ি পাই।

কারণ, জগৎ সম্বন্ধে তাঁর জীবনে তিনি এটুকু ঠিকই বুঝেছিলেন যে—

তাড়াতাড়ি করা ভালো, নাই কিছু ঠিক
মায়াময় দুনিয়ায় সকলি অলীক।

মায়াময় দুনিয়ার মায়াজাল মানতেই হয়; কিন্তু প্রতিদিনের আচার-ব্যবহার-আশা-প্রত্যাশার বাস্তবতাও তো মিথ্যে নয়। এই বাস্তবের কোলেই মানুষকে বাঁচতে হয়। অতএব, 'বনফুলের' আধ্যাত্মিক খুড়োমশাই একে যে অমান্য করেন নি, সেটা প্রত্যাশিত ব্যাপার। তবে, এ-চরিত্রের পরিহাসের ভিৎটা অন্য লক্ষণে আশ্রিত। খুড়োমশাই মোটেই আধ্যাত্মিক নন। 'বনফুল' মুখোশ খুলে দিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিকতার ভাণটা দেখিয়ে দিয়েছেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের প্রতি-দিনের লেনদেনের বাস্তবতা মেনে নিয়ে যাঁরা বৃহৎ মানব-সমাজের নেতা বা বন্ধুভাবে বিদ্যমান ছিলেন বা আছেন, তাঁদের অনেকের মধ্যে গণ্য চীনের কনফুশিয়াসের কথা আজ মনে এলো।

একজন য়ুরোপীয় লেখক বলেছেন যে, সিদ্ধার্থকে আমরা রোমান্টিক সন্ন্যাসবাদের মূর্ত বিগ্রহ বলে মানি,—জানি জোরোয়াস্টার ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংলাপে সমর্থ,—এইরকম আরো কেউ কেউ; কিন্তু কন্‌-ফুশিয়াসের ধ্যান-ধারণার প্রকৃতিই অন্য রকম। তাঁর ধর্মশিক্ষা বা তাঁর আদর্শ বলতে যা বোঝায়, তাতে কোথাও ঈশ্বরের নাম নেই। তিনি ইহবাদী, ইহনিষ্ঠ মানুষ। তিনি অমরত্বের কথা তুলতে নারাজ ছিলেন। তাঁকে একদা জিগেস করা হয়েছিল—'অমর্ত্য সত্তা বলতে আপনি কি বোঝেন?'

জবাবে তিনি বলেন—'মানুষকেই যখন দুর্বোধ্য মনে হয়, তখন ভূত, প্রেত, আত্মার কথা না তোলাই ভালো।'

'অলৌকিক' আর 'আধ্যাত্মিক' শব্দ দুটি আমাদের চেতনায় কেমন যেন একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে, জট পাকিয়েছে দুটিতে। অথচ, আধ্যাত্মিক মানুষকে কেন যে অলৌকিকে অভিজ্ঞ হতেই হবে, সে-কথা হয়তো আমরা ঠিক বুঝে দেখতে চাই না।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে বেরিয়ে সাহিত্যিকের ভাবনা অনুসরণ করে মানুষের এই সব সমস্যার কথা ভাবতেই হয়। এ সব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা যায় না। সময়, প্রসার, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি নানা চিন্তা দেখা দেয়। সৌন্দর্যতত্ত্ব আর দর্শন, এরা তো পরস্পরকে বাতিল করে না, বরং পরস্পরের মুখাপেক্ষী এরা।

মনে পড়ছে ক্রোচের কথা। তাঁর দৃষ্টি ছিল দর্শন আর নন্দনতত্ত্ব মিলিয়ে।

কোন্ দর্শকেরই বা সে-রকম নয়? কোন্ দ্রষ্টা নিজের চোখকে বাতিল করতে রাজী?

শোনা যায়, কেউ কেউ বলেন যে, আমরা নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবল বোধহয় চোখ চেয়ে আছি, আর জগৎ এই আমাদের চোখে-চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে।

কিন্তু তাই কি? আমরা কি নিষ্ক্রিয়?

প্রত্যক্ষ করবার কাজও কাজ। তাতে আমাদের প্রত্যেকের সক্রিয়তা আছে। এই গ্রহণ করা, স্বীকার করা,—নিজের মধ্যে আসতে দেওয়াও তো আধ্যাত্মিক কাজ। কেউ কেউ বলেন, জগৎ আমার ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ধাক্কা দিয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু তাই কি? আমিই কি গ্রহণ করছি না?

এই আত্মানুভূতি আর আত্ম-জ্ঞানই তো স্বজ্ঞা। বোধহয়, এরই নাম 'ইনটুইশন'। একেই বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ। আমি সজ্ঞানে জগৎকে আমার মধ্যে আমন্ত্রণ করছি কিন্তু তদধিক কিছু না,—আমি modify

জুড়ছি না। , এইটুকুর নাম প্রত্যক্ষীকরণ।

এই প্রত্যক্ষতাগুণেই সাধারণ মানুষের তুলনায় যথার্থ সাহিত্যিকের দৃষ্টি অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে বাধা নেই।

স্রষ্টা যিনি, তিনিই সত্যিকার রসজ্ঞ। ধরা যাক্, বিশেষ কোনো একটি বস্তু একদিকে,—এবং দর্পণে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব অন্যদিকে। কবি দেখছেন বস্তু, পাঠক দেখছেন বিম্ব। কবি দেখছেন আকাশের চাঁদ; পাঠক দেখছেন চাঁদের ছায়া। স্রষ্টা রসকে পেয়ে থাকেন রসের স্বরূপে। রসের মধ্যে রামধনু দেখছেন এক পক্ষ; অন্য পক্ষ দেখছেন রামধনুর মধ্যে রস।

সময়-চেতনার প্রসঙ্গ থেকে, আজ আমাদের অতীত থেকে বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়ে এই সব কথা মনে এলো। সময়ের গভীরে প্রবেশ করতে হলে রসিকের সাহায্য চাই। 'আধ্যাত্মিকতা' বললেই আমরা অলৌকিকের ছায়াজগতের জন্যে হন্যে হই।

যাক এ-সব কথা। কন্‌ফুশিয়াস বলতেন—নবীনের দল তাঁদের নিজের নিজের ঘরে ঘরে স্নেহ-মমতার সত্যকে সত্য হতে দিন,—তাঁরা সত্যবাদী হোন,—মানুষের সমাজে তাঁরা সত্যিকার শুভেচ্ছা ছড়াতে সাহায্য করুন। এই প্রধান কাজটা সম্পন্ন হতে দিয়েও যদি বাড়তি আরো কিছু শক্তি বা উদ্যম হাতে থাকে, তাহলে সাহিত্য বা শিল্পের চর্চায় তা প্রয়োগ করা যাক্।

তিনি বলতেন—যে-ছেলে বাপের ইচ্ছে বা আদর্শ পর পর তিন বছর লক্ষ্য করে, অনুসরণ করেও তা থেকে বিচ্যুত হয়নি, তাকেই বলা যাবে কর্তব্যপরায়ণ সন্তান।

বলেছেন—খেতে বসে ভরপেট খাবার জন্যে যে মেতে ওঠে না,—বাড়িতে বাস করতে পেয়ে বাড়ির আরামের জন্যে আকুলিবিকুলি জাগে না যার,—কাজে যার আলস্য নেই,—কথায় যার অসতর্কতা নেই,—বড়ো আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দিকে যার নজর,—এবং এইভাবে সদাচারের দিকে যার গতি, একমাত্র তাকেই বলা যাবে নিষ্ঠাবান ছাত্র।

জানি এ-সব সুবচন সর্বত্র ঠিক সাহিত্য হয়ে ওঠেনি। কন্‌ফুশিয়াস সজ্ঞানে সাহিত্য-রচনায় বসেন নি। প্রশ্ন জাগে—কন্‌ফুশিয়াসের এ-সব আদর্শ কি আজকের মাটিতে পড়লে বাঁচবে? মাটি বদলে গেছে। মাটি তো সময়ে বাঁধা। সময় যে দুর্বোধ্য রহস্য।

কন্‌ফুশিয়াস বলতেন—যে-কাজ কল্যাণকর বলে মনে হয়, সেটা না করে ফেলে রাখার নাম নৈতিক ভীরুতা।

'বনফুলের' 'আধ্যাত্মিক খুড়ো' তারই উদাহরণ। জগৎকে মায়াময় বলেও সুদ আদায় করবার তাগাদায় বেরুতে, এমন কি আদালতে যেতেও তাঁর দ্বিধা ছিল না।

উঁচু-নিচু দু'রকম মানুষের স্বভাব-ভেদ দেখিয়ে গেছেন কন্‌ফুশিয়াস। তিনি বলতেন—সত্যিকার উঁচু প্রকৃতির লোক যারা তাদের কাছে কাজ করা সোজা, কিন্তু তাদের খুশি করা শক্ত। অন্যায় পথে তাদের খুশি করবার চেষ্টা করে দেখো, কোনো সুফল ফলবে না। এরা যখন অন্যকে খাটিয়ে নেয়, তখন অন্যের সামর্থ্য অনুসারেই কাজ আদায় করতে জানে। কিন্তু নিরেশ মানুষ যারা, অন্যায় পথে তাদের খুশি করবার চেষ্টা মোটেই বিফলে যাবে না। এই ধরনের লোকেরা যখন অন্যদের কাজে লাগায়, তখন আশা করে যে, সব কিছু করবার জন্যেই সেইসব অধীনস্থ লোক সর্বদা তৈরি থাকবে।

আজ, এই নিচু মানুষদের জগতে এসে পৌঁছেছি আমরা। এ-কথা আমার কলমে মানাচ্ছে না, ঠিকই। আমি সম্পাদক নই, নেতা নই, সমাজ-কর্তাও নই। আমি একজন পাঠকমাত্র। আমার কথায় উঁচু-নিচু কোনো পক্ষই ক্রুদ্ধ হবেন না, এই কামনা জানাতে গিয়ে হঠাৎ মনে হোলো আমিই সেই 'আধ্যাত্মিক খুড়ো',—যিনি সত্যের জন্যে কোনো ঝুঁকি নিতে সম্মত নন।

নিজেকে নিজে টিটকিরি দেওয়া ছাড়া এরপরে আর গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস-রোমের মতন ব্যক্তি-বিবেক উদ্দীপিত করে তোলবার আদর্শ নিয়ে, সুখ-দুঃখ সমভাবে মেনে নেবার পথ দেখিয়ে, খৃষ্ট-জন্মের চারশ' সাতাশি বছর আগে, তিয়াত্তর বছর বয়সে প্রাচীন চীনের যে-ঋষির মৃত্যু হয়েছে, সেই ঋষি কন্‌ফুশিয়াসকে আমি মনে মনে প্রণাম জানালুম।

আমার সেই প্রণামই নিজের এই পতিত সত্তার সম্বন্ধে আমার সর্বোচ্চ টিটকিরি।

আমি জানি, সাহিত্যিক যাঁরা তাঁরাও কেউ কেউ বলবেন,—সমগ্র সত্যের দিকে চোখ রেখে চলতে গেলে পুরোনো কালের বাজার-দর ধরে থাকাটা কিছু নয়। আর, সাহিত্যে যে আমাদের স্বকালের প্রতিফলন দেখতে চাই, এ-কথা কি অস্বীকার করা চলে?

না, না, পুরোপুরি অস্বীকার করতে আমরা কেউই সমর্থ নই এবং তা কখনো বাঞ্ছিতও নয়।

এবং সাহিত্যেরও মরশুম আছে। আমি ওসব তর্ক-বিতর্ক নিয়ে নিজেকেও বিব্রত করতে চাই না, আমার সমব্যথী পাঠককেও না। তাই আমার প্রিয় লেখক 'বনফুলের' ব্যঙ্গ-কবিতা থেকেই এই ধরনের মরশুম,—আর সাহিত্যিকদের ক্ষমতা-অক্ষমতার কিছু বিবরণ উল্লেখ করি। 'বনফুল' লিখেছেন—

লেখার তাগাদা দিতে ভাই
তোমাদের কোন দ্বিধা নাই।

পোস্টকার্ড কিংবা খামে
নানাবিধ লেখকের নামে
মিস্টিক, কমিউনিস্টিক
রিয়াল বা আইডিয়ালিস্টিক
যে যেখানে আছে
সকলের কাছে
এক-একটি চিঠি ছাড়ো তাই।

পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক, পুস্তক-বিক্রেতা ইত্যাদি অন্য পক্ষের কাছে তিনি অতঃপর সাহিত্যিকের ক্ষমতা-অক্ষমতার কথাও বলেছেন,—মরশুমের কথাও তুলেছেন—

আমরা যে লেখা কোথা পাই
সে কথা ভাব না একবার
মনে হয়—ওই রে আবার—
আসিছেন দশভুজা আস্ফালিয়া
দশ-প্রহরণ
কী উপায়ে করা যায় শির-সংবরণ।

এই দুর্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত বাংলা দেশে বিবেকানন্দের 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না'—উক্তিটির প্রচণ্ড প্রতিবাদ হিসেবে 'আধ্যাত্মিক খুড়ো'রা যখন আধ্যাত্মিকতা এবং বিষয়কর্ম একই পরিহাসে জীর্ণ করে ফেলেছেন, তখন অসহায় সাহিত্যিক কতকটা তাঁদেরই মুখাপেক্ষী থেকেও বলতে বাধ্য হন—

তোমাদের তাগাদার চোটে উর্ধ্বশ্বাসে
গল-লগ্নী-কৃতবাসে
হাজির হইয়াছিনু কল্পনা-মন্দিরে
হতাশা-বিধ্বস্ত চিত্তে আসিয়াছি ফিরে
বন্ধ কপাট সেথা—দ্বারে খাড়া দ্বারী।

সত্যিই, এই অন্যমুখিতার ফলে, আজ কবিদের 'কল্পনা' কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেন না। দরজার প্রহরী বলেছে—

হয়েছে বিপদ।
কল্পনার শ্রীপদে শ্লীপদ,
লাম্বেগো কোমরে,
নাচিতে অক্ষম তিনি পাঠক-ওমরে---

কিন্তু সেটা অজুহাত মাত্র। লেখকের মন ক্ষব্ধ। কিছু ভালো লাগছে না তাঁর। 'কল্পনা' হয়তো নাচতে চান নটরাজ-নৃত্য। তিনি চান প্রলয়-নাচন। কিন্তু সৌখীন দর্শকদের আসরে সেটা কি সহনযোগ্য হবে? 'বনফুল' বলেছেন—

আমি জানি ওটা ভাণ।
যে তাণ্ডব-নৃত্য তিনি নাচিবারে চান
ঝটিকা ঝঞ্ঝনা-ছন্দে, সমুদ্র-মন্থন-
নাস্য ভরে
এ আসরে
সে নাচ নাচিতে মানা
শ্লীপদের করিয়া বাহানা
সরিয়া আছেন তাই বন্ধ করি দ্বার
এখন খ্যামটা নাচে রুচি নাই তাঁর।

কন্‌ফুশিয়াস বলেছিলেন,—যে-কাজ কল্যাণকর বলে মনে হয়, সেটা অসমাপ্ত রাখার নামই নৈতিক ভীরুতা। সে-নিরিখে আজকের সাহিত্যিক-মর্জির বিচার করলে বলতেই হবে যে পুরোপুরি না হলেও এটা সত্যিই আংশিক ভীরুতা। খ্যামটা নাচটা বাতিল হোলো বটে। সেইটুকুই খাঁটি। কিন্তু তাণ্ডবটা স্থগিত থাকবে কেন? শুধু সময়ের ভয়ে?

না, না,—আমাদের লেখকদের সততা সর্বত্রগামী নয় বটে, কিন্তু তাঁরা সর্বদাই কল্পনার শ্লীপদের বা লাম্বেগোর অজুহাত দিচ্ছেন যে, তাও নয়। এই সেদিনও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বেঁচেছিলেন। তিনিও সেরকম কোনো অজুহাত দেননি। অজুহাত দেখানোটা সৎ লেখকের স্বভাব নয়। তা যে নয়, তার প্রমাণ 'বনফুলের' আর একটি কবিতা—যেটির নাম 'তোমরা'। তাতে তাঁর সহজ স্বাধীন বেপরোয়া ভাবটা ফুটেছে—

তোমরা যারা ভাবছ মোদের
ডুবিয়ে দেবে উঠিয়ে দেবে
ঝরিয়ে কিংবা ফুটিয়ে দেবে
শোনো
হাঃ হা হা হা
সেলাম, সেলাম, সেলাম---

বলেছেন—

চাবুক-ধারী গুণ্ড
কিংবা দরদ-কুণ্ড
নাই কারুকে চিনতে বাকী
আদ্দি রেশম খদর খাকী
কোন্‌ দেবতার ধরনটা কি
আমরা বুঝি
দন্ত-হাসি কয় কী বাণী
ভুক্ত-ভোগী আমরা জানি
আমরা বুঝি
নিজের মাঝে শক্তি কেবল
আমরা খুঁজি---

বলেছেন যে, এই শক্তি-সঞ্চয়ই জীবনের আসল কথা। সেটাই সার কথা—

সার বুঝেছি ভাই রে
শক্তি যে নেই বাইরে।
নিজের জোরে উঠব মোরা
নিজের জোরে ছুটব মোরা,
নিজের জোরে ফুটব মোরা
ডরব নাকো,
দয়া কিংবা দাবড়ানিতে
আহ্লাদে বা ঘাবড়ানিতে
মরব নাকো—

এই মেজাজই স্বাধীন সাহিত্যের মেজাজ। কিন্তু 'বনফুলের' এ-সব কথা,—অন্তত তাঁর এই কবিতাটি কোনো সাহিত্য-ক্রয়-বিক্রয়ের বা সাহিত্য-রচয়িতার পক্ষ স্মরণ করে লেখা হয়নি। এখানকার এই 'তোমরা' সম্বোধনটি শাসন-সম্পর্কিত প্রবক্তাদের উদ্দেশ্যেই উদ্দিষ্ট। ভাবজগতের আধ্যাত্মিক শাসন বলতে যা বুঝিয়ে থাকে, সেটা পরিবেশের দোষে আজ সারা বিশ্বে বড়োই ব্যাহত হচ্ছে বলে অনেকের বিশ্বাস। 'বনফুল' সে-ইশারা দিয়েছেন ১৩৫৭তে। তাঁর সে-কবিতার নাম 'হাসি, ১৩৫৭'—

পূজার বাজারে চাও হাসির খোরাক?
তাহাই তো আছে দাদা বাকী সব ফাঁক
পরনেতে বস্ত্র নাই, পেটে নাই ভাত
তবু মুখে হাসি ফোটে বাহিরায় দাঁত
যে কাণ্ড ঘটিছে ভাই সারা বিশ্বময়
তা দেখে গম্ভীর থাকা সম্ভব কি হয়?

আজ, কনফুশিয়াস বেঁচে থাকলে বাংলা কবিতার, একালের এই বিশ্ববার্তা শুনে, এবং একালের এইসব সাহিত্যিকের স্বকালদর্শন দেখে মনে মনে খুশি হতেন বলেই আমার বিশ্বাস। একালের 'মর্মঘরে' এই কালই জলে উঠছে। বাংলার ঈশ্বর গুপ্ত আর ইংলণ্ডের পোপ, দুই দেশের দুই কবি যেন নিজেদের সময় থেকে বেরিয়ে, আমাদের সময়ে এসে পৌঁছেছেন। 'বনফুলের' এই কবিতায়—

হিমালয় তেয়াগিয়া মহাকাল ভুতু
পপুলারিটির লোভে দেন কাতুকুতু
গণেশের বগলেতে, তপস্যা ভুলিয়া
যুধিষ্ঠিরের নামে হয়েছে হুলিয়া।

মনে পড়ে পোপের Essay on Man, মনে পড়ে ঈশ্বর গুপ্তের মেজাজ; মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি উনিশ-শতকের বঙ্গসাহিত্যরথীদের দিব্যসামর্থ্য মনে পড়ে।

সেই উনিশ-শতকের বাংলার সাহিত্য-পথের পরিহাস-দর্শনের ব্যাখ্যা করতে গেলে সুকুমার রায়ের ইশারা মনে আসে। অজিত দত্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' বইখানিতে যেভাবে যে-অর্থে তা স্মরণ করেছেন, সে-অর্থে নয়। অজিতবাবু 'অপরিচ্ছন্নতা' অর্থে 'বিদঘুটে' শব্দের ব্যাখ্যা ভেবেছেন মনে মনে। অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্র দত্ত ইত্যাদি নাট্যকারের প্রহসনের দোষের কথা-সূত্রে তিনি গিরিশচন্দ্রের অক্ষমতার সঙ্গে সে-সব ত্রুটির যোগ অনুভব করেছেন।

আমি মোটেই সে-অর্থে সুকুমার রায়ের ঐ দু'ছত্র এখানে ব্যবহার করছি না। উনিশ শতকের বাংলা পরিহাস-সাহিত্যে সমগ্রভাবে আমাদের যে আত্মদর্শনের রূপটা ফুটেছিল, 'বনফুলে'র এই সব ছত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মনে হয় আমাদের সাহিত্য-সমাজে সর্বত্র না হোক্,—এখনো কোনো কোনো অঞ্চলে সে-সত্তার উত্তরাধিকার মুছে যায়নি। 'বনফুল' তো লিখতে পেরেছেন—

ছাত্র-শকটেরে টানে মাষ্টার ষাঁড়েরা
মন্ত্রিত্ব করিছে যত গোপাল ভাঁড়েরা।
হবু গবু লজ্জাভরে রজ্জু দিয়া গলে।
নাম লিখায়েছে না কি শহীদের দলে।

এবং 'হাসি, ১৩৫৭'র শেষ দু'ছত্রে এই স্বাধীন সাহিত্যিক লিখেছেন—

এ দেখেও হাসি যার না ফোটে বদনে
ঠোঁট তার ফাটিয়াছে,—হাসে মনে মনে।

এবং এই দু' লাইনে পৌঁছে,—দর্শন নয়, নন্দনতত্ত্ব নয়, ক্রোচে নয়,—আর কোনো কথাই নয়, আমার মনে পড়ে সুকুমার রায়ের সেই দু'ছত্র—যা তিনি কাতুকুতুবুড়োর কথা-প্রসঙ্গে লিখে গেছেন—

'বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি
কোন্ দেশী
শুনলে পরে হাসির চেয়ে
কান্না আসে বেশী।

ৎসচাঙ একবার কনফুশিয়াসকে জিগেস করেছিলেন—আচ্ছা, আদর্শ প্রশাসনের জন্যে কোন্ নীতি আপনার শ্রেষ্ঠ মনে হয়?

জবাবে তিনি বলেন—শাসকের পাঁচটি গুণ থাকা দরকার, আর চারটি দোষ তাঁকে ছাড়তে হবে।

—কী কী গুণ? কী কী দোষ?

—গুণ হোলো—দাক্ষিণ্য কিন্তু অমিতব্যয়িতা নয়; দ্বিতীয়ত, প্রজাদের বিভিন্ন দায়িত্বের ভার দিতে হবে কিন্তু সাবধান, বোঝা বেশি বলে অশান্তি যেন না জাগে; কামনা থাকা চাই, কিন্তু লোভী হলে চলবে না; মর্যাদা দরকার, কিন্তু মেজাজী হওয়া নিষেধ, প্রতাপগৌরব থাকবে, কিন্তু ভয়ঙ্কর হলে চলবে না।

—আর, দোষ হোলো—আগে ভাগে, হুঁশিয়ার না করে প্রথম অপরাধেই প্রাণদণ্ড দেওয়া; জনসাধারণকে শিক্ষায় বঞ্চিত রেখে দেশের কাছে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা দাবি করা; নিজে দরকারী কোনো-কিছু চাইতে গড়িমসি করে ঠিক সময়ে জবাব চাওয়া; আর, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে দৈন্য দেখানো। সাহিত্যের পথে সময়-রহস্য নিয়ে ভাবুকরা ভাববেন বইকি, কিন্তু দেশ-কালের গণ্ডিতে বাঁধা আমাদের আচারের আদর্শও ভেবে দেখা দরকার। মরশুমী সাহিত্যের মধ্যেই বা এই চিরকালের ভাবনা অপাংক্তেয় হবে কেন?

(ক্রমশঃ)

বিলুপ্ত

সমীর ঘোষ

অরণ্যে অনেক গান। নতুন পাতার কোলে রঙ
ফোটা ফুলেদের সুর, অনেক সূর্যের ঝরা স্রোত
চিলেদের পালকের দূরান্তের পাড়ির সারং
নদীর চলন্ত ঢেউয়ে। জীবনের আনকোরা রং
কাদের মুখের মতো। কাদের চোখের নীল আলো
জোনাকের আলো হোয়ে তারাদের সঙ্গে ওতপ্রোত
অবিমিশ্ররূপে বুঝি আকাশের প্রান্তরে মিলালো—
সে আকাশে তুমি বুঝি রূপসীর মায়াদীপ জ্বালো।
এখানে নেইকো সুর। বিপুলের ঝঙ্কৃত গমক।
বেদনার পুঞ্জীভূত স্রোত শুধু শিরায় শিরায়।
সেখানেতে রক্ত নেই। পলাশের সুতীক্ষ্ণ চমক
কাঁদে নাকো হেনাদের ছোট অশ্রু ছড়ায়ে রূপক।
তবু সূর্য, তবু চাঁদ বসন্তের দুরন্ত পালক
নদীর জলের স্রোত চিল কিম্বা ঈগলের গায়।

রাজধানী :

নয়াদিল্লী এখন জমজমাট। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আলোচনা সভা—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দু'দিনব্যাপী অধিবেশন সুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এখন রাজধানীতে। বেসরকারী আলোচনার জন্য অধিবেশন আহূত হলেও বর্তমান খাদ্যসঙ্কট সমাধানের জন্য একটি বাস্তববাদী পরিকল্পনা রচনাই এই অধিবেশনের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মহাপ্রয়াণের পর এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা। মহাত্মা গান্ধীর তিরোভাবের পর কংগ্রেস বলতে জওহরলালকেই বোঝাতো। তিনি ছিলেন দেশ ও কংগ্রেসের একচ্ছত্র কাণ্ডারী। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ছায়াতলেই সমাপ্ত হ'ত কংগ্রেসের সকল অধিবেশন। অধিবেশনের প্রারম্ভে দু'মিনিট নীরবে দণ্ডায়মান থেকে সদস্যগণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই অবিসম্বাদী নেতৃত্বের কথা স্মরণ করে জওহরলালের প্রতি নিবেদন করেছেন তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। পি টি চাকো, গোবিন্দম নায়ার প্রমুখ যে-সকল কংগ্রেস নেতা বিগত অধিবেশনের পর পরলোকগমন করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেও একটি ভিন্ন শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম দিনের অধিবেশনেই খাদ্য-সঙ্কট সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে। শ্রী এস এন মিশ্র এ বিষয়ে আলোচনা সকলের শেষে উত্থাপনের প্রস্তাব করলে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার তা' বাতিল করে দেন এবং বলেন যে, খাদ্য নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ হলে অধিবেশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে।

মজুতদার ও মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন এবং খাদ্যসঙ্কটের সুযোগ নিয়ে বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের সাহসিকতার

● দিল্লীর বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী

সাথে মোকাবিলার দাবী উঠেছে এ দিনের অধিবেশনে।

খাদ্যের ওপর প্রস্তাব উত্থাপন করে ডঃ রামসুভগ সিং কিষাণ সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সম্যক ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করেছেন।

একথা আমরাও বারবার বলেছি। সারা বছরের শ্রমে উৎপন্ন ফসলের ন্যায্যমূল্য না পেলে, নিজের জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ন্যায্য-মূল্যে তাদের হাতে তুলে দিতে না পারলে এবং চাষের উপযুক্ত সরঞ্জাম তাকে [illegible] না করলে ভাঙা লাঙ্গল ও হাড়্ডিসার বলদ নিয়ে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি কিষাণের পক্ষে সম্ভব নয়। দেরিতে হলেও নেতৃবৃন্দের নজর এদিকে পড়েছে, খুবই আনন্দের কথা।

● ডঃ রামসুভগ সিংহ

শুধু তাই নয়। ডঃ সিং আরেকটি খাঁটি সত্য কথা বলেছেন। এতদিন নেতারা শস্য মজুত করে রাখার অপরাধ সকল চাষীর ওপরই চাপাতে চেষ্টা করতেন। ফলে, ছোট চাষীর বীজধান নিয়ে টানাটানির অভিযোগও আমরা পেয়েছি। ডঃ সিং বলেছেন, মজুতদারেরা ভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। তাদের বাছাই করে আলাদাভাবে শায়েস্তা করা উচিত হবে। ভারতের কিষাণ বলতে যাদের বোঝায় তাদের শস্য ঘরে মজুত করে রাখবার সামর্থ্য কোথায়? এ কারবার করেন যাঁরা তাঁরা বড় বড় জোতদার—ব্যাঙ্কে জমা রয়েছে তাঁদের মোটা অঙ্কের টাকা।

কংগ্রেস এদের সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুক না কেন, সক্রিয় ব্যবস্থা এবং সে ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করতে সাধারণ মানুষকে সাথে না টানতে পারলে বিরাট কোন সাফল্য লাভের সম্ভাবনার আশা নেই।

খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসা পরিচালনার বিরূপ সমালোচনাও হয়েছে। আবার কোন কোন সদস্য পাশাপাশি খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির ব্যবস্থা বজায় রাখার উমেদারীও করেছেন।

খোলাবাজার পাশাপাশি চালু থাকলে পশ্চিম বাংলার খাদ্যশস্যের মূল্য বেঁধে দেওয়ার পর যে পরিস্থিতি হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি ভিন্ন সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এ বিষয়ে আমরা আগেও আলোচনা করেছি। ভারতবর্ষের পাঠকদের কাছে আগছে সপ্তাহে পুনরায় আমাদের মতামত পেশের আশা রইল। সম্পাদিকার তাগিদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির শেষ দিনের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের ওপর জোর দিয়েছেন শ্রী এন ভি গ্যাডগিল। তিনি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেছেন, প্রস্তাবে যে সব কথা রয়েছে তা দৃঢ়তার সাথে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারলে এক সপ্তাহের মধ্যেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।

এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন মতভেদ থাকতে পারে না। কংগ্রেসের অধিবেশনে এ পর্যন্ত যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে ভাল কথা কম সন্নিবেশিত হয় নি। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ খুব কমই হয়েছে। সেগুলো নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালিত হলে দেশের চেহারা এতদিনে যেতো একেবারে পাল্টে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিমূল হতো দৃঢ়। ঘরে ঘরে আজ অন্নের হাহাকার উঠতো না—কালোবাজার, মুনাফাশিকারী ও মজুত-দারদের চাপে মানুষের জীবনযাত্রাও এত দুর্বিষহ হয়ে উঠতো না।

উদ্বোধনী ভাষণে কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। শ্রীকামরাজ ও শ্রীলালবাহাদুরের যৌথ নেতৃত্বে কথা ও কাজের গরমিল হবে না বলেই আমরা আশা করি।

তিনমাস হতে চলেছে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রথম দিকে মন্ত্রিসভা গঠনে সামান্য বিলম্ব দেখে অনেকে একটু সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর অসুস্থতার সময় দেশে ও বিদেশে উঠেছিল নানা ধরণের গুজব। আজ প্রমাণিত হচ্ছে এ সব গুজব কত অমূলক।

একদিন আমরা তরুণ কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরুর কাছে শুনে-ছিলাম, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে দেশের পররাষ্ট্র-নীতির সাফল্য। কেবল পররাষ্ট্র-নীতি নয়, সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও এ নীতি অপরিহার্য। প্রতিবেশীর সঙ্গে হৃদ্যতার অভাব হলে শান্তিতে বসবাস অসম্ভব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার শ্রীশরণ সিংয়ের ওপর অর্পণ করে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সর্দারজী নেপাল সফর শেষ করে আফগানিস্তানে গিয়েছেন। এর পর সিংহল যাত্রার কথাও উঠেছে।

নেপালের সঙ্গে ভারতের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কৈরালা মন্ত্রিসভার পতনের পর চীনের কূটচক্রান্তে নেপাল ও ভারতের সম্পর্কে ফাটল ধরবার উপক্রম হয়েছিল। শ্রীশাস্ত্রীই (তখন তিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নেপালের ভ্রান্তি দূর করেছিলেন। শ্রীশরণ সিং ও নেপালের রাজা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে মতামত বিনিময়ের পর যে ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে, ভারত ও নেপালের মূলগত ঐক্যের কথাটার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হিমালয়ের কোলের এই ক্ষুদ্র রাজ্যটির সামগ্রিক কল্যাণে ভারতের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

একথা আজ স্বীকার করতেই হবে শ্রীশাস্ত্রী অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের পর শক্ত হাতেই হাল ধরেছেন। সরকারের খরচ হ্রাস এমন কি,

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিস্তা কাঠমাণ্ডু বিমান ঘাঁটিতে শ্রীশরণ সিংকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন।

প্রয়োজন হলে বৃহদাকার শিল্পের পরিকল্পনা রূপায়ণ স্থগিত রাখার যে সকল প্রস্তাব তিনি করেছেন, তার সঙ্গে কোন মহলের মতের মিল যদি নাও হয়, তবু স্বীকার করতেই হবে, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের জন্য এ নীতি প্রবর্তন অপরিহার্য। বোম্বাই শহরের অভিনেত্রীদের স্নানাগার ও লকার থেকে যে পরিমাণ কালো-টাকা বেরিয়ে আসছে, তা' বাজারে ছড়ানো কালোটাকার ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। এই কালোটাকার সঠিক হদিস না হলে কোন ব্যবস্থাই টিকবে না। মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ বানচাল হয়ে যাবে কালোটাকার কবলে পড়ে।

দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ়-ভিত্তিক করার জন্য শ্রীচ্যবন সদল-বলে রাশিয়া গিয়েছেন। মিগ বিমান ছাড়াও ভারতীয় নৌবহরকে শক্তি-শালী করার এবং প্রতিরক্ষার অন্যান্য সরঞ্জাম সম্পর্কে তিনি সেখানে আলোচনা চালাবেন। ভারতের এক সময়ের অকৃত্রিম বন্ধু যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য পাকিস্তানের অপপ্রচারের থেকে ভারতকে মৌখিক সহানুভূতি দেখালেও সাহায্যের ব্যাপারে আগের মত আগ্রহশীল নন। এ পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য রাশিয়ার সম্ভাব্য সাহায্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ় মনোবলের পরিচয়ই দিয়েছেন।

* * *

আসছে সোমবার পার্লামেণ্টের অধিবেশন সুরু হচ্ছে। তার প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে এখন থেকেই। বিরোধী দলগুলো খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য তৈরি হচ্ছেন। সদাচার সমিতির প্রশ্নটি এবং কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রশ্নও হয়তো উঠবে। দিল্লীর রাজনৈতিক পণ্ডিতদের ধারণা, প্রধান-মন্ত্রী সেক্ষেত্রে দৃঢ় মনের পরিচয়ই দেবেন।

* * *

আসছে শনিবার ৫ই আগস্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের পুণ্য জন্মদিবস। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক ও আদর্শ শিক্ষক রাষ্ট্রপতির জন্মদিবস সম্যক মর্যাদার সঙ্গে পালনের জন্য গেল দু' বছরের মত এই দিনটি শিক্ষক-দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

* * *

প্রবল বৃষ্টিপাত এবং যমুনা নদীতে ও নজাফগড় হ্রদে ভীষণ প্লাবনের ফলে দিল্লীর ১৫০টি গ্রাম দু' ফুট থেকে সাড়ে চার ফুট জলমগ্ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে প্রায় দু' লক্ষ লোক বাস করে। বন্যার ফলে ষাট হাজার একরের ওপর জমি জলপ্লাবিত হয়েছে এবং প্রায় দশ হাজার একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

গত ২৭শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনে এসেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণের পর শাস্ত্রীজী এই প্রথম দিল্লীর গ্রামাঞ্চলে আসেন এবং বন্যাপীড়িত গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকারে সম্ভাব্য সকল জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

● রাশিয়াযাত্রার প্রাক্কালে পালাম বিমান বন্দরে শ্রীচ্যবন

আসাম ঃ

খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়ের ভেতর দিয়ে এখনও উদ্বাস্তু আসছে দলে দলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। গড়ে প্রতিদিন দু'শ' থেকে আড়াই শ' পরিবার এসে আশ্রয় নিচ্ছে বিভিন্ন শিবিরে। একই কাহিনী তাদের মুখে—ব্যাপক নরহত্যা বন্ধ হলেও অত্যাচার, উৎপীড়ন চলেছে হিন্দুদের ওপর পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠীর সহায়তায়। দুর্জনের দেশে নিরাপদে বাস করতে না পেরে নতুন করে শান্তির নীড় বাঁধবার দুর্নিবার আশা নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর আসামে প্রবেশ করেও কিন্তু এরা কোন আশার আলোই দেখতে পাচ্ছে না। খাসি পাহাড়ের সাময়িক আশ্রয়শালার স্থানাভাব। সেখানে ঠেলাঠেলি করে কয়েকদিন মাথা গুঁজে থাকবার পর এদের যেতে হচ্ছে যেখানে, সেখানেও ভিড় জমে গিয়েছে আগেই। সম্প্রতি গৌহাটিতে পাঠানো হয়েছিল একটি বিরাট দলকে। সেখানে ঠাঁই না পেয়ে ফিরে আসতে হয় তাদের। কিছুদিন জেলা-আদালতের বারান্দা হয়েছিল তাদের একমাত্র আশ্রয়। অব্যবস্থার জন্য এমনি হয়রানি হামেশাই ভোগ করতে হচ্ছে উদ্বাস্তুদের।

এখানেই শেষ নয়। আসাম থেকে বিদায়ী মুসলমানদের সঙ্গে সম্পত্তি-বিনিময় করে এসেছে যারা তারাও জমির দখল পাচ্ছে না। আসামে অনুপ্রবেশ-কারী মুসলমানদের পরিত্যক্ত জমি-জায়গা স্থানীয় বাসিন্দারা আগেই দখল করে বসে আছে। দখল ছাড়তে আর চাইছে না। রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করেও কোন ফল হচ্ছে না। সরকার জমি-বিনিময়ের আইনগত ফ্যাকড়া তুলেছেন।

আইনের দোহাই সরকার দিলেও মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া ভিটে ও জমি খেয়াল-খুশিমত যে-কোন লোক জবরদখল করতে নিশ্চয়ই পারে না। জমির মালিক হবেন সরকার। এ সব যুক্তির কোন সদুত্তর সরকারের কাছ থেকে আসছে না। জমি-বিনিময় করে এসেছে কম হলেও তিন হাজার পরিবার। রাজ্য সরকার সচেষ্ট হলেই এদের পুনর্বাসন অতি সহজে হতে পারতো।

আসাম আজ তার পূর্ব প্রতিশ্রুতিও

● শ্রী ডি কে বড়ুয়া

ভুলতে বসেছে। পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক হিন্দু-হত্যা সুরু হলে আসামের একদল নেতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বে-আইনীভাবে যে-সব পাকিস্তানী মুসলমান এসে আসামে আস্তানা নিয়েছে তাদের জমিতেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হতে পারবে—কোন উদ্বাস্তুকেই বাইরে যেতে হবে না। আসাম সরকার এর প্রতিবাদ করেন নি। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ বলেই ধরা হয়ে থাকে।

আজও সরকার নীরব। এ নীরবতা অর্থহীন নয়। যে-কারণে দেশ বিভাগের সময় শ্রীহট্টকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, যে-কারণে সুরু হয়েছিল আসামে 'বাঙাল খেদাও' হিংস্র, বর্বর আন্দোলন ঠিক সেই কারণেই অধিকসংখ্যক বাঙালী পরিবার আসাম গ্রহণ করতে পারছেন না। আসামের ভাষা-আইনও অন্যতম অন্তরায়। অহমিয়াভাষীরা সেখানে মাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ। আসাম তাই এক হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পরিবার গ্রহণ করতে অসম্মত। পাঁচ শ' পরিবারকে অবিশ্যি নেফা এলাকায় পুনর্বাসনের কথাও আছে। এই দেড় হাজারের অধিক পরিবারকে আসামের বাইরে পাঠাবার জন্য জোর চাপ দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রের ওপর।

এই দেড় হাজার পরিবারও উপরোধে 'ঢেঁকি গেলার' মতই আসাম রাখতে রাজী হয়েছে। সর্বভারতীয় নীতির সঙ্গে তা' না হলে তাল রেখে চলা যায় না। আসাম উদ্বাস্তু সমাগম দেখে আর্থিক সঙ্গতির এবং বন্যায় গৃহহারাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটি বড় করে তুলে ধরবার চেষ্টাও করছে। আসামে জমির অভাব নেই। দেড় বিঘা করে প্রতি পরিবারকে জমি রাখবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাও সর্বত্র কড়াকড়িভাবে রক্ষিত হচ্ছে না।

* * *

আসামের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ডি কে বড়ুয়া মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। পরীক্ষার পাশের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য 'গ্রেস মার্ক' দেওয়া নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত আসামের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ইতিমধ্যেই নিয়েছেন। ঠিক শতকরা ৩০ ভাগের কম ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে বিদ্যালয়ে অকৃতকার্য হবে তার অনুমোদন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ বাতিল করে দিতে পারবেন। বাৎসরিক প্রমোশনও যে বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীর শতকরা ৭০ ভাগের কম হবে, তাদের সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হবে।

সরকার আশা করেন, এই দু'মুখো সাঁড়াশী আক্রমণে কাজ হবে অনেক-খানি—বিদ্যালয়গুলো একটু সচেতন হবে এবং শিক্ষার মান উন্নত হবে তাতে।

এরপর থেকে মেয়েদের পক্ষে গণিত হবে অবশ্যপাঠ্য। গণিতের পাঠ্যতালিকা সামান্য হ্রাস করা হবে।

খাদ্য সম্পর্কে আসাম সরকার বরাবর এক কথাই বলে এসেছেন—খাদ্য পরিস্থিতি ভাল—সন্তোষজনক। খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আসামে এবার দু' লক্ষ নয় হাজার মণ অধিক ধান ফলেছে। সরকারী তথ্য ও পরিসংখ্যানের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছে না দেশের মানুষ। খাদ্যশস্যের চরম সঙ্কট দেখা দিয়েছে আসামের সর্বত্র।

সরকারের মুখপাত্রদের ভাষ্যের চুলচেরা বিচার করলেও দেখতে পাওয়া যাবে একজনের সঙ্গে আরেকজনের কথার গরমিল নেহাৎ কম নয়। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা আসামে খাদ্যশস্যের 'অতিরিক্ত মজুত ভাণ্ডার' সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রের কাছে ১৫ লক্ষ টন চাল চেয়ে পাঠিয়েছেন। যে রাজ্যে অতিরিক্ত ফসল ফলেছে তার উচিত ঘাটতি রাজ্যগুলোকে সাহায্য করা। সে কেন অতিরিক্ত শস্যের জন্য হাত পাতবে কেন্দ্রের কাছে। এর উত্তর কে দেবে?

এদিকে মানুষের ঘরে চাল বাড়ন্ত। সরকারের বাঁধা দামে ন্যায্যমূল্যের দোকান ভিন্ন কোথায়ও চাল পাওয়ার উপায় নেই। ন্যায্যমূল্যের দোকানেও চাল সব সময় মেলে না। কালো-বাজার হয়েছে মানুষের একমাত্র সম্বল। সরকার এখানেও নীরব দর্শক—যেন তার কিছুই করণীয় নেই। চালের দামের সঙ্গে সঙ্গে মাছ, শাকসব্জী ডাল, তেল ও অন্যান্য খাদ্যের দামও গিয়েছে বেড়ে। গেল মাসে সরষের তেল ছিল প্রতি লিটার পৌনে চার টাকা। এখন বিক্রি হচ্ছে পাঁচটাকা করে। পাঁচটাকা কে-জি-র কম খুব কম মাছই বাজারে পাওয়া যায়। ডালের দাম বেড়েছে এ মাসে কে-জি প্রতি ২৫ পয়সা।

এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে আসামে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক বিক্ষোভের। রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র গৌহাটী শহর পরিণত হয়েছে বিক্ষোভ মিছিলের শহরে। গণ-বিক্ষোভের পর পুলিশ কিছু কিছু দোকানে ও গুদামে হানা দিয়ে চাল ও তেলের সন্ধানও পেয়েছে। এই গোপন মাল কিন্তু পুলিশ এখনও বাজেয়াপ্ত করে মালিকের কাছ থেকে নিয়ে আটক করে নি। এতে উত্তেজনাটা বেড়েছে আরও বেশি। বিরোধী দলগুলো এই সুযোগে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তোড়জোড় চালাচ্ছে।

পাঞ্জাব:

সদাচার সমিতি নিয়ে দিল্লীর জল গাবিয়ে ওঠার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষেণ পড়েছেন বড় বিপদে। শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রোঁর বিদায়ের পর অপ্রত্যাশিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর আসন পেয়ে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জবরদস্ত জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শ্রীনন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেন্দ্রের ধাঁচে তিনি গঠন করবেন সদাচার সমিতি এবং ভ্রষ্টাচারীদের উচ্ছেদই হবে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রধান কাজ।

এখন শোনা যাচ্ছে তিনি মত পাল্টাতে সুরু করেছেন। সদাচার সমিতির পত্তন পাঞ্জাবে করা যুক্তিযুক্ত

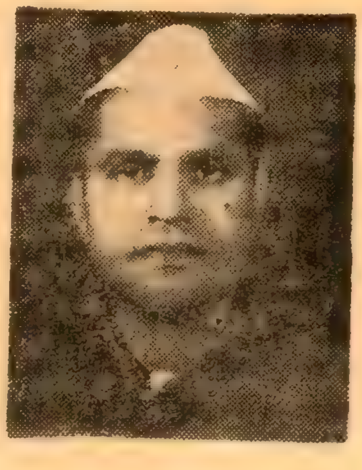

● শ্রীরামকিষেণ

হবে কি না, সে নিয়ে নাকি মাথা ঘামাচ্ছেন। কায়রোঁর আমলের তদারকী সংস্থাই দুর্নীতি প্রতিরোধের পক্ষে যথেষ্ট বলে এখন তিনি মনে করছেন।

গেল কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক হাওয়ার পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কায়রোঁ-বিরোধীদের মধ্যে রীতিমত ভাঙন

● সর্দার দরবারা সিং

সুরু হয়েছে। অবস্থা দেখে রামকিষেণও একটু থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁর এই পরিবর্তনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে মন্ত্রিসভার মধ্যে।

অধিক ফসল ফলাবার জন্য চাষীদের উৎসাহিত করার, প্রয়োজন-মত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার যে প্রস্তাব তুলেছিলেন স্বরাষ্ট্র ও উন্নয়ন-মন্ত্রী সর্দার দরবারা সিং তা নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে মতভেদের।

পাঁচ একরের উর্দ্ধে যাদের জমি নেই তাদের রাজস্ব মকুবের প্রস্তাব এনেছিলেন সর্দার দরবারা সিং। এতে তের লক্ষ চাষী পরিবারের দীর্ঘদিনের অভিযোগের একটা সুরাহা হতে পারতো। এতে নতুন মন্ত্রিসভা দরিদ্র-সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হতো। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার রাজস্বের ঘাটতি পূরণ বিত্তবানদের ওপর নতুন কর চাপিয়ে করা যেতো অতি সহজেই। রামকিষেণ বিষয়টি আবার বিবেচনার কথা ভাবছেন। তাঁর মতে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটা পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা না করে এত তাড়াতাড়ি প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব নয়।

একেই বলে গদি ও পদের মহিমা। দায়িত্ব পাওয়ার আগে যে-যতই হুঙ্কার দিন না কেন, দায়িত্বভার একবার কাঁধে চাপলে একটু সমঝে চলাই উচিত। তা' ছাড়া, গদীর লালচটাও কম নয়। একথা একদিন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, একজন মুখ্যমন্ত্রীকে। শ্রীরামকিষেণও 'গদীর লালচ মে গির গিয়া'। এ অভিযোগ উঠেছে তাঁর অনুগামীদের মধ্য থেকেই।

বিহার ঃ

রামগড়ের রাজা শ্রী কে এন সিংকে বাদ দিয়ে নতুন করে বিহারের স্বতন্ত্র পার্টির শাখা গঠনের উদ্যোগ-পর্ব চলেছে।

বিহারের স্বতন্ত্র দল ভেঙে দেওয়ার পরের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য এখানে এসেছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কর্তাব্যক্তিদের প্রতিনিধি শ্রীরাজু। তিনি দু'দিন ধরে আলোচনা করেছেন, শ্রীরামবিনোদ সিং, সর্দার হরিহর সিং এবং শ্রীজলেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে। রাজাবাহাদুরের বিরোধীরা নতুন করে দল গঠনের দায়িত্ব নিতে রাজীও হয়েছেন।

স্বতন্ত্র দলের কেন্দ্রীয় সংস্থা রাজাবাহাদুরের সকল আপত্তিই ইতিমধ্যে নাকচ করে দিয়েছে। রাজাবাহাদুরের বিরোধী স্বতন্ত্র নেতারা মনে করেন, তাঁকে বাদ দিয়ে নতুন দল গঠন করা হলেই বিহারের স্বতন্ত্র দলের কর্মী ও আইন সভার সদস্যগণ কংগ্রেসে যোগদান করবেন না। গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েই তাঁরা স্বতন্ত্র দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের গ্রহণের ব্যাপারে বিহার কংগ্রেসের মতবিরোধও কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

রামগড়ের রাজা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তিনি অধুনালুপ্ত রামগড় জনতা দলের পুনঃপ্রতিষ্ঠার তোড়জোড় চালাচ্ছেন। এই জনতা দলকে নিয়েই বিহারের স্বতন্ত্র দলের ইউনিট গড়ে উঠেছিল—এরাই ছিল স্বতন্ত্রের প্রধান সম্বল ও শক্তি। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এদের একটি সম্মেলনে রাজাবাহাদুরের ওপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বিহারের স্বতন্ত্রদলপন্থীদের খেলাটা জমে উঠেছে বেশ ভালভাবেই। রাজাবাহাদুরকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র দলকে চাঙ্গা করে তোলা খুব সহজ হবে মনে হচ্ছে না। অবিশ্যি এই মুহূর্তে কিছু সঠিকভাবে বলাও শক্ত।

উত্তর প্রদেশ ঃ

প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তর প্রদেশে খাদ্যসঙ্কট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এর ওপর গ্রামাঞ্চলের অনেক এলাকাতেই খাদ্যশস্যের দোকান নিয়ে চলেছে শক্তিধরদের শক্তি পরীক্ষা। ফলে দোকানের অস্তিত্ব পাচ্ছে লোপ। মানুষ পড়েছে চরম দুর্গতির মধ্যে।

সরকার এ ব্যাপারে কতকটা উদাসীন। সরকারী আমলারা খাদ্য নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সত্যাগ্রহ এড়াবার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করেছেন। শহরাঞ্চলের মানুষের সন্তোষের দিকেই নজরটা তাঁদের বেশি। গ্রাম হচ্ছে তাতে উপেক্ষিত।

খাদ্যশস্য নিয়ে শক্তির খেলার জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য দিচ্ছে বালিয়ার আশে-পাশের গ্রামগুলো। বালিয়া শহরের সংলগ্ন—রেলের লাইনের পরই বাহেরী গ্রাম। দু'মাসের অধিক এখানে কোন ন্যায্যমূল্যের খাদ্য-শস্যের দোকান নেই। দু'মাস আগে চোরাই কারবার চালাবার অভিযোগে দোকান তুলে দেওয়া হয়। পরে আরেকটি দোকান খুলেছিল। ক'দিন পরেই তারও ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যায়। এখন কোন দোকানের বালাই নেই।

এ গ্রামের মানুষ বন্যাপীড়িত। চাষের জমিও এখানে খুবই কম, এরা উপার্জন করে শহরে গিয়ে। পঞ্চায়েত প্রধান গণ-স্বাক্ষর নিয়ে তিন-তিনটি আবেদনপত্র পেশ করেছেন দোকান খোলার জন্য। তহশিলদার রেশন কার্ড দেবার আদেশও জারী করেছেন। জেলার কর্তারা একেবারে নীরব। উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না জেলা-শাসক। তাঁর পক্ষে এ অঞ্চলের প্রবল প্রতাপান্বিত কংগ্রেস এম এল এ-র বিরুদ্ধাচরণ সহজ নয়। এই ব্যক্তিটি ধরেছেন পুরোনো দোকান-দারকেই আবার দোকান খোলবার অনুমতি দিতে হবে।

বাহেরী গ্রামের খাদ্যশস্যের দোকানের ওপর নির্ভর করে ছিল সমগ্র মালদেপুর ন্যায় পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। পাশেই হরিজনদের পল্লী, আয় তাদের অত্যন্ত কম। ঘাস কেটে, খড়ের ঝুড়ি বানিয়ে দিনে একটাকার মত তাদের আয়। দিন তাদের এমনিতে চলতে চায় না। ন্যায্যমূল্যে খাদ্য-শস্য পেলে এবারে কষ্টের লাঘব নিশ্চয়ই খানিকটা হত।

স্থানাভাবে আমরা একটি গ্রামের দুর্গতির চিত্রটি তুলে ধরছি। এ ঘটনা বিরল নয়। শহরও একেবারে বাদ যায় নি। রেওয়াতী উপনগরের ১৫ হাজার মানুষ খাদ্য বণ্টন (দোকানের মালিকানা) নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের চাপে পড়ে ধুঁকছে। ১২ই জুলাই থেকে তারা ন্যায্যমূল্যের খাদ্যশস্য পাচ্ছে না দোকানের অভাবে।

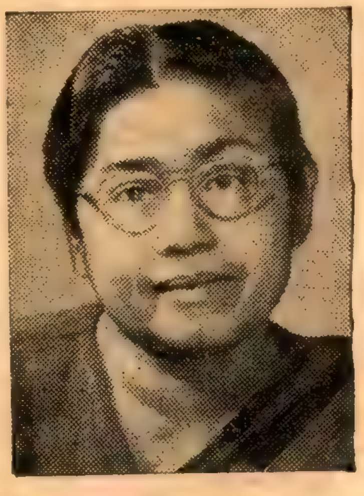

● শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীকে একজন দরদী সমাজ-সেবিকা হিসেবেই মানুষ জানে। বন্যাপীড়িত অঞ্চলের মানুষের ব্যাকুল আর্তনাদে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না। আমরা বালিয়া জেলার মানুষের দুরবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি সরকারী কর্মচারীদের অবিলম্বে খাদ্যশস্য বণ্টনে নিয়োগ করলে সমস্যার কিছুটা অন্তত সমাধান হবে।

রাজস্থান :

বিধানসভার অধিবেশন অপ্রত্যাশিত-ভাবে ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত মুলতুবী রাখায় সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা। কোন কোন মহলের ধারণা, সরকারী ভাষা বিল নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধই বিধানসভার মুলতুবী ঘোষণা করার কারণ।

বিধানসভার অধিবেশন শুরু হয়েছিল ৩রা আগস্ট। কর্মসূচী অনুযায়ী ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত অধিবেশন চালু থাকার কথা ছিল। ক'দিন আগে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা কমিটির সভাতেও বিধান-সভার অধিবেশন মুলতুবীর কোন কথাই আলোচিত হয় নি।

উপ-নির্বাচনের জন্য শ্রীদামোদরলাল ব্যাস এবং শ্রীকুম্ভরাম আর্যের নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ দানা বেঁধে উঠেছিল। বিক্ষুব্ধ দলটি ভাষা বিলের সুযোগ নিয়ে সেই ঝাল মেটাবার চেষ্টা করছেন।

উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলীর প্রভাবও এতে কিছুটা রয়েছে। এই অবস্থায় পড়ে নেতারা একটা মিটমাটের চেষ্টাতেই নাকি অধিবেশন মুলতুবী রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

কেউ কেউ আবার বলছেন, খাদ্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সত্যাগ্রহের ঝামেলা এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই বিধানসভা মুলতুবী রাখা হয়েছে।

সরকারের ঘোষণা এ বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট। দেশের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিনে যাতে অবস্থাটা ভাল করে সভার সদস্যরা জানতে পারেন, তার জন্যই বিধান-সভার অধিবেশন কিছুদিন স্থগিত রাখা হয়েছে বলে সরকারী ঘোষণায় বলা হয়েছে।

এ কাজ করে রাজস্থান সরকার শুভবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। সদস্য-গণ সঠিক অবস্থাটা জানতে পারলেই বিষয়টি নিয়ে বিধানসভায় খোলাখুলি আলোচনা সম্ভব হবে।

মধ্যপ্রদেশ :

আচার্য বিনোবা ভাবে ভূদান আন্দোলনের দায়িত্ব যৌথ নেতৃত্বের হাতে তুলে দিতে পারেন বলে,

● আচার্য বিনোবা ভাবে

বিশ্বস্ত মহল মনে করছেন। স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং বার্ধক্যের কথা চিন্তা করে তিনি পদযাত্রাও চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারেন।

দিল্লী ও বোম্বাই থেকে চিকিৎসকগণ এসে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর দীর্ঘ-দিন পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় পদযাত্রা আরম্ভ করলে তাঁর দেহ ভেঙে পড়বে বলে অভিমতও চিকিৎসকগণ ব্যক্ত করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বিনোবাজীকে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, আচার্য যৌথ নেতৃত্ব গঠনের বিষয়টি বিশেষ-ভাবে এখন বিবেচনা করছেন। সম্ভবত, তিনি আচার্য দাদা ধর্মাধিকারী, শ্রী আর কে পাতিল, শ্রীনারায়ণ দেশাই, শ্রীমনোমোহন চৌধুরী এবং রবিশঙ্কর মহারাজকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। কমিটি তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ চালাবেন।

শুক্রবার - ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু...!

তরুণীমনের সংগোপনে যে মাতৃত্বের স্বপ্ন, তারই সুষমামণ্ডিত গীতিমুখর হাস্যোজ্জ্বল কাহিনীচিত্র!

ফিল্মডিলের

বিংশতি জননী

রূপায়ণে

মাধবী • অনুপ

লিলি • মিতা • গীতা দে

ভানু • জহর • শ্যাম লাহা

নৃপতি ০ প্রেমাংশু ০ হরিধন

রাজলক্ষ্মী ০ লীলাবতী ০ শীতল

রঞ্জনা সেনগুপ্তা ০ লতিকা প্রভৃতি

পরিচালনা • খগেন্দ্র রায়

সংগীত • কালোবরণ

রূপবাণী - ভারতী - অরুণা

অশোকা - অলোকা - শ্যামাশ্রী
(বেহালা) (শিবপুর) (হাওড়া)

নেত্র - গৌরী - কৈরী - রাজকৃষ্ণ
(দমদম) (উত্তরপাড়া) (চুঁচুড়া) (ইছাপুর)

শ্রীরামপুর টকীজ - নৈহাটি সিনেমা

ফিল্ম ডিল—১০ ওয়াটারলু ষ্ট্রীট। কলিঃ-১

আন্তর্জাতিক

• রাষ্ট্রপতি প্রাসাদে ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনারত নেগুইন খান (বামে)।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আবার নতুন করে ক্ষমতার উত্থান-পতন সুরু হয়েছে। মাত্র দশ দিন রাষ্ট্রপতি পদে থাকার পর মেজর জেনারেল নেগুইন খানকে জনমতের চাপে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

সায়গনের পথে ছাত্র ও বৌদ্ধদের বিক্ষোভ এত তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, নেগুইন খান পুলিশ ও সৈন্য দিয়ে বিক্ষোভ দমনের পরিবর্তে এদের দাবী মেনে নিয়ে পদত্যাগ ও সংবিধান বাতিল করাও বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছেন। হয়তো তিনি বুঝেছিলেন, পুলিশ ও সৈন্যদের একটা বড় অংশ বিক্ষোভকারীদের পশ্চাতে আছে, সুতরাং এদের বিরুদ্ধে গিয়ে লাভ নেই—তাহলে দগো দিন দিয়েমের মত পরিণতি হবে।

অবশ্য ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে নেগুইন খান ক্ষমতা ত্যাগ করেছেন, তা নয়। ভিয়েৎনাম ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে প্রায় বিশ হাজার ছাত্রছাত্রী সায়গনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে তারা বেতার কেন্দ্রের বাড়ি ভেঙে দেয়, দা নাং-এ মার্কিন সৈন্য-ব্যারাকে পাথর ছুঁড়ে মারে, এবং ক্যাথলিকপ্রধান অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হয়। বিক্ষোভকারীদের পাল্টা ছাত্র সংগঠন (ইণ্টার-স্টুডেণ্ট ফোর্সেস অফ সায়গন) নেগুইন খানের শাসন বজায় রাখার দাবীতে মিছিল বের করার চেষ্টা করে এবং ভিয়েৎনাম ছাত্র ইউনিয়নের সদর দপ্তরে হানা দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেগুইন খান বিরোধী ছাত্ররাই জয়লাভ করে। এই ছাত্রদের পেছনে বৌদ্ধ ধর্মনেতা, সামরিক বাহিনীর অনেকে এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দুয়ং ভন মিন্ ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ত্রান থিয়েন খিয়েমের সমর্থন ছিল। এঁদের মিলিত প্রতিরোধের মুখে নেগুইন খানের টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি সম্মানের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করতে সম্মত হয়েছেন।

ছাত্র ও বৌদ্ধদের দাবী মেনে নিয়ে নেগুইন খান রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, তাঁর উদ্যোগে প্রস্তুত সংবিধান বাতিল করতে স্বীকৃত হয়েছেন এবং নতুন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পর সামরিক পরিষদ ভেঙে দিতে রাজী হয়েছেন। আরও স্থির হয়েছে সেনানায়কেরা সামরিক পরিষদ ত্যাগ করে নিজেদের সামরিক দায়িত্বে ফিরে যাবেন। ভিয়েৎনামের শাসন পরিচালনার জন্য বেসামরিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠিত হবে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জন্য একজন রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার জন্য সামরিক পরিষদ চেষ্টা করেও সাফল্য লাভ করে নি। শেষ পর্যন্ত তারা অন্তর্বর্তী-কালের জন্য একটি 'ত্রয়ী পরিষদ' (Triumverate) গঠন করেছে। এই 'ত্রয়ী পরিষদে' আছেন, মেজর জেনারেল নেগুইন খান, প্রাক্তন রাষ্ট্র-প্রধান দুয়ং ভন মিন্ (বড় মিন্) ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লেফটেনাণ্ট জেনারেল ত্রান থিয়েন খিয়েম। ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, ত্রান থিয়েন খিয়েম নিজে রাষ্ট্রপতি হয়ে দুয়ং ভন মিন্‌কে প্রধানমন্ত্রী করতে চেয়ে-ছিলেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নাকি মেজর জেনারেল নেগুইন খানকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কোন শাসন ব্যবস্থাকে মানতে রাজী হন নি। তাই আপোষ হিসাবে তিনজনকেই একসঙ্গে ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে।

কিন্তু এরূপ ত্রয়ীর শাসন পরি-চালনা করা বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অসম্ভব। পরস্পরের মধ্যে বিন্দুমাত্র সদ্ভাব নেই এবং কেউ কারও সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে রাজী নন। হয়েছেও তাই, ২৭শে আগস্ট ত্রয়ী গঠিত হয়েছে, আর ২৮শে আগস্ট মেজর জেনারেল নেগুইন খান ত্রয়ী থেকে পদত্যাগ করেছেন। এখন নতুন করে আবার ক্ষমতা দখলের চেষ্টা চলছে।

মার্কিন সমর্থনপুষ্ট নেগুইন খান সকল ক্ষমতা নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করার ফলেই সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে জনসাধারণ কি ভাবে বাধা দিতে পারে, সায়গন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সায়গনের ছাত্র ও শিক্ষকরাই প্রধানত এবারের 'বিপ্লবের' উদ্যোক্তা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশের সাধারণ মানুষের মতামতের দিকে লক্ষ্য না

রেখে কেবলমাত্র তাঁবেদার সেনানায়কের ওপর নির্ভর করে চলার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তা সফল হতে পারে না। জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলরের মত অভিজ্ঞ সেনানায়ক সায়গনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতরূপে থাকা সত্ত্বেও নেগুইন খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, এবং নেগুইন খানের ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জয়যুক্ত ও কমিউনিস্ট আক্রমণকে বন্ধ করতে হলে, মার্কিন নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় সেনানায়ক নয়, জনসাধারণের মতামতের ওপর নির্ভর করে নীতি স্থির করতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

আটলাণ্টিক সিটিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে বর্তমান রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন সর্বসম্মতিক্রমে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলের প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। জনসনের অনুরোধে সম্মেলন উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য সেনেট-সদস্য হুবার্ট হামফ্রেকে নির্বাচিত করেছে।

হামফ্রের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, জনসন ঘোষণা করেছেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে উপরাষ্ট্রপতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বেশি ক্ষমতা দেবেন। হামফ্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই একজন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। সম্প্রতি নাগরিক অধিকার আইন পাশ করার ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

• লিণ্ডন জনসন

নেগুইন খানের পদত্যাগের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনরত সায়গন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ।

জনসন ও হামফ্রে দুজনেই উদারনৈতিক মনোভাবাপন্ন, আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্প্রসারণের নীতিতে বিশ্বাসী, এবং দেশে নিগ্রো সমানাধিকার প্রদানে আগ্রহী। এই জুটি নির্বাচনে আশাতীত সাফল্য লাভ করবেন বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। সাম্প্রতিক 'গ্যালপ পোলে' দেখা যায়, জনসন গোল্ডওয়াটারের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন। এই হিসাব অনুযায়ী জনসন পাবেন শতকরা প্রায় ৭৫টি ভোট, আর গোল্ডওয়াটার পাবেন ২৯টি, আর বাকি ৬টি ভোট এখনও অনিশ্চিত।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তৃতায় রিপাবলিকান

পার্টির প্রার্থী ব্যারি গোল্ডওয়াটার ও রিপাবলিকান পার্টি নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়। নেতৃবৃন্দ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নাগরিক অধিকারের ওপর বিশেষভাবে জোর দেন।

সেনেট-সদস্য জন প্যাস্টোর সম্মেলনে দলের মুখপাত্ররূপে প্রধান ভাষণ দেন। প্যাস্টোর কংগ্রেসে আণবিক শক্তি সংক্রান্ত যুক্ত কমিটির

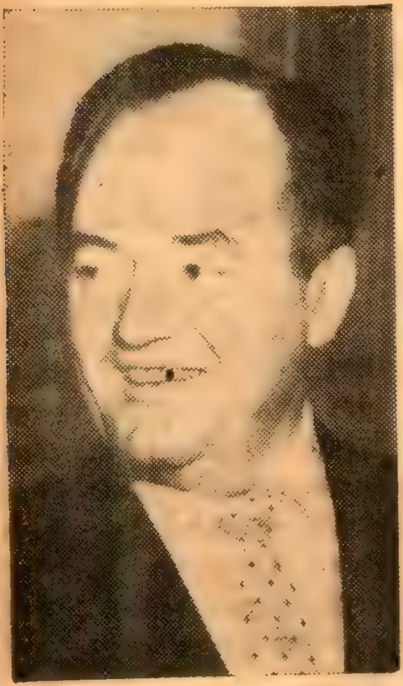

• হবার্ট হামফ্রে

সভাপতি। তিনি গোল্ডওয়াটারের আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আণবিক যুদ্ধে জয়ী বলতে কেউ থাকবে না।' যেভাবেই হোক যুদ্ধ এড়াতে হবে, এবং শান্তি রক্ষা করতে হবে—এই বক্তব্যের ওপর তিনি জোর দেন।

জনসন মনোনয়নগ্রহণ বক্তৃতায় এই শান্তিনীতির কথাই পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠাই বর্তমান আণবিক যুগের প্রধান কাজ।'

প্রতিক্রিয়াশীল ও চরমপন্থীদের হস্তগত রিপাবলিকান পার্টির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কয়েক সহস্র ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি আটলান্টিক সিটি সম্মেলনে সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

সাইপ্রাস :

সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে জেনেভায় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সুরু হয়েছে। অ্যাচেশন পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তাব করা হয়েছে, সাইপ্রাস গ্রীসে যুক্ত হবে—মিলন (enosis) সম্পূর্ণ হবে। তুর্কী সংখ্যালঘুদের জন্য গ্রীস একটি দ্বীপ তুরস্কের হাতে ছেড়ে দেবে।

গ্রীস এই প্রস্তাব গ্রহণে উৎসাহী। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়স ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইসমেট ইনোনু উভয়েই এর বিরোধী। ম্যাকারিয়স সাইপ্রাসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান, এবং এ ব্যাপারে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন। তুরস্কের দাবী, তুর্কীদের জন্য সাইপ্রাস ভূখণ্ডের অংশ ছেড়ে দিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, গ্রীস সকলেই সাইপ্রাস সমস্যার আশু মীমাংসা চায়। সাইপ্রাসের ব্যাপারে সোভিয়েটের উৎসাহ তাদের ভাল লাগছে না।

• প্রেসিডেন্ট ম্যাকারিয়স

তাছাড়া সাইপ্রাসে 'ন্যাটো' ঘাঁটি রাখতেও তারা বদ্ধপরিকর। এ অবস্থায় ম্যাকারিয়স যদি কিছুতেই গ্রীক প্রধানমন্ত্রী জর্জ পপিনড্রিউ ও জেনেভায় গ্রীক রাষ্ট্রদূত ডিমিট্রি নিকোলোরাজিসের কথা না শোনেন, তা হলে শেষ পর্যন্ত ম্যাকারিয়সকে বাদ দিয়েই একটা মীমাংসার ব্যবস্থা হলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। ইতিমধ্যেই

• ইসমেট ইনোনু

ম্যাকারিয়সের বিরুদ্ধে সাইপ্রাসে গুপ্ত চক্রান্তের কথা শোনা গেছে।

কঙ্গো :

কঙ্গোর অধিকাংশ স্থানই আজ বিদ্রোহীদের দখলে। লিওপোল্ডভিলে মসয়ে টি শোম্বের সরকার কোন রকমে নিজেদের শাসন বজায় রেখেছেন। ভয় আছে, যে কোন সময় এই শাসনও ভেঙে পড়তে পারে।

স্ট্যানলিভিল থেকে বিদ্রোহীদের নেতা জেনারেল নিকোলাস ওলেঙ্গা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। মার্কিন সমরোপকরণ ও সৈন্যদল যদি কঙ্গোর ঘরোয়া ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়, তবে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে বলে ওলেঙ্গা ঘোষণা করেছেন। মার্কিন সৈন্য দেখামাত্র তাকে গুলী করে মারার

জন্য ওলেঙ্গা তাঁর সৈন্যদের ওপর নির্দেশ দিয়েছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমেই বেশি করে কঙ্গোর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ছে।

টি শোম্বে

বিদ্রোহীদের হাতে কঙ্গো চলে গেলে আফ্রিকায় চীনা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সুতরাং যেভাবে হোক বিদ্রোহ দমন করতে হবে এবং ময়সে টি শোম্বের কেন্দ্রীয় সরকারকে রক্ষা করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র টি শোম্বেকে দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বি-২৬ বোমারু বিমান ছাড়াও, টি-২৮ ও সি-৪৭বিমান, এবং এইচ-২১ ও এইচ-৩৪ হেলিকপ্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে। আরও উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গরা এই সব বিমান চালনা করছে।

টি শোম্বের পক্ষে মার্কিন সাহায্য ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই। সেনেগল, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া ও মালাগাসির কাছে সৈন্য সাহায্য চেয়ে তিনি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দেয় নি। বেলজিয়ামও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করছে না। তাই শেষ পর্যন্ত, খুব ইচ্ছা না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই বেশি করে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে।

কিন্তু কঙ্গোর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই অংশ গ্রহণের ফলে আফ্রিকাতে তো বটেই, খাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। মার্কিন সেনেটে ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা মাইক ম্যানসফিল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কঙ্গো থেকে সরে আসার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কঙ্গোর ব্যাপারে বাইরের কোন রাষ্ট্রের যদি দায়িত্ব থাকে, তবে তা প্রধানত বেলজিয়ামের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অহেতুক তার দায়িত্ব বাড়াবে কেন?

আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানেও মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। লুমুম্বা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত টি শোম্বের প্রতি অধিকাংশ আফ্রিকাবাসীর কোন সহানুভূতি নেই। তাই তাঁর শাসনের অবসানে কেউ দুঃখিত হবে না। সম্প্রতি ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার প্রজাতন্ত্রের রাজধানী দার-এস-সালামে কয়েক সহস্র নরনারী কঙ্গো থেকে মার্কিন হস্তক্ষেপ প্রত্যাহারের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

নেপাল ঃ

নেপাল সরকারের আমন্ত্রণে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং তিনদিনব্যাপী নেপাল সফর করে এলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে কার্যভার গ্রহণের পর সর্দার শরণ সিং তাঁর প্রথম বিদেশযাত্রার স্থানরূপে নেপালকে বেছে নিয়েছেন। কেবল নেপাল নয়, নেপাল থেকে এসেই তিনি আফগানিস্তানে গিয়েছেন, এবং সেখান থেকে ফিরে তিনি ব্রহ্মদেশে যাবেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োজন-রূপে সর্দার শরণ সিং অত্যন্ত সঙ্গতভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দান করার কাজে হাত দিয়েছেন।

সর্দার শরণ সিং এবং নেপালের মন্ত্রী পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীসূর্যবাহাদুর থাপা সোনাউলি-পোখড়া সড়ক প্রকল্প সম্পর্কিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন।

সর্দার শরণ সিং-এর নেপাল সফর নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৈরালা মন্ত্রিসভা অপসারণের পর ভারত ও নেপালের মধ্যে যে অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেক দিন দূর হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি নেপাল সফরে গিয়ে ভারত-নেপাল সম্পর্কের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। জওহরলাল নেহরুও এর জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে এই দুই দেশের মধ্যে কোন মনোমালিন্য নেই। ভারতের রাষ্ট্রনেতারা স্বীকার করে নিয়েছেন, নেপালের শাসনের রূপ নেপালের ঘরোয়া ব্যাপার—এ বিষয়ে ভারত কোনভাবে হস্তক্ষেপ করবে না, ভারত থেকে কাউকে নেপালের রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতেও দেওয়া হবে না।

কাঠমাণ্ডুতে সর্দার শরণ সিংকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে সম্বর্ধনা জানানো হয়। নেপালের রাজা মহেন্দ্র, মন্ত্রিসভার সভাপতি ডঃ তুলসী গিরি, সহকারী সভাপতি শ্রীসূর্যবাহাদুর থাপা পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীবেদানন্দ ঝা প্রভৃতির সঙ্গে সর্দার শরণ সিং ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

ভারত ও নেপালের মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার কথা ঘোষণা করা হয়। ভারত ও নেপালের সম্পর্ক যুগ-যুগান্তের এবং তা অবিচ্ছেদ্য, এই কথাই উভয় দেশের নেতারা স্বীকার করেন।

নেপালের বৈষয়িক উন্নয়নের ব্যাপারে ভারত সাগ্রহে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়। স্থির হয়েছে, সোনাউলি-পোখড়া সড়কের জন্য ভারত নেপালকে ৯'১১ কোটি টাকা সাহায্য দেবে। তা ছাড়া ভারতের মধ্য দিয়ে নেপালের বহির্বাণিজ্য পরিচালনার সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। নেপালে একটি বড় কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্যও ভারত সরকার সাহায্য দেবে। সিমারাতে এই কল স্থাপন করা হবে—এত বড় কাপড়-কল নেপালে আর নেই। এর জন্য ভারত সরকার নেপাল শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনকে ২৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে।

সর্দার শরণ সিং-এর এই সফরের ফলে নেপালবাসীদের মনে ভারতের প্রতি বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হয়েছে। নেপাল মন্ত্রিসভার সভাপতি ডঃ তুলসী গিরি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা শীঘ্রই ভারত সফর করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁরা উভয়েই ভারত সরকারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

পাকিস্তান :

সর্দার শরণ সিং যখন সরকারী-ভাবে ভারতের প্রতিবেশী বন্ধুরাষ্ট্রগুলিতে

• আয়ুব খাঁ

সফর করছেন, তখন আর একটি বে-সরকারী শুভেচ্ছা দল ভারত থেকে পাকিস্তানে যাচ্ছেন। 'ভারত-পাকিস্তান মীমাংসা গোষ্ঠী' (India-Pakistan Conciliation Group) নামে কিছুদিন হল দিল্লীতে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই শুভেচ্ছা দল পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছেন।

প্রথমে স্থির ছিল, ২রা সেপ্টেম্বর এই শুভেচ্ছা দল পাকিস্তান রওনা হবেন। কিন্তু এখন ঘোষণা করা হয়েছে, আয়ুব খাঁর সুবিধার জন্য এঁরা ৫ই সেপ্টেম্বর যাবেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই দলের নেতৃত্ব করবেন, আর এই দলের অন্যান্যরা হলেন : সাংবাদিক শ্রী বি শিবরাও, 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী এস মূলগাঁওকার, ভারত-পাকিস্তান মীমাংসা গোষ্ঠীর সম্পাদক শ্রী জে জে সিং ও সর্বসেবা সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শুভেচ্ছা সফর সব সময়েই ভাল। কিন্তু এই শুভেচ্ছা দলটির সফরের ব্যাপার নিয়ে ইতিমধ্যেই নানারূপ বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে শুভেচ্ছা দলের নেতা শ্রীজয়প্রকাশ কখন যে কি করে বসেন, সে সম্পর্কে সকলেই খুব উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি তিনি প্রস্তাব করেছেন, চীনকে আকসাই-চীন ছেড়ে দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের বিবাদ মিটিয়ে ফেলা উচিত। স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রেমিক ভারতীয়-মাত্রেই এই 'সর্বসেবা ভূদান নীতি'র তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কাশ্মীর সম্পর্কেও শ্রীজয়প্রকাশের মনোভাব অনেকটা দান করার মতই। শেখ আবদুল্লাকে নিয়ে তিনি যেভাবে দিল্লীতে মাতামাতি করেছিলেন, তা অনেকেরই ভাল লাগে নি। পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার ও পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কেও তাঁর মনোভাব বিভিন্ন মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেকেরই বিশ্বাস, ভারত-পাক বিরোধের ব্যাপারে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর অনুগামীরা পাকিস্তানের দিকেই ঝুঁকে আছেন।

এই অবস্থায় এই শুভেচ্ছা সফরের দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হবে বলে মনে হয় না। আর যদি তাঁদের বিভিন্ন মন্তব্যে পাকিস্তানের সুবিধা হয়, তবে ভারত-পাক সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে অবনতির আশঙ্কা আছে।

গ্রন্থ মেলা

লোহার বাসর : আশা দেবী, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি: ৬। দাম: ২'৫০ পঃ।

মুস্কিল আসান : আশা দেবী, শ্রীপ্রকাশ ভবন, এ৬৫, কলেজ স্ট্রীট-মার্কেট, কলি: ১২। দাম: দু' টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ভূগোল আজ নানা দিগদিগন্তে বিস্তৃত। কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই লুক্কায়িত যে পূতিগন্ধময় পরিবেশ রয়েছে, সেখানকার বীভৎস উপাখ্যান শোনাবার সাহস ক'জনেরই বা আছে? আশা দেবীর 'লোহার বাসর' সেই পরিবেশকে কেন্দ্র করেই রচিত। সুকিয়া স্ট্রীট। এখানেই 'নারী-নিবাস'। এই নিবাস-ই হচ্ছে 'লোহার বাসর'। মধ্যবিত্ত সংসারের বহু মেয়েকেই এই হোস্টেলে বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। এখানে একটা 'সীট' পাওয়া সহজ কথা নয়, আবার কায়দা-কানুনও অনেক। তবু অনুলেখা এখানে এসেই দেখতে পায় এখানে: আসল উদ্দেশ্য কি। সঙ্গিনীদের জীবনও কি দুঃসহ। তারা নিরুপায়। লোহার বাসর ভেদ করে বেরিয়ে আসা যেন অসম্ভব। তবু এখানে রয়েছে দ্বৈতসত্তার যুবক সুরঞ্জন, আবার হোস্টেলের আসল কর্তা 'ধূর্ত কাকাবাবু'। লোহার বাসর থেকে একদিন সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসে অনু। কিন্তু বেরিয়ে আসাটা সহজে সম্ভব হয় নি। জীবনে তখন সঞ্চিত হয়েছে অনেক ইতিহাস, অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। অশ্রুকণা, বীথি, বীণা, মঞ্জু—এরা ভেসে ওঠে দু'চোখের সামনে। লেখাপড়া জানা কেরাণী সুরঞ্জনও তখন হয়ে উঠেছে তার কাছে অন্য মানুষ। আবার উমার মতো মেয়ে কি অসাধারণ শক্তিতে ভেঙে দিয়েছে লোহার বাসর, তাও জানা গেল একদিন। আশা দেবী তাঁর এই উপন্যাসে শুধু নতুন দিকেই আলোকপাত করেন নি, ভিন্ন-

---

জয়ন্তী সেন

মুখী জীবনের অজ্ঞাত কাহিনীও সুগভীর মর্মবেদনায় আমাদের শুনিয়েছেন।

'মুস্কিল আসান' গল্প-সংকলনটি একেবারেই অন্য জাতের, অন্য স্বাদের। 'মুস্কিল আসানে' রয়েছে ঢেউ খেলানো নির্মল হাসি; অনেক সামান্য ঘটনাও জট পাকাতে পাকাতে মুস্কিল আসানের গুণে শেষ পর্যন্ত অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছে। মাত্র বারোটি গল্পের সংকলন—'সভাপতি বিভ্রাট' থেকে 'কুট্টিপিসির হাসপাতাল' পড়লে শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও খুশি হবেন। বর্তমানের সমস্যায় আমাদের 'হাসি' যেন ফুরিয়েছে—তবু 'মুস্কিল আসান' পড়ে প্রাণখোলা হাসি হাসতেই হবে। এখানেই আশা দেবীর কৃতিত্ব সর্বাধিক।

১। **একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে,**
২। **অপরূপা চাম্বা** : দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত। কনটেমপোরারী পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিঃ, ৬৫, রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলি: ৩। প্রতিটির মূল্য ৬৲।

চরৈবেতি। মানুষ চলেছে; কোথায় চলেছে? কিসের সন্ধানে সে চলেছে? কে তাকে জানায় উদার আহ্বান। সেই উদার আহ্বানে সে কোন লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছায়? বিংশ শতাব্দীর মানুষ অর্থকেই আসল সত্য বলে মনে করে, কিন্তু যেদিন সে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলতে থাকে সম্মুখের পানে, সেদিনই সে খুঁজে পায় নিজেকে, মুক্তিকে; চাওয়া-পাওয়ার স্পৃহা শেষ হলে পরিচয় হয় তার বিরাটত্বের সঙ্গে। 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে'র লেখক সেই বিরাটত্বের পরিচয় পেয়েছেন এবং তারই অলৌকিক রস গ্রন্থের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। তীর্থ করা তাঁর বিলাস নয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। ভারতের সমতলভূমি থেকে যেতে যেতে চির-ঈপ্সিত কেদার-বদরীর পথ যেখানে সামনে—সেখানে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। তবু তিনি চিরযাত্রী। যারা যাত্রার পথে চলেছে, তাদের তিনি চিরসাথী। ভারত-ঐতিহ্য ও ভারত-সংস্কৃতিকে তিনি চলার পথে তাদের সাহচর্য পেয়েই হিমালয়ের বুকে আবিষ্কার করেছেন। 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে' পড়ে লাভ কতটা হল সেটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে অসীম বিস্ময়, আশ্চর্য জীবনানুভূতি, অমর প্রকৃতির স্পর্শলাভ, ঈশ্বরপ্রীতি এবং নগাধিরাজকে প্রাণপদ্মে পুনরাবিষ্কার। এই কারণে 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে' সকলের কাছে অনায়াস-অভিনন্দন লাভ করবে। আবার 'অপরূপা চাম্বা' হচ্ছে হিমালয়েরই অন্তর্গত। চিরসুন্দর, চিরনতুন। অনেক কিছু দেখতে দেখতে লেখক রাজকন্যার নামে নাম রাখা শ্রীময়ী চাম্বা (চম্পা)-কেই দেখেছেন, জেনেছেন তার মনের কথা। তিনি সেখানকার ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন, সেই সঙ্গে লোকগাথা-গুলিকে অনুরণিত করে তুলেছেন অক্ষরে অক্ষরে। ফটো ও মানচিত্র গ্রন্থটির গৌরব বৃদ্ধির সহায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একুশ ॥

ফেরবার সময় গায়ত্রী বললেন, ডক্টর ভৌমিককে কেমন দেখলে ?

শর্মিলা খুশি মনে বললেন, বেশ। খুব পণ্ডিত লোক।

—পণ্ডিত লোক নিশ্চয়। বাইরের ডিগ্রী আছে, পাটনা ইউনিভার্সিটির নামকরা স্টুডেণ্ট। কিন্তু—গায়ত্রী থামলেন।

—কিন্তু কেন ? —শর্মিলা কৌতূহলী হলেন।

—লোকটা বড্ড বেশি মেটিরিয়ালিস্ট।

শর্মিলা বললেন, সায়েন্সের লোক, হওয়াই তো স্বাভাবিক।

—তা জানি। কিন্তু ডক্টর ভৌমিক দস্তুরমতো অ্যাগ্রেসিভ। এই জন্যে বাপের সঙ্গেও ওঁর সব সময় বনে না।

—তাই নাকি ?

গায়ত্রীর মুখে ছায়া পড়ল : আচ্ছা, আমরা তো গুরুদেবের কাছে দু'দিন এলুম। এর মধ্যে প্রভাকরজীকে একদিনও দেখেছ তুমি ?

শর্মিলা স্বীকার করলেন, না দেখেন নি।

—অথচ, এইখানেই উনি ছিলেন। প্রভাকরজী ধর্ম বিশ্বাস করেন না—ঈশ্বর মানেন না। তিনি বলেন, সাধু-সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করার অর্থই হল, কতগুলো অকর্মা লোককে প্রশ্রয় দেওয়া। এরা হচ্ছে একদল সোশ্যাল প্যারাসাইট, যাদের কাজ হল মানুষের ঘাড়ে বসে খাওয়া আর লোকের বোকামোর সুযোগ নিয়ে তার মনকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে ঠেলে দেওয়া।

গায়ত্রীর ক্ষোভের অর্থটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল শর্মিলার কাছে।

গায়ত্রী বললেন, এই নিয়েই ভৌমিকজীর সঙ্গে প্রভাকরজীর গোলমাল। ভৌমিকজী রাগ করে বলেছেন, সব সম্পত্তি তিনি গুরুদেবের নামে লিখে দেবেন—যদি প্রভাকরজী তাঁর কাছে দীক্ষা না নেন। প্রভাকরজী বলেছেন, সম্পত্তির চাইতেও সত্যকে তিনি দামী বলে মনে করেন।

শর্মিলা চুপ করেই রইলেন।

গায়ত্রী বললেন, সত্যের অহঙ্কার। কিন্তু, সত্য কোথায় আছে—কে তার সন্ধান জানে? প্রভাকরজীর ভুলও একদিন ভাঙবে। বুঝবেন, এ-সব সায়েন্স-ল্যাবরেটরী কত মিথ্যে—মানুষ এ-সমস্ত দিয়ে কোনোদিন শান্তি পাবে না।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গে ওঁর প্রায়ই তর্ক হয়—না ?

—তর্ক করে কী করব ? আমরা তো পৃথিবীর দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছি দুজনে। বরং প্রভাকরজী মাঝে মাঝে আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমি চুপ করে শুনি।

—এই সমস্ত নাস্তিকের থিয়োরী শুনতে খারাপ লাগে না তোমার ?

গায়ত্রী হাসলেন। বললেন, রহীম খান খানানজী কি বলেছেন, জানো ?

'জো রহীম উত্তম প্রকৃতি কা করি
সকত কুসঙ্গ,
চন্দন বিষ ব্যাপত নঁহি লপটে
রহত ভুজঙ্গ—'

শর্মিলা আস্তে আস্তে বললেন, তা ঠিক।

মেসে ফিরে অনেক দিন পরে যেন আবার আত্মস্থ হলেন শর্মিলা। প্রভাকর নাস্তিক, ধর্মকর্ম কিছুই মানেন না, সাধু-মহান্তদের ওপর তাঁর একটা সহজাত বিদ্বেষ আছে। এ নিয়ে

গায়ত্রী রাগ করতে পারেন, কিন্তু শর্মিলা কেন অনুযোগ করতে যাবেন? তাঁরও তো ভক্তি-বিশ্বাস কিছুই নেই। তিনি মনের কাছ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, যে কৃষ্ণচূড়া তাঁর বুকের রক্তে বন্যার ডাক পাঠিয়েছে—যা কোনোমতেই তাঁকে স্থির হতে দিচ্ছে না, তার সেই মোহগ্রাস থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন তিনি। গুরুদেবের বদলে প্রভাকর যদি তা দিতে পারেন, কোনো নালিশ নেই শর্মিলার।

প্রভাকরের সত্যিকার পড়াশুনো আছে। তাঁরও বিশেষ অনুরাগ রয়েছে ক্যাকটাস সম্পর্কে। প্রভাকর বলেছেন, সময়-সুযোগ করে একবার বেরিয়ে পড়ুন আমার সঙ্গে—ঘুরবেন বনে-জঙ্গলে, সত্যিকারের অভিজ্ঞতা হবে। বইয়ের ছবি আর ছাত্রীদের নিয়ে দুটো-একটা সৌখীন এক্সকার্শন—ওতে কি আর কাজ হয়!

অবশ্য বনে-জঙ্গলে ঘোরবার সুযোগ শর্মিলার কখনো হবে না। কিন্তু প্রভাকর যেন কাজ করবার একটা নতুন প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভেতরে। কিসের জন্যে নিজের ভেতর অনর্থক জটিলতার জাল বুনছেন তিনি? এবার থেকে কাজের ভেতরে ডুবে যাবেন, বইটা শেষ করবেন, তারপর হাত দেবেন তাঁর থীসিসের কাজে। প্রভাকর তাঁকে সাহায্য করবেন, কথা দিয়েছেন।

সন্ধ্যায় শর্মিলা লেখা নিয়ে বসলেন। একটানা লিখে গেলেন প্রায় দশটা পর্যন্ত। অনেক দিন পরে যেন তিনি সহজ আর স্বাভাবিক হতে পেরেছেন।

তবু রাতে ঘুমোবার আগে আবার কোথা থেকে পাহাড়ী নদীর ধারে সেই আরক্তিম বিকেলটি ফিরে এল। সেই মানুষটির ছায়া পড়েছে লাল আলোর মাঝখানে। বলছে—

শর্মিলা চোখ বুজলেন প্রাণপণে। দু' হাতে কান চেপে ধরলেন। দেখবেন না, শুনবেন না, ভাববেন না। কৃষ্ণচূড়ার ফুল-ঝরার দিন শেষ হয়ে গেছে, এবারে ক্যাকটাসের পালা।

এক সাহিত্যিক বন্ধুর অসুখ। চিঠি লিখেছে, 'হয়তো আমি আর বাঁচব না। পারো তো একবার দেখে যেয়ো।'

চিঠিটা পড়ে মন খারাপ হয়ে গেল কিরণের। বাংলা দেশের দুর্ভাগা লেখক একজন। বাজারে প্রায় বিশখানা বই আছে, কিন্তু জনপ্রিয়তা নেই। লেখাই একমাত্র উপজীবিকা, আর সংসারটিও ছোট নয়।

বয়েসে ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড়ো, পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কিন্তু দেখলে পঁয়ষট্টি বছরের বুড়োর মতো মনে হয়। ক্রনিক অসুখে জরাজীর্ণ। শুকনো চোয়াল ভাঙা মুখে তীক্ষ্ণ ঘৃণার হাসি ফুটে থাকে, চোখ দুটো কোটরের ভেতরে আগুনের মতো জলজল করে।

—সেক্সের সুড়সুড়ি আর ক্রাইম-মার্কা প্লট ছাড়া পপুলার হওয়া যায় না এদেশে। আমি পপুলার হতে পারব না—অতটা নীচে নামবার মতো প্রবৃত্তি আমার নেই। তার চেয়ে বরং না খেয়ে মরব।

না খেয়েই মরছে।

পত্র-পত্রিকার বাজারে তার চাহিদা কম, তিন বছরে বইয়ের সংস্করণ হয় না। তাকে দেখলেই প্রকাশকের মুখের রং বদলায়। এদিকে পাঁচ-ছটি ছেলে মেয়ে, বড়ো ছেলেটা দু-দুবার স্কুল ফাইনাল ফেল করেছে। লোকটা মরছে।

কিরণ সেই টালীর ঘরে অপরিচ্ছন্ন শয্যায় দেখল তাকে। দড়িতে ময়লা জামা-কাপড়। একটা টুলের ওপর কতগুলো ওষুধের শিশি। একটা মাটির ভাঁড়ে থুথু আর ছাই। এক ফালি বারান্দায় কয়েকটা ছেলে-মেয়ের কান্নাকাটি। সেলাই করা কাপড় পরা স্ত্রী, হাতে দু' গাছা শাঁখা ছাড়া কোনো আভরণ নেই।

আর কেমন একটা অদ্ভুত চিমসে গন্ধ চারদিকে। ব্যাধির গন্ধ।

—কিরণ, আমি আর বাঁচব না।

—কী বকছ দাদা পাগলের মতো? মরবার কী হয়েছে এখুনি? তোমার তো এ ক্রনিক অসুখ—দু'চার দিন ভুগেই আবার উঠে দাঁড়াবে।

—উঠে কোথায় দাঁড়াব? আমি তো তোদের মতো পপুলার রাইটার নই। আবার উঞ্ছবৃত্তি—আবার তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো পাবলিশারের দোরে দোরে ঘোরা। তার চাইতে একেবারে ছুটি পেলেই বেঁচে যাই।

কিরণ রাগ করল।

—এ সব তুমি কী বলছ স্বার্থপরের মতো? স্ত্রী, ছেলেমেয়ে—এরা কোথায় যাবে?

—কোথায় যাবে? কেন, ভিক্ষে করতে। জানিস তো, আমিও বাঙাল। রিফিউজীর বউ, ছেলেমেয়ের ভিক্ষের কোনো লজ্জা নেই। আর থাকবার ভাবনা? শেয়ালদার সাউথ স্টেশন আছে কী করতে? দেখেছিস তো, মানুষ মরা গরুর মতো কি ভাবে গাদাগাদি করে পড়ে থাকে ওখানে?

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

—তুমি থামো দাদা। বৌদি কী ভাবছেন বলো তো?

—কী আবার ভাববে? ওর পরিণাম ও জানে। শুধু দুঃখ কী জানিস? সাহিত্যকে বড্ড বেশি ভালোবেসেছিলুম ছেলেবেলা থেকে। টাকা চাই নি—কিন্তু লেখাগুলোর যদি সত্যিকারের বিচার হত, তা হলেও খানিকটা সান্ত্বনা নিয়ে মরতে পারতুম। কিন্তু, দলের মুখ চেয়ে যেখানে বুক-রিভিউ'র রেওয়াজ—সেখানে আমাকে কেউ বুঝতে পর্যন্ত চেষ্টা করল না!

অনেকখানিই অভিমানের কথা—অভিযোগের সবটা সত্যি নয়। অভাবের তাড়ায় বইয়ের পর বই লিখে লেখক শুধু শক্তির অপচয়ই করেছেন, কোথাও সম্পূর্ণ দানা বেঁধে ওঠে নি তাঁর সাহিত্য—এই অপ্রিয় আলোচনা করবার সময় এ নয়। কিরণ বললে, সময় এখনো যায় নি দাদা, একটু ধৈর্য ধরো।

—সময় হয়তো আসবে। কিন্তু, আমি মরে যাওয়ার পর। তখন তোরা ঘটা করে শোকসভা করবি, প্রবন্ধ লিখবি আমাকে নিয়ে—নীচের ছাই ঢাকা পিকদানিতে খানিক থুথু ফেলে দাদা বললেন, হয়তো আমার বইয়ের বিক্রিও শোকের ধাক্কায় মাস কয়েক ভালোই চলবে। কিন্তু আমার কী লাভ হবে বলতে পারিস?

কিরণ বিরক্ত হয়ে বললে, বকুনি যদি না থামাও, আমি উঠে যাব এখান থেকে।

—যাবি বইকি। রোগীর ঘরে বেশিক্ষণ বসতে নেই, শরীর-মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তোকে ডেকেছি অন্য কারণে। তুই সেই হাঙর-মার্কা ঘোষকে বলিস, যেন অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা আমাকে অ্যাডভান্স করে—হয়তো এর পরে ওর কাছে কিছুই আমার আর চাইবার দরকার হবে না, আর তোর পকেটে যদি কিছু থাকে তো দিয়ে যা—পাঁচ, দশ যা হয়। আজ ঘরে চাল ছিল না—এদের কিছু জোটে নি।

কুড়িটা টাকা সঙ্গে ছিল, দিয়ে কিরণ রাস্তায় বেরুল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা তলিয়ে আছে। এই মানুষটা তাদের সকলের আয়নার মতো। এখনো তার বাজার আছে, বই কিছু কিছু চলে, এখনো ঠিক ভিক্ষের ঝুলি হাতে নিয়ে তাকে প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় না। কিন্তু যেদিন তার বাজার থাকবে না, নতুন জনপ্রিয় লেখকদের আড়ালে হারিয়ে যাবে সে—সেদিন এই পরিণাম তারও ঘনিয়ে আসবে। এমনিতেই সে হট্‌কেক-সেলার নয়, সেদিন—সেই দুঃসময়ে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, হয়তো রাজেনবাবুও তাকে চিনতে পারবেন না।

কলকাতার উদ্বাস্তু-উপনগর—এক সময়ে মাঠ আর জলায় একাকার ছিল। এখন টালীর ঘর থেকে তেতলা পর্যন্ত ছাড়া ছাড়া বাড়ি। কাঁকরের রাস্তা অসমতল, অন্যমনস্ক হয়ে চললে হোঁচট লাগে। পথের ধারে দুর্গন্ধ কাঁচা ড্রেন—প্রায় আধ মাইল দূরে সবেধন বাসটির স্টপেজ। কিরণ এগিয়ে চলল সেদিকেই।

আকাশের পশ্চিমে মেঘ ঘনাচ্ছিল, নজরেই আসে নি এতক্ষণ। হঠাৎ বিকেলের সব আলো যেন কার একটা ফুঁয়ে নিবে গেল, কিরণ চমকে চেয়ে দেখল মাথার ওপর অন্ধকারের একটা কালো পর্দা টানা হয়ে গেছে। তারপর বিদ্যুতের ভ্রূকুটি, বজ্রের ধমক আর ঝড়ের হাওয়া!

একমুঠো ধূলো আর কাঁকর উড়ে এল মুখের ওপর। বৃষ্টি নামল।

কিরণ ছুটল। দূরে একটা মুদির দোকান দেখা যায়। ওর ঝাঁপের তলায় গিয়ে হয়তো দাঁড়ানো যেতে পারে আপাতত। ছুটল সেই দিকেই।

—কিরণদা—কিরণদা!

ঝড় আর বৃষ্টির শব্দের ভেতরে যেন দৈববাণী শুনল কিরণ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

পাশেই বাগানাওলা একটা একতলা বাড়ি। তারই বারান্দা থেকে কে যেন ডেকে চলেছে: কিরণদা, এদিকে—এদিকে—চলে আসুন এখানে—

গলার স্বরটা চেনা চেনা ঠেকল, কিন্তু, তখন আর ভাববার সময় নেই। বৃষ্টির ছাটে আর ধুলোয় চশমার কাচ ঝাপসা। যেই ডাকুক—আশ্রয় পাওয়াটাই এখন বড়ো কথা। আর চিনেই যখন ডেকেছে, তখন শুধু আশ্রয় নয়, এক পেয়ালা চা-ও হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

কাঠের গেট ঠেলে সে ঢুকে পড়ল। বাগানে শিউলি, চাঁপা আর চন্দ্রমল্লিকার গাছ। ঝড়ের ধাক্কায় আর বৃষ্টির ঘায়ে কনকচাঁপার পাপড়ি ঝরছে। বারান্দায় দাঁড়ানো ছেলেটি ব্যাকুল হয়ে বললে, ইস, এর মধ্যেই যে প্রায় ভিজে গেছেন! আসুন—আসুন, ঘরে বসবেন।

চশমার কাচ না মুছেও কিরণ চিনতে পারল এবার। ছেলেটি বাণীব্রত। বাণীব্রত চট্টোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

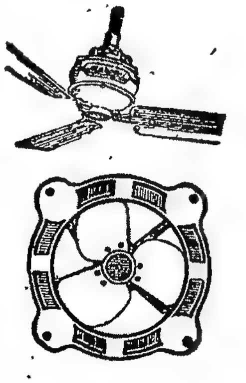

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পযন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো (প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল গয়ারাম। দু রাত্রি ঘুম নেই। চোখ দুটো কর কর করে। মেনকার প্রসব-বেদনার আর্ত চীৎকার শুনতে শুনতে ঝিমুনি এসেছে। এক সময় মেনকাও ঘুমিয়ে পড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে। তখন আর শোনা যায় না গোঙানি। চারদিকের নীরবতায় চোখে ঘুমের আমেজ লাগে। বন্যা-সমুদ্রের ওপারে লোকালয় থেকে মায়েদের ঘুমপাড়ানি গানের সুরে সুরে চোখ আসে বুজে। ঘুম আসে জলের ছল ছলাৎ শব্দের মৃদু জলতরঙ্গে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙতেই গয়ারামের স্বপ্নটা মিলিয়ে যায় কোথায়। কারা যেন ঘুম পাড়াচ্ছিল তাকে। আর শোনা যায় না সেই সুর, তাল কেটেছে। তার বদলে একটা করুণ তান কানের পর্দায় নতুন মূর্ছনা সৃষ্টি করছে। করুণ কান্না। একটি অশ্রুতপূর্ব কণ্ঠে কে যেন তার আবির্ভাব ঘোষণা করছে। যেন নবজন্ম ঘটেছে কোথাও। একটি নবজাতকের কণ্ঠস্বর।

তাড়াতাড়ি চোখ কচলে উঠে বসল গয়ারাম। সত্যই তার পাশে সেই নবজাতক হাত-পা নেড়ে আর তীক্ষ্ণ আওয়াজে তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। এও কি সম্ভব। এই সমুদ্র-শয্যায় এই নবজাতক। মৃত্যুর অতল অন্ধকার থেকে জীবনের রামধনু-রঙ। নতুন প্র[illegible]

কিন্তু চারদিকের মৃত্যুর নৈঃশব্দের মধ্যে এ জীবনকে ধরে রাখবে কেমন করে। সে তো কেবল মরণের দুঃস্বপ্নই দেখে এসেছে। কি করবে মৃত্যুর মত স্তব্ধ এ সমুদ্রের মাঝে এই নবজাতককে নিয়ে।

ঘুম-জড়ানো চোখে ভাবতে চেষ্টা করে গয়ারাম। উঠে দাঁড়ায়। মনে পড়ে সব যেন আস্তে আস্তে। গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রেখে রাত্রি কাটানোর কথাও মনে পড়ে এখন। গাছের মাথায় হ্যারিকেন জ্বেলে রেখে বিপদ-সঙ্কেতের কাহিনীও মনে পড়ে। কেউ আসে নি উদ্ধার করতে তাদের।

চারদিকে শুধু জল আর জল। এই বিশাল সমুদ্রের মাঝখানে কোথাও কোন জনমানবের চিহ্নও নেই। নেই কোন প্রাণের স্পন্দন। শব্দহীন এই মহাসমুদ্রে কেবল জলের কল কল ছল ছল অবিরাম শব্দ। কোথাও হঠাৎ পাড় ভেঙে পড়ার বিরাট গর্জন। বিশ্ব চরাচর ব্যাপী এই নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে ভূতুড়ে আলোটা

লখীন্দরের ভেলা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

কেবল শুনতে থাকে এক এক সময় গাছের মাথায়।

ঐ আলোটাই গয়ারামের জগতে একমাত্র দিকদর্শন। আলোটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয় সে বেঁচে আছে। মেনকার প্রসব বেদনার ভয়ার্ত চীৎকারে ভাবতে পারে মরে নি এখনও তারা। মেনকার জীবন-যন্ত্রণার ঐ কাতরানি শুনে গয়ারামও প্রচণ্ড আর্তনাদে বিশাল পৃথিবীর তাবৎ জীবজগৎকে জানিয়ে দিতে চায়, দুটি প্রাণী এই নির্জন উর্মিমুখর বালুকাবেলায় ছটফট করছে বাঁচার আকুতিতে। শব্দ কোলাহলময় আনন্দের জগৎ থেকে তারা নির্বাসিত। তারা ফিরে যেতে চায় রূপ-রস-গন্ধে ভরা সুন্দর পৃথিবীতে। কিন্তু হায়! কেউ শোনে না তাদের এই আকুল কান্না। গাছের মাথায় উঠে গয়ারাম যখন চীৎকার করে—কে আছ বাঁচাও। ডুবে মলাম; কেউ সাড়া দেয় না। শুধু তার অশান্ত আর্তনাদ অনন্ত জলরাশির ওপর দিয়ে দিকদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মহাশূন্যে। শুধু হো-হো-ও-ও শব্দটা হাহাকার করে ফেরে অসীম অনন্তে কোন সাড়া না পেয়ে। আর সেই শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই কোথাও একটা ঘূর্ণি বিপুল জলস্রোতের মধ্যে পাক খেতে খেতে কলকল শব্দ তুলে বিকট অট্টহাসিতে নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে বিদ্রূপ করে।

তবু কি প্রাণান্তকর প্রয়াস গয়ারামের। মেনকা তো ভালমন্দ সব অনুভূতির বাইরে। যন্ত্রণা উঠলে ককায়, তারপর এক সময় চুপ করে যায় নয়ত ঘুমোয় অঘোরে। বোধহয় জ্ঞানও নেই তার যে কোথায় সে আছে এবং কি অবস্থায় আছে। গয়ারাম তো কাঁদতে পারে না মেনকার মত। দিনরাত ককাতেও পারে না। কিন্তু সে কি কম কাঁদে, কম চীৎকার করে। কেউ যদি গয়ারামের বুকের ওপর এসে কান পাতে এখন, শুনতে পাবে মহাসমুদ্রের কলরোল। কি বিপুল আক্রোশে আর ক্ষোভে তার ছোট্ট বুকের ভেতরে বাঁচার আকুল আগ্রহটা তোলপাড় করে আছড়ে বিছড়ে কাঁদছে।

—উঃ, বাবা রে! মলাম! আর যে পারি না—

গয়ারামও আর পারে না। এই রকম এক অস্বস্তিকর পরিবেশে পুরুষমানুষ হয়ে দুদিন সে শুধু বসে বসে কাতরানি শুনছে অসহায়ের মত। কি করতে পারে সে। সে কেমন করে মেনকার যন্ত্রণা লাঘব করবে। দুটো আশ্বাসবাণী শোনাবে, তাও পারে না। মৃত্যুপুরীতে তার আশ্বাসবাণীটাকে মনে হবে মৃত্যুর চেয়েও করুণ।

তাই তাড়াতাড়ি গয়ারাম আলোটা হাতে নিয়ে গাছের ওপরে চড়ে বসে।

—উঃ, কি অন্ধকার; আলো কই; আলো! অন্ধকারে ভয় পেয়ে মেনকা চেঁচিয়ে ওঠে। কাতরাতে কাতরাতে হাত বাড়িয়ে হাতড়াতে থাকে সেই জায়গাটা যেখানে গয়ারাম বসেছিল। গয়ারামকে না পেয়ে চমকে ওঠে যন্ত্রণার মধ্যেই। কোথায় গেল মানুষটা। পালিয়ে গেল নাকি তাকে ফেলে।

—গাছের মাথায়—গাছের ওপর থেকেই সাড়া দেয় গয়ারাম।

—অন্ধকারে মলাম আমি! তুমি কোথায়!

গয়ারাম তাড়াতাড়ি নেমে আসে আলোটা গাছের মাথায় বেঁধে দিয়ে। দূর থেকেও আলোটা দেখা যাবে। যদি কেউ এই মহাসমুদ্রের মাঝে হঠাৎ আলো দেখে তাদের উদ্ধার করতে ছুটে আসে এই আশায় গয়ারাম একটি-মাত্র হ্যারিকেন গাছের মাথায় ঝুলিয়ে আসে।

—আমাকে গলাটা টিপে মারতে পার! মার না! তাহলে দুজনাই বাঁচি। মার, মার না! চীৎকার করে মেনকা কাঁদে আর মাথার চুল ছেঁড়ে।

গয়ারাম এসে বসে ওর পাশে শান্ত হয়। না, আর দেখা যায় না। আলো থাকলে বড় স্পষ্ট দেখা যায় মেনকাকে। ও যখন যন্ত্রণায় ছটফট করে তখন ওর মুখের রেখাগুলো কুঁকড়ে স্থবির মানুষের মুখের মত মৃত্যুর হাতছানি দেয়। ওর বিবর্ণ যন্ত্রণাকাতর মুখের ওপর শিরাগুলো দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে। ভারি বীভৎস দেখায় ওকে। মনে হয় ওর পাশে পুরাকালের একটা মৃতদেহ মমি হয়ে জলের ওপর ভাসমান এই তাঁবুর যাদুঘরে নড়াচড়া করছে।

তার চেয়ে অন্ধকার অনেক ভালো। এখানে দেখা যায় না মেনকাকে। শুধু কানে আসে ওর গোঙানি। সেও ভাল। তাঁবুর চারপাশে বন্যা-স্রোতের কলকলানি, আর মেনকার কান্না মিশে অহরহ যে মৃত্যুঝঙ্কার শোনা যায় তা গা-সওয়া হয়ে এসেছে। ওদের কান্না থামলে বোধহয় তার হৃৎস্পন্দনও যাবে থেমে। মনে হয় সে বেঁচে নেই। এই যন্ত্রণাজর্জর দাহর মাঝেই তো বেঁচে আছে সে। মরবার দিনও এই দহনজ্বালা নিয়েই মরবে।

মরবে তো বটেই। তা না হলে ভজন আর সখারাম তাকে উদ্ধার করার যে আশ্বাস দিয়ে বাবুদের নৌকোয় চেপে পার হয়ে গেল তারা ফিরল না কেন? পাড়া শুদ্ধ লোক উঠে গেল ডাঙায় অথচ সেই রইল পড়ে। সকলেই বলে গেল ডাক্তার নিয়ে তারা আসবে তাদের উদ্ধার করতে। কেউ এল না। কেন? তারা কি এই পৃথিবীর কেউ নয়। এই গ্রহ থেকে কি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে দুজন মানুষ। এই পৃথিবীতে তারাই দুজন মাত্র জীবন্ত প্রাণী!

মেনকা এক এক সময় হঠাৎ যেন ক্লান্ত হ'য়ে চুপ করে যায়। মনে হয় সে বুঝি আর যুঝতে পারছে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নিশ্চুপ হ'য়ে যায় এক এক সময়। যেন ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় নিজেও ঘুমিয়ে পড়তে চায় গয়ারাম। সারা দিনরাত ধরে জেগে

বসে, মৃত্যুর এই বিভীষিকা দেখে দেখে সেও বুঝি ক্লান্ত। এই সুযোগে গয়ারামও ঘুমিয়ে নিতে চায় একটু। কিন্তু ঘুম আসে না। আসে চিন্তা। সত্যিই মরবে তারা। বাঁচতে পারবে না কোনমতে। ভুল করেও কি কোন লোক আসবে না তাদের উদ্ধার করতে। অন্য সকলের সঙ্গে যায় নি বলেই কি এই দণ্ড।

কিন্তু যেত কেমন করে। রাত্রির কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে দু' হাত জল যে ধাড়াই বাড়বে এ তো ভাবে নি সে। যখন নৌকো এসেছে উদ্ধার করতে তখনও কি সে ভেবেছিল একথা। আর ভাবলেই বা কি হোতো। একখানা নৌকোয় কেমন করে ছেলে বুড়ো কচি কাঁচা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঁচার আশ্বাসে। শুধু কি মানুষ। ছাগল, ভেড়া, মুরগী, হাঁস থেকে সুরু করে সংসারের যাবতীয় টুকিটাকি মায় শিল-নোড়া ও চালের ওপর ঝুলন্ত কুমড়োটা পর্যন্ত। এরকম বোঝাই নৌকোয় কেমন করে সে আসন্ন-প্রসবা মেনকাকে নিয়ে উঠত। তার ঘর আলো করে যে আসছে সে তো তার সাত রাজার ধন এক মাণিক। সে জন্ম নিত ঐ ছাগল ভেড়া মুরগীর আস্তানায়।

না, কখনই না। কিন্তু ভাবতে ভাবতে বুঝি ঘুম এসে যায়। ঘুম মানেই মৃত্যু। তক্তাটার নীচে জলের ছল ছলাৎ শব্দ। ভাসমান তক্তাটাকে গয়ারাম বেঁধে রেখেছে গাছের সঙ্গে। বাকী তিনটে বাঁশের খুঁটি বন্যাস্রোতে টলটলায়মান। কাঁপছে স্রোতের টানে থর থর করে। খুঁটির সঙ্গে টাঙিয়ে দেওয়া মেনকার ছেঁড়া শাড়ির চাঁদোয়াটাও নাচছে স্রোতের তালে তালে। এই আস্তানাটা যেন ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মতই চঞ্চল। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার মত শক্তি এই পদ্মপাতার মত কম্পমান তাঁবুটা পাবে কোথায়?

তাই তো জেগে বসে থাকে গয়ারাম দিনরাত। এখন বোধহয় রাত্রি ন'টা। জলের কলকলানি স্তব্ধ হ'য়ে এসেছে। চারিদিকে মৃত্যুর মত শান্ত, নিশ্চুপ পরিবেশ। এই নঃশব্দের ভয়াবহতা তাকে সজাগ করে রাখে। এই শান্ত সমাহিত ভাবের নামই তো মৃত্যু। এই তো তার চুপিসাড়ে আসার লগ্ন। চোরের মত পা টিপে টিপে সে এসে তুলে নিয়ে যাবে তার রথে তাদের দুজনকেই। মেনকার কোন সাড়াশব্দ নেই। বোধহয় মরেছে ও। মরেই তো ছিল। ভালই হয়েছে। কিন্তু সে। সেও কি মরেছে। না মরলে এত নিঃসাড় অন্ধকার কেন। কেন সে শুনতে পাচ্ছে না মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। বুকের ধুক ধুক শব্দটাও তো শোনা যেত। সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সব ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ লাগছে গায়ে। কি ঠাণ্ডা। পায়ের থেকে শির শির করে উঠছে উপর দিকে। পিঠের কাছে এসে পৌঁছেচে। কি শীতল। শির শির করে উঠছে তার দেহ বেয়ে বেয়ে।

হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে চমকে উঠল গয়ারাম। চীৎকার করে উঠল—কি রে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়া দিয়ে উঠল সারা শরীর। ঝপ্ করে শব্দ তুলে কি একটা লাফিয়ে পড়ল জলে।

—সাপ। এই মেনকা সাপ।

ঠেলা দিতেও উঠল না মেনকা। আবার ধাক্কা দিতে গিয়ে থেমে গেল কি ভেবে। দরকার নেই মেনকাকে উঠিয়ে। কি হবে সে জাগলে। সুরু করবে তার কান্না। নাকি সুরের চীৎকারে সুরু হবে নরক-যন্ত্রণা। তার চেয়ে ঐ নিস্তব্ধতা অনেক ভাল। সাপ উঠেছিল গায়ে, তাতে কি হয়েছে। সাপই তো এসেছিল মৃত্যুরূপে। তাকে ঝেড়ে ফেলেছে গয়ারাম। আর ভয় নেই মৃত্যুর। মৃত্যুর সঙ্গেই তো তার লুকোচুরি। এমন মৃত্যুদূত তাকে না কামড়িয়ে ছেড়ে দিল কেন? ভয় পেয়েছে তাকে। মৃত্যুও ভয় পায় তাহলে। সাক্ষাৎ যমও অব্যাহিত দিয়েছে। ভুলে গিয়েছে তার বিষাক্ত ছোবল। এখানে সবাই ভুলেছে ক্রূরতা, হিংসা। তার খুঁটি বেয়ে উঠেছে অজস্র পিঁপড়ে, পোকা, আরশুলা, ব্যাঙ। বোধহয় সাপটাও ছিল ঐ খুঁটি আশ্রয় করে। খাদ্য খাদক একই জায়গায় নিরুপদ্রবে সহাবস্থান করেছে। কেউ কাউকে হিংসা করে নি। সেও উপদ্রব করবে না। ঘুমোক মেনকা যত খুশি। উঠেই তো আরম্ভ করবে—আর যে পারি না! ও মাগো।

কি বলবে গয়ারাম। কি সান্ত্বনা দেবে। সেই এক কথা।—এই তো এসে গেল নৌকো। ডাক্তার নিয়ে তক্ষন এল বলে।

—কই নৌকো, কখন আসবে।

—দেরি নেই, এল বলে। একটু সবুর কর মেনকা।

এর চেয়ে ভালই আছে মেনকা। সাড়াশব্দ নেই। ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে। দরকার নেই ঘুম ভাঙিয়ে। এ ঘুম যদি কোনদিন না ভাঙে তবুও।

নড়ে চড়ে বসল গয়ারাম একটু। গাছের মাথায় দপ দপ করে জলছে লণ্ঠনটা। লাইট হাউসের মত অকূল সমুদ্রে এ দিগ্দর্শনযন্ত্র। জীবনের সঙ্কেত এই আলো। এটুকু ছাড়া আর চারদিকে তো মৃত্যুর অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ব্যাপ্ত এই বিশ্বচরাচর।

কতক্ষণ কেটে গেল এই অন্ধকারে। একা জেগে আছে গয়ারাম। বিশ্বচরাচরে সে একমাত্র প্রাণী সচেতন। মাথার ওপরে অনন্ত আকাশ আর লক্ষ কোটি গ্রহনক্ষত্র নির্নিমেষ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। সাক্ষী হয়ে রইল আকাশের ঐ গ্রহ-তারকারা। মৃত্যুকে পাহারা দিচ্ছে একটি জীবন।

গয়ারামের চিন্তাস্রোত থেমে গেল হঠাৎ। সত্যিই কি মৃত্যুকে পাহারা দিচ্ছে সে। মেনকা বেঁচে আছে তো। না মরেছে। অনেকক্ষণ তার সাড়া-শব্দ নেই। এমন কি পাশ পর্যন্ত

ফিরছে না। শোনা যাচ্ছে না শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

গয়ারাম তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে মেনকাকে জাগাতে গেল। না, গায়ে হাত দেবে না। যদি জেগে ওঠে। তবে নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখবে শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে কিনা; কিন্তু তাও তো সম্ভব হবে না। অন্ধকারে তো ঠিক বুঝবে না। যদি গায়ে হাত লাগে তার চেয়ে গাছ থেকে আলোটা নামিয়ে নিয়ে এসে দেখবে মেনকাকে।

আলোর কথা মনে হতেই দমে গেল সে। আলো আনলেই জেগে উঠবে মেনকা। সুরু হবে চীৎকার আর মরণযন্ত্রণা। দেখা যাবে যন্ত্রণার বিষে নীলবর্ণ মেনকার পাতলা ঠোঁট দুটো। তার চেয়ে এই ভাল। মৃত্যু, তা অনেক শান্তির। ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা আসে গয়ারামের। ঘুমিয়ে পড়ে মেনকার পাশেই।

কিসের শব্দে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় গয়ারামের। চোখ খুলতেই চোখে পড়ে প্রভাতের স্বর্ণাভ আলো। আর সেই সঙ্গে পাখীর গান। কি মিষ্টি সুর। তার কানের কাছে এসে গান শোনাচ্ছে। কি পাখী। কোথা থেকে এল। কান খাড়া করে রইল গয়ারাম। এ তো পাখীর কণ্ঠ নয়।

—একি!

ধড়মড় করে উঠে বসল সে। অবাক হয়ে চেয়ে রইল গয়ারাম। এ তো শিশুর কান্না। তার পাশেই শুয়ে ছোট্ট মানবশিশু। চীৎকার করে প্রভাতের সূর্যকে জানাচ্ছে তার আগমনবার্তা। হাত-পা ছুঁড়ে প্রমাণ করছে তার অস্তিত্ব। মৃত্যুর মাঝে জীবনের জয়ধ্বনি দিয়ে ঘুম ভাঙাচ্ছে বিশ্বচরাচরের।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল গয়ারাম। সন্তান। এর জন্যই বুঝি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে এসেছে এ দুদিন। তার ভয়াল ভ্রূকুটিকেও গ্রাহ্য করে নি সে। সে তো এই জীবন। এই কান্না। এই চীৎকার। রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া জীবন্ত এক মহাপ্রাণ।

কিন্তু কি করবে সে এখন। মহাসমুদ্রের মাঝে কেমন করে বাঁচাবে এই জীবনকে। চারিদিকে শুধু ক্ষিপ্ত রাশি রাশি গৈরিক জলস্রোতের ক্রুদ্ধ আস্ফালনের মাঝে কেমন করে এ জীবনকে রক্ষা করবে। কে আছে এখানে দ্বিতীয় সত্তা।

এতক্ষণে লক্ষ্য পড়ল মেনকাকে। চমকে উঠল সেদিকে লক্ষ্য পড়তেই। নীচে সমুদ্র। ওপরে আর-একটা সমুদ্র সৃষ্টি করে তার মধ্যে শুয়ে অচৈতন্য মেনকা।

—মেনকা। মেনকা!

সাড়া নেই। কি করবে গয়ারাম। কিছুই ঠিক করতে পারে না। একদিকে নবজাতকের চীৎকার অন্যদিকে অচেতন মেনকা। গয়ারাম ছট্‌ফট্ করে। কিছু ভেবে না পেয়ে উঠে বসে গাছে। চারদিকে চেয়ে চেয়ে আবার নেমে আসে। আসছে। কি একটা আসছে। হয়ত নৌকো। আসতেই হবে। সৃষ্টি যখন বর্তমান তাকে রক্ষার যোগাযোগটা ভবিষ্যৎ হতে পারে না।

একেবারে কাছেই এল সেটা। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকল তার আস্তানাতেই।

—কি ব্যাপার। কি রে।

আশায় আর আশঙ্কায় চেয়ে রইল সেটার দিকে। কলার ভেলার ওপর চারটি কঞ্চি চার কোণে পুঁতে টাঙানো একটা মশারি।

গয়ারাম দারুণ ঔৎসুক্য নিয়ে মশারিটা খুলে ফেলতেই আঁৎকে উঠে সভয়ে পিছিয়ে এল একটু। ভেলার উপর পরিপাটি বিছানায় শোয়ান এক লখীন্দরকে ভাসিয়ে দিয়েছে কারা কোন বেহুলার উদ্দেশে হয়ত।

গয়ারাম চেয়ে রইল কিছুক্ষণ সেদিকে বিমূঢ়ের মত। কি করবে সে এখন। একদিকে জীবন আর একদিকে মৃত্যু।

একদিকে অহিবিষে নীল হয়ে যাওয়া নীরবতা। গয়ারাম জীবন ও মৃত্যুকে এমন পাশাপাশি দেখে নি কোনদিন। এ এক অদ্ভুত বৈষম্য। একবার মৃত্যুকে দেখে চমকে উঠছে, পরক্ষণেই শিশুর চীৎকারে ফিরে আসছে জীব-জগতে। প্লাবনের দুর্বার গতির মুখে গয়ারাম যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে কেবল সেই মৃত্যু তার সামনে প্রত্যক্ষ। কার জয় হবে। মৃত্যুর না জীবনের।

যে মৃত্যুভয়ে গয়ারাম আধমরা হয়েছিল সেই মৃত্যুকেই জয় করল শেষ পর্যন্ত। তাড়াতাড়ি ভেলায় নেমে মৃতদেহটা ঠেলে ফেলে দিল জলে। যে মৃতদেহ দেখে প্রথমে ভয়ে শিউরে উঠেছিল গয়ারাম, চোখের সুমুখে তাদের শেষ পরিণতির এমন নিষ্ঠুর ভয়াবহ রূপ দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ভয়ে, সেই লাশটাকে অবলীলাক্রমে জলে ফেলে দিয়ে সেখানে শুইয়ে দিল অচৈতন্য মেনকা আর ক্রন্দনরত নবজাত শিশুকে। মরণের ভেলায় ভাসিয়ে দিল নবজীবনকে। তারপর নিজেও সে ভেলায় চড়ে পাড়ি দিল লোকালয়ের উদ্দেশে।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

শহর কলকাতা

সেকালের লাটভবন এবং একালের রাজভবন

মার্কুই ওয়েলেসলির নামাঙ্কনে আরেক সরণী

ওয়েলেস্‌লি প্লেস

এবং

রাজভবন

এ-দেশে ইংরেজ রাজতন্ত্রের সদর্পী উদ্‌গাতা ক্লাইভ। কিন্তু ভূ-ভারতের প্রতি প্রান্তেই উক্ত রাজতন্ত্রের প্রসার সাধনে যাঁরা নির্লজ্জ কৃতিত্বের অধিকারী—মার্কুই ওয়েলেস্‌লি তাঁদের মধ্যে শ্রেয়তম। তিনি তাঁর চতর্থ ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটনের পশুশক্তি এবং দুষ্টবুদ্ধির অব্যর্থ প্রয়োগবলে এ-দেশে কেবল যে ইংরেজ আধিপত্যের ভিত্তিই সুদৃঢ় ক'রে তোলেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে এ-দেশীয়দের মধ্যেও ইংরেজ-ভক্ত সারমেয়-বংশের উদ্ভাবক-রূপে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাই চিরকালের স্মরণীয় চরিত্ররূপে ইংরেজ সরকার তাঁর স্মৃতির সংস্থাপন ঘটে, শহর-কলকাতার একাধিক রাজপথে এবং উদ্যানে। তাঁর স্মৃতি-সংস্থাপিত সরণীর মধ্যে ওয়েলেস্‌লি প্লেস একাধারে রাজকীয়, ঐতিহ্য-ভাজন এবং সুসাবুজ্যে রমণীয়। এ-রাস্তার শীর্ষদেশের বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে রাজভবনের অক্ষয় অভিষেক ঘটায়, তার অপরিমেয় মহিমার ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে আরও।

আজ যেখানে একাধিক তোরণ-সংযোজিত রাজভবনের অধিষ্ঠান, এককালে সেখানেই ছিল তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি। একাধিক মহীরুহের ছায়া-বিচ্ছুরিত তৃণাঞ্চলে সাবর্ণ চৌধুরীদের দ্বিসাপ্তাহিক হাট বসতো শোনা যায়। উক্ত হাটেই নাকি হাট করতে আসতো গোবিন্দপুরের বাবুর দল, সুতানুটির কৃষকসমাজ এবং হুগলী অঞ্চলের তন্তুবায় শ্রেণী। তাছাড়া প্রথম দিকে চার্নক সাহেবেরও সাময়িক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এই হাট। কিন্তু পরবর্তীকালে চার্নক সাহেব যখন তাঁর বাণিজ্যের প্রধান বন্দর স্থাপন করেন বাগবাজারে এবং একাধিক উপবন্দর প্রতিষ্ঠা করেন বৈঠকখানা, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চলে, তখন নাকি স্বাভাবিক কারণেই বিলোপ ঘটে সেই হাটের। তারপর হাটের বিনিময়ে সেই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দিনে দিনে এক গোচারণ ভূমিরূপেই প্রকাশ করে তার স্বরূপ—যেখানে প্রায় প্রত্যহই আহিরীটোলা, বৈঠকখানা এবং কালীঘাট অঞ্চলের রাখাল-বালকদের সমাগম ঘটতো সকালে, দুপুরে এবং বৈকালে। ঠিক এভাবেই উক্ত তৃণাঞ্চলের আয়ুষ্কাল ছিল কবে পর্যন্ত—আজ তা নির্ধারণ করার কোনো উপায় নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম পরিচ্ছেদে যখন উক্ত ভূমিখণ্ডেই রাজভবন বা লাটভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন মার্কুই ওয়েলেস্‌লি, তখন তা বিচিত্র বৃক্ষের অনিয়ন্ত্রিত সমাবেশে এক পরিত্যক্ত অঞ্চলরূপেই পরিগণিত ছিল কলকাতায়।

শ্রীপদাতিক

লাটভবন বা রাজভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে। এ-দেশী এবং বিদেশী স্থপতিদের মধ্যে যাঁরা সেদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন শীর্ষাসন, তাঁদেরই সংঘবদ্ধ সাধনার সাফল্যের প্রতীকরূপে অচিরেই এক অভিরাম পরিবেশে অনিন্দ্যভঙ্গীতে মাথা তুলে দাঁড়ায় সেকালের লাটভবন। তার উত্তরে-দক্ষিণে এবং পূর্ব-পশ্চিমে সংযোজন ঘটে একাধিক তোরণের। প্রাঙ্গণ তার কায়া বিস্তার করে অজস্র ঋতুপত্রের বিচিত্র বিলাসে। লাট-ভবনের প্রতিকক্ষে এবং কক্ষের কারুকার্যখচিত প্রতি দেয়ালে বিভূষণ ঘটে বহুমূল্য আসবাবের, অমূল্য চিত্ররাজির, বিস্ময়কর বিচিত্র মূর্তির এবং সৌখীন ঝাড়লণ্ঠনের। বিশেষ এক অনুকূল দিনে, এই লাটভবনে প্রবেশোপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেন মার্কুই ওয়েলেস্‌লি চৌরঙ্গী থেকে লালদীঘি, এবং লালদীঘি থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিভিন্ন ভবনরাজি এবং গীর্জার শিখরদেশ সজ্জিত হয়ে ওঠে নানা রঙের

আলোকসজ্জায়। বিভিন্ন রাজপথে সমাহৃত হয় অজস্র কৃত্রিম তোরণ। ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের প্রতিভাসরূপে দেহ ভাসায় আলোকসজ্জিত সহস্র তরণী। উৎসবের উৎফুল্ল সঙ্কেতে তোপধ্বনি জাগে বারবার। গভর্নর ওয়েলেস্‌লির আমন্ত্রণে লাটভবনের উদ্ভাসিত প্রাঙ্গণে সমাগম ঘটে সহস্রাধিক ইংরেজ নারী-পুরুষের এবং এ-দেশীয় মহাজনদের—যাঁদের প্রতি বরদানে কোনো কার্পণ্য প্রকাশ করেন না বৈশ্যের দেবী। প্রত্যেককেই সবিনয়ে স্বাগত জানান মার্কুই ওয়েলেস্‌লি। তাঁর সাড়ম্বর দরবার বসে লাটভবনের উত্তর অলিন্দের সুপ্রশস্ত অঙ্গনে। দেশীয় সামন্ত রাজা, তদানীন্তন জমিদার শ্রেণী এবং ইংরেজ অভ্যাগতদের উদ্দেশে নীতিদীর্ঘ ভাষণদান করেন তিনি। তারপর পানাহার পর্বের সমাপ্তি ঘটলেই তিনি অভ্যাগতদের সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমবিস্তীর্ণ হলঘরে। এই হলঘরেই এক বহুমূল্য এবং বিস্ময়কর গালিচার প্রান্তদেশে সংস্থাপন ঘটেছে সিংহাসনের। গালিচার অভূতপূর্ব বর্ণের উদ্ভাসেই যেন ম্লানিমার উত্তরীয় পরেছে সেই কারুকার্যখচিত সিংহাসন। এ-গালিচা ইংরেজ তার স্বদেশ থেকে আমদানি করে নি। মহীশূরপতি টিপু সুলতানের দরবারকক্ষ থেকে তা লুণ্ঠন ক'রে এনেছিলেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। সেদিন সেই লুণ্ঠিত গালিচাই নবনির্মিত লাটভবনের দরবারকক্ষে উজ্জ্বল মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ঘটায় সগৌরবে। ---যাই হোক, এই গালিচা মাড়িয়েই সিংহাসনে উপবেশন করেন সেদিন মার্কুই ওয়েলেস্‌লি। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের মধুর ঐকতানের সমতালে আসর জ'মে ওঠে নাচের, গানের এবং নেশাতুর উল্লাসের। এই জমজমাট আসর যখন উদ্দাম পদসঞ্চারে এগিয়ে আসে রাত্রির তৃতীয় অঙ্কের উপান্তে, তখন লাটভবনের বহিরঙ্গনে আবার সুরু হয় আতসবাজির অনুষ্ঠান। এ-অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন লক্ষ্ণৌ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত সুদক্ষ কারিগরবৃন্দ। তারপর আতসবাজির অনুষ্ঠানে যবনিকা নামলেই নৃত্য-গীতের আসর জ'মে ওঠে আবার। সম্ভবত রাত প্রায় চারটের পর এই আসরের উচ্ছল গতিময়তায় ক্লান্তির ছায়া নামে ধীরে ধীরে।

লাটভবনের সেই মহোৎসবের সূত্রেই একটি উপকাহিনীর প্রচলন ঘটেছিল কিছু পরবর্তীকালে। যদিও আজ তা স্তিমিত অনেকের স্মৃতিতেই এবং তা ইতিহাসগ্রাহ্য কি না—সে-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট, তবু শ্রুতির কাছে তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বলেই এখানে তার পরিবেশনা খুব একটা অসামঞ্জস্য হবে না হয়তো। কাহিনীটি এই :

গভীর রাত্রের আতসবাজির শেষে আবার যখন নৃত্য-গীতের আসর জ'মে ওঠে, তখন মদ্য পানান্তে বিভ্রান্ত এক ইংরেজ রমণী হঠাৎ ছুটে এসেই নাকি চুম্বনদান করে এ-দেশীয় এক তরুণ সামন্তরাজকে। উক্ত রমণীর যিনি স্বামী, এ-দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসায় তিনি নাকি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন ভীষণ। তাঁর ধারণা জন্মে : সুদর্শন সেই সামন্তরাজাই প্রলুব্ধ করেছেন তাঁর স্ত্রীকে। সুতরাং তিনি ছুটে এসেই মত্ত অবস্থায় এক প্রচণ্ড ঘুষি ছোড়েন সামন্তরাজাকে লক্ষ্য ক'রে। রাজা এই আকস্মিক ঘটনায় বিচলিত হয়ে পড়েন সাময়িকভাবে। তারপর যখন বুঝতে পারেন : এ-ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ, তখন সবেগে তিনিও এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতের মাধ্যমে যোগ্য জবাব দেন রমণীর স্বামীকে। সুতরাং এবার স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেশ দানা বেঁধে ওঠায় নাচ-গানের মুখর পরিবেশে এক বিরক্তির ছবি ফুটে ওঠে হঠাৎ। তাই উভয়ের মাঝখানে ছুটে আসেন গভর্নরের চতুর্থ ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন আর্থার ওয়েলেস্‌লি।

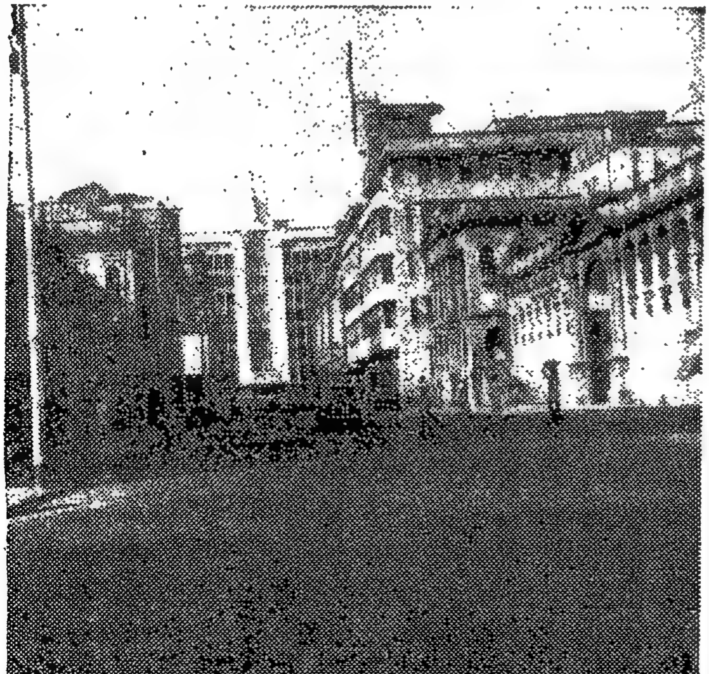

● ওয়েলেসলি প্লেসের দৃশ্য

তিনি ধীরমস্তিষ্কে শ্রবণ করেন উভয়েরই বৃত্তান্ত। হয়তো তিনি বুঝতেও পারেন : এ-ক্ষেত্রে রাজার কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ রমণীর শ্লীলতা-হানির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন রাজাকেই এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে বহিষ্কার করেন উৎসবের আসর থেকে। অপমানিত রাজা রাতের অন্ধকারে একাকী তাঁর নিজগৃহে ফিরে আসেন সত্য, কিন্তু ভোর হওয়ার পূর্বেই দুজন বলিষ্ঠ পাইকসহ তিনি নাকি গোপনে আবার হানা দেন লাটভবনে। সেই মদমত্তা রমণীর স্বামীকে তিনি কৌশলে অপহরণ ক'রে টেনে আনেন লাটভবনের বহির্দেশে। তারপর সেখানেই সাহেবকে গলা টিপে হত্যা ক'রে তার শবদেহ রেখে যান লাটভবনের উত্তর তোরণোপান্তে।

কিন্তু তারপর? তারপর এ-কাহিনীর আর কোনো বিস্তার নেই। পরদিন প্রভাতে সাহেবের শবদেহ ইংরেজকুলের মনে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, এবং তারা উল্লেখিত সামন্তরাজার বিরুদ্ধে সত্যই কোনো শাস্তিবিধান করেছিল কিনা—সে-বিষয়ে তাঁদের উক্তিতে কোনো ইংগিত নেই—যাঁরা এ-কাহিনী কথায় কথায় আজও বিবৃত করেন। অতএব, তারপর কী হলো—বর্তমান নিবন্ধকারের কাছে সে-প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা সমীচীন হবে না পাঠকবৃন্দের পক্ষে।

লাটভবন বা রাজভবন আত্মপ্রকাশের পরেও ওয়েলেসলি প্লেসের কোনো অস্তিত্ব ছিল না এ-অঞ্চলে। ওয়েলেসলি প্লেস এ-অঞ্চলের এক বিশেষ সরণী-রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ১৮০৩ খৃস্টাব্দে। তখন রাস্তার পূর্ব বাহুতে লালদীঘির মতোই চতুষ্কোণাকৃতি একটি ছোটো পুকুর ছিল—সেকালেই যার নামকরণ হয়েছিল Little Tank. এই Little Tank-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী রাস্তার অন্যতম রাস্তা ছিল ওয়েলেসলি প্লেস। তাই ওয়েলেসলি প্লেস তখন অভিহিত ছিল সম্ভবত ভিন্ন কোনো নামে। অনেককাল পরে উক্ত Little Tank-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যখন মাথা তুলে দাঁড়ায় সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস, সম্ভবত তখনই পশ্চিম পার্শ্ববর্তী সেই রাস্তা নামধারণ করে ওয়েলেসলি প্লেস। এই ওয়েলেসলি প্লেস লাটভবনের উত্তর তোরণ থেকে সরাসরি ডালহৌসী স্কোয়ার বা ট্যাঙ্ক স্কোয়ার গমনাগমনের জন্যেই যে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তা প্রমাণের স্বপক্ষে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার এক মন্তব্যের উদ্ধৃতিই যথেষ্ট :

'The Road in which the Telegraph office and Spence's Hotel are now located was opened in 1803, in order to provide a direct route from North Gate of the newly built Government House to Dalhousie or as it was then called Tank Square...'

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে যখন ভারতের সর্বত্রই সেপাই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, তখন এই ওয়েলেসলি প্লেস সংলগ্ন বসতি অঞ্চলেও একদিন এক আকস্মিক আতঙ্কের শিহরণ জাগে অহেতুক। অর্থাৎ সেদিন গুজব রটে : ব্যারাকপুর থেকে একদল বিদ্রোহী সেপাই ওয়েলেসলি প্লেস সংলগ্ন লাটভবন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজদের সমগ্র বসতি অঞ্চল আক্রমণ করার জন্য সশস্ত্রে ছুটে আসছে। তাই বসতি অঞ্চল ছেড়ে বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায় অধিকাংশ ইংরেজ বাসিন্দা। আর কেউ কেউ গৃহের বহির্দ্বারে তালা ঝুলিয়ে অন্দর-মহলে আত্মগোপন করে নিঃশব্দে। কিন্তু পরে দেখা যায় : বিদ্রোহী সৈন্য নয়, একদল ইংরেজ সৈন্যই

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত এই প্রাচীন ভাস্কর্যটি ভারতীয় কেশবিন্যাসের একটি ঐতিহ্যময় সাক্ষ্য। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্য্যের।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারল চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সরভিসংপৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯

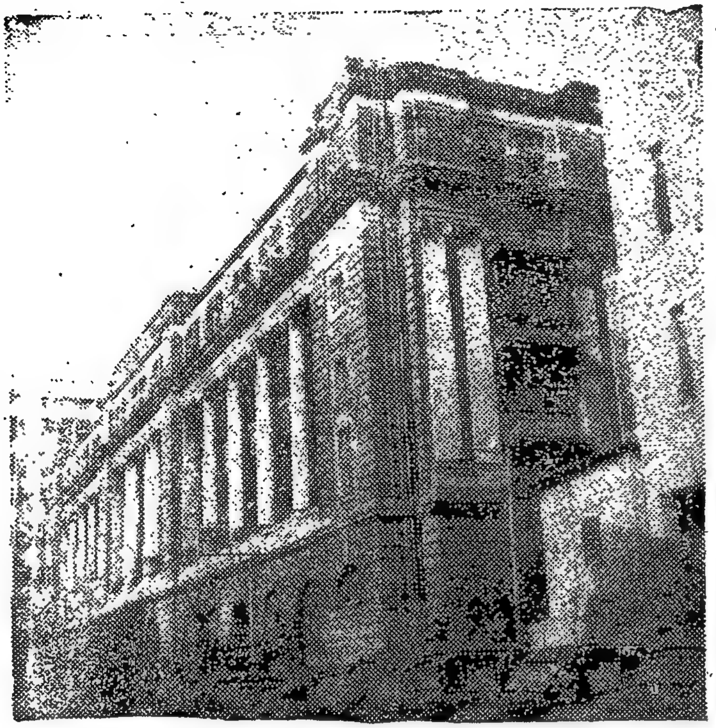

সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস

দ্রুত কুচকাওয়াজের তালে এগিয়ে আসছে ওয়েলেস্‌লি প্লেসের বুক বেয়ে। তাদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য : এতদঞ্চলের এ-দেশীয় মুষ্টিমেয় সৈন্য-বাহিনীকে নিরস্ত্র ক'রে লাটভবন এবং ইংরেজ বসতি অঞ্চল সুরক্ষিত করা। সেপাই বিদ্রোহের প্রচণ্ড আগুন এতদঞ্চলের এ-দেশীয় সৈন্য-মহলেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে ভেবেই তাদের নিরস্ত্র ক'রে পূর্বাহ্নে সাবধানতা অবলম্বন করেন ইংরেজ সরকার। অথচ তা সত্ত্বেও ওয়েলেস্‌লি প্লেস সংলগ্ন বসতি অঞ্চল থেকে সেই আকস্মিক আতঙ্কের ঘোর কেটে যেতে সময় লেগেছিল বেশ কিছুকাল।

এককালে ওয়েলেস্‌লি প্লেসের যে-অংশে ছিল সেই Little Tank, আজ সেখানেই উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে এই বিশাল গৃহের নক্সা প্রস্তুত করেছিলেন তদানীন্তন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ব্র্যানফা। তাঁর সেই নক্সা অনসারেই গৃহের নির্মাণকার্য সুরু হয় ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে। গৃহটি সত্যই বিশাল এবং প্রাচীন স্থাপত্যের এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। তার ভিত্তির উচ্চতাই পাঁচফুট। ভিত্তির উপরিভাগ থেকে তার সমস্ত শিখর পর্যন্ত উচ্চতার মাপ প্রায় একশ' কুড়ি ফুট। এ-গৃহের মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণ অভিনব—যার কোনো উদাহরণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় শহর-কলকাতার অন্য কোনো গৃহে। তার সুদৃশ্য অলিন্দশ্রেণী Coignet style-এ নির্মাণ করেন মেসার্স ফরনারো ব্রাদার্স। আর তার ফটকসমূহ নির্মাণ করেন মেসার্স বার্ন এণ্ড কোম্পানী। সেকাল থেকে একালেও ৮নং ওয়েলেস্‌লি প্লেসের এই বিশাল গৃহেই ট্রাঙ্ক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সহ সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস অবস্থিত। এই সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের একাংশ ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে পরিদৃশ্যমান।

এ-রাস্তাতেই অবস্থিত শহর-কলকাতার প্রাচীনতম হোটেল 'স্পেন্সেস'। স্পেন্সেস হোটেল ছাড়াও ব্যাঙ্ক, বন্দুকের দোকান, গ্যারেজ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন আবাসগৃহের সুনিয়ন্ত্রিত সন্নিবেশ ঘটেছে এ-রাস্তার উভয় বাহুতে। অফিস-পাড়ার রাস্তা হলেও, অন্যান্য রাস্তার মতো বেসামাল ভীড়ে বিপর্যস্ত নয় ওয়েলেস্‌লি প্লেস। দ্বিপদচারীদের পদসঞ্চার এখানে নির্ধতি হলেও, বেশ একটা নির্লিপ্ততা অনুভব করা যায় রাস্তার আসীমান্তে। সমগ্র রাস্তা আগের দিনের মতোই পরিমার্জিত, সুশোভন এবং প্রস্থে সুবিস্তৃত। আজ তা স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্পদ। অথচ তা সত্ত্বেও, সাম্রাজ্যবাদের সেই বিখ্যাত দালাল মার্কুই ওয়েলেস্‌লির স্মৃতিই সে আজও বহন করছে কেন—আমাদের সামান্য বুদ্ধি তার হদিস নির্ণয়ে অক্ষম।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সাত ॥

॥ লুঠে কাটে মারে
ছমুতে পাএ জারে ॥

শ্মশানতলার মাঠে বরগীদের সঙ্গে বাগদীদের লাঠালাঠি। আঁধার-মাণিকের বাগদীরা যখন মাঠসই হচ্ছে তরোয়ালের চোটে, ফুলেশ্বরী তখন পথে। বিপণ্ন, বেপথুমতী, ভয়ে কাঁপছেন।

সুরকণ্ঠের ওপর ভরসা না করে নিজেই বের হয়েছেন পথে। এ ...নের সব পথ জানেন না, শুধু একটি পথ চেনেন। মনে অসম্ভব সাহস এনেছিলেন সন্ধ্যায়। দুঃসাহসিক কাজ করবার জন্য যেমন প্রয়োজন। ভয় থাকলে আর এ গ্রামে আসতেন না। সাহস তাঁকে করতেই হবে। পিতার রক্তচক্ষু মনে পড়ে. স্বামীর সদর্প প্রত্যাখ্যান, কিন্তু এখন যদি তিনি সাহস না আনেন, তবে তাঁর জীবন ভেসে যায়। তাছাড়া, এখন তাঁকে চলতেই হবে, ফেরবার পথ কাঁটা বুজিয়ে দিয়ে এসেছেন।

কিন্তু বেশি এগোতে পারলেন না। কিছুদূর এগোতে না এগোতেই ভয়ঙ্কর কোলাহল, লাঠির শব্দ, ঘন ঘন উচ্চরোল শুনতে পান, আগুনের আভা, দেখেন। 'তোমরা সব চেতন হও, গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে,' রামাই-এর চীৎকার নৈশ-প্রকৃতির বুকে ক্ষুধার্ত ও ভীত শৃগালধ্বনির মত ভয়ঙ্কর শোনাচ্ছিল।

ডুমুরগাছ ধরে ফুলেশ্বরী নিজেকে সামলালেন। কপালে করাঘাত করলেন। জীবনে দিবালোকে যে পথে হাঁটেন নি, রাতে সে পথ দিয়ে চলতে কত ভয় হচ্ছিল। পথের ভয় নিমেষে দূরে গেল। কলঙ্কের ভয়, বিপদের ভয় তাঁকে নিশ্চল করল।

সুরকণ্ঠের বাড়ি ছাড়তে কত না অধীর হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় সুরকণ্ঠের পিসীমার নিষ্ঠুর কথা কত অসহ্য মনে হয়েছিল। এখন মনে হল সে গৃহই সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সে বৃদ্ধার আঁচলের তলে মুখ লুকোলে লোকে তাঁকে নির্লজ্জ বলবে না। ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন ফিরে ছুটে চললেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে খিড়কী খুললেন। পাছ দুয়োরের আগড় খুলতে দেখেন উঠোনে সুরকণ্ঠ।

'ভাগ্য!' দস্যুভয় ভুলে তিরস্কারের ভয়ে ফুলেশ্বরী আবার সচকিত হলেন।

'ফুলি।' সুরকণ্ঠের কণ্ঠে গভীর স্বস্তি। 'শীগগির ভেতরে এস. বড় বিপদ।'

'কি বিপদ?' ফুলেশ্বরী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে জিজ্ঞেস করেন, 'কি হল?'

'কাতারে কাতারে ঘোড়া। বাগদীদের সঙ্গে জবর লড়াই লেগেছে।'

'কাদের?'

'জানি না। কিন্তু ফুলি, আমার এ বাড়িতে ত' তোমাকে লুকোই এমন ঠাঁই নেই। কি করি?'

'পাগল কোথায়?'

'সে বুড়ীর সঙ্গে ঢেঁকশেলের পেছনে।'

'কি করছে।'

'আর কি করছে। লুকোচ্ছে। কোথায় লুকোবে। যে সৈন্য দেখলাম, তারা ভোর হতে গাঁয়ে নইচাম দেবে।'

'তবে উপায়?' ফুলেশ্বরী ফুকরে কেঁদে উঠলেন, 'তুমি আমায় বাঁচাও, ভাগ্না।'

'চল তোমায় দিয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'আর কোথায়। তোমার শ্বশুর-বাড়ি। তাদের কোঠাঘর, পাকা দালান, এমন ভিখিরীর কুঁড়ে নয়।'

'না ভাগ্না।' ফুলেশ্বরী থরথর কাঁপতে কাঁপতে স্বেদাক্ত মুখে বললেন, 'তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ। তারা জানে না আমি এসেছি। এখন রাতের আঁধারে তোমার সঙ্গে গেলে তারা কি ভাববে?'

'ভাবে ভাবুক। দায় তাদের, আমার কি?'

'না ভাগ্না। তুমি পাষাণ হয়ো না। আমার কলঙ্কে ছি ছি পড়বে, আমার কথা কাক-চিলের মুখে ছড়াবে, আমায় জ্যান্ত মাটিতে পুঁতবে ওরা।'

'আগে এ কথা ভাবা উচিত ছিল।' সুরকণ্ঠ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'চল চোরকুঠরীতে যাই।'

'সেখানে কি----?'

'চল দেখি।'

সুরকণ্ঠ ঘরে এলেন। চকমকি ঠুকে পিদীম জ্বালালেন। অন্দরের যে ঘরে ফুলেশ্বরী বিকেলে কেশ-বিন্যাসে বসেছিলেন, সে ঘরের কোণের চৌকি ঠেললেন। চৌকির পেছনে দরজা, চোরকুঠরীতে ঢুকলেন।

বদ্ধ বাতাস, দুর্গন্ধ। এক কোণে পুঁটলিবাঁধা তুলো, ভাঙ্গা লক্ষ্মী-পুজোর চৌকি। বললেন, 'এখানে থাক, আমি পিসীমাকে ডাকি।'

পাগল আর পিসীমা এলেন। সুরকণ্ঠ বললেন, 'ফুলি আর পিসীমা বস। আমি চৌকি ঠেলে রাখি। পিদীম রাখ। পাগল তুই ঢেঁকশেলের পেছনে যা।'

'ঠানদি যেখানে আমি সেখানে,' পাগল ক্ষীণ স্বরে বলে। সুরকণ্ঠ হাসলেন। বললেন, 'গাঁয়ে ডাকাত পড়েছে, তো বেটার ভূতের ভয় গেল না।'

'ভাগ্না কোথায় যাও?'

'আমি বাইরে দাঁড়াই।'

'বাইরে দাঁড়াবে কি? এই বলছ কাতারে কাতারে মানুষ', পাগল কাতর মিনতি করে।

'কাঁঠাল গাছের ঘন পাতা', পিসীমা সুরকণ্ঠকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। দস্যুভয়ের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় নয়। আগেও কাঁঠাল-গাছের ওপর আত্মগোপন করা হয়েছে।

'তাই যাব।' সুরকণ্ঠ বেরিয়ে গেলেন।

দরজা পড়ল। চৌকি ঠেলা হল। ভেতরে বসে ফুলেশ্বরী ঘামতে লাগলেন। পাগল কান পেতে দূরের গোলমাল বাড়ে না কমে শুনতে থাকে। পিসীমা ক্ষীণালোকে ওপর পানে চোখ রেখে স্থির। তাঁকে ঘিরে আলোছায়ার রহস্যময় পরিমণ্ডল। কোলের ওপর হাত রেখে দু' ঠোঁট নেড়ে ঠাকুরের নাম জপ করেন। একবার শুধু, ফুলেশ্বরীর দিকে বিরূপ উদাস দৃষ্টি রেখে, স্বগত বললেন, 'কত সোনাদানা আছে ঘরে, যে সুরকণ্ঠ আমাদের পাহারা দিতে রেখে গেল?'

নিশ্বাসের বাতাস কমে আসছে। ঘর ক্রমে দুর্গন্ধ হয়ে উঠছে। ওদিকে কোলাহল ক্রমে বাড়তে থাকে। সুরকণ্ঠের সাড়া নেই। ফুলেশ্বরী পাংশুমুখে মনে মনে ডাকেন কিরীটি-শ্বরীকে। মনে হয় বাইরে সর্বনাশ ঘটে যাবে। সুরকণ্ঠ বলতেও সময় পাবেন না যে ঐখানে চোর-কুঠরীতে মানুষ আছে, দোর খুলে দিয়ে বাঁচাও। হয়ত এই-ই বিধি-লিপি। ফুলেশ্বরী সকলের কথা অমান্য করে লুকিয়ে এখানে এসেছেন, তাই এবার শাস্তি হবে। ক'টি প্রিয়মুখ মনে পড়তে লাগল। আর কি দেখা পাবেন?

'ভাগ্না----' কি যেন বলতে গেলেন।

পাগল বললে, 'ওকে আর ডেকো নি বাবু। তিনিই কুডাক ডেকে ডেকে এই সর্বনাশটা আনলে।'

'হ্যাঁ, তোমার খুড়ো সব জানে। এত যদি জানে---'

'সে বাঁ ভিমত মড়া জাগায়, মড়া নাচায় জানলে?'

'এত যদি জানে ত' তাড়িয়ে দিক্ না ওদের!'

'হ্যাঁ, তাড়িয়ে দেবে! ওনার একার শক্তিই কি সব! আরো কত শক্তিমান রয়েছে না?'

'তাই বল, তোর খুড়োর চে' অনেক ভাললোক আছে।' ফুলেশ্বরী যেন পাগলের সঙ্গে ঠাট্টা করে সহজ হতে চেষ্টা পেলেন। যদিও গলায় কোন স্বাভাবিকতা এল না।

বাইরে কাঁঠালগাছের ওপর বসে সুরকণ্ঠ চিন্তায় ভারী হয়ে উঠতে লাগলো। গোলমাল মোটেই

কমছে না। এখন যেন বাড়ছে, ক্রমেই বাড়ছে। সত্যি সত্যি গুরুতর একটা হাঙ্গামা বাধলে তিনি ফুলেশ্বরীকে নিয়ে কি করবেন? বাগদীদের মত বনে পালাবেন?

বাগদীদের মত বনে! প্রস্তাবটি নেহাৎ মন্দ নয়। বিপৎকালে ভগবানই বুদ্ধি জোগান, তিনি বিপদ-বারণ। ডাকাত পড়লে তারা জঙ্গলে পালায়, খাজনা আদায় করতে জমিদার লেঠেল পাঠালে গা-ঢাকা দেয় জঙ্গলের সীমান্তে। মাঝে মাঝে চারক্রোশ দূরের রাজপথ দিয়ে নবাব, রাজা বা জমিদার যাত্রা করেন। কখনো যুদ্ধে যান, কখনো তীর্থ-দর্শনে। তখন আশপাশের গাঁ থেকে রসদ সংগ্রহ করবার ধুম পড়ে যায়। গরু, ছাগল, হাঁস সব তাড়িয়ে নিয়ে ঐ জঙ্গলে চলে যায় বাগদীরা।

জঙ্গলের গভীরে যায় না, বাইরের সীমানায় গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু, স্বুরকণ্ঠ ভাবতে লাগলেন চারক্রোশব্যাপী সে নিবিড় জঙ্গলে একবার ঢুকতে পারলে মন্দ হয় না। যদিও, কলঙ্কের ভয় তাতে নেহাৎ কম নয়।

গাছের ডালে বসে বসে স্বুরকণ্ঠের মনে ভক্তি এল। গাছে চাপা তাঁর অভ্যেস আছে। এক সময়ে হাড়ির মেয়ে কুমিবুড়ীর খোঁজে ডোমকল অবধি ধাওয়া করে-ছিলেন। কুমি ছিল ডাকিনীসিদ্ধ। গাছে চেপে যাওয়া-আসা করত। স্বুরকণ্ঠ তার সাকরেদী করতে গিয়েছিলেন।

বুড়ী ভারি বজ্জাত ছিল। মাটিখাওয়া কাজ করেছিলেন স্বুরকণ্ঠ। তাঁকে শুধু মিছে ঘোরাত, মাঝে মাঝে গাল দিত, আর স্বুরকণ্ঠ যখন মনস্থির করে মন্ত্র জপে বসতেন, তখন কাছে বসে অশ্লীল সব ছড়া বলত। স্বুরকণ্ঠ আপত্তি জানালে হেসে হেসে বলত, 'ত্যাখন কত সব দত্যিদানা ভয় দেখাবে, কত গোরো (ফর্সা) বিটি এসে মন ভোলাবে, আসন ছাড়া করতে চাইবে না? ত্যাখন সইতে পারিস যাতে, তাই ত' শেখাচ্ছি।' আসলে কিছুই শেখায় নি সে। গাছের ডালে বসে বসে স্বুরকণ্ঠ একটি জিনিসই সইতে শিখলেন, সেটি কাঠ-পিঁপড়ের কামড়। এখন সে-কথা মনে পড়ল।

তারপর চোখ বুজলেন। শক্ত হয়ে গাছে বসে দু-পাঁচ লহমা

ঘুমিয়ে নেওয়া তাঁর অভ্যেস আছে। ওদিকে হইচই, বাঁশফাটার আওয়াজ যেন চলতেই থাকে।

অন্ত্যজ পাড়ার বাগদীরা কেন, সকলেই তখন ভাবছে—জঙ্গলে পালালে হত। জঙ্গলের কথা যখন মনে পড়ল, তখন আকাশ ফিকে হচ্ছে, ওদিকে আগুনের তেজ কমে এসেছে, এখন পালাতে গেলেই চোখে পড়ে যাবে।

কিছুক্ষণ লাঠি চালাবার পর রামাই মাথাঘুরে পড়ে চোট খেয়ে। জ্ঞান হবার পর সে আর এক দণ্ডও দাঁড়ায় নি। 'এ ডাকাত সে ডাকাত নয়,' বলে পালিয়ে এল নিজের পাড়ায়। বললে, 'যেমন করে হোক জঙ্গলে পেল্যয়ে চল।'

'এই সব ফেলে?'

'তবে মর গা।' তারা সাধু-সন্ন্যেসী বলে রেয়াৎ করছে না, ঝুলি ঝোলা উল্টে দেখছে, তোমাদের ছেড়ে দেবে, ভেমো চাষার আর বুদ্ধি কত হবে?'

এ-হেন সম্ভাষণে পিতৃতুল্য খুড়োকে আপ্যায়ন করে রামাই জঙ্গল পানে রওনা হল।

গরু ভেড়ার দড়ি কেটে দিলে সবাই, বাসনকোসন যা নিতে পারলে না, তা পুকুরে ফেললে। তারপর পোঁটলা-পুঁটলী বগলে নিয়ে গুড়ি-গুড়ি জঙ্গলের দিকে চললে। রামাই-এর ধরণগতিক দেখে পারীর সন্দেহ হল।

'আমাদের ত' নিয়ে চললে, আমার ভাই-বোনাই কোথা?'

'চুপ কর্।'

'কেন, চুপ যাব কেন, তাদের চালাস নিতে হবে না?' পারীর মনে হঠাৎ ঘোর সন্দেহ হল।

'পরে নিস্। তারা পেল্যে বেঁচেছে।'

রামাই-এর গলার স্বর যেন কেমন। আত্মনির্ভরতা নেই। যে কথা বলছে তা কি সে বিশ্বাস করে? পারী দেখতে পেলে রামাই-এর মাথার ফেটার নীচের পেতলের পাত দুমড়ে গেছে। ধারালো কোন অস্ত্রের আঘাতে তার কপাল থেকে ডান কান অবধি ফাঁক। রক্ত জমে আছে, মাংস বেরিয়ে এসেছে।

'ওগো এ কি সর্বনাশ গ'।' পারী চেঁচাতে গেল।

'চুপ যা।' রামাই-এর ধমকে এমন কিছু ছিল যে পারীর কান্না মাঝপথে থামল।

চলতে চলতে এক থুত্থুরে বুড়ী বিরক্ত হয়ে শুধোলে, 'হ্যাঁ আমাই, খুব নাকি নেজমতে চাকরি করিস, তা এতগুলো ডাকাত এসে পড়ল তোর মত হুঁশঅলা ছেলো তার এতটুকু টের পেলি না?'

'চুপ যা।' রামাই একই জবাব দিলে।

পরে, জরুরী পঞ্চায়েতে পাতানী পিসী একই প্রশ্ন তুললেন একদিন।

বললেন, 'পাঁচমাথা এক ঠাঁই হয়েছ, এখন শুধোই। আমরা মেয়েছেলে, দশহাতে কাছা নেই, তা তোমরা ত' সবাই ছিলে, এতবড় একটা নৈরেকার কাণ্ড ঘটে গেল আগে জানতে পার নি?'

না। জানতে পারে নি। আঁধারমাণিক গ্রামের লোক সবাই নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল, সন্ধ্যেবেলা দাবা খেলছিল, এবং মাঝে মধ্যে একত্র হয়ে বহু মূল্যবান প্রসঙ্গ নিয়ে কূটবিচার চলছিল। কোন বাড়িতে মামাশ্বশুর ভাগ্নেবউ-এর মুখ দেখে ফেলেছে। শ্যাম ঘোষ জেতে গয়লা কিন্তু স্বভাবে চাষার। ভোলা ঘোষের বউ-এর নাক বড় লম্বা, পরের ঘরের কেচ্ছা শুঁকতে ছাড়ে না। মধুর শ্বশুর বড় সেয়ানা, আড়াই বিঘে জমি নিষ্কর আদায় করলে, আনন্দীরামের সংসার হাতে এখনো জেয়দা টাকা আছে, স্নানান্তে রামখণ্ডী মিশ্রী দিয়ে জল খায়, ইত্যাদি কথায় বাতাস গরম হচ্ছিল।

পাতানী পিসীকে ধমক দিয়ে অবশ্য হালদার মশায় বলেছিলেন, 'তোর বড় ঘেনর ঘেনর করা অভ্যেস। আমরা টের পাব। বলে তা'বড় তা'বড় মানুষ সব ঠেক খেয়ে গেল। টের পাব কি। আমরা কি জন্মে ও জেতের লোক দেখেছি?'

'রাম কহ, রাম কহ', আরেক বৃদ্ধ বললেন, 'বেটারা বামুন দেবতা বলে কিছু মানলে না?'

'আর দেবতা বামুন।' পাতানীপিসী খর খর করে বললেন, 'কলিতে আর দেবতা বামুনের মহিমে থাকবে না। সাধুসন্ন্যেসীদের ক্ষ্যামতার নাকি অবধি নেই? পারলে তারা ঠেকাতে? তাদের গাঁজার কলকেটা অবধি কেড়ে নিলে না? আসলে দেবতা বল, বামুন বল, সন্ন্যেসী-ফকির বল, কারো কোন সাধ্যি নেই বিপদ এলে ঠেকাবার।'

তবে সে পরের কথা।

রাত পোহাতে তবে বোঝা গেল পাতানী পিসীর নৈরেকার কাণ্ডের আসল চেহারাটা।

'দেহ, দেহ, আরো দেহ, সোনা, রূপা, তঙ্কা,' বোঝা গেল বরগীরা একটি বিনে দুটি বাংলা শেখে নি, একটিতে যখন কাজ চলে যাচ্ছে তখন আর অন্য কথা শেখবার দরকারও অনুভব করে নি। (ক্রমশঃ)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতা প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

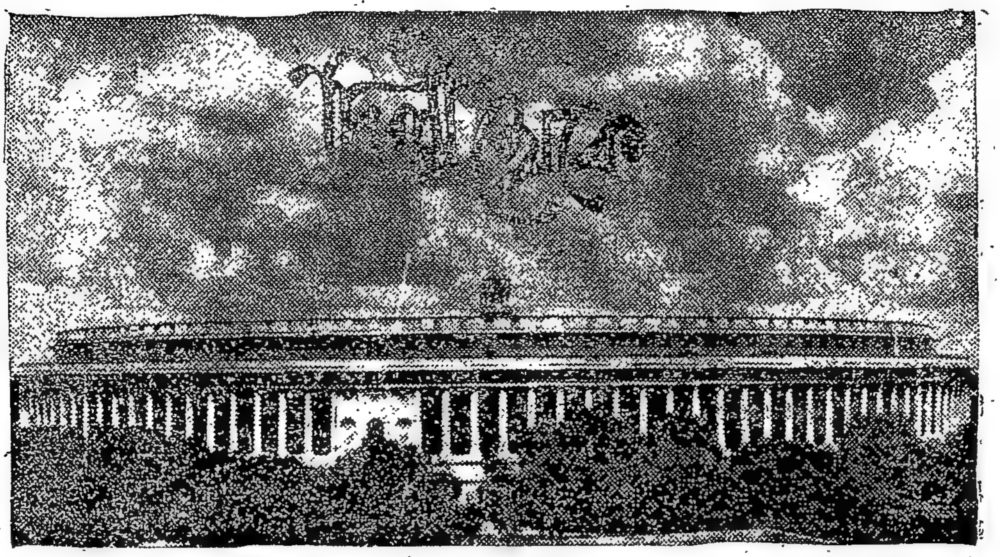

দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

মূককে যিনি বাচাল করেন, পঙ্গুকে যিনি গিরি লঙ্ঘন করান, করীকে যিনি পঙ্কে বদ্ধ করেন তার নাগাল আজও পাই নি। এ জীবনে পাব কিনা জানি না। তবে রাজধানী মহানগরী দিল্লীতে ভিখিরি নামক হতভাগার দলকে সাময়িকভাবেও যে ক্ষুদ্র ফলটি মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিতে পারে আজ না হয় তার কথাই শুনুন।

আমি আজ দিল্লীর রাজপথের শত-সহস্র ছায়াঘন জামগাছের কথাই বলব। রাজা-বাদশার দেশ। পোলাউ কোর্মা কাবাব কালিয়া ছাড়া যাদের খানাপিনায় ব্যাঘাত ঘটে—আজ না হয় আমাদের আলোচনা থেকে তাদের ছুটিই দিয়ে দিন। আরুইন রোডের ফ্যাশনেবল্ ফলের দোকানে আজ নাই বা গেলাম।

এত রাজনীতির ভেল্কিবাজী, সমাজনীতির পরিবর্তন, অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতির বিষয় হাতে থাকতেও সামান্য ফল জাম নিয়ে লেখা কেন? সত্যিই তো স্পর্ধা নেহাৎ কম নয়। রাজা-উজীরের ভিতর হতভাগা জনতার একজনের উঁকি মারায় কি দুঃসাহস।

দিল্লীর রাজপথে শত-সহস্র জাম পড়ে থাকে? থাকে। ইণ্ডিয়া গেট, পার্লামেণ্টারী ষ্ট্রীট, তালকটোরা রোড, রাজপথ, জনপথের দু'পাশে সারিবদ্ধ শুধু গাছ। বছর কুড়ি-পঁচিশ পূর্বে যেদিন রাজপথে এ অতি পরিচিত ফলটি দেখেছিলাম, সেদিন নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারি নি। দিল্লী মানেই সেদিন কিশোর মনো-মুকুরে আঁকা ছিল একটা রুক্ষ কর্কশ শহরের ছবি, যার অনুর্বর ভূমিতে খেজুর ছাড়া হয়তো আর কিছুই জন্মাতে পারে না। পরে জেনেছি তাও নাকি দিল্লীতে জন্মায় না।

দিল্লীর রাজপথে জাম পড়ে রয়েছে। একটা দুটো নয়, শত-সহস্র। সেইগুলো কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে একদল হতভাগা অন্তত দু-দুটি মাস দু' মুঠো খাবার জোগাবে। মৃন্ময়ী মূর্তি (ভক্ত পাঠক ক্ষুণ্ণ হবেন না, অনেক অভিমান নিয়ে বলছি। না হলে মহাকালীর দেশে আকাল কেন?), যা আজ করতে অপারগ—একটি ছোট্ট ফল রাজধানী দিল্লীর বুকে তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখছে।

ওদের জাম কুড়োতে দেখে অতিকষ্টে নিজেকে আটক রাখি। শহরের নকল সভ্যতার অক্টোপাসে গ্রামীণ মনটা বাঁধা পড়েছে। তবুও কারণে-অকারণে মাঝে মাঝে সে উঁকি ঝুঁকি মারে, তাকে চেপে রাখা যায় না।

মনে পড়ে দীঘির কালো জলে নীল রঙের ঐ ছোট্ট ফলগুলো গাছ থেকে টুক করে পড়ে কি রকম যেন মিলে যেতো। পাকা জামগুলো ভাসতো বইকি। কলকাকলি মুখরিত সেই ছোট্ট পুকুরের তীরে আজ কোনো শিশুর দল ছুটে যায় কি এই ছোট্ট জাম কুড়োতে? তাদের ঈর্ষা করি। সেই গ্রাম আমার কাছে তার দুয়ার বন্ধ করেছে। সে প্রিয় নাম আমার শরীরের রক্তপ্রবাহ আজ বেদনায় হিমশীতল করে তোলে। সে দৃশ্য আজ আমার কাছে শুধু স্বপ্ন। হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বুঝি না। দুনিয়ায় আছো কোনো শক্তিমান নওজোয়ান আমার ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট পুকুরের কিনারায় কুটিকু-টুকুতে যে আমায় ফিরিয়ে নিতে পারো। আছে হিম্মৎ। দিতে পারো কুরবানি? আমি ফিরে যেতে চাই সেই জামতলায় যার অদূরে মুক্ত বাতাসের নৃত্যচ্ছন্দে হেলে দুলে নেচে ওঠে সবুজ ধানের ক্ষেত। ফিঙের শিস্, দোয়েলের নাচ, শ্যামার চঞ্চলতা. বউ-কথা-কও-এর

একঘেয়ে ডাক যেন ভুলেই যেতে বসেছি। যেন কেটে গেছে এক যুগ।

দূরে কারা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে? বিগত দিন? দিবাস্বপ্ন? মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাল কবে সেই সরল শিশু-মনটি গ্রাস করে বসেছে, টের পাই নি। মনে হয় সেই ভালো ছিল—গ্রামছাড়া সেই রাঙা মাটির পথ আজও এ প্রবাসী সন্তানের মন ভুলায় কেন? কেন এ অকারণ শিহরণ? কেন এ মন দুলে ওঠে সেই ফেলে-আসা নানা রঙের দিনের ছবিতে?

বললাম, 'এই জাম বিক্রি করবি?'

মেয়েটি সরল দৃষ্টি ফেলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। কোঁচড় ভর্তি জাম।

ঠিক সেই দৃশ্য। আড়িয়াল খাঁ নদী অদূরে গৈরিক স্রোতোরাশিতে আপন ভোলা সন্ন্যাসীর মতন হেলে দুলে চলেছে। সাহাদের চাল-ডালের দোকানের পাশে নতুন চায়ের দোকানে সদ্যক্রীত কাপ-প্লেট নিয়ে অপটু বারুইকর্তা হরিপাল টুং টাং আওয়াজ করে চা খাচ্ছে। অদূরে খালের দু'পাশ ঘিরে ছেলেমেয়ের দল একই জামগাছ থেকে জাম কুড়োচ্ছে। দু'ধারেই তার শাখা বিস্তৃত। ঠিক যেন কুমোরবাড়ির বড় কুমোরের ছোট্ট মেয়ে হরিমতি নতুন পাওয়া শাড়িখানা জামের রঙে রঙিয়ে কোঁচড় ভরে জাম নিয়ে ঝক্‌ঝকে দাঁত বার করে হাসছে। জানে না বাড়িতে কুমোরগিন্নীর ঠাস বুনোনি হাতে কি জমা রয়েছে তার কপালে।

মেয়েটা বলল, 'জামুন কিনবে? জামুন?'

ভুলে গিয়েছিলুম এটা পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট। পার্লামেণ্টের সামনে আমি দাঁড়িয়ে। হিন্দুস্থানের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী গণতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র পার্লামেণ্ট। রাজধানী। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি হরিমতি নয়। তারই অন্য এডিশন। যাযাবর। বেদেনী। শহরে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। জাম কুড়ুচ্ছে। খেতে নয়। খাওয়াতে। ওরা খেতে জানে না। ওদের খাওয়া মানা। আপেল, নাসপাতি, বেদানা, আঙ্গুর, চেরি নয়। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া বিনি পয়সার জাম। হতভাগারা তাও খেতে জানে না। খেতে পারে না। খাবার শক্তি নেই ওদের।

মেয়েটি বলল, 'এসো।'

কতকগুলো ইট-পাটকেল নিয়ে একটা অর্ধনগ্ন লোক দাঁড়িপাল্লা দিয়ে জাম ওজন করছিল। কথায় বার্তায় মনে হল মেয়েটার স্বামী। বন্ধুও হতে পারে। অথবা সখা সতীর্থ, এক পথের পথিক। রঙ মিশমিশে কালো। দাঁতগুলো ঝকঝক করছে।

তাকে দেখিয়ে বলল, 'সাহেবকে জামুন দে। এই কোঁচড় থেকে নিয়ে ওজন কর। তোর ভাগ্য খুব ভালো, সাহেব। একেবারে গাছপাকা জামুন।'

তার মূলধন এক সেরও হবে না। এক সেরের দাম বারো আনা, মানে আধ সের চাল। মানে চারটি প্রাণীর একবেলার অর্ধাহার। মা অন্নপূর্ণা সুপ্রসন্না বইকি।

বললাম, 'এ ক'টা জামে তো হবে না হরিমতি। লোক অনেক। অন্তত সের তিন-চারেক চাই। পারবে দিতে? অনেক দিন জাম খাই নি।'

হরিমতি লোকটার দিকে তাকালো।

তারপর আমাকে চলে যেতে বললো।

আমি তালকটোরা রোডের ওধারে ঘুরতে লাগলুম। আমার উদ্দেশ্য শুধু ওরা কি করে তাই দেখা। অদূরে পার্লামেণ্টের মাথায় ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা মেঘে ঢাকা আকাশে হেলে দুলে নাচছিল।

দুটো ছোট শিশু ঘুমিয়ে ছিল। মেয়েটা তাদের জাগালো। লোকটা তার ছোট্ট বিপণি (?) টুকু ছেড়ে একটা গাছে উঠলো। সামান্য অন্তর্বস্ত্রে নিজেকে কোনোমতে ঢেকে হরিমতি শাড়িখানা খুলল। একটা দিক নিজে দু' হাতে ধরলো। অন্য দিকটা দিল দুই শিশুর হাতে। কখন্ তার স্বামীটি গাছে ঝাঁকি দিতে সুরু করেছে মেয়েটি বোধহয় খেয়াল করে নি। হাত ছেড়ে শাড়িখানা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল। জামগুলো মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল। মেয়েটা আবার শাড়ি পেতে ধরলো।

মাটিতে জাম পড়লে জাম নষ্ট হয়ে যাবে। কেউ কিনবে না। তাই বোধহয় এ অভিনব পন্থা।

কতক্ষণ তারা এ সংগ্রাম চালিয়েছে জানি না। হঠাৎ দেখলাম হরিমতি এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে খুঁজছে।

শাড়িটা বেশ করে পরে আবার স্মার্ট মেয়ের মতন মাজায় বেঁধে নিয়েছে।

বুঝলাম আমাকেই খুঁজছে।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। গরজটা যেন আমারই এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, 'কি হরিমতি, হয়েছে তিন সের জাম সংগ্রহ?'

মেয়েটার সাথে সাথে খিল খিল করে হেসে উঠলো তার সাথী।

বললাম, 'হাসছো কেন?'

লোকটাই বলল, 'হুজুর, সেই থেকে তুমি হরিমতি বলে ডাকছো কিনা তাই। ওর নাম হরিমতি নয়। ওর নাম গঙ্গা।'

আসলে হাসির কারণ তা নয়। নিশ্চয়ই। তিন সের জাম এক সাথে বিক্রি হচ্ছে। শুধু তাই নয়। জামটাও সংগ্রহ হয়েছে। অন্তত দু'বেলা খাবার জুটবে। শুধু শিশুদের নয়। স্বামী-স্ত্রীরও।

টাকা পাঁচটা ছুঁড়ে দিয়ে জামগুলো ব্যাগের ভিতর পুরে ফেললুম।

ওদের স্বচ্ছ প্রাণখোলা হাল্কা মেঘের মতন হাসিতে যোগদান করে আমি বললুম, 'ও তাই নাকি? আমি তো ভেবেছিলুম এ মেয়ে পিঙ্গলাকাঠি গ্রামের আড়িয়াল খাঁর তীরের কুমোর-বাড়ির বড় কুমোরের ছোট্ট মেয়ে হরিমতি। তা তো বটেই। সে গ্রাম যে অনেক দূরে ফেলে এসেছি। ঠিকই তো। ভুলেই গিয়েছিলুম এটা তোমাদের রাজা-বাদশার দেশ, হিন্দু-স্থানের ওয়াজির-ই-আজম-এর বাসস্থান মহানগরী দিল্লী।

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অপমান আর হতাশা অপর্ণার চোখে আগুনের মত জ্বলে উঠেছিল। মানুষ নিজেকে কতভাবেই না ঠকায়। এত বছর ধরে আশাভঙ্গের বেদনাকে বেপরোয়া আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে ভুলে থাকতে পেরেছিলো কেবল বুকের মধ্যে বিশ্বাসের সেই প্রদীপটা নিভে যায় নি বলে। অপর্ণাও মনে মনে ভাবতো, আসলে সমরেশের প্রতি তার দাবীই সব চাইতে বেশি। মাধবীকে অসহায় একা দেখে নেহাৎ করুণাবশতই সমরেশ তাকে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছিল। অপর্ণার বাবা তখনও বেঁচে আছেন, বড় ভাই এয়ারফোর্সে ভালো চাকরি করে। নেহাৎ আত্মীয়-স্বজন সব ছড়িয়ে পড়েছে বলে তাকে কলকাতায় মেয়েদের হস্টেলে পড়াশুনা করতে হচ্ছে। কিন্তু তারপর ভাগ্যের চাকা তারও ঘুরেছিলো। ভাই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আকস্মিকভাবে। বাবার মন ও শরীর এমনই ভেঙে পড়ে যে, তিনিও আর বেশিদিন বাঁচেন নি। স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত অপর্ণা, যদি সেই ভদ্রলোক আর একটু সহানুভূতিশীল হতেন। স্ত্রীর যে একটা অতীত জীবন থাকতে পারে, একথা অস্বীকার করার চেষ্টা অবশ্য তিনি করেছিলেন। জীবনে সব কিছুই সহ্য করতে পারা যায়, একমাত্র ভণ্ডামী ছাড়া। তাই সত্যকে একটা মুখোশ পরিয়ে আড়াল করে রাখার লোকদেখানো প্রচেষ্টা তার কাছে এত হাস্যাস্পদ মনে হয়েছিল যে, সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে আসতে এতটুকু দ্বিধা হয় নি। শোনা যায়, এবারে ভদ্রলোক অনেক দেখে-শুনে অশিক্ষিত একটি গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হয়েছেন। যেমন করে লোকে গল্পের বই-এর পাতা উল্টোয়, ঠিক সেইভাবেই অপর্ণা মনে মনে তার জীবনের অন্য আর এক অধ্যায়ে এসে দাঁড়ালো।

আজ সকালে নিজে যেচে সে সমরেশের কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলো। অতীতে যা হয়েছে, এখন সুখী হবার পথে অন্য কোন বাধা কেন দুটি জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে চুরমার করে দেবে? মাধবী যখন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল না এবং তার মৃত্যুকে ঘিরে যত রহস্যজালই সৃষ্টি করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা বলে ধরে নিতেই হবে—তখন এবারে আবার নতুন করে তারা জীবন সুরু করতে পারবে না কেন? সমরেশের নিঃসঙ্গতার ব্যর্থতার আর যন্ত্রণার ভার সেও যদি পাশে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে বহন করে, তাহলে কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ হয়তো এনে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে।

'তুমি পাগল হয়েছ অপর্ণা'—সমরেশ বিষণ্ণ হেসে বলেছিলো—'মাধবী পারল না, তুমি কি করে পারবে। আমি তোমাকে আমার বিষণ্ণ সঙ্গটুকু ছাড়া আর কিছুই দিতে পারব না। তখন তুমিও হয়তো গ্ল্যামার-ভরা সোসাইটির অভাবে ধীরে ধীরে মাধবীর মত ক্রমশ ডিসইলিউশন হয়ে অনুতাপ করতে সুরু করবে। একবার ভুল করে ঠকেছি, আর আমাকে ভুল করতে বোলো না।'

'কিন্তু'—অপর্ণার ম্যাসকারার শেড লাগানো চোখের পাতা ভিজে উঠেছিলো—'একটা কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ সমরেশ। আমার হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে, যেটা মাধবীর ছিলো না। সোসাইটির গ্ল্যামার দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন পালিয়ে যেতে পারলে আমি বেঁচে যাই। আর তোমার প্রতি আমার প্রথম দিনে যে দুর্বলতাটুকু ছিলো—এখনও —এখনও—

কথা শেষ না করে অপর্ণা ক্লান্ত করুণ চোখ দুটি তুলে সমরেশের অনুভূতিহীন চোখের দিকে অনেক মিনতি জানিয়েছিল। কিন্তু! রগের কাছে শির দুটো দপ্‌দপ্‌ করছে, মনে হচ্ছে ধমনীর মধ্যে অসহ্য উত্তপ্ত জ্বরের অনুভূতি তার সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

'না, না!'—সমরেশ কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে বলে উঠেছিলো—'জানি না আমার ভবিষ্যৎ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। দেহ-মন যার অসুখের বিষে ঝাঁজরা হয়ে গেছে, এমন লোকের কাছ থেকে তুমি দূরে পালিয়ে যাও।'

নিজের উপরে নিজেই অসহ্য রাগে ফেটে পড়ছিলো অপর্ণা। কি দরকার ছিলো সেধে অপমানিত হতে

যাওয়ার। তার চেয়ে এখনকার জীবনকে নিয়েই কি সুখী হওয়া যায় না। অভাব তো তার কিছু নেই। বাবা মারা গেছেন, ভাইও নেই। তবু মফস্বলের স্কুলের হেডমিসট্রেস লতিকা এখনও তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখে। লতিকা—তার ভাই-এর স্ত্রী। বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই বিধবা হয়েছিলো, কিন্তু কি আশ্চর্য মনের জোরে পরিতৃপ্তির আভাসটুকু মুখ থেকে মুছে ফেলে নি। বাইরে থেকে আচার-আচরণে শোক প্রকাশের চিহ্ন নেই, কিন্তু হারের লকেটে স্বামীর ছবিটি একবারও গলা থেকে তার নামে না। লতিকা লেখে—

'তুমি এখানে চলে এসো ভাই। জীবন-সমুদ্রের ঢেউ-এ ওঠা-নামা করার মধ্যে হয়তো উন্মাদনা রয়েছে, কিন্তু আনন্দ বা শান্তি কোনটাই তোমার মিলবে না। এখানে শালবনের ওপারে আকাশ লাল করে ভোরবেলার সূর্য ওঠে; ভিজে ঘাসে শিশির ঝলমল করে মণিমুক্তার মত। জানলার ধারে রঙ্গন ফুলের গায়ে থোপা থোপা ফুলের গুচ্ছ দেখলে চোখ ভরে যায়। যদি তোমার ভালো লেগে যায়, তাহলে আমাদের সেক্রেটারীকে বলে একটা চাকরিও ঠিক করে দিতে পারি। এখানে আমার কোয়ার্টার্স বেশ বড়, তিনখানি ঘর, দক্ষিণের বারান্দায় যুঁই আর হাসনাহানার লতা লাগিয়েছি। তোমার কষ্ট হবে না। মেয়েরাও খুব ভালো। ওদের নিয়ে আমার দিনগুলো খুব আনন্দে কেটে যাচ্ছে।'

চিঠিটা পড়তে পড়তে বুকের সেই অশান্ত দোলা যেন অনেকটা কমে গেলো। ফটোফ্রেমে যুগল ছবি দুটোর দিকে একবার তাকালো অপর্ণা। বিয়ের পরে লতিকাকে নিয়ে বিলিতি দোকানে তুলে এনেছিলো মলয়। সেই একই স্নিগ্ধ শান্ত পরিতৃপ্তির আভাস। খুব অল্প সময়ের জন্যে হলেও লতিকা সব কিছুই পেয়েছিল। তাই আজকে অনাস্বাদিত সুখ চেয়ে তাকে হাহাকার করে মরতে হচ্ছে না। কিন্তু অপর্ণার জীবন যেন একটা অনুর্বর মরুভূমি। কোনদিনও ফুল ফুটল না, ফল ধরল না। ওখানে আমি অত শান্তির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব— অপর্ণা তখুনি জবাব দিয়েছিলো লতিকাকে—'তোমার জন্যে শালবন, সূর্য-ওঠা রঙ্গন, যুঁই, হাসনাহানা, দক্ষিণের বারান্দা, মেয়েরা আর পরিপূর্ণ সুখের স্মৃতি রয়েছে। কিন্তু আমার কি তাতে মন ভরবে? উন্মাদনার মধ্যে তবু একটা নেশা রয়েছে, নেশার ঘোরে সময়টা তবু কাটে ভালো। যাই হোক, ঝড়ের সমুদ্রে যদি কোনদিন সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তবে তোমার ঐ শান্তির দ্বীপটুকুর হাতছানিকে অগ্রাহ্য করব না।'

লতিকা আর চিঠি লেখে নি তারপর। হয়তো সময় পায় নি, অথবা কি লিখবে ভেবে পায় নি। সত্যিই ওর কোয়ার্টার্সে পালিয়ে গিয়ে কি শান্তি পাওয়া যাবে? তন্ন তন্ন করে নিজের মনকে নাড়াচাড়া করে দেখলো অপর্ণা, কোথাও কোনো তাগিদ অনুভব করা যায় কিনা।—কিন্তু কি হবে, ঐ একঘেয়ে নিরবচ্ছিন্ন বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে।—তাহলে?

অপর্ণা মলিন হয়ে আসা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বেড-সুইচ টিপে দিলো। দেওয়ালজোড়া আয়নায় তার সবটুকু ছবি ফুটে উঠেছে। ছবিটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলো অপর্ণা, যেন আর কারো ছবি দেখছে এমনি মনের ভাব নিয়ে। হাজার মেকআপের প্রলেপ লাগিয়েও সময়ের অকরুণ ছাপটা কপালের খাঁজে, গালের ভাঁজে, গলার কাছে উঁচু হয়ে ওঠা হাড়ের আভাস বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনের উন্মাদনা ফুরিয়ে আসার ইঙ্গিত। লতিকা তারই সমবয়সী, অথচ ওর নরম-শান্ত সৌন্দর্যে এখনও ভাঁটা পড়ে নি। হয়তো আগের মত ছিপ্‌ছিপে গড়ন আর নেই, হয়তো রোদে জলে ঘোরা-ফেরা করে বলে গায়ের রঙের শ্যাম আভা আরও মলিন হয়েছে। তবু গালে টোলপড়া হাসিটি তার এখনও সরসতায় ভরা।

আয়না থেকে সরে এসে অপর্ণা হঠাৎ কমলেশ বসুর কথা ভাবল। শেষ চিঠিটা ওকেই লিখে রেখে গেলে হয়। মনের মধ্যে যে সব কথা উচ্চারণ করা হয় নি, হয়তো তার আর কোনো মূল্যই তখন থাকবে না। তবু বলে যাওয়ার তাগিদ মন থেকে মুছতে চাইছে না। কি কথা? পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের বিরুদ্ধে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ। জীবনকে নিয়ে এমন ভাবে ছিনিমিনি খেলতে সে চায় নি, কিন্তু তার সেই সর্বনাশা খেলাই খেলতে হোলো। আজকে একবার যখন সমরেশ চায়ের পেয়ালায় চিনি আর দুধ মেশানোর ভার তাকে দিয়েছিল, বিষটা মিশিয়ে দেওয়ার কথা তখনই তার মনে হয়। কিন্তু দিতে পারে নি। সেই দুর্বলতা। ওটাকে যদি বুক থেকে উপড়ে ফেলা যেতো। তখনই এই উপসংহার স্থির হয় গেছে। আর এই ভীষণ নির্জন নিঃসঙ্গতাকে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে না অপর্ণা।

কমলেশ বসুকে চিঠিতে অকপটে সব কথা লিখে শেষ করার পর অপর্ণা একবার ঘড়ির দিকে তাকালো। আটটা বেজে গেছে। তারপর নিজের মনের কথা ভেবে নিজেরই হাসি পেলো। অপর্ণা এখনও ভাবছে—এই গাঢ় কমলালেবু রঙ-এর শাড়িটার সঙ্গে গোলাপী লিপস্টিক মানাচ্ছে না। এখনও মুখের চামড়ার সরু সরু লাইনগুলো স্নিগ্ধ ফুড ঘষে তারপর হাল্কা মেকআপে ঢেকে ফেলার কথা তার মনে আসছে। এলোমেলো অসংবৃত চুলের বোঝাকে দু'হাতে জড়িয়ে নিয়ে অপর্ণা পাগলের মতো হাসতে লাগলো।

দরজাটা ফাঁক হয়ে গেছে টের পায় নি, হঠাৎ ছায়ার মত একজন নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো।

'কে?' অপর্ণার গলা কেঁপে উঠলো।

'আমি।'

'আপনি এ ঘরে'—আগন্তুকের দিকে মুখোমুখী উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল অপর্ণা—'কেন, এ ঘরে আপনাকে ঢোকবার অধিকার কে দিলো।'

'আমি প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। তারপর এই দরজায় টোকা দিয়েছি। আপনার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এই আশঙ্কাতেই অনধিকার প্রবেশ ঘটেছে, মাপ করবেন।'

'হঠাৎ আমি অসুস্থ একথা মনে হোল কেন?'

'মানুষ একলা ঘরে নিজের মনে হাসে না। হাসি নয়, আমার সত্যি একবার মনে হয়েছিল আপনি কাঁদছেন।' কমলেশ বসু এতক্ষণে টেবিলের উপর রাখা খামের দিকে চোখ ফেরালেন—'আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানার সৌভাগ্য আমার হয় নি। সেদিন আপনার ফ্ল্যাটে বসে কেবল ক্রাইম আর ক্রিমিনাল নিয়েই মুখ-রোচক আলোচনা হয়েছিলো। তব চিঠি যে আমাকে লিখেছেন, এ জন্য নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি।'

অপর্ণা হাত বাড়িয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে চিঠিটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমলেশ বলিষ্ঠ হাতে তার হাত চেপে ধরে বললেন—'পরের জিনিসের প্রতি নজর দেওয়া ঠিক নয় অপর্ণাদেবী। চিঠি যখন একবার লেখা হয়ে গেল, তখন তাতে আর আপনার অধিকার নেই। এটা সম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।'

'আপনি কিন্তু আমার সামনে পড়বেন না'—মুখ লাল করে অপর্ণা বলল—'চিঠি মুখের কথা নয়। দূরে না গেলে চিঠির অস্তিত্ব নিরর্থক।'

'বেশ, পড়ব না।'—কমলেশ বসু পাশের ঘরে যেতে উদ্যত হলেন—

'কিন্তু আমারও অনুরোধ, আপনি দেরি করবেন না। আরও কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

পাশের ঘরে বসে চিঠিটা খুলে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিয়ে কমলেশ বসু কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ভেজানো দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ে শেষ মুহূর্তে অপর্ণার হাত থেকে সেই ছোট শিশিটা ছিনিয়ে নিলেন জোর করে। তারপর ওর থর থর করে কেঁপে ওঠা প্রায় সংজ্ঞাহীন অচৈতন্য শরীরটাকে বিছানায় শুইয়ে ফুল-স্পিডে পাখা চালিয়ে দিলেন। পাল্‌স একটু কুইক, বুকও দ্রুতবেগে ওঠা-নামা করছে। রুক্ষ জটবাঁধা চুলগুলো কপাল থেকে সরিয়ে কুঁজো থেকে জল ছিটিয়ে দিলেন একটু একটু করে। ভয়ের কিছু বোধহয় নেই, কিন্তু একজন ডাক্তারকে টেলিফোন করা দরকার।

একটু একটু করে চেতনা ফিরে আসছিলো। অপর্ণা হঠাৎ চোখ মেলে তাকালো। ঘরটা এখনও দুলছে।

'উঃ, আর একটু দেরি হলে আর দেখতে হোত না'— কমলেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঝুঁকে পড়লেন—'এ দুর্বুদ্ধি কেন যে আপনার হোল জানি না। এখন আমাকে একটু ব্যান্ডি আর গরম দুধের যোগাড়ে বেরোতে হবে, কাকে বসিয়ে রেখে যাই, তাই ভাবছি।'

'আর ভয় কি?'—অপর্ণার ক্লান্ত মুখে হাসির আভাস চিক চিক করে উঠল—'আসল জিনিসতো নিজের হেফাজতেই রেখেছেন।'

'আপনাকে কিন্তু এক্সপ্লানেশন দিতে হবে'—কমলেশ বসু পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিশিটা অনুভব করে নিলেন—'আত্মহত্যা করার চেষ্টাও একটি অপরাধ, আশা করি সে জ্ঞান আপনার আছে। আমি ভেবেছিলাম, আপনার মধ্যে অন্তত চরিত্রবল আর সাহসের অভাব নেই—কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, ইউ আর এ কাওয়ার্ড। জীবনকে মুখোমুখী দেখতে যে পারে না, সেই এভাবে পালিয়ে বাঁচতে চায়।'

'আমি কি করব?'—ক্ষীণ কণ্ঠে অপর্ণা বলে ওঠে—'চিঠিটা যখন পড়ে ফেলেছেন, তখন আপনার অজানা আর কিছুই নেই। ভবিষ্যতে যদি মুখ তুলে তাকানোর মত কোনো অবলম্বন না থাকে, তাহলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে?'

'এখন থাক ও সব'—কমলেশ বসু গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'তবে আপনাকে কথা দিতে হবে, কোনদিন এ জাতীয় পাগলামী আর করবেন না। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভ করুন আগে, জীবনদর্শন সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা তখন ভালোভাবেই করা যাবে।'

অবসাদ কাটিয়ে হঠাৎ অপর্ণা উঠে বসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—'কিন্তু আমার কাজের সমালোচনা করার অথবা ভবিষ্যৎ-জীবন কিভাবে কাটাবো তা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার আপনাকে কে দিল? এখানে আপনি বসে আছেন কেন?'

কমলেশ বসু উত্তর না দিয়ে হাসলেন। অপর্ণা যত উত্তেজিত

ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল বিজনেস কোম্পানী

কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি নং পি/১৪/৮/৬৪

নিম্নোক্ত পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

১। আপার ডিভিশন ক্লার্ক ২টি পদ। বেতনক্রম ১৫০—৭—১৮৫—৮—২২৫৲ টাকা

যোগ্যতা—কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পাশ হইতে হইবে। বয়স ১৫।৯।৬৪ তারিখে ৩৫ বৎসরের কম বাঞ্ছনীয়।

২। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ৫টি পদ। বেতনক্রম ৬০—৩ ৮১—৪—১২৫—৫—১৩০৲ টাকা।

যোগ্যতা—কোনো স্বীকৃত বোর্ডের হায়ার সেকেণ্ডারী বা স্কুল ফাইন্যাল পাশ হইতে হইবে। বয়স ১৫।৯ ৬৪ তারিখে ২৫ বৎসরের কম বাঞ্ছনীয়।

সরাসরি নিজ হাতে লিখিত অফেরৎযোগ্য প্রশংসা পত্রাদির নকল সহ দরখাস্ত (ক) নাম ও ঠিকানা (খ) পিতার নাম ও ঠিকানা (গ) বয়স (ঘ) যোগ্যতা (ঙ) নাগরিকত্ব (চ) স্কুল ও কলেজে কখন পড়িয়াছেন কোন ডিভিশনে পাশ ও প্রাপ্ত নম্বর বর্ণনা এবং নিম্ন বর্ণিতের অনুকূলে একটি ২·৫০ টাকার মূল্যের রেখিত পোষ্টাল অর্ডার সহ ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখের ভিতর ডাকযোগে, ডাইরেক্টার, ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল বিজনেস কোম্পানী, ৩৯, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬-এ পৌছান চাই।

হয়ে উঠছে, সে ততই নিরুদ্বেগ প্রশান্ত একটা নির্বিকার মূর্তির মত নিজেকে ভাবলেশহীন করে তুলছে। অপর্ণা থামলো না দেখে অবশেষে একটিবার মুখ খুললে সে—'আপনার ঘুমের প্রয়োজন। ড্রেসিং টেবিলে কার্ডবোর্ডের বাক্সটার গায়ে লেখা আছে 'স্লিপিং পাউডার'। ঐ একটি পুরিয়া খেয়ে লক্ষ্মীমেয়ের মতো শুয়ে পড়ুন দেখি। আর অধিকারের কথা বলছিলেন—আমার আর অন্য কি অধিকার থাকতে পারে। একজন মানুষ অপর আর একজন মানুষের বিপদের সময় মায়া, মমতা, প্রীতি ও সখ্যতা অথবা সাহায্যের হাত যেমন স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে দেয়, বিশ্বাস করুন—আমি ঠিক সেই মনোভাব নিয়েই আপনাকে বাঁচাতে চাইছি। লাভ-লোকসানের কথা বিন্দুমাত্র ভাবছি না।

'সত্যিই পরম পরোপকারী মহানুভব ব্যক্তি আপনি।'—বিদ্রূপের সুর প্রচ্ছন্ন না করেই বলে উঠলো অপর্ণা। সেই মুহূর্তে দরজায় কলিং-বেলের কর্কশ শব্দ।

'ব্যস্ত হবেন না'। কমলেশ বসু খোঁচাটা নীরবে হজম করে উঠে দাঁড়ালেন—'আমি দেখছি কে এমন অসময়ে বিরক্ত করতে এলো; আপনি অসুস্থ আছেন এই অজুহাতে অভ্যাগতদের বিদায় করে দিয়ে এই এলাম বলে।'

দরজা খুলে কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন কমলেশ বসু।

'এখানে অপর্ণা লাহিড়ী বলে কেউ থাকেন?'—পুলিশ ইন্সপেক্টার চশমার কাচের ভেতর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করলেন—'তার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট আছে।'

'কেন?'—কোনোরকমে শব্দটা উচ্চারণ করলেন কমলেশ বসু। তবে কি অপর্ণা তাকে সব সত্যি কথা বলে নি।

'অপর্ণা লাহিড়ীকে ডেকে দিন, আমাদের যা বলার, তাকেই বলব।'

—কথাবার্তার শব্দ শুনে অপর্ণা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। গাঢ় কমলা রঙের শাড়ির আঁচল লুটোচ্ছে, এলোমেলো রুক্ষ চুল মুখের দু'পাশে ছড়ানো, ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে।

'আপনাকে গ্রেপ্তার করার অর্ডার রয়েছে।'—ইন্সপেক্টার এগিয়ে গেলো সামনের দিকে।

'কেন?'—অপর্ণা বেশ শান্তভাবেই বলল।

'সমরেশ সরকারের গ্লাসে বিষ মেশানোর অপরাধে।'

'সমরেশ! কি বলছেন আপনি? সমরেশের কি হয়েছে।'—অপর্ণা আর্তনাদ করে উঠল।

'ফরচুনেটলি ওঁর কিছু হয় নি। জলের গ্লাস, নিজে না খেয়ে সুনন্দ মিত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। সুনন্দ মিত্র সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। অবশ্য কেসটা বাঁকা করার চেষ্টা করা হয়েছিল গ্লাসটা বদলি করে দিয়ে।'

'আপনারা ভুল করছেন ইন্সপেক্টার'— কমলেশ বসু এগিয়ে এলেন এবারে।—'এ ঘটনা কখন ঘটেছে?'

'আজই বিকেলে। অপর্ণাদেবী সমরেশ সরকারের সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলেন। রামবিলাস বলে চাকরটি সে কথা আমাদের জানিয়েছে, আমরা আরও দু-একটা উৎস থেকে জেনেছি যে, উনি সমরেশ সরকারকে একটি বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে দিনকতক অস্থির করে তুলেছিলেন। সে কথা উনি অস্বীকার করতে পারেন কি?'

'কে বলেছে?'—অপর্ণার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে ততক্ষণে।

'আই এ্যাম সরি মিসেস লাহিড়ী, আমাদের ডিউটি পালন করতে হবে। আপনাকে আমি পনের মিনিট সময় দিচ্ছি।'

অপর্ণার পিছু পিছু কমলেশ বসুও শোবার ঘরে ঢুকলেন।

'আর কেন?'—অপর্ণা ক্লান্ত সুরে বললো—'যে শিশি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, এবারে আবার তাই হাতে তুলে দিন। এখনও বেঁচে থাকার মত মনের জোর রাখতে বলছেন?'

'আপনি গিয়েছিলেন ওখানে'—কমলেশ বসুর মুখ যেন পাথরে খোদাই করা'—কেন? কি জন্যে? গ্লাসে বিষ এলো কি করে?'

'বিষ আমি মিশিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম'— অপর্ণার ঠোঁটের কোণে হাসির ছোঁয়াটুকু চিক চিক করে উঠল—'টেবিলের ওপরে একটা কাচের বড় গ্লাসে ওর খাবার জল রাখা ছিলো। লেসের ঢাকনি দিয়ে ঢাকা। সময়ে অসময়ে ওর তেষ্টা পায় বলে রামবিলাস নিয়ম করে জল রেখে যায়। সমরেশ যখন আমাকে সোজা-সুজি প্রত্যাখ্যান করল, তখন হ্যাণ্ড-ব্যাগের মুখ খুলে শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম সুযোগের অপেক্ষায়। ওকেও মারব, তারপর নিজেকেও। একে প্রতিহিংসা বলতে পারেন অথবা সব কিছু শেষ করে দিয়ে যবনিকা টেনে দেওয়ার প্রস্তুতি।'

'তারপর?'—কমলেশ বসু সম্মোহিতের মত চোখের পলক না ফেলে প্রশ্ন করলেন।

'তারপর বিষ আমি কিছুতেই মেশাতে পারলাম না'—হঠাৎ দু' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল অপর্ণা—'আমি যে কতখানি দুর্বল, অসহায়, ভীতু, সেই মুহূর্তে আমার চোখে তা ধরা পড়ে গেল। চোরের মত পালিয়ে চলে এলাম এখানে। নিজেকে নিজে শেষ করে দিতেই হবে—এই সঙ্কল্প করে লিখতে বসলুম চিঠিটা।'

'তুমি বিষ দাও নি অপর্ণা'—হঠাৎ কমলেশ বসুর নিষ্প্রাণ নিষ্কম্প চাহনিতে বিচলিত হয়ে ওঠার স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠল।

(ক্রমশঃ)

আশ্রয়

এডমণ্ড ওয়ের

তিনটি মূর্তির শরীরের ওপর বৃষ্টি তির্যকভাবে এসে বিঁধছে। ওরা তিনজন আলায়ো লাসকা, নিক ক্রিস্টোফার আর বাড়ি থেকে পলাতক ছেলেটি ওদের লম্বা হাতলওলা বেলচার ওপর ভর দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

নিজেদের পেশীর শক্তি দিয়ে যে গর্তটা ওরা খুঁড়েছে, তার দিকে ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—সেই গর্তটায় বৃষ্টির জন্যে নরম কাদা চুইয়ে ঢুকে কি করে ওদের পরিশ্রমের ফলটাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে।

তিনজনেই এই মুহূর্তে ভাবছে ওদের ফেলে-আসা বহু দূরের জীবনের কথা, প্রিয়জনের কথা। লাসকা ছিল যাযাবর, তাই সে ভাবছে বুনো হংসীদের কথা, যারা হয়ত এই মুহূর্তে উত্তাপের সন্ধানে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করছে। নিকের প্রকাণ্ড বুকটার ভেতর ওর বউ আর ছেলের মধুর চিন্তায় ফুলে ফুলে উঠছে; নিকের বউ-ছেলে থাকে সমুদ্রের ওপারে এক বিদেশের শহরে। আর বাড়ি থেকে পালিয়ে-আসা ছেলেটা নিজের গাল দুটিতে বৃষ্টির কামড় অনুভব করতে করতে স্বপ্ন দেখে তার স্নেহময়ী মায়ের; এখন ওর মা কত দূরে।

দিনটা ছিল রবিবার। রোজ যারা ট্রেঞ্চ খোঁড়ে তারা আজ তাদের উষ্ণ বোর্ডিং-বাড়িতে আরাম করছে, মাছ খাচ্ছে আর ওরা তিনজন শুধু পরিশ্রম করছে। গভীরভাবে ওরা নিশ্বাস নেয়, ঠাণ্ডার জন্যে ওদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসগুলো ধোঁয়ার মত ওদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়।

লাসকা গজ গজ করে বলে, ‘দেখেছ কি করে গর্তটা ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এত তাড়াতাড়িতে যে গর্ত কেউ খুঁড়তেই পারে না।’

‘পাইপের মধ্যে মাটি ঢুকে যাচ্ছে। মাটি যদি আরও পাইপে ঢোকে ইনসপেক্টার আমাদের ছিঁড়ে ফেলবে।’ নিক বলে।

ওদের খোঁড়া গর্তটার পাশেই বিরাট দৈত্যসমান গর্ত খোঁড়ার মেশিন। গোধূলির আলো অন্ধকারে ওটাকে ঠিক যেন একটা ঘাপটি-মারা নিঃশব্দ বিষণ্ণ অথচ সদাসতর্ক প্রাণীর মত দেখাচ্ছে। পিস্তন একটা ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিনটা অচল হয়ে গেছে বলেই ওটাকে ত্রিপল দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

বাঁধের ত্রিশ ফুট নীচে যে নর্দমার নতুন বসান পাইপটা চলে গেছে, সেটার

পৃথিবী কা ন আক্রমণ থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা রার জন্যেই ওরা এই বৃষ্টিতেও টি খুঁড়ে চলেছে। পাইপের গোড়ার মু টা খুঁজে বার করবার জন্যে ওরা এগারো ঘণ্টা ধরে মাটি খুঁড়ছে। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি ওদের হতাশ করে দিয়েছে। বাঁধে গর্ত্ত হয়ে গেছে বৃষ্টিতে, আর পাইপের মুখ বুজে যাচ্ছে কাদায়।

লাসকা বলে, 'যা তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে আসছে, কি দুর্ভোগ যে আছে আমাদের।'

'আমরা আর কি করতে পারি?' ছেলেটা বলে।

নিক ক্রিস্টোফার ওর বেলচা থেকে চেঁছে কাদাটা তুলে ফেলে। আকাশের ঘনঘটার দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'এক বছরের মধ্যে আমি আমার নিজের দেশে ফিরে যাব। আমার বউকে দেখব, আমার বাচ্চাকে দেখব।'

লাসকা বলে, 'যাও না নিক, দেখ না এখানে ইন্সপেক্টার কোন লোক পাঠাবে কিনা? কয়েকটা লণ্ঠন জোগাড় করে স্টেণ্ডারকে ফোন করে খবরটা জান না হয়?'

নিক কাদার ভেতর ওর বেলচাটা পুঁতে দিয়ে বস্তির দিকে এগিয়ে যায়।

ছেলেটা ঠাণ্ডায় কাঁপছে। ভয় পেয়েছে ছেলেটা। অন্ধকারের মধ্যে ছেলেটার চোখ দুটো লাসকা'র মুখের দিকে চেয়ে যেন আশ্রয় খোঁজে। ছেলেটা বলে, 'লোকজন এসে গেলেও কি করে পাইপের মুখ আমরা পরিষ্কার করব?'

'হোস পাইপ দিয়ে জোরে জল ঢুকিয়ে করব।'

'বাঃ, এক মাইলের মধ্যে জল নেবার কোন জায়গা আছে নাকি?'

লাসকা কিছু বলে না। ছেলেটা লাসকার উত্তরের অপেক্ষা করে কিন্তু লাসকা নিরুত্তর। ছেলেটা ভিজে জামাটা গা থেকে খুলে ফেলে ঘাড়ের ওপর চাপায়। জামাটা ঝড়ের ঝাপটায় মাথার ওপরে পাখির ডানার মত ওড়ে। মনে হচ্ছে ছেলেটাই পাখির মত ডানায় ভর দিয়ে এই মাটি ছেড়ে চলে যাবে। ছেলেটার খালি মাথাটা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। ওর পাতলা রসে-যাওয়া মুখখানায় আর চিবুকে জল জমে রয়েছে। ওর ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে। ছেলেটার বয়স মাত্র সতের।

লাসকা গর্তটার দিকে চেয়ে থাকে। যা অন্ধকার তলাটা, কিছু দেখা যায় না, তবু অন্ধকারে কিছু একটা আছে, যা ওকে আকর্ষণ করছে। লাসকা বলে, 'একটা যদি দড়ি পেতুম, তাহলে বালির বস্তা বেঁধে ম্যানহোলের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতুম। পাইপটা তাহলে পরিষ্কার হয়ে যেত।'

'কোথায় আমরা দড়ি পাব?'

'তা জানি না। স্টেণ্ডার জানতে পারে।' লাসকা অচল যন্ত্রটার পাশে এগিয়ে যায়। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে এবার। লাসকা বলে, 'কি ঠাণ্ডা।'

ছেলেটা লাসকার সঙ্গে সঙ্গে যায়। ওর কাছাকাছি থাকে একটু উষ্ণতা আর বন্ধুত্বের স্পর্শের জন্যে।

বস্তির ঘরে আলো দেখা গেল। দরজা খুলে বোধহয় স্টেণ্ডার দলবল নিয়ে বেরিয়েছে। লণ্ঠনগুলোর হলদে আলো, পায়ের জুতোর শব্দ আর সামনে-পিছনে চলমান মানুষের কতকগুলো ছায়া বেরিয়ে এল ঝড়ের মধ্যে।

ওরা সবাই গর্তটার চারধারে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠনের আলোয় স্টেণ্ডারের মুখটা দেখা যাচ্ছে। ঠোঁট দুটো ওর বেঁকান, বোধহয় ওর ঠোঁট দুটো সবসময় গালমন্দ দেবার জন্য প্রস্তুত বলেই। লম্বা দিগ্বিজয়ীর মত ওর চেহারা। শুধু ওর গলা থেকে আদেশ ছিটকে বেরিয়ে আসে, আর লোকগুলো শব্দ করে গর্তে নেমে গিয়ে খুঁড়তে লেগে যায়। পাঁকে বন্দী জন্তরা প্রাণের জন্যে যেমন ছটফট করে, তেমনি ওরাও গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে হাঁফায়।

ছেলেটা বড় বড় চোখ করে অন্ধকারে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এর আগে নর্দমা সম্বন্ধে খুব কমই ও ভেবেছে, নর্দমা যে ভাল লাগার মত কোন জিনিস নয়, তা ও জানে। কিন্তু লাসকা, নিক আর স্টেণ্ডার এই নর্দমার কাজটা কি গুরুত্বপূর্ণই না করে তুলেছে। ওরা যারা গর্ত করছে তারা ভীষণ দৈত্যের মত পরিশ্রম করছে। ওদের এই বিপুল পরিশ্রম তারপর বিশ্রাম, ক্ষুন্নিবৃত্তি নিরসন সব কিছুর মধ্যেই যে প্রচণ্ডতা, তা ছেলেটাকে অভিভূত করে।

স্টেণ্ডার লাসকাকে বলল, 'ওরা পাইপের কাছে গিয়ে পৌচেছে।' তারপর নিজেই গর্তের মধ্যে নেমে গেল পাইপটার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে।

একটু পরে স্টেণ্ডার উঠে এসে গলা চড়িয়ে বলল, 'একজনকে পাইপের মধ্যে যেতে হবে। পায়ে একটা দড়ি বেঁধে যে পাইপে ঢুকে ম্যানহোল পর্যন্ত যাবে, তাকে পঞ্চাশ ডলার দেওয়া হবে—যে যাবে পঞ্চাশ ডলার পাবে, পঞ্চাশ ডলার?'

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। ওরা সবাই পঞ্চাশ ডলারের কথা ভাবে, কাজটার জন্যে নিজেরা উপযুক্ত কিনা বিচার করে মনে মনে। ছেলেটা ভাবল, একমাত্র ওই যেন কাজটা করতে হবে শুনে ভয় পাচ্ছে। ও পঞ্চাশ ডলারের কথা ভাবতে পারছে না, ভাবছে ভয়ের কথা। ইঁদুরের গর্তের মত একটা গর্তে মাত্র আঠার ইঞ্চি যেটার ব্যাস, সেটার ভেতর দিয়ে তিনশ' ফুট যাওয়া। ভেতরে স্যাঁৎসেঁতে কাদা আর অন্ধকার। পেছু ফেরা চলবে না। কিন্তু ও যদি না নিজে থাকতে এগিয়ে যায়, ওরা জানবে ও ভয় পেয়েছে।

লাসকার পাশ থেকে তাই ছেলেটা এগিয়ে আসে, তারপর অনিশ্চিত

গলায় বলে ওঠে, 'আমি যাব স্টেওয়ার।' ওর মনে হল ও ওর এই কথাটা যদি ফিরিয়ে নিতে পারত। ও যে বুঝতে পারছে—এখন এখানে কেউই ওটার মধ্যে ঢোকবার জন্যে ঘাড় পাততে রাজী নয়।

স্টেওয়ার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এসে ওর মাথার ওপর লণ্ঠনটা তুলে ধরে। ছেলেটার মুখের দিকে কৌতূহলী চোখে চেয়ে বলে, 'কাপড়-জামা খুলে ফেল।'

'কাপড় জামা খুলে ফেলব ?'

'হ্যাঁ তাই ত' বলছি।'

লাসকা ওকে বোঝায় তাতেই ওর সুবিধে। ছেলেটা ভাবে ওকে ওরা খুব কায়দা করে বন্দী করে ফেলেছে। এখন পালাবার পথ নেই। বাড়িতে নিজের ভয় ও প্রকাশ করতে পারত, বলতে পারত আমি ভয় পেয়েছি, আমি এটা করব না। কিন্তু এখানে কাদামাখা মূর্তিগুলো সবাই ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। লাসকা একটা দড়ি জোগাড় করে দড়িটার একপ্রান্ত ওর হাঁটুতে বেঁধে দিতে আনল।

ছেলেটার মনে হল এই রাত্রের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে উধাও হয়ে যায়। ওর গলাটা বুজে আসছে। ছেলেটা যান্ত্রিকভাবে পরনের পোষাক খুলে ফেলে। শুধু গায়ে একটা সোয়েটার আর পায়ে একটা বুট। নিকই বসতি থেকে বুটটা এনে দেয়।

লাসকা ভারী দড়িটার একপ্রান্ত ওর পায়ে বেঁধে দেয়।

'খুব শক্ত হল নাকি।' লাসকা জিজ্ঞেস করে।

'না, ঠিক আছে।' ছেলেটা বলে।

ওরা স্টেওয়ারের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। স্টেওয়ার পায়চারী করছে। লাসকা ওকে নিয়ে ত্রিশ ফুট নীচে গর্তে নামে। লাসকা পাইপটার ভেতর সাবধানে মুখ ঢুকিয়ে দেখে নেয়। ছেলেটা নীচে কাদামাখা মানুষ-গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাইয়ের দৃষ্টি ওর দিকে ফেরানো। বৃষ্টির শিলা লণ্ঠনের গায়ে এসে পড়ে ছিটকে ছেলেটার গায়ে বিঁধছে।

'যা এবার।' লাসকা বলে। ছেলেটার মুখ সাদা হয়ে গেল।

'বুঝেছিস, ম্যানহোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস—সব সময় ভাববি।' লাসকা বলে।

ছেলেটার গলাটা আবার বুজে এল। মনে হল ভেতর থেকে একটা চাপে ও ফেটে যাবে। সারা শরীরে কিসের এই ভয়ের অস্থিরতা ও বুঝতে পারে না। পাইপের মুখের ভেতরে মাথা ঢুকিয়েই ও আতঙ্কে মাথাটা বার করে নেয়।

'ঢোক, ভয় কি।' লাসকা অভয় দেয়।

ভেতরে ঢোকে ছেলেটা। ওর চারপাশে কাদা বড়বুড়ি কাটে। কাদা থেকে মুখ বাঁচাবার জন্যে ও পাইপের ওপরদিকটায় নিজের মাথাটা ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দেয়। লাসকা এখন কত দূরে, ওর কথা কিছু বুঝতে পারে না ছেলেটা। লাসকা এখন অন্য এক পৃথিবীতে, যে পৃথিবীতে এখন রাত্রি, ঝড়বৃষ্টি, আর সেই বৃষ্টিতে লণ্ঠনের নরম আলো। এখানে শুধু ঘৃণা নোংরা, আর অন্ধকার।

এই অন্ধকার বুঝি পাগল করে দেয় মানুষকে। মনে হয় এই আঁধারের দেওয়ালে করাঘাত করে এই অন্ধকার দূর করি। লাসকার উৎসাহবাণী এখানে ছেলেটার কাছে এসে পৌঁছয় না। ছেলেটা চীৎকার করে ওঠে, ওর নিজের কণ্ঠস্বরে কানে ওর তালা লাগে। ভয়ে অবশ হয়ে যায় ও। চোখের সামনে যে অন্ধকারের অনিশ্চিত পর্দা নেমে আসছে তা বুঝি ও নখ দিয়ে আঁচড়ে সরিয়ে দিতে চায়।

মাত্র কিছুটা দূর ও গিয়েছে, কিন্তু আতঙ্কে অবশ হয়ে গেছে ও। সামনে কাদার ঢেউ খেলছে। এই অবস্থায় ফেরা ছাড়া কোন উপায় নেই। ও যদি সামনে এগিয়ে যায়, তার অর্থ হবে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু। ফেরবার চেষ্টা করল ও, কিন্তু পাইপের জয়েণ্টে ওর আঙুলটা আটকে যাচ্ছে। ও এখানেই তাহলে চাপা পড়ে রইল। একঘণ্টার মধ্যে ওর দেহটা শুধু পড়ে থাকবে এখানে। ওরা খুঁড়ে ওকে বার করবার আগেই এই ভয়াবহ ঠাণ্ডায় ও মারা যাবে।

পাগলের মত মাথা কোটে ছেলেটা

পাইপের শক্ত দেওয়ালে, রক্ত ঝরে ওর অজান্তে, তারপর ও নেতিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ও এমনি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল—ও জানে না। মনে হল দূর থেকে একটা সহানুভূতি-মাখানো প্রশ্ন ওকে সত্যিই কেউ যেন করছে, 'কি রে ঠিক আছিস ত'?'

এই মুহূর্তে নিজের জীবনটাকে যতটা ও ভালবাসে, ততটাই ভালবাসল ছেলেটা লাসকাকে। এতক্ষণ অন্ধকারে যে হতাশার বিরাট চাপ ওকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল, তা যেন লাসকা তুলে নেয় ওর ওপর থেকে; যেন নিজের শরীর আর মনে নতুন করে ভারসাম্য ও ফিরে পেল, পেল বাঁচবার আশা।

ভাঙা গলায় ও বলল, 'ভালো।' আবার ও কথা বলল। নিজের কণ্ঠস্বর কি ভালই না লাগল। কিন্তু অর্থহীন এই চীৎকার করে ভালো বলা যে বোকামি তাও ভাবল।

বাঁ হাত দিয়ে ও দেখলে, কাদার ঢেউটা এবার থিতিয়ে গেছে। হাতের ওপর ভর দিয়ে ও শরীরটা এগিয়ে নিয়ে গেল সাঁতারুর ভঙ্গীতে।

আতঙ্ক ও ভুলে গেছে, বিজয়ের দিকে ও এগিয়ে চলেছে। পাইপের এক একটা জোড়ের মুখ ও অতিক্রম করছে, আর কুড়ি ইঞ্চি ও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্যের দিকে। এক একটা জোড়ের মুখ এলেই বিশ্রাম নিতে চাইছে ওর মন, কিন্তু লক্ষ্যে পোঁছোবার আগে পর্যন্ত ওর থামবার উপায় নেই।

এক ঘণ্টারও বেশি ও পাইপের মধ্যে রয়েছে। ও জানে না, কত দূরে ও এসেছে। হয়ত অর্ধেকটা হলেও হতে পারে। ও বর্তমান ভুলে গেছে, ভুলে গেছে ভয়, ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে ভাব, অন্ধকার। ও স্বপ্ন দেখছে কারাগারের বাইরে মানুষের পৃথিবীর। যেন কোন নরকের দ্বীপে ও নির্বাসিত।

ও জানে না ও কতক্ষণ ধরে পাইপের জোড়গুলো গুণে আসছে. কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যা ও উচ্চারণ করেছে অস্ফুট স্বরে, তা বুঝতে পারল। একান্ন, বাহান্ন, তিপ্পান্ন।

হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর দেখতে দেখতে ওর যন্ত্রণাকাতর দুটি চোখে একটা বিবর্ণ আলোর রেশ যেন ধরা দিল। ও চোখ বুজল, চোখ খুলল, আবার চাইল। হ্যাঁ, সত্যিই একটা আলো, স্বস্তিতে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল ছেলেটা। ও জানে এই আলোটা নিশ্চয় আসছে স্টেগুরের লণ্ঠন থেকে। ও মনে মনে দেখে, ম্যানহোলের জড়ো-হওয়া একদল মানুষকে ওর জন্যে অপেক্ষা করতে।

ধীরে ধীরে আলোটা দেখবার মত হয়। ডিম্বাকৃতি থেকে গোলাকার হয়ে যায় আলোটা। ম্যানহোলের ঠিক তলায় এসে পড়েছে ও, কাদা এখানে খুব পাতলা হয়ে পড়েছে।

কে যেন বাজের মত চীৎকার করে বলে, 'কি কেমন?' পাইপের ভেতর থেকেই শুনল ছেলেটা।

'খুব ভাল।' ওর উত্তর যেন সূঁচের মত তীক্ষ্ন হয়ে ওর কানে এসে বিঁধল। তারপর দীর্ঘক্ষণের অবশতা। ছেলেটার সমস্ত অনুভূতি মরে গেছে যেন, পাইপের শক্ত খোলে ওর মুখটা ঠেকে গেলেও কোন সাড় নেই। তবু স্বচ্ছন্দ বোধ করে ও। ভয় নেই, যন্ত্রণা নেই, ভাবনারও বালাই নেই। যেন ও অন্ধকারেরই কোন প্রাণী, আলো ওর কাছে বিদেশী কোন পদার্থ।

ওর চোখের সামনে গোল হলদে আলোর থালাটার উপস্থিতি ওর বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষণ। বাইরে ওরা নড়াচড়া করছে, ও তা শুনতে পাচ্ছে। পাইপের মুখে মুখ বাড়িয়ে স্টেগুর উঁকি দেয়, ছেলেটা দেখে। ওরা সবাই উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে, সবাই ওকে দেখবার জন্যে ঠেলাঠেলি করে গর্তের ভেতর দিয়ে উঁকি মারছে। একটু পরে স্টেগুর আর লাসকা নীচে নেমে এল ম্যানহোল দিয়ে।

হাত বাড়িয়ে ওরা ওকে তুলে ধরল, যেন অস্বাভাবিক কোন কিছু ও। আলোতে ওর চোখ ঝলসে গেল। মনে হল যেন, আলোগুলো ওর চোখের সামনে নাচছে।

লাসকা ওর মুখে একটা বোতল ধরে বলে, 'খেয়ে নে যতটা পারিস।'

আর ও দাঁড়াতে পারছে না। ও শান্তভাবে বিশ্বাস করে যে, ওর মাংস আর হাড়গুলো পলেস্তারা দিয়ে তৈরি। জয়লাভ করে এসেছে ও, কিন্তু বিজয়ের গান ও শুনতে পাচ্ছে না। ও বোকার মত নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকে, রক্ত পড়ছে হাত দুটো দিয়ে কিন্তু যন্ত্রণা অনুভব করছে না ও। ওর যেন হাত-পা নেই। ওপরে ওরা ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের দিকে চেয়ে ছেলেটার হঠাৎ অভিমান হল ওদের ওপর। স্টেগুর ওর একটা হাত ধরেছে, লাসকা ধরেছে আর একটা হাত। ওরা ওকে তুলে ধরে। তারপর হঠাৎ লাসকা ওকে নিজেই নিজের দুটো হাত দিয়ে তুলে ধরে।

ছেলেটা জড়ানো গলায় বলে, 'তোমার কাদা লেগে যাবে।'

'চুলোয় যাক, কিছুই ওর দ্বারা হল না। পাইপটার কোন গতি হল না।'

—'তোমার পাইপ চুলোয় যাক।' লাসকা বলে।

ছেলেটা বুঝতে পারে লাসকা ওকে নিয়ে ম্যানহোলের লোহার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলেছে। রাত্রের বাতাস ছেলেটার গায়ে এসে বিঁধছে। মাথাটা আরও গভীরভাবে লাসকার কাঁধে ডুবিয়ে দিল ছেলেটা। গভীর স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলে ছেলেটা, যেমন কোন সৈনিক আহত হয়ে গভীর স্বস্তিতে ভাবে—যুদ্ধের সঙ্গে তার যা সম্পর্ক, তা শেষ হয়ে গেছে এই আঘাতের পরে।

অনুবাদ: চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ নবম প্রবাহ ॥

"একদিন রোমের সম্রাট নীরোর বাণিজ্যতরী এসেছিল এই পূর্বভারতে।"

বিশ্ববিখ্যাত বীর আগস্টাস।

আগস্টাস খৃস্টপূর্ব ৩০ সনে সমুদ্রপথে বাংলা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সূত্রপাত করলেন। পুরোনো কীটদষ্ট জীর্ণ দলিল। জায়গায় জায়গায় উইপোকায় খেয়েছে। তবুও সৌভাগ্যক্রমে এই লেখাটুকু পড়া যায়:

Augustus developed direct sea-trade between India and Rome ---

বীর। কিন্তু শুধু যুদ্ধ, রাজ্যবিস্তার আর রক্তপাতের স্বপ্ন দেখেন নি আগস্টাস। রাজ্যের পরিধি বেড়ে গেলেই রাজা নিশ্চিন্ত হতে পারেন না, প্রজারা সুখী হবে এমন কোন কথা নেই। দেশের প্রতিটি মানুষের চোখে-মুখে খুশির দীপ্তি ঝক্‌মক্ করবে, হাসবে— তাদের জীবন হবে গানে ভরা, স্বপ্নে মাখা। কিন্তু কেমন করে হবে—কেমন করে সম্ভব?

এইখানেই আসে অর্থনীতি, আসে ব্যবসা-বাণিজ্য আর অর্থের সঙ্গত বণ্টনপ্রথা ইত্যাদি হাজারো জটিল তত্ত্বের প্রশ্ন। আপাতত সে সব থাক—

সত্যিকারের প্রজানুরঞ্জন রাজা লক্ষ্য করেন, দেশের বাণিজ্যিক অবস্থার দিকে। চেষ্টা করেন—পৃথিবীর দেশে দেশে নিজেদের ব্যবসাকে প্রসারিত করে দিতে। তার ফলে বিদেশী মুদ্রা আসবে ঘরে কিম্বা মুদ্রার বিনিময়ে আসবে সেখানকার কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তুসম্ভার।

সম্রাট আগস্টাসও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবসাকে প্রসারিত করে দিতে মনোনিবেশ করেছিলেন।

শুধু আগস্টাস কেন? আর এক জন রাষ্ট্রবিদ স্ট্র্যাবো তো পরিষ্কার বলেছেনই, ইটালীর নেপলস বন্দর থেকে বিশটা জাহাজে পণ্য বোঝাই হয়ে রওনা হতে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। বন্দরে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিলেন—তাদের গন্তব্য স্থান—বেঙ্গল।

—কি আছে জাহাজে?

—কি আর থাকবে? আমাদের উদ্দেশ্য তো কিছু সুতো, টুকিটাকি কলকব্জা ওদের বাজারে ছেড়ে নিয়ে আসবো বাংলা দেশের তুলো থেকে কাটা সুতো—

সময়টা খৃস্টপূর্ব পঁচিশ সন। সেই সুদূর অতীতেও এই বাংলা দেশ পর্বতের ব্যবধান, দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধানকে এড়িয়ে সেই দূর বিদেশের সওদাগরদের প্রলুব্ধ করেছিল। লোভের হাতছানি দিয়েছিল।

আগস্টাস। স্ট্র্যাবো আরও— আরও কত নাম করবো। বাংলা

উত্তরঙ্গ মুক্তি

শ্যাম রায়

নিকানো আকাশে তিনটি রঙের প্রতিমা লক্ষ্য
তসবিরে তুমি তাহারে রচনা করো
বাহির আলোতে পূর্ণ জীবনকক্ষ
তবু হীরামণি তুলে ধরো !

অনেক আশার আশ্বাসে যাঁরা দিলেন প্রাণ
তাঁরা জানেনাকো কখন মুক্তি পেলে
বেদনার বাধা ভেঙেই পেয়েছে ত্রাণ
দৈন্যেরে যাও অবহেলে।

যে যাবার গেছে ফিরেও অনেকে এসেছে পথে
ধুনো আর মেঠো ফুল চারিদিকে থাকে
রওনা হয়েছে ভাবনার জয়রথে
তরবারি আজ ছবিটি আঁকে।

মাথায় সিঁথিতে বিদ্যুৎ ও মেঘ। ধানের ক্ষেতে
একহাঁটু জল। বকের উহিনী ওড়ে।
সবাই রেখেছে আশার পাত্র পেতে
ঋদ্ধি কখন আসবে তোড়ে।

ছোট ছোট দ্বীপ ছোট ছোট তরী প্রবাহে ভাসে:
তরঙ্গহীন যাত্রা নয়কো কভু
নির্জন বুকে রক্ত কাঁপছে ত্রাসে
গতিময় মন সাঁকো-সম্মিত তবু।

আজ তুমি নও দুঃসাহসীর বিজয়রত্ন
ধরে ছোট ছোট-কাজের আগুন-জলে
পথঘাট আজ নয়কো নিঃসপত্ন
যাত্রা তবুও নব সৃষ্টির ছলে।

দেশের বাণিজ্যের অতীত ইতিহাস বিদেশীদের নামে কণ্টকিত। এরা বাংলা দেশের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পূর্বসূরী।

তারপর—বছরের পর বছর পার হয়ে গেছে। বাংলা দেশের বাণিজ্যের প্রসারও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। ইতিহাস বলছে--

Trade in Bengal grew rapidly ----

রোমের সম্রাট তাইবেরিয়াস রোমের বাণিজ্য সুদূর বাংলা দেশ পর্যন্ত বিস্তারিত করে দিয়েছিল।

'Pliny'-এর গ্রন্থ একটি নির্ভরযোগ্য পুরানো দলিল। সেই রেকর্ডে লেখা আছে এক বিচিত্র ইতিহাস---ভুবনবিখ্যাত বিলাসী সম্রাট নীরো। মহামান্য সম্রাট নীরো অহরহ বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকতেন, আর কখনো-সখনো প্রাসাদশীর্ষে বসে ললিত অঙ্গুলি-বিন্যাসে বেহালায় সুরের মূর্ছনা ফুটিয়ে তুলতেন। সেই সুর বাতাসের সওয়ার হয়ে চলে যেত দূর-দূরান্তরে। আর পথচারী জনতা বিস্মিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তো। ভাবতো, চরম বিলাসী। কিন্তু সাধনা আছে তো।

সত্যিই সাধনা ছিল। বেহালাবাদক নীরোর খ্যাতি জানে পৃথিবীর দূরতম দেশও। কিন্তু কেউ জানে না---একজনও জানে না, তাঁর আর একটি বিশেষ গুণের কথা।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূল্যবান মণি-মুক্তো-হীরা সংগ্রহের অদ্ভুত নেশা ছিল তাঁর। যত মূল্য হো---তাকে আনতেই হবে।

নীরোর অনুচররা দূর-দূর দেশ থেকে বার্তা নিয়ে আসতো---কোন দেশে পাওয়া যাবে মুক্তো-হীরা-মণি। সম্রাটের কাছে খবর গেল---পূর্ব ভারতবর্ষের কোন দেশে আছে বহু মূল্যবান হীরা। অমনি সম্রাটের টনক নড়ল। যে দেশে এত মহার্ঘবস্তু পাওয়া যায়---সেখানে নিশ্চয়ই আরো মূল্যবান---আরো শোভন অনেক কিছু আছে---অতএব---

সেই দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ গড়ে তোলা উচিত। দালা হুকুম দিলেন দেশের বড় বড় সওদাগরদের। বাণিজ্যতরীর বহর প্রস্তুত করো---

কে জানে কোন সুদূর কুয়াশাচ্ছন্ন অতীতে নীরোর প্রেরিত বাণিজ্য-তরীর মিছিল, এদেশের কোন বন্দরে তাদের নোঙর ফেলেছিল। হয়তো সেই বন্দরের চিহ্ন আজ আর নেই---সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেদিনের সেই রোমের সওদাগররাও নেই। কিন্তু আছে—'Pliny'র রেকর্ড।

এই পুরানো গ্রন্থের পাতা খুলে ধরলেই শত শত শতাব্দীর ওপার থেকে হাজারো মানুষের কলকণ্ঠে মুখরিত এই বাংলা দেশের বন্দরের বহু দূরাগত কোলাহল যেন কানের কাছে বাজতে থাকে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গ দর্শন

● খাদ্যের দাবীতে ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় আইন অমান্য সত্যাগ্রহের প্রথম দিনে।

রাজধানী ঃ

পশ্চিম বাংলার জাতীয় পরিষদ-পন্থী (দক্ষিণপন্থী) কমিউনিস্টদের পরিচালনায় মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ ও খাদ্যসঙ্কট সমাধানের দাবীতে পাঁচ-দিন গণসত্যাগ্রহের মহড়া হয়ে গেল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে একই সময়ে চলেছিল এ মহড়া। এ সত্যাগ্রহ ভারত-বন্ধের প্রস্তুতিপর্ব।

পাঁচদিনে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী, শ্রীভবানী সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দসহ বেশ কিছুসংখ্যক দলের কর্মী কারাবরণ করেছেন। পূর্বনির্দিষ্ট সমাবেশে এক দফা বক্তৃতার পালা সাঙ্গ করে সত্যাগ্রহীরা গিয়ে দাঁড়িয়েছেন পুলিশ বেষ্টনীর কাছাকাছি, সেখানে অফিস ফেরত উৎসুক জনতার সামনে আরেক দফা বক্তৃতা শেষ করে গিয়ে তাঁরা উঠেছেন অপেক্ষমাণ পুলিশের গাড়িতে।

এ আন্দোলন নতুন নয়। পশ্চিম বাংলা, বিশেষ করে, রাজধানী কলকাতার মানুষ এ আন্দোলন দেখে আসছে প্রায় পনের বছর ধরে। প্রতি বছরই একবার করে এ সময়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে এবারে আন্দোলনের চেহারা ছিল ভিন্ন ধরণের। অন্যান্য বিরোধী দল, এমন কি, কমিউনিস্টরা সকলে এর সামিল হতে পারেন নি। কাজেই এতে উত্তেজনার উত্তাপ ছিল না আগের দিনের আন্দোলনের মত। তা' ছাড়া, এর সময়-সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

আন্দোলনের উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে, বলা শক্ত। ভারত-বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে গণশক্তিকে জাগ্রত ও সুসংহত করাই এর একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে, আন্দোলন ব্যর্থই হয়েছে বলতে হবে। সত্যাগ্রহীরা সাধারণ মানুষের মনে কোন দাগই কাটতে পারেন নি। মিছিল, সত্যাগ্রহ, অনশন ও কারাবরণ করে জনজাগরণ সম্ভবও নয়। সম্ভব হলে আগের আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হতো না এবং খাদ্যসঙ্কটের সমাধান হয়ে যেতো অনেক আগেই। দ্রব্যমূল্যও বৃদ্ধি পেত না বছরের পর বছর।

সংগ্রামের কায়দা না পাল্টাতে পারলে, বিধানসভায় তুফান সৃষ্টি করে, পথসভায় গলা ফাটিয়ে এবং সর্ব-শেষে কারাবরণ করে কোন সমস্যারই সমাধানের দিন আর নেই। একথা বিরোধী দলের নেতারা না বুঝলে সাধারণ মানুষকে তাঁদের পাশে পাবেন না। সাধারণ মানুষের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। সহজে সাড়া দেবার মত সময় তাদের নেই। তারা এ সব পুরোনো ঢঙের আন্দোলনে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন ভিন্ন আর কোন পথই আজ খুঁজে পাচ্ছেন না। বিরোধী দলের ডাকে সাড়া দিয়ে জীবন বলি দিয়েও তারা দেখেছে। তাদের কষ্টের কোন লাঘবই হয় নি।

দিশেহারা মানুষকে পথ দেখাতে হলে প্রয়োজন বিরাট সংগঠনের। তাতে গঠনমূলক কর্মপন্থা থাকা চাই। মানুষ দেখতে চায় চোখের সামনে আন্দোলনের আসল ও বাস্তব রূপটা—বাহ্যিক উত্তেজনায় আর তাদের আস্থা নেই।

এ ধরণের আন্দোলনে লাভের চাইতে ক্ষতি হয় বেশি। সাধারণ মানুষ একে দলগত প্রচারের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হিসেবেই গণ্য করে। সরকারের নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। তাঁরা একে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। আন্দোলন স্তিমিত হলেই আবার মুনাফা-শিকারীরা নতুন উদ্যমে সংঘবদ্ধভাবে মুনাফা লুঠতে সুরু করে। তারপর মে-জুন মাস নাগাদ আবার সংগ্রামের ডাক আসে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে। সাধারণ মানুষ এ দেখে দেখে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাদের নৈরাশ্য দূর করে, মনোবল ফিরিয়ে এনে সংহত করতে হলে গণবিক্ষোভের পথ ছেড়ে গঠনমূলক কিছু করতে হবে।

তবু স্বীকার করতেই হবে, পরিষদ-পন্থী কমিউনিস্টরা অন্তত নিয়মটা

রক্ষা করেছেন। অন্য বিরোধী দলগুলো এখনও পর্যন্ত পাঁয়তারা কষেই চলেছেন। তাঁরা হয়তো শেষের দিকে নমঃ নমঃ করে নিয়মরক্ষা করবেন।

তারপর আসে শাসকগোষ্ঠীর কথা। তাঁরা একের পর এক হুকার দিচ্ছেন, সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ আবার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সমর্থনে বিস্তার করছেন অভিনব যুক্তিজালের। সমাজবিরোধী শক্তির কাছে পরাভূত হয়েছেন তাঁরা। এ পরাজয় স্বাভাবিক; কারণ, সমাজবিরোধী মুনাফাবাজদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কোন প্রচেষ্টাই তাঁদের পক্ষ থেকে হচ্ছে না।

খোদ সরকার পরিসংখ্যানের মারপ্যাঁচ দেখিয়ে নয়া নয়া পরিকল্পনার বহর তুলে ধরে ভোলাতে চেষ্টা করছেন। গেল সপ্তাহে এখানে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম এবং পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহতা। শারদীয়া উৎসব আসছে সামনে। আটা, ময়দা ও সুজি বাজার থেকে উধাও হয়েছে। তাঁরা শলা-পরামর্শ করে ঠিক করে গেছেন আটা, ময়দা ও সুজি এর পর থেকে ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত বিক্রি করা হবে। কার্যক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় তা না দেখে কেউ এতে উৎসাহিত হবে বলে মনে হচ্ছে না। শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম পশ্চিম বাংলা সরকারের খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রস্তাবও সমর্থন করে গেছেন।

কেবল বণ্টনের ব্যবস্থায় সমস্যার সমাধান হতে পারে না। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন ফসল সবটা সরকারের হাতে না এলে কালোবাজারের গোপন পথ বন্ধ হবে না। সরকার দাম বেঁধে দিলেও বড় বড় মজুতদার ও জোতদার সহজে সায়েস্তা হবে না। জোতদার ও চাষী উদ্বৃত্ত শস্য যার কাছে বেশি দাম পাবে গোপনে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। সে পথ বন্ধ করতে হলে বিরাট সংগঠন ও বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সে ধরণের কোন প্রস্তুতিই দেখা যাচ্ছে না। কাজেই পশ্চিম বাংলা সরকারের পরিকল্পনা যত বৈপ্লবিক হোক না কেন, সাধারণ মানুষের মনে তেমন কোন আশার সঞ্চার করতে পারে নি।

● রাইটার্স বিল্ডিংসে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনারত কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম।

তারা দেখতে পাচ্ছে, সরকারের নির্ধারিত মূল্যে বাজারে কোন জিনিসই পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার দাম বেঁধে দিয়েই কর্তব্য শেষ করেছেন। সে দাম বজায় রাখার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। ন্যায্যমূল্যের দোকানে পর্যন্ত সরু ও মাঝারী চালের দামের পার্থক্য লোপ পেয়েছে। সরু চালে ধান, তুষ ও কুঁড়োর সঙ্গে গম পর্যন্ত ঠাঁই পেয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্যশস্যে আরও কত কি মিশবে সেই আতঙ্কও রয়েছে।

শ্রীঅশোক মেহতা আবার পুরোনো ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে গেছেন। তিনি বলে গেছেন—অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কৃষি উৎপাদনে পশ্চিম বাংলা একেবারে পিছনে পড়ে আছে। এ অভিযোগ আগেও আমরা শুনেছি। একথা উঠলেই আমাদের কৃষি-দপ্তরের কর্তারা রুষ্ট হয়ে ওঠেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও বলেন ভিন্ন কথা। যে কথাই সরকার বলুন না কেন, যত পরিসংখ্যানই তাঁরা উদ্ধার করুন না কেন, পশ্চিম বাংলায় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার পর এদিকে কাজ বেশি হয় নি বলেই আমরা জানি। এ খুবই দুঃখের। টাকা হাতে পেয়েও যাঁরা তার উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেন নি, তাঁদের প্রশংসা কেউ করবে না।

এ কাজের জন্য যাঁরা দায়ী তাঁদের অযোগ্যতা ঢাকবার চেষ্টা বৃথা। তাঁরা ক্ষমারও অযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একথাটা অস্বীকার করলে ভুলই করবেন।

২৪ পৃঃ পঃ।ঃ

সুন্দরবন পশ্চিম বাংলার শস্য ভাণ্ডার। এ এলাকায় সোনা ফলে অতি সহজে। শুধু ধান নয়, সুন্দরবন সরবরাহ করে কলকাতার বাজারে নিত্য নতুন শাকসব্জী। কিন্তু আমাদের কৃষি দপ্তরের কৃপায় সুন্দরবনই সব চাইতে অবহেলিত। প্রথম

পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামান্য সাফল্য লাভের পর থেকে আত্মপ্রসাদে এ দপ্তরের কর্মকর্তারা একেবারে মশগুল হয়ে আছেন। কাজ আর কোন দিক দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে না আশানুরূপ গতিতে।

রাজ্যের অপরাপর অংশের চাষীদের মতই সুন্দরবনের চাষীকে মান্ধাতার আমলের ভাঙা লাঙ্গল সম্বল করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটুকু তাঁরা উৎপাদন করে তাও সেচ দপ্তরের ঔদাসীন্যে ভেসে যায় বাঁধ ভাঙা জোয়ারের লোনা জলে।

বাঁধ ভাঙার ফলে চাষীর সর্বনাশের কাহিনী আগেও আমরা পরিবেশন করেছি। বলেছি, সময় থাকতে' আল বেঁধে ঠিক করে না রাখতে পারলে 'বচ শাল' পাওয়ার আশা করা অন্যায়। একথা স্বীকার করতেই হবে, আমাদের সরকার ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের কথার যেমন খেলাপ হয় না তেমনি আচার-আচরণ ও নীতিরও পরিবর্তন হয় না সহজে। সরকার তাই আমাদের কথা কানে তোলেন নি। ফলে আবার লোনা জল ঢুকেছে গোসাবা থানার বিস্তীর্ণ এলাকায়।

ভরা জোয়ারের প্রবল চাপ সহ্য করতে পারে নি রাঙাবালিয়ালাটের অকেজো স্লুইস গেটটি। তাকে উড়িয়ে দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হাজার দুই বিঘা চাষের জমিতে ঢুকে পড়েছে লোনা জল। সর্বনাশ হয়েছে সব্জী বাগানের, চাষীর কাঁচা ঘর পড়েছে ধ্বসে, খাল ও পুকুরের মাছ মরেছে লোনা জলে খাবি খেতে খেতে। কম হলেও হাজার বিঘা জমির ধানের চারা মাঠে যাচ্ছে পচে।

পাঁচদিন পর আমাদের সেচ দপ্তরের কর্মীরা এসে বাঁধের কাজে হাত দিয়েছেন। ভাঙনের মেরামতের কাজ হয়েছে। কিন্তু সর্বনাশ ঠেকানো সম্ভব নয়। বদ্ধ লোনা জল বের করতে না পারলে ধানের চারা বাঁচতে পারে না।

গোসাবা, বাসন্তী ও ক্যানিং থানার প্রায় তিন শ' মাইল দীর্ঘ বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত অংশগুলোর মেরামতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে না পারলে আসছে পূর্ণিমায় বিপদ ঘটতে পারে।

* * *

বাসন্তী থানার রাণীগড়ের দুটি এবং শেয়ালফেলির একটি ফিশারীর বাঁধ ভেঙে বেশ কয়েক হাজার টাকার মাছ বেরিয়ে গেছে।

সুন্দরবনের মাছের সুনাম আছে—তাজা, জ্যান্ত মাছ কলকাতার বাজারে আসতো সুন্দরবন থেকেই। মৎস্যমন্ত্রী

● শ্রীফজলুর রহমান

শ্রীফজলুর রহমানের দৌলতে কলকাতায় যাওয়া তো দূরের কথা, সুন্দরবন এলাকার মানুষই মাছ খেতে পাচ্ছে না। বাঁধ ভেঙে নদীতে মাছ চলে গেলেও রহমান সাহেবের আইনের জালে ভেড়ির ও ফিশারীর মাছ একটি ধরা পড়ছে। মাতলা ও বিদ্যাধরীর মাছ লঞ্চে চেপে মৎস্য দপ্তরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে ভিন্ন অঞ্চলে।

বাঙালীর মাছ না হলে চলতে চায় না। আঁশটেনি গন্ধ পেলেই লোভ সম্বরণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। অভাবের দিনে তাই মাছের জাতবিচার না করে সস্তার টেপা মাছ পেয়ে খেতে সুরু করেছিল ক্যানিং ও কাকদ্বীপের বাসিন্দারা। তারা ভাবতেও পারে নি এতে বিষক্রিয়ার কথা। টেপা মাছের বিষক্রিয়ায় সস্তায় মাছ খাওয়ার আক্কেল সেলামী দিতে হয়েছে অনেককেই।

মৎস্যমন্ত্রীকে দোষ দেব না। তাঁর এ সব কথা জানবার নয়। কিন্তু তাঁর দপ্তরের পদ্মাপারের অভিজ্ঞ অফিসারটি নিশ্চয়ই জানেন, টেপা মাছ দু' জাতের, এক জাত মানুষের খাদ্য—অপরটি অখাদ্য। জেলেরা, মৎস্য ব্যবসায়ীরা সেই অখাদ্য মাছ যাতে বাজারে চালাতে না পারে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলে এতগুলো মানুষের জীবন সংশয় হতো না—একজনের জীবনের অবসান ঘটত না।

নদীয়া:

করিমপুর বাজারে বেশ কিছুদিন থেকে চাল আসছে না। চালের অভাবে হাহাকার উঠেছে ঘরে ঘরে। চালের আমদানী বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজার থেকে গম হয়েছে উধাও। নিম্নমধ্যবিত্তের ও দিন-মজুরের জীবন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। প্রতি ঘরেই চাল বাড়ন্ত—হাঁড়ি চড়ছে না। বাজারে একেবারে চাল নেই, এমনও নয়। সে চালে হাত দেওয়া নিম্ন আয়ের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তার প্রতি কে-জির দক্ষিণা দিতে হচ্ছে পাঁচ সিকে করে।

আংশিক রেশন সকলের জন্য নয়। তার সরবরাহ অত্যন্ত অনিয়মিত। চোরাকারবারের সাথী সিঁদেল চোর। তাদের উৎপাতটাও বেড়েছে কিছুদিন থেকে। সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবারী ও সিঁদেল চোরের দলের সঙ্গে পাকিস্তানের দুর্বৃত্তদের আঁতাতটা আবার জমে উঠেছে।

শিকারপুরের গ্রামরক্ষীরা গভীর রাত্রিতে একজন পাকিস্তানী গরু-চোরকে পাকড়াও করেছে। চোরাই বলদসহ হাতে নাতে ধরা পড়ে খোদাবক্স স্বীকার করেছে তার সঙ্গে ছিল

হাকিম, ফরাত, হাসান ও আতাহার আলি। এরা সকলেই পাক এলাকার কাজীপুর থেকে এসেছিল। এপারেও তাদের দোস্ত আছে অনেক। তাদের সহায়তায় নিয়মিত চোরাকারবার ও চুরি চালাচ্ছে অনেক দিন থেকে। খোদাবক্সের জবানবন্দী অনুসারে পুলিশ ফুলবাড়ি গ্রাম থেকে দুজন মুসলমান ও একজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করেছে।

হুগলী:

চুঁচুড়া থেকে মেদিনীপুরের সমুদ্র-সৈকত দীঘা পর্যন্ত বাস চলাচলের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই নয়া বাস রুট প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলা পরিবহন সংস্থাগুলোর এক যুক্ত বৈঠকে। এর প্রাথমিক কাজও সুরু হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী চুঁচুড়া থেকে একটি বাস ছাড়বে প্রতি শুক্রবারে, বাসটি দীঘায় গিয়ে পৌঁছবে সোমবার।

হুগলী-বদনগঞ্জ রুটের বাসের গতিপথও বাড়াবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে একই বৈঠকে। এ রুটে দুটি বাস গোঘাট, কামারপুর ও জয়রামবাটি হয়ে প্রতিদিন চারবার যাতায়াত করবে কোটালপুর পর্যন্ত। এই ব্যবস্থা চালু হলে গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষের যাতায়াতের পথ সুগম হবে।

* * *

নয়া রাস্তার পত্তন হচ্ছে কলকাতা থেকে শিল্পনগরী দুর্গাপুর পর্যন্ত। দুর্গাপুরের সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই সড়কের প্রয়োজন সমধিক। এই সড়ক নির্মাণের কাজে কর্তাব্যক্তিদের অদূরদর্শিতার ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে হুগলী ও বর্ধমান জেলার দরিদ্র চাষীদের। আবাদী জমির বুক চিরে রাস্তা নির্মাণ করলে তার দু'পাশের জমির জল সরবরাহ ও জল নিকাশের পথের কথাটা বোধহয় সড়ক নির্মাতারা বেমালুম ভুলেই গেছেন। ফল যা' হবার তাই হচ্ছে। এদিকের মাঠে জলের অভাবে চাষ প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অপর দিকে জমি খালের জলে ডুবে আছে। সড়কের দু'দিকের জমিতে জল চলাচলের ব্যবস্থা অচিরে না হলে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল আর এবার চাষীর ঘরে উঠবে না।

মেদিনীপুর:

রসুলপুর নদীর মোহানা বাংলা সাহিত্যের পাঠকের অজানা নেই। জোয়ারের জলে স্ফীতবক্ষা নদীর তাণ্ডবের কথা সকলেই জানেন। জানেন না বোধহয় কেবল পশ্চিম বাংলা সরকারের সেচ দপ্তরের কর্মিগণ। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে না। নদীর মোহানা পেটুয়া থেকে মাইল চারেক দূর পর্যন্ত জোয়ারের ধাক্কায় বাঁধ ভাঙায় কয়েক শ' বিঘা জমি নোনা জলে ভরে গিয়েছে।

সমুদ্রের প্রধান বাঁধটির অনেক জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। জনপুট সংলগ্ন বাঁকীপুটের বাঁধের অবস্থা খুবই খারাপ। সেচ বিভাগের এতদিনে একটু টনক নড়েছে। মেরামতের তোড়জোড়ও চলেছে। এদিকে চাষের কাজ চলেছে পুরোদমে। মজুর পাওয়া এখন কষ্টসাধ্য। কাজেই কাজ এগোচ্ছে না। এই কাজটি আগে সুরু করলে বিপদের আশঙ্কায় চাষীদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটতো না। সেচ দপ্তরের ব্যয়ও হতো অনেক কম।

জলপাইগুড়ি:

জলঢাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে আসছে বছর ২রা অক্টোবর। কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও জলঢাকার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর এই সুসংবাদ পরিবেশন করে গেছেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। তিনি জানিয়েছেন, বন্যা প্রকল্পের কাজের বড় রকমের কোন বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

২রা অক্টোবর জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্মদিবস। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুরও জন্মেছিলেন ২রা অক্টোবর। কর্তৃপক্ষ তাই জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্বোধন ২রা অক্টোবরে করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বন্যার জলে বিধ্বস্ত প্রকল্প এলাকার সড়কগুলি মেরামত ও নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হচ্ছে ১৫ লক্ষ টাকা। বন্যার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে 'পাওয়ার হাউসটি' রক্ষার জন্য নদীর তীরে ১৫ ফুট উঁচু একটি প্রাচীরও

● ডঃ কে এল রাও

তোলা হবে। এ ছাড়া মূল নক্সার কোন রদ-বদল প্রয়োজন হবে না।

জলঢাকার বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হলে স্থানীয় এলাকায় প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে দশ পয়সায়। এখন দিতে হচ্ছে প্রতি ইউনিটে চুয়াল্লিশ পয়সা।

সেচমন্ত্রী জানিয়েছেন, পশ্চিম বাংলা ও সিকিমে সীমান্তবর্তী নদী রম্মমের ওপর একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রাথমিক সমীক্ষাও হয়েছে। রম্মম এসে মিশেছে তিস্তায়।

তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে খাল কেটে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব বলেই সেচমন্ত্রী মনে করেন। তাঁর মতে কাজটা কঠিন নয় এবং হওয়া উচিত। তবে, এর রূপায়ণ সম্পর্কে তিনি আশ্বাস দিতে পারেন না।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা ও আসামের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের নদীপথে সরাসরি যোগাযোগ অত্যন্ত প্রয়োজন। এতে পরিবহনে খরচ হ্রাস পাবে অনেকখানি। পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত রাজ্য আসাম ও পশ্চিম বাংলার সামগ্রিক উন্নতির দিক বিবেচনা করে এ কাজটি কেন্দ্রীয় সরকারের আগেই করা উচিত ছিল। এই খাল কাটতে হলে তিস্তার ওপর একটি বাঁধও দেওয়া আবশ্যক হবে। তিস্তার বাঁধের আবেদন আসাম সরকার নাকি কেন্দ্রের দরবারে পেশও করেছেন। পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে এ দাবী আগেই ওঠা উচিত ছিল। আসাম ও পশ্চিম বাংলা মিলিতভাবে চাপ দিলে চতুর্থ যোজনায় এ কাজ হওয়া অসম্ভব হবে না। প্রস্তাবিত এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে অনগ্রসর উত্তরবঙ্গের অগ্রগতির পথ খুলে যাবে অনেক দিক দিয়ে।

মুর্শিদাবাদ:

ফরাক্কায় সেদিন ফরাক্কা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের বৈঠক হয়ে গেল। বৈঠকে পশ্চিম বাংলার সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য, কলকাতা পোর্ট কমিশনারের চেয়ারম্যান শ্রী বি বি ঘোষ, ফরাক্কা প্রকল্পের চেয়ারম্যান শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তাব্যক্তিরাই উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকের শেষে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও সাংবাদিকদের তেমন কিছু জোরালো আশ্বাস দিতে পারেন নি। কবে বাঁধের কাজ শেষ হবে সঠিক বলতে পারেন নি। ছ' মাস নদীর বুকে কাজ না চালিয়ে বাঁধের কাজ সমাপ্তির সঠিক সময় বলা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন।

● শ্যামাদাস ভট্টাচার্য

তবে ১৯৭০ সালের মধ্যে বাঁধটি যাতে শেষ হয় তার চেষ্টা চলবে।

ফরাক্কার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য তিনি সকলকেই অনুরোধ জানিয়ে গেছেন।

কলকাতা বন্দরের ওপর পূর্ব ভারত সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কলকাতা বন্দরকে রক্ষার জন্য ফরাক্কা বাঁধ একান্ত প্রয়োজন। একথা সকলেই স্বীকার করেন। ডঃ রাও সে কথারই পুনরুক্তি করেছেন সেদিন সাংবাদিকদের কাছে। শুধু কলকাতা বন্দর নয় —শহর কলকাতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে হুগলী নদীর সংস্কারের ওপর। হুগলীতে বর্ষার মাস-চারেকের বেশি ভাগীরথীর বুক বেয়ে জলস্রোত নামে না। স্রোতের অভাবে আট মাস জোয়ারের লোনা জলের পলি ও বালি জমে হুগলীর বুক ভরে উঠছে দিনের পর দিন। এখানে-সেখানে জেগে উঠছে চড়া। ১৯৭০ সালের মধ্যে এই চড়ার সংখ্যা আরও বাড়বে। ফরাক্কার বাঁধের কাজ শেষ হলেই সমস্যার সমাধান হবে না। স্রোতোবেগ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন হবে চড়া কাটার। তাতে আবার কিছুটা সময় যাবে।

পানীয় জলের অভাবে কলকাতার নাভিশ্বাস ওঠবার উপক্রম হয়েছে। ভাগীরথীর শাখাবাহুগুলো মজে সৃষ্টি হয়েছে নানা স্থানে বদ্ধ জলাভূমির। এ সব কথার আমরা আগেও বিস্তৃত আলোচনা করেছি। গড়িমসি করে কালক্ষেপ করলে সমস্যা আরও বাড়বেই, বরাদ্দ টাকার অঙ্কও বাড়াতে হবে। আমরা আশা করি, কেন্দ্রীয় সরকার সব দিক বিবেচনা করে ফরাক্কা বাঁধের কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য যত্নশীল হবেন।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

রঙ্গজগৎ

'তারকা'-লোকে বিভ্রাট

এই সেদিন মাত্র যাদের দেখবার জন্য গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে কয়েক হাজার লোক দাঁড়িয়েছিল—যে মুখের একটু হাসি দেখার জন্য এবং দুটো কথা শোনার জন্য শহরের মান্য ব্যক্তিরাও একশত টাকার টিকিট কিনে তাদের 'সঙ্গম' ছবি দেখেছে। তাদেরই বাড়িতে ও লকারে কিনা খানাতল্লাসী! শুধু খানাতল্লাসী নয়, এ-যাবৎ এদের মত তারকাদের লকার থেকে ৩৯ লক্ষ চোরা টাকা উদ্ধার হয়েছে। তা ছাড়া আছে সোনাদানা, হীরা-জহরৎ। এক সুন্দরীর তো বাথরুম থেকেই উদ্ধার হয়েছে ২০ লক্ষ টাকা। এই টাকা ওদের শ্রমার্জিত, তবে সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য চোরাপথে অর্জিত। অর্থাৎ যে শ্রমের পারিশ্রমিক হওয়া উচিত দুই লক্ষ, তার জন্য তারা আদায় করেছে দশ লক্ষ; এবং খাতাপত্রে দুই লক্ষ দেখিয়ে বাকি আট লক্ষ নিয়েছে গোপনে এবং দুই লক্ষ টাকা আয়ের ট্যাক্স দিয়ে বাকি আট লক্ষ টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়েছে। এই ফাঁকির বিভ্রাটে পড়েছে আজ চিত্রতারকারা, কিন্তু চিত্রপ্রযোজক থেকে বড় বড় ব্যবসায়ীরা সবাই এই জানা পথে ব্যবসা করে। সকলের ঘরে ডবল হিসাবের খাতা।

চিত্রতারকারা এক শ্রেণীর মানুষের জীবনে দেবদেবীর মত আসন-লাভ করেছে। ঘরে ঘরে ওদের ছবি শোভা পায়। অনুরক্তরা ভুলে যায় ওরাও সাধারণ মানুষ। বছর দেড়েক আগে অভিনেত্রী শ্যামা বিদেশ থেকে ফিরে আসার সময় শুল্ক বিভাগের কর্মীরা খানাতল্লাসী করে অনেক জিনিসপত্র পায়। তার উপর শুল্ক ধার্য করতে চাইলে শ্রীমতী বলেন, ও সব তিনি উপহার পেয়েছেন। তখন প্রশ্ন করা হয়, এত উপহার কি করে পেলেন? তিনি জবাব দেন, 'ম্যয় আওরৎ হু'। সে সময় রাজকাপুরের কাছেও অনেক নতুন যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়েছিল। শুল্ক বিভাগের কর্মীরা বলেছিলেন, 'যাবার সময় আপনার সব যন্ত্রপাতি ও জিনিস ছিল ভাঙাচোরা, অকেজো, ফেরার সময় দেখছি ইউরোপের হাওয়ার গুণে সব নতুন হয়ে গেছে।'

কোন ধনী প্রযোজকের প্রচারে এবং প্রচার জৌলুষে বিহ্বল দর্শকের সমর্থনে শিল্পীরা রাতারাতি 'তারকা' হয়। অথচ তখন স্টুডিওতে কর্মীরা অর্ধাহারে থেকে খেটেও বাঁচতে পারছে না। যেখানে তারকা নিচ্ছে দুই লক্ষ টাকা, সেখানে ইলেকট্রিশিয়ান পাচ্ছে একশত টাকা, যেখানে পরিচালক নিচ্ছে ৩০ হাজার টাকা, সেখানে সহ-পরিচালককে দিচ্ছে একশত টাকা। বোম্বাইয়ের তারকারা যখন লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে লুকোচুরি খেলছে, বাংলার টেকনিশিয়ানরা তখন সামান্য মজুরীর জন্য অনশন ধর্মঘটের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ক্ষয়িষ্ণুতার একটা লক্ষণ ধনবৈষম্য; কিন্তু সিনেমার মত এত ধনবৈষম্য আর কোথাও নেই।

এই চোরাই টাকা উদ্ধার-অভিযানে চলচ্চিত্র-শিল্পে যদি 'তারকা' ও টেকনিশিয়ানে, প্রযোজক ও প্রদর্শকে আয়ের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়, তবে তাতে হবে সকলের মঙ্গল।

সুজন।

● ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খান

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খান

ভারতের সঙ্গীত-জগতের এক মহা প্রতিভাধর ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খানের গত ১৩ই আগস্ট জীবনাবসান হয়েছে। এই সংবাদ সঙ্গীত-জগতের পক্ষে গভীর শোকের। ওস্তাদজীর গুণগ্রাহী শ্রোতারা বেদনাহত। ওস্তাদ মুস্তাক হোসেনের জীবনাবসানে সঙ্গীত-জগতে একটি যুগাবসান হলো। যিনি প্রাচীন সঙ্গীতকে বর্তমান কালের সঙ্গীতধারায় সংযুক্ত ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

স্বল্পদৈর্ঘ্য পাতলা ওস্তাদজীকে দেখে মনে করা যেতো না যে, তিনি এত বড় একজন গুণী। চেহারায় তেমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্তু চোখ দুটোর দিকে তাকালে তখন কারো পক্ষে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন আলাপী, অত্যন্ত নম্রপ্রকৃতির। আস্তে আস্তে কথা বলতেন, আর ঘন ঘন উর্দু কবিতা আবৃত্তি করতেন। উর্দু কবিতা আর মাঝে মাঝে গানে তিনি শ্রোতাদের মাতিয়ে রাখতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—তাঁর পরে তাঁর ঘরোয়ানা গাইবে কে? তিনি বললেন, আমার ছেলে ইসতিয়াক এবং আমার ভাগ্নে।

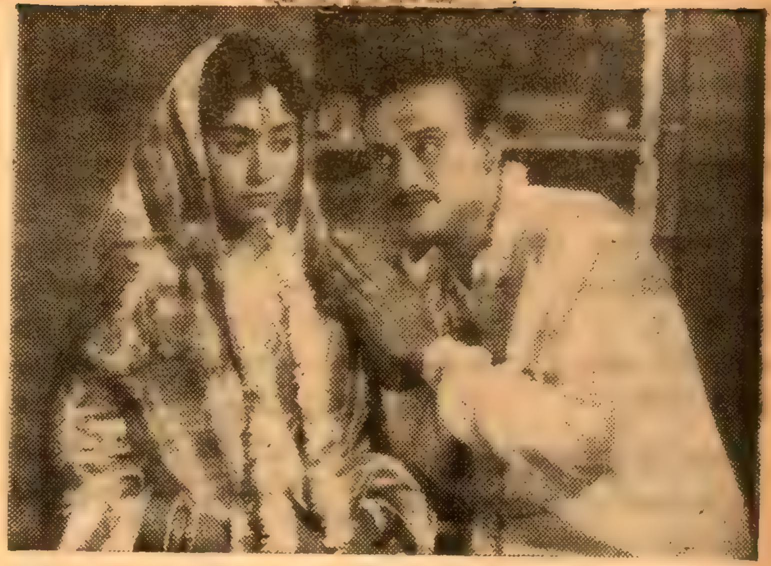

● মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত 'দিনান্তের আলো' ছবির একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও কালী ব্যানার্জী।

ওস্তাদরা নাকি সাধারণত ঈর্ষা-পরায়ণ হয়। কিন্তু খানসাহেবের মধ্যে কখনো ঈর্ষার প্রকাশ দেখা যায় নি। যখন কোন গায়ক ভাল গান গাইতেন, তিনি এত উৎসাহিত হয়ে উঠতেন যে, সোজা মঞ্চে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতেন। সেই গায়কের প্রশংসায় তিনি মুখর হয়ে উঠতেন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব ছিল অত্যন্ত উদার। তরুণ ছাত্রদের শিক্ষাদানে তাঁর আগ্রহ অন্যদের বিস্মিত করতো। ছাত্রদের তিনি বলতেন—এই বৃদ্ধের কাছে অনেক প্রাচীন সম্পদ সঞ্চিত আছে; পার তো শিখে নাও।

কিন্তু জীবনের শেষমুহূর্ত কেটেছে বিষাদে। যদিও ভারতের সর্বত্র তাঁর খ্যাতি ছিল, কিন্তু কয়েকজন সংকীর্ণ-মনা ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে নানা রূপ কানাকানি করতে থাকে। সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ দিয়ে সম্মান জানালেও তাঁর এক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ করে দেয়। এ কারণে তিনি বড় ব্যথিত হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে গিয়েও তাঁর সুরের গুনগুনানি থামে নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি সরগম করে যেতেন। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

● 'মেরা কসুর ক্যা হয়' হিন্দী ছবিতে শ্রীমতী নন্দা।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খানের জন্ম হয়েছিল ১৮৮১ সালের ৩রা ডিসেম্বর। তাঁর জন্মস্থান বাদাউনের শাহগোয়ান শহর। পাঁচ বছর বয়স থেকে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন তাঁর পিতার কাছে এবং রামপুরের ওস্তাদ ওয়াজির খানের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এ ছাড়া তিনি এমন আরো অনেক ওস্তাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন, যাঁরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে প্রতিভাবান।

ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খানের মৃত্যুতে এ যুগের এক মহান সঙ্গীত-শিল্পীকে আমরা হারালাম।

নাটকের কথা

দর্শক-সদস্য

লিটল থিয়েটার গ্রুপের নতুন কার্যক্রম।

গত ২৪শে আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গ্রুপের উদ্যোগে আহূত এক মহতী সভায় দর্শক-সদস্য পরিকল্পনাটি আলোচনা করেন শ্রীউৎপল দত্ত। তিনি বলেন, আমাদের পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অনেক সময়েই নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই অনুশীলন ছাড়া থিয়েটারের উন্নতি সম্ভবপর নয়। তাই আমরা আজ এক নতুন পরিকল্পনা কার্যকরী করার চেষ্টা করছি যেখানে দর্শকদের আনন্দদানের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়েই নাট্যকার ও অভিনেতৃবৃন্দের এবং বিশেষ করে প্রয়োগকর্তা কোন পেশাদারী আপোষ মীমাংসার মধ্যে না গিয়ে রুক্ষ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েও থিয়েটারে নতুন ভাষার অনুসন্ধানে ধাবন করতে পারবেন। বছরে মাত্র ২০·০০ (এককালীন ১৮·০০) টাকার বিনিময়ে আমরা অন্যূন চারটি নতুন নাটক ও নাটক সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান এবং থিয়েটার সংক্রান্ত ফিল্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করব।

শ্রীতাপস সেন ঐতিহ্যময় বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস অনুধাবন করতে গিয়ে বলেন, লিটল থিয়েটার গ্রুপের এই দর্শক-সদস্য পরিকল্পনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বাংলা থিয়েটার

চিরকাল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিল, সেটাই তার জন্য এবং তার মধ্য দিয়েই একদিন না একদিন তা বিরাট মহীরুহে পরিণত হতে পারবে। তাই এই পরিকল্পনায় তিনি দর্শকবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

বক্তৃতার শেষে লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনেতৃবৃন্দ উৎপল দত্ত অনূদিত ও পরিচালিত মিডসামার নাইটস ড্রীম (চৈতালী রাতের স্বপ্ন) অভিনয় করেন।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির

অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের অষ্টাদশ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২২শে আগস্ট মহাজাতি সদনে এক মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কবিগুরুর 'চণ্ডালিকা' নাটকের নৃত্যরূপ, আলো বাগচি (মা) ও সুতপা দত্তর (প্রকৃতি) লীলায়িত নৃত্যছন্দ দর্শকবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। সন্ন্যাসীর ভূমিকায় চন্দনা নাগের নৃত্যও নয়নাভিরাম, নৃত্য বিচিত্রায় 'তারকাসুর বধ' দৃশ্যে অসুরের ভূমিকায় শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দৃপ্ত রুদ্ররূপ ও সাবলীল নৃত্যকৌশল ও ভারতী সেনগুপ্তার 'কার্তিক' নৃত্য দর্শকবৃন্দের প্রশংসালাভ করেছে। 'কথক' নৃত্যে পূর্ণিমা হালদার ও 'ভারত নাট্যমে' কৃষ্ণা রায় ও শুক্লা সেনগুপ্তা প্রশংসার পাত্রী, তা ছাড়া সূর্যবন্দনায় সর্বাণী দাস, রীতা দাস, কৃষ্ণা ঘোষ, চয়নিকা চক্রবর্তী ও শেলী সিনহার নৃত্যও উল্লেখযোগ্য।

নৃত্য পরিচালনা করেন নৃত্যশিল্পী শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সহকারী স্বপ্না সেনগুপ্তা ও অনুপশঙ্কর, শ্রীমতী তৃপ্তি মুখার্জীর সুললিত কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

লণ্ডনে নাট্যোৎসব

লণ্ডনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি বেশ জমে উঠেছে। হেনরিউড কনসার্ট, চিত্রপ্রদর্শনী সিটি অব লণ্ডন ফেস্টিভ্যাল ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আধুনিক নাটকের উৎসব।

● 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ছবির নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিক।

রয়াল সেক্সপীয়র কোম্পানী 'কিঙ লীয়র' ও 'কমেডি অব এরর' সারা বিশ্বভ্রমণ শেষ করে গ্রীষ্মকালীন উৎসবের জন্য আধুনিক নাটক অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

'হেরল্ড পিটারের 'বার্থডে পার্টি' নাটক নিয়ে উৎসব সুরু হয়। তাদের দ্বিতীয় নাটক 'এফোর নাইট কাম'। নাটকটি লিখেছেন মিডল্যাণ্ডের স্কুলশিক্ষক ডেভিড রুডকিন। এই নাটকটি ১৯৬২ সালে প্রথম অভিনীত হয় এবং নাট্যকার প্রতিশ্রুতিবান হিসাবে পুরস্কার লাভ করেন। নাটকটিতে নাট্যকার নিখুঁতভাবে পটভূমি রচনা করেছেন। উৎসবে স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' নাটকটিও অভিনীত হবে।

লেনিনগ্রাদ মঞ্চে ভারতীয় নৃত্যনাট্য

'পিপলস ব্যালে থিয়েটারে' গত সপ্তাহে 'ভারতের সূর্যের নিচে' নামে একটি ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে যে নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন,

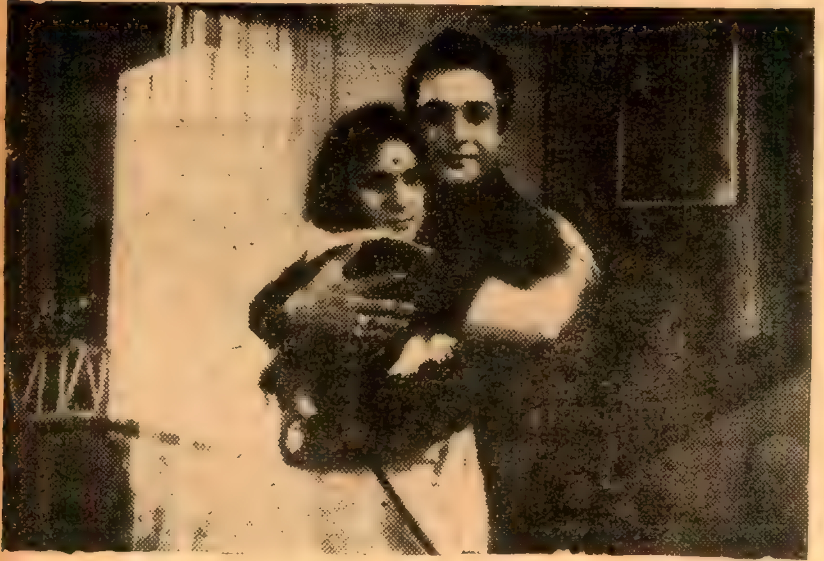

● 'প্রথম প্রেম' ছবিতে নমিতা সিংহ ও বিশ্বজিৎ

● লণ্ডনের রয়াল সেক্সপীয়র কোম্পানী অভিনীত 'এরোর নাইট কাম' নাটকের একটি দৃশ্য

তা সোভিয়েট দর্শকদের বিপুল প্রশংসার দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছে।

লেনিনগ্রাদের এই 'পিপলস ব্যালে থিয়েটার' পুরোপুরি অপেশাদার 'অ্যামেচার'দের দ্বারা পরিচালিত। এই নাট্যশালার নৃত্যশিল্পীরা স্বরস্রষ্টা ও বাদ্যযন্ত্রশিল্পীরা এবং অন্যান্য কর্মীরা সকলেই কলে-কারখানায়, দপ্তরে, শিক্ষালয়ে, গবেষণাগারে বা অন্যান্য কর্মস্থলে কাজ করেন। কাজের শেষে এঁরা মিলিত হয়ে নতুন নতুন নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা করেন, নিজেরাই সংগীত রচনা করেন, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা তৈরি করেন এবং মহড়া দেন। এই দলে একজনও পেশাদার নৃত্যশিল্পী, মঞ্চশিল্পী বা বাদক নেই।

এঁদের সাম্প্রতিকতম 'ভারতের সূর্যের নিচে' নৃত্যনাট্যের কাহিনী এঁরা নিজেরাই রচনা করেছেন। গল্পাংশ এই রকম : গ্রামের ধনী ও চোরাই মালের কারবারী মহাজন লক্ষ্মীকান্ত সুন্দরী তরুণী কমলাকে বিবাহ করতে চায়। কমলার বাবা লক্ষ্মীকান্তের কাছে ঋণী। তাই তার ওপরে এই শয়তান কুশীদজীবী চাপ দেয়। কমলা লক্ষ্মীকান্তকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করায়, লক্ষ্মীকান্ত এক সাপুড়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে : লক্ষ্মীকান্তের কাছে গচ্ছিত রাখা একটি চুরি করা সোনার হার ঐ সাপুড়েটি সাপ খেলা দেখাবার ছলে কমলার ঝাঁপির মধ্যে রেখে দেয়। চুরির দায়ে কমলা ধরা পড়ে। কিন্তু মাখন ও তার বন্ধুদের তৎপরতায় সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়—সাপুড়ে তার দোষ স্বীকার করে। গ্রামের লোক সবাই একজোট হয়ে লক্ষ্মীকান্তকে গ্রামছাড়া করে এবং আনন্দ উৎসবের মধ্যে মাখনের সঙ্গে কমলার বিবাহ দেয়।

নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছেন স্থানীয় এক হাসপাতালের দপ্তর কর্মচারী শ্রীমতী নিনা আনিসিমোভা। কমলার ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করেছেন এখানকার একজন গ্রন্থাগারিক (লাইব্রেরিয়ান) শ্রীমতী এলভিরা আভেরিয়ানোভা। এখানকার এক কারখানার তরুণ ফোরম্যান গ্যাগি পিনাইয়েফ মাখনের ভূমিকায় যে নৃত্যকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের দক্ষতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন কারখানার ও দপ্তরের শ্রমিক ও কর্মচারী।

স্টুডিও খবর

* শ্যামল মিত্রের প্রযোজনায় 'রাজকন্যা' ছবির মহরৎ গত ২৪শে আগস্ট নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। উত্তমকুমার ও রীণা ঘোষ ছবিটির নায়ক নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন। রীণা ঘোষকে সম্প্রতি লিটল থিয়েটারের সেক্সপীয়র নাটকে অভিনয় করতে দেখা গেছে।

* একটি ভক্তিমূলক চিত্রে কীর্তন-কলা-ভারতী শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ ছেচল্লিশ ॥

মৃত্যুর প্রত্যাশাপথ

১৯৫২ সালে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' মঞ্চস্থ হয়। রবিদা অর্থাৎ স্বগত রবি রায় শ্যামলীর বাবার ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বোবা মেয়েকে নিয়ে বিব্রত পিতার ভূমিকাটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন রবিদা। 'শ্যামলী'র সে সময়ে একটানা ৪৮৪ রাত্রি পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন উত্তমকুমার। ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই উত্তমকুমারের শরীর খারাপ হতে থাকে এবং ৪৮৪ রাত্রি পর্যন্ত অভিনয় করে, তিনি অবসর নেন। উত্তমকুমার সুস্থ থাকলে একটানা অভিনয়ে 'শ্যামলী' যে কতদিন চলত, তা হিসেব করে বলা থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের পক্ষেও অসম্ভব ছিল সেদিন। তাড়াতাড়া চিঠি, টেলিফোনের ওপর টেলিফোন—কবে সুস্থ হবেন উত্তমকুমার? কত দিন পরে তিনি আবার অভিনয় করতে পারবেন? ইত্যাদি প্রশ্নে রবিদার বিব্রত পিতার চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা অধিকতর বিব্রত হয়েছিলেন সেদিন স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ।

আড়াই বৎসর কাল 'শ্যামলী'র একটানা অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে যারা প্রথম রাত্রি থেকে অভিনয় সুরু করে ছিলেন, সেই সব শিল্পীদের মধ্যে একজনেরও কোন দিন কামাই ছিল না। অর্থাৎ ঐ দীর্ঘ দিনের মধ্যে original casting-এর কোন duplicate হয় নি।

উত্তমকুমার নাটক থেকে বিদায় নেওয়ার পর মধ্যে বার তিনেক অন্য অভিনেতাকে উত্তমকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করান হয়েছে। কিন্তু রবিদার মৃত্যুর পরে যখন তাঁর ভূমিকাটি সন্তোষ সিংহকে দিয়ে অভিনয় করান হয়, সেদিন রবিদার স্মৃতিকে স্মরণ করে আমি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন সেই কাহিনীটি বিবৃত করছি।

৪৮৪ অর্থাৎ উত্তমকুমার সেদিন শেষ অভিনয় করছে, সেদিন রবিদাকে দেখলাম অত্যন্ত বিমর্ষ। কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা কইছেন না। যে মানুষ সর্বদা হাসিখুশি, তাঁর মুখে আজ গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। শুধু রবিদা নয়, সেদিন শিল্পী, কর্মী এবং সংগঠনকারীরা সকলেই একটু মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রবিদা যেন সকলের চেয়ে 'শ্যামলী'র অভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেদনায় একটু বেশিই ভেঙে পড়েছিলেন।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়লে, রবিদা ধীরে ধীরে আমার ঘরের পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলেন। চুপচাপ সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। মুখে কোন কথা নেই। রবিদার মনের অবস্থা বুঝে আমিই কথাটা পাড়লাম।

বললাম—মন খারাপ করে আর কি হবে রবিদা? ৪৮৪ পর্যন্ত ত চললো। 'শ্যামলী'র এই পরমায়ুই বা আমরা কি আশা করেছিলাম?

—একশো রাত্রির পর থেকে আমি আশা করেছিলাম।

—কত?

—আরো আড়াই বছর। নাটক ভাল হয়, পয়সা দেয়। কিন্তু এমনটা হয় না। আজ পর্যন্ত কোন পার্টের একটা duplicate হয় নি? ৪৮৪-তে বন্ধ হোল। পুরোপুরি ৫০০টা হলে তবু যা হোক একটা রাউণ্ড ফিগার হোত।

—যা হোল না, তা নিয়ে আর মন

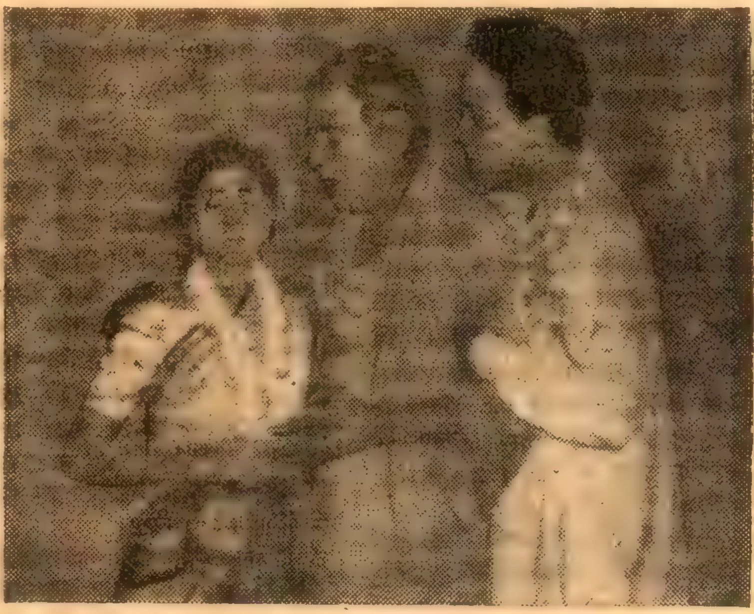

'শ্যামলী' নাটকের নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'শ্যামলী'র পিতার ভূমিকায় স্বর্গত নট রবি রায়।

খারাপ করে লাভ কি রবিদা ? 'শ্যামলী' অগণিত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছে সত্যি। কিন্তু কেউ কেউ ত আবার এ কথাও বলেছেন যে, আমরা আফিমের নেশায় দর্শকদের ভুলিয়ে রেখেছি।

আমার কথা শুনে রবিদা চটে গেলেন। সজোরে টেবিলে চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন—কি? ঐ সব আলতু কথায় তুমি কান দাও? আফিমের নেশা? একটা জড়ো, হাবা মেয়ে—সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাচ্ছে না নাটকে? শাশুড়ীর পায়ে মাথা খুঁড়ে স্থান ভিক্ষে করছে না সে? একটা মূক মেয়ের কাকুতি দর্শকদের অভিভূত করছে না? আফিমের নেশায় মানুষ বুঁদ হয়ে ঝিমোয়—চোখ দিয়ে জল পড়ায় না?

স্টেজের ঘণ্টা বেজে উঠলো—রবিদা উঠে গেলেন। যাবার সময় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—যাই, আর দুটো অঙ্ক করে এসে শ্যামলীকে গলা টিপে মেরে আসি।

রবিদা স্টেজে চলে গেলেন। দেখলাম; চোখ দুটো জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

পাশের ঘরে 'শ্যামলী'র পরিচালক শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র মহাশয় বসেছিলেন। তাঁদের কাছে এসে বললাম, রবিদার কথা।

যামিনীদা বললেন—রবির সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে। দেখছি ত কারুর সঙ্গে কোন কথাই কইছে না।

—আমি এতক্ষণে আজ একটা সিগারেটও খেতে দেখি নি রবিদাকে।

মল্লিকসাহেব বললেন—রবি খুব সেন্টিমেণ্টাল।

আমি বললাম—আজকে সকলের সেন্টিমেণ্টেই নাড়া দিয়েছে। তবে রবিদার একটু বেশি।

আমাদের সেদিন কারুরই মনের অবস্থা ভাল ছিল না। এমন কি থিয়েটারের ঝাড়ুদার চাকর-বাকরেরাও 'শ্যামলী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখ অনুভব করেছিল।

মল্লিকসাহেব ও যামিনীদার সঙ্গে কথা কয়ে নিজের ঘরে এসে বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়লো। বিরতির মাঝে রবিদা মল্লিকসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলনের সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রবিদা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

স্টেজে যাবার আগে আমার ঘরের পর্দাটা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বললেন—আর একটা অঙ্ক। এসো দেখে নাও। আর ত 'শ্যামলী'কে দেখতে পাবে না।

কথাকটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিদার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মনে হোল, 'শ্যামলী'র বাপের ভূমিকায় দীর্ঘদিন অভিনয় করে, সত্যিই যেন তিনি কন্যার বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁর এ কথার আর কোন জবাব দিলাম না। উঠেও গেলাম না 'শ্যামলী'র শেষপর্ব দেখতে। রবিদা বলতে লাগলেন—বুঝলে, অক্সিজেন দেওয়া রোগীকে মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব বলতে পার। 'শ্যামলী'র হোল অপঘাত-মৃত্যু।

রবিদা চলে গেলেন 'শ্যামলী'র শেষপর্ব অভিনয় করতে।

এর এক বছর পরে রবিদা চোখ কাটাতে গেলেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সুষ্ঠুভাবেই চোখ অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু অন্য উপসর্গ দেখা দেওয়ায় রবিদাকে চক্ষু-বিভাগ থেকে সাধারণ বিভাগের শয্যায় নিয়ে আসা হোল। যেদিন সাধারণ বিভাগে তাঁকে নিয়ে আসা হয়, সেই দিন বিকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখি, তিনি অচৈতন্য। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সহসা রবিদার কথা-গুলো মনে পড়ে গেল। 'অক্সিজেন দেওয়া রোগীকে মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব বলতে পার।' সত্যিই প্রস্তুতিপর্ব—পরের দিন সকালে খবর পেলাম—রবিদা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'শ্যামলী'ই রবিদার শেষ অভিনয়।

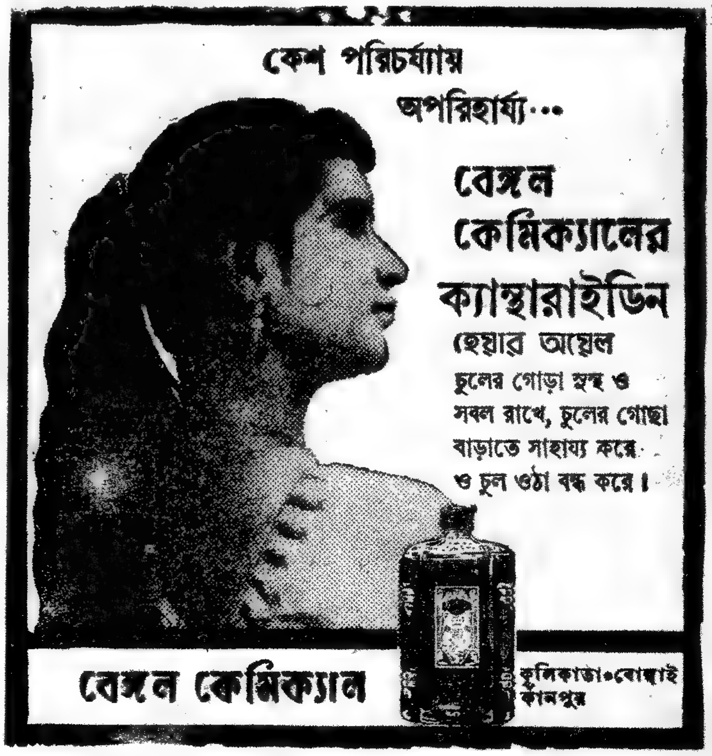

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

নট হিসেবে গিরিশবাবু বড়—না মুস্তাফি সাহেব বড় এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে। তবে গিরিশচন্দ্র ছিলেন প্রধানত emotional actor আর অর্দ্ধেন্দুবাবুর approach to his role ছিল intellectual। উত্তরকালে শিশিরকুমারের ভেতর এই দুটি দিকই লক্ষ্য করেছি। সেই কারণেই এতটুকু দ্বিধা না করে বলা যায় শিশিরবাবু সর্বকালের এবং সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট। তা যদি না হত, তবে ইনস্টিটিউটের আমলেই শিশির-কুমারের 'কেদার' দেখে রবীন্দ্রনাথ অতোটা বিস্মিত এবং মোহিত হতে পারতেন না।

নাট্যসাহিত্যানুরাগী সবাই জানেন যে, মাইকেলের বিখ্যাত নাটিকা 'একেই কি বলে সভ্যতা'র উপর ভিত্তি করেই দীনবন্ধু তাঁর কালজয়ী নাটক 'সধবার একাদশী' রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের শিক্ষিত সমাজের ইয়ংম্যানদের জীবনের একটা সুন্দর বাস্তব চিত্র এই নাটকে পাওয়া যায়। তবে নাটকটি যে dated হয়ে যায় নি তার প্রধান কারণ—এ কাহিনীর নিমচাঁদ চরিত্র। অনেকে মনে করেন—মাইকেলকে স্মৃতিপটে রেখেই দীনবন্ধু নি চাঁদকে সৃষ্টি করেন। দীনবন্ধু অবশ্য সেকথা স্বীকার করেন নি—বলেছিলেন—'মধু কি কখনো নিম হয়?' শ্রীঅক্ষয় সরকার (সাধারণীর সম্পাদক), শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কিন্তু মনে করতেন—মধুসূদনই নিমচাঁদের প্রটোটাইপ এবং সেইজন্যই চরিত্রটি এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল নাটকে। সে যাই হোক, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে মধুসূদনের চরিত্রের কিছুটা নিমচাঁদে প্রতিভাত হয়েছে, একথা মানতেই হবে।

পরবর্তীকালে 'মাইকেল' নাটক মঞ্চস্থ করার সময় শিশিরকুমার প্রায়ই একটা কথা বলতেন। মাইকেলের জীবনে দারিদ্র্যজনিত দুঃখ-কষ্টটাই চরম ট্র্যাজেডীর ব্যাপার নয়—কি শক্তি এবং প্রতিভা

নিয়ে তিনি এসেছিলেন এবং অসংযত জীবন যাপনের ফলে কতটুকু সাহিত্য-সৃষ্টি তিনি করে যেতে পারলেন, এইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডী। পাশাপাশি যখন রবীন্দ্র-নাথের জীবনের পর্যালোচনা করি, তখন দেখা যায়, কবির সারা জীবন কি সংযত, কি সুশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং কি নিয়মানুগ। আর এই জন্যই তিনি সমর্থ হয়েছিলেন গভীর, মহৎ এবং বিরাট সৃষ্টির প্লাবন বইয়ে দিতে। নিমচাঁদ এক জায়গায় বলছে—'নিমচাঁদ। কি ছিলে আর কি হয়েছ।' অর্থাৎ—তার ভেতরে যে প্রতিভা ছিল, চারিত্রিক indiscipline-এর জন্য তার কিছুই পরিস্ফুট হতে পারলো না।

বাগবাজার এ্যামেটিওর থিয়েটার গঠন করে ১৮৬৮ সালে গিরিশবাবু 'সধবার একাদশী' মঞ্চস্থ করেন। বাগবাজারের মুখার্জী পাড়ায় বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে দুর্গোৎসবের সময় নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর যথাক্রমে নিমচাঁদ এবং কেনারামের ভূমিকায় নামেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নাটক দেখতে আসেন। দ্বিতীয় অভিনয় হয় শ্যামপুকুরে। গিরিশচন্দ্রের শ্বশুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দেবের বাড়িতে। তৃতীয় অভিনয় হয় গড়পারে শ্রীজগন্নাথ দেবের গৃহে। চতুর্থ অভিনয়ে অনেক নামকরা লোক উপস্থিত ছিলেন। যথা — শোভাবাজার রাজবাড়ির কুমারেরা, ডাঃ দুর্গাদাস কর (ডাঃ আর জি কর এবং শ্রীরাধামাধব করের বাবা) —এঁর ছেলে রাধামাধব কর নাটকে কাঞ্চনের ভূমিকায় অভিনয় করতেন, শ্রীসারদাচরণ মিত্র (পরে হাইকোর্টের জজ) এবং নাট্যকার স্বয়ং।

অভিনয় শেষে দীনবন্ধু মিত্র গিরিশচন্দ্রকে আলিঙ্গন করে বলেন যে, তাঁরই জন্য যেন নিমচাঁদ চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছিল। এ অভিনয় হয় শ্যাম-পুকুরের রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে সরস্বতীপূজার দিন ১৮৭০ সালে। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র পরে এক সময় লেখেন—ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত বহু নাটক যত্নের সঙ্গে পড়েছি। এর কিছু কিছু স্মরণে আছে, কিছু কিছু বিস্মৃত হয়েছি। ভবিষ্যতে হয়তো আরও অনেক কিছু ভুলে যাব—কিন্তু সে রাত্রে গিরিশচন্দ্রের নিমচাঁদের ভূমিকাভিনয় এত প্রাণবন্ত হয়েছিল যে, এ ছবি কখনও আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে যাবে না।

এই একটি চরিত্রে অভিনয় করেই গিরিশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর চতুর্থ রজনীতে জীবনচন্দ্ররূপে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয় দেখেও দীনবন্ধুবাবু

মুগ্ধ হয়ে যান। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর মঞ্চস্থাপত্য এবং মঞ্চসজ্জার ভার নেন। ইনিই বোধহয় বাংলার প্রথম architect of the stage. সধবার একাদশীর অভিনয়ই ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দিয়েছিল।

১৮৭১ সালের জুন মাসে ন্যাশনাল থিয়েটার দীনবন্ধুর লীলাবতী নাটক মঞ্চস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, বেলবাবু, মহেন্দ্রলাল বোস, রাধামাধব কর প্রভৃতি নাটকে অংশ গ্রহণ করেন। অভিনয় খুব উচ্চস্তরের হয়েছিল—সমবেত দর্শক এবং নাট্যকার নিজে অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেন।

এরপর গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল-এর পরবর্তী অভিনয়ের জন্য দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নাটক রিহার্সালে নামান। দৃশ্যপটাদি চিত্রিত করেন ধর্মদাস সুর। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে দলের অন্যান্যের এই সময় মতদ্বৈধ হওয়াতে তিনি দল ছেড়ে চলে যান। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন—অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বোস, নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল সুর, বেলবাবু প্রভৃতি। অর্দ্ধেন্দুবাবু এক সঙ্গে অনেকগুলি ভূমিকায় নামেন—মিঃ উডের চরিত্রে তাঁর অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য। দর্শকরা খুবই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন অভিনয় দেখে, কিন্তু নাট্যকার দীনবন্ধু বলেন যে, গিরিশচন্দ্রের অভাবটা সর্বসময়েই অনুভূত হচ্ছিল।

এই নাটকেই প্রথম অমৃতলাল বোস মঞ্চাবতরণ করেন। এর আগে তিনি প্রথমে কাশীতে এবং পরে পাটনায় হোমিওপ্যাথ হিসেবে চিকিৎসা করতেন। সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

গিরিশচন্দ্রের যুগের নাট্যমঞ্চের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ দেবার ইচ্ছা আমার নেই। সে সময় যে সব ভাল ভাল নাটক এবং নামকরা অভিনেতা ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধেই দু'চার কথা বলবো।

ন্যাশনাল দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' মঞ্চস্থ করেন ১৮৭৩ সালের ১৮ই জানুয়ারী। শেক্সপীয়ারের মেরী ওয়াইভসের ফলস্টাফ চরিত্রের অনুসরণেই এ নাটকের জলধর চরিত্রটি আঁকা হয়েছে। এই চরিত্রের রূপায়ণে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে চরম প্রতিভার পরিচয় দেন তা দেখে স্বয়ং

● স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি

গিরিশবাবু বলেছিলেন —অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় অতুলনীয়, অভূতপূর্ব—এ হচ্ছে অতুলনীয় মধ্যে অতুলনীয়। নায়ক বিজয়ের ভূমিকায় অমৃত বোসের অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। বেলবাবুর 'মল্লিকা' এবং ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর 'নবীন তপস্বিনী'ও দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছিল।

গিরিশবাবু বলতেন যে, মুস্তাফি সাহেবের হাস্যরসাভিনয় অত্যন্ত উচ্চস্তরের—কমিক element-এর সঙ্গে এমন একটা seriousness থাকতো বলেই অর্দ্ধেন্দু অপ্রতিদ্বন্দ্বী কমেডিয়ান।

এই সময় কণ্টিনেণ্ট থেকে ডেব্‌কার্সন বলে একটি সাহেব কলকাতায় আসেন। গ্র্যাণ্ড ওপেরা হাউসে তিনি হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত এবং কৌতুকধর্মী নক্সা অভিনয় করতেন, নভেম্বর মাসে ১৮৭২ সালের এক বৃহস্পতিবার থেকে তিনি প্রদর্শনী সুরু করেন। এ সব নক্সার নাম দেওয়া হয়েছিল ডেব্‌কার্সন সাহেবকা পাক্কা তামাসা।

এ রকম একটি নক্সা 'বেঙ্গলী বাবু'তে তিনি পাদপ্রদীপের সামনে এসে গান ধরতেন—

'I am a very good Bengalee Babu.
I keep my shop at Radhabazar;
I live in Calcutta eat my dalbhat.
And smoke my Hookka.'

এর সমুচিত উত্তর দেন অর্দ্ধেন্দুশেখর তাঁর মুস্তাফি সাহেবকা পাক্কা তামাসায়। পুরানো টুপী, ছেঁড়া এবং নোংরা কোটপ্যাণ্ট পরে হাতে বেহালা নিয়ে দর্শকদের সামনে এসে তিনি সাহেবদের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক গান গাইতেন—

'হাম্ বড়া সাহেব হায় দুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাথ্;
মিষ্টার মুস্তাফি name হামারা
চাটগাঁও মে মেরা বিলাত,
Lord of all হায় হাম্
চুনাগলি মেরে মোকাম
কোট পিনি, পেণ্টালুন পিনি
পিনি মেরা ট্রাউজার্স;
Every two years new স্যুট পিনি
Direct from চাঁদনী বাজার।
Dirty niggar হাতে হামার
বহুত ময়লা আছে, ছোঃ, ছোঃ, ছোঃ।

এর পর থেকেই সবাই অর্দ্ধেন্দুবাবুকে সাহেব বলে ডাকতে সুরু করে। গিরিশবাবুর মতে মুস্তাফি সাহেবের সঙ্গে তুলনায় ডেব্‌কার্সনের রসিকতাগুলি হোত অনেক নীচস্তরের। (ক্রমশঃ)

পাঠক মন

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠিকা। আপনাদের পত্রিকা সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই। মোটামুটি পাঠকমনের অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে আমি একমত। সাপ্তাহিক বসুমতীর অধিকাংশ রচনাই বাংলা পত্রিকা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। পঁচিশ পয়সায় যে এত কিছু পাওয়া যেতে পারে সেটা আশ্চর্য। আপনাদের পত্রিকা নতুন অখ্যাতনামা লেখকদের খাতির করছে, এতে আমরা সবাই আশান্বিত; কিন্তু লেখা সম্বন্ধে আর একটু বাছবিচার করলেই হয়তো ভালো হয়।

বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য ঠিক নতুন লেখক নন। বিবেকরঞ্জনের লেখা আগেও পড়েছি, আগ্রহ করে পড়েছি দিল্লীর বাসিন্দা বলেই। সাপ্তাহিক বসুমতীতে দিল্লীর ওপর লেখা রচনাগুলো ভালো লেগেছে, কিন্তু গত কয়েকটি সংখ্যায় উনি দিল্লীর পটভূমিকার যে কাহিনীবিচিত্রা লিখেছেন সে সম্বন্ধেই আমার অভিযোগ। এটা ছাপানোর সার্থকতা খুঁজে পেলাম না। শুধু উপন্যাস হিসেবে ছাপালে এটুকু বলা যেত যে, এটি একটি কষ্টকল্পিত এবং অবাস্তব উপন্যাস। ঘটনার যোগাযোগ নেই, চরিত্রের বিকাশ নেই, অনেকটা ছকে বাঁধা সিনেমার গল্পের মতন। সে যাই হোক, কিন্তু লেখক এটাকে দিল্লীর পটভূমিকায় কেন বলেছেন—সেখানেই আমার আপত্তি। দিল্লী না বলে যে কোন জায়গাই বলা চলতো। আজবনগরের পটভূমিকায় বললেও অত্যুক্তি হত না। দিল্লীর বিশেষত্ব এ গল্পের কোথায় যে ফুটে উঠেছে, সেটাও বুঝতে পারলাম না। এই সব চরিত্র ও ঘটনার জন্য দিল্লীর পটভূমিকার কোন প্রয়োজন ছিল না। দিল্লীতে যে এ সব ঘটনা ঘটে না, সেকথা আমি ঠিক বলতে পারবো না, কারণ দিল্লীর প্রায় ৫০ হাজারের ওপর সব বাঙালীকে আমি চিনি না। আমাদের পরিবারের আটজনের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, তাদের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এসব লোকের মধ্যে আমি এসব ঘটনা ঘটতে দেখি নি বা শুনি নি সেটা হয়তো বা আমারই চোখ কিংবা কানের দোষ। গল্পের মাঝে মাঝে লালকেল্লা বা ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ কিংবা আলিপুর রোডের নাম না ঢোকালে এটা যে দিল্লীর পটভূমিকায় গল্প সেটা বোঝাই অসম্ভব হতো।

বিবেকরঞ্জনের লেখার স্টাইল সুন্দর। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো ভালো গল্প আশা করবো।

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়
১১, মিরডার্ড লেন
নয়াদিল্লী

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতীর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। দৈনিক ও মাসিকের একজন নিয়মিত লেখকও বটে, সেই জন্যেই এই তিনটি পত্রিকার উপর ভালবাসা নিবিড়, সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ, এই সম্পর্কের সূত্র ধরেই দু-চারটি কথা বলতে চাই।

যে সব লেখা বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে প্রতিটিই মূল্যবান ও অবশ্যপাঠ্য; তবে দু-চারটি স্থানে, কোথাও একটু তথ্য যোগ করতে আর কোথাও সংশোধন করতে চাই।

১। শ্রীরণজিৎকুমার সেন লিখিত 'খাঁটি মানুষ শশিভূষণ' প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় রণজিৎবাবু শশিভূষণের শিশু-সাহিত্যে দানের কথা বলেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, স্বর্গীয় দাশগুপ্ত শিশু-সাহিত্যে তাঁর দানের জন্য শিশু-সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'ফটিক স্মৃতি পদকে' ভূষিত হয়েছেন। আমি ও রণজিৎবাবু উভয়েই অবশ্য উক্ত পরিষদের সঙ্গে যুক্ত।

২। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ভারতবর্ষের 'ভাষাসমস্যা' প্রবন্ধে সংস্কৃতকে মৃত ভাষা হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়ে কারণ হিসেবে বলেছেন—এই ভাষায় ১০০ বছরের ভেতর কোন বিজ্ঞান বা সাহিত্যের পুস্তক রচিত হয় নি। কিন্তু হিন্দীতেই কি হয়েছে?

শ্রীরবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
৫।২৫, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট
কলিকাতা-২৯।

* * *

সূর্য সেন স্ট্রীট প্রসঙ্গে শ্রীপদাতিকের লেখায় সামান্য ভুল তথ্য আছে। পাঠকরা ভুল তথ্য মনে রাখতে পারেন, তাই ভুল সংশোধন করলে বাধিত হবো।

জালালাবাদ পাহাড়ে ১৩ জন নিহত হন নি, হয়েছিলেন ১১ জন। জালালাবাদে একাধিকবার সংঘর্ষ হয় নি, হয়েছিল একবার, ২২শে এপ্রিল। মাস্টারদাকে ধরার জন্য যে পুলিশে খবর দিয়েছিল সে তাঁর স্বগ্রামবাসী নয়। মাস্টারদা ধরা পড়েছিলেন গৈরালা গ্রামে এবং সংবাদপ্রদানকারী ঐ গ্রামেরই অধিবাসী ছিল।

কল্পতরু সেনগুপ্ত
ব্রাইট স্ট্রীট, কলিকাতা।

খেলা ধুলা

অশুভ সংকেত

যাত্রা অশুভ, একেবারে শুরুতেই বাধা; পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ভারতীয় দল বিদেশ সফর শুরু করল ঠিক টোকিও অলিম্পিকের প্রাক্কালে। নিউজিল্যাণ্ডে সফরের প্রথম টেস্টে ভারত ৩-১ গোলে নিউজিল্যাণ্ডের কাছে পরাজিত হয়ে সকলকে অবাক করেছে। ১৯২৮ সালে ভারতীয় হকির জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, আর ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ন অলিম্পিকে ক্ষুণ্ণ হল বিশ্ব হকিতে ভারতের একচ্ছত্র প্রাধান্য, অস্ত গেল ভারতীয় হকির গৌরবসূর্য। এরপর টোকিও এবং জাকার্তার এশিয়ান গেমস এবং রোম অলিম্পিকের আসরে হকির গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছে প্রতিবেশী পাকিস্তান। এখনও ভারতীয় দল অতীতের সেই পুরানো ক্রীড়াধারা এবং কলাকৌশলকে আঁকড়ে থাকতে চায়। কিন্তু বর্তমানে হকিতে দেখা যাচ্ছে লড়াকুবাজীর যুগ, মানে জোর যার মুল্লুক তার। হকিতে অগ্রগণ্য প্রায় প্রত্যেকটি দেশই এখন দৈহিক শক্তিকে হকি খেলার মধ্যে বেশি করে কাজে লাগাচ্ছে।

তাই বলতে গেলে হকির এই লাঠি-বাজীর যুগে ভারতের স্টিকের নিখুঁত কলাকৌশল এবং পরিচ্ছন্ন ক্রীড়াধারা অচল এবং পঙ্গু। টোকিও অলিম্পিকের পূর্বে ভারত সময় পেয়েছে প্রচুর। অলিম্পিক হকি দল গঠনের নামে হাঁক-ডাক এবং তোড়জোড় করা হয়েছে জোর এবং হয়েছে অজস্র অর্থব্যয়। বিদেশ সফরের প্রথম টেস্টে পরাজয়ের ফলে অলিম্পিক হকিতে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে ক্রীড়ামোদী-মহলে। তবুও আমরা আশায় বুক বাঁধছি শুধু এই কথা চিন্তা করে—সব ভাল যার শেষ ভাল।

ময়দান ফুটবলের তরুণ প্রতিভা

ফুটবল খেলায় গোল রক্ষকের দায়িত্ব অসীম। গোলরক্ষকের একটি ভুল বা ত্রুটি মানেই একটি গোল এবং দলের পতন। তাই গোলরক্ষকের ভাগ্যে হঠাৎই আসে সুনাম এবং যশ, আবার অল্পতেই তাঁকে হতে হয় বদনামের ভাগী। এক ধরণের গোলরক্ষক আছেন, মাঠে যাঁদের গ্যালারী শো দেখানোর দিকে ঝোঁক বেশি, সহজ বলকে অনেক কায়দা-কসরৎ দেখিয়ে ধরে অযথা শক্ত করে তোলেন এবং এইভাবে প্রায়ই

শ্রীঅমিতাভ

ডেকে আনেন নিজের বিপদ এবং দলের বিপদ। একজন জাত গোলরক্ষক হবেন মার্জারের মত ক্ষিপ্র, দৃষ্টি হবে শ্যেনসম, বিচার-বুদ্ধি হবে প্রখর, উপস্থিত বুদ্ধি হবে তীক্ষ্ণ এবং বিপদের মুখে তখন ধীর স্থির।

আমি আজ যে খেলোয়াড়টির কথা বলছি—ইনি যথেষ্ট তরুণ বয়সে প্রথম ডিভিসনে প্রথম আবির্ভাবেই কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের কাছ থেকে লাভ করেছেন ভূয়সী প্রশংসা। কলকাতা ময়দানের সম্ভাবনাময় উদীয়মান গোল-রক্ষকদের মধ্যে কালীঘাটের তরুণ গোল-রক্ষক শ্রীশিবদাস রাওয়ের স্থান একেবারে প্রথম সারিতে। শিবদাস রাওয়ের বয়স মাত্র আঠারো; জন্ম ১৯৪৬ সালে এই কলকাতাতেই। জন্মের পর থেকে এই দক্ষিণ কলকাতাতেই মানুষ হয়েছেন তিনি। ফুটবলের হাতেখড়ি দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্ক আর বিবেকানন্দ পার্কের মাঠে। সারা স্কুল-জীবনটা কেটেছে তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনে। স্কুলে থাকার সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে সুরু করলেন একটা ক্লাব—নাম দিলেন বালীগঞ্জ তরুণ সংঘ।

কৈশোরের খেলোয়াড়ী জীবনটা কেটেছে এই তরুণ বালীগঞ্জ সংঘের পক্ষে খেলে। ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে খেলার সুযোগ পেলেন বেনেটোলার পক্ষে। ১৯৬১ সালে বেনেটোলা ছেড়ে এসে যোগ দিলেন কালীঘাট ক্লাবে। ১৯৬৩ সালে কালীঘাট দ্বিতীয় ডিভিসন বিজয়ী হয়ে ১৯৬৪ সালে প্রথম ডিভিসনে উন্নীত হল। শিবদাস রাওয়ের ওপর অর্পিত হল প্রথম ডিভিসনে কালীঘাটের গোলরক্ষার গুরুদায়িত্ব।

স্কুল-জীবনের শেষ দু'বছর তীর্থপতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন রাও ফুটবলে এবং ক্রিকেটে। ক্রিকেটেও তিনি কম যান না, প্রথম ডিভিসন ক্রিকেটে মিলন সমিতির পক্ষে খেলেন। রাওয়ের কলেজ-জীবন কাটছে এখন চারুচন্দ্র কলেজে। কলেজের পক্ষে নিয়মিত খেলেছেন নক-আউট খেলাগুলিতে। রাওয়ের সামনে এখন পড়ে আছে বিরাট খেলোয়াড়ী জীবন। অনেক প্রলোভন, আসবে অনেক বিপথের হাতছানি; কিন্তু খেলোয়াড়ী আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়ে কঠোর সংযম, নিরলস সাধনা এবং অধ্যবসায়কে পাথেয় করে অগ্রসর হলে রাও পৌছতে পারবেন তাঁর লক্ষ্যে, সার্থক হবে তাঁর স্বপ্ন—তাঁর খেলোয়াড়ী জীবন।

এস রাও

● ছাত্রীদের ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইলের ষ্টার্টের দৃশ্য

আই-এফ-এ শীল্ডের জন্মকথা

তখন ফোর্ট উইলিয়াম শীর্ষে উড়ত ইউনিয়ন জ্যাক, ইডেনে প্যাগোডার পাশে বাজত বিলিতি ব্যাণ্ড, ফোর্ট থেকে গোরা আর মিলিটারীরা দল বেঁধে মাঠে আসত। তাদের সঙ্গে থাকত ম্যাসকট বা সৌভাগ্যসূচক প্রতীক, তাদের বিউগলে কখনও বা ধ্বনিত হত বিজয়ের দৃপ্ত সুর, কখনও বা পরাজয়ের করুণ সুর কেঁদে কেঁদে আছড়ে পড়ত গঙ্গার পাড়ে। শ্যামবাজার, বোবাজার, বাগবাজার, শোভাবাজার থেকে দল বেঁধে বাঙালীরা আসত—দিত শঙ্খধ্বনি—বাজাত কাঁসর-ঘণ্টা। তখন সাদায় কালোয় ফুটবল যুদ্ধে ছিল প্রাণ, ছিল পবিত্রতা, ছিল অভিনবত্ব, ছিল বৈচিত্র্য, ছিল মহত্ত্ব।

কয়েকটা যুগের দমকা হাওয়া বয়ে গিয়েছে ময়দানের ওপর দিয়ে—ওলট-পালট করে দিয়েছে সমস্ত কিছু। ইউনিয়ন জ্যাক নেমে গিয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম শীর্ষ থেকে, বৃটিশরা এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে, কেটে গিয়েছে বিলিতি ব্যাণ্ডের সুর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকেই মিলিটারী আর গোরা টিমগুলি অন্তর্হিত হয়েছে কলকাতা ময়দান থেকে; গুটিকয় সাহেব টিম এখনও ময়দানে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে বটে, কিন্তু তারা কায়াহীন ছায়া মাত্র।

এই কালের আবর্তে পরিবর্তনের কিছুমাত্র স্পর্শ লাগে নি ময়দানে একজনের, সেটা হল ত্রিকালজয়ী আই-এফ-এ শীল্ড। সুদীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে আই-এফ-এ শুধু ঘর বদলেছে, তার বিজয়ীর তালিকায় খোদিত হয়েছে বিভিন্ন নাম। ১৮৯২ সালে শোভাবাজারের নগেন সর্বাধিকারী, ডালহৌসির ব্রাউন এবং লিণ্ডসে আর সি-এফ-সির আন্তরিক প্রচেষ্টায় জন্ম নিল আই-এফ-এ শীল্ড। লণ্ডনের ইলকিংটন কোম্পানীর কাছ থেকে তৈরি হল একটা সুদৃশ্য শীল্ড। ১৮৯৩ সালে আই-এফ-এ শীল্ড আত্মপ্রকাশ করল এবং ভবিষ্যতে সর্বভারতীয় ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা বলে স্বীকৃত হল। প্রথম বছরে রয়াল আইরিশ রাইফেল দল বিজয়ী হয়। ভারতীয় দল হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশিবার শীল্ড বিজয়ী হয়েছে মোহনবাগান—মোট নয় বার। ১৯৬৪র শীল্ডে মোট ৩২টি দল যোগ দেবে। বাংলার বাইরে থেকে যোগ দেবে মোট দশটি খ্যাতনামা দল। ৩১শে আগস্ট সুরু হয়েছে শীল্ডের খেলা। বিস্তারিত বিবরণ আগামীবার দেওয়া যাবে

সমাচার দর্পণ

আজাদ হিন্দ বাগে রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতার পর শেষ হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা। রাজ্য প্রতিযোগিতায় মোট এগারটি নতুন রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষদের বিভাগে এবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বি, এন, রেল দল। মহিলাদের বিভাগে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হয় এবং বালিকাদের বিভাগে সেন্ট্রাল, বালকদের এবং কিশোরদের বিভাগে ন্যাশনাল বিজয়ী হয়।

* * *

কুয়ালালামপুরে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগতায় খেলা সুরু হয়েছে ভারত প্রাথমিক পর্যায়ে মালয়েশিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে এবং পরে টসে জয়লাভ করে পরবর্তী খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীস্বকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

a beautiful woman's
constant companions
are not her family and friends,
her near and dear ones,
but her box of beauty aids
which help her to look beautiful
anytime, anyplace—always and forever.
ask her and she'll tell you . . .
her constant companions are
AFGHAN SNOW
BEAUTY AIDS
afghan
nail polish
kiss of
lipstick
afghan face powder
afghan snow
E. S. PATANWALA, BOMBAY-77. (INDIA)

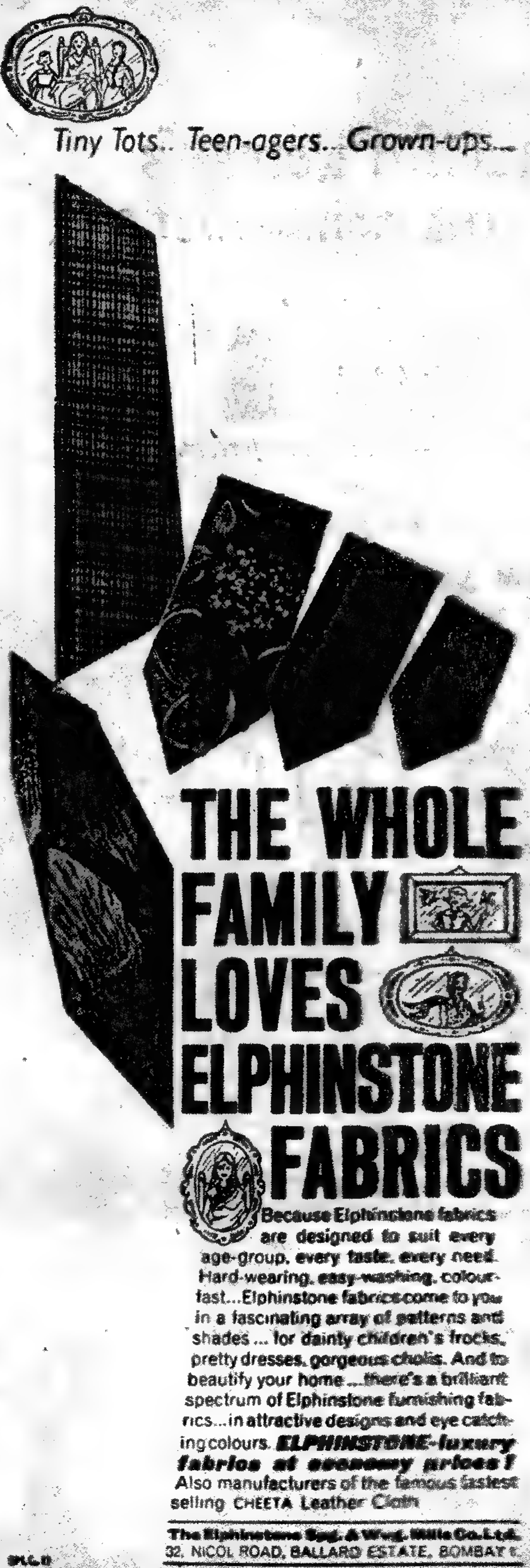
Tiny Tots.. Teen-agers.. Grown-ups...
THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS
Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast...Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ...there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics...in attractive designs and eye catching colours. ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!
Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth
The Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.
32, NICOL ROAD, BALLARD ESTATE, BOMBAY 1.

সাপ্তাহিক
বসুমতী

নেপাল, আফগানিস্থান ও বার্মায় শুভেচ্ছা-সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং।

১৬শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 10th September, 1964 • Vol. 69, No. 16

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৯৬৩
আজকের মানুষ	...	৯৬৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	৯৬৫
ভারতদর্শন	...	৯৬৯
আন্তর্জাতিক	...	৯৭৪
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৯৭৯
মুখের রেখা (কবিতা)	কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী	৯৮২
ব্রজেন্দ্র-স্মৃতি (প্রবন্ধ)	অমূল্য সেন	৯৮৩
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	৯৮৬
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	৯৮৮
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	৯৮৯
দলিল (গল্প)	খগেন্দ্র দত্ত	৯৯৩

756.3 .003/3 V. 69 no. 16

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

... Office : 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.

...HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

... 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

...a Ropes	Loglines	Heald Cords
...al Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage-Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	৯৯৭
বাবুইয়ের বাসা (কবিতা)	শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়	১০০০
তিনগল্পের খসড়া (কবিতা)	শান্তনু দাস	১০০০
কুহেলী-বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১০০১
একটি অদ্ভুত আকর্ষণ (অনুবাদ-গল্প)	আর্যভট্ট	১০০৫
বঙ্গদর্শন	...	১০০৯
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১০১৪
রঙ্গজগৎ	...	১০১৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১০২০
পাঠক মন	...	১০২১
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১০২৩

ভিন্ন জাতের — ভিন্ন স্বাদের

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

(১৩৭১)

প্রিয় লেখকদের প্রিয় গল্প

লিখেছেন :

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ [illegible] সমরেশ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, সুশীল রা[illegible] লীলা মজুমদার, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আশা দেবী, উশীনর ও আরো অনেকে।

'জরাসন্ধে'র
কারাগারের বৃহত্তম অজানা কাহিনী
"রাজাবাহাদুর"

রণজিৎ রা[illegible]
চমকপ্রদ শিকার-কাহিনী
"শিকার প্রসঙ্গে"

স্বামী রায়ের খণ্ড উপন্যাস
"জল"

প্রাণতোষ ঘটকের
"শহর কলকাতা"

মননশীল প্রবন্ধ লিখেছেন :

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল বসু, অশোক সেন এবং আরো অনেকে।

এছাড়া রয়েছে—

খ্যাতিমান শিল্পীদের আঙ্গিক চিত্র ও অলংকরণ।

মূল্য—আড়াই টাকা

মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

৬৯ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৫শে ভাদ্র ১৩৭১ | Thursday, 10th September 1964

বিজ্ঞান ও দারিদ্র্য

পৃথিবীর গরীব মানুষের কাছে দুর্ভিক্ষ ব্যাপারটি অপরিচিত নয়। এই দুর্ভিক্ষের কার্য-কারণ বিচারের পর দেখা গেছে যে, এ হচ্ছে যুদ্ধলিপ্সু, সাম্রাজ্যবাদী ও অর্থলোভী মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ। অবশ্য এই পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের পরমাশ্চর্য জয় এবং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সুদূরবিস্তারী প্রসার দেখে একদল চিন্তাশীল মানুষ ভেবে আসছেন যে, সাধারণ মানুষও সুখী হবে। কিন্তু কোথায় সেই সুখ? দারিদ্র্যের বিভীষিকায় তাদের জীবন বিপর্যস্ত। তাই বিজ্ঞানের জয়যাত্রার কথা তাদের কাছে পরিহাসমাত্র। অসহায় বৈজ্ঞানিক হয়তো দূর থেকে সেই দশা দেখছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেন নি। কেন না বিজ্ঞান আজ ধনকুবেরদের দ্বারা কবলিত, কিংবা তা ধুরন্ধর রাষ্ট্রবিদ্‌দের স্বপ্নসাধের সঙ্গী। পায়ের তলায় যে মৃত্তিকা রয়েছে—তার উর্বরতা বৃদ্ধির দ্বারা শস্য সংগ্রহ কিংবা শিল্পোন্নতির দ্বারা খাদ্যবস্ত্রের সমস্যা সমাধানের কথা না ভেবে যাঁরা শুধু চাঁদ ধরে এনে, তা দরিদ্রদের হাতে তুলে দেবার কথা বলেন—তাঁদের মনোবৃত্তি একান্তই শিশুসুলভ। কেন না, দরিদ্রদের দুঃখ বেড়েই চলেছে; সেই সঙ্গে অপরিমিত হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে। এই দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ যদি ক্রমশ বাড়তেই থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষার জন্য আপন আপন দেশে, এমন কি এই ভারত রাষ্ট্রেও যে প্রচেষ্টা চলেছে তা নগণ্য; প্রতিটি দেশেই যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সফল প্রয়োগ না ঘটে তাহলে ১980 সালের মধ্যেই সারা বিশ্ব দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে।

এই ভাবী দুর্ভিক্ষের কথা বলেছেন—মার্কিন বিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ ডঃ টেমও ইওয়েল। তাঁর এই কথা হয়তো স্বার্থান্বেষী মানুষ এক কথায় ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বর্তমানে যাঁরা চাঁদে পৌঁছবার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছেন, তাঁদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা—স'বা বিশ্বে দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে এলে ক্ষুধার্ত মানুষের বিক্ষোভ-তরঙ্গ তাঁদেরও কি রেহাই দেবে? অবশ্য তাঁরা তখন যদি মর্ত্য ত্যাগ করে চাঁদের দেশে অবস্থান করেন, তাহলে রেহাই পেয়ে যাবেন। মাটির ওপর পা দিয়ে থাকতে গেলে তাঁদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। সেই কারণে বিজ্ঞানে অত্যুন্নত দেশগুলির আজ চিন্তা করা দরকার, কোন সুস্থ উপায়ে এই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যেতে পারে। অশিক্ষিত মানুষকে শুধু জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপদেশ দিলেই রক্ষা নেই, প্রকৃত রক্ষাকবচ রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেনের সঙ্গে দেশে দেশে বিজ্ঞানের আদান-প্রদানে। রাষ্ট্রসংঘেও আজ এই কথা সোচ্চারে ঘোষিত হোক।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

অবশ্যই অনুপান ঠিক হয় নি। তা নইলে আগুনের কণা ছাপিয়ে গন্ধকের ধোঁয়াই বা কেন বাতাস ভারী ক'রে তুলবে? না,—কোথায় যেন একটা বৈষম্য আছে। আছে অসঙ্গতি। কেরলের রাজনৈতিক মঞ্চে যখন চরম উত্তেজনার গুঞ্জন তখন এ কথাটাই বারবার মনে এলো। সমুদ্রসৈকতে শীতল নারকেল-কুঞ্জের আশ্রয়ে, স্নিগ্ধ কেরলের মানুষ আবার কেন অধৈর্য হ'য়ে উঠেছে সে কথাই ভাবছেন রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ। চিন্তাক্লিষ্ট কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন, আরও অনেক বিশিষ্ট বিদগ্ধ চিন্তাবিদ আর রাজনীতিক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীপাতিল ছুটে এসেছিলেন কেরলে। এ যেন কোনও রহস্যময় নাটকের রোমাঞ্চকর অঙ্ক। অথবা কোনও ইতিহাস বুঝি সূচিত হ'তে চলেছে অলক্ষ্য শক্তির প্রয়াসে। যাই হোক, দৃষ্টি সকলের একজনের ওপরই—। কেরলের বহু আলোচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর শংকর। তাঁর বিরুদ্ধে সম্মিলিত-ভাবে অনাস্থা প্রস্তাব উঠেছে কেরল বিধানসভায়। সরকারী বিরোধী দলের সমস্ত সদস্য, কমিউনিস্ট, সংযুক্ত সমাজবাদী, মুসলিম লীগ দল সবাই তাঁর মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সোচ্চার বিক্ষোভ জানিয়েছেন। আরও অনেক রাজ্যের একাধিক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হ'য়েছে—কিন্তু কেরলের পরিস্থিতি তার থেকে কিছু স্বতন্ত্র। একে রাজনৈতিক চমক বা কংগ্রেসী সংগঠনের ইতিহাসে নতুন নজীর বললে অত্যুক্তি হয় না। কংগ্রেসী দলের পনেরো জন বিধানসভার সদস্য শ্রীশংকরের নেতৃত্বের বিরোধিতায় বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু শংকরের বৈশিষ্ট্য সেখানেই—যেখানে তিনি এত দুর্যোগেও অনড়, আত্মনির্ভর।

যে চ্যালেঞ্জ সমগ্র কংগ্রেস দলের সামনে এসে গোটা ভারতের কংগ্রেসী নেতৃত্বকে যুগ পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে সেই চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে আজ কেরলে সম্ভবত শ্রীশংকর একা। কোনও আইনসভায় এমন ব্যাপার এই প্রথম। উত্তর-স্বাধীনতাকালে কেরলের সপ্তম মন্ত্রিসভার মুখ্যনায়ক শ্রীশংকর '৬২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তাঁর কার্যভার নিয়েছিলেন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীথানু পিল্লাই পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর। সেই থেকে তাঁর বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত তিনবার অনাস্থা প্রস্তাব উঠেছে। '৬৩ সালের সুরুতে আর সেপ্টেম্বরে দু'বার যে অনাস্থা প্রস্তাব উঠেছিল, তা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর অনুবর্তীদের সাহচর্যে। কিন্তু এবারের ধাক্কা সামলানো তাঁর একার পক্ষে সত্যি দুরূহ। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বারবার বিরোধী কংগ্রেসীদের মত পরিবর্তনের আবেদন জানিয়েও সাড়া পান নি। কংগ্রেসী সংগঠনের শৃংখলা আরোপের প্রতি এই কটাক্ষপাত প্রকারান্তরে দায়ী করেছে শংকরকেই। বিরোধী শ্রী কে এম জর্জ রাজধানীর নিদ্রা কেড়ে নিয়েছেন।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু স্বয়ং গত নভেম্বরে শ্রীশংকরকে দুর্নীতির সমস্ত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়ে এক বিপর্যয়ের রাশ টেনে ধরেছিলেন। এযাবৎ যে গৃহযুদ্ধ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সমর্থক আর প্রদেশ কংগ্রেস-পন্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উক্ত ঘটনার পর তা প্রকট হ'ল শ্রীচাকো ও শংকরের দ্বন্দ্বে। অথচ একদিন এই চাকোই ছিলেন তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত। কেরলে কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে চাকো-শংকরের যুক্ত বিপ্লব কেরলের এক চিহ্নিত অধ্যায়। প্রদেশ কংগ্রেসীদের সহায়তায় এরপর শংকর চাকোর উচ্ছেদ চাইলেন মন্ত্রিত্ব থেকে। হাইকমাণ্ডের নির্দেশে চাকো অবসর নিলেন। আর সেই সঙ্গেই শংকরের প্রতিকূলে রাজনীতির চাকারও মোড় ফিরল। খৃস্টান-নায়ার গোষ্ঠীর পক্ষে চাকো এজন্য সম্প্রদায়ের শ্রীশংকরের বিপক্ষে আপোষহীন বিদ্রোহ জানালেন। শংকর অভিযুক্ত হ'লেন দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রশ্রয়-দানের জন্য। সর্বোপরি শ্রীচাকোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে। কিন্তু নাটক যখন জমজমাট তখন অকস্মাৎ মৃত্যু হ'ল চাকোর ও তাঁর সহকর্মী শ্রীগোবিন্দন নায়ারের। কিন্তু তাঁদের বিক্ষোভের প্রভাব তখন ছড়িয়ে পড়েছে অনেক দূর। তবুও অগাস্টে চাকো-নায়ারের সমর্থকরা প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির নির্বাচনে হেরে গেলে কংগ্রেস নেতারা কিছুটা আশ্বস্ত হ'য়েছিলেন। কিন্তু শংকর নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পান

শ্রী আর. শংকর

নি। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে এই সম্মিলিত অনাস্থা প্রস্তাব কেরলের রাজনীতির মঞ্চে আবার এনেছে বিস্ময়। আর এই বিস্ময়ের মধ্যেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শংকরের অনমনীয় বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। আসছে বছরের ফেব্রুয়ারীতে কেরলের সাধারণ নির্বাচন। সে সময়ে শ্রীজর্জের কথা যদি সত্যিও হয়—আসন্ন নির্বাচনে যদি কংগ্রেস নেতৃত্ব কেরলের রাজনীতির ঘূর্ণি হাওয়ায় নিশ্চিহ্নও হ'য়ে যায়—তবুও শ্রীশংকরকে তাঁর পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এক অভূতপূর্ব ইতিহাসের উপলক্ষ্য হিসেবে আজকের মানুষ বহুদিন মনে রাখবে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

'সময়-রহস্য' কথাটার মধ্যেই মানব-জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের অনেক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির স্মৃতিচিহ্ন আছে। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ,—এই তিন সীমানায় বাঁধা স্তরে-স্তরে ভাগ করে সুবিপুল সময়-ধারণাকে আমরা একই সত্যের বোধগম্য তিনটি নামে পরিণত করেছি। তত্ত্বের বিদেহী কুয়াশা যেন সীমায় ধরা দিয়ে দৃশ্যরূপ পেয়েছে।

আমরা ইহকালে বাস করি বটে, কিন্তু চিরকালকে ভুলি না। আবার, চিরকালের দিকে নজর আছে বটে, কিন্তু ইহকালের দিকেই বেশি সজাগ থাকতে হয়। কেউ বলেন আমাদের ইহকালই প্রধান, কেউ বলেন চিরকাল। কেউ বলেন, যা দেখছি, তাই-ই আগে। কেউ বলেন, যা অগোচর, তাই-ই। যে যাই বলুন,—কা'রও পক্ষেই সময় হারানোটা সুবিবেচনা নয়। লালন ফকিরের গানে আছে—

সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না।
জল শুকাবে মীন পালাবে,
পস্তাবি রে মন-কানা ॥
তিরপিনির তীর-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিহার করে,
(তুমি) উপর উপর বেড়াও ঘুরে
সে গভীরে ডুবলে না।

বাউলের এই গান যেন অশেষের ইশারা। সময় সম্বন্ধে এই সম্পদবোধ গভীর ব্যাপার। লালন ফকির যে জল এবং মীনের কথা বলেছেন, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মশায়ের 'বাংলার বাউল' বইয়ে সে-সবের ব্যাখ্যা আছে। সে-বই বেরিয়েছে ১৩৬৪তে।

সে-সব কথা ভাবতে গিয়ে মন চলে যাচ্ছে সময়তত্ত্ব থেকে যোগের তত্ত্বে। আধুনিক কবিতায় সময় কবিদের যেভাবে ভাবিয়েছে সে-ভাবনা নয়; বাউলের ভাবনা অন্য ধরণের। তাঁরা যে জলের কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে কখনো বলা হয়েছে 'আব-হায়াত', কখনো 'উল-হায়াত',—মানে, জীবন-নদী। উপেন্দ্র-কুমার লিখেছেন—'ইহার রহস্য অদ্ভুত; দেহরূপ নৌকায় এই গঙ্গানদী বোঝাই—অকস্মাৎ প্লাবনে নদীর পাড় ভাসিয়া যায়, আবার তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায়। এই গাঙে প্রকাণ্ড এক মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।'

লিখেছেন—'এই বর্ষাকালে বাঁধ বাঁধিয়া মাছ না ধরিলে, অর্থাৎ সময়ে সাধন না করিলে, কোনো ফলই লাভ হয় না।'

এই মন্তব্যের পরেই ঢাকা জেলার নরসিংদির এক বাউলের গানের এই টুকরোটুকু তিনি তাঁর আলোচনায় তুলে দিয়েছেন—'কিছু হবে না রে সময় গেলে—সময়ে সাধন না হলে।' লালনের আর একটি গান তুলে দেখিয়েছেন—

সামান্যে কি চিনে সেই নদী,
সেথা বিনে হাওয়ায় ঢেউ ওঠে,
নিরবধি,
শুভযোগে জোয়ার আসে যদি
ত্রিবেণী ভেসে যায় সমানে ॥

সে নদী চেনা সহজ নয়। সেখানে বিনা-হাওয়ায় কেবলই ঢেউ উঠছে। শুভযোগে সেই নদীতে যখন জোয়ার আসে, তখন ত্রিবেণী ভেসে যায়।

মৃত্তিকাহীন নদী পরে
মীন এক আসা যাওয়া করে,
অন্যে চিনতে পারবে কেনে।
পূর্ণিমার যোগে সে মীন ভাসে।
কারুণ্য তারুণ্য লাবণ্যে যখন মিলে,
সাধকে মীন ধরিতে পারে সেই দিনে।

সাধক মীন ধরতে পারেন সেই শুভযোগে—যখন কারুণ্য আর তারুণ্য এসে লাবণ্যের সঙ্গে মেশে।

আউল, বাউল, সাঁই, সহজিয়া—এসব শব্দ বাংলায় খুবই চেনা বটে, কিন্তু অল্প-জানা। উনিশ-শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' বইয়ে এঁদের কথা বলে গেছেন। স্বর্গত মণীন্দ্রমোহন বসু বৈষ্ণব সহজিয়া-ধর্মের আলোচনায় অক্ষয়কুমারকেই অনুসরণ করে গেছেন। উইলসন সাহেবের 'Hindu Religions or An Account of the Various Religious Sects of India' এই ধারার প্রসিদ্ধ বই। উপেন্দ্রকুমার মনে করেন যে, অক্ষয়কুমার দত্ত লোকমুখে শোনা-কথার ওপর বেশি নির্ভর করে গেছেন। মণীন্দ্রমোহন অনেক জায়গায় অক্ষয়কুমারের ওপরেই বেশি নির্ভর করেছেন। যেমন বাউলের 'চারিচন্দ্র ভেদ' ব্যাপারের ব্যাখ্যায়। উপেনবাবু দেখিয়েছেন যে, বাউলদের 'চন্দ্রভেদ' আর তান্ত্রিকের 'ষট্‌চক্রভেদ' মণিবাবুর মতে,—প্রায় সদৃশ। স্বর্গত শশিভূষণ দাশগুপ্তও তাই বলে গেছেন। কিন্তু উপেনবাবু পার্থক্যের কথা তুলেছেন। তিনি বলেছেন—'আমাদের কল্পনায় বাউল নামে এক অদ্ভুত জীব বাস করে এবং এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন তাহাদের বর্ণনায় বেশ খানিকটা রঙ চড়ানো হইয়াছে।' অক্ষয় দত্ত 'সাঁই-সম্প্রদায়ের' বিবরণ দিয়েছিলেন, 'সহজী' সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেছিলেন। উপেনবাবু জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'সহজী' বলে কোনো সম্প্রদায় এখন আর বাংলায় নেই. 'দরবেশ'

বলেও কোনো সম্প্রদায় নেই এখন। 'সাঁই' মানে স্বামী বা গুরু। এখন মুসলমান বাউলদের মধ্যে কোন কোন সাধককে 'আউল' বা 'আউলিয়া' বলা হয়। আউলিয়া গুরুর কাছে এঁদের দীক্ষা। একালে আউল-বাউল একই কথা। চব্বিশ পরগনার বারাকপুর মহকুমায় ঘোষপাড়া গ্রামে 'কর্তাবাবা' রামশরণ পালের বাড়িতে প্রতি বছর দোলপূর্ণিমার সময়ে পশ্চিম-বাংলার বাউলদের শাখা 'কর্তাভজা'-সম্প্রদায়ের মেলা হয়ে থাকে। বীরভূমের কেঁদুলীর মেলাও বাউল-সমাবেশের অনুষ্ঠান। পূর্ববঙ্গে রাজসাহী জেলায় খেতুরের মেলা আর প্রেমতলীর মেলাও এই বাউলদের সম্মিলন।

কর্তাভজা-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এই যে, চৈতন্যদেব তাঁর শেষ লীলায় কন্থাধারী মুসলমান ফকিরের বেশে ত্রিবেণীর ঘাট থেকে নদী পেরিয়ে কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি ঘোষপাড়ায় এসে পৌঁছেছিলেন। সেখানে রামশরণ পালের সঙ্গে ফকিরের দেখা হয় এবং তাঁরই বাড়িতে তিনি বহু সমাদরে আশ্রয় পান। বাইশজন তাঁর শিষ্য হন। রামশরণ পাল হন মোহান্ত। ফকিরের অনুমোদনে তিনিই হন 'কর্তাবাবা'।

অনেক পরিশ্রম করে উপেনবাবু এসব তথ্য দিয়েছেন। উইলসনের বইয়ে রামশরণ যে 'রামসুন্দর' হয়েছেন, তাও উল্লেখ করেছেন তিনি। স্পষ্ট করে বলেছেন—'দত্ত মহাশয় তাঁহার বর্ণিত আউল-বাউল-নেড়া-কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তাই পুনঃ পুনঃ তাহাদের স্কন্ধে ব্যভিচার-দোষ চাপাইয়াছেন কিন্তু ইহা ব্যভিচার নয়—সুকঠিন যোগ-সাধনা।' আর স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের কাছে যেসব বাউলগান ছিল—'প্রবাসী'তে হারামণি বিভাগে যার কিছু কিছু ছাপা হয়েছিল,—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে 'বঙ্গবীণা' কাব্যসংগ্রহের মধ্যে যেসব বাউলগান প্রকাশিত হয়, সেগুলি দেখেই তিনি এইসব গান-সংগ্রহের প্রেরণা পান। তিনি বলেছেন অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত দু'খণ্ড 'হারামণি'তে যে সব বাউলগান বেরিয়েছে,—'পাঠ-বিকৃতি বাদ দিয়া ধরিলে, সেইগুলিই বাংলার প্রকৃত বাউলগান।'

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন—'ক্ষিতিমোহনবাবুর গানের রচয়িতা বাউলগণ কোথায় গেল?' লালনফকিরের রচনার মূল পাঠ দেখবার কৌতূহল নিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে যান। ক্ষিতিমোহনবাবুর সঙ্গে তাঁর সেই আলাপ-আলোচনার সঙ্গী ছিলেন শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাউল সম্বন্ধে স্বর্গত সেন-মশায় তাঁর লীলা-বক্তৃতা দেন। ১৩৫৭'র আশ্বিনের বিশ্বভারতী-পত্রিকায় প্রকাশিত সে বক্তৃতাও তিনি দেখেন। ১৩৬২-৬৩তে বাউল-পরিচয় নামে ঐ বিশ্বভারতী পত্রিকাতেই আবার ক্ষিতিমোহন আরো কিছু লেখেন। সে-সব দেখে উপেন্দ্রকুমারের মনে হয় যে, একালের বাউলদের সাধনার সঙ্গে সে-সব কথার মিল নেই। হয়তো ক্ষিতিমোহনবাবু যা বলেছেন সে-সব মধ্যযুগের অন্য অঞ্চলের ধর্মসাধনার কথা। সে-সব একালের বাংলার বাউলের সাধনা নয়। একালের গবেষকদের আহ্বান করে তাই উপেন্দ্রকুমার জানিয়েছেন—

'শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের যে-গানটি বাউলগানের সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে সর্বত্র সুপরিচিত, সেটি হইতেছে—'নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে?' আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় দেড় হাজার বাউলগান পর্যালোচনা করিতেছি, কিন্তু ইহার মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ও অনেকটা আধুনিকা-গন্ধী গান খুঁজিয়া পাই নাই।'

বলেছেন যে, এই গানের ভণিতায় যে 'মদন' নামটি আছে, সেটিও অন্য কোনো মদন-এর ইঙ্গিত। 'মানস-মুকুল'-এর মতন চমৎকার বচন সৃষ্টি আসল বাউলদের কাজ নয় বলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। উপেন্দ্রকুমারের নিজের কথায় আসল-বাউলদের—'ভাষা ও উপস্থাপনা-ভঙ্গি অন্যরূপ।'

তিনি মনে করেন যে, ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগের কবীরের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন বলেই বাংলার বাউলদের সম্বন্ধে 'সামরস্য'—অর্থাৎ প্রেম ও বৈরাগ্যের ধারা রসে এক করে নেবার কথা তুলেছিলেন। তিনি বলেন—'বাংলার কোনো বাউলই এই শিব-শক্তি যোগকে 'সমরস' বলে না।' বাউলকে তিনি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত অবস্থার মানুষ হিসেবেই চেনেন। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ অধিকারী হাউড়ে-গোঁসাই নামে পণ্ডিতের গানেও এই 'সমরস'-এর প্রয়োগ দেখেন নি তিনি। 'শূন্য' বা 'সহজ শূন্য' কথাও তাঁরা ব্যবহার করেন না।

এই রকম আরো অনেক সংশয়-সন্দেহের কথা আছে তাঁর আলোচনায়। কিন্তু পদে পদে সবিনয় নিবেদন এসব। এসব তর্কের মীমাংসা আমার এই পথের লক্ষ্য নয়। 'সময় বুঝে বাঁধাল বাঁধলে না'—বাউলের এই অনুভূতিতে পথ হারিয়ে, পণ্ডিতের সঙ্গে অনেক দূর চলে এসেছি। এবার ফেরা যাক্‌। লালনের গানে আছে—

'সোনার মানুষ ভাসছে রসে।'

হঠাৎ চমকে উঠতে হয়। এ কোন্ লালন? ইনি আসল না নকল? যিনি বা যাঁরা 'মানস-মুকুল'-এর মতন শব্দ সমাবেশের স্রষ্টা হতে পারেন কি-না সন্দেহের বিষয় বলে মনে হয়, তাঁরাই কি এই 'সোনার মানুষ ভাসছে রসে'র মতন চমৎকার ইশারা রেখে গেছেন?

নরসিংদির বাউল সম্প্রদায়ের আদিগুরুর নাম রামদাস। উপেন্দ্রকুমার

মনে করেন যে, বাংলা ১২০০ সালের গোড়ার দিকে রামদাস বাউল ঢাকা জেলার নরসিংদিতে এসে বসেছিলেন। নরসিংদির এক বাউল গেয়েছেন—

কিছু হবে না রে সময় গেলে
সময়ে সাধন না হলে।
এই বর্ষাকালে রইলি বসে
মীন চলে যায় জলে ভেসে,
বর্ষা গেলে জল শুকালে
কি হবে পাছে বাঁধ বাঁধিলে?

আর একটি গানে আছে—'চেতন থাকতে লও চিনে কোন্ বাড়ি রে কার' লালনের সেই 'সোনার মানুষ' সম্পর্কিত গানে বলা হয়েছে—

সোনার মানুষ ভাসছে রসে
যে জানে সে রস-পন্থী,
দেখতে পায় সে অনায়াসে।
তিন শ' ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি
তার মধ্যে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে।

এই গানে এবং আরো সব গানে লালন এই নদীর গভীর ভাবটি ভেবেছেন,—অমাবস্যা-পূর্ণিমার কথা তুলেছেন—মীনের আসা-যাওয়ার সময়ের ইশারা দিয়ে সেই মাছ ধরবার তাগিদ দিয়েছেন—

পিতামাতার নাই ঠিকানা
অচিন দলে বসতখানা
আজগুবি তার আওনাখানা
কারণবারির যোগবিশেষে
অমাবস্যায় চন্দ্র উদয়
দেখতে যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে, থেকো সদায়
ত্রিবেণীতে থেকো বসে।

যাকে ধরতে হবে,—'আত্মারূপে সেই অধর'—সে কোথায়?—'এই মানুষে সেই মানুষ আছে'।

উপেন্দ্রকুমারের ব্যাখ্যা মনে পড়ে—

'বাউলরা প্রকৃতির রজঃ-প্রবৃত্তির সময়কে 'অমাবস্যা' বলে। ইহা ঘোর অন্ধকারময় কামের সময়। কামের স্বরূপকে বাউলরা নিরবচ্ছিন্ন দেহ-ভোগের অন্ধকারময় শক্তি বলিয়া বুঝিয়াছে। এই অমাবস্যার মধ্যেই তাহাদের পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়। এই পূর্ণচন্দ্র 'সহজ মানুষ' বা 'অধর মানুষ', ইনিই প্রেম-স্বরূপ। তাই অমাবস্যাকে অনেক স্থলে তাহারা 'কাম' বলিয়া বুঝিয়াছে এবং পূর্ণিমাকে 'প্রেম' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এই 'অধর মানুষ' বা পরমাত্মা সহস্রারে অটল-রূপে বিরাজিত। ইনি এই যোগের সময় রস-রূপে প্রকৃতি-দেহে-ক্রীড়া করেন এবং পূর্ণভাবে-মূলাধারে প্রকৃতির কারণবারিতে আবির্ভূত হন। এই আবির্ভাবকে তাহারা 'পূর্ণিমার যোগ' বলে। ইহাই বাউলদের 'অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়'।---এই যোগের তৃতীয় দিনে বা কোনো সম্প্রদায়ের মতে চতুর্থ দিনে 'মানুষ ধরা'র প্রশস্ত দিন।'

এসব ব্যাপার 'দমে'র কাজ। —যোগের কাজ। শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের পথ ধরে, এ নাকি দেহের মধ্য দিয়ে দেহ-বিলুপ্তির দিকে যাওয়া। গুরুর মুখে শুনতে হয় এসব। সাধকের সঙ্গে চলতে হয় এ পথে। নাভিপদ্ম থেকে হৃদয়পদ্মের দিকে এই যে গতি, এ তো সাহিত্যগতি নয়। এই সম্প্রদায়গত সাধনার এলাকা থেকে এইবার ফেরা যাক্ সর্বসাধারণের অন্য দেশে, অন্য সময়ে।

গূঢ় আচারের দিক থেকে এঁদের এই পথ সর্বসাধারণের চোখে যতোই অচেনা বা অন্ধকার মনে হোক না কেন, এঁদের গানের মধ্যে অনেক আলো আছে, হিল্লোল আছে। হিল্লোল—কথাটা এঁদের পারিভাষিক অর্থে নয়, এমনিই মনে এলো। মনে এলো—

আয় কে যাবি ওপারে
দয়ালচাঁদ মোর দিচ্ছে খেয়া
অপার সাগরে।

এ পদ সিরাজ সাঁইয়ের। এই সঙ্গে মনে আসছে ক্ষিতিমোহনের সংগৃহীত মদন বাউলের কয়েক ছত্র—

দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তাড়া-হুড়া নাই।

আবার আর এক গানে—

আমার ডুবলো নয়ন রসের তিমিরে
কমল যে তার গুটালো দল
আঁধারের তীরে।

রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে গগন-হরকরার পদে আছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে
বেড়াই ঘুরে;
লাগি সেই হৃদয়শশী
সদা প্রাণ হয় উদাসী,
পেলে মন হোতো খুশি
দেখতাম নয়ন ভরে।

যুগের তিমিরেই হোক্, জোৎস্নাতেই হোক্—এ যে গভীর নিমজ্জন, তাতে সন্দেহ নেই।

সময়ের ঢেউয়ে ঢেউয়ে জীর্ণ হতে হতে, কোনো এক অনুভূতির অবগাহনে পৌঁছে স্থির হতে চেয়েছে মানুষ। মাথা খাটিয়ে প্রতীক ব্যবহার করেছে—অমাবস্যা, পূর্ণিমা, ত্রিবেণী ইত্যাদি। ইশারায় নিজের সামর্থ্য-অসামর্থ্যের কথা বলতে চেয়েছে, যেমন—'নাগরদোলা' শব্দটির প্রয়োগে,—যেমন অন্যান্য উক্তিতে,—যার মানে হোলো 'জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন'। আবার 'ষোলজন বোম্বেটে' মানে পাচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় আর ছয়রিপুর সমাবেশ। পাঞ্জু শাহের গানে সাধনার গূঢ় অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত আছে।

ধর্মের পথে সাহিত্যের ধারা এইভাবে দেশে-দেশে রস্যব্যঞ্জনার সর্বপরিচিত পথ ছেড়ে সাম্প্রদায়িক পরিভাষায় গিয়ে ঠেকে। বাউলদের বাংলা গানে 'সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র', 'একাদশ কলি', 'অষ্টম ইন্দু' ইত্যাদি এরই উদাহরণ। উপেন-বাবুর বইয়ের 'অর্থ-সংকেত ও টীকা-টিপ্পনী', সেজন্যে খুবই সহায়ক।

কিন্তু সে-সব গূঢ় অর্থের কথা স্থগিত থাক। আজ আমার এই কথাই মনে আসছে যে, সময়ের ধারা আমাদের চেতনাকে একদিকে যেমন কেবলই ফুটিয়ে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি এই সময়ব্যাধি থেকে আমরা নিরন্তর সরে যাবার চেষ্টা করছি। ধর্মের পথেও তাই, সাহিত্যের পথেও তাই। রোমান্টিক মেজাজ আমাদের। প্রত্যেক কালপর্বেই আমরা আমাদের কাছের সময় থেকে দূরের সময়ে,—অথবা সময়হীনতায় সরে যাবার চেষ্টা করছি।

মনে পড়ছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ'-এর নাম-পৃষ্ঠাতেই ছিল—

অচেতনে চেতন। ঘুমন্তে জাগা।
সকলি বিচিত্র স্বপনের কাণ্ড।
গোড়া নাই আগা।

সে-কাব্যের প্রথম সর্গের নাম 'মনোরাজ্য-প্রয়াণ'। মনোরাজ্যে যাত্রার প্রথম শর্তই ছিল—'সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ'। এবং প্রতিদিনের ব্যবহারিক সংস্কার বিস্মৃত হবার আগে নয়,—সেই বিস্মরণের পরে—ঐ 'ঘুমন্তে জাগা' অবস্থাতেই—

ছায়া-রূপা রমণী সুযোগ ভাবি
কবির মনোমন্দিরে খুলি' দিল রহস্যের
চাবি।

দ্বিতীয় সর্গে নন্দনপুরে পৌঁছে কবি প্রমোদ, হর্ষ, উল্লাসের দেখা পেয়েছেন, —স্বাস্থ্য, দাক্ষ্য ইত্যাদিকে দেখেছেন, —শুনেছেন—

সংযম যাহার নাহিক সাধা,
শ্রেয়-পথে ফিরিতে আপনি
হয় আপনার বাধা।
ছাড়া পেলে অশ্ব
ছুটিবে অবশ্য
লক্ষ্য দেখাইয়া এবে তারে চাই বাঁধা।

আজ এ-কথা হঠাৎ কেন মনে এলো? এই আমাদের মর্ত জীবনের মূল চেষ্টাটাই হোলো অধরা-কে ধরবার চেষ্টা। বাউলরা ধর্মের গূঢ় আচারের পথে এগিয়েও মানুষের ইহজীবনের সেই আসল কবিতা লিখে গেছেন; আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—একালের চোখে এই অতি অক্ষম, কিন্তু,—সেকালের সামর্থ্য অনুসারে দেখলে খুবই উল্লেখযোগ্য এই 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-কাব্যে কবিতার মধ্যে ইহজীবনের সেই আসল সাধনা 'শ্রেয়ে'র ইশারা দেখাতে ভোলেন নি। বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বাউল' ছিলেন না,—'বাউল'রাও সজ্ঞানে মূলত কবি হতে চান না। আধ্যাত্মিক সাধনার পথেও 'মানস-মুকুল'এর মতন চমৎকার শব্দ তৈরি হয়ে যাওয়াটা বিচিত্র নয়।

মানুষকে ছেড়ে দিলে সে তার লক্ষ্যের দিকে অবশ্যই এগিয়ে যায়। দ্বিজু ঠাকুর ঠিকই বলে গেছেন—'ছাড়া পেলে অশ্ব ছুটিবে অবশ্য'। তাই তার লক্ষ্য দেখিয়ে তাকে বাঁধা চাই। সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে তাই আমাদের বাঁধা পড়তেই হয়। নশ্বরতার পরেও একটি মনোভূমি চাই। এই মন দিয়েই তো জীবনকে জানলুম, চিনলুম। মনই তো দিচ্ছে, নিচ্ছে, রাখছে, হারাচ্ছে। এই মন শুদ্ধ হোক, শান্ত হোক, পূর্ণ হোক।

এসব কথার দার্শনিক তাৎপর্যে নজর রেখে, খুব সতর্ক হয়ে বাকশাসন করবার মেজাজ নেই এ-রচনায়। মনে এলো, তাই বলছি। ক্ষীণভাবে হলেও ভেতরে একটা বিশ্বাস কাজ করছে বলে অনুভব করছি। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণের 'কল্কি' নামে ইংরেজী বইয়ে পড়েছিলুম—মানুষ অবস্থার দাসও নয়, অন্ধ দেবতাদের খেয়ালের খিদ্‌মত্‌গারও নয়। বিশ্বের সর্বত্র পরমোৎকর্ষ সন্ধানের যে তাগিদ বিদ্যমান, মানুষের মধ্যে সেই তাগিদটাই জ্ঞানে ধরা দিয়েছে। অতীতে জীবনের নিম্নস্তরে প্রকৃতির ইচ্ছাতেই প্রগতি ঘটতো, এখন প্রগতি-সাধন মানব-ইচ্ছার বিষয়ীভূত।

অনুবাদে এসব কথা আসবে না। তাই সেই মূল কথাটা মূলেই স্মরণ করি—

'Progress happened in the Sub-human world: it is willed in the human. Conscious purpose takes the place of unconscious variations. Man alone has the unrest consequent on the conflict between what he is and what he can be. He is distinguished from other creatures by seeking after a rule of life, a principle of progress.'

বনফুলের ব্যঙ্গ-কবিতাও সেই প্রগতির তাগিদ,—লালনফকির, গগন হরকরাও তাই,—আবার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নন্দনপুরও সেই একই তাগিদের আর-এক অভিব্যক্তি।

সময়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক, সময় নামক নদীর এই আধ্যাত্মিক দিকটি কি অধুনা ভোলবার সময় এলো?

(ক্রমশঃ)

রাজধানী :

● নয়াদিল্লীতে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীআমেদ রিয়াদ তর্কী (বামে)।

ব্যর্থতা, নৈরাশ্য যাঁদের বুকে বাসা বাঁধতে সুরু করেছে এ-আই-সি-সির বৈঠকে তাঁরাই দু-চারটে গরম বক্তৃতা করে মনের ঝাল মেটাবেন, এই আশাই সকলে করেছিলেন। শ্রীত্রিকমলাল যমুনাদাস প্যাটেলের ঝাঁঝালো ব্যঙ্গোক্তিতে যখন চারদিক থেকে বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন, তখন ওয়াকিং কমিটির সদস্যগণ বিস্ময়ে প্রথমটায় হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। এ অধিবেশনে পরিষ্কার হয়ে গেল নেহরু-উত্তর কংগ্রেসের আসল রূপ। কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ যত প্রবলই হোক, দেহের ফাটল তার যত বড়ই হোক না কেন, ভবিষ্যৎ তার কোনদিক দিয়েই একেবারে অন্ধকার নয়। রোগ তার যা' কিছু আছে তার নিরাময়ের, ক্ষতস্থানে উপযুক্ত প্রলেপ দেবার নেতৃত্বের অভাব এখনও ঘটে নি। এ অধিবেশনেই প্রমাণিত হয়েছে ক্ষীণদেহ, খর্বকায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর বিরাট ব্যক্তিত্ব। কামরাজ পরিকল্পনার ওপর আলোচনাকালে যখন প্রবল ঝড় উঠেছিল, তার ঝাপ্টায় যখন সৃষ্টি হয়েছিল বিষম বিক্ষোভ ঠিক সেই সময়টিতে প্রধানমন্ত্রী উঠে-ছিলেন তাঁর বক্তব্য পেশ করতে। সঙ্গে সঙ্গেই পরিবেশ গিয়েছিল পাল্টে। যুদ্ধের জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়েই যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। তিনি অনেক ভ্রান্তিরও নিরসন করেছেন। তাঁর কথা থেকে এটা পরিষ্কার হয়েছে, প্রকৃত প্রস্তাবে পরলোকগত প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রধান-মন্ত্রীর আসনের জন্য তাঁর কথাই ভেবেছিলেন।

● শ্রীত্রিকমলাল যমুনাদাস প্যাটেল

সব চাইতে দুঃখের কথা, এ অধিবেশনে সদাচার সমিতি নিয়ে আলোচনাকালে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উচ্চপদের সম্যক মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন নি। সদাচার সমিতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের স্থান কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আলোচনা সভা নয়। এতে কংগ্রেসের মর্যাদাহানিও কম হয় নি।

* * *

অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী আবার নতুন ফ্যাসাদে পড়েছেন। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার বিরোধের ব্যাপারে তিনি সিঙ্গাপুরে মালয়েশিয়াকে সমর্থন করতে গিয়ে যে উক্তি করেছেন তাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। প্রধান-মন্ত্রীও নাকি একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন। বৈদেশিক ব্যাপারের কোন কাজের ভার আর যাতে তাঁর ওপর ন্যস্ত না হয় এমন দাবীও শীগগির উঠতে পারে। এবারে মন্ত্রিসভার কিছু সংখ্যক সদস্য জোর দিতেও পারেন।

* * *

কংগ্রেস হাইকমাণ্ড একদিকে যেমন কেরলের পরিস্থিতি নিয়ে পড়েছেন বিপদে, অপরদিকে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন উপনির্বাচনে কংগ্রেস-

প্রার্থী মনোনয়নের ফয়সালা নিয়ে। মুঙ্গের নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী এবার কে হবেন? জেলা কংগ্রেস কমিটি চাইছেন তাঁদের প্রতিনিধিকে পাঠাতে। হাইকমাণ্ড চান শ্রীঅশোক মেহতাকে ঐ কেন্দ্র থেকে লোকসভায় আনতে।

এদিকে শ্রীমেহতাও নাকি স্থানীয় লোকের মনোভাব সরেজমিনে বুঝে দেখবার জন্য বন্ধুদের মুঙ্গেরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা আশার সংবাদ শ্রীমেহতাকে দিতে পারেন নি। স্থানীয় কংগ্রেসের কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্যের সম্ভাবনা কম। তা' ছাড়া, বিরোধী দলগুলোর প্রার্থী সোসালিস্ট নেতা শ্রীমধুলিমায়া খুবই জনপ্রিয়।

বিহারের এ অঞ্চলে ভূমিহার ও রাজপুতদের বিরোধ সব চাইতে বেশি। আগে যিনি এখানকার লোকসভার সদস্য ছিলেন, তিনি ছিলেন ভূমিহরদের প্রতিনিধি।

শ্রীমেহতার মনোনয়নের অপর দিকটাও ভাবনার সৃষ্টি করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে গেলে তাঁকে পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যানের পদে ইস্তফা দিতে হয়। তিনি নাকি এতে রাজী নন। তিনি চাইছেন আগে তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে নেওয়া হোক। তারপর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে তাঁর কোন আপত্তি থাকবে না।

* * *

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীআমেদ রিয়াদ তুর্কী দিল্লীতে এসেছেন। শ্রীতুর্কী উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দু' দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

পাঞ্জাব:

পাঞ্জাব এখন বন্যাপ্লাবিত। জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে শিকারের সন্ধানে যেমন এসে হাজির হয় রক্তপিপাসু হাঙ্গরের দল, ঠিক তেমনি পাঞ্জাবে প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে নগ্নমূর্তিতে নখ-দন্ত বিস্তার করে আত্মপ্রকাশ করেছে একদল মুনাফা শিকারী। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষেণ জাল ফেলে দু-তিনটিকে টেনে তুলতেই দলের গোদাগুলো একটু ভড়কে গিয়েছিল—পিছু হটেছিল কয়েক পা। অবস্থাটা একটু ভাল করে খতিয়ে দেখে নিয়ে আবার নতুন কায়দায় শিকারে নামার ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেড়াচ্ছে—সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

পাঞ্জাবের বন্যা কিন্তু একটা ভাল কাজ করেছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে, উপদলীয় সংঘাতকে, সাময়িকভাবে হলেও ডুবিয়ে দিয়েছে। বন্যা আরও নিয়ে এসেছে নবগঠিত রামকিষেণ মন্ত্রিসভার সামনে নতুন পরীক্ষা। এ পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করবে মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ। পাঞ্জাবের বন্যা প্রকৃতির প্রতিকূলতার চাইতে মানুষের প্রতিবন্ধকতাই বেশি দায়ী। সাধারণ মানুষের মনে এ বিশ্বাস বাসা বেঁধেছে অনেক আগেই। তাঁদের ধারণা, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজনীতিকদের প্রভাবে তাঁদের সুবিধার্থে পাঞ্জাবের জলনিকাশী পয়ঃপ্রণালীর বিন্যাস সঠিকভাবে হয় নি। এ অভিযোগের তদন্তের জন্য স্বরাষ্ট্র ও উন্নয়নমন্ত্রী সর্দার দরবারা সিং ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

● শ্রীঅশোক মেহতা

● সর্দার দরবারা সিং

সম্প্রতি অর্থ কমিশনার শ্রীক্লেচার স্বীকার করেছেন,—ত্রুটিপূর্ণ ড্রেনই অধিকাংশ অঞ্চলের বন্যার কারণ। সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়ার সরেজমিনে এ বিষয়ে তদন্ত করে সঠিক তথ্য পেশ করার নির্দেশও দিয়েছেন। পনের দিনের মধ্যে ডেপুটী কমিশনারদের তাঁদের জেলার সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখে, ত্রুটিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করে দিয়ে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে। সে রিপোর্টে প্রতিকারের সুপারিশ থাকবে।

সরকারের এ সিদ্ধান্তে সবাই খুব খুশি এখন। বিরোধী দলগুলো পর্যন্ত এর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন সরকারকে। এ সমস্যা বারবার তুলে ধরা হয়েছিল কায়রোঁ মন্ত্রিসভার সামনেও। কোন সাড়া আসে নি সেদিনের সরকারের কাছ থেকে। উল্টে নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে বন্যাক্লিষ্ট মানুষকে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে। বন্যার জলকে তার স্বাভাবিক গতি-পথে প্রবাহিত করার আশায় যারা কোদাল ধরে নর্দমা ভেঙেছে তাদের ওপর নেমে এসেছে প্রশাসনী খড়্গ—

● শ্রীরামকিষেণ

মামলা রুজু করেছেন সরকার এদের অপরাধী সাব্যস্ত করে।

বন্যা প্রতিরোধ জলনিকাশী পরিকল্পনার জন্য গঠিত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীফ্লেচার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, কায়েমী স্বার্থকে রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর জলনিকাশী ব্যবস্থার যথাযথ বিন্যাস করে নি। এর চাইতেও মারাত্মক ভুল হয়েছে, প্রভাবশালী রাজনীতিকদের চাপে পড়ে মূল খাল কাটার আগেই তার শাখা-প্রশাখার কাজ শেষ করে ফেলা।

মানুষের হাতে গড়া এ বিপর্যয়ের জন্য রামকিষেণ মন্ত্রিসভা দায়ী নয়, কিন্তু এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের দায়িত্বটা এসে পড়েছে আজ তাঁদের ঘাড়েই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে এ সমস্যার পূর্ণ সমাধান মন্ত্রিসভা করে উঠতে পারবেন কিনা, সে প্রশ্নও উঠেছে কোন কোন মহলে। তাই বলছিলাম—পাঞ্জাবের প্লাবন প্রতিরোধের ব্যবস্থাপনার ওপর নির্ভর করছে মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা, তার ভবিষ্যৎ সত্তা।

এ বন্যায় পাঞ্জাবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে পর্যুদস্ত করে ফেলেছে। শস্যহানি হয়েছে প্রচুর, ধ্বংস হয়েছে অগণিত গৃহ। গ্রামাঞ্চলে শুধু জল, আর জল। ক্ষতি বেশি হয়েছে সোণেপত, পাণিপত, রোটাক সাংরুর, পাতিয়ালা, ফরিদকোট, ফিরোজপুর ও জলন্দর জেলায়। পাঞ্জাবের প্রায় অর্ধাংশ এখন জলমগ্ন। এক সাংরুর জেলারই চার লক্ষ মানুষ এবং চার শ' গ্রাম বন্যার করাল গ্রাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শস্য বিনষ্ট হয়েছে এক কোটি টাকার অধিক। বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার চারেকের মত। কম-বেশি একই অবস্থা হয়েছে অন্যান্য জেলাগুলোর।

• • •

এর পূর্ণ সুযোগ নিচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। তাদের গোপন হাতের খেলায় দেখা দিয়েছে চরম খাদ্যসঙ্কট। সরবরাহ দপ্তরের মতে বোম্বাই, কলকাতা ও উত্তর প্রদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী সংস্থা নিপুণ বাজিকরের মত বাজার নাচিয়ে তুলেছে।

পাঞ্জাবের শস্যভাণ্ডার কোটকাপুরা-মোগা এলাকায় তিরিশ লক্ষ মণ গম নাকি এখনও মজুতদারদের গুদামে মজুত হয়ে আছে। কোটকাপুরা, ফরিদকোট ও জইতুর বাজারের গুদামজাত গমের ওপর নাকি ব্যাঙ্ক দাদন দিয়েছে এক কোটি টাকা।

জোতদারদের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযানের পর পরিবেশ পাল্টে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী মহল উঠেছিল আতঙ্কিত হয়ে—গমের দাম তাতে হ্রাস পেয়েছিল বেশ কিছুটা। অভিযানে মজুতদারের হিসেবের গরমিল ধরাও পড়েছে অনেক ক্ষেত্রে। ব্যবসায়ীরা গরমিলের অভিনব ব্যাখ্যা দিতে সুরু করেছে। সরকারের সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী প্রতি পরিবারকে দশ কুইণ্টাল গম ঘোষিত মজুত গমের অধিক মজুত গম থেকে দেওয়াতেই হিসেবে নাকি গরমিল ঘটেছে।

পল্লী অঞ্চলের বড় জমিদারগণ মজুতদারদের অংশীদার হচ্ছেন। সরকারের অভিযান সুরু হতেই মজুতদাররা তাদের গুদাম থেকে মাল পাচার করে দিচ্ছে গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের গুদামঘরে। সরকারী আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এ সব গুদামঘর।

আরেকটি নতুন চাল চেলেছেন জমিদারের দল। তাঁদের সংস্থা 'ফার্মার্স কোরাম' ধুয়া তুলেছে সরকার গমের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিলে বিপদ ডেকে আনবেন—চাষীরা মোটা শস্যের চাষের দিকে ঝুঁকে পড়বে। কম খরচে তাতে লাভ হবে অধিক। জমিদার, জোতদার ও ব্যবসায়ীদের মিতালী বিপদে ফেলেছে মন্ত্রিসভাকে। পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠীর অনেকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে এদের গাঁটছড়া। কাজেই এরা শক্তি কম ধরে না। এতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি রাতারাতি মজুত-বিরোধী অভিযান বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে তাঁর বিরোধীরা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীযশ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে সুরু করে দিয়েছেন। শ্রীরামকিষেণ শক্ত করে হাল ধরতে না পারলে তরী পাড়ে ভেড়াতে পারবেন কিনা, এ সন্দেহও জেগেছে অনেকের মনে।

মধ্যপ্রদেশ :

শেখ আবদুল্লা এবারে নাকি ভূদান নেতা আচার্য বিনোবা ভাবের মন গলাতে পারেন নি। কাশ্মীরের একাংশ

▶ শেখ আবদুল্লা

ভূমি পাকিস্তানকে দানের যে প্রস্তাব তিনি বোম্বাই শহরের বুকে বসে করে গেছেন, তারপর আবদুল্লার আহ্বানে সাড়া দেওয়া কারো পক্ষেই সমীচীন নয়।

আশানুরূপ সাড়া না পেয়েই শেষ পর্যন্ত শেখ সাহেব আচার্য ভাবের চরণতলে বসে নয়া আব্দার পেশের আশায় ওয়ার্ধা সফর বাতিল করে ঘরে ফিরে গেছেন। প্রকাশ, আচার্য ভাবে তাঁকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন—বর্তমান পরিস্থিতিতে কাশ্মীর নিয়ে কোন আলোচনা যুক্তিযুক্ত হবে না। কেউ কেউ বলছেন আবদুল্লা আগেও একবার ভাবেজীর সাক্ষাৎ কামনা করেছিলেন। জুন মাসের শেষের দিকে কাশ্মীরের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনায় বসতে আচার্যকে অনুরোধ করেছিলেন। সেবারের অনুরোধও আচার্য রক্ষা করতে পারেন নি। আলোচনার দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। পাক-ভারত প্রশ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর আচার্যজীর মতের পরিবর্তন ঘটে।

* * *

গেল সপ্তাহে বিধানসভায় পরিবেশিত অডিট রিপোর্টে তেইশ কোটি দশ লক্ষ টাকার হিসাব নিয়ে আপত্তি দেখান হয়েছে। ১৯৬৩ সালের ৩১শে মার্চে যে সকল আপত্তি ছিল তার ১,২৬,৬০২টি বিষয়ের কোন মীমাংসাই সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো বিগত সেপ্টেম্বরের শেষ অবধি করে উঠতে পারেন নি। সব চাইতে বেশি আপত্তি অডিট থেকে করা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরের খরচ সম্পর্কে। কৃষি দপ্তরও কম যায় না। তার খরচ সম্পর্কে আপত্তির বহর তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে।

৭৮টি জনকল্যাণ কাজে সরকার খরচ করেছেন তের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা। এগুলোর বিস্তারিত পরিকল্পনার কোন অনুমোদনই নেই। এ ছাড়া, আর্থিক ক্ষতি ও অর্থ অপব্যয়ের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে অডিট রিপোর্টে।

উড়িষ্যা:

বিধানসভা সাত দিনের জন্য মুলতুবী। রাজধানী ভুবনেশ্বর এখন লৌহ শিরস্ত্রাণধারী পুলিশের সতর্ক প্রহরাধীন। শহরের কয়েকটি অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। মন্ত্রীদের গৃহে, রাজ্য পরিকল্পনা পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীবিজু পট্টনায়কের বাড়িতে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে।

রাজ্য বিধানসভা, সরকারী দপ্তরখানা, বিভাগীয় প্রধানদের কয়েকটি দপ্তর ও একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের দপ্তরখানার এলাকায়

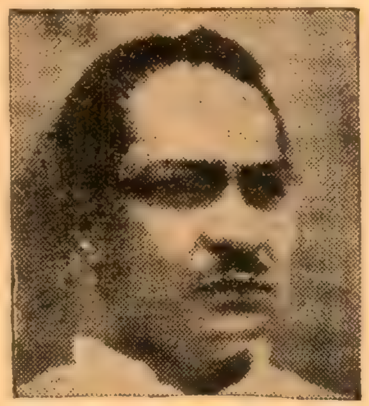

● শ্রীবিজু পট্টনায়ক

পাঁচজন অথবা তার বেশি লোকের সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছে। এ আদেশ বলবৎ থাকবে ৬০ দিন।

অধিবেশন মুলতুবী রাখার সময় বিধানসভার উপাধ্যক্ষ শ্রীলোকনাথ মিশ্র বলেছেন, আগের দিন বিধানসভার কাজ চলার সময় একদল শিক্ষিত যুবক যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন তা অভূতপূর্ব। আর কোন রাজ্য বিধানসভায় এরূপ কোন ঘটনা ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না।

বিধানসভা ভবনের মধ্যে প্রবেশ করে, সেখানে উচ্ছৃঙ্খল জনতাং রাজ প্রতিষ্ঠার কথা আমরাও আগে শুনি নি। উড়িষ্যার ছাত্রগণ দেশের ছাত্রসমাজের মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে। প্রহরীদের বাধা, উপেক্ষা করে একদল ছাত্র বিধানসভা ভবনে প্রবেশ করে ২রা সেপ্টেম্বর। কাচের শার্সি-জানালা ভেঙে চুরমার করে, আসবাবপত্রাদি তছনছ করে ফেলে। তারপর শ্লোগান দিতে দিতে দর্শকের গ্যালারীতে প্রবেশ করে সেখানেও শ্লোগান দিতে সুরু করে। তাদের এ অভিযানে নষ্ট হয়েছে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি।

দাবী ছিল তাদের সামান্য। বাসের কণ্ডাক্টার নাকি একজন ছাত্রকে প্রহার করেছিল। তার প্রতিকারের দাবীতে বিধানসভায় এসে ছাত্রগণ লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল।

ছাত্রদের মতিগতি দেখে দুজন মন্ত্রী নাকি শৌচাগারের জানালা-পথে পালিয়েছিলেন। লাঠিধারী, প্রহরারত পুলিশ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। রিভলভারধারী সার্জেণ্ট মন্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা কোন পর্যায়ে নেমেছে, উড়িষ্যার ঘটনা তারই একটি নজীর। এ অপরাধ অমার্জনীয়। কেন এমন হল? তরুণের দল সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন এমন উত্তেজিত, উন্মত্ত হয়ে উঠলো? উড়িষ্যার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা একবাক্যে ছাত্রদের কাজের নিন্দা করেছেন। আজ শুধু নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করে, ছাত্রদের কাজের সমালোচনা করে, নেতারা এবং দেশের শিক্ষাবিদগণ নীরব হলে মারাত্মক ভুল করবেন। নিষ্কৃতি পাবেন না। এর প্রতিকারের নির্ধারণ এখনই করা প্রয়োজন হবে।

ছাত্রসমাজ বয়সের বৈগুণ্যে হয়ে পড়ে দিশেহারা—উদ্‌ভ্রান্ত। গড়ে ওঠার বয়সে তার দেহ ও মনের জন্য চাই উপযুক্ত খোরাক। তার জীবনতরী খুঁজে বেড়ায় একটা অবলম্বন। সামনে তার থাকা চাই ভবিষ্যৎ

জীবনের একটা বিরাট আদর্শ। এর কোনটাই কি তারা পাচ্ছে? এ প্রশ্নের জবাব উড়িষ্যার প্রচ্ছন্ন শাসক শ্রীবিজু পট্টনায়ক, ও অন্যান্য নেতারা নিশ্চয়ই দেবেন। তিনি এক বিবৃতিতে, 'ছাত্রগণ গণতন্ত্রের পীঠস্থান আক্রমণ করে, সভার মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে' বলে মন্তব্য করেছেন। দিন কয়েক আগে তিনি ও শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান কংগ্রেসের বৈঠকে যে কাণ্ডটি করেছেন, তা কি কম দুঃখজনক? ছাত্রদের সামনে আদর্শ কোথায়? কি অবলম্বন করে তাদের চরিত্র গড়ে উঠবে?

আমরা ছাত্রদের কার্যকলাপের সমর্থন করছি নে। আগেই বলেছি, তাদের অপরাধ অমার্জনীয়। কিন্তু আমাদের দায়িত্বের কথাটা, ছাত্রদের সামনে আমাদের চারিত্রিক নিষ্ঠার বিষয়টি এবং ছাত্রদের দেহ ও মনের যথোপযুক্ত খোরাকের জোগান দেবার কর্তব্যের কথাটা রাষ্ট্রনেতারা যেন বেমালুম ভুলে না থাকেন।

কাশ্মীর :

কাশ্মীরকে কংগ্রেস সংগঠনের প্রক্রিয়ারে আনা সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভবত অক্টোবরের শেষাশেষি নেওয়া হবে। কাশ্মীরের জাতীয় সম্মেলনকে ঢেলে সাজিয়ে কংগ্রেসের কাঠামোতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রশ্ন নিয়ে এখন চলেছে বিচার-বিশ্লেষণ।

জাতীয় সম্মেলনের মুখপাত্রদের সূত্র থেকে বলা হচ্ছে, কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে এমনি ধরণের সাংগঠনিক পর্যায়ে জাতীয় সম্মেলনকে আগে গড়ে তোলা প্রয়োজন হবে। কংগ্রেস হাইকমাণ্ডও তাই চাইছেন। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জি এম সাদিক নাকি এখন এই মতই পোষণ করেন। তিনিই প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীয় সম্মেলনের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবই দলের তরফ থেকে উত্থাপন করেছিলেন।

জাতীয় সম্মেলনের কংগ্রেস-ভুক্তির প্রস্তাবটি সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গৃহীত হয় নি। এ-আই-সি-সি'র আগামী

● শ্রীসাদিক

অধিবেশনে এ বিষয়ে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়তো জাতীয় সম্মেলনের অস্তিত্ব বজায় রাখা হবে। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন, জাতীয় সম্মেলনের জেলা-ভিত্তিক সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে কংগ্রেসের অনুমোদিত সংস্থা হিসেবে গণ্য করা হবে। এ কাজ করতে গেলে কংগ্রেসকে পাল্টাতে হবে তার সংবিধান। তা ছাড়া, কংগ্রেসের আদর্শে যাঁরা বিশ্বাসী এবং কংগ্রেসের নামে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা পড়বেন বিপদে। তাঁদের তখন গিয়ে মিশতে হবে জাতীয় সম্মেলনের সঙ্গে।

নাগাভূম :

বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে শান্তির আলোচনা সপ্তাহখানেকের মধ্যে আরম্ভ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হচ্ছে। নাগারা এখন দ্বিধা-বিভক্ত। তাদের চরমপন্থীরা মাথা নোয়াতে রাজী নয়। এদের নেতা তথাকথিত কমাণ্ডার-ইন-চীফ কাইটো। তার অনুগামীরাই কোহিমার নিকটবর্তী গ্রামে হানা দিয়ে লুঠতরাজ চালিয়েছিল। মোকোকচং এবং ওখারের মাঝের অঞ্চলের দারাং সেতুটি তারাই সেদিন ধ্বংস করেছিল।

কাইটোর কোন সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সন্দেহ করা হচ্ছে, ব্রহ্মের পথে সে পাড়ি জমিয়েছে চীনে এবং সেখান থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশিলু আও নাকি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীকে এ সব কথা জানিয়েও এসেছেন। এ সত্ত্বেও বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে বৈঠকের উদ্যোগপর্ব চলেছে। শ্রীআও অবিশ্যি আশা করেন, নাগারা আলোচনায় বসলেই অবস্থার উন্নতি হবে—চীনের উস্কানীতে কোন ফল হবে না। কাইটোর অনুচরগণ ধীরে ধীরে কেটে পড়তে বাধ্য হবে। অস্ত্র সম্বরণের পর পারস্পরিক আলোচনা, মেলামেশার সুযোগ যত বাড়বে ততই সৃষ্টি হবে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশের। কাইটোর সাথীদের সঙ্গেও নরমপন্থীরা হয়তো একটা সমঝোতার সুবিধা পাবে। পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মগোপনকারী নাগারা যাতে একসঙ্গে বসে নিজেদের মধ্যে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পালাটা শেষ করে নিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই শান্তি বৈঠকের সময় নাকি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

● শ্রীশিলু আও

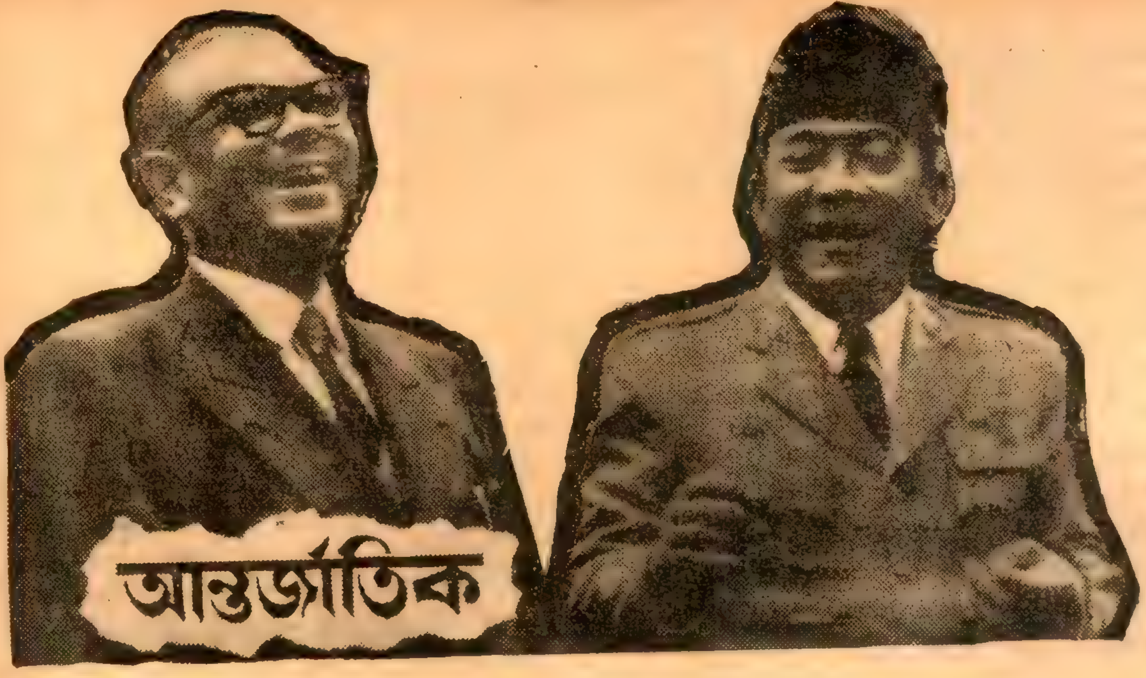

• দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর এক অগ্নিঝটিকার পূর্বমুহূর্তের প্রাণখোলা হাসি।

মালয়েশিয়া :

সমগ্র মালয়েশিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। জোহোর অঞ্চলে ইন্দোনেশীয় প্যারা সৈন্যের অবতরণ ও গেরিলাবাহিনীর আক্রমণ বৃদ্ধির ফলে মালয়েশিয়ার নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। এই সঙ্গে সুরু হয়েছে সিঙ্গাপুরে চীনা ও মালয়ীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো অবিচ্ছিন্নভাবে 'মালয়েশিয়া ধ্বংসের' সংকল্প ঘোষণা করে আসছেন এবং ইন্দোনেশীয় গেরিলা সৈন্যদল কিছু-দিন ধরেই মালয়েশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে গোলযোগ সৃষ্টি করছে। এবারের ঘটনা হল, বিমান থেকে ৩০ জন ইন্দোনেশীয় প্যারা সৈন্য ২রা সেপ্টেম্বর জোহোর অঞ্চলে লিবাসে অবতরণ করে। পরে এই সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় '১৫০। মালয়েশিয়া এই ঘটনাকে মালয়েশিয়ার ওপর ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণরূপে ঘোষণা করেছে। ইন্দোনেশিয়ার সরকারী মুখপাত্র অবশ্য এই ঘটনাকে স্বীকার করেন নি, জোহোরে যারা অবতরণ করেছে, তারা যে ইন্দোনেশীয় প্যারা সৈন্য একথা প্রমাণ করা যায় নি, এই হল ইন্দোনেশিয়ার বক্তব্য।

বাইরের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভেতরেও গোলমাল সুরু হয়েছে। সিঙ্গাপুরে চীনা ও মালয়ীদের মধ্যে সম্পর্ক অনেকদিন থেকেই খারাপ। কিছুদিন পূর্বেও এখানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে। তবে এবারকার দাঙ্গার সময়টা লক্ষ্য করার মত। ২রা সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ সুরু হয়েছে, আর তার পরের দিনই, অর্থাৎ ৩রা সেপ্টেম্বর চীনারা সিঙ্গাপুরে দাঙ্গা আরম্ভ করে দিয়েছে। এর পেছনে ইন্দোনেশিয়ার প্ররোচনা আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো ক'দিন মালয়েশিয়ার পূর্বে অধিবাসীদের প্রতি 'মালয়েশিয়া ধ্বংসের' জন্য উদ্যোগী হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

তবে মালয়েশিয়া এবার ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণ ও প্রতিরোধে দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছে। মালয়েশিয়ার সাহায্যে কমনওয়েলথ সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে। বৃটিশ গুর্খা সৈন্য ও নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যবাহিনীর সৈন্যরা জোহোরে ইন্দোনেশীয় গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। আর মালয়েশিয়ার সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়েছে প্রধানত সিঙ্গাপুরে দাঙ্গা থামাবার কাজে।

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়া দ্বন্দ্বে বৃটিশ ও নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যবাহিনীর অংশ গ্রহণের ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইন্দোনেশিয়ায় ইতিমধ্যেই সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে বানচাল করতে হবে—সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় কাজ এই হল সংগ্রাম-ধ্বনি।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইন্দোনেশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়া অভিযোগ উত্থাপন করেছে। মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল দাতো বিন আবদুল রহমান নিরাপত্তা পরিষদে মালয়েশিয়ার বক্তব্য পেশ করার জন্য ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছেন। আগামী

বুধবার নিরাপত্তা পরিষদে এই সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়েছে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ, সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে কার্যকরী কোন প্রস্তাব গ্রহণে বাধা দেবে। যদি নিরাপত্তা পরিষদ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে, তবে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির পক্ষ থেকে মালয়েশিয়াকে আরও বেশি করে সৈন্য, অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দেয়া হবে বলে মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান কমনওয়েলথ সাহায্যের উপর অনেকখানি ভরসা রাখেন।

• •

জোহোরে ইন্দোনেশীয় প্যারা সৈন্যের আক্রমণের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কুয়ালালামপুরে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন হয়েছে। সাধারণভাবে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার বিষয়ে আলোচনা ছাড়াও মালয়েশিয়ার বিপদে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলির সাহায্যের বিষয় সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে। প্রথম দিকে অর্থমন্ত্রীদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা দিলেও, শেষ পর্যন্ত সবাই মালয়েশিয়ার সার্বভৌম অধিকার ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। জুলাই মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যেভাবে মালয়েশিয়ার প্রতি সমর্থন জানানো হয়েছিল, এবারে কুয়ালালামপুর সম্মেলনেও অনুরূপভাবে সমর্থন ঘোষিত হয়। ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমর্থনের আশ্বাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী কুয়ালালামপুর সম্মেলনে ভারতের

• শ্রীকৃষ্ণমাচারী

প্রতিনিধিত্ব করেন—লণ্ডন সম্মেলনেও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তিনি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমাচারী অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় মালয়েশিয়ার প্রতি ভারতের সমর্থনের কথা বলেছেন। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় মালয়েশিয়া যেভাবে ভারতকে সমর্থন করেছিল, শ্রীকৃষ্ণমাচারী তার সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেন। তবে তিনি একথাও বলেন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যে বিরোধ, ভারত তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কামনা করে।

শ্রীকৃষ্ণমাচারী মালয়েশিয়ার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মালয়েশিয়ার সুখ-দুঃখের সঙ্গে মালয়েশিয়াবাসী ভারতীয়দের একাত্ম হতে আহ্বান জানান।

বার্মা :

নেপাল ও আফগানিস্তানে সাফল্যের সঙ্গে শুভেচ্ছা সফর সমাপ্ত করে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বার্মায় গিয়েছেন। চারদিন ব্যাপী বার্মা সফর শেষ করে সর্দার স্বরণ সিং গত ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতে ফিরে এসেছেন।

রেঙ্গুনে সর্দার স্বরণ সিং বিপুল

• রেঙ্গুনে শুভেচ্ছা বিনিময়রত সর্দার স্বরণ সিং ও বার্মার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ থি তান।

পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নে উইন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউ থি তান-এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সমস্যা, ভারত-বার্মা সম্পর্ক, বার্মায় ভারতীয়দের অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ভারতের প্রতিবেশীদের মধ্যে বার্মার সঙ্গে ভারতের এখন পর্যন্ত কোন বিবাদ বাধে নি। উভয়ের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। উভয়েই বিশ্বশান্তি ও জোট-নিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী। এই সব কারণে ভারত ও বার্মার মধ্যে সম্পর্ক যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ। কিন্তু ইউ নু'র প্রধান মন্ত্রিত্বকালে ভারতের সঙ্গে বার্মার সম্পর্ক যত মধুর ছিল, বর্তমানে তা নেই। নে উইন শাসনে অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই ধীরে ধীরে ভারত-বার্মা সম্পর্কের হৃদ্যতা কমে আসছে। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের ব্যাপারে বার্মার সমর্থন ভারত পায় নি, বরং বার্মা চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল, এরূপ মনে হয়েছে। কলম্বো সম্মেলনে বার্মা ভারতের পক্ষে অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করে নি। সম্প্রতি ভারতীয়দের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা এবং বার্মা থেকে নানাভাবে ভারতীয়দের চলে আসতে বাধ্য করার নীতি গ্রহণ করার ফলে এই সম্পর্কে আরও ফাটল ধরেছে। তাই সর্দার স্বরণ সিং দৌড়ে গেছেন বার্মার নেতাদের সঙ্গে কাথাবার্তা বলার জন্য, যাতে ভারত-বার্মা সম্পর্কের উন্নতি করা যায়।

সর্দার স্বরণ সিং-এর দৌত্য সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যে সব ভারতীয়ের ব্যবসা সরকারী নীতির ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দান ত্বরান্বিত করা হবে বলে বার্মা সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদি ভারতীয়েরা বার্মায় থেকে সরকারের সমাজতান্ত্রিক কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবে তারা 'মর্যাদা ও নিরাপত্তার' সঙ্গে বার্মায় থাকতে পারবে বলে বার্মা সরকারের নেতৃবৃন্দ সর্দার স্বরণ সিং-কে জানিয়েছেন। বিষয়টি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। যে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় বার্মা ত্যাগ করে চলে আসছে, তারা অধিকাংশই দরিদ্র—তারা সমাজতন্ত্রের বিরোধী বলে নিশ্চয়ই চলে আসছে না। এদের বার্মায় বসবাস ও জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে যে সব বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, বার্মা সরকার তা পরিবর্তন করতে স্বীকৃত হয়েছেন কিনা, দিল্লী ও রেঙ্গুন থেকে প্রচারিত যুক্ত ইস্তাহার বা সর্দার স্বরণ সিং-এর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতি থেকে তা বোঝা যাচ্ছে না।

যাই হোক, সর্দার স্বরণ সিং-এর শুভেচ্ছা সফরের ফলে ভারত-বার্মা সম্পর্ক যে আরও দৃঢ় হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। জেনারেল নে উইন ভারত সফরের আমন্ত্রণও গ্রহণ করেছেন।

পাকিস্তান ঃ

রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁর পূর্ব পাকিস্তান সফরকে কেন্দ্র করে আবার ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আয়ুব খাঁ চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। সেদিন ঢাকা, কুমিল্লা, খুলনা, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ প্রভৃতি শহরে ছাত্ররা পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। ছাত্রদের দাবী : পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে—সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

খুলনায় ছাত্র আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ এবার ভাড়াটে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল। ঢাকাতেও বিশিষ্ট ছাত্র-নেতাদের গ্রেপ্তার করে আন্দোলন বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নি।

আয়ুব-ভুট্টো চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, তাতে এদের দমন করা সরকারের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়।

* * *

অবশেষে থলে থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। আলাস্কা থেকে নির্বাচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট-সদস্য গ্রুয়েনিং বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত তাঁর কাছে এক চিঠিতে জানিয়েছেন, পাকিস্তান মার্কিন সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে।

গ্রুয়েনিং সম্প্রতি পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের কাছে এক চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

আয়ুব খাঁ

পাকিস্তানকে ৮০০ মিলিয়ন ডলার অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যখন বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন পাকিস্তান এই সব অস্ত্র ব্যবহার করছে না কেন? পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত গ্রুয়েনিং-কে জানিয়েছেন, পাকিস্তান মার্কিন সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্য প্রস্তুত রেখেছে।

গ্রুয়েনিং বলেছেন, প্রয়োজনমত এই চিঠিটি তিনি পরে প্রকাশ করবেন।

পাকিস্তানের এই বক্তব্য অবশ্য

নতুন নয়। প্রকারান্তরে এই কথা সে বারে বারে ঘোষণা করেছে। অন্য কোন প্রতিবেশীর কাছ থেকে পাকিস্তানের ভয় নেই, মার্কিন পক্ষাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আক্রমণের আশঙ্কা নেই—পাকিস্তানের একমাত্র শত্রু ভারত। সুতরাং ভারতের বিরুদ্ধে তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তবে গ্রুয়েনিং-এর কাছে লেখা চিঠিতে যেরূপ স্পষ্ট বলা হয়েছে, মার্কিন সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হবে, পূর্বে এভাবে বলা হয় নি। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্থির করতে হবে, পাকিস্তানকে তারা সামরিক সাহায্য দেবে কি না। পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দেবার অর্থই হল ভারতের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করার ব্যাপারে সম্মতি দেয়া।

সাইপ্রাস:

রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিয়স বুঝেছেন, কেবলমাত্র গ্রীসের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে সাইপ্রাস রক্ষা করা যাবে না। গ্রীসের সে শক্তি নেই, আর 'ন্যাটো' অন্তর্ভুক্ত গ্রীসের পক্ষে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কাটিয়ে ওঠাও শক্ত।

ম্যাকারিয়স তাই এবার এসেছিলেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায়, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নাসেরের সঙ্গে কথা বলতে। নাসের ম্যাকারিয়সকে সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে সামরিক সাহায্য দিতেও নাসের রাজী হয়েছেন। কেবল নাসের নয়, সমগ্র আরব জগৎ সাইপ্রাসের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। লক্ষ্য করার বিষয়, সাইপ্রাসের শত্রু তুরস্ক মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরব জাতি তুরস্ককে সমর্থন না করে খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ম্যাকারিয়স ও গ্রীকদের সমর্থন করছে। ধর্মের

• নাসের ও ম্যাকারিয়স

পরিবর্তে এখানে রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রাধান্য লাভ করেছে। তুরস্কের পশ্চাতে ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি আছে, আরব জাতি তা সমর্থন করে না। সাইপ্রাসে 'ন্যাটো' ঘাঁটি স্থাপন সমগ্র আরব জাতির স্বাধীনতার পরিপন্থী। সাইপ্রাসকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন-তুর্কী কূটনীতির বিরুদ্ধে তাই একদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অপর দিকে আরব জাতি এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু মুশকিল হল, ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবে গ্রীসের প্রধানমন্ত্রী পপিনড্রিউ সর্তাধীনে সাইপ্রাসের গ্রীসভুক্তি সমর্থন করেছেন, আর অপর দিকে সোভিয়েট-আরব সমর্থিত ম্যাকারিয়স স্বাধীন সাইপ্রাসের নীতিতে অটল রয়েছেন। এই মতভেদের পরিণতি কি হবে?

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম:

'ত্রয়ীশাসন' প্রতিষ্ঠার ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসানের পরিবর্তে তা আরও বেশি করে বেড়েছে। প্রত্যেকেই অপরকে সরিয়ে ক্ষমতা গ্রহণের চেষ্টা করছে। 'ত্রয়ী'র প্রধান দুজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল নেগুইন খান ও প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ত্রান থিয়েন খিয়েমের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই বেশ ভালভাবেই সুরু হয়েছে।

মেজর জেনারেল নেগুইন খান প্রধানমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হবার দু'দিন পরেই ঘোষণা করা হল, নেগুইন খান ভয়ঙ্কর অসুস্থ—চিকিৎসার জন্য তাঁর দীর্ঘ অবসরের প্রয়োজন হবে। তাঁর জায়গায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত

• নেগুইন জুয়ান

অর্থনীতিবিদ ডঃ নেগুইন জুয়ান ওয়ান অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীরূপে কর্মভার গ্রহণ করলেন। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল নেগুইন খানের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু ২৯শে আগস্ট ডঃ ওয়ান অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন, আর তার চারদিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর মেজর জেনারেল নেগুইন খান সায়গনে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কর্মভার গ্রহণ করেছেন। শাসন সংক্রান্ত কয়েকটি পরিবর্তনের সিদ্ধান্তও তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন।

সরকারী ভবনের চত্বরে যখন নেতাদের মধ্য ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পূর্ণমাত্রায় চলেছে, তখন সায়গনের পথে পথে ইতস্তত ক্যাথলিক-বৌদ্ধ দাঙ্গাও হচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অশান্ত পরিস্থিতি আরও পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ শ্রীজয়ন্ত চৌধুরীও আছেন।

শ্রীচ্যবন সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল রোডিয়ন ম্যালিনভস্কির সঙ্গে সোভিয়েট সামরিক সাহায্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতের সামরিক প্রয়োজন বিবেচনা করে সোভিয়েট ইউনিয়ন কিভাবে সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে খোঁজ করার জন্যই তাঁর সোভিয়েট ইউনিয়নে আগমন। বিশেষ ধরণের কিছু সামরিক যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ভারত সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে কিনতে চায়।

মার্শাল ম্যালিনভস্কি ভারতের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ভারতের প্রয়োজন মত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রস্তুত।

● মার্শাল ম্যালিনভস্কির সঙ্গে আলোচনারত শ্রীচ্যবন

শ্রীজয়ন্ত চৌধুরী সোভিয়েট ইউনিয়নের হাল্কা ধরণের ট্যাঙ্কগুলি বিশেষভাবে পরিদর্শন করেন। সম্ভবত এই ট্যাঙ্ক কেনার জন্য তিনি ভারত সরকারকে অনুরোধ করবেন।

ভারত যাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সামরিক যন্ত্রপাতি ক্রয় না করে তার জন্য শেষ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিশেষভাবে কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ভারত যদি সোভিয়েট মিগ্ বিমান গ্রহণ না করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে তার প্রয়োজনীয় বিমান দেবে। কিন্তু ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক সর্ত আরোপ না করে যে দেশ ভারতকে সামরিক যন্ত্রপাতি দেবে, ভারত তার কাছ থেকেই তা গ্রহণ করবে—সে সোভিয়েট ইউনিয়ন হোক, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হোক।

• •

চীনের সর্বগ্রাসী 'ভূমি ক্ষুধার' বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদায়' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত চীনের একটি পাঠ্যপুস্তকের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, চীন বার্মা, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়, নেপাল, ভূটান ও সিকিমকে চীনের ভূখণ্ড বলে দাবী করে।

চীন সোভিয়েট ইউনিয়নেরও বিস্তীর্ণ অঞ্চল দাবী করে বসেছে। স্ট্যানোভয় পাহাড় বরাবর সমগ্র অঞ্চলের ওপর চীন দাবী জানিয়েছে। কিরগিজিয়া, তাজিকিস্তান, কাজাকস্তান, সাখালিন প্রভৃতি সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলকে চীন আজ তার নিজস্ব ভূখণ্ড বলে দাবী করছে। বহির্মঙ্গোলিয়ার ওপরও চীনের দাবী আছে।

'প্রাভদা'র অভিযোগ, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে চীনের তত্ত্বগত আক্রমণের পশ্চাতে রয়েছে এই আগ্রাসী নীতি। তাই দেখা যাচ্ছে, কেবল ভারত আক্রমণ করেই চীন চুপ করে থাকবে না। যে-সব দেশের ওপর তার দাবী আছে বলে চীনের ধারণা, সে-সব অঞ্চল দখল করে নেবার জন্য চীন চেষ্টা করবে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ বাইশ ॥

ধুলোর ঝড় শেষ হয়ে গিয়ে বাইরে বৃষ্টি নামল। মেঘের অন্ধকার আর আকাশভাঙা বৃষ্টিতে বাড়িটার চারদিকের পৃথিবীটা যেন লুপ্ত হয়ে গেল আপাতত। ঠিক সময় মতোই কিরণকে ডাক দিয়েছিল বাণীব্রত, নইলে মুদীর দোকানটা পর্যন্ত পৌঁছতে জামা-কাপড়ের কিছু আর অবশিষ্ট থাকত না।

বাণীব্রত বললে, আসুন কিরণদা, এঘরে আসুন।

এইটেই নিশ্চয় বাণীব্রতর শোবার আর পড়বার ঘর। একটি ছোট চৌকি, বইয়ের শেলফ, লেখাপড়ার চেয়ার-টেবিল, দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি; বইয়ের শেলফের খানিকটা অংশ জুড়ে অনেকগুলো পত্র-পত্রিকা। সামনের জানলার ধারে ফুলে ভরা একটা লবঙ্গ-লতিকা বৃষ্টিতে থর থর করে কাঁপছে—জলের ছাট আসছিল সেখান দিয়ে—বাণীব্রত জানলাটা বন্ধ করে দিলে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে লতাটা এসে মাঝে মাঝে জানলার গায়ে আছড়ে পড়ছিল, কিরণের মনে হল যেন মাথা খুঁড়ছে।

ঘরে আবছা অন্ধকার। বাণীব্রত সুইচ টিপে আলো জ্বালল। খুশিতে মুখ-চোখ ঝক ঝক করছে তার।

—আপনি তাহলে সত্যিই এলেন আমাদের বাড়িতে!

—ইচ্ছে করে আসি নি। ঝড়-বৃষ্টিতেই টেনে আনল এখানে। আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনতুম না।

বাণীব্রত অভিমান করে বললে, আমি তো অনেকবার ঠিকানা দিয়েছি আপনাকে। আপনি ভুলে গেছেন।

কিরণকে স্বীকার করতে হল। সত্যিই সে ঠিকানাটা ভুলে গিয়েছিল।

—বসুন কিরণদা—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—চেয়ারটা পরিষ্কার করবার দরকার ছিল না, তবু একটা তোয়ালে দিয়ে সসম্ভ্রমে মুছে দিলে বাণীব্রত: বসুন। ভিজে গেছেন নাকি? শুকনো কাপড়-টাপড় এনে দেব?

কিরণ হেসে ফেলল: আমি বসছি, তার আগে তুমি স্থির হয়ে বোসো দেখি। শুকনো জামা-কাপড়ে দরকার নেই, বৃষ্টির দু'একটা ছিটে ছাড়া আমার গায়ে কিছু লাগে নি।

কিরণ বসল, কিন্তু বাণীব্রত দাঁড়িয়েই রইল।

—ভাগ্যিস আমি বারান্দায় ছিলুম, তাই দেখতে পেলুম আপনাকে। এখানে কোথায় এসেছিলেন? ভবেশ মুখুজ্জের বাসায়?

—তুমি কী করে জানলে?

—বা রে, পাড়ায় রয়েছেন, লেখক—আপনার মতো লোক আর কার কাছেই বা আসবেন?

কিরণ কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাণীব্রতর দিকে। নামজাদা লেখকরা তার কাছে প্রায় কল্প জগতের অধিবাসী। বাণীব্রত বোধহয় ভাবে। লেখকেরা সব সময় উচ্চ চিন্তায় ব্যাপৃত, গভীর জীবনদর্শন ছাড়া আর কোন তুচ্ছ সাংসারিক ভাবনা তাদের কখনো পীড়ন করে না; তারা স্বপ্নে পুষ্ট পায় এবং দাড়ি কামাতে কামাতে নায়িকার মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে। কিন্তু

লেখকেরাও যে বাজারে গিয়ে ঝিঙের দর নিয়ে ঝগড়া করতে পারে, সাহিত্য-চর্চার চাইতে পরচর্চায় যে তাদের বেশি আনন্দ এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোমাণ্টিক কবিরাও যে নাক ডাকে, এ-সব খবর জানলে বোধহয় এক মাস তার মন খারাপ হয়ে থাকবে।

বাণীব্রত বললে, বাবা-মা আজ দক্ষিণেশ্বরে মাসিমার বাড়িতে গেছেন —রাতে সেখানেই থাকবেন। বাবা আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারলে খুব খুশি হতেন। বাবা হেড্ মাস্টার, অঙ্কের লোক, কিন্তু সাহিত্য খুব ভালো-বাসেন। আপনি এমন দিনে এলেন, যে ওঁর সঙ্গে দেখাই হল না।

—তাতে কী হয়েছে, আর একদিন আসা যাবে।

—নিজে থেকে কি আর আসবেন আপনি? আমিই গিয়ে ধরে আনব। কিন্তু দাঁড়ান—দিদি বোধহয় রান্না করছে, ওকে ডাকি। আর চা করতে বলি আপনার জন্যে।

—চায়ের দরকার নেই আমার—ভদ্রতা করে বলতে গেল কিরণ, কিন্তু তার আগেই চটির জোরালো আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বাণীব্রত। বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়েও তার উল্লসিত ডাক শোনা গেল: দিদি—এই দিদি—

কিরণ বসে রইল চুপ করে। বৃষ্টি চলছে একভাবেই—কতক্ষণে যে থামবে বলা মুস্কিল। রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, ফেরবার পথে অনেক দুর্ভোগ বইতে হবে তা হলে। টালীগঞ্জে একটু কাজ ছিল, সে বোধহয় হয়ে উঠবে না—ব্রীজের তলায় সমুদ্র দুলতে থাকবে। কিরণ অন্যমনস্ক চোখ মেলে দেখতে লাগল, বাইরে থেকে লবঙ্গলতার মঞ্জরী তেমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরছে কাচের গায়ে। কেন কে জানে, অল্প বয়েসে পড়া 'উদারিং হাইটস' উপন্যাসটা ভেসে এল মনের সামনে।

বাণীব্রত ফিরে এল। বললে, দিদি এক্ষুণি আসছে।

—রান্না পুড়িয়ে তোমার দিদিকে আসতে হবে না—অত অভ্যর্থনার দরকার নেই।

—রান্না কিসের আর? আজ তো বাড়িতে আমি আর দিদি—চালে-ডালে স্রেফ খিচুড়ি। সে যখন খুশি হলেই হবে। আপনি খিচুড়ি খান কিরণদা?

কিরণ বললে, তুমি কি ভাবো, লেখকরা হাওয়া খেয়ে থাকে?

—তা নয়—বাণীব্রত লজ্জা পেল। তারপর মাথা নামিয়ে বললে, ইয়ে, কিছু যদি মনে না করেন, খেয়ে যাবেন এখান থেকে?

কিরণ হাসল: নেমন্তন্নটা কা'র? তোমার, না কৃষ্ণার?

—দিদি তো চটেই উঠল। বললে, মাছ-টাছ কিছু নেই—খানিক চাল-ডাল সেদ্ধ করে দেব নাকি ভদ্রলোককে? আমি বললুম, তা কেন—আমরা যা খাই, তাই নয় একদিন—

—নেমতন্ন মনে রইল। কিন্তু আজ নয়।

—আপনার কখনো সময় হবে না—বাণীব্রতর দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—সময় আমার নিশ্চয় হবে, আজ তোমার দিদিকে লজ্জা দিতে চাই না। তাকে সুযোগ দিয়েই আমি আসব। সে যাক। ভবেশদার সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ আছে তোমার?

বাণীব্রত একটু চুপ হয়ে রইল। আস্তে আস্তে বললে, কিছু মনে করবেন না কিরণদা, ভদ্রলোক যেন একটু—। মানে, কারো সঙ্গে ভালো করে কথাই বলেন না। আমরা দু-একটা মিটিঙে ডাকতে গিয়েছিলুম, বলেছেন বক্তৃতা করা আমার পেশা নয়, অন্য লোক দেখো। দু-একবার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলুম, হাই তুলে বলেন, আচ্ছা এখন এসো তা হলে—আমি একটু ব্যস্ত আছি।

—ভবেশদা খুব অসুস্থ, তা জানো?

—আমরা কী করব, বলুন? বাড়িতে গেলে হয়তো দেখাই করবেন না—যা তা অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন।

ভবেশদা সিনিক হয়ে গেছে, কাউকে আর সহ্য করতে পারে না। সাহিত্যিক জীবনের সব ব্যর্থতা আর দারিদ্র্য নিয়ে বিশ্বসংসারকে অভিসম্পাত দিচ্ছে এখন। একটু আগেই নিজের চোখে তা দেখে এসেছে কিরণ। বাণীব্রতদের কোনো দোষ নেই—ভবেশদার সঙ্গে কারুর সদ্ভাব থাকবার কথা নয়।

কিরণ বললে, তবু তোমাদের উচিত চাঁদা করে ওঁকে কিছু সাহায্য করা। খুব কষ্টে আছেন।

—চাঁদা আমরা তুলতে পারি, কিন্তু উনি নেবেন?

—তা নেবেন।

—আচ্ছা দেখব চেষ্টা করে।

—গবর্নমেণ্ট থেকে বোধহয় শ' দেড়েক টাকা পেনশন পান। কিন্তু কিছুতেই কুলোয় না।

—কী জানেন কিরণদা, ওঁর বই পড়তে ভালো লাগে না। কেমন যেন শুকনো মনে হয়। ওঁর থিয়োরীগুলোই অদ্ভুত। মেয়েরা মাত্রেই চোর, পুরুষ মাত্রেই শয়তান আর মানুষ মাত্রেই এক-একটা ছদ্মবেশী খুনী—এ ধরণের পার্ভারশন বেশিক্ষণ ভালো লাগে কারুর? এই জন্যেই ওঁর বই লোকে পড়তে চায় না।

—এক একজন এক একভাবে জীবনকে ব্যাখ্যা করে, বাণীব্রত। তার মধ্যেও সত্য আছে।

—কিন্তু কিরণদা, এ তো আংশিক সত্য।

—সব সত্যই আংশিক বাণীব্রত, আপেক্ষিকও। সকলের সত্য, সম্পূর্ণ সত্যকে আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। সেইখানেই তো দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ।

—সাহিত্য আলোচনা থেকে আমি বুঝি বাদ পড়ে গেলুম?

ঘরে ঢুকল কৃষ্ণা। হাতে ট্রে। তাতে বেগুনী, ফুলুরি, চায়ের পেয়ালা।

বাণীব্রত শিউরে উঠল: ছি-ছি দিদি, তুই শেষে কিরণদাকে ফুলুরি—

এইবারে চোখ পাকিয়ে একটা ধমক দিলে কিরণ : তুমি থামো। এই বর্ষার সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে ফুলুরিই তো আইডিয়াল। থ্যাঙ্ক ইউ কৃষ্ণা—তোমার ফুলুরির ভাঁড়ার অক্ষয় হোক।

কৃষ্ণা হাসল, চা খাবার এগিয়ে দিলে সামনের টেবিলে। বললে, যা দুষ্টি, এ ছাড়া আর—

—তুমিও।

—আচ্ছা থাক, বলব না।—কৃষ্ণা বাণীব্রতর পাশে তক্তপোষটিতে বসে পড়ল। কিরণ একবার চেয়ে দেখল তার দিকে। আজ এই বর্ষার সন্ধ্যায়, তার নিজের বাড়ির পরিবেশে, মেয়েটিকে আরো সহজ, আরো ঘরোয়া বলে মনে হচ্ছে। তার কাছে ভাইবোন যেদিন গিয়েছিল, সেদিন কৃষ্ণার পরণে ভালো শাড়ি ছিল একখানা, একটুখানি প্রসাধন ছিল চোখে মুখে। আজ কোনো আতিশয্য কোথাও নেই। কালো রোগা একটি মেয়ে—দুটি চোখের ঐশ্বর্য নিয়ে সাধারণ বাঙালী সংসারের জীবনযাত্রার ভেতরে নিঃশেষে মিশে গেছে।

খেতে খেতে বাণীব্রত বললে, জানেন কিরণদা, দিদি খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে।

—থাম তুই।

—বা-রে, লজ্জার কী আছে। এই যে রবীন্দ্রনাথের ছবিটা দেখছেন না? দিদিরই তো আঁকা।

—তাই নাকি? ভালো করে খেয়াল করি নি তো।—কিরণ ছবিটার দিকে চেয়ে দেখল। হাতে আঁকা বলে চেনা গেল এতক্ষণে, কোণায় যেন ছোট একটা স্বাক্ষরও দেখতে পাওয়া গেল।

—কিছু না—কিছু না—টুকটাক এই সব করেই সময় কাটে।—কৃষ্ণা প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল : সাহিত্যের কথা বরং বলুন।

—সাহিত্যের কথা তো রোজই হয়, আজ বরং আর্টের আলোচনাই হোক। বাণীব্রত, তোমার দিদির দু-একখানা ছবি নিয়ে এসো তো।

বাণীব্রত খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কৃষ্ণা তার হাত চেপে ধরল।

—এই খবর্দার। মারব কিন্তু।

—দেখছেন—যেতে দিচ্ছে না।

—আচ্ছা, পরে হবে—কিরণ হাসল : এখন গোলমাল করে লাভ নেই। কিন্তু কৃষ্ণা কি শুধু ছবিই আঁকে? লেখে-টেখে না তোমার মতো?

—না, লেখে না। খালি আমার লেখার নিন্দে করে। বলে 'এ হয় নি, সে হয় নি।' আমি বলি, 'বেশ তো, নিজে লিখে দেখাও না'—বলে, 'লিখব কেন? তা হলে ক্রিটিক হবো কী করে?'

কৃষ্ণা বললে, অন্যায় বলি—বলুন?

কিরণ হেসে উঠল : না, আদৌ নয়। বরং ক্রিটিক হওয়ার আসল তত্ত্বটা বুঝে ফেলেছ দেখে খুব খুশি হলুম।

বাণীব্রত সগর্বে বললে, জানেন, দিদি খুব ভাল ছাত্রী ছিল। কিন্তু থার্ড ইয়ারে উঠে সেই যে হার্টের অসুখ করল, এক বছর পড়ে রইল বিছানায়। আর লেখাপড়া করতেই পারল না। নইলে সত্যিই ও ভালো ক্রিটিক হত।

কিরণ বললে, বাণীব্রত, তা হলে মনে মনে দিদির সমালোচনার ওপর তোমার শ্রদ্ধা আছে।

—বড্ড ড্রাসটিক যে। নইলে আপত্তি করতুম না।

—ড্রাসটিক না হয়ে কী করব?—কৃষ্ণা হাসল : তোর বাজে লেখায় প্রশ্রয় দেব নাকি? এখনো তোর লেখার কোনো ফর্মই তৈরি হয় নি কন্‌টেন্টে কোনো নতুন কথা নেই—

—শুনুন কিরণদা—শুনছেন তো? —তারস্বরে প্রতিবাদ তুলল বাণীব্রত।

—সবই শুনছি।—কিরণ চা শেষ করে সিগারেট ধরালো : ভাবছি, আড়ালে আমার অদৃষ্টে কী ঘটে।

—আপনার সম্বন্ধে?—বাণীব্রত বললে, বাপ রে, আপনার যা ভক্ত, সে আর কী বলব।

—তোমার চেয়েও বেশি ভক্ত? —কিরণ হাসল।

—আমি যদি কখনো বলেছি, কিরণদার এই গল্পটা আমার ঠিক—বাণীব্রত একটু সামলে নিলে : মানে আমি ভালো বুঝতে পারলুম না, ব্যস—কী চটে গেল। বলে বসল, 'তোর একদম ব্রেন নেই, কী করে বুঝবি?'

—এই, চুপ কর—কৃষ্ণা রাঙা হয়ে উঠল।

—না-না, ওকে বলতে দাও—কিরণ সকৌতুকে কৃষ্ণার লজ্জিত মুখের দিকে চাইল : লেখক হিসেবে একটুখানি প্রশংসা শোনবার আকুলতা সকলেরই আছে, আমাকেই বা তার ব্যতিক্রম ভাবছ কেন?

—ওর কথায় কান দেবেন না! বড্ড বাজে বকে।

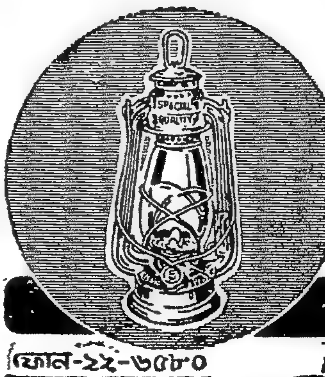

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

মুখের রেখা

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

চৌচির বিকালে—
ভগ্নাংশ রৌদ্রের সাংকেতিক জটিলতা।
নিভেছে উত্তাপ,
সামান্য বিলাপে কার পুনর্বার
ব্যর্থ হয় অন্তর পরিতৃপ্তি,
আলো-ছায়ার যন্ত্রণা কি শাশ্বত হবে!

দিনের রৌদ্র-কটাক্ষে
যারা ছিল শীত-স্নেহ ছায়ার গহ্বরে,
তাদের বহির্গমন সবুজ সবুজ ঘাসে
নিভন্ত আগুন থেকে এনেছে ষড়যন্ত্র।

: আমিও এসেছি—
কোন কথা বলবে না আজ?
—হলুদ বেদনা-দগ্ধ অস্তসূর্যের কারুণ্যে
আমি উচ্চকিত ;
আবার দেখতে পাব তাকে।

মাটির স্তূপ-মূলে
আমার প্রণামখানি সমর্পিত থাক,
কোন কথা বলব না,—পশ্চাতের প্রতীক্ষায়
প্রতিধ্বনি সংকেতে
ধূসর মুখের রেখা আর দেখব না,
আমিও ফিরে এলাম।

নিরুক্ত ঘাসের ফুলে শেষ বিকালটুকু
রেখে যাক বহুশ্রুত আর্তনাদ,
তার মুমূর্ষু দু' চোখে স্তব্ধ থাক
ফুল ফোটার প্রতিজ্ঞা।

ভাঙা আয়নাতে আর মুখ দেখব না।

—তার মানে, তুমি বলতে চাও ও বানিয়ে বলছে? কিন্তু কোনো কোনো মিথ্যেও শুনতে ভালো লাগে। অন্তত আমার তো লাগেই।

—আমি বানিয়ে বলি নি কিরণদা—বাণীব্রত আবার প্রতিবাদ করল: বরং—

—আঃ চুপ কর না—কৃষ্ণা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ: একটু বসুন কিরণদা, আমি আসছি।

কিরণ বললে, না, আর বসব না। বৃষ্টিটা থেমেছে মনে হচ্ছে। এবার যেতে হবে আমাকে।

বৃষ্টি সত্যিই থেমেছে। কালবৈশাখী যেমন আকাশ ভেঙে হঠাৎ নেমে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে। কাচের জানলার বাইরে লবঙ্গ-লতার মঞ্জরীটি নুয়ে পড়েছে ক্লান্তিতে, কোথাও নালা দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাওয়ার শব্দ আসছে, ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে—ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে সন্ধ্যার তারা দেখা দিয়েছে।

কৃষ্ণা বললে, শুধু এক মিনিট বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

কৃষ্ণা বেরিয়ে গেল। ক্ষুব্ধ হয়ে বাণীব্রত বললে, এতদিন পরে তো হঠাৎ এসে পড়লেন। বসবেন না আর একটু?

—না, একটা কাজ রয়েছে টালীগঞ্জে। যাই হোক, বাড়ি যখন চেনা হয়েই গেল, তখন সুযোগ পেলেই আসব। তা ছাড়া ভবেশদার যা অবস্থা দেখলুম—তাঁর জন্যেও আসতে হবে এদিকে। পথে তোমাদের বাড়ি তো রইলই।

—ভবেশবাবুর জন্যে আমরা চাঁদা তুলব।

—তুলো। ওটা জরুরি। —কিরণ উঠে দাঁড়ালো।

কৃষ্ণা ফিরে এল। হাতে তার শ্রীনিকেতনের ধরণে কাজ করা চামড়ার একটা ফাইল কেস।

—এইটে নিয়ে যান কিরণদা।

—সে কি! কেন?

—আমি তৈরি করেছি আপনার জন্যে। হাতে করে দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু আমার শরীর খারাপ বলে বাবা বাড়ি থেকে বিশেষ বেরুতে দেন না—কবে যে গিয়ে দিয়ে আসতে পারব তারও ঠিক নেই। তাই আজ যখন আপনাকে কাছে পেলুম—কৃষ্ণার চোখ নেমে এল মাটির দিকে।

ফাইলটা হাতে নিয়ে মুগ্ধ হল কিরণ। অনেক যত্নে তৈরি। সুন্দর একটি ছবি খোদাই করা হয়েছে চামড়ার ওপর, তাতে রং তুলিও বোলানো হয়েছে। ছবিটি চিনতে দেরি হল না। বলয়ভ্রংশ প্রকোষ্ঠ বিরহী যক্ষ অঞ্জলি ভরে কুর্চি ফুল নিয়ে চেয়ে আছে সামনের আকাশের ঘনিয়ে আসা নীল মেঘমালার দিকে।

—চমৎকার হয়েছে তো!

সগর্বে বাণীব্রত বললে, দিদি চামড়ার কাজের জন্য মেডেল পেয়েছে—জানেন কিরণদা?

—আঃ, বাণী!

কিরণ বললে, এবার আর ওর সার্টিফিকেটের দরকার নেই। আমি এমনিতেই বুঝতে পারছি।

মেসে ফিরতে রাত ন'টা। বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বাণীব্রত। শেষ পর্যন্তও এক কথা: 'কবে আসছেন আবার?'

—আসব, আসব, শীগ্‌গিরই আসব।

কৃষ্ণা অনুরোধ করে নি। ওর চোখই ওর কথা বলে দিয়েছিল।

কিরণ ঘরে ফিরে ফাইল কেসটা খুলল। দেখল, ভেতরটা একেবারে খালি নয়, একটি ছবি আছে। স্কেচ। তারই স্কেচ; কোনো পত্র-পত্রিকা কিংবা বইয়ের ছবি দেখে আঁকা হয়েছে।

আর স্কেচটির তলায় ছোট ছোট অক্ষরে লেখা: 'লহো প্রণাম।' (ক্রমশঃ)

ব্রজেন্দ্র-স্মৃতি

অমূল্য সেন

১৯৩৬ সাল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের তখন জীবনসন্ধ্যা। কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে পালিত স্ট্রীটের ওপর একটি গৃহের একাংশে তিনি একাকী থাকতেন। অভাবিতভাবে তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আচার্যদেবের অতি নিকটে আসবার। কোন বড়োলোকের দেয়া পরিচয়পত্র আমার ছিল না। তৎকালীন বাংলা দেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত ইংরেজ-রোষকবলিত বহু যুবকের একজন হয়েই আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সাদরে আমাকে তিনি কাছে টেনে নিলেন। আমি অভিভূত হলাম। তাঁকে দেখে মনে হল, ভারতের সুদূর অতীতের বৈদিক সাহিত্যে যে ঋষিদের কাহিনী পাঠ করেছি, তাঁদেরই একজন আমার সম্মুখে কায়া ধরে এসেছেন। দেখলাম, শ্বেতশ্মশ্রুবিলম্বিত, অপূর্ব সুষমামণ্ডিত বদনমণ্ডল, তপঃক্লিষ্টতনু, নিমীলিত নয়ন। অসীম আকাশের পরপারে অলক্ষ্য থেকে ভেসে আসা অমৃতবাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অন্তরের অন্তস্তলে থরে থরে সাজিয়ে রাখছেন, ঋষি তাই ধ্যানস্থ। ভক্তিবিনম্রচিত্তে ঋষির পদতলে প্রণত হলাম।—তারপর ছ'মাস কাল প্রায় প্রতিদিন তাঁকে প্রণাম করেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তাঁর কথা শুনেছি।

দূর থেকে কতো কথা শুনেছিলাম এই আশ্চর্য মানুষটির সম্বন্ধে। উপকথার অতিমানবের মতো বিশ্বের সামগ্রিক জ্ঞানের রাজ্যে তিনি অবলীলাক্রমে বিচরণ করেন, সর্ববিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ। দর্শনশাস্ত্রের শেষ কথা রয়েছে তাঁর কাছে, পুরাতত্ত্বে ও ইতিহাসে অসামান্য তাঁর ব্যুৎপত্তি, বিজ্ঞান তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত। একদা তিনি নাকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র, ইংরেজী সাহিত্য, গণিতশাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, রসায়নশাস্ত্র—এই ছ'টি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি বা থিসিস পরীক্ষা করে পি-এইচ-ডি, ডি-এস্‌-সি ডিগ্রী দেয়া অনুমোদন করতেন। কিংবদন্তী আছে, মধ্যযুগের শেষভাগে ক্রিকটন নামে ইংলণ্ডে সর্ববিদ্যাপারঙ্গম এক মনীষী ছিলেন। ওটা মধ্যযুগ, জানবার বিষয়বস্তু তখন ছিল সীমিত। সুতরাং সবজান্তা হওয়া

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

অপেক্ষাকৃত সোজা ছিল। মধ্যযুগের মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁকে বলতো, 'এ্যাডমিরেব্‌ল ক্রিক্‌টন'। আধুনিক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি অপরিমেয়। এ যুগেই বাংলার তথা ভারতের জ্ঞান-তপস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ ক্রিকটনের ঐতিহ্যকে মূর্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবিতাকারে তাঁর যে প্রশস্তি রচনা করেছেন, তাতে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই।—তবু তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়। তাঁর জন্মের এই শতবর্ষপূর্তির কালেও কতটুকু আর তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবো। তাঁকে মনে রেখেছেন মুষ্টিমেয় দর্শনশাস্ত্রানুরাগী পণ্ডিতেরা শুধু, দু'চারখানা অতি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ এবং নিবন্ধ মাত্র তাঁদের জন্য রেখে গেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'আপনি এত বড়ো, আপনার কাছটিতে এসে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারথীরা, বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকেরা একেবারে শিশুর মত ছোট হয়ে যান, এ তো নিজের চোখেই দেখছি। অথচ সে অনুপাতে আপনার তো লেখা দেখতে পাই নে। আমরা, সাধারণ পাঠকেরা আপনার মনীষার চাক্ষুষ পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে রইলাম। কেন আমাদের এ দুর্ভাগ্য?'

স্মিতহাসি হেসে তিনি বলেছিলেন—'এম-এ পাশ করে কলেজে প্রফেসর হলাম, ভাবলুম আমি খুব জানি। অহঙ্কার ছিল, আমার এ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে পৃথিবীকে দান করে যাবো। খুব লিখতে সুরু করলাম। ২৯ বছর যখন আমার বয়স, তখন বই পড়তে পড়তে হঠাৎ খেয়াল হল, তাইতো আমি যে কিছুই জানি নে, কিছুই শিখি নি। আরও অনেক না জেনে, না পড়ে আমাকে তো লেখা মানাবে না। লেখা ছেড়ে দিলুম, শুধু পড়তে লাগলুম নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ। আর ভবিষ্যতে লিখবো বলে সব নোট করে রাখতুম। আমার লেখা গাদা গাদা নোট সব দেওঘরে (?) আমার বাড়িতে জমেছিল। বাড়িটা অনেকদিন খালি পড়েছিল, কাগজগুলি ছিল অসাবধানে। রাজমিস্ত্রী একদিন সে বাড়ির সংস্কার করতে এসে কাগজগুলি অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিলে।—আর সেগুলি খুঁজে পাই নি। তারপর এলো আমার অন্ধতা, মনে রাখবার ক্ষমতা

গেলো আমার একেবারে কমে। সুতরাং মন থেকে অপরের সাহায্যে যে কিছু লিখবো, তারও আর উপায় নেই।'

একটু থেমে আবার বললেন—'সব আমার নষ্ট হয়ে গেছে, পরপারের ডাক শোনবার আশায় দিন গুণছি। কিন্তু প্রশান্ত (শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ), কালিদাস (শ্রীকালিদাস নাগ), সরোজ (শ্রীসরোজ দাস) —এঁরা আমাকে বড্ড তাগাদা দিচ্ছেন আমার জীবন-চরিত লিখে রাখবার জন্য। তাঁদের অনুরোধ এড়ানো বড়ো কঠিন। মোটামুটি একটা খসড়া তৈরি করতে সাহায্য করলেন তাঁরা। কিন্তু তাতে জীবনের খুঁটিনাটি সব সাজাই কি করে? ভাবতে গেলে সব এলোমেলো হয়ে যায়। সেক্রেটারিকে গুছিয়ে কিছুই বলতে পারি নে। —তারপর হারিয়ে যাওয়া খেইগুলো খুঁজে পেলাম রাত্রির নিস্তব্ধতায়। সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, বাইরের কোলাহল সব যায় থেমে, আমি শুয়ে শুয়ে বা বসে বসে ভাবতে থাকি। বালিশের পাশে থাকে কাগজ আর পেন্সিল। হঠাৎ এক একটা ভাব এসে পড়ে, স্মৃতির দুয়ার যায় খুলে। তক্ষুণি কাগজে পেন্সিলের আঁচড় কেটে সেগুলি তুলে রাখবার চেষ্টা করি।—অন্ধের কিবা আলো, কিবা আঁধার। একটা লাইনের ওপর আর একটা লাইন উঠে পড়ে। এই দেখো তোমরা পড়তেই পারবে না এ হিজিবিজি লেখা। তারপর সেক্রেটারি (বিজ্ঞানের একজন নামকরা ছাত্র) আসেন, তাঁকে বলি, চেষ্টা করে দু'একটা শব্দ পড়তে। অনেক কষ্টে একটি শব্দ পড়েন তিনি, অমনি আমার সব মনে পড়ে যায়। আমি বলতে থাকি, সেক্রেটারি লিখতে থাকেন। সেক্রেটারি লেখাটা পড়েন, জায়গায় জায়গায় সংশোধন করেছি।'

বোধহয় এ অভিনব আত্মকাহিনী সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি আচার্য-দেব। যতদূর জানি, ছাপাও হয় নি তাঁর আত্মকাহিনীর নামে আজীবন গবেষণার আংশিক কাহিনীটুকু। তাঁর আদেশে পাণ্ডুলিপির খানিকটা পড়েছিলাম, বুঝি নি কিছুই। বিজ্ঞানের ছাত্র ছাড়া তা কেউ বুঝবে না। একটা পরিচ্ছেদ তাতে ছিল, মনে আছে—নাম, The Philosophy of Mathematics. জন্মশতবার্ষিক উৎসবে ওই পাণ্ডুলিপিখানা উদ্ধার করে ছাপাবার বন্দোবস্ত কি করা যায় না? আজও তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ বেঁচে আছেন, এ কাজ তাঁদের।

তাঁর মুখে শুনেছি, মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যরূপে তিনি বড়ো বেশি পরিশ্রম করতেন, ওটি তাঁরই হাতে গড়া। তদুপরি যে শাসনযন্ত্র প্রচলনের দ্বারা মহীশূর তৎকালে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল, তার প্রণেতা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। মহীশূরের মহারাজা তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন 'রাজতন্ত্র-প্রবীণ'।

কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি—সর্ববিষয়ে এ অমানুষিক পরিশ্রম তাঁর সইলো না। দিনের পর দিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে কী একটা বিষয়ে নোট দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এলো এ্যাপোপ্লেক্সির মারাত্মক আঘাত, তিনি অজ্ঞান হয়ে রেজিস্ট্রারের কোলে পড়ে গেলেন। একটু ভাল হয়েই আবার কাজে মন দিলেন। কিছুদিন পরে ঘটলো এ্যাপোপ্লেক্সির দ্বিতীয় আক্রমণ। মাথার তন্ত্রী গেল ছিঁড়ে, চোখের দৃষ্টি হল লুপ্ত, ঘটলো স্মৃতিভ্রংশ। জ্ঞান তাঁর পুরোপুরি বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু কোন জিনিসের নাম বা মানুষের নাম তিনি মনে করে বলতে পারতেন না। শুধু আদ্যক্ষরটি বলতেন এবং বাকি অক্ষরগুলি অপরের মুখে শুনে নিয়ে তবে পুরোটা বলতে পারতেন।

এ অবস্থায় তাঁকে আমি দেখেছি। মহামনীষী আচার্যদেবের, বাণীর বরপুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের এ করুণ পরিণতি দেখে বেদনায় বিদ্ধ হয়েছি। মনে হয়েছে, তাঁর উপমা রয়েছে শুধু মহাভারতের কর্ণের চরিত্রে। জীবনের সবকিছু কাজ, যা অসংখ্য ছোট-বড়ো কাগজে টোকা ছিল, নিয়তির বিধানে তা জঞ্জাল বোধে বিসর্জিত। বিশ্বের সংস্কৃতির দরবারে তিনি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী, অথচ শেষজীবনে কতবড়ো অভিশাপ বহন করছেন। জীবনের সাধ তাঁর গ্রন্থপাঠ ও গ্রন্থরচনা, তা থেকে তিনি বঞ্চিত। কঠোর সারস্বত সাধনার মূর্তপ্রতীক ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন-রথের চাকা হঠাৎ যেন কর্দমে প্রোথিত হয়ে গেছে মহাবীর কর্ণের রথের চাকার মতোই। আর তিনি তা টেনে তুলতে পারলেন না। তিনি কর্ণের মতো মহান, কর্ণের মতোই অভিশপ্ত।

তবুও তাঁর কী আত্মপ্রসাদ, কী তাঁর তদ্‌গতচিত্ততা। অবাক হয়ে ভাবি, এ বিপুল শূন্যতা তিনি কী দিয়ে ভরে রেখেছিলেন। বুক জুড়ে যাঁর এতবড়ো হাহাকার, বাইরে তিনি এতো আনন্দ-ময়, এতো মাধুর্যময় ছিলেন কোন্ মন্ত্রবলে? তাঁর দুঃখ, তাঁর সুখ এমন সুসহ, এমন সহজ করে কে রেখেছিলেন!—আমাকে বললেন—'এই যে আমি কিছু দিয়ে যেতে পারলুম না, তাতে কোন দুঃখ নেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগিয়ে যাবেই। ব্যক্তিবিশেষ সে এগিয়ে যাওয়াকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তার জন্য সে ব্যক্তির এ অহমিকা সাজে না যে তার জন্যেই এগিয়ে চলেছে জগৎ। কতো ব্রজেন শীল আসবে, কতো দানে সমৃদ্ধ হবে পৃথিবী।'

এই ব্রজেন্দ্রনাথ। আমার বড়ো সঙ্কোচ হোতো এই ভেবে যে, তাঁর অসুস্থ শরীরে তাঁকে আমি বিরক্ত করি। আমি গেলেই ভৃত্যকে ডেকে চা ও খাবার দিতে বলতেন তাঁকে ও আমাকে। একদিন বলে ফেললাম, আমি বড়ো সঙ্কুচিত বোধ করি তাঁর এই আদর-আপ্যায়নে। তাঁর কাছে আসাটাই আমার কতবড়ো সৌভাগ্য, তার ওপর রোজ রোজ চা ও খাবার—

তিনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—'না না, তুমি যখনই সময় পাবে আমার কাছে আসবে।

যা জানতে চাও, আমাকে জিগ্যেস করে নেবে। আমি খুব খুশি হই তাতে। —আর খাওয়ানো? তুমি বলছিলে না যে, তোমার এখানে আসাটা সৌভাগ্য। আমিও তোমাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। জান তো, আতিথেয়তা পরম ধর্ম, বিশেষত বাঙালীর। কেউ কিছু দিতে না পারলেও অন্তত মিষ্টি কথা বলে একখানা বাতাসা ও একগ্লাস জল দিয়ে অভ্যাগতকে আপ্যায়িত করবে।'

সমগ্র বিদ্বজ্জনপূজিত ব্রজেন্দ্রনাথ এ সুরে কথা বলছেন তার সঙ্গে, যার একমাত্র পরিচয় বাংলা দেশের নগণ্য শিক্ষার্থীরূপে। এতো ছোট আমি আর কতো বড়ো তিনি; সকল ব্যবধান তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন অপরিসীম স্নেহের পরশে। জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁর পদতলে দাঁড়াতে আর আমার কোন কুণ্ঠাই রইলো না।

একদিন সিন্ধুসভ্যতার কথা উঠলো। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, কী তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য প্রাচীন ভারতের, প্রাগ্-ঐতিহাসিক ভারতের ইতিকথা সম্বন্ধে। তাঁর বড়ো ইচ্ছা ছিল, বাঙালী ছাত্র-গবেষকরা উঠে পড়ে লেগে যায় মহিঞ্জদারোর গবেষণা-কার্যে। তখন একজন বিদেশী ভারত-তত্ত্ববিদ (বোধহয় জার্মান) মহিঞ্জদারোর লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করছিলেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল, তাঁর গবেষণাকার্যে পড়লো পূর্ণচ্ছেদ। আজও সে লিপি অপঠিতই রয়ে গেছে।

মহীশূরে থাকতে ব্রজেন্দ্রনাথ মহিঞ্জদারোতে গবেষণা করবার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহারাজা প্রমুখ বড়ো বড়ো ব্যক্তিরা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন এ গবেষণাকার্যের। তিনি বললেন,—'যদি কেউ এ বিষয়ে অগ্রসর হতে চান, তবে তাঁকে তিনি পথ বলে দিতে পারেন, এ গবেষণা চালাবার পথ।' তারপর মুচকি হেসে আমাকে বলেছিলেন—'তুমি বড্ড বোকা ছেলে। এত কথা আমার কাছ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে নিচ্ছো, অথচ কিছু টুকে রাখছো না। শোনো নি বুঝি, ব্রজেন শালের ঘরোয়া কথাবার্তা টুকে নিয়ে পরে তা বেশ গুছিয়ে লিখে thesis submit করে কতো ছেলে Ph. D. D. Sc. হয়ে গেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণখোলা হাসিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হল। তারপর হঠাৎ নিভে গেলেন, মৃদু কণ্ঠে বললেন—'আর আমার দেবার কিছুই নেই, চোখ মাথা সব গেছে। —তুমি বড্ড দেরি করে আমার কাছে এসেছো। বড্ড দেরি করে এসেছো।'

জীবনের সর্বকাজেই তো আমি দেরি করে ফেলেছি, তাই চলার পথে পিছিয়ে রয়েছি।

থাক সে অবান্তর কথা। মানুষ ব্রজেন্দ্রনাথের কথা বলছি। সকালবেলা তিনি নিজহাতে ভৃত্যের সাহায্যে খুচরো পয়সা দান করতেন। বহু ভিখারি নীচে এসে কোলাহল করতো। তিনি একে একে তাদের ওপরে ডাকতেন, দুঃখের কাহিনী শুনতেন এবং বুঝে বুঝে পয়সা দিতেন। অন্ধ যারা, তারা ছিল তাঁর বিশেষ করুণার পাত্র। ঢাকঢোল পিটিয়ে কাগজে নাম- বেরোবার লোভে এ দান নয়। দুর্গতদের দুঃখ মোচনে লোকচক্ষুর অন্তরালে হৃদয়বান ব্রজেন্দ্রনাথের এ এক আশ্চর্য প্রয়াস।

রুগ্ন অচল ব্রজেন্দ্রনাথকে গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা অবিস্মরণীয় দুটি সভায় নিয়ে গিয়েছিল, তাঁকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করেছিল। যুগাচার্য রামকৃষ্ণ-দেবের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে বিরাট ধর্মমহাসম্মেলন তখন কলকাতায় হয়েছিল, সেখানে সভ্যজগতের স্বধর্মনিষ্ঠ মনীষীরা সমবেত হয়েছিলেন, সে মহাসম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) সতীর্থ মনীষীশ্রেষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ। আর একবার ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলনে, যাঁকে চিহ্নিত করে রেখেছে ব্রজেন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব। দর্শনজগতের মনীষী অধ্যাপকগণ তাঁদের আচার্যদেবকে বরণ করেছিলেন, মানপত্র দিয়েছিলেন। এ দুটি সভাতে ব্রজেন্দ্রনাথের যে অভিভাষণ দুটি পঠিত হয়েছিল, তা ব্রজেন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সভার পূর্বেই আমার এ দুটি পড়বার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু আমার মতো সাধারণ পাঠকের কাছে তা ছিল যথারীতি দুর্জ্ঞেয়। জয়ন্তী উৎসবের তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে তিনি আমাকে বলেছিলেন, বিভিন্ন রকমে সর্বদেশে সর্বলোকে জয়ন্তী উৎসব কেন করে। হিন্দুর কল্পনায়, ইহুদীর কল্পনায়, খৃস্টানের কল্পনায় এ উৎসবের মর্মবাণী তিনি আমাকে বুঝিয়ে বললেন।

সব কথা ধরতে পারি নি আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে। যেটুকু বুঝেছিলাম তা এই।

রাত্রির অন্ধকারে সমস্ত ধরা ঢেকে যায়। এমন তমসা ভেদ করে যে আবার আলো ফুটে উঠবে তা যেন আদিমানুষের সন্ত্রস্ত মন বিশ্বাস করতে পারে না। প্রার্থনা করে সে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে—আলো দাও, দূর করো আঁধার। তারপর যখন সত্যি সত্যি তিমির বিদীর্ণ করে আকাশের পূর্বাচলের দুয়ার ভেঙে জ্যোতির্ময়ের উদার অভ্যুদয় হয়, আলোতে উদ্ভাসিত হয় সমগ্র ধরাতল, আদিমানুষের মন আনন্দে গান করে ওঠে—জয়তে, জয়তে, আঁধারের ওপর আলোর জয় হয়েছে। এই জয়ধ্বনি ভাষার বিভিন্নতায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। মানুষের জীবনেও যখন বছরে একবার তার জন্মদিন ঘুরে আসে, তখন মনে হয় মৃত্যুর গভীরতম কালোর ওপর জন্মের ও জীবনের উদার আলোর জয় আবার ঘোষিত হল। কৃতজ্ঞ হয়ে মানুষ প্রার্থনা করে,—হে সর্বশক্তিমান, আবার তুমি আলোর জয় ঘোষণা করলে। জয় হোক, জয় হোক তোমার, হে আলোকময়।

এখানেই জয়ন্তী উৎসবের সার্থকতা। আমরা মৃত্যুকে স্বীকার করি নে, আবির্ভাব উৎসব আমাদের সবচাইতে বড়ো উৎসব।

বিংশ শতাব্দীর এই ষষ্ঠদশকে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, আশুতোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুগন্ধর মহামানবের জন্মবার্ষিকী পালন করার অপূর্ব সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি। অন্ধ যাত্রী আমরা, বর্তমানের তিমির-রাত্রির নিকষ কালোতে পথ ভুলে ঘুরে মরছি। আসবে নাকি আমাদের জীবনে জ্যোতির্ময় প্রভাত? মূর্তিমান জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনাথের আলোকদীপ্ত জীবনের জন্মজয়ন্তীর এই শতবর্ষপূর্তির শুভক্ষণে গাইবো আমরা উদাত্ত কণ্ঠে এই গান—আলোয় আলোকময় করো হে, জয় জয় আলোকের জয়। *

---

* আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তিসমূহের ভাব সম্পূর্ণ তাঁর, ভাষা বর্তমান লেখকের।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দশম প্রবাহ ॥

"শত শত শতাব্দী পূর্বে চীনা সওদাগররা এই বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যেত বিচিত্র সুগন্ধি দ্রব্য।"

সুদূর রোম,—সেই বিশাল পর্বতশ্রেণী পার হয়ে, ঊষর রুক্ষ মরুভূমির দেশ মধ্যএশিয়া আর ইজিপ্ট অর্থাৎ মিশরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের কথা বলেছি।

বঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রের সরোষ গর্জনে দূরতম পৃথিবীর আহ্বান। এই সমুদ্র বেয়েই চিরকাল এসেছে, আজও আসে বাইরের বিশাল পৃথিবীর পণ্যসম্ভার। কিন্তু—

উত্তরে এই যে দুর্ভেদ্য আর দুর্গম দুরারোহ হিমালয়—তার গিরিকন্দরের পাথরে-পাথরে অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে বাঙালীর বাণিজ্যের অলিখিত ইতিহাস।

চীন। মহাচীন। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য দেশ। সেখানে বিপুল পণ্য উৎপন্ন হতো। তারা নিজের দেশের বাইরে বাজার খুঁজবে—এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু খুঁজলেই তো আর বাজার পাওয়া যায় না। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয় আর অপরিমিত দুঃসাহস নিয়ে অনেক দূরের অজানা দেশের দিকে অনিশ্চিত অভিযান সুরু করতে হয়।

ভাবতে বিস্ময় লাগে, এই বাণিজ্য। বাণিজ্য করে অর্থোপার্জনের স্থূল উদ্দেশ্যের জন্যই পৃথিবীর বহু দেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। কাঁচা সোনার লোভে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা; বাণিজ্যের প্রসারকল্পে ভাস্কো-ডি-গামার উত্তাল ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতবর্ষে আসা। ভাস্কো-ডি-গামাকে অনুসরণ করে এসেছে তাঁর স্বদেশবাসীরা আর ফরাসী, ইংরেজ। এদের প্রত্যেকের চোখে ছিল বাণিজ্যের স্বপ্ন। হাতে ছিল তুলাদণ্ড।

যাক এসব কথা—এ ইতিহাস সকলের জানা—নিশীথকালীন এক দুঃস্বপ্নের মত।

চীন। তার তিনদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বাইরের পৃথিবীর সংবাদ সেখানে সেদিন পৌঁছতো না। নিষিদ্ধ দেশ বলে জানতো চীন ও তিব্বতকে। তবুও সেকালের অধিবাসীরাও অনুভব করেছিলেন, পর্বতের ওপারের দেশে তাদের বাণিজ্যের বিস্তার করতে না পারলে উপায় নেই। অতএব—

অতএব পাহাড়ের চড়াই-উতরাইয়ের পথ বেয়ে সুরু হলো দুর্গম পদযাত্রা। হোক কষ্ট। যেতেই হবে। পেরিপ্লাস অফ এরিথোরিয়ান সী'তে বলছে—Silk cocoon were being

exported from China by way of Tibet, the Ganges, and the Bay of Bengal......

রেশমগুটি চীন থেকে তিব্বতের পথে (ভারতবর্ষে) রপ্তানী হতো—তারপর গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে দিয়ে পৌঁছে যেত বঙ্গোপসাগরের মোহনায়। হয়তো তাম্রলিপ্ত। কিন্তু তাম্রলিপ্তের কথা এখানে উল্লেখ করে নি। কলকাতার কথাও না। হয়তো আমাদের অজানা নতুন কোন বন্দর থেকে চীনা সিল্কের পণ্য-বোঝাই জাহাজ দাক্ষিণাত্য প্রদক্ষিণ করে আরব সমুদ্র অতিক্রম করে পারস্য ইরাক ইরাণের দিকে পাড়ি জমাতো।

চীনা সওদাগরেরা রেশমের কাপড় নিয়ে আসতো, কিন্তু কি নিয়ে ফিরে যেত—চীনা বণিকরা কি শূন্যগর্ভ জাহাজ নিয়ে সমুদ্রের জল কেটে কেটে দেশে ফিরে যেত ?

রপ্তানী আর আমদানী। এই দুই নিয়ে হলো বাণিজ্য। তারা রপ্তানী করল, আর কিছু আমদানী করবে না, তাহলে বাণিজ্য হবে কি করে ?

হ্যাঁ, তারা আমদানী করতো বৈকি। বিচিত্র জিনিস তারা নিয়ে যেত তাদের দেশে।

Periplus of Erythroean Sea গ্রন্থের একেবারে শেষে নিতান্ত অবহেলায় ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে লেখা আছে সেই বিচিত্র জিনিসের ইতিবৃত্ত।

গঙ্গা যেখানে সমুদ্রে পড়েছে—সেই দক্ষিণবঙ্গের লোনা মাটিতে অজস্র নারকেলগাছ জন্মাতো (আজও জন্মায়, তবে শহুরে সভ্যতার নির্মম বিস্তারে অনেক কমে এসেছে) নারকেল-তেলের সঙ্গে সুগন্ধি কোন জিনিস মিশিয়ে চীনারা তাকে সুবাসিত করে তুলতো। এই সুবাসিত ভারতীয় অর্থাৎ বঙ্গদেশীয় তেল তাদের খুব প্রিয় ছিল।

ঠিক পরিষ্কার করে Scented তেল বলে নি Periplus, বলেছে 'Spikenard' স্পিকেনার্ড। অক্সফোর্ড, চেম্বারসের ডিক্সেনারী বলছে সুগন্ধি তৈল জাতীয় পদার্থ।

শুধু কি তৈল ? আছে—আরও আছে। চীনা বণিকেরা নিয়ে যেত অদ্ভুত একটা জিনিস। যেমন অদ্ভুত তার নাম—তেমনি বিচিত্র জিনিস।

ম্যালাবাথারাম। ম্যালাবাথারাম কি ? অভিধান বলল, An aromatic leaf mentioned by ancient writers, required in the preparation of perfumed ointment....

হয়তো সেই সুপ্রাচীনকালে গঙ্গার তীরে তীরে ঘন সবুজ পাতাভরা কোন গাছ দেখা যেত—হয়তো সেই বৃক্ষ কালের প্রভাবে পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বেঁচে আছে তীব্র সুগন্ধি পল্লবের সুনাম নিয়ে পেরিপ্লাসের পাতায়। হয়তো গঙ্গার সোঁ সোঁ বাতাস এই সুগন্ধকে বহন করে নিয়ে যেত দূর থেকে দূরান্তরে। আকাশে গা টেনে টেনে সোনার থালার মত চাঁদ উঠতো। চাঁদের আলো আর গন্ধাকুল বাতাস দূর অতীত দিনের বহু—বহু রাত্রিকে মায়াময় করে তুলতো।

এক সময় গঙ্গার ঘাটে চীনা বজরা ভিড়তো। আর এই গাছের ডাল নির্মমভাবে কেটে কেটে ভারে ভারে সুগন্ধি পাতা বিক্রি করে দিত গাছের মালিকেরা। কে জানে আজকের স্নো-এসেন্সের মতই কদর ছিল হয়তো এই গাছের পাতা থেকে তৈরি সুগন্ধি জিনিসের।

আরও আছে। চীনা সওদাগরেরা নিত স্যাফারিক। স্যাফারিক অর্থাৎ তীব্র নীলরঙের সুদৃশ্য মূল্যবান পাথর। আর—

আর গঙ্গার বয়োবৃদ্ধ কচ্ছপের শক্ত পিঠের খোল। কচ্ছপের যত বয়স বাড়ে—তত খোল শক্ত হয়। এই খোল রঙ করে চীনা শিল্পীরা তাদের নিপুণ হাতের অঙ্গুলিবিন্যাসে তৈরি করতো টুকিটাকি ঘরসাজানো বিলাসের সামগ্রী।

শত শত শতাব্দী পূর্বে চীনা বণিকের দৃষ্টি গঙ্গার কূলে কূলে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতো কোথায়—কোথায় ম্যালাবাথারাম—কোথায় স্যাফারিক - - -

(ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—শাখা সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গোহাটী

গ্রন্থ মেলা

সূর্যের প্রতিবেশী : আশিস সান্যাল সম্পাদিত। সেকাল-একাল, ৭, টেমার লেন, কলকাতা-৯। দাম : চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে বিভিন্ন রকম সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু এমন সংকলন সহজে চোখে পড়ে না, যা আমাদের উত্তেজিত করতে পারে, আনন্দ দিতে পারে এবং তা পড়ে আমরা বলতে পারি—এজাতীয় সংকলন এই প্রথম বের হোল। এতোদিন যা হয় নি বর্তমানে 'সূর্যের প্রতিবেশী' সংকলনে তা সম্ভব হয়েছে। এটি নিগ্রো কবিতার সংকলন। নিগ্রোদের নিয়ে যতটা হৈ-চৈ করি—তাদের মানসপ্রকৃতি, সৌন্দর্যবোধ, জীবন-জিজ্ঞাসা, প্রার্থনা কিংবা দুঃসাহসিকতার কতটা পরিচয় রাখি? কবিতার মধ্য দিয়েই ঐতিহ্য, স্বদেশ, জাতীয় জীবন ও ব্যক্তিসত্তার উদঘাটন ঘটে। সেই কারণে নিগ্রো কবিতা পড়া ছাড়া তাদের সামগ্রিকভাবে জানা প্রায় অসম্ভব। 'গণবার্তা' পত্রিকায় একবার কার্যকর প্রচেষ্টা হয়েছিল। কবি শ্রীআশিস সান্যাল আফ্রিকা ও আমেরিকার নিগ্রো কবিতা সম্পাদনা করে অসাধ্য-সাধন করলেন। সত্তর-এর অধিক কবিতার অনুবাদ করেছেন বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ ও নবীন কবিরা এবং গ্রন্থটির চিন্তাগর্ভ সম্পাদকীয় রচনা করেছেন শ্রীআশিস সান্যাল। কবিদের সম্পর্কে যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তা যেমন পরিশ্রম-সাপেক্ষ তেমনি তথ্যজ্ঞাপক। এই ধরণের সংকলন আপন বৈশিষ্ট্যে সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করবে।

সোভিয়েত দেশ : সম্পাদক : ও পি বেনুখ। ১।১ উড স্ট্রীট, কলি: ১৬। মূল্য : ২৫ পয়সা।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত 'সোভিয়েত দেশে'র বিশেষ সংখ্যাটি যেমন সমৃদ্ধ তেমনি সুন্দর। নবভারত গঠনে সোভিয়েত দেশ ও ভারত কী ভাবে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ তারও প্রকৃষ্ট পরিচয় রয়েছে মূল্যবান নানা রচনায় এবং

জয়ন্তী সেন

দুর্লভ নানা চিত্রে। আই স্পিরিদনোফের 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উৎসব দিবস', জি ইসাচেঙ্কোর 'নবভারতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য' বি এস রোমানোফের 'ভিলাইয়ের মনোভাব' ডি তিমোফিয়েভিচের 'ভারতের অপূর্ব যুবশক্তি', ই বরোভিকের 'রাঁচীর তরুণ দল' কেবলমাত্র জাতীয় আন্দোলন, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দান করে না, এগুলি ঐতিহাসিক তথ্যরূপে মূল্যবান। এ ছাড়া অসংখ্য জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ রয়েছে। সোভিয়েত দেশেরও পরিচয়। রয়েছে 'ভারতে বৃটিশ কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড'-এর দুর্লভ ছবি। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাটি পড়লেই সোভিয়েত দেশের সংগে ভারতের সুনিবিড় বন্ধন পরিস্ফুট হয়ে উঠবে—একথা একবাক্যে স্বীকার করা যায়।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা : সম্পাদক : শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ। ৬।৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলি: ৭। মূল্য : প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

দ্বিভাষিক এই পত্রিকাটির দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যাটিও বৈশিষ্ট্যময়। এতে লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, অরবিন্দ পোদ্দার, শিতাংশু মৈত্র প্রমুখ বিশেষজ্ঞ। প্রভাসচন্দ্র সেনের 'শঙ্করাচার্য কি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ?' প্রবন্ধটির চিন্তাসূত্রগুলি তাৎপর্যমণ্ডিত। 'The Two Gitanjalis' প্রবন্ধটির বক্তব্য বেশ সরল। পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

রোশনাই : ভাদ্র, ১৩৭১—সম্পাদিকা : গীতা দাশ। এশিয়া মুদ্রণী, কলি: ১২। মূল্য : পঁচাত্তর পয়সা।

কিশোরদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা রোশনাই। বিচিত্র রকমের গল্প-কাহিনী, যথোপযুক্ত প্রবন্ধ, যা জ্ঞানের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলিকে সহজেই মেটায়। সুন্দর কবিতা, কয়েকটি সুচিন্তিত ফিচার, সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে সংখ্যাটি। লেখকদের মধ্যে আছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, ধীরেন্দ্রলাল ধর, নির্মলেন্দু গৌতম, মনোজিৎ বসু প্রভৃতি। জওহরলালের একটি চিঠির অনুবাদও সংকলিত হয়েছে। আমরা কিশোরদের উপযুক্ত এই মাসিকপত্রটির সমাদর হবে বলে আশা করি।

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

● লালবাজার স্ট্রীটের পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের সম্মুখভাগের একটি দৃশ্য

॥ লালবাজারের নানাকালের কথাচিত্র ॥

শ্রীপদাতিক

আজ লাল শিরস্ত্রাণের লয়প্রাপ্তি ঘটলেও, সেকাল থেকে একালের এই সেদিন পর্যন্তও তার লোহিত বিস্তার বজায় ছিল সপ্রতাপে। যেন হাজার হাজার নির্শাখা এবং নিষ্পত্র মাদারের চূড়া-বিধৃত নির্গুণ লালফুলের মেলা—যা লালবাজারের সার্বিক পরিমণ্ডলকে সুপ্রকট ক'রে রেখেছিল শহর-কলকাতার অসংখ্যাতীত নাগরিকবৃন্দের চোখে। এই লাল শিরস্ত্রাণধারীদেরই সশস্ত্র মহাকেন্দ্র লালবাজার। অতএব সেই সূত্রেই সাধারণের উদাসীন মানস-প্রবাহে 'লালবাজার' নামটির প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, এমন ধারণা করেন অনেকেই। কিন্তু এ-ধারণা ভিত্তিহীন। কারণ ইতিহাসের ভাষ্য তার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। ইতিহাস বলে: 'লালবাজার' লালদীঘির সূত্রেই আত্ম-প্রকাশিত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুপস্থিতির যুগে চৌধুরীদের হাট-বাজার ছিল একাধিক। শোনা যায়: আজ যে-বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে রাজভবনের অধিষ্ঠান—সেখানেই ছিল তদানীন্তন চৌধুরীদের দ্বি-সাপ্তাহিক হাট। আর বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট-অঞ্চলে দোলযাত্রার মেলা বসতো বৎসরে একবার এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনে একটি পরিমার্জিত বাজারের অবস্থিতি ছিল লালদীঘির উত্তর-পূর্ব উপকূলে—যেখানে আজ নগর-শান্তি-রক্ষীদের সশস্ত্র উপদুর্গ বা লালবাজার থানার উদ্ধত অবস্থান। লালদীঘির উপকণ্ঠস্থ বাজার বলেই তা নামধারণ করে লালবাজার। এ-বাজার তার পরিবেশগত রূপ বদলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে। তখন লালদীঘির উত্তর-পূর্বোপকূল থেকে বাজারের পাশ ঘেঁষে প্রায় বৈঠকখানা পর্যন্ত বিস্তার ঘটে একটি সুশোভন সরণীর। তৎকালীন কলকাতায় এটিই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট রাজপথ; ইংরেজদের মতে The best street in Calcutta. তখন তার নামকরণ হয়েছিল Avenue to the Eastward. এ-নামের স্থায়িত্ব ছিল ১৭৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তারপর লালবাজার-সংলগ্ন রাস্তা ব'লেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণাধীনে তা নাম ধারণ করে লালবাজার স্ট্রীট। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম যুগে লালবাজারের বাজারকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে ওঠে সরাইখানা, হোটেল ইত্যাদি। এ-সম্পর্কে মনীষী উইলিয়াম কেরী প্রথম যুগের ইংরেজ রাজ-পুরুষদের মধ্যে দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত ক'রে যা বলেছেন—তা এই:

'Lall Bazar is mentioned by Holwell, in 1738, as a famous bazar. - - - In 1788 Sir William Jones refers to the nuisance here of low taverns, kept by Italians, Spanish and Portuguese.'

তাছাড়া লালবাজার স্ট্রীটের আরেক অংশে মাথা তুলে দাঁড়ায় 'হার্মনিক ট্যাভার্ন' এবং 'হোটেল লণ্ডন'। হার্মনিক ট্যাভার্ন এবং হোটেল লণ্ডনের গৃহদ্বয় ছিল সুরম্য এবং পুষ্পিত তরুলতায় পরিবেষ্টিত। তৎকালীন বিত্তবান ইংরেজ নরনারী এবং এ-দেশীয় বিলাসী জমিদার শ্রেণীর নৈশবিহারের একমাত্র কেন্দ্র ছিল হার্মনিক ট্যাভার্ন। এখানে পানাহারের পর, প্রমত্ত নরনারীর এক-একটি রাত আত্ম-বিসর্জিত হতো অশালীন পরিবেশের বেপরোয়া প্রমোদ-পল্বলে। বিশেষ ক'রে শীতকালের শীতল আবহাওয়ায় এই মত্তোৎসবের মুক্ত ধারায় কোটালের বান ডাকতো আরও বেশি। তখন ইংরেজ রাজ-পুরুষদের মধ্যে যাঁদের স্থান ছিল মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে, তাঁরা বর্ণানুক্রমে এবং নিজব্যয়ে উক্ত ট্যাভার্নেই নাচ, গান এবং পানাহারের আসর জমিয়ে আমন্ত্রণ জানাতেন তদানীন্তন ভাগ্যবানদের। এ-সম্পর্কে তৎকালীন ভাগ্য-বিড়ম্বিতা ইংরেজ রমণী মিসেস ফে-র এক লিখিত উক্তিতে জানা যায়:

'I felt far more gratified some time ago when Mrs, Jackson procured me a ticket for the Harmonic, which was supported

by a selected number of gentlemen, who in alphabetical rotation, give a concert, ball and supper, during the cold season, I believe, once a fortnight,'

শোনা যায় : এ-ধরণের এক-পক্ষকালীন নাচের আসরেই নাচতে নাচতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন জ্যাকসন দুহিতা মিস হেলেন। তাই নাচের আসরে যতি পড়ে খানিকক্ষণ। মিস হেলেনকে নিয়ে আসা হয় ট্যাভার্নের এক নিভৃত কক্ষে। সেখানে তাঁর জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফিরতেই, সেই কক্ষে তিনি একাকী বিশ্রাম করার মানসে প্রত্যেককে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। কেবল ট্যাভার্নের একজন অর্ধশিক্ষিত তরুণ খানসামা—যে ভারতীয় হলেও, ইংরেজদেরই দৈহিক সাদৃশ্যের অধিকারী এবং যে তার বংশ-গুণেই লাভ করেছে সৌম্য মুখশ্রী—তাকেই পরিচর্যাকারীরূপে নিজের কাছে রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মিস হেলেন। সুতরাং যথারীতি সে-ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়। উক্ত তরুণ খানসামাকে মিস হেলেনের কক্ষে রেখে সবাই আবার ফিরে আসেন নাচের হলঘরে। সুললিত ঐকতানের সঙ্গে নাচের আসর আবার জ'মে ওঠে নেশাতুর পরিবেশে।

ওদিকে ট্যাভার্নের নিভৃত কক্ষে কেবল মিস হেলেন এবং সেই তরুণ খানসামা। দরজা ভেজিয়ে দেওয়ার জন্য খানসামাকে ইশারা করেন মিস হেলেন। খানসামা যথারীতি তাঁর আদেশ পালন করা মাত্রই তাকে তিনি ডেকে নেন নিজ শয্যার পাশে। তারপর একসময় হঠাৎ সেই পানোন্মত্তা নারী খানসামাকে তাঁর লীলায়িত বাহুতে আবদ্ধ করেন নিবিড়ভাবে এবং বলেন : I love you my dear.

এ-ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং ভীরু সেই খানসামা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বেশ সাহসী হয়ে ওঠে তখন। হেলেনের উষ্ণ আলিঙ্গনই যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার করে তার মনে। সুতরাং মদ্যপান না করেও কী-এক গভীর নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে তার সমস্ত সত্তা। মধুর আবেশে সে তার বিবশ দেহভার এলিয়ে দেয় হেলেনের কবোষ্ণ কোমল বুকেই।

ঠিক এমনই সময়ে, সম্ভবত অসুস্থা কন্যার একবার খবর নেবার প্রয়োজনেই হঠাৎ দরজা ঠেলে প্রবেশ করেন মিসেস জ্যাকসন। কিন্তু প্রবেশ করেই তিনি বেশ চমকে ওঠেন। একজন নগণ্য খানসামার এই স্পর্ধায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে, তিনি নাচের আসর থেকে ডেকে আনেন তাঁর আত্মীয়জনদের। তাঁদের কাছে তিনি অভিযোগ করেন : খানসামা বলপূর্বক তাঁর দুর্বল কন্যার শ্লীলতা হানি করেছে।

মায়ের এই মনগড়া অভিযোগে সবিশেষ অবাক হন মিস হেলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন প্রতিবাদ করার মতো কোনো শক্তি এলো না তাঁর বুকে, এবং মুখেও ফুটলো না কোনো কথা নেশা এবং শঙ্কা—এ-দু'য়ের গভীর সংমিশ্রণ তখন তাঁকে নির্বাক ক'রে ফেলেছে সম্পূর্ণ। অতএব সেদিনের সেই প্রচণ্ড ঝড়ের সমস্ত দাপট একাই মাথা পেতে গ্রহণ করে খানসামা। হেলেনের আত্মীয়জনদের দ্বারা নানা-ভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার পরেও সে নিস্তার পায় নি। পরের দিনই তৎকালীন মেয়র কর্তৃক তার বিচার হয় এবং বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সে বাধ্য হয় কারবরণ করতে।

কিন্তু সেকালের কারাগার তেমন সুরক্ষিত হয়তো ছিল না। তাই মাসখানেকের মধ্যেই উক্ত কারাগার থেকে বেশ সহজেই পালিয়ে আত্মগোপন করার সুযোগ পায় সেই খানসামা।

মিস হেলেন হয়তো ভেবেছিলেন : কারামুক্তির পর আবার তিনি মিলিত হবেন খানসামার সঙ্গে। কিন্তু যখন খবর পেলেন খানসামা পলাতক এবং তৎকালীন ইংরেজ-নিয়োজিত গোয়েন্দা বিভাগও যখন তার সন্ধান পেলো না কোথাও—তখন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন হেলেন। তারপর দিনে দিনে, এভাবেই অনাহার এবং অনিদ্রার অবিরাম আঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দীর্ঘ অসুস্থতার পর একদিন দেখা দেয় তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি।

এ-দেশে নানাভাবে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তাই অবশেষে তাঁকে পাঠানো হয় ইংলণ্ডে। শোনা যায় : ইংলণ্ডের দক্ষ চিকিৎসকরাও নাকি তাঁর নিরাময় সাধনে সক্ষম হতে পারেন নি। অনেক বৎসর পর, অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে, উন্মাদিনী অবস্থায় ইংলণ্ডেই দেহরক্ষা করেন মিস হেলেন।

মিস হেলেনের মৃত্যু-সংবাদ কলকাতায় পৌঁছবার পর, কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ পরিবারে যখন তা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছিল—তখন সেই আলোচনা আড়াল থেকে শুনেই নাকি প্রচণ্ড রকম আর্তনাদ ক'রে ওঠে উক্ত পরিবারেরই এক-শ্মশ্রু-মণ্ডিত প্রৌঢ় বেয়ারা। তারপর সেদিন রাত্রেই সকলের অলক্ষ্যে সে নাকি আত্মহত্যা করে উদ্বন্ধনে। তার আত্মহত্যার পর বিশেষ তদন্তের শেষে জানা যায় : উক্ত বেয়ারাই তার তরুণ বয়সে খানসামার কাজে নিযুক্ত ছিল হার্মনিক ট্যাভার্নে—যাকে অন্তরের গভীর প্রেম নির্বিচারেই নিবেদন করেছিলেন মিস্ হেলেন।

কাহিনীটি বেশ রোমাঞ্চকর। বংশ-পরম্পরায় যারা খানসামার কাজেই নিযুক্ত—এমন এক পরিবারেরই জনৈক প্রবীণের কাছ থেকে আমি সংগ্রহ করেছি এই কাহিনীর উপকরণ। হয়তো এ-কাহিনীর স্বপক্ষে ইতিহাস কোনোদিন সাক্ষ্য দেবে না, তবু যুগ-যুগান্তর ধ'রে সাধারণের অন্তর্লোকে তা করুণ প্রেমের উপাখ্যানরূপে জেগে থাক—এ প্রার্থনাই আমি করবো।

হার্মনিক ট্যাভার্ন এবং হোটেল লণ্ডনের সন্নিকটে সেকালেই একটি রঙ্গালয়েরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এই রঙ্গালয়টি ছিল সারা কলকাতার প্রথম থিয়েটার-গৃহ। এই রঙ্গালয় বা থিয়েটার-গৃহের স্থান-নির্দেশ সম্পর্কে

ইতিহাসবিদেরা দ্বিমত প্রকাশ করলেও, আজ থেকে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে সে-স্থান সুস্পষ্টভাবেই আবিষ্কার করেন রেভারেণ্ড ডবলিউ কে ফারমিঙ্গার। তিনি ৮নং লালবাজার স্ট্রীটস্থ বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান রেলি ব্রাদার্সের পাট-গুদামের এক দেওয়ালকেই হারিয়ে যাওয়া সেই নাট্যশালার এক অংশরূপে প্রমাণ করেন। মহাকালের করাল দৃষ্টি এড়িয়ে তা ওভাবেই ছিল দাঁড়িয়ে পাট-গুদামের এক উপেক্ষিত প্রাচীররূপে। অতএব রেভারেণ্ড ফারমিঙ্গারের প্রমাণসূত্রেই প্রথম নাট্যশালার স্থান-নির্দেশ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ্‌দের আজ দ্বিমতের অবসান হওয়া উচিত।

সিরাজদ্দৌলার কলকাতা অবরোধ-কালে নবাব-বাহিনীর তোপের আঘাতে বিশেষভাবেই বিধ্বস্ত হয় সেই রঙ্গালয়। তারপর নানা ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে ইংরেজ যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত রঙ্গালয়টিকেই একটি গীর্জায় রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে বার বার নির্দেশ পাঠান। এ-সম্পর্কে ১৭৫৮ খৃস্টাব্দের ৩রা মার্চে তাঁরা লেখেন :

We are told that the Building formerly made use of as a theatre may with little expense be converted into a Church or public place of worship, as it was built bv the voluntary contributions of the inhabitants of Calcutta. We think there can be no difficulty in getting it freely applied to the before-mentioned purpose especially when we authorise you to fit it up decently at the Company's expense, as we hereby do' ---

কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, ডিরেক্টরগণের উল্লেখিত নির্দেশ পালন করা হয় নি। ফলে উক্ত রঙ্গালয় যেমন গীর্জারূপে রূপান্তর লাভ করার সুযোগ আর পায় নি, তেমনই রঙ্গালয়রূপেও সে পুনঃ সংস্কারের মাধ্যমে কোনো-দিন মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি অর্জন করতে পারে নি। যে-পাদপ্রদীপের আলো তার নিভিয়ে দিয়ে গেল সিরাজ-বাহিনী, তা নিভেই রইলো চিরকাল।

সেকালে লালবাজার স্ট্রীট এবং বেণ্টিক স্ট্রীটের সঙ্গমস্থলেই অবস্থিত ছিল শহর-কলকাতার আদি বা প্রথম কারাগার। কারাগার সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী গৃহই ছিল কালেক্টর অব ক্যালকাটার কার্যালয়। এবং এই কার্যালয়ের গা-ঘেঁষেই ছিল Sailors' Home. উল্লেখিত কারাগারেই কারারুদ্ধ হয়েছিলেন সেকালের নির্ভীক সাংবাদিক জেমস্ অগাস্টাস হিকি—যিনি কুখ্যাত বাস্টিডের অভিমত অনুসারেও ছিলেন : A worthless man ; but the pioneer of the Indian press. বাস্তবিকই হিকি ছিলেন কলমের লড়াইয়ে সেকালের একজন অদ্বিতীয় সৈনিক। ইংরেজ অসাধু ব্যবসায়ীদের কার্যকলাপ তাঁকে পীড়িত করেছিল ; অন্তরে তাঁর অস্বাভাবিক জ্বালা ধরিয়ে-ছিল হেস্টিংসের, স্বৈরাচার এবং ইম্পের পক্ষপাতদুষ্ট বিচারের প্রহসন। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর ক্ষুরধার কলমের জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বার বার কদর্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন হেস্টিংসের, ইম্পের এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের। তাঁর লেখনীর জোরেই লোকচক্ষে যৎপরোনাস্তি হেয় প্রতিপন্ন হন গভর্নর হেস্টিংস। সম্ভবত সে-কারণেই তিনি হিকির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন তাঁকে মিথ্যাদায়ে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে। হিকিকে কারাগারে নিক্ষেপ করার পেছনে প্রধান বিচারপতি ইম্পে এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের দুষ্টবুদ্ধিও কাজ করে প্রবলভাবে।

এককালে, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে লালবাজার অঞ্চলেই ছিল মিঃ স্মিথ নামে একজন সাহেবের দোকান—যেখানে সুন্দরবনের বাঘ, হরিণ ইত্যাদি বিক্রয় করা হতো।

এ-সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে সেকালের ক্যালকাটা গেজেটের একটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত করেছেন। বিজ্ঞাপনটি বাংলা ভাষায় এই :

"২৩০ নং লালবাজারে মিঃ স্মিথের দোকানে একটি Royal Bengal Tiger বা সুন্দরবনের বৃহৎ বাঘ বিক্রয়ার্থে আনানো হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চারিমাস বয়স্ক দুইটি বাঘের ছানা ও একটি চিতা বাঘও বিক্রয় করা হইবে। গ্রাহকগণ স্বচক্ষে দেখিয়া বাঘের মূল্যাদি স্থির করুন। দাম

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সাড়া লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয় ; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা ; ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।

মূল্য : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দেখিবার জন্য ইহার রক্ষককে আট আনা বখশিস দিতে হয়।"

আজ যেখানে কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার্স—সেখানেই কোনো এক অংশে ছিল Merchant Prince জন পামারের বাসগৃহ। জন পামারের পিতা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সেক্রেটারী। সম্ভবত সেই সূত্রেই জন পামার তদানীন্তন মর্যাদার উচ্চতম বেদীতে আরোহণ ক'রে তাঁর নিজ ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধনে সক্ষম হন। তিনি নাকি একজন দাতা বা দানশীলরূপেও সবিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন জনসমাজে। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে, তাঁর তথাকথিত দানের বিস্তার ছিল কেবল খৃস্টান মহলেই। তাঁর আতিথেয়তাও নাকি ছিল সর্বজনবিদিত। তাঁর অতিথি সৎকারের ঘনঘটায় প্রায় অভিভূত হয়ে পড়তেন অজস্র অতিথি। তবে এই অজস্র অতিথির মধ্যে প্রত্যেকেই প্রায় সেই স্তরের ব্যক্তি —যে-স্তর কেবল ভোগের, ঐশ্বর্যের এবং বিলাসের। জন পামারের তৎকালীন অতিথিবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথি ছিলেন দুজন গভর্নর জেনারেল—যাঁরা জন পামারের আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে উক্ত গৃহে রমণী-মাংসের উষ্ণ আস্বাদ পর্যন্ত লাভ করেছিলেন।

যাই হোক, ১৮৯০ খৃস্টাব্দের অক্টোবরে জন পামারের বাসগৃহ উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে অধিকার করেন ইংরেজ সরকার। তারপর প্রভুল অর্থ-ব্যয়ে উক্ত গৃহ যেমন পরিবর্ধিত করা হয়, তেমনই সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে আরও উদ্ধত কোঠাবাড়ির পত্তন ঘটিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতা পুলিশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার্স। তখন লেফটেন্যান্ট-গভর্নর স্বয়ং তাঁর মনোমতো নিযুক্ত করতেন কমিশনার অফ পুলিশ—যিনি জাস্টিস অব দি পিস রূপেও এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হতেন সেকালে। তখন পুলিশের অধীনে উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ—এই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল কলকাতা। সমগ্র কলকাতার শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে তখন পুলিশ কমিশনারের পরিচালনাধীনে ছিলেন তিনজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, পঁচিশজন ইন্সপেক্টর আটজন সাব ইন্সপেক্টর একত্রিশজন সার্জেণ্ট, উনসত্তরজন কর্পোরাল, একান্নজন স্পেশাল কনস্টেবল এবং এক হাজার একুশ জন কনস্টেবল। তা ছাড়া একটি ডিটেকটিভ বিভাগও ছিল। তবে পরবর্তীকালে এ-প্রথার পরিবর্তন ঘটে চূড়ান্তরূপে। বর্তমানে যে পুলিশ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীনে ভারতের বৃহত্তম মহানগরী—তার সংখ্যা আজ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আগের তুলনায় অস্বাভাবিক রূপে। আজকাল লালবাজার থানা জমজমাট। এখানে পদার্পণ করলেই মনে হয় এক সুপরিচালিত মেলায় এসে পড়েছি।

বর্তমানে লালবাজার স্ট্রীট অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কেবল বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট থেকে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের উপকণ্ঠ পর্যন্তই তার বিস্তার। অথচ এই সঙ্কুচিত বিস্তারের মধ্যেই আজও এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে অজস্র প্রতিষ্ঠান। লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের এপাশে-ওপাশে এবং সামনে অধিষ্ঠিত অজস্র বিপণি, প্রেস এবং অতি উদ্ধত কয়েকটি অট্টালিকার অন্দরে আধুনিক ব্যবসায়ীদের কিছু বিখ্যাত কার্যালয়। উদ্ধত অট্টালিকাসমূহের মধ্যে মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং, নর্টন বিল্ডিং এবং বিকানীর বিল্ডিং কেবল উল্লেখযোগ্য নয়, দর্শনীয়ও বটে।

আজ লালবাজার স্ট্রীটের একালের পরিবেশে সেকালের কোনো প্রকট স্বাক্ষর না থাকলেও, তার অদৃশ্য প্রভাব হয়তো আজও বজায় আছে খানিকটা। তাই লালবাজার স্ট্রীটে পা রাখলে অজ্ঞাতসারেই হঠাৎ পশ্চাৎ-পিয়াসী হয় মন—যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে লালবাজার থানার কর্কশ অট্টালিকা এবং সেখান থেকে আবার যখন দৃষ্টি প্রসারিত হয় রাইটার্স বিল্ডিং এবং সেণ্ট এ্যাণ্ড্রুস গীর্জার সমুন্নত চূড়ায়।

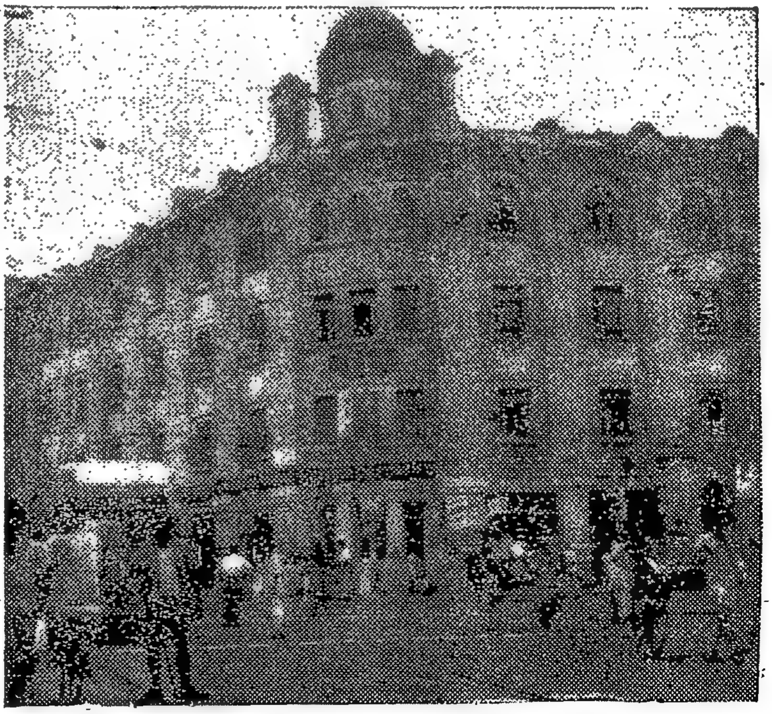

● মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং

রিক্সায় উঠে বসে সুবিমানবাবুর সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলো প্রফুল্ল। ওর ছোট ভাই সুধন্যও। রিক্সা চলতে সুরু করলো, আর তখনই আত্মমগ্ন হলো প্রফুল্ল। ভাবনার গভীরে তলিয়ে গেল।

সোদপুরে এই প্রথম আসা ওর। এর আগে সোদপুর স্টেশনের উপর দিয়ে যাতায়াত করেছে বহুবার। ট্রেনের কামরার ভেতর থেকে দেখেছে স্টেশনটা। বাংলা আর ইংরেজী অক্ষরে খোদাই করা পাথরের উপর স্টেশনের নামটা পড়েছে। তার বেশি নয়। অর্থাৎ বরপক্ষের মতামতটা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি জানাতে অনুরোধ করেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যে হলেই ভালো হয়।

আচ্ছা এত অল্প সময় দিলেন কেন ভদ্রলোক। কেন এত তাড়াতাড়ি জানাবার অনুরোধ করলেন মতামত। তাহলে কি অন্য কোন খোঁজ আছে ওদের হাতে? অন্য কোন সম্বন্ধ? হয়তো হবে।

সুবিমানবাবুর জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ব্যাপারটাকে একবার ভাবতে চেষ্টা করলো প্রফুল্ল। তাঁর অনুরোধটাকে একেবারে অবান্তর বলে কুণ্ঠা আর সঙ্কোচের কোন নজির ও তো রাখে নি। বরং বলা যায় একটা অবজ্ঞার ভাবই ফুটিয়ে তুলেছে। পিতার আমন্ত্রণে অতিথি হয়ে আসা মানুষগুলোর সামনে গিয়ে না বসলে অশালীন মনে হবে সমস্ত ব্যাপারটা, তাই বাধ্য হয়ে এসেছিল, অনেক কথা, অনেক প্রশ্নের মধ্যে দু-একটারও উত্তর না দিলে অশোভন দেখাবে তাই যেন মুখ খুলেছিল মেয়েটি। কয়েক মিনিটের দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্য থেকে এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে প্রফুল্ল।

তাহলে কি আজ মেয়েটার শরীরটা খারাপ ছিল? মন-মেজাজ ভালো ছিল না? তাতে কি? প্রফুল্লরা তো আর রোজ আসছে না ওদের বাড়ি। প্রফুল্লও না, ওর ছোট ভাইও না। প্রতিদিন কিংবা প্রতি সপ্তাহে ওকে পছন্দ করতে

দক্ষিণা

খগেন্দ্র দত্ত

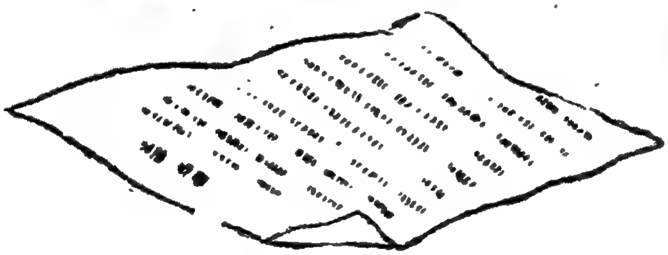

সোদপুর নামটার সঙ্গেই পরিচয় ছিল এতকাল।

এবার কিছুটা পরিচিত হয়ে গেল পরিবেশের সঙ্গে। এ এলাকার একটা পরিবারের সঙ্গেও। আবার যে পরিবারটার সঙ্গে আজ পরিচয় হল সে পরিবারের সঙ্গে পরিচয়টা স্থায়ী করা হবে কিনা ভাবতে হবে। দু-চার দিনের মধ্যেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

কন্যাপক্ষের কর্তা বড় রাস্তা অবধি এগিয়ে দিতে এসে ঐ কথাটার উপরেই জোর দিয়েছেন বেশি। উড়িয়ে দিতে পারলো না। নিশ্চয়—ওদের হাতে অন্য ছেলের সন্ধান আছে। এখানে না হলে ওখানে কথা দেবেন। কাজেই প্রফুল্লকে দিতে হবে একটা মতামত। আর ওর মতের উপরেই নির্ভর করছে ওদের বাড়ির মতামত।

কিন্তু কি মতামত দেবে ও? আচ্ছা, মেয়েটাকে এত দাম্ভিক দাম্ভিক বলে মনে হল কেন? দাম্ভিক কি? না কুমারী মেয়ের স্বাভাবিক লজ্জা, কিংবা অপরিচিত পুরুষের সামনে এসে দাঁড়াবার স্বাভাবিক সঙ্কোচ? তাও তো নয়। মাপা কথা, মাপা উত্তরের মধ্য দিয়ে আসবে না ওরা। বিশেষ একটি দিনে বিশেষ একটি সময়ে এসেছিল ওরা। আজকের দিনটা তো ওর জীবনে একটা বৈচিত্র্য বহন করে আনা উচিত ছিল, আর সে বৈচিত্র্যের প্রভাবে ওর মুখের রেখায় রেখায় গোলাপী দীপ্তির উদ্ভাসও ফুটে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু সে উদ্ভাসের ছায়ামাত্রও কি ছিল ঐ মুখের আয়তনে?

কোথায় একটা সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে এসে মুখোমুখি বসবে, মানসিক প্রস্তুতি থাকবে কোন প্রশ্ন এলে তার সঠিক জবাব দেওয়ার। কিছু ভয়,

কিছু আনন্দের মিশ্রণে মায়াময় হয়ে উঠবে মুখাবয়ব। কিন্তু কৈ? এ সবের কোনটারই তো খোঁজ পেল না প্রফুল্ল। এমন কিছুই দেখতে পেলো না যা ওকে ক্ষণিকের জন্যও উন্মনা করবে বাড়ি ফেরার পথে, না একফালি সহজ হাসি, না আজকের আয়োজনকে সার্থক করার জন্য এতটুকু ব্যাকুলতা।

প্রফুল্ল এবং ওর ভাইয়ের সামনে আসার ভঙ্গি, দাঁড়ানো, কথা বলার ধরণ ইত্যাদি দেখে প্রফুল্লর মনে হয়েছে যেন বাধ্য হয়ে এসেছে ওদের সামনে। না এলে বাবা অসন্তুষ্ট হবেন, মা চেঁচামেচি করবেন সে কারণেই যেন আসা।

ওকে দেখবার জন্য প্রফুল্লরা এসেছে ঠিক কথা। ওর কথা, ওর চাল-চলন, হাব-ভাব, রূপ একনজরে যা দেখা যায় সবই দেখবে। কিন্তু সেটা কি একতরফা? তা কি করে হয়? অপর পক্ষ থেকেও তো কিছু আশা করেছিল প্রফুল্ল। কথা বলার অবকাশে কিংবা বিশেষ কোন মুহূর্তে আড়চোখে ওর দিকে একবার তাকাবে আর ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জায় ঘামবে এই তো কল্পনা করেছিল প্রফুল্ল।

কিন্তু কৈ, সে চেষ্টাও তো করে নি মেয়েটি। ওর মনের কোণে সেরকম কোন ইচ্ছা ছিল বলেও তো মনে হয় নি। এরকম একটি মেয়েকে জীবনে স্থান দিতে প্রস্তুত আছে কিনা, কি করে এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবে প্রফুল্ল বুঝে উঠতে পারছে না। অথচ বাড়ির সীমানায় পা রাখলেই মা এসে দাঁড়াবেন সামনে, পাশের বাড়ির বৌদিও জানতে চাইবে ওর মতামত। তখন কি বলবে ও? কী জবাব দেবে?

আচ্ছা, সুধন্যর কিরকম লাগলো একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না? ও যখন সঙ্গে এসেছে ওর মতামত তো একটা আছে। সেটা জেনে নেওয়া উচিত নয় কি? কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে কথা সুরু করার আগেই রিক্সা এসে থামলো স্টেশনে। সুধন্য নেমে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লও। রিক্সাওয়ালাকে পয়সা দিতে গিয়ে ভাবলো একেবারে ট্রেনে উঠে পরে ভাইকে জিজ্ঞেস করবে। কিংবা ট্রেন থেকে নেমে তারপর।

পকেট থেকে টাকা বের করল একটা প্রফুল্ল। সুধন্যর হাতে দিয়ে বললো: দু'খানা টিকিট কেটে নিয়ে আয়।

টাকা হাতে সুধন্য টিকিটঘরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললো: ও মশাই, শুনুন।

কে কাকে ডাকছে বুঝে ওঠা মুস্কিল। তবু সে আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো সুধন্য। দু'ভাই-ই একসঙ্গে পেছন ফিরলো।

দেখলো ওদের দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক না বলে যুবক বলাই ভালো। মনে হল ওদেরই ডাকছে।

তবু সন্দেহ জাগলো মনে। কাকে ডাকছে কে জানে? ওদের? কেন ডাকতে যাবে ওদের? তবে কি একটু আগে যে বাড়ি থেকে মেয়ে দেখে এল সে বাড়ির কেউ?

কৈ, সে বাড়িতেও তো এ যুবকটিকে দেখেছে বলে মনে পড়লো না। তাহলে কি অন্য কোন আত্মীয়, অন্য পরিচিত কেউ? কিন্তু সেই কেউ-টি কে তা বুঝে উঠতে না পেরে যুবকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখলো প্রফুল্ল। দেখলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সারা শরীর জরিপ করে ফিরলো বার দুই-তিন। তবু ঠিক বুঝে উঠতে পারলো না যুবকটি কে? না, ওর পরিচিত কেউ নয়। কোন কালেও এর সঙ্গে পরিচয় হয় নি। একদিনের জন্যও যদি পরিচয় হতো তাহলেও প্রফুল্ল ভুলতো না। ওর মন থেকে মুছে যেত না। ওর স্মৃতিশক্তি এত দুর্বল নয়।

তবু সন্ধান করতে লাগলো অতীতের পটভূমিতে। স্মৃতির নদীতে সাঁতার কেটে বেড়ালো বেশ কয়েকটি পলক। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না ঐ মুখের আদল। কোন হদিস পেল না ঐ চেহারার।

তাহলে সুধন্যর কোন বন্ধু? ওরই সহপাঠী কিংবা সহকর্মী? অথবা ওর পরিচিত কেউ?

সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফেরালো সুধন্যর দিকে। কিন্তু কোথায়? ওর চাহনিতেও তো একরাশ বিস্ময়। ওর চোখে-মুখেও তো কৌতূহল।

: আপনাদেরই ডাকছি আমি।

ওদের দিকে তাকিয়ে সংশয়ের অবসান ঘটালো সেই যুবকটি।

দু'ভাই এগিয়ে গেল আহ্বায়কের কাছে। শঙ্কা আর কৌতূহল যুগপৎ কাজ করছে ওদের মনের মধ্যে। খানিকটা বিরক্তিও।

: কি বলছেন? প্রফুল্লই প্রশ্নটি করলো কাছাকাছি গিয়ে।

: বলছিলাম—যুবকটি অনুনয়ের ভঙ্গি করলো: মিনিট তিন-চার সময় যদি আমার জন্যে দেন বাধিত হব।

প্রফুল্লর চোখে-মুখে বিরক্তির রেখা ফুটলো। কপালেও অস্বস্তির কুঞ্চনরেখা। একবার ভাবলো এক কথায় জানিয়ে দেবে ওর জন্য সময় দিতে পারবে না। ওর সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক যে ওর কথা শুনতে হবে। চেনা নয়, জানা নয় কি দরকার ওর জন্য সময় ব্যয় করে? কিন্তু যুক্তির চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল কৌতূহল। সুধন্যর দিকে তাকালো প্রফুল্ল। সে কিন্তু নির্বাক নিস্পন্দ।

কথা বললো প্রফুল্লই: কি বলতে চাইছেন বলুন।

: দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তো সব কথা বলা যাবে না, দয়া করে যদি ঐ রেস্টুরেণ্ট পর্যন্ত যান বড় উপকৃত হব।

হাতজোড় করলো যুবকটি। চোখের ইশারায় দেখিয়ে দিল রেস্টুরেণ্ট। বড় রাস্তার ধারে অতি হালফ্যাশনের একটি রেস্টুরেণ্ট।

প্রফুল্লর বিস্ময় চরমে উঠলো। কি ব্যাপার? কি উদ্দেশ্য আছে

ভদ্রলোকের? পাগল নয়তো? অথবা কোন বদ মতলব?

ভয় জড়ানো কৌতূহলটা প্রফুল্লর মনের তলায় ছটফটই করলো। হাত-পা ছুঁড়লো। কথা হয়ে বেরিয়ে এল না কণ্ঠনালীকে ভর করে।

যুবকটি হয়তো বুঝলো প্রফুল্লর মনের অবস্থা। তাই ওর মনের সন্দেহকে খানিকটা ঘোলাটে করে দেবার উদ্দেশ্যে বললো: দেখুন, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার চেয়ে এক জায়গায় বসে বলা ভালো নয় কি? আশপাশে আর কোথাও তো বসবার জায়গা নেই, তাই বলছিলাম ঐ রেস্টুরেণ্ট পর্যন্ত যদি একটু কষ্ট করে হেঁটে যান, চা-ও খাওয়া হবে, আমার জরুরী কথাটাও বলা যাবে।

যুবকটির গলার স্বর, করুণ আবেদন এবং উৎকণ্ঠা প্রফুল্লকে মনস্থির করতে সাহায্য করলো। একটা ভদ্র শিক্ষিত যুবকের অনুরোধে কয়েকটা মিনিট নষ্ট করলে ক্ষতি কি? বাড়িতে এমন জরুরী কাজও কিছু নেই যে, এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে।

বাধ সাধলো সুধন্য, সে-ই যুবকটির অনুরোধের উত্তর দিতে গিয়ে বললো: আমাদের ট্রেনের সময় হয়ে গেছে যে।

: ট্রেন অনেক আছে দাদা। প্রতি পনের-বিশ মিনিট অন্তর ট্রেন আছে এ-লাইনে। আমিই তুলে দিয়ে যাব ট্রেনে। কোন অসুবিধা আপনাদের হবে না।

অগত্যা সুধন্য চুপ করে গেল। শুধু একবার দাদার মুখের দিকে তাকালো। এমন একটা ভাব যেন যুবকটির অনুরোধ রক্ষা করলেই ভালো হয়।

: আসুন।

যুবকটি হাঁটতে সুরু করলো। পেছন লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো প্রফুল্ল। ওরই বয়েস হবে। একহারা চেহারা, গায়ের রং ফর্সা বলা চলে না। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। সাদা ধবধবে ধুতি, সার্ট পরণে। কথাবার্তায়ও মার্জিত রুচির ছাপ। কিন্তু কি বলবে ও? কেন ওদের ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ওই রেস্টুরেণ্ট পর্যন্ত। কি উদ্দেশ্য, কি প্রয়োজন কে জানে?

সম্ভব-অসম্ভব অনেক কথাই মনে এল প্রফুল্লর। হয়তো একটু আগে দেখে আসা মেয়েটি সম্বন্ধে কিছু বলবে। হয়তো মেয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোন গোপন খবর।

তাই হবে। সে রকম একটা কিছুই বলবে। কোন রহস্যময় জগতের দরজা উন্মুক্ত করে দেবে ওদের চোখের সামনে। মেয়েটি হয়তো বিবাহিতা, হয়তো স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হয় না বলেই নিজের কাছে এনে রেখেছেন সুবিমানবাবু। সুযোগ বুঝে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন আবার। এমন কত ঘটনাই তো ঘটছে আজকের সমাজে।

যুবকটি একবার পেছন ফিরে বললো: দেখুন, আপনারা হয়তো ভাবছেন—আপনাদের সময় নষ্ট করছি। তার জন্যে মনে অস্বস্তিও বোধ করছেন নিশ্চয়।

: না, না—রাগ করবো কেন? কি যে বলেন আপনি। একেবারে বাজে আড্ডায় সময় নষ্ট করার জন্য তো আপনি ডাকছেন না। নিশ্চয় প্রয়োজন আছে।

: সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম। প্রয়োজনটা মুখ্যত আমার বটে, শুনলে আপনাদেরও উপকারে আসতে পারে।

প্রফুল্লর সব ভাবনা, সব চিন্তা, সব সংশয় একটা ধাক্কা খেল, কিন্তু কোন কথা বললো না। যুবকটিকে অনুসরণ করে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে ঢুকলো।

রেস্টুরেণ্টের ভেতর পা দিয়েই সব টেবিলগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিল যুবকটি। উত্তর প্রান্তের দিকে পা চালাতে গিয়ে বললো: এদিকে আসুন, এদিকটা একটু ফাঁকা আছে।

তাই গেল প্রফুল্ল। পেছন পেছন সুধন্যও। গিয়ে বসলো শেষ টেবিলটিকে ঘিরে যে চারটি চেয়ার তার একটিতে। সামনের দুটো চেয়ার দেখিয়ে শান্তভাবে বললো: বসুন।

বসলো প্রফুল্ল, সঙ্গে সঙ্গে সুধন্য।

বয় এল কাছে। যুবকটি চায়ের অর্ডার দিল। তিন কাপ চা।

: আর কিছু? বয় জানতে চাইল।

: না, আর কিছু না। প্রফুল্ল বললো।

: খালি চা?

: হ্যাঁ, তিন কাপ ডবল হাফই নিয়ে এস।

বয় চলে গেল। প্রফুল্ল উৎকর্ণ হয়ে বসলো। যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

চায়ের কাপ সামনে আসার আগে যুবকটি বলতে সুরু করলো: আপনাদের অনেকক্ষণ সময় নষ্ট করছি, কিন্তু কি করি বলুন—এ ছাড়া যে আমার অন্য কোন পথ নেই।

প্রফুল্ল তখনও নির্বাক। কিন্তু বেশ উদ্‌গ্রীব। দুটো কানও সজাগ।

যুবকটি যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো, নড়ে চড়ে বসলো। কি ভাবে কথাটা সুরু করা যায় ভেবে নিল।

প্রফুল্লর মনে বিরক্তির ছায়া। কি দরকার ভূমিকার ভণিতা করে? আসল কথাটা তুললেই তো হয়। যে জন্যে ডেকে নিয়ে আসা। মনের কথা মনেই রইলো। বলা হোল না।

চায়ের কাপ এল। তিনজন তিনটে কাপ টেনে নিল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে যুবকটি আরম্ভ করলো: দেখুন, একটা কথা আপনাদের জানাবার জন্যে আজ গোটা বিকেলটা আমি ব্যয় করেছি। বেলা দুটো থেকে এখানে অপেক্ষা করছি আপনাদের আশায়।

: কিন্তু আমরা তো দুটোর সময়ই নেমেছি ট্রেন থেকে। প্রফুল্ল উত্তর দিল।

: তা দেখেছি। আপনারা নেমেছেন, রিক্সা নিয়েছেন, ওদের বাড়িতে গেছেন। ওখানেও ঘণ্টা দুই ছিলেন, সব জানি। জানি না শুধু যাকে দেখতে গিয়েছিলেন তার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার পেয়েছেন।

চমকে উঠলো প্রফুল্ল। ওর হাতের কাপের চা পর্যন্ত ছলকে উঠলো।

বললো : সেরকম কোন আশঙ্কা কি করেছিলেন আপনি ?

: করি নি বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে খুব বেশি উগ্র না হতে আমি বারণ করেছিলাম।

বিস্ময়ের আর শেষ নেই। ওর চোখে-মুখে রাজ্যের সব বিস্ময় এসে ভর করলো। কৌতূহল হয়ে উঠল সীমাহীন। এ কোন্ রহস্যলোকের বাতায়ন উন্মোচিত হচ্ছে ওর নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে।

: আপনার সঙ্গে তাহলে ঐ মেয়েটির জানাশোনা আছে বলুন ?

: জানাশোনা তো আছেই। তা না হলে আমার কি দরকার স্টেশনের আকাশ-ঝলসানো দুপুরের এই পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার ? কি দরকার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ?

: আপনার কি কোন আত্মীয়া ?

: হ্যাঁ, পরম আত্মীয়া।

প্রফুল্ল তাকিয়ে থাকলো নির্বাক। কি বলতে চাইছে যুবকটি ? পরমাত্মীয়া শব্দটার ওপর যতটা সম্ভব জোর দিয়ে উচ্চারণ করে কী অর্থ প্রকাশ করতে চাইছে।

: ওকি অবাক হচ্ছেন ?

মৃদুহাস্যে কথাটি ছুঁড়ে দিল যুবকটি।

: হ্যাঁ, অবাকই করছেন আপনি।

: বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে ? ভাবছেন বুঝি প্রতারক ?

: না, না—তা ভাবতে যাবো কেন ? মাথা ঝাঁকাতে সুরু করলো প্রফুল্ল। ঠোঁটের কোণায় ফুটিয়ে তুললো এক-ফালি হাসির ক্ষীণ দীপ্তি। কিন্তু শুষ্ক : তবে পরমাত্মীয় শব্দটির মানে ধরতে পারছি না।

: সেটাও আমার মুখ থেকে শুনতে চান ? বেশ, বলবো। আবার সে মানেটাকে তথ্য সহকারে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দায়িত্বও তো আমার।

কথার সঙ্গে সঙ্গে পকেটে হাত ঢোকালো যুবকটি। হাতড়াতে লাগলো। বের করলো মাঝারি সাইজের একটা খাম। টেবিলের উপর রাখলো সেটা ও খুললো। বের করলো একটা। ফটোগ্রাফ। আর একখানা বড় কাগজ। রঙিন। কিছু ছাপা, কিছু কালির লেখা।

টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললো : এই ফটো দেখুন। দেখুন চিনতে পারেন কিনা ?

সেই ফটোর উপর চকিত দৃষ্টির ঝলক ফেলে অবাক হয়ে গেল প্রফুল্ল। অবাক নয় থ হয়ে রইলো। ওর দৃষ্টির অনুসরণে সুধন্যও। একটি যুগ্ম ফটো। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একটু আগে দেখে আসা সেই মেয়ে আর সামনের এই যুবক। কোন ভুল নেই। চিনতে একটু কষ্ট হচ্ছে না, কোন অসুবিধা নয়।

প্রফুল্লর দুটো চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। ঝাপসা মনে হল সামনের সব কিছু। এমন কি টেবিল, চেয়ার, কাঠের পার্টিশন, মায় যুবকটি শুদ্ধ অস্পষ্ট।

বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল প্রফুল্লর জন্যে। সেটাও প্রকাশ পেল হাতের সেই ফিকে নীল কাগজখানা যখন সামনে রাখলো।

: এটা আমাদের রেজেস্ট্রি ম্যারেজের দলিল।

: রেজেস্ট্রি ম্যারেজ ?

প্রফুল্লর সমস্ত শরীর যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো।

: হ্যাঁ, সবিতা আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

মাথায় বাজ পড়লে মানুষ যেমন স্থির নিষ্পন্দ হয়ে যায় তেমনি একটা স্ট্যাচুর মতো শক্ত হয়ে বসে রইলো প্রফুল্ল। দুটো চোখ শুধু খোলা রইলো। স্থির হয়ে থাকলো যুবকটির চোখে।

প্রফুল্লর হঠাৎ মনে হল যে যুবকটির সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেছে, এতক্ষণ যার কথা শুনেছে সে আর অপরিচিত যুবক নয়—সে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী। ওর একান্ত প্রিয় সামগ্রীর উপর লোভী থাবা বসাতে এসেছে। এতক্ষণের সংশয়, কৌতূহল সব হারিয়ে গিয়ে ওর পৌরুষ মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইলো।

যুবকটি তখনও বলে চলেছে, যেমন এক উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় থেমে থেমে : দেখুন, আমরা উভয়ে উভয়কে মন-প্রাণ দিয়ে বসে আছি। তবু মানুষের হাতে গড়া সামাজিক একটা বৈষম্যকে হিমালয়ের মতো আমাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে তার জেদ বজায় রাখতে চাইছেন সুবিমানবাবু। কাজেই—

যুবকটির গলা কোমল হয়ে এল। চোখের তারায় অনুনয়ের স্রোতস্বিনী দেখা দিল : আপনি যদি বিয়েটা ভেঙে দিয়ে যান আমরা একটা সুখের এবং শান্তির নীড় গড়তে পারি।

মুহূর্তের মধ্যে সব রাগ, সব ঈর্ষা গলে জল হয়ে গেল। জল তো নয়—জলের স্রোত। আর সে স্রোতে ভেসে এল সম্পূর্ণ বিপরীত অনুভূতি। সমবেদনা।

ওর নিজস্ব কোন জিনিসের উপর লোভী থাবা বসাতে ঐ যুবকটি এগিয়ে আসে নি বরং প্রফুল্ল নিজেই সে অপরাধ করতে এসেছে।

এই অপরাধ মনে জাগার সঙ্গে সঙ্গে ফটোগ্রাফ আর দলিলটা ঠেলে দিল যুবকটির দিকে। বললো : রেখে দিন, আর নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধার আয়োজন করুন। আমরা উঠি।

অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়ালো প্রফুল্ল। চেয়ার সরালো ক্ষিপ্রহস্তে। কাউণ্টারের দিকে পা বাড়ালো চা-এর দাম দিতে।

বাধা দিতে চাইলো যুবকটি। কিন্তু তার আগেই দাম দিয়ে দিল প্রফুল্ল। যখন রেস্টুরেণ্ট ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো তখন মুখ-চোখ ওর ঘৃণায় কুঞ্চিত হল। সে কুঞ্চন, সে ঘৃণা কি একটু আগে দেখে আসা মেয়েটির প্রতি—না নিজের প্রতি কে জানে।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর

"আজ্ঞা কর বাঙ্গালা মুলুকে আমি জাই।
জবর করিয়া তং শানিব চৌথাই ॥"

পরে গ্রামপঞ্চায়েতে গ্রামবৃদ্ধদের এ-সব কথার জবাব দিতে হয়েছিল বইকি। এতকাল কেউ ভাবে নি গ্রামের মেয়ে হন্ বা না হন্, পাতানী পিসী মেয়েমানুষ হয়ে এমন সাহস পাবেন যে প্রশ্ন তোলেন, বর্গীরা ত' আজই আসে নি, তবে সে সংবাদ এ গ্রামে আগে আসে নি কেন?

পাতানী পিসীর প্রশ্ন শুনে সবাই বিচলিত হন। বর্গী আসুক, বর্গী যাক, এর চেয়েও বড় অনর্থ ঘটে যাক, যদি রাঢ়দেশটাই তুলে নিয়ে সাগরে ফেলে দেয় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তবু সমাজের দেওয়াল ভাঙতে পারে না। যা নিয়ম, তাই চলবে। স্ত্রীলোকের এতবড় স্পর্ধা কেউ দেখে নি কখনো, পুরুষদের পৌরুষ সম্পর্কে সংশয়। তা ছাড়া পাতানী পিসী নিজের ভাইকে বলেছিলেন, 'তোরা মানুষ ন'স, এর চে' হাড়ি-বাগদীদের মানুষ বলি, তারা ঘরের বউ-ঝির ধর্ম রাখলে তবু।'

এ প্রশ্নের সঙ্গে অন্তরের বেদনা জড়িত ছিল। অভাবিত বিপর্যয়ের আঘাতে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তবু যা হবার তা হয়ে গেছে, তাকে আর ফেরান যাবে না, তাই পাতানী পিসীকে সবাই মিলে থামিয়ে দিলে।

কত বর্গী এসেছিল? কেউ বললে ষাট হাজার, কেউ বললে আশী হাজার, রামাই আগে দেখেছিল, সে বলল, 'মাথায় মাথায় সমুদ্দুর।' রামাই যখন শিশু, তখন স্বরকণ্ঠের পিসী এবং অন্যদের সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র গিয়েছিল, সমুদ্র দেখে এসেছে।

পরে সবাই বললে চল্লিশ হাজার। রামাই বললে, 'আমরা দেখলাম অগণন, গোণা যায় না।'

সংবাদবাহক বললে, 'না, অগণন নয়। বিষ্ণুপুরে স্বয়ং মদনমোহন কামান দেগে চল্লিশ হাজার বর্গীকে অন্য পথে পাঠিয়েছেন।' সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, তবে চল্লিশ হাজারই হবে।

বেয়াড়া ছেলে কাশীশ্বর বললে, 'কেন, চল্লিশ হাজার হবে কেন? মুর্শিদাবাদের খবর যখন পনেরো থেকে বিশ হাজার, তখন তাই হবে।'

'তারা সব জানে।'

কাশীশ্বর নাছোড়বান্দা। 'তারা সব জানুক না জানুক, ফৌজে সেপাই কত, ঘোড়া কত, এসব গণতি করে তাদের অভ্যেস আছে। তাছাড়া, মিছে বলবেই বা কেন? বিশ হাজার বর্গী এসে নবাবকে জব্দ করে রেখে গেল এটা ত' কোন গৌরব নয়। বরং চল্লিশ হাজার এসেছিল, তাই আমরা পারি নি, একথা কইলে তবু মান থাকে। আমার মনে হয়, নিন্দে অপযশ হবে

তা জেনেও যখন তারা সমাচার জানাচ্ছে বিশ হাজার, তখন বিশ হাজারই হবে।'

আঁধারমাণিক গ্রামের লোকরা অনেকদিন থেকেই বিশেষ ভাবতে চায় না। চিন্তা করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করবার পরিশ্রমে তারা বিমুখ। তার চেয়ে যা শুনলাম তাই বিশ্বাস করে নেওয়াতে আরাম আছে। শোনা কথা শোনায় যে, সে লোকটি যদি বেশ খ্যাতিমান নামী হয় তাহলে ত' কথাই নেই। অমুকে যখন বলেছে তখন সেকথা মিথ্যে হতে পারে না।

কাশীশ্বরের কথা শুনে তাই আচার্য-বাড়ির বড়কর্তা বললেন, 'এ বড়ই জ্যেঠা হয়েছে দেখতে পাই। তা হবে না কেন, আনন্দীরামের বাড়িতে ঘন ঘন গতায়াত। ও বাড়ি থেকেই গ্রামে উল্টো বাতাস বয়। সংবাদ এনেছে যে সে লোক নয়, আমাদের রামগতি। তার চেয়ে ও কি বেশি জানে?'

কাশীশ্বরের বাবা সদাই সন্ত্রস্ত থাকেন, ছেলের দোষঘাট ঢেকে চলেন। সরোষে বললেন, 'তার চেয়ে তুই বেশি জানিস?'.

কাশীশ্বর চোখ নামিয়ে রাখলে। রামগতি জাতে সদ্‌গোপ, তিনশো বিঘা জমি তার, অনেক হাল-বলদ খাটে, এবেলা ওবেলায় তার ঘরে আশীটি লোক পাতা পাড়ে। সে জাতে বড়, কিন্তু তার বাবার পরণে মলিন যজমানী ধুতি; তাদের সংসার এখন বলতে গেলে, কায়স্থ ও সদগোপদের সিধা-নির্ভর। কাজেই তার কথার দাম হবে না এখানে।

তাই ঐ কথাই গ্রাম হতে গ্রামে ফিরতে লাগল। চল্লিশ হাজার বর্গীকে স্বয়ং মদনমোহন তাড়িয়েছেন, বিষ্ণুপুর রক্ষা পেয়েছে দৈবকৃপায়। তাই চল্লিশ হাজার বর্গীই এসেছিল। যে শুনল, সেই ভারী নিশ্চিন্ত হল। তাই বল, চল্লিশ হাজার। তাদের সঙ্গে কি আমরা পারি?

কে পারবে? এগারো শ' ছনপঞ্চাশে আঁধারমাণিক গ্রামে যে বর্গীরা এল তাদের মুখে 'হর হর' মানে শিবের নাম নয়। হর হর মানে হরণ কর, লুঠ কর। কিঞ্চিদধিক একশো বছর আগে এ জাতের স্রষ্টা কি ধর্মরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন? উত্তর-পুরুষকে দেখে তা মনে করা কঠিন।

বর্গীরা যেতেই অবিশ্যি বাগদী-বুড়ী পাতা কুড়োবার গান বাঁধলে, 'এত দেশ থাকতে বর্গী রাঢ়ে আইল্যে কেনে?' বাগদীবুড়ী গেরস্তপাড়ায় ওষুধ-বিষুধ দিতে যায়, এ দেশকে যে রাঢ় বলে তা সে কথায়বার্তায় জেনে নিয়েছে।

রাঢ়ে আইল্যে কেনে বললেই ত' হয় না। এ গ্রামের মানুষ দিনগত পাপক্ষয়ে বিশ্বাসী, উচ্চাশা তাদের ধাতে নেই, স্বল্পে তুষ্ট থেকে ঈশ্বরের আরাধনা করবার দৃষ্টান্তকে তারা চিরদিন শ্রেষ্ঠপন্থা বলে মেনেছে। উচ্চাশা মানুষকে লোভী করে, স্বধর্মচ্যুত করে, একথা বিব তুলোট কাগজের হাতে লেখা পুঁথি থেকে একজন পড়েছে, দশজন শুনেছে। লোভী হয়ো না তাতে শনি অর্শায় বলে বহু রাজারাজড়া, ঋষি-গৃহস্থের বহু উপাখ্যান শৈশবে শুনেছে পিতামহী, মাতামহী, বুড়ী দাসী, বৃদ্ধ গুরুজনের কোলের কাছে বসে, যেখানে তাদের প্রথম পাঠশালা।

তাই তাদের জানবার কথা নয়, বর্গীদের বাংলায় আনলে একটি মানুষের লোভ। নাগপুর ও বেরারের অধিপতি সেনাসাহেব সুবা রঘুজী ভোঁসলে। প্রথম বাজীরাও নেই। নৃপতি শাহুর ডান হাত চলে গেছে। প্রভাব, প্রতিপত্তি, বাংলার চৌথ চাই।

ধুনোয় বাতাস দিলেন দাক্ষিণাত্যে নিজাম আসফ জাঁ। সরফরাজের আত্মীয়স্বজনের ভার বহন করতে করতে তিনি বিরক্ত, ওদিকে মারাঠাদের চৌথ জোগাতে জোগাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তিনি শুষ্ক হেসে জানালেন, আমার আর কি সাধ্য, তবে রঘুজী ভোঁসলেকে একথা স্মরণ রাখতে বলি যে, হিন্দুস্থানের কোষাগার হচ্ছে বাংলার ধান এবং রেশম। দাক্ষিণাত্যে ঔরঙ্গজেবকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মুর্শিদকুলী খাঁর প্রেরিত খাজনা। দিল্লীর মহম্মদ শাহকে আলিবর্দী সেই একই ওষুধে টিকিয়ে রেখেছেন।

উচ্চাশা কুপরামর্শের বাতাস পেয়ে গনগনিয়ে জ্বলতে লাগল। রঘুজীর আদেশ পেয়ে 'ভাস্কর চলিল ধাইয়া সন্য সঙ্গে করিয়া সাজন।' সঙ্গের সৈন্য সবাই বর্গী। এরা সব রাজার বেতনভোগী সৈন্য। সমাজের আগাছা নিয়ে গঠিত। চালাবার মত একটি ঘোড়া এবং ঘোরাবার মত একটি তলোয়ার থাকলে মাইনে-টাইনের জন্যে পরোয়া করে না। এদিকে নিদারুণ কষ্টসহিষ্ণু। শিবাজীর শিক্ষার ধার ক্ষইতে ক্ষইতে ঐটুকু এখনো রয়ে গেছে। একমুঠো ছোলা চিবোতে চিবোতে যুদ্ধে যেতে পারে।

নেতৃত্বে ভাস্কর, তারপর তেইশজন সর্দার। তাদের তাঁবে বিশ হাজার সওয়ার। যাত্রার আগে জ্যোতিষী দিনক্ষণ দেখে দিলে, মন্দিরে মন্দিরে পূজো পড়ল। মারাঠা সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাঁবু, রসদ, ভোগবিলাসের আয়োজন উপকরণ চলে না। ভারাক্রান্ত হয়ে ব্যাহত হয় না অগ্রগতি। যথা গমন তথা আশ্রয়, যা পায় তাই খায়, উপবাসে আপত্তি নেই।

তারপর উড়িষ্যার আকাশ অন্ধকার হল। বিনা চেষ্টায় কটক জয় করে বাংলার আকাশে সংবর্তক মেঘের মত দক্ষিণ-পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিলে বর্গী। দুরন্ত তাদের অগ্রগতি। উড়িষ্যার শেখমাসুম খাঁ পরাজিত, দুর্লভরাম বন্দী। বিজয় সাফল্যের স্বাদ পেয়ে বর্গীরা এগোতে লাগল, শুধুই এগোতে লাগল।

এদিকে মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, রাঢ়বঙ্গে তখন গাজনের উৎসব, মাঠের রবিশস্য গোলায় তুলে মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে এর পরের ফসল বোনার দিনের জন্যে, তাছাড়া চড়ক-পূজার পরই শুভ নববর্ষ সমাগত প্রায়।

গ্রামে গ্রামে ঘরামিরা আটচালার চালা বাঁধে, বৃদ্ধ ঘরামি নীচ থেকে কাঁপা গলায় নির্দেশ দেয় খড়ের আঁটির সজ্জা কেমন হবে। সূত্রধর মন্দিরের দরজায় নতুন কারুকাজ করে, রাজ-কুমোর গড়ে দশভুজা মহামায়ার মূর্তি খোদিত মাটির ইট।

গ্রামবৃদ্ধারা ছোট ছোট কুমারী মেয়েকে শেখান নিমেষে শিব গড়ে পূজা করবার কৌশল, ব্রতাদির নিয়ম। পুকুর পাড়ে দ্বিপ্রহরে মৃদু গলায় পুরাঙ্গনারা আলোচনা করেন শুভ বৈশাখ-মাসে অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থ করবার প্রস্তাব। 'আগো মেয়েছেল্যের দশহাতে কাছা মিল্যে না, আমাদের কথা কেউ নেয় না' কেউ সনিশ্বাসে জানান। আবার এমন সময়ে, চৈত্রমাসের অমাবস্যার রাতে শ্মশানে ঘুরে ঘুরে নেকড়া, কানি, স্ত্রীলোকের কড়ে আঙুলের হাড় সংগ্রহ করে রাখে হাড়িনী বাগদিনী বৃদ্ধারা। বৎসর ভোর তুকতাকের সামগ্রী, 'আমাদের কষ্ট কেও চক্ষে দেখ্যে না গ।' আক্ষেপ করে বলে, যদিও গুণমন্ত্র জানে ব'লে গ্রামের প্রায় সকল মানুষ তাদের পায়ের নখে সম্বৎসর যেন বাঁধা থাকে, অনুগত, তবু তারা গৌরব করে না কেন না 'গুণীন গুণ হারায়, যখন নিজের গৌরব নিজে গায়।'

এমন চৈত্রমাসে সতী আম্রশাখা হাতে পতির সঙ্গে যায়, আঁতুড়ের দোরে গুণীন বন্ধন দিয়ে যায়, বর্ষার কথা মনে করে জেলেরা জাল বাঁধে, পুণ্যলোভী গৃহস্বামী প্রজাদের তাগিদ দিয়ে পুকুর খনন করায় রাঢ়ের রৌদ্রে, প্রখর তাপে, যে পুকুর বৈশাখে প্রতিষ্ঠা হবে।

এমন চৈত্রমাসে এই সব ছবি আঁধার করে বর্গী এল। কাড়া নাকাড়া ডঙ্কা নিশান বাজল না। সহস্র সহস্র কণ্ঠে 'হর হর' প্রমত্ত উল্লাস আকাশ-বাতাস ভরে ফেলল।

আঁধারমাণিক গ্রামে সকাল হ'ল।

শ্মশানতলার মাঠ প্রশস্ত জায়গা পেয়ে সেখানে বর্গীরা রাতটুকু অপেক্ষা করে। বাগদীরা তাদের সৈন্য কত দেখতে পায় নি। দেখলে আক্রমণ করত কিনা সন্দেহ। রামাই-এর ধারণা ছিল গ্রামে ডাকাত পড়েছে। কোতোয়ালী সড়কের সন্নিকটে গ্রাম। দস্যুদল মাঝে মাঝেই হানা দেয়। গ্রাম চালায় গ্রামপঞ্চায়েত। রাজা অথবা নবাব, বিনিই মালিক হন না কেন, তাঁর শাসন এতদূর শক্তপোক্ত নয় যে, গ্রামের দস্যুভীতি দূর করেন।

তাই ডাকাত পড়লে কি করতে হবে না হবে তা এ গ্রামের লোক জানে। এ গ্রামের বাগদীদের সঙ্গে পাঁচইড়া ও নাটাগোলা গ্রামের বাগদীদের তিন-পুরুষের বিবাদ। রামাইরা বলে, ও দু'গ্রামের বাগদীরাই নাকি ডাকাত। ডাকাতি করে।

ওরা বলে, 'আঁধারমাণিক দিয়ে রেতেভিতে যেছিস যখন, ভোরের সূয্যি আর দেখতে আশা রাখিস নি। বেটারা জবর ডাকাত।'

বর্গীদের আক্রমণ করবার সময়ে রামাই বোঝে নি কাদের সঙ্গে লড়ছি। যখন বুঝল তখনি পালাল, কেন না বুঝে দেখল লড়াই মানে এই নয় যে, বোকার মত প্রাণটা কোন গত্তিকে দিয়ে এলাম।

বাগদীপাড়া আগে। শ্মশানতলার সবচে' কাছে। বড় পুকুরের পাশে ধর্মঠাকুরের থান এবং এখানে প্রয়োজনানুরূপ দূরত্ব রেখে হাড়ি, বাগদী, মুচি, কেওড়া, কৈবর্তরা বাস করে। প্রায় দু'তিন পাড়া অন্তর এক একটি পুকুর। অন্ত্যজ-পাড়ার মানুষ ছিল না। সকলেই রাতারাতি জঙ্গলে পালিয়েছিল। শুধু অতি বৃদ্ধ অতি বৃদ্ধা যারা, সেইসব নরনারী ঘরে শুয়ে শুয়ে অগণিত ঘোড়ার ধাবমান পা দেখল, বর্গীদের গর্জন শুনল এবং সভয়ে ভাবলে একদিন এও দেখতে হবে সেই জন্যেই বোধহয় ধর্মঠাকুর বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের। কি দেখা দেখলাম, এত মানুষ পৃথিবীতে আছে? এই এত এত ঘোড়া!

বাগদী-কৈবর্তপাড়া শুধু পথ হিসেবে ব্যবহার করলে বর্গীরা। কিন্তু বামুন কায়েত বৈদ্য গন্ধবণিক সুবর্ণ-বণিক পল্লী অত সহজে ছাড়া পাবার নয়। এ গাঁয়ের কোন্ ব্রাহ্মণ পরিবারই বা কুলবৃত্তি পৌরোহিত্য করেন? প্রায় সকলেই চাষবাস ক্ষেত-গেরস্তীতে আছেন। কায়স্থপল্লীর অবস্থাও তাই। যদিও কেষ্টনগর, বড়নগর এবং বর্ধমান মুর্শিদাবাদে অনেকে চাকরী করেন।

সকালে সূর্যোদয়ে প্রলয়ের সূচনা। ইট-বাঁধানো প্রাচীন ও শীতলস্পর্শ রাস্তা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল ঘোড়ার খুরের আঘাতে। পালাবার পথ নেই, গ্রাম তিনদিকে বেষ্টিত। আচার্যবাড়ি গ্রামের মধ্যে উন্নত, তার মত উঁচু বাড়ি নেই। পাতানী পিসীর তিন ভাই-এর শতবিঘা

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যুক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো.

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

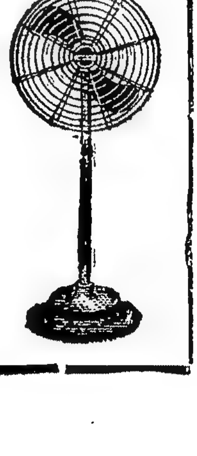

জমিজমি, গৃহদেবতা নিত্য রুপোর আসনে ভোগ-নৈবেদ্য পান।

দরজা ভেঙে বর্গীদল অনায়াসে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। 'রুপি দেহ রুপি দেহ', বড় আচার্য তাদের কথা বোঝেন না, উপবীত ধরে বোঝান আমি ব্রাহ্মণ, মিনতি করেন।

তারা তাঁর কথা বোঝে না। দুর্গোৎসব কালীপূজায় হাড়িকাঠ যেখানে বাঁধানো চত্বরে প্রোথিত সেখানে তাঁকে পিছমোড়া করে বাঁধলে, বলির রক্ত এবং জল নিষ্কাশনের নালার কাদায় মুখ গুঁজড়ে ধরলে।

কাঁপতে কাঁপতে তিনি চাবি বের করে দেন কোমর থেকে, চাবি হাতে অন্দরে যান। কিন্তু তিনি সিন্দুক খুললেন না, ঠাকুরঘরে সতী প্রপিতামহীর পায়ের আলতাছাপ দেওয়া বস্ত্রখণ্ড এবং গুরুদেবের ব্যবহৃত পাদুকা, পিতলের সিংহাসনে অষ্টধাতুর অষ্টভুজা, রুপোর গোপাল, ওপরে টাঙানো চাঁদোয়া, পূজাপার্বণে ধান নেবার জন্য তাঁর স্বহস্তে বেঁধে রাখা ধানের গোছা দেখে যেন এক পলকে বোঝেন এ সবই বিপন্ন, কেন না তাঁর চেনা পৃথিবীর বুঝি শেষ দিন উপস্থিত। কি হয়েছে, কারা এল, কেন তাঁরই স্বগৃহে তাঁর এই লাঞ্ছনা কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না তিনি। বোধশক্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

অন্তিম সময় বুঝি! কিন্তু এখনো যে কত কাজ বাকী, তিন স্ত্রী, পুত্রকন্যা, আশ্রিত স্বজন, আত্মীয়-পরিজন, ভাই-বোন, দাসদাসী, সবার ওপর কর্তব্য কি করেছেন? তিনি ত' কর্তা।

'হা ঠাকুর, এ কি করলে!' বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুরঘরের দুয়ারে আছাড় খেয়ে পড়লেন। পুরাঙ্গনারা হাহাকার করে কেঁদে উঠলেন। আর তখন, সেই ছোট অপরিসর দালান, সংকীর্ণ কোঠা, সরু সিঁড়ি, অন্তঃপুরের আবছা আঁধার, সব ভরে ফেলল বর্গীরা। সব জুড়ে তারা যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠে এল। মেয়েদের হাতের সোনার গহনা তারা দেখেছিল। সর্বত্র তারা সোনা দেখছিল। গৃহবিগ্রহের পেতলের সিংহাসনে, অন্দরে চৌকির নীচে, পানের সরঞ্জামের পেতলের থালায়, পূজোর ঘরের বাসনে। ওদিকে গোয়ালে আর্ত হাম্বারব, গোয়ালের চালে ও খড়ের পোয়ালে প্রধূমিত আগুন।

পাতানী পিসী নীচে চোর-কুঠুরীতে বসে গুরুমন্ত্র জপছিলেন। তাঁর বুকের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে বড় আচার্যের মেয়ে, তাঁর ভাইঝি। তার পেট কোঁচড়ে মায়েদের গহনা, চোখ নিমীলিত, ভয়ে ফোঁপাচ্ছে। আরো ক'টি বালক-বালিকা, মেজ আচার্য, ছোট আচার্যের ছেলেমেয়ে, সব ক'টিকে আনতে পারেন নি, 'যে ক'টি থাকে থাক, মা অষ্টভুজা আমার ভায়ের বংশ রেখ' এই বলে ওদের আগলে বসে আছেন।

এত বিপদেও চোখে পড়ল খুড়ীমার দৌহিত্র, দৌহিত্রী। অন্য সময় হলে ওদের আমল দিতেন না। মেয়ের ঘরের ছেলেপুলেকে প্রশ্রয় দেওয়া কেন, ছেলের ঘরের ছেলে কি এ বাড়িতে কম আছে ব'লে ঝগড়া-কেজে করতেন।

এখন কিছু মনে হল না। নীচু গলায় তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, 'কাঁদিস নে, যার গলা শোনা যাবে তারে আমি নিজহাতে বড় পুকুরে গলায় শিল বেঁধে জলসৈ করব।'

দেখলেন ভাইঝির দাঁতে দাঁত লেগেছে, শরীর নিস্পন্দ। বিপদ গণলেন। আজ এমন বিপদে তাঁকে পার করে কে? ভাইঝিটি এ গ্রামেরই বউ, শ্বশুরঘর বাপের বাড়ি দুইই যায় আসে। মনে পড়ল এই ভাইঝির মার মৃগী ব্যারাম ছিল। এ মেয়ে মূর্ছা গেল, কেমন করে একে সুস্থ করি? পাতানী পিসী মনে মনে বিপদহারী মধুসূদনকে ডাকতে লাগলেন। ওপরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তখনো জানেন না।

তাঁর দরজা ভেঙেও বর্গী ঢুকল। বন্যার মত ঢুকল, সকলকে ফেলে ভাইঝিটিকে তুলে নিয়ে গেল। 'হারে তোদের ব্যগ্রতা করি' বলে পাতানী পিসী ছুটে গেলেন, কিন্তু ওরা তাঁর বুকে তলোয়ারের বাঁট দিয়ে গুঁতো মারলে। (ক্রমশঃ)

বাবুইয়ের বাসা

শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

বাবুইয়ের বাসা মাথায় নিয়ে
একটি মেয়ে পথে নামলো
সমস্ত দিন ঘুরে
একটি বাবুইও না ধরতে পেরে ফিরলো
—তখন রাত্রি
ভুল এলো ক'রে
চোখের মায়াকাজল মুছে
বালিশে মুখ গুঁজে শুলো
সকালে কলের জলের
ছল ছল শব্দে
তার গা চমকে উঠলো
তখন পাশের বাড়ির চক্রবর্তী
অফিসে বেরুচ্ছে।

তিন গল্পের খসড়া

শান্তনু দাস

একটি তারা দু'টি তারা তিনটি তারার আলো
চুমকি দেয়া জরির কাপড়, এ কোন দ্বিচারিণী
সংগোপনে প্রেমের আলাপ? রাতটা এখন কত
সম্মুখে খাদ, পিছনেতে তাকায়ো না আর

এক প্রেমিকা, দুই প্রেমিকা, তিন প্রেমিকার ভো
তিন তন্বীর প্রতিবিম্ব, স্বচ্ছ লেকের জল
আকাশ এত কালো এমনবিমর্ষ ওই চাঁদ
এই সময়ে পায়ে পায়ে চার প্রেমিকা এলে
উন্মাদিনী হেসে ওঠে তিনটি সুরের তালে।

একটি হৃদয়, দু'টি হৃদয় তিনটি হৃদয় মিলে
আকাশ প্রমাণ স্বপ্ন নিয়ে পাখনা মেলে দেয়
সারাটি পথ ভেসে ভেসে অবশেষে আর
স্বপ্ন নিয়ে ছিটকে পড়ে নির্মম ফুটপাতে!

অপর্ণা লাহিড়ীকে জেরা করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন রামদুলাল দত্ত। ঘরে বরুণেন্দ্র বসাক আর কমলেশ বসু ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। জীবনের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যে মানুষ কয়েক ঘণ্টা আগে বিষ খেতে চলেছিলো, এত স্থৈর্য, সংযম আর মনের জোর তার এলো কোথা থেকে? কমলেশ বসু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিল—অপর্ণার চোখে-মুখে কোথাও বিভ্রান্তির ছাপ নেই। রুক্ষ পারিপাট্যহীন প্রসাধনমুক্ত তার মুখের রেখায় এক অদ্ভুত গাম্ভীর্যের ছাপ।

'আপনি সমরেশ সরকারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন—'

'হ্যাঁ।'

'কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছিল কি?'

'সব কথাই বোধহয় খুলে বলতে হবে আমাকে। কোন কিছুই প্রাইভেট রাখা চলবে না?'—পাল্টা প্রশ্ন করলো অপর্ণা। তারপর বেশ সহজভাবেই বলল—'সমরেশকে আমি একটি প্রস্তাব জানাতে গিয়েছিলাম। ওকে বলেছিলাম—আমাকে বিয়ে কর।'

'সমরেশবাবু রাজী হয়েছিলেন?'

'না। ও আমাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে।'

'তাতে আপনার মনে কি রি-একশন হয়েছিল?'

'যা হওয়া এক্ষেত্রে স্বাভাবিক।'—অপর্ণার চোখে যেন আগুন ঝল্‌সে উঠল—'মাথায় খুন চেপে গেল—বলতে পারেন।'

'সে মুহূর্তে আপনার হাতের কাছে বিষ ছিল?'—রামদুলাল দত্ত বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলেন।

'ছিল। ব্যাগ খুলে শিশিটা নাড়াচাড়াও করছিলাম। জানতাম সমরেশের জলের গ্লাসে যদি মিশিয়ে দিই, তাহলে কোন না কোন সময়ে ও সেই জল খাবেই।'

'কখন আপনি শিশিটা বার করলেন?'

'যখন সমরেশ ঘর ছেড়ে বারান্দায় গেল।'

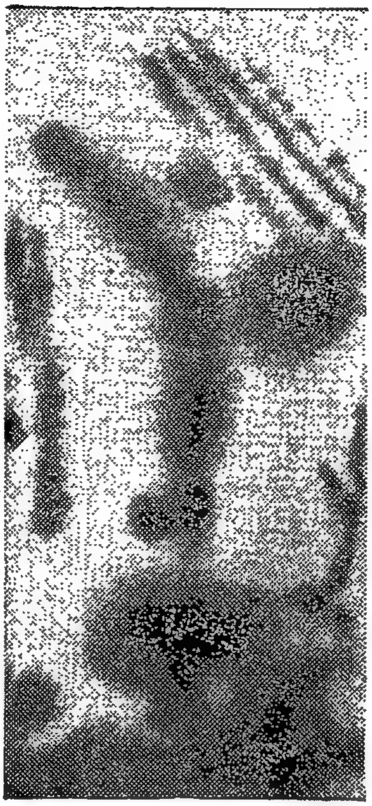

কুহেলী বিলীন

বিশু বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'সেই গ্লাসটা কেমন দেখতে মনে আছে?'

'নিশ্চয়'—অপর্ণা বিনা দ্বিধায় বলল—'সাধারণ গ্লাসের যে সাইজ তার চেয়ে একটু বড়। সাদা কাচের উপর সরু সোনালি কতকগুলো পাতার নক্সা। সোজা ধরণের নয়, মাঝখানে একটু চাপা, ওপরটা আর তলাটা গোল মত। লেসের ঢাকনির রঙ গোলাপী, আর তার চারদিকে রঙ-বেরঙের পুঁতি ঝোলানো। মাধবীর ঐ গোলাপী রঙের উপর একটু দুর্বলতা ছিল, আমরা দুজনে নিউ মার্কেট থেকে এ লেসের সেটটা কয়েকদিন আগেই কিনেছিলাম।'

'আচ্ছা, কাছাকাছি আর একটা সবুজ রঙের অন্য কোন গ্লাস কি আপনার চোখে পড়েছিল।'

'নিশ্চয়। রামবিলাসকে না পেয়ে সমরেশ নিজেই আমার জন্য রেফ্রিজারেটার থেকে এক বোতল অরেঞ্জ একটা সবুজ গ্লাসে ঢেলে নিয়ে আসে। আমার খুব তেষ্টা পাচ্ছিল। এক নিশ্বাসে সবটুকু খেয়ে আমি গ্লাসটা পাশের ঘরে জানলার তাকের উপর রেখে এসেছিলাম।'

'ঠিক আছে।'—রামদুলাল দত্তের চোখে-মুখে তৃপ্তির আভাস ফুটে উঠল—'অন্য গ্লাসটার এক্সপ্লানেশন পাওয়া গেল—কি বলেন ডাক্তার বসাক। আচ্ছা মিসেস লাহিড়ী, আপনি তারপর কি করলেন?—সমরেশবাবু ঘর ছেড়ে বারান্দায় যাওয়ার পরে।'

'বসে রইলাম খানিকক্ষণ। বিষটা গ্লাসে ঢেলে দিতে আমার কোন অসুবিধা ছিল না। লেসের ঢাকাটাও আলগা করে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু—না, বিষ আমি মেশাই নি'—হঠাৎ খাপখোলা তরোয়ালের মত সোজা হয়ে উঠে বসল অপর্ণা—'নানা কথার প্যাঁচে আমাকে দোষ স্বীকার করিয়ে নিতে চাইছেন বুঝতে পারছি—কিন্তু বিষ আমি সমরেশকে দিতে পারি নি।'

'কেন?'—গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করলেন রামদুলাল দত্ত।

এবারে প্রথম উত্তর দিতে গিয়ে হোঁচট খেল অপর্ণা। কিন্তু সে খুব সামান্য সময়ের জন্য। তারপরেই মুখ তুলে শান্তভাবে বলল—'মনকে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করাই যাদের কাজ, কোন ডেলিকেসি তাদের থাকতে পারে না। হ্যাঁ—আমি স্বীকার করছি সমরেশকে আমি বিষ দিতে চেয়েছিলাম—ওর মৃত্যু কামনা প্রাণপণে করছিলাম সেই মুহূর্তে। অপমান সহ্য করার মত দুর্বলতা আমার চরিত্রে নেই। কিন্তু নিজেকে যত শক্ত ধাতুতে তৈরি মনে করতাম,

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা নেহাৎই কল্পনা। সাধারণ মেয়ের মতই আমি দুর্বল, আমার এতটুকুও মনের জোর নেই। কাজেই আমারই বিষ খেয়ে মরা ভালো, এই কথা ভেবে আমি পাগলের মত নীচে নামছিলাম। কোনদিকেই আমার খেয়াল ছিল না। এমন কি পর্দার ওপাশে একজনের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল; এখন মনে পড়ছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইবার কথাও খেয়াল হয় নি।'

'আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কি?'

'প্রমাণ!'—অপর্ণা ভুরু কুঁচকে তাকালো।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রমাণ না দিতে পারলে তো মুখের কথা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে শক্ত।'—রামদুলাল দত্ত বাঘের মতো অসহায় শিকারের দিকে বিজয়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

'সমরেশকেও আমি চলে আসার সময়ে বলেছিলাম—তোমাকে বিষ দিতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার মত কাপুরুষের বেঁচে থাকাই অন্যায়। সমরেশ তখন অন্যমনস্ক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। মনে হোল আমার কথাটা ওর কানেই যায় নি। তবে কি ও শুনতে পেয়ে বিশ্বাস করেছিল যে আমিই গ্লাসে বিষ মিশিয়েছি।'

'না, না, সমরেশবাবু আমাদের কোন কথা বলেন নি'—বরুণেন্দ্র এতক্ষণ বাদে সহানুভূতির সুরে বললেন—'নানা রকম মেণ্টাল শকের ফলে উনি কিরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। নার্ভাস ব্রেকডাউনের আর দেরি নেই। আপনি নির্ভয়ে সব কথা আমাদের বলুন।'

বরুণেন্দ্র বসাকের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে অপর্ণা হাতের কাছে রাখা জলের গ্লাস মুখের কাছে তুলে গলাটা অল্প ভিজিয়ে নিলো।

'মিসেস লাহিড়ী, আপনি বিষ মেশাতে চেয়েছিলেন, সে কথা অস্বীকার করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত হয়তো আপনি কি করেছেন, নিজেই জানেন না। হয়তো না ভেবেই সেই শিশিটা খালি করে ঢেলে দিয়েছিলেন গ্লাসের মধ্যে। তারপর সে কথা আর খেয়াল পর্যন্ত করেন নি। আমি বলছি না আপনি কোল্ড ক্যালকুলেটিং পন্থায় খুন করেছেন। মানুষ রিপুর বশ। হঠাৎ যে কোন রিপুর অনুভূতি যখন আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন কাণ্ডজ্ঞান-হীন হয়ে কখন কি যে করে বসি, তার খেয়াল পর্যন্ত পরে থাকে না। খুব ভালো করে চিন্তা করে দেখুন দেখি, হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে শিশিটা বার করে একা ঘরে আপনি কি করলেন?'

'শিশিটা এখনও কমলেশবাবুর জিম্মায় আছে। আর সেটা যে খালি নয়, সে কথাও আপনাদের অজানা নয়।'—অপর্ণা কমলেশ বসুর দিকে ফিরে তাকালো।

'কিন্তু শিশি যে একটাই ছিলো, তার প্রমাণ তো আমরা পাই নি। সমরেশ সরকারকে বিষ দিয়ে তারপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে আপনি নিজেও নিজের জীবনে যবনিকাপাত করতে যে চান নি —তাই বা বলি কি করে। এই তো ক'দিন আগে বেলেঘাটার বস্তির একটা লোক বউকে সন্দেহ করে একটা ভারি ইট দিয়ে মাথাটা একেবারে ছাতু করে ফেলল। তার পরে বস্তি থেকে বেশ কিছুদূরে আমগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে একটা লাশ ঝুলছে দেখে পুলিশে খবর দেয় সকলে। সনাক্তকরণের সময় দেখা গেল সেই লোকটাই, আগে বউকে মেরে পরে নিজে আত্মহত্যা করেছে। আপনি হয়তো ভাবছেন, এই গল্প বলার এখন কি প্রয়োজন। আমি আসলে মানুষের মনস্তত্ত্ব আপনাকে বোঝাতে চাইছি। শিক্ষা, পরিবেশ, সমাজের প্রভাবের ফলে ধরণ-ধারণ আলাদা হলেও আসলে সব মানুষই এক।'

'শিশি একটাই ছিলো।'—অপর্ণার চোখে আবার বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল—'আপনি খবর নিয়ে দেখতে পারেন। যার কাছ থেকে জোগাড় করেছিলাম, তার নাম ঠিকানা আপনাকে লিখে দিচ্ছি।'

রামদুলাল দত্ত অপর্ণার কথায় যে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলেন না, সে তার মুখের ভাব দেখেই বোঝা গেল। অথচ অপর্ণা তার কথার এতটুকু নড়চড় করছে না। আগেও যা বলেছে এখনও তাই বলছে। বিষ সে দেয় নি। দিতে পারে নি। আর বিষ তার কাছে কেবল একটি শিশিতেই ছিলো। অন্য আর কোন জায়গা থেকে সে যে আরও বিষ সংগ্রহ করেছে, তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। এখন চালান করে দিলেও আদালতে এই কেস টিকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বরং সমরেশ সরকারের এই দুটি খুনই পরপর করা সম্ভব। তার মোটিভও আছে, সুযোগও আছে; উপরন্তু সে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ নয়। বিকৃত মানসিক অবস্থা হলে মানুষ এরকম নৃশংস কাজ অনায়াসে করতে পারে। তারপর এলোমেলো কথা বলে অভিনয় করার সুবিধে তো তার আছেই। বিব্রত হয়ে রামদুলাল দত্ত কলমের খাপ দাঁত দিয়ে চেপে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

'এবারে আমি আপনাকে যদি কয়েকটি প্রশ্ন করি, আশা করি আপনার তাতে আপত্তি হবে না মিসেস লাহিড়ী'—বরুণেন্দ্র বসাক চেয়ারটা টেনে এগিয়ে বসলেন।

'আমার আর আপত্তি করার কি আছে'—অপর্ণা মনের ভাব গোপন করে বলল।

'একটু ভেবে বলুন তো, সমরেশ সরকার ঠিক কি মুডে সেদিন ছিলেন?'

'ও খুব অন্যমনস্ক ছিলো, আর আমার মনের ইচ্ছা ওকে জানাতেই আমি যে শেষ পর্যন্ত ডিস্‌ইলিউশন্‌ড হয়ে যাব একথা বার বার বলছিল। মাধবী যেমন হয়েছিল।'

'আপনি তখন খুব উত্তেজিত হয়ে নীচে চলে এলেন। আপনার কা-

সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল তখন কিন্তু বলেন নি। কে তিনি মনে পড়ছে কি ?'

'আমি ভদ্রলোককে ভালো করে চিনি না। তবে সেদিন পার্টিতে দেখেছিলাম। ঐ যে মল্লিক না কি যেন নাম। নামটাও জানতাম না, তবে বারান্দার একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন সমরেশের কাকাবাবু সত্যজিৎ সামন্ত। তিনিই তখন ভদ্রলোকের পরিচয় দিলেন। আমার অবশ্য জানার আগ্রহও ছিল না—তবু ভদ্রতার খাতিরে দাঁড়িয়েছিলাম কয়েক মিনিটের জন্য।'

'কি বললেন—মল্লিক। বসন্ত মল্লিক' —প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রামদুলাল দত্ত। —'সে হতভাগাও জুটেছিল তাহলে। লোকটার দেখছি আশ্চর্য ক্ষমতা, খুন-জখম, চুরি-জোচ্চুরি, চোরাই ব্যবসা—সবখানেই ঠিক হাজিরা দেবে। কই, সমরেশ সরকার তো বসন্ত মল্লিকের শুভাগমনের কথা জানান নি।'

'সমরেশ সরকার তো সত্যজিৎ সামন্তের কথাও বলেন নি। আমার মনে হয় অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে ওঁর সমস্ত কিছুই গোলমাল হয়ে গেছে।'

—বরুণেন্দ্র বসাকের চোখ দুটো হঠাৎ চক্ চক্ করে উঠল—'মিসেস লাহিড়ী, আপনাকে আবার গোড়া থেকে আরও একটু খুলে বলতে হবে। তারপর বসন্ত মল্লিক ও সত্যজিৎ সামন্ত—এদের দুজনকেই ডেকে পাঠানো যাবে।'

এতক্ষণ কমলেশ বসু নীরব দর্শকের মত একপাশে বসেছিল। অপর্ণার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই বলল—'কথা বলে বলে হয়তো উনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কিছুক্ষণ একটু ছুটি দিতে পারেন না।'

রামদুলাল দত্তের চোখে তির্যক ব্যঙ্গের খোঁচা ফুটে উঠছে দেখে কোন অপ্রিয় কটুবাক্য উচ্চারণ করার আগেই বরুণেন্দ্র বসাক বলে উঠলেন—'বেশিক্ষণ ওঁকে আটকে রাখবো না মিঃ বোস। তবে বুঝতেই তো পারছেন—ইট ইজ এ সিরিয়াস চার্জ। আমি ভালোর জন্যেই সব কথা খোলাখুলি আলোচনা করে নিতে চাই। এতে আমাদের মিঃ দত্তর কেস ইনভেস্টিগেট করতে সুবিধা হবে। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসার পরে কি কি হয়েছিল বলুন তো। কোন ছোটখাট ঘটনাও যেন বাদ না পড়ে।'

অপর্ণা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলতে সুরু করল। সমরেশ যখন তার একটি কথারও উত্তর না দিয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় চলে গেল, তখন প্রায় পাগলের মত ছুটে সে নীচে নেমে এসেছিল। সিঁড়িঘর আর হলঘরের

আপনার জন্যেই বিউলাক্স

আপনার সৌন্দর্য্য-সাধনার চাহিদা মেটাতেই প্রসাধনী-বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার 'বিউলাক্স'। ল্যানোলিন ও ক্যালামিনযুক্ত 'বিউলাক্স' বিউটি ক্রীম আপনার দেহত্বকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির যে কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করলে এর অনন্যতায় আপনি মুগ্ধ হবেন। মৃদু সুগন্ধযুক্ত এই ক্রীমটির নিয়মিত ব্যবহারে মুখমণ্ডল ও দেহত্বকের অবাঞ্ছিত দাগ মিলিয়ে যাবে এবং আপনার দেহলাবণ্যে যুক্ত হবে কোমল স্নিগ্ধতা ও শুভ্র মসৃণতা। বিউলাক্সের কোন বিকল্প নেই।

বিউলাক্স

স্নো যদি ব্যবহার করেন তবে 'বিউলাক্স' স্নো-ই ব্যবহার করুন— এটি শ্রেষ্ঠতম উপাদানে তৈরী। এর মৃদু সুগন্ধ তুলনাহীন।

ANKAR

অংকর ইণ্ডাষ্ট্রীজ

মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা, ফোন : বারাসাত-৬০
কলিকাতা কেন্দ্র : ৭-বি, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন, কলিকাতা-১২, ফোন : ২৪-৬০২৮

মাঝে যে দরজা, তারই পুরু রঙচঙে পর্দার আড়ালে বসন্ত মল্লিককে দেখতে পায় নি বলেই ধাক্কা লাগে। ভদ্রলোকের বোধহয় ধাক্কাটা একটু জোরেই লেগেছিল, কেন না তারপর মুখ বাড়িয়ে অপর্ণাকে দেখেও তিনি কাতরোক্তি ছাড়া অন্য আর কোন কথা বলতে পারেন নি।

'আপনিও কি বসন্ত মল্লিককে দেখে কোন কথা না বলেই চলে গেছলেন।'

'আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম —পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কি? আবার কি যেন জড়িয়ে বললেন, কিন্তু আমার সে কথা শোনার মত ধৈর্য ছিল না। চলেই আসছিলাম, তখন সত্যজিৎ সামন্তকে সামনে দেখতে পেলাম। আমার সামনেই উনি ভদ্রলোককে ডেকে বললেন—কি মশাই, পুলিশ এখনও আপনাকে ধরে নি?

'ঠাট্টা করেই বলেছিলেন হয়তো, কিন্তু ভদ্রলোক ভীষণ ভয় পেয়ে বলে উঠলেন—আমি সমরেশবাবুর সঙ্গে সেই সব কথাই বলতে এসেছিলাম। এ বিপদ থেকে উদ্ধার আমাকে পেতেই হবে। ঘরে শান্তিতে টেকা যাচ্ছে না, বাইরে বেরোলে পুলিশের চোখ। অথচ মজা দেখুন, কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, টেরও পেলাম না—আমি এ পর্যন্ত শুনে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, সত্যজিৎবাবু আবার বললেন—এঁকে চেনো ত' অপর্ণা—ইনি হলেন বিখ্যাত বিজনেসম্যান বসন্তবিহারী মল্লিক।

'আমি কোন গতিকে নমস্কার জানালাম। কানে এলো বসন্ত মল্লিক বলছেন—আমি আজকে তাহলে ফিরেই যাই। আপনার সঙ্গে যখন স্পেশাল অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে, আমি বরং পরে আর একদিন আসব।—সত্যজিৎবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—হাতে পনেরো মিনিট সময় আছে। আপনি যা বলার বলে আসতে পারেন। তারপর উনি আমার পিছু পিছু বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডেকে আমার শরীর সম্পর্কে ওঁর দুশ্চিন্তা জানালেন। আমি বললাম—শারীরিক ভালোই আছি, কিন্তু—

'কিন্তু কি?—সত্যজিৎ সামন্ত খুব সহানুভূতির সুরে আমার পিঠে হাত রাখলেন।—জীবনে ঐ একটি জিনিসের আমার বড় অভাব ডাঃ বসাক। চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল বলে সকলে আমাকে দোষ দেয়—কিন্তু তলিয়ে দেখে না। কেন আমি এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। তাই সত্যজিৎ সামন্তের কথায় আমার চোখে জল এলো।

'আমার মন ভেঙে গেছে কাকাবাবু। আমি বলে উঠলাম।—নিজের উপর সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। পারলে সমরেশকে আমি বিষ খাওয়াতাম—মাধবীর মত ছটফট করে ওকেও মরতে হোত; কিন্তু—কিন্তু আমি পারলাম না।

'সত্যজিৎ সামন্ত নিজের গাড়িতে করে আমাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে গেলেন। রাস্তায় অনেক ভালো ভালো কথা বললেন অবশ্য। জীবনে দুঃখ-আঘাত সবই সহ্য করতে হয়, কেবলমাত্র সুখ চাওয়া অন্যায়। আমি বিশেষ শুনছিলাম না, ঐ বিষের শিশি হাতের মুঠোয় ধরে তখন আমি নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবছি।'

অপর্ণা কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েছিলো। কমলেশ বসু এবারে আপত্তি জানানোর আগেই বরুণেন্দ্র বসাক বললেন—'আপনি পাশের ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিন মিসেস লাহিড়ী, এখন আমাদের বাকি কাজগুলো সেরে নিই।'

'আমাকেও যেতে অনুমতি দেবেন কি?'—কমলেশ বসু উঠে দাঁড়াল।

'স্বচ্ছন্দে। মিসেস লাহিড়ী এখন এই মানসিক অবস্থায় বেশিক্ষণ একা থাকেন, তা আমরা চাই না।'

'ব্যাপার কি ডাক্তার বসাক?'—রামদুলাল দত্ত ওদের ঘর থেকে যেতে দেখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'পুলিশ হলেই কি বেরসিক হতে হয়?'—বরুণেন্দ্র বসাক কপট গাম্ভীর্যের ভাণ করলেন—'মেয়েরা যতই আধুনিকা, প্রগতিপন্থী হোক না কেন, এখনও বিপদে পড়লে পুরুষের কাছে নির্ভরশীল হতে তাদের ভালো লাগে। আর আমরাও প্রাগৈতিহাসিক সমগোত্রীয়দের চেয়ে একটুও বদলাই নি। হাতের মাসল ফুলিয়ে তখুনি ছুটি ওদের রক্ষা করার তাগিদে।'

'আপনি এখনও ঠাট্টা করছেন ডাঃ বসাক'—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন রামদুলাল দত্ত—'এই ভদ্রমহিলার জন্য আমার বড় দুঃখ হচ্ছে। বেচারী সত্যিই বড় আনফরচুনেট।'

'যাক। পুলিশের তাহলে হৃদয় আছে'—বরুণেন্দ্র বসাক সহানুভূতির সুরে বললেন।

'এই সব দেখেশুনেই মনে হয় আগেকার যুগই ভালো ছিলো মশাই। বাপ-মা ধরে-বেঁধে বিয়ে দিয়ে দিতো—তারপর সুখে-দুঃখে জীবনটা নির্বিঘ্নেই কেটে যেতো যা হোক করে।'—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রামদুলাল দত্ত কড়িকাঠের দিকে তাকালেন।

'অত উতলা হবেন না মিঃ দত্ত। একটা কথা জেনে রাখুন—অপর্ণা লাহিড়ী আপনার আমার মতই ইনোসেণ্ট, যারা অত বেপরোয়া চরিত্রের মানুষ, রেখে ঢেকে কাজ তারা করে না। তাদের কাছ থেকে আমরা ভিন্ন প্রকৃতির ক্রাইম আশা করি। এই ধরুন, পিস্তল দিয়ে আচমকা গুলী ছুঁড়ে মারা অথবা—সেই আপনার গল্পের লোকটির মত দুম করে থান ইট মেরে স্ত্রীর মাথা ছাতু করে দেওয়া। সেকেণ্ড মার্ডারের পর আমার ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এর পেছনে কারো শয়তানী বুদ্ধি আছে। না, না, কে খুনী, তা এখনও বলতে পারছি না। আরও দু-চারদিন তলিয়ে দেখতে হবে মনে হচ্ছে।'

'আমি বসন্ত মল্লিক, অপর্ণা লাহিড়ী আর সমরেশ সরকার এদের তিনজনকেই অ্যারেস্ট করার কথা ভাবছি।'—রামদুলাল দত্ত হঠাৎ বেশ কঠিন সুরে বলে উঠলেন।

'বসন্ত মল্লিককে বাদ দিন মিঃ দত্ত'—হাসি চেপে নরম গলায় বললেন বরুণেন্দ্র বসাক—'তাহলে ওঁর ওয়াইফ ওঁকে আর আস্ত রাখবেন না।' (ক্রমশঃ)

একটি অদ্ভুত আকর্ষণ

আর্যভট্ট

পুরো একটা বছরকে পরিক্রমা করে ছ'টি ঋতু। আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা বড় কাব্যিক ঋতু। আষাঢ়ের তখন সম্পূর্ণ ঘনঘটা। ঋতুমতী শ্রাবণ-শর্বরী সেদিন রতি-বিহ্বলতায় যেন উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে।

দময়ন্তী ওর জন্মতিথি পালন করছে সেদিন। এর আগে অবশ্য কোনদিন করে নি। এই প্রথম। স্বামী জয়ন্ত মুখার্জী জার্মান-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার। অকস্মাৎ চাকুরীতে পদোন্নতি হয়েছে। আজ এই জন্মতিথি পালনের একমাত্র উদ্দেশ্য হোলো এই পদোন্নতি, অবশ্য জয়ন্তর ইচ্ছানুসারেই এটা হচ্ছে। যাই হোক, নিমন্ত্রিত হয়েছে অনেকেই। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই খাওয়া-দাওয়া সেরে উপহার দিয়ে, দময়ন্তীর দীর্ঘজীবন আর মঙ্গল কামনা ক'রে বিদায় নিয়েছে। বাকি যে ক'জন আছে তাঁরা আর যেতে পারছে না শ্রাবণ-শর্বরীর এই অকারণ উন্মত্ততার জন্যে।

এদের মধ্যে চারজন তন্বী তরুণী। সবাই বিবাহিতা এবং দময়ন্তীর বিশিষ্ট বন্ধু। আর আছে দুজন পুরুষ। তাঁরা জয়ন্তর বন্ধু। এই দুজনের মধ্যে একজন হোলো তরুণ ব্যারিস্টার, নাম মিঃ রায়, আর একজন বিশিষ্ট ডাক্তার, নাম মিঃ চৌধুরী। সবাই গোল হয়ে বসে আছে কাউচে। মাঝখানে শ্বেতপাথরের একটা গোল টেবিল। তার উপর মোরাদাবাদী ফুলদানীতে দাঁড়িয়ে থেকে যেন অপাঙ্গ হেনে সকলের দিকে তাকিয়ে আছে একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধা।

দময়ন্তী আর জয়ন্তও এই বৈঠকের উৎফুল্লতার আস্বাদ গ্রহণ করছে।

এরকম একটা বৈঠকে ত' আর কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। তাই আরম্ভ হোলো আলোচনা। এবং এই আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুই হোলো প্রেম।

আরম্ভ হোলো বিতর্ক। প্রেম সম্বন্ধে সেই সনাতন সেই শাশ্বত বিতর্ক। বিতর্ক কি? বিতর্ক হোলো—কেউ কি জীবনে একবারের বেশি বার বার কাউকে ভালোবাসতে পারে;

অনেকেই এমন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করল, যারা জীবনে শুধু একবারই অন্তত গুরুতরভাবে ভালোবেসেছে শুধু একজনকেই। আবার দু-একজন এমন কথাও বলল, যারা জীবনে বহুবার ভালো-বেসেছে বহুজনাকেই অত্যন্ত প্রচণ্ড-ভাবে। কিন্তু মেয়েরা যাদের মতামত পর্যবেক্ষণ শক্তির উপর নির্ভর না করে শুধু কাব্য-কল্পনার উপরই

নির্ভর করে তারা বলল, এ জগতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সত্যিকারের প্রেম শুধু একবারই সম্ভব। ওরা বলল, প্রেম হোলো পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে একটা গুপ্ত সমবেদনা। একটা রজতশুভ্র সংযোজক। একটা রেশমী বন্ধনী। যে বন্ধনী দুটি আত্মা আর দুটি মনকে একই সূত্রে চিরদিনের জন্য বন্ধন করে রাখে।

মেয়েদের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিস্টার মিঃ রায় বলে উঠল, 'এ আপনাদের ভুল ধারণা। মানুষ যতবার খুশি ততবারই ভালোবাসতে পারে, একের পর এক তার জীবনীশক্তি দিয়ে। যে একবার ভালোবাসার মর্ম বুঝেছে, সে জীবনে বহুবার ভালোবাসবে বহুজনাকে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। প্রেমটা কি জানেন? ওটা আমার মতে একটা মেজাজ---একটা মানসিক এবং তার সঙ্গে খানিকটা ইন্দ্রিয়-দুর্বলতাই আমি বলব।'

মিঃ রায়ের দৃঢ়তাপূর্ণ কথায় সবাই হতভম্ব হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত আর উপায়ান্তর না দেখে সবাই মিলে মিঃ চৌধুরীকে এই বিতর্কের মধ্যস্থ করল।

মিঃ চৌধুরীর আবার এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই নেই। কিন্তু সবাই মিলে চেপে ধরল এ বিষয়ে একটা কিছু মতামত দিতেই হবে।

তখন মিঃ চৌধুরী নিরুপায় হ'য়ে বলল, 'মিঃ রায় যা বলেছেন সে কথা ঠিকই। ভালোবাসার ব্যাপারটা একটা মানসিক দুর্বলতার ব্যাপারই বটে। মেটাফিজিক্সও এ কথাই বলে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম ঘটে না, তা নয়। যেমন ধরুন আমি একটি ভালোবাসার কথা জানি, যে ভালোবাসার মেয়াদ ছিল প্রায় চল্লিশ বছর এবং একদিন এক মুহূর্তের জন্যেও সেই পবিত্র প্রেম মলিন হয় নি বা তাতে ফাটল ধরে নি। হ্যাঁ, তবে ফাটল ধরল সেদিন—যেদিন একজন মারা গেল।'

মিঃ চৌধুরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, 'ও, ওয়াণ্ডারফুল! কি চমৎকার! এরকম ক'জনার ভাগ্যে হয়?'

মিঃ চৌধুরী একটু হাসলো। পর-মুহূর্তে হাসি থামিয়ে বলল, 'আপনারা সবাই ভুল করছেন। আমি যে ভালোবাসার কথা এইমাত্র বললাম, সেটা হোলো একটি মেয়েছেলের গভীর ভালোবাসার কথা। যে লোকটিকে সারা জীবন ধ'রে এ ভালোবেসে গেছে তার কাছ থেকে ও কোন প্রতিদানই পায় নি জীবনে।'

মিঃ চৌধুরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের উৎসাহ এবং আগ্রহের দীপশিখা এক মুহূর্তে নির্বাপিত হয়ে গেল। সবাই নির্বাক এবং নিস্তব্ধ। শুধু এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে একটা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে।

সকলের মুখের উপর দৃষ্টির একটা প্রলেপ বুলিয়ে মিঃ চৌধুরী সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার বলতে সুরু করল, 'খুব বেশি দিনের কথা নয়। এই মাসখানেক আগের কথা। একজন বৃদ্ধা মেয়েছেলের শয্যাপাশে আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল তাঁর মারা যাবার কয়েকদিন আগে। একজন আইন-ব্যবসায়ীও উপস্থিত ছিল তখন সেখানে। আমাদের দুজনকেই মেয়েছেলেটি তাঁর উইলের এক্সিকিউটর করে। তাঁরই জীবনের একটি প্রেমের কাহিনী সেদিন তিনি বলেন আমাদের কাছে। এমন অদ্ভুত এবং মর্মস্পর্শী ব্যাপার এর আগে আর কোনদিন শুনি নি আমি জীবনে। সব কথা বলতে গেলে অনেক সময় নেবে, কাজেই আসল ব্যাপারটা খুব ছোট করেই বলে যাচ্ছি আমি। মেয়েছেলেটির নাম লক্ষ্মী। ওদের দুধের ব্যবসা। আমাদের বাড়ির ঠিক পিছন দিকেই একটা ছোটখাট খাটালের মালিক ছিল ওর বাবা। উত্তরাধিকারসূত্রে ওর বাবা-মা মারা যাবার পর সেটার মালিক হয় লক্ষ্মী নিজে।

'এদেশের লোক নয় ওরা। বাড়ি উত্তর প্রদেশের কোথায়। দুইপুরুষ ধ'রে এখানেই। প্রায় বাঙালী ব'নে গেছে বললেই চলে। যাই হোক, লক্ষ্মীর বয়স যখন বারো থেকে তেরোর মধ্যে তখন ওকে প্রায় রোজই বাঁধা খদ্দেরদের বাড়িতে নিয়মিত দুধ পৌঁছে দিতে হোতো—পাড়া থেকে বেপাড়ায়ও সন্ধ্যা-সকাল দুবেলায়ই। আগে ওর বাবা না হয় কোন কোনদিন ওর মা-ই একাজ করত। কিন্তু লক্ষ্মী বড় হবার পর ওর বাবা ওকে দিয়েই এই কাজটা নাকি করাতে সুরু করে শুধু গ্রাহকদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় রাখবার জন্যে। উদ্দেশ্য; ওরা মারা গেলে যাতে লক্ষ্মী ব্যবসাটাকে চালিয়ে নিতে পারে বেশ ভালোভাবে। যাই হোক, তখন থেকে দুবেলা বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেওয়া এবং মাসকাবারী পাওনা আদায়ের ভার পড়ে ওরই উপর।

'একদিন সকালবেলা বাড়ি বাড়ি দুধ দিতে দিতে লক্ষ্মী পাড়া ছেড়ে বেপাড়ায় গিয়ে পড়েছে। বড় রাস্তা পেরিয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকতেই দেখে বার-তের বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে একটা বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে গা ঠেকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছেলেটি অবশ্য ওদের জাতের নয়; বাঙালী। অত্যন্ত মায়া হোলো লক্ষ্মীর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে। ছেলেটি ওর সমবয়সী। লক্ষ্মীর প্রাণের ভিতরটা নাকি তখন কেঁদে উঠল। দুধের বালতি হাতে করে এগিয়ে গেল লক্ষ্মী ছেলেটির কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন? নাম কি?'

'নারায়ণ', বলল ছেলেটি দু-হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে।

লক্ষ্মী বলল, 'বাঃ বেশ নাম ত'! আমার খুব ভালো লেগেছে এই নামটা। কিন্তু কাঁদছ কেন?' বলেই লক্ষ্মী এক হাতের দুধের বালতি নামিয়ে রেখে সেই হাত দিয়ে ছেলেটির চিবুক ধ'রে আদর করতে আরম্ভ করল।

দু-হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে নারায়ণ বলল, 'চিলে আমার খাবারের ঠোঙা ছোঁ মেরে ফেলে দিয়েছে। মা পয়সা দিয়েছিল খাবার আনতে, এখন আমি কি করব ?'

লক্ষ্মী রাস্তার উপর তাকিয়ে দেখল সত্যি সত্যি একটা ঠোঙা আর কিছু খাবার রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে আছে।

লক্ষ্মীর আঁচলে সবসময়ই কিছু না কিছু পয়সা বাঁধা থাকত। আঁচল থেকে পয়সা খুলতে খুলতে লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করল, 'কত দাম খাবারের ?'

'আট আনা।' বলল নারায়ণ।

লক্ষ্মী নারায়ণের হাতে আট আনা পয়সা দিয়ে সেই হাতটা নিজের দু-হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বলল, 'এবার খাবার নিয়ে বাড়ি যাও। আমি রোজ দুবেলা এই গলিতে দুধ দিতে আসি। তোমার সঙ্গে দেখা হবে ত' ?'

'নারায়ণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে পয়সাগুলো গুণতে গুণতে খাবার আনতে চলে গেল। সেইদিন থেকে লক্ষ্মী নাকি এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে থাকতে পারে নি ছেলেটিকে। একথা ও সরলচিত্তে স্বীকার করেছে আমার কাছে।

'এই ঘটনার পর থেকেই লক্ষ্মী সুযোগ পেলেই লুকিয়ে-চুরিয়ে দুধ বিক্রি করে নিজের কাছে পয়সা রাখতে আরম্ভ করল শুধু ঐ ছেলেটাকে দেবার জন্যে। ওর হাতে পয়সা দিতে পারলেই নাকি ওর মন আনন্দে নেচে উঠত। একদিন বিকেলবেলা নারায়ণ ইস্কুল থেকে ফিরছে। বগলে একগাদা বই। লক্ষ্মীও দুধের বালতি হাতে করে গলি থেকে বেরুতে যাবে, এমন সময় নারায়ণের সঙ্গে মুখোমুখি। দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল দুজনকে দেখে। বালতি নামিয়ে আঁচল থেকে সব পয়সাগুলো নিয়ে লক্ষ্মী নারায়ণের হাতে দিয়ে দিল। নারায়ণ একগাল হেসে পয়সাগুলো গুণছে এমন সময় লক্ষ্মী ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে উঠল, 'মেরে বালাম—ছোটি বালাম।' বলেই হাত সরিয়ে নিল লক্ষ্মী। নারায়ণ চেয়ে রইল লক্ষ্মীর মুখের দিকে শুধু একগাল হাসি নিয়ে। এইভাবে প্রায় তিন বছর কেটে গেল। এবং এই তিন বছর ধরে লক্ষ্মীর দৈনন্দিন যা কিছু অর্থসঞ্চয় সবই দিয়ে দিল নারায়ণকে।

'লক্ষ্মী তখন প্রায় ষোড়শী। জীবন-যৌবনের কথাও নাকি তখন ভাবতে শিখেছে। অবশ্য এটা ওরই মুখের কথা। আমি তখন আমার কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা লক্ষ্মীদেবী একটা কথা—'

'বলুন ডাক্তারবাবু', বলল লক্ষ্মী।

আমি বললাম, 'আপনি কি ওকে ভালোবাসতেন ?'

'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি ওকে খুব পেয়ার করতাম। এখনো করি। ও আমার চোখে একটা জহরত। আমার মনে হয় এই তামাম দুনিয়াতে নারাণ ছাড়া আর কোনো মর্দানা নেই। সাচ্চা কথা বলছি আপনাকে।' বলল লক্ষ্মী।

আমি বললাম, 'নারায়ণ ত' আপনাকে বিয়ে করত না, তবে কেন ভালোবাসলেন ?'

'পেয়ারের কি কিছু নিয়ম আছে ডাক্তারবাবু।' বলল লক্ষ্মী। আমি

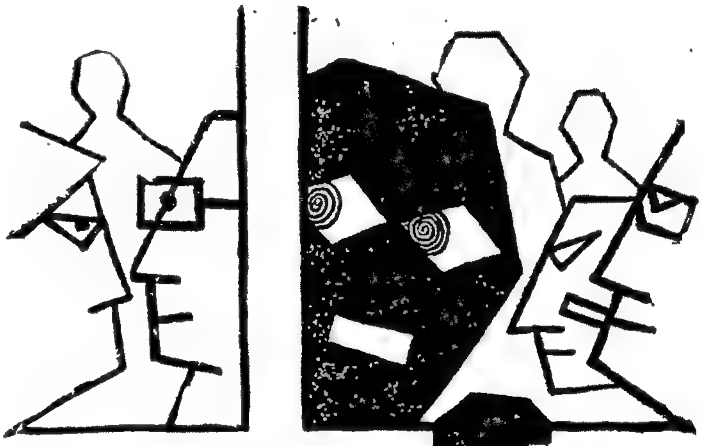

ওদের নিরস্ত্র করুন

লোকটা নিশ্চয়ই আপনার নজর এড়ায়নি। বিনা-টিকিটের যাত্রী—বুঝে নিতে কষ্ট হয় না। টিকিট ফাঁকি দিয়ে লোকটা অন্যের জায়গা দখল করেছে, রেলকে ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করছে, ফলে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়াবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—এদের পাপচক্র জাতীয় জীবনে দুর্নীতির এক দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করছে। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত্র করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

PANORAMA/ER/64

চুপ করে গেলাম। লক্ষ্মী আবার বলতে আরম্ভ করল।

'কিছুদিনের মধ্যেই নাকি নারায়ণ উধাও। ওর আর কোন পাত্তাই পায় না লক্ষ্মী। অনেক কষ্টে খবরাখবর নিয়ে জানতে পারল নারায়ণ এখানে নেই। কলকাতার বাইরে চলে গেছে ওর মামার বাড়িতে। সেখান থেকেই লেখাপড়া করবে।

'এই খবরের পর দু'দিন অবিশ্রাম কাঁদল লক্ষ্মী লোকচক্ষের অন্তরালে। বছর ঘুরল। শীতের শেষাশেষি। কলকাতায় সেবার বসন্ত রোগের মহামারী। বহু লোকই এই মহামারীর কবলে পড়ল। লক্ষ্মীর বাবা-মা'ও রেহাই পেলো না এই মহামারীর হাত থেকে। একমাত্র রইল শুধু লক্ষ্মী।

'এই বিয়োগান্ত নাটকের পর থেকে ব্যবসার সব দায়িত্ব এখন লক্ষ্মীর কাঁধেই পড়ল। বাড়ি বাড়ি আর দুধ দিতে যেতে পারে না ও। এই কাজের জন্যে অন্য লোক ঠিক হোলো। অবস্থা-ব্যবস্থা ভালো বলে কিছুদিন পরই ওদের জাতভাইয়ের মধ্যেই বিয়ের সম্বন্ধ আসতে থাকে একটার পর একটা। লক্ষ্মী জানিয়ে দেয় ও বিয়ে করবে না। লোক ফিরে যায় হতবাক এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে।

'এইভাবে পুরো সাতটা বছর কেটে গেল লক্ষ্মীর শুধু নারায়ণের স্বপ্ন চোখে নিয়ে। ব্যবসার থেকে যা লাভ হয় নিজের খরচ-খরচা বাদে সবই ও সঞ্চয় করে যায় নারায়ণের জন্য।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩।৷০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩।৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

'লক্ষ্মী তখন পুরো তেইশ বছরে পা দিয়েছে। ওর দেহের দেহলীতে রতি-বিহ্বলতা নাকি পুরো-মাত্রায় দেখা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদিও নারায়ণকে পাবার ওর কোন সম্ভাবনাই নেই, তবু একমাত্র নারায়ণের কথা চিন্তা করেই বিপথগামিনী হয় নি ও। আশ্চর্য। এরকম একটা ঘটনা যে বাস্তবে ঘটতে পারে তা আমি কল্পনাও করতে পারি না।' বলল মিঃ চৌধুরী। একটু থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, 'যাই হোক, এর পরও নাকি আজ তিন বছরের উপর কেটে গেল। নারায়ণের দেখা পায় না লক্ষ্মী ওদের গলিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে। তবু লক্ষ্মী আশা ছাড়ল না। দেখা একদিন না একদিন হবেই। ভাবলো মনে মনে।

'এর কিছুদিন পরেই এল শারদীয়া উৎসব। পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারী দুর্গাপূজা। প্যাণ্ডেল আর লাইটের জাঁকজমক। সবাই তখন ঠাকুর দেখতে বেরোয়। লক্ষ্মীও বেরিয়েছে সেজে-গুজে ঠাকুর দেখতে।

'একটা প্যাণ্ডেলে ঢুকে লক্ষ্মী দেখে নারায়ণ দাঁড়িয়ে ঠাকুরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে একটি বউ-এর হাতে হাত দিয়ে। বউটি নাকি দেখতে বেশ সুন্দর। লক্ষ্মীর মন নাকি বলল এ নারায়ণেরই বউ। যাই হোক, লক্ষ্মী নারায়ণের দিকে চেয়ে রইল, যদি নারায়ণ ভুলেও একবার ওর দিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত তাই হোলো—নারায়ণের চোখ পড়ল ওর দিকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নাকি বউ-এর হাত ধ'রে বেরিয়ে গেল প্যাণ্ডেল থেকে।

'লক্ষ্মী বুঝতে পারল যে নারায়ণ ওকে চিনেও চিনল না। শুধু এই ভয়ে পাছে বউ কিছু মনে করে। নারায়ণের কোন দোষ নেই, বউকে ত' অনেকেই ভয় করে। এই ভেবে নিজের অমলিন মনকে সান্ত্বনা দিল লক্ষ্মী।

এই ঘটনার পর থেকে লক্ষ্মী আর কোন খোঁজখবর করে নি নারায়ণের। নিজের খাটালেই শুয়ে থাকে দিন-রাত আর স্বপ্ন দেখে নারায়ণের। কাজকর্ম করবার লোক ত' আলাদা আছেই। তারাই সব দেখাশুনা করে, টাকা-পয়সা আদায় করে। লক্ষ্মী শুধু হিসাব-নিকাশ নেয়। আর টাকা-পয়সা যা জমে সবই রেখে দেয় নিজের গুপ্ত তহবিলে নারায়ণের জন্যে। আপনারা হয়ত আমার কথা শুনে অবাক হচ্ছেন। কিন্তু অবাক হবার কিছুই নেই এতে। এটা একেবারে পুরোপুরি সত্য ঘটনা। আমার নিজের কানে শোনা, নিজের চোখে দেখা।' বলল মিঃ চৌধুরী। বলেই চুপ করে আর একটা সিগারেট ধরাতে লাগল।

অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে মেয়েরা তখন বলে উঠল, 'তার পর?'

মিঃ চৌধুরী সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তারপর? তারপর আর কি। আমার কাছে নিজের জীবনের এই করুণ কাহিনী বলবার কয়েকদিন পরেই ও মারা গেল। তবে মারা যাবার আগে ও নগদ চার হাজার টাকা দিয়ে গেছে আমার হাতে নারায়ণকে দেবার জন্যে। আর ওর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক করে গেছে ওকেই। আমি নারায়ণবাবুকে ওর পাওনাগণ্ডা সব বুঝিয়ে দিয়েছি আজ প্রায় দিন সাতেক হোলো। তবে এরকম অকপট এবং গভীর ভালোবাসার দৃষ্টান্ত অন্তত আমার জীবনে এই প্রথম।'

এই পর্যন্ত বলেই মিঃ চৌধুরী চুপ করে একটা সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।

ব্যারিস্টার মিঃ রায়ের চোখ দুটো তখন অশ্রু-ছলছল হয়ে উঠেছে। মিঃ চৌধুরীর দিকে অশ্রুসজল দৃষ্টি নিয়ে বলল, 'যা বলেছেন মিঃ চৌধুরী সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েরাই ঠিক ভালোবাসতে জানে। আমরা—মানে এই so called পুরুষরা ত' সব hypocrite। *

* মোপাসাঁর 'A Strange Fancy' গল্পের ছায়াবলম্বনে।

● খাদ্যের দাবীতে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

রাজধানী ঃ

বর্ষণমুখর ভাদ্রের সায়াহ্নে মনে পড়ছে বিদ্যাপতিকে। শূন্য মন্দির। বাদলভরা 'মাহ ভাদর'। কবি একাকী বাতায়নে বসে আছেন উদাস মনে। সামনে তাঁর ভেসে উঠছে নৈরাশ্যে ভরা বিরহকাতরা শ্রীরাধিকার করুণ মুখচ্ছবি।

কবি আমি নই। কাব্যরস আস্বাদনের তেমন সুযোগও জীবনে বেশি ঘটে নি। তবু, কেন জানি না, বাদল-সন্ধ্যায় মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে পড়ছে। চোখের সামনে কিলবিল করছে অসহায়, হতাশাভরা, বেদনা-কাতর মা-বোনদের মুখগুলো। নৈরাশ্য প্রতিটি ঘরের শান্তি ম্লান করে দিচ্ছে। কূল-কিনারা কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। অনটনের সংসার আর সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির শ্রীরাধিকার মতই তাঁরা ডাক ছেড়ে বলে উঠছেন—'এদিক ঝাঁপই তো ওদিক উঘারি।' নুন আনতে পান্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। চালের দাম জোটে তো, নুনের পয়সা থাকে না।

ঘরে চাল এখনও বাড়ন্ত। রেশনের চালে দু'বেলা চলে না। গমও প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায় না। বেশি দামের চাল কেনবার সামর্থ্য সকলের নেই। কম দামের চালের ভাত শিশুরা মুখে তুলতে পারছে না। চালের নমুনা রাজ্য-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি সমবায় দোকান থেকে হাজির করা হলে তিনি নাকি এ ধরণের চাল সরবরাহের জন্য রুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর রোষদৃপ্ত নয়নের দিকে তাকিয়ে অপরাধীরা শায়েস্তা হয়েছে কিনা, এমন কি, তারা ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল কিনা সে সংবাদ পাই নি। সে ধরণের অঘটন ঘটবে বলে আশাও করি নে। চাল-তেল-মাছ থেকে সুরু করে রসুইখানার এমন সামগ্রী খুব কমই আছে যা' নিয়ে একদফা এমনি রোষকষায়িত নয়নে আমাদের সরকারের কর্মকর্তারা তাকান নি। তারপরই একেবারে তাঁরা নিভে গেছেন বৃষ্টিতে ভেজা বারুদের মত। কাজেই মায়েদের কাছে নতুন সংবাদ—আশার কথা নিয়ে উপস্থিত হতে আমি অক্ষম। এই অক্ষমতাই সম্ভবত আমার চিত্তকে আজকের সন্ধ্যায় উদাস করে তুলেছে।

* * *

সরষের তেল নিয়ে সরষে ফুল দেখতে দেখতে এত আক্কেল-সেলামী দেবার পরও পশ্চিম বাংলা সরকারের আক্কেল যেন কিছুতেই ফিরতে চাইছে না। আমাদের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান মাছের ব্যাপারী সাজতে গিয়ে ল্যাজে-গোবরে একাকার করে ফেলার পর ব্যবসাটা তুলে দিচ্ছেন এখন কেন্দ্রীয় দপ্তরের হাতে। নিজের অপদার্থতা ঢাকবার জন্য ক্ষমতা অপরের হাতে তুলে দেবার এমন দৃষ্টান্ত বিরল। তিনি একবার ভেবে দেখলেন না, তাঁর অক্ষমতার অভিশাপ কতখানি দেশবাসীকে ভোগ করতে হবে। নিজের হাতে কারবারটা থাকলে মাছের দামটা নির্ধারণের ক্ষমতা থাকতো পশ্চিম বাংলা সরকারের হাতেই। এখন সরবরাহকারী রাজ্যের দাবীর বহর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। মাছের দামটা স্বভাবতই যাবে আরও বেড়ে।

মৎস্যমন্ত্রী রহমান সাহেব নাকি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। তাঁর নিজের দলের বন্ধুরা, মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিরূপ হয়ে উঠছেন—তলব করে বসছেন ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ। মুস্কিল থেকে আসান পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে তিনি মৎস্য দপ্তরকে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা করছেন। খুব ভাল কথা। তাঁর দপ্তরের তাঁরই মত বাকসর্বস্ব মানুষটি না থাকাই উচিত। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয় বলেই আমরা জানি। শালগ্রাম শিলার পরিবর্তন না করে, গঙ্গাজল দিয়ে মন্দির শোধন না করে পূজারী ও জোগাড়ে বদলালে কোন লাভই হয় না। পথিপার্শ্বে, পাহাড়ের গায়ে নুড়ির অভাব নেই। তা দিয়ে শালগ্রাম হয় না। নকল শিলার বিশুদ্ধতার অভাবেই সৃষ্টি হয় অপবিত্র পরিবেশের! মেকী শিলার ফরমান কেউ মানতে চায় না।

মৎস্যমন্ত্রীর আদেশ এখনও বলবৎ রয়েছে। কেউ তা' মানছে না। তিনি নিশ্চয়ই জানেন, বাজারে মাছ না থাকলেও উদ্বৃত্ত পয়সার অধিকারী ভাগ্যবানদের মাছের অভাব হচ্ছে না। তাদের গৃহে গৃহে মাছ পৌঁছে যাচ্ছে ভোর হতে-না-হতেই। সেই সঙ্গে পল্লীর গলিতে, গুপ্তগৃহে চোরা-কারবারীরা যে-দামে মাছ চালাও বিক্রি করছে সে দাম মৎস্যমন্ত্রীর বাঁধা দামের দ্বিগুণ।

মাছ যাচ্ছে না গরীবের ঘরে। তেল মাথায় পড়ছে না, যার মাথা তেলের অভাবে উস্কো-খুস্কো। হতাশায় এরা ভেঙে পড়ছে। এদিকে পূজার বাকী মাত্র এক মাস। ধনীর দুয়ারে তার উদ্যোগপর্ব সুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য দোকানীদের উৎসাহের সীমা নেই। দোকানের রূপসজ্জা চলেছে এখন থেকেই। আসছে নতুন মাল—রঙ-বেরঙের জামা-কাপড়, ফ্রক। কাগজের পৃষ্ঠা ভরে উঠছে চটকদার, বাহারের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে। বিজ্ঞাপনগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ধনীর দুলালদের। দুঃখিনী জননীরা, স্বল্পআয়ের পরিবারের গৃহিণীরা আরও মুষড়ে পড়ছেন। পূজার সময় যা' হোক কিছু ছেলে-মেয়েদের দিতেই হবে। অর্থ কোথায়? কেউ কেউ পূজা বোনাসের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে কবে মিলবে ঠিক-ঠিকানা নেই। মালিকের মর্জির ওপর নির্ভর করে। পঞ্চমী-ষষ্ঠীর আগে অনেক মালিকেরই হাত থেকে পয়সা গলতে চায় না। কিন্তু এদিকে এর মধ্যেই কাপড়ের বাজার গরম হয়ে উঠছে। তা' ছাড়া, সারা বছরের ঋণের কিছুটা শোধ না-করলেই নয়। পূজা বোনাসই দেনা শোধবার প্রধান সম্বল।

পূজার কথাটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও এর মধ্যে একদিন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পূজার সপ্তাহে তিনি মাথাপিছু দেড় কে-জি চাল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সম্ভব হলে দু' সপ্তাহই দেড় কে-জি দেবেন।

এ সব কথা শুনতে ভাল লাগে। ময়দার অভাব হবে না, এমন আশ্বাসও মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। ভবিষ্যতের কথা তুলে রাখাই ভাল। সেদিনেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আজ কিন্তু বাজারে ময়দা নেই। চোরাবাজারের শরণ না নিলে ময়দা পাওয়ার কোন উপায়ই নেই। ময়দার অভাবে ছোট ছোট রুটির কারখানার পাততাড়ি গোটাবার অবস্থা হয়েছে। রুটির দাম বেড়ে গেছে। কোয়ার্টার পাউণ্ড রুটির

● শ্রীপ্রফুল্ল সেন

দাম বেড়েছে দু'সপ্তাহের মধ্যে দু'পয়সা। তবু আশার কথা পূজার সময়—উৎসবের দিনে লুচি খাওয়াবার ব্যবস্থাটা হচ্ছে সরকার বাহাদুরের বাহাদুরীতে।

* * *

মায়েদের কি এক জ্বালা? কর্তার মেজাজ তিরিক্ষে। ছেলেমেয়েদের ঘ্যান-ঘ্যানানির অন্ত নেই। পড়াশোনা সেই সঙ্গে শিকেয় উঠেছে। তারপর আজকে শহীদ দিবস, কালকে খাদ্য দিবস, পরশু ভর্তির জন্য দাবী দিবস লেগেই আছে। কখন তারা অনাহত দেহে ঘরে ফিরবে সে চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় দুয়ারের দিকে।

মাসের পহেলা তারিখেই ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনে নিহত 'শহীদদের' প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ধর্মঘট করে। খাদ্যের দাবী পেশ করেছে তারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ক'জন পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছে হাঙ্গামা সৃষ্টির অভিযোগে। দেশের নেতাদের কাছে মায়েরা আজ নতুন প্রশ্ন তুলেছেন। খাদ্য নিয়ে আন্দোলন তো হল অনেক। আন্দোলনে নিহত সন্তানদের মায়ের নয়নের জল ঝরছে এখনও অঝোরে। খাদ্য সমস্যার সমাধান হয়েছে কি? না হয়ে থাকলে তরলমতি শিশুদের উস্কিয়ে দিয়ে আর লাভ কি? এতে কি উচ্ছৃঙ্খলতাই বাড়ছে না? তা হয়ে থাকলে, এ কায়দার রণে ভঙ্গ দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি? এ প্রশ্নমালার জবাব দেশের মুরুব্বিরা দিলে আমরা খুশি হব।

আন্দোলন তাঁরা নতুন করে গড়ে তুলতে না পারলেও স্বতঃস্ফূর্ত স্বে-আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাকেও সঠিক পথে চালাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হত। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু-নিধন যজ্ঞের সংবাদে যখন আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দিশেহারা, বিভ্রান্ত তখন ছাত্রসমাজই পরিচয় দিয়েছিল সুস্থ ও বলিষ্ঠ মনের। তারা প্রতিবাদ-পত্র নিয়ে গিয়েছিল পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনারের দপ্তরে। তাদের সেদিন আমরা কেউ সামনে দাঁড়িয়ে উৎসাহিত করি নি—পরি-চালিত করি নি সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে। ফলে, যা হবার তাই হয়েছিল। এমনি বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সময়ে আমরা তা আলোচনা করবো।

দার্জিলিং:

শহর শিলিগুড়ি উত্তর বাংলার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। নেপাল, ভূটান, সিকিম ও উত্তর বাংলার দূর-দূরান্তের গ্রামাঞ্চলের পাইকারী পণ্যের প্রধান বাজার শিলিগুড়ি। ভারতের মাটিতে

চীনা সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণের পর থেকে এ শহরের গুরুত্ব বেড়েছে অনেক। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে শহরের কলেবর। গড়ে উঠছে নতুন ঘাড়িঘর, দোকান-পাট। কিন্তু শিলিগুড়ি হারিয়েছে তার অতীতের সুন্দর সুদৃশ্য ক্ষুদ্র শহরের শ্রী।

মানুষের অলক্ষ্যে গড়ে ওঠা আগাছায় ভরা বাগানের মতই যেন এ শহর আপনা থেকে গজিয়ে উঠেছে। এ শহরের দিকে তাকালে যে-কোন নগর পরিকল্পনাকারের মাথা হেঁট হয়ে আসবে লজ্জায়। অতি আধুনিক কায়দার গৃহের যেমন অভাব নেই, অভাব তেমনি নেই তার আশে-পাশে অলিতে-গলিতে কুঁড়েঘরের। সুসজ্জিত দোকান ঝলমল করছে একদিকে নিয়ন আলোতে। তার পাশেই মাটির প্রদীপের মত টিম-টিম করে জ্বলছে লণ্ঠন কুঁড়েঘরের দোকানগুলিতে।

নগর পরিচালকদের ঔদাসীন্যে নর্দমার ময়লা জল নিকাশের সুবন্দোবস্তের কোন বালাই নেই। বর্ষার জলে একবার ধুয়ে-মুছে যাবার পর, কিছুদিন কড়া রোদ উঠলেই নাকে রুমাল গুঁজে ছাড়া চলা কঠিন হয়ে পড়ে। শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে পর্যাপ্ত পানীয় জলেরও কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

সিকিম, ভূটান এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুয়ার শিলিগুড়ির পরিবহনের অবস্থা আরও খারাপ। মহানন্দার পুরোনো জীর্ণ পুলটির ওপর দিয়ে হাজার হাজার যান-বাহন চলাচল করে প্রতিদিন। পুলের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গতি বেড়েছে বেশি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সৃষ্টি হয় অচলাবস্থার। নতুন সেতুর কাজ শেষ হলে, সেবক রোড দিয়ে পুরাদমে গাড়ি চলাচল সুরু না হওয়া পর্যন্ত এ দুর্ভোগ কমবার নয়। তাতেও পুরোনো পুলের প্রয়োজন একেবারে বাতিল হওয়ার নয়। কর্মকর্তারা সেদিকে নজর না রাখলে ভবিষ্যৎ সামলাতে পারবেন না। দুমুখো—আগমন ও নির্গমনের দুটো আলাদা পথ না-করতে পারলে পরে বর্ধিত যান-বাহনের ভিড় সামলানো দায় হবে।

শহরের পরিচালকরাও পড়েছেন কিছুটা বিপদে। পরিকল্পনা-বিহীন গজিয়ে ওঠা শহরের চেহারাকে মেজে-ঘষে ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়। তবে, চেষ্টার অসাধ্য একথাও বলবো না। প্রচুর খালি জায়গা পড়ে আছে। স্থানীয় সংস্থাগুলো মিলিতভাবে চেষ্টা করলে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নিয়ে শহরের চেহারা সহজেই কিছুটা পাল্টানো যেতে পারে। এতে প্রয়োজন হবে মিউনিসিপ্যালিটি এবং অদূরভবিষ্যতে জেলা পরিষদের পূর্ণ সহযোগিতা। এ ছাড়া, প্রয়োজন রয়েছে জেলাভিত্তিক সহযোগিতার।

দাবগ্রাম মৌজা নিয়ে বিরোধের মীমাংসা এখনও হয় নি। শিলিগুড়ির সামাজিক, আর্থিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ এই মৌজার সঙ্গে অধিক। মৌজাটি জলপাইগুড়ি জেলার অধীন। জলপাইগুড়িব নতুন রেলওয়ে স্টেশন হয়েছে এই দাবগ্রাম মৌজাতে। এটি 'টারমিনাস' স্টেশন। শিলিগুড়ি থেকে এর ব্যবধান মাত্র দু'মাইল। জলপাইগুড়ি জেলার আর-টি-এর হুকুম না নিয়ে শিলিগুড়ির গাড়ি এখানে ঢুকতে পারে না। এতেও সৃষ্টি হয়েছে চূড়ান্ত অসুবিধার। এ স্টেশনটিতে নেমে যাঁরা দার্জিলিং, সিকিম, কার্শিয়াং ও কালিম্পং মোটরে যেতে চান তাঁদের ভোগ করতে হয় হয়রানি। এ স্টেশন থেকে শিলিগুড়ির দিকে ভাল রাস্তাও নেই। পি-ডব্লিউ-ডি একটি রাস্তার পরিকল্পনা নাকি ওপরমহলে পেশ করেছেন। এখনও তার জবাব আসে নি।

মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের পর তা' নিয়ে মামলা চলেছে আদালতে। আদালতের নিষ্পত্তির আগে মিউনিসিপ্যালিটির নতুন পরিষদ গঠিত হতে পারছে না। নির্বাচনে পরাভূত কাউন্সিলরগণ স্বভাবতই নাগরিক-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে উদাসীন।

তিলক ময়দান এখানকার একমাত্র খেলার মাঠ। এ মাঠটিও সামরিক বাহিনীর। জায়গার অভাব নেই। কর্তারা একটু সচেতন হলেই সুন্দর স্টেডিয়াম নির্মাণ হতে পারে।

বর্ধমান :

৩০শে আগস্ট, রবিবার আসানসোল থেকে তিন মাইল দূরে চান্দা গ্রামের নিগা কালোপাহাড়ী হাট লুঠ হয়েছে। নির্ধারিত মূল্যে চাল ও অন্যান্য সামগ্রী না পেয়েই মানুষ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। প্রায় দু'শ' লোকের এক বিক্ষুব্ধ জনতা হাটটি লুঠ করে।

ক্ষতির পরিমাণ নাকি হাজার পাঁচেক টাকা হবে। এ ব্যাপারে পরে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। এই ধরণের বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনার কথা আমরা পূর্বে বলেছিলাম। দুষ্কৃতকারী, আইনভঙ্গকারীদের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে। এ বিষয় কোন দ্বিমত হতে পারে না। কিন্তু একথাও মানতে হবে মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। ধৈর্যের বাঁধ যাতে সাধারণ মানুষের না ভাঙে, শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন যাতে অশান্ত হয়ে না ওঠে তা দেখবার দায় ও দায়িত্ব সরকারের। প্রজা পালন, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টকে দুষ্টের হাত থেকে রক্ষাই সরকারের কাজ। দুষ্টের চক্রান্তজালে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমাদের সরকার যদি সে-কথা ভুলে না যান, তা হলে ছা-পোষা মানুষের মনের বিক্ষোভ দূর হবে—সরকারকেও তারা দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।

মানুষের দুরবস্থা বেড়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। তার প্রমাণ বর্ধমান শহরের খুচরা দোকানীদের মৌন মিছিল। তাদের অভিযোগ—বড় বড় পাইকার চাল, গম, আটা, ময়দা, তেল চিনি প্রভৃতি ভোগ্যপণ্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই সরবরাহ পাচ্ছে। খচরা দোকানীকে

সে মাল নির্দিষ্ট দামে না দিয়ে খুশিমত চড়া দাম নিচ্ছে। খুচরা দোকানীদের ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। এ বঞ্চনা বেশিদিন চলতে পারে না। এর প্রতিকার না হলে, সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে বিপদ আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না।

মেদিনীপুর:

শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে এবার যে-পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে তা চাষের খুবই অনুকূল। চাষীরা পূর্ণ উদ্যমে নেমে গিয়েছে চাষের কাজে। ধানের নতুন চারা পুঁতছে চাষী ও চাষী-বৌ মিলে নতুন উৎসাহে। কোন কোন জায়গায় চাষের কাজ শেষও হয়েছে। আসছে সপ্তাহের মধ্যেই ধানের চারা রোপণের কাজও শেষ হবে। আরও দু-এক পশলা বৃষ্টি চাষীরা আশা করছে।

তরিতরকারীর উৎপাদন নাকি এবার আশানুরূপ হয় নি। পাটের চাষ ধানের চাইতেও নাকি ভাল হচ্ছে।

কাঁথি শহরের পূর্বাঞ্চলের মানুষকে পাগলা শিয়াল পাগল করে তুলছে। দিন-দুপুরে ছোট ছেলেমেয়েরা নিরাপদে পথ চলতে পারছে না। জাড়িয়া, গোবিন্দপুর প্রভৃতি এলাকাতেই পাগলা শিয়ালের উপদ্রবটা সর্বাধিক। স্থানীয় মানুষ এই শিয়ালের দলকে ঘায়েল করতে পারে নি। মহকুমা-শাসক একটু চেষ্টা করলেই শিয়ালের উপদ্রব থেকে গ্রামবাসীরা মুক্তি পেতে পারেন।

বীরভূম:

বীরভূম থেকে আটা-ময়দা-গম ও চাল বিহারে পাচারের সংবাদ আমরা আগেও দিয়েছি। জেলার কর্তারা একটু সতর্ক হলে দুর্নীতির দুষ্টচক্র এত জোরদার হতে পারতো না।

২১শে আগস্ট আটা বোঝাই দুটি লরী ধরা পড়েছে কচুজোড় গ্রামের সিউড়ি-দুবরাজপুর রোডে। আটার দাম হবে প্রায় সতের হাজার টাকা। লরী দুটির কোন উপযুক্ত পারমিট ছিল না।

এ আটার মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাগজপত্রে যাঁর নাম ছিল তিনি বেমালুম মালিকানা অস্বীকার করে বসেছেন। লরীর মালিকরাও হাজির হচ্ছে না।

খুবই আশ্চর্যের কথা। ধরে আনতে বললে যারা অতি উৎসাহে মানুষকে কোমরে দড়ি দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে আনতে কসুর করে না, তারা এই পাপচক্রের আসল মানুষের হদিস করতে পারছে না। তবু মন্দের ভাল। এবারে পুলিশ আটা বে-ওয়ারিশ ঘোষণা করে নীলামে স্থানীয় খাদ্য-বিভাগের কাছে বিক্রি করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে।

* *

ভদ্রলোকের চুক্তির পরিণাম কারও অজানা নেই। চুক্তি কোনদিনই রক্ষিত হয় নি—চুক্তি সম্পাদনের পরদিনই আর চুক্তিমাফিক কাজের কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ সত্ত্বেও খাদ্য-বিভাগের কর্তারা বীরভূমের তেলকল মালিকদের সঙ্গে এক চুক্তি করে বসেছিলেন। চুক্তি অনুযায়ী প্রতিদিন ৩৬৫ টন করে তেল সারা বীরভূমে সরবরাহের কথা ছিল।

চুক্তির পরদিন থেকে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। খাদ্য দপ্তর চুক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করে খুচরা দোকানের নামও ঘোষণা করেছিলেন। তেলকল মালিকরা তেল একেবারে দিচ্ছে না, বলবো না। তাদের মর্জি হলে সামান্য কিছু পরিমাণ খুচরা দোকানে ছাড়ে। কাজেই সাধারণ মানুষ আশায় আশায় বোতল ও শিশি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দোকানে দোকানে।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা বরং একটু ভাল। পাঁচ টাকা কে-জি দিতে পারলে তেল পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অঢেল। অবিশ্যি তাতে ভেজাল কতটা আছে বলা শক্ত।

একথা আমাদের খাদ্য দপ্তর এবং খোদ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন নিশ্চয়ই জানেন। তেলের মালিকরা কথা রক্ষা করেছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর মুখের

চাষী ও চাষী-বৌয়েরা পূর্ণ উদ্যমে নেমে গিয়েছে চাষের কাজে

ওপরই বলে দিয়েছিল—দাম বাঁধবার ক্ষমতাটা তাদের না দিলে তেলে ভেজাল থাকবেই এবং বাজারে বাঁধা দামে তেল পাওয়া যাবে না। তাদের কথার নড়চড় হয় নি। তেলের অভাব আর নেই। চড়া দাম দিলেই তেল পাওয়া যাচ্ছে। ভেজাল! সে তো সব জিনিসেই চলছে। হলুদ, জিরে থেকে সুরু করে রান্নার সকল উপকরণেই ভেজাল থাকে অল্পবিস্তর। তা' ছাড়া, সেদিন শহর কলকাতাতেই নামজাদা কোম্পানীর তেলের বিভিন্ন টিন পরীক্ষার পর বিচিত্র ফল পাওয়া গেছে। কোনটা নির্ভেজাল, আবার কোনটায় রয়েছে শিয়াল কাঁটা মেশানো। এর পর আর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

জলপাইগুড়িঃ

বন্যার জল নেমেছে। চাষের তোড়জোড় চলছে নতুন করে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে। নীচু জমির আবদ্ধ জল নিকাশের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সেখানে চাষের কথাই ওঠে না। নকশালবাড়ি এলাকার যাদের সর্বস্ব নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে তারা এখনও অসহায়। আমাদের ত্রাণকর্ত্রী শ্রীআভা মাইতির দপ্তরের লালফিতা কেটে এখনও কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা এদের জন্য করা হয় নি।

* * *

সরকারী নীতি ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি না থাকলে দেশের কর্মীদের হাতে কাজ কত দ্রুত এগোয় তার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে জলঢাকা প্রকল্প ঘুরে এলে। পাঁচদিনে তাঁরা বন্যা ও ধ্বসে বিধ্বস্ত দেড় মাইল নতুন করে নির্মাণ করেছেন। কাজ চলছে এখন খালও সেতুর ওপর। বোঝবার উপায় নেই দু'দিন আগে এ এলাকার রূপ কি ছিল। দিবারাত্রি কাজ চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। অসাধ্য সাধন করেছেন এখানকার ইঞ্জিনীয়ার, সুপারভাইজার ও ওভারশীয়রগণ। অর্থ হয়তো এতে কিছু বেশি খরচ হবে।

ডঃ কে এল রাও বলে গেছেন, ক্ষতির পরিমাণ পনের লক্ষ টাকা। এ-অঙ্ক দ্বিগুণ হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। নক্সার পরিবর্তন, পাওয়ার হাউসের ভেতর থেকে জমাট পলিমাটি অপসারণ এবং উঁচু প্রাচীর তোলার ব্যয় ডঃ রাওয়ের হিসেবে ধরা হয় নি।

জলঢাকার প্রকল্প শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯৬৫ সালের জুন মাসে। এখন বলা হচ্ছে, কাজ শেষ হবে ২রা অক্টোবর। বিশেষজ্ঞগণ খোলাখুলি এ-বিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন না। কেউ কেউ বলছেন, মন্ত্রীমশায় অত্যন্ত আশাবাদী, তাঁর আশা পূরণের চেষ্টা চলেছে।

এ কথার অর্থ তাঁর আশা পূরণ হবেই, ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

● শ্রীআভা মাইতি

জুন মাসের কাজ শেষ হচ্ছে অক্টোবরের ২রা তারিখে। এই অতিরিক্ত সময়ের জন্য প্রতিদিন ব্যয় হবে তিরিশ হাজার টাকা। আরও পিছিয়ে যাওয়ার মানে অধিক ব্যয়। তবু কাজ চলছে এবং এ-কাজে কর্মীদের তরফে কোন গাফিলতি, কোন ফাঁকি নেই। এটাই বড় লাভ ও আনন্দের কথা।

এ-প্রকল্পের সুরুতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছিল আড়াই কোটি টাকা। এখন দাঁড়িয়েছে দশ কোটিতে। আরও ক' কোটি লাগবে এক্ষুণি বলা সম্ভব নয়। অডিট রিপোর্টের মন্তব্যে রয়েছে এ-প্রকল্প ব্যয়-বাহুল্যের জন্য কোনদিনই লাভজনক হবে না।

আমাদের পরিকল্পনাকারদের এইটেই বড় অপরাধ। তাঁরা ভবিষ্যতের—দু'দিন পরের কথাটা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আমলেই আনতে চান না। আর একখানা দিলে তিনখানা করে আনতেও তাঁরা ওস্তাদ। কতবার যে এর নক্সাকে কর্তারা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের চারটি ইউনিটের জায়গায় এখন তিনটি ইউনিটের কথা হচ্ছে। তাতে ২৭ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে না। আসছে বছর ২রা অক্টোবর একটি ইউনিটের বেশি চালু হওয়া দুষ্কর। পুরোপুরি প্রকল্পটি চালু হলে লোকসানের অঙ্ক নিশ্চয়ই কমবে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছেন।

২৪ পরগণাঃ

অনাহারে, অর্ধাহারে ক্লিষ্ট দেহে রোগের সংক্রমণ হয় অতি সহজে। ওলাইচণ্ডী ও শীতলাদেবীরা এই সুযোগই নাকি খুঁজে বেড়ান দিবারাত্রি। সুন্দরবনের সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষের দুর্দশার কথা—কি ভাবে শাকসব্জী খেয়ে জীবন কাটিয়েছে—টেপা মাছ খেয়ে বিষক্রিয়ায় টেপা মাছের মত পেট ফুলে ওঠার সে মর্মন্তুদ সংবাদ আমরা পেয়েছি আগে। পাথরপ্রতিমা থানায় শীতলা-দেবীর আবির্ভাবের সংবাদ এসেছে এবারে।

মহামারী আকারে বসন্ত রোগ দেখা দিয়েছে এখানে। ৪৫ জন এ-রোগে প্রাণ হারিয়েছে। এখনও বহু পরিবার বসন্তে ভুগছে। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের দুজন কর্মী এসেছিলেন। দু'দিন তাঁরা কয়েক ঘরের মানুষকে টিকা দিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

দিল্লী থেকে

● নয়াদিল্লীর একটি বাজার—'আনারকলি মার্কেট'

যাঁরা খেতে পেয়েও ঘটা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গলায় মালা পরে (বাংলা দেশে গাঁদাফুলের মালাটা যতদূর মনে পড়ছে পাঁঠাকেই বলির পূর্বে পরানো হয়, দিল্লীর কায়দা স্বতন্ত্র। সবই চলে) অভুক্ত থাকেন, আজকাল দিল্লীর সংবাদপত্রের কলমে তাঁদের নিয়ে খুব হৈ-চৈ হচ্ছে। পিক্‌নিক্ করতে যাওয়ার মতনই এঁরাও ব্যাচে ব্যাচে ঘোরাঘুরি করছেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে মালা পরে জমিদারী কায়দায় ঢালা বিছানায় অঙ্গ দুলিয়ে শুয়ে পড়ছেন। ওজন দেখে মনে হয় না খাবারের এঁদের কোনো অভাব আছে বা দুর্মূল্যতার দরুণ এঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছেন। কি করে হবেন ? দিল্লীর দুর্মূল্যতার কারণও যে এঁরাই। দিল্লীর বাজার, বিশেষ করে প্রভিশন্ স্টোরগুলোর শতকরা আশিভাগ এঁদেরই হাতে। তাই দিল্লীর দু-পাঁচটা রাস্তার মোড়ে এঁদের 'মেলোড্রামাটিক থিয়েটার দেখে অভিভূত না হয়ে থাকতে পারলাম না। রাজনীতিতে না এসে ফিল্ম-এ গেলে বোধহয় এঁদের 'কেরিয়ার' আরও ভালো হতো। বোম্বাই-এর ফিল্ম-এর রাজাদের ঠিকানা এই ভুঁইফোড় রাজনীতিকদের জানা না থাকলে তাঁদের সনির্বন্ধভাবে জানাচ্ছি—আমার কাছে সব ঠিকানা মজুত আছে। প্রয়োজন হলে এখনও দিতে পারি।

হাঙ্গার স্ট্রাইক আমরা কখন্ করি ? দাম্পত্য-কলহের কথা ছেড়েই দিন (সেটা শুধু বাঙালীদের ঘরেই প্রচলিত ; স্বামী রাগ করে দপ্তরে অভুক্ত গিয়ে কি করেন আমরা সবাই জানি, অভুক্ত থাকেন শুধু নির্বোধ গৃহিণী।) রাজনীতিতে এই হাঙ্গার স্ট্রাইক প্রচলিত করে মহাত্মা গান্ধী যে

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

কি বিপদ বাধিয়েছেন সেটা বর্তমান নেতৃবৃন্দ হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছেন। সেই চালাক চাষীটার গল্প মনে পড়ে না কি ?

একটা চাষী আর একটা বর্ধিষ্ণু চাষীর কাছ থেকে বেশ মোটা রকমের কিছু টাকা ধার নিয়েছিল। আসল তো দূরের কথা সুদটুকু শোধ করারও নাম করছিল না।

গ্রামের সবাই মিলে বলল, 'দে না গিয়ে একটা চারশো কুড়ি নম্বর ঠুকে। ঠকাচ্ছে যে তোকে।'

সমন এলো। জীবন্ত সমন। কোর্ট থেকে। তখন চালাক চাষী গ্রামের সবচেয়ে বড় উকিলের শরণাপন্ন হলো। অনেক ভেবে-চিন্তে সে চাষীকে একটা পরামর্শ দিল। পরামর্শ মত কোর্টে গিয়ে সে চুপ করে বসে রইলো।

হাকিম ডাকলেন। প্রশ্ন হলো, 'তুমি এর কাছ থেকে এতো টাকা ধার নিয়েছিলে ?'

চাষী এদিক-ওদিক ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। তারপর জবাব দেয়, 'ব্যাঃ।'

ধমক দিয়ে হাকিম বলেন, 'চালাকী নয়, জবাব দাও। প্রশ্নের জবাব দাও। বলি, তুমি এর কাছ থেকে কত হাজার টাকা ধার নিয়েছিলে ?'

আবার জবাব এলো, 'ব্যাঃ।'

উকিল বললেন, 'বলুন ধর্মাবতার, এরকম নির্বোধ উন্মাদকে কেউ কখনও অতগুলো টাকা ধার দিতে পারে ? এ সব প্রতারণা।'

চালাক চাষী জিতে গেল।

তখন উকিল এসে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, এবার আমার ফীসটা। কি রকম জিতিয়ে দিলুম। বলো দিকি নি।'

চালাক চাষী বললে, 'ব্যাঃ।'

উকিল নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ল।

এও যেন তাই। এতদিন রাজনীতিক পণ্ডিতেরা কথায় কথায় হাঙ্গার স্ট্রাইকের ভয় দেখাতেন। সে উপবাসের পিছনে ছিল একটা সাধনা একটা সঙ্কল্প, অটল সঙ্কল্প। একটা লোকের তপস্যা-লব্ধ সাধনায় একটা প্রদেশ গড়ে উঠলো। সরকারকে কাঁপিয়ে তুলেছিল ক্ষীণকায় একটি অন্ধ্রবাসী।

একটা লোকের সংহত শক্তি যেখানে অতখানি শক্তিশালী সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে পারে, সেখানে ঘটা করে দলে দলে অতোগুলো লোকের তাকিয়া হেলান দিয়ে একটা মানুষ দেখানো ছলনার তাৎপর্য কি ? মনে পড়ে সেই মহাশক্তিমান বিপ্লবী বীরকে—যাঁর একার আমরণ অনাহারব্রতে সমগ্র ভারতের সংহত বৃটিশশক্তি সেদিন কম্পিতবক্ষে হয়েছিল ভীত-সন্ত্রস্ত ? মনে পড়ে একটি বিপ্লবী দেশপ্রেমিকের

আমরণ অনাহারব্রতে সমগ্র ইটালীতে এসেছিলো আলোড়ন ? মনে পড়ে ক্ষীণকায় জাতির জনকের অনাহার-ব্রতে সেদিন সমগ্র জাতির জীবনে জেগেছিল যে নব প্রাণস্পন্দন ?

আজ সেই পবিত্র ব্রতের নাম ধরে এ ছিনিমিনি খেলা কেন ? কেন এ প্রবঞ্চনা। শুধু ব্রতের ভাণ নয়, ব্রতের পরে সাইক্লোস্টাইল স্টেটমেন্টে কেন এ প্রচার-ক্ষুধা ? ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এ অভিনয় করলে যেমন এ ব্রতের কোনো অর্থ হয় না, তেমনই দিল্লীর জনতাকেও নিরর্থক হয়রানিতে শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতের অগ্রগতির পথেও যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হচ্ছে না কি ?

তথাকথিত উপবাসব্রতে দিল্লীর জনগণের ভিতর সামান্যতমও সাড়া এসেছে কি ? তারা কোথায় ? দুর্মূল্যতার যূপকাষ্ঠে যারা দিনান্তের মুখের গ্রাসটুকু সংগ্রহেই ব্যস্ত তাদের সময় কোথায় ? যেদিন তারা ব্যাঘ্রগর্জনে বাস্তব বিপ্লবের সূচনা করবে সেদিন পথ-কুকুরের মতন মেকী দেশপ্রেমীর মুখোস-আঁটা সমাজদ্রোহীর দল পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। কি অন্যায় কথা। দোকানগুলো বন্ধ রাখার এ ভেল্কিবাজীটুকু কি কেউ ধরতে পারে না ? এই তথাকথিত আন্দোলনের কর্ণধারদের নিজেদের হাতেই রয়েছে চাবিকাঠি। এদিকে তাঁরাই একটা নকল আন্দোলন স্থরু করে জনমানসকে ভানুমতীর খেল দেখিয়ে বাস্তব আন্দোলন থেকে দূরে রাখছে। দিল্লীর জনতার চোখ খুলবে কবে ?

মনে পড়ে বহুদিন পূর্বে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে দুই জমিদারের ভিতর একটা কলহের সূত্রপাত হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল পূর্ব বাংলার এক নিরালা পল্লীতে।

এক জমিদার অন্য জমিদারপুত্রের মাথাটি ফাটিয়ে নির্বিবাদে বাড়ি ফিরে গেছেন। খানিকক্ষণ পরে চেতনাহীন জমিদারপুত্রকে ঘিরে জমিদারবাড়িতে বিরাট জটলা। রক্ত দেখে পুলিশও এসে হাজির। এমন সময় ধীর পদক্ষেপে শান্তভাবে এসে দাঁড়ালেন জমিদার। যেন কিছুই জানেন না : 'এঁ্যা এত ভীড় কেন ? তোদের বাড়ি এত লোকের জটলা কেন ?'

জমিদারপুত্রের চেতনাটা একটু একটু ফিরে এসেছিল। একটা হেঁচকা টান মেরে উঠে বসে চীৎকার করে উঠলো, 'ও রে জমিদারের পো তোরে তো খাইছি।'

জমিদার চোঁ-চা দৌড়।

দুর্ভাগ্য, দিল্লীর জনতার মাথা ফাটা অবস্থাতেও চৈতন্যটুকু ফিরছে না। না হলে পুঁজিবাদী ভণ্ড ব্রতধারীদের ঘাড়টা নেড়ে (কানটা ধরতে ভদ্রতায় বাধে।) একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—ভবনদীর পারে এসে বিড়ালতপস্বী আহ্নিকে বসেছো ?

প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছি সেই দিনের—প্রকৃত জনতা যেদিন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উঠে রুখে দাঁড়াতে শিখবে। রাজনৈতিক দলাদলির ঊর্ধ্বে, জাতীয় জাগরণের নব অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় আছি।

সাংবাদিক বন্ধু-সতীর্থদের শুধু বলতে চাই—খাবার লুকিয়ে রেখে যাঁরা ঘটা করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গলায় মালা পরে ব্রতোপবাসের ভাণ করে থাকেন, তাঁদের কাহিনীকে কেন্দ্র করে সংবাদ গড়া চলে না। এ জাতীয় নিউজ সেন্সটা সত্যিই নুইসেন্স। নিউজ হলো সেইটে, সকাল সাতটা থেকে খেটে বিকেলে লাইনে দাঁড়িয়ে চিনিটুকু সংগ্রহ করতে না পেরে যে শ্রমিক তার শিশুটির মুখে খাবারটুকু জোগাতে পারে না। ঘটা করে যাঁরা মালা পরে ছুটছে, চিনির বস্তা যে তাঁদেরই মাল-গুদোমে।

আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট সত্যিই গ্রেট। লাখ টাকার একটি লাইন বলেছিলেন—'সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।' অপূর্ব এঁদের অভিনয়। এঁদের চিনতে জনতার এখনও ঢের দেরি আছে কি ?

রঙ্গজগৎ

বাউল গায়ক নবনী দাস

বাংলা দেশের বিশিষ্ট বাউল গায়ক শ্রীনবনী দাস গত ২৩শে আগস্ট বীরভূমে নিজ বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। যৌবনকালে ইনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভ করেছিলেন। ইদানীংকালে বিশ্বশান্তি ও যুবউৎসবের অনুষ্ঠানেও ইনি গান গেয়েছেন। তাঁর পুত্র শ্রীপূর্ণ দাস, লক্ষ্মণ দাসও সঙ্গীত-জগতে পরিচিত।

রাষ্ট্রপরিচালিত স্টুডিও

স্টুডিও কর্মী ও টেকনিশিয়ানরা ন্যায্য পারিশ্রমিক ইত্যাদির জন্য যে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, আপাতত তার মীমাংসা হয়েছে জানা গেল। সম্মানজনকভাবে যদি মীমাংসা হয়ে থাকে তবে তা আনন্দের বিষয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার দেশে সর্বাধিক বড় চিত্রনির্মাতা। বছরে সহস্রাধিক সংবাদ, তথ্য ও প্রচারচিত্র সরকার নির্মাণ করান। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন স্টুডিওতে ভাড়া দিয়ে, ল্যাবরেটরীর চার্জ দিয়ে এসব চিত্র নির্মিত হয়। সরকার সর্বাধিক বড় চিত্র-নির্মাতা হওয়া সত্ত্বেও সরকারের নিজস্ব কোন স্টুডিও নেই। এযাবৎ স্টুডিও করার পরিকল্পনাও প্রকাশ করা হয় নি। অথচ সরকারের নিজস্ব স্টুডিও থাকলে তাতে সরকারী চিত্র নির্মাণে যেমন অর্থের সাশ্রয় হতো; তেমনি কাজের মানও উন্নত হতে পারতো। এখন যে মুনাফাটা স্টুডিও মালিকরা লাভ করে সেটা সরকারী তহবিলে আসতো। সর্বোপরি স্টুডিও কর্মী ও টেকনিশিয়ানদের কাজের নিরাপত্তা এবং মজুরীর দিক থেকে একটা যুক্তিসঙ্গত মান দাঁড় করানো যেতো।

চলচ্চিত্র আজ আর নিছক মনোরঞ্জনী ব্যাপার নয়; একটা দিক মাত্র। সংবাদচিত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞানচিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ও শিক্ষার জন্য চিত্র নির্মাণ প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশের সরকার করে থাকে। এদিক থেকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন স্টুডিওর প্রয়োজন আছে।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

আরোহী

তপন সিংহের সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'আরোহী' একটি নতুন স্বাদের ছবি। অভিনবরূপে ও নতুন পরিবেশে এই ছবির আঙ্গিক গঠিত হয়েছে। গতানুগতিক ছবি দেখে যখন আমাদের ছবির প্রতি বীতরাগ এসে গেছে, সে সময় এই ছবিটি বৈচিত্র্যের স্বাদ দিয়েছে।

সাহিত্যিক বনফুলের একটি গল্প 'আরোহী'। এই গল্পের নায়ক অর্জুন মণ্ডল সমাজে অপাংক্তেয়। জীবনের অভিজ্ঞতায় সে বুঝতে পারলো লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হওয়া যায় না। প্রায় ৪০ বছর বয়সে সে লেখাপড়া সুরু করলো, এবং কঠোর অধ্যবসায়ে শিক্ষালাভ করলো—তার শিক্ষাগুরু স্থানীয় ডাক্তারের ছেলে বলাই। লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটলো। নিজের জীবনের যে অপূর্ণতা, বলাইকে দিয়ে সে তা পূর্ণ করতে চাইল, তাই নিজের আজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে বলাইকে বিলেত পাঠালো।

ছবির সুরুতে দেখা গেল ডাক্তারের কিশোর পুত্র বলাই খেলা করছে প্রস্তরাকীর্ণ এক উপত্যকা ভূমিতে। দেখেই মনে হবে, এ বাংলা দেশ নয়। বাংলার বাইরের কোন জেলা। তারপরে জমিদার ও দুধওয়ালীর কথায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

একটা লোক হাতে মাছ নিয়ে দৌড়চ্ছে, তার পিছু পিছু তাড়া করছে। লোকটা সরকারী ডাক্তারখানায় ঢুকে ডাক্তারের কাছে নালিশ জানালো—জমিদারের লোক তার মাছ কেড়ে নিতে চায়। এই লোকটি স্থানীয় মৎসজীবী অর্জুন মণ্ডল। এই অর্জুন লেখাপড়া শিখে, পরে হাসপাতালের ড্রেসার আর ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার হয়েছিল। তার চেয়েও বড়, ডাক্তারের অবর্তমানে অভিভাবক। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে সে মানবতার বিকাশের স্তর থেকে স্তরান্তরে আরোহণ করেছিল।

ডাক্তার এক দরদী-হৃদয় মানুষ। সে উপার্জনের জন্য ডাক্তারী করে না, করে মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে। গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করা যার স্বভাব। পরিচালক তপন সিংহ এই দুটি প্রধান চরিত্রের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন ডাক্তার-পুত্র বলাইকে; বাল্য, কৈশোর ও যৌবন—তিন বয়সে।

ছবিতে বিভিন্ন চরিত্র উপস্থিত হয়েছে। ছোটগল্পের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের রূপ দেবার জন্য পরিচালক কিছু স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন। পরিচালক একজন সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে তুলেছেন। অপাংক্তেয়কে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন। সামাজিক মঙ্গলের দিক থেকে এই বলিষ্ঠতার জন্য তিনি ধন্যবাদ-ভাজন। কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে একটা পাগলাটে ভাব ও মোটা কথায় বক্তব্য প্রকাশের জন্য আশানুরূপ অন্তরস্পর্শী হয়ে ওঠে নি, অন্তত বুদ্ধি দিয়ে যাঁরা বিচার করবেন তাঁদের কাছে, তবে সাধারণ মানুষের কাছে এই চরিত্র আবেদনহীন নয়, এবং অর্জুন সকলের কাছে একটা বাণী নিয়ে পেঁৗছতে সমর্থ হয়েছে। পরিচালক যথেষ্ট যত্নসহকারে চরিত্র সৃষ্টিতে সহায়তা করেছেন, কিন্তু অর্জুন যখন ইংরেজীতে কথা বলতে শিখেছে, সে সময় ডিকশনারী মুখস্থ করে বিদ্যার্জন করার ধারণা প্রকাশ সামঞ্জস্যহীন। অথবা কন্যার বিয়ের সময় পুলিশ ডেকে এনে হুলুস্থুল বাধানো তার মত চরিত্রের লোকের পক্ষে খুব স্বাভাবিক মনে হয় নি, হাসির সুযোগ

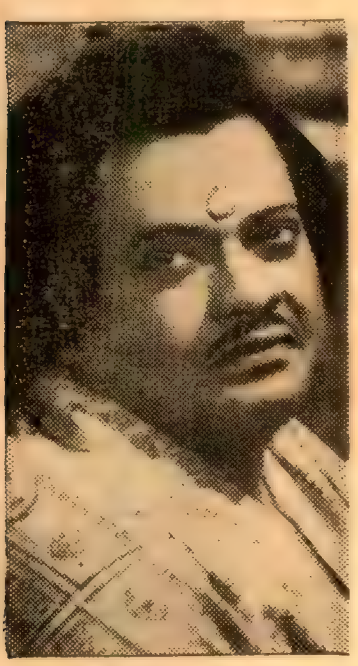

● নির্মীয়মাণ ছবি 'মায়াবিনী লেন'-এর একটি ভূমিকায় জহর রায়।

উপস্থিত করেছে মাত্র। ছবিটিকে সাধারণ দর্শকদের গ্রহণযোগ্য করার জন্য গানের সংখ্যাও অপ্রয়োজনীয়-ভাবে বেশি হয়েছে। প্রথম একটি দৃশ্যে প্রয়োজন থাকলেও শেষের দিকে বাউলকে উপস্থিত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রথম দিকে ছবিটিকে মন্থরগতি এবং আতিশয্যপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু দ্বিতীয়াংশে গতি যেমন বেড়েছে তেমনি ভাবপ্রবণ ঘটনা-বহুলতায় মনে রেখাপাত করে।

অর্জুন মণ্ডলের চরিত্রকে কালী ব্যানার্জী গভীর বিশ্বাসের সাথে রূপায়িত করেছেন। তবে পাগলাটে ভাবটা এত বেশি না থাকলে ভাল হতো। এটা অবশ্য অভিনেতা অপেক্ষা পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারের দোষ। সাধারণ সহজ সরল মানুষের জীবনের বলিষ্ঠ দিক কালী ব্যানার্জীর অভিনয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিকাশ রায় অভিনীত ডাক্তারের প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবেন। দুধওয়ালীর টাইপ-চরিত্রটি ছায়াদেবীর এক অপূর্ব সৃষ্টি। ছোট্ট একটি চরিত্র অভিনয়ে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বড় বলাই ও তার নবপরিণীতা স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে যথাক্রমে অজয় গাঙ্গুলী ও দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত। উভয়েই নবাগত, কিন্তু সাবলীল অভিনয়ের জন্য তারা দুজনেই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে সুদর্শনা দোলনচাঁপার লজ্জানম্রতা, একটু ছেলেমানুষী ভাব ও দুষ্টুমি সকলের ভাল লেগেছে। ডাক্তারের স্ত্রীর চরিত্রে শিপ্রাদেবী এবং জমিদার-রূপে শ্যাম লাহা, রবি ঘোষ, জহর রায়, রসরাজ চক্রবর্তী, নৃপুর গোস্বামী, সুখেন দাস প্রমুখ সকলেই যথাযথ অভিনয় করেছেন।

ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ দিগন্ত-বিস্তৃত দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ। গ্রাম্য পরিবেশ ও নির্জনতা, প্রাকৃতিক শোভা এবং শান্ত মেজাজ—চিত্রগ্রহণকারী বিমল মুখার্জী তুলে ধরেছেন। কণ্ঠসঙ্গীতের বাহুল্য যদিও আছে, কিন্তু গানগুলি সুগীত এবং আবহ সঙ্গীত প্রশংসনীয়।

বয়স্ক শিক্ষার জন্য প্রেরণা সৃষ্টির দিক থেকে এবং মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ছবিটির সমাজকল্যাণকর ভূমিকা রয়েছে।

● 'আরোহী' চিত্রের একটি ভূমিকায় দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত।

মেরা কসুর ক্যা হ্যায়

বাহার ফিল্মসের এই হিন্দী ছবি প্রেম, বিরহ, শঠের শয়তানী, মৃত্যু ও নানা মর্মান্তিক ঘটনার পর পুনর্মিলনের ছকে বাঁধা কাহিনী। ছবিটি দেখে আমার মনে হয়েছে শিক্ষিত বা যুক্তি দিয়ে যাঁরা বিচার করেন, তাঁদের জন্য এই ছবি তৈরি হয় নি। যাদের জন্য তৈরি হয়েছে তারা সামনের দুই শ্রেণীতে বসে শিস দিয়ে, নানারূপ বাক্য ছুঁড়ে দিয়ে, বিভিন্ন শব্দ করে ছবিটিতে যে আনন্দ পাচ্ছে সে-কথা প্রকাশ করেছে।

ছবিতে ধর্মিন্দর সেজেছেন ব্যারিস্টার ও প্রেমিক; নন্দা দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করেছেন, একদিকে গ্রাম্য সরল বালিকা, আর একদিকে শহরের নর্তকী। একই চেহারার বিপরীতধর্মী দুটি চরিত্র। শশীকলা সেজেছেন এক কালনাগিনী ছলনাময়ী নারী—যে একটা সংসারকে উচ্ছন্নে দেবার পথে নিয়েছিল। তার শেষ শাস্তি পেল যার কাছে এবং যে

● 'বিংশতি জননী' চিত্রে মাধবী মুখার্জী, গীতা দে, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা ও লিলি চক্রবর্তী

সমস্ত শয়তানীর কথা প্রকাশ করেছিল, সেই চরিত্রে অভিনয় করেছে ওমপ্রকাশ। আর বাবলু নামে একটা ছেলে সমস্ত চিত্রনাট্যের সূত্ররূপে কাজ করেছে। যতই অস্বাভাবিক ও অশোভন মনে হোক, শিশু অভিনেতাটির পাঠ মুখস্থ করার এবং অভিনয় শক্তির প্রশংসা না করে পারা যাবে না।

কাহিনীর প্রথমাংশে কেবল হাসির ঝরনা ঝরেছে, শেষের অংশে দুঃখের কালোছায়া। নায়িকার মা-বাবা আত্মহত্যা করলো মেয়ে সম্পর্কে ভুল খবর পেয়ে, নায়িকাও নদীতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু বেঁচে গেল এবং পুনর্মিলন ঘটলো।

ছবিতে প্রচুর গান ও নাচ রয়েছে। যে নাচগান সঙ্গতি-অসঙ্গতি বিবেচনা না করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শহরের নর্তকীরূপে নন্দার স্ল্যাকস্ পরিহিতা অবস্থায় কয়েকটি নাচে কিছুটা কুরুচির পরিচয় ছিল বলে এক শ্রেণীর দর্শক শিস দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ মাতিয়ে তুলেছিল। সুতরাং হিন্দী মনোরঞ্জনী ছবির সকল আকর্ষণ ছবিটিতে আছে। ছবির পরিচালক কৃষ্ণাণ পানজু।

নাটকের কথা

কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যসংস্থা 'মুখোশ' এবারে ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত দুটি নাটক 'নিশাচর' এবং 'রজনীগন্ধা' নিয়ে রাজধানী দিল্লীতে যাচ্ছে। আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহ-ব্যাপী উপরোক্ত নাটক দুটি নয়াদিল্লীর AIFACS HALL-এ এঁরা মঞ্চস্থ করবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধনঞ্জয় বৈরাগীর রহস্য নাটক 'নিশাচর' ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে কলকাতার থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে শতাধিক রজনী অভিনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'রজনীগন্ধা' সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের নাটক। চারটি চরিত্র সংবলিত এই নাটকটি কলকাতা, শহরতলীতে এবং অন্যান্য প্রদেশে অভিনীত হয়ে প্রচুর জনসমাদর লাভ করেছে।

উপরোক্ত নাটক দুটির বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছেন সর্বশ্রী তরুণ রায়, দীপান্বিতা রায়, সমরেশ চক্রবর্তী, প্রশান্ত ঘোষ, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়, অনুকূল দত্ত প্রভৃতি মুখোশের শক্তিমান শিল্পিবৃন্দ।

স্টুডিও খবর

* অজয় করের পরবর্তী ছবি 'কাঁচ কাটা হীরে'র চিত্রগ্রহণ খুব শীঘ্র আরম্ভ হচ্ছে। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপদান করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও বৈজয়ন্তীমালা। ছবিটির প্রযোজক আর ডি বনশাল। বৈজয়ন্তীমালা এই প্রথম বাংলা ছবিতে অভিনয় করছেন।

* রাজেন তরফদারের 'বনমল্লিকা'র ছবির জন্য নায়িকা নির্বাচিত হয়েছেন সন্ধ্যা রায়।

* ঋত্বিক ঘটক 'বগলার বঙ্গদর্শন' নামে একটি ছবি করছেন। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁরই লেখা। নায়ক-নায়িকার চরিত্রে দুজন নতুন শিল্পী অভিনয় করবেন।

সংবাদ বিচিত্রা

সত্যজিৎ রায়ের 'দুই' শীর্ষক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা

এই মাস হতে নিউইয়র্কে নতুন যে টেলিভিশন বা বেতারবীক্ষণ কার্যসূচী শুরু হবে, তাতে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের পরিচায়ক দুটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানসূচীর নামকরণ করা হয়েছে 'ইণ্ডিয়া হণ্টিং প্যাসেজ'। ১৪ই সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও প্রযোজক শ্রীসত্যজিৎ রায় রচিত 'দুই' শীর্ষক একটি সংলাপ বর্জিত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এটি একটি ধনী ও একটি গরীব ছেলের সংঘর্ষের কাহিনী।

ঐ দলিল চিত্র বা ডকুমেন্টারী ফিল্মের অপর অংশে দেখানো হবে অজন্তা গুহার ফ্রেস্কো চিত্রাবলী এবং খাজুরাহোর অপর ভাস্কর্য। এরই মাঝে মাঝে থাকবে কলকাতার চিলড্রেনস লিটল থিয়েটার ইউনিটের নৃত্য এবং রবিশঙ্করের সেতার বাজনা।

ঐ অনুষ্ঠানে ভারতের একটি মেলার দৃশ্যও প্রদর্শিত হবে। রামায়ণকে ভিত্তি করে রাজস্থানে যে পুতুল নাচ দেখানো হয়ে থাকে, ঐ মেলার দৃশ্যে তাও দেখা যাবে। বোম্বাইয়ের লিটল ব্যালেট্রুপ বা শিশু ব্যালে নৃত্যশিল্পীদের নৃত্য ১৯৬০ সালে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিল এবং ইয়োরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তাদের সেই নৃত্য ঐ অনুষ্ঠানে দেখা যাবে।

১৫ই সেপ্টেম্বরের অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে 'পুণ্যসলিলা গঙ্গা' নামে দলিল চিত্রটি। হিমালয় পর্বত হতে প্রবাহিত হয়ে ভারতের আত্মাস্বরূপ এই নদীটি বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে। এই চিত্রে তীরবর্তী, প্রধান প্রধান জনপদের দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, মির্জাপুর, পাটনা, কাশী, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের জীবনধারা ও সংস্কৃতি ও শিল্পের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কোম্পানী এই চিত্রখানির নির্মাতা। প্রযোজক লো হ্যাজামের পরিচালনাধীনেই এই চিত্র নির্মিত হয়েছে।

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য : এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

● 'আই মিলন কি বেলা' হিন্দী ছবিতে সায়রাবানু

সানফ্রান্সিসকো উৎসবে 'ছায়াসূর্য'

পার্থপ্রতিম চৌধুরী পরিচালিত 'ছায়াসূর্য' ছবিটি ভারত সরকার কর্তৃক সানফ্রান্সিসকোর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য মনোনীত হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক উৎসব আগামী ১৪ই অক্টোবর থেকে ২৭শে অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। 'ছায়াসূর্য' ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শার্মিলা ঠাকুর।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র-কর্মী সমিতি

সোভিয়েট ইউনিয়নের চলচ্চিত্র-কর্মী সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন চিত্র পরিচালক নিও কুলিডঝানভ। পরিচালক সেগেই গেরাসিমভ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

আইজেনস্টাইনের অসম্পূর্ণ কাজ

বিখ্যাত পরিচালক সেগেই আইজেনস্টাইনের সব লেখা, নক্সা এবং আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে ছয়খণ্ডের একটি পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে। এই পুস্তকে অনেক অপ্রকাশিত নক্সা, চিত্রনাট্য এবং সিনেমা-তত্ত্ব আছে, যা প্রত্যেক চলচ্চিত্র-কর্মীর পক্ষে বিশেষ আগ্রহের ব্যাপার। পুশকিন সম্পর্কে একটা চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা এবং চিত্রটিকে বর্ণরঞ্জিত করার কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। এই কল্পনা বাস্তব রূপ পেলে আইজেনস্টাইন হতেন বিশ্বের প্রথম রঙিন চিত্রনির্মাতা।

শব্দহীন ক্যামেরা

সংবাদ-চিত্র ক্যামেরাম্যানদের স্বপ্ন এতদিনে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মস্কোতে এমন ক্যামেরার নমুনা তৈরি হয়েছে যাতে ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মের জন্য চিত্র এবং শব্দগ্রহণের কাজ একসঙ্গে করা যাবে। কাজের সময় এই ক্যামেরা মাত্র ৩৫ ডেসিবেল শব্দ তৈরি করবে। এই ক্যামেরার দ্বারা যে-কোন স্থানে যে-কোন অবস্থায় ক্যামেরাম্যানরা কাজ করতে পারবে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল থিয়েটার মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয়শক্তির পরিচয় দিয়ে সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করেন। স্বয়ং মধুসূদন প্রথম রাত্রের অভিনয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং গিরিশবাবুর অভিনয়প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহেন্দ্র বোসের প্রাণী অহল্যা যে কল্পনরসের সৃষ্টি করতো বাংলার রঙ্গমঞ্চে আজও তা অতুলনীয়। মুস্তাফি সাহেবের ধনদাসও সবাইকে মোহিত করতো।

১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক পাথুরিয়াঘাটায় গঙ্গার ধারে কলকাতা জাতীয় হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। হাসপাতালের জন্য ডাক্তার ম্যাকনামারা এই সময় চাঁদা তোলবার বন্দোবস্ত করেন। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস সুর এবং নগেন্দ্রনাথ পাল ডাক্তার ম্যাকনামারার সঙ্গে দেখা করে ঠিক করেন, অভিনয় করে হাসপাতালের জন্য কিছু টাকা তাঁরা তুলে দেবেন। টাউনহলে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাধীনে নীলদর্পণ নাটক মঞ্চস্থ হয়। গিরিশবাবু নিজে মিঃ উডের ভূমিকায় নামেন। এ নাটকের অভিনয় নাকি এত চমৎকার হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল। রূপসজ্জায় এবং বাচনভঙ্গীতে গিরিশচন্দ্রকে অনেকে চিনতেই পারেন নি—ভেবেছিলেন, ম্যাকনামারা সাহেবের কোন ইংরাজ বন্ধু (যিনি বাংলা জানেন) বোধহয় এ ভূমিকায় অভিনয় করছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে উডের ভূমিকায় মুস্তাফি সাহেবের অভিনয় নাকি আরও উচ্চস্তরের হোত।

অভিনয়ে সাহেবরা বেশি আসতে পারেন নি। কিন্তু অভিনয়ের প্রশংসা শুনে তাঁরা ইচ্ছা প্রকাশ করেন

শিলালি

আর একটি শো করবার জন্য। ৩১শে মার্চ ১৮৭৩-এর Englishman পত্রিকায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

"On Saturday night (29th March), the members of the Calcutta National theatre performed in the Town Hall the play of Nildarpana for the benefit of the National Hospital. It is a great pity that so short a notice was given, as on that account very few Europeans were present. However, the natives mustered very strongly on the occasion and testified by their repeated plandits how much they enjoyed the performance. The acting was exceedingly good throughout. We hope, the management will give another performance shortly."

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এই সময় অর্ধেন্দুশেখর নগেন্দ্রনাথ হিন্দু ন্যাশনাল নাম দিয়ে নতুন থিয়েটার খোলেন। ঢাকায় গিয়ে অভিনয় দেখিয়ে এঁরা প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে ১৭ই মে থেকে ৩১শে অবধি নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, জামাইবারিক এবং কৃষ্ণকুমারী নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। সারা ঢাকা শহরে সবার মুখে তখন অর্ধেন্দুর নাম—তাঁর অভিনয় দেখে সবাই একেবারে মুগ্ধ। জলধরের চরিত্রে মুস্তাফি সাহেবের জুড়ি ছিল না। উড সম্বন্ধেও এক কথাই বলা চলে। তাঁর ভীমসিংহ এবং নিমচাঁদও দর্শকদের ভালই লেগেছিল।

অমৃত মুখার্জী, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী এবং নগেন্দ্রনাথও অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৮৭৩ সালের অগাস্ট মাসে ৯।৩ বিডন স্ট্রীটে বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়—এঁদের নিজস্ব মঞ্চ ছিল। এঁদের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। এঁরাই প্রথম স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী আমদানী করেন। মাইকেল তখন মৃত্যুশয্যায়—থিয়েটার সম্বন্ধে কবির সঙ্গে শরৎ ঘোষ আলোচনা করতে যান। মাইকেলই পরামর্শ দেন স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেত্রী আনবার জন্য। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে থিয়েটারের উদ্বোধন হয়—তারপর তাঁর শেষ সম্পূর্ণ নাটক মায়াকাননও এখানে মঞ্চস্থ হয়। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় আজীবন বেঙ্গলী থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। ১৯০১ সালে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই থিয়েটারটি উঠে যায়। বিহারীলাল ছিলেন এখানকার মধ্যমণি। একাধারে তিনিই ছিলেন এখানকার প্রধান অভিনেতা, নাট্যকার এবং অভিনয় শিক্ষক। বিহারীবাবুর মৃত্যুতে গিরিশচন্দ্র বলেন : 'বঙ্গের রঙ্গমঞ্চ হইতে আর একটি উজ্জ্বল তারা খসিল। বেঙ্গল থিয়েটার আজ অনাথ।'

বিহারীবাবুর লেখা অনেক

নাটক খুব জমে যেত এবং এ সব নাটকের অভিনয় থেকে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রচুর রোজগারও হয়। গোলাপ (সুকুমারী দত্ত), জগত্তারিণী, এলোকেশী ও শ্যামাসুন্দরী এই চারজনই এখানে এ্যাকট্রেস হিসাবে যোগ দেন—বাংলা পেশাদার মঞ্চের এঁরাই প্রথম অভিনেত্রী। দুর্গেশনন্দিনীতে সুকুমারীর বিমলা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। পরে মুস্তাফি সাহেবের কাছে শিক্ষা নিয়ে সুকুমারী প্রতিভাশালী অভিনেত্রী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

মহিলা অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করা সম্বন্ধে গিরিশবাবুর মন্তব্য হল—'সকল দেশেই বালক লইয়া প্রথমে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় আরম্ভ হয়। কিন্তু সে অভিনয় সাধারণের তৃপ্তিকর না হওয়ায়, স্ত্রীলোকের ভূমিকা (part) স্ত্রীলোক করিতে থাকে। ন্যাশনাল থিয়েটারে বালক লইয়া অভিনয় হইত। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে স্ত্রীলোক অভিনয়কার্যে প্রবৃত্ত হইলে ন্যাশনাল থিয়েটারে আর আদৌ লোক হইত না। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায় বালক লইয়া অভিনয় করিতে গিয়া বহু আয়াস-সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিলেন। বালকের অভিনয়কার্যে যে কেবল সুন্দররূপে অভিনয়কার্য সম্পন্ন হয় না তা নয়, বালকেরও সর্বনাশ হয়। কোমল বয়সে স্ত্রীলোকের হাবভাব অনুকরণ করিতে গিয়া এক রকম মেয়েলি ঢং আজীবন রহিয়া যায়। বালকের অভিনয়ে অন্যান্য প্রচুর দোষও উপস্থিত হয়। কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রীরূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন দেশে কে পাইয়াছে? অদ্যাপি নটী নামের সহিত উচ্চনীতির সংযোগ কেহই করেন না। কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোক না লইয়া আমরা কাহাকে ডাকব? গিরিশবাবুর আগে কি পরে আর কেউ এত প্রাঞ্জলভাবে এ সমস্যার আলোচনা করেন নি।

১৮৭৩-এর শেষ দিকে হিন্দু ন্যাশনালের নতুন নামকরণ হোল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এখানে কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়। গিরিশচন্দ্র কৃত মৃণালিনীর মঞ্চরূপায়ণ দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছিল। মৃণালিনীতে অভিনয়শিক্ষাও দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। ন্যাশনাল এবং গ্রেট ন্যাশনালের সব শিল্পীরা একত্রে এ নাটকে নামেন:

পশুপতি—গিরিশবাবু, হৃষীকেশ—অর্ধেন্দুশেখর, হেমচন্দ্র—নগেন্দ্র ব্যানার্জী, দিগ্বিজয়—অমৃতলাল বোস, ব্যোমকেশ—অমৃত মুখার্জী (বেলবাবু), বক্তিয়ার—মহেন্দ্র বোস প্রভৃতি।

(ক্রমশঃ)

পাঠক মন

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠকমন' বিভাগটির সূচনা করার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদিকা নিঃসন্দেহে পাঠক-পাঠিকাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ লাভ করবেন। কোনো পত্রিকার বহুল প্রচারের ওপর পাঠক-পাঠিকাদের মতামত বিশেষভাবে নির্ভর করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাঠকের মতামত প্রকাশ করার মূল্য বোঝে না বর্তমানের অধিকাংশ পত্রিকা। এদিকটি তাই অনাদৃত, অবহেলিত থেকে গেছে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পাঠকের অভিমত প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'পাঠকমন' বিভাগটি সংযোজন করে আপন স্বকীয়তায় এবং বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল হয়েছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' স্বল্পমূল্যে প্রকাশিত রাজনীতি, সমাজনীতি, রস-সাহিত্য, কাব্য, রঙ্গমঞ্চ ও খেলাধূলার উল্লেখযোগ্য প্রকাশন বলে এর আকর্ষণ সার্বজনীন।

এর প্রচ্ছদপটে চলমান সপ্তাহের সর্বোল্লেখযোগ্য খবরের আলোকচিত্র নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। তবে প্রচ্ছদপটের কাগজ আরেকটু উন্নত ধরণের কামনা করি।

'আজকের মানুষ' পর্যায়টি কালোপযোগী। পাঠক এর মাধ্যমে বর্তমান যুগের বিশেষ মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর, ভারত-দর্শন, বঙ্গদর্শন, নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী, রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে পত্রিকাটির মান বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

'গ্রন্থমেলা' বিভাগটি অত্যন্ত মূল্যবান কিন্তু এর পরিসর অতি অল্প। আমার মতে প্রতি সংখ্যায় এটি প্রকাশ না করে, ২।৩ সংখ্যা বাদ দিয়ে এটি একটু বেশি পরিসরের মধ্যে প্রকাশ করলে ভালো হয়। তাতে পত্রিকার কাগজের সংখ্যা ঠিকই থাকবে উপরন্তু পাঠক একসঙ্গে অনেকগুলি গ্রন্থের আলোচনা দেখতে পাবে।

শ্রীপদাতিকের 'শহর-কলকাতা' অনবদ্য রচনা। এর মধ্যে বিশেষভাবে ভালো লেগেছে 'মহানগরীর বৈঠকখানা'। লেখকের আসল নাম ও পরিচয় আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে পেলে খুশি হতাম।

ধারাবাহিক উপন্যাসের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মিষ্টিমধুর উপন্যাস 'কৃষ্ণচূড়া' বেশ ভালো লাগছে। ভালো লেগেছে দিল্লীর পটভূমিকায় লিখিত বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দুরন্ত দেহলী'। এই পত্রিকার রহস্য-উপন্যাসের মান আরেকটু উন্নত ধরণের

আশা করি। এর সঙ্গে আরেকটি কথা—নবীন লেখকদের আরেকটু সুযোগলাভ বাঞ্ছনীয়।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র উল্লেখযোগ্য এবং সার্থক সংকলন এর বিশেষ সংখ্যাগুলি। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেক্সপীয়র বিশেষ সংখ্যা, রবীন্দ্র বিশেষ সংখ্যা এবং নেহরু বিশেষ সংখ্যা।

এই পত্রিকার সব চাইতে বড় ত্রুটি এর মুদ্রণ ও আলোকচিত্র। লেখা মাঝে মাঝে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং ছবিগুলি বেশির ভাগ সময়েই অত্যন্ত আবছা।

পরিশেষে স্বল্পমূল্যের মধ্যেও 'সাপ্তাহিক বসুমতী' নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল বলে এর উত্তরোত্তর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করি।

শ্রীমতী পারিজাত আয়কত
ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ)।

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন উৎসাহী ও নিয়মিত পাঠক হিসেবে, বসুমতীর 'পাঠকমন' পর্যায়ের মারফৎ পাঠক-পাঠিকাদের নিজ নিজ মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ দান ক'রে আপনারা যে উচ্চ মনের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য প্রথমেই অশেষ ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনাদের।

বর্তমানে প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র স্থান স্বতন্ত্র—কারণ এই পত্রিকাটি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন-অলংকারে অলংকৃত সংবাদ বা সাহিত্য অথবা রঙ্গজগতের নিছক পত্রিকা নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এ পত্রিকা হ'ল নামমাত্র মূল্যের এক বলিষ্ঠ সম্পাদনার সাহিত্য, সংবাদ, রঙ্গজগৎ, ক্রীড়াজগৎ ও ফিচার-সাহিত্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে ভারতদর্শন, বঙ্গ-দর্শন, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি বিভাগগুলি যেমন সংক্ষিপ্ত সমাচারের মাধ্যমে দেশ ও তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এবং বিশ্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায়, তেমনই অপরদিকে গল্প-প্রবন্ধ-ধারাবাহিক উপন্যাস-কবিতা ইত্যাদির মাধ্যমে সাহিত্য-রসিকদের সাহিত্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত করে যথেষ্ট।

পত্রিকায় প্রকাশিত 'আজকের মানুষ' বিভাগটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কারণ বর্তমান পটভূমিকায় আমরা যাঁদের নিয়ে বসবাস করব—তাঁরা যদি আমাদের নিকট পরিচিত না হন, তবে তাঁদের সঙ্গে বসবাস করাও দুঃসাধ্য। অতএব বসবাসের পূর্বে তাঁদেরকে আমাদের চিনতে হ'বে, জানতে হবে। বসুমতী তার 'আজকের মানুষ' পর্যায়ের প্রতিটি নিবন্ধের মাধ্যমে সেই দায়িত্বই পালন করে আসছে।

শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' পর্যায়ের ধারাবাহিক নিবন্ধসমূহে বিভিন্ন দেশ-সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা এবং তার পরিচিতি পেশ যেমন প্রশংসনীয়, তেমন বিভিন্ন সাহিত্যিকের বহুমুখী চিন্তাধারার আলোচনাও এখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনাদের 'শহর-কলকাতা' বিভাগটি আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। অতীতের স্রোতে বিলীয়মান কলকাতার প্রাচীন ইতিহাসের কঠিন বাস্তব এবং গূঢ় সত্যকে কেন্দ্র করে শ্রীপদাতিকের 'শহর-কলকাতা' রচিত হলেও—লেখকের রচনা-কৌশলে, শব্দ-বিন্যাসে তা রসসিক্ত, ছন্দোময় এবং আকর্ষণীয়। কঠিন বাস্তবকে নিয়ে এমন ছন্দোময় কাব্যিক-রচনা খুব কমই চোখে পড়ে। আধুনিক কলকাতার নবীন অধিবাসীর চোখে, প্রাচীন কলকাতার রহস্যময়ী রূপ ও তার সংস্কৃতিকে তুলে ধরার পক্ষে, লেখকের এ এক সার্থক প্রয়াস। এ লেখায় শ্রীপদাতিকের অবদান অতুলনীয় ও বিস্ময়কর। এ বিভাগের সংযোজন পত্রিকাটির মানকে ঊর্ধ্বগামী করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদেরও এক নতুন কৃতিত্বের অধিকারী করেছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণচূড়া', মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের 'আঁধারমানিক', নতুন সংযোজন 'বাণিজ্যের সেকাল ও একাল', 'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' এবং 'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী' যে পত্রিকাটির যথেষ্ট মর্যাদা বাড়িয়েছে—তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু আপনাদের 'ক্রীড়া-জগৎ' বিভাগটি বড় সংকীর্ণ, বোধহয় একটু বিস্তারিত করা উচিত। কারণ বর্তমান সভ্যতায়—'ক্রীড়া-জগতের' অবদানও কম নয়।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও, পত্রিকাটি কয়েকটি দোষে দোষী। যেমন, মুদ্রণের ত্রুটি পাঠকমনে দুঃখ দেয়। আবার ক্রীড়া, রঙ্গজগৎ প্রভৃতি বিভাগের ছবিগুলি বড় অস্পষ্ট। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র এই সব সামান্য ত্রুটি দূরীকরণের ব্যবস্থা ক'রে পত্রিকাটির মান আরো উঁচু করার জন্য বসুমতী কর্তৃপক্ষের নিকট আমার অনুরোধ রইল। কারণ বর্তমান জটিল রাজনীতিক্ষেত্রে পত্রিকাটির অবদান যতোই অসামান্য হোক, তাকে ভবিষ্যতের জন্য আরো শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র দিন দিন উন্নতি কামনা করে আজকের আলোচনায় ইতি টানলাম এখানেই।

শ্রীবরুণকুমার ধর
কে: অ:—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস
৩৫, উল্টোডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

খেলা ধুলা

অলিম্পিকের আদিপর্ব

প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অলিম্পিকের কাহিনী। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অলিম্পিয়ার সেই ত্রিভুজাকৃতি পবিত্র অঙ্গন। গ্রীক দেবতা হেবার মন্দির। একদিকে পেলোপনিস, অন্যদিকে এলফিয়স ও ক্লেদিয়াসের রূপালী জলস্রোত। গ্রীষ্মের সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে গ্রীক প্রতিযোগীরা নগ্নগাত্রে সার বেঁধে তালে তালে পা ফেলে চলেছে। প্রতিটি মূর্তি যেন শ্বেতপাথরে খোদাই করা। সূর্যের সোনালী আলোয় দেহের প্রতিটি পেশী প্রতিফলিত হচ্ছে। অগণিত জনতা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে, পেশীবহুল পুষ্ট দেহের কি অপূর্ব সুষমা।

খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬ সালে অলিম্পিকের প্রথম যাত্রা সুরু—একথা ইতিহাস বলে। গ্রীষ্মকালীন পূর্ণিমা তিথিতে প্রতি চার বছর অন্তর এই ক্রীড়া উৎসবের সমাবর্তন হত। অলিম্পিক ছিল গ্রীকদের জাতীয় ক্রীড়া উৎসব। বর্তমানে যেমন অলিম্পিক ছাড়া আছে এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেম ইত্যাদি, প্রাচীন গ্রীসেও তেমনি আরও তিনটি জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল—সেগুলি হল পিথিয়ান, নেমিয়ান আর ইসথমিয়ান। কিন্তু এই প্রতিযোগিতাগুলি অলিম্পিকের মত জনপ্রিয় হতে পারে নি, কালের আবর্তে তারা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

অতীতে গ্রীকরা ৬০০ ফুট স্থান জুড়ে গড়েছিল এক স্টেডিয়াম।

শ্রীঅমিতাভ

অলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র ৬০০ গজের দৌড় প্রতিযোগিতাই ছিল সম্বল। এই প্রথম অনুষ্ঠানে করোইবস নামে এক গ্রীক বিজয়ী হন বলে শোনা যায়। তখন বিজয়ীকে ভূষিত করা হত অলিভার পাতার পবিত্র মুকুটে। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ত দেশ-দেশান্তরে। ক্রমে ক্রমে দৌড়ের সঙ্গে প্রবর্তিত হল মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ, রথচালনা, অশ্বচালনা প্রভৃতি। এই সময় অলিম্পিকে পেণ্টাথলন প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিল এবং পেণ্টাথলনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল লাফান, দৌড়ান, ডিসকাস নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ এবং মল্লযুদ্ধ। প্রাচীন অলিম্পিকের সূচনায় প্রতিযোগিতা এক দিনেই শেষ হয়ে যেত। ধীরে ধীরে প্রতিযোগিতা পঞ্চদিবসব্যাপী পরিব্যাপ্ত হল। শুধু তাই নয়, অলিম্পিক মাসে গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের অন্তাবরোধ স্থগিত থাকত। প্রাচীন অলিম্পিক গেমস গ্রীসের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য ও মিলনসূত্রের কাজ করত।

প্রাচীন প্রথা অনুসারে অলিম্পিক বিজেতা এথেন্সে রাজকীয় সম্মান লাভ করতেন। সরকারী ব্যয়ে সরকারী আবাসে তিনি জীবনযাপন করতে পারতেন। স্পার্টাও অলিম্পিক বিজেতাকে যোগ্য সমাদর দেখাত, যুদ্ধের সময় রাজার পাশে পাশে থাকবার সম্মান

● চুণী গোস্বামী

সুলেখা
স্পেশাল
ফাউণ্টেনপেনের
কালি

৪টি স্থায়ী রঙে পাওয়া যায়
• ব্লু-ব্ল্যাক •
• রয়্যাল ব্লু •
• ব্ল্যাক •
• ব্রাউন •
সুলেখা ওয়ার্কস লিঃ
কালকাতা—৩২
PRO/SW-

● দমদম এয়ারপোর্টে অলিম্পিক মশাল

তিনি পেতেন। ম্যাসিডনের প্রাচীন মুদ্রায় দেখা যায় রাজা ফিলিপ ঘোড়ায় চড়ে আছেন—কণ্ঠে তাঁর অলিম্পিকের জয়মাল্য। অন্যান্য গ্রীক রাজাদের মুদ্রাতেও অলিম্পিক বিজয়ের স্বাক্ষর দেখা যায়। গ্রীসের জাতীয় জীবনে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ছিল আনন্দ ও অনুপ্রেরণার উৎস এবং হাজার বছর ধরে এর উন্মাদনা আপামর জনসাধারণকে অশেষ আনন্দ যুগিয়েছে। কিন্তু খৃস্টের মৃত্যুর ৩৯৩ বছর পরে ধর্মান্ধ রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াসের কঠোর আদেশে অলিম্পিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। এই খেয়ালী সম্রাট ঘোষণা করেন—এই ধরণের খেলাধূলা খৃস্টধর্ম সম্মত নয়; এবং তার পর থেকে নিভে যায় প্রাচীন অলিম্পিকের পবিত্র পূতাগ্নি।

জার্মানীর ফুটবল মরশুম

জার্মানীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ফুটবলের দারুণ ভক্ত। সেখানে ফুটবলের জনপ্রিয়তা অন্য সব খেলারই ঊর্ধ্বে। আমাদের কলকাতা ময়দানে ফুটবল মরশুম সুরু হয় মে মাসে এবং চলে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। কিন্তু জার্মানীতে ঠিক উল্টো, আমাদের যেখানে শেষ, ওদের সেখানে সুরু। আগস্ট মাস থেকে পরবর্তী মে মাস অবধি চলে জার্মানীর ফুটবল মরশুম। ফুটবলের বিশ্রাম সেখানে মাত্র দু'মাস। জার্মানীর ফেডারেল ফুটবল লীগের দলসংখ্যা হল ১৬টি। এখানে মোট ফুটবল ক্লাবের সংখ্যা প্রায় চোদ্দ হাজার এবং তাদের সভ্য-সংখ্যা হল প্রায় আঠারো লক্ষ। লীগের খেলায় সর্বনিম্ন দুটি দল অবনমনের আওতায় পড়ে এবং তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করে দুটি শ্রেষ্ঠ দল এসে। ফুটবলের জনপ্রিয়তার স্রোত, তার দুর্বার আকর্ষণ বর্তমানে পরিধি বিস্তার করেছে শহর থেকে গ্রামে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

তরুণ ক্রিকেটারের কৃতিত্ব

পূজার আগমনী গানের পরেই শোনা যাবে ক্রিকেটের পদধ্বনি। দেশে ফেরার পথে ইংলণ্ড জয়ী অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল আগামী ১৭ই অক্টোবর ভারতের সঙ্গে টেস্ট খেলায় মিলিত হবে ইডেন উদ্যানে। রঞ্জী ট্রফি এবং দলীপ ট্রফির খেলা আর কয়েকদিনের মধ্যেই সুরু হবে। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের দল গঠনের জন্য বাংলা থেকে ৩০ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনডোর স্টেডিয়ামের স্বল্প পরিসরের মধ্যে নাকি নেট প্র্যাকটিশ চলছে।

খুবই আনন্দের কথা যে, বাংলার তরুণ খেলোয়াড় রবীন মুখার্জী ভারতীয় রেল দলের পক্ষে রঞ্জী ট্রফিতে প্রতি-নিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বভারতীয় স্কুল ক্রিকেটে রবীন মুখার্জী পূর্বে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, বাংলার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষেরা তাঁকে বরাবরই অবহেলা করেছেন, তাঁর তরুণ প্রতিভা কোনবারই যোগ্য স্বীকৃতি পায় নি। বাংলার ক্রিকেট দল গঠনের নামে যে কতবড় প্রহসন চলে, তা আজ সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের বুঝতে বাকি নেই।

সমাচার দর্পণ

বিহারীলাল কলেজে অনুষ্ঠিত মহিলাদের আন্তঃকলেজ টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী লরেটো কলেজ ফাইন্যালে স্কটিশচার্চ কলেজকে ৩—১ খেলায় পরাজিত করে পুনর্বার বিজয়ী হবার গৌরব অর্জন করল। দশটি কলেজের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সাতটি কলেজ এবার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'মুক্ত কেশের
পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি'
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের
আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন—
"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"
সেই জন্য সৌন্দর্য্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন
সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল—বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ
মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে
ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল
সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা

সাপ্তাহিক
বসুমতী

রুশ-ভারত মৈত্রীতে উদাত্তকণ্ঠ ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও শ্রীক্রুশ্চেভ।

৯ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 17th September, 1964 • Vol. 69,

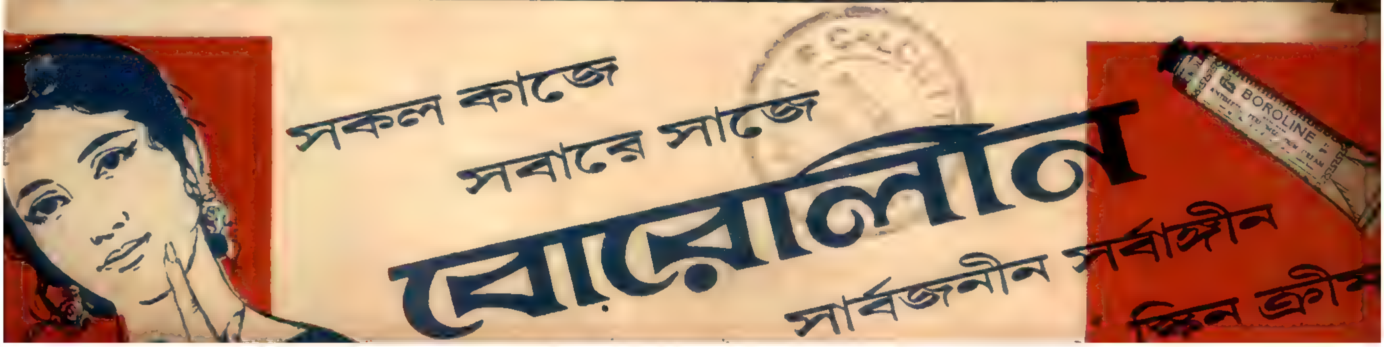

সূচীপত্র

756.3
1603/3
V.69
no.17

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১০২৭
আজকের মানুষ	...	১০২৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১০২৯
এ মাসের বৃটেনে	জি. এ. জনসন	১০৩৩
ভারতদর্শন	...	১০৩৫
আন্তর্জাতিক	...	১০৪১
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৪৬
আজকের পশ্চিম জার্মানী	মৈত্রেয়	১০৫০
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১০৫৩
নন্দন কানন (গল্প)	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ	১০৫৭
সংলাপের মধ্যবর্তী (কবিতা)	শান্তিব্রত ঘোষ	১০৬১
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১০৬২

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

নাট্য-সাহিত্যের সেই গৌরব-জ্যোতি
ঐতিহাসিক নাট্য-প্রতিভার বরপুত্র
অমর নাট্যমহাকবি—গীতিনাট্য-সম্রাট
পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে :—প্রতাপাদিত্য, কিন্নরী, বঙ্গে রাঠোর, মিডিয়া, প্রমোদরঞ্জন।

২য় ভাগে :—ভীষ্ম, বাঙ্গালার মসনদ, পদ্মিনী, গুহামুখে, ভূতের বেগার, চাঁদের আলো।

৪র্থ ভাগে :—রঞ্জাবতী, নারায়ণী, দুর্গা, ফুলশয্যা, আলাদিন, জয়শ্রী, ফুল্লী।

৫ম ভাগে :—আলিবাবা, রামানুজ, বাদশাজাদী, পুনরাগমন, বৃন্দাবন বিলাস, রূপের ডালি।

৬ষ্ঠ ভাগে :—আলমগীর, অশোক, চাঁদবিবি, বাসন্তী, কুলভঙ্গ, খাঁজাহান, বিরামকুঞ্জ, রাধাকৃষ্ণ।

৭ম ভাগে :—রঘুবীর, জুলিয়া, বেদৌরা, কুমারী, বরুণা; কবি-কাননিকা রত্নেশ্বরের মন্দিরে।

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১০৬৪
পাঠক মন	...	১০৬৮
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১০৬৯
এক দুই (কবিতা)	সুশীলকুমার গুপ্ত	১০৭২
সেই হঠাৎ পরিচিত পাখিটি-কে (কবিতা)	মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	১০৭২
দিল্লী থেকে	বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য	১০৭৩
বঙ্গদর্শন	...	১০৭৫
রঙ্গজগৎ	...	১০৭৯
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১০৮৩
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১০৮৫
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১০৮৭

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিষ্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, কংকে ম্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই।

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ — 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন ১৩৭১ — Thursday, 17th September 1964

শিক্ষকদের আন্দোলনের জন্য দায়ী কে?

'শিক্ষক দিবসের' আমেজ ফুরুতে না ফুরুতেই শিক্ষকদের আন্দোলন এমন বৃহদাকার ধারণ করবে তা প্রায় ভাবাই যায় নি। স্বাধীন ভারতে শিক্ষকদের মর্যাদা দানের নামে, তাঁদের কল্যাণ সরকার কতোটা করতে পেরেছেন, তা যদি সরকারের কাছে জিগ্যেস করা যায় তাহলে কোনো সদুত্তর পাওয়ার আশা দুরাশামাত্র। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কয়েক বছর পূর্বে সরকার যে পরিমাণে নির্ধারণ করেছেন, তা প্রায় নগণ্য বলা যায়। জিনিসপত্রের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার সঙ্গে বর্তমানে প্রাপ্ত মাহিনার সঙ্গতি থাকা ত' দূরের কথা, যে মুষ্টিভিক্ষা তাঁরা লাভ করেন, তদ্দ্বারা সংসার নিয়ে শিক্ষকসমাজের পক্ষে দিনাতিপাত করা অসম্ভব ব্যাপার। এই ঘটনা আর কিছুদিন এইভাবে চললে, শিক্ষকসমাজের অবলুপ্তি অপরিহার্য। তখন একমাত্র যাঁরা থাকবেন তাঁরা হচ্ছেন সরকারী পেটোয়া এমন কিছু ব্যক্তি যাঁরা শিক্ষাখাতে ব্যয় কমিয়ে 'পলিসি' নির্ধারণ করতেই তৎপর। কিন্তু সেই পলিসির পরিণতিতে যে দেশ তিমিরাচ্ছন্ন হবে, একথা ভাববার মতো সময় ক'জনেরই বা আছে? তবু যাঁরা ভাবেন তাঁরা জাতীয় শিক্ষাকে জরুরী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষকদের বেতন ও মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির আন্দোলনে সায় অবশ্যই দেবেন।

কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি বিদ্যালয়ের ঘাড়ে আধা খরচ বহনের অর্ধেক দায়িত্বভার দিয়ে পরোক্ষে ছাত্রদের অভিভাবকদের শোষণ করার উপায় অবলম্বন করেন, তাহলে সে ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য নয়। তবু বলা দরকার, শিক্ষকদের আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে মতান্তর থাকলেও তাঁদের বুভুক্ষুদশাও তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। যে ট্যুইশনির কথা হামেশাই বলা হয়, বর্তমান আর্থিক সঙ্কটে বিপদাপন্ন মধ্যবিত্তসমাজে তাও সহজ সুলভ নয়। অথচ ভবিষ্যৎ ভারতের আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু এই দেখার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত রয়েছে শিক্ষকদের দশা দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কলেজ শিক্ষকদেরও বেতনের হার পরিবর্তন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একেবারেই অচল, অটল। কেন না একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চালু হওয়ার পর কলেজী শিক্ষার ওপর তাঁদের মাথাব্যথা তেমন নেই। তাই সাধারণ চাকুরেদের মতো কলেজের শিক্ষকরাও আজ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষকদের এই দুর্দশা সম্বন্ধে সরকার যদি বিন্দুমাত্র সচেতন থাকতেন, তাহলে এই আন্দোলনে তাঁদের নামতে হোত না। ইচ্ছে করলে অন্যান্য চাকুরীজীবীদের মতোই এঁদের দাবীর প্রতি কিছুটা কর্ণপাত করে আমাদের সরকার আন্দোলন বন্ধ করতে পারতেন। এইভাবে সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে সরকার জাতীয় কর্তব্য থেকেই বিচ্যুত হচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

'আমাকে মক্কায় নিয়ে চল মহম্মদ। এ রাজসিংহাসন আমার চাই না। চাই না রাজকোষ।'—মোগলযুগের এক রাজনৈতিক সংকট উত্তীর্ণ হ'তে এই ভণিতা শুনেছিলাম দুর্ধর্ষ সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মুখে। আজও ব্যাপারটা প্রায় তাই-ই। তবে সেদিন সম্রাট এই ভণিতার আশ্রয়ে নিজের সিংহাসন অটুট রাখতে পেরেছিলেন। আর আজ আসন শূন্য করে দিতেই অনুরূপ উক্তি করেছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র। বহু পরিচিত নাম। বহু ঘটনার দুর্দম নেতা।

সম্প্রতি উড়িষ্যার ঘটনাবৈচিত্র্যকে আরও বিচিত্র করে তুলেছিল জনৈক ছাত্র বনাম সরকারী বাসের কর্মচারীদের বিতণ্ডা। সেখান থেকে ঘটনা গড়িয়েছে বিধানসভায়। তুলকালাম কাণ্ড। এমন সর্বৈব উচ্ছৃঙ্খলতা এর আগে খুব কম চোখে পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিত্র এ ঘটনায় বিচলিত ও ব্যথিত হয়েছেন। নিজের ওপর এর দায়িত্ব নিয়ে স্বীকার করেছেন আইনসভার মর্যাদারক্ষায় তাঁর ব্যর্থতা। আর এর প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন পদত্যাগ ক'রে। অনুমতি মিলেছে। অতএব পথ খোলা। তিনি—না, মক্কায় যাবেন না। তবে ?— সে কথা পরে বলছি। কিন্তু ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে তাঁর মিলটা কোথায় ? কেন মিল আছে তাঁকে নিয়ে নানা মহলে যে দারুণ চাঞ্চল্য উঠেছে সেখানেই। কংগ্রেস প্রশাসনিক-প্রহসন সকলের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে শ্রীবীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে। রাজনীতির ইতিহাসে নতুন নজীর রেখে তিনি বললেন তাঁর যাবতীয় দায়দায়িত্ব সম্পত্তি সব নামমাত্র একটাকায় যে কোনও ভারতীয় নাগরিকের কাছে হস্তান্তরে রাজী আছেন। কিন্তু বিশেষ ফল হ'ল না। তাই আত্মসম্বরণের অবকাশে ছাত্রবিক্ষোভের সুযোগ দিয়ে আমাদের মুখর আলোচনা বন্ধ করতে আসন ত্যাগ করার সংকল্প নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে লোকে মহৎ বলে জেনেছে। কিন্তু তিনি যাই হোন—সুচতুর রাজনীতিক সন্দেহ নেই।

ভারতের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সবাই তার কর্মক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯১৭ সালের ২৬শে নভেম্বর তাঁর জন্ম কটক জেলার রঘুনাথপুরে। বিখ্যাত মিত্র-পরিবারের উত্তর-পুরুষ তিনি। বাবা এ্যাডভোকেট শ্রীবিপিনবিহারী মিত্র। কাকা শ্রীনিমাইচরণ মিত্র কটক জেলা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এবং বিগত বিহার-উড়িষ্যা আইনসভার নামকরা সদস্য। মিত্র-পরিবারের সবাইকেই এখানে লোকে একডাকে চেনে। শ্রীবীরেন মিত্র তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন কৈশোরেই। কটক র‍্যাভেনশ' কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর স্বদেশী-আন্দোলনের উন্মাদনায় তরুণমনের বিকাশকে খুঁজে পেয়েছেন। কটক মেডিক্যাল স্কুলের ধর্মঘটের নেতৃত্ব করে কারাবরণ করলেন। রাজনীতি তাঁকে নেশায় মজিয়েছে। দেশজনের ডাক তাঁকে ঘর ছেড়ে পথে এনেছে। এ পথেই একদিন চলতে চলতে পেয়েছেন নেতাজী সুভাষের আশীর্বাদ। তরুণ সংগ্রামীর কাছে তখন একাধিক কারাবরণও কিছুই না। '৪২-এর বিপ্লবের পর শ্রীমিত্রকে দেখেছি শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে। একনিষ্ঠ উৎসাহী নেতার নেতৃত্বে সেদিনকার উড়িষ্যার দীর্ঘতম শ্রমিক-ধর্মঘটের কথা এখনও জনশ্রুতির মত লোকমুখে জীবন্ত হ'য়ে আছে। সেদিন চৌদুয়ারের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলের অজস্র শ্রমিক শ্রীমিত্রের মুখের কথাতেই ভরসা রেখে বত্রিশদিন ধর্মঘট চালিয়েছিলেন। '৪৭ সালে সে-তে গণতন্ত্রপরিষদের আক্রমণে বিপর্যস্ত কংগ্রেসের ভরাডুবি সামলে ছিলেন শ্রীমিত্র। তাঁর সহকর্মী শ্রীবিজু পট্টনায়ক আর তাঁর যুক্ত প্রয়াসেই সেবার উড়িষ্যায় কংগ্রেস অভিযানের নতুন দিগন্ত সূচিত হ'য়েছিল। '৫২ সালের নির্বাচনকাল থেকেই বিধান-সভায় শ্রীমিত্র আসন অধিকার করে আছেন। কটকের অগণিত জনতা বারবার গভীর শ্রদ্ধায় তাঁকে সাধারণ মানুষের কথা বলা ও শোনার দায়িত্ব দিয়ে স্বীকৃতির আসনে অভিষিক্ত করেছে। তিনিও তাঁদের প্রতারিত করেন নি ; '৬১ সালের জুন মাসে বিজু পট্টনায়কের মন্ত্রিসভায় তিনি হ'লেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। এর দুবছর পর কামরাজ পরিকল্পনায় শ্রীপট্টনায়ক পদত্যাগ করলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব এল তাঁর ওপর—'৬৩ সালের ২রা অক্টোবর। নেতা হিসেবে তাঁর সমর্থনে আছেন উদ্বেলিত জনতা। কিন্তু এ ছাড়াও তাঁকে কংগ্রেসের বিভিন্ন মহল দায়ী করেছে নানা সন্দেহজনক কার্য-কলাপের সঙ্গে জড়িত থাকায়। অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি এখনও। তাছাড়া, পদত্যাগের পর শ্রীমিত্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ প্রমাণের সুযোগ কতটুকু তাও ভাববার কথা।

শ্রীবীরেন মিত্র

একদিন জনতার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়েই রাজনীতির বিচিত্র পথ পার হ'য়ে বীরেন মিত্র পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে। আজ আবার জনতার সঙ্গে মিশে গিয়েই নতুন পথের সন্ধানে চলবার সংকল্প নিয়েছেন তিনি। তবে সে পথের লক্ষ্যস্থল এখনও আমরা জানি না। শুধু এটুকুই শুনেছি, সে পথ গয়া বা মক্কা নয়—রাজনীতি। এবং একান্তভাবে রাজনীতিই (?)।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

সময় বাইরের স্রোতও বটে, ভেতরের সম্পর্কও বটে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আটাত্তর বছর বয়সের হিসেব মিলিয়ে দেখেছিলেন বাইরের সঙ্গে। প্রকাণ্ড পিপুলগাছ; বিশাল পাহাড়, বহতা নদী,—এবং এইরকম আরো নানা অস্তিত্বের সমাবেশ দেখেছিলেন বাইরে। তারই মধ্যে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন এই বলে—

রবি ঠাকুরের দেখা সেইদিন মাত্তর
আজ তো বয়স তার মাত্র আঠাত্তর।

কিন্তু সকলের নজর একরকম নয়। এরই বিপরীত উদাহরণ হিসেবে রামহরিবাবুর কথা ভেবে দেখা যায়। সত্তর বছর বয়সে সেই রামহরিবাবু কী করেছিলেন, সে-বর্ণনা আছে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জ্যোতির্ময় ঘোষ মশায়ের 'ভ্রুতশ্রী' গল্পসংগ্রহে (১৩৪১)। তাঁর সে-গল্পের নাম 'জাগরণ'।

সত্তর বছর বয়সে রামহরিবাবু একদিন হিন্দু-আদর্শানুরাগের প্রেরণা পেয়ে হঠাৎ জেগে ওঠেন। সেদিন ঘুরে ঘুরে তিনি কালীঘাট নিরামিষাশী সম্প্রদায়, নিখিল এশিয়া ভজগোবিন্দ সভা, অল বেঙ্গল হরিবোল সম্প্রদায়, নিখিল যোগীপাড়া বাই লেন পরলোকতত্ত্ব প্রচারিণী সভা ইত্যাদির ঠিকানা জোগাড় করলেন। মধ্যাহ্নে আহারে বসে বললেন—'হারু নাপতের ছেলেটা পটল তুলেছে,—বেশ হয়েছে।'

হারু নাপতের ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর এই পরিতৃপ্তির কারণ কী?

কারণ এই যে, হারু নাপতের একটা ছাগল অনেকদিন আগে তাঁর শখের একটি গাছ খেয়ে ফেলেছিল।

এ থেকে এই সত্যই ধরা পড়ে যে, রামহরিবাবুর ভেতরটা পরিণত হয় নি। রবীন্দ্রনাথ আটাত্তর বছর বয়সকে তুচ্ছ করে গেছেন তাঁর যে আভ্যন্তরীণ নবীনতার জোরে, সে-জোর সব মানুষের থাকে না বটে, কিন্তু রামহরিবাবুর অন্তঃকরণে সে-শক্তির বাষ্পটুকুও লাগে নি কোনোদিন। সত্তরে তিনি ছিলেন অপরিণত এক কৃপণচেতা বৃদ্ধ; আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশি বছর বয়সেও ছিলেন অনন্যসাধারণ নবীন।

মানুষ অবস্থার পুতুল। সময়-চেতনার পরিবর্তন, আর সময়ের স্রোতে চেতনার পরিবর্তন দুইই সত্য। বোধ হয়, দুইই এক কথা। বলরাম দাসের একটি প্রার্থনার পদ মনে পড়ে। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, প্রথম জীবনে অজ্ঞান ছিলেন তিনি,—তখন মাতৃস্তন্য পান করেছেন, বাল্যসখাদের সঙ্গে দিন কেটেছে; তারপর ইন্দ্রিয়জালে আচ্ছন্ন অবস্থায় গেছে আর এক পর্ব; সংসারে আসক্তি বেড়েছে আরো; চতুর্থ পর্বে এখন বার্ধক্য এসে চোখের জ্যোতি হরণ করেছে, তখন আর উপায়ান্তর কি?

চারি হৈল গেল যদি,
হরিল আঁখির জ্যোতি;
শ্রবণে না শুনি অতিশয়
বলরাম দাস কয়
এই বার রাখ মহাশয়
ভক্তি দান দেহ রাঙ্গা পায়।

এ পদ প্রার্থনার পদ। সারা জীবনের অভিজ্ঞতা আর পাণ্ডিত্য দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, ভক্তিভরে পরমের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া মানুষের আর পরিত্রাণের উপায়ান্তর নেই। অনেকের মনে সময় সম্বন্ধে সজ্ঞান অনুসন্ধানই জাগে না। আর একটি পদে তিনি বলে গেছেন—

'জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে
শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে
নিদ্রায় তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে।
পঞ্চাশ বৎসরে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে।'

এসব লাইনে বলরাম দাস যা বলেছেন, তা খুবই স্বীকার্য কথা। এইভাবেই মানুষের দিন কেটে যায়। কিন্তু এসব জ্ঞানের কথায় সাহিত্যের স্বাদ লেগেছে কিনা, সেটা সংশয়ের কথা। সাহিত্যের পথে বেরিয়ে আলো, অন্ধকার, সময়, অসময়,—সবই দেখতে ইচ্ছা করে। জীবনের এসব অভিজ্ঞতা সাহিত্যে কীরকম ছাপ রেখে যায়, জানতে ইচ্ছে হয়।

আমাদের সময়-ধারণা জীবনের ঋতুতে ঋতুতে বদলে যায়। কিন্তু সবাই কি সব কথা বলতে পারেন? বলরাম দাস ঋতু-বদলের কথা বলতে গিয়ে তাঁর আধ্যাত্মিক গর্জটাই দেখিয়েছেন, তিনিও সময় দেখেন নি।

জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, পাণ্ডিত্যে যা বলা যায় না, বিশেষ ইন্দ্রিয়ের গুণে সেই অকথিত কথাই হঠাৎ সাহিত্য হয়ে ওঠে। সময় সম্বন্ধে সেইরকম অভিজ্ঞতা অনেকটা একালের সাহিত্যের বিষয়। পুরাকালে সময় ভারি সরল ছিল।

বলরাম দাস পণ্ডিত ছিলেন। রমণীমোহন মল্লিকের সম্পাদনায় জীবনী ও টীকা সমেত তাঁর কাব্য ছাপা হয় ১৩০৬ সালে। সেই সুদূর ১৮৯৯-এ মেহেরপুর থেকে রমণীমোহন সে-বই উৎসর্গ করেছিলেন চার্লস এডওয়ার্ড বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের নামে। অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মশায়

ছিলেন রমণীমোহনের বন্ধু, তাঁরই লেখা বলরাম দাসের জীবনী থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন রমণীমোহন।

বলরাম দাসের 'প্রেমবিলাস' প্রসিদ্ধ কাব্য। তাতে তাঁর আত্মজীবনী ছিল কয়েক ছত্র পয়ারে। সেই আত্ম-জীবনী থেকে জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম আত্মারাম, জননী সৌদামিনী; বাসস্থান ছিল কাটোয়ার শ্রীখণ্ডে, এবং জাতিতে তাঁরা ছিলেন বৈদ্য। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহধর্মিণী জাহ্নবী দেবীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। বলরাম তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন।

প্রসিদ্ধ 'ভক্তিরত্নাকর' বইখানিতে নিত্যানন্দের শাখাভুক্ত ভক্তদের যেখানে নাম করা হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে—

মুরারি চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর
পরমেশ্বরী দাস, বলরাম বিজ্ঞবর।

সেকালে বলরাম যে বিজ্ঞ ব্যক্তি ব'লে কীর্তিত হয়েছিলেন, এটি তার আর এক নজীর।

কিন্তু নিজের বোধকে শিক্ষিত সর্বসাধারণের বোধে পরিণত করবার যে ভাষাগত চেষ্টার নাম 'সাহিত্য', সে কি শুধু বিজ্ঞতার সাধ্য? কেবল তত্ত্বজ্ঞানের গুণেই কি সাহিত্যের গভীর আবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব?

আমাদের সময়-ধারণার নানা দিকের সাহিত্যিক অভিব্যক্তির কথা ভাবতে গিয়েই এসব প্রশ্ন মনে আসছে। মনে পড়ছে প্রবীণ পণ্ডিত কালিদাস রায় কবিশেখর মশায়ের পরিভাষা—'তালিকা' আর 'মালিকা'।

'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' নামে তাঁর প্রবন্ধ-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ডে সে-প্রবন্ধটি ছাপা হয়। বইয়ের বারো নম্বর প্রবন্ধ সেটি। নাম—'তালিকা ও মালিকা'। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গোবিন্দ-দাসের লেখায় অনুপ্রাসের মালিকা চোখে পড়ে,—জগদানন্দও একাক্ষর অনুপ্রাসের মালিকা সাজিয়ে গেছেন। কিন্তু পুরোনো বাংলা সাহিত্যে 'নারী-গণের পতিনিন্দা'য়,—কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'অঙ্গদের রায়বার' অংশে মালিকা নয়,—তালিকার অন্ত নেই।

ঈশ্বর গুপ্তের লেখাতেও রসের গভীর অনুয়চেতনা-ঘটিত মালিকার চেয়ে তালিকাই বেশি। এবং তিনি শুধু শ্লেষ-যমক অনুপ্রাস-সিদ্ধির ফিরিস্তি রেখে যান নি, বস্তুতালিকাও রেখে গেছেন। তাঁর ঋতুবর্ণনার কবিতাগুলি সেদিক থেকে স্মরণযোগ্য।

রঙ্গলালের 'কাঞ্চীকাবেরী'র উল্লেখ করেছিলেন কবিশেখর। রঙ্গলালের 'মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদূর্য' ইত্যাদির উল্লেখ ছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি স্থান বা অঞ্চলের তালিকা এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিতালিকাও ছিল। রজনীকান্ত সেনের হাসির গানেও নানা উপকরণের তালিকা দেখা গেছে। একটি পদ্মের মৃণাল জলে ভাসতে দেখে হেমচন্দ্র অনেক স্মৃতি, অনেক উপকরণের তালিকা দিতে পেরেছিলেন। সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের 'তাজমহল' বা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের লেখাগুলিতেও তালিকার সীমা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন 'মেঘদূত' কবিতা লিখলেন, তখন সে তো আর কালিদাসের কাব্যলোক থেকে সংগৃহীত বস্তুতালিকা মাত্র হোলো না। তাঁর 'সেকাল' বা 'মেঘদূত' তো কেবল তালিকা নয়, এসব তাঁর কবিচেতনার সৃষ্টি,—এসব রচনায় তাঁর অনুভূতি রেখে গেছে অভিজ্ঞতার 'মালিকা'।

কালিদাস রায় মশায়ের এই কথা-দুটি ভারি ভালো লেগেছিল আমার। বাংলায় সময়-ধারণা সম্বন্ধে যথার্থ কবিত্বের চিহ্ন আমার বেশি নজরে পড়ে নি বলেই বোধ হয়, আজ এ-কথা লিখতে গিয়ে এই সহজ পরিভাষা মনে এলো।

সময়ভেদে মানুষের আচরণভেদের কথা বলতে গিয়ে শুধু বলরাম দাস তালিকাই দিয়েছেন, মালিকা দিতে পারেন নি। জ্যোতির্ময় ঘোষ রামহরিবাবুর সত্তর বছর বয়সটা শুধু রামহরিবাবুর আধ্যাত্মি-কতার অসার আস্ফালন সূচিহ্নিত ক রবার জন্যেই ব্যবহার করেছিলেন। এদিকে, বাংলা সাহিত্যের পথে চলতে-চলতে আমি সময়-ধারণার মালিকা খুঁজছি। সে তো শুধু 'বেলা যায়', 'বেলা যায়', ধ্বনি নয়।

রবীন্দ্রনাথ অনেক দিয়েছেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁরই নানা ছত্র মনে পড়ে। কিন্তু আজ আমি চেষ্টা করছি তাঁর কোনো লাইন না ছুঁয়ে, অন্য লেখকের অন্য লাইন বা অন্য শব্দ বা অন্য সংকেত ধরে আমাদের অভিপ্রেত সময়-আস্বাদনের দিকে যেতে।

'আজকের এক মুহূর্ত' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন—

যে ঘোড়ায় চড়ে আমরা অতীত ঋষিদের
সঙ্গে
আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেই সব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে কোথাও;

আমার হৃদয়ের ভিতর
সেই সুপক্ব রাত্রির গন্ধ পাই আমি।

মনে পড়ে, তাঁর 'নিরালোক'—

'কে যেন উঠিল হেঁচে,—
হামিদের মরখুটে কানা ঘোড়া বুঝি।'

অনেকবার ঘোড়ার ছবি জেগেছে তাঁর মনে। কিন্তু এসব ঠিক সময়-ধারণার অভিব্যক্তি নয়। এসব অন্য ইশারা। অস্পষ্টতার ইশারা। স্বপ্নের যন্ত্রণা হয়তো। 'মহাপৃথিবী'র 'স্থবির-যৌবন' নামে আর একটি কবিতার শেষ কয়েক ছত্রে ঘোড়ার উল্লেখ ছিল—

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে
নদীর কিনারে
কোনো এক বিকেলের জাফরান
দেশে।
কোকিল কুকুর জ্যোৎস্না ধুলো
হয়ে গেছে কত ভেসে।
মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া
কে বাঁচিতে পারে!

সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে ঘুরে-বেড়ানো তাঁর 'বিড়ালের' কথা

জন্তন পর্যন্ত। জীবনানন্দের জগতে কতো যে জীবজন্তুর ভীড়! মহিমের ঘোড়া, হামিদের ঘোড়া,—কতো যে ঘোড়া! ধূসর ঘোড়া চরছে নদীর কিনারায়। কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে বিড়াল! এইসব জীবজন্তুর মধ্য দিয়ে কালের গতি সম্বন্ধে কবিমনের একটা ধারণা পাওয়া যায় বটে। কিন্তু ততোধিক কিছু নয়। জীবনানন্দ রোমাণ্টিক সময়-বোধেরই হা-হুতাশ রেখে গেছেন নিজের বিশেষত্ব-চিহ্নিত রূপকে-প্রতীকে। তাঁর 'মুহূর্ত' এক দৃশ্যধারণা মাত্র। 'বিভিন্ন কোরাস'-এ তিনি বলেছেন—'সময় কীটের মত কুরে খায় আমাদের দেশ।' কিন্তু জে-বি প্রিস্টলির মতন সময়সন্ধিৎসু নন তিনি। সে অন্য প্রয়াস।

আমি আমাদের তরুণ বাঙালী কবিদের লেখায় এই ধরনের কিছু পাবো বলে আশা করেছিলুম। কারণ আমাদের গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি অন্যান্য সাহিত্য-প্রকার ঠিক এই ধরনের ধারণা ব্যক্ত করবার অনুকূল পথ বা উপায় বলে এখনো সাধারণত মনে করা হয় না। অন্যান্য পাত্রে ঘটনা, কাহিনী, চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদিই প্রধান ব্যাপার। কিন্তু কবিতা হোলো বেদনার আধার,—অন্তর্দৃশ্য, বহির্দৃশ্য দুইই মিলে মিশে মনে যে ধারণা জাগিয়ে তোলে, কবিতায় সেই ধারণা ধরা পড়ে। আমি ভেবেছিলুম আমাদের নবীনতম আধুনিক কবি যাঁরা, তাঁরা এসব ধারণার দিকে এগিয়ে যাবেন।

শুধু সময় সম্বন্ধেই নয়, ধারণাশক্তি ব্যাপারটা সাহিত্যের ব্যাপকক্ষেত্রেই বুঝে দেখা দরকার। কবি অমিয় চক্রবর্তীর বর্ণনা মনে পড়ে। তাঁর 'সাম্প্রতিক' প্রবন্ধমালার মধ্যেই তিনি সে-কথা লিখেছেন—

> নানা অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার শক্তিই ধারণাশক্তি। ভাবের চিত্রময় অন্তর্লীন একটি সূক্ষ্ম শরীর তৈরি হওয়ার জন্যে চাই মনের সম্বৃত বেগ, যা আপন কালে এবং ছন্দে প্রকাশ পায়, যাকে তাড়া দেওয়া যায় না; অথচ যার মধ্যে বিভিন্ন সমন্বিত সৃষ্টির অনিবার্যতা আছে।'

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আরো—

> 'রিপোর্টার বৃত্তির প্রাবল্য আধুনিক ধারণাশক্তিকে বিড়ম্বিত করে, কেননা তার মধ্যে অভিষিক্ত চৈতন্যের স্থির বিদ্যুৎ নেই, যাতে তল পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়। অথচ কেবলমাত্র ঘটনার চকমকি ঘষাকে অনেকে নূতন শিল্প-চেতনার সাক্ষ্য বলে মানেন।'

অর্থাৎ লেখকের ধারণাশক্তি অতিশয় যোগস্থতার ফল,—সে যেন যোগীর বিভূতি। সাহিত্যে যথার্থ যোগী যদি না আসেন, তাহলে এসব প্রত্যাশিত ঐশ্বর্য আসবে কোথা থেকে?

অমিয়বাবুর কথাতেই বলতে পারা যায়—

● জীবনানন্দ দাশ

> 'স্টক এক্সচেঞ্জের টুকরো তথ্য, দলের ঝাণ্ডা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের পাণ্ডা, বিবৃত বুলি এবং নোংরা চায়ের পেয়ালা জোড়াতালি দিয়ে সচেষ্ট কাব্যরচনা হল কাব্যের ছেঁড়া কাঁথা। কাব্য গাঁথা হয় যে-সৃষ্টির জাল বুনে তাতেও দ্রব্যের মনোহারি দোকান বসতে পারে, কিন্তু সেখানকার পসরা জুটেছে অন্যভাবে।'

তিনি শিল্পসৃষ্টির পুরো কম্পোজিশনের ইশারা দিয়ে 'কম্পোজিশন' শব্দটাই প্রয়োগ করেছেন। ভারি সুন্দর তাঁর কথাগুলি—

> 'কী বলতে চায় জানিনা, কিন্তু এই একটি সমগ্র রচনা, বিশেষ অর্থে কম্পোজিশন। ছবির মেরে অহৈতুক একতা। বোধনের আলোকে শুধুমাত্র দেখাতে পারলে দর্শকের মনে হবে, দেখছি। দৃশ্য সত্য, দিব্য সত্য এবং প্রাতিভাসিক সত্যে মিলিয়ে অন্তর্গূঢ় আধুনিক মন খামকা কী দেখাতে চায়। তার ধারণাশক্তি একটি পড়ন্ত রৌদ্ররশ্মির অদ্ভুত পাত্রের মতো, তাতে কতকিছুর অনিবার্য প্রবেশ, আধেয় যা-খুশির অধিকার।'

শুধু নবীনরা, তরুণরা, সাম্প্রতিকরা বা আধুনিকরা কেন,—সাহিত্যে চিরন্তন সৃষ্টিসুখে বা সৃষ্টিবেদনায় আত্ম-সচেতন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই এই ধারণাশক্তির বিস্ময়কে পুরোপুরি না হোক, অংশত অবশ্যই চেনেন। আমি ভাবছিলুম, আমাদের বাংলা কবিতার এলাকায় শুধু তথ্য নিয়ে, ঘটনা নিয়ে, বক্তব্য নিয়ে মাতামাতি বা ব্যস্ততা যেটুকু অনিবার্য, সেইটুকুই চলুক, কিন্তু ধারণার মেজাজটাও জীবনানন্দ বা অমিয় চক্রবর্তী পর্যন্ত এসে থেমে যাবে কেন? কম্পোজিশনের প্রগাঢ়তা এবং বর্ণাঢ্যতা, বিস্তার এবং সংহতি সবই দেখা দিক।

আপাতত সময় সম্বন্ধে কবিমনের সচেতনতার প্রসঙ্গে অমিয়বাবুর 'এলিয়টের নতুন কবিতা' প্রবন্ধটি উল্লেখ করলে পাঠক-পাঠিকাকে অল্প কথায় আমার বক্তব্য জানাতে পারবো। তাই তাঁরই কথা শোনাচ্ছি।

তিনি এলিয়টের কয়েকটি কবিতার নমুনা তুলে 'মন্ত্রধ্বনিত কাব্য', 'দৃঢ় চিত্রণের ভাষা' ইত্যাদি উক্তি প্রয়োগ করেছেন। বলেছেন যে 'নিরবধিকাল এবং অবাঙমানসগোচর মর্ত্যযোগে আমরা আছি',—এলিয়ট তাঁর ধারণাশক্তি দিয়ে একেই পেয়েছেন,—আর, পাঠক হিসেবে তাঁর কাব্যের 'আভাময় বিস্ময়টুকু'ই আমাদের উপভোগ্য। লিখেছেন—

> 'কালের পরমতত্ত্ব এই চারটি কবিতাকে ছেয়ে আছে। ছোটো ছোটো গ্রামের নামে এই কবিতাগুলি রচিত—Burnt Norton, East Coker, The Dry Salvages, Little Gidding'—

এবং—

> 'আমরা যেখানে আছি তার একদিকে শেষ, একদিকে নতুন আরম্ভ;

অথচ সমস্ত মহাকালের মধ্যে আরম্ভও নেই, শেষও নেই। বসন্তের গোলাপ, শীতের তুষার ফুল, হেমন্তের রাঙা ঝরা পাতা—দূরে নদীর রৌদ্র জল—এবই ধার দিয়ে আমরা চলেছি। মনে হয় চলেছি। আসলে চলা আর স্থিরতা দুইই এক আকাশে বিধৃত; যার মধ্যে দিয়ে চলছি তা আছে এবং ছিল, শেষ হবে না। কিছুই তাই হারায় না, হারাবে কোথায়?'

এলিয়টের ধারণা ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন—

'মহাকাল বা মহাকাশ তার স্বরূপ কী; আমাদের মন-গড়া কম বেশি স্থিতি বা পরিমাণের বিচারে তা ধরা পড়ে না—

The moment of the rose and the moment of the Yew-tree are of equal duration.

সঙ্গেই যোগ করলেন,

for history is a pattern of timeless moments,

অর্থাৎ চৈতন্যের ভাস্বর-যোগে সময় আরো একটি মহাকালকে উদ্‌ঘাটিত করে, সেইটেই হল আসল ইতিহাস।

গভীর উপলব্ধি এসব। বলরাম দাস বা লালাবাবুর সময়-ধারণা তাঁদের নিজের নিজের যে-বেদনার রঙে রঞ্জিত ছিল, এ ঠিক সে-রঙ নয়। এলিয়টের এ-অবস্থান যেন নিত্য-আবর্তনের স্থির বিন্দুতে অবস্থান। এ তো ক্ষুধার্তের ধিক্কার নয়, ব্যাধিগ্রস্তের চীৎকার নয়, রাজনীতির ইস্তাহার নয়, পরীর গল্পের যাদু নয়। এখানে এসে, হঠাৎ যেন মার্কিন পোষাকে কোনো এক গগন হরকরাকে দেখতে পেলুম। যেন লালন ফকির একতারা বাজাচ্ছেন।

পাঠক-পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ওঁদের কাউকেই দেখিনি। শুধু মনে এলো, তাই এসব কথা লিখছি। আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই বৃত্তে ঘুরছি। যিনি দেখেছেন, তিনিই চিনেছেন। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা একই দেখেছেন। মনে পড়ছে ইমার্সনের প্রবন্ধ—Circles। ইমার্সন বলেছিলেন—আমাদের চোখ বর্তুলাকৃতি,—তাকেই তিনি বলেছেন—প্রথম বৃত্ত; যে দিগন্ত তার নজরে পড়ে, সেটি দ্বিতীয় বৃত্ত; এবং সারা প্রকৃতির মধ্যে এই এক বৃত্তচিহ্ন কতোভাবেই না দেখা দেয়। সেন্ট অগাস্টিন ঈশ্বরের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি সে-ই বৃত্ত যার কেন্দ্র সর্বত্রই, কিন্তু যার পরিধি কোথাও নেই।

এলিয়টের কথায় ফেরা যাক। অমিয়বাবু তাঁরই কথা মনে নিয়ে লিখেছেন—

'সময়ের বিস্ময়মন্ত্রে আমরা সকলেই দীক্ষিত, কেননা এই যুগের বিজ্ঞানদৃষ্টি লক্ষ কোটি বিগত বৎসরকে লুকোনো ভূ-স্তরে, কঙ্কালের হারানো পুনরাবিষ্কৃত যোগসূত্রে, আদিম তারা থেকে অণুতম কণিকার আকাশে ব্যক্ত করেছে—ইতিহাসের মানসিক মহাকালও চতুর্দিকে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এক হিসাবে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই পিছনেরও অতি কাছের খবর আমাদের কাছে ধরা পড়ল, পূর্বতর যুগের মানুষ পূর্বতমদের কাছ থেকে আরো দূরে ছিলেন। মনের কাল তাই আমাদের আজ আরো ব্যাপক, এবং একই কালে বৃহৎ বিশ্বের বৈচিত্র্য কতরূপে প্রকাশিত হয়ে চলছে সে সম্বন্ধেও আমরা সচেতন। সুতরাং আমাদের কবিতায় গল্পে কালের নূতন দৃষ্টি এসে পৌঁছল; আপেক্ষিক কাল, প্রাণীদের মধ্যে চৈতন্যের ভিন্নতায় কালের ভিন্নতা; ঘুমের কাল এবং জাগরণের কালের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিকদের প্রমাণিত পার্থক্য—এই সকল বিষয় আজ কাব্যের অন্তর্গত।'

এলিয়টের কথা থেকেই তিনি এই সময়-ধারণার সূত্র ধরে অডেনের এবং স্পেণ্ডরের প্রসঙ্গ তুলেছেন—

'আমরা জানি বিশেষভাবে স্পেণ্ডর ঐতিহাসিক কালের কাব্যব্যাখ্যাতা, এমন কি তাই নিয়ে তিনি অতি সুন্দর লীরিক রচনা করেছেন যাতে বিস্ময়ের সহজতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ঘটনা; অডেন মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টি-পাওয়া; নানা জাতীয় ভাবনার সময়কে নিয়ে তিনি অদ্ভুত কাব্য বেঁধেছেন।'

জে বি প্রিস্টলির কয়েকটি সময়-নাট্যও আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু সে-কথা পরে বলা যাবে। আজ আমাদের বহু কর্ম কোলাহলময় কলকাতার একটি অপরাহ্ণ-সীমা থেকে আমি অনন্ত কালের দিকে চেয়ে থাকতে চাই। সাহিত্যে আমাদের আধুনিক সেই নরোত্তমের দল দেখা দিন, যাঁরা আমাদের সমস্ত সংযোগের মধ্যেও যোগস্থ থাকবেন। যাঁরা জৈব সত্যের সংসারে বসেও মানবিক সত্যকে আরো সত্য করে ধরবার চেষ্টা করবেন। জগৎ বেড়ে যাচ্ছে, বোধহয়। মানুষকে আরো বাড়তে হবে। এ ভাবনাও আমার কলমেই লিখলুম বটে, কিন্তু আসল লেখক আমি নই,—বাংলায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখে গেছেন। সে আমাদের শোনবার কথা। মনে আসছে তাঁরই কথা—

'তোমার নিজের স্ফূর্তির সহকারে, তোমার নিজের অভিব্যক্তির সহকারে, তোমার জগতের পরিধি প্রসার লাভ করিতেছে। ঠিক যে রীতিতে তুমি জগতের সৃষ্টি করিয়াছ, ঠিক সেই রীতিক্রমে তোমার জগতের সীমা বাড়াইতেছ। দেশে তাহার সীমা বাড়াইতেছ ও কালে তাহার সীমা বাড়াইতেছ।'

তিনি একথা বলেন নি যে, জগৎ নিত্যবিস্তারসর্বস্ব। বলেছেন—'জগতের স্রোত আকাশ ব্যাপিয়া কাল বাহিয়া চলিতেছে; সুনিয়তভাবে চলিতেছে; কেন না তোমার ইচ্ছাক্রমে উহা ঐরূপে চলিতে বাধ্য।'

রামেন্দ্রসুন্দর জগৎকে নিয়মাধীন জেনেছিলেন।

এলিয়টের সময়-ধারণা থেকে আজ আমার মন এসে পড়লো তাঁর এই জগৎ-জিজ্ঞাসায়। দুটি এক অবস্থান নয়। অনুষঙ্গের যোগ মাত্র। হয়তো আরো গভীর যোগ আছে। রামেন্দ্রসুন্দরও একটি স্থির বিন্দুর ওপর জোর দিতে চেয়েছিলেন। মানুষকে তিনি এই জগৎ-বিস্তারের মধ্যেই 'মনুষ্যত্বের অর্থ' বুঝে দেখতে বলেছিলেন। তাঁর জন্মশতবর্ষের উৎসবভূমিতে দাঁড়িয়ে এই সেদিন জেমো-কাঁদিতে গিয়ে আমি এই কথাই ভাবছিলুম। (ক্রমশঃ)

এ মাসের বৃটেনে

জি. এ. জনসন

বৃটেনে এই সময়ে লোকেরা ভাবতে সুরু করে ছুটির কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার কথা। আবহাওয়ার দেবতা এ বছর বেশ সদয় ছিলেন বলতে গেলে যদিও হঠাৎ-আসা কিছু ঝড় একেবারে হয় নি এমন নয়। যদি এমনি চলতে থাকে, তাহলে একটা অসুবিধের কথা হবে যে, মাটি ভাল করে জল পাবার আগেই শরৎ এসে যাবে, আর সবই শুকিয়ে যাবে, কিন্তু এখন পর্যন্ত বাগানের অবস্থা মোটামুটি ভালই রয়েছে।

যাঁরা বাড়িতে থাকবেন বলতে হবে ভাগ্যবান তাঁরাই। ভারতবর্ষে যিনি বহুদিন বাস করেছেন, তিনি জানেন সূর্যের আলোকে পাকড়াও করতে হলে সূর্যের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হয় না। এখানে তাই হয়, ফলে রাস্তা সর্বপ্রকার যানবাহন---বাস, ... মোটর সাইকেল, মোটর ...দের গাড়ি ... তে ... ছে। ... তাঁটিতে ... বাঁধতে ... র নেতার ... খরের ঘমা লেগে... ঘটনাবলীর স্রোত থেকে ... ত কেউ যদি বিদেশে বেড়াতে ...তে চান, তিনি দেখবেন যে, যদিও এয়ার লাইনের চাকরি-খুশি কর্মীরা সবাই ঠিকঠাক কাজ করছে---কিন্তু ট্র্যাভেল এজেন্সীর লোক হয়ত আপনার জন্য হোটেলে ঘর ঠিক করে রাখতেই ভুলে গেছে, কি হাঙ্গামা বলুন তো!

অথচ ঘরে বসে আপনি সমুদ্র-তীরের ভিড় দেখতে পারেন, প্রমোদ-মেলার প্রমোদ দেখতে পারেন---দেখতে পারেন রাস্তায় থেমে-যাওয়া মোটর গাড়ির আট মাইল লম্বা লাইন, ইয়টগুলি ঠাণ্ডা মেরে রয়েছে, বৃষ্টিতে পোলো খেলা হয় নি, আর ক্রিকেটও আস্তে আস্তে তার ভবলীলা সাঙ্গ করছে---অবশ্যই এগুলি দেখবেন আপনি টেলিভিশনে। আর যদি

— সাপ্তাহিক বসুমতীর লণ্ডনস্থ বিশেষ প্রতিনিধি স্টেটসম্যানের প্রাক্তন সম্পাদক জি এ জনসন।

সিনেমায় যেতে চান তো গিয়ে দেখবেন, এক রাত্রির দুঃস্বপ্নের নায়ক জনপ্রিয় সঙ্গীতকার তাঁর প্রবল ভক্তবৃন্দ দ্বারা ধাবিত। অবশ্য আপনার খারাপ সীটটার জন্য যা কষ্ট হবে, আর কিছু কষ্ট নাও হতে পারে। থিয়েটারে গিয়ে রয়্যাল শেক্সপীয়র কোম্পানীর অভিনয় দেখতে পারেন (লর্ড চেম্বার-লেনকে ধন্যবাদ) সঙ্গে পাবেন বেঠোফেনের দু-একটা টুকরো, যার সঙ্গে দেখানো হচ্ছে ত্রিশ বছর আগেকার কোনো আশ্চর্য আধুনিক নাটকের থেকে কিছু অংশ---একেবারেই অসহ্য ডিসপেপসিয়া রোগীর মত।

আর তা যদি মনে হয় তাহলে আবার টেলিভিশন দেখতে বসে যান, দেখুন 'মিরর' খবরের কাগজ দলের তরফ থেকে লর্ড বুথবিকে পাঁচ লক্ষ টাকা উপহার কেন দেওয়া হচ্ছে আর লর্ড বুথবি তাঁদের স্বার্থ কি ভাবে রক্ষা করেন। অবশ্য তিনি সাইপ্রাস সম্পর্কে কথা বলতেও সুরু করতে পারেন- - - - -

আর তাহলেই দেশের সামান্য আমোদ-প্রমোদের তল্লাট থেকে চলে যেতে হবে বৃহত্তর পৃথিবীর দিকে। নোয়েল কাওয়ার্ড-এর একটি নাটকের চরিত্র বলছে টেলিভিশনে 'আপনার জীবনের ঘটনা বলুন এ থেকে কে পর্যন্ত।' আন্তর্জাতিক দুশ্চিন্তার দৌড় অবশ্য আরো দূরে গেছে---এ থেকে ভি পর্যন্ত। আর্চ বিশপ ম্যাকারিয়স, এবং সাংবী অ্যালিস থেকে ভিয়েৎনাম পর্যন্ত এবং এস কেও ভুললে চলবে না---সিনেটর গোল্ডওয়াটার। আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে দুশ্চিন্তা আরো বেড়েছে, কারণ এ বছরেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর পঞ্চাশ বছর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পঁচিশ বছর গত হল। সাইপ্রাসের হাই কমিশনারের সঙ্গে একমত হয়ে পৃথিবীর কোনো প্রধান রাষ্ট্রনায়কই এখন আর তৃতীয় মহাযুদ্ধের কথা ভাবতে পারছেন না। কিন্তু দুর্ঘটনা তো কেউ এড়াতে পারে না, কেন না এখন পারমাণবিক অস্ত্র তো ক্রমানুয়ে একের পর এক রাষ্ট্রের করায়ত্ত হতে

ফুলভারে সজ্জিত বসন্তের বিদায় দৃশ্য

চলেছে, কথাটা ভয়াবহ সিনেটর তাঁর দেশের কন্যাগুরদের কাছে বলেছেন।

আন্তর্জাতিক গোলমালের প্রাথমিক ধাক্কা এসে পড়ে স্টক মার্কেটের উপর। লণ্ডনের স্টক এক্সচেঞ্জ আপাতত শান্ত, সেটাই ভরসার কথা। কিন্তু গোলমাল আরো আছে।

বহু বছর আগে (যখন আরো গোলমাল সৃষ্টিকারী) দাড়ি কামানোর বৈদ্যুতিক খুর তখনো বেরোয় নি, গ্র্যাজুয়েট হবার পর আমার শিক্ষককে একটা রোলস্ খুর উপহার দিয়েছিলাম। তখন সেটাকেই দাড়ি কামানোর সবচেয়ে দ্রুত যন্ত্র বলে ভেবেছিলাম। দু' বছর আগে আমি যখন ইংল্যাণ্ডে ফিরি তখন জনপ্রিয় খবরের কাগজের পুরো পাতা বিজ্ঞাপন দেখে বুঝলাম যে, রোলস্ খুরওলারা এখন ওয়াশিং মেশিন তৈরি করতেই বেশি মনোযোগী, এবং জন ব্লুম-এর দাড়ির চাইতে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড কামানোই প্রধান লক্ষ্য। সম্প্রতি এই ওয়াশিং মেশিন সাম্রাজ্যের পতনে এ-শিক্ষা আমাদের হওয়া উচিত যে, যাঁরা শেয়ার কেনেন তাঁদের সাবধান হতে হবে।

এটা এবং আরো আধুনিক ঘটনা হল যে, একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান কোনো কোনো শেয়ার কেনা-বেচা বন্ধ করেছেন---এর ফলে জনসাধারণ আধুনিক ব্যবসার রহস্য সম্পর্কে আরো ওয়াকেবহাল হচ্ছেন। এবং স্পষ্টতই কোনো একটি বিশেষ জিনিসের ব্যবসা করা ঠিক নয় এটা বোঝা যাচ্ছে।

ধরা যাক: প্যাটাগনিয়ার আলপিনের ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। একজন লোক ...

...

করবার ...

এই শেয়ার ...

কয়েক বছর পর পা... তেমন প্রয়োজন রইল না, ... সঙ্গে শেয়ারের বাজারদরও কমে গেল। এই সময় ধরা যাক্ একজন লোক একটি পকেটে ধরে এমন কমপিউটার তৈরি করলো, কিন্তু ভালভাবে তৈরি করার মত মূলধন নেই তার। এখন ধরা যাক্ একটি লোক, যার সঙ্গে এসব জিনিসের কোনো সম্পর্ক ছিল না, সে হঠাৎ এসে দুটো কোম্পানীরই কর্তা হয়ে বসল টাকা দিয়ে---এরপর কি হতে পারে তা আমার চাইতে অনেক ভারতবাসী ভাল বলতে পারবেন।

ভারত দর্শন

● পার্লামেণ্ট ভবন

রাজধানী ঃ

অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর পরিবেশের মধ্যে কেটে গেল এ সপ্তাহটা। কেরলের মন্ত্রিসভার পতন, উড়িষ্যার প্রধানমন্ত্রীর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সিদ্ধান্ত, উত্তর প্রদেশের ঘটনাবলী, পার্লামেণ্টের অধিবেশনের সুরুতে খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বজ্রনিনাদ, ভারতীয় মহিলাদের জাতীয় ফেডারেশনের অভিযান এবং সর্বোপরি গভীর রাত্রিতে ভারতের সলিসিটর-জেনারেল শ্রীহেমনাথ সান্যালের নৃশংস হত্যাকাণ্ড রাজধানীর জীবনপ্রবাহকে অত্যন্ত উদ্বেগসঙ্কুল করে তুলেছিল, নয়াদিল্লীর মানুষ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

শ্রীহেমনাথ সান্যালের হত্যা সম্পর্কে মানুষের মনের সংশয় এখনও দূর হয় নি। সন্দেহভাজন পাঁচজনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। একজন সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই নাকি স্বীকারোক্তি করেছে। পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডকে নিছক চুরির ঘটনা বলে ধরে নিয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে এ পর্যন্ত যা' কিছু প্রকাশ করা হয়েছে তাতে মনে হয়, চুরি করতে এসে বেকায়দায় পড়ে দুর্বৃত্তেরা শ্রীসান্যালকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিল।

শ্রীসান্যালের অগণিত বন্ধু-বান্ধব, তাঁর আত্মীয়-পরিজন ও নয়াদিল্লীর সাধারণ মানুষের মত সম্পূর্ণ আলাদা। দেওয়াল-আলমারীর ভেতরে যে-সিন্দুকটি ছিল তা' আকারে অত্যন্ত ছোট। শ্রীসান্যালের অনুপস্থিতিতে দিনের বেলায় যে-কোন সময়ে চোর সিন্দুকটি অনায়াসেই অপহরণ করতে পারত। তা' ছাড়া, আলমারীর বাইরেও মূল্যবান জিনিসের অভাব ছিল না। হত্যাকারীরা সেগুলো স্পর্শও করে নি।

অভিযোগ উঠেছে, তদন্তকালে এসব বিষয়ের প্রতি সম্যক দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। গাড়ি খারাপ হওয়ার অভিযোগে শ্রীসান্যালকে যথাসময়ে হাসপাতালে পাঠানো হয় নি। এখন শোনা যাচ্ছে, গাড়ি খারাপ ছিল না। সংবাদটাই মিথ্যা। এসব অভিযোগ অত্যন্ত মারাত্মক।

আকবর রোডে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বসতিপূর্ণ এলাকাতেই তিনি ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, সংসদের অধ্যক্ষ এবং ভারত সরকারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরাই এখানে বাস করেন। এঁদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশবাহিনী সদাসতর্ক। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অপরাধীরা হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপদে পালাতে পেরেছে। এতে মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে ত্রাস ও সংশয়ের। এ ঘটনা কেবল মর্মান্তিক নয়, অত্যন্ত রহস্যজনক। পার্লামেণ্টের সদস্যগণও এই বেদনাদায়ক ঘটনার উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

● শ্রীহেমনাথ সান্যাল

দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্র শ্রীসান্যালের কাছে পাঠানো হয়েছিল আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। এ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তিনি পেশও করেছিলেন। ১২ই সেপ্টেম্বর কলকাতা যাত্রার আগেই চূড়ান্ত রিপোর্টও তাঁর দাখিল করার কথা ছিল। তিনি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন না। তাঁর ঘরে হীরা-জহরৎ অথবা মূল্যবান কোন অলঙ্কারও ছিল না। এসব কথা উদয় হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। কিসের লোভে তবে দুর্বৃত্তেরা তাঁকে এমন নৃশংসভাবে হত্যা করলো? এসব প্রশ্ন একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। মানুষের মনে যে-সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে তা' দূর করতে হলে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এ ঘটনার তদন্ত আবশ্যক হবে। শ্রীসান্যালের পদমর্যাদা ও দায়িত্বপূর্ণ কাজের কথা চিন্তা করে তাঁর গৃহে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা হলেও আজ তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটতো না।

শ্রীসান্যাল ছিলেন কৃতী পুরুষ। আইনশাস্ত্রে ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। তিনি ছিলেন আইনশাস্ত্রে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্যতম। সুপ্রীম কোর্টে, কলকাতা হাইকোর্টে ও অন্যান্য স্থানে তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও বেদনা প্রকাশ করে তাঁর পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। আমরাও অত্যন্ত বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে শ্রীসান্যালের স্ত্রী-কন্যা ও আত্মীয়-পরিজনদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

* * *

সংসদে সরকারের খাদ্যনীতি অনুমোদিত হয়েছে ২০১—৩৪ ভোটে। দীর্ঘ পনের ঘণ্টা ধরে দেশের খাদ্যসঙ্কট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিতর্ককালে বিরোধী পক্ষ থেকে মজুতদারী ও মুনাফা-বাজী প্রতিরোধের ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে ভীরুতার, ব্যবসায়ীদের প্রতি সরকারের অহেতুক দরদের এবং মজুতদারদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নরম মনোভাবের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছিল। পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম। তিনি বলেছেন, জনমনে অনাস্থার সৃষ্টি করেছেন বিরোধী দল। তাতেই দেশের খাদ্য পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

খাদ্যসঙ্কটের ওপর আলোচনা-কালে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ যে-সকল কথা বলেছেন, তাতে নতুন কিছু নেই। এ-ধরণের বিতর্ক দেশবাসী দীর্ঘকাল শুনেছে। খাদ্যমন্ত্রী কিছুটা নতুন কথা শুনিয়েছেন। তিনি খাদ্য সমস্যাকে জটিলতর করে তোলার দায় ও দায়িত্বটা সম্পূর্ণ চাপিয়ে দিয়েছেন বিরোধীদের ঘাড়ে। এ যুক্তি অভিনব। বিরোধী দলগুলি এখন অত্যন্ত দুর্বল; কংগ্রেসের মত সাংগঠনিক শক্তি বিরোধীদের কারও নেই। এখন প্রশ্ন উঠবে কংগ্রেস কি করেছেন? কংগ্রেস তার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে খাদ্যের সঠিক অবস্থাটা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কি? সরকারও কি এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণদায়িত্ব পালন করেছেন?

কেউ তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি। কংগ্রেস, বিভিন্ন বিরোধী দল এবং রাষ্ট্রনেতারা মিলে সৃষ্টি করেছেন মানুষের মনে বিভ্রান্তি, নৈরাশ্য ও হতাশা। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কেউ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভয় আজ পর্যন্ত দেন নি। সময়ে অসময়ে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা ঘোষণা করেছেন খাদ্যসঙ্কটের কথা। সরকারী ঘোষণার পরই মুনাফাখোর ও মজুতদারের দল তুলেছে বাজার গরম করে। মুনাফা লুটেছে অবাধে। তাদের প্রতিরোধের জন্যও সরকার, কংগ্রেস অথবা বিরোধী দল সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা চান নি। সাধারণ মানুষের ওপর আস্থা স্থাপন করে, তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করলে মজুতদাররা সাহস পেত না সরকারের আদেশ অমান্য করতে।

শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম স্বীকার করেছেন, রাজধানীতেই সরকারের নাকের ডগায় সরকারী ব্যবস্থার সুফল পাওয়া যায় নি—অধিক মূল্য দিতে হচ্ছে মানুষকে। অথচ নয়াদিল্লীতেই সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় কয়েকদিন বিপুল পরিমাণ

● শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম

খাদ্যশস্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। দেশের মানুষকে আরও কাছে টেনে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে অভিযান চালালে এতদিনে অবস্থা ফিরে যেতো—শায়েস্তা হতো অতি মনাফালোভীর দল। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পায় নি। তারা সরকার, কংগ্রেস ও বিরোধীপক্ষের কায়দা ও কৌশল ধরে ফেলেছে। এক পক্ষের তীব্র প্রতিবাদ এবং অপর পক্ষের পাল্টা আক্রমণের প্রহসন তো চললো দীর্ঘকাল। এখন উভয় পক্ষের সংগ্রামের কায়দাটা বদলানো দরকার। ভাঁওতা দিয়ে বেশিদিন চলতে পারে না। মানুষ চিরকাল নীরব থাকবে না।

বিরোধী দলের ঘাড়ে খাদ্য পরিস্থিতি জটিলতর করে তোলার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী রেহাই পেতে পারেন না। মানুষকে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যশস্য ও অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহের

● শ্রীঅশোককুমার সেন

প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব সরকারের। মানুষের ভাণ্ডার বাড়ন্ত না থাকলে, বিরোধী দলের নেতারা গলা ফাটিয়ে মাঠে ময়দানে চীৎকার করলেও মানুষ তাঁদের কথায় সায় দেবে না। এই সহজ ও সরল কথাটাও দেখছি খাদ্যমন্ত্রী বেমালুম এড়িয়ে গেছেন।

* * *

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, গোওয়া পার্লামেন্টারী নির্বাচনে ভোটপত্রের

কারচুপির বিষয় বিবেচনার জন্য নির্বাচনী কমিশন প্রয়োজনীয় তদন্ত-কার্য চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত চালাতে নির্বাচনী কমিশন দৃঢ়সঙ্কল্প।

ব্যালট বাক্সের পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে সরকারের সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করে তিনি বলেছেন, ট্রাইবুনালের রায়ে যাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তাড়াহুড়া করে যে-ভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাতে মনে হয়, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়াই লক্ষ্য। সরকার এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

শ্রীসেন ঠিকই বলেছেন। আইনের একটা স্বাভাবিক গতি রয়েছে। তার সেই গতিপথ কোনভাবে যাতে প্রভাবিত না হয় সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি থাকা উচিত।

* * *

শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জোরালো আক্রমণ চালিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্কটের ঘনঘটা এবং সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি বাধ্য হয়েছেন এই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে। স্বতন্ত্র দল ভিন্ন সকল

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

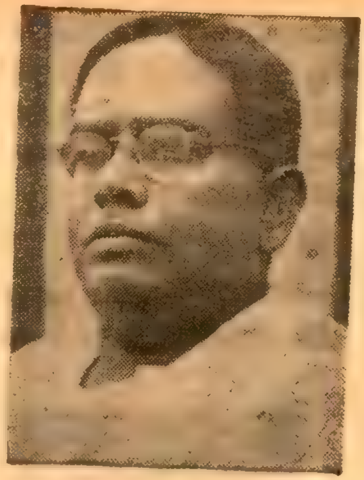

● শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরোধী দলই এই অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে এই দ্বিতীয়বার অনাস্থা প্রস্তাবের মোকাবিলা করতে হল। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে নেহরু-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন আচার্য জে বি কৃপালনী। বিপুল ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য হয়েছিল সে প্রস্তাব। এবারেও বিপুল ভোটাধিক্যেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়েছে।

মাত্র তিনমাস আগে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। বিরোধী পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা যত যুক্তিসঙ্গতই হোক না কেন, তিনমাসের শিশু-মন্ত্রিসভাকে সত্যিই তার জন্য দায়ী করার সময় সত্যিই আসে নি। অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে দেশের দুর্গতির কথা মন্ত্রিসভার কাছে গণতান্ত্রিক পথে তুলে ধরার চেষ্টায় অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে থাকলে আমরা আপত্তি করবো না। অনাস্থা প্রস্তাব সামনে থাকলে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার এবং সরকারের দোষত্রুটির প্রতিকারের দাবীর পথটা সহজ হয়।

মধ্যপ্রদেশ:

শ্রী কে এল খাদিওয়ালার পরিত্যক্ত আসনে কে আসবেন তা নিয়ে জোর জল্পনা-কল্পনা চলেছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকের ধারণা—বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের হাল ধরার উপযুক্ত ব্যক্তি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু। তিনি উপদলীয় রাজনীতির অনেক উর্ধ্বে। তা ছাড়া বিবদমান দুটি দলের মধ্যে বোঝাপড়া করে প্রদেশ কংগ্রেসকে চাঙ্গা করাও তাঁর পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

শ্রীদেশলেহরার অনুগামীরা পূর্বেও ডঃ কাটজুকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি করতে সম্মত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের দল তখন বেঁকে বসেছিলেন। বিরোধীদের পর্যুদস্ত করে চূড়ান্ত জয়ই ছিল তাঁদের একমাত্র কামনা। মুখোমুখি সংগ্রামে দেশলেহরা হেরে গেলেন; খাদিওয়ালা হলেন কংগ্রেসের নেতা।

হাইকোর্টের বিরূপ মন্তব্যের

● ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু

পর গেল মাসে শ্রীখাদিওয়ালা সভাপতির পদে ইস্তফা দিয়েছেন। হাইকোর্টের মন্তব্য থেকে অব্যাহতির আশায় তিনি আপীল করেছেন সুপ্রীম কোর্টে। সুপ্রীম কোর্টের বিচার সময়সাপেক্ষ। কাজেই অধিক দিন প্রদেশ কংগ্রেসের

সভাপতির আসন শূন্য থাকতে পারে না।

কংগ্রেস হাইকমাণ্ডও চাইছেন, সর্বসম্মত প্রার্থীকেই সভাপতির আসনে বসাতে। বিরোধীদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মন্ত্রিসভায় নিয়ে একটা মিটমাটের চেষ্টাও চলেছে। শ্রীতখতমল জৈন ভিন্ন আর কাউকে মন্ত্রিসভায় নিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র সম্মত হচ্ছেন না।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন অথবা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীকে নতুন করে গঠনের প্রশ্নটি নির্ভর করছে শ্রীদেশলেহরা কর্তৃক উত্থাপিত নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তির ওপর। এ সপ্তাহেই

● শ্রী ডি পি মিশ্র

তাঁর মামলার বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠিত হচ্ছে।

* * *

শেষ পর্যন্ত সর্বোদয় সমাজের শুচিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠলো। দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে সর্বোদয় কর্মীদের কয়েক জনের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি রায়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের খরচের হিসেবে নাকি প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার গরমিল ধরা 'ভাউচার' পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কিছু টাকার খরচের উপযুক্ত ভাউচার করা হয় নি। সম্মেলনের কাজের জন্য সংগৃহীত সিমেণ্ট এবং টিনেরও নাকি কোন হিসেব নেই।

* * *

ভারতীয় জনসংঘের নেতৃত্বেও ফাটল ধরতে সুরু করেছে। দেশের

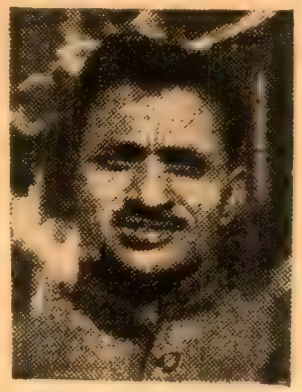

● শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায়

খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ও পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে সমর্থনের প্রশ্ন নিয়ে মতভেদ চলেছে নেতাদের মধ্যে। শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে সরকারের আবেদনে সহযোগিতার পক্ষপাতী।

জনসংঘের সভাপতি শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায় এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। তাঁদের মতে, বৈদেশিক ব্যাপারে সরকারের নীতি ভ্রান্তিপূর্ণ, বিপজ্জনক। এতে আস্কারা পাচ্ছে কমিউনিস্টরা। ভারতে তাদের অনুপ্রবেশের পূর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছেন ভারত সরকার।

শ্রীবাজপেয়ী খাদ্যশস্যের শতকরা ৪০ ভাগ সরকারী গুদামে তুলে ন্যায্যমূল্যের দোকানের মাধ্যমে বিতরণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। ঘোষ-উপাধ্যায় গোষ্ঠী স্টেট ট্রেডিংয়ের

রাজস্থান ঃ

জয়পুরের জল ঘোলা হতে সুরু করেছে—সৃষ্টি হচ্ছে কংগ্রেসের সামনে নতুন সঙ্কট। শ্রীদামোদরলাল ব্যাস ও শ্রীকুম্ভরাম আর্যের মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অনেকের মনই বিগড়ে উঠছে।

এঁদের দুজনকেই মন্ত্রিসভায় গ্রহণের চেষ্টা হয়েছিল মাস কয়েক আগে। তখন বিরূপ ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া। তিনি এক সময়ে কুম্ভরামকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের দাবীও তুলেছিলেন। কুম্ভরামের প্রধান শত্রু ছিলেন প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী দামোদরলাল। এখন এঁরা দুজন হ'য়ে পড়েছেন পরম সুহৃদ। মুখ্যমন্ত্রীর মতেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় এদের প্রবেশ নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে দলের মধ্যে। নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মন্ত্রিসভায় গ্রহণও সম্ভব হচ্ছে না।

মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় পথটাও প্রায় পরিষ্কার হয়ে এসেছিল। শিকারপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য শ্রীবালুরাম এবং ধোলপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত অপর একজন সদস্য পদত্যাগ করতেও সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুর নাকি এতে সম্মতি দিতে পারছেন না।

● শ্রী সুখাদিয়া

তিনি এসেছেন ভরতপুর থেকে। শ্রীব্যাসের মনোনয়নে তাঁর নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে গোলযোগের আশঙ্কা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। শ্রীকুম্ভরামের বিরুদ্ধে অনেকেই খড়গহস্ত। ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীচন্দনমলের গৃহে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সভায় উপস্থিত ছিলেন শ্রীরাজবাহাদুর, পূর্তমন্ত্রী শ্রীহরিশচন্দ্র, জয়পুর জেলা কংগ্রেসের প্রধান শ্রীরামকরণ যোশী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তাঁরা শ্রীব্যাস ও শ্রীআর্যের মনোনয়নের বিরোধিতার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পদত্যাগ করে এ দুজনের মন্ত্রিসভায় প্রবেশের পথ সুগম করতে সম্মত হয়েছিলেন—তাঁরাও এখন সরে দাঁড়াতে নারাজ। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাদিয়া হাইকমাণ্ডের অনুমোদন নিয়ে এসেছেন।

হাইকমাণ্ডের ঘোষণা আগুনে ঘৃতাহুতির সামিল হয়ে পড়েছে। বিধানসভার ১৪ জন সদস্য হুঙ্কার দিয়ে উঠেছেন—তাঁরা পদত্যাগ করবেন। ধোলপুরের কংগ্রেসকর্মীরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তাঁরা কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগের হুমকী দিয়েছিলেন।

এই পটভূমিকাতেই বিধানসভার অধিবেশনের মুলতুবী ঘোষণা করা হয়েছিল ২৪শে আগস্ট। এখন সবটাই নির্ভর করছে শ্রীসুখাদিয়ার কৃতিত্বের ওপর। বিরোধের মীমাংসায় তাঁর সুনাম আছে। ঘোলা জল একটু থিতিয়ে এলে বিরোধীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা তিনি করে উঠতে পারবেন বলে অনেকেই আশা পোষণ করেন।

* * *

কংগ্রেসের দলীয় কোন্দলের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী হওয়ার ফসলটা বেশিমাত্রায় কুড়িয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। ২৪শে তারিখেই স্বামী কুমারানন্দের নেতৃত্বে বিধানসভায় এসেছিলেন কমিউনিস্ট সত্যাগ্রহী দল। তখন বাইরে প্রবল বর্ষণ চলেছে। সেই দিনই হঠাৎ বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী হল। কমিউনিস্টরা এর সুযোগ নিয়েছে—প্রচার করেছে তাদের সত্যাগ্রহের জন্যই বিধানসভা বন্ধ হয়েছে। অনেকেই এ অপপ্রচার ধরতে পারে নি—মেনে নিয়েছে সত্যাগ্রহই বিধানসভার অধিবেশন মুলতুবী রাখার মুখ্য কারণ।

শ্রীরাজবাহাদুর

বিহার :

পরেশনাথ পাহাড়ের মালিকানা নিয়ে মন কষাকষি চলেছে গুজরাটের বিত্তশালী জৈন সম্প্রদায় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে।

পরেশনাথ পাহাড় জৈনদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানে বিশ জন তীর্থঙ্কর এবং অগণিত জৈন সন্ন্যাসী নির্বাণলাভ করেছেন। পরেশনাথ পাহাড় জৈন সম্প্রদায়ের কাছে কেবল নির্জীব পাথরের স্তূপ নয়। কাজেই তাঁরা এ পাহাড়ের কর্তৃত্ব রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিতে পারেন না। তাঁদের মতে জৈনধর্মের কোন ধারণাই রাজ্য সরকারের নেই।

বিহার সরকার মনে করেন—পরেশনাথ পাহাড় বিহারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সরকার জৈন সম্প্রদায়ের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত। জৈনগণ সরকারের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। বিহার সরকারের ঐ প্রস্তাবের পর গুজরাটের জৈনধর্ম গুরুরা আত্মশুদ্ধির জন্য সারা ভারতের জৈনধর্মে বিশ্বাসীদের তিনদিন অনশন পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রয়োজন হলে তাঁরা প্রতীক সত্যাগ্রহের পথে নামতেও দ্বিধা করবেন না।

* * *

সরেজমিনে সমীক্ষার পর সোভিয়েট দেশের বিশেষজ্ঞদের হাতে বোকারো পরিকল্পনার যে পরিবর্তন ঘটবে—তাতে ব্যয় হ্রাস পাবে শতকরা বিশ থেকে পঁচিশ ভাগ।

সোভিয়েট দেশের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামের দামও কম। অ' ছাড়া, কারিগরী কাজের ব্যয়ও নাকি আমেরিকার চাইতে কম হবে। বিশেষজ্ঞরা পরিকল্পনার নক্সার কিছু রদ-বদলও করবেন। তাতেও ব্যয় হ্রাস পাবে। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞগণ মস্কো ফিরে যাবার আগেই তাঁদের পরিবর্তিত নক্সার একটা প্রাথমিক খসড়া ইস্পাত মন্ত্রণালয়ে পেশ করে যাবেন। তাতে আগামী নভেম্বর মাসের ভেতরেই উভয় দেশের মধ্যে বোকারো পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা চুক্তিতে আসাও সহজ হবে। চূড়ান্ত নক্সা রচনায় সময় লাগবে ছ'মাস। তার কাজ আগামী মে মাসের মধ্যে শেষ হবে।

বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিকল্পনার কাজ সুরু হবে ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে এবং কাজ শেষ হতে সময় লাগবে তিনবছর। বোকারোর কারখানা থেকে ইস্পাত বাজারে সরবরাহ হবে ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি।

পরিকল্পনার কাজ ত্বরান্বিত করা এবং কাজকে ত্রুটিহীন সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পূর্ণ করার জন্য সোভিয়েট দেশ চাইছে পূর্ণ কর্তৃত্ব। বোকারো পরিকল্পনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলাদা। এর সর্বাঙ্গসুন্দর রূপায়ণের ওপর নির্ভর করছে ভারত-সোভিয়েট মর্যাদা। সোভিয়েট রূপকারগণ পূর্ণ কর্তৃত্ব পেলেও ভারতীয় কারিগর, ইঞ্জিনীয়ার এবং ভারতীয় যে-সংস্থাটি এর পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তাঁদের সহযোগিতার

কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে এর মধ্যেই বিতণ্ডার সৃষ্টি হওয়ায় ইস্পাত মন্ত্রণালয় বিব্রত বোধ করছেন।

কেরল ঃ

শঙ্কর-মন্ত্রিসভার পতনের পর কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে কমিউনিস্ট সরকারের পতনের পরও কেরলে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।

শ্রীশঙ্করের বিরোধী কংগ্রেস-কর্মীরা এর মধ্যেই তাঁদের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে নেমে পড়েছেন। শোনা যাচ্ছে, চাকোর অনুগামী দল এবং নায়ার-দল শ্রী এম পদ্মনাভনের নেতৃত্বে কেরলে স্বতন্ত্র পার্টি গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন

শ্রীচাকো মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেবার পর থেকেই স্বতন্ত্র পার্টি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ সুরু করে দিয়েছিল। চাকো নাকি কেরলে স্বতন্ত্র দলের নেতৃত্ব গ্রহণেও সম্মত হয়েছিলেন। স্বতন্ত্র নেতা শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁকে তাড়াতাড়ি কিছু না করতে তখন উপদেশ দিয়েছিলেন। তারপর এ আলোচনায় ভাটা পড়ে।

সামনে আসছে সাধারণ নির্বাচন। চুপ করে বসে থাকারও আর সময় নেই। শ্রীপদ্মনাভন তাই এবার উঠে-পড়ে লেগেছেন স্বতন্ত্র দল গড়ে তুলতে। আলাপ-আলোচনা চলেছে মুসলিম লীগের সঙ্গে। দল গড়ে তোলার পর নির্বাচনী আঁতাত হবে এঁদের মুসলিম লীগের সঙ্গে।

মহারাষ্ট্র ঃ

খাদ্যসঙ্কট থেকে মুক্তির নতুন পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন রাজ্য সরকার। অনুপূরক খাদ্য অধিক উৎপাদনের কথাটাই সরকার এখন ভাবছেন। মাছ, ফল ও তরিতরকারীর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ফল ও তরিতরকারী বেশি করে পেলে খাদ্যের ঘাটতি নাকি অনেকটা মিটবে।

সরকার এ কাজের জন্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনাও নিয়েছেন। ফল উৎপাদকদের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়া হবে। সোজা কথায় অধিক ফল ফলাও আন্দোলন সুরু হবে মহারাষ্ট্রে। ফল ও তরিতরকারী সংরক্ষণের জন্যও দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা ব্যয় করে ঠাণ্ডাঘর নির্মিত হবে। খুবই ভাল কথা। পশ্চিম বাংলার পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, বাঙালীকে তরিতরকারী, শাকসব্জী, কলা ও আলু খেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সরকারের উপদেশ শিরোধার্য করে বাঙালী যেদিন খাদ্যের অভ্যাস বদলাতে সুরু করেছে সেদিন থেকে আলু, কলা ও তরিতরকারীর বাজারে আগুন লেগেছে। বাজারে যাতে আগুন লাগতে না পারে তার ব্যবস্থাটাই মহারাষ্ট্র সরকারের আগে করা উচিত হবে।

আসাম ঃ

নতুন ধান উঠেছে এর মধ্যেই আসামের কয়েকটি জেলায়। যে-সব জেলায় প্লাবনের জলে ধানের ক্ষতি হয় নি সে-সব অঞ্চলে ফলনও এবারে ভাল হয়েছে। নতুন ধান বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসায়ীরাও নতুন চাল চেলেছে। বস্তা-পচা, অখাদ্য চাল বাজারে ছেড়েছে সস্তায়। ফলে, চালের ও ধানের দাম কিছুটা নেমেছে।

মজুতদার ও চালকলের মালিকরা বরাবরই এ কৌশলটা অবলম্বন করে থাকে। নতুন ধান উঠতেই বাজারে সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম মন্দা। চাষীর উদ্বৃত্ত ধানটা এমনি করে, অল্প পয়সায় পাইকার-মজুতদার এবং চালকলের মালিকরা গুদামে তুলে নেয়। চাষী বঞ্চিত হয় তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। কারণ গরীব চাষীর পক্ষে বেশিদিন ধান ঘরে ধরে রাখা সম্ভব নয়। চাষীর উদ্বৃত্ত ধান কেনা শেষ হয়ে গেলেই পাইকার, মজুতদার ও চালকলের মালিকদের চাকা যায় ঘুরে—ধানের দাম, চালের দাম তখন বাড়তে সুরু করে সঙ্কটের গতিতে। সরকারের কর্তব্য এ সময়ে এগিয়ে আসা—নতুন ফসল ওঠার আগেই ধানের সর্বনিম্ন মূল্য বেঁধে দেওয়া।

* * *

পার্বত্য এলাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের নেহরু-পরিকল্পনা গ্রহণের পর পার্বত্য রাজ্য গড়ে তোলার আন্দোলন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃত্ব সম্মেলন এখন কমিশনের অপেক্ষায় আছে। আসামের পার্বত্য এলাকার প্রশাসনিক কাঠামো তৈরির জন্যই কমিশন গঠিত হবে। প্রস্তাবিত কমিশনের সামনে নেতারা তাঁদের বক্তব্য পেশেরও সুযোগ পাবেন। কাজেই সর্বদলীয় পার্বত্য নেতারা এখন নীরব।

এদিকে আবার নতুন দাবী তুলতে সুরু করেছেন ছোট ছোট উপজাতীয় নেতারা। তাঁরা দাবী তুলছেন বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে নিজেদের আলাদা করার। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার কংগ্রেস কমিটী মিকির থেকে আলাদা হওয়ার দাবী তুলেছে। তাদের অভিযোগ, কাছাড়ীরা মিকিরদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে থাকায় বঞ্চিত [illegible] দাবী [illegible] তাদের প্রভাবমুক্তর। তাদের ভাষা এবং সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। মিজোদের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাকি তাদের নেই। কাজেই তাদের জেলা পরিষদ আলাদা করতে হবে। তারা এ নিয়ে স্মারকলিপি পেশ করার পর তাদের প্রতিনিধিরা আঞ্চলিক পরিষদ পর্যন্ত বর্জন করেছেন। একটা মীমাংসা না করতে পারলে বাড়বে জটিলতা এবং তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করবে অবাঞ্ছিত মহল। পাহাড়ের বাসিন্দারা যেভাবে একের পর এক দাবী পেশ করতে সুরু করেছে, তা মেনে নেওয়াও কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। মেনে নিলে দাবীর বহর বেড়েই যাবে। কোনদিনই তাদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হবে না।

সরকার সত্যি বিপদে পড়েছেন। এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে সর্বাগ্রে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রয়োজন হবে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে, শিক্ষার প্রসার হলে জাতীয় ঐক্যবোধ জাগ্রত হতে বেশিদিন লাগবে না।

আন্তর্জাতিক

• আলেকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় আরব শীর্ষ সম্মেলনে সমবেত কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধান।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ

আলেকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় আরব শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। আরব রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রপ্রধান, রাজা ও প্রধানমন্ত্রীদের এই সম্মেলনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের সভাপতিত্ব করেন।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য এই আরব শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। ইজরায়েল যদি জর্ডান নদীর জলের গতি ঘুরিয়ে দেয় তাহলে একাধিক আরব রাষ্ট্র শুকিয়ে মরে যাবে। আরব জাতি সংঘবদ্ধভাবে ইজরায়েলের এই কার্যের প্রতিবাদ করেছে। তা সত্ত্বেও যদি ইজরায়েল এই কাজ করে, তবে আরব রাষ্ট্রগুলি একযোগে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। ইজরায়েল বাঁধ বাঁধবার কাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে জর্ডান নদীর জল তারা আটকে দিতে পারে।

সংযুক্ত আরব কমাণ্ডের সুপ্রীম কমাণ্ডার জেনারেল আলি আমির সম্প্রতি বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র পরিদর্শন করেছেন। তিনি শীর্ষ সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর রিপোর্টে বলেন, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে আরব রাষ্ট্রগুলির অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণ প্রয়োজন।

ইজরায়েলের কার্যকে কেন্দ্র করে আরব জাতির ঐক্য আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইজরায়েলের সমর্থনে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এগিয়ে এলে আরবদের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সম্পর্ক আরও খারাপ হবে। এমনিতেই অধিকাংশ আরব দেশের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী, বিশেষ করে ইংলণ্ডের সম্পর্ক খারাপ। ইজরায়েলকে উপলক্ষ্য করে এই সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটবে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ঃ

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ নয় দিন ব্যাপী এক শুভেচ্ছা-সফরে বর্তমান সোভিয়েট ইউনিয়নে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও রাষ্ট্রপতির সেক্রেটারী শ্রী এস দত্তও গিয়েছেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সোভিয়েট ইউনিয়নে বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ তাঁকে একজন বিশিষ্ট বন্ধু বলে মনে করেন।

• মিকোয়ান

পূর্বে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী সুদৃঢ় করার জন্য তখন তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হবার পর এই তাঁর প্রথম সোভিয়েট সফর।

মস্কো বিমান বন্দরে ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে সম্বর্ধনা জানিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি আনাস্তাস মিকোয়ান ভারত-সোভিয়েট মৈত্রীর কথা উল্লেখ করেন। মিকোয়ান ঘোষণা করেন, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে। ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়ন উভয়েই শান্তি ও সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধী।

ভারতের ওপর চীনের আক্রমণ সোভিয়েট ইউনিয়ন সমর্থন করে নি, এবং এই আক্রমণের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রকাশ্যে তীব্রভাবে চীনকে ভর্ৎসনা করেছে।

বিমান বন্দর থেকে এক খোলা গাড়িতে মিকোয়ান ও প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভের সঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ক্রেমলিন প্রাসাদে যান। সর্বত্র

জনসাধারণ তাঁকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছে।

জওহরলাল নেহরু সোভিয়েট ইউনিয়নে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। একাধিকবার তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় হয়েছে। বর্তমানে নেহরু নেই। তবে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য সোভিয়েট ইউনিয়নে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবে বলে মনে হয়।

রাষ্ট্রপতির সফরের পূর্বে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী ওয়াই বি চ্যবন সোভিয়েট ইউনিয়নে সফর করেছেন, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী মার্শাল ম্যালিনভস্কী ও প্রধান-মন্ত্রী ক্রুশ্চেভের সঙ্গে সামরিক অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ক্রুশ্চেভ ভারতকে সর্ব-রকমে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং অত্যন্ত অনুকূল ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সোভিয়েট সফর সুরু হয়েছে।

ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী আন্ত-র্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এর মূল্য অপরিসীম। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের শুভেচ্ছা-সফরের ফলে এই মৈত্রী আরও দৃঢ় হবে।

চিলিঃ

গত সপ্তাহে চিলিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থী এডুয়ার্ডো ফ্রেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট দলসমূহ সমর্থিত স্যালভেডর অ্যালেণ্ডেকে ১,৪০০,০০০—৯৭০,০০০ ভোটে পরাজিত করে ছয় বৎসরের জন্য চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাডিকাল পার্টির প্রার্থী জুলিয়ান ডুরান বিশেষ ভোট পান নি:

চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এবার বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বামপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট দলগুলির সমর্থিত অ্যালেণ্ডে কিউবার ফাইডেল ক্যাস্ট্রো ও ব্রেজিলের বিতাড়িত বামপন্থী রাষ্ট্রপতি গুলার্টের সমর্থন পেয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাসী অ্যালেণ্ডে দরিদ্রের বন্ধু, এবং দেশের সর্বত্র দরিদ্র জনসাধারণ তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন করবে, এরূপ আশা করা গিয়েছিল। সান্টিয়াগোতে অ্যালেণ্ডের সমর্থনে লক্ষাধিক লোকের সভাও হয়েছিল। তাই অ্যালেণ্ডের পরাজয় অনেককেই বিস্মিত করেছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই বেশি বিস্মিত।

• এডুয়ার্ডো ফ্রেই

ল্যাটিন আমেরিকার কোন দেশে এই প্রথম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির কোন একজন প্রার্থী নির্বাচিত হলেন। আট বৎসর পূর্বে এডুয়ার্ডো ফ্রেই যখন তাঁর দল গঠন করেন, তখন তিনি মাত্র শতকরা ৭টি ভোট পেয়েছিলেন। আর আট বৎসর পরে আজ তিনি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন।

সেনেট-সদস্য হিসাবে ইতিমধ্যেই এডুয়ার্ডো ফ্রেই চিলির ভেতরে ও বাইরে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর আমলে চিলির সমৃদ্ধি বাড়বে কিনা, দেশের অধিকাংশ দরিদ্র অধিবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কিনা, তাই লক্ষ্য করবার বিষয়। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি জর্জ আলেসান্দ্রি চিলির অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বিশেষ কিছু করতে পারেন নি।

দক্ষিণ রোডেশিয়াঃ

অবশেষে আইয়ান স্মিথের চৈতন্যোদয় হয়েছে দেখা যাচ্ছে। তিনি স্বীকার করেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় সকল অধিবাসীর গণ-ভোট গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন না।

দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ আফ্রিকীয়দের ভোটাধিকার নেই। সংখ্যালঘু শ্বেতকায়রা সমগ্র দেশে তাদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্বেতকায়-শাসিত দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করাই প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথ ও তাঁর দলের উদ্দেশ্য। আফ্রিকীয়রা এর ঘোরতর বিরোধী। তাদের বক্তব্য, সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করে সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতা দিতে হবে। এই নিয়ে আফ্রিকার সকল দেশেই তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

• আইয়ান স্মিথ

বিগত কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে আফ্রিকীয় ও এশীয়দের চাপে বৃটিশ সরকার সম্মত হয়েছেন, এখনই এই মুহূর্তে আইয়ান স্মিথ সরকারকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেয়া হবে না।

সম্প্রতি লণ্ডনে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস-হিউমের সঙ্গে আলোচনার পর আইয়ান স্মিথ স্বীকার করেছেন, তিনি গণভোট গ্রহণ করবেন। অবশ্য এই সঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার অধিকাংশ মানুষ (শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়) তাঁর স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করবে, এবং আইয়ান স্মিথের কর্তৃত্বেই শীঘ্রই দক্ষিণ রোডেশিয়া স্বাধীন হবে।

জাপান :

টোকিওতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের যুক্ত অধিবেশন সুরু হয়েছে। ১০২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন।

এই সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি অর্থমন্ত্রী শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী বলেছেন, বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্যদের দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ভাণ্ডারের অর্থবৃদ্ধি হলে তবেই অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলি তাদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য এখান থেকে পাবে। অনুন্নত দেশগুলির আজ প্রধান সমস্যাই হল, উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগুলির বিশেষ দায়িত্ব আছে।

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারীর এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক বর্তমানে সরাসরি বেসরকারী শিল্পপতিদের সাহায্য করতে পারে না। দেশের সরকারের সম্মতিতে, তার প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে তবে কোথাও কোথাও বিশ্বব্যাঙ্ক বেসরকারী শিল্পপতি ব্যবসায়ীদের টাকা দেয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তে বিশ্বব্যাঙ্ক দেশের বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির মারফৎ সরাসরি শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের এই টাকা দিতে পারে কিনা সে সম্পর্কে টোকিও সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে বিগত জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি মিঃ উড্স বলেন, এই সিদ্ধান্তের দ্বারা উন্নত দেশগুলি বেশি লাভবান হবে, এবং অনুন্নত দেশের ক্ষতি হবে।

রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রভৃতি যদি অনুন্নত দেশগুলির সাহায্যে বেশি করে এগিয়ে আসে, তবে এই দেশগুলিকে বিভিন্ন উন্নত দেশগুলির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না।

সিংহল :

নেপাল, আফগানিস্তান ও বার্মায় সাফল্যের সঙ্গে শুভেচ্ছা-সফর শেষ করে এবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং সিংহলে গিয়ে পৌঁছেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর সর্দার স্বরণ সিং কলম্বো উপস্থিত হয়েছেন, সিংহলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভারত-সিংহল সম্পর্ক, বিশেষ করে সিংহলের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা আলোচনার জন্য।

কলম্বো বিমান বন্দরে নেমেই সর্দার স্বরণ সিং ঘোষণা করেন, তিনি ভারতের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্রতিবেশী' সিংহলে শুভেচ্ছা-সফরে এসেছেন।

সর্দার স্বরণ সিং-এর সঙ্গে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী শ্রীচন্দ্রশেখর আজাদও গিয়েছেন। শীঘ্রই সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে এক বৈঠক হবে। সর্দার স্বরণ সিং-এর এই সফর তারই ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য।

সর্দার স্বরণ সিং, শ্রীমতী বন্দরনায়ক, শ্রীফেলিক্স বন্দরনায়ক ও গভর্নর জেনারেল শ্রীউইলিয়াম গোপাল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

সিংহল দাবী করেছে, সিংহলের ৭ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে ভারতে ফিরিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সমস্যা হল, এরা বংশপরম্পরায় সিংহলে বাস করছে, এবং এখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কোন কোন অঞ্চলে তামিলভাষী এই সিংহলী ভারতীয়রাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের দল ফেডারেল পার্টি ও সিংহলের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক দল। হঠাৎ

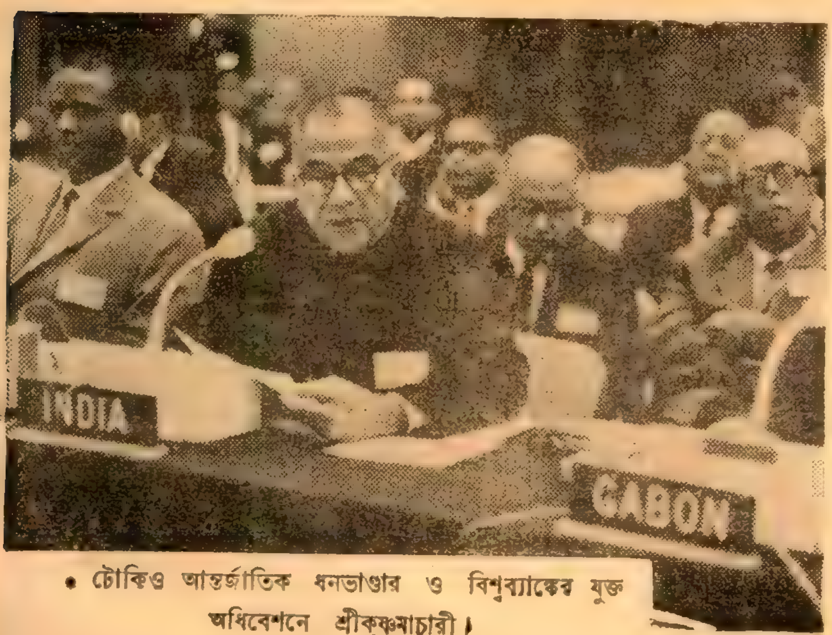

• টোকিও আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের যুক্ত অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণমাচারী।

এদের বিতাড়ন করবে, এদের জীবিকা, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এরা ভারতে আসতে চায় না, ভারত সরকারও এদের ভারতে নিতে রাজী নন।

ভারত ও সিংহলের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এই ৭ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারলে এই মৈত্রীসম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।

সর্দার স্বরণ সিং আশা প্রকাশ করেছেন, ভারত ও সিংহল সরকার এবং এই সব ভারতীয় বংশোদ্ভূত, সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটা সমাধান নিশ্চয়ই বের করা যাবে।

সর্দার স্বরণ সিং শ্রীমতী বন্দরনায়কের সঙ্গে অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও আলোচনা করেন। আসন্ন জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে সম্ভাব্য যে-সব বিষয় আলোচিত হবে, সে সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়।

চীন-ভারত সমস্যা সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। সীমান্তবিরোধ নিয়ে বর্তমানে যে অবস্থা রয়েছে, শ্রীমতী বন্দরনায়ক তার পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে ভারতের মনোভাব সর্দার স্বরণ সিং অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন। ভারত কলম্বো প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করেছে। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চীনকে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। তবেই চীন ও ভারতের মধ্যে এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা সম্ভব।

পাকিস্তান:

বেসরকারী শুভেচ্ছা-সফর ও কূট-নৈতিক সফরের মধ্যে কি কোন তফাৎ নেই? জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে বর্তমানে যে ভারতীয় শুভেচ্ছা দলটি পাকিস্তান সফর করছেন, তাঁরা কি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের শুভেচ্ছা জানাতে গেছেন, না কাশ্মীর ও অন্যান্য ভারত-পাক সমস্যার সমাধানের সূত্র অনু-সন্ধানের জন্য কূটনৈতিক দৌত্যকার্যে গিয়েছেন? পাকিস্তান থেকে তাঁদের সফরের যে-সব সংবাদ আসছে, তাতে মনে হয় তাঁরা কূটনৈতিক দায়িত্ব নিয়েই সেখানে গেছেন।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে গঠিত এই শুভেচ্ছা দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন: শ্রী জে জে সিং, শ্রী এম মূলগাঁওকার, শ্রী বি শিব রাও ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

শুভেচ্ছা দল পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো প্রভৃতির সঙ্গে সমগ্র পাক-ভারত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আয়ুব খাঁ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এঁদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'আগে কাশ্মীরের সমস্যা মেটাও, তারপর পাক-ভারত বন্ধুত্বের কথা আলোচনা করা যাবে।' অর্থাৎ, কাশ্মীর বিষয়ে একটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্ভব নয়, এই হল পাকিস্তানের বক্তব্য।

জয়প্রকাশ এতে মোটেই বিচলিত নন। কারণ তিনি তো কাশ্মীরের ব্যাপার আলোচনা করতেই গিয়েছেন। ৭ই সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব্ পাকিস্তান সংবাদ দিচ্ছেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শুভেচ্ছা দলের অপর চারজন সদস্য আয়ুব খাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে

কাশ্মীর সমস্যা মীমাংসার সম্ভাব্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন।

রাওয়ালপিণ্ডিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জয়প্রকাশ নারায়ণ ঘোষণা করেন, কাশ্মীর শুদ্ধ সকল পাক-ভারত প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা করেন। শীঘ্রই আয়ুব খাঁ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে বৈঠক হবে বলে আশা প্রকাশ করে শ্রীজয়প্রকাশ বলেন, এই বৈঠকের পূর্বে দুই দেশের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের সফরের ফলে এই বৈঠক ত্বরান্বিত হবে বলে তিনি আশা করেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জয়প্রকাশ নারায়ণকে স্বীকার করতে হয়, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের মতের কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে তিনি বলেন, এই পরিবর্তন আনতে হবে।

আর, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর বন্ধুরা এই পরিবর্তন আনয়নের জন্যই আদা-জল খেয়ে লেগেছেন। এতে যদি ভারতের ক্ষতি হয়, তাতেও আপত্তি নেই।

* * *

'আজাদ কাশ্মীরের' রাষ্ট্রপতি কে এইচ খুরশিদকে পদচ্যুত করা ও তাঁর বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ এতদিনে জানা গেছে।

এক সংবাদে প্রকাশ, শেখ আবদুল্লা যখন পাকিস্তান সফরে যান, তখন খুরশিদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনাকালে নাকি খুরশিদ শেখ আবদুল্লার 'স্বাধীন কাশ্মীরের' প্রস্তাবের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখান। এই সংবাদ পেয়েই আয়ুব খাঁ ও তাঁর দলবল চটে গেছেন। ৫ই আগস্ট জোর করে খুরশিদকে 'আজাদ কাশ্মীরের' প্রধানের পদ ত্যাগে বাধ্য করা হয়।

খুরশিদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে মকবুল জিলানি নামে এক ব্যক্তির

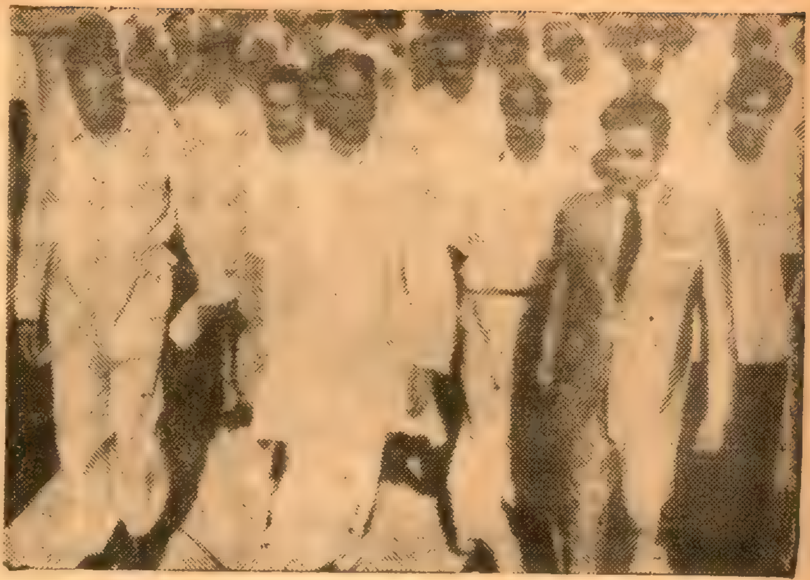

• রাওয়ালপিণ্ডিতে দলবলসহ ভারতীয় শুভেচ্ছা মিশনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ।

বিশেষ হাত আছে। কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে যুক্ত এই মকবুল জিলানি কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে আসার পর থেকেই আয়ুব খাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে কাজ করছেন। আবদুল্লা-খুরশিদ বৈঠকের সময় জিলানি উপস্থিত ছিলেন। জিলানিই নাকি খুরশিদের বিরুদ্ধে আয়ুবের কান ভারি করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন।

পাকিস্তান সরকার খুরশিদের ওপর কড়া নির্দেশ দিয়েছেন, 'আজাদ কাশ্মীরের' রাজনীতিতে তিনি অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার ব্যাপারেও তাঁর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

• আয়ুব খাঁ

খুরশিদকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে অপসারণের পর খুরশিদের অনুগামী বলে পরিচিত প্রায় ৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে গোলাম নবী গিলকার, মহম্মদ ইউসুফ কুরেশী, আবদুল সালাম ইয়াত্তু, ক্যাপ্টেন ফিরোজুল উদ্দীন, মীর আবদুল আজিজ, বাসারত আহমদ শেখ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু কাশ্মীরী-ভাষী কর্মচারীকে সরিয়ে দিয়ে করাচী-রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কর্মী 'আজাদ কাশ্মীরে' প্রেরণ করা হয়েছে। খুরশিদ সমর্থক বলে গণ্য দুটি উর্দু দৈনিক ও আরও কয়েকটি সাময়িক-পত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সমগ্র 'আজাদ কাশ্মীর' জুড়ে যা চলছে, তা চরম স্বৈরাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ আয়ুব খাঁ রাত-দিন চেঁচাচ্ছেন—কাশ্মীরের অধিবাসীদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাই •

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তেইশ ॥

পাটনায় ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার ডক্টর প্রভাকর ভৌমিকের সঙ্গে দেখা হল শর্মিলার।

বিকেলে কিছু মার্কেটিং করে ফিরছিলেন শর্মিলা, অন্যদিক থেকে আসছিলেন প্রভাকর। একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুজন।

—নমস্কার।

—নমস্কার।—প্রভাকর হাসলেন : আপনাকে একা দেখছি যে ? মিসেস শর্মা কোথায় ?

এবার শর্মিলাও হাসলেন : ভুল করলেন ডক্টর ভৌমিক। আমরা দুজনে সব সময় একসঙ্গে বেরুই না। তা ছাড়া আজ আবার ঠাণ্ডা লেগে গায়ত্রীর একটু জর জর হয়েছে, শুয়ে আছে চুপ করে।

—এখনো মিসেস্ শর্মা দিনে-রাতে সেই বার-কয়েক স্নান করেন তো ? ঠাণ্ডা লাগার আর দোষ কী !

—আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

প্রভাকর বললেন, জানি, অনেক দিনের আলাপ। কিন্তু মিসেস্ শর্মা আমাকে বিশেষ পছন্দ করেন না। ওঁরা ধার্মিক, আমি নাস্তিক। অ্যাণ্ড দ্য টু এণ্ড্ নেভার মীট্ টুগেদার।

শর্মিলা বললেন, এ-সব আলোচনা ছেড়ে দিন—এগুলো বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু গায়ত্রীর জীবনের ইতিহাস তো আপনি ভালো করেই জানেন। এই বিশ্বাসই ওকে একভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে কবে ও দেউলে হয়ে যেত।

—হয়তো। হয়তো নয়।—প্রভাকর চিন্তিতের মতো মাথা নাড়লেন : বাঁচার এর চাইতেও ভালো রাস্তা ওঁর ছিল।

—কোন্ রাস্তা কার পক্ষে ভালো সেটা কি অনেকখানি ব্যক্তিগত বিচারের ওপরেই নির্ভর করে না ?

—ব্যক্তিগত বিচার ?—প্রভাকর একটু থামলেন : সেখানেও ব্যক্তি-সম্পর্কে কতগুলো প্রশ্ন আসে। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে আর এ-সব তর্ক নয়। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই। মেসেই তো ফিরছেন ?

—তা ফিরছি। কিন্তু আপনি কোথায় চলেছিলেন, নিজের কাজ নষ্ট করে—

—কাজ আমার কিছুই নেই, বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। সুতরাং আপনার সঙ্গে গেলে ক্ষতি কিছুই নেই, বরং খানিকটা গল্প করা যাবে। লাভেরও কিছু সম্ভাবনা আছে।

শেষ কথাটায় একটু রাঙা হলেন শর্মিলা।

—কিসের লাভ ?

—মেস পর্যন্ত এগিয়ে দিলে তখন কি আর ধুলো পায়ে রাস্তা থেকে বিদায় করতে পারবেন ? অন্তত ভদ্রতার খাতিরেও বলতে বাধ্য হবেন, আসুন না ডক্টর ভৌমিক, এক কাপ চা খেয়ে যান। এমন কি মিসেস্ শর্মা পর্যন্ত এ-কাজটুকু না করে পারেন নি, চায়ের সঙ্গে কাশী থেকে আনা চমচম আর ডালমুট খাইয়েছেন।

শর্মিলা হেসে উঠলেন : এই কথা !

কিন্তু আপনাকে ভদ্রতা করে বলতে হবে কেন, আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দেবেন, সেইটেই তো বড়ো কথা। কিন্তু কাশীর চমচম আর ডালমুট খাওয়াতে পারব না—তবে গায়ত্রীর কাছে খোঁজ নিতে পারি।

—পাবেন না। উনি আজকাল নির্দয় হয়ে গেছেন। নিজেও খান না, কাউকে খাওয়ানও না।

—চলুন না, দেখা যাক।

দুজনে এগিয়ে চললেন।

সাধারণত বেশি কথা বলতে শর্মিলা ভালোবাসেন না—নতুন মানুষের কাছে মুখ খুলতে তাঁর একটু দ্বিধা আসে। কিন্তু প্রভাকরের কাছে আপনিই সহজ হওয়া চলে, তাঁকে ঘিরে একটি শক্তিময় স্বাভাবিকতা আছে, উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন মন—কোথাও ছায়া নেই, কোথাও সেই নিভৃত নিঃসঙ্গতার আড়াল নেই—অনেকের ভেতরেই যেটাকে বাধার মতো অনুভব করা যায়; যেন কাছে গিয়েও সরে আসতে হয়—মনে হয় লোকটিকে কখনো সম্পূর্ণ করে জানা যাবে না। হঠাৎ একজনের কথা বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল, আর মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হলেন শর্মিলা, একটা চাপা যন্ত্রণা যেন একবারের জন্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করল।

প্রভাকর বললেন, যদি অনুমতি করেন—

শর্মিলা চকিত হয়ে উঠলেন : কী বলছেন?

—একজন পুরুষ সঙ্গে থাকতে অত বড়ো একটা প্যাকেট আপনি বয়ে চলেছেন, এটা শিভালরির দিক থেকে সম্পূর্ণ বে-আইনী। ওটা দিন আমাকে।

—না—না—থাক।

—থাকবে কেন? দিন।

না দিয়ে পারা গেল না। কোথায় এক ধরণের অদ্ভুত জোর আছে প্রভাকরের, ভয় করে—ভালোও লাগে।

—ডক্টর ভৌমিক, আর ক'দিন আপনি আছেন

—ক'দিন নয়। কাল ভোরেই চলে যাব।

—আবার কবে আসবেন?

—কিছুই ঠিক নেই। কাজের জন্যেই তো আসতে হয়। হয়তো পনেরো দিনের মধ্যেই আসতে পারি, আবার দু' মাস দেরিও হতে পারে।

শর্মিলা একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু আলোচনার দরকার ছিল।

—বলেছি তো, আমার পুঁজি-পাটা যৎসামান্য, আপনাকে নতুন কথা কিছুই বলতে পারব না। তবু যদি আপনার কৌতূহল থাকে, চিঠিপত্রে যোগাযোগ করা যেতে পারে। ঠিকানাটা বরং রেখে যাব আপনার কাছে। আর যদি কখনো পাটনায় আসেন, সে তো আমার সৌভাগ্য।

—গিয়ে হয়তো দেখব আপনি 'টুরে' বেরিয়ে গেছেন। নিরুদ্দেশ হয়েছেন কোনো ফরেস্ট বাংলোয়।

—হতে পারে সে-রকমটা, অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি একটা চিঠি লিখে আসেন—

—উঃ, কতগুলো বাধাই যে তৈরি করে রেখেছেন নিজের চারদিকে। রাঁচীতে কখন আসবেন, তার ঠিক নেই; পাটনায় কখন থাকবেন তার নিশ্চয়তা নেই। আপনারা বড়ো বলেই আপনাদের নাগাল পাওয়া এত শক্ত।

—উল্টো কম্প্লিমেণ্ট দিলেন মিসেস রায়চৌধুরী।

—উঁহু, অত বড়ো একটা নাম নয়, শর্মিলা বলবেন। কিন্তু উল্টো কম্প্লিমেণ্ট কেন বলছেন?

—আমি আদৌ বড়ো লোক নই, একেবারে বুনো। বন-জঙ্গল নিয়ে কারবার করি। তাই ভদ্র-সমাজে বেশিক্ষণ থাকতে পাই না।

কিন্তু শর্মিলা দেবী, জঙ্গলের যে কী অদ্ভুত আকর্ষণ আছে সে আমি আপনাকে ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। বটানিস্ট হিসেবে এক একদিন এক একটা নতুন বিস্ময় আপনাকে চমকে দেবে, প্ল্যাণ্ট লাইফের রহস্য আপনাকে মগ্ন করে দেবে। বাই দি ওয়ে—জানেন, আমাদের এই বিহারেই স্যাণ্ডাল উডের সন্ধান পাওয়া গেছে?

—চন্দন গাছ? বিহারে?—শর্মিলা চমকে উঠলেন: সিলোন আর সাউথ ইণ্ডিয়া ছাড়া আর কোথাও কি—

—হয়, হতে পারে দেখা যাচ্ছে। পরেশনাথ হিল্‌সেই আমরা চন্দন গাছ পেয়েছি।

—বলেন কি।

—খুব হেলদি গাছ নয়—মাইশোর ফরেস্টের সঙ্গে অবশ্য তুলনা করাই চলে না। কিন্তু গাছ যখন পাওয়া গেছে—তখন কালচার করলে নিশ্চয় ডেভেলপমেণ্ট সম্ভব। কী করে এল,

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৭৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বলা কঠিন। শোনা যায়, অনেক কাল আগে নাকি একজন বাঙালী ফরেস্ট অফিসার কিছু চন্দন গাছ এনে এখানে লাগিয়েছিলেন। সে যাই হোক—গাছ হয়েছে, বেঁচে আছে, এইটেই বড়ো খবর। শুধু সায়েন্টিফিক নয়—এর ইকনমিক পসিবিলিটিও ভেবে দেখুন।

—নিশ্চয়, সন্দেহ কি!

প্রফেসারস মেসের কাছে এসে গিয়েছিলেন দুজনে। প্রভাকর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

—নমস্কার, এবার আসি যাই।

—বা-রে, চা খাবেন বললেন—

প্রভাকর হাসলেন: সে-তো রইলই, পরে যে-কোনোদিন হতে পারবে। কিন্তু আজ আর আপনাদের বিরক্ত করতে চাই না।

—আমরা কিসে বিরক্ত হবো না হবো সেটা আমাদেরই ভাবতে দিন। আসুন।

—কিন্তু কাশীর চমচম নেই।

—না থাক, রাঁচীতেও কিছু পাওয়া যায়। তাইতেই আপাতত খুশি থাকতে হবে আপনাকে।

প্রভাকর দুই চোখ ভরে সস্নেহে দৃষ্টি ফেললেন শর্মিলার ওপরে। বললেন, সত্যি, আমি ঠাট্টা করেছিলুম। আজ চলি, আর একদিন আসা যাবে।

—এমনি জোর করে ধরে না আনলে আপনি কখনো আসবেন না। চলুন।

বলেই লজ্জা পেলেন শর্মিলা। ঠিক এইটুকু পরিচয়েই কি এমন করে দাবি করা যায় কারো ওপর? কতটুকু তিনি চেনেন প্রভাকরকে? পরক্ষণেই মনে হল, প্রভাকরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বাভাবিকতা আছে: তিনি নিজের মধ্যে কোনো আড়াল রাখেন না—তাঁর সব স্পষ্ট, সমস্ত উজ্জ্বল। তাই স্পষ্ট হয়েই তাঁর সঙ্গে মিশতে হয়, জোর করে কোনো কুণ্ঠার আবরণ টেনে রাখবার দরকার হয় না।

শর্মিলা আবার বললেন, আসুন।

এবার হার মানতে হল প্রভাকরকে।

ঘণ্টা দেড়েক বসলেন—গল্প হল, চা-মিষ্টি এল। গায়ত্রী মনে মনে প্রভাকর সম্পর্কে যা-ই ভাবুক, গায়ে একটা মোটা চাদর জড়িয়ে হাসিমুখে তিনিও এসে আসরে বসলেন।

শর্মিলা ভেবেছিলেন, দরকারী কথা কিছু আলোচনা করবেন, তা আর হল না। একটুখানি সূচনা হতেই গায়ত্রী বললেন, 'এই রে, প্রফেশ্যনাল ডিসকাশন সুরু হল, আমি উঠি।' কাজেই সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিতে হল। তার বদলে চলল গল্প, বন-জঙ্গলের গল্প।

প্রভাকর বলছিলেন, কী যে আকর্ষণ আছে অরণ্যের! এক এক সময় মনে হয় গাছপালাগুলো যেন কথা কইছে, একটু কান পেতে থাকলে ওদের সব কথা শুনতে পাওয়া যাবে। এক একদিন রাত্রে আকাশ ভরে জ্যোৎস্না ওঠে, বাংলোর বারান্দায় বসে বসে দেখি সমস্ত জঙ্গল জ্যোৎস্নায় ঘুমুচ্ছে—কখনো কখনো হাওয়া লেগে পাতার আওয়াজ উঠছে। যেন কী একটা স্বপ্ন দেখে কথা বলে উঠল। আবার কোনোদিন ঝড়-বৃষ্টি আসে—অন্ধকারে গাছপালা মাথা খুঁড়তে থাকে—একটা ওয়েলিংয়ের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, যেন কতকালের কান্না জমে রয়েছে ওদের বুকের ভেতর। তখন ভাবি, ওদের সব কথা সব কান্নার যদি মানে বোঝা যেত—

শর্মিলা আবার বললেন, ডক্টর ভৌমিক, আপনি কবি।

—একেবারে না, ও-সব বালাই আমার নেই।—প্রভাকর হাসলেন: আমার ইন্টারেস্ট পুরো সায়েন্টিফিক। তা হলে বটানিস্টের অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনি পাওয়া যেত, দিনের পর দিন নেচারের বুইও মিস্ট্রির সামনে মাথা খুঁড়ে মরতে হত না।

—কথাটা আপনি ঘুরিয়ে নিলেন ডক্টর ভৌমিক।

গায়ত্রী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ, অরণ্যের অনেক কথা আছে। কিন্তু প্রভাকরজী, আপনার সায়েন্টিফিক কিউরিসিটি সে-কথা কোনোদিন শুনতে পাবে না। তার জন্যে হেনরি ডেভিড থোরোর মতো মন থাকা চাই, রুশোর মত মেজাজ থাকা চাই, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথের মতো কান থাকা চাই।

—থোরোর কথা কিছু জানি না, ওয়ার্ডসওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ ভালো বুঝি না—প্রভাকর দুটো উজ্জ্বল চোখ তুলে গায়ত্রীর দিকে চাইলেন: তবে ডারউইনকে খানিকটা জানি। বনভূমি সব সময় দেবতার কণ্ঠস্বর বহন করছে—বৈজ্ঞানিক হিসেবে এ থিয়োরীতে আমার সমর্থন নেই। আমি বিশ্বাস করি—ইট্‌স এ লাইফ। অ্যাণ্ড হোয়াট এ লাইফ! কামনা-বাসনা, সংগ্রাম-হিংসা—অর্থাৎ অ্যানিম্যাল-ওয়ার্ল্ডের সব মৌলিক উপকরণগুলো সব চাইতে আদিমভাবে জেগে আছে ওখানে।

—এইখানেই আপনাদের সকলের চাইতে বড়ো ভুল।—গায়ত্রীর চোখও ঝক ঝক করে উঠল: এই দৃষ্টির জন্যেই আপনারা ঈশ্বরের সঙ্গে কমিউনিকেশন হারিয়েছেন। যেখানে তাঁর বন্দনা উঠছে—সেখানে আপনারা হিংসার মন্ত্রণা শুনছেন।

প্রভাকর একটু চুপ করে রইলেন। কী একটা বলতে গিয়েও একবার সামলে নিলেন, তারপর শান্ত গলায় বললেন, গায়ত্রীজী, আবার সেই নর্থ পোল আর সাউথ পোল। কিছুতেই আপনার সঙ্গে আমার মিলবে না, আজ সারাটা রাত ধরে তর্ক করলেও নয়। আসুন আপাতত সন্ধি করে ফেলি। —একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন: অনেকক্ষণ আপনাদের সময় নষ্ট করা গেল, এবার ওঠা যাক। অ্যাণ্ড মেনি মেনি থ্যাঙ্কস্ ফর ইয়োর টী অ্যাণ্ড সুইট্‌স্।

শর্মিলা জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে কালই চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ। ভোরবেলাতেই।

—আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেবেন, বলেছিলেন।

হোয়াই, অফ কোর্স ।—পকেট থেকে একটা কার্ড বের করলেন প্রভাকর, এগিয়ে দিলেন শর্মিলার দিকে : যদি কখনো আসেন অনুগ্রহ করে, দিন-কয়েক আগে একটা পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। আর পারেন তো গায়ত্রীজীকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন, প্রাণভরে তর্ক করা যাবে ওঁর সঙ্গে।

উত্তরে গায়ত্রী একটুখানি বিরস হাসি হাসলেন, জবাব দিলেন না।

প্রভাকর বললেন, চলি—নমস্কার।

—নমস্কার—নমস্কার।

গায়ত্রীও আর বসলেন না শর্মিলার কাছে। 'আমার ভারী মাথা ধরেছে'—বলে উঠে পড়লেন। শর্মিলার এতক্ষণে মনে হল, আজ মেসে প্রভাকরকে ডেকে আনা গায়ত্রীর ভালো লাগে নি। আরো ভালো লাগে নি তার কাছে প্রভাকরের ঠিকানা রেখে যাওয়া, কিন্তু গায়ত্রীর সেণ্টিমেণ্ট মেনে চলতে গেলে শর্মিলার চলে না, প্রভাকরকে দিয়ে তার অনেক সাহায্য হবে, অনেক উপকার পাবেন তাঁর কাছ থেকে। এখানে কিছু নিয়ে আলোচনা করবার মতো একটা লোকও তো কেউ নেই।

গায়ত্রী চলে গেলে শর্মিলা লক্ষ্য করলেন, টেবিলের ওপর বিকেলের চিঠিপত্র রয়েছে। একটা পত্রিকা, একটা দিল্লীর সেই পাবলিশারের বিনীত তাগিদ, আর একখানা খাম। গোটা গোটা কাঁচা হাতের ঠিকানা : লেখার চিঠি।

'জানো কাকিমা, আমাদের হাতে লেখা ম্যাগাজিনের জন্যে সেই লেখক কিরণ কাকার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলুম। উনি আমাদের চার লাইন কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে লাইনগুলো এই :

'বুকে আঁকা আছে কৃষ্ণচূড়ার দিন
এ জীবন ভরে বয়ে যাবো তার ঋণ
হয়েছি ধন্য, পেয়েছি সুধার স্বাদ
কৃতজ্ঞ আমি—কী দেব আশীর্বাদ ?'

কাকিমা, মেয়েরা জিজ্ঞেস করছে, এই কবিতার মানে কী। আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না। তাই তোমাকে চিঠি লিখলুম। তুমি—'

শর্মিলা আর পড়তে পারলেন না। বুকের ভেতরে আবার বন্যা ভেঙে পড়ল। না ভুলতে দেবে না, কিছুতেই কি এরা ভুলতে দেবে না ?

(ক্রমশঃ)

আজকের পশ্চিম জার্মানী

—মৈত্রেয়

প্রজাপতি নির্বন্ধ। সে প্রেম করেই হোক। বাপ-মার পছন্দ মতোই হোক। আর ঘটককুলের কর্মতৎপরতার জোরেই হোক। এ ব্যাপারে আগে থেকে কেউই কিছু স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখতে পারে না। আমাদের দেশে শেষ পর্যায়ের মাধ্যম সম্বন্ধে বেশ একটু রসঘন সমালোচনা বা মুখরোচক গাল-গল্পের প্রচলন আছে। হয়তো এমন ধরণের বিবাহব্যবস্থা একমাত্র আমাদের দেশেই সীমাবদ্ধ বলে অনেকে মনে করেন। প্রেম করে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে বিয়ে করার রীতি, পাশ্চাত্য থেকে আমদানী করা আরও পাঁচটা হালফ্যাশন কায়দা-কানুনের মতো আমাদের দেশে অধুনা প্রচলিত বলে অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন। কেউ বা ভাবেন এটা প্রগতির পরিচয়। উদারতার লক্ষণ। রক্ষণশীল সমাজের প্রাচীরের ধ্বস নামছে। কিন্তু সমাজ-সমীক্ষকদের ধারণা—যত কিছু সামাজিক রীতিনীতির অদল-বদল, সমস্ত কিছুই নির্ভর করে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার ওপর।

অধুনা জার্মান-সমাজে চাকা ঘুরছে। বিবাহিত জীবনে সুখ ও শান্তির জন্য বিবাহপদ্ধতিরও রূপান্তর ঘটছে। যে রীতি আজ আমরা পশ্চিম থেকে গ্রহণ করছি, সে রীতি পশ্চিমের এক বিশেষ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পশ্চিম জার্মানীতে লোপ পেতে চলেছে। ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে দেখলো, মন দিলো নিলো, ঘর বাঁধলো।—এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সমাজে বিষফোঁড়ার মতো। তাই আজকের পশ্চিম জার্মানীর তরুণ যুবক-যুবতী বিয়ে করবার জন্য যেন একটু বেশি বৈষয়িক হয়ে উঠছে। আমাদের দেশের মত ঘটকালী ব্যবসা শিকড় গেড়ে বসতে না পারলেও, বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীতে যুবক-যুবতীর ভাবান্তরের সুযোগ নিয়ে এই ঘটকালী একটা বিশেষ 'ইণ্ডাস্ট্রি'তে পরিণত হয়েছে বলা চলে।

ওদেশে ওদের বিয়ের একটা হিসেব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে গত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানীতে প্রায় নয় মিলিয়ন বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। ৬ লক্ষ দম্পতি তাদের জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে ওদেশের ঘটকদের শরণাপন্ন হয়েছে।

পশ্চিম জার্মানীতে যুবক-যুবতীদের জীবনের সঙ্গী নির্বাচনের সহযোগিতার জন্য ২ শত ষাটটি প্রজাপতি নির্বন্ধ এজেন্সি রয়েছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের অকৃপণ সাহায্য এবং অপরিসীম তৎপরতায় এমন ব্যাপক পরিমাণ বিবাহ সম্ভব হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দশটি এমন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের শাখা-প্রশাখা শুধু ওদেশেই নয়, গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিস্তারিত।

এই দশটি প্রতিষ্ঠানই অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এবং বিরাট ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ শুভবিবাহ ঘটিয়ে থাকে। যদিও বেশির ভাগ প্রজাপতি নির্বন্ধ কেন্দ্র একটি লোক দ্বারাই পরিচালিত। অর্থাৎ আমাদের দেশের ভাদুড়ীমশাই, চক্রবর্তীমশাই-এর মতো ঘটক ঠাকুররা যেমন একক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন ছেলে-মেয়ের সন্ধান রাখেন এবং সন্ধান দেন তেমনি আর কি। এরকম বিবাহ-ব্যবস্থার হঠাৎ এমন ব্যাপক প্রচলনে সমাজের একটা দিক সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গোটা জার্মান জাতির মধ্যে এসেছে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সে পরিবর্তনের স্রোতে সমাজের প্রতিটি নরনারী পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে নতুন সমাজগঠনে। হিটলারের নীতিকে ওরা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে চায়।

এদিকে দ্বিধাবিভক্ত জার্মানীতে একটার পর একটা সমস্যা মাথা তুলছে। যে গণতান্ত্রিক সমাজ পশ্চিম জার্মানীতে গড়ে উঠছে তাতে ছেলেমেয়ে প্রত্যেকেরই সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা, তন্বী যুবতীরা আর 'সেক্সিডল' নয়। দর্শনীয় বস্তু হ'য়ে ওরা আর পুরুষদের শুধুমাত্র 'সম্পদ' হয়ে থাকবার জন্য অস্তিত্ব বহন ক'রে চলছে না। আজ পশ্চিম জার্মানীর পুরুষরা মেয়েদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। তাদের জীবনের ধর্মে-কর্মে স্ত্রীকে পেতে চায় সহযোগী হিসেবে। দাম্পত্য-জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হবে উভয়ের জীবনসঙ্গী। তাই তাদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনে আজকে 'বিউটি'র চাইতে 'ইউটিলিটি'র স্থান অগ্রগণ্য। তাইতেই আজ ওদেশে এমন বিবাহ-সংক্রান্ত মাধ্যম এতো সক্রিয় হবার সুযোগ পেয়েছে। এই সব বিবাহ-নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান সবরকম ছেলেমেয়েদের খোঁজ রাখে। কোন্ ছেলে কোন্ মেয়ের উপযোগী হবে, তার একটা প্রাথমিক বিচার করে তাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ করে দেয় এবং শেষ পর্যন্ত বিবাহ ঘটাবার কৃতিত্ব অর্জন করে।

সাবেককালে জার্মানীতে ঘটকদের পক্ষে ব্যবসা চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। তাঁদের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। কোন বিবাহে কৃতকার্যতা লাভ করার পর, আবার তাকে আর একবার পাকা-পাকি করতে হ'ত কাজের কমিশন আদায় করবার জন্য। ঘটকের মাধ্যমে বিয়ে তখন ওদেশে প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে ঘটকসম্প্রদায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভূত কর্ম-তৎপরতা কল্যাণসাধনে অগ্রসরমান।

ফেডারেল এ্যাসোসিয়েশান অফ জার্মান ম্যারেজ এজেন্সির চেয়ারম্যান মিস্টার আর্টার ফ্লিডনার সম্প্রতি এক বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় অধুনা তরুণ-তরুণীর পক্ষে মনোমত জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'জীবন-সঙ্গী নির্বাচনী সংস্থা'গুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। বর্তমান-কালে ওদেশের সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনায় মিস্টার আর্টার ফ্লিডনার বলেন, সাম্প্রতিককালে তরুণ যুবক-যুবতীরাই প্রধানত এরকম 'ম্যারেজ এজেন্সির' সুপারিশ গ্রহণে বেশি আগ্রহী। এর কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন, কর্মবহুল জীবনে বর্তমানের পশ্চিম জার্মানীর তরুণ-তরুণীর পক্ষে তাদের বাপ-মায়ের মতো সামাজিক পার্টি বা নৃত্য আসরে যোগদানের সুযোগ ও সময় কম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাধারণত এইসব পার্টি বা নৃত্য আসরগুলিই ছিল সামাজিক মেলামেশা, মন দেওয়া-নেওয়া এবং মনের মানুষটিকে বেছে নেবার পক্ষে পীঠস্থান। আজকের পশ্চিম জার্মানীর ছেলেমেয়েদের পক্ষে এমন বিলাস-বহুল আসরে যোগদান সাময়িক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র।

কেউ কেউ এমন মত প্রকাশ করছেন যে, আজকাল ছেলেমেয়েরা সেয়ানা। অর্থাৎ আগের চাইতে বেশি বৈষয়িক। অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান পুরোমাত্রায় রয়েছে। মিস্টার ফ্লিডনার বলেন, আর্থিক উদ্দেশ্যেই ম্যারেজ এজেন্সির অফিসগুলিতে তরুণ-তরুণীদের জীবন-সঙ্গী বেছে নেবার জন্য ভিড় বেড়ে চলেছে, এমন 'সত্যে'র মধ্যে 'ফ্যালাসি' রয়েছে। একথা বিশ্বাস করা যায় না, কেবলমাত্র পরস্পরের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্ত-সমর্থ করবার জন্যেই 'বলফ্লোরে' হঠাৎ প্রেমে পড়ে গিয়ে বিয়ে না করে, আজকের পশ্চিম জার্মানীর ছেলেমেয়েরা ঘটকদের শরণাপন্ন হচ্ছে—হিসেব করে জীবনসঙ্গী নির্বাচন করবার জন্যে। তবে এমন কিছু মক্কেল যে ঘটকরা পায় নি তা নয়। বর্তমান সমাজে একটা সংসারে সমস্ত দায়িত্ব বহনের পক্ষে পুরুষরা এমন স্ত্রী চান, যে আর্থিক সাহায্যেও সংসারে কাজে লাগবে। তাই বলে তাদের 'বিবাহ ব্যবসায়ী' ব'লে টিটকারি দেবার কিছু নেই।

তবে অধুনা অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরাই ঘটকদের অফিসে ভিড় বাড়াচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। তবে কি ওদের চোখের নীল বিদ্যুৎ আভা স্তিমিত হয়ে এসেছে? প্রেম করে সর্বস্ব বিসর্জন দেবার ভাব-প্রবণতা উবে গেছে? কিম্বা সামাজিক পরিবেশে তাড়াতাড়ি বিয়ে না ক'রে উপায় নেই? মিস্টার ফ্লিডনার বলেন, গত বছরের হিসাবে দেখা গেছে, নববিবাহিত দম্পতির একটা বিরাট অংশ তাদের নতুন জীবন সুরু করেছে ঘটকদের নির্ধারিত সঙ্গী নির্বাচনের মাধ্যমে। আর এই সব মক্কেলদের বয়স বেশির ভাগই দেখা গেছে মেয়েদের ক্ষেত্রে বাইশ বছরের কাছাকাছি আর ছেলেদের ক্ষেত্রে তিরিশ বছরের কাছাকাছি।

পশ্চিম জার্মানীর আধুনিকা তরুণীরা বসে থাকে বিশ্বস্ত, কর্মঠ এবং গৃহী জীবনসঙ্গীর অপেক্ষায়। তারা জীবনে সুখী হতে চায়, অলস জীবনের স্রোতে গা ভাসিয়ে নয় কিম্বা কোন ধনপতির পাঁচটা বিলাস-সামগ্রীর মতো আর একটা সম্পদ হয়ে নয়। স্বামী দায়িত্বহীন নাগরিক হবে কিম্বা অলস-বিলাসে দিন কাটাবে এ তারা আদৌ প্রত্যাশা করে না। আবার দিনরাত কর্মব্যস্ততা কিম্বা বিলাস-ব্যসনে কাটাবে এদিকে প্রিয়ার জন্য একটুক্ষণ সময়ও দিতে পারবে না, এমনি ধরণের স্বামীও আজকের জার্মানীর কোন তরুণীই কামনা করে না।

আজ মেয়েদের কাছে ছেলেদেরও অনেক দাবী। কাফেতে, সিনেমা হলে কিম্বা 'বলফ্লোরে' চোখ-ধাঁধানো মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ এদের যতই থাক না,—সে আকর্ষণ অন্ততপক্ষে প্রেমে পড়বার বা বিয়ে করে গৃহবধূ হিসেবে গ্রহণ করবার জন্যে নয়। সৌন্দর্যের প্রতীকস্বরূপ 'সেক্সিডল' মেয়েদের দিন ফুরিয়েছে। ছেলেরা

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

● পশ্চিম জার্মানী তরুণ-তরুণীদের হাট বসে গেছে। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম বা কলেজের ইউনিয়ন অফিসে নয়। এরা দল বেঁধে ঘটকের অফিসে জমা হয়েছে তাদের জীবনের সঙ্গী নির্বাচনে।

এমন একটি মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেতে চায়, যার সৌন্দর্যের চাতুর্য থাকবে না, থাকবে মাধুর্যের প্রলেপ। কৌতুকীস্বভাবা হোক ক্ষতি নেই,—কিন্তু যেন যৌতুক-সর্বস্ব দানসামগ্রীর মতো নিছক ছাদনা-তলার দর্শনীয় বস্তু না হয়। বরং সংসার সম্বন্ধে সচেতন এবং দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন এমন মেয়েকে আজকের পশ্চিম জার্মানীর যুবকেরা কামনা করে, যে মেয়েরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে পায়ে পা ফেলে চলতে পারে। গৃহস্বাদ ভুলে যেতে বসেছে আজকের মেয়েরা ইউরোপীয় সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তনের জোয়ারে। আজকের জার্মান-যুবক-প্রাণে শাশ্বত গৃহশান্তি স্বাদের আকাঙ্ক্ষা-ঢেউ চলকে উঠেছে। তাই তারা স্ত্রীকে দেখতে চায় গৃহকর্ত্রী হিসাবে। পেতে চায় সারাদিনের কর্মক্লান্ত মনে উচ্ছল বিশুদ্ধ আনন্দসুখ, একান্ত প্রিয়জনের প্রীতিস্পর্শ। আর?

আর, রুক্ষ পোষাকী-সভ্যতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যুবক তার গৃহিণীকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী নয়, জীবনসঙ্গিনী হিসেবেও পেতে চায়। আজকের জার্মান যুবক চায়, তার স্ত্রীও দায়িত্ব নিক গোটা সংসারের কিছু। তারা আশা করে দুজনে মিলে উপার্জন করবে, দুজনে মিলে গড়ে তুলবে তাদের সংসার। ছেলেমেয়েদেরও মানুষ করবে উভয়ের মিলিত স্নেহ এবং মমতায়। ছেলেরা মেয়েদের, তাদের প্রিয় জীবন-সঙ্গিনীদের চায় ওদের পাশে পাশে। দুঃখে-সুখে সমান অংশীদার হিসাবে।

এই প্রিয়সঙ্গী নির্বাচনে তাই ওরা ছুটছে ঘটকদের দরজায়। মনোমতো স্বামী বা স্ত্রীর সমস্ত রকম তথ্য পাবে ছেলেমেয়েরা। তাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেন ঘটক ঠাকুররা। বিবাহের যাবতীয় ব্যবস্থা পর্যন্ত করে থাকেন।

আশ্চর্য ফল দেখা দিয়েছে এমন বিবাহব্যবস্থায়। এদের কাছে এ ব্যবস্থা ব্যবহারিক-জীবনে নতুন বলা যেতে পারে। তবুও পরিসংখ্যান বলে, এই ধরণের বিয়েতে আজকে পশ্চিম জার্মানীর তরুণ-তরুণী বেশি সুখী হচ্ছে। পশ্চিম জার্মানীতে তাই ঘটকদের রাজা ঘটক।

● আহিরীটোলা স্ট্রীটের বর্তমান দৃশ্য

॥ সেকাল থেকে একালের সমীপবর্তী আহিরীটোলা ॥

সুদূর সেকালে ভাগীরথীর রূপসী তনুর বিস্তার ছিল উভয় দিকেই ব্যাপক। তাই তখন তার গর্ভে নিমজ্জিত ছিল একালের আহিরীটোলা। নানা পুরাতত্ত্ববিদের মতে, অরণ্য-সমীপবর্তী একখণ্ড চরের আকারে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। আত্মপ্রকাশের পর, অনেককাল অবধি তার সর্বাঙ্গই ছিল পলি-বিধৃত। অতএব, তখন স্বাভাবিক কারণেই তার উর্বর অঙ্গের একদিকে যেমন বেতসবন আর হোগলাবনের বিস্তার ঘটে, আরেক দিকে তেমনই নবীন তৃণাঞ্চলের হরিৎ চিত্রাপণ তার নৈসর্গিক বিবর্তন ঘটে দিনে দিনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তখন তা মানবসমাজের অধিবাস ক্ষেত্রের পরিপন্থী ছিল সম্পূর্ণ। বেতসবন, হোগলাবন বা তৃণাঞ্চলের বিকাশপ্রাপ্তি ঘটলেও, তখন তার আপ্রান্তিক মৃত্তিকা ছিল কর্দমাক্ত। তবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্তির পর থেকেই ধীরে ধীরে তা জমাট বেঁধে ওঠে এবং লীলাবতী গঙ্গা তার ললিত গতিময়তাকে আরও পশ্চিমভাগে সরিয়ে আনায়, পূর্বোপকূলের সেই চরভূমি বেশ কঠিন হয়ে তার কর্দমাক্ত পরিবেশের অবসান ঘটায় চিরতরে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর অন্তিম অংশে। সপ্তদশ শতাব্দীর উন্মেষপর্বে এই বিস্তৃত চরভূমির নিসর্গ বিস্তার একদিন গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একদল পশু-পালকের। তখন চিৎপুর-অরণ্যের নিরন্ধ্র বিস্তার ছিল উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং উল্লেখিত চরভূমির অবস্থান ছিল তার ভয়াবহ উপকণ্ঠেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগিয়ে আসে পশু-পালকের দল। লাঠি হস্তে তারা দুর্ধর্ষ, সড়কি হস্তে তারা প্রচণ্ড এবং সমাজ তাদের যথবদ্ধ ঐক্যের সুদৃঢ় মোকাবিলা করার শক্তি তাদের আয়ত্তগত বলেই দলে দলে তারা এগিয়ে আসে নির্ভয়ে। হোগলাবন কেটে তারা মাটির ঘর তোলে, বেতবন কেটে পুকুর বসায়, এবং বিস্তৃত তৃণাঞ্চলে ছেড়ে দেয় পশুর পাল। জীবিকার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য কলগান জাগে, মুখর হয়ে ওঠে গঙ্গার পূর্বোপকূলবর্তী প্রান্তর এবং অলস মধ্যাহ্নে মহীরুহের

শ্রীপদাতিক

শীতল ছায়ায় হঠাৎ বাঁশি বেজে ওঠে রাখালের। নতুন সমাজযাত্রার মাত্রাহীন পদক্ষেপে এতকালের পতিতা মৃত্তিকার উত্তরণ ঘটে মর্যাদার এক বিশেষ স্তরে।

শোনা যায় : এই পশু-পালকদের আগমন ঘটে আদি সপ্তগ্রাম থেকে। জীবিকা তাদের পশুপালন, জাতে তারা গোয়ালা। গোয়ালার আরেক প্রতিশব্দ আহিরী। সম্ভবত তাদের মধ্যে তখন আহিরী শব্দটির প্রচলন ছিল ব্যাপকতর। তাই পরবর্তীকালে তাদের সেই নবনির্বাচিত বসতি অঞ্চল নামধারণ করে আহিরীটোলা।

সপ্তদশ শতাব্দীর ...

বেশি ঘনীভূত হয়ে ওঠে আহিরীটোলায়। দিনে দিনে আহিরীদের বংশবৃদ্ধি ঘটায় বসতি অঞ্চল বিস্তার লাভ করে চারণভূমি পর্যন্ত। তাই অধিকাংশ রাখালকে তখন পশুর পাল নিয়ে রওয়ানা হতে হতো দূরবর্তী চারণ-ভূমির উদ্দেশে। আহিরীদের দুধের ব্যবসা বিস্তৃত ছিল বহুদূর পর্যন্ত। গঙ্গার ওপারের হাট-বাজারেও নৌকোর সাহায্যে তারা দুধ সরবরাহ করতো নিয়মিত। তাছাড়া খাদ্য এবং দুধ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তখন আহিরী-টোলার ঘাটেই এসে জাহাজ ভিড়তো বিদেশী বণিকদের। এমন কি, পর্তুগীজ দস্যুরাও মাঝে মাঝে জাহাজ ভেড়াতো এখানে। তারা নাকি আহিরীদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে রাত্রিযাপনও করতো কালে-ভদ্রে।

শোনা যায় : একবার রাত্রি-যাপনকারী একদল দস্যুই অপহরণ ক'রে নিয়ে যায় আহিরীদের চন্দ্রমুখীকে।

এই চন্দ্রমুখী ছিল আহিরী বংশেরই এক যুবতী নারী। চন্দ্রমুখীর জন্মের রাত্রি ছিল ঘোর অমাবস্যার।

চাঁদের উদয় দেখেছিল আহিরী সমাজ। তাই প্রত্যেকেই একবাক্যে তার নাম রেখেছিল চন্দ্রমুখী। চন্দ্রমুখী ক্ষণজন্মা এবং ঐশ্বরিক মাহাত্ম্যের প্রতিফলন রয়েছে তার সত্তায়—এ-বিশ্বাস সেদিন থেকেই ভর করে আহিরী সমাজের ওপর। তাই শৈশবে আত্মীয়-অনাত্মীয় নির্বিশেষে প্রত্যেকেই তাকে বুকে-বুকে রাখতো এবং কৈশোরেও তাকে চোখে-চোখে রাখতো সবাই। তারপর কৈশোর ছেড়ে চন্দ্রমুখী যখন তার যৌবনোপান্তে চরণ রাখে, তখন হয়তো আহিরী সমাজের দীর্ঘদিনের এই সংস্কারবদ্ধ ব্যবহারের প্রভাবেই চন্দ্রমুখীর চরিত্রে প্রকাশ পায় এক সমাহিত ভাব। দিনে দিনে সংসারের প্রতি তার অনাসক্তিই প্রকাশ পায়। একাকিনী সে বিচরণ করতে ভালোবাসে গঙ্গার কূলে কূলে, অরণ্যের আশে-পাশে এবং চারণভূমির পথে-বিপথে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় ব'সে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক। তাছাড়া জ্যোৎস্না রাত্রে সে ঘরে থাকে না। প্রায় জ্যোৎস্না রাত্রেই মুক্ত আকাশ-তলে সে ঘুরে বেড়ায় নিঃসঙ্গিনী। আহিরীরা বিশ্বাস করে: সে দেবী। তাই তার প্রত্যেক ব্যবহারেই তারা লক্ষ্য করতে সুরু করে কোনো এক ঐশ্বরিক—ইচ্ছা অথবা লীলা! সুতরাং সমগ্র আহিরী সমাজের এই নির্দ্বন্দ্ব বিশ্বাসেই চন্দ্রমুখীর প্রতিষ্ঠা ঘটে ভক্তির বেদীতে। সে ইচ্ছাময়ী। তার স্বেচ্ছা-গতিবিধির প্রতি কোনো সন্দেহ প্রকাশ করাকে পাপ ব'লে গণ্য করে আহিরী সমাজ।

ঠিক এমনই দিনে, কোনো এক সন্ধ্যেবেলায় আহিরীটোলার ঘাটে এসে জাহাজ বাঁধে একদল পর্তুগীজ দস্যু। তারা যোগ্যমূল্যের বিনিময়ে আহার ক্রয় করে আহিরীদের কাছ থেকে। তারপর আহারান্তে তারা রাত্রি-যাপনোদ্দেশ্যে তাঁবু খাটায় আহিরী-টোলার এক মুক্ত প্রাঙ্গণে। সে-রাত ছিল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত। সুতরাং মধ্যরাত্রের অনেক আগেই ঘর ছেড়ে যথারীতি বাইরে আসে চন্দ্রমুখী। মুক্ত আকাশতলে সে যখন একাকিনী পায়চারী করতে করতে এগিয়ে আসে পর্তুগীজদের তাঁবুর কাছে, তখন তাঁবুর অন্তরাল থেকেই তাকে দেখতে পায় পর্তুগীজদলের নায়ক। চন্দ্রমুখীর সুঠাম দেহের সর্বাঙ্গেই উদ্ভিন্ন যৌবন যেন মন্থরবেগে সাঁতার কেটে চলেছে জ্যোৎস্নায়। তাই হঠাৎ সেই মুহূর্তে সে-দস্যুর অন্তরের আত্ম-সমর্পণ ঘটে প্রচণ্ড উত্তেজনার অনলে। গুড়ি মেরে সে বেরিয়ে আসে তাঁবু ছেড়ে। তারপর চন্দ্রমুখীর কাছে এসেই সে তাকে লুফে নেয় এবং সেভাবেই আবার ফিরে আসে তাঁবুর অন্তরালে।

পরদিন ভোরেই দস্যুদলের অন্তর্ধান লক্ষ্য করে আহিরীরা। দস্যু-দলের জন্য তাদের কোনো মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তারা অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে ওঠে—যখন দ্যাখে চন্দ্রমুখীও নেই। অনেক খোঁজ-খবর নেওয়ার পর তারা বুঝতে পারে: দস্যুদলই তাকে নিয়ে গেছে চুরি করে, সুতরাং কান্নার রোল ওঠে ঘরে ঘরে। দেবী নেই। দেবীর অভাবে এবার অচিরেই কোনো অমঙ্গল নেমে আসবে গাঁয়ে—এ-আশঙ্কায় প্রায় প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যৎপরোনাস্তি।

কিন্তু দেখা গেলো: সপ্তাহখানেক পরেই আবার ফিরে এলো চন্দ্রমুখী। গভীর অবসাদে সে তখন ক্লান্ত। মাত্র সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দেহে যেন তার জরার আবির্ভাব লক্ষ্য করে গ্রামবাসীরা। কিন্তু যাই হোক, সে ফিরে আসায় ঘরে ঘরে আবার প্রতিষ্ঠালাভ করে স্বাভাবিক অবস্থা। দেবীর আবির্ভাবে অমঙ্গলের আশঙ্কা কেটে গেলো। অতএব প্রতিঘর থেকে বেরিয়ে এলো আহিরীটোলার প্রতিটি নর-নারী। অপার ভক্তির বেদীতে আবার তারা বরণ ক'রে নিলো তাদের পরম আত্মীয়া গৃহদেবী চন্দ্রমুখীকে।

তারপর দেখতে দেখতে কেটে যায় সময়। মাসের পর মাস পিছিয়ে এসে, বছর পূর্তির লগ্ন যখন আসন্ন-প্রায়, তখন একদিন অভূতপূর্ব বিস্ময়ে লক্ষ্য করে সমস্ত গ্রামবাসী: কুমারী চন্দ্রমুখী প্রসব করেছে একটি শ্বেত সন্তান। আর সন্তান প্রসব করেই সে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায়। তাই ভয়ে-বিস্ময়ে সবাই ছুটে আসে তাকে শান্ত করতে। কিন্তু কেউই তাকে সামলাতে পারে না। সে নবজাতককে পা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েই রক্তাক্ত কলেবরে ছুটে আসে এক বটতলায় এবং বটতলারই এক

আহিরীটোলার একাংশের বসতি অঞ্চল

নুয়েপড়া লতায় ডান পা তুলে আকাশের দিকে সে তুলে ধরে তার রক্তবর্ণ দৃষ্টি—যে-দৃষ্টির অতল গভীরে হাজার প্রশ্নের ডুবুরী ডুবিয়েও কোনো উত্তর খুঁজে পেলো না আহিরীটোলায় সংস্কারবাদী অধিবাসীদের কেউ। তবে একজন প্রবীণ ওঝা এসে শুধু বললো : দেবী গর্ভে ধারণ করেছিলেন পাপ। সেই পাপ আজ সন্তানের আকারে গর্ভচ্যুত বলেই অতিমাত্রায় রুষ্ট হয়ে উঠেছেন দেবী। পাপের তিনি বিলয় চান চিরতরে। অতএব এসো, এই পাপ-সন্তানের রক্তধারায় আমরা আজ রঞ্জিত করি দেবীর চরণদ্বয়।

অবোধ আহিরী সমাজ কী বুঝলো—কে জানে। দলে দলে তারা সায় দেয় ওঝার কথায়। দুর্বলচিত্ত নারীসমাজ খিল দেয় ঘরে ঘরে। কেবল বলিষ্ঠ পুরুষেরা এগিয়ে এসে কুড়িয়ে নেয় সেই নবজাতককে। তারপর তা বট-তলায় চন্দ্রমুখীর চরণোপান্তে স্থাপন ক'রে খড়্গ তুলে ধরে একজন যুবক। কিন্তু আশ্চর্য, তখনো কোনো সাড়া নেই চন্দ্রমুখীর। নুয়েপড়া লতায় ডান পা তুলে তখনো সে আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছে আরক্তিম চোখে। তবে যখন কণ্ঠে কণ্ঠে একবার ধ্বনিত হয়ে ওঠে 'জয় হোক দেবীর' এবং পরক্ষণেই ক্ষমাহীন খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত শিশুর রক্ত আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়েই ঝ'রে পড়ে বটতলায়, তখন নিহত শিশুর বুকেই অস্ফুট আর্তনাদে আছড়ে পড়ে চন্দ্রমুখী। তারপর সমবেত আহিরীর দল কোনো কিছু না বুঝে ওঠার আগে সেখানেই সে ত্যাগ করে তার অন্তিম নিঃশ্বাস।

এ-কাহিনী অনেক কালের। হয়তো তা মুখে মুখেই গ'ড়ে উঠে সাধারণের স্মৃতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে তার আপন আসন। কিন্তু সেকালের সাধারণ মানুষ একালের আহিরীটোলায় অনুপস্থিত বলেই, এই শোনা কাহিনীর প্রতিধ্বনি আজ আর শোনা যায় না কোথাও। তবে দু-একজন অতি

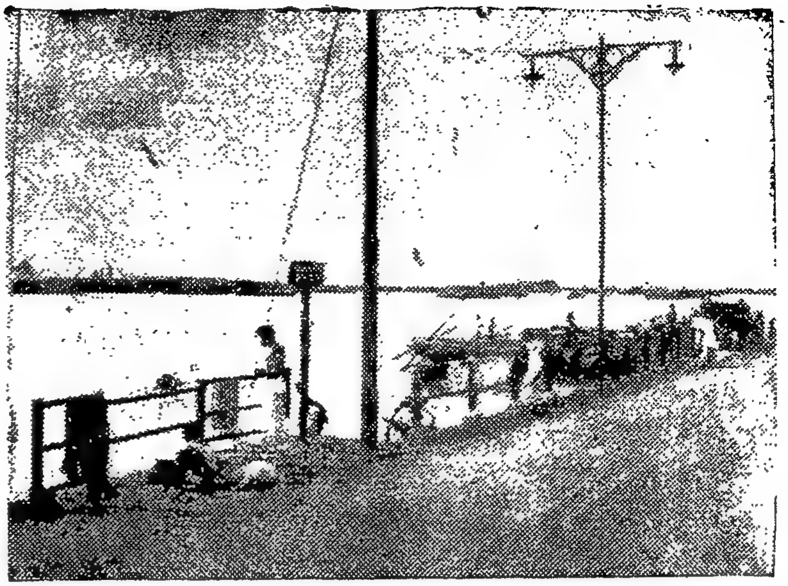

আহিরীটোলা থেকে গঙ্গার দৃশ্য

প্রবীণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আজও—যাঁরা তাঁদের পূর্ব-পুরুষদের স্মৃতির তেপান্তর থেকে সে-কাহিনীর ভগ্নাংশ-গুলি কুড়িয়ে, নিজেদের স্তিমিত চেতনার ভাণ্ডারে রক্ষা করছেন কোনো-মতে। আমি একাধিক দিনের অবিরাম পরিশ্রমের বিনিময়ে তাঁদের শিথিল বচনের জটিল অরণ্য থেকে অতি সাবধানে আহরণ করেছি উল্লেখিত উপকাহিনীর সমুদায় ভগ্নাংশ। আজ সেগুলি পর পর বহু যত্নে সাজিয়ে উপহার পাঠালাম আমার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে। সত্যাসত্য যাই হোক, বর্তমান নিবন্ধের সূত্রে উল্লেখিত উপকাহিনীর কোনো সার্থকতা আছে কিনা—তা বিচার করার দায়িত্বও আজ গ্রহণ করুন পাঠক-পাঠিকারাই।

আহিরীটোলায় আহিরী সমাজের অবস্থিতি ছিল অনেক কাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে আহিরীদের পাশাপাশি এসে বসতি স্থাপন করে ঘর-কয়েক তন্তবায় এবং আদি সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী থেকে আগত কিছু বণিক পরিবার। সম্ভবত এই বণিকগোষ্ঠীর সংস্পর্শ লাভ করেই দিনে দিনে বাণিজ্যের এক উপকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে আহিরীটোলা। তাছাড়া জব চার্নকেরও প্রথম বসতবাটি গ'ড়ে ওঠে এখানেই। তিনি আহিরীটোলার সমীপবর্তী অরণ্যের কিছু অংশ সংস্কার ক'রে বাণিজ্যোপকরণের আড়ং প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর এদেশীয় বণিক সমাজের সহযোগে নির্মাণ করেন গুটিকয় চলাচলযোগ্য পথঘাট। তাঁর আমলেই আহিরীটোলা অঞ্চলে গণ-সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটে।—এমন অভিমত আজকাল প্রকাশ করে থাকেন ইতিহাসবিদ্‌দের অনেকেই।

তারপর দেখতে দেখতে অতীতের নীরব অন্ধকারে নিরঞ্জন ঘটে দীর্ঘ সময়ের। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিমপর্ব থেকে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় অধ্যায় অবধি, নানাভাবে বহুবার উত্থান-পতন ঘটে আহিরীটোলার। কখনো সে বর্ধিষ্ণু গ্রামরূপে তার চূড়ান্ত মূর্তি প্রকাশ করে, আবার কখনো ক্ষয়িষ্ণু হয়ে সে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করে দীনতার স্বাক্ষর। তার এই দীনতার স্বাক্ষরই আরও স্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। তখন দেখা যায় : আহিরীটোলা থেকে

আহিরী সমাজের যেমন বিলোপ ঘটেছে, তেমনই বণিক সমাজেরও বসতির স্থানান্তর ঘটেছে আহিরীটোলা থেকে অন্যত্র। কেবল এদিকে-ওদিকে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঘর-কয়েক তন্তুবায় এবং কিছু শ্রমজীবী পরিবারের। অবশ্য একটি নতুন বাগান-বাড়িরও অস্তিত্ব ছিল। সম্ভবত সে-সময়ে কোনো এক সম্ভ্রান্ত ভূ-স্বামী এই বাগানবাড়িটি প্রতিষ্ঠা করেন—যার উপাধি ছিল নাথ। তাই কিছু পরবর্তী-কালে তৎকালীন জনসাধারণই উক্ত বাগানবাড়ির নামকরণ করে 'নাথের বাগান'।

তারপর অতিক্রান্ত হয় আরও প্রায় অর্ধ শতাব্দী। তখন ইংরেজ সরকার এ-দেশীয় জমিদার শ্রেণীর সহযোগে সংস্কার সুরু করে অরণ্যের, অনাদৃত তৃণাঞ্চলের এবং এদিকে-ওদিকে কিছু জলাভূমির। তাই স্বাভাবিক কারণেই সমগ্র চিৎপুরে বিস্তার লাভ করে নতুন বসতি এবং আহিরীটোলাতেও এসে বসতি স্থাপন করেন দু-এক ঘর সম্ভ্রান্ত পরিবার। এই সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির মধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবার সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ব্রাহ্মণ পরিবার আহিরীটোলায় আসেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এ-পরিবার বংশগত দিক থেকে কুলীন এবং উপাধি মুখোপাধ্যায়। তাঁরা এতদঞ্চলে এসেই একদিকে যেমন নির্মাণ করেন প্রাসাদ-প্রতিম বসতবাটী, তেমনই একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন স্থানীয় জনসাধারণকে। তাছাড়া একটি বাজারও প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা। সম্ভবত তাঁদেরই আহ্বানে এবং আকর্ষণে দিনের পর দিন আরও অজস্র সম্ভ্রান্তজনের বসতি-বিস্তার ঘটে আহিরীটোলায়। এই সম্ভ্রান্ত বসতির অভিরাম দৃশ্যই পরে আহিরীটোলাকে অঙ্গীভূত করে মহানগরীর।

আহিরীটোলার মন্দির, জমিদার-বাড়ি এবং সেই বিত্তশালী ব্রাহ্মণ-বাড়ি ছাড়াও 'আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়' নামে একটি প্রাচীন শিক্ষায়তন উল্লেখ-যোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর আহিরীটোলায় কোনো শিক্ষায়তন ছিল না। তাই তখন যদুনাথ শর্মা ওরফে যদু পণ্ডিত নামে তৎকালীন একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি নিজ গৃহেই জন-কয়েক শিশুছাত্র নিয়ে একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। পরে ছাত্রসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তিনি আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে একটি আটচালা ঘর নির্মাণ ক'রে পাঠশালাটিকে স্থানান্তরিত করেন সেখানেই। কিন্তু কিছুদিন পর সেখানেও স্থানাভাব ঘটায়, পাঠশালাটি আবার স্থানান্তরিত হয় তৎকালীন এক বিত্তশালী ব্যক্তি শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশস্ত দালানবাড়িতে। এই দালানবাড়িতে উঠে আসার পরেই পাঠশালাটি নাম ধারণ করে: 'মধ্য ছাত্রবৃত্তি বাংলা পাঠশালা।' তারপর যে-কোনো কারণেই হোক, এ-পাঠশালার স্থানান্তর ঘটে আরও একাধিক বার। শেষে বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন রায় বাহাদুর কানাইলাল দে বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং কার্যকরী সদস্যপদ গ্রহণ করেন রমানাথ লাহা, ভোলানাথ চন্দ্র, গোবিন্দ-চন্দ্র শীল প্রভৃতি। তা ছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যালয়ের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে সাহায্য করতে থাকেন নানাভাবে।

উল্লেখিত শক্তিশালী কার্যকরী সমিতির পরিচালনাগুণেই শিক্ষায়তনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বিশেষভাবে এবং অচিরেই তা নাম ধারণ করে 'আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়'।

তারপর সময় এগিয়ে চলে। উল্লেখিত কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ একে একে পরলোকগমন করায় সমিতির সদস্য-তালিকায় যাঁরা নতুন আসেন, তাঁদের পরেও আরও নতুন সদস্যের আবির্ভাব ঘটে ক্রমানুয়ে। এভাবেই সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্তির পর বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে। তারপর ১৯৪১ খৃস্টাব্দের কোনো এক শুভলগ্নে 'আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়' ভাড়াটে বাড়ি থেকে উঠে এসে স্থায়ী আসন গ্রহণ করে তার নিজস্ব ভবনে। আজও সুপরিচালিত সেই 'আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়' আহিরীটোলা ষ্ট্রীটেই বিদ্যমান। আজ থেকে মাত্র বছর-কয়েক আগে তার শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে সাড়ম্বরে।

আহিরীটোলার পশ্চিম প্রান্তিক রেখা থেকে ভাগীরথীর দৃশ্য অত্যন্ত রমণীয় হলেও বর্তমানে আহিরীটোলারও সার্বিক পরিবেশ সর্বাংশেই স্বাস্থ্য-পরাঙমুখ বলা চলে। আজকাল আহিরী-টোলার প্রধান প্রধান অংশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অজস্র খাটাল, অসংখ্য কাঁচা মালের গুদাম এবং ছোটো-খাটো কারখানা। সম্ভবত এ-সমস্ত কারণেই তার অবস্থানগত পরিবেশ একদিকে যেমন ঘিঞ্জি, অন্যদিকে তেমনই কদর্য-পঙ্কিল এবং কটুগন্ধের অবাধ বিস্তারে বিষাক্ত। কোনো কোনো অংশে আবার অসংখ্য জরাগ্রস্ত বাড়ি দেহভার ঝুঁকিয়েছে পরপারের দিকে। আহিরীটোলা ষ্ট্রীটের উত্তরে বিপ্রদাস লেন, নাথের বাগান ষ্ট্রীট এবং ভগবান ব্যানার্জী লেন সংস্কারের প্রসাদ-বঞ্চিত চিরকাল। দক্ষিণে অজস্র অলিগলি সমন্বিত দর্মাহাটা। আজ দর্মাহাটা-রূপেই তার পরিচিতি বিস্তার করেছে সমগ্র অঞ্চলে। তা ছাড়া এখানেই অবস্থিত অবাঙালীদের ডালপট্টী। এখানে ডাল কাচা এবং ডাল ভাঙার অজস্র কলে দুঃসহ ঘর্ঘর শব্দের বিরাম নেই দিবসে এবং রাত্রে। তাই এ-অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের অধিকাংশই আজ বিক্ষুব্ধ। কিন্তু বিক্ষুব্ধ হলেও, আচরণ তাঁদের বিশেষভাবেই শান্ত। আর শান্ত বলেই রাজ্য সরকার এবং পৌর প্রতিষ্ঠান আহিরীটোলার প্রতি উদাসীন থাকার বিরামহীন সুযোগ গ্রহণ করছেন নির্ভাবনায়। তবে এভাবেই যদি আরও কিছুকাল চলতে থাকে, তাহলে ঐতিহ্যমণ্ডিত আহিরীটোলা হয়তো মহানগরীর প্রশাখাচ্যুত হয়ে, ঢালু-পথে গড়াতে গড়াতে আবার ফিরে যাবে তার আদিম প্রবৃত্তির দেশে।

বাঁধের পথ ধরে চলতে চলতে ইতু দেখতে পেল হাজীসাব পাটক্ষেতের প্রান্তে বসে আছে হাঁটু দুমড়ে। বিকেলের ফিকে রোদে হাজীসাবের মুখমণ্ডল অতিশয় লাল দেখাচ্ছে। ইতু একটু ইতস্তত করল। আঁচলটা দাঁতে কামড়ে ভাবল সরাসরি যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা। তিনবছর ধরে দেখে আসছে তোরাপহাজী একটা বেয়াড়া ধরণের লোক। যত রাগী, তত গলাবাজ। হাঁক দিলে পিলে চমকে ওঠে। মুনিষ-মাহিন্দার থরথর করে কাঁপে। বড়বিবি, ছোটবিবি তো উনুনে লুকিয়ে বাঁচতে চায়।

আজ দুপুর থেকে হাজীসাব ঘরে ফেরে নি। পাটক্ষেতে ধানক্ষেতে ছোটাছুটি করে বেড়িয়েছে। বিকেলেও ফিরল না দেখে বড়বিবি ইতুকে পাঠিয়ে দিল মাঠে।

ইতু গজগজ করে এগোচ্ছিল এতক্ষণ। আচ্ছা মানুষ বটে হাজীসাব। শুধু জমি আর ফসল আর টাকা। আর কিছু কি থাকতে নেই মানুষের। সম্ভবত, মেয়েও সেটা টের পায় বলে নমাজে বসে বসে কাঁদে। ইতু তখন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসে। শুনতে পেলে হাজী ধমক দেয়, বেহুদা, খবিস লড়কী।

এমনি ধমক দিয়েছিল প্রথম ইতু যখন তার মায়ের সঙ্গে এ বাড়ি আসে। শীতের পর পদ্মা সীমান্তের যে ভিখিরিদের মিছিলটা প্রতি বছর এদেশে আসে, তাদের দলেই এসেছিল ওরা। হাজীবাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল দুজনে। পরে হঠাৎ হ[illegible]জরায় মা মরে গেলে ইতু এ বাড়িতেই রয়ে গেল। এবং তখনও তোরাপহাজীর কান্না শুনে ইতু হেসেছিল। ইতু তখন সবে তার বুকখানি ঢাকতে সুরু করেছে। ইতু আর ইতস্তত না করে এগোল। একটু পরেই বেলা ডুববে। হাজী তখনও ঘরে না ফিরলে একা তাকে ফিরতে হবে। সুতরাং অতি দ্রুত কাছে পৌঁছে সে ডাকল, 'হাজীসাব।'

তোরাপহাজী ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। 'কী রে?'

'বড়বিবি আপনাকে যেতে বলল।' নাকছাবি খুঁটতে থাকল ইতু।

'তাই বল। আমি ভাবছি, বড়বিবি বুঝি মারা গেল।' হো হো করে হেসে উঠল হাজীসাব। ইতু অবাক। হাজীকে

নন্দন কানন

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

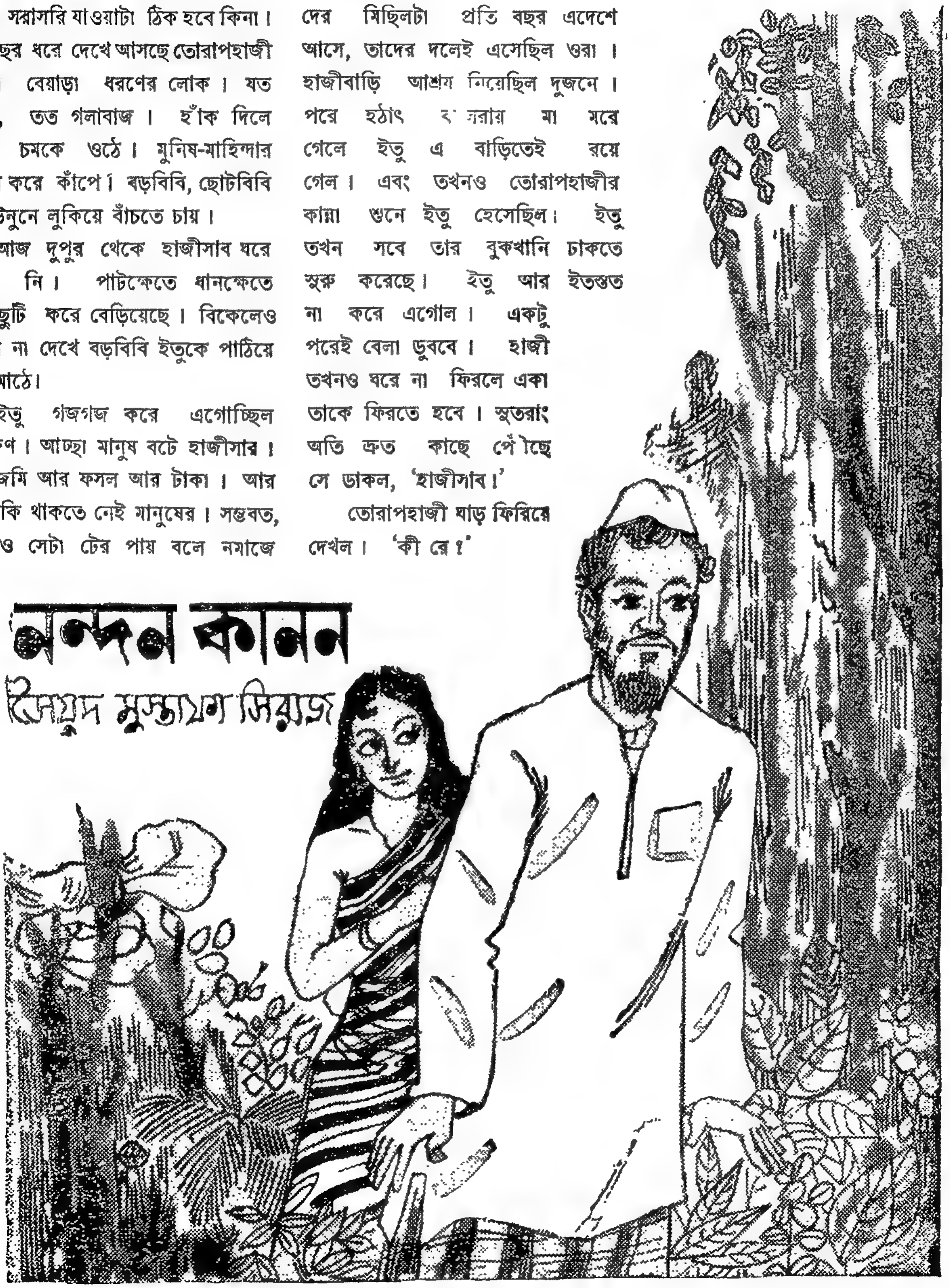

কোনাদন হাসতে দেখেছে, মনে পড়ে না।

ইতু সাহস পেয়ে বলল, 'ঘরে যাবে না হাজীসাব ?'

'ঘরে ?' তোরাপহাজী অদ্ভুত চোখে ইতুর দিকে তাকাল। আজ মেজাজটা বড্ড ভাল নেই, বুঝলি ?'

'কেন হাজীসাব ?'

'কিচ্ছু ভালো লাগে না রে ?'

'তোমার কিদে পায় নি ?'

'নাঃ।'

'ওমা।' ইতু একেবারে পাশে এসে বসল। 'কিদে পায় না কেন গো ?'

হাজীসাব সেই অদ্ভুত দৃষ্টিতে ইতুর মুখ দেখছে। ইতু চোখ নামাল। হঠাৎ যেন গা ছমছম করল ইতুর। মা তাকে একটা গল্প বলেছিল, স্পষ্ট মনে আছে। সাপের গল্প। কবে তার মরে যাওয়া বাপের সঙ্গে একটা সাপের দেখা হয়েছিল, চোখে চোখে চেয়ে থাকার পর, মানুষের দৃষ্টি সইতে না পেরে সাপটা পালিয়ে যায়। কিন্তু বাপটাও ভয় পেয়েছিল দারুণ, বাপও গুড়ি মেরে মেরে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের বর্ণনায় দৃশ্যটা অবিকল চোখে ভাসত। প্রায়ই তার মনে হত, কোথাও একটা লোক ও একটা সাপ গুড়ি মেরে দ্রুত পালাচ্ছে পরস্পর দূর থেকে দূরে।

'ইতু।'

ইতু চমকে উঠে তাকাল ভয়ে-ভয়ে। তোরাপহাজী উঠছে। টুপিটা খুলে ফের ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে মাথায় পরছে। তারপর লম্বা জামাটা পাশ থেকে কাঁধে তুলে রাখল। পরল না জামাটা। মস্তো লম্বাচওড়া শরীরে যেন আগুন জলছে। বুকের অল্প লোমে পাক ধরেছে। দাড়িগুলি প্রায় সবটাই পাকা। তোরাপহাজী পাটক্ষেতের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'দেখছিস, পাতার রঙ কেমন উস্কো-খুস্কো। মরতে বসেছে। বিষ্টি নেই আসমানে।'

হাজীসাব আল ধরে এগোতে থাকল। 'আউসগুলো গজাবে না মোটে। সব এবার নিষ্ফল। মাঠ থেকে ঘরে ফিরতে ইচ্ছে করে না রে।'

ইতু ভাবল, এই লোকটা আসলে একটা খাঁটি চাষা। ইতু বলল, 'তোমার অনেক জমি, না হাজীসাব ?'

তোরাপহাজী একটু হাসল। 'অনেক। দেখবি ? ঐ যে, ঐ বাবলাবন থেকে— নালা শরবন--- দেখছিস', হাজীর আঙুলটা ঘুরে ঘুরে সীমানা দেখাচ্ছে। 'যতদূর চোখ যাবে তোর---তারপর ঐ বাগান---'

বাগানের কথা জানে ইতু। অনেক ফলের গাছ সেখানে। চাখবার উপায় নেই তা বলে। সবই চালান যায় শহরে। দুই বিবি বলে, 'কঞ্জুস একেবারে, হাড়-কিপটে, জল্লাদ। তাই ত' আঁটকুড়ো হয়ে জন্ম গেল।'

এখন এ মুহূর্তে বাগানটা দেখতে ইচ্ছে করে। এবার নাকি লিচু ফলেছিল বিস্তর। আম। কলা। কাঁঠাল। অথচ কারুর ভোগে লাগতে দেবে না লোকটা পয়সা ছাড়া। বড়বিবি ছোটবিবি বলে, 'পয়সা কারুর সঙ্গে যাবে না। আখেরাতে খোদার সামনে কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব সব।' এসময় দুই বিবি সব ঝগড়া ভুলে গলাগলি কিছু অশ্রুপাতও করে। ইতু ভাবল, যদি এখন হাজীসাবের সঙ্গে সে বাগানে যেতে পারে, লুকিয়ে কিছু ফল নিয়ে যাবে বিবিদের জন্যে। সেদিন রাখালটা এককোঁচড় লিচু খাইয়েছিল বিবি দুটিকে। দুটিতে লুকিয়ে লুকিয়ে হেসে কেঁদে বাঁচে না। ইতুকেও দিল কিছু। সাবধান করে দিল, 'খবরদার, যেন কানে ওঠে না।' তারপর খোসাগুলো ইতুর বুকের ভেতর ন্যাকড়ায় বেঁধে ফেলতে পাঠিয়ে দিল ডোবার জলে। হাজীসাব তবুও কিভাবে টের পেয়েছিল। রাখালটা মারের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে গেল তো গেলই। নতুন রাখাল এল একটা। সে কিন্তু একেবারে হাজীসাবটি। ইতু মনে মনে একশো গাল দেয় উঠতে বসতে। 'বেজন্মা, শুয়ার, শয়তান!'

তোরাপহাজী আলপথে এগোচ্ছে। আঙুল তুলে জমি দেখাচ্ছে। ফসলের কথা বলছে। ইতু একটু অবাক হয়ে পেছন পেছন পথ চলছে। হাজী তার সঙ্গে এত বাক্যালাপ কোনদিনই করে নি। হল কি লোকটার ? নাকি মাঠে ফসল হবে না ভেবে, বৃষ্টির ভয়ে, এক-দিনেই পাগল হয়ে যাচ্ছে! এই হাজীসাবের এক ভাই নাকি এমনি করে পাগল হয়ে গিয়েছিল। টাকার শোকে। চড়া দরে পাট কিনে রেখেছিল। আরও লাভের আশায় বাজারে ছাড়ে নি। হঠাৎ দর নেমে গেলে লোকটা রাতারাতি ক্ষেপে গেল। রাস্তায় উদোম শরীরে ঘুরে বেড়াত। শেষটা কুচ্ছিত ঘা হল শরীরে। মরেই গেল।

রোদ লাল হতে হতে জমে যাচ্ছে যেন। জমি থেকে লোকজন উঠে যাচ্ছে দলে দলে। একটা নীলাভ আচ্ছন্নতা ধূসর করে তুলেছে মাঠ বন গ্রাম। সব কোলাহল থেমে পড়ল চারপাশে। মাথার ওপর একদল সাদা বক উড়ে যেতেই তোরাপহাজী মুখ তুলে তাদের দেখল। 'আসমান কালো করে মেঘ এলে ওরা যদি উড়ে যায়, ঠিকই বিষ্টি হবে, বুঝলি ?'

'হুঁ।' ইতু মাথা নাড়ল বক দেখতে দেখতে।

'আসমান তো বিলকুল সাফ। কী হবে বক উড়ে ?'

ইতু চুপ করে থাকল।

দূরে একটা পাখি অনেক সময় ধরে একটানা ডাকছিল। টি---টি---টি! হাজী বলল, 'ওটা হটিটি পাখি। বিষ্টির জন্যে কাঁদছে।'

ইতু থেমে দাঁড়িয়ে ডাকটা শুনল স্পষ্ট করে।

'উঁহু। এমনও হতে পারে—' তোরাপহাজী হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'ওর জোড়াটার জন্যে কাঁদছে। এখন ওদের ডিম দেবার সময় কিনা ? সব পাখির এখন ডিম দেবার সময়। এখন ওরা বাসা বানাবে। এমনও হতে পারে, হটিটি পাখিটা কাঁদছে না, ওর জোড়াটাকে ডাকছে।' হাজীসাব মৃদু মৃদু হাসতে থাকল। 'আজ এসব দেখেই দিন কাটিয়েছি। কী আর করি।'

ইতু সরলভাবে প্রশ্ন করল, 'সবাই ডিম দেয় না কেন হাজীসাব ? বেশ হত তাহলে !' তারপরই হিহি করে হাসল।

'বেশরম লেড়কী।' তোরাপহাজী দারুণ জোরে হেসে উঠল। 'বয়স হয়েছে, বুঝিস নে কিছু ? একেবারে উজবুক আউরত রে তুই। মা-বাপ শেখায় নি' —হঠাৎ থেমে আবার বলতে থাকল, 'দূর, আমার যেন কী হয়েছে আজ। মা-বাপের মাথা তো কবে খেয়েছিস---দূর'---বিড়বিড় করে কী দোওয়া উচ্চারণ করল তোরাপহাজী।

'হাজীসাব !' ইতু আবার প্রশ্ন করল।

'কি রে ?'

'এদিকে কোথায় চললে, ঘরে ফিরবে না ?'

'চল, বাগানটা দেখেই যাই। বাগানে গেছিস কোনদিন ?'

'না হাজীসাব।'

'আজ চল। দেখবি কেমন বাগান বানিয়েছি।'

একটু-একটু অস্বস্তি অনুভব করলেও পরক্ষণে দারুণ একটা আনন্দ ইতুর মনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ইতু বাগানের রসাল ফলগুলির কথা ভাবছে। বাগানে গাছগুলি নাকি প্রচুর ফলেছে এবার। ফলের ভারে ডাল নুয়ে পড়েছে মাটিতে। সেরা জাতের ফলের গাছ তোরাপহাজীর বাপজান আমদানী করেছিল কোন্ মুল্লুক হতে। সেই গাছ এখন ফল দিচ্ছে। তোরাপহাজী যেতে যেতে সেই বাপজানের গল্প বলল। যেসব মুল্লুকের গাছ, তাদেরও বর্ণনা দিতে থাকল। ইতু ঘন চোখে প্রায় হাজীর জামা স্পর্শ করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

তারপর তোরাপহাজী বাঁধে দাঁড়িয়ে বলল, 'দরিয়া দেখেছিস কখনো ? দেখিস নি। নীল দরিয়ার পানি। যতদূর চোখ যায়, সব একাকার। দরিয়া ও আসমানে ফারাক নেই। সেই দরিয়ার ওপার থেকে গাছ এনেছিলেন বাপজান। সেই গাছ তোকে দেখাবো।'

'দরিয়া কতদূর হাজীসাব ?' ইতু প্রশ্ন করল।

'অনেক দূর।' হাজীসাব বাঁধ থেকে নামছে। আবছা অন্ধকারে বনঝোপ থেকে পোকার ডাক শোনা যায় এখন। ডোবায় ব্যাঙ ডাকছে শুনে হাজীসাব একটু দাঁড়াল। কান খাড়া করে থেকে বলল, 'বিষ্টি হতে পারে শীগগির।' তারপর দু'পাশের জঙ্গলের মধ্যে একফালি সরু পথে চলতে থাকল। ইতুর গা ছমছম করছে। হাজীর জামাটা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগোল সে।

'আর কতদূর ?' একসময় প্রশ্ন না করে পারল না ইতু।

তোরাপহাজী হাসল। 'ভয় হচ্ছে ? আমি তো রয়েছি।'

'আলো নেই, গাছটা দেখা যাবে না।' অস্ফুটকণ্ঠে বলল ইতু।

তোরাপহাজী জবাব দিল না। সুমুখে উঁচু বেড়া। ছোট্ট একটা দরজা ছিটেবেড়ার। তোরাপহাজী বলল, 'একটা পাহারাদার রেখেছি এমুড়োয়। আরেকজন ওমুড়োয়। কার সাধ্যি ঢোকে।' হাজী প্রফুল্লকণ্ঠে বলতে থাকল, 'তবু চুরি করে ব্যাটারা। ফাঁকি দিয়ে বেচে, শুনেছি। হাতেনাতে পেলে কি আস্ত রাখবো ? তবে যতটা পারিস, নিজের পেটে খা। পয়সা করতে গেলেই দেব থাপ্পড়।'

সন্তর্পণে দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই একটা গাঢ় অন্ধকারে দুজনে নিমজ্জিত হয়ে গেল। ইতু হাজীর একটা হাত চেপে ধরল সঙ্গে সঙ্গে। হাজী কিছু বলছে না। যেন সবটুকুই তার চেনা। ঠিকঠাক পা ফেলে পথ চলছে। আস্তে আস্তে ইতুর ভয়টা কিছু কমল। নাকে এবার আশ্চর্য সব গন্ধ পাচ্ছে ইতু। সুখপ্রদ গন্ধ। নেশা ধরে যায় পলকে পলকে।

অন্ধকারে একটানা চলছে। সবই হিসেবের বাইরে মনে হয়। একটুও হাওয়া নেই। উৎকট ভ্যাপসা গরম জমে আছে গাছের নীচে। কেবল ফলের সুগন্ধ ধারাবাহিক। সারা শরীর, প্রতিটি

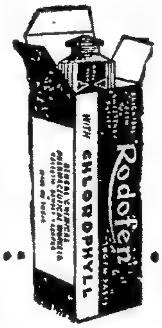

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে হ'লে
ক্লোরোফিল যুক্ত
রদফেন
টুথপেষ্ট ব্যবহার করুন

দাঁতের গোড়ার ঘা, পায়োরিয়া ইত্যাদি সারাতে ক্লোরোফিল সাহায্য করে। নিয়মিত ক্লোরোফিল যুক্ত রদফেন ব্যবহারে মুখের বিশ্রী গন্ধ নিবারিত হয়, দাঁত ঝকঝকে সাদা দেখায়, ঘা ও দাঁতের ক্ষয় দূর হয়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

স্নায়ু উন্মুখ করে তোলে এই গন্ধ। অন্ধকারে গন্ধময় এই জগতে চলতে চলতে ইতু এবার তোরাপহাজীর হাতটা ছেড়ে দিল। তারপর জামাবিহীন বুক থেকে আস্তে আস্তে, হাজীর অগোচরে, কাপড়টা খুলে কোমরে জড়াল। ওর সারা শরীর ঘামে চবচব করছে। এখন বাকী কাপড়টুকু খুলে ফেলতে পারলে যেন খুবই বেঁচে যায়। ইতু একটু হাসি একটু উদ্বেগে দূরে দূরে চলতে থাকল। তোরাপহাজী ডাকল, 'ইতু!'

'এই যে হাজীসাব। চলুন।'

'পিছিয়ে পড়লি কেন?'

'চলুন তো।'

'বড্ড গরম হয়ে আছে রে। কাপড়চোপড় ফেলতে পারলে বেশ হত।' অন্ধকারে হা হা করে হাসছে তোরাপ-হাজী। বাগানটা কাঁপছে থরথর করে। হাসি থামিয়ে হাজীসাব আবার ডাকল। 'ইতু!'

'উঁ?'

'ফল খাবি?'

'উঁ?'

'উঁ কি রে লেড়কী? বল না, খেতে ইচ্ছে করে কিনা?' হাজী ধমক দিচ্ছে।

'অন্ধকার যে।'

'তা হোক। হাত বাড়ালেই ফল ছোঁওয়া যায়। মুখে তুললে রসও পাওয়া যায়।'

গাছের পাতায় ক্ষিপ্রতম শব্দ উঠছে। খসখসে শব্দটা। তারপর বোঁটা ছেঁড়ার। সম্ভবত ফল ভাঙছে তোরাপহাজী।

'ইতু!'

'উঁ?'

'একটা কেচ্ছা শোন। বাবা আদম-এর হবার কেচ্ছা। কোরানে রয়েছে। শয়তান কী করেছিল শোন—'

'হাজীসাব।' আর্তনাদ করল ইতু। 'শয়তান বললে আমার ডর লাগে।'

'ডর লাগে?' হঠাৎ ফিসফিস করে বলল তোরাপহাজী। এবং কণ্ঠস্বরে একটা চাপা অমসৃণ হাসিও উৎসৃষ্ট করে পড়ছে। 'কিন্তু শয়তান তো সব-খানেই রে। সবসময়—সামনে পেছনে, যেদিকে ফিরবি'—এ পর্যন্ত শুনেই ইতু ভয়ঙ্করভাবে তাড়া খেয়ে হাজীর ওপর ছিটকে গেল।

'শয়তানকে এত ডর!' সেই অমসৃণ হাসিটা পাতাছেঁড়া শব্দের মতো অন্ধকারে ঝরে ঝরে পড়ছে, অথচ দেখা যাচ্ছে না। ইতুর শরীর বেয়ে তারা গড়াচ্ছে। ইতু হাজীসাবকে জড়িয়ে ধরে অনুভব করল হাজীসাবের প্রকাণ্ড শরীর ঘামে চবচব করছে। পিচ্ছিল মাংসের স্তূপটা থেকে থেকে কাঁপছে। তারপরই আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ পেল ইতু। রসাল পাকা ফলের। ভয়ের ঘনতার ওপর বিন্দু বিন্দু জমছে গন্ধটা শিশিরের মতো। মস্তিষ্কের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে একটা আশ্চর্য তীব্রতা—যা হৃদয়কেও আপ্লুত করে। এই বাগানে অনেক ফলের গাছ আছে। আম, আনারস, কলা, পেঁপে। বুঝলি ইতু। আমার হাতের এই আমগুলোয় কিন্তু সব রকম ফলের স্বাদই পাবি। মুখে তুললে তফাৎ টের পাবি নে—আম না আনারস, না কলা, না পেঁপে—'

ইতু চুপ করে আছে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ওর মনে হচ্ছে, হাজীসাবের লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছে। এমন কি ওর নিজের কোমরটাও এত পিচ্ছিল যে সেও উদোম হয়ে যাবে মনে হয়।

'ইতু?' তোরাপহাজীর একখানা পিচ্ছিল হাত ইতুর শরীরের ওপর নামতে থাকল। 'আর ডর লাগে?'

'না।' খুব শান্তস্বরে জবাব দিচ্ছে ইতু। ইতুর ভয়বোধটা আর নেই।

তোরাপহাজী একটু এগোল। ইতু অনুভব করল—হাজীসাবের লুঙ্গিটা খুলে যাচ্ছে ক্রমশ। 'ও হাজীসাব, লুঙ্গিটা পরো বাপু'—বলার জন্যে একটু-একটু ইচ্ছে, অথচ কী একটা আলসেমি। নিজের বুকের কাপড়খানাও তুলতে ইচ্ছে করে না।

'আয়, এখানে বসে খাওয়া যাক।' হঠাৎ ইতুকে টেনে নিয়ে হাজীসাব বসল। পিটুলিগাছের নরম শরীর দলে পা বিছিয়ে বসেছে। অন্ধকারে ফলের ওপর দাঁত-বসানো শব্দ। বাগানটা অতিশয় নিঝুম। ভ্যাপসা গরমে সব কিছু চবচবে মনে হয়। অন্য কোন শব্দ নেই, আলো নেই। নক্ষত্রও ডুবে আছে গভীরে। 'আদম-হবা এমনি করে মেওয়া খেতেন বেহ্‌শতে। আঃ কী সুখের দিন ছিল!'

পরম তৃপ্তিতে ফল খাচ্ছিল ইতু। দুটি হাত ও ঠোঁট গড়িয়ে পাকা ফলের রস। জীবনে এমন সময় কোনদিনও আসে নি। আর আসবে না হয়তো। ইতু মনে মনে হাজীসাবের প্রতি দারুণ প্রসন্ন হয়ে উঠছে—ফিক্‌ফিক্ করে হাসল সেই প্রসন্নতা পরিস্ফুট করতে। 'হাজীসাব।'

জিভের ও ঠোঁটের যুগপৎ শব্দ তুলে তোরাপহাজী বলল, 'কী?'

'বিবিরা জানলে খুব মজা হবে।' দুলে দুলে হাসতে থাকল ইতু।

—'খবরদার!' সাপের মত গর্জে উঠল তোরাপহাজী। 'বলিস না। কাকেও না।'

ইতু চুপ সঙ্গে সঙ্গে।

'এসব কথা বলতে নেই।' শান্ত কণ্ঠস্বরে তোরাপহাজী বলল।

অনেক সময় ধরে বসে থাকল দুজনে। ফল খাওয়া শেষ করেও চুপচাপ বসে থাকল। ইতু হাজীসাবের শরীরে শরীর ছুঁইয়ে নিবিড়ভাবে তার তৃপ্তিটুকু জানাতে চাচ্ছে। তোরাপহাজী হঠাৎ কেমন কাঠ হয়ে গেছে। কেমন ঠাণ্ডা, শুকনো-শুকনো।

এতক্ষণ পরে এবার একটু হাওয়ার শব্দ। পাতা কাঁপছে গাছে গাছে। কোথায় একটা পেঁচা ডাকল। ফলের সুগন্ধটা এলোমেলো জলের ঢেউ-এর মতো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। জোনাকি জ্বলতে দেখা গেল। শব্দ করে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটা ভিন্নতর উত্তরঙ্গ ব্যাপকতা অন্ধকার বাগানে এগিয়ে আসছিল।

'আঃ!' অস্ফুট কণ্ঠস্বরে হাজী বলে উঠল, 'কতদিন ফল খাই নি। দরিয়াপারের এই গাছগুলো এত সুন্দর মেওয়া ফলায়। চেখে দেখতে ইচ্ছে করত না।'

ইতু জানে একথা। বড়বিবি ছোটবিবি বলে। ইতু নিজেও ভাবে একথা। এই কিপটে লোকটাকে নিজের বাগানের মেওয়া চাখতে কেউ কোনদিন হয়তো দেখে নি।

'বিষ্টি হবে। রাতেই বিষ্টি নামবে, দেখিস। হাওয়ায় কেমন গন্ধ দিচ্ছে। আর—' তোরাপহাজী চুপিচুপি বলল, 'ব্যাঙ ডাকছে, শুনতে পাচ্ছিস? বিষ্টি নামবে জানলে ওদের বিয়ে হয়।'

হাওয়ার জোর বাড়ছিল একটু করে। বাগানের সবটুকু অন্ধকার ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। জোনাকির আলোগুঁড়ি চারপাশে। জোনাকিরা দলে দলে বেরিয়ে আসছে। ইতুর মনে হল, আস্তে আস্তে একটা উৎসবের আয়োজন সুরু হয়ে গেছে। ইতুর দারুণ রকমের একটা আনন্দ—অপরিচিত, একটা কিছু ঘটবে মনে হয় তারই প্রস্তুতি।

তারপর একটা আলো দেখা গেল। একটু দূরে আলোটা নড়াচড়া করছিল। তারপরই মানুষের হাঁক।

'পাহারাদার!' চকিতস্বরে বলে উঠল হাজীসাব। আলোটা এগিয়ে আসছিল সবটুকু অন্ধকার চূর্ণ করে। বন্যার সুমুখে-পড়া ভয়বিহ্বল মানুষের মতো তোরাপহাজী লাফ দিয়ে উঠল। 'ওঠ, চল, পালা---'

ইতুর একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে দৌড়তে থাকল তোরাপহাজী। বিড়বিড় করে কোরাণের শব্দ উচ্চারণ করছিল সে। ইতু বিস্ময়ে কাঠ পুতুলের মতো হাজীসাবের শরীরে আটকে রয়েছে। পিটুলি ঝোপ কাঁটাখোঁচে শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে দুজনের।

বাগানের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তোরাপহাজী। তাড়াখাওয়া জন্তুর মতো লাফ দিল ইতুকে নিয়ে। ইতু ওপারে গিয়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অন্ধকার আশ্চর্য বাগানটা; এক নিষিদ্ধ রসাল ফলের প্রকাণ্ড অস্তিত্ব যেন।

বাঁধের পথে চলতে চলতে ইতুর মনে হল তোরাপহাজী যেন একটা শয়তান দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর বাগানে। দিগন্তে এখন চাঁদের মুখ। স্বল্প নিষ্প্রভ জ্যোৎস্না মাঠে। একটা বিষণ্ণ ব্যাপকতায় ভাসছে দুজনে। হাজীসাব শান্ত, নিস্তেজ। আকাশ দেখছিল বারবার মুখ তুলে।

'বিষ্টি হতে পারে। হাওয়ায় কেমন গন্ধ।' শুয়ারের মতো নাক উঁচু করে আছে তোরাপহাজী। 'আমি আজ সারা রাত মাঠে ঘুরবো। তুই ফিরে যা ইতু।'

ইতু এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপর হাজীকে সত্যি সত্যি মাঠে নেমে যেতে দেখে সে ঘরের পথে পা বাড়াল। অন্ধকার বাগানে কী সব ঘটতে যাচ্ছিল, ইতুকে বিষণ্ণ করে তুলেছে এই ভাবনাটা।

'কাকেও বলবি নে।' ভয়ার্ত মানুষের কণ্ঠস্বরটা ক্রমান্বয়ে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সম্ভবত দৌড়চ্ছে লোকটা। ইতুও ভয় পেল হঠাৎ। দৌড়তে থাকল। এ মুহূর্তে তার সেই সাপের খলপচ মনে পড়ে গেছে।

সংলাপের মধ্যবর্তী

শক্তিব্রত ঘোষ

অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেল: 'কতকাল পর বলুন তো
মিস্টার, মিস্টার—'
'মিস্টার সান্যাল', বলে কান্তবাবু শূন্যস্থান পূর্ণ করে দিয়ে
কাঁধে হাত রাখলেন, 'নামটাও ভুলে গেলে? বিস্মরণ এত
দ্রুত? কি হে?'
সঙ্কোচে আনত হয়ে ভাবলাম: কান্তবাবু আমার বড়ই হবে, তবু
'সদানন্দ' বলেই ডেকেছিলেন স্মিতহাসে—
ভুলও তবে লোক চিনে আসে?

'তারপর, কি খবর? কি করছ, কোথায় রয়েছ, আর গৃহিণী কেমন,
কিম্বা ছেলেগুলে, নাতি? এখন তো সুখের দিন হে—'
কান্তবাবু অনায়াসে শুধালেন; আমি কিছু পর
বললাম: 'আপনার খবর?'

'খবর? পেন্সন পাচ্ছি। ছেলে এক মার্কিনী অপিসে অফিসার,
এম-এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে গেল ওদেশেই নিজের উদ্যমে,
ফিরে এসে এ-চাকরি। কোম্পানী গাড়িও দিল, তারপর বিয়ে
নিজেই করল, পেল বাড়ি যৌতুকে লেকের কাছে, ছোট্ট নাতি
ভীষণ দুরন্ত, সে তো ঠাকুমার কোলেই মাতাল।
এখন জীবন নির্ভেজাল।'

টুইশানি করে ফিরছিলাম। বয়স একষট্টি।
পকেটে ঘরের চাবি,
দোকানে দাঁড়াবো একবার। রুটি নেব।
গা জ্বলছে। দরজা খুলেই বাতি জ্বাললাম,
চিরকাল ঈর্ষার গোলাম।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একাদশ প্রবাহ ॥

"সেকালে সওদাগররা সম্রাটের মত মহিমা নিয়ে মানুষের মনে বিরাজ করতো।"

সুদূর সেই ইটালী, মধ্যপ্রাচ্য, চীন, রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রাচীন বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত আরও সুদীর্ঘ আর জটিল।

এখন থাক সে প্রসঙ্গ। পুণ্যতোয়া গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা বিধৌত নদীমাতৃক এই বাংলার আর এক নাম ছিল 'জল-বাংলা।' হয়তো পাঠক এই নাম জানেন। হাজার হাজার বছর আগে বাংলাদেশের অজস্র নদীর ঘাটে-ঘাটে বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যাপারীদের বজরা এসে নোঙর করতো। এক জেলার পণ্যসম্ভার নদী পাড়ি দিয়ে চলে যেত আর এক জেলার বন্দরে-বাজারে-হাটে। সেদিন বাঙালীর ছেলেরা চাকরী কাকে বলে, পরের দাসত্ব কাকে বলে জানতো না। ছিল দরজার কপাটের মত চওড়া বুক, ছিল অটুট স্বাস্থ্য—তেমনি ছিল পরিশ্রমের অসাধারণ ক্ষমতা। শাঁখারী শাঁখা তৈরি করতো, কাঁসারী ভরণ আর পিতলের বাসন তৈরি করতো, কামারশালায় কামার তৈরি করতো দা-কুড়াল-খন্তা। দৈহিক পরিশ্রমকে, হাতের কাজকে একালের বাঙালীদের মত ঘৃণা করতো না আমাদের অতীত বংশধররা।

সেদিন সওদাগররা ছিল বাঙালীর কাব্যের, সাহিত্যের নায়ক। তাঁরা সম্রাটের মত মহিমা নিয়ে বাঙালীর মনে বিরাজ করতেন।

একজন বণিক। ব্যবসায়ী মাত্র, আর কিছু না। তার শিক্ষাদীক্ষা ছিল কিনা, মানসিক সম্পদ ছিল কিনা, সে ইতিহাস অজানা। কিন্তু অজানা নয়, অবাস্তব নয়, তার বিস্ময়কর জনপ্রিয়তার বিপুল-ব্যাপ্ত প্রসারতা।

বাংলাদেশের হুগলী জেলায় আসুন। একটি সুপ্রাচীন কালের বর্ধিষ্ণু গ্রাম—সপ্তগ্রামে এসে আপনাকে থামতে হবে।

সপ্তগ্রামের কাছে একটি অঞ্চলের নাম চন্দ্রহাটি। চন্দ্রহাটি নামটি সেকালের এক বিখ্যাত সওদাগরের নামের স্মৃতি বহন করছে। কিম্বদন্তী বলে, চাঁদ সওদাগর এখানে একটি হাট বসিয়েছিলেন। বিপ্রদাসের 'মনসা-মঙ্গলে' আছে, চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য-তরী 'ত্রিবিনিগঙ্গা' বেয়ে দূর সমুদ্রে যেত। সপ্তগ্রাম থেকে ত্রিবেণী দূরে নয়। আর গঙ্গার গতিপথও ছিল কাছে। তাই বিপ্রদাস বলেছেন ত্রিবিনিগঙ্গা।

ঢাকা জেলা আজ বিদেশী রাষ্ট্র। পূর্ব পাকিস্তান। অতীত বাংলার আলোচনায় বারে বারে ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরের কথা এসে যায়। যাবে। সেকালের বাঙালীদের ঐতিহ্য, তার বিদ্যা, তার সংস্কৃতির সঙ্গে পদ্মা-মেঘনা

গারের দেশ জড়িয়ে রয়েছে ওতপ্রোতভাবে।

ঢাকা জেলার একটি থানার নাম সাভার থানা। সাভার থানা এলাকার ভেতরে আছে এক বিস্ময়কর দীঘি। হরিশ্চন্দ্র দীঘি তার নাম। মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে এই দীঘিতে আজও জলোচ্ছাস হয়। পূর্ণিমার চাঁদের আলো দীঘির নিস্তরঙ্গ জলে ঝিলমিল করে। নিশি রাত। চারিদিক নিস্তব্ধ। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে একটি ছায়াদেহ বাতাসের ওপরে পা ফেলে নাকি দীঘির পাড়ে পাড়ে পদচারণা করে। অকস্মাৎ থেমে দাঁড়ায় সেই প্রেতদেহ। তার সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে গর্জন করে ছুটে আসে ঝড়ো হাওয়া। জলে জাগে ঢেউয়ের কলরোল। মত্ত উচ্ছ্বাসে ফুলে ওঠে, ফেঁপে ওঠে জল। দীঘির উঁচু পাড় অতিক্রম করে মাঠে-মাঠে ছড়িয়ে পড়ে জল। আজও মাঘীপূর্ণিমা রাত্রে এখানে জনসমাগম হয়। মেলা বসে। বিশাল জনতা ভিড় করে দেখে এই অতিপ্রাকৃত ঘটনা। চাঁদ সওদাগর নাকি যোগবলে মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে জোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। চাঁদ সওদাগরের আর এক নাম ছিল হরিশ্চন্দ্র। 'মনসামঙ্গলে' আছে চাঁদ বেনে বলছেন, তিনি চৌদ্দ জগতের ঠাকুর। লোকে বলে, তাঁর এই অহঙ্কারকে প্রমাণ করার জন্যই চাঁদ দীঘিতে জোয়ার এনেছিলেন।

বীরভূমে আছে অযোধ্যা। এই অযোধ্যার মাটিতেও রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে চাঁদ সওদাগরের স্মৃতি। বাইশ কবির মনসামঙ্গলের গানে এই সওদাগরের বিপুল ধনসমৃদ্ধির ইতিবৃত্ত মুখর হয়ে ওঠে। গৌড় মহানগরী। প্রাচীন বাংলার রাজধানী। তার গা বেয়ে গঙ্গা ধীর-মন্থর গতিতে চলেছে দূরে তাম্রলিপ্তের উদ্দেশ্যে। এই গঙ্গার গৈরিক জলরাশির ওপরে একদিন একটি বিচিত্রবর্ণ সুসজ্জিত বাণিজ্যতরী দেখা গেল। শুধু একটি তরী নয়। নৌবহর। সকলের সামনে যে জাহাজ ছিল—তার নাম মধুকর। বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

চৌদ্দখানা মধুকরে করহ সজন।

বিজয়গুপ্তের মতে চাঁদ সওদাগরের সব জাহাজের নামই ছিল মধুকর। আবার কেউ বলে, তাঁর প্রধান জাহাজের নাম মধুকর। এই মধুকরকে সামনে রেখে চাঁদের বাণিজ্যতরীর বহর সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূর দেশে চলে যেত।

কি বস্তু নিয়ে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য করতো—সে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পদ্মপুরাণে আছে, চাঁদের বাণিজ্যদ্রব্য ছিল হীরা ও কাঞ্চন। বাইশ কবির মনসামঙ্গলে আছে, চাঁদকে দুলাই কাণ্ডারী বলছে—

দুলাই বলে সওদাগর তব বাপ কোটিরার।
জানিত বাণিজ্য ব্যবহার।
ভাল দ্রব্য যত্ন করি নিয়ে যেত ডিঙ্গা ভরি
সোনারূপা আনিত অপার।

সেকালে গৌড় ছিল বঙ্গের রাজধানী। তার ধনসম্পদের খ্যাতি ছিল বহুদূর প্রসারিত। বলা বাহুল্য, সওদাগর চাঁদকে গৌড় আকৃষ্ট করবে। গৌড়ে এসেছিল চাঁদ সওদাগর। এখানে কাঞ্চনাগার ছিল তার। যখন পঞ্চগৌড়ে এসেছিল তখন তার সওদাগর উপাধি ছিল না। কিন্তু সে নিজের বুদ্ধির আর ব্যক্তিত্বের জোরে গৌড় সম্রাটের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠেছিল। অতীত ইতিহাসের ভেতরে কুয়াশার ছায়ার মত দেখা যায়, চাঁদ সওদাগর নাকি বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া ছিলেন। মনসার গীতকর্তা বিপ্রদাস বলেছেন, বীরচাঁদ ভুঁইয়া।

বর্তমান বিহারের ভাগলপুরের একটি অঞ্চলের নাম 'চম্পা'। এই চম্পার সঙ্গে অতীত-বাণিজ্যের গৌরবের ইতিহাস পরম মমতার মত জড়ানো রয়েছে। সেই সুপ্রাচীনকালে এই চম্পানগরী থেকে বণিকরা সমুদ্রযাত্রা করতেন। জৈন উত্তরাধ্যয়ন সূত্র থেকে জানা যায়, আড়াই হাজার বছর আগে চম্পা ছিল বিখ্যাত সমুদ্র-বন্দর। বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে আছে, চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিছুকাল চম্পায় কাটিয়েছিলেন।

সওদাগর শব্দটি ফরাসী ভাষা থেকে এসেছে। ঐতিহাসিকরা অনেক গবেষণা করেছেন কেন চাঁদের নামের সঙ্গে সওদাগর কথাটা এসেছে। খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে পূর্ব উপদ্বীপে, মালয়দ্বীপে আরবীয়গণ বাণিজ্য করতে আসতো। এই সময় চাঁদ সওদাগরও বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন। এই আরবীয় বণিকগণ চাঁদকে 'সওদাগর' বলতো।

বর্ধমান জেলার মানকড় রেলওয়ে স্টেশন। তার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে গাঙ্গুর নদী। সেই সুদূর অতীতে গাঙ্গুর নদীর তীরে ছিল ধনে-জনে সমৃদ্ধ জনপদ, চম্পাই নগর। আজও আছে চম্পাই নগরে জোড়া শিবমন্দির। এই শিবমন্দিরের দিকে তাকিয়ে কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে। এই দুই শিবকে নাকি বিখ্যাত নৈষ্ঠিক শিব-উপাসক চাঁদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মন্দির দুটো ঠিক পাশাপাশি নয়। একটা জঙ্গলের ভেতরে। তাই লোকে বলে, 'এক শিব মন্দিরে, আর এক শিব ঝোড়ে।' একটা শিব আবার মোটা। তার নাম মোটা শিব। শিবদের স্নান করাতে গেলে নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়তে হয়—মনসাদেবী তার চিরশত্রু ভাবতে পারে, তাকেই বুঝি প্রণাম করছে। তাই—

ভোরের ছায়াময় অন্ধকারে চাঁদ সওদাগর এসে দাঁড়াতেন গাঙ্গুর নদীর তীরে। দৃপ্ত, গর্বিত চোখের চাউনি। দুই শিবকে বগলে নিয়ে সোজা নদীতে নামতেন। একটু একটু করে জল বাড়তো। কোমর ডুবতো, বুক ডুবতো। মাথা ডুবতো। বগলের নীচে শিবদের স্নান হয়ে যেত।

আজও গাঙ্গুর নদীর শুকনো খাতের দিকে তাকিয়ে গর্বিত বিপুল সম্পদের অধিকারী এক বাঙালী বণিকের স্মৃতি মনের ভেতরে ভেসে ওঠে।

(ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

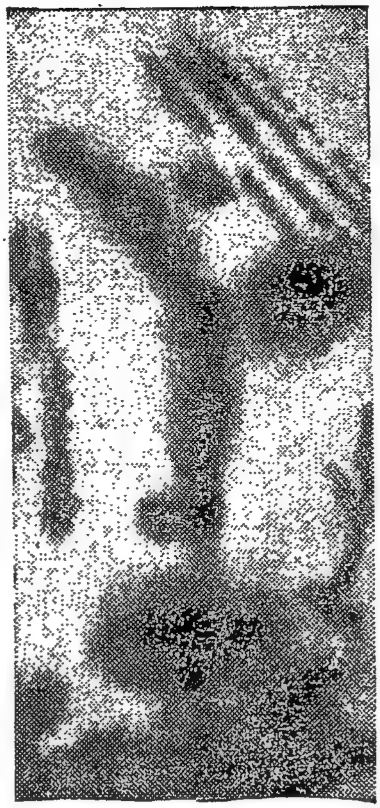

কুহেলী বিলীন

বিশু বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

রামদুলাল দত্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কপালের উপর বিরক্তির স্পষ্ট খাঁজগুলো লক্ষ্য করছিলেন। আশ্চর্য মানুষ ঐ খামখেয়ালী ডাক্তারটি। ডাক্তারী ডিগ্রী আছে বটে কতকগুলো, কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপে গুপ্তচরগিরি করে নিশ্চয় হাত পাকিয়ে এসেছেন। তা না হলে যে ভাবে এলোমেলো সূত্রগুলো একত্র করে মোটামুটি একটা কেস খাড়া করে ফেলেছেন ভদ্রলোক, তাতে ঝানু পুলিশ অফিসারেরও মনে চমক ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ তিনদিন অকারণে ভদ্রলোক নিখোঁজ, কোথাও পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।

সমরেশ সরকারকে পুলিশের নজরবন্দী করে রাখা হোক, এ কথা ডাঃ বসাকই বলেছিলেন। কিন্তু তারপর দু-তিনদফা অসুস্থ হয়ে পড়াতে ভদ্রলোককে নার্ভাস ব্রেকডাউন বলে একটি নাম করা নার্সিং হোমে শেষ পর্যন্ত ঢোকানো হয়েছে। ডাঃ বসাকের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি সারাদিন সেবা-শুশ্রূষা করে আর রাত্রিবেলা মেট্রন নিজে দেখেন। বন্ধ দরজার গায়ে প্রকাণ্ড নোটিশ টাঙিয়ে রাখা হয়েছে, 'প্রবেশ নিষেধ।'

'সবটাই ডাক্তার বসাকের বাড়াবাড়ি', রামদুলাল দত্ত জোরে জোরে উচ্চারণ করলেন—'নার্ভাস ব্রেকডাউন তো ভদ্রলোকের গোড়া থেকেই, মিছিমিছি এখন নতুন করে ঝামেলার সৃষ্টি।'

'আপনার টেলিফোন স্যার'—একজন ইন্সপেক্টার এসে দাঁড়ালো।

'কে করেছে?'

'নার্সিংহোম থেকে। নাম-ধাম বলছে না, কেবল বলছে মিঃ দত্তকে ডেকে দিন জরুরি দরকার।'

এক-এক সময় মনের মধ্যে খাপছাড়া ভাবনা এসে একটুখানি উঁকি মেরে চলে যায়, তার আদি-অন্ত বোঝা যায় না। খুব বিরক্ত হয়ে টেলিফোন ধরতে আসছিলেন রামদুলাল দত্ত, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় গ্রামের পুকুরে মাছচুরি যাওয়ার লোমহর্ষক গল্প—শুনে তখন তাঁর খুব শখ হোত, লেখাপড়া শিখে সময় নষ্ট না করে ঐ চোরের কাছে হাতেখড়ি নিতে। নিলে মন্দ হোত না। পরবর্তী জীবনে যারা পুলিশ হবে, তাদের চোর-ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে বেশ কিছুকাল কাটানো উচিত। তাহলে অন্তত ওদের বেখাপ্পা শয়তানীর হদিশ খুঁজে পেতে অত দেরি হয় না।

'হ্যালো' প্রায় ধমক দিয়ে বলে ওঠেন রামদুলাল দত্ত। যারা টেলিফোনে নাম বলতে চায় না তাদের জন্য একতিল সহানুভূতিও তিনি অনুভব করেন না কোনো কালে। 'কে কথা বলছে, কাকে চাই।'

'আজ্ঞে আপনাকেই'—একটি ভীরু মেয়েলী গলা ভেসে এলো অন্য দিক থেকে: 'আমি—আমি একজন নার্স।'

'তা এখানে কি দরকার?' রামদুলাল দত্ত প্রায় হুমকি দিয়ে ওঠেন।

'সমরেশ সরকার বলে যে পেশেণ্টকে আপনারা চোদ্দ নম্বর কেবিনে রেখেছেন, তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই কথাটাই আমি আপনাকে জানাতে চাইছিলাম।'

'দাঁড়াও, তোমার—আপনার নাম কি? কোথায় থাকেন? এই সমস্ত আগে খুলে বলুন।'

একটু চাপা হাসির শব্দ এলো ওধার থেকে। একটু চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দও বুঝি বা।

'কথাটা গোপন রাখবার জন্য আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষের লোভ দেখানো হয়েছে, একজন সাধারণ নার্সের কাছে তার মূল্য কম নয়।'

'বলেন কি? ব্যাপারটা জটিল বলে মনে হচ্ছে?'—রামদুলাল দত্ত ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলতে সুরু করলেন

'তাছাড়া আরও অনেক কিছু পাওয়ার আশা আমাকে একজন দিয়েছে।' অপর পক্ষের ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলে চলল মেয়েটি—'সারাদিন যে বাইরের নার্সটি থাকে, তার চোখে ধুলো দেওয়া খুব সহজ নয়, কিন্তু মেট্রনের জন্য রাত দশটায়, দুটোয় আর ভোর পাঁচটায় তিনবার আমিই কফি তৈরি করে দিয়ে আসি। নাইট ডিউটিতে সারারাত একবারও চোখের পাতা বন্ধ করার উপায় নেই বলে খুব কড়া কফি বার বার খেতে হয়। যতই হোক মেট্রনের বয়স হয়ে আসছে ত'? কফির পেয়ালায় ঘুমের ওষুধ দিলেই ঘুমিয়ে পড়বেন, আর তখন শিশিতে একটি পরিয়া মিশিয়ে দেব। জানি না,

কিসের পুরিয়া, তবে তাতেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।'

'আমাকে কেন একথা বলছেন'—রামদুলাল দত্ত নরমস্বরে বলে উঠলেন।

'কেন বলছি? আমি নিজেই জানি না। ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে কফির পেয়ালা এইমাত্র দিয়ে এলাম মেট্রনকে। তারপর—তারপর হঠাৎ কে যেন ধাক্কা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল। মনে হোল, আমি একজন নার্স, মানুষকে বাঁচিয়ে তোলাই আমার কাজ। টাকার লোভে আমি এ কি করতে চলেছি।'

'কে কে আপনাকে এই কুকাজ করতে পরামর্শ দিয়েছে? তার নাম বলুন। দেরি করবেন না।'

'বলছি। সবই খুলে বলছি। কিন্তু কথা দিন, আমার কিছু হবে না।'

'না, না, আপনার কথা কেউ জানবে না। তাড়াতাড়ি বলুন।'

'তার নাম—উঃ'—বলে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটি। রিসিভারটা বোধহয় ছিটকে পড়ল মাটিতে। প্রচণ্ড একটা শব্দ একটু চাপা আর্তনাদের আভাস, তারপরেই সব চুপচাপ।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে রামদুলাল দত্ত সাংঘাতিক রকম তৎপর হয়ে উঠলেন। মেজাজ একেবারে সপ্তমে, গাড়িতে স্টার্ট দেওয়ার সময়ে ক্লাচ টিপতে ভুল করে ড্রাইভার কড়া ধমক খেলো। স্পিডের কাঁটা মাত্রাজ্ঞান ছাড়ালেও 'আরও জোরে, আরও জোরে চল' বলে হুঙ্কার দিতে সুরু করলেন। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। এখন রাত গভীর হয়ে আসছে, রাস্তায় ভিড় নেই বললেই চলে। প্রায় ঝড়ের গতিতে অনাবশ্যক হর্ন দিতে দিতে গাড়ি এগিয়ে গেল।

নার্সিংহোমে এই সময় সাধারণত চুপচাপ। নীচে লাউঞ্জে দু-চারটি উৎকণ্ঠিত আত্মীয়-স্বজন হয়তো বিষণ্ণমুখে চিন্তায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে থাকেন। কেউ বা করিডরে নিঃশব্দে পায়চারী করেন অতন্দ্র চোখে। মাঝে মাঝে ইতস্তত ঘরে বেড়ানো নাইট-নার্সদের কাছে গিয়ে জানতে চান নীচু গলায়—'রুগী কি ঘুমোচ্ছে? এখনও অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে কি?'

মেট্রন খুব কড়া লোক, রুগীর ঘরে আত্মীয়-স্বজনের উপস্থিতি একেবারে পছন্দ করেন না।

'এত ভিড় কেন গেটের কাছে!' রামদুলাল দত্ত নিজের মনেই বলে উঠলেন। গাড়ি থামামাত্র দু-চারজন লোক শশব্যস্ত হয়ে ছুটে এলো সামনে। অ্যাক্সিডেণ্ট। তিনতলার বারান্দা থেকে লতিকা দত্ত বলে একজন নার্স নীচে পড়ে গেছে। না, প্রাণ নেই। মাথার পেছনটা একেবারে থেঁতলে গেছে। কি করে পড়ল? সেটাই আশ্চর্য, কেন না বারান্দার রেলিং বুক সমান উঁচু। অনেক দিন আগে একজন রুগী বুঝি লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল, তারপর সাবধান হয়ে নতুন লোহার রেলিং বসানো হয়েছে। তবে কি এটাও আত্মহত্যা?

সিনিয়ার নার্স মলিনা মিত্র রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুছে স্থিরগলায় বললেন—'না, আত্মহত্যা বলে মনে হয় না আমার। লতিকাকে আমি খুব ভালো করেই চিনতাম। এক পাড়াতেই আমাদের বাড়ি। বিধবা মা, চার-পাঁচটি ছোট ছোট ভাই ও বোনের জন্য বেচারী আপ্রাণ খাটতো। এমনও হয়েছে, এখানে সারাদিন কাজ করে রাত্রিবেলা মেট্রনকে লুকিয়ে প্রাইভেট রুগীর কাছে নাইট-ডিউটি দিয়েছে। ওকে এখানে পার্মানেণ্ট স্টাফে ঢুকিয়ে নেওয়ার কথা হয়েছিল, আগামী মাস থেকেই তাহলে ওর দেড়শ' টাকা মাইনে হয়ে যেতো। আত্মহত্যা ও করতেই পারে না।'

'তাহলে?' রামদুলাল দত্ত ভুরু কুঁচকে তাকালেন। উত্তর পাওয়া গেল না।—'ঘটনাস্থলে কেউ ছিল কি?'

মলিনা মিত্রের নির্দেশে একটি অল্পবয়সী মেয়ে জড়োসড়ো পায়ে মুখ নীচু করে এসে দাঁড়ালো। অনভ্যস্ত নার্সের পোশাকে, তার চলাফেরায় প্রচুর আড়ষ্টতা রয়েছে। নাম, সুরমা বিশ্বাস।

'আমি একটু আগে তিনতলায় দশ নম্বর কেবিনের পেশেণ্টের টেম্পারেচার নিতে গিয়েছিলাম। দশটায় যাওয়ার কথা, তখন বোধহয় সাড়ে দশটা হয়ে গেছে। মেট্রন রাগ করবেন ভেবে আমি খুব তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আচমকা হঠাৎ ধাক্কা লাগে। অত রাত্রিতে ওপরে বাইরের ভিজিটারের যাওয়ার নিয়ম নেই, যদিও স্পেশাল পারমিশন নিয়ে কেউ মধ্যে মধ্যে আসেন। তবু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?'

'আমি একজন ডাক্তার। আপনাদের চোদ্দ নম্বর ঘরের পেশেণ্টের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। আমার নাম ডাঃ বসাক।' খুব নীচু গলায় জবাব দিয়ে ভদ্রলোক তরতর করে নীচে নেমে গেলেন।

'কি বললেন—ডাঃ বসাক!' রামদুলাল দত্ত আশ্চর্য হয়ে তাকালেন—'কি রকম চেহারা মনে আছে কি?'

ভীতু ভীতু চোখে মাথা নাড়ল মেয়েটি।

এত কথা যে এতক্ষণ বলতে পেরেছে, সেই ওর পক্ষে যথেষ্ট। এখন যেন অনেক দূর ছুটে আসার পরে দম নেওয়ার জন্য হাঁপাচ্ছে।

'ঠিক করে ভেবে বলুন—লোকটি রোগা না মোটা, লম্বা না বেঁটে, মাথায় চুল আছে, না আমার মত প্রকাণ্ড টাক।'

সুরমা বিশ্বাস অসহায়ের মত মাথা নাড়লো। সিঁড়ির ঠিক ঐ খানটিতেই আলোর বাল্ব কেটে গেছে। অন্ধকার ওখানে জমাট হয়েছিলো। অস্পষ্ট একটা ছায়া ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে সে পায় নি।

'তারপর?'

'তারপর আমি লতিকাদিকে দেখলাম, খুব ব্যস্ত হয়ে মেট্রনের জন্য কফি নিয়ে

ঢুকছে। আমার সঙ্গে আবার প্রায় ধাক্কা লাগার জোগাড় হয়েছিল। সাধারণত খুব হাসি-খুশি থাকে লতিকাদি, আজ আমাকে দেখে কেবল বলল—'আমি হয়তো ছুটি নিয়ে এখন চলে যাব। শরীরটা ভালো লাগছে না। দেড়টার সময় মেট্রন ঘণ্টা দিলে একটু খেয়াল রাখিস।' দুদিন ধরেই ওর মুখ চোখ কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছিল। শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে সকলেরই, ভাবলাম লতিকাদিও বোধহয় জ্বরে পড়বে। আমার কাজ শেষ করে যখন নীচে যাচ্ছি, দেখলাম বারান্দার একধারে দাঁড়িয়ে লতিকাদি কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইছে। এই টেলিফোনে মেট্রন ছাড়া আর কেউ হাত দেয় না। আর লতিকাদিকে কখনও নিয়ম ভাঙতে দেখে নি। যাই হোক, দোতলায় তিন নম্বরে যে মেয়েটির পরশু বাচ্চা হয়েছে, ইলাদি তাকে দেখাশুনো করছে। কাজ কম, কারণ বাচ্চাটা রাত্তিরে একবারও ওঠে না। ইলাদি আমাকে গল্প করার জন্য মাঝে মাঝে ডেকে নেয়। সেখানে যাব মনে করে নীচে নামছি, হঠাৎ সেই ডাঃ বসাকের সঙ্গে আমার দেখা। একটু হেসে তিনি বললেন—'একটা দরকারী জিনিস ফেলে এসেছিলাম।' না, আমি এবারেও ওঁর মুখের দিকে তাকাই নি। শুনেছি উনি একজন মস্ত বড় ডাক্তার তাই পাশ কাটিয়ে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর—'

তার কিছুক্ষণ পরেই নার্সিংহোম শুদ্ধ লোক বাইরে মালি আর দরোয়ানের ঘরের কাছে অস্পষ্ট কোলাহলের শব্দ পায়। লতিকা দত্তের তালগোল পাকানো শরীরটা তিনতলা থেকে জড়ো করে রাখা ইটের স্তূপের ওপরে পড়ে রয়েছে। জমাট কালো রক্তের ধারা আরও বীভৎস করে তুলেছে দৃশ্যটা।

'মেট্রন কোথায়?' রামদুলাল দত্তের হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল লতিকা দত্তের ক্লান্ত সুরে বলা কথাগুলো।

'ও—কি হয়েছে বুঝতে পারছি না।' মলিনা মিত্র দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বললেন—'আমাদের অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ান ডাঃ সান্যালকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।'

আমি খবর পেয়ে আগে মিস দত্তের ডেড বডিটা পরীক্ষা করে দেখি। তারপর মেট্রনকে খোঁজ করে শুনি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কোন রকম স্লিপিং ড্রাগ খুব হেভি ডোজে ওঁকে বোধ হয় দেওয়া হয়েছিলো। ফলে একেবারে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন। না, ভয়ের কোনো কারণ নেই যদিও।'

'আর সমরেশ সরকার?' তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন রামদুলাল দত্ত। 'ওঁকে কোন রকম ওষুধ খাওয়ানো হয় নি তো এর মধ্যে।'

সিনিয়ার নার্স মলিনা মিত্র মাথা নাড়লেন। মেট্রনের নিজের দায়িত্ব, অন্য কেউ মাথা গলাতে সাহস পাবে না। তবে ঘুমের আগে মাইল্ড ডোজে রোজই ব্রোমাইড মিক্সচার ওঁকে দেওয়া হয়। দিনের নার্স ডোরা ডিসুজা ডাঃ বসাকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ডিনারের পরে একদাগ খাইয়ে তবে বাড়ি গেছে।

'আমার বিশেষ অর্ডার রইল, সমরেশ সরকারের ঘরে যে-সব ওষুধ, পাউডার, পিল আছে, সব একজায়গা করে এখানে দিয়ে যান।' মলিনা মিত্রের দিকে ফিরে তাকালেন রামদুলাল দত্ত—'ঐ ওষুধ আর খাওয়ানো চলবে না। আর মিস সুরমা বিশ্বাস, আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনিই লতিকা দত্তকে শেষবারের মত জীবিত অবস্থায় দেখেছেন, এবং সম্ভবত খুনীর সঙ্গেও দু-দুবার মুখোমুখি হয়ে কথাও বলেছেন। আপনাকে মাথা ঠাণ্ডা করে আরও একবার আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।'

চোদ্দ নম্বর ঘরের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হোল। একমাত্র মলিনা মিত্র ছাড়া আজ ও ঘরে আর সকলের 'প্রবেশ নিষেধ' জারী করে গম্ভীর মুখে রামদুলাল দত্ত মালি ও দরোয়ানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে নীচে নামছিলেন।

'কিন্তু চার্টে রয়েছে—দেড়টায় পেশেণ্ট উঠলে তাকে একদাগ মিক্সচার দিতে হবে, আর ভোর পাঁচটায় চায়ের সঙ্গে একটি পুরিয়া।' মলিনা মিত্র বিপন্ন মুখে বললেন—'ডাঃ বসাকের স্পেশাল অর্ডার ওষুধ খাওয়াতে যেন কোন গণ্ডগোল না হয়।'

'আর পুলিশের স্পেশাল অর্ডার হোল—পেশেণ্টকে আমাদের হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত কোন ওষুধ দেওয়া চলবে না। শুধু ওষুধ নয়, ও ঘরের ফ্লাস্কে রাখা জলও দেবেন না। নিজের হাতে জল ফুটিয়ে বোতলে ভরে রাখুন, চা বা কোকো নিজের হাতে তৈরি করে দিন, কারো ওপর নির্ভর করবেন না।'

লতিকা দত্তের শরীরটাকে স্ট্রেচারে করে তুলে নিয়ে গেল পোস্টমর্টেম করার উদ্দেশ্যে, তারপরেই নার্সিং-হোমের আবহাওয়া আগেকার মত ঝিমিয়ে পড়ল। মলিনা মিত্রের বয়স হয়েছে। আগে তিনি ইংরেজ মেট্রনের অধীনে কাজ করে ডিসিপ্লিনের মর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কৌতূহলী অল্পবয়সী নার্সের দল নিজেদের কাজ ফেলে জটলা করে, গুজবে মেতে উঠবে, এ তিনি ভাবতেই পারেন না। দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই ভিড় হাল্কা হয়ে গেল, ঘড়ির কাঁটাও ঘুরতে সুরু করল নিয়ম মত। সাড়ে বারটায় হার্টের রুগীটিকে ইনজেকশন দেওয়ার কথা। সতেরো নম্বরে টাইফয়েডের কেসটা খারাপের দিকে বাঁক নিয়েছে, মাথায় আইসব্যাগ দিতে হবে, ন' নম্বরের পেশেণ্টকে লেবার-রুমে যে কোন মুহূর্তে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। নিজে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেই মেশিনের চাকা ঠিকমত ঘুরবে না। মলিনা মিত্র নিজের মানসিক অবসাদের কথা ভাবতেই ভুলে গেলেন। এক-একবার মেয়েটার মুখ উঁকি দিয়ে যাচ্ছিল মনের মধ্যে। তিনিই জোর

করে ওকে নার্সিং শেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এজন্য কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না বেচারীর।

* * *

সুরমা বিশ্বাসের ডিউটি ইলা হালদারের উপর পড়েছিল। তিন নম্বরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে দেখে নিলো মা ও বাচ্চা দুজনেই ঘুমোচ্ছে। ঘুম ভাঙলেও ক্ষতি নেই, মাথার কাছে বেল টিপে দিলে স্টাফ-রুম থেকে কেউ না কেউ খোঁজ নিতে আসবে। তিনতলায় দশ নম্বরের মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের কাল অ্যাপেনডিক্স অপারেশন। তাঁকে এখন একটা ক্যাপসিউল খাইয়ে ভোরবেলা মরফিন ইনজেকশন দেবার কথা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গা ছম্ ছম্ করছিল সুরমার কথা ভেবে। বাল্বটা কেটে গেছে। অন্ধকারে ভালো করে কিছুই দেখা যায় না। এখানেই একটু আগে অস্পষ্ট আবছা একটা মূর্তি দেখেছিল সুরমা। যদি আবার তাকে দেখা যায়!

'কে? কে ওখানে?' হঠাৎ সমস্ত শরীর আড়ষ্ট করে ইলা বলে উঠল। স্পষ্ট একটা ছায়া নেমে আসছে তিনতলা থেকে।

'আমার নাম ডাঃ বসাক—' ছায়ামূর্তি জবাব দিলো। সুরমা বলেছিলো, সেই অচেনা সন্দেহজনক মানুষটির নামও, ডাঃ বসাক। গলার কাছে কে যেন একখণ্ড পাথর পুরে দিয়েছে। কি করবে সে? চিৎকার করে ডাকবে কাউকে? কিন্তু সমস্ত ঘরে রুগীরা এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। তাদের শান্তিভঙ্গ করাও যে অমার্জনীয় অপরাধ।

'লতিকা দত্তের হাত-ব্যাগটা আমাকে একটু এনে দিতে পারেন। মানে যে ব্যাগে ওর বাড়ি-ফেরার পোশাক আর অন্য টুকিটাকি থাকতো। চুপ, খুব সাবধান লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে আসুন; কেউ যেন টের না পায়। আমি আপনাদের ঐ তের নম্বরের ঘরে অপেক্ষা করছি। ও ঘরটা দেখছি খালিই পড়ে আছে—।'

যন্ত্রচালিতের মতো ঘাড় নাড়লো ইলা। কাঁধে একটা কাপড়ের থলি ঝুলিয়ে আসতো লতিকা, তাতে একখানা রঙিন শাড়ি, দু-একখানা ফিল্মের ম্যাগাজিন আর নীল প্ল্যাস্টিকের একটা ছোট ব্যাগ থাকতো। স্টাফ-রুমে দেওয়ালের পেরেকে এখনও থলিটা ঝুলছে। ওটার কথা কারো মনে পড়ে নি। এমন কি লতিকার ছোট ভাইরেরও নয়। সে বেচারী ছেলেমানুষ,—ভয়ে আর শকে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গিয়েছিল।

'নিয়ে আসুন চট করে। খবরদার, কেউ যেন টের না পায়।'

স্টাফ-রুমে দুজন নার্স চার্ট লিখছিল, তাদের চোখ এড়িয়ে কোন গতিকে ব্যাগটা নিয়ে এলো ইলা। চোদ্দ নম্বর ঘরের সামনে একটা টুলে পুলিশ বসে ঝিমোচ্ছে। তের নম্বরের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মৃদু আলোর রেখা দেখা যায় পর্দার আড়ালে।

ব্যাগটা হাত বাড়িয়ে ডাঃ বসাকের হাতে তুলে দিয়ে ইলা ভাবলো, দরজা এখনও অল্প একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে। অনায়াসে টেনে বন্ধ করে তারপর চাবি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। জানলায় লোহার গ্রিল লাগানো, বাথরুমের দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। না, পালাতে পারবে না কিছুতেই। কাঁপা কাঁপা হাতে চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে মলিনা মিত্রের কাছে এসে ইলা বলল—'পুলিশকে জানিয়ে দিন মলিনাদি, আমি ওকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে ফেলেছি—।'

'কাকে?' মলিনা মিত্র ইলার উত্তেজিত মুখের দিকে অপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাকালেন।—আজকের ঘটনার পরে এদের যেন হিস্টিরিয়া রোগে ধরেছে।

'লতিকাকে যে লোকটা মেরেছে—।' ইলার গলার স্বর উত্তেজনায় অস্বাভাবিক শোনালো। (ক্রমশঃ)

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

লক্ষ্ণৌ যাদুঘরে রক্ষিত এই প্রাচীন ভাস্কর্যটি ভারতীয় কেশবিন্যাসের একটি ঐতিহ্যময় সাক্ষ্য। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্য্যের।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-২৯।

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১২শ সংখ্যায় (১৩৭১—২৮শে শ্রাবণ) মূল্যবান বিষয়বস্তু নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, নাম 'সিপাহী বিপ্লব ও বাঙালী'—লেখক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখাটির বিষয়বস্তু নিয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। লেখক শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বাধীনতাকামী সিপাহীদের প্রতি বাঙালীর সহানুভূতি ছিল না, তা মনে করা ভুল হবে। পূর্বে এবং পরে স্বদেশ-প্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু মধ্যবর্তী এক বছরের জন্য একটা জাতির চরিত্র বদলে যেতে পারে না।'

অতি খাঁটি কথা। সঙ্গে সঙ্গে এও ঐতিহাসিক সত্য যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে তৎকালীন ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত বাঙালী-সমাজ ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন বলে বরণ করে নেয় নি। তার সাহিত্যে, কল্পনায় এবং কার্যক্রমে এ বিদ্রোহ বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে নি। ওই বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা গৌণ। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' এবং সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেনের নাম উল্লেখ করেছেন এবং অত্যন্ত সমীচীনভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, 'আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত শ্যামসুন্দরের নাম উল্লেখ করা হয় নি।' শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এদিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান।

কিন্তু, কেন তৎকালীন বাংলার বৈদগ্ধ্য এবং স্বদেশপ্রেম ১৮৫৭ সালের এত বড়ো একটি বিপ্লবাত্মক ঘটনাকে প্রাধান্য বা সক্রিয় সহানুভূতি দান করতে পারলো না? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন প্রমুখ বাংলার হৃদয়বান মনীষীরা ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক ছিলেন কিম্বা ইংরেজ শাসনকে স্বাধীনতার উর্ধ্বে স্থান দিতেন—একথা চিন্তা করাও পাগলামি। অথবা যেহেতু কোন বাঙালী রেজিমেণ্ট ছিল না কিম্বা নাম করার মত কোন বাঙালী সিপাহী ছিল না বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে, সুতরাং এ আন্দোলনে উপেক্ষা বা বিতৃষ্ণা দেখিয়েছেন তৎকালীন স্বদেশপ্রেমিক মনীষীরা—এও যদি আমরা মনে করি, তবে চরম অবিচার করা হবে ওই স্বনামধন্য বাঙালীদের উপর, কুৎসিত প্রাদেশিকতা বা সাম্প্রদায়িকতার দোষে তাহলে দুষ্ট করা হবে ওই যুগের উদারচেতা মার্জিত বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বকে। হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা বিদ্রোহকে সমর্থন করে নি, যদিও বিদ্রোহী সিপাহীদের বিচারকালে ইংরেজ শাসন ও বিধানের কাছে ইংরেজ জাতির নিরপেক্ষ আইনানুগ বিচারপদ্ধতির কাছে বলিষ্ঠ আবেদন জানিয়েছে। অথচ এই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তৎকালীন নীল-চাষ রদ আন্দোলনে কতবড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, নীলচাষীদের দুঃখ ও বঞ্চনাকে নীলচাষের মালিক সাহেব-দের অত্যাচার ও শোষণকে সর্ব-লোকের গোচরে আনবার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কতবড়ো ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন হরিশচন্দ্র,—এ তো আমরা জানি।

এ কি শুধু এই কারণে যে, নীলচাষীরা বাঙালী এবং হরিশচন্দ্রের সকল সহানুভূতি জমা ছিল বাংলার জন্যে? আমরা নিশ্চয়ই একথা মনে ভাবি নে।

এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জানতে হলে দুটি জিনিস সম্বন্ধে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রথমত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি, দ্বিতীয়ত বাংলার রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ধারা ও বৈশিষ্ট্য—যার পটভূমিকায় রয়েছে একটি বিরাট জীবন, অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়। আমরা জানি, এ রেনেসাঁতেই নিহিত রয়েছে বাংলার তথা ভারতের পরবর্তী জাতীয়তা আন্দোলনের প্রারম্ভিকা। এবং এও জানি যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ—তা সে যত বড়ো ঐতিহাসিক ঘটনাই হোক না কেন, বাংলার তৎকালীন স্বদেশচিন্তায় কোন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারে নি।

কেন পারে নি, সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করতে গেলে এ লিপির কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে।

অমূল্য সেন
অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

* * *

সাপ্তাহিক বসুমতী সত্যিই একখানি সুন্দর পত্রিকা। এর স্থায়ী স্তম্ভগুলি—ভারতদর্শন, বঙ্গদর্শন, শহর কলকাতা, আন্তর্জাতিক ও সম্পাদকীয়—প্রত্যেকটিই অত্যন্ত আকর্ষণীয়। পত্রিকাটির নিজের একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং বাংলার বর্তমান অন্য পত্রিকাগুলি থেকে স্বতন্ত্র—তাই অতি শীঘ্রই গড়ে তুলতে পেরেছে একটি গুণমুগ্ধ পাঠকমহল। সত্যকে সহজ ও সুন্দরভাবে পরিবেশন করাতে এ পত্রিকা করে নিয়েছে নিজের স্থান সবার শীর্ষে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এর 'আন্তর্জাতিক'টি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি, সমস্ত বিশ্বের সর্বাধুনিক খবর এমন সুন্দরভাবে আলোচিত শুধু বাংলা কেন, অন্য কোন ভাষার পত্রিকাতেও হয় কিনা সন্দেহ। এই স্তম্ভটা যিনি পরিবেশন করেন, তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

পত্রিকাটিতে মাঝে মাঝে এক-আধটা হাসির গল্প ও কিছু বৈজ্ঞানিক আলোচনার কথা থাকলে খুবই ভাল হয়। সাপ্তাহিক বসুমতী একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর পত্রিকা হয়ে গড়ে উঠুক—এই কামনা করি।

শ্রীত্রিদিবকুমার রায়
২৬৩, ইঞ্জিনীয়ার্স হোস্টেল
পোঃ ধুরুয়া—রাঁচি

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'জার টাকাকড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকাকড়ি নাই সেই প্রাণে মরে ।।'

টাকাকড়ি সবার ঘরে ছিল না। টাকার সঙ্গে কড়ি লোকে আজীবন চলে আসছে তাই বলে, কিন্তু এ গ্রামে ক'জন বা কাঁচাটাকার কারবার করে অভ্যস্ত, হাতে গোণা যায়। বাসন-কোসন, গায়ের অলঙ্কার, গোলার ধান সম্পত্তি বলে গণ্য। হাটে-বাজারে গ্রামদেশের মানুষ খাদ্যবস্তু কেনে ক্বচিৎ। চাল কিনে খায়, সেজন বড় দুর্ভাগা এ কথা ঘরেপরে শোনা যায়। ক্ষেতে উঠোনে সব্জী, পুকুরপাড় থেকে বৃদ্ধা দাসী চুপড়ি ভরে শাক তোলে, জেলে কড়ির বদলে মাছ জোগায়। গন্ধবণিক মশলা দেয় কড়িতে, তিলিঘর থেকে তেল আসে কড়িতে। সরস্বতী পুজোয় জেলে মাছ জুগিয়ে 'সাইৎ' করে দাম নেয় কড়িতে, তা ছাড়া পুজোয় বস্ত্রদানে তুষ্ট রাখতে হয়।

খাজনা চাষী দেয় ধানে, জমিদার দেন টাকায়। আঁধারমাণিক গ্রামের লোক টাকা যখনই সংগ্রহ করে তখনই মাটিতে পোঁতে, সিন্দুকের কলসীতে রাখে, দেবস্থানের কুলুঙ্গিতে, ঢেঁকশেলের কোণে, আদাড়ে জায়গায়।

বর্গীর ভয়ে যে বের করে দেবে, এমন টাকা সবার হাতে কই। গোয়ালে গরু, গোলায় ধান, ঘর-সংসারে লক্ষ্মীশ্রী, অথচ কাঁচাটাকা সামান্যই হাতে, এ কথা শুনে সদ্গোপ পাড়ার নিতাইকে ঘোড়ার পায়ে বেঁধে নিয়ে গেল টেনে।

সুরকণ্ঠ ভেবেছিলেন দরিদ্রের ঘর দেখে ওরা আর এদিকে আসবে না। কিন্তু বর্গীরা ধানের গোলা এবং উঠোনে ছোলা, লঙ্কার গাদায় ঘোড়া ছেড়ে দিলে। নিজেরা তলোয়ার হাতে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। টাকা, অলঙ্কার, রূপোর বাসন, যা পায় তাই নেয়। যে দিতে পারে না তারই লাঞ্ছনা। মুখে 'হর হর' আর চোখে সন্ধানী ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। কারো কথায় বিশ্বাস করে না, নিজেরা দেখে আঁতি পাঁতি খুঁজে, তাদের তাড়া আছে। গ্রাম এই একটাই নয়।

সুরকণ্ঠ যখন দেখলেন ওরা তাঁর বাড়ির দিকে আসছে, তখন মন থেকে জোর করে ভয় তাড়ালেন। ফুলেশ্বরী তাঁর শরণাগতা তা ছাড়া পিসীমা, পাগল, চোরকুঠরীতে বিনে-বাতাসে ওরা বোধহয় জ্ঞানই হারাল।

তাঁর খিড়কি দেখে পরিত্যক্ত বাড়ি মনে করে ওরা চলে যাচ্ছিল। সুরকণ্ঠ এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা লাফিয়ে আগড় টপকে ঢুকল।

বয়স্ক লোকটি লক্ষ্য করে দেখলে

সুরকণ্ঠের গৈরিক বস্ত্র, কাঁধে প্রলম্বিত চাদর, গলায় মোটা উপবীত, রুক্ষ, দীপ্ত চেহারা। সে বললে, 'ব্রাহ্মণ?'

সুরকণ্ঠ বললেন, 'ব্রাহ্মণ।'

তারপর, তিনি যেন পাথর বা গাছ, এইভাবে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে লোকটি ঢুকল। সুরকণ্ঠ দেখতে লাগলেন ওরা এঘর থেকে ওঘর যাচ্ছে। তাঁর সব ঘরেই তৈজস পুরনো মাদুর, সম্পত্তি মাটির হাঁড়ি, পেতলের কড়াই, ঠাকুর সেবার স্বল্প ক'টি বাসন।

সুরকণ্ঠ দেখলেন তাঁর শোবার ঘর খুলেই ওরা দাঁড়িয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল বুঝি কখন ফুলেশ্বরীরা এসে ওঘরে ঢুকেছেন, তাঁদের দেখেই ওরা দাঁড়াল। তারপরই বুঝলেন তা হতে পারে না। বেরিয়ে এলে ওদের উনি দেখতে পেতেন। তাঁর শোবার ঘরে সামান্য তৈজস, শোবার জন্য মেঝেতে গাঁথা বাঁশের মাচা, জলচৌকির ওপর তাঁর কাগজ, কলম, শিকেয় ঝোলানো পুঁথিপাটা, মেঝেতে খড়ির দাগ, আঁক কষা। একজন নাগরা পরা পা আঁকের ওপর রাখল, শিকেয় খোঁচা দিল।

ঝুর ঝুর করে খসে পড়ল পুঁথির পাতা, ভৃগুমণ্ডলীর নির্দেশ অনুযায়ী কষা রাশি রাশি আঁক, কাঠের পাটায় জড়ানো তুলোট কাগজের কোষ্ঠীপত্র। এ গ্রামে এবং আশে পাশে গত বিশ বছরে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এবং কৃচিৎ অন্যান্য জল-চল জাতের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নবজাতক জন্মো নি যার কোষ্ঠী এখানে ছিল না। আরো কত রাজ-পুরুষ, সম্মানিত ব্যক্তি, দূর-দূরান্তের বড় বড় শহরের।

সুরকণ্ঠের অজানতে নিশ্বাস পড়ল শব্দ করে, বুক কাঁপিয়ে। সাধনা, সারাজীবনের সাধনা। ধন-মান প্রত্যাশা করে নি যে, আসক্তির আগুন যার বুকে জ্বলে, সে আগুন চাপা দিতে যে শঠপাঠ সাধন-আরাধনার ভস্ম লেপে রাখে এমন একটি লোকের সাধনা।

কিছু না পেয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করে ওরা বেরিয়ে এল। ওদের চোখ দিয়ে সুরকণ্ঠ দেখলেন নিজের বাস-গৃহকে। জীর্ণ, প্রাচীন, দরিদ্র। মনে মনে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানালেন

ওরা বেরিয়ে গেল। সুরকণ্ঠ ওদের পেছন পেছন বেরুলেন। পথে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন ব্রাহ্মণপাড়ায় আর্তনাদ, কলরব, হৈ হৈ। পল্লীর পর পল্লীতে আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ফিরে এলেন। এতক্ষণে মনে পড়েছে পাগলদের বের করতে হবে।

অবসন্ন ফুলেশ্বরী শুকনো মুখে সুরকণ্ঠের পিসীমার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছেন। পাগল একটানা কেঁদে চলেছে উঁউঁ, বিলাপের স্বর একই লয়ে চলে। ওঠানামা নেই।

'বাইরে এস।'

'ভাগ্যি, উনি অনেকক্ষণ থেকেই অচেতন, এত যে ডাকছি।' সুরকণ্ঠ ঘরে ঢুকলেন। এখন ঘরে আর জায়গা নেই। একটু নড়তে গেলে গায়ে গায়ে ঘষে যায়, সুরকণ্ঠ নির্নিমেষে দেখতে লাগলেন পিসীকে।

'কি দেখ?' পাগলের সভয় প্রশ্ন।

'পিসীমার হয়ে গেছে।'

'কি বললে?'

'হয়ে গেছে। গরমে, ভয়ে, বাতাস পান নি, দম আটকে।'

সুরকণ্ঠের স্বর ভাবলেশহীন। যদিও, বুকের দিকে চাইলে দেখা যায় বুক জোরে জোরে উঠছে নামছে, যত বৃদ্ধ এবং জরাগ্রস্তই হন না কেন, পিসীমার মৃত্যু তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি দু'হাতে জাপটে পাঁজাকোলা করে পিসীকে তুললেন এবং সোজা নিয়ে গেলেন অন্দরের ঘের আঙিনায়, যেখানে আপনাহতে বীজ ছড়িয়ে একটি তুলসী গাছ তুলসীবন করে ফেলেছে, শোয়ালেন সেখানে।

বৃদ্ধার শরীর দেখে এখন সুরকণ্ঠের মনে হল কি পবিত্র, শ্বেত অর্জুন কাঠে রচা শায়িত মূর্তি যেন, জীর্ণ ক্ষেমবস্ত্র সরালে দেখতে পাবেন শুধুই সাদা ফুল, বক্রেশ্বরে এক সন্ন্যাসীর কাছে কোন মহাত্মার দেহরক্ষা সম্পর্কে যেমন গল্প শুনেছিলেন।

রাত্রির উৎকণ্ঠা উদ্বেগ, সামনে মৃত্যুর দৃশ্য ফুলেশ্বরীকে বিচলিত করল। অন্যসময় হলে ডাক দিয়ে কাঁদতেন, কিন্তু এখন বাইরে গোলমাল দুর্বিপাক চলেছে, আবার এই সব কিছুর মধ্যে সুরকণ্ঠের নির্জন অঙ্গনে, তুলসীগন্ধ বনে, বৃদ্ধার এ মৃত্যুদৃশ্য যেন সবরকম উচ্ছ্বসিত আবেগকে তর্জনী তুলে নিষেধ জানাচ্ছে। তবু ফুলেশ্বরীর দুঃখ হল। এমন বৃদ্ধবয়সে দুচোখে তুলসীপাতা দিয়ে বাঁশের দোলায় হরিধ্বনিসহ যাবার কথা ছিল।

সবাই তাই গিয়েছে, তাই যায়। আঁধারমাণিক গ্রামে জন্ম-মৃত্যু সবই সামাজিক ঘটনা। কিছুই সমাজের বাইরে নয়। যদি কেউ জোর করে বলে, যেমন ফুলেশ্বরীর বাবা বলেছিলেন, মরেছে আমার বউ, তাতে তোমাদের কি! তাতেও সমাজ সরে থাকবে না। বিয়েতে যেমন পাঁচজন এসে দাঁড়িয়ে শুভকাজ কমিয়ে দেয়, মৃত্যুতেও তাই। শেষ সময়ে আগে থেকে পাড়া-প্রতিবেশী আসবে, ধরাধরি করে তুলসীতলায় নামাবে, ছুঁয়ে থাকবার কালে ঘিরে বসে থাকবে এবং স্নানান্তে আবার তাদের কত কাজ, অশৌচের হাঁড়ি ফেলা, ঘর ধোওয়া, একসঙ্গে বসে চোখের জল ফেলা।

মৃত্যুর সময় থেকে জীবাত্মা আবার নিঃসঙ্গ। কিন্তু পৃথিবীবাসের শেষ-ক্ষণটুকু পর্যন্ত মানুষ দশজনের, একলার নয়। সেজন বড় দুর্ভাগা যার মৃত্যু-শোকে দশজন ভাগ নিল না, বিশেষত বার্ধক্যের মৃত্যু, হরিনাম গঙ্গাজল বিনে যদি হয়, শেষযাত্রায় যদি দশজনের কাঁধ না পড়ে

এই দুঃখটিই সবার বড় হয়ে বিঁধল ফুলেশ্বরীকে, নীরবে তিনি অশ্রু ফেলেন।

পাগল এতক্ষণ অবাক হয়ে

দেখছিল একবার সুরকণ্ঠকে, তারপর পিসীমাকে। তার মুখে চোখে ছিল ভীরু মিনতি। অন্য সময়ে, স্বস্তির দিনে, এই ঘরে দোরে পিসীমার সান্নিধ্যে সে কত দাপটে ঘুরে বেড়ায়, গৃহপালিত পশুর মত স্বচ্ছন্দে, আবদারে, দাবী জানিয়ে।

এখন বিপদের মধ্যে পড়ে বোঝা যেতে লাগল এ বাড়িতে পাগল সত্যিই আশ্রিতমাত্র। তার মুখে চোখে সে দীনতা লেখা ছিল। সুরকণ্ঠ এবং ফুলেশ্বরী তার অনেক ওপরের মানুষ, সে দীন, আশ্রিত, এঁদের কৃপানির্ভর, এ কথা তার অসহায় চাহনিতে প্রকাশ পায়। এই বৃদ্ধাকে সে বন্ধক দেবার গহনার মত, কথায় কথায় ব্যবহার করেছে। উনি আছে বলেই আমি আছি, নইলে আমার যাবার ঠাঁই গড়াগড়ি যায়, এ কথা তার ঠোঁটের আগায় থাকত।

দু'বেলা দু'থালা ভাত বাঁধা আছে, তারই জোরে তার আস্ফালন, এখন তার মনে হল এ-সংসারে তার আশ্রয়স্থল ঐ পড়ে আছেন ভুঁয়ে। মনে সংস্কার-জনিত ভয় এল নিমেষে। তাকে বুড়ি বড়ই ভালবাসত। বন্ধঘরে মরল, তারও দোষ লাগে নি ত? সুরকণ্ঠের দিকে চেয়ে সে বালকের মত প্রশ্ন করে 'তুমি কথা ক'চ্ছনা কেন? ভাল-মন্দ কিছু একটা বল।'

'এই দেখেছিলাম আমি।' সুরকণ্ঠের স্বর গম্ভীর।

'কি দেখেছিলে?' পাগল কাঁপতে সুরু করে।

'তুই আমার সঙ্গে ছিলি।'

'কবে?'

'ভয়ানক দুর্যোগ, সর্বনাশ প্রাণহানি।' বলতে বলতে সুরকণ্ঠের মনে হল সেই চৈত্রের দ্বিপ্রহরেও বিশ্বপ্রকৃতি কত নিরুদ্বেগ ছিল, শান্ত, ঠিক সেই শান্তি কি আর ফিরে আসবে? যা যায় তা আর অক্ষুণ্ণ নিখুঁত হয়ে ফেরে না, নতুন হয়ে আসে। সুরকণ্ঠের মন মন্থন করে এক হাহাকার বুকের মাঝেই গুমরে রইল। নিশ্বাস ফেলে স্বগত খেদ করলেন 'এই বয়সে অপঘাত মৃত্যু।'

'অপঘাত মৃত্যু কেন?' ফুলেশ্বরী কাতর হয়ে প্রশ্ন করেন।

'এ মৃত্যু ত স্বাভাবিক নয় ফুলি।'

সুরকণ্ঠের কথা যেন আঘাত করে পাগলকে। অবোধ ক্ষ্যাপার মত সে এর দিক থেকে ওর দিকে চেয়ে সহসা চেঁচিয়ে ফুকরে কেঁদে ওঠে 'পিসীমা তুমি কোথায় গেলে, আমায় ভাসিয়ে গেলে গো।'

কিছুক্ষণ বাদে, পাগলের কান্না প্রশমিত হলে ফুলেশ্বরী কাতর হয়ে বলেন, 'ভাগ্না এখন উপায়?'

'উপায় বিশ্ববাসিনীতলা।'

শ্মশান-সন্নিধানে — বিশ্ববাসিনী-মন্দির, দেবতার দীঘি, বিশ্ববাসিনীর খাল। সাধারণত আঁধারমাণিকের লোক শ্মশানতলার মাঠ বলে। বিশ্ববাসিনীর নাম উচ্চারণ করে না। কেন না, এ গ্রামে বিশ্ববাসিনীদেবী বালিকা বিগ্রহ, নিঃসঙ্গতাকে ডরান, তাই কেউ অসাবধানে বিশ্ববাসিনীতলা এই নাম, মৃত্যুর ঘটনা ব্যতিরেকে উচ্চারণ করলে তাকে ঘাটসই করেন। কেউই এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নি, অথচ সবায়ের ধ্রুব বিশ্বাস— এ-রকমটা ঘটে।

'তবে লোক ডাক', ফুলেশ্বরী অস্ফুটে বলেন।

'রও, গ্রামটা আগে দেখে আসি কি অবস্থা। তোমরা সাবধানে হয়ে থাক, কোন লোক আসছে মনে হলেই কুঠুরীতে যেও।'

কিন্তু সুরকণ্ঠের পিসীমাকে দাহ করতে আসে এমন সময় তখন কারো নেই। একটু এগিয়ে সুরকণ্ঠ থমকে দাঁড়ালেন। ঘোড়ার পিঠে মানুষ দেখে সন্ত্রস্ত হলেন। সবাই হাটতলার দিকে যাচ্ছে। যাবার সদর রাস্তাও আছে, এমনি রাস্তাও আছে। সুরকণ্ঠ এর হেঁসেল, তার গোয়ালের পিছু দিয়ে চলতে থাকলেন। কিছুদূর গিয়ে বাচস্পতি মশায়ের পাঁচিল দেখতে পেলেন, পাশে পোয়াল গাদা। সেখানে গা লুকিয়ে খড় সরিয়ে দেখতে লাগলেন।

দয়ারাম দত্তের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। নেড়ামাথা এক বৈরাগী, ভিনদেশী হবে, তাকে ওরা এগিয়ে দিচ্ছে। ওদের কথা বোঝে বলে বুঝি ধরে এনেছে। সে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে চলেছে, কি বলছে? এতক্ষণে সুরকণ্ঠ দেখেন দোরের কাছে অশ্বারোহীর সামনে স্বয়ং দয়ারাম, ঘর্মাক্ত কলেবর, দরজা ঠেস দিয়ে, যেন দাঁড়িয়ে শুয়ে আছেন এমনি এলিয়ে পড়া শরীর।

'বৈরাগী নাগরার খোঁচা খেয়ে বলে চলে, 'এরা ডাকাত নয়, এরা বর্গী।'

সুরকণ্ঠ নতুন নাম শুনলেন।

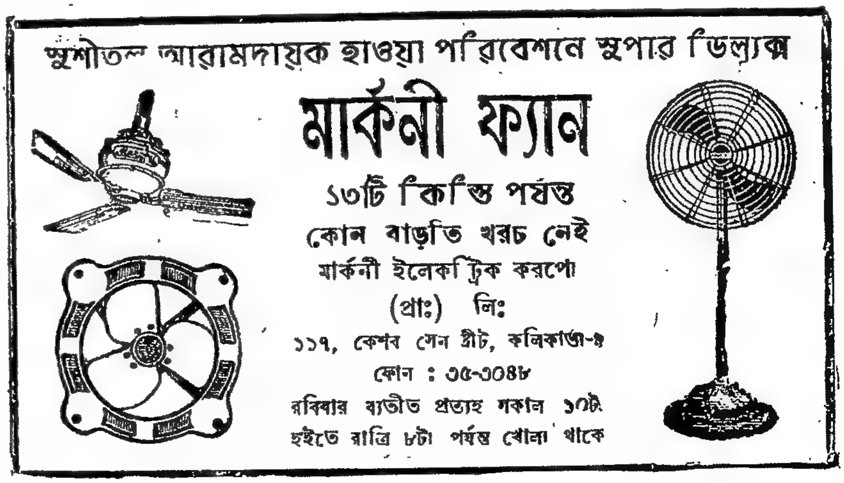

'এদেশে খাজনা নিতে এসেছে, হ্যাঁ, চৌথাই।'

'চৌথ।' সকল অশ্বারোহী সমস্বরে বলে।

'দিল্লীর বাদশার সনদ নিয়ে এসেছে, আমাদের নবাবও খাজনা দেবে, আপনারাও দাও, সোনা দাও, রূপো দাও।' তারপর বৈরাগীটি যেন আর সহ্য করতে পারলে না। আর্তকণ্ঠে বললে, 'দিয়ে দাও না কর্তা, নইলে ধনে মারবে, প্রাণে মারবে, আহা আমা হতে কত গিরস্তের প্রাণ গেল, আমি দুঃখে বড় ডরাই গো!'

তারপর 'হর হর' শব্দে বর্গীরা বাড়িতে ঢুকে পড়লে, সয়ারামের ওপর দিয়ে ঘোড়া চলে গেল। বৎসরে বৎসরে আঠারো হাত দশভুজা সয়ারামের বাড়িতে পূজা পান, বিসর্জনকালে প্রতিমা বের করা হ'বে বলে দেউড়ি উঁচু। পাঁচ-সাতশো লোক সে সময়ে বসে যাত্রা শোনে, আঙিনা ততবড়। এখন সবই ভরে গেল ঘোড়-সওয়ারে, আর সবাই যখন পিলপিলিয়ে ঢুকছে, ভেতরে যখন আর্ত নরনারী-শিশুর চীৎকার শোনা যাচ্ছে 'বাঁচাও, বাঁচাও,' তখন বৈরাগীটি উল্টোদিকে এক ছুট মারলে।

ওদিকে অশ্বারোহীরা তলোয়ার খুলে তাড়া করে আসছে, হাটতলায় যত ধূলো ওড়ে, তত ত্রস্ত মানুষ ছুটে বাঁচতে চেষ্টা করে, ওরা সব স্বুবর্ণ-বণিক। মেয়েদের হাত, গলা ও কান থেকে গহনা ছিঁড়ে নিচ্ছে, শিশুদের ভাগ্য ও মল। সদগোপ পাড়ার নিতাই-এর বোনকে দুজন হাসতে হাসতে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে স্বুরকণ্ঠ 'রাম রাম' বলে চোখ ফেরালেন।

ওদিকে বসে বসে কুলেশ্বরী স্বুরকণ্ঠের বিলম্ব দেখে চিন্তায় মরছিলেন। কিঞ্চিদধিক তিনদণ্ড বাদে স্বুরকণ্ঠ এলেন। মুখ শুকনো, চোখ লাল।

'এত দেরি করে? এদিকে পিসীকে গিঁপড়ে খায়' অনুযোগ করতে গিয়ে কুলেশ্বরী থেমে গেলেন। আস্তে আস্তে ভয়ে বললেন 'কি দেখলে?'

'কিছু না। পাগল, কুড়োলখানা দে।'

'কেন, তুমি ডাকাত মারতে যাবে না কি?'

'উঠোনের কাঁঠালগাছ কাটব।'

'কেন? ভাগ্যি তুমি কি পাগল হলে? আমি কমনে দাঁড়াব?'

'পিসীকে বাড়ির চৌহদ্দিতে পোড়াব। ঘাটগতি আর করবার উপায় নেই।'

'আগুন দেখা যাবে যে।'

'হুঁ, এমন আগুন এখন কত উঠবে আকাশে, মজাটা দেখ না।'

সত্যিই তাই। স্বুবর্ণবণিক পাড়া, গন্ধবেণেদের পাড়া থেকে আকাশে ধোঁয়া উঠছে, ছাই উড়ছে, বাঁশের ফটফট শব্দ। এ-গ্রামের যত পাখী, আগুনের ভয়ে সব আকাশে উড়ল।

(ক্রমশঃ)

এক দুই

সুশীলকুমার গুপ্ত

সুচন্দ্রা, তুমি যখন এলে আমি তখন একেবারেই
প্রস্তুত ছিলাম না। মনে পড়ছে—ছিদাম মুদি লেনে
ভাড়াটে বাসা, অগোছালো সংসার। তোমাকে এনে
বসালাম ভাঙা চেয়ারে, আমিও কাছেই
বসে পড়ে কি বলতে গেলাম; কিন্তু কথার খেই
হারিয়ে গেল কলিংবেলের শব্দে। খাতাটা টেনে
পড়তে সুরু করলে; আমি একটা কটাক্ষ হেনে
গেলাম টেলিফোন ধরতে, এসে দেখি তুমি নেই।

আজ আমি প্রস্তুত। ঝাউ-ঘেরা লেকের ধারে
জাহাজের মতো বাড়ি, রেডিওগ্রাম, খুব দামী
কাচের পাত্রে মাছ, রেফ্রিজারেটর, নীল আলোর ঝাড়ে
ফুলের মত চোখ। কিন্তু তুমি কই? এদিকে আমি
তোমার ফটো দেখি, টব সাজাই, আর বারে বারে
হাওয়ায় চমকে উঠি; ভাবি—এ সবই কি বেনামী।

সেই হঠাৎ পরিচিত পাখিটি-কে

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

মিশে মিশে সেই সব অনুপম মাধুরীর আলো
চোখের কাজল ওর কালোয় আলোয় যেন মেখেছে সোহাগে;
যাতে করে ছুটে গেছি মনের লাগাম ছিঁড়ে ওর পিছু পিছু—
যত আমি কাছে যাই মন থেকে বনে আর বনে
আমাকে সে ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় দৃষ্টির আড়ালে।
ভাবছে এম্নি করে নিয়ে গিয়ে করবে সে শূন্যে উধাও,
নিমেষে শূন্যের দেশে যেতে পারি একথা সে জানে না
জানে না,
কারণ ও মূঢ়—নীল গানে মাখা দূর বনপাখি।
ডানায় গন্ধ মুখ গুঁজে বসলো সে হাঁটুর উপর
হঠাৎ তাকেই দেখে হৃদয়ের এত কাছে হলাম অবাক।
মাথায় বুলিয়ে হাত টেনে টেনে স্নেহের গৌরব
বললাম গান গাও আলো নয় কালো এই ঘন অন্ধকারে;
হয়ত দু'ফোঁটা শান্তি, পেতে পারি স্বুরচা[illegible] গা[illegible]
তুমিই তখন হবে পৃথিবীতে প্রিয় থেকে প্রি[illegible] নাম॥

আর কোনো ভয় নেই। তেঁতুল-পাতা সেদ্ধ, শিকড় পোড়া, হরিমটর দিয়ে কটা দিন কোনমতে কাটাতে পারলেই হলো। তারপর? তারপর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেই কটা দিন পেট চেপে টিকে থাকলেই হলো। মা এবার হাতীর পিঠে আসছেন। মা দুর্গার কথাই বলছি। দুর্গার গজে আগমনের ফল হলো 'গজে চ জলদাদেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।' বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হবেন। আশার কথা বইকি।

আশ্বাস না দিয়ে উপায় নেই। মা এবার থাকবেনও একদিন বেশি। সপ্তমীপূজো দু'দিন গ্রহণ করবেন।

সবই ভালো। শুধু সেই দিনগুলিই ফুরিয়ে গেছে। সেই নানা রঙের দিন-গুলির কথা বলছি। দুর্গাপূজোর তিন-চার মাস আগে থেকে যখন দিল্লীর স্কোয়ারে স্কোয়ারে ছোকরার দল পরিকল্পনা করতো, ক'দিনের পূজোতে কত রকমের পোষাক তৈরি করাবে, কর্তামশাইরা চুপি চুপি গৃহিণীদের মন ভেজাতেন শাড়ি কেনার ফর্দ চেয়ে। তাঁদের নিজেদের পোষাক তৈরি হত ইঙ্গ-বঙ্গ কায়দায়। পূজোর পরেই শীত। দিল্লীর শীত বেজায় শীত। হাড়কাঁপুনি শীত। তাতে চাই প্রচুর শীতবস্ত্র। তাই একটু আগেই পূজোর সময় উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সব খরচার সাথে সাথে এটাও সামিল হয়ে যেতো। তাই ফরাসডাঙার ধুতির সাথে সাথে তৈরি হত থ্রী পিস স্যুট। নতুন জুতো হতো জোড়ায় জোড়ায়। মিষ্টি আসতো গোলমার্কেটের দোকান থেকে বাক্সয় বাক্সয়। মা'র পূজোর সামগ্রীর জন্য গোলমার্কেটে নতুন দশকর্মভাণ্ডার খুলে গেল।

আজ?

আজকের কাহিনী জিজ্ঞাসা করবেন না। মনে কষ্ট পাবেন, দেবেন তার চেয়েও বেশি। দেরাদুনের দু'মণি বস্তার চাল আসতো বস্তায় বস্তায়। এক বস্তার দাম ছিল চোদ্দ টাকা। ইতিহাস নয়, কুড়ি-বাইশ বছর আগের কথাই বলছি। বস্তায় বস্তায় চাল আসতো আত্মীয়-কুটুমদের জন্য। তাদের অনেককে পাথেয় দিয়ে আদর করে ডেকে আনা হত। মেয়ে-জামাই থাকে সাহারানপুর। ডাকো তাদের। ছোট বোনের নতুন বিয়ে হয়েছে মীরাটে। তাদের আনতে হবে। সম্পর্কে পাতানো মাসীমারা গাজিয়াবাদে আছেন। পূজোর ক'দিন কেন ডাকা হবে না? আর কর্তার যদি থিয়েটারে পার্ট থেকে থাকে, তাহলে নেমন্তন্নের এরিয়াটা বলা যায় না, গিয়ে ঢাকা, কলকাতা, বরিশাল, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, হুগলীর

শ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

বুড়ি ছুঁয়ে আসতে পারতো। সব পাস্ট টেন্সেই বলছি। যেমনটি আজ শুধু স্মৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার গাঁয়ের শিউলি-ছড়ানো ফেলে-আসা শারদোৎসবের ছবিগুলো।

দুটোই আজ অতীত।
রাজ্যহারা রাজার বিচিত্র কাহিনী।
আর আজ?

আজ মা-দুর্গার পূজো একটা দিন বেশি হবে বলে দিল্লীর পূজোৎসবের কর্মোদ্যোক্তারা সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। বিবেচনা করে দেখুন, পাতানো আত্মীয়ের দল নয়, মেয়ে-জামাই নয়, ছোট বোন ভগ্নীপতি নয়, স্বয়ং মা ভগবতী একটি দিন সন্তানদের মাঝে শাস্ত্রসম্মতভাবে বেশি থাকতে চাইছেন। তার ঠ্যালা সামলাতে গিয়ে সমাগরা ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরে সবাই চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।

না খেয়ে উপায় নেই।

চাঁদা তোলা একটা জটিল সমস্যা। এর চেয়ে হাজারবার ডন-বৈঠক দেওয়া সহজ। চৌত্রিশটা পূজো। কয়েক লাখটাকা সংগ্রহের ব্যাপার। পাড়ায় পাড়ায় এর ভেতর কমিটী তৈরি হয়ে গেছে। চাঁদার খাতা নিয়ে এবার তাঁরা কি ভাবে আক্রমণটা করবেন, তারই স্ট্র্যাটিজির তোড়জোড় চলছে।

পূজোর ভোগে এবার মা'র আর মিষ্টান্ন জুটছে না। দুধ দিল্লীতে বাড়ন্ত। চিনির নাম নেওয়া মানা। কিসমিস পেস্তা বাদাম সব ফ্রণ্টে গেছে। রাজধানীর বাজার খালি। দুধের তৈরি মিষ্টি বাজারে মানা। চালটা এখনও আছে, তাই দিল্লীর চালটা এখনও বানচাল হয় নি। ততদিনে মহামতি সরকার বাহাদুর ফুড ফ্রন্টের দাবাখেলায় কি চাল চালবেন সেটাই লক্ষণীয়। মাকে লাঞ্চে ভোগ দেওয়াও বিপজ্জনক। দিল্লীতে পাঁউরুটি তৈরি নিষেধ। স্যুপের জিনিস-পত্তর জুটছে না। কেক, পেস্ট্রি অগ্নিমূল্য। তবে হ্যাঁ পাওয়া যাচ্ছে।

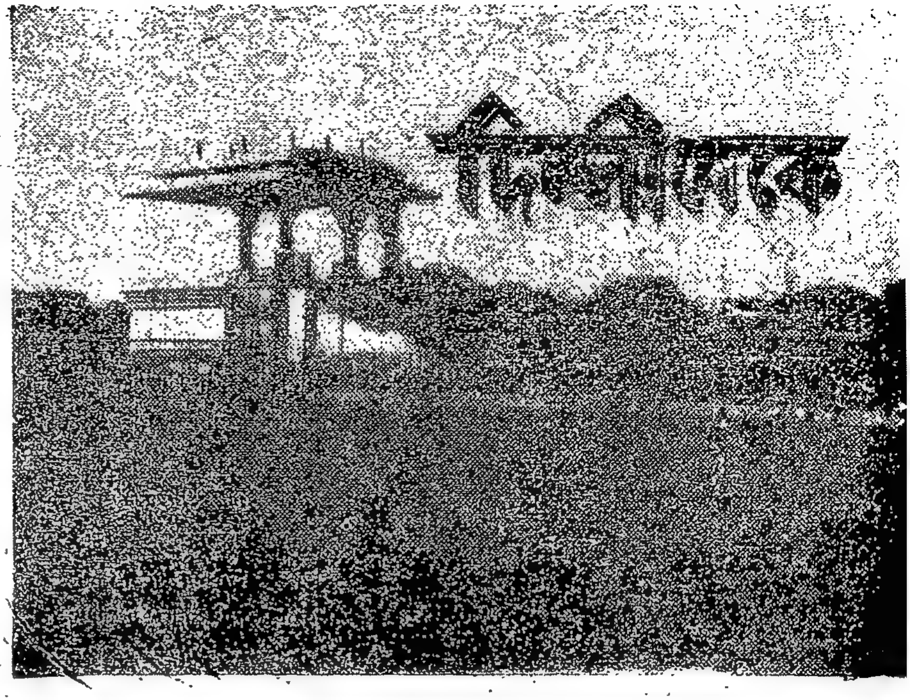

● রামলীলা ময়দান : শারদোৎসবে দিল্লীর অন্যতম আকর্ষণ

ফলটাও, সত্যি কথাটি নিশ্চয়ই বলব, কম্প্যারেটিভলি সস্তা। আঙুর, আপেল, নাসপাতি, মিষ্টির প্রক্সি দিতে পারবে।

খাবারের এ দুর্গতি দেখে মা কি সত্যিই দেশের অবস্থাটুকু বুঝতে পারবেন? মহাদেবকে ভয় নেই। যোগী মহেশ্বরের যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। ও বিদেশী-দিশি লাঞ্চ ওঁর কাছে সব সমান। ভয় হলো বঙ্গদুহিতা দুর্গাকে। সন্মানে বাধবে যে। পূজোর ভোগে মিষ্টি নেই, প্যাণ্ডেলের সে আড়ম্বর নেই, বাত্তি নেই, সন্তানরা নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ পরে নেই, সানাই নেই, ঢাক নেই, এমন কি হিন্দুস্থানী গানের লারে-লাপ্পার রেকর্ড পিকাপটুকু পর্যন্ত এবার নাকি উঠে যাচ্ছে। এ সব কি? আত্মীয়দের তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেবার নানা পন্থা আছে। শান্তিপুরী কায়দায় নৌকোয় পা ঠেলে 'আর ক'দিন থেকে গেলে পারতে গো,' বলে তো আর মা'র সাথে মস্করা করা চলে না।

তবুও বলব, দিল্লীর পাড়ায় পাড়ায় শরতের ছোঁয়া লেগেছে। আরাবল্লীর রুক্ষ পাথরের গায়ে শিউলি-গাছে কুঁড়ি ধরেছে। দিল্লীর আকাশে-বাতাসে শরতের স্নিগ্ধ স্পর্শ লেগেছে। টগর, জবা, পদ্মের বর্নে মৌমাছির মধুগুঞ্জনে দিল্লীপ্রবাসীর মন উদাস। সহস্র মাইল দূরের এ বাতাবরণ, এ পরিচিত পরিপার্শ্ব টুকু তার মনে এত দোলা দেয় কেন?

ভেস্টিবিউলে চেপে নববিবাহিত যে দম্পতি এই গত বছরেও বাংলা দেশের পূজো দেখতে ছুটেছিলেন, আজ বাংলার পূজো তাঁদের টানছে না কেন? পাথেয়। পাথেয় চাই। জীবনের পথে আজ পাথেয়টুকু দিন দিন বড়ই মহার্ঘ হয়ে উঠছে। শুধু জীবনযাত্রার নয়, জীবন অতিবাহনের মূল্যটুকুও আজ রক্ত নিংড়ে দিতে হচ্ছে। শুধু কি তাই? এত কষ্ট স্বীকার করে, এই সহস্র মাইল অতিক্রম করে সেখানে যে দৃশ্যটুকু চোখে পড়বে, সেটা না দেখাই বোধহয় ভালো। মন ভেঙে যাচ্ছে। দেহ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসছে। আর ভাবা যাচ্ছে না।

দিল্লীর দিদিমা-পিসিমার দল বেশ আছেন। তাঁরা এতো ঝামেলা বোঝেন না। এর ভিতরই তাঁরা গান ধরেছেন,

'এবার আমার উমা এলে,
আর উমারে পাঠাবো না
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া
জামাই বলে মানবো না।'

আগমনী সঙ্গীত দিল্লীতে খুবই জনপ্রিয়।

আবার গাইছেন—

'বল মা উমা হরের ঘরে
কেমন ছিলি
বল মা তাই।'

ছেলেমেয়ের দল পূজোর নাটকের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রিহার্সেল এখনও সু— হয় নি। সিনেমার হিড়িকে এখনও যাঁরা পরিশ্রম স্বীকার করে থিয়েটার করার উৎসাহ রাখেন, তাঁদের নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবো।

এতদিন একটা নতুন হিড়িক ছিল মিক্সড্ কাস্ট করার। দিল্লীর পূজোয় গত বছরও একাধিক জায়গায় মিক্সড্ কাস্ট থিয়েটার হয়েছে। এবার শুনলাম, জায়গায় জায়গায় পুরুষদের আর ঢুকতে দেওয়া হবে ‍। হউজ খাসের মহিলা সমিতির সেক্রেটারী মিসেস মুখার্জী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বই খুঁজছেন ক'সপ্তাহ ধরে। সেদিন আমাকে বললেন, 'নেহাৎ যখন পাওয়াই যাচ্ছে না, লিখেই দিন না একখানা বই। বইখানা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ পুরুষ-বর্জিত।'

পুরুষদের সঙ্গটাও দুর্বিষহ হয়ে উঠছে গৃহিণীদের। তাতো হবেই। স্বয়ং শঙ্করাচার্য বলে গেছেন। বিত্তোপার্জন যদ্দিন করবে ততদিন—'পরিবারে পরিবারো রক্তঃ'। আজ যে পরিবারও উপার্জন করতে নেমেছেন। যাঁরা নামেন নি, সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' দেখে দিল্লীতে নামি নামি করছেন।

দেবনগরে গত বছর কিন্তু ঠিক উল্টোটি হয়েছিল। হিরোইন পাওয়া যায় নি বলে বিচিত্রানুষ্ঠানের আহ্বায়ক রাজাবাবুকে প্রজার সামিল করতে কেউ কসুর করেন নি। ম্যাজিশিয়ান রাজা চাটুজ্জের কথাই বলছি।

বাংলা দেশের মতন দিল্লীতেও শারদোৎসবের অঙ্গ হিসেবে সাহিত্য সঙ্কলনকে যথেষ্ট উঁচু জায়গা দেওয়া হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় শারদীয়সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের উদ্দেশ্য দুমুখী। সাহিত্য-সেবার চেয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহের দিকেই ঝোঁক বেশি। না করে উপায় নেই। টাকা কিন্তু ন্দ ওঠে না। অনেক জায়গায় পূজোর চাঁদার অঙ্ককেও ছাড়িয়ে গেছে পত্রিকার বিজ্ঞাপনের আয়ের পরিমাণ। বাণীর নাম করে লক্ষ্মীর আরাধনা দিল্লীর এ অভিনব পন্থায় নতুনত্ব আছে বই-কি।

এখানকার হাওয়ার অণুপরমাণুতে রয়েছে ডিপ্লোম্যাসি, রাজনীতির চাল। অর্থ সংগ্রহের পথ তো একটা খুবই নগণ্য উপায় মাত্র। সোসালিস্ট প্যাটার্ন অব সোসাইটির ভেল্কীবাজীতে সতেরোটা বছর যাঁরা চল্লিশ কোটি নরনারীকে মোহান্ধ করে রেখেছেন, তাঁরা পুতুল খেলার দড়িটুকু দিল্লী থেকেই টেনে চলেছেন, ভুললে চলবে কেন?

সেদিন খুব দূরে নেই—একটি মাত্র পূজোকে কেন্দ্র করে টেলিভিশনের সামনে হাত জোড় করে মায়ের সন্তানরা বলতে বাধ্য হবে, 'তোমার পূজো তুমিই করিয়ে নাও মা। লোকে আর কি করাবে? তাদের সে শক্তি আর কোথায় দিলে?'

রাজধানী ঃ

শরৎ এসে পড়েছে। দিকে দিকে ঘোষিত হচ্ছে তার আগমনবার্তা। মেঘকন্যারা দল বেঁধে হাওয়ায় দোল খেতে খেতে ঝিমঝিম, ঝমঝম করে নেচে উঠে দু-এক পশলা ঢেলে দিয়ে বিদায় নিচ্ছে। ভোর হতে-না-হতেই শিউলি তার শুভ্র আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে শারদলক্ষ্মীকে। পদ্ম, যুঁই, টগর আর মল্লিকারা হাসিমুখে বন্দনা সুরু করেছে শরতের।

শহর কলকাতার রূপও এক সপ্তাহে অনেকখানি পাল্টে গেছে। উৎসবের আয়োজন চলেছে সর্বত্র। কুমারটুলী এখন কর্মচঞ্চল। শহরের পল্লীতে-পল্লীতে প্রায় প্রতিদিন বৈঠক হচ্ছে পূজা-কমিটীর। অলিগলির মোড়ে-মোড়ে ঝুলছে 'বারোয়ারী' ও 'সর্বজনীন' পূজার ঘোষণাপত্র। দোকানগুলোর রূপসজ্জাও সমাপ্তপ্রায়।

*　*　*

এদিকে আফিসে-কারখানায় চলেছে বোনাসের দাবীতে কর্মীদের আন্দোলন। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পালন করছেন দাবীদিবস। ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে তাঁদের দাবী আদায়ের আন্দোলন। ১৫ই সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ কর্মবিরতি দিবস পালন করলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর কলেজের অধ্যাপকগণ পালন করবেন একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট।

দিনবারো আগেই আমরা গুরু-পূজা করেছি। শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি, সমাজজীবনে তাঁদের যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতীক নিশান বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছি। মাঠে-ময়দানে, স্কুল-কলেজে সভা করে শিক্ষকদের প্রতি সমাজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করেছি। শ্রদ্ধাভরে শিক্ষকদের গলায় পরিয়েছি পুষ্পমাল্য। দু' সপ্তাহ যেতে না যেতেই শিক্ষকসমাজ এক-যোগে পথে নামলেন কেন? এ প্রশ্ন

● পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনে ভাষণরত জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু।

ওঠা স্বাভাবিক। তবে কি, আমাদের গুরুপূজায় ত্রুটি ছিল?

আমাদের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন শিক্ষক। উপ-রাষ্ট্রপতিও নিজেকে শিক্ষক বলেই দাবী করেন। দুজন শিক্ষককে আমরা সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন দিলেও জাতি শিক্ষকদের প্রতি এখনও পর্যন্ত সুবিচার করতে পারেন নি। দেশের যাঁরা ভবিষ্যৎ স্রষ্টা, যাঁদের হাতে গড়ে উঠছে, আগামী দিনের নাগরিক—তাঁদের কথা বলতে গিয়ে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দুঃখ করে বলেছিলেন, শিক্ষকগণ চাপরাশীর চাইতেও কম বেতন পেয়ে থাকেন। এ অবস্থার পরিবর্তন এখনও ঘটে নি।

শিশু ভবিষ্যতে কি হবে তা স্থির হয়ে যায় তার সাত বছর বয়সের মধ্যেই। এ বয়সটা তার কাটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবী ন্যূনতম একশ' টাকা মাসিক বেতন। এ দাবী তাঁদের অত্যন্ত ন্যায্য। ভারত সরকারের শ্রমদপ্তরের সমীক্ষা অনুসারে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই একজনের আয় মাসে ১২৫৲ টাকা হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রাথমিক শিক্ষকদের একশ' টাকা বেতন দেবার আশ্বাসও দিয়েছিলেন। সে প্রতিশ্রুতি অর্থাভাবে নাকি তিনি পূরণ করতে পারছেন না।

প্রয়োজনে আমাদের অর্থের অভাব কোনদিনই হয় নি। আসল কথা, রাষ্ট্রনেতারা আমলাতান্ত্রিক জালে জড়িয়ে পড়েছেন। আমলাদের চোখে প্রয়োজন যেটা বেশি সেটাই নেতাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে। যাঁদের ওপর জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাঁদের প্রয়োজনের কথাটা তাই সহজে পড়ে যায় আমলাদের লালফিতার তলায় চাপা। শিক্ষকদের প্রয়োজনের কথা স্বীকৃত হয়েছে অনেকবার। প্রতিটি শিক্ষা কমিশনই শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতির কথাটা অধিক জোর দিয়েই বলেছেন। তাঁরা স্বীকার করেছেন, শিক্ষকদের অভাব না ঘুচলে শিক্ষার মান উন্নত হতে পারে না।

পশ্চিম বাংলায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জোরদার আন্দোলন সুরু হয় ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে। তখন শিক্ষাদপ্তরের প্রধান আমলা নাকি সাংবাদিকদের কাছে শিক্ষক-সমাজের নিন্দা করে বলে ফেলেছিলেন, চাপরাশীর চেয়ে কম বেতন পান বলে যে-সব শিক্ষক ধর্মঘটে নেমেছেন তাঁরা শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে চাপরাশীর কাজ নিতে পারেন। অন্য দেশ হলে এর তদন্ত হতো—বিচার হতো তাঁর, যিনি শিক্ষকদের সম্বন্ধে এমন হীন মনের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বিচিত্র এ দেশ! তদন্ত ও বিচার

আমাদের সরকার করেন নি। শুধু তাই নয়, অভিযুক্ত ব্যক্তির চাকুরীর মেয়াদ বাড়ছে বছরের পর বছর।

পশ্চিম বাংলা সরকার কর্মচারীদের পাঁচ থেকে দশ টাকা মাগ্গীভাতা বাড়িয়েছেন। এ বছর বাজেট পেশ করার সময়, অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় জোর গলায় বিধানসভায় ঘোষণা করেছিলেন, সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ টাকা পাবেন।

আমাদের শিক্ষাদপ্তরের আমলা-রাজের কেরামতীতে শিক্ষকগণ এই অর্থের একাংশ থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন। ঘোষণা করা হয়েছে—দশ টাকার পাঁচ টাকা দিতে হবে বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলীকে। বাকী পাঁচ টাকা দেবেন শিক্ষাদপ্তর।

সরকার এখনও শিক্ষকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব বিধান করে উঠতে পারেন নি। শিক্ষকদের ভাগ্যবিধাতা বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী। তাঁদের মর্জির ওপর, তাঁদের খেয়াল-খুশিমত চলতে হয় শিক্ষকসমাজকে। পরিচালকমণ্ডলী অম্লান বদনে পাঁচ টাকা দিয়ে দেবেন, একথা বিশ্বাস নিশ্চয়ই ডঃ ধীরেন সেনও করেন না। কে না জানেন, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বিরুক্তি না করে বিদ্যালয়ের দেয় অংশের টাকাটা পেয়েছি বলে স্বাক্ষর করতে হয়। দরিদ্র শিক্ষককে সরকারী সাহায্যটুকু পাওয়ার আশাতেই এ কাজ করতে হয়। তবে এ প্রহসন কেন? এতে কি শিক্ষকের মর্যাদা ধুলায় লুটাচ্ছে না?

আমরা খুব বড় গলায় প্রচার করি—শিক্ষকদের ছেলেমেয়ের পড়ার খরচ লাগে না—সদাশয় সরকার বাহাদুর বেতনের টাকা দিয়ে থাকেন। দু' বছর এ টাকা শিক্ষকগণ পান নি। কবে পাবেন, ভবিষ্যতে পাবেন কিনা, তাও কেউ বলছেন না। তা' ছাড়া, শিক্ষকদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার পুরা টাকা কোনদিনই সরকার দেন নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সন্তান ষষ্ঠ শ্রেণীতে না উঠলে কোন টাকাই দেওয়া হয় না। অথচ বিদ্যালয়ের ঘাটতি পূরণের বেলায় সরকার পঞ্চম শ্রেণীকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছেন। বিদ্যালয়ের বেতনের হার বেড়েছে ঢের। দশম শ্রেণীর ছাত্রের বেতন প্রায় প্রতি বিদ্যালয়ে দশ টাকা। সরকার কিন্তু ছ' টাকার বেশি কোনদিন দেন নি।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যাই বেশি। তাঁদের বেতন ১৬০৲ টাকা। ভবিষ্যৎ তাঁদের অন্ধকার। বি টি হতে না পারলে এক কপর্দকও তাঁরা বেশি পাবেন না।

● শ্রীশৈল মুখোপাধ্যায়

বি টি পড়বার সুযোগও হতাশাব্যঞ্জক-ভাবে সীমাবদ্ধ।

আমলাতন্ত্রের পেষণে শিক্ষক-সমাজ আজ নিষ্পেষিত। তাঁদের মর্যাদার আসনে বসাতে হলে আমলাচক্রের ব্যূহ আগে ভেদ করতে হবে। তা' না হলে মুখে যত কথাই বলি, সুসজ্জিত কক্ষে 'শিক্ষক দিবসে'র দোহাই দিয়ে দু-চারজন শিক্ষকের প্রতি যত সম্মানই প্রদর্শন করি না কেন, গুরুপজা সার্থক হবে না।

নতুন ব্যারাকপুরে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিক্ষক সম্মেলনে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীঅপূর্বচন্দ্র প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ দেশের শিক্ষাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করার কথা বলেছেন। গৃহ নির্মাণ ও আসবাবপত্রের আড়ম্বর না করে শিক্ষার মান উন্নত করার ওপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। এ সব কথা অনেক আগে আমাদের শিক্ষাগুরু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে গেছেন। ডঃ ধীরেন সেন রবীন্দ্রনাথের হাতে-গড়া মানুষ বলেই আমরা জানি। গুরুর নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ তো দূরের কথা, তিনি তাঁর বিপরীত পথেই চলেছেন। বিদ্যালয়গৃহ নির্মিত হয়েছে তাঁর আমলে অনেক, কিন্তু মানুষ গড়ে উঠছে না।

দার্জিলিং:

হিমালয়ের কোলের পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা অনুসারে পল্লী-শিল্প গড়ে তোলার কাজ সুরু হয়েছে এক বছর আগে। ছোট ছোট শিল্প ও বাণিজ্য-কেন্দ্র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুধ, মাখন ও পনীরের ব্যবসা এবং কৃষিভিত্তিক অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজও হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ের দুগ্ধ-ভাণ্ডার ভারত-নেপাল-সিকিম সীমান্তের রিমবিক অঞ্চল। রিমবিক-সিংখোলা ডেরি সমবায় সমিতি রিমবিকে দুগ্ধ সরবরাহ-কেন্দ্র খোলার কাজে হাত দিয়েছেন। আগস্ট মাসে এর গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এই গৃহ নির্মাণের জন্য চার হাজার এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি কেনার জন্য দু' হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

আমাদের পরিকল্পনাকারদের কাজে একটা-না-একটা ত্রুটি থেকেই যায়। এ ক্ষেত্রেও তাঁরা দুর্গম পার্বত্য এলাকার পথের কথাটা আগে-ভাগে চিন্তা না করাতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সমস্যার। রিমবিক থেকে শিলনবাড়ি বাণিজ্যকেন্দ্রে যাতায়াতের পথ মাত্র এক ৷ খচ্চর এ পথের একমাত্র বাহন। রিমবিকের গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হতে-না-হতেই সুরু হয় প্রবল বর্ষণ। বর্ষার জলে পথ মানুষের অগম্য হয়ে আছে।

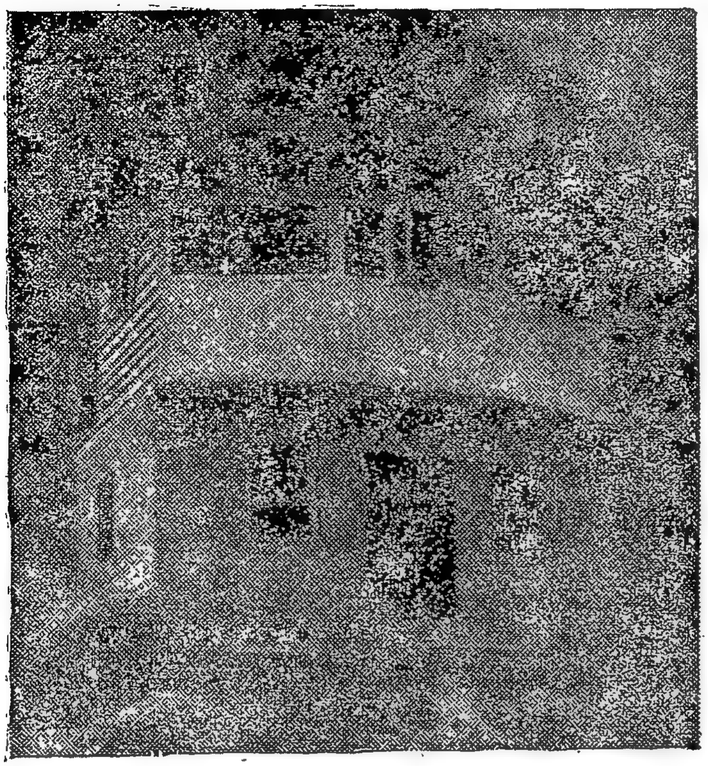

● রিমবিক দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র

রিমবিক-লোধামা-ফুলবাজারের ১৪ মাইল ব্যাপী রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জেলা পরিষদের। জেলা পরিষদের বাৎসরিক বাজেটে ২৬ মাইল রাস্তা মেরামতের জন্য পাঁচ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকৃতির খেয়াল-খুশির অত্যাচার সহ্য করতে হয় এ অঞ্চলের রাস্তাগুলোকে প্রতিনিয়ত। এ টাকায় বর্ষার ঢলে নেমে আসা ধ্বস সরানো ভিন্ন অন্য কাজ সম্ভব হয়ে ওঠে না। এবারেও ধ্বস সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার ছাড়া আর কোন মেরামতী কাজ সম্ভব হয় নি।

লোধামা খোলার কাঠের পুলের মেরামতের কাজ চলেছে। একটি বাঁশের সাঁকো হয়েছে এখন অবলম্বন। ভারী বোঝা নিয়ে এর ওপর দিয়ে যাতায়াত সম্ভব নয়।

মাল চলাচলের পথের অভাবে রিমবিকের চাষের ফসল মাঠে মারা যাচ্ছে। বিজনবাড়ি বাজারে রিমবিক থেকে একমণ শস্য পাঠাতে এখন খরচা পড়ছে সাড়ে চার টাকা। পরিবহনের এই মোটা ব্যয় বহনের ক্ষমতা দরিদ্র চাষীর নেই। অনন্যোপায় হয়ে জলের দামে বেচতে হচ্ছে তাদের সারা বছরের শ্রমলব্ধ শস্য। চাষীদের বিপদের সুযোগ নিচ্ছে পাইকাররা পুরোমাত্রায়। তাতেও শেষরক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। দুধ বিক্রি হচ্ছে প্রতি সের তিরিশ পয়সা করে। আলু ৩৫ পয়সা, বিলিতি বেগুন আট আনা এবং স্কোয়াস ১২ পয়সা করে বিক্রি হচ্ছে।

সরকার এ অবস্থা অবিদিত নহেন। আলু ও বিলিতি বেগুন জন্মায় এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে। রাস্তার অভাবে চাষী আজ তার উৎপন্ন শস্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এবারে বেশ কিছুটা ফসল তার অবিক্রিত থেকে যাবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে নতুন নতুন পরিকল্পনায় শুধু অর্থই ব্যয় হবে, সমস্যার কোন সমাধান হবে না—মানুষের দুঃখও ঘুচবে না। আমাদের পূর্তমন্ত্রী নতুন রাস্তা নির্মাণের ফিরিস্তি প্রতি বছরই দিয়ে থাকেন। দার্জিলিংয়ের এ অঞ্চলের রাস্তার প্রতি পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুপ্ত একটু নজর দিলে প্রতি বছর দেশের শস্যহানি কিছুটা কম হবে।

জলপাইগুড়িঃ

জলপাইগুড়ির মানুষের এখন বড় কাজ হচ্ছে চাল সংগ্রহ করা। আফিসে একদিন না গেলেও চলতে পারে, কিন্তু পেটের অন্ন না জোটালেই নয়। খোলা বাজারে চাল নেই অনেক দিনের কথা। ন্যায্যমূল্যের দোকানের চালে সকলের চলে না। চাল পেতে হলে দাঁড়াতে হবে লাইনে। আগে খুঁজে বের করতে হচ্ছে কোন্ দোকান এ কাজের অধিকার পেয়েছে। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্ণা দিয়ে কোথাও মিলছে আড়াই কে-জি, আবার কোথাও পাঁচ কে-জি।

চাল বাঙালীর প্রধান খাদ্য। এর দামের ভিত্তিতেই ঘোরে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের চাকাটি। ডালের দাম হয়েছে প্রতি কে-জি পাঁচসিকে। খেসারীও জাতে উঠেছে। তার প্রতি কে-জির মূল্য নব্বই পয়সা। আলু নব্বই পয়সা। বারো আনার নীচে কোন তরকারী নেই। মাছের কথা নতুন করে বলার তেমন কিছু নেই। চুনো-পুঁটির দাম তিন টাকা। অন্য কোন মাছই চার টাকা কে-জির নীচে পাওয়া যাচ্ছে না। ওপরে সাত থেকে আট টাকা চলছে মাছের বাজার। কচ্ছপের মাংসের পর্যন্ত চাহিদা গিয়েছে বেড়ে। প্রতি কে-জি কচ্ছপের মাংস বিক্রি হচ্ছে তিন টাকা করে। পাঁঠার মাংস সাড়ে চার টাকা।

সাধারণ মানুষ পড়েছে অশেষ দুর্গতির মধ্যে। কচু, ডাঁটা, কলমী, লাউ ও কুমড়ো শাক হয়েছে এখন তাদের অবলম্বন।

বীরভূম ঃ

জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতির আসন নিয়ে স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কলহ দানা বেঁধে উঠেছে। এ লোভনীয় পদের প্রার্থী প্রায় সকলেই।

● অজয় মুখোপাধ্যায়

বীরভূম জেলা স্কুল বোর্ডের বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ষাট লক্ষ টাকা। এ টাকার খবরদারীর দায়িত্বভার কেউ কারও ওপর ছেড়ে দিতে রাজী নন। এমন লোকও পদপ্রার্থী রয়েছেন, যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তিনি নাকি আবার পশ্চিম বাংলার অধিনায়ক শ্রীঅতুল্য ঘোষের স্নেহভাজন। এ অবস্থায় কংগ্রেসের নেতারা যা করেন, বীরভূমে তার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে সুরু করেছেন। দুর্নীতি-বিরোধী বলে যাঁরা দাবী করেন তাঁরা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করতেই, অপরপক্ষ থেকে উঠেছে তার প্রতিবাদ। শেষে উভয় পক্ষই একযোগে জেলা কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন।

বীরভূম জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে উচ্চশিক্ষিত সদস্যও রয়েছেন দু-তিন জন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তাঁদের একজনকে জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতির জন্য মনোনয়ন পত্র দিলেই ঝামেলা চুকে যেতে পারে—যোগ্য ব্যক্তিও উপযুক্ত কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন।

মফস্বলের কংগ্রেস নেতাদের কাছে এখন জেলা বোর্ড, জেলা স্কুল বোর্ড এবং পৌরসভার সভাপতির পদগুলো প্রাইজ-পোস্টে পরিণত হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই সে খবর রাখেন। তাঁর মত আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে তাই আমরা যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়নের দাবী জানাই। এ কাজ করতে পারলে কংগ্রেসের সুনাম বাড়বে—হৃত গৌরব আবার আমরা ফিরে পাবো।

নদীয়া ঃ

আবার ম্যালেরিয়া এসে বাসা বাঁধতে সুরু করেছে নদীয়ার বুকে। ম্যালেরিয়ার নাম শুনলেই নদীয়া জেলার গ্রামাঞ্চলের মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে নদীয়া এক সময় ছারখার হয়ে গিয়েছিল—মানুষ সেদিন ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে সম্প্রতি যাঁরা এসেছেন, তাঁরাই নাকি এবারে ম্যালেরিয়া আমদানী করেছেন। এ অভিযোগ পরীক্ষা-সাপেক্ষ। রক্ত পরীক্ষায় এদেশের মানুষের দেহেও ম্যালেরিয়ার বীজাণু পাওয়া গেছে। যে-ভাবেই হোক, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন নদীয়ার শ'-দেড়েক মানুষ। এ রোগ যাতে মহামারীর আকার নিতে না পারে তার ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন। নদীয়ার পরিবেশ এ রোগ সংক্রমণের অত্যন্ত সহায়ক। উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে পড়েছেন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। অপর কোথাও ম্যালেরিয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নি। এ সব দিক বিবেচনা করে স্বাস্থ্যদপ্তরকে নদীয়ার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের ব্যবস্থায় হাত দিতে হবে।

• • •

নদীয়ার মানুষকে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আর সরষের তেলের জন্য বোতল বা টিন হাতে করে দোকান থেকে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হবে না। আমাদের সরকার নতুন পরিকল্পনা নিয়েছেন। প্যাকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নদীয়ায় অধিক সরষে ফলানো হবে। ক'কেটি থানার, বিশেষ করে, কৃষ্ণগঞ্জ থানার চাষীরা এর মধ্যেই নয়া পরিকল্পনা মাফিক কাজের জন্য প্রস্তুত নাকি। খোশ খবর ঝুটা হলেও আনন্দদায়ক। সরকার নারকেলের তেল সোয়াবিনের তেল দেবেন ন্যায্যমূল্যের দোকানের মারফৎ। এর পর সরষের ফলন বাড়লে তো কথাই নেই। নদীয়ার মানুষের অন্তত তেলের অভাবটা তো ঘুচবে!

সরষের তেল বাঙালীর হেঁসেলের প্রধান উপকরণ। অন্য তেলে মাছ ভাজা ভাল হয় না। তেলের ব্যবস্থা তবু কৃষিদপ্তর কাগজে-পত্রে একটা এনে হাজির করেছেন। মাছের ব্যবস্থা সম্পর্কে নদীয়ার সন্তান মৎস্যমন্ত্রী শ্রীরহমান একেবারে নীরব। নদীয়ায় মাছ পাওয়া এখন ভাগ্যের কথা। কৃষ্ণনগরের মাছের বাজার বেশ কিছুদিন থেকে খাঁ-খাঁ করছে। মাছের আঁশও সেখানে

● ফজলুর রহমান

এখন আর নজরে পড়ছে না। নদীয়া রত্নপ্রসবিনী মৎস্যমন্ত্রীর মত পুত্র নদীয়ার জঠরে কি করে জন্মেছিল, সেইটাই মানুষ এখন ভেবে পাচ্ছে না।

রঙ্গজগৎ

● নাট্যকার মন্মথ রায়
১৯৬৪ সালের বিশ্বরূপা পুরস্কার পেয়েছেন।

চলচ্চিত্র রপ্তানী সংস্থা ও ভারতীয় চলচ্চিত্র

বিদেশে ভারতীয় ছবির চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতীয় সমাজচিত্র, তার সমস্যামূলক ছবি দেখার আগ্রহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। লণ্ডনে সাপ্তাহিক ভারতীয় ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ বছরে ৪।৫ টি করে ভারতীয় ছবি ক্রয় করে থাকে। আফ্রিকার কয়েকটি দেশকে ভারতীয় ছবির বাজার বললে অত্যুক্তি হবে না।

কিন্তু ভারতীয় ছবি রপ্তানী ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত সংগঠিত নয়। সমাজতন্ত্রী দেশগুলি বিনিময়-ব্যবস্থায় ছবি ক্রয় করে, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবসায়ী-রীতিতে ছবির প্রদর্শন হয়ে থাকে। ছবির চাহিদাও সব দেশে একরকম নয়, আফ্রিকায় সাধারণত বোম্বাই-মাদ্রাজের মনোরঞ্জনী ছবির চাহিদা বেশি। সোভিয়েটেও বাংলা অপেক্ষা হিন্দী ছবির চাহিদা। এই চাহিদা মেটাবার জন্য সংগঠিত ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ইতালীর মিলানে বছরে কয়েকবার ছবির মেলা বসে। তাতে ছবি নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়।

এক বছর পূর্বে সরকারী ও বে-সরকারী যুক্ত উদ্যোগে ফিল্ম এক্সপোর্ট কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। এরূপ একটি সংস্থা হওয়া সকলের কাম্য। কিন্তু বে-সরকারী পুঁজিকে না টেনে কর্পোরেশনটি একান্ত সরকারীভাবেই গঠিত হওয়া উচিত ছিল। সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়া যদি ভারতের লক্ষ্য হয়ে থাকে, এবং এই ঘোষণার মধ্যে যদি সত্যিই আন্তরিকতা থাকে তবে বে-সরকারী পুঁজিকে সঙ্গে টেনে নেওয়ার এত আগ্রহ কেন আমরা বুঝি না। বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পে যেরূপ কালোটাকার বে-পরোয়া গতিবিধি সেক্ষেত্রে রপ্তানী কর্পোরেশনের মত সংস্থায় পঁজিবাদীদের না টানাই উচিত ছিল। যেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সরকারী স্টুডিও গঠন ও চলচ্চিত্র প্রযোজনা এবং পরিবেশনার প্রয়োজনীয়তা অনেকে উপলব্ধি করছেন, সেক্ষেত্রে রপ্তানী কর্পোরেশনে ব্যক্তিগত পুঁজি শুভ ফলপ্রসূ হবার কারণ নেই। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ—সংস্থা গঠিত হবার এক বছর কালের মধ্যে ভারতীয় ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নি; এবং এই সংস্থা ফিল্ম ফেডারেশনের কুক্ষিগত হবার পথে।

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

বিংশতি জননা
(ফিল্ম ডিল)

মাশ্রিত একটি মানবিক আবেদনধর্মী কাহিনীচিত্র 'বিংশতি জননী'। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন খগেন রায়।

কাহিনীর মূল মর্ম: এক তরুণী শিশুসন্তানকে গঙ্গার পাড়ে রেখে নিজে গঙ্গার বুকে আত্মবিসর্জন করে। বেকার যুবক চন্দন শিশুটিকে কুড়িয়ে নিজের কাছে রাখে। কিন্তু বাড়িওয়ালা এরূপ কুড়িয়ে পাওয়া শিশু রাখতে দিতে রাজী না হওয়ায় সে শিশুটিকে নিয়ে অনাথ আশ্রমে যায়। অনাথ আশ্রমে অল্পক্ষণের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাতে সে শিশুটিকে নিয়ে একরকম পালিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত মামাতো বোন শিপ্রার সাথে পরামর্শ করে সকলের অলক্ষ্যে শিশুটিকে এক নারীনিবাসে রেখে আসে। শিপ্রা সহ কুড়িজন মেয়ে এখানে বাস করে, আর তাদের উপরে আছে এক শ্যেনচক্ষু সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। মেয়েরা ঠিক করলো সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে গোপন করে তারা শিশুটিকে পালন করবে, এ কাজে সহায়ক হলো হোস্টেলের পরিচালক নিধিরাম। শিশুটিকে গোপনে রাখার ব্যাপার নিয়ে নানারকম ভয় ও হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে একদিন দেখা গেল হোস্টেলে মেয়েদের নেত্রী মানসী ও চন্দনের মধ্যে অনুরাগ সৃষ্টি হয়েছে; এই অনুরাগের দূতিয়ালী করেছে শিপ্রা।

একদিন সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেয়েদের মধ্যে শিশুটিকে নিয়ে আলোচনা আড়াল থেকে শুনতে পেয়ে ভয়ঙ্কর রকম একটা ভুল করে বসে। সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের ডেকে আনে। সকলেই উদ্বিগ্ন। এমন সময় প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়লে হাসির রোল পড়ে।

একটি হাস্যরসাত্মক চিত্রনাট্যের জন্য কাহিনী আকর্ষণীয় ছিল। কিন্তু ছবিটি চলচ্চিত্রধর্মী না হয়ে, হয়ে উঠেছে মঞ্চধর্মী। মঞ্চের সীমিত গতি ও রীতির জন্য চলচ্চিত্রের সাবলীল গতি না থাকায় ছবির আকর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। স্থানে স্থানে দৃশ্য সৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যও চোখে পড়ে এবং কিছু কিছু অনাবশ্যক দৃশ্য চরিত্র ও সংলাপ উপস্থিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মেয়ে হোস্টেলের অভ্যন্তরে এমন কি শিপ্রার কক্ষে পর্যন্ত চন্দনের উপস্থিতি বকশিসের জোরেও সম্ভব হওয়া উচিত নয়। অথবা শিপ্রার সঙ্গে দেখা করতে চন্দনের যেখানে এত কড়াকড়ির মধ্যে পড়তে হয় সেখানে মানসীর সঙ্গে নির্বিঘ্নে সাক্ষাৎ নেহাৎ জোর করে গল্প-মেলাবার জন্য ছাড়া আর কি হতে পারে। একটি অনাবশ্যক চরিত্রসৃষ্টি বড় পুরোনো ধারণা। সতর্কতা এবং সামঞ্জস্যবোধ নিয়ে ছবিটি পরিচালিত হলে আরো উপভোগ্য হতে পারতো। ছবিটির মধ্যে হাসির উপাদান যথেষ্ট আছে, এবং দর্শকরা প্রচুর হাস্যরস উপভোগ করেন। তবে এই হাসি শিল্পগুণাশ্রিত হলে আরো আনন্দের হতো।

ছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপ দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অনুপকুমার (চন্দন), মাধবী মুখার্জী (মানসী), লিলি চক্রবর্তী (শিপ্রা), গীতা দে (সুপারিনটেণ্ডেণ্ট), জহর রায় (নিধিরাম), শীতল ব্যানার্জী, মিতা চ্যাটার্জী, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চ্যাটার্জী, লীলাবতী, প্রেমাংশু বসু, লতিকা দাশগুপ্তা, ভানু ব্যানার্জী, প্রতিমা চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, কল্পনা, বুলবুল, সুজাতা প্রমুখ।

সঙ্গীতাংশে একটি ঘুমপাড়ানী ও সন্ধ্যা মুখার্জীর কণ্ঠের আর একটি গান সুগীত। মৈত্রেয়ী দাশগুপ্তার সঙ্গীত রচনা প্রশংসনীয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কালোবরণ।

● নির্মীয়মাণ 'অশ্রু দিয়ে লেখা' ছবিতে নিরঞ্জন রায় ও গীতালী রায়

● 'দুই পর্ব' ছবির একটি দৃশ্যে কালী ব্যানার্জী ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

নাটকের কথা

মুক্তাঙ্গন মঞ্চে সেক্সপীয়রের ওথেলো

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা 'শৌভনিক এবার সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি নিয়মিতভাবে মুক্তাঙ্গন মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। 'ওথেলো'র বঙ্গানুগ্রন্থন ও নির্দেশনায় রয়েছেন শৌভনিকের অন্যতম শিল্পীসদস্য কৃষ্ণ কুণ্ডু।

'ওথেলো' বাংলার মঞ্চে নতুন নয়। ইতিপূর্বে এই নাটক অভিনীত এবং প্রশংসিত হয়েছে। শৌভনিকের 'ওথেলো' পূর্ববর্তী নাটক অপেক্ষা কিছুটা সংক্ষিপ্ত হলেও নাটকটি উপভোগ্য হয়েছে। সরল বাংলা সংলাপে এই

● ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'এই মিলন কী বেলা' ছবির নায়ক রাজেন্দ্রকুমার

নাটক দর্শকদের সেক্সপীয়রের নাটকের মহত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। নাটকের বিভিন্নধর্মী চরিত্র মানবমনের মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক। এই একটি ক্ষুদ্র নাটকে যেন মানবচরিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সেক্সপীয়র নাটকে চরিত্র সৃষ্টিতে অভিনেতার কৃতিত্ব। চরিত্রকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে পারার ওপর নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে। আলোচ্য নাটকে 'ওথেলো'র চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। এই চরিত্র সৃষ্টি প্রশংসনীয়, কিন্তু আরো গভীরতর উচ্চারণ ও অভিব্যক্তি পূর্ণ সার্থকতার সহায়ক হতো। ডেসডিমনাকে রূপদান করেছে শুভ্রা ঘোষ। শুভ্রা ঘোষ নৃত্য, আবৃত্তি ও অভিনয়ে ইতিপূর্বে রসিকজনের প্রশংসা লাভ করেছে। ডেসডিমনার চরিত্রকে শুভ্রা ঘোষ যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে ফুটিয়ে তুলেছে এবং তার বাচনভঙ্গী দর্শকদের সমর্থন লাভ করেছে। হত্যার দৃশ্যটি আরো সুপরিকল্পিত হলে করুণ ও বিমূর্ত মুহূর্ত দর্শকমনকে আরো মথিত করে তুলতে পারতো। শ্রীমতী শুভ্রাকে আমরা ইতিপূর্বে ভিন্নধর্মী চরিত্রে দেখেছি: এবার তার ডেসডিমনা চরিত্র অভিনয় একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। নাটকের আর একটি প্রধান চরিত্র ইয়াগোকে সার্থক রূপদান করেছেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে শৌভনিকের যত নাটকে আমরা দেখেছি তার মধ্যে তাঁর ইয়াগো শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন এমিলিয়ার ভূমিকায় অলকা পাল, বিয়াঙ্কা—জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ক্যাসিও—গোপেন মুখার্জী, রডারিগো—গৌর চট্টোপাধ্যায়, ব্রাবনশিও—অশোক মিত্র, ডিউক—শিবু মজুমদার, মন্তানো—গোপাল সান্যাল ইত্যাদি।

নাটকটিতে চরিত্রগুলির সাজসজ্জা, আলোকসম্পাত এবং সঙ্গীত প্রশংসনীয়। দেবাশীষ দাশগুপ্ত আবহসঙ্গীতে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন।

নাট্যবিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান

থিয়েটার সেণ্টার নাট্যবিদ্যালয়ের পঞ্চম পাঠক্রম পরীক্ষায় অভিনয় ও প্রযোজনায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ বারজন ছাত্রকে থিয়েটার সেণ্টার হলের একটি মনোরম অনুষ্ঠানে গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর সার্টিফিকেট বিতরণ করেন সভাপতি শ্রীমিহিরকুমার সেন।

এদেশে ঐ ধরণের কোনো বিদ্যালয় বিরল। বাংলা দেশে এই ধরণের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীতরুণ রায়ই সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন, থিয়েটার সেণ্টার নাট্যবিদ্যালয় তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই নাট্যবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করেন নাট্য-বিশেষজ্ঞ শ্রীঅশোক সেন। অভিনয় ও প্রযোজনায় শিক্ষাদানের জন্য এখানে যুক্ত রয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ বিমান বিশ্বাস, শ্রীতাপস সেন, শ্রীখালেদ চৌধুরী, শ্রীতরুণ রায়, শ্রীমাধুরী চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণা রায়, শ্রীবিনতা

● থিয়েটার সেণ্টারের নাট্যবিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ অশোক সেন বিবরণ দান করছেন।

● মুক্তিপ্রাপ্ত 'মরুতৃষ্ণা' চিত্রের একটিদৃশ্যে অসিতবরণ ও সবিতা চ্যাটার্জী

রায়, শ্রীঅজিত মিত্র, শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী ও অতিথি অধ্যাপক ডঃ অজিত ঘোষ।

সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠানের পর দুটি একাঙ্ক নাটিকা পর পর মঞ্চস্থ হয়। প্রথমে অভিনীত হয় দীপঙ্কর সেনের 'মুক্তির সন্ধানে' (রাইজিং অব দি মুনের ভাবালম্বনে রচিত), তারপর মঞ্চস্থ হয় শ্রীধনঞ্জয় বৈরাগীর 'অভিনয়'। 'মুক্তির সন্ধানে'র সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগের দ্বারা 'অভিনয়' একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। পঞ্চম পাঠক্রমের ছাত্ররাই দুটি নাটিকায় অভিনয় করেন, প্রথম নাটিকাটি তাঁরাই প্রযোজনা করেন। অভিনয়-নৈপুণ্য ও প্রযোজনা দেখে মনে হল, তাঁদের শিক্ষা সার্থক হয়েছে।

জানা গেল যে, নাট্যবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ পাঠক্রম অবিলম্বে সুরু হবে।

বড়ো পিসীমা

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম সংলগ্ন মঞ্চে আরবান হেলথ সেণ্টার রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে 'বড়ো পিসীমা' নাটক অভিনয় হয়েছে। নাটকটির লেখক শ্রীবাদল সরকার এবং পরিচালনা করেছেন শ্রীসতীপ্রসাদ বসু। হেলথ সেণ্টারের কর্মিবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গের উপস্থিতিতে আনন্দমুখরিত পরিবেশে নাটকটির অভিনয় হয়।

অভিনয়ে অংশগ্রহণকারিগণ সকলেই হেলথ সেণ্টারের কর্মী। বছরে দুয়েকদিন সখের জন্য এঁরা রূপসজ্জা নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন। তা সত্ত্বেও এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রশংসনীয়ভাবে অভিনয় করেছেন।

বড়ো পিসীমার ভূমিকায় শ্রীমতী বীণা সেনগুপ্তা, পিসেমশাই রূপে ডাঃ দেবল সেন, শম্ভুর ভূমিকায় তরুণ মৈত্র এবং অনুর চরিত্রে শ্রীমতী লীলা দাঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিলীপ সাহা, ডাঃ বি সি সান্যাল, শ্রীমতী পি সরকার, শ্রীমতী অণিমা গাঙ্গুলী, কিরণকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মহাজীবন

সুনীল ভঞ্জ রচিত নতুন নাটক 'মহাজীবন' সম্প্রতি মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে। মধুচক্র নাট্য সম্প্রদায় নাটকটি অভিনয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

'মহাজীবন' নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন অবলম্বনে লিখিত। সুভাষচন্দ্রের যৌবনকাল থেকে অন্তর্ধানের কাল পর্যন্ত ঘটনাবহুল জীবনকে নাট্যকার ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এইরূপ নাট্য রূপদান কঠিন কাজ। নাট্যকার যত্ন সহকারে নাটকটিকে তথ্যপূর্ণ করতে চেষ্টা করেছেন, তবে তিনি যে সর্বাংশে সফল হয়েছেন তা বলা চলে না।

সুভাষচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিবানন্দ; তিনি অভিনয়ের জন্য প্রশংসার যোগ্য। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুনীল মুখোপাধ্যায়, অনিল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন রায়, অনিল ভট্টাচার্য। নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রাক্তন কর্মী ক্যাপ্টেন হীরালাল।

সংবাদ বন্দনা

বিশ্বরূপা পুরস্কার

১৯৬৪ সালের বিশ্বরূপা পুরস্কার লাভ করেছেন শ্রীমন্মথ রায়। বিশ্বরূপা থিয়েটারে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পুরস্কার দান করেন।

পরিচালক বীরেন নাগের জীবনাবসান

চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীবীরেন নাগ গত ৭ই সেপ্টেম্বর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে শ্রীনাগের বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর। আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করে ১৯৪৪ সালে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পে শিল্পনির্দেশকরূপে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'বিশ সাল বাদ'। তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'কোহরা'। তার আগে তিনি কয়েকটি বাংলা ছবিতে শিল্পনির্দেশকরূপে কাজ করেছেন।

মৈমনসিংহ জেলায় ১৯২০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও সহোদর ভ্রাতা রেখে গেছেন।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ সাতচল্লিশ ॥

অভিনয় ও অভিযোগ

ঘরের পর্দাটা নড়ে উঠলো। থিয়েটারের কয়েকটা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বিরক্তভাবেই চাইলাম দরজার দিকে। পর্দার ওপার থেকে অতিপরিচিত অভিনেত্রীর কণ্ঠ ভেসে এলো।

—আসতে পারি?

—এসো।

—কাজে বাধা দিলাম নাকি?

—না না, বাধা কি? তাছাড়া কাজ তো তোমাদের নিয়েই—তারপর কি ব্যাপার বলো।

—দেখুন, এখানে তো আমার আর কাজ করা চলে না।

নামকরা অভিনেত্রীর মুখে কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। নতুন নাটক। ক্রমশ বিক্রি বাড়ছে। এমন সময় এ কি সর্বনেশে কথা। তাই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন? কি হোল?

—সেসব কথা আপনাকে বলতে পারবো না। মোটকথা, ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ বুঝতে পারছি যে, আমার পেছনে একটা দল হয়েছে।

—সেকি! কি বলছ তুমি?

—ঠিকই বলছি। আপনি যদি নাচে গিয়ে আমার সিন্‌গুলো দিন-দুই লক্ষ্য করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

—বেশ লক্ষ্য করবো। আর তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার সেই বিপক্ষ দলকে কখনই ছেড়ে কথা কইবো না।

—তার দরকার নেই। কি হবে আমার জন্যে আপনাদের অশান্তি ভোগ করার? বরং আমাকেই ছেড়ে দিন।

—কেন বার বার তুমি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছো? সবেমাত্র নতুন নাটক খোলা হয়েছে। তোমাকে ছাড়ার ইচ্ছাই যদি আমাদের থাকতো—তাহলে ত' নাটক খোলার আগেই তোমাকে বলে দিতাম।

—কিন্তু আমার মন ভেঙে গেছে। এই ভাঙা মন নিয়ে অভিনয় করতে পারবো না আমি।

—বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে কি এমন ঘটলো। সবকথা যদি খুলে বলা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে না হয় লিখে জানাও। অন্ধকারে আমিই বা কি করে, কি করি বলো?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ভাগ্য! আমার ভাগ্য নইলে এমনই বা হবে কেন?

অভিনেত্রীটি কাঁদ-কাঁদভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আর আমি তখন আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলাম। কি এমন ঘটনা ঘটলো যা ও মুখফুটে বলতেও পারছে না অথচ প্রতিটি কথায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

রঙমহল থিয়েটার তখন রিসিভারের হাতে। রিসিভারের হয়ে আমি সব

১১ই সেপ্টেম্বর হইতে চলিতেছে

রাধা - পূর্ণ - আলোছায়া - যোগমায়া (হাওড়া)

২৷৷, ৫৷৷, ৯ ৩, ৬, ৯

শ্রীকৃষ্ণ (বালী) - শ্রীমা (খড়দা) - শ্রীরামপুর টকিজ

রাজকৃষ্ণ (ইছাপুর) - কৈরী (চুঁচুড়া)

লেখাপড়া করি।' মনে মনে ঠিক করলাম ব্যাপারটি যাই ঘটে থাকুক, রিসিভারের কানে কথাটা তোলা দরকার। যাই হোক, হাতের কাজ চাপা দিয়ে রেখে, ঠিক করলাম স্টেজের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসি। উঠতে যাব ইতিমধ্যে জনৈক প্রবীণ অভিনেতা ঘরে প্রবেশ করলেন।

—উঠছ নাকি ব্রাদার ?

—হ্যাঁ। ভাবছিলাম একটু নীচেয় যাব।

—আমি যে উঠে এলাম তোমার ঘরে এককাপ চা খাব বলে।

—বেশ তো, বসুন।

চায়ের অর্ডার দিয়ে প্রবীণ অভিনেতাটিকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা দাদা অমুকের কি হয়েছে বলুন ত' ?

—তুমি শুনলে কার কাছে ?

—এই ত' আপনি আসবার একটু আগে ও আমার ঘরে এসেছিল।

—কি বললে ?

—বললে না কিছুই। শুধু বার বার বলতে লাগলো—এখানে কাজ করা আমার দ্বারায় চলবে না। আমি ছেড়ে দেব। কত করে বললাম, কেন ছেড়ে দেবে ? কি হয়েছে বলো ? কিন্তু কিছুই ভাঙলো না। শুধু যাবার সময় কাঁদ-কাঁদভাবে বলে গেল—ভাগ্য ! আমার ভাগ্য। নইলে এমনই বা হবে কেন ?

—হুঁ। তা এতকাল ঘর করে কপাল যখন পুড়েছে, তখন ভাগ্য বলতে হবে বৈকি।

—কপাল পুড়েছে ? সে আবার কি ?

—আছে, ভায়া আছে। সে তুমি বুঝবে না। তবে হ্যাঁ, তোমার নাটকের গুণ আছে ভায়া। রিহার্সাল থেকে আর এই সাত-আটটা অভিনয়ের মধ্যেই হিরো-হিরোইনের মধ্যে ভাব-ভালবাসাটা বেশ দানা বেঁধেছে। র‍্যাপিড প্রগ্রেস।

—বলেন কি ?

—হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নাটকটাও ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত। এই সুখবরটা তোমায় দিয়ে, তোমার কাছে চা খাব বলেই ত' এলাম।

—নাটক চালানোর দিক থেকে ভাব-ভালবাসার খবরটা হয়ত সুখবর। কিন্তু অল্প বয়সের হিরোটির জন্যে যে দুঃখ হচ্ছে।

—দুঃখ হচ্ছে কেন ? আমি তো বলি, এই ভাল হয়েছে।

—না দাদা, আপনার কথা সমর্থন-যোগ্য নয়। একটা অল্প বয়েসের ছেলে এইভাবে বয়ে যাবে—

—বয়ে যাওয়ার বাকীটা কি ছিল শুনি ? তোমার কাছে একটু আগে কপাল চাপড়ে যিনি ভাগ্যের দোহাই দিয়ে গেছেন, এর আগে হিরোটির যে তার সঙ্গেই—

—এ্যাঁ ! বলেন কি।

—ঠিকই বলছি ভায়া। পাকা খবর।

—কিন্তু হিরোর সঙ্গে যে ওর অন্তত দশবছরের বয়সের তফাৎ।

—তাতে কি। থিয়েটারে এর আগে ওর চেয়ে অনেক বেশি বয়সের তফাৎ আমরা দেখেছি। তাইত বলছি ভাই, তোমার নাটকের গুণ আছে।

—কিন্তু এ তাহলে সত্যি সত্যিই ছেড়ে যাবে নাকি ?

—না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। টীমওয়ার্ক তোমার ঠিকই বজায় থাকবে। তবে ওর এখন থেকে একটা না একটা complain প্রায় রোজই লেগে থাকবে। কোনদিন ভাগ্য দেখিয়ে কপাল চাপড়াবে। কোনদিন হিরো-হিরোইন ওকে স্টেজের ওপর ল্যাং মারার চেষ্টা করছে বলবে। কোনদিন ওদের দুটির দিকে জুলজুল করে চেয়ে থাকবে; কোনদিন বা কটমট করে চাইবে। মোটকথা, নাটক যখন জমেছে, টীমওয়ার্ক বজায় রাখার জন্যে এটুকু তোমায় সহ্য করতেই হবে।

—ভাগ্যিস, আপনি এসে পড়েছিলেন। নইলে ওর কথা শুনে ত' এখুনিই স্টেজে যাচ্ছিলাম, সরেজমিনে তদন্ত করতে।

—তা হলে ঠিক সময় বুঝেই এসেছি বলো ?

—তা এসেছেন বৈকি। কিন্তু ও যে বলে গেল ওর বিপক্ষে একটা দল হয়েছে।

—না না, দল আবার কি। তবে ছেলেছোকরারা এই নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করছে এই আর কি।

—ছেলেছোকরাগুলো তো আপনার কথা শোনে। ওদের একটু বারণ করে দেবেন। এই নিয়ে যেন আর—

—বেশ। তা দেব। ও দু-একদিন নতুন নতুন দু-একটা ফুট কাটবে, তারপর আপনিই চুপ করে যাবে। কিন্তু তোমার নাটক ত' চুপ করে থাকবে না ?

—তার মানে ?

—মানে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মা, ছেলে আর ছেলের বৌ যেখানে কথা বলছে, সেখানে ছেলে যখন বলে—মা তুমি কি। ছেলের মুখ চেয়েও কি এই দুখিনী মেয়েটাকে তুমি সহ্য করতে পার না ? তখন—?

প্রবীণ অভিনেতার কথা শুনে সহাস্যে শুধু তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। উত্তর করতে পারলাম না।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

১৮৭৪-এর শেষ দিকে গ্রেট ন্যাশনালও অভিনেত্রীদের দ্বারাই ফিমেল রোল করাতে লাগলেন। ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন এবং লেঃ গভর্নর রিভার্স টমসন অমৃতলালের বিবাহ বিভ্রাট নাটকে ক্ষেত্রমণির ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় দেখে মন্তব্য করেন, ইংলণ্ডের স্টেজেও এই জাতীয় কুশলী অভিনেত্রী সচরাচর দেখা যায় না। কমিক রোলে পরবর্তীকালে ক্ষেত্রমণি অর্দ্ধেন্দুশেখরের বিপরীতে প্রায় সমানে সমান অভিনয় করতে পারতেন।

নানা রকম উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে চলে শেষ পর্যন্ত গ্রেট ন্যাশনাল বন্ধ হয়ে যায় —এদের বাড়িতেই জমিদার কেদার চৌধুরীর সহায়তায় গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমেই গিরিশবাবু ভাল ভাল শিল্পীদের—যথা বিনোদিনী, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বোস, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখার্জি, ক্ষেত্রমণি এবং কাদম্বিনীকে এখানে একত্রিত করেন।

দু-একটি নাটক মঞ্চস্থ করবার পর ১৮৭৭ সালের পয়লা ডিসেম্বর মাইকেলের মেঘনাদবধ (গিরিশকৃত নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ হয়। দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রে রাম ও মেঘনাদের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয় করেন গিরিশবাবু। নৃমুণ্ড-মালিনীরূপে ক্ষেত্রমণি এবং প্রমীলার চরিত্রে বিনোদিনীর অভিনয়ও দর্শকদের বিমুগ্ধ করেছিল।

এরপর কবিবর নবীন সেনের পলাশীর যুদ্ধকে নাট্যাকারে মঞ্চস্থ করেন গিরিশচন্দ্র। সবারই অভিনয় ভাল হয়েছিল—বিশেষভাবে ক্লাইভের ভূমিকায় গিরিশবাবুর প্রশংসা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ (গিরিশচন্দ্রের নাট্যরূপ) ২৭শে এপ্রিল ১৮৭৮-এ এইভাবে মঞ্চস্থ হয় :

নগেন্দ্র—গিরিশচন্দ্র, শ্রীশ—মহেন্দ্র, বোস, সূর্যমুখী—কাদম্বিনী, কুন্দ—

শিলালি

বিনোদিনী, ইত্যাদি। বিষবৃক্ষের সাফল্য দেখে বেঙ্গল থিয়েটার চন্দ্রশেখর মঞ্চস্থ করে—কিন্তু অভিনয় লোকে নিল না। অবশ্য এদের দুর্গেশনন্দিনী খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গিরিশবাবুও দুর্গেশনন্দিনীর মঞ্চরূপ দিয়ে ১৮৭৮-এর ২২শে জুন অভিনয় সুরু করেন। কেদার-বাবু এবং কিরণবাবুর জগৎ সিংহ ও ওসমান দর্শক নেয় নি—সুতরাং গিরিশ-বাবু নিজে জগৎসিংহ এবং মহেন্দ্র বোস ওসমানের ভূমিকায় নামলেন—এবারে বই জমল।

এর কিছু পরেই থিয়েটারটি হাত বদল হয়ে প্রতাপ জহুরীর কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং গিরিশবাবু অভিনয়কে পেশা হিসাবে গ্রহণ করে থিয়েটারে চাকরী নেন।

এখানে হামির, পলাশীর যুদ্ধ, এবং গিরিশের স্বলিখিত ওপেরা মায়াতরু ও মোহিনী প্রতিমা মঞ্চস্থ হয়। তারপর আলাদীন ও দু'সপ্তাহের জন্য মাধবী-কঙ্কনও অভিনয় করা হয়। ১৮৮১-র ২১শে মে গিরিশ-রচিত 'আনন্দে রহ' নাটকের উদ্বোধন হয়। এ নাটকের কাহিনী রাণা প্রতাপ, আকবর ও মানসিংহকে নিয়ে কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারে কয়েকমাস আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্রুমতী নাটকের (রাণা প্রতাপ সম্বন্ধে) অভিনয় এমনভাবে দর্শকমন টেনে নিয়েছিল যে, তারপরে আর আনন্দে রহ জমলো না।

এরপর গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটক মঞ্চস্থ করতে সুরু করেন। রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার বিবাহ, সীতাহরণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, প্রভৃতি নাটক যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় এবং কি অর্থের দিক দিয়ে, কি যশের দিক দিয়ে, গিরিশ-প্রতিভার জয়জয়কার পড়ে যায়। এই সব নাট্য-রচনার ফলে নাট্যকার হিসাবেও গিরিশচন্দ্র তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাবণ-বধ থেকে সুরু করে তপোবন অবধি (১৯১২) গিরিশবাবু বোধহয় ৭২টি নাটক লিখেছেন—তাঁর পাণ্ডব

● স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু

গৌরব, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, চৈতন্য-লীলা, বিল্বমঙ্গল, জনা, সিরাজদ্দৌলা, শঙ্করাচার্য, তপোবল, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটক কোনোদিন দর্শক বা পাঠকের কাছে পুরানো বলে মনে হবে না।

এরপর প্রতাপ জহুরীর সঙ্গে মতদ্বৈধতার জন্য গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে আসেন। তারপর কেদার চৌধুরী কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ মঞ্চস্থ হয়। অর্ধেন্দুবাবু, মহেন্দ্র বোস, মতি সুর প্রভৃতি অভিনয়ে নামলেও নাটক দর্শকের মনোরঞ্জন করতে পারে নি। আর দু-একটি অসফল নাটক মঞ্চস্থ হবার পর এ থিয়েটার ভেঙে যায়।

গিরিশচন্দ্রকে কিন্তু বেশিদিন বসে থাকতে হয় নি—বাংলার রঙ্গজগতে এরপর একাধিপত্য সুরু হয় স্টারের। সুরু থেকেই স্টারের সঙ্গে গিরিশবাবু যুক্ত ছিলেন। কিন্তু স্টার-প্রসঙ্গ আরম্ভ করবার আগে গ্রেট ন্যাশনালের যুগ সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্রের 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বই থেকে কিছুটা তুলে দিচ্ছি।'

'১৮৭৩ হইতে ১৮৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ছয় কি সাত বৎসর বাংলা থিয়েটারের একটা ধারাবাহিক বিশৃঙ্খলার দিন।

গ্রেট ন্যাশনালে ক্রমাগত স্বত্বাধিকারীর পরিবর্তন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর অধীনে অধ্যক্ষ কখনও ধর্মদাস সুর, কখনও অবিনাশ-চন্দ্র কর, কখনও বা নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; মহেন্দ্রলাল বসু। কেদারনাথ চৌধুরীও ম্যানেজার ও স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই উপেন্দ্রনাথ দাসের পরিচালনেও কিছুদিন গ্রেট ন্যাশনাল চলিয়াছিল।

গিরিশবাবুও এ সময়ে থিয়েটারকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহিরে বাহিরেই ছিলেন, প্রয়োজন হইলে দলের লোকেরা সময় সময় তাঁহাকে ধরিয়া আনিত, তাঁহার উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করিত। তবে এই সময়ের শেষাশেষি তিনি গ্রেট ন্যাশনাল ভাড়া লইয়া নিজে কিছু দিনের জন্য স্বত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন। কিন্তু এসময়ে গিরিশচন্দ্রের অসাধারণ অভিনয়খ্যাতি ভিন্ন অন্য প্রতিভা বিকশিত হয় নাই। কাজেই এ সময় আমরা গিরিশবাবুকে ঠিক রঙ্গালয়ের কর্ণধাররূপে দেখিতে পাই না। অর্ধেন্দুশেখরের অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও স্থায়িভাবে এ সময়ে থিয়েটারে ছিলেন না; মাঝে মাঝে আসিতেন। শিখাইতেন, সাজিতেন, আবার পলাইতেন। নাটকের অভাব, সুপরিচালনার অভাব, অর্থের অভাব, শৃঙ্খলা ও নিয়মের অভাব—থিয়েটারকে যেন একটা বিভীষিকার স্থল করিয়া তুলিয়াছিল—অথচ এ সময়ে প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতার আদৌ অভাব ছিল না।

থিয়েটারের ভিতর ও বাহিরের অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সময়ে নানা হাত ঘুরিয়া গ্রেট ন্যাশনাল মাড়োয়ারী ব্যবসাদারদের হাতে গিয়া পড়িল। প্রতাপচন্দ্র জহুরী ইহার স্বত্বাধিকারী হইলেন। গিরিশচন্দ্র এ সময়ের পূর্ব পর্যন্ত সদাগরী আফিসে চাকরী করিতেন। মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের হাতে পড়িয়া থিয়েটার ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত হইলে গিরিশচন্দ্র আফিসের চাকরী ছাড়িয়া থিয়েটারে কায়েমীভাবে যোগ দিলেন। সে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে। নাট্যকার, অধ্যক্ষ ও নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা এই প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার হইতেই আরম্ভ হইল।

এই থিয়েটারেই গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক বাহির হইল 'রাবণ বধ'। ইহার পর হইতেই বাংলা থিয়েটারের একটা স্থায়ী রূপ আমরা দেখিতে পাই। এতদিন থিয়েটার নাটকের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট তাহার ক্ষীণকায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। আজ দীনবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইয়া, কায়ক্লেশে যেন থিয়েটারের মর্যাদা রাখিতেছিল। তারপর, দুর্ভিক্ষের সময় যেমন অন্নের বিচার থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার তার ছাই-পাঁশ রাবিস, যাহার প্রচলন দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তখন লিখিয়াছিলেন 'ইহা না-টক, না-মিষ্টি,'—এইরূপ নাটক অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ প্রাণশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপুত্র গিরিশচন্দ্র ইহার সেই মৃতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন। তাঁহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল, কেবলমাত্র অভিনয়-প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারা যায় না। নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন; আর এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father ot the Native Stage —ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা একপ্রকার অভিভাবকশূন্য বেওয়ারিশ অবস্থায় টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত-পানে বাংলায় নাট্যশালা এই পঞ্চাশ বৎসরাবধি কাল বাঁচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অমৃতভাণ্ড বহন করিয়া আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র। কাজেই বাংলার নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা তিনিই।' (ক্রমশঃ)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

খেলাধুলা

অলিম্পিকের আধুনিক পর্ব

হিরোশিমা নাগাসিকার চিতাভস্ম থেকে জন্ম নিয়েছে নতুন জীবন, নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা। বিংশতি বর্ষের কঠোর সাধনায় আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত জাপান অতীতের কলঙ্কময় ইতিহাস মুছে ফেলে আজ এশিয়ার মধ্যে অলিম্পিকের অনন্ত জ্যোতি বহন

● পঙ্কজ রায়

করার গৌরব অর্জন করল। অরুণোদয়ের দেশে প্রাণের নব কল্লোলধ্বনিতে উদাত্ত-কণ্ঠে নিমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছে দেশে দেশে। ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্টের সেই অভিশপ্ত দিন। সেই অভিশাপের কণ্টক মুকুট মাথায় নিয়ে সেদিন জন্ম নিয়েছিল যোশিনোরি সাকাই। দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে হানাহানির রুধির-স্নাত সেদিনের সেই নবজাতক আজ তারুণ্যের প্রাণচঞ্চলতায় উদ্দাম ও উদ্বেল। গ্রীসের অলিম্পিয়াতে প্রজ্বলিত হয়েছে অলিম্পিক মশাল, এখন সেই পবিত্র পূতাগ্নি চারটি আধারে

শ্রীঅমিতাভ

জাপানের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে এসে ৮ই বা ৯ই অক্টোবর টোকিওর রাজ্যপাল আজুমার অফিসকক্ষে রক্ষিত হবে। ১০ই অক্টোবরের স্মরণীয় দিনটিতে গ্রীস হতে আনিত আলোকাধার হতে অগ্নি সঞ্চারিত হবে ইম্পিরিয়াল প্যালেসের সম্মুখে স্থাপিত একটি দীপাধারে।

১০ই অক্টোবর জাপানের ঘড়ি যখন ৫-৩০ মিঃ ঘোষণা করবে, ইম্পিরিয়াল প্যালেস থেকে একটি প্রজ্বলিত মশাল আটজন দৌড়বীরের একটি রিলে দল বহন করে নিয়ে যাবে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামের দ্বার-দেশে অলিম্পিকের পবিত্র পূতাগ্নি গ্রহণ করবেন ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ যোশিনোরি সাকাই। সেই পূতাগ্নি হস্তে সমস্ত স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করে সাকাই, স্টেডিয়ামের মধ্যস্থলে রক্ষিত দীপাধারের কাছে যাবেন প্রায় ১৭৯টি সোপান অতিক্রম করে। তারই হাতে অলিম্পিকের পূতাগ্নি নবগরিমায় উজ্জ্বল হয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবে নবজীবনের জয়গান।

জাপানের অলিম্পিক দল

প্রায় দেড় হাজার বছরের বিস্মৃতির পর অলিম্পিকের নবজন্ম হয় ১৮৯৬ সালে—অলিম্পিকের লীলাভূমি গ্রীসের এথেন্সে। তারপর থেকে অলিম্পিকের জয়যাত্রা বন্ধ হয় নি, কেবল যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া। এবছর টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিক এশিয়ার পুণ্যভূমিতে প্রথম

● চিত্রে হিরোশিমা সহরের এক মিউজিয়মে রক্ষিত বিধ্বংসী আণবিক বিস্ফোরণের ফলে ভয়াবহ দৃশ্যের অঙ্কিত একটি চিত্রের দিকে ভ্রমণকারীদের বিস্ময়ান্বিতভাবে তাকাইয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে।

অনুষ্ঠিত হবে। ৯৩টি দেশের প্রায় আট হাজার প্রতিযোগীর মিলনে টোকিও অলিম্পিক হয়ে উঠবে প্রাণচঞ্চল, উজ্জ্বল এবং উৎসবমুখর।

স্বীয় মাতৃভূমিতে অলিম্পিকের আসরকে সর্বাঙ্গীণ সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সারা জাপান আপ্রাণ চেষ্টা করছে। জাপানীদের চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং বৈশিষ্ট্য অসম্ভবকে সম্ভব করা। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এবার জাপানে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রতিযোগী যোগদান করবে। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে জাপান সাধারণ স্তরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। জিমনাস্টিকে জাপান চারটি স্বর্ণপদক লাভ করে, বেসরকারী তালিকায় একাদশ স্থান দখল করে। জাপানের জনপ্রিয় খেলা জুডো এবার টোকিও অলিম্পিকে প্রতিযোগিতায় তালিকাভুক্ত হয়েছে। প্রায় ২৯টি দেশ জুডোতে অংশ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জুডোর জনক জাপান, জুডোরই দেশ স্বর্ণপদক আহরণ করবে বলে মনে হচ্ছে। এই জুডোতে এশিয়ার অগ্রগণ্য দেশ জাপানের, অলিম্পিকের আসরে সাঁতারে পদক পাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। সিমিজু, উমে নোটো, তামিটো এবং সিগের উপর জাপানের সন্তরণ সাফল্য নির্ভর করছে। মুষ্টিযুদ্ধে একমাত্র লাইট ওয়েটে সিরাটোরি জাপানের পক্ষে সম্মান লাভ করতে পারেন। জিমনাস্টিকে রাশিয়ার প্রাধান্য সত্ত্বেও, জাপান এবার রোমের ফলাফল অপেক্ষা আরও ভাল ফল প্রদর্শনের দৃঢ় আশা রাখে।

এ্যাথলেটিকসে জাপানের সম্ভাবনা তেমন আশাপ্রদ নয়। জাপানের দ্রুতগামী দৌড়বীর হিদো ইজিমা মাত্র কিছুদিন পূর্বে ১০·১ সেকেণ্ডে একশত মিটার অতিক্রম করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অলিম্পিকের আসরে ইজিমার কোন স্থান পাওয়া খুবই শক্ত হবে। হ্যামার থ্রোতে তাকিও সুগাওয়ারা যে একটি পদক লাভ করবেন তা অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস। জাপান দলের হকির মান অনেক উন্নত হয়েছে বর্তমানে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম তিনটি স্থানের মধ্যে আসার আশা তাদের নেই বললেই চলে। যাই হোক, শেষে এই কথাই বলব যে অলিম্পিকের আসরে জাপানের প্রতিযোগীদল তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

আবেদন মঞ্জুর

ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল শেষ পর্যন্ত ৫৩ জনকে টোকিও অলিম্পিকে পাঠাতে সম্মত হয়েছে। ভারোত্তোলনে তিনজন প্রতিযোগীকে পাঠানোর সুযোগ দেওয়ায় ক্রীড়ামোদীরা আনন্দিত হয়েছে। কারণ ভারোত্তোলনে ভারতের লক্ষ্মীকান্ত দাস টোকিওর আসরে কোন পদক লাভ করলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তবে মুষ্টিযুদ্ধে আরও একজ··ক দলভুক্ত করলে ভালই হত। কারণ ভারতের মুষ্টিযোদ্ধাদের এশিয়ান গে··র সাফল্যের কথা চিন্তা করেই আমি এ কথা বলছি ১০০ মিটার রিলে রেস এবং ৮০০ মিটারের ট্রায়ালের পর হয়ত এ্যাথলেটিকসের প্রতিযোগী সংখ্যা বৃদ্ধি হতে পারে। ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পক্ষে শ্লেফ-দ্য-মিশনের ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌, কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

29 SEP 1969

ভৌগোলিক পৃথিবীর মত গল্পলোকের
অশেষ বৈচিত্র্যময়
অনন্য সাহিত্য-সম্ভার

শারদীয়
সাপ্তাহিক বসুমতী
১৩৭৬

* মহালয়ার পূর্বেই প্রকাশিত হবে *

লিখেছেন :

বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী	:	প্রেমেন্দ্র মিত্র
শহরের মধ্যবিত্ত জীবন-কাহিনী	:	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
গ্রামোন্নয়নের ফলাফল শীর্ষক ব্যঙ্গ গল্প	:	পরিমল গোস্বামী
রোমান্সধর্মী রহস্য গল্প	:	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সমাজধর্মী রোমান্টিক গল্প	:	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অরণ্য-কাহিনী	:	সমরেশ বসু
রম্যরচনা	:	সৈয়দ মুজতবা আলী
বাঙালী পরিবারের ঘরোয়া গল্প	:	আশাপূর্ণা দেবী
বাংলার রেঁনেশাস যুগের কাহিনী	:	সুশীল রায়
একটি আষাঢ়ে গল্প	:	লীলা মজুমদার
মন্ত্র শিল্পের পৌরাণিক রূপক গল্প	:	মৈত্রেয়ী দেবী
বিদেশের পটভূমিকায় মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী	:	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
একালের বৈঠকী গল্প	:	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনী	:	উশীনর
চমকপ্রদ শিকার-কাহিনী	:	রণজিৎকুমার রায়
একটি অনুদঘাটিত মামলার কাহিনী	:	সুভাষ সমাজদার

ও ভিন্নধর্মী গল্পে আরো অনেকে।

'জরাসন্ধে'র উপন্যাসোপম
কারাগারের বৃহত্তম অজানা কাহিনী
"রাজাবাহাদুর"

বাণী রায়ের খণ্ড উপন্যাস
বিচিত্র প্রেম-কাহিনী
"জল"

॥ প্রতিটি কাহিনীতে প্রিয় লেখকদের স্বকীয় সৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর ॥

● রূপ রস বিষয় ও ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র ●

মননশীল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লিখেছেন : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয় ঘোষ, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সেন, তরুণ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

মূল্য আড়াই টাকা

সাপ্তাহিক
বসুমতী

বিপুল ভোটাধিক্যে
অনাস্থা প্রস্তাব
অগ্রাহ্য।

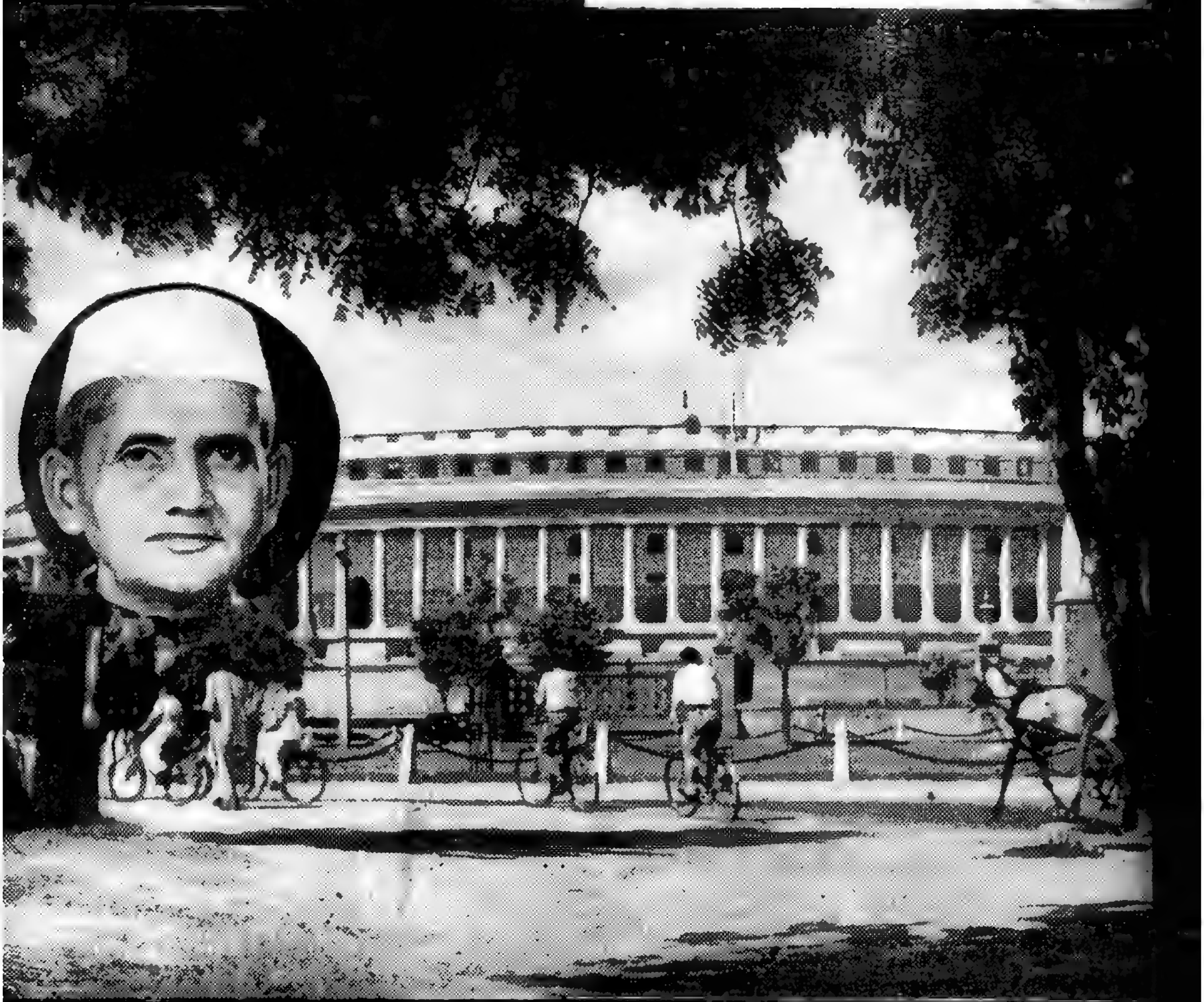

র্ষ, ১৮-শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 24th September, 1964 • Vol. 69, No.

756.3
·002/3
V.69 no.18

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১০৯১
আজকের মানুষ	...	১০৯২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১০৯৩
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১০৯৬
ভারতদর্শন	...	১০৯৮
আন্তর্জাতিক	...	১১০৪
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১১০৯
অতীত ও বর্তমান (কবিতা)	পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	১১১২
প্রেমিকা (কবিতা)	সমীরণ চৌধুরী	১১১২
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১১১৩
অন্য তরঙ্গ	সুব্রত	১১১৭
আঁধার মাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১১১৮
হাওয়াই গাটার (কবিতা)	সুনীল বসু	১১২০
বিপ্রলব্ধ (কবিতা)	সন্দীপকুমার সেনগুপ্ত	১১২০
ডিম্বাকৃতি চিত্র (অনুবাদ-গল্প)	উষাপতি চক্রবর্তী	১১২১
টোকিওর চিঠি	মিত্রেন	১১২৩
খড়ের বাছুর (গল্প)	দুলাল পাল	১১২৮
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১১৩১
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১১৩৩
বঙ্গদর্শন	...	১১৩৭
পা[illegible] মন	...	১১৪২
রঙ্গজগৎ	...	১১৪৩
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১১৪৭
র[illegible]দেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১১[illegible]৯
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১১৫১

ভৌগোলিক পৃথিবীর মত গল্পলোকের
অশেষ বৈচিত্র্যময়
অনন্য সাহিত্য-সম্ভার

শারদীয়
সাপ্তাহিক বসুমতী
১৩৭৬

এ সপ্তাহেই প্রকাশিত হলো

লিখেছেন :

বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী	: প্রেমেন্দ্র মিত্র
শহরের মধ্যবিত্ত জীবন-কাহিনী	: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
গ্রামোন্নয়নের ফলাফল শীর্ষক ব্যঙ্গ গল্প	: পরিমল গোস্বামী
রোমান্সধর্মী রহস্য গল্প	: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সমাজধর্মী রোমাণ্টিক গল্প	: নরেন্দ্রনাথ মিত্র
অরণ্য-কাহিনী	: সমরেশ বসু
রম্যরচনা	: সৈয়দ মুজতবা আলী
বাঙালী পরিবারের ঘরোয়া গল্প	: আশাপূর্ণা দেবী
বাংলার রেনেশাঁস যুগের কাহিনী	: সুশীল রায়
একটি আষাঢ়ে গল্প	: লীলা মজুমদার
মন্ত্রশিল্পের পৌরাণিক রূপক গল্প	: মৈত্রেয়ী দেবী
বিদেশের পটভূমিকায় মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী	: সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
একালের বৈঠকী গল্প	: মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
একটি ত্রেতাযুগীয় প্রেম	: আশা দেবী
রোমাঞ্চকর ভৌতিক কাহিনী	: উশীনর
চমকপ্রদ শিকার-কাহিনী	: রণজিৎকুমার রায়
একটি অনুদ্ঘাটিত মামলার কাহিনী	: সুভাষ সমাজদার

ও ভিন্নধর্মী গল্পে আরো অনেকে।

'জরাসন্ধে'র উপন্যাসোপম	বাণী রায়ের খণ্ড উপন্যাস
কারাগারের বৃহত্তম অজানা কাহিনী	বিচিত্র প্রেম-কাহিনী
"রাজাবাহাদুর"	'জল'

।। প্রতিটি কাহিনীতে প্রিয় লেখকদের স্বকীয়
সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর ।।

রূপ রস বিষয় ও ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র

মননশীল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় লিখেছেন : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বিনয় ঘোষ, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক সেন, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ ঘটক, কল্পতরু সেনগুপ্ত এবং আরো অনেকে।

মূল্য আড়াই টাকা

সাপ্তাহিক
বসুমতী
সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৬১ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন ১৩৭১ Thursday, 24th September 1964

গুপ্তধনের সন্ধানে

হিসাব বহির্ভূত কালো টাকা উদ্ধারের জন্য আমাদের সরকার নাকি কৃতসংকল্প। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী রাজ্যসভায় অন্তত সেই সংকল্পের কথাই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু যে কালো টাকার খেলায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সাধ স্বপ্নে বিলীন হতে চলেছে, সেই টাকার অঙ্কটাই বা কত? কারো কারো মতে, যে বিরাট পরিমাণ কালো টাকার মাহাত্ম্যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল হতে বসেছে, সেই টাকা যদি উদ্ধার করা যায় তাহলে সহজেই সরকার আর-একটি পরিকল্পনায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারেন। ঐ টাকা সরকারের আওতায় এলে দেশরক্ষার খাতে বর্তমানে স্থিরীকৃত অর্থ সঠিক রেখে জনকল্যাণের কাজে অধিকতর অর্থ ব্যয়িত হতে পারে। অপরপক্ষে সাধারণ দরিদ্র মানুষ মজুতদার ও কালোবাজারীর হাত থেকে রক্ষাও পাবে। এ ছাড়া বিদেশের কাছেও ঋণের জন্য সরকারকে হাত পাততে হবে না।

গোপনে সঞ্চিত অর্থ ও লুক্কায়িত সোনাদানার খবর আমাদের সরকারের যে অজানা, তা বলা যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলি থেকে বাড়তে বাড়তে এই কালো টাকার অঙ্ক নাকি ৩০০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত জয়পুর কংগ্রেস অধিবেশনে মোটামুটি এই হিসেবটাই তুলে ধরা হয়েছিল। তবু কালো টাকার মালিকদের ধরার মতো নির্মম সৎসাহস সরকার দেখাতে পারেন নি। ১৯৪৭ সালে গঠিত আয়কর তদন্ত কমিশন এই টাকা উদ্ধারের জন্য একটা পরিকল্পনা সরকারের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বছর পনের আগে শ্রীনেহরুও এই কালো টাকা বের করে দেবার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রের জঘন্যতম শত্রু কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার কোনো 'মারাত্মক' নীতি গ্রহণ না করার জন্যে তাদের দৌরাত্ম্য এমনই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আজ তারা যেন রাষ্ট্রশক্তিকেই চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কেন না, যে রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুত, সেই কল্যাণ আজ অর্থপিশাচদের কালো টাকার খেলায় আকাশ-কুসুম হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭ সালে আয়কর তদন্ত কমিশনের প্রাথমিক রিপোর্টের পর অনেক জল ঘোলা হয়েছে। কালো টাকার মাহাত্ম্যে এক শ্রেণীর মানুষ বেনামীতে কারবার চালাচ্ছে, সময় ও সুযোগমতো গ্রাসের অন্ন মজুত করে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে, আর আমদানীর দর চড়া ও রপ্তানীর দর কম দেখিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করছে। সরকারের অর্থনীতিকে এইভাবে আর কোনো দেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যা হোক ১৯৬৪ সালে সরকার যখন সচেতন হলেন, আইন তৈরি করলেন, তখন কালো টাকার মালিকরাও আরো সতর্ক হয়ে হিসাব বহির্ভূত সেই টাকা নিয়ে নতুন খেলা সুরু করলেন। সরকারও সজাগ হলেন রোমাঞ্চকর এই গুপ্তধনের রহস্য সন্ধানের জন্য। কয়েকজন 'তারকা'র কিছু কালো টাকা বের হল; এর পরের অবস্থা যথা পূর্বং তথা পরং।

অবশ্য বর্তমান অর্থমন্ত্রী অতীত জীবনে বড় ব্যবসায়ী হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। কালো টাকার হদিস বের করা তাঁর পক্ষে হয়তো অসম্ভব নয়। এখন তিনি কালো টাকার পেছনে ধাওয়া করুন, আর নিরুপায় আমরা তাঁর সংকল্প স্মরণ করে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিলীন হই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ক্ষমা ক'রবার যোগ্যতা আছে কার? শান্তির বুলি কার মুখে সাজে?—'ক্ষমা' শক্তিমানের গুণ। শক্তিহীনের ভূষণ। যেমন রাশিয়ার পক্ষেই শান্তিপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। ভারত পারে শান্তির আবেদন জানাতে। তাই খ্রুশ্চফের মত দেশনেতা যখন বলেন: 'পৃথিবীর উপরিস্থিত জীবনের নামে, সর্বমানবের সুখের নামে, মানবজাতির ভবিষ্যতের নামে দৃঢ় ও অটল হ'য়ে পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, সর্বাত্মক ও পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ দাবী করুন।'—আমরা আশ্বস্ত হই। কিংবা তাঁর মুখেই—'আমাদের হাতে অভূতপূর্ব শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র আছে'—শুনে বিচলিত হই না। যুদ্ধোত্তর যুগে বস্তুত বিশ্ব-ইতিহাসে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী নিকিতা, সের্গেইয়েভিচ খ্রুশ্চফ এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিত্ব। বিশ্ব-ইতিহাস রচনায় লেখনী ধারণের দায়িত্ব তাঁর অনেকখানি।

তাঁর জীবনের অতীতের পৃষ্ঠাগুলো উল্টালে যেন আজকের রাশিয়ারই ক্রমইতিকথার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া হয়। তিনি নিজেই বলেছেন—'বিপ্লব আমাদের দেশের সকল শ্রমিক, সকল মেহনতী মানুষের কাছে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছে। আমি সেই বৈপ্লবিক অগ্রগতিরই আরেক দৃষ্টান্ত।'

আজ যিনি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার সভাপতি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রথম সম্পাদক, তিনি প্রথমজীবনে ছিলেন মেষপালক। আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে য়ুরোপীয় রাশিয়ার কুর্স্ক অঞ্চলে কালিনোভকা পল্লীর এক দীনতম ভূমিদাসের পরিবারে তাঁর জন্ম। ক্রমশ তিনি ধনী জমিদারের ক্ষেতমজুরের কাজ করেছেন, কারখানায় ফিটার মিস্ত্রীর কাজ শিখেছেন। আর সেই সঙ্গেই চালিয়ে গেছেন পড়াশোনাও। এই বয়সে তাঁর ভাল লাগত এমিল জোলা আর কার্লমার্ক্সের শ্রমিক-বিপ্লবের কাহিনী। অত্যাচারী জার শাসকের নজরে শ্রীখ্রুশ্চফ ছিলেন শ্রমিক-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। এ ১৯১২ থেকে '১৫ সালের কথা। এর পর '১৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মহান নেতা লেনিনের অধিনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হ'ন রাশিয়ায়। সাধারণ জনতাই তখন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। শ্রীখ্রুশ্চফ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন এখানেই। '১৮ সালে যোগ দিলেন পার্টিতে। প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই আসে প্রতিরোধ। সেদিন সদ্যোজাত সোভিয়েটকেও সংগ্রাম করতে হ'য়েছিল পুঁজিবাদী সব দেশের বিরুদ্ধে। আজকের শান্তির অতন্দ্র সৈনিক শ্রীখ্রুশ্চফ সেদিন ছিলেন স্বাধীনতার স্থিরপ্রতিজ্ঞ যোদ্ধা।

এর পরের অধ্যায় অনেকটাই আত্মপ্রস্তুতির। দনবাসে এক কয়লাখনির সহকারী ম্যানেজার হিসেবে তিনি চাকরী পেলেন। পার্টি-সংগঠকের পাঠ নিলেন শ্রমিক ফ্যাকাল্টিতে। মস্কোর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকাডেমির ছাত্র হ'লেন। এইভাবে একদিন দেশবিশ্রুত হ'লেন মস্কোর এক জেলা পার্টি কমিটীর সেক্রেটারী, পরে, মস্কো রিজিওনাল পার্টি কমিটী ও শহর পার্টি কমিটীর সেক্রেটারী হিসেবে। '৩৪ সাল থেকেই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রতিবার নির্বাচিত সদস্য। '৩৮ সালে উক্রাইনের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রথম সম্পাদক হ'লেন। তাঁর কর্মজীবনের সাফল্যের সুদীর্ঘ ইতিকথা বিবৃত করার পক্ষে এ পরিসর নিতান্ত সীমিত। দুঃখক্লিষ্ট জনগণের একান্ত কাছের মানুষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর-নায়ক শ্রীখ্রুশ্চফ '৪৯ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর সম্পাদক ও মস্কো রিজিওনাল কমিটীর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। '৫৩ সালে কেন্দ্রীয় কমিটীর প্রথম সম্পাদক এবং পরিশেষে '৫৮ সালে মন্ত্রিসভার সভাপতি হ'য়েছেন।

সদাকৌতুকপ্রিয় বিদগ্ধ দূরদর্শী রাজনীতিক এই মানুষটির মনের খোরাক সাহিত্য আর সংগীত। গম্ভীর মুখের কথায় বিশ্ববাসীকে চমকে দিতে পারেন, আবার প্রাণখোলা উচ্ছকিত হাসিতেই সবাইকে কাছে টানতে পারেন নির্বিশেষে। অনেকে তাই বলেন খ্রুশ্চফ এক 'ভয়ঙ্কর ভাল মানুষ' (!) তা—যাই হোক, তাঁর সতেরো বছর বয়সের তারুণ্য আজ সত্তর বছরেও যে অম্লান আছে এটা সর্বৈব সত্য। কৈশোরে শ্রমিক খ্রুশ্চফ লড়েছেন জীবিকা আর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য।

এন.এস.খ্রুশ্চফ

আর আজও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী প্রবীণ শ্রমিক অক্লান্ত আছেন সারা দেশের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে। দিগন্তে দৃষ্টি বিছিয়ে অপেক্ষায় আছেন সেদিনের—যেদিন পৃথিবীতে নামবে যুদ্ধহীন শান্তির ছায়া। নিরীহ যুদ্ধক্লান্ত মানুষ ভয়মুক্ত হ'য়ে খুঁজে পাবে নিশ্চিন্ত জীবন-তপোবন। শ্রীখ্রুশ্চফ তাই এখন যথার্থ শ্রমিক। বিশ্বশান্তির ইমারত গড়ার অন্যতম যুগান্তকারী অবিশ্রাম শ্রমিক।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

জেমো-কাঁদিতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মস্থান দেখলুম।

সভা হোল। অনেক কথা শোনা গেল। কাঁদির রায়-মশাইরা এবং অঞ্চলের গণ্যমান্য সকলেই ত্রিবেদী মশায়ের জন্মশতবর্ষপূর্তির উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করেছেন সর্বান্তঃকরণে।

সভায় গান শুনছিলুম। খুব গরম ছিল সেদিন। পদ্মফুলের মালা গাঁথবার ভঙ্গিটি অভিনব মনে হয়েছিল। গান শুনতে শুনতে সেই মালা দেখছিলুম। সেই সময়ে রায়-পরিবারের প্রবীণ একজন আমাকে বললেন—'এই কথাটাও শুনে রাখুন। রামেন্দ্রসুন্দর গয়ায় গিয়েছেন শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করলেন। আর, মনে মনে প্রার্থনা জানালেন। কী প্রার্থনা? তাঁর সে-প্রার্থনার কথা আমরা শুনেছি। তিনি চেয়েছিলেন—এই মর্ত্য জীবনে আবার যেন না ফিরে আসতে হয়।'

জীবন সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের এ-মনোভঙ্গি নিয়ে আমি আগে কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। সময়-ধারণা, কর্মফল, পাপ-পুণ্য, আলো-অন্ধকারের চেতনা, প্রিয়-অপ্রিয়বোধ—সাহিত্যে মানবমনের এই রকম নানা-কথাই নিজেদের চিহ্ন রেখে যায়। তাঁর সাহিত্যেও সে-সব কিছু কিছু লক্ষ্য করা গেছে। আমিও সে-সব দেখেছিলুম। কিন্তু মৃত্যুর পরে এই মানব-জীবনেই আবার ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন,—এবং সে-সম্ভাবনা আছে, এই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আর ফেরবার ইচ্ছে নেই বলেই তিনি প্রার্থনা করে গেছেন—এ-খবর তুচ্ছ নয়।

আমি তাই পদ্মের মালা দেখবার উপভোগ স্থগিত রেখে, মন দিয়ে খবরটি শুনেছিলুম। ভেবেছিলুম শ্রীযুক্ত শৈলেন্দুনারায়ণ রায় মশায়কে এ-বিষয়ে পরে জিগেস করবো। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

জেমো-কাঁদির সেই বিকেলটি নিবিড় শ্রদ্ধার পরিমণ্ডল হয়ে উঠেছিল। সকলেই ভারি ভক্তিভরে সম্মিলিত হয়েছিলেন। আমরা বিশেষভাবে তাঁরই জীবৎকালের কথা ভেবেছিলুম।

সভার পরেও আমরা অনেকে অনেক কথা বলেছিলুম। নীল আকাশ দেখেছিলুম। গাঢ়-সবুজ গাছপালার বেষ্টনী-ঘেরা সেই দৃশ্যপটে পরমাশ্চর্য একটি বিকেল সেদিন ভারি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন, সময় নিয়ে অন্য উদ্বেগ ছিল বটে। জেমো-কাঁদির সেই সভার পরেই আবার আমরা পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। রাধাঘাটে পৌঁছে গঙ্গা পেরিয়ে বহরমপুরে যেতে হয়েছিল। নদীর ওপর তখন চাঁদ উঠেছে। ওপারে যেতে-যেতেও আমরা কেবল ওপারের কথাই ভাবছিলুম,—জীবনের পরপারের কথা মনে হয়নি। বহরমপুরের দিকেই মন ছিল। সেখানে আর-একটি ত্রিবেদী-সভা ছিল। চাঁদের ঝাপসা আলোয়, পাতলা মেঘে-ঢাকা আকাশের নিচে সেই নদীর ওপর ভাসতে-ভাসতে হঠাৎ মনে পড়েছিল রামেন্দ্রসুন্দরের 'জগৎ-কথা'র দুটি শব্দ—'মেলা' আর 'মেশা'। প্রথমটি তিনি রাসায়নিক সম্মিলন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। দ্বিতীয়টি সাধারণ মিশ্রণ অর্থে।

এসব স্মৃতি হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। গভীর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না মনের। কিছু প্রমাণ করতে চায়নি সে। মনের পটে শুধু এই অস্পষ্ট ধারণা দেখা দিয়েছিল যে—সব মানুষ বোধ হয়, জগতের সঙ্গে ঠিক মিলতে আসেন না। তাঁরা মেশেন বটে,—অনেকে অনেকের সঙ্গে মেশেন। অনেক রকম ইচ্ছে-অনিচ্ছের সঙ্গে মেশেন তাঁরা, অনেক সুখদুঃখের ছায়াবাজি দেখেনও। কিন্তু অনেক কিছু দেখতে-দেখতেও মেলেন না।

আমি জানি না, এ-কথা ঠিক হচ্ছে কী না। যা মনে হয়েছিল তাই লিখছি। বোধ হয়, নিরাসক্তি-ব্যাপারটাই এই রকম। এখানকার সবই দেখছি,—সকলের সঙ্গেই আছি, কিন্তু কিছুতেই আত্মহারা হচ্ছি না,—এই ভাবটাই তো অনাসক্তি। বোধ হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের ভেতরে সেই অনাসক্তি ছিল।

অনেক দর্শনের প্রবন্ধ লিখে গেছেন তিনি। লিখেছেন যে, আমাদের সাংখ্য আর বেদান্ত ভিন্ন পরিভাষায় জগৎ সম্বন্ধে একই মত জানিয়ে গেছেন। এই বাহ্য জগৎ পঞ্চভূতে তৈরি। লিখেছেন—'সাংখ্যের মহাভূত ও বেদান্তের স্থূলভূত, উভয়েই তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র।'

এসব তত্ত্বসন্ধানের পরিশ্রমে যাঁরা রাজী আছেন, তাঁরা রামেন্দ্রসুন্দরের পরিশ্রমের দিকটাই বোধ হয় বেশি দেখেছেন। কিন্তু তাঁর আরো একটি দিক দেখবার যোগ্য। সেদিন রাধাঘাট থেকে বহরমপুরে যেতে যেতে বর্ষা-শেষের গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে আমার মনে জেগেছিল সেই দিকটি।

মনে হয়েছিল যে, পৃথিবীতে যে সব মানুষ মিলতে আসেন, তাঁদের সমস্যা এক ধরনের; যাঁরা মিশতে আসেন তাঁদের অন্য ধরনের। কেউ কেউ এখানকার রূপে রসে মিশে থাকেন; তাঁরা সকলের ব্যবহারের ঘড়ি ধরেই

চলেন বটে, কিন্তু তাঁদের গভীর মনের ভেতরে ভেতরে কাজ করে অন্য সময়বোধ।

রামেন্দ্রসুন্দর বোধ হয় সেই রকম বোধের মানুষ ছিলেন। তাই গয়াতে অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করে তিনি তাঁর যোগ্য প্রার্থনাই করেছিলেন—আমাদের চিরাভ্যস্ত সময়প্রবাহে তিনি আর ফিরতে চাননি।

'জিজ্ঞাসা' বইখানির 'মায়াপুরী' প্রবন্ধের কথা মনে পড়েছিল। তাতে তিনি ডারুইনের বিবর্তনবাদের কথা তুলেছিলেন। কথায়-কথায় বিদ্যাসাগর মশায়ের 'বোধোদয়ে'র কথাও উঠেছিল। প্রাকৃতিক-নির্বাচন তত্ত্বটি তিনি আমাদের লোকবিশ্রুত ঈশ্বর-ধারণার পাশাপাশি দেখিয়ে কেমন যেন ব্যঙ্গ করেছিলেন—

> 'বোধোদয়ে পড়া গিয়াছিল, ঈশ্বর সকল জীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্তা। কথাটা ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ধরাধান নামক চিড়িয়াখানার মালিক সহস্র কোটি জীবকে এই চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্ন-সংগ্রহের জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে ধরিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাবে কষ্ট হইবে না; অতএব পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর।'

এই মর্ত্যজীবনে মর্ত্যের মানুষকে তার সময়-ধারণা আর বিশ্ববিধানের ধারণা,—দুটিকে এইভাবে একসঙ্গে মিশিয়ে দেখতে হয়। রামেন্দ্রসুন্দর নিজের সত্তার গভীরে অনাসক্তি বজায় রেখে,—অর্থাৎ তিনি নিজে তাঁর নিজস্ব আধ্যাত্মিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত থেকে, লোকজগতের কালপ্রবাহবোধ বিশ্লেষণ করে গেছেন।

জীবমাত্রেই আত্মরক্ষার জন্যে তার অস্তিত্বের পক্ষে যে আয়োজন অনুকূল, সেই আয়োজনই বেছে নেবে,—প্রতিকূল যা, তা বর্জন করবে। রামেন্দ্রসুন্দর একেই বলেছিলেন—'হেয় বর্জন' আর 'উপাদেয় গ্রহণ'। কিন্তু অনুভূতি না থাকলে 'হেয়ই' বা কী,—'উপাদেয়ই' বা কী? সুখ লাভের ইচ্ছে থাকতে হবে, দুঃখ পরিহারের সংকল্পও জাগা দরকার। এই ইচ্ছা-অনিচ্ছাই তো উচ্চ শ্রেণীর জীবের জন্মগত সংস্কার।

সেদিন রাধাঘাটের দিকে ফিরে দেখেছিলুম আবছা আকাশের দেয়াল

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

দাঁড়িয়েছিল আমাদের পেছনে। আমাদের সামনে তখন বহরমপুরের ঘাটের আলো। নদীর আরো উজানে প্রকাণ্ড এক পুলের সিলুট। সদ্যনির্মিত সেতু। স্রোতে ভেঙে গেছে তারই একাংশ। দেখলুম সে-দৃশ্য।

সেই ছবি দেখতে-দেখতে মনে পড়েছিল আমাদের এই জীবলোকে সহজ সংস্কারের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক দেখিয়ে গেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। বুদ্ধিবৃত্তি আমাদের জীবন-রক্ষার অনুকূল। হয়তো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়েই মানুষের এই বুদ্ধিও দেখা দিয়েছে। সেই বুদ্ধিবলেই আমরা বিশ্বজগতের পর্যবেক্ষক। হয়তো সেই বুদ্ধিবলেই রামেন্দ্রসুন্দর এ-জগতের দুঃখজালে আর ফিরতে চান নি।

'বিচিত্র জগৎ' বইখানিতে তাঁর একটি প্রবন্ধের নাম দিয়েছিলেন 'প্রজ্ঞার জয়'। তাতে বলেছিলেন যে, বলির পাঁঠা সার-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে,—যেটার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়লো এই মুহূর্তে, তার পাশেরটা তা দেখলো বটে, তবু নির্বিকার মনে পাতা চিবুচ্ছে। এ রকম ব্যাপার যে ঘটতে দেখা যায়, তার কারণ কী?

কারণ, নিম্নস্তরের জীবের বুদ্ধির অভাব। পশুপক্ষী সময়কে কতোটুকুই বা দেখতে পায়? মানুষের দৃষ্টি সময়ের আরো অনেক বৈচিত্র্য দেখতে পায়। এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডার ইত্যাদি কবিরা তাঁদের মননগুণে সময়কে কেবল এক সত্তার আত্মচিন্তায়, পরিবর্তন-স্বীকৃতিতে কিংবা শুধুই আত্মরক্ষার সম্পর্কে সমাপ্ত বলে দেখেন নি। কেবলমাত্র একটি সরল রেখায় প্রসারিত ব্যক্তি-হৃদয়ের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখাটা সনাতন,—এবং চিরাভ্যস্ত সাহিত্যে তাঁরা সময়বিচিত্রার ছেদ ও সমান্তরাল গতিই দেখেছেন। এঁরা এই অর্থেই আধ্যাত্মিক। ততোধিক কিছু নয়।

হয়তো এ সবই খেয়ালমাত্র। কিন্তু এই খেয়ালের নামই 'প্রজ্ঞা'। রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন—প্রজ্ঞাই স্রষ্টিকর্ত্রী—'ইহা রূপের জগৎ অবলম্বন করিয়া একটা নামের জগৎ-রচনা করিয়া ফেলে।' প্রজ্ঞাই আমাদের 'concept' দেয়। সে-কাজ সহজ সংস্কার বা instinct-এর কাজ নয়।

আমি আজ এসব কথা লিখতে ইতস্তত করছি। সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে মাঝে মাঝে হাওয়া এই রকমই ভারি হয়ে যায়, কিংবা এ হয়তো অতিশয় পাংলা হয়ে যাবারও উদাহরণ। এসব অঞ্চলে আমাদের সাধারণ, অভ্যস্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সহজ ভাবটা পাওয়া যায় না। চলতে কষ্ট হয়। তবু চলি আমরা।

চড়াইয়ের উঠবার কষ্ট আছে,—আবার সুখও আছে। তা হোক, তা যাক্। আমি এ-পথে আজ আর এগিয়ে যাবার চেষ্টা করবো না। সংসারে সাক্ষাৎভাবে আমরা নিজেরা যেটুকু দেশের মধ্য দিয়ে এবং যেটুকু কালের মধ্য দিয়ে আসি-যাই, সেইটুকুই তো আমাদের সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের সীমা। তার বাইরেটা অচেনা। আমরা তবু প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত দেশেরও ধারণা রাখি, প্রত্যক্ষ-বহির্ভূত কালেও অবিশ্বাসী নই! সাহিত্যেও সেই প্রজ্ঞারই জয় হয়। এই তো নিয়ম।

সময় সম্বন্ধে একালের লেখকদের প্রজ্ঞার খেলা দেখতে-দেখতে,—সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কথা থেকে এই কথাই আমার মনে এসেছিল। লেখক, শিল্পী ইত্যাদি যাঁরা সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের সাধনার এই প্রত্যক্ষের বাইরে যাবার তাগিদটুকু লক্ষ্য করবার জন্যেই এইসব ভারি হাওয়ার অঞ্চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। এইবার সহজ কথায় ফেরা যাক্।

এই কিছুদিন আগে, শিল্পের ক্ষেত্রে কর্তব্য—এ-বিষয়ে সহজ কথাটি অনেকবার অনেক ভঙ্গিতে লিখেছেন কানাই সামন্ত মশাই—তাঁর 'শ্রীনন্দলাল বসু' বইখানিতে। সেখানেও প্রজ্ঞার কথা আছে,—ভক্তের অপরোক্ষ দর্শনের কথাও তিনি লিখেছেন। অবনীন্দ্রনাথের কথা তুলে দিয়েছেন তিনি—'বর্ণ মেশায় না চোখ, বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল বা ম্লান দেখিতেছে তাহারই ওজনটুকু নীলে মেশানোই বর্ণকে ভঙ্গি দেওয়া।' অবনীন্দ্রনাথই বলেছিলেন—'আমি কালি দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি, যদি মনের রঙটুকু সেই কালিতে মেশাই'

সাহিত্যে শিল্পিসমাজের এইসব অনুভূতির দিকও বিবেচ্য। এইসব অনুভূতির রীতি একটু অন্য ধরনের। য়ুরোপের আধুনিক সাহিত্যে তাই কতো যে রীতি, কতো যে খেয়াল!

তাই এ-চিন্তাস্রোতে এইবার য়ুরোপের সাহিত্যের কথা উঠছে। সেইদিকে নজর ফেরানো যাক্। (ক্রমশঃ)

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যাবতীয় রচনা দুই খণ্ডে সঙ্কলিত)

উভয় খণ্ডই সম্পাদনা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের গবেষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এবং তৎকর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত ও প্রতিটি বই বিশ্লেষিত।

প্রথম খণ্ডের সূচী:

নাটক॥ পাষাণী। তারাবাই। রাণা প্রতাপসিংহ। দুর্গাদাস। সাজাহান। মেবার-পতন। **প্রহসন॥** কল্কি-অবতার। বিরহ। প্রায়শ্চিত্ত। **কবিতা॥** আর্য্যগাথা (১ম)। আর্য্যগাথা (২য়)। আষাঢ়ে। হাসির গান। **গদ্য রচনা॥** একঘরে। কালিদাস ও ভবভূতি। **পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী।**

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী:

নাটক॥ সীতা। ভীষ্ম। সোরাব রুস্তম। নূরজাহান। চন্দ্রগুপ্ত। সিংহল বিজয়। পরপারে। **প্রহসন॥** বঙ্গনারী। ত্র্যহস্পর্শ। পুনর্জন্ম। আনন্দ-বিদায়। **কবিতা॥** মন্দ্র। আলেখ্য। ত্রিবেণী। গান। **গদ্য রচনা॥** বিলাতের পত্র। চিন্তা ও কল্পনা। **ইংরেজী কবিতা॥** LYRICS OF IND। **পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী।**

প্রথম খণ্ড: সাড়ে বার টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড: পনর টাকা

প্রথম খণ্ড পূর্বেই বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল। উভয় খণ্ডই লাইনো হরফে মজবুত কাগজে ঝরঝরে ছাপা; কয়েকটি সুন্দর ছবি সমন্বিত। স্বর্ণাঙ্কিত রেক্সিন বাঁধাই: সুন্দর প্রচ্ছদপট ও শোভন সংস্করণ। সংগ্রহে রাখার মত বই।

রচনাবলী সিরিজের আমাদের আর কয়েকটি বই:

বঙ্কিম রচনাবলী ১ম

সমগ্র উপন্যাস একত্রে [১২·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী ২য়

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য [১৫·০০]

রমেশ রচনাবলী

সমগ্র উপন্যাস একত্রে [৯·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত:

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন [২৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা ৯

গ্রন্থ মেলা

বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন: ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। মূল্য: সাড়ে বারো টাকা।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত ও স্বীকৃত প্রতিভার অধিকারী ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আজো বাংলা সাহিত্যের অনাবিষ্কৃত দিকগুলিকে অনন্যসাধারণ গবেষক ও সাহিত্য-সাধকরূপে জ্ঞানের আলোকে ভাস্বর-মণ্ডিত করে তুলছেন। মঙ্গলকাব্য থেকে লোকসাহিত্য এমন কি মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন উদ্‌ঘাটনেও যে পারদর্শিতার তিনি পরিচয় দিয়েছেন, তার খ্যাতি তাঁকে বাংলা দেশের মধ্যেই সীমিত রাখে নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক থেকে শিশিরকুমার স্মৃতি পুরস্কার দিয়ে তাঁকে যেমন সম্মানিত করা হয়েছে, তেমনি সোভিয়েট সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বাংলা ভাষার সম্পদকে তাদের সামনে তুলে ধরে তিনি এক অসাধারণ কাজ করেছেন। ডক্টর ভট্টাচার্যের বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস দুই সুবৃহৎ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্য সেখানেই থেমে থাকেন নি বাংলা, সামাজিক নাটক ও মঞ্চ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর অফুরন্ত অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের প্রকাশ ঘটেছে বর্তমানে প্রকাশিত উপরোক্ত গ্রন্থটিতে।

ডক্টর ভট্টাচার্যের Dramatic conscience যে কি গভীর, এই গ্রন্থটিতেও তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মঞ্চ বিষয়ে তাঁর নাড়ীজ্ঞান তুলনাহীন। অন্যান্য অধ্যাপকদের রচিত নাট্য-গ্রন্থের সঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থের মূলগত প্রভেদ এইখানেই এবং যাঁরা সত্যিকারের নাটকের বিবর্তন সম্পর্কে কিছু জানতে চান, তাঁদের কাছে উপরোক্ত গ্রন্থটি অপরিহার্য। ডঃ

জয়ন্তী সেন

ভট্টাচার্যের গ্রন্থে অযথা কোনো বক্তব্য ঠেসে, গুঁজে গ্রন্থটিকে বিভীষিকার বস্তু করে তোলা হয় নি। বাঙালীর মানস-প্রকৃতির সঙ্গে যোগ রেখেই গ্রন্থটিতে দুর্লভ বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে। সেই বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কোথাও অপ্রাসঙ্গিক হয়েছেন। এরিস্টটলের পোয়েটিক্সের নিয়ম-কানুন খাটাবার জন্য বিষয়কে অযথা ভারগ্রস্ত করে তোলেন নি। পাশ্চাত্য সমালোচকরাও ঠিক এই নিয়মটি পালন করে থাকেন। Aeschylus, Sophocles, Euripides-এর নাটক পড়ে বা দেখে এরিস্টটল ট্র্যাজেডির যে সব নিয়ম-কানুন বেঁধে দেন—বার্নার্ড শ'র নাটক বা গলসওয়ার্দির নাটকের সমালোচনার সময় সেসব নিয়ম প্রয়োগ করা হাস্যকর—একথা পাশ্চাত্যের সমালোচকেরা ভালোভাবেই জানেন।

সাহিত্যালোচনার মূলসূত্র: —দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়, নবভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কল—৯। মূল্য: তিন টাকা।

নবীন অধ্যাপকরা যেমন গ্রন্থের বিষয়ের দিকে অধিক মনোযোগ রাখা অপেক্ষা খ্যাতিমান অধ্যাপকদের আশীর্বাণীর দিকেই সর্বাধিক নজর দান করা প্রয়োজনীয় মনে করেন—আলোচ্য পুস্তিকার সূচনায় পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার সেই মনোবৃত্তির প্রকাশ রয়েছে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য পুস্তিকাটি ছাত্রদের জন্য রচিত, সাধারণ পাঠকরাও পাঠ করলে উপকৃত হবেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় কোথাও নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করার মতো সাহস দেখান নি। পূর্বসূরীদের আলোচনাকে ভিত্তি করেই তাঁর প্রতিটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। অতি আধুনিক পর্বের প্রস্তাবনিকা অসম্পূর্ণ, যেমন কাব্যাংশে অজিত দত্তের নামোল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এমনই অনেক ত্রুটি উপেক্ষণীয় নয়।

রাষ্ট্র: সম্পাদক: নির্মল বসু। কার্যালয়: ১৫৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ব্লক—এন, রুম নং ৮, কলকাতা-৬ মূল্য: এক টাকা।

বাংলা ভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটিতে বর্তমান সংখ্যায় লিখেছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ সনদের

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

সংশোধন সমস্যা' সম্পর্কে শিশিরকুমার সান্যাল, 'প্রকৃতি', সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা'র ওপর স্নেহময় চাকলাদার, 'জওহরলাল নেহরুর রাষ্ট্রচিন্তা' সম্বন্ধে প্রভাতকুমার পালিত।

এছাড়া হর্ষবর্ধন, কালিদাস চক্রবর্তী, ও রাণী মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ মূল্যবান। পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে অশোককুমার মুখোপাধ্যায় অনূদিত জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার'। 'রাষ্ট্র' পত্রিকার উল্লেখ্য বিভাগ হচ্ছে 'গ্রন্থপরিচয়'। দুঃখের ব্যাপার বর্তমান সংখ্যায় ঐ বিভাগটি অল্পপরিসরে সীমাবদ্ধ। আর একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, বিশ্ব-রাজনীতির ও রাষ্ট্রের থিয়োরী সম্পর্কে আমরা যতোই চিন্তা করি না কেন, স্বদেশের রাজনীতিকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি না। বর্তমান সংখ্যায় তার পরিচয় বড়ই নগণ্য; এমন কি একালের লাঞ্ছিত জনসাধারণের দুঃখ-বেদনার কথা এতোই সীমাবদ্ধ যে, তা এই পত্রিকার পক্ষে গৌরবের বিষয় নয়। তবু পত্রিকাটি নানা দিকের বিচারে অদ্বিতীয় ও অনন্যসাধারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে এটি অপরিহার্য।

স্বাস্থ্য দীপিকা : পরিচালক : শ্রীনিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। ২, ফরডাইস লেন, কলিঃ ১৪। প্রতি সংখ্যা ৪০ পয়সা।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত এই মাসিক পত্রিকাটির ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত। 'সর্পাঘাত ও প্রতিকার', 'মানব সেবায় এক্স-রে', 'হার্ট খারাপ?' 'সুস্থতা, রোগ ও জীবাণু' প্রবন্ধগুলি মূল্যবান। 'মনে ছিল আশা' গল্পাকারে তথ্যমূলক নিবন্ধ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত হলেও এর ভাষা কিছুটা সংযত হওয়া উচিত ছিল। 'গর্ভাবস্থায় কি কি খাবেন' প্রবন্ধটি সুলিখিত হলেও সর্বস্তরের মানুষের উপযোগী নয়—বিশেষত 'যারা দিন আনে দিন খায়' তাদের জন্যও একটি উপযুক্ত খাদ্য-তালিকা থাকা উচিত ছিল।

নূতন পরিবেশ : সম্পাদক : প্রশান্ত গায়েন। ১০বি, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কলিঃ ১২। মূল্য : এক টাকা।

পত্রিকাটি পড়লেই সুস্থ রুচির পরিচয় লাভ করা যায়। নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'মেঘনাদ কাব্য প্রসঙ্গে' যা বলেছেন তাতে মতদ্বৈধ থাকলেও তা যুক্তিপূর্ণ এবং নতুন তথ্যজ্ঞাপক। আশিস সান্যালের 'কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা' প্রবন্ধটি নিরপেক্ষতা ও মননশীলতায় চমৎকার। একাঙ্ক নাটিকা লিখেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ। কৃষ্ণ ধর, তরুণ সান্যাল প্রভৃতির কবিতা উল্লেখযোগ্য। 'সমাজ দর্পণ' বিভাগ দুটি পত্রিকাটির সম্পদ। বিদেশী সাহিত্য ও আর্ট সম্পর্কেও নতুন বিভাগ থাকা উচিত।

চুল পাকছে?
চুল পড়ছে??
চুল রুক্ষ হচ্ছে???

বেঙ্গল কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল
মেখেই দেখুন না ...

বয়স আপনার যাই হোক না কেন, এর ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা রাখে-চুল হয়ে উঠে পরিপুষ্ট—চিক্কণতা ও কমনীয়তা বাড়ে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

ভারত দর্শন

● পালাম বিমানঘাঁটিতে ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার প্রজাতন্ত্রের অর্থমন্ত্রী শ্রীবমানি (বামে)।

রাজধানী

রাজধানীর আকাশ অনেকটা মেঘমুক্ত। শরতের শুভ্র পুঞ্জ পুঞ্জ হাল্কা মেঘ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে-সেদিকে নীল আকাশের কোল বেয়ে। একটু জমাট বাঁধলে আবার হয়তো দু-এক পশলা বর্ষণ হবে। বর্ষণ না হলে গর্জনেই ঘটবে তার পরিসমাপ্তি। তারপর আসবে প্রশান্তি।

রাজধানীর রাজনৈতিক আকাশও প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা তাল রেখেই চলেছে। ছ'দিন একনাগাড়ে শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে স্বচ্ছ, শুভ্র না হলেও পুঞ্জ পুঞ্জ বিচ্ছিন্ন মেঘের সঞ্চার কিছুটা হয়েছিল সংসদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে। সামান্য গুমট গরমেরও সৃষ্টি হয়েছিল। গুরু গর্জনও শোনা গিয়েছে কখনও-সখনও। তাতে কোন প্রলয়ের সৃষ্টি হয় নি। প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যেই অগ্রাহ্য হয়েছে। হওয়ার কথাও ছিল তাই। কারণ এটাই আশ্বিনের প্রকৃতির নিয়ম। মেঘে মেঘে ঘর্ষণের পর একটু বিদ্যুতের চমকানিতেই তার শেষ। অন্ধকারে কোন রকমে যারা পথ চলে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যায় সে বিদ্যুতের আলোতে। পথিক হয়ে পড়ে বেশি করে বিভ্রান্ত।

অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনায় চোখা-চোখা শাণিত যুক্তিবাণ নিক্ষেপ করে সরকারকে কাবু করে তোলার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন বিরোধী দলগুলো। সরকারকে কাহিল করে তোলা তো দূরের কথা, সংসদীয় বিতর্কের উঁচু মানের পরিচয়ও তাঁরা দিতে পারেন নি। গর্জনের অংশটুকু বাদ দিলে বাকিটা বৈচিত্র্যবিহীন —একেবারে একঘেয়ে। দু-একজনের বক্তৃতায় বিদ্যুতের ঝলকটা ছিল। কিন্তু তা-ও মনে দাগ কাটার মত নয়।

একযোগে মিলিত আক্রমণ না হলে বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা যায় না—ক্ষুরধার যুক্তিজাল বিস্তারের জন্য উপযুক্ত পটভূমিকারও প্রয়োজন আছে। এ জিনিসটি না থাকলে, দ্বিধা ও কুণ্ঠার ভাবটা কাটে না—আসে না বলিষ্ঠতা, দৃঢ়তা ও সংহত শক্তি। তাতে আক্রমণ জোরদার হয় না—নিক্ষিপ্ত যুক্তিবাণ নিজেদের গা ঘেঁষে চলে যায়—লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। বিরোধী দলের এক পক্ষ ভারত সরকারের পররাষ্ট্র-নীতির অন্ধ সমর্থক। আরেক পক্ষ পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরিয়ে হা-পিত্যেশ নয়নে তাকিয়ে আছেন। পশ্চিমী শক্তির কোলে বসে কামান দাগাতে না পারলে ভারতের আত্মরক্ষার বিপদের কথা তাঁরা ভাবছেন। দেশের চরম খাদ্যসঙ্কটের মীমাংসার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতভেদ কম নয়। কেউ চান খাদ্যশস্যের ব্যবসা পুরাপুরি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে। আবার কেউ খোলা বাজার বন্ধের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত। কাজেই বাঁধাধরা ছকের বাইরে কেউ যেতে পারেন নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর জবাব ছাড়া সরকার পক্ষের অন্য কারো জবাবেও নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায় নি। অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী খুব দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়েছেন, প্রতিরক্ষার এবং উন্নয়ন কাজের ব্যয়হ্রাস করা হবে না। বিদ্যুতের ঝলকানি ভিন্ন যুক্তির সারবত্তা খুঁজতে গেলে হতাশ হতে হয়। কেউ তো এ প্রশ্ন তোলে নি। প্রতিরক্ষার ব্যয়হ্রাস কারোই কাম্য নয়। উন্নয়নের যে-সব কাজে

হাত দেওয়া হয়েছে তা সুসম্পন্ন করতে কেউ বারণও করে নি। কাজেই এ বক্তব্য পেশের কোন প্রয়োজনও ছিল না।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রায় দু'ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছেন। সংসদে এই তাঁর

● শ্রীকৃষ্ণমাচারী

দীর্ঘতম বক্তৃতা। ভাষার সুষমা ও ঔজ্জ্বল্য না থাকলেও জবাবের মধ্যে ফুটে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। যেরূপ নিপুণতার সঙ্গে তিনি বিরোধী পক্ষের অভিযোগ একের পর এক খণ্ডন করেছেন, তাতে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণও তাঁর প্রশংসা না করে পারেন নি। নীতিবাক্য উচ্চারণ না করে, ভাবাদর্শের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে বাগাড়ম্বরের অবতারণা না করে সরাসরি সহজ ও সরল ভাষায় জানিয়েছেন, দেশের সমস্যা সম্পর্কে সরকার সজাগ এবং সমস্যার সমাধানে চেষ্টার কোনই ত্রুটি হবে না।

পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অনুসৃত নীতি থেকে সরে যাবার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করে বলেছেন, নেহরুর পররাষ্ট্র-নীতি থেকে সরকার একচুলও সরে যায় নি।

এ প্রশ্ন যাঁরা তুলেছিলেন তাঁরাও ইতিহাসের কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। কে.ন অবস্থাই স্থিতিশীল নয়। সময় ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আসে নতুন দায় ও দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যাঁদের ওপর এসে বর্তায় তাঁদের পক্ষে পূর্বসূরীদের পরিত্যক্ত পথে পদচারণা করা সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। সময়োপযোগী কাজ সমাধা করতে উত্তর-সাধকদের কিছুটা কৃতিত্ব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শাস্ত্রীজী সে কথাও কৌশলে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে কসুর করেন নি।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শেই করার আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। আগামী দু'মাস কষ্টভোগের পর দেশের খাদ্য সরবরাহের কোন অসুবিধা হবে না বলেও তিনি জানিয়েছেন। খাদ্য সম্পর্কে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা চলতে থাকবে। তবে, এর ফল পেতে ছ' থেকে আট বছর লাগবে। প্রতি বছরই কিছুটা উন্নতি হবে।

সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সংযোগের অভাব, ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ কালোবাজারে পাচারের কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। দুর্নীতির অভিযোগ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে উঠলে তার প্রতিকারের আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন। দ্রব্য-মূল্য আয়ত্তের মধ্যে রাখার, খাদ্যশস্যের, বস্ত্রের মূল্য নির্ধারণের সঙ্কল্প তিনি নতুন করে ঘোষণা করেছেন। খাদ্যশস্যের করপোরেশন আগামী জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে চালু হবে এবং একে পরীক্ষামূলক রাষ্ট্রীয় ব্যবসা হিসেবেই গণ্য করা হবে।

শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভা এই সব কাজে যতটা সাফল্য লাভ করবেন—দেশের ভবিষ্যৎ তার ওপরেই নির্ভর করবে। আমরা আগেও বলেছি, এর জন্য তাড়াহুড়ো করে অনাস্থা প্রস্তাবের প্রয়োজন ছিল না। অনাস্থা প্রস্তাব এনে সামান্য গুমট আবহাওয়ার সৃষ্টি ছাড়া আর কোন লাভ হয়েছে বলে আমরা মনে করি নে।

* * *

ট্যাঙ্গানিকা ও জাঞ্জিবার প্রজাতন্ত্রের অর্থমন্ত্রী শ্রীপল বমানি নয়াদিল্লীতে এসেছিলেন। রাজধানীতে অবস্থান-কালে তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী, অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী, বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

মাদ্রাজ ঃ

তামিল জাতীয় দলের প্রায় সকল সদস্যই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। মাদ্রাজে রাজনৈতিক দল আগাছার মতই গজিয়ে উঠেছিল অনেকগুলো। তার একটা অন্তত কমলো।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার এ-ঘটনাকে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের

● শ্রীকামরাজ নাদার

সংহতির পথে বিরাট পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেছেন। তামিল জাতীয় দলের বিলুপ্তিসাধনে কংগ্রেস সভাপতির ভূমিকাও খুব প্রশংসনীয়। তিনি দলের

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। সমাজতন্ত্রীদের সংহতির যে-উদাত্ত আহ্বান তিনি সেদিন দিয়েছিলেন, তাতে কাজও হয়েছিল যথেষ্ট। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হবে বলে তিনি সেদিন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। দলের নেতা শ্রী ই ভি কে সম্পথের কাছ থেকে যেদিন তিনি ৫৩ হাজার সদস্যের কংগ্রেসে যোগদানের আবেদনপত্র গ্রহণ করেছিলেন।

ডি-এম-কে থেকে সদলবলে বেরিয়ে এসে তামিল জাতীয় দল গঠন করেছিলেন শ্রীসম্পথ ১৯৬১ সালে। প্রথম দিকে তাঁকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল। সভা-সমিতি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। শ্রীসম্পথের প্রায় প্রতিটি সভাই ভেঙে দিত ডি-এম-কে'র অনুগামীরা। শ্রীসম্পথ ও তাঁর সাথীদের শারীরিক নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করতে হয়েছে।

শ্রীসম্পথ দৃঢ়চেতা মানুষ। সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তিনি দলকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিন বছরের মধ্যে দু'হাজারের ওপর দলের 'ইউনিট' তিনি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর দলের প্রতিটি সদস্য নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ। তা' ছাড়া প্রতিটি সদস্য দলের আদর্শে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং দ্রাবিড়-কাজাগামীদের মতই একাগ্রচিত্তে দলের কর্মসূচী অনুসরণ করে থাকে।

এই সুসংহত ও সুসংগঠিত দল কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধিতে অনেক সহায়ক হবে। অনেকগুলো শ্রমিক সংগঠনও এদের সঙ্গে কংগ্রেসে এসে যাচ্ছে। এখন আর মাদ্রাজ কংগ্রেসকে ভাড়াকরা শ্রমিক দিয়ে শ্রমিক সমাবেশের কলেবর বৃদ্ধি করতে হবে না।

• • •

সালেম ইস্পাত কারখানার দাবী জোরদার করার অভিপ্রায়ে দ্রাবিড়-মুন্নেত্র-কাজাগাম নেতা শ্রী সি এন আন্নাদোরাই সর্বদলীয় আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। এ আবেদনের পেছনে ভক্তবৎসলম-মন্ত্রিসভার নিপুণ হস্তের খেলা আছে বলে কোন কোন মহলে গুঞ্জন উঠেছে। সালেমে পাঁচ হাজার টনের একটা ছোট ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ মেসার্স দস্তুর এণ্ড কোম্পানী করা সত্ত্বেও এখনও এ ব্যাপারে কোন কিছু করা হয় নি। কেন্দ্রীয় ইস্পাতমন্ত্রী যা' বলেছেন, তাতে অদূরভবিষ্যতে এ-কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কার্যকরী হবে কি না, এ সন্দেহ জেগেছে সর্বত্র। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি প্রচুর সম্ভাবনার দিক বিবেচনা করে গোয়া ও বিশাখা-পত্তনমে ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার অধিক পক্ষপাতী। সালেমের কারখানার কাজে অচিরে হাত দেবার দাবী বাতিল না করলেও শ্রীরেড্ডি যা বলেছেন তার মোদ্দা কথা হল, জাতীয় সাশ্রয়ের দিক বিচার-বিবেচনা করেই স্থির করা প্রয়োজন চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ইস্পাত উৎপাদনের নতুন কারখানা খোলার হবে। এতে মাদ্রাজ সরকার অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছেন। সালেমে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠার আশ্বাস তাঁরা দিয়েছিলেন। এর রাজনৈতিক গুরুত্বও সেইজন্য সমধিক। এই পরি-প্রেক্ষিতেই কাজাগাম নেতা আন্দোলনে অংশীদার হতে কংগ্রেসকেও অনুরোধ জানিয়েছেন। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধ থেকে কংগ্রেসকে মুক্ত করা এবং নিজের দলকে জনসমক্ষে সে সুযোগে তুলে ধরাই আন্নাদোরাইর প্রধান লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীভক্তবৎসলম সহজে কোন আন্দোলনের বিরোধিতা করেন না। কাজাগাম নেতার আন্দোলনের প্রস্তাব সম্পর্কেও তিনি নীরব।

● শ্রীআন্নাদোরাই

● শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি

● শ্রীভক্তবৎসলম

সালেম ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যতের ওপর কংগ্রেসের আগামী নির্বাচনের সাফল্যও অনেকখানি নির্ভর করে। রাজনীতির পণ্ডিতদের ধারণা, এই কারণেই আড়ালে থেকে আন্নাদোরাইয়ের আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে বাধ্য।

মহারাষ্ট্র:

মজুতদার-জোতদার ও পাইকারদের গোপন গুদাম থেকে খাদ্যশস্য উদ্ধারের অভিযানে আশানুরূপ কোন সুফল পাওয়া যায় নি। সরকার নিরুপায় হয়ে

জেলায় জেলায় মন্ত্রীদের পাঠাবার মনস্থ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীরা এক-একটি জেলার ভার গ্রহণ করবেন এবং সে জেলার ব্যবসায়ীরা যাতে মজুত শস্যের সঠিক পরিমাণটা মন্ত্রীদের গুনিয়ে দেয় সেভাবে কাজ করা হবে।

এতেও কোন কাজ হবে না। তোয়াজ ও তোষামোদে কোনদিন অসাধু ব্যবসায়ী সাধু সাজে বলে আমরা শুনি নি। সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করার পথ আলাদা। তাদের টুঁটি চেপে না-ধরতে পারলে কোনদিনই তারা পথে আসে না। মহারাষ্ট্র সরকার যে-পথ অবলম্বন করছেন, তাতে লোক-দেখানো হৈ-চৈ সার হবে এবং তার সঙ্গে সরকারী ভাণ্ডারের মোটা অঙ্ক খসে যাবে মন্ত্রীদের রাহা খরচ জোগাতে।

রাজ্য সরকার স্থির করেছেন গোপন গহ্বর থেকে যে-খাদ্যশস্য বেরিয়ে আসবে তার ৪০ ভাগ যাবে ন্যায্য মূল্যের দোকানে এবং বাকীটা বিক্রি হবে খুচরা দোকানের মাধ্যমে। খুচরা দোকানে মাল সরবরাহের এবং পাইকারদের মুনাফার সীমা এখনও সরকার নির্ধারণ করে উঠতে পারেন নি। অক্টোবরের শেষের দিকে নাকি এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

* * *

গোয়াবাসীদের পানীয় জলের চাহিদা মেটাবার জন্য মহারাষ্ট্র সরকার নবমুক্ত এলাকার নদীর জলের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

মহারাষ্ট্রের সেচমন্ত্রী শ্রী এস আর চ্যাবনের সঙ্গে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদয়ানন্দ বন্দোদকারের এ বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে। শ্রীচ্যাবন নাকি কোলাপুর ও সবন্তবতীর দুটি নদীর জলের গতিপথ ঘুরিয়ে দিতে রাজীও হয়েছেন।

গুজরাট :

প্রস্তাবিত সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় হবে তা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল মতবিরোধের। গুজরাট কংগ্রেসের উপদলের নেতা শ্রীরসিকলাল পারিখ এর ফয়সালার জন্য একেবারে দিল্লীর দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছেন। প্রায় প্রতিটি প্রধান শহরের মাতব্বরেরা

শ্রীরসিকলাল পারিখ

চাইছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্যালয় তাঁদের শহরে করতে। দাবীর সপক্ষে যুক্তিও কেউ কম দেন নি।

গুজরাট সরকার অবস্থা দেখে নিয়োগ করেছিলেন একটি কমিটি। কমিটী তার সুপারিশ দাখিল করার পর আবার নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। সৌরাষ্ট্রবাসীরাই উত্তেজিত সব চাইতে বেশি। কমিটী তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেন নি। কমিটী ভবনগরে সৌরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছেন। প্রাক্তন সৌরাষ্ট্র সরকারের রাজধানী রাজকোটে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

শ্রীবলবন্তরাও মেহতা

প্রধান কার্যালয় হতে পারে তার জন্যই চেষ্টা চালাচ্ছেন বিরোধীরা।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পড়েছেন অত্যন্ত ফাঁপরে। তিনি উপায়ান্তর না-দেখে, এ ব্যাপারে আরেক দফা বিচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

* * *

প্রায়ই দেখা যায় কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার মধ্য থেকে একটু অবসর পেলেই নিরিবিলিতে অন্যমনস্কভাবে মানুষ যা করে, তার মধ্যে ধরা পড়ে তার আসল স্বরূপটি। খুলে যায় তখন তার সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা। বিশ্বকবির সামনে [illegible] করেই খুলে গিয়েছিল চিত্রাঙ্কনের অপরিসীম ক্ষমতা।

ভারতের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের অধিবেশনে অনেক সময় বসে বসে কাগজের ওপর দাগ টেনে যেতেন। খেয়াল মুহূর্তের তাঁর সেই কালির টান সাদা কাগজে অনেক সময় একটা কিছু হয়ে উঠতো। কখনও হয়তো কিছুই হত না। তিনি সেই মুহূর্তেই ছিঁড়ে অথবা পুটলী করে ফেলে দিতেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবলবন্তরাও মেহতা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকাকালে প্রধানমন্ত্রীর সেই দলা-পাকানো, ছেঁড়া পাতাগুলো সংগ্রহ করেছিলেন সযত্নে। শ্রীমেহতার সংগৃহীত সেই ছবিগুলো মোটা টাকায় কিনে নিতে চাইছেন আমেরিকার কয়েকটি সংস্থা।

খেয়ালের বশে আঁকা ছবি এখন অমূল্য সম্পদে পরিণত হতে চলেছে। হয়তো এর ভেতরে ধরা পড়বে স্রষ্টা নেহরুর আসল রূপটি। রাজনীতিতে জীবন উৎসর্গ না করলে, নেহরু একজন বিশ্ববিশ্রুত চিত্রশিল্পী ও কবি হতে পারতেন কি না, তার সাক্ষ্য হয়তো এ ছবি দিতে পারবে।

গোয়া :

গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী লেঃ গভর্নর সচদেবকে সামলাতে পারছেন না। সব ব্যাপারেই সচদেব নাক গলাতে চেষ্টা করছেন। সামান্য ব্যাপার নিয়েও

তিনি এত মাথা ঘামাতে চেষ্টা করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদয়ানন্দ বন্দোদকারের পক্ষে প্রশাসন কাজ পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাঁর এই অযাচিত ও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীর দরবারে নাকি আর্জি পেশ করেছেন।

শ্রীসচদেব স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছেন বলেও মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন।

এ বিরোধের আশু মীমাংসা না হলে, সাংবিধানিক সঙ্কট সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করেন।

মধ্যপ্রদেশ:

প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এ-বছর। বিরাট এলাকা জলমগ্নও হয়েছিল। তবু, এ-বৃষ্টি আশা ও ভরসার সঞ্চার করেছে চাষীর মনে।

মধ্যপ্রদেশের শস্যভাণ্ডার ছত্তীশগড়ের চাষীরা অবিশ্যি এখনও শেষ-বর্ষণের আশায় আছে। দেরিতে প্রবল বর্ষণের ফলে জোয়ার, ভুট্টা ও বাজরার ক্ষতির আশঙ্কাও কেউ কেউ করছে। এখানকার দরিদ্র-সাধারণের প্রধান খাদ্য এই তিনটি ফসল।

এ তো গেল ভবিষ্যতের আশা-ভরসার কথা। বর্তমান অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। চাষীর ঘরে এবং মজুতদারের গোপন গহ্বরে শস্য যা-কিছু আটকে আছে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে তা বেরিয়ে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। চাল ও ভুট্টা ছাড়া সব জিনিসের দামই বেড়ে চলেছে। সরু চালের দাম কমেছে প্রতি কুইণ্টালে দশ টাকা করে। কিন্তু মোটা ও মাঝারী চালের দাম একটি পয়সাও কমে নি। ভুট্টার দাম গেল জুন মাসের তুলনায় কমেছে প্রতি কুইণ্টালে সাত থেকে আট টাকা।

জোয়ার ও বাজরার দাম বেড়ে গেল দু'মাসের মধ্যে প্রতি কুইণ্টালে পনের টাকা। গেল বছরের তুলনায় জোয়ার ও বাজরার মূল্য বেড়েছে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ। গম, ডাল ও তেলের দাম বেশ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। অভাব যে-সব এলাকায় বেশি, সে-সব অঞ্চলে গম পাওয়াই দুষ্কর। প্রতি সের গম বিক্রি হচ্ছে দু'টাকা ছ'পয়সা করে।

রেওয়া বিভাগের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এ-অঞ্চলের রাস্তাঘাট খুবই কম। যানবাহন চলাচলের তেমন ব্যবস্থা নেই। প্রচণ্ড বর্ষণে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এখনও অনেক অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে আছে। সরকারী সাহায্য কেন্দ্রে অচল অবস্থা। মানুষ তার শেষ সম্বল বেচে দিয়ে ফতুর হয়েছে।

উপজাতিদের কষ্ট চরমে উঠেছে। অর্ধাহার ও অনাহারে দিন চলছে।

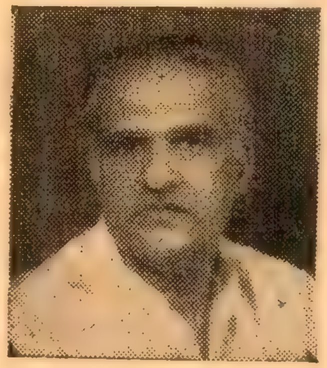

● শ্রীগৌতম শর্মা

গাছের পাতা ও ঘাসের মূল অনেকের প্রধান খাদ্যে পরিণত হয়েছে। বস্তার ও সিধি জেলার উপজাতিদের অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছিলেন বিধান-সভার দুজন সদস্য। সরকার তা 'প্রপাগাণ্ডা' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

সব চাইতে মজার ব্যাপার, এই খাদ্যাভাবের কথাটা মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী স্বীকারই করতে চান না। তাঁদের যুক্তি আলাদা। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের তুলনায় মধ্যপ্রদেশে খাদ্য-শস্যের মূল্য অনেক কম। অতএব

মধ্যপ্রদেশের খাদ্য-পরিস্থিতি স
জনক। কথায় আছে, যাঁরা ঘ
ভাণ করে ঘাপটি মেরে থাকেন,
জাগানো হাজার চেষ্টাতেও সম্ভ
না। পাশের দুটি রাজ্যই ঘাটতি অ
তাদের নির্ভর করতে হয় বা
আমদানীর ওপর। মধ্যপ্রদেশ
শস্যের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত অঞ্চল।
শস্যের মূল্য ঘাটতি দুটি র
তুলনায় কম হওয়া স্বাভাবিক।

সরকারী কর্মচারীরা
অভাবনীয় যুক্তির অবতারণা করে
তাঁদের মতে, চোরাকারবার ও
চালানের সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধির
সম্পর্ক নেই। যত দোষ সব চাষীর
কিছুটা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব র
চাষী নাকি খাদ্যশস্য মজুত করে
আছে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগৌতম
সরকারের দায়িত্ব একেবারে এ
যান নি। চাষীকে তার শ্রমের উ
মূল্য দেওয়াই নাকি সরকারের নী
তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন
উৎপাদনে উৎসাহদান সরকারের
থেকে কাম্য।

খাদ্যমন্ত্রীর কথার যৌক্তি
অনস্বীকার্য। চাষী কি সত্যি
মূল্য পাচ্ছে? দরিদ্র চাষী তো
না খেতে পেয়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে।
বাঁচবার পথ করে দেওয়াও
সরকারেরই দায়িত্ব। সরকার সে দ
সততার সঙ্গে পালন করলে দেশে
আজ দুর্ভিক্ষের ছায়া নেমে আ
না।

গেল বছরেও বৃষ্টি হয়েছিল অ
দেরিতে এবং সে বৃষ্টিও সর্বত্র
হয় নি। জোয়ার, বাজরা ও
উৎপাদন আশাতীতরূপে হ্রাস পেয়ে
বৃষ্টির অভাবে রেওয়া, সিধি, সাতন
পান্না জেলায় শীতকালীন
মোটেই হয় নি। তখন থেকে সর
সতর্ক হলে আজ এ দুরবস্থার
হতো না। নভেম্বর মাসের পরই খ
শস্যের মূল্যবৃদ্ধি সুরু হয়। সে

খাদ্যশস্যের মূল্য রাতারাতি মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। জুন মাস থেকেই নিদারুণ কষ্টের মধ্যে সাধারণ মানুষ দিন কাটাচ্ছে।

সরকার ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলেছেন অনেক। ঋণ দেবার ব্যবস্থা করেছেন। জলমগ্ন এলাকায় ঘোড়ার পিঠে খাদ্যশস্য যেতেও আরম্ভ করেছে। এসব ব্যবস্থা যথাসময়ে করলে, এত কষ্ট ভোগ করতে হত না। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে মানুষকে গাছের পাতা-সিদ্ধ খেয়ে জীবন কাটাতে হত না।

* * *

বিধানসভার ছ'জন নির্দলীয় সদস্য বস্তারের গদিচ্যুত মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেওয়ের প্রতি সুবিচারের আবেদন পেশ করেছেন প্রধান-মন্ত্রীর দরবারে। তাঁদের মতে প্রবীরচন্দ্র বস্তারে এবং বস্তারের বাইরেও অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি ব্যক্তিবিশেষের আক্রোশের বলি হয়েছেন। অভিযোগ তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রের বিরুদ্ধেও উত্থাপন করেছেন। বস্তার থেকে বিতাড়ন এবং গদি থেকে মহারাজাকে অপসারণের ব্যাপারে শ্রীমিশ্রেরও নাকি হাত ছিল। তাঁর সমর্থকদের বস্তারে প্রতিষ্ঠাই ছিল আসল লক্ষ্য। শ্রীমিশ্র সে-সময়ে মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমান চীফ সেক্রেটারী ছিলেন বস্তারের কালেক্টার এবং ডি-আই জি শ্রীরঞ্জিত সিং ছিলেন বস্তারের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

সদস্য ছ'জন তাঁদের আবেদনে এই অফিসার দুজনের অপসারণ এবং সমগ্র ব্যাপারটির পূর্ণ তদন্তের দাবী জানিয়েছেন। অনুরোধ করেছেন প্রবীরচন্দ্রের পেনসন দিয়ে দিতে এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ভোগের প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিতে। সেই সঙ্গে বস্তারের মানুষের প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রাজা নরেশচন্দ্রকে অপসারণের দাবীও তাঁরা জানিয়েছেন।

জেলের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী শ্রীবেদরাম বড় বিপদে পড়েছেন। বিধানসভার বিরোধী দলের আক্রমণ কাটিয়ে ওঠার পর থেকে মেয়েমহল তাঁর বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে উঠেছেন।

অভিযোগ উঠেছে তিনি দেশের আইন লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর দুই স্ত্রী। একজন আবার অপ্রাপ্তবয়স্কা। পূর্বে এই স্ত্রীর বয়স সম্পর্কে যে এফিডেভিট দেখানো হয়েছে, তাও নাকি সত্যি নয়।

এসব অভিযোগ কংগ্রেসের উপদলের পক্ষ থেকে পেশ করা হয়েছে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের দপ্তরে।

● শ্রীসামসুদ্দিন

বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর আলোচনাকালে বিরোধী দলের নেতা শ্রীবীরেন্দ্রকুমার শকলেচা এ অভিযোগ তুলেছিলেন। রাজ্যপালকে এ ব্যাপারে সঠিক সংবাদ না দেবার অভিযোগও তিনি তুলেছিলেন। শ্রীবেদরাম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

গেল ১১ই সেপ্টেম্বর প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্রলেখা সহায়ের নেতৃত্বে আইনসভার কংগ্রেস দলের মহিলা-সদস্যাগণ বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করেছেন রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপালকে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে মন্ত্রী অপরাধী হলে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের।

কাশ্মীর ঃ

সাদিক মন্ত্রিসভার কলেবর শীগগিরই বৃদ্ধি পেতে পারে। শ্রীসাদিক মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ ও সৈয়দ মীর কাসিমের শূন্য স্থান পূরণের বিষয়টি এখন বিবেচনা করছেন। সৈয়দ মীর কাসিম মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়ে কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীসামসুদ্দিন খুব সম্ভবত মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন। জম্মু থেকে নির্দলীয় কোন বিশিষ্ট নেতাকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণের কথাও চলছে।

* * *

পাকিস্তানের নয়া দোস্ত চীন এর মধ্যেই বিগড়ে গেছে। চীনা সৈন্যরা অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আয়ুবের ঘাড়ের ওপর। তারা হালিয়া গিরিপথ অতিক্রম করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং রেমোতে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। হালিয়া গিরিপথ গ্রাস করে চীনারা আরও ভেতরে ঢুকে পড়বার তোড়জোড় করছে।

শোনা যাচ্ছে, চীনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ গেল মাসেও নির্বিঘ্নেই চলেছিল। চীন নতুন দাবী তুলতেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থির হয় এই বিরোধের মীমাংসার পর আবার কাজ সুরু হবে। চীন নীরব থাকবার পাত্র নয়। তার সর্ত যে দেশ মানতে পারে নি, সে দেশের ওপর শক্তি প্রয়োগে চীন দ্বিধাবোধ করে নি। এমন কি, তার গুরু রাশিয়াকে জব্দ করতেও সে কসুর করছে না। পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট শ্রীআয়ুব খাঁ ভারতকে কোণঠাসা করার অপচেষ্টাতেই এসব জেনে-শুনেও হাত বাড়িয়ে ডেকে এনেছেন চীনকে। খাল কেটে কুমীর আনার বিপদের কথা ভারতবাসী আয়ুবকে আগেই জানিয়েছিল। আয়ুব সে কথায় কান দেন নি। কুমীর যখন খালে একবার ঢুকেছে তখন খাঁ সাহেবকে বার-সাতেক অন্তত কুমীরের কামড়ে নাকানি-চুবানি খেতেই হবে। তারপর জান বাঁচাতে নতিস্বীকার করতে হবে চীনের সর্তেই।

• মস্কোয় হৃদ্য-পরিবেশে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও মিকোয়ান আলাপ-আলোচনা করছেন'

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সোভিয়েট ইউনিয়ন সফর দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনকে আরও দৃঢ় করেছে। রাষ্ট্রপতি সর্বত্র বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন। ভারতের প্রতি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রীতি ও ভালবাসার পরিচয় সর্বত্র পাওয়া গেছে।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিভিন্ন সোভিয়েট রিপাবলিকও সফর করেন। এর মধ্যে আর্মেনিয়ার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘকালের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় যোগের কথা ডঃ রাধাকৃষ্ণণ উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই কলকাতা শহরেও একটি অতি প্রাচীন আর্মেনিয়ান চার্চ রয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েটের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি আনাস্তাস মিকোয়ান রাষ্ট্রপতির সম্মানে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। মস্কোর বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে একটি নাগরিক সম্বর্ধনা জানান হয়। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে সম্মানসূচক 'ডক্টর অফ ফিলজফি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এইসব অনুষ্ঠানেই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা, সহাবস্থান, শান্তিনীতি প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। নেহরুর মৃত্যুর পরেও ভারত নিষ্ঠার সঙ্গে নেহরু-নীতি অনুসরণ করে চলেছে বলে নেতৃবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন। ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ডঃ রাধাকৃষ্ণণও সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ও শান্তিনীতির প্রশংসা করেন। বিশেষ করে তিনি খ্রুশ্চফের প্রশংসা করে বলেন, তাঁর অনুসৃত নীতি বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে। যুদ্ধের ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণ সোভিয়েট জনসাধারণ তথা বিশ্ববাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান।

১৭ই সেপ্টেম্বর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠানে, প্রেসিডিয়ামের সহকারী সভাপতি জর্জি জোর্জেনিড্জে, সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সারগেই ল্যাপিন, ভারতে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আইভান বেনেডিকটভ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক অধ্যাপক ও ছাত্র অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে সম্মান জানায়।

১৮ই সেপ্টেম্বর ক্রেমলিন প্রাসাদে সুপ্রীম সোভিয়েট কক্ষে প্রদত্ত নাগরিক সম্বর্ধনায় মস্কোর মেয়র ভ্লাডিমির প্রোমিসুভ রাষ্ট্রপতির প্রতি স্বাগত ভাষণ জানান। এই অনুষ্ঠানে মিকোয়ান, খ্রুশ্চফ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ১৯শে সেপ্টেম্বর লুমুম্বা মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়েও ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতির সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির প্রতি ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। আরও ঘোষণা করা হয়েছে, নিকিতা খ্রুশ্চফ অদূর ভবিষ্যতে ভারত সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।

চীন :

চীন কিভাবে লুব্ধদৃষ্টিতে অন্যান্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে, তার আর একটি বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ইতিপূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'য় চীনের ভূমিক্ষুধার সমালোচনা করা হয়েছিল। আবার নতুন সংবাদ পাওয়া গেছে, সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর চীনের দাবী সম্পর্কে।

চীন সোভিয়েট ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দাবীদার। গত ১০ই জুলাই জাপানের কয়েকজন পার্লামেণ্ট সদস্য মাও-সে-তুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ জাপানের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সেকাই সুহো'তে প্রকাশিত হয়েছে। জাপানী এম-পি'রা সোভিয়েট ইউনিয়নভুক্ত কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের ওপর জাপানের দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে মাও-সে-তুং বলেন, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ জাপানের ফিরে পাওয়া উচিত, কারণ রাশিয়া একদিন অন্যায়ভাবে এই দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল।

এই উপলক্ষে মাও-সে-তুং যে [illegible] দেখান, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। [illegible] বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নের ২২০

লক্ষ বর্গ কিলোমিটার মোট ভূখণ্ডে ২০ কোটি লোক বাস করে,— আর সেখানে জাপানের মোট ৩৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জমিতে লোকসংখ্যা হল ১০ কোটি। এই অসমান ভূমিবণ্টন সমর্থনযোগ্য নয়। সুতরাং, অপর রাজ্য আক্রমণ করে নিজ দেশের অতিরিক্ত লোকের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে—মাও-সে-তুং দেখছি হিটলারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

জাপানী এম-পি'দের কাছে মাও-সে-তুং আরও বলেছেন, রাশিয়ার জার সম্রাটরা ১০০ বৎসর পূর্বে বৈকাল হ্রদ দখল করে, এবং তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে ভ্লাডিভস্টক, খাবারোভস্ক, কামচাটকা প্রভৃতি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান চীন সরকার এইসব অঞ্চল সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে ফিরে পাবার দাবী জানায়। ইয়াল্টা চুক্তি অনুযায়ী মঙ্গোলিয়া শাসনের ব্যবস্থা চীনের মনঃপূত নয়। মাও-সে-তুং দুঃখ করে বলেছেন, ১৯৫৪ সালে যখন ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিন চীনে এসেছিলেন, তখন চীনা নেতারা মঙ্গোলিয়ার ওপর তাঁদের দাবী জানিয়েছিলেন, কিন্তু ক্রুশ্চেভ বা বুলগানিন তাঁদের কথায় কোনরূপ কর্ণপাত করেন নি।

● মাও-সে-তুং

চীনের পক্ষ থেকে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, নানকিং চুক্তি (১৮৪২), আইগুন চুক্তি (১৮৫৮), তিয়েনৎসিন চুক্তি (১৮৫৮), পিকিং চুক্তি (১৮৬০) ইলি চুক্তি (১৮৮১), সিনমনোসেকি চুক্তি (১৮৯৬), লিসবন প্রোটোকল (১৮৮৭), হংকং কনভেনশন (১৮৯৮) ও আন্তর্জাতিক প্রোটোকল (১৯০১) বর্তমান চীন সরকার স্বীকার করে না, এবং এইসব চুক্তির ফলে যে-সব অঞ্চল পূর্বের চীন থেকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, চীন তা প্রত্যর্পণের দাবী জানাবে।

মোটকথা, চীনের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিবাদের আসল কারণ, অপরের ভূখণ্ডের ওপর চীনের নজর। ভারতের সঙ্গে বিবাদ বাধার কারণও এই, কমিউনিস্ট জগতের প্রধান সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের বিবাদের মূল কারণও এই একই। সোভিয়েটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চীনের চাই।

জাপান :

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর টোকিওর ইয়োয়োগিতে অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে এই গ্রামটি প্রায় এক মাইল দূরে হবে।

আসন্ন অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় সাড়ে আট হাজার ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগী ও অফিসার আসবেন,—তাঁদের মধ্যে সাত হাজারের বেশি ইয়োয়োগিতে এই অলিম্পিক গ্রামে বাস করবেন।

গ্রামটির উদ্বোধনের দিন ছ'টি দেশ থেকে আগত পঞ্চাশজন

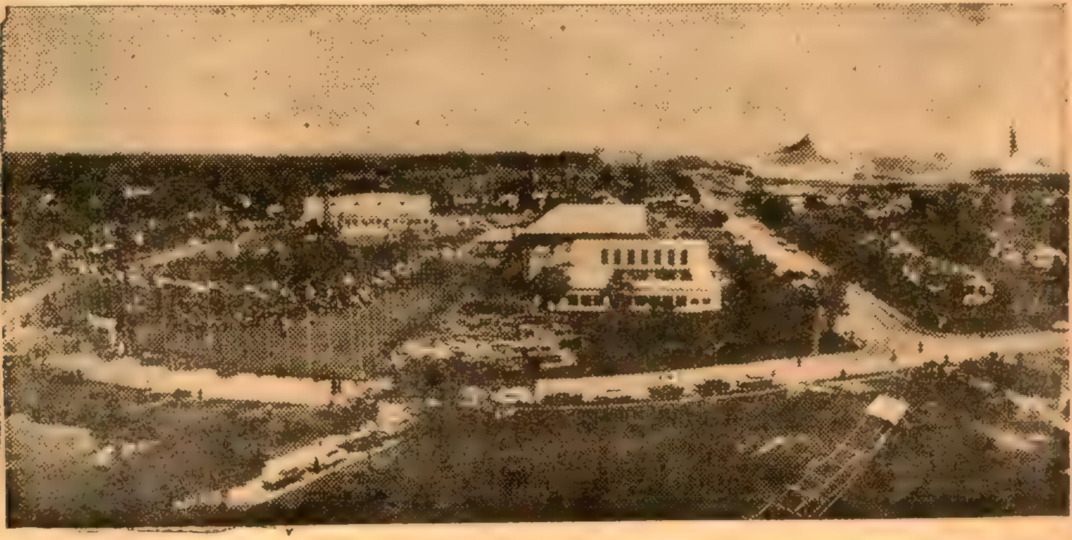

● অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন-উৎসবের দৃশ্য

ক্রীড়াবিদ প্রতিযোগী ও অফিসার গাঁয়ে প্রবেশ করেছেন। তাঁরা এখন থেকে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন। এঁদের মধ্যে একজন হাঙ্গেরীয় দোভাষীও আছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেণ্টোতে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন বি জনসন ঘোষণা করেছেন, মহাকাশে কেউ মারণাস্ত্র নিক্ষেপ করলে, কিভাবে তা ব্যর্থ করা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা তা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন।

জনসন এই সভায় বলেন, মহাকাশে রকেট-চালিত ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য মারণাস্ত্র স্থাপনের কোন পরিকল্পনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই। তবে অন্য কোন রাষ্ট্র ভয় দেখাবার জন্য এই কাজ করতে পারে, এই আশঙ্কায় ১৯৬২-৬৩ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীদের ওপর এই আক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

জনসন জানিয়েছেন, বর্তমানে যে ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে, তাতে বিশ্বপ্রদক্ষিণরত মারণাস্ত্রবাহী মহাকাশযানকে কক্ষপথে বাধা দিয়ে ধ্বংস করা যাবে। তিনি আরও বলেন, কোন দেশ মারণাস্ত্রবাহী মহাযান প্রেরণ করলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার খবর রাডারের সাহায্যে গ্রহণ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা স্বাধীন বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য এই নতুন ব্যবস্থা বিশেষ সহায়ক হবে বলে জনসন বলেছেন। প্রতিষেধক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে, একথা জানার ফলে অপরের পক্ষে আক্রমণ চালানো সহজ হবে না, এবং ফলে যুদ্ধের আশংকা কমে যাবে—জনসন এই আশা প্রকাশ করেছেন।

• লিণ্ডন জনসন

কিন্তু এর ফলে মহাকাশে মারণাস্ত্র নিক্ষেপ এবং সেই মারণাস্ত্র ধ্বংসের জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ, দুই-ই পাশাপাশি চলবে না তো? মহাকাশ নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয়!

সাইপ্রাস :

সাইপ্রাসে গ্রীক-তুর্কী সংঘর্ষ থামাবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ বাহিনী

• ইউ থাণ্ট

প্রেরিত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর চেষ্টায় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অন্তত সাময়িকভাবে হলেও থামানো সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু কেবল তদারকী বাহিনীর সাহায্যে সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে সাইপ্রাসের রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগ করা হয়েছিল। ফিনল্যাণ্ডের স্যাকারিয়াস তুওমিয়াজো রাষ্ট্রসংঘের সালিশ রূপে বিবদমান পক্ষগুলির মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি রোগভোগের পর তুওমিয়াজোর মৃত্যু হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে তুওমিয়াজোর জায়গায় সাইপ্রাসের জন্য নতুন সালিশ নিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন, রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল ইউ থাণ্ট। নতুন সালিশের নাম: ইকুয়েডরের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি গালো প্লাজা।

সাইপ্রাস সমস্যার প্রধান ভূমিকায় যারা রয়েছে, সেই গ্রীস, তুরস্ক ও বৃটেনের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সাইপ্রাসের গ্রীক ও তুর্কী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকৃত সমাধানের আশা করা ভুল। রাষ্ট্রসংঘ সালিশকে তাই কেবল ম্যাকারিয়াস-গ্রিভাস অনুগামী গ্রীক সাইপ্রাসবাসী ও কুচিক অনুগামী তুর্কী সাইপ্রাসবাসীদের সঙ্গে কথা বললেই চলবে না, যারা আসল পক্ষ তাদের সঙ্গে আলোচনা করে মীমাংসার জন্য চেষ্টা করতে হবে। রাষ্ট্রসংঘ সালিশের সম্মুখ-প্রচেষ্টায় সুফল পাওয়া না গেলেও, পর্দার অন্তরালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলছে, তার সাহায্যে সাইপ্রাস সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান আশা করা যেতে পারে।

ইতালী :

ইতালীর বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা পালমিরো তোগলিয়ত্তি মারা যাবার পর সম্প্রতি তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধ নিয়ে কমিউনিস্ট জগতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। ৪,৫০০ শব্দবিশিষ্ট এই প্রবন্ধটি তোগলিয়ত্তি লিখেছিলেন আসন্ন আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের জন্য। কিন্তু ইয়াল্টায় অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটায়, তাঁর পক্ষে এই প্রবন্ধ বা স্মারকলিপি নিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে আলোচনা করা আর সম্ভব হবে না।

ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তোগলিয়ত্তির এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। ইতালীর দুটি বিখ্যাত পত্রিকা 'রিনাসিটা' ও 'লা ইউনিটা'তে এটি প্রকাশিত হয়েছে।

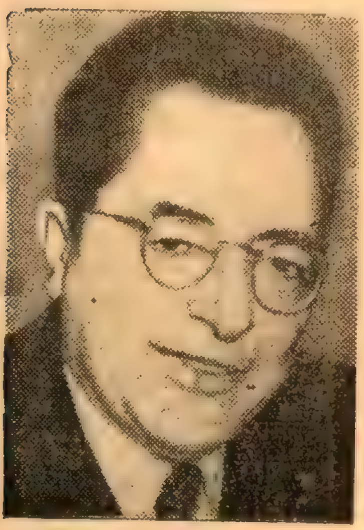

• পালমিরো তোগলিয়ত্তি

তোগলিয়ত্তি রুশ-চীন বিরোধে ক্রুশ্চেভকে সমর্থন করলেও চীনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। প্রয়োজন হলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চীনে প্রতিনিধি-দল পাঠিয়ে মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে, এমন কথাও তিনি বলেছেন। চীন সম্পর্কে ক্রুশ্চেভ বাড়াবাড়ি করছেন, এমন ইঙ্গিত তোগলিয়ত্তির লেখায় আছে।

অপর দিকে আবার তিনি স্ট্যালিন আমলের গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করার ব্যাপারে ক্রুশ্চেভের মন্থর নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। গণতন্ত্রের বিনাশ সাধনের জন্য স্ট্যালিন যা করেছেন, তোগলিয়ত্তি তার ঘোর বিরোধী। কিন্তু স্ট্যালিন ও স্ট্যালিন-বাদের বিরুদ্ধে বলা সত্ত্বেও ক্রুশ্চেভ এখনও সোভিয়েট ইউনিয়নের নাগরিকদের সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার দিচ্ছেন না, তোগলিয়ত্তি এই অভিযোগ করেছেন।

জাতীয় স্তরে কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবীও তিনি জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশ-গুলির ওপর সোভিয়েট ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ তোগলিয়ত্তি সমর্থন করেন নি।

ধর্মের স্বাধীনতা, বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা প্রভৃতির ওপরও তিনি জোর দিয়েছেন। সর্বপ্রকার গোঁড়ামী ও অন্ধসংস্কার অতিক্রম করে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তোগলিয়ত্তির আবেদন বিভিন্ন দেশে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ এই প্রবন্ধটি প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু যখন তাঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ইতালীয় কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন, তখন তাঁরাও তা প্রচার করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নেও এ নিয়ে আলোচনা চলছে।

তোগলিয়ত্তির স্থানে ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নেতা হয়েছেন লুইগি লোঙ্গো। লোঙ্গো সম্প্রতি এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ইতালীর কমিউনিস্টরা তোগলিয়ত্তির পথ অনুসরণ করে চলবে। তোগলিয়ত্তির পথ বলতে বোঝায়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, মার্কসবাদ সম্পর্কে গোঁড়ামীমুক্ত উদার ধারণা, কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং ধর্ম ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এত ঘন ঘন পটপরিবর্তন হচ্ছে যে, এখানকার ঘটনার গতি পর্যবেক্ষণ করা কষ্ট-সাধ্য হয়ে পড়ছে। গত বৎসর নো দিন দিয়েমকে হটাবার পর থেকে এ পর্যন্ত চারবার ক্ষমতার অদল-বদল হল।

এবারের ক্ষমতা দখল খুব অল্পক্ষণের জন্য হলেও কম চমকপ্রদ নয়। ১৩ই সেপ্টেম্বর হঠাৎ ২০০০ বিদ্রোহী সৈন্য সায়গন দখল করে জেনারেল নেগুইন খানের সরকারের পদত্যাগ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহের নায়ক হলেন ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল লাম ভান ফ্যাট। ফ্যাট জেনারেল খানকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করেন, এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন।

জেনারেল নেগুইন খান তখন সায়গনে ছিলেন না, দূরে সমুদ্রতীরে ক্যাপ সেণ্ট জ্যাক্স শহরে ছিলেন। পরের দিন তিনি সায়গনে ফিরে এলেন এবং অনুগত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করে ক্ষমতায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন। তবে, জেনারেল খান বিদ্রোহীদের

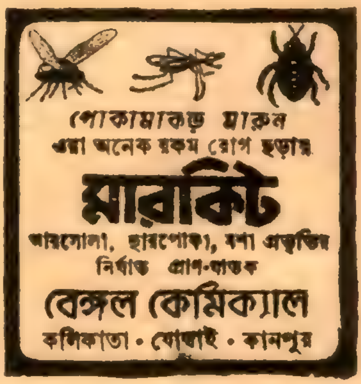

• জেনারেল নেগুইন খান

কোনরূপ শাস্তি দেন নি। বিদ্রোহীরাও বিবৃতি-মারফৎ জেনারেল খানের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

এবারের বিদ্রোহে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে, জেনারেল নেগুইন খান বৌদ্ধদের সমর্থন লাভ করছেন। আর ক্যাথলিকরা খান শাসনের অবসানের জন্য চেষ্টা করেছেন। ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল ফ্যাট নিজেও একজন ক্যাথলিক। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিকাংশই বৌদ্ধ, সুতরাং এদের সমর্থন পেলে খানের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হবে না। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনও খানের দিকে। সুতরাং জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নেগুইন খান যদি চলতে পারেন, তবে তাঁর পক্ষে অধিকাংশ দেশবাসীর নৈতিক সমর্থন এবং মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের জোরে শাসন চালিয়ে যাওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

পাকিস্তান :

শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আজম জিন্নার ভগিনী মিস ফতেমা জিন্না সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থীরূপে আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতিপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সম্মত হয়েছেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর করাচীতে বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিস জিন্না এই সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেন।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টি ও নিজামে ইসলাম দল নিয়ে এই সম্মিলিত বিরোধী ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। আগামী বৎসর মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে। তবে যে ৮০,০০০ 'বেসিক ডেমোক্র্যাট' রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করবেন, তাঁদের নির্বাচন এই বৎসর নভেম্বর মাসে হবে। নভেম্বর মাসের বেসিক ডেমোক্র্যাট নির্বাচনে বিরোধী দলের নির্বাচন-অভিযান পরিচালনার দায়িত্বভার মিস জিন্না গ্রহণ করেছেন। তিনি

• লামভান ফ্যাট

পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে সফর করে বক্তৃতা করবেন।

কায়েদে আজমের ভগিনী ও সর্বক্ষণের সঙ্গীরূপে মিস্ ফতেমা জিন্না পাকিস্তানের সর্বত্র পরিচিত ও বিশেষ সম্মানিত। তিনি আয়ুব শাসনের তীব্র সমালোচক। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরে দাবী জানিয়ে আসছেন।

পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতিতে আয়ুব খাঁকে পরাজিত করা খুবই শক্ত কাজ, তবু মিস ফতেমা জিন্নার মত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ায়, আয়ুব খাঁর জয়ের সম্ভাবনা অনেকখানি কমে গেছে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সিংহল :

সিংহলের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা সম্পর্কে শীঘ্রই সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করবেন। এই আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং সম্প্রতি সিংহলে গিয়ে শ্রীমতী বন্দরনায়ক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে এসেছেন।

সকলেই স্বীকার করেছেন, বিষয়টি খুবই জটিল হলেও উভয় পক্ষের সদিচ্ছার সাহায্যে সন্তোষজনক একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাবে।

সিংহলে প্রায় ১০ লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত আছে। সিংহল সরকার এদের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষকে ভারতে ফেরৎ পাঠাতে চায়। কিন্তু এদের অধিকাংশই সিংহলের বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত, বংশপরম্পরায় এখানকার অধিবাসী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পূর্বে এই সমস্যাটি সম্পর্কে সিংহলের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটা ঐক্যমত স্থাপনের জন্য শ্রীমতী বন্দরনায়ক চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতা ও সিংহলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাডলী সেনানায়ক ও লঙ্কা সমসমাজ পার্টির নেতা শ্রীকলভিন ডি আর সিলভারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সিংহলের ভারতীয় শ্রমিকদের নেতা শ্রী এস থোণ্ডামান ও শ্রী এ আজিজ এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চেয়েছেন। শ্রীমতী বন্দরনায়ক এখন পর্যন্ত এঁদের ডাকেন নি।

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চব্বিশ ॥

সামনের জানলাটা দিয়ে পূবের হাওয়ায় যেমন হঠাৎ কখনো কখনো এক-আধটা পাতা রাস্তা পার হয়ে উড়তে উড়তে চলে আসে, ঠিক তেমনি করেই এল লেখার চিঠিটা।

'কিরণ কাকা, আপনি নিশ্চয় আমাদের ভুলে গেছেন। আপনারা বড়ো লেখক, কত কাজ আপনাদের! আমাদের কথা কি আর মনে থাকে? আমরা কিন্তু আপনাকে ভুলি নি। মা-বাবা সব সময় আপনার কথা বলেন। আর ভগদাস যে আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, সেই মজার ব্যাপারটা নিয়েও আমরা খুব গল্প করি।

আমাদের স্কুল খুলেছে, আমরা হাজারীবাগে চলে এসেছি। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিন আছে, কিন্তু আমরা সবাই মিলে হাতে লেখা একটা কাগজ বের করছি। আপনি আমাদের কাগজের জন্যে চার লাইন কবিতা লিখে দেবেন। মেয়েরা বলেছে আপনি কিছুতেই কবিতা দেবেন না, কিন্তু আমি এক টাকা বাজি ধরেছি ওদের সঙ্গে। আপনি নিশ্চয় কবিতা দেবেন—দেবেন তো? প্রণাম নেবেন। ইতি লেখা।'

প্রথমটা স্মৃতির স্নিগ্ধতায় মন ভরে উঠল। কিরণ চোখ বুজে কিছুক্ষণ সেই মাঠ—সেই হু-হু বাতাসের স্পর্শ নিলে, কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী কিছুক্ষণ তাকে ঘিরে রইল। কয়েক মিনিটের জন্যে পাহাড়ী নদীটার ওপরে সোনালি সন্ধ্যা নেমে এল, তারপরেই যন্ত্রণার মূর্তির মতো সেখানে ফুটে উঠলেন শর্মিলা। তৎক্ষণাৎ কিরণের চিঠি লিখতে ইচ্ছে করল, 'আমি পারব না, কবিতা আমি কোনোদিন লিখি নি।' তারপরেই মনে হল, লেখা ছেলেমানুষ, সে এক টাকা বাজি হেরে যাবে, এটা কোনো কাজের কথাই নয়।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চার লাইন কবিতা লিখে ফেলল. একটা খামে পুরে মেসের চাকরকে ডেকে তখুনি ডাকে পাঠিয়ে দিলে। আর পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে অনুতপ্ত হল। এ কবিতা কার জন্যে লিখল সে? কেনই বা লিখল? এই চারটি লাইনের আড়ালে যার উদ্দেশ্যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা সে পাঠিয়ে দিয়েছে, এ কবিতা কোনোদিন সে পড়বে না।

সেই ব্যর্থ সন্ধ্যাগুলোর পরেই তো তার আশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল। তারপর সেই একটি চিঠি—নিজের মনের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে দূরে সরে গেছেন শর্মিলা। তিনি তো কৃতজ্ঞতা চান নি। মুক্তিই চেয়েছিলেন তার কাছ থেকে। এ কবিতা শর্মিলা পড়বেন না, উপযাচক হয়ে কৃষ্ণচূড়ার ঋণ স্বীকার করবার কিছুমাত্র দরকার ছিল না।

কিন্তু চিঠিটা ডাকে দিয়ে হাতের তীর বেরিয়ে গেছে এখন। ও আর ফেরানো যাবে না। নিজের সম্পর্কে ভারী একটা ঘৃণা বোধ করল কিরণ। সেই ছেলেবেলায় একদিন রাজহাঁসের কলম খুঁজতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল সে। পথ-ঘাট কিছুই চিনত না, কতদূরের সেই পদ্মবিলে শেষ রাতের

জ্যোৎস্নায় রাজহাঁসের ঝাঁক নেমে আসে, সে-সব খবর কিছুই জানা ছিল না তার। তবু সূর্য ওঠবার আগেই সে সামনের মাঠ দিয়ে চলতে স্বরু করেছিল, পার হয়ে গিয়েছিল শীতের নদীটার হাঁটুজল, একটা পুরোনো দীঘির উঁচু পাড়ের ওপরে ভাঙা মন্দিরকে হাজারো পাকে জড়ানো বটগাছটার ছায়ায় জিরিয়ে, আদি-অন্তহীন বেনা আর কুঁজি কাঁটার বনে সে পথ হারিয়ে ছিল।

তারপর বেলা দুটো পর্যন্ত সে কি খিদে, কী ভয়, কী যন্ত্রণা। মাথার ওপরে উড়ন্ত শঙখচিল, কোথা থেকে হাড়গিলার কর্কশ চিৎকার, তিনটে লাল লাল বাচ্চা নিয়ে একটা শেয়ালের ছুটে পালানো। যখন মনে হয়েছিল, এই বেনাবনের ভেতরেই সে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে, তাকে আর কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না, তখন—

তখন সেই মুসলমান ফকির।

'বাবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

রাজহাঁসের পালক আর নয়, তখন মৃত্যুভয়। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল।

'আমার পথ হারিয়ে গেছে।'

সেই ফকিরই তাকে গ্রামের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বাবা, ও-সব মাঠ-ঘাটে অমন করে ঘুরতে নেই। ওখানে নানা রকম সাপ আছে, বুনো শূয়োর আছে, কখনো কখনো চিতাবাঘও বেরোয়। এ রকম পাগলামি কোনোদিন আর কোরো না।'

রাজহাঁসের পালক মেলে নি, তার বদলে মৃত্যু এসে ছায়া ফেলেছিল। কিরণ জানে, রোমান্টিক ছেলেমানুষীর বিরুদ্ধে তার অবচেতন মনে বিদ্রোহ জেগেছিল সেই প্রথম। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সব রকম ন্যাকামিকে সে আঘাত করতে চেয়েছে, রূঢ় সত্য দিয়েই যাচাই করতে চেয়েছে জীবনকে, সেই জীবনের চোরা গলির গোলকধাঁধায় আবিষ্কার করতে চেয়েছে তার আত্মাকে।

বাংলা দেশের পাঠকেরা এই কিরণ বসুকেই জানে, তার যা কিছু খ্যাতি-অখ্যাতি এরই ওপর।

প্রতিমা যখন স্ত্রী হয়ে এল, তখন কিছুদিন আবার চিরকালের ছেলেমানুষীর পালা। কিন্তু কাঁটা উঠে এল এক বছরের ভেতরেই। অবিশ্বাসে সন্দেহে এক মুহূর্তে সব কাঁচা রঙ গলে গেল, বেরিয়ে এল জীবনের বীভৎস কালো—আর সেই কালোর পটভূমিতে কিরণ আর একবার নিষ্ঠুরভাবে সত্যের মুখোমুখি হল।

তারপরে মনে হয়েছিল রঙ আর কোনোদিন ধরবে না, সম্পূর্ণ মোহমোচন ঘটেছে তার। কিন্তু আশ্চর্য কৃষ্ণচূড়া, আশ্চর্য সেই নীল মেঘের মতো দূরের পাহাড়, সেই গুচ্ছ গুচ্ছ হলুদ ফুলে ভরা মহাকাল, সেই সন্ধ্যার সোনালি নদী। শুধু একটি রঙ নয়, সাত রঙ রাঙিয়ে দিল, একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলল; আর কিরণ যে-কোনো তৃতীয় শ্রেণীর অপাঠ্য উপন্যাসের নায়কের মতো—

কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য, এখনো নেশা কাটল না। আজও সে লেখাকে উপলক্ষ করে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে শর্মিলার কাছে।

একটা সিগারেট ধরিয়েছিল কিরণ, দুতিনটি টান দিয়ে সেটাকে নির্মমভাবে চেপে ধরল অ্যাসট্রের ভেতর। আর নয়, এইখানেই এর শেষ হওয়া দরকার।

কৃষ্ণাকে মনে পড়ে গেল।

সেই শান্তিনিকেতনের কাজ-করা ফাইল কেসটি, কিরণের একটি স্কেচ, তার তলায় দুটি শ্রদ্ধাস্নিগ্ধ কথা: 'লহো প্রণাম'। কৃষ্ণা তাকে ভক্তি করে। যুক্তির দিক থেকে ভক্তি জিনিসটাকে কিরণ বিশ্বাস করে না, সে জানে ওটা শুধু অকারণ মানুষের ছোট হয়ে যাওয়া, আত্মমর্যাদার অপমান করা। কিন্তু রোগা কালো মেয়ে কৃষ্ণার গভীর চোখ দুটি তার ভালো লাগে, তার কাছ থেকে এইটুকু শ্রদ্ধা নিতে তার দ্বিধা হয় না।

আর শর্মিলা—

মেসের চাকর এসে ডাকল: বাবু!

কিরণের ধ্যান ভাঙল। বিরক্ত হয়ে বললে, কী হল?

—টেলিফোন এসেছে।

এই এক যন্ত্রণা। মেসে একটা টেলিফোন আছে ম্যানেজারের ঘরে। যখন কোনো ফোন আসে, তখন দোতলার ঘরে নেমে যেতে হয় এবং প্রায়ই সেটা বিরক্তিকর ঠেকে। বিশেষ করে কাজকর্মের সময় কেউ যখন ডেকে এনে জানায়: 'আপনাকে আমাদের সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা করতে হবে'—তখন সাধারণ সৌজন্যটুকুও বজায় রাখা কঠিন হয়ে ওঠে।

কিরণ বিরস দৃষ্টিতে চাকরটার দিকে চাইল। বললে, কে ডাকছে?

—আজ্ঞে কোন্ এক হাসপাতাল থেকে কথা কইছেন। নাম বললেন, ডাক্তার ঘোষাল।

ডাক্তার ঘোষাল। অ্যাসাইলাম থেকে ডাকছেন। কিরণ চমকে উঠল। নিজের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর ডাক্তারকে সে দিয়ে রেখেছিল বটে, কিন্তু এর আগে কোনোদিন তাঁর তো ফোন করবার দরকার পড়ে নি।

পায়ে চটি গলিয়ে তখুনি নীচে নেমে গেল সে।

—কিরণ বসু কথা বলছি।

ওপার থেকে ডাক্তারের ত্রস্ত গলা শোনা গেল: দয়া করে এখুনি একবার আসতে পারেন? বড্ড জরুরি।

কিরণ ব্যাকুল হয়ে বললে, কী হয়েছে?

—অ্যাকসিডেণ্ট।

—অ্যাকসিডেণ্ট? কার অ্যাকসিডেণ্ট? —জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না, তবু যেন কিরণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না।

—মানে মিসেস বসু হঠাৎ—

কিরণ প্রায় চিৎকার করে উঠল। বেঁচে আছে তো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন।

আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে পারেন তো একবার চলে আসুন।

—আমি এখুনি আসছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে তেতলায় ছুটল কিরণ।

অনেকদিন যেন ভালো করে ঘুমোয় নি প্রতিমা, এমনিভাবে চোখ দুটি তার গভীর শান্তিতে বুজে আছে। ক্লান্ত করুণ মুখে মানসিক ঝড়-বিপর্যয়ের কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। অসম্ভব রোগা হয়ে গেছে—চোখের কোটর ছায়ায় ঢাকা, গালের হাড় উঠে পড়েছে, শুধু ক্লান্তি আর শীর্ণতা ছাড়া কোথাও তার পাগলামির কোনো লক্ষণই নেই। যা কিছু অন্ধকার অবিশ্বাস আর ভয় তার দুই চোখেই জমাট হয়ে থাকত, সে চোখ দুটি এখন অতল বিশ্রামে মগ্ন।

প্রতিমা ঘুমুচ্ছে।

না, ঘুম নয়। প্রতিমার সব অসুস্থ, অসংলগ্ন চিন্তাগুলো এখন নিশ্চেতনার আড়ালে। তার জ্ঞান নেই।

পাশের চেয়ারটাতে বসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে প্রতিমার দিকে চেয়ে রইল কিরণ। তার স্ত্রী। জীবনে মানুষ যা কিছু কামনা করে—বিশ্রাম, আশ্রয়, প্রতিদিনের কাজ আর ভাবনার ভার থেকে অন্তত খানিকটা মুক্তি, তার সব তাকে দিতে পারত প্রতিমা। কিন্তু কোথা থেকে কিভাবেই যে বিষ উঠে এল! রাজহাঁসের পালক খুঁজে বেড়ানোর শেষ মোহটুকুও একটা অন্ধকার বিসপিলতার বিলীন হয়ে গেল।

ডাক্তার কথা কইছিলেন। ঝাপসা দৃষ্টিতে কিরণ তাকালো তাঁর দিকে।

—আমার সেই ওষুধটায় খুব কাজ হয়েছিল, জানেন? আগে মধ্যে মধ্যে ভায়োলেণ্ট হয়ে উঠতেন, সব থেমে গিয়েছিল। এখন খালি চুপ করে বসে থাকতেন। এমন কি এ-ও মনে হত, যেন অল্প অল্প বুঝতে পারছেন। কিন্তু হঠাৎ—

কিরণ অপেক্ষা করতে লাগল।

—হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন ওদিকের বাড়িটার ন্যাড়া ছাতে। বেলা এগারোটা তখন, ঝি-টা ওঁর জন্যে খাবার আনতে গিয়েছিল। ইদানীং এত শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, দুম করে কিছু একটা করে ফেলতে পারেন সে-কথা কারুর মনেই হয় নি। কিন্তু তবু ওঁকে ছাতে যেতে দেখে দুজন চাকর হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। কিন্তু তারা ধরে ফেলবার আগেই ছাত থেকে লাফিয়ে পড়লেন।

বিবর্ণ গলায় কিরণ বললে, সুইসাইড করতে চেয়েছিল।

—কিন্তু সে ম্যানিয়া তো ওঁর ছিল না। এতদিন ধরে আমি ওঁকে ওয়াচ করে আসছি, কোনোদিন সে লক্ষণ তো কিছু দেখি নি।

—মনের গতি তো অন্যদিকে ঘুরে যেতে পারে।

—সাধারণত তা তো হয় না। এক একজনের এক-একটা ফিক্সেশন এক-একটা কমপ্লেক্স। মন থেকে তারই জটটা ছাড়িয়ে দিতে পারলেই পেসেণ্ট ভালো হয়ে ওঠে। মিসেস বসু সম্পর্কে এ দিকটা আমার কখনো স্ট্রাইক করে নি। মৃত্যু ভয়টাই ওঁর বেশি করে ছিল, ইচ্ছে করে মরতে চাইবেন এ কথা মনেই হয় নি কখনো।

কিরণ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বাঁচবে?

—নিশ্চয় বাঁচবেন। একতলার নীচু ছাত, নীচের ফুলের গাছগুলোতে কিছু বাধাও পেয়েছিলেন। হাত-পায়ে কতটা লেগেছে, বুঝতে পারছি না, তবে ফ্র্যাক্চার কিছু হয় নি। যা লেগেছে মাথায়।

—কিন্তু সেইটেই তো মারাত্মক।

ডাক্তার ঘাড় নাড়লেন। বললেন, আমারও তো ভয় সেইখানেই ছিল। তবে চোখ পরীক্ষা করে দেখেছি, কনকাশন হয়েছে বলে মনে হল না। তা হলে পেসেণ্টের চেহারাই অন্যরকম হয়ে যেত। তবু আমি মেজর সিন্হাকে কল দিয়েছিলুম। তিনি দেখে শুনে বললেন, শকটা আজই কেটে যাবে, বিকেলেই হয়তো সেন্স ফিরে পাবেন। আর একটা এক্স-রেও দরকার হতে পারে, অবস্থা বুঝে কাল তার ব্যবস্থা করব।

—তা হলে আপনি বলছেন ভয়ের কিছু নেই?

—না—না। ইউ মে টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।

অতএব কিরণের আর কিছু করবার নেই। ডাক্তার ঘোষাল তার সব ভাবনার ভার তুলে নিয়েছেন। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে, একটার পর একটা সিগারেট খেতে পারে, আর শুধু অলস কৌতূহলে এই ধাঁধাটার একটা জবাব খুঁজতে পারে: প্রতিমা মরতে চায় নি, মৃত্যুকে সে ভয় করত—তবু, তবু কেন সে আত্মহত্যা করতে চাইল?

কিষাণ
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

বাইরে দুপুরের রোদ বিকেলের ছায়া লেগে কোমল হয়ে এল। এদিকে পুকুরের জলটা সেই রোদের ছোঁয়ায় নীলোজ্জ্বল। বাতাসে শুকনো ঘাস আর গাছপালার শব্দ আসছে, শালিকের আলাপ শোনা যাচ্ছে। অনেক দূরে ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ। লাল রঙের একটা গরু পুকুরের ধারে ধারে চরে বেড়াচ্ছে।

শান্তি আর বিশ্রাম। এখানে চারদিকে কোথাও তাড়া নেই, কলকাতার ব্যস্ততা নেই, জীবনের ঝড় নেই, যারা মনের তুফানে ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে গেছে এ যেন তাদের এক নির্জন সমুদ্রতীর, সাগরের ঢেউ তাদের এইখানটিতে এনে ফেলে গেছে, তাদের কোনো দায় নেই, কোনো দুশ্চিন্তাও নেই।

প্রতিমা তাই ঘুমুচ্ছে। না—ঘুমুচ্ছে না। ঘুমও তো সম্পূর্ণ বিশ্রাম নয়—সেখানে স্বপ্নেরা এসে ভিড় করে। অচেতনার অতলে তলিয়ে রয়েছে প্রতিমা। একেবারে মুক্তি। মৃত্যুর সিংহ-দুয়ারের মুখোমুখি।

কিরণ একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

—ডক্টর ঘোষাল, আজ আমি থাকতে পারি এখানে ?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়। গেস্ট রুম তো রয়েছেই আমাদের। কোনো অসুবিধে হবে না।

—আর—এতক্ষণে একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গেল: অরবিন্দদা—মানে প্রতিমার দাদাকে একটা খবর দিতে চাই। আপনার টেলিফোনটা ইউজ করতে পারি ?

—কী আশ্চর্য, সে-কথা জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? আসুন আমার সঙ্গে।

সারা শরীরে যেন বিলক্ষণ ভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিরণ। কর্তব্য। জীবনের অর্থ আর কিছুই নয়, শুধু কর্তব্যের আংটাগুলোকে পর পর গেঁথে নিয়ে সেই শিকলে নিজেকে পাকে পাকে জড়ানো।

(ক্রমশঃ)

অতীত ও বর্তমান

শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অন্ধকার অতীতের অলিগলি খুঁজে দেখি পাথরের স্তূপ,
শিলালিপি, গুহাচিত্র, ফসিল বা মুদ্রা কোন মূর্তির ভগ্নাংশে
মেলে কিনা একালের মানুষের এতটুকু ভাবনার রূপ,
মোনালিসা নীরবতা কী রহস্যে অগোচরে মুখ টিপে হাসে।

মৃতের কবর খুঁড়ি, খুঁজি কোথা লুপ্ত হোল যারাও প্রাসাদ,
বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে আসীরীয় সভ্যতা যে হারালো বালিতে
উচ্ছিষ্ট ভগ্নাংশ তার জোড়াতালি দিলেও কি ঘুচিবে প্রমাদ
অর্বাচীন আজিকার চোখে-দেখা সাধনায়, লেখার কালিতে?

গবেষক মন এই মর্গের ডাক্তার যেন, বন্ধ হয় দম,
জ্যামিতিক জানালার পথ দিয়ে হাতছানি দেয় নীলাকাশ,
বারান্দার টবে ফোটা গোলাপের পাপড়িতে ছুঁয়েছে নরম
রোদের উষ্ণতা আহা। প্রত্নতত্ত্ব কতটুকু দেয় এ আভাস?

কাপালিক অন্ধকার অতীতের সভ্যতার করোটিতে বসে:
গোলাপের পাপড়িতে স্নিগ্ধতার হাসি ফোটে প্রাণের পরশে।

প্রেমিকা

সমীরণ চৌধুরী

তাই বলেছিলে বুঝি। জীবনেব রঙিন প্রচ্ছদ
অপলকা, আমাদের অনায়াস গতি—
বারুদের কটু গন্ধে ফাল্গুনের সন্তান-সন্ততি
থেকে থেকে খাবি খায়; উন্মোচনে নয় নিরাপদ

আবেগে ব্যাকুল তৃষ্ণা। রমণীয় তাহা
সংবৃত মননে তৃপ্ত, স্থির কচ, আর যাহা
ফেনিল জীবনপাত্রে উচ্ছ্বসিত, দেখো দেবযানী
বিধাতার ক্ষণিক কৌতুক, শর হানি

যুগে যুগে রেখে যায় ব্যর্থতার তুহিন প্রলাপ।
বেদনার কালীদহে জুড়ায় কি হৃদয়ের তাপ।
'ফেরাও নৌকার গতি',—এইমতো বিলায়ে বিধান
প্রেমিক নির্জনে গেল। প্রেমিকার ক্লান্তিহীন কান

এখনো বিভোর হয় সেই সব তৃপ্তিহীন সুরে;
আশ্চর্য হৃদয় তার মুগ্ধ হয় শুধু ঘুরে ঘুরে
গলে-যাওয়া মুহূর্তের স্রোতে। ভালে জয়টিকা
প্রেমিকা হাতড়ে মরে, কোথায় কালের যবনিকা।

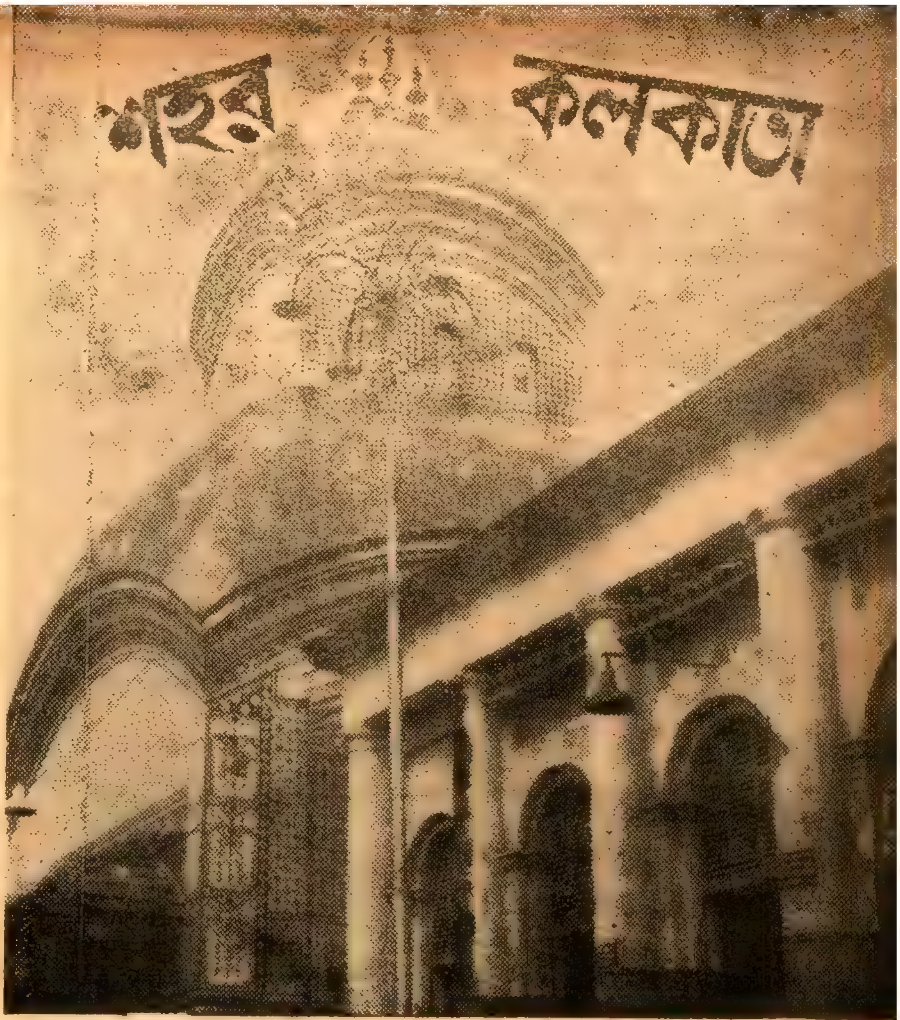

● কালীঘাট মন্দির

॥ নানা মুনির নানামতের কালীঘাট ॥

কলকাতার অধুনাকালের বসতি-বিস্তীর্ণ যে-ভূমি—এককালে তা আত্ম-সমাহিত ছিল অরণ্যের আদিম ইন্দ্রিয়-লোকে। যদিও তার আদি-স্বরূপের ইতিবৃত্ত আজ নির্ভুলরূপে উৎকীর্ণ নেই কোথাও—তবু অনুমানের কাঁধে হাত রেখে, যদি ধৈর্যের সরণীতে চিন্তার পদক্ষেপে কোনো তালভঙ্গ না হয় এবং সেকালের বেপথু সমাজ-চিত্রের যে-সামান্য খান-কয়েক অস্থি আজ আধুনিক জ্ঞান-মৃত্তিকার অন্ধকার দেশে ক্ষয়িষ্ণু—তা যদি যথাসম্ভব আবিষ্কার করার নিষ্ঠা কোনো অবসাদের শর-নিক্ষেপে হঠাৎ আহত হয়ে না পড়ে, তাহলে অবয়বগত দিক থেকে কিছু বিভিন্নতা ঘটলেও, বার বার সে-কথাই প্রমাণ হবে। প্রমাণ হবে: দূর থেকে সুদূরের বিস্মৃত পশ্চাত্তে বর্তমান নগর-মৃত্তিকার অধিকাংশই ছিল অরণ্যের অবিচ্ছিন্ন ছায়ান্তরালে নিমগ্ন।

আজ যে-অঞ্চল কালীঘাট নামে পুণ্যান্বেষীদের পীঠস্থান—অরণ্যের ঘনিষ্ঠ বাহুর বন্ধন থেকে এককালে মুক্ত ছিল না সে'ও। এই কালীঘাটেরই তদানীন্তন অরণ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম পাদদেশে ছিল নদীর বঙ্কিম রেখা। তাই অরণ্য-সমীপবর্তী কোনো এক বিশেষ অংশে সেকালে বসতি স্থাপন করে একদল জেলে। এই জেলে সমাজের জীবন তখন যে কেবল মৎস্য-শিকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো তা নয়, প্রয়োজনবোধে তারা চাষাবাদের কাজেও নিয়োজিত করতো নিজেদের। সেকালে রাষ্ট্রের শাসন হয়তো ছিল, কিন্তু তার শৃঙখলার বিস্তার ছিল না সর্বত্র। তা ছাড়া শান্তিরক্ষার প্রয়োজনে অধুনাকালের মতো তখন কোনো পুলিশ বা প্রহরীর প্রচলন যে ছিল না—তা বলাই বাহুল্য, তাই তদানীন্তন জনপদের যূথবদ্ধ অধিবাসিগণ নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা করতো নিজেরাই। লাঠি, সড়কি, গাঁইতি এবং তীক্ষ্ণধার কুঠার তাদের অস্ত্র। এই অস্ত্র নিয়েই তারা পথরোধ ক'রে দাঁড়াতো দুর্ধর্ষ দস্যুদলের, জীবনান্ত ঘটাতো হিংস্র শ্বাপদকুলের এবং প্রয়োজন হ'লে তারা সে-অস্ত্রেই অরণ্যের অপসারণ ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ দিতো

শ্রীপদাতিক

ফসল-বিলাসী জমিকে। সুতরাং উল্লেখিত জেলে সমাজেরও জীবনের গতি-প্রকৃতি ছিল তদ্রূপ। কালে কালে লুঠেরাদের ঠেকিয়ে এবং অরণ্যের আদিম বিস্তৃতিকে পরমাত্মীয়ের মতো জয় ক'রে, সেকালের সেই সমগ্র জেলে সমাজ আপন বসতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় প্রভূত।

প্রথম দিকে এই জেলে সমাজের স্বধর্ম ঠিক কী ছিল—বলা দুষ্কর। তবে কিছু পরবর্তীকালে, অর্থাৎ আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় অঙ্কে, তাদের মধ্যে কোনো এক সাধু-পুরুষের আবির্ভাব ঘটে—যিনি প্রবর্তন করেন ধর্মপূজার। তবে এই ধর্মপূজার স্থায়িত্বকাল খুব বেশি নয়। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পরিচ্ছেদেই সেখানে ধর্মপূজার যবনিকা পাত ঘটায় নদীয়া-নবদ্বীপ থেকে আগত বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার। কারণ, সে-কালের কিছু বিক্ষিপ্ত লিপি, প্রাচীন জনশ্রুতি এবং সেই সঙ্গে একাধিক কিংবদন্তী থেকে কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কারের সূত্রে জানা যায়: পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বৈষ্ণবধর্মের প্রচলন সুরু হয় বর্তমান কালীঘাটের তৎকালীন জনপদে। কিন্তু এই বৈষ্ণবপন্থীদের পক্ষেও

সেখানে অধিককাল অতিবাহিত করা সম্ভব হয় নি। কারণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সেখানে নাকি নরবলি-যোগে মহাশক্তির আরাধনা ক'রে শাক্তধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন একজন কাপালিক। এ-সম্পর্কে নানা কাহিনীর মধ্যে একটি বিশেষ কাহিনী সেকাল থেকেই লোকের মুখে-মুখে চলে আসছে। এ-কাহিনী হয়তো কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নেই, তবু এ-কালের চরম শাক্ত-পন্থীদের কেউ কেউ তা নির্বিচারেই বিশ্বাস করেন ব'লে আজ তার অবতারণা করা বাহুল্য হবে না আশা করি। কাহিনীটি এই :

একদিন বৈষ্ণব সমাজের প্রধান আখড়া যখন শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তনে মুখর, তখন হঠাৎ এক কাপালিক সেখানে উপস্থিত হয়ে বৈষ্ণবদের উদ্দেশে সরোষে বলেন : তোমাদের এই মিথ্যাধর্মের নিরর্থক উৎসব থামাও। আমি বহুদূর থেকে এখানে আসছি। কারণ আমি স্বপ্নে জানতে পেরেছি : তোমাদের এখানেই কোথাও সুদর্শন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলি পতিত হয়েছে। সুতরাং এসো, আজ সবাই মিলে আমরা তার অনুসন্ধান করি এবং বৈষ্ণবধর্মের অসত্য অবলম্বন ত্যাগ ক'রে এখানেই রচনা করি মহাশক্তির অন্যতম পীঠস্থান।

কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ কাপালিকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাতো দূরের কথা, তাঁকে আমলই দিলেন না। উপরন্তু তাঁকে সবাই মিলে উপহাস করলেন যথেষ্ট। সুতরাং উপহাস-লাঞ্ছিত সেই কাপালিক সেখান থেকে নীরবেই স'রে পড়লেন তখন এবং বৈষ্ণবরাও আবার যথারীতি মুখর হয়ে উঠলেন কৃষ্ণ-কীর্তনের উচ্চকিত অনুষ্ঠানে।

তারপর পক্ষকাল কেটে যায়। এই পক্ষকালের মধ্যে আর কোনোদিন সেই কাপালিককে দেখা যায় নি। তবে পক্ষকাল অতিক্রান্তির পর হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখতে পান বৈষ্ণব সমাজ : তাঁদের আখড়ার কাছ থেকে অবিচ্ছিন্ন এক রক্তের রেখা দূরবর্তী অরণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। অপার কৌতূহল-বশত এই রক্তের রেখা অনুসরণ করেই বৈষ্ণবপন্থীরা সেদিন প্রবেশ করে অরণ্যে। কিন্তু অরণ্যে প্রবেশ করেই একস্থানে আচমকা তাঁরা যা দেখতে পান—তাতে দারুণ শঙ্কায় শিহরণ জাগে তাঁদের প্রতি রোমকূপে। তাঁরা দেখতে পান : পদ্মাসনে ব'সে আছেন সেই কাপালিক। সামনেই তাঁর সংস্থাপিত মহাকালীর প্রস্তর-প্রতিমা—যাঁর উদ্দেশে সদ্য বলিদান করা হয়েছে এক নধরকান্তি যুবককে। আর যুবকের রক্তধারায় সিক্ত মৃত্তিকার একদিকে সযত্নে স্থাপিত এক জ্যোতির্ময় পদাঙ্গুলি।

কাপালিকের ধ্যান ভাঙে। তিনি তাঁর রক্তদৃষ্টি প্রসারিত করেন সামনে। তারপর বৈষ্ণবদের উদ্দেশে বলেন : আমার নাম আত্মারাম। স্বপ্ন আমার অলীক নয়। এই দেখো, আমি খুঁজে পেয়েছি সতীর সুদর্শন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন পদাঙ্গুলি। এই পদাঙ্গুলির মাহাত্ম্যেই এখানে পীঠস্থান রচনার উদ্দেশ্যে আবির্ভূতা মহাশক্তির প্রতিমা। নরবলির মাধ্যমে আজ তাঁর প্রথম পূজা করেছি আমি। আমি বিশ্বাস করি, আজ প্রথম পূজার এই রক্তধারাতেই ভেসে যাবে বৈষ্ণবকুলের সমগ্র বসতি।

কাপালিকের কথায় এবার আরও বেশি শিউরে ওঠেন বৈষ্ণবপন্থীরা। তাঁরা ভাবেন : হয়তো তাঁদের বসতি-অঞ্চল ভাসিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই অরণ্য থেকে আখড়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে রক্তের রেখা। সুতরাং সেই মুহূর্তে সভয়ে তাঁদের অনেকেই শাক্ত-ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন কাপালিকের কাছে। আর যাঁরা এতকালের আচরিত ধর্ম অত সহজেই বিসর্জন দিতে পারলেন না, তাঁরা পালিয়ে এলেন এবং পরে বসতি-অঞ্চল ছেড়েও তাঁরা স'রে গেলেন দূরে।

শোনা যায় : সেই ভয়ঙ্কর কাপালিকের প্রভাব এড়াবার জন্যেই যে-সমস্ত বৈষ্ণব ত্যাগ করেন তাঁদের ভিটেবাড়ি, তাঁরা একযোগে দক্ষিণ-পূর্বের এক দূরবর্তী স্থানে স'রে এসে নতুন

● কালীঘাট থেকে আদিগঙ্গার দৃশ্য

বসতির পত্তন ঘটান—যা পরবর্তী-কালে জনসাধারণের সহজাত আচার-সূত্রেই নাম ধারণ করে বৈষ্ণবঘাটা। সম্ভবত এই বৈষ্ণবঘাটার কিঞ্চিৎ অস্তিত্ব বজায় আছে এ-কালেও।

যাই হোক, উল্লেখিত কাপালিক কর্তৃক শক্তি-প্রতিমা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নাকি কালীঘাট নামের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু কালীঘাট সম্পর্কীয় উপকাহিনী কেবল একটিই নয়, আরও আছে। সুতরাং একাধিক উপকাহিনী বা কিংবদন্তীর ঠিক কোন্‌টির মধ্যে ইতিহাসের উপকরণ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত—আজ তা নির্ভুল আবিষ্কারের চেষ্টা করা বৃথা। কারণ উপকাহিনীগুলির কোনোটিই ঠিক স্বাভাবিক নয় এবং একটির সঙ্গে আরেকটির বিরোধ রয়েছে যথেষ্টই। ---এ-সম্পর্কে অপর এক কিংবদন্তী হলো এই যে, সাবর্ণ চৌধুরীদের অন্যতম আদিপুরুষ কেশব রায়-চৌধুরী। তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশে অরণ্যের মধ্যবর্তী কালীকুণ্ড-তীরে আসেন এবং সেখানে দেবীর প্রস্তর-প্রতিমার দর্শন পান। অতএব সেখানেই তিনি তা প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে দেবীকে কেন্দ্র ক'রেই নির্মাণ করেন একটি ক্ষুদ্র দেবালয়। তারপর তাঁরই পরবর্তীকালের অন্যতম বংশধর রাজীবলোচন রায়চৌধুরী পূর্বের ক্ষুদ্র দেবালয়ের স্থলে প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানের বিশাল মন্দির।

এ-সম্পর্কে আরেকটি কিংবদন্তী এই: কোনো এক সময় জঙ্গলগিরি নামে এক সন্ন্যাসী গভীর বনের মৃত্তিকায় একটি গাভীকে দুগ্ধ বিসর্জন করতে দেখেই সে-স্থান খনন করেন এবং খনন করার পর সবিস্ময়ে লাভ করেন পাষাণ প্রতিমার জ্যোতির্ময় মুখ-মণ্ডল। তারপর তিনিই তা কালী-কুণ্ডের তীরে এক পর্ণকুটিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে কালীঘাট নামের প্রচার করেন সাধারণ্যে।

তা ছাড়া আরও একটি কিংবদন্তী হলো এই যে, এক সময় পান-পোস্তা নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র আকারের কালীমন্দির ছিল। মন্দির ক্ষুদ্র হলেও কালী-দর্শনার্থীর সমাবেশ ঘটতো অসংখ্য। এই অসংখ্য দর্শনার্থীর প্রয়োজনেই পরে একটি হাট বসতো সেখানে। তারপর বেশ কয়েকটি যুগ অতিক্রান্তির পথেই একদিন লয়প্রাপ্তি ঘটে মন্দিরের। তবে মন্দির ধ্বংস হলেও, হাটের অস্তিত্ব বজায় ছিল নিয়মিতই—যে-হাট পরে পোস্তার হাট নামেই তার পরিচিতি বিস্তার করে জনসমাজে। একদিন গঙ্গাসাগর-তীর্থ-যাত্রার পথে পোস্তার হাটেই হাট করতে আসেন একদল কাপালিক। কিন্তু হাট করতে এসেই তাঁরা পূর্বোক্ত মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ দর্শন করেন এবং সে-স্থানের মৃত্তিকা খনন ক'রে উদ্ধার করেন মহাকালীর পাষাণ-প্রতিমা। অতএব উক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার পর তন্ত্রমতে নরবলির প্রয়োজন বলেই তাঁরা পাষাণ-প্রতিমাসহ লোকালয় ছেড়ে প্রবেশ করেন গভীর অরণ্যে। তারপর সেখানেই তা প্রতিষ্ঠা ক'রে, নরবলির পর আরাধনার আয়োজন করেন নিয়মিত। তারপর দিনে দিনে কাপালিকদের এই নিয়মিত আরাধনার সংবাদ বিভিন্ন লোকালয়ে পৌঁছবার পর, জনসাধারণ কর্তৃক উক্ত আরাধনা-ক্ষেত্রের নামকরণ হয় কালীঘাট।

কালীঘাট সম্পর্কে উল্লেখিত কিংবদন্তীসমূহ ছাড়াও আরও অনেক কিংবদন্তীর প্রচলন আছে। এ-সমস্ত পরস্পরবিরোধী কিংবদন্তীর সূত্রে সত্য-নিরূপণ যে সত্যই অসম্ভব—আজ তা সহজেই অনুমেয়। কালীঘাটের সেবায়েতরূপে প্রথম যাঁকে পাওয়া যায়—নাম তাঁর ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী। সম্ভবত তখন ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পরিচ্ছেদ। এই পরিচ্ছেদেই কালী-ঘাটের মাহাত্ম্য-খ্যাতি ব্যাপ্তিলাভ করে দেশ-দেশান্তরে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রামের চণ্ডীকাব্য এবং বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী গ্রন্থেও বিবরণ-বিন্যাস ঘটেছে তদানীন্তন কালীঘাটের। অনেকে বলেন: ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী গুরু ব্রহ্মচারীরূপেই অধিক পূজনীয় ছিলেন সাধারণের কাছে। তাঁরই অন্যতম শিষ্য যশোহরের বসন্ত রায় কালী-ঘাটের পর্ণকুটিরের স্থলে ক্ষুদ্র আকারের একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করেন সর্বপ্রথম। ভুবনেশ্বরের একমাত্র জামাতা ভবানীদাসের বংশধররাই নাকি হালদার উপাধি গ্রহণ করেন পরবর্তীকালে—যাঁরা আজও কালীঘাট মন্দিরের সেবায়েতরূপে বর্তমান।

মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্তী যে-বিশাল ভূমিখণ্ড দেবত্তর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত, অনেকে মনে করেন তা বড়িশার ভূ-স্বামী সন্তোষ রায় কর্তৃক প্রদত্ত। আবার অনেকের মতে তা দেবত্তররূপে দান ক'রে গিয়েছিলেন পুরাকালের ক্ষত্রিয়-রাজগণ। তবে জমিদানকারী এবং মহাকালীর পাষাণ-প্রতিমার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে মতানৈক্যের অবকাশ থাকলেও দেবীকে কেন্দ্র ক'রে ক্ষুদ্রাকৃতি মন্দিরের স্থলে যে-বিশাল মন্দির মাথা তুলে দাঁড়ায় ১৮০৯ খৃস্টাব্দে—তার নির্মাতা সম্বন্ধে দ্বিমত

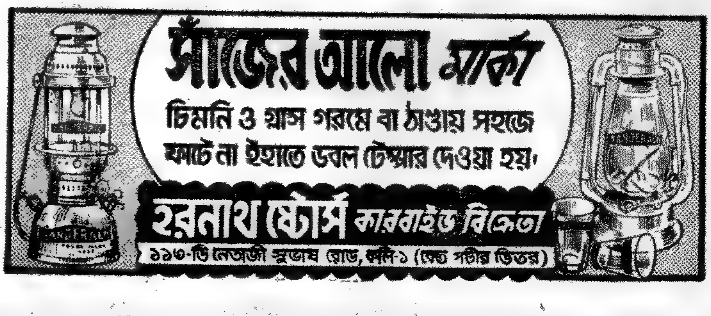

● কালী টেম্পল রোডের বর্তমান দৃশ্য

নেই কোথাও। বড়িশার ভূ-স্বামী সন্তোষ রায়ের পুত্র রামলাল এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচনই বিশাল মন্দির-গৃহ নির্মাণ করেন প্রায় ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে। এই মন্দিরের উচ্চতা যেমন ষাট হাত, তেমনই ভেতরের পরিসরও পঞ্চাশ হাত। সমগ্র অবয়ব তার সুশোভন এবং গম্ভীর। গাম্ভীর্যের এক অক্ষয় প্রতীকরূপে সে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একালেরও নির্বিচার ভক্তির শিখরদেশে।

মন্দিরের পাদদেশে আদিগঙ্গার যে-প্রাচীন ঘাট আজও বর্তমান—১৭৭১ খৃস্টাব্দে তা নিজব্যয়ে নির্মাণ করেন হজুরিমল্ল নামে পাঞ্জাবের একজন সৈনিক। তা ছাড়া ঘাটের সন্নিকটবর্তী নকুলেশ্বর দেবের যে-মঠ-মন্দির—তা'ও ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন তারা সিং নামে পাঞ্জাবেরই একজন ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী। এই নকুলেশ্বর মঠেই শিবরাত্রি এবং নীলষষ্ঠীর লগ্নে অজস্র যাত্রীর সাড়ম্বর-সমাহার ঘটে আজও। এককালে চড়ক-পর্বেরও মহানুষ্ঠান সমাধা হতো এখানেই। সম্ভবত সে-কারণেই নকুলেশ্বর মঠের বহিঃপ্রাঙ্গণ চড়কডাঙ্গা নামে পরিচিত ছিল কিছুকাল আগেও।

কালীঘাটের শ্যামরায় বিগ্রহও অনেককালের প্রাচীন। বাওয়ালী নিবাসী দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভূ-স্বামী উদয়নারায়ণ মণ্ডল ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন শ্যামরায় বিগ্রহের মন্দির এবং ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তার দোলমঞ্চ নির্মাণ করেন সাহানগর নিবাসী মদন কর।

কখনো বিলম্বিত এবং কখনো বা দ্রুত লয়ের মাত্রাহীন ছন্দে চরণ ফেলে চ'লে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। পাঠানদের মহাপ্রস্থানের পর মোগলদের জয়ধ্বজা উড়েছে সপ্রতাপে। তারপর মোগলরাও ভূতাশ্রয় লাভ করেছে দিনে দিনে, এসেছে ইংরেজ। সম্ভবত ইংরেজদের আমলেই কালীঘাট থেকে সমূলে অপসারণ ঘটে অরণ্যের এবং তার সমগ্র অংশেই বসতি-বিস্তার সুরু হয় বুদ্ধিজীবী সমাজের।

তারপর সুদীর্ঘ উৎপীড়নের কাল কেটেছে ইংরেজদেরও। যুগের পর যুগান্তর এসেছে, ফাঁসির মঞ্চেও জীবনের জয়গান গেয়ে, বিদ্রোহের বহ্নি-উৎসবে উজ্জীবন লাভ করেছে দেশের রক্ত-লাঞ্ছিত মাটি। সুতরাং সে-মাটির প্রচণ্ড উত্তাপ আর সহ্য করতে না পেরেই ইংরেজ-নিয়তিরও অগস্ত্যযাত্রা ঘটেছে এ-দেশ থেকে।

আজ স্বাধীন আমাদের সমগ্র দেশ এবং কালীঘাট সেই স্বাধীন দেশেরই পীঠস্থান। অথচ তা সত্ত্বেও আজ তার সার্বিক পরিবেশ অধোযাত্রী কেন? কেন তা মহানগরীর অঙ্গীভূত হয়েও, স্বাধীনতা-উত্তরকালের নবীন মর্যাদার উদ্ভাসে আজ উজ্জ্বল হওয়ার সুযোগলাভে বঞ্চিত?

সত্যই, আজ কালীঘাটের কোনো অংশেই প্রকৃত সংস্কারের কোনো আয়োজন নেই। অনিয়ন্ত্রিত জনারণ্যে বিপর্যস্ত তার সমগ্র ভূ-ভাগ। রাস্তাঘাট তার বিপন্ন এবং সঙ্কুচিত বেপথু বসতির অব্যাহত সম্প্রসারণে। কালী টেম্পল রোড প্রশস্ত হয়েও এবং হাজার হাজার দেবী দর্শনার্থীর পদরেণু প্রত্যহ তার আসীমান্তে ধারণ করেও রাজপথের পরিমার্জিত স্বরূপ সে অর্জন করতে পারে নি। জরার অকাল আক্রমণ তনুর বিস্তারে তার ক্লান্তির স্বাক্ষর এঁকেছে প্রকটভাবে।

আর মন্দির-পাদদেশের সেই আদিগঙ্গার গতিও আজ মুমূর্ষু রোগিণীর স্তিমিত হৃদয়। আজ তার কূল নেই, মান নেই। জোয়ারের লগ্নেও তার কঙ্কালসার বুকে সুস্থ জীবনের কোনো স্পন্দন আর জাগে না। তবু তার বুকেই আজন্মের পাপ বিসর্জন দিতে আসে হাজার হাজার স্নানার্থী। হায় রে কলিকালের কালীঘাট, আর কতকাল তুমি সনাতন-সংস্কারবন্দী মানুষের শিশু-চিত্ত অপহরণ ক'রে, বিনিময়ে পুণ্যের নামে বিতরণ করবে আদিগঙ্গার কটুগন্ধী ক্লেদ।

অন্য তরঙ্গ

লেখা ছাপাবার জন্য যে কোন লেখককেই সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু তার অর্থ কখনো এই নয় যে, লেখককে সাংবাদিক হতে হবে। শিল্পসৃষ্টি ও সংবাদ পরিবেশনা, এই দুই বৃত্তি সম্পূর্ণ আলাদা যেমন সাহিত্য-রচনা ও শিক্ষকতা। সম্মানীয় শিক্ষক সাহিত্যের সুলেখক না-ও হতে পারেন, বা শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হবেন, এমন কোন কথা নেই, বৃত্তিগত ভিন্নতাই তার প্রধান কারণ। অথচ জগতে এমন দৃষ্টান্তও অবিরল যে একই ব্যক্তি একই সঙ্গে সুশিক্ষক ও সুলেখক, বা সু-সাংবাদিক ও সু-সাহিত্যিক।

অবশ্য এই সব বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটির ভিত্তিই সৃজনশীলতা। সেইজন্য একই ব্যক্তির দ্বিচারিতা অনধিকার প্রবেশের নিন্দায় কখনো ভর্ৎসিত নয়। কেন না এই সব ক্ষেত্রগুলি যে কোন একটি বৃত্তিচারীর পক্ষে বিচরণের সম্ভব ক্ষেত্র। এবং split personality-র প্রসঙ্গ অতঃপর যখন আর অগ্রাহ্য হবার কারণ নেই, তখন বৃত্তিগত বিশুদ্ধতার সংশয় হয়তো আর কখনো উচ্চারিত হবে না। তবু একথাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, দুই ক্ষেত্রে চরিতার্থতা কুড়িয়েছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়।

সুলেখক বা সুকবি বা সুসাহিত্যিক কথাগুলি প্রশংসাবাচক, এর অধিক কিছু নয়। এই সব শব্দের পৃষ্ঠায় নাম লেখাতে হলে ক্ষমতায় মধ্যবিত্ত হলে চলে, তাঁদের ঘিরে কখনো মহৎ প্রত্যাশা ঘন হয় না। অথচ শিল্পের ক্ষেত্রে মহত্ত্বকে সন্ধান এক সাধারণ ধর্ম ; এই মহৎ দ্যোতনার অনুপস্থিতি কোন রচনাকেই গুরুতর ভূমিকা দান করতে পারে না। 'এই কবিতাটি ভালো', 'এই উপন্যাসটি ভালো'— পাঠকের মনে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার অর্থ এই যে রচনাটি মধ্যমান ; এবং কোন সৎ লেখক এহেন সাধুবাদে বরং সংকুচিত বোধ করবেন ও নিজের সম্পর্কে পুনর্বিবেচনায় আগ্রহী হবেন। বস্তুত এই জাতীয় প্রতিক্রিয়া মানে সাহিত্যজগতে রচনাটি বাতিল হয়ে গেল। শিল্প-ব্যক্তিত্বের কাছে এর চেয়ে শোচনীয় আর কিছু হতে পারে না।

শিল্প-ব্যক্তিত্বই বস্তুত মূল কথা। এক্ষেত্রে বৃত্তিপ্রসঙ্গ বহিরঙ্গ। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি একজন সফল ব্যবসায়ীও। আধুনিক বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ লেখকরা প্রধানত শিক্ষক। ঔপন্যাসিকদের অনেকেই সাংবাদিক। বৃত্তি হিসেবে সাহিত্য-রচনাকে গ্রহণ করা আজ কোন সাধারণ প্রবণতা নয়, এই নিয়ে আক্ষেপ করবার বিশেষ কোন কারণ হয়তো নেই। তবু একথা বাতিল হয়ে যায় না যে বৃত্তিগত এক-চারিতা নিষ্ঠার জনক, এবং সেটা কাম্য। যাঁরা শিক্ষকতা করেন তাঁরা অনেক সময় একটা সুবিধে ভোগ করে থাকেন, তাঁদের জীবিকাবৃত্তি পক্ষান্তরে তাঁদের শিল্প-ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলবার পক্ষে সহায়ক। শিল্পরাজ্য জ্ঞানের রাজ্য সন্দেহ নেই, জ্ঞানচর্চা যেহেতু শিক্ষকতার অঙ্গ, সেজন্য তাঁরা স্বভাবতই বিষয়ের মুখোমুখি দাঁড়ান কম, বরং শিল্পচর্চায় তাঁদের অধিকারের দিগন্ত তাতে ব্যাপ্ত হতে থাকে। বোধহয় এই কারণেই সাহিত্য-শিল্পের প্রথম সারির কুলীন যে আঙ্গিক, অর্থাৎ কবিতা, তার লেখকরা অনেকেই শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রতি আপাত পক্ষপাত দেখিয়েছেন। কিন্তু তথাপি পাশাপাশি এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যিনি শিল্প ব্যক্তিত্ব হিসেবে বরণীয় তিনি কতখানি শিক্ষক হিসেবে সফল ? দুই ক্ষেত্রেই সমান উজ্জ্বল, এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসেও মুষ্টিমেয়, অর্থাৎ জীবন ও জীবিকা বা শিল্পসৃষ্টি ও শিক্ষকতা, এর যে কোন একটি অংশ আহত হতে বাধ্য। অর্থাৎ এক ক্ষেত্রে সৎ যিনি, তিনি অপর ক্ষেত্রে অসৎ না হয়েও সৎ না-হতে পারেন। দুয়েরই ভিত্তি সৃজনশীলতা ও সঞ্চারণশক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই জাতীয় বিষম প্রায়ই আত্মপ্রকাশ করে। বৃত্তিই সাধারণত বেশি আহত হয়, এ সব ক্ষেত্রে তার নিজস্ব ভূমিকাটি এতে শোচনীয় হয়ে ওঠে, অনেকটা ill served master-এর মত।

সাংবাদিকতাবৃত্তি জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমন লেখকরা সচরাচর কথাসাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত দেখান। কেন না সেক্ষেত্রে বৃত্তি তাঁদের সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে। বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত ঘটনা এবং সমকালীন সামাজিক প্রবণতাগুলি তাঁদের দুয়ারে প্রতিনিয়ত এসে উপস্থিত হচ্ছে, এর জন্য তাঁদের পরিশ্রম করতে হয় না। বড় বেশি তৈরি-অবস্থায় এসে উপস্থিত হয় বলে সেগুলিকে সাজিয়ে তুলতে শিল্প-বিবেকের প্রয়োগ প্রায়শ উপেক্ষিত হয়। ঘটনা ও তাৎপর্যের সামঞ্জস্য বিধানের কাজ যেখানে এত সহজে চুকে যায়, সেটা শিল্প-উপলব্ধির উৎক্ষিপ্ত সম্মোহন অবস্থার ফল না বলে, সেখানে কোথাও একটা ফাঁক থেকে যায়, এবং সংবাদের সমকালীন বৃত্তকে অতিক্রম করা হয়তো সেখানে দুঃসাধ্য।

—সুব্রত

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কথায় বলে ছত্রিশজাতে সমাজ, একো জাত এক পাড়ায় থাকে, গ্রামের রীতি। এক বৃত্তির মানুষ একঠাঁই থাকবে এ নিয়ম কে গড়েছিল বলা কঠিন। তবে বৃত্তি থেকেই জাত, জাত থেকে একঠাঁই বসবাসের নিয়ম। বর্গীরা এসে অন্তত কিছুক্ষণ হাটতলায় ছত্রিশজাতকে এ ওর ঘাড়ে ফেলে ছোঁয়ানেপায় শ্রীক্ষেত্তর করে ছাড়লে। আগুনের ধোঁয়ায় সব আঁধার করে দিয়ে তবে বর্গীরা গ্রাম ছেড়ে গেল।

আনন্দীরামের বাড়ি আশ্চর্য, কপাল গুণে অক্ষত রয়ে গেল। কপাল গুণ, অর্থাৎ ললাটলিপিতে এ গ্রামের লোকের বড়ই বিশ্বাস। কর্ম করতে দেখলেও বলবে এই সময়ে যে এই কাজটি করতে হবে এ বুদ্ধি ওকে জোগালে কে। কর্ম বড় না ভাগ্য বড় এ তর্ক প্রাচীন কারুকাজখচিত রম্য আটচালায় এ পর্যন্ত ওঠে নি তার কারণ হল ভাগ্যের অমোঘ ক্ষমতায় কারো অবিশ্বাস নেই। প্রাচীন বাচস্পতি, নবীন আনন্দীরাম সবাই ভাগ্যে বিশ্বাসী।

আনন্দীরামের ভাগ্য তখন কৃপা করেছিল। সদগোপপাড়া থেকে তাদের মাহিন্দাররা সপরিবারে পালিয়ে এসেছিল ইতিমধ্যে। তারা বললে আরো সব পালিয়ে এসছিল, কিন্তু ভোরের আলো ফোটে দেখে ঝোপে-জঙ্গলে সেঁদিয়েছে। 'কর্তা, কর্তা!' তাদের আর্তনাদ শুনে মামা বলেছিলেন, 'রও, এর মধ্যে ফন্দীবুদ্ধি আছে।' মা বলেছিলেন, 'চুপ', কিন্তু আনন্দীরাম কারো কথা শোনেন নি। চাপা দোর খুলে নেমে যান।

দোতলায় সব চালেডালে হয়ে বসে থাকতে থাকতে আগুনের শিখা যখন দেখা যেতে লাগল, তখন প্রাচীন মাহিন্দার বললে, 'ছোট কর্তা, ত্যাতক্ষণ পালেদের আমবাগান তোমাদের বেঁচিয়েছে, এখন ভোরের আলোয় সব দেখা যায়। এখন কি করবে?'

'কি আর করব।'

'পোয়ালে আগুন দ্যাও।'

'আগুন দেব।'

'হ্যাঁ ছোটকর্তা, পোয়ালে আগুন দ্যাও যদি বাঁচতে চাও।'

'আগুন বাতাসে লহ লহ জ্বলবে, আমরা সব ঘরে বসে শোর পোড়া হব।'

ছোট মাহিন্দারকে ধমক দিয়ে প্রাচীন বৃদ্ধ বললে, 'ভেমো বুদ্ধি তোমার। পোয়াল ফেলবে পথের ওপর, গাদানি করবে। তাতে আগুন দিলে দু'কাজ হবে। এক, ওনারা আগাতে ভয় খাবে, আর দূর হতে দেখলে ভাববে ইদিকেও আগুন লেগেছে, লুঠ হয়ে গেছে, আর বৃথা এগিয়ে লাভ নেই।'

আনন্দীরাম আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে নেমে এলেন। মাহিন্দারদের বললেন. 'রান্নাঘরের পেছনে পুরনো

বাঁশের গাদা, সব নিয়ে এস। আগুন জোর হবে।'

ধূ ধূ ক'রে জ্বলতে লাগল আগুন, সে আগুন দূর থেকে যে দেখল সেই মনে জানল মুখুটি বাড়ি আর নেই।

স্বরকণ্ঠ অবশ্য পিসিমাকে দাহ করবার সময়ে এতকথা এগিয়ে ভাবেন নি। আপাতকর্তব্য বড় ছিল। ব্রাহ্মণ বিধবার মড়া, যথাসাধ্য সদ্গতি হওয়া প্রয়োজন। অন্দরের ঘের-আঙ্গিনার পাঁচিল পেরোলে তাঁদের সুপ্রাচীন আমবাগান, যদিও বর্তমানে তাঁর দখলে নেই, বন্ধকী বাগান আচার্যদের কাছ থেকে তিনি কোনদিন খালাস করলেন না।

এ-বাগানের রাণীভোগ ও বেগম-পছন্দ আমগাছগুলি সরল, সু-সম দূরত্ব রেখে রোপিত। 'জাত আমের যত্ন জেয়াদা' প্রবাদে আছে, কিন্তু হাতবদল হতে হতে এ-বাগান মালিকের যত্ন-আদর পাবার ভাগ্যি বহুদিন হারিয়েছে। এখন, ব্রাহ্মণপল্লীতে ঐ ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড ছোট একটি অরণ্যের মত পড়ে থাকে। পরিত্যক্ত, নির্জন, গাছের ডাল হতে ঝুক্তি ফুল ও তেল-পোরা ফলের মোটা লতা দোলে, প্রত্যুষে একজোড়া বেঁজী সন্দিগ্ধ নাকে মাটিতে বঙ্করাজ গোখুরের গতিবিধির দাগ শুঁকতে থাকে, বর্ষাকালে ঘন উদ্ভিদে ঢেকে যায়।

স্বরকণ্ঠ স্থির করেন সেখানেই পিসিমাকে দাহ করবেন। গৃহপ্রাঙ্গণে মৃতদেহ দাহ করা ঠিক নয়।

'কোন দেশে করে না,' ফুলেশ্বরী বলেন।

'কে বললে? বড়গাঙপার ইসলামাবাদে যাও না কেন, স্বগৃহের চৌহদ্দিতে দাহ না করলে উঁচুজেতে মড়ার গতি হয় না।' স্বরকণ্ঠ শুষ্ক হাস্য করে বললেন।

'তা ঘরে আর শ্মশানে কোন ভেদ রইবে না, কি বল?' পাগল চোখ মুছে সরল প্রশ্ন করে।

'আমি কখনো এমন কথা শুনি নি।' ফুলেশ্বরী না বলে পারেন না।

'আমি বল আর তুমি বল, পৃথিবীর কতটুকু দেখেছি বল ফুলি? একো দেশে একো নিয়ম, সাদা চোখে যা দেখ তার চেয়ে পৃথিবীটা অনেক, অনেক বড়।'

'বাড়িতে পোড়ালে গতি হয়?' যা জানেন না যা দেখেন নি তা বিশ্বাস করতে ফুলেশ্বরী প্রস্তুত নন। আগে জেনে নেওয়া দরকার এতে শাস্ত্রের অনুমোদন আছে কি না।

'দুর্ভিক্ষে, বিপৎকালে, যুদ্ধে, মহামারীতে, মুখাগ্নিমাত্র করে মাটি দিতে পার, যুগীরা যেমন সমাজ দেয়, কিন্তু কথার কথায় বিলম্ব হয়ে যায়।'

সেই আমবাগানেই পিসিমাকে দাহ করা হল। জীবিতকালে বৃদ্ধা থাকতেন সবচেয়ে নীরবে, সংসারের কোথাও ছিলেন না। এখন চিতার ওপর তাঁর দেহ সত্বর জ্বলে গেল এবং দেহ যেমন চিতাগ্নিতে লয় পেতে থাকল, তেমনি দ্রষ্টাদের মনে হতে লাগল মৃন্ময় দেহের বন্ধন যেমন খসে যাচ্ছে, পিসিমাকে যেন তেমনি বেশি করে উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

এত যে প্রয়োজনীয় ছিলেন তিনি, একথা আগে জানা যায় নি। বিবাহ-বৈধব্য সব পালা শেষ করে দিয়েছিলেন সাত বছর বয়সের মধ্যে। তারপর তাঁর কাজ ছিল এ গৃহের পরিচর্যা করা।

স্বরকণ্ঠের মনে হল পিসিমা চলে যাওয়া মানে নিত্য ধূপদীপদান বন্ধ, এ জীর্ণ আলয়ের প্রতিটি ইটের জন্য মমতার অবসান, ব্রত পূজা উপবাসের পাট বন্ধ, তাঁর পেছনের বন্ধনমুক্তি।

শোকের অবসানে পাগলের মনে ঢুকল অনিশ্চয়তার ভয়। সে মনে মনে ভাবতে থাকে স্বরকণ্ঠ খুড়োকে জাতে পাগল ধাতে পাগল বললেই হয়। পিসি ছিল পিছটান। ঘাসের আঁটির লোভ দেখিয়ে দুষ্ট গরুকে গোয়ালে এনে বন্ধ করতে হয়। স্বরকণ্ঠকে পাগল তেমনি, পিসি ডাকতেছে, তিনি কানতে লেগেছে, তোমার নাম করে ভাতের হাঁড়ির সামনে বসে আছে দ্বাদশীর দুপুরে এই সব কথা বলে বাড়ি নিয়ে আসত। এখন, পিসির অবর্তমানে একলহমায় সে পাগলকে না অপ্রয়োজনীয় ভাবে এই আশঙ্কায় পাগল কাতর হয়।

ফুলেশ্বরীর শুধু মনে হয় বড়ই বিপন্ন তিনি। জেদের বশে এমন কাজ করেছেন, যে কি এগোলে কি পেছোলে উভয়তই তাঁর বিপদ। এখন এ গ্রামে কাকপক্ষীকে মুখ না দেখিয়ে পিত্রালয়ে ফিরে যেতে পারলে মান বাঁচে। স্ত্রীলোকের চরিত্রে দোষ কথায় কথায় লাগে। তাঁর মা বলেন মাতামহী চিতায় উঠবার আগে শুনলেন অমুকের মা বড় সাধ্বী। পুণ্যপিপাসু ছেলে মেয়ে পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্রীর দিকে

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

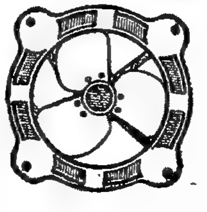

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো. (প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

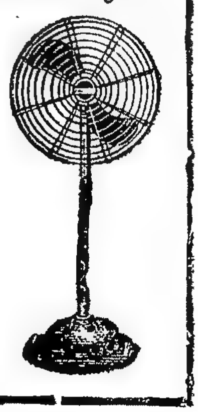

চেয়ে চিতায় পা রেখে বললেন 'আগে ছাই উড়ুক।'

মনে পড়তে লাগল কথায় কথায় মেয়েদের শাস্তি দেবার কতরকম গল্প শুনেছেন, আহা, শাশুড়ীর নির্যাতনের ভয়ে, সমাজের শাসনের বহর দেখে গেরস্তবউ গাছপাথর যা পায় তারই সামনে হাতজোড় ক'রে বলে, হে গাছ, যদি সত্যযুগের গাছ হও, হে পাথর যদি সত্যযুগের পাথর হও, তবে আমায় বাঁচাও। তারপর হলুদ-বরণ বেনেবউ পাখী হয়ে তবে সে বালিকা বাঁচে।

সমাজ-সংসার কি, যার জন্যে এত কষ্ট করে এত দূরে এলেন সেই কি বুঝে দেখবে? মেয়েবুদ্ধির জ্বালা কত, কাকে বোঝাবেন আর সহ্য করতে পারেন নি একলা থাকার দুঃখ, তাই ছুটে এসেছিলেন অধীর হয়ে, আসতে পেরেছিলেন কেমন করে? একা সুরকণ্ঠ থাকেন জানলে আসতে সাহস করতেন কি? বৃদ্ধা একজন অভিভাবকস্থানীয়া আছেন জেনে মনে ভরসা ছিল কত। পরিবারে এমন একটি বৃদ্ধা থাকা মানে কতখানি আশ্বাসের ঠাঁই এখন তা মনে হতে লাগল।

এখন তিনি কি করবেন? কোন-দিকে যাবেন? সুরকণ্ঠের বাড়িতে কেন লুকিয়েছিলেন তা কি বলবেন? কে তাঁর কথা বিশ্বাস করবে? এদিকে লুকিয়ে এসে এমন কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছেন যে, কোন মেয়েছেলেকে যে শুতে বলবেন সে পথও বন্ধ। ফুলেশ্বরীর মনে মনে অবসন্ন বোধ হল, কিন্তু সামনে এখন অনেক কাজ।

সুরকণ্ঠ চিতার পাশে পা ফাঁক করে দাঁড়ালেন। শ্মশানে-মশানে ঘোরবার অভিজ্ঞতা এখন কাজে লাগছে কত। উঁচু টালে চিতা সাজান নি, দগ্ধ রোদে ইট-পোড়া মাটি খুঁড়ে অগভীর চৌকো খাতে সাজিয়েছিলেন চিতা। পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন, শ্মশানে হরিশচন্দ্র যেন। রাজপুরুষের মত চেহারা এখন ছাই-মাটিতে মাখামাখি। বললেন, 'পাগল, বাইরে গিয়ে একবারটি দেখে নিয়ে খিড়কী বন্ধ দে।' স্বগত বললেন, 'পুকুর সেঁচলে হয়ত কাদা উঠবে, কিন্তু মুক্ত করতে হবে সব ঘরদোর।'

সেই সময়ে আনন্দীরামের বাড়ির দরজায় একটি লোক কাতরস্বরে ডাকছিল—'দোর খোল, প্রাণ বাঁচাও, দয়াময় দোর খোল।' তার শরীর কর্দমাক্ত। পরনে গেরুয়া, এই লোকটিকে সুরকণ্ঠ দয়ারামের দরজায় দেখেছিলেন। তার কাতর ও ভীরু কণ্ঠে অপরিসীম মিনতি, চোখে জল। হাত ও পা রক্তাক্ত।

(ক্রমশঃ)

হাওয়াই গীটার

সুনীল বসু

নির্জন নীল জলের কিনারে কে বাজায় বসে হাওয়াই গীটার
সুরের কান্না টুং টাং ঝরে ধ্বনির মুক্তো গালিচায় ঝরে
তারার একেট একটি ঝুলছে নীলিমা-গ্রীবায় অভ্র হীরার
আহা রাত্রির নিজে এঁকেছেন ঈশ্বর; মিহি তুলির আঁচড়ে।

বালির উপরে কে বাজায় নীল হাওয়াই গীটার সোহাগে দরদে
কর্পূর সাদা জোছনা ঝরবে নরম ঘাসের চিকণ রেশমে
কোথাও আকাশ অঙ্গ ঢাকছে রুপোলি মেঘের শুভ্র গরদে
হৃদয় ময়ূর নেচে ওঠে কেন লাখো ইচ্ছার রঙিন পেখমে

হাওয়াই গীটার কে বাজায় বসে দিগন্ত ধূ ধূ সমুদ্রতীরে
তালে তালে ওই পা ফেলছে জুড়ি উঁচু পাহাড়ের পান্থশালায়;
চটুল চোখের চকমকি জ্বলে হাল্কা হাসির হীরের মালায়
ফেলছে হৃদয় পনীরের মত দুইভাগ করে আহ্লাদে-চিরে।

বিপ্রলব্ধ

প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত

জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেছে। তারপর
আঙার মাণিক মন এখন প্রণাম
পাবার বয়সী; বার বার সর্বনাম
ধরে দিয়েছি ডেকে ব্যর্থ। অন্তশ্চর
প্রাণপাখিটার নবজন্ম অভিষেকে
পৌরোহিত্যে এসেছেন বৃদ্ধ কালান্তক।
মাঙ্গলিকীর পূর্বাহ্নে সব নাবালক
অভিপ্রায়ে অন্তর্জলি দিলাম। বিবেকে
রেখেছি কেবল যত্ন, অধিকার, প্রীতি,
অযুত সমৃদ্ধিভরা আন্তরিক রীতি।
শ্রদ্ধাজ্ঞান যত্নাভাসে সকল প্রত্যয়
পুড়ে মন বিপ্রলব্ধ। বাউল যৌবন
তাই জ্বলে পুড়ে খাক্। আর এ সময়
বিচিন্তার অধ্যাপক বার্ধক্য প্রবণ।

আমার প্রধান ভৃত্যের বিবেচনায় আমার সেই গুরুতর আহত অবস্থায় খোলা আকাশের নীচে রাত কাটানো বিপজ্জনক মনে হয়েছিল। তাই সে আমাকে নিয়ে এক প্রাচীন দুর্গে অনধিকার প্রবেশ করল। সেই দুর্গে ছিল বিষণ্ণতা ও মহিমার সংমিশ্রণে গঠিত ও এতকাল ধরে আপিনীয় পর্বতমালায় বিভীষিকার বস্তু। একথা যেমন বাস্তব সত্য তেমনি অলৌকিক-গল্পের লেখিকা মিসেস র‍্যাডক্লিফের কল্পনাতেও। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় যে, সেই দুর্গ অতি অল্পদিন হ'ল কেউ সাময়িকভাবে ছেড়ে গিয়েছে। রাত কাটাবার জন্যে আমরা সব চাইতে ছোট ও অনাড়ম্বর একটা ঘর বেছে নিলাম। ঘরটি ছিল দুর্গের বুরুজের একেবারে শেষে। আর তার সাজসজ্জা জীর্ণ ও প্রাচীন হলেও দামী ছিল। দেওয়ালের পর্দাগুলি কারুকার্য করা ছিল। আর দেওয়ালের গায়ে সাজান ছিল নানারকমের ও আকৃতির যুদ্ধে-জেতা যোদ্ধাদের নিজেদের নাম লেখা ঢাল। উজ্জ্বল সোনালী রঙের লতাপাতা আঁকা ফ্রেমে অনেকগুলি আধুনিক বিশিষ্ট চিত্র সেখানে টাঙান ছিল। চিত্রগুলি শুধু যে দেওয়ালের গায়ে টাঙান ছিল তা' নয়। সেই দুর্গের অদ্ভুত রচনাশৈলীর ফলে সেগুলি দেওয়ালের কোণে টাঙানও দরকার হয়েছিল। আমার যে মানসিক বিপর্যয় আরম্ভ হ'য়েছিল, তা হয়ত আমাকে ঐ চিত্রের দিকে আকৃষ্ট করেছিল।

আমি তখন পেড্রোকে ডেকে ঘরের ভারী পাল্লাগুলি বন্ধ করে দিতে বললাম। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আর তাকে বললাম, আমার বিছানার মাথার দিকে যে লম্বা মোমবাতির ঝাড় ছিল, তার সলতেগুলি জ্বালিয়ে দিতে ও বিছানার চারপাশে যে কালোরঙের ভেলভেটের ঝালর দেওয়া পর্দা ছিল, তা' দুপাশে সরিয়ে দিতে বললাম। এগুলি বলবার কারণ, যদি আমার ঘুম না-ও আসে, তবুও যাতে আমি খানিকটা এই চিত্রগুলির ধ্যানে ও খানিকটা একটা ছোট্ট বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারি। বইটা আমার বালিশের উপরে ছিল আর তাতে ছবিগুলির বিষয়বস্তু ও সমালোচনা থাকার কথা ছিল।

বহু—বহুক্ষণ ধরে আমি বইটা পড়লাম আর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। খুব তাড়াতাড়ি ও সুন্দরভাবে সময় কেটে গেল ও রাত গভীর হল। বাতির ঝাড়টা এমন জায়গায় ছিল যে, আমার দেখার অসুবিধা হচ্ছিল। আমার ঘুমন্ত ভৃত্যকে আর জানালাম না। একটু কষ্ট করে হাত বাড়িয়ে আমি সেটাকে যাতে আরও স্পষ্টভাবে বই-এর উপর আলো পড়ে, সেইরকম জায়গায় নিয়ে এলাম।

কিন্তু তার ফল যা হোল তা' একেবারে কল্পনাতীত। এখন অসংখ্য বাতির আলো গিয়ে পড়ল ঘরের কুলুঙ্গীতে। এতক্ষণ সেই কুলুঙ্গী খাটের একটা লম্বা ফ্রেমের আড়ালে থাকায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। পরিষ্কার আলোতে আমি তখন একটা চিত্র দেখলাম। সেটা আমি আগে লক্ষ্য করি নি। চিত্রটি ছিল একটি কিশোরীর। সবেমাত্র কৈশোর পেরিয়ে পূর্ণযৌবনা নারীত্বে পরিণত হতে চলেছে কিশোরী।

তাড়াতাড়ি চিত্রটির উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম। কিন্তু কেন যে করলাম তা' বুঝলাম না। তবে যতক্ষণ আমার চোখের পাতা বন্ধ ছিল, ততক্ষণ আমি মনে মনে চোখ বন্ধ করার কারণ খুঁজতে লাগলাম। তার কারণ, চিন্তা করবার জন্যে সময় নেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আর আমার দৃষ্টি যে আমাকে প্রতারিত করে নি, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া ও আমার কল্পনার রাশ টেনে আরও স্থির ও ধীরদৃষ্টিতে দেখার ইচ্ছা। একটু পরেই

লাম আবার একদৃষ্টিতে চিত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি যে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কেন না, চিত্রটির উপর আলোর প্রথম রশ্মি পড়ামাত্র আমার ইন্দ্রিয়ের উপর যে তন্দ্রাজনিত অসাড়তা নেমে আসছিল, তা' চলে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিল।

আমি আগেই বলেছি, ছবিটি একটি কিশোরীর। তাতে শুধু মাথা ও কাঁধ দেখা যাচ্ছিল, চিত্রশিল্পীর ভাষায় 'ভিনিয়েত' ঢং-এর ছবি ও আমেরিকার শিল্পী সালির অঙ্কিত মাথাওয়ালা ছবির মত।

দুটি বাহু, বক্ষ, এমন কি উজ্জ্বল কেশের প্রান্তভাগ ক্ষীণভাবে এসে সমস্ত চিত্রের পটভূমিকা রচনা করেছিল—যে অস্পষ্ট অথচ গাঢ় অন্ধকার তাতে মিশে গিয়েছিল। চিত্রের ফ্রেম ছিল ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল সোনালী রং-এর ঐ লতাপাতা আঁকা ফিলিগ্রীর সূক্ষ্ম কাজ করা। শিল্পকার্য হিসাবে চিত্রটি খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু চিত্রটি যে এত আকস্মিক ও গভীরভাবে আমার হৃদয়ে দোলা দিয়েছিল, তা' তার শিল্পকার্য ও মুখটির অপার্থিব সৌন্দর্যের জন্যে নয়। আর এও অসম্ভব যে, আমার কল্পনা আধো-তন্দ্রা থেকে মুক্তি পেয়ে মাথাটাকে জীবন্ত বলে মনে করেছিল। চিত্রটির ডিজাইনের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কেবলমাত্র মাথা ও কাঁধ আর ফ্রেমের বৈশিষ্ট্য এইরকম ধারণাকে মনেও স্থান দিতে দেয় নি ও ক্ষণিকের জন্যেও তা' ভাবা সম্ভব হয় নি।

বোধহয় ঘণ্টাখানেক ধরে আমি আধো-বসা আধোহেলান দেওয়া অবস্থায় একদৃষ্টিতে চিত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষকালে চিত্রটির আসল রহস্যের কারণ বুঝতে পেরে, আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছবিটি যে আমাকে মুগ্ধ করেছিল, তার কারণ, প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে ছবিটি ছিল পরিপূর্ণভাবে জীবন্ত এবং তা' আমাকে প্রথমে সচকিত ও পরে বিভ্রান্ত, পরাজিত ও ভীত করে তুলেছিল। গভীর ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি বাতির ঝাড়টা আগে যেখানে ছিল, সেখানে রাখলাম। যে চিত্র দেখে আমি উত্তেজিত হয়েছিলাম, সেটা এখন আর দেখা গেল না। আমি তখন যে বইতে ঐ চিত্রগুলির বর্ণনা ছিল, তা আগ্রহভরে খুঁজতে লাগলাম। যে পাতায় সেই ডিম্বাকৃতি চিত্রের কথা লেখা ছিল, সেই পাতা উল্টিয়ে নিম্নোক্ত হেঁয়ালী-ভরা অদ্ভুত লেখাগুলি পড়লাম:

'সেই কিশোরীটি ছিল অসামান্যা সুন্দরী—আর সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনি হাসিখুশিতে ভরপুর। কিন্তু তার জীবনে অভিশাপ নেমে এল যখন সে চিত্রশিল্পীকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে গেল এবং তাকে বিয়ে করল। সেই শিল্পী ছিল ঘোর আবেগপ্রবণ ও কর্মঠ। সে সাদাসিধেভাবে জীবন কাটাতো ও শিল্পের মাধ্যমে তার প্রিয়তমাকে খুঁজে পেয়েছিল। আর কিশোরীটি ছিল অসামান্যা সুন্দরী। সে যেমন ছিল সুন্দরী তেমনি আনন্দে ভরা; সব সময়েই হাসিখুশিতে ভরপুর। সে ছিল হরিণশিশুর মত চঞ্চল। সব কিছুই তার প্রিয় ও আদরের ছিল, কেবল যে শিল্প ছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাকে সে ঘৃণা করত। আর ছবি আঁকার জন্যে হাতলওয়ালা চওড়া কাঠের তক্তা, তুলি ও অন্যান্য সরঞ্জামগুলি যেগুলি তাকে তার প্রিয়তমের মুখচন্দ্র থেকে বঞ্চিত করেছিল, সেগুলি দেখে সে ভয় পেত।

সুতরাং যখন সেই শিল্পী তার নবপরিণীতাকে তুলিতে আঁকার ইচ্ছা জানাল, তখন তার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। কিন্তু সে ছিল বাধ্য ও বিনীত মেয়ে। তাই শান্তশিষ্ট হয়ে হপ্তার পর হপ্তা বসে কাটাল সেই উঁচু অন্ধকার বুরুজের মধ্যে—যেখানে আলো আসত কেবল মাত্র মাথার উপর দিয়ে বিবর্ণ ক্যানভাসের উপর। কিন্তু শিল্পীকে কাজের নেশা পেয়ে বসেছিল এবং সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও দিনের পর দিন কাজ করে যেতে লাগল। সে ছিল আবেগপ্রবণ, কল্পনাবিলাসী ও মেজাজী, আর সে তার কাজের নেশার মধ্যে ডুবে থাকল। তার ফলে সে লক্ষ্যই করল না যে, যে আলো সেই নির্জন কক্ষে ম্লান হয়ে এসে পড়ত, তা' তার প্রিয়তমার স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তার প্রিয়তমার শীর্ণ চেহারা সে ছাড়া আর সকলে দেখতে পেত। তবুও সেই কিশোরী কোন অভিযোগ না করে ক্রমাগত তার মুখে হাসির রেখা টেনে রাখল। কেন না সে দেখতে পেয়েছিল যে, সেই খ্যাতিমান শিল্পী তার কাজে পেত জ্বলন্ত উৎসাহ আর দিন রাত্রি কাজ করে যেত তুলি দিয়ে তাকে আঁকবার জন্যে।

শিল্পীকে সে খুবই ভালবাসত, কিন্তু দিন দিন সে মনমরা হয়ে যেতে লাগল ও তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। যারা চিত্রটি দেখেছিল তারা সত্যই মৃদুস্বরে চিত্রটির সঙ্গে কিশোরীর সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করল। তাদের কাছে এটা ছিল এক অদ্ভুত আশ্চর্য, আর সেটা যেমন শিল্পীর আশ্চর্য ক্ষমতার নিদর্শন, তেমনি যে প্রিয়তমাকে সে মনের মত করে ছবিতে এঁকেছিল, তার প্রতি গভীর প্রেমও প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু শেষটায় যখন তার কাজ শেষ হয়ে এল, সেই কক্ষে আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হল না। শিল্পী এখন কাজের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কচিৎ সে চিত্রটির উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিত, এমন কি তার প্রিয়তমার মুখচন্দ্র দেখতও না। সে দেখল না যে চিত্রটির উপর সে যে সাদা ছোপ এঁকেছিল, সেটা তার পাশে বসেছিল যে প্রিয়তমা তার কপোল থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

এমনি করে অনেকগুলি সপ্তাহ চলে গেল। এখন তুলি দিয়ে চোখের উপর অথবা মুখের উপর একটা টান দেওয়া ছাড়া আর কিছু বাকী থাকল না। তখন সেই কিশোরী, প্রদীপ যেমন নেভার আগে দপ্ করে জ্বলে ওঠে, সেই রকমভাবে তার স্বাস্থ্য ফিরে এল, তখন তুলির টানে সাদা ছোপ তুলে দেওয়া হল আর এক মুহূর্তের জন্যে সেই শিল্পী তার শিল্পকাজের সামনে সম্মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে বিবর্ণ হয়ে গেল ও কাঁপতে লাগল। সে চীৎকার করে উঠল, 'এ যে একেবারে জীবন্ত'। এইকথা বলে সে যখন তার প্রিয়তমার দিকে ফিরে তাকাল, তখন সে মরণের কোলে ঢলে পড়েছে!'

অনুবাদক—উমাপতি চক্রবর্তী

টোকিওর চিঠি

● টোকিওর দর্শনীয় টেলিভিশন টাওয়ার

আগামী অক্টোবর মাসে অষ্টাদশ অলিম্পিক খেলাধূলার জন্য এলাহি প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে শহর টোকিওয়। শুধু টোকিওয় নয়, সমগ্র জাপানেই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের অপেক্ষায় দিন গুণছে। এবং শুধু জাপানে এই প্রথম বলেই নয়, অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান সমগ্র এশিয়ায় টোকিওতেই সর্বপ্রথম। সুতরাং এই বিশ্বজোড়া খেলার মেলায় টোকিও যাতে অতিথিসৎকারে হিমসিম না খায়, তার জন্য অহর্নিশ ব্যাপক আয়োজনের বিরাম নেই।

এমনিতেই রাজধানী টোকিওয় তিলধারণের জায়গা নেই। ১৯৬২ সালের গণনায় টোকিওর লোকসংখ্যা ধরা হয়েছিল দশ মিলিয়ন, অর্থাৎ সমগ্র জাপানের প্রতি সাড়ে নয় জনের একজন টোকিওর বাসিন্দা। সে তুলনায় অন্যান্য শহরে জনসংখ্যার চাপ নগণ্য। টোকিওর পরে ঘনবসতিপূর্ণ শহর বলতে বোঝায় ওসাকা। জনসংখ্যা মাত্র তিন দশমিক এক মিলিয়ন। বর্তমান বছরে অলিম্পিক উপলক্ষে যে বিরাট জনসমাগম হবে, সেজন্য কর্তৃপক্ষকে নয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। একটি আনকোরা অলিম্পিক উপনগরীর নির্মাণকার্য দ্রুত সমাপনের পথে এগিয়ে চলেছে টোকিওয়। এই বাবদ সরকারী খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ২,৩০০ মিলিয়ন ইয়েন।

অবশ্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের হঠাৎ-চাপ সহ্য করায় জাপানীরা অভ্যস্ত। ১৯৫৮ সালে এই টোকিও শহরেই তৃতীয় এশীয় ক্রীড়াসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অতিথি-অভ্যাগতে টোকিও সেদিনও ছিল রীতিমত সরগরম। তবে অলিম্পিকের আকর্ষণ অনেক বেশি হবে, ব্যবস্থাও অনন্য। এজন্য ক্রীড়াপরিচালক সমিতি বহুদিন যাবৎ ব্যতিব্যস্ত আছেন। স্টেডিয়াম সম্প্রসারণ, অর্থ সংগ্রহ, দোভাষী শিক্ষণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থার ভার তাঁদের ওপরই ন্যস্ত আছে। বিদেশী অতিথিদের সুবিধার জন্য প্রায় পঁচিশ হাজার দোভাষী ইতিমধ্যেই তৈরি হ'য়ে আছেন।

বিভিন্ন দেশ থেকে কমপক্ষে সাড়ে সাত হাজার খেলোয়াড়, দর্শক এবং কর্মকর্তা আসছেন। এর ওপর জনবহুল যানবহুল টোকিওয় দেশীয় ক্রীড়ামোদীর ভিড়, সাংবাদিকদের ব্যস্ততা এবং টেলিভিশন কর্মীদের তোড়জোড়।

মিত্রেন

জনস্রোতে প্লাবিত টোকিও অষ্টমীর রাত্রের কলকাতাকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে জাপানে একটা মস্ত সুবিধে। স্টেডিয়ামে যাঁরা স্থান পাবেন না, তাঁদের বেতারে ধারাবিবরণী শুনে দুধের স্বাদ জলে মেটাতে হবে না, অন্তত ঘোলের ব্যবস্থা আছে। টেলিভিশন। শুধু শহর টোকিওয় নয়, দূর গ্রামেও, চাষীর কুটিরে, খামারবাড়ির ছাদে এখন টেলিভিশনের তার। টোকিওই আজ এশিয়ায় বৃহত্তম টেলিভিশন স্টুডিওর অধিকারী। রঙিন টেলিভিশন প্রচারের ক্ষেত্রেও ১৯৬০ সাল থেকে জাপান পৃথিবীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। এ বিষয়ে প্রথম স্থানের মর্যাদা এখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের করায়ত্ত।

মূলত সৌন্দর্য-পিপাসু ছিমছাম শিল্পীর জাত হলেও খেলাধূলায় জাপান আজ একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রণী দেশ। অলিম্পিক উপলক্ষে যাঁরা টোকিওর

আসছেন তারা দু'হাজার বছরের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ জাপানী 'স্থমো' কুস্তি, বিখ্যাত যুযুৎসুর আধুনিক সংস্করণ 'জুডো' এবং জাপানী অসিযুদ্ধ 'কেন্দো'র সেরা খেলাগুলি দেখতে পাবেন। 'জুডো' অবশ্য ইতিমধ্যেই য়ুরোপ-আ মরিকায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। ১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক জুডো-প্রতিযোগিতা সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় এই টোকিও শহরেই। তারপর ১৯৫৮ সালে আঠারটি জাতি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক জুডো অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। জুডোর বিভিন্ন কসরৎ দেখতে হ'লে টোকিওর কোডাকান জুডো ইনস্টিটিউটে আসতে হবে। এখানে দলে দলে তরুণ জাপানীরা যুযুৎসুর কৌশল শিখতে আসেন। আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে নিরস্ত্র নাগরিকের ক্ষেত্রে জুডো একটি মূল্যবান রক্ষাকবচ।

বাংলা রহস্য-রোমাঞ্চের বই-এ যুযুৎসুর কথা অনেক পড়া যায়, কিন্তু বাংলা দেশে জুডোর চর্চা হয় না কেন? দেহগঠনের চেষ্টাই বা কৈ?

জাপানী জাতটার কিন্তু এই একটা মস্ত গুণ। সব দিক সমানভাবে ওজন করে চলতে শিখেছে আর তাই বিচিত্র প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও জাপান আশ্চর্য্য দ্রুত-গতিতে উন্নতির শীর্ষদেশে নিজেকে স্থাপনা করতে পরাঙ্মুখ হয় নি। জাপান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বয়ং এইচ জি ওয়েলস বলেছেন, With astonishing energy and inteligence they set themselves to bring their culture and organization to the level of the European powers. Never in all the history of mankind did a nation make such a stride as Japan...did. এবং বস্তুতপক্ষে ধীশক্তি ও অপর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা নিয়েই জাপানী শিশু জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে জাপানের মতো সুশৃংখল দ্রুততায় কোনও জাতি বার বার জাতীয় জীবনে এক একটি আশ্চর্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করে তুলতে পারে নি। সংকট এসেছে, প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট। কিন্তু হার স্বীকার করে নি 'উদয়-ভানুর দেশ'। জাপান সত্যিই Land of the Rising Sun.

● 'হিনামাৎসুরি' বা পুতুল উৎসবের দিনে বিচিত্র 'কিমোনো' পরিহিতা জাপান-সুন্দরী।

১৯২৩ সালের ভীষণ ভূমিকম্পে টোকিও শহর ভেঙে চুরমার হয়ে গেছল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ইয়াকোহামা বন্দর। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে সামলে উঠতে টোকিওকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে তিনটি মাত্র বৃহৎ পর্বতসঙ্কুল দ্বীপের অধিকারী জাপান বুক ঠুকে নেমে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু অকল্পনীয় ক্ষতিই নয়, স্বাধীনতা পর্যন্ত হারাতে হয়েছে। কিন্তু অতি অল্প সময়ে আবার পৃথিবীর অন্যতম প্রাগ্রসর সেরা জাতির মধ্যে আপন জ্যোতিতে জাপানী জ্যোতিষ্ক জলজল করে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে উপর্যুপরি এয়ার রেডে টোকিও সমেত জাপানে বড় বড় শহরগুলি পুড়ে ছাই হয়েছে। কিন্তু কুড়িটা বছরের ব্যবধানে টোকিও আবার নিজের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে এতটুকু বেসামাল হয়ে পড়ে নি। কুড়ি বছরই বা কেন। ১৯৪৫-এ ধ্বংস, পটসড্যাম চুক্তি অনুযায়ী নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ ও পরবর্তী পরাধীনতা। ১৯৫২ সালে সানফ্রান্সিসকো শান্তিচুক্তির ফলে হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। সুতরাং নতুন করে টোকিও গড়তে স্বাধীন জাপান সময় পেয়েছে মাত্র বারটি বছর। কিন্তু কী অবিশ্বাস্য অগ্রগতি। পাঁচসালা দশসালার গড়িমসি নয়। বুকে ভরসা এবং একটি সুশৃংখল জাতি হলে বিপদ-বাধা আপনি দূর হয়ে যায়। ইতিহাসে চোখ রেখে এই জন্যই এইচ জি ওয়েলস বিস্ময়ে প্রশংসামুখর হয়েছিলেন; য়ুরোপ, আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গিয়ে শাসনতান্ত্রিক আধিপত্য বিস্তার করেছে, টিকতে পারে নি শুধু জাপানে। যেদিন জাপান বুঝতে পেরেছিল, পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ শিল্প-বাণিজ্যে বহু দূর অগ্রসর হয়ে গেছে, সেইদিনই রাতারাতি সাজ সাজ রব

তুলে নিজেকে সুগঠিত করে নিয়েছে, নিজের ঐতিহ্যকে বিসর্জন না দিয়েও প্রতীচ্যের সু-টুকু অনায়াসে গ্রহণ করেছে। সময় মানে নি, ঐতিহাসিক অবস্থাকে তোয়াক্কা করে নি। চোখে-ঠুলি-পরা সামন্ততন্ত্রের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পৃথিবীর প্রাগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে কদমে কদম ফেলার সংকল্পকে সাধিত করেছে।

এইচ জি ওয়েল্‌স বলছেন,—In 1886 she was a mediaeval people, a fantastic caricature of the extremist romantic feudalism; in 1899 hers was a completely westernized people, on a level with the most advanced European powers. She completely dispelled the persuasion that Asia was in some irrevocable way hopelessly behind Europe.

সুতরাং মধ্যযুগের নিগড়বন্ধন ছিন্ন করতে জাপানের সময় লেগেছিল মাত্র তেত্রিশটি বছর। আর এই অগ্রগতির পিছনে এক ই প্রেরণা ছিল প্রতীচ্যের দেমাক ভাঙার অটুট প্রতিজ্ঞা।

১৯২৩-এ টোকিওর ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর থেকেই প্রত্যক্ষভাবে সাজসজ্জায় এবং জীবনে পাশ্চাত্য-প্রভাব লক্ষণীয় আকার নেয়। স্কুল-কলেজের মেয়েরাও কিমোনো ছেড়ে স্কার্ট পরে। জীবনকে দ্রুতগামী করার জন্য সবরকম ব্যবস্থা সুরু হয়ে যায় সমগ্র জাপান জুড়ে। এ সমস্তরই গোড়াপত্তন টোকিওয়।

টোকিও শহরের পুরোনো নাম ছিল 'এদো'। সম্রাট মেইজি (১৮৬৮-১৯১২) সামন্ততান্ত্রিক স্মৃতিবিজড়িত 'এদো' শহরকে আধুনিক পরিকল্পনায় গড়ে তুলেছিলেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে। (অবশ্য 'স্বপ্ন' শব্দটা জাপানে নিতান্ত সৌখীন। বলা উচিত সংকল্প।) প্রাচীন কিয়োতো থেকে মেইজি 'এদোয়' রাজধানী স্থানান্তরিত করে নতুন নাম রাখলেন টোকিও অর্থাৎ পূর্ব রাজধানী। সম্রাট মেইজি ছিলেন জাতির জীবনে আধুনিক যুগের স্রষ্টা। আর রাজধানী টোকিও মডার্ন জাপানের শারীররূপ। কেবল-মাত্র রাষ্ট্রনীতিতেই নয়, শিল্প-সামজ-নীতির ক্ষেত্রেও মেইজি-শাসন জাপ-ইতিহাসে পুনরুত্থানের যুগ। টোকিও সেই উত্থানেরই প্রতীক;

আপনার জন্যেই বিউলাক্স

আপনার সৌন্দর্য্য-সাধনার চাহিদা মেটাতেই প্রসাধনী-বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কার 'বিউলাক্স'। ল্যানোলিন ও ক্যালামিনযুক্ত 'বিউলাক্স' বিউটি ক্রীম আপনার দেহত্বকের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির যে কোন প্রয়োজনে ব্যবহার করলে এর অনন্যতায় আপনি মুগ্ধ হবেন। মৃদু সুগন্ধযুক্ত এই ক্রীমটির নিয়মিত ব্যবহারে মুখমণ্ডল ও দেহত্বকের অবাঞ্ছিত দাগ মিলিয়ে যাবে এবং আপনার দেহলাবণ্যে যুক্ত হবে কোমল স্নিগ্ধতা ও শুভ্র মসৃণতা। বিউলাক্সের কোন বিকল্প নেই।

বিউলাক্স

(PB-A-9/64 (Beng))

স্নো যদি ব্যবহার করেন তবে 'বিউলাক্স' স্নো-ই ব্যবহার করুন— এটি শ্রেষ্ঠতম উপাদানে তৈরী। এর মৃদু সুগন্ধ তুলনাহীন।

ANKAR

অংকর ইণ্ডাষ্ট্রীজ
মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা, ফোন : বারাসাত-৬৭
কলিকাতা কেন্দ্র : ৭-বি, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেং
কলিকাতা-১২, ফোন : ২৪-৬০২৬

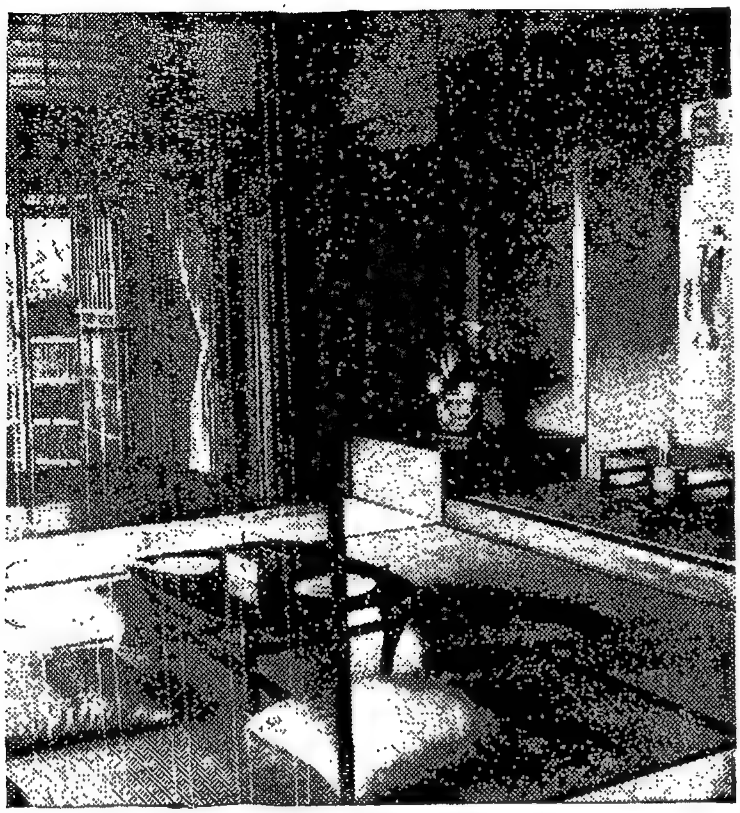

● জাপানী ঘরের প্রতিনিধি

Meiji Restoration-এর সর্বোত্তম ফসল।

সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারাচ্ছন্নতা থেকে জাপানকে বেরিয়ে আসতে হতই। জাপানের ওপর মঙ্গলময়ের অশেষ আশীর্বাদ, সে তার প্রয়োজনকে যথার্থ মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, জাপান শিল্পবিপ্লবের দিকে নজর দিয়েছিল।

জাপানের প্রতি প্রকৃতির কৃপণতা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কাঁচামাল বলতে জাপান প্রায় কিছুই পায় নি, কেন না জাপানে কর্ষণযোগ্য জমির অভাব। গোটা দেশটাই পার্বত্য অঞ্চল।

তাই শিল্পোন্নতিই জাপানের পক্ষে একমাত্র বাঁচবার পথ। প্রকৃতি জাপানকে দিয়েছে পাহাড় এবং জল। জলে মাছ, পাহাড়ী প্রস্রবণে বিদ্যুৎ। জাপান এই দুটিকেই তার উন্নতির পথে পাথেয় করেছে। পাহাড় কেটে যেটুকু চাষাবাদ সম্ভব, তা অবশ্য ঠিকই আদায় করে নিচ্ছে কর্মঠ জাপানী কৃষক। কিন্তু তাতে দেশেরই প্রয়োজন মেটে না। সুতরাং সমস্ত অভাব পূরণের দায়িত্ব বিদ্যুতের। জাপান যেন পৃথিবীর একটি বৃহৎ কারখানা। সারা দুনিয়ার কাঁচামাল সংগ্রহ করে জাপানী কলকারখানায় তার রূপান্তরসাধনই আজ জাপানের জীবিকা। এজন্য জাপানীরা শহরমুখী। শহরে জনসংখ্যার চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই সব কারণে বেহিসেবী স্থানাভাবের দরুণ টোকিওয় আজ অধিকাংশ পরিবারকে একটিমাত্র ঘর নিয়েই তুষ্ট হতে হয়। তবে হ্যাঁ, রুচিসম্মত উপায়ে ঐ একটা ঘরেই নিপুণ হাতে সংসার পাততে জানেন তাঁরা। বিভিন্ন উপায়ে একটা ঘরের মধ্যে কেমন ক'রে চূড়ান্ত প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে হয়, টোকিওয় না-এলে তা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। এখানে জানলার কপাটও দেওয়ালের কাজ করে। কাঠের কপাটের নীচে থাকে একপ্রস্থ কাচ বা কাগজের আবরণ—জাপানী ভাষায় যাকে বলে, 'শোজি'। দরকারমতো শোজি ঢাকা দিয়ে বা খুলে দেওয়াল বা জানলার প্রয়োজন মেটানো হয়। জানলা বাবদ জায়গা খরচের বালাই নেই তাই টোকিওয়।

এ দের যে-কোনো একটা ঘরে প্রবেশ করলেই আপনি সূক্ষ্ম শিল্পরুচির পরিচয় পাবেন। মেঝে থেকে ঘরের দেওয়াল অনাড়ম্বর শিল্পী-হাতের রচনা। দু-একটি নক্সা-তোলা মাদুর দিয়ে ঘরের মেঝে পরিপাটি করে মোড়া থাকে।

দেওয়ালে রঙিন কাগজের আবরণী। এই বিচিত্রিত মাদুর বা 'তাতামি' ছাড়া আর যে জিনিসটি অতিথির মনোরঞ্জন করবে, জাপানী গৃহে সেই বিখ্যাত 'তোকোনামা' না থাকলে গৃহসজ্জা অসম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রতি গৃহেই ছোট্ট একটি সজ্জা-পারিপাট্যের স্থান আলাদা করে রাখা হয়। ঘরে ঢুকে এই বিশেষ তোকোনামাটি লক্ষ্য করে অনায়াসে বলা যাবে—তখন বসন্ত না শরৎ, শীত না গ্রীষ্ম। তোকোনামায় যদি চেরীফুলের গুচ্ছ এবং ঘা চেরীর সৌরভ পান, তবে চে বুজেই বলে দেবেন—জাপান সে সময় মিঠে সূর্যের আলোয় স্নান করছে, গৃহদ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ঋতুরাণী বসন্ত। উৎসবের দিন তোকোনামায় এই সঙ্গে জাপানী পুতুল ও অন্যান্য কিউরিও রাখা হয়। জাপানীরা বড় ঘরে অস্থায়ী কাঠের পার্টিশন রাখেন সুবিধামতো স্থান সংকুলানের জন্য। আর যাঁরা একটি ঘরের মালিক তাঁরা রাত্রের বিছানা গুছিয়ে রেখে সকাল-সন্ধ্যা ঘরটি উপবেশনের উপযুক্ত করে রাখেন। স্থানাভাব হবে বলে চেয়ার-টেবলের বদলে সুন্দর নক্সা-তোলা

ভূষণের ব্যবহারই অধিকতর প্রচলিত।

তবে এখন টোকিওয় বহুতলা ফ্ল্যাটবাড়ির প্রচলন হয়েছে, কিন্তু আসল জাপানী গৃহ বলতে বোঝায় একতলা কাঠের বাড়ি। অবশ্য সে-রাম সে-রাজত্ব নেই। জাপানী মেয়েদের অমন অবাক-করা রঙ-বেরঙের রাজকীয় পোষাক আজ মার্কিনী স্কার্টের মধ্যে নিজের শিল্প-রুচির ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন জাপানী মেয়েদের সর্বাঙ্গে শিল্পকাজ ছিল। বিশেষ করে কিমোনো জাপানের একেবারে নিজস্ব জিনিস। মেয়েদের কাঁধ থেকে কোমর অবধি পিঠের ওপর বিচিত্র ঝালর। কিন্তু আজকের বিনিময় ও দ্রুতগতির দেশ জাপান নিজেকে অনেক সংক্ষিপ্ত করে এনেছে। টোকিওর রাজপথে পা দিলেই আপনি আজ আর মাথার ওপর বাহারি ছাতার ফুল ঘোরাতে ঘোরাতে, হাতে পাতলা সুচিত্রিত পাখা নিয়ে, পেছনে কিমোনোর পেখম উড়িয়ে জাপানী মেয়েদের সুনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে হেঁটে যেতে দেখবেন না। দেখলে টোকিওকে তাদের দেশ মনে হতে পারত; ডিসিপ্লিন এবং শিষ্টতার প্রতীক জাপানী সাহেব-বিবি-গোলাম। জাপানী শিষ্টতার জন্য জাপানকে 'ভদ্র মানুষের দেশ' or The Land of Gentlemen বলা হয়।

টোকিওয় স্থানাভাবের আর একটি কারণ, বিদেশী পর্যটকের অসম্ভব ভিড়। সৌভাগ্যত টোকিওয় তুষারপাত কদাচিৎ হওয়ায় স্কী-খেলোয়াড়দের উপরি চাপের হাত থেকে রাজধানী রক্ষা পেয়েছে। তত্রাচ পর্যটকরা শহরের হোটেল বাড়িগুলি অধিকাংশ সময়ই অধিকার করে থাকেন। সংখ্যার দিক থেকে, বলা বাহুল্য, মার্কিন মুলুকের পর্যটকই বেশি। ফলত বিদেশী পর্যটকদের মারফৎ জাপান যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৬০ সালে এই বাবদ জাপানের আয় হয় ১১৬ মিলিয়ন ডলার।

আজকের জাপানী নৃত্যে ও সাজে পাশ্চাত্য প্রভাব

পর্যটকদের মনভোলানোর জন্য কাজে কাজেই টোকিও নগরী প্রতিমুহূর্তে নিজেকে মনোহারিণী করে তুলছে। গীতবাদ্য, সিনেমা, থিয়েটার, নাইট ক্লাব আর নিয়োন বাতিতে টোকিওর প্রতি রজনীই উৎসব-রজনী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জাপানের ওপর দিয়ে একটা সাংঘাতিক বিপর্যয়ের ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধ জাপানকে অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দিয়েছিল বিভীষিকার অভিজ্ঞতা, এ্যাটম বোমার শাস্তি, পরাধীনতার শৃংখল। সাত-সাতটি বছর ধরে টোকিওর ওপর মার্কিন সেনাপতি ডগলাস ম্যাকার্থার কার্যত মার্কিনী শাসন চালিয়ে যান। ফলে টোকিও জাপানী ঐতিহ্যের সঙ্গে মার্কিনী কালচারকে বহুল পরিমাণে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শহরের আকাশে বাতাসে আজ সেই অতিরিক্ত মার্কিনী প্রাণচাঞ্চল্য ও উত্তেজনার চিহ্ন উপলব্ধি করা যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীত, পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রা, সিম্ফনি এবং পাশ্চাত্য পোষাক ও আদবকায়দা জাপানের ঐতিহ্যপূর্ণ শিল্পরস-পিপাসুর গরিমাকে অনেকটা ম্লান করেছে বলতেই হয়।

তবু বার বার টোকিওর দিকে তাকিয়ে অবাক হই। জাপানের হৃৎপিণ্ড টোকিওকে দেখে বিস্ময় মানি। এই তো সেদিন যুদ্ধক্লান্ত জাপান বিপর্যয় মাথায় নিয়ে পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র বারটি বছরে আবার সে সমৃদ্ধির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে গেল। জাতির মনে কী দুর্দমনীয় শক্তি ও কর্মক্ষমতা থাকলে এই বিস্ময়কর ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয়।

শ্লেষ নয়, স্তুতি করেই এই দ্বীপমালার দেশের প্রসঙ্গে নতুনভাবে বলতে ইচ্ছে করে:

'কি সুন্দর মালা
আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ!'

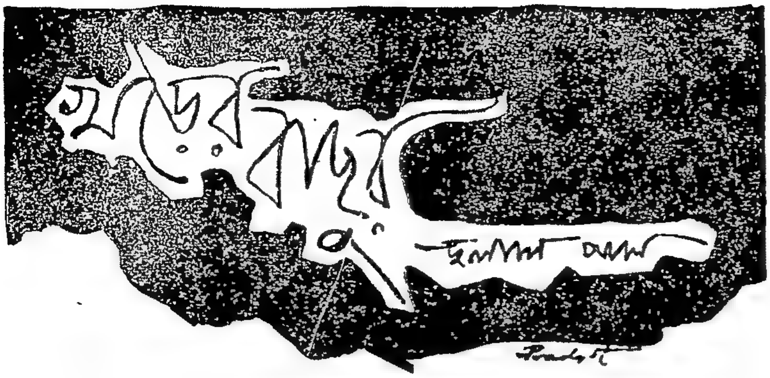

সে-ঘটনা বছর পাঁচেক পরে আবার মনে পড়ল উপলের।

বর্তমানের আয়নায় অতীত রেডিয়ামের মত জলজ্বল করে উঠল: উপলের দাদা মরল।

লোকে বলল: আত্মহত্যা। মানে নিজেকে নিজে মেরেছে।

উপল সে-সময়ে ক্লাস নাইনে পড়ে।

কবিতা লেখে। চান করতে করতে গান গায়। উপন্যাস পড়তে পড়তে নায়কের সঙ্গে নিজেকে গুলিয়ে ফেলে, মাঝে মাঝে ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার স্বপ্ন দেখে; আর ভাবে অফ-টাইমে সাহিত্য করবে।

অতএব উপল অবাক হয়ে গিয়েছিল—মানুষ তাহলে ইচ্ছা করে মরতে পারে! ও শুনেছে—অনেক লোক আত্মহত্যা করে; আর মহাভারতে পড়েছে, ভীষ্ম ইচ্ছে করে মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু তার নিজের একান্ত পরিচিত জগতে আর একজন ভীষ্মকে নিজের চোখের সামনে মরতে দেখল।

দেখল এবং অবাক হল।

সে বয়েসটা স্বপ্ন দেখার, পৃথিবীকে অবাক চোখে দেখবার, ভবিষ্যতের মায়াজালে আচ্ছন্ন হবার। সেখানে—তার দাদার মৃত্যু একটা বিরাট ছন্দপতন।

সে অনেক ভেবেছিল; তবে সে-ভাবনা দাদার মৃত্যুর শোকে নয়, মৃত্যুর কারণের জন্য।

তার দাদার কিসের দুঃখ ছিল। কিসের অভাব।

ভাই ছিল, বোন ছিল, ছিল মা-বাবা—সব।

ওর খেয়াল হল: দাদা যেন ওর কিসের অপেক্ষায় দিন কাটাত। প্রায়ই সে কাগজ টাইপ করে আনত। দিনের ভেতর পাঁচ-ছবার চিঠির বাক্স খুলে দেখত। আর খবরের কাগজের সবচেয়ে বিরক্তিকর পাতাটা গিলে খেত। চোখ দিয়ে।

প্রায় সারাদিনই মুখ গোমড়া করে বসে থাকত।

ওর দাদা বি-এ পাশ করেছিল। প্রথম প্রথম অনেক বন্ধু-বান্ধব আসত। ধীরে ধীরে তাদের সংখ্যা কমল—কমল তাদের আসা-যাওয়া।

ওর দাদা আর তার দু-একজন বন্ধু যে-সব কথাবার্তা বলত, তার মধ্যে থেকে একটা কথা ওর মনের ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল: ব্যাকিং।

উপলের মনেই পড়ল না যে, ওর দাদা কোনদিন প্রাণ খুলে হেসেছে।

(অথচ মা-বাবা বলত: উৎপল ছোট-বেলায় ভীষণ হাসিখুশি ছিল। পাড়ার লোক বলত: অত হাসিও না বৌদি—পেটে খিল ধরে যাবে। এত ছটফটে ছিল যে, কেউ হাত-পা মেলে একদণ্ড বসতে পারত না। উপলের কাছে এগুলো আরব্য রজনীর গল্পের মত।)

সেই দাদা তার মরল।

রোগে নয়, দুর্ঘটনায় নয়—নিজে নিজেই মরল।

বাড়ির লোকে কান্নাকাটি করল। বাইরের লোকে বলাবলি করল: ছেলেটার মনের জোর বড় কম।

উপল দেখেছিল, তার দাদার মৃত চেহারার সঙ্গে জীবন্ত চেহারার বিশেষ তফাৎ ছিল না।

ওর মনে হয়েছিল: দাদা নিজেকে মারল কেন?

দিনকতক আগে কেটে-ফেলা গাছটার ডালপালা মাঠে পড়েছিল। তাদের সবুজ রং ধীরে ধীরে বিবর্ণ, অনুজ্জ্বল হয়ে গেছে। উপল সেদিকে তাকিয়ে ছিল কিন্তু সেগুলো তার চোখে পড়ছিল না। তাকাতে তাকাতে চোখ দুটো তার ক্লান্ত হয়ে পড়ল। চোখ রগড়ে ও ঘরের ভেতরে তাকাল।

এবার দাদার ছবিটা চোখে পড়ল। দেয়ালে টাঙানো।

হলুদ হয়ে গেছে। সময়ের হাতের স্পর্শ দিনে দিনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হচ্ছে। তবু চেনা যায় ওর দাদাকে, তার হাসিকে। সতেজ প্রাণের সরলতাকে।

সেবার উৎপল প্রথম হয়েছিল পরীক্ষায়। (উপলের বাবা গল্প করেন।) হাতে প্রাইজের বই নিয়ে ছবি উঠল উৎপলের। একমাথা ঘন কালো চুল। স্বপ্নভরা ভাসা ভাসা চোখ। মুখের কোণে সাফল্যের হাসি। মৃদু মৃদু।

মায়ের কথা মনে পড়ল উপলের।

ওর মা ছবিটার দিকে তাকায়। নীরব অলস দুপুরে। রাত্রের নির্জন ভারী মুহূর্তগুলোয়। মা যখন আগে কাঁদত, উপলের কান্না পেত—দাদা আর আসবে না।

মা এখনো কাঁদে। উপলের এখন কিন্তু কান্না আসে না—আসে ভয়।

ও জীবনকে ভালবাসে।

বিষেণরামের গলা শুনে ও আবার মাঠের দিকে তাকাল। আর ভাবল: চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি। চলার নামই জীবন। কিন্তু ও একটা পাথরের মতই চুপচাপ। ওর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—ও জেগে না ঘুমিয়ে। হাত-পা নেড়ে নিজের সন্দেহ দূর করে। ওর কাছে সময় নিস্তরঙ্গ, পৃথিবী গতিহীন, জীবন স্পন্দনহীন।

উপলের বাবা চিন্তাহরণবাবু। চাকরী থেকে বিদায় নেবার দিন ঘনিয়ে এসেছে তাঁর। জীবনে উন্নতির মাপকাঠি—সরকারী অফিসের আপার ডিভিসন ক্লার্ক। পাঁচটি সন্তানের জনক হয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে তিনের। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তবে বড় ছেলে উৎপল তাঁর কাছ থেকে কেবল নিয়েই

প্রায় সারাদিনই মুখ গোমড়া করে বসে থাকত

গেছে। ছোট মেয়েটা সেদিক দিয়ে ভাল—তিনমাস বয়েসেই পৃথিবী ছেড়ে গেছে। চিন্তাহরণবাবুর এখন চিন্তা—উপল। আইবুড়ো মেয়ের চেয়েও। উপলও সেকথা বুঝতে পারে। তার বয়েস এখন ২৪। আর এক বছরের ভেতরে সরকারী অফিসের চাকরী না পেলে সরকারী অফিসের দরজা ওর কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে আরো অনেক অফিসের দরজা।

তাই খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে পড়ে। আগে কাগজ পড়ত একটা—এখন যত পারে তত। উন্মাদের মত আবেদন করে। এর ফলে দু-এক জায়গায় ইণ্টারভিউ পেয়েছে। ইণ্টারভিউতে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল (ওর কাছে সেটা ব্যঙ্গ বলে ধারণা হয়েছিল।): Experience আছে? কুইনাইনের মত তেতো প্রশ্ন। তাই তেতো মুখে তপ্ত জবাব দিয়েছিল: আপনারা চাকরী না দিলে Experience পাব কোথায়?

বলা বাহুল্য, সে চাকরী উপলের হয় নি।

তবু ও আবেদন করে। হয়ত কেউ ভুল করেও ওকে চাকরী দিয়ে দেবে। কখন কি হয়—বলা যায় কি? অনেকে ওর আবেদন করা দেখে বলে: চাকরী-চাকরী করে পাগল হয়ে যাবে দেখছি, উপল।

: তবে কি করব?

: যদি কিছু মনে না কর তো বলি।

: বলুন। ওর এখন শুধু শোনার পালা।

: ব্যবসা কর, ব্যবসা। দেখছ না. অন্য অন্য প্রদেশের লোকে কেমন তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে।

: কিন্তু ক্যাপিটাল?

ভদ্রলোক হেসে অত্যন্ত সহজভাবে বললেন: মনের জোর।

উপল এর কোন জবাব দিতে পারে নি। জবাব খুঁজে পায় নি। ও এখনো খবরের কাগজ দেখে আর আবেদনপত্র হাতে লিখে সরাসরি অফিসের লেটার বাক্সে ফেলে আসে। (আগে টাইপ করত, ডাকে পাঠাত।) আর বাবার পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় পাওয়া দু-কামরায় বাকী সময়টার গলা টিপে মারে।

ওদের বাড়ির তিনদিকে বস্তি। আর একদিকে একটা ছোট মাঠ। তারপরে একটা ডোবা। জল তার সবুজ। উপলদের জানলা দিয়ে সব কিছু দেখা যায়। দু'ফুট বাই তিনফুট জানলার ধারে বসে ও ওই মাঠ আর ডোবার জগৎ দেখে। সে-জগতের কুশীলব হল চারজন। গোয়ালা, তাদের চারটে মহিষ, দুটো গাই। সব সময় জল-কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। (ওর আগে দেখে গা ঘিন ঘিন করত। এখন ওইসব দেখে সময় কেটে যায়—ওই নোংরামির আড়ালে যৌবনের সোনালী ফসল হারিয়ে যায়।) পাড়ার লোকে কিছু বলে না। চোখের সামনে গোয়ালা দুয়ে দেয়—তারা খাঁটি দুধ নিয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে যায়।

মাঠটা যেন ছায়াছবির পর্দা।

উপল বসে বসে এই এক অপূর্ব জগৎ দেখে।

নোংরা মাঠটা। পচা গোবরের গন্ধ। গোয়ালা। গরু। আর সেই বাছুরটা---

আগে জিনিসটা উপলের চোখে পড়ে নি।

ওদের জানলা আড়াল করে একটা বড় গাছ দাঁড়িয়ে ছিল। গাছটার নাম জানে না; তবে তার ফলটাকে বলে বিষফল। রাশি রাশি ফল হত। কাকে খেত না, রাস্তার কুকুরে শুঁকত না; কোন পিঁপড়েও একবার পরখ করত না; শুধু পাড়ার বাচ্চা ছেলেরা ওইগুলো নিয়ে খেলত বা মারামারির সময়—ঢিল হিসেবে ব্যবহার করত। বাকীগুলো ওখানে পচে মাটির সাথে মিশে যেত। তবে গাছটাতে অনেক বাসা বেঁধেছিল। সেটা বোঝা যেত না—যেদিন ওটাকে কেটে ফেলা হল, সেদিন উপল অবাক হয়ে দেখল—পাতার আড়ালে অনেক বাসা। পাখীর। আর দেখল মাঠটাকে। সম্পূর্ণভাবে। যেন বাড়ির বউ ঘোমটা ফেলে তার সামনে হাজির হল।

'এ জানকীরাম, জানকীরাম —নিঁদ ভাঙল বা।'

মাঠের দিক থেকে ভেসে আসে কথার এই খণ্ডগুলো। আগে উপল কোনদিন এসব শুনতে পায় নি। এখন পায়। উপল বুঝতে পারে—রাত চারটে। গোয়ালাদের দিন সুরু হয়েছে।

তারপর বিছানা থেকে উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দেখে গোয়ালাদের কুঁড়েটা, ছন্নছাড়ার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। ভিখিরিদের অনাদৃত রুক্ষ মেয়ের মত। কঁড়ে বলে পরিচয়

দিলেও যেন কুঁড়েঘর লজ্জা পায়। কোনরকমে চার পায়ে দাঁড়িয়ে। টিনের ভার সইতে পারছে না যেন। তিন পাশ শতচ্ছিদ্র টিন দিয়ে ঘেরা। (উপল মাঝে মাঝে ভাবে—অমন টিনগুলো পেল কোত্থেকে?) রোদ বিষ্টি হিম ওর বুকের ওপরেই পড়ে। চারজন গোয়ালা ওর ভেতর কেমন করে শুয়ে থাকে? চারখানা দড়ির খাট কোথায় ষোলখানা পা রাখে? (অবশ্য শীতকালে আর বর্ষার সময়।)

জানকীরাম উঠে গরু-মহিষের দেখাশোনা সুরু করে। লাল গাইটার একটা চমৎকার বাছুর। সেটা যদি একবিন্দু ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে নতুন এসেছে। নতুন বাসস্থানের পুরনো দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয় নি।

আনন্দ-ভুবন থেকে যে অমৃতসঞ্চয় সাথে করে এনেছে, তাই খরচ করে কেবল আনন্দ করে। লাল গাইয়ের দুধ খেয়ে কিছুদিনের ভেতর বাছুরটা বেশ নধর হল। বিষেণরাম—উপলদের গোয়ালা—তার কিন্তু মন খারাপ।

উপল বলে: গোয়ালা, তোমার বাছুরটা কিন্তু বেশ হয়েছে।

জবাবে বিষেণরাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাছুরটার দিকে তাকায়। খরিদ্দাররা সবে-বাচ্চা-হওয়া গাইয়ের দুধ নিতে চায় না। বড় পাতলা—জল জল।

কিছুদিন বাদে বাছুরটার গলায় দড়ি ঝুলল। লাল গাইকে দেখামাত্র লাফালাফি করে। জানকীরাম খানিকক্ষণ বাদে বাছুরটাকে ছেড়ে দেয়। ওদিকে বিষেণরাম বালতি-হাতে প্রস্তুত। বাছুরটা দৌড়ে গিয়ে দুধ খেতে আরম্ভ করে। উঃ! সেকি আনন্দ! অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর শিশুরা মায়ের দুধ পেলে যেমন করে—বাছুরটার অবস্থাও ঠিক তেমন।

এরপর বিষেণরাম ডাকে: জানকীরাম!

জানকীরাম বাছুরের গলার দড়ি ধরে টান দেয়। বাছুরটা প্রথমে খেয়াল করে না। তারপর বুঝতে পেরে আপত্তি প্রকাশ করে। কিন্তু জানকীরাম ছাড়বে কেন?

বিষেণরাম দুধ দুইতে আরম্ভ করে। বালতিতে প্রথম ছরর ছরর শব্দ হয়। তারপর সেই ধাতব শব্দটা মিলিয়ে গিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ বেরোয়। আর দশহাত দূরে দাঁড়িয়ে বাছুরটা—। লোভাতুর কিন্তু অসহায়।'

মাঝে মাঝে বাছুরটা ক্ষেপে যায়, লাফালাফি করে, লাল গাই চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু জানকীরাম তো এ লাইনে অনেকদিন। সে লাল গাইয়ের গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দেয়। মাথা চুলকায়। সময় সময় নিজের মাথাটা লাল গাইয়ের মুখের কাছে নিয়ে যায়। লাল গাই সেটা মুখ দিয়ে চাটে।

উপল বেদনা অনুভব করে।

বিষেণরামকে উপল বলে: বাছুরটাকে আর একটু দুধ খেতে দাও না কেন?

বিষেণরাম উপলের বোকামিতে হেসে বলত: ও শুধু দুধ খাবে তো, আপনারা কি খাবেন?

: ও আর কতটুকু খাবে?

উপলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিষেণরাম বলে: ওই জন্যই তো বেশি খেতে দিই না। বেশি খেলে বোখার হবে।

বিষেণরামের কথা খুব যুক্তিহীন নয়।

কিন্তু দিনে দিনে বাছুরটা রোগা হতে লাগল। আর আগের মত লাফায় না। দুধ খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। শুধু বোবা চোখে লাল গাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন। ভোরবেলা। বিষেণরামের চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল উপলের। জানকীরামকে ভীষণ বকছে। আর জানকীরাম একটা দড়ি ছড়ির মত করে সেই বাছুরটাকে বেদম মারছে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে। সেদিন বিষেণরাম দুধ দিতে এল না—এল জানকীরাম।

উপল জিজ্ঞাসা করে: কি ব্যাপার জানকীরাম?

জানকীরাম উত্তেজনায় প্রথমে তো জবাব দিতে পারে না; তারপর নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে বলে: আর কি বলবে বাবুজী। আজ উ উল্লু সব দুধ পিয়ে নিয়েছে।

: কি করে?

তার উত্তরে জানকীরাম যা বলল তা এই: আগের দিন রাত্রে দড়ি দিয়ে ভালভাবেই বাছুরটাকে বেঁধে রেখেছিল। তবে দড়িটা হয়ত একটু পুরনো ছিল। শেষ রাতে—জানকীরাম ওঠার আগে বাছুরটা দড়ি কেটে লাল গাইয়ের দুধ নিঃশেষ করে খেয়ে ফেলেছে। তবে ফল তো উপল নিজের চোখে দেখেছে।

জানলা দিয়ে উপল দেখল, বাছুরটা ম্রিয়মাণ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখের ভাষা তার হারিয়ে গেছে। লাল গাইটা একবার ওর দিকে তাকাল, বাছুরটা সেদিকে খেয়ালও করল না।

পরদিন থেকে বাছুরটা অসুখে পড়ল। হয়ত চুরি করে বেশি দুধ খাওয়ার জন্য।

দিনে দিনে ওর শরীর খারাপ হতে লাগল। এখন ওকে ছেড়ে দিলেও দুধ খেতে চায় না। খেলেও, যেন চরম অনিচ্ছার সঙ্গে আস্তে আস্তে খায়। একটুখানি খেয়ে আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। জানকীরাম লেজ মুড়ে দেয়—তবু সে নিস্পৃহ।

হয়ত বাছুরটা অভিমান করেছে।

উপল দেখত বাছুরটা সয়ে যাচ্ছে।

এর কয়েকদিন বাদে উপল ভোরে উঠে দেখে বিষেণরাম সেই চিরপরিচিতভাবে লাল গাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে। হাতে বালতি।

জানকীরাম টিনের চালার ভেতর থেকে বেরোল। উপল একটু অবাক হল। জানকীরামের হাতে দড়ি নেই কেন? ওর হাতে একটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। তার চারখানা পা আছে। দেহ আছে। নেই—কান, মুখ, চোখ, লেজ।

আর নেই প্রাণ।

সেটা লাল গাইয়ের কাছে নিয়ে গেল। লাল গাই তাকে আদর করতে লাগল।

বিষেণরামের বালতিতে দুধ পড়ার শব্দ হল। উপলের পিছনে খস খস আওয়াজ হল। ও পিছন ফিরে তাকাল। ওর মা দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো তার দেয়ালে টাঙানো মৃত ছেলের ছবির দিকে। উৎপলের নকল চেহারার দিকে—অবশিষ্ট স্মৃতির দিকে।

উপল বুঝতে পারে—উৎপলের ইচ্ছামৃত্যুর ইচ্ছাটাকে।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ দ্বাদশ প্রবাহ ॥

'উত্তরে মেঘপাহাড়ের দেশ দার্জিলিং; আর জলপাইগুড়িতেও বাঙালীর বাণিজ্যবিস্তারের ইতিবৃত্ত খুব রোমাঞ্চকর।'

এবার এই বাংলা দেশের জেলায় জেলায় সেই সুদূর অতীতে কিভাবে বাণিজ্য চলতো, কত রকমের বাণিজ্যসম্ভার ছিল—সেই বিস্মৃতপ্রায়, বিগতগৌরবের ইতিবৃত্ত বলতে চেষ্টা করবো।

এই বাংলা দেশের মানচিত্রের একবারে সুদূর উত্তরে মেঘপাহাড়-বরফের দেশ দার্জিলিং। সেখানে শীতে বরফ পড়ে। গাছপালা, বাড়িঘর শ্বেতশুভ্র তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জানলা-দরজা দিয়ে কালো মেঘ ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর আঁশের মত বাতাসে ভেসে ভেসে আসে। যেদিকে তাকাও বরফাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গ। তুষারঢাকা পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘ-রৌদ্রের লীলা চলে। 'টুরিস্টরা' দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে যায়।

দার্জিলিং। ভ্রমণকারীদের স্বপ্ন। এখানে আবার কোনকালে বাণিজ্য হয় না কি।

হয়। হতো ব্যবসা-বাণিজ্য। কিসের বাণিজ্য? খুব বেশিদূরে যেতে হবে না, কলকাতার পথঘাটে কি ভারতবর্ষের যে-কোন শহরের বাজারে হাটে নিওন লাইটের অপূর্ব বর্ণরাগে ঝকমক করে একটি লেখা—

'দার্জিলিং টী'। কোথাকার চা? দার্জিলিংয়ের চা। অমনি চায়ের সমাদর বেড়ে গেল। আভিজাত্য বেড়ে গেল আপ্যায়নকারী গৃহীর। 'চা' জন্মাতে হলে যে রকমের ভূমি দরকার, তা প্রচুর আছে দার্জিলিংয়ে। পার্বত্যময় ঢালু জমি। যেখানে বর্ষার জল দাঁড়াতে পারে না। এখানে রুক্ষ-কঠিন ভূমিতে পর্যন্ত চা-গাছ জন্মায়। যতদূর চোখ যায়, দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত সবুজ চা-গাছের বিস্তার। চা-বাগানের মাঝে মাঝে দীর্ঘ সবুজ প্রান্তরের ভেতরে একটি একটি ঝাপড়া গাছের মত বাব্‌লাগাছ দেখা যায়। সকালে বিকালে কুলী মেয়েরা পিঠে টুকরি বেঁধে পাতা তোলে। টী ফ্যাক্টরীতে জমা দেয়। সেখানে হয় ব্লেণ্ডিং। তারপর—

দেশ-দেশান্তরে চলে যায় সুগন্ধি দার্জিলিং টী। শুধু চা নয়। ধানও হয়। খুব সামান্য। চা-ই এখানকার প্রধান পণ্যসম্ভার। আর এই সেইদিনও বাংলা দেশের ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ার জন্য কুইনাইনের আদর ছিল—সেই কুইনাইনের গাছ সিঙ্কোনাও এখানে হয়। সিঙ্কোনাও রপ্তানী হয় এইখান থেকে।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে আছে সবুজ অরণ্যের সমারোহ। এখানেও আছে মানুষের পণ্যসম্ভার। পাওয়া যায় চিরতা, মঞ্জিষ্ঠা আর এ্যাকোনাইট।

পাহাড়ীরা নিয়ে অরণ্যসংহার করে। চিং ... আর এ্যাকোনাইটের গাছ... ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে পাঠা... বড় বড় শহরে। ঘরে আসে দু'পয়... আর—

যদিও ... পাহাড়। তাহলেও কিছু কিছু ...মা, লোহা আর তামা পাওয়া যায়। সেই যৎসামান্য কাঁচামালই দূর দূ... দেশে চলে যায়।

নেপালী মেয়েরা নিপুণ কারিগর। মোটা পশমী মোজা আর কম্ফর্টার প্রস্তুত করে। সেই মোজা আর কম্ফর্টারের আদর আছে আজও বাংলা দেশের যে-কোন জায়গায়। শিলিগুড়িতে শাড়ি চাদর ও আলোয়ান তৈরি হয় তাঁতে। বাজারে বাজারে বিক্রি হয় সেগুলো। মোটা কার্পাসের কাপড় আর কম্বল, কুকরী, বাঁশের ঝুড়ি আর কাঠের পাত্র নির্মাণে এককালে নেপালী রমণীদের খুবই সুখ্যাতি ছিল আজকে যুগের প্রভাবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে হয়তো তারা আর কুটিরশিল্পের দিকে মনোযোগ দিতে পারে না, কিন্তু তাদের রক্তধারায় আছে কারিগরী-বৃত্তি ও বিস্ময়কর নিপুণতা।

এই জেলা থেকে চা, পাট ও চটের থলে রপ্তানী হয় কলকাতায়। আর নেপাল ও সিকিম থেকে যে পশমী বস্ত্রাদি, চামড়া, ভেড়া, ছাগল, গৃহপালিত পশুপক্ষী আমদানী হয় তা এখান থেকে চলে যায় বাংলার সমতলের দিকে।

দার্জিলিং শুধু টুরিস্টদের স্বপ্ন নয়। মেঘপাহাড় বরফের দেশেও বাণিজ্য হয়। হতো।

আরো নীচে আসুন। উত্তর বাংলার বর্ধিষ্ণু জেলা জলপাইগুড়ি। এ জেলার সবচেয়ে বড় ব্যবসা চা-রপ্তানী। ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার বলছে, the most important industry —tea. প্রায় শতাব্দীপূর্বে যে পশ্চিম ডুয়ার্স নিবিড় অরণ্যের ভেতরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, সেই পশ্চিম ডুয়ার্স নির্মমভাবে বাস্তবতম পরিবেশের ভেতরে জেগে উঠেছিল। তরাইয়ের বিস্তীর্ণ জঙ্গল কেটে চা-বাগান করা হলো।

শুধু পশ্চিম ডুয়ার্সে নয়। জলপাইগুড়ির উত্তরে খরস্রোতা তিস্তা থেকে সুরু করে সাঙ্কো নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত সবুজ চা-বাগান। প্রায় একশো বছর আগে প্রথম চা-বাগান করা হয়েছিল চামটায়। সি জে ডাউয়েল একজন চা-ব্যবসা প্রসারের উদ্যোগী বলেছেন—উত্তরের চা-বাগান নিয়েই সন্তুষ্ট হলো না এ জেলার অধিবাসীরা। ডায়না নদী থেকে একেবারে ভূটানের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করা হলো চা-বাগান।

ডাউয়েল খুব কাব্য করে বলেছেন, যেখানে যেখানে অরণ্য ছিল, যেখানে আদিম অন্ধকার ঘন হয়ে জমে থাকতো—that Premeval forest disappeared for the greater expansion of tea-gardens. সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের আগুনে তরাইয়ের অনেকটা গেল, গেল রাজাভাত খাওয়ার গভীর জঙ্গল। তার কারণ এই সব সবুজ বনদেহের মাটি যে চা-গাছের পক্ষে খুব উপযোগী। ডাউয়েল মন্তব্য করেছেন—Remarkable for waterless character।

চা-গাছের জমিতে জলের প্রয়োজন। কিন্তু ধানের জমির মত আবদ্ধ জল খুব ক্ষতিকর। এমন জমি হওয়া দরকার যেখানে জল দাঁড়াতে পারে না। শুধু জমি হলেই হয় না। যেটুকু জল প্রয়োজন তাই বা পাবে কোথা থেকে! ভূটানের পাহাড়ে পাহাড়ে আছে অজস্র ঝরণা। এই ঝরণার জলে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে, সবুজ হয়ে ওঠে ভূটান সীমান্তের চা-বাগান।

চা-পাতা তোলা সুরু হয় বসন্ত সমাগমে। মার্চের শেষে কি এপ্রিলের প্রথমে আর শেষ হয় একেবারে শীতে, সেই ডিসেম্বরে। এখানকার মানুষ দিগন্তের সীমায় সীমায় প্রসারিত ঘন সবুজ চা-বাগানের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। এই চা তাদের পেটের অন্ন জোগাবে, দেবে পরনের কাপড়, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের সামগ্রী আসবে স্রোতের মত।

চা-বাগানের কুলীরা আসে দূরদেশ থেকে। ছত্রিশগড় থেকে আসে, আসে বিলাসপুর থেকে। শিশু ও নারী কুলীরাই চায়ের পাতা তোলায় খুব সুপটু। জেলার স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেরই চা-বাগানের শেয়ার আছে। বছরে বছরে লভ্যাংশ পায় সেই শেয়ারের মালিকরা। আর—কিছু ধান হয়। হয় তামাক কফি আর আলু। আর তরাইয়ের হিংস্র অরণ্যে জন্মে অপর্যাপ্ত শালগাছ। বাতাসে শালের ফুল ঝরে ঝরে পড়ে। শালগাছের আড়াল থেকে ময়ূরের ডাক শোনা যায়। এই শালগাছের গায়ে গায়ে নম্বর পড়ে। তারপর একদিন কুড়ালের ঘা পড়ে। কাঠ কেটে স্তূপ করে রাখা হয়। ট্রাকে করে সেই কাঠ চালান হয়ে যায় দূর-দূরান্তরে। বহু বাঙালীর অন্ন জোগায় এই শালকাঠ।

তাঁত চলতো সে আমলে ঘরে ঘরে। তাঁতের কাপড় ও শাড়ি স্থানীয় বাজারেই বিক্রি হতো বেশি। চট ও মোটা রেশমী কাপড়ও তৈরি হতো কিছু কিছু। তবে এ সবকেই ম্লান করে দেয় চায়ের ব্যবসায়। এ জেলার বাণিজ্যকেন্দ্র জলপাইগুড়ি শহর, টিট্যালা, আর রাজনগর। দেবীগঞ্জ, বড়ুয়া, ময়নাগুঁড়ি, আলিপুর আর বক্সাতেও ব্যবসার কেন্দ্র এক সময়ে ছিল।

হয়তো উপরোক্ত কোন কোন স্থানের ব্যবসায়িক গুরুত্ব আজকালের প্রভাবে অনেক খর্ব হয়ে গেছে, কিন্তু একদিন জলপাইগুড়ির আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য যে এই জনপদগুলিকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল—সেই ইতিহাস লেখা আছে এ জেলার প্রাচীন গেজেটিয়ারে—আছে অতীত বাংলার ধনসম্বল ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিবৃত্ত— (ক্রমশঃ)

অফিসে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিল বিশ্বাসের টেলিফোন পেয়ে রামদুলাল দত্ত হতাশ হয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে কড়িকাঠ গুণতে বসলেন। তার নাকি পুলিশের কাছে অনেক কিছু বলার আছে।

'গোড়ার দিকে হাজার দফা জেরা করে একটি কথাও বার করা যায় নি—অথচ যেই কেসটা মোটা-মুটি ছকে ফেলতে স্বরু করেছি অমনি এসে আরও পাঁচ-সাত কথা বলে সব ভণ্ডুল করার চেষ্টা।' জোরে না বললেও মনে মনেই উচ্চারণ করলেন কথাগুলো স্পষ্ট জোরালো ভাষায়। কিছুক্ষণ বাদেই বাইরের দরজার কলিংবেলের কর্কশ শব্দ।

'গোড়ায় আমি সব কথা খুলে বলি নি—' আমতা আমতা করে বলল অনিল বিশ্বাস।

'খুব ভাল কাজই করেছেন—' মুখ বিকৃত করে মনে মনে বললেন রামদুলাল।

'কারণ—আমি ভেবেছিলাম, উনি মানে সমরেশবাবু হয়তো এই ব্যাপারে কোন রকমে জড়িয়ে পড়ছেন। আমি অবশ্য চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না, তবু প্রমাণ-গুলো যেন সবই ওঁর বিপক্ষে বলেই মনে হয়েছিল। তাই—'

'তাই আপনি ইচ্ছে করে আমাদের ভুল পথে চালিয়ে দিলেন। জানেন পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলা অপরাধ। এজন্যে আপনার জেল হয়ে যেতে পারে।' জমা আক্রোশ ফেটে পড়ল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ করে।

'আমি যখন মাধবী সরকারকে লাইব্রেরীতে আবিষ্কার করি, তখন তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে বলেছিলেন—বিষ মিশিয়ে দিয়েছে এই শরবতের গ্লাসে। মাধবী সরকারকে বিষ মেশাবে কে? সমরেশ-বাবুর কথা ভেবেই আমি তখন বলে-ছিলাম—উনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, আমাকে একটি কথাও বলেন নি।

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

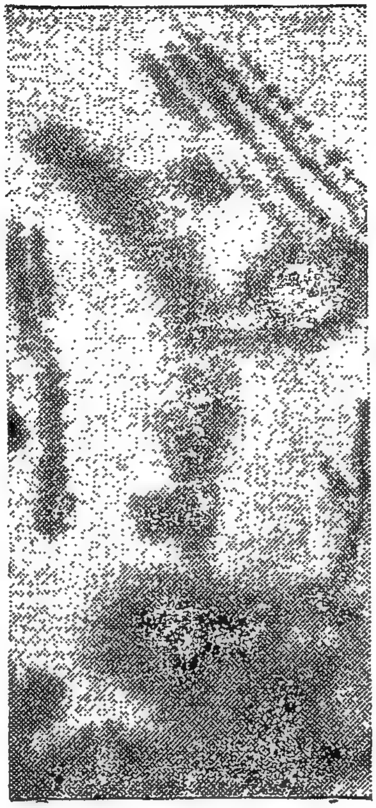

কুহেলী বিলীন

[illegible]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সুনন্দ মিত্রের মৃত্যুর দিনও আমি গ্লাসটা ঐ কারণেই বদলি করে দিই। যাতে পুলিশ ঠিকমত বুঝতে না পারে, অন্তত তাদের বুঝতে একটু দেরি হয়।' অনিল বিশ্বাস উত্তেজিত না হয়ে স্থির হয়ে বসে কথাগুলো বলে চলল।

'পুলিশকে আপনারা বোকা, কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীন বলেই ধরে নিতে চান, কিন্তু আসলে তা নয়। আপনি যে পয়লা নম্বরের মিথ্যেবাদী, তা গোড়াতেই ধরে ফেলে-ছিলাম, আর সেজন্যেই আপনার গতিবিধি নজরে রাখার জন্য আমাদের চর দু-তিনজন দিনরাত পাহারা দেয়। যা হোক, এসব নতুন কথা নয়। আর যদি কিছু বলার থাকে, তাহলে পরোপকারের চেষ্টা ছেড়ে জীবনে একবার সত্যি কথাটা বলে ফেলুন।'

দু-চার মিনিট ইতস্তত করল অনিল বিশ্বাস। তারপর নীচু গলায় বলল—'আচ্ছা, আপনাদের সেই ডাক্তার বসাকের সঙ্গে একবার দেখা হতে পারে?'

'আজ্ঞে না। তাঁর খবর আজ তিনদিন পাওয়া যাচ্ছে না। মিসিং স্কোয়াডে খবর দেওয়ার কথা ভাবছি।'

'কথাটা তাঁকেই বলব ভেবে-ছিলাম।' অনিল বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলল—'হয়তো খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, তবু আমার কোথায় যেন খটকা লাগছে। আমি সেদিন লাইব্রেরীতে যখন মিসেস সরকারকে ডাকতে উপরে উঠছিলাম, তখন সত্যজিৎ সামন্তের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা। আমাকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হওয়ার ভঙ্গিতে তিনি তাড়াতাড়ি নেমে চলে গেলেন। অথচ আপনাদের কাছে জবানবন্দী দেওয়ার সময়েও ওপরে যাওয়ার কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন।'

'এ ছাড়া আর কিছু বলার আছে?' রামদুলাল দত্ত ভুরু দুটোকে বাঁকিয়ে প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন—'আমাদের কেসের মোটামুটি একটা সমাধান করে এনেছি, এ সময়ে আবোল-তাবোল সাক্ষ্য দিয়ে আমাদের সোজা রাস্তা ছেড়ে বাঁকা পথে টানবেন না। আর লোক পেলেন না মশাই। বড় বড় দার্শনিকতত্ত্ব যাদের মুখের বুলি, তাদের মানুষ খুন করার মত সাহস ক্ষমতা কোনটাই থাকে না।'

অনিল বিশ্বাসকে আরও কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে হয়তো মনের ঝাল মেটানো যেত। কিন্তু সময় নেই। একসঙ্গে তিনটে অর্ডার।

হ্যাঁ লতিকা দত্তকেও নিশ্চয় খুন করা হয়েছে। সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও তাঁর অভ্যস্ত চোখ নার্সিং-হোমের তিনতলার বারান্দার লোহার রেলিঙের ভাঙা শিকটার দিকে ঠিকই নজর করেছিল। কিছুটা জমাট রক্ত আর কয়েক গাছি চুল জড়ানো। একজন ইন্সপেক্টার সেই রক্ত আর চুলের স্যাম্পল্ জোগাড় করে নিয়ে গেছে ল্যাবরেটারিতে। লতিকা দত্তকে ফেলে দেওয়ার আগে ঐ ধারালো শিকের আঘাত তার মাথায় একটি গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল। পড়ে যাওয়ার আগেই সম্ভবত হতভাগ্য মেয়েটি প্রাণ হারায়।

'কে সেই শয়তান।' বলে হতাশ হয়ে আর একবার কড়িকাঠের দিকে চোখ ফেরানো মাত্র টেলিফোনের ঝঙ্কার বেজে উঠল। ঠিক সময় বুঝে টেলিফোন বাজতে জানে। অনেকটা বসন্ত মল্লিকের 'ওয়াইফে'র মতো নাছোড়বান্দা সুরে।

'আপনার টেলিফোন স্যার।'

'কে করেছে?' অভ্যস্ত প্রশ্ন করলেন রামদুলাল দত্ত।

'নার্সিংহোম থেকে মলিনা মিত্র।'

'হ্যাঁ, আমি মলিনা মিত্র। যে লোকটি ডাঃ বসাকের পরিচয় দিয়ে সুরমা বিশ্বাসকে ঠকিয়েছিলো, তাকে আমাদের তেরো নম্বর কেবিনে কায়দা করে বন্ধ করে রেখেছি। ভদ্রলোক অবশ্য দরজায় ঘা দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোন রকম রিস্ক নিতে চাই না। তাড়াতাড়ি আপনাদের লোক পাঠিয়ে দিন।'

'কি রকম দেখতে লোকটি বলুন তো—' কৌতূহল চাপতে না পেরে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন রামদুলাল দত্ত। মলিনা মিত্র বোধহয় অন্য আর একজনকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন কিছুক্ষণ।

'হ্যালো—হ্যালো কথার উত্তর দিচ্ছেন না কেন?'

আমি তাকে দেখি নি।'

'কে দেখেছে'

'কেউ না। সিঁড়িতে অন্ধকার ছিলো।'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে রিসিভার প্রচণ্ড শব্দ করে নামিয়ে রাখলেন রামদুলাল দত্ত। তারপর আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

'ভদ্রলোক বার বার বন্ধ দরজায় ঘা দিচ্ছেন—' মলিনা মিত্র উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন—'এক একবার অন্য পেশেণ্টদের ঘুমের ব্যাঘাত হবে মনে করে ভাবছিলাম দরোয়ানদের ডেকে নিয়ে দরজা খুলি। কিন্তু সাহস হয় নি। লতিকা দত্তের জিনিসপত্র কিন্তু ওঁরই কাছে রয়েছে।'

'বলেন কি। প্রমাণ নষ্ট করে দিতে পারে তাহলে। লতিকা দত্তের জিনিস-পত্র এখানে ছিলো সে কথা পুলিশকে বলা হয় নি কেন?' সিঁড়ি প্রায় টপকে রামদুলাল দত্ত দোতলার অন্ধকারটুকু পার হয়ে গেলেন। তের নম্বরের কয়েদী আপাতত চুপচাপ হয়ে গেছে। মলিনা মিত্রর থেকে চাবি নিয়ে খুব সাবধানে দরজার হাতল ঘুরিয়ে দিলেন রামদুলাল দত্ত। পাঁচ-সাতটা জোরালো টর্চ একই সঙ্গে এসে পড়লো ইজিচেয়ারে হতাশ হয়ে এলিয়ে-পড়া লোকটির মুখে। অনেকক্ষণ দরজা খোলার বৃথা চেষ্টা করে এখন বোধহয় তন্দ্রায় চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিলো। জোরালো আলো চোখে পড়াতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে।

'ডাঃ বসাক?' বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন রামদুলাল দত্ত। মলিনা মিত্রের ফ্যাকাশে মুখে কে যেন ছাই মাখিয়ে দিয়েছে।

'কি ব্যাপার মিঃ দত্ত। আমাকে এখানে আটক করার পেছনে কি অর্থ থাকতে পারে এতক্ষণ মাথা ঘামিয়েও আবিষ্কার করতে না পেরে অগত্যা নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ।'

'ডাঃ বসাক—আপনাকেও তাহলে জিজ্ঞাসা করি, তিনদিন উধাও হয়ে থাকার পরে এখানে এত রাত্তে ঘোরাঘুরি করছেন কেন?'

'সে সব কৈফিয়ৎ পরে হবে। অনেকখানি সময় নষ্ট হয়ে গেছে মিঃ দত্ত। আপাতত এক পেয়ালা খুব কড়া কফি, লতিকা দত্তের বাড়ির ঠিকানা আর পুলিশের ঐ জিপ গাড়িটা আমার প্রয়োজন। হ্যাঁ আপনিও আমার সঙ্গে নৈশ সফরে বেড়াতে চলুন।'

'আমি দুঃখিত ডাঃ বসাক'—মলিনা মিত্র কফি আনার হুকুম দিয়ে নীচু গলায় বললেন।

'দুঃখ করবেন না মিসেস মিত্র, না জেনে আমরা এ-জাতীয় ভুল জীবনে অনেক করে থাকি। আমি কেবল এই কথাটাই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, আমাকে বিনা কারণে খুনী আসামীর মত হাজতবাস করালেন কেন?'

'তার কারণ খুনী আসামীটি অতিশয় ধড়িবাজ ঘুঘু, একটু আগে ধরা পড়ে আপনার নাম ব্যবহার করার মত উপস্থিত বুদ্ধি তার ছিল। নার্সিং-হোমে রাতবিরেতে ডাক্তারদের আগমন এখন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। লতিকা দত্তের ঠিকানায় অবশ্য নতুন কিছু পাওয়া যাবে না। আমি বিশ্বজিৎকে ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমাদের লাইনে নতুন এলেও ছেলেটি খুব স্মার্ট ও উৎসাহী।'

কফির পেয়ালার ফুটন্ত পানীয় প্রায় এক চুমুকে শেষ হয়ে গেল। ডাঃ বসাক লতিকা দত্তের কাপড়ের ব্যাগটি হাতে তুলে নিয়ে মলিনা মিত্রকে বললেন—

'এটা আমিই মেয়েটির মায়ের হাতে পৌঁছে দেব। তবে আজকের রাতটুকু আপনারা খুব সতর্ক থাকুন। কাল বিকেলে—মনে হচ্ছে কাল বিকেলেই সমরেশ সরকারকে আমরা বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব। একটা অনুরোধ মিসেস মিত্র, আপনি ডোরাকে আমার ফ্ল্যাটে ফোন করে জানিয়ে দিন—আমি

বেশ বহালতবিয়তেই বর্তমান আছি। ও বেচারী কোন খবর না পেয়ে হয়তো দুশ্চিন্তায় ঘুমোতেই পারে নি।'

ডাঃ বসাকের হেঁয়ালীভরা কথা-বার্তার পেছনে একটা কিছু রহস্য আছে। রামদুলাল দত্ত আজ এ নিয়ে বোধহয় পাঁচ পেয়ালা কফি শেষ করেছেন, তবু পরীক্ষার আগে পড়ুয়া ছেলের মত চোখ দুটো যেন ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। এবারে ছ'নম্বর পেয়ালাটা অর্ধেক খালি করে তিনিও জোর দিয়ে বললেন—

'আমিও ঐ মেয়েটির বাসায় সকাল হলেই যাব মনে করেছিলাম, তবু আপনি যখন বলছেন, একবার যাওয়াই যাক।'

বড় রাস্তা ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে একেবারে সরু একটা গলিতে পরিণত হোল। রাস্তা মসৃণ নয়, বড় বড় গর্তে গাড়ি প্রায় উল্টে যাওয়ার ব্যবস্থা। এদিকে দুধারে খোলা নর্দমার তীব্র গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে। খুঁজে খুঁজে সাতচল্লিশের ডি মার্কা বাড়িটা পাওয়া গেল। বাড়ি না বলে ওটাকে ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বলাই সঙ্গত। ইটের গাঁথুনী জীর্ণ হয়ে এসেছে, একটু নাড়া খেলেই হয়তো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

বিজলী বাতি জ্বলে না, একটা টিমটিমে হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোর চারপাশে জন-কয়েক লোককে গোল হয়ে জটলা করতে দেখা গেল। দেওয়ালের গায়ে মাথা এলিয়ে একটি বিধবা মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সম্ভবত উনিই লতিকার মা। আগন্তুকদের দেখে তাঁর কোন ভাবান্তর ঘটল না। দু-চারজন কৌতূহলী প্রতিবেশী পুলিশের লোক দেখে শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন।

'আমি লতিকা দত্তের মায়ের সঙ্গে একটু একলা দেখা করতে চাই।' ডাঃ বসাকের শেখানো কথার পুনরাবৃত্তি করলেন রামদুলাল দত্ত।

একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে এগিয়ে এসে বলল—'মা বোধহয় আপনাদের কথার উত্তর দিতে পারবেন না, দিদির সম্পর্কে যা জানতে চান, আমিই বলতে পারি। এতক্ষণ আরেকজন অফিসার এসেছিলেন, তাঁকে সবকিছু খুলে বলেছি।'

ছেলেটির নাম সুশান্ত। বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়ে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে কথাবার্তা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে খুব বেশি খবর পাওয়া গেল না। তবে লতিকা গত চার-পাঁচদিন একটু অন্যমনস্ক ছিল। পরশুদিন শরীর খারাপের অজুহাতে কাজে যায় নি, কেবলই ছট্‌ফট্ করেছে। সুশান্ত কলেজের অফ পিরিয়ডে বাড়ি ফিরে দুপুরে ঘুমিয়ে নেওয়ার মতলব করেছিল। তাকে ডেকে লতিকা হঠাৎ বলল—'টাকাই মানুষের সব চাইতে বড়, বুঝলি খোকা। টাকার জন্যে মানুষ নিজের ধর্ম পর্যন্ত অনায়াসে ছাড়তে পারে।'

'কি বাজে বকছিস্ দিদি। এ তো পুরোন বস্তাপচা তত্ত্বকথা।' সুশান্ত ঘুমের ঘোরে বিরক্তি প্রকাশ করল—'ধর্ম-টর্ম ছেড়ে দিতে একটুও আপত্তি হোত না—যদি একটা গুপ্তধনের সন্ধান কেউ দিতে পারত।'

লতিকার মা মেয়ের হাতব্যাগ বুকে আঁকড়ে ধরে জলভরা চোখে এগিয়ে এলেন।

'লতু, কারো কোনদিন ক্ষতি করে নি বাবা, তবে কেন ওর এই দশা হোল। ওকে মেরে কার কতটুকু লাভ হোল জানি না।'

'এই পৃথিবী বড় খারাপ জায়গা মা।' ডাক্তার বসাক সহানুভূতিভরা গলায় বলে উঠলেন—'কত অসহায় নির্দোষ মানুষও এখানে পাকেচক্রে পড়ে সর্বনাশে তলিয়ে যায়। আপনার মেয়ের স্বভাবের প্রশংসা তো সকলেই করছে।'

'নিজের মেয়ে বলে বলছি না, ও ছিলো আমার ছেলের চেয়েও বেশি। কত বলতাম, তোর দিনরাতের খাটুনি, একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া কর, এক-আধটা টনিক খা। হাসিমুখে বলত—তুমি বুড়ো হয়েছ, খোকা, মীরা, ছবিরা ছেলেমানুষ—যত্নের দরকার তোমাদের। আমার এখন ওসব লাগবে না। কি বলব বাবা, একটুকরো মাছ দিলে ভাইয়ের পাতে তুলে দিয়ে বলত—ওর পরীক্ষার বছর যা মাছ-দুধ বাড়তি থাকবে, ওকেই দেবে। সেই সোনার মেয়েকে আমার কে এমনভাবে'---কথা শেষ করতে না পেরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভদ্রমহিলা।

'গত তিন-চারদিন আপনার

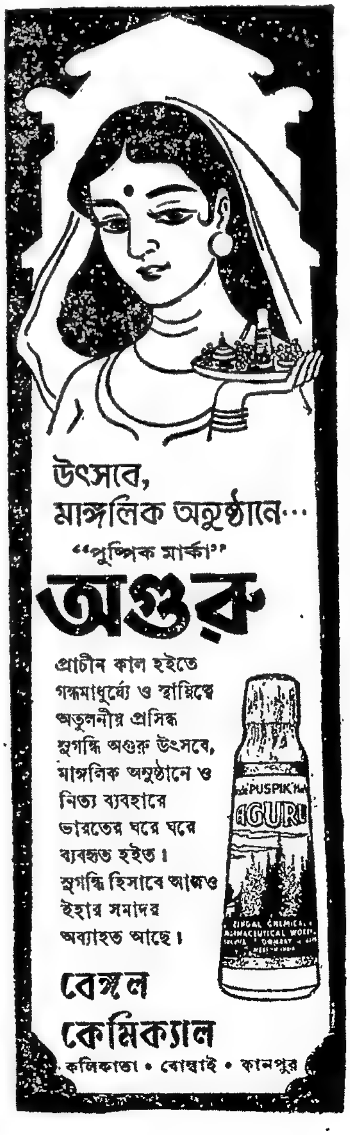

মেয়েকে কি একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল?'

'আমি মনে করেছিলুম শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।' জলভরা চোখ মুছতে মুছতে মা কান্না-জড়ানো গলায় বলতে সুরু করলেন—'পরশু, হ্যাঁ পরশু দুপুরে কাজ কামাই করে আমার পাশে এসে শুলো। বললে—তোমার সঙ্গে কতকাল গল্প করতে পাই নি মা—দিনরাত কাজের ধান্দায় ঘুরি।'

'তারপর?' ডাঃ বসাক কথার মাঝখানে খেই ধরিয়ে দিলেন।

'একটু কেমন কেমন কথা বলতে সুরু করল। মেয়ে আমার এমনিতে খুব চাপা, দু-চারটে কথা যাও বা বলে, তাও কেবল সাংসারিক অভাব-অনটনের বিষয়ে। পরশুদিন কিন্তু ওসব কথা নয়, কেবল অনেক টাকা হলে আমাকে হাঁপানীর চিকিৎসা করাবে, মীরার বিয়ের পণ যোগাড় হয়ে যাবে, খোকা এম-এ পড়বে এই সব। আমি মেয়ের খামখেয়াল দেখে হাসছিলাম, লতু বললে—হাসছ মা, কিন্তু দেখো টাকা যোগাড় হবেই।'

'আচ্ছা, আপনার মেয়ের কাছে গত তিন-চারদিনের মধ্যে কেউ দেখা করতে এসেছিল?' ডাঃ বসাক আবার প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—'হ্যাঁ একজন এসেছিলো। তবে এ বাড়িতে নয়। লতু সাধারণত নাইট ডিউটি দিতে সাতটা বাজলে পর বেরোয়। গত হপ্তায় দু-তিনদিন বেলা পাঁচটা বাজলেই যাওয়ার তাড়া। মেয়ে বড় হয়েছে, আমি আর কি বলব। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এত তাড়া কেন? কেমন ফ্যাকাশেপানা মুখ করে লতু বলল—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দরকার আছে।'

'আপনি সেই ভদ্রলোককে কি দেখেছিলেন?'

'না, বাবা, আমি কি বাড়ির বাইরে যাই—না রাস্তাঘাট চিনি। তবে আমার মেয়ের বন্ধু মিনু বলতে পারে। কাউকে যদি মনের কথা বলত তো সে ঐ মিনু। যা তো মীরা, ডেকে নিয়ে আয় তোর মিনুদিকে।'

মিনু অর্থাৎ মিনতি বলে মেয়েটি গম্ভীর মুখে সামনে এসে দাঁড়ালো। রোগা, কালো চেহারা, চোখের নীচে অনেক কান্নার ফলে ঘন কালির ছাপ।

'আপনি লতিকা দত্তকে চিনতেন?' এবারে রামদুলাল দত্ত প্রশ্নের ভার নিলেন।

'হ্যাঁ।'

'আপনাকে উনি মনের কথা সব খুলে বলতেন।'

'কিছু কিছু বলত। সব বলত কিনা জানব কি করে?' মিনতি পাতলা ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে নীরস কণ্ঠে বললো।

'ইদানীং বেলা পাঁচটায় আপনার বন্ধু এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, সে সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'না।'

'সত্যি কথা বলছেন।'

'মিথ্যা কথা আমি বলিনা।'

রামদুলাল দত্ত ক্রমশ ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন দেখে ডাঃ বসাক তাড়াতাড়ি মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন।

'আচ্ছা মিনতিদেবী, বন্ধুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?'

'আজ বেলা তিনটের সময়ে'—চোখে মুখে বিদ্রোহের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল অনিচ্ছুক উত্তর দেওয়ার মুহূর্তে। লতিকা দত্তের মৃত্যুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না বলেই কাউকে ক্ষমা করার প্রবৃত্তি ওর নেই। তবু রামদুলাল দত্ত এবং অন্যান্যদের ঘর থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সামান্য সহজ হতে পেরেছে মেয়েটি।

'কি কথাবার্তা হোল একটু ভেবে বলুন দেখি, সাবধান। যেন কোন কিছু বাদ না যায়।'

'তাতে কি লাভ হবে? লতুকে যে মেরেছে, তাকে আপনারা কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'কারণ লতু আমার কাছে পর্যন্ত এই ভদ্রলোকটির বিষয়ে একটা কথাও উচ্চারণ করে নি। আমি প্রথমে অন্য কিছু সন্দেহ করেছিলাম। ও অবশ্য ছেলেদের সঙ্গে মিশতে চাইত না, তবু মানুষের মনের দুর্বলতার কথা কেউ বলতে পারে না।'

'এই ভদ্রলোকটি কি অল্পবয়সী?'

'সে সব ও আমাকে কিছুই বলে নি, তবে যখন খুব ঠাট্টা করছিলাম, কেমন গম্ভীর হয়ে বলল—যা বলছিস মিনু, তা নয়। এ আমার অগ্নিপরীক্ষা বলতে পারিস। একটা কথা তোকে বলে রাখছি এখন থেকে, যদি আমার কিছু হয়, তাহলে জেনে রাখবি লোভের ফাঁদে পা দেওয়ার শাস্তি আমাকে পেতে হয়েছে।'

'কিন্তু এসব কি বলছিস লতু। কি হয়েছে তোর।'

'না, কিছু হয় নি ত। দ্যাখ মিনু, আমি যখন থাকি না, মা'র দিকে একটু খেয়াল রাখিস, হাঁপানীটা বড় বেড়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর ও কতকগুলো চিঠি বসে বসে ছিঁড়ল। পুরোন চিঠি আমরা যেভাবে ছিঁড়ি সেভাবে নয়। একেবারে কুচিকুচি করে। শেষকালে আগুন ধরিয়ে দিল। ওর মুখ-চোখের ভাব দেখে ভয়ে আমি আর কিছু বলি নি। তবে—তবে সেই ছেঁড়া কাগজের দু-চারটে টুকরো উড়ে ঘরের কোণে পড়েছিল—আমি তুলে রেখে দিয়েছিলাম।'

'এখনও সেগুলো আছে আপনার কাছে?'

'আছে'—খুব নীচু গলায় মিনতি আঁচলের তলা থেকে একটা ছোট্ট টফির কৌটো বার করল। ঢাকাটা খুলে ডাঃ বসাক আগুনে পোড়া কয়েক টুকরো কাগজের অবশিষ্ট সাবধানে তুলে ধরলেন, মোটা দামী বিলিতি কাগজ, ফিকে হলুদ রং। বেগুনী কালিতে লেখা। বেশির ভাগই পড়া যায় না, কেবল একটি খণ্ড আয়তনে একটু বড়। তাতে লেখা—'র : বার[illegible] পরে—'

(ক্রমশঃ)

রাজধানী :

উৎসবমুখর হয়ে উঠেছে শহর কলকাতা। দোকানে ভিড় জমতে সুরু করেছে। পূজার দিন যত এগিয়ে আসছে, ভিড়ও তেমনি বাড়তে সুরু করেছে। ভিড় বাড়লেও আসল কেনাকাটার কারবার সুরু হয় নি পুরাদমে। কেনার চাইতে এখনও বাছাইয়ের দিকেই নজরটা বেশি। চট করে যাদের পছন্দ হবে, পকেটের সামর্থ্য বিচার করে যাদের যা-হোক একটা কিনে ঘরে ফিরতে হবে, তারা এখনও দোকানের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারেন নি। সামনের মাসের বেতনের সাথে বোনাস অথবা পূজার জন্য ধার হিসাবে অগ্রিম বেতন হাতে না এলে তাদের বাজারে আসা সম্ভবও নয়।

এখন যাঁরা দোকানে দোকানে ঘুরে শাড়ির রঙ ও পাড় পছন্দ করে বেড়াচ্ছেন তাঁরা সকলেই প্রায় ওপর-তলার ঘরণী। দক্ষিণ কলকাতায়, বিশেষ করে, গড়িয়াহাটার মোড়ের দোকানগুলোতে বিকেলের দিকে মেয়েদের ঠেলে ঢোকাই এখন অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

* * *

এবারে পূজায় ভোগের চাল ও ময়দার অভাব হবে কি না এখনও সঠিক বলার সময় আসে নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রতিশ্রুতি রক্ষার চেষ্টায় নেমে পড়েছেন। ময়দা-কলের কিছুসংখ্যক মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাতজনকে আটক করা হয়েছে ভারতরক্ষা আইনের তিরিশ ধারায়। ভারতরক্ষা আইনের একচল্লিশ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হয়েছে দুজনকে। তল্লাসী চালাবার সময় পুলিশ দুজনের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেছে মোট তিন লক্ষ আট হাজার সাত শ' তের টাকা।

এ উদ্যম প্রশংসনীয়। আরও প্রশংসা অর্জন করতে পারতেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী—যদি তিনি 'সাদীর রাতেই বিড়াল কাটতে পারতেন।'

● কলকাতায় দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় আন্দোলনের নেতা ডঃ দাদু ও শ্রীমার্কস।

এ গল্প রাজবাড়ির। দু'ভাই বিয়ে করেছিলেন দুই রাজকুমারীকে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই রাজকুমারীর পঞ্চাশ পাদুকাঘাত সবিনয়ে মাথা পেতে গ্রহণের সর্তে রাজকুমারীরা দু'ভাইকে বিয়ে করেছিলেন। বড় ভাই ছিলেন চালাক-চতুর ও সাহসী। বিয়ের রাতেই সে বিরক্ত হয়ে রাজকুমারীর সযত্নপালিত আদরের বিড়ালের আচরণে বিরক্ত হয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়। রাজকুমারী তার স্বামীর বীরত্ব ও সাহস দেখে ভয়ে আর কোনদিন বিয়ের সর্তের কথাটা উচ্চারণ করেন নি। ছোট ভাই ছিল ভীরু। তাকে প্রতিদিন প্রভাতে নীরবে সহ্য করতে হতো পাদুকাঘাত। বড় ভাইয়ের সংবাদটা যখন তার কাছে এলো, তখন আর সময় নেই। রাজকুমারী তাকে চিনে ফেলেছেন। তবু বেচারা আশায় বুক বেঁধে একদিন ছোট র[illegible]কুমারীর বিড়াল হত্যা করে [illegible] ডেকে আনলো। পরদিন থেকে পাদুকাঘাতের সংখ্যা হল দ্বিগুণ।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী [illegible]ফুল্লচন্দ্র সেন কালোবাজারীদের [illegible] না দিয়ে প্রথম প্রহরেই আঘাত হানলে, তারা মানুষের পকেট [illegible] দেড় মাসের মধ্যে ময়দায় কো[illegible] কোটি টাকা মুনাফার সুযোগ পেতো না;

সাহস পেতো না অপরাধীদের আত্মীয় তাঁর দুয়ারে ধর্ণা দিতে—ক্ষমার আবেদন জানাতে।

মুখ্যমন্ত্রী নরম হন নি। ক্ষমাপ্রার্থীকে তিনি জানিয়েছেন, 'মানুষের খাদ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে তাদের তিনি ক্ষমা করবেন না।' সঙ্কল্পে তিনি অটুট থাকলে অর্থলিপ্সু সমাজ-বিরোধীরা নিশ্চয়ই শায়েস্তা হবে। মানুষের মনে ফিরে আসবে আস্থা। শুধু ময়দার কলের দুজন মালিককে গ্রেপ্তার করলেই চলবে না। মুনাফা-খোরদের চক্রব্যূহ ভেদ করে তাদের পর্যুদস্ত করতে হলে জাল ফেলে সব রাঘব-বোয়ালদের ডাঙায় টেনে তুলতে হবে। তা না হলে, সাময়িক ধরপাকড়ের কোন ফলই হবে না। সমাজ-বিরোধীদের চক্রান্তের মূলে কুঠারাঘাতের উদ্যম এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। সেকাজে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হবে সরকারী নীতির আমূল পরিবর্তনের।

* * *

পশ্চিম বাংলা সরকার সম্প্রতি আউস ও বোরো ধানের সর্বোচ্চ মূল্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাঁধেন নি সর্বনিম্ন দামটা। পরের ঘোষণায় বলা হয়েছে—ধানের দাম প্রতি মণ তের টাকার নীচে নেমে গেলে সরকার নিজেই ধান কিনে নেবেন। এ কারচুপি কেন? কেন সরকার ধানের সর্বনিম্ন দাম বেঁধে দিয়ে ব্যবসায়ীদের হাত থেকে চাষীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করলেন না? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সরকারী কর্মচারীদের সব কাজই চলে ঢিমে তালে। এদিকে আউস ধানের চাল পর্যন্ত বাজারে উঠে গেছে। চাষীর ঘর থেকে ব্যবসায়ীরা দশ-এগারো টাকা মণ দরে ধান কিনে নিয়ে গোলা বোঝাই করছে। সে ধানের চাল আবার প্রতি কিলো ৮০ থেকে ৮৬ পয়সা মূল্যে বিক্রি হচ্ছে হাটে-বাজারে।

সরকারের নীতির একটুও বদল হয় নি। সরকার এখনও আমন ধানের দাম নির্দিষ্ট করে দেন নি। ধান কাটা যখন আধাআধি শেষ হয়ে যায়, তখন ধানের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রহসন মাত্র। ছোট চাষীর ক্ষমতা নেই—ধান ঘরে মজুত করার। তার দায়-দেনার ও পেটের টান সব চাইতে বেশি। কাজেই দেখা যাচ্ছে সরকার চাষীকে বাঁচাবার, তাকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে উৎপাদনে উৎসাহ দানের নীতি গ্রহণ করেন নি। তা করলে, চাষীর হাতেই অর্থাৎ ধান মাঠে থাকতে থাকতেই সরকার ধানের সর্বনিম্ন দাম নির্দিষ্ট করে দিতেন। ব্যবস্থা করতেন—সেই ন্যায্য-মূল্য না দিয়ে যারা চাষীকে প্রতারণার পথে নামাবে, তাদের সমুচিত শাস্তি দানের।

* * *

মানুষের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠছে—বিপদে না পড়লে সরকার নড়তে চান না। পূজার বাজারে বিপদে পড়েই—চারিদিকের অভিযোগে থাকতে না পেরেই সরকার ময়দা-কলের জন-কয়েকের উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। বিপদ কেটে গেলে, এ উদ্যম থাকবে কিনা সেইটাই বড় কথা।

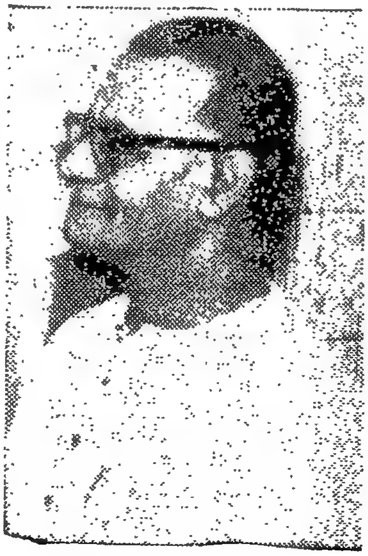

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

শ্রীবিজয়সিং নাহার

বিধানসভায় বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে ঘোষণা হয়েছে, তাও এই সাক্ষ্যই বহন করে। বিল পাশ হয়েছে। ইংরাজী চলবে এ রাজ্যে অনির্দিষ্ট কাল। বাংলাকে সরকারী ভাষা এই মুহূর্তে করে ফেলার নানা অসুবিধার কথা তুলেছেন শ্রীবিজয়সিং নাহার।

এ সব অজুহাত তোলার সাহস—১৯৬১ সালে সরকারের ছিল না। কবিগুরু জন্ম-জয়ন্তী নিয়ে মেতে উঠেছিল সারা দেশ। তখনকার জন-মতের চাপে এ সব অজুহাত তোলা সম্ভব ছিল না। বিপদের মুখে আমাদের সরকারের উৎসাহ যায় বেড়ে। তাঁরা ঠিক করে ফেলেছিলেন—ইংরাজী ভাষার আয়ু শেষ করে দেবেন ১৯৬৫ সালে। বিপদ কেটে যাবার পর, এখন পরিভাষা ও টাইপ রাইটারের অভাবের অজুহাত উঠেছে। এতদিন সরকার ঘুমিয়েছিলেন কেন? কেন তাঁরা এ সব অসুবিধা দূর করেন নি? উত্তর দিতে গেলে সব বেফাঁস হয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে সরকারের আসলে কোন ব্যাপারেই তেমন বলিষ্ঠ নীতি নেই। গোটা সরকার ঘোরে আমলাচক্রের চাকার সঙ্গে সঙ্গে। আমলাদের দাসসুলভ মনোভাবের পরিবর্তন হয় নি। কাজেই বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও

রবীন্দ্রনাথের দেশে তাঁদের ভাষায় সরকারী কাজ পরিচালনা সম্ভব নয়।

সরকার এই আমলাচক্র ভাঙতে পারলেই দেখতে পেতেন বাংলা ভাষায় সরকারী কাজ আগেও চলেছে। ত্রিপুরায় চিরকালই বাংলা ছিল সরকারী ভাষা। কোচবিহারের

শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর

সরকারী ভাষাও ছিল বাংলা। পরিভাষার দোহাই না দিয়ে ত্রিপুরার কাছ থেকে সাহায্য নিলে ঝামেলা চুকে যেত অনেকখানি।

* * *

সেদিন আইনসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর তথ্যাদি তুলে ধরে দেখিয়েছেন—পশ্চিম বাংলায় তরি-তরকারীর দাম এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। শুধু তরিতরকারী নয়, মশলাপাতি থেকে স্বুরু করে ভোগ্যপণ্য প্রত্যেকটি জিনিসেরই মূল্য বেড়েছে শতকরা প্রায় একশ' ভাগ।

তরিতরকারী মূল্যবৃদ্ধির যে-কারণ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন, সে কথা মানতে হলে সরকারের দায়িত্ব এ বিষয়ে কমে যায় না। অন্যান্য জিনিষের মূল্যবৃদ্ধিতে তরিতরকারীর দাম বৃদ্ধি পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মানুষের প্রধান খাদ্যের অভাব হলে এবং তার মূল্য অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকলে অন্যান্য জিনিষের দামও বেড়ে থাকে। চালের খোলা বাজারে মূল্য এখন ৪৫৲ টাকা। এক বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে পঞ্চাশ ভাগেরও অধিক। গেল বছরেও মানুষের ধারণা ছিল, সরকারের প্রচেষ্টায় মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ সম্ভব হবে। সরকার সে কাজে ব্যর্থ হয়েছেন। কাজেই তরকারীর দাম বৃদ্ধির 'বিশেষণে সবিশেষ' ব্যাখ্যা না দিয়ে সরকারের উচিত হবে—ধান-চালের দামটা স্থিতিশীল করে দেওয়া। তা হলেই অন্যান্য জিনিসের মূল্যও একটা নির্দিষ্ট স্তরে নেমে যাবে। একথা কাউকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হয় না। তা ছাড়া পরিসংখ্যান ও ব্যাখ্যার মারপ্যাঁচ দেখতে দেখতে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। কথায় আর তারা আস্থা স্থাপন করতে পারছে না, কাজ দেখতে চাইছে সবাই।

* * *

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ডঃ ওয়াই এম দাদু ও মিঃ জে ডি মার্কস সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসেছিলেন। অগণিত জনতা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ভারতীয় আফ্রো-এশিয়ান সংহতি সম্মেলনের পক্ষ থেকে তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারূপে ডঃ দাদুর নাম এখানকার রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল মহলে সুবিদিত। মিঃ মার্কসও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

মেদিনীপুর:

লোনা জলে মাঠের পর মাঠের আবাদ বরবাদের খবর আমরা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দিয়ে আসছি। এ ঘটনা নতুন নয়। প্রতিটি বছর চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুরের সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘটছে এই ঘটনা। বাঁধ ভেঙে, স্লুইস গেট ভাসিয়ে নিয়ে, অকেজো ও অরক্ষিত স্লুইস গেট দিয়ে প্রবেশ করছে লোনা জল। শস্যহানি হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির। আবাদী জমি পরিণত হচ্ছে অনাবাদী জমিতে। চাষী হচ্ছে নিঃস্ব। দেশের মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে ফসল থেকে। কিন্তু, জল কিছুতেই ঢুকতে চাইছে না আসল জায়গায়। এই লোনা জলের কয়েক ফোঁটাও রাজ্য সেচ দপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের কানে প্রবেশ করলে নিশ্চয়ই তাঁরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন—ছুটে চলে যেতেন চাষীর পাশে। প্রতিকার একটা হতো।

বিশুনাথপুর, জলধা, বড়রাস্কুয়া, দুবলবাড়, খিরপাল, ভেড়িচাউলী, শঙ্করপুর প্রভৃতি গ্রামে লোনা জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়েছে। নতুন করে চাষের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। চাষী চেষ্টার ত্রুটি করে নি। জল নেমে যাবার পর কয়েকবার তারা ধানের চারা লাগিয়েছিল। ফল হয় নি। লোনা মাটিতে ধানের চারা টিকতে পারে না। সব শুকিয়ে উঠেছে।

এ-ঘটনার প্রতি আমরা সেচমন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি তদন্ত করে দেখুন, চাষীর আকুল আর্তনাদ, গ্রামবাসীর

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য

আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও প্রতিকার কেন হচ্ছে না। কর্মচারীদের ঔদাসীন্যে, তাদের অকর্মণ্যতায় দেশের উৎপাদন হ্রাস হয়ে থাকলে, তাদের

শাস্তি হওয়া উচিত। এ-গাফিলতি অমার্জনীয় বিভাগীয় কর্মচারীদের কোন ত্রুটি না-থাকলে, তাও পরিষ্কার করে বলা উচিত। সরকার একেবারে নির্বিকারই বা কেন? আশা করি, সেচমন্ত্রী এ-সব প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং এই বিপুল পরিমাণ শস্যহানির অভিযোগ যাতে না উঠে, তার জন্য সম্যক্ প্রতিকারের ব্যবস্থাও করবেন।

* * *

পশ্চিম বাংলার মানুষের মুখের অন্ন ছিনিয়ে নিয়ে চোরাকারবারীরা এখন তা চালান দিতে সুরু করছে পূর্ব পাকিস্তানে। চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর থেকে নদীপথে ধান ও চাল পাচার হচ্ছে। সম্প্রতি সুতাহাটার অন্তর্গত কুকুড়াহাটিতে হানা দিয়ে পুলিশ পাঁচশ' মণ চাল আটক করেছে। এ-সম্পর্কে কুকুড়াহাটি বাজারের দুজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

* * *

মেদিনীপুরে এখন আটা ও ময়দা কোন দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে না। আটার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে চালের বাজারে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে। চাল একেবারে উধাও হয় নি; কিন্তু তা' ইচ্ছামত পাওয়া দুষ্কর। কুচো চিংড়ি, অড় ও বোয়াল জাতীয় মাছ ছাড়া জাতের কোন মাছই চার টাকার কমে পাওয়া যাচ্ছে না। কুচো-চিংড়িও বিক্রি হচ্ছে আড়াই টাকা করে। আলু ও পটলের দাম বৃদ্ধিতে নটেশাকের কদর বেড়েছে। আলু এক টাকা, পটল পাঁচ সিকে এবং বেগুনের দাম চলছে বার আনা। নটে-শাক এক আঁটি বিক্রি হচ্ছে ১০ পয়সা করে।

বর্ধমান:

আসানসোলের শিল্পাঞ্চলে খাদ্য-সঙ্কট অত্যন্ত প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। আটা, ময়দা ও চালের অভাবে আসানসোলের পলিটেকনিক হোস্টেলের ছাত্রদের নাকি একদিন উপবাসে কাটাতে হয়েছে। কারখানার কর্মী, দিনমজুর এবং আফিসের বাবুদের সকল কাজ শিকেয় তুলে শহরময় ছুটাছুটি করতে হচ্ছে চাল ও আটা সংগ্রহের জন্য।

একদিকে চরম খাদ্যসঙ্কট অপর-দিকে দেখা যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার খাদ্য মজুত রয়েছে ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের গুদামে। এ এক বিচিত্র অবস্থা। পুলিশ রাণীগঞ্জ, আসানসোল ও বরাকর প্রভৃতি এলাকার কয়েকটি গুদামে হানা দিয়ে প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য উদ্ধার করেছে। এ-ছাড়া, পুলিশ একটি দোকান থেকে নাকি ৮৮ হাজার টাকাও উদ্ধার করেছে। বে-আইনী-ভাবে খাদ্যশস্য মজুত রাখার অভিযোগে পুলিশ কয়েকজন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে।

মুনাফা-শিকারীরা আজ কোন্ পর্যায়ে উঠেছে আসানসোলের ঘটনা থেকে তার কিছুটা দেশবাসী আন্দাজ করে নিতে পারবেন। এর জন্য দায়ী কে? তদন্তকারী পুলিশবাহিনীই তার জবাব দিয়েছে। তাদের মতে, আসানসোলে খাদ্যাভাবের কোন সঙ্গত কারণ নেই। জেলা শাসকদেরও একথা অজানা নয়। যে-কাজটা কলকাতা থেকে পুলিশ পাঠিয়ে করতে হল সে-কাজ তাঁরাই করতে পারতেন। ধান আটকের অভিযানে জেলা শাসকের কেরামতীর কথা আমরা ভুলি নি। ছোট চাষীদের কাছ থেকে তখন অভিযোগ উঠেছিল বীজ ধান আটকের। জেলা শাসক যথাসময়ে কর্তব্য পালন করলে লক্ষ লক্ষ টাকার চাল, ডাল, গম ও আটা চোরাকারবারী ও মুনাফা-বাজদের গুদামে পড়ে থাকা সত্ত্বেও শিল্পাঞ্চলের মানুষকে এই নিদারুণ খাদ্যসঙ্কটের মধ্যে পড়তে হতো না। কয়লাখনি এলাকার চান্দাগ্রামের হাটও সম্ভবত লুঠ হতো না।

* * *

কালনার অসমাপ্ত রবীন্দ্র সদন নাকি এখন নিশাচরদের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। মাস ছয়েক আগে ভবনটির পশ্চিম দিকের দেওয়াল ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে একটি গোপন পথ। এই পথেই চলেছে নৈশ অভিযান। কর্তৃপক্ষ নীরব। মেরামতের কোন ব্যবস্থা একমাসের মধ্যে হয় নি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্মৃতিজড়িত ভবনের এ দুরবস্থা জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক।

কালনা শহর ও পল্লী অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল রবীন্দ্র-ভাণ্ডারে। এ-পর্যন্ত এ টাকার হিসাব-পত্রও সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা হয় নি। কথা ছিল, রবীন্দ্র সদনে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি পাঠাগার, রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ দানের জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে।

উদয়শঙ্কর ও অমলাশঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্য-নাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্র-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য। শহরময় এখন অভিযোগ উঠেছে, সে অনুষ্ঠানের তিনটি বিল বইয়ের হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। হাজার হাজার টাকার হিসেবও মিলছে না। এর কোন প্রতিবাদও হচ্ছে না কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের তরফ থেকে।

নদীয়া:

চোরাকারবার প্রতিরোধের জন্য নদীয়া সীমান্তে এখনও সান্ধ্য আইন বলবৎ রয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের কষ্টটাই শুধু বেড়েছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। চোরাকারবারীদের অবাধ বাণিজ্য চলেছে। ওপার থেকে আসছে সোনা, ওভালটিন, গুঁড়া দুধ, শিশু-খাদ্য, ঘড়ি প্রভৃতি বিদেশী মাল। এপার থেকে যাচ্ছে লঙ্কা, জিরে, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা ও সূতীবস্ত্র। চাল, ডালও পাচার হচ্ছে অল্প পরিমাণে।

পাকিস্তানের রাজাপুর সীমান্ত অতিক্রম করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সম্প্রতি একদল চোরাকারবারী প্রবেশ করেছিল মাটিয়ারী গ্রামে। পুলিশের

সামনা-সামনি পড়তেই মাল ফেলে দিয়ে তারা সরে পড়েছে।

এমনি ঘটনা হামেশাই ঘটছে। মাঝে মাঝে চোরাই মাল উদ্ধারের সংবাদও পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবেশিত হচ্ছে ফলাও করে। আসল কাজ কিছুই হচ্ছে না। চোরা-কারবার বন্ধ হচ্ছে না। কেউ কেউ বলছেন, সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। সীমান্ত-পুলিশের সকলেই সৎ হবে, এরূপ আশা আমরাও করি নে। চেষ্টা থাকলে, ওপরওয়ালারা একটু শক্ত হলে এমন অবাধে কারবার চলতে পারতো না।

* * *

নদীয়ার সর্বত্রই নাকি এবার চাষ ভাল হয়েছে। মাঠ এখন সবুজে, হরিতে ভরা। আমন ধানের চারা উঠেছে সতেজ হয়ে। আউস কিছুটা কাটা হয়েছে। বাকীটা রয়েছে মাঠ আলো করে। উৎসাহী চাষীরা আবার আউস কেটে সেই জমিতে আমন লাগাচ্ছে। খুবই আশার কথা। উপযুক্ত সরঞ্জাম ও উৎসাহ পেলে চাষীরা এ মাটিতেও সোনা ফলাতে পারবে।

* *

চাষী ন্যায্য মূল্য না পেলে উৎসাহটাও যায় তার কমে। আমাদের সরকার বাহাদুর ধান কিনবেন বলে শুনেছিল চাষীরা। আশা ছিল—সরকারের ভাণ্ডার থেকে ন্যায্য মূল্যই মিলবে। সরকারের ধান ক্রয়ের কোন উদ্যোগই এখনও দেখা যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে দশ টাকা মণ দরে চাষীকে বেচতে হচ্ছে নতুন আউস ধান। বাজারে আউসের চালও উঠেছে। দাম তার প্রতি কে-জি ৮২ পয়সা।

২৪ পরগণা ঃ

সুন্দরবনের দক্ষিণাঞ্চলের দুরবস্থার সংবাদ আমরা আগেও দিয়েছি। এ-অঞ্চলে প্রতি বছরই খাদ্যাভাব দেখা দিয়ে থাকে। অভাব-অনটন থেকে মানুষকে কিছুটা রেহাই দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা ছিল খয়রাতি সাহায্যের। গড়ে শতকরা পনের জনকে প্রায় চারমাস এ-সাহায্য দেওয়া হত। সরকারী যন্ত্রের এমনি মহিমা যে, এবার তা একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে হাহাকার পড়ে গেছে দরিদ্র পরিবারগুলোতে। অর্ধাহারে এবং শাকসব্জী সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে অনেক পরিবারকে।

পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, কুল্পী, কাকদ্বীপ ও সাগরের বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের রেশন দোকানও পর্যাপ্ত নয়। সেখানে সামান্য যা মেলে তাই এখন একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছে। তাও সব সময় সরবরাহ ঠিক না থাকায় মানুষকে অশেষ হয়রানি ভোগ করতে হচ্ছে।

জলপাইগুড়ি ঃ

ঘরের ছেলে ক'দিনের জন্য ঘরে ফিরেছিলেন। আমাদের পূর্তমন্ত্রী

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এসেছিলেন জলপাইগুড়ি শহরে। তবে, এবারে আর স্বগৃহে না উঠে সার্কিট হাউসে উঠেছিলেন। নিজের বাড়িতে ওঠার বিপদ আছে। আরেকবার এসে সেই ঝামেলা তাঁকে পোহাতে হয়েছিল। নিজ বাসভূমে তিনি ঘেরাও হয়েছিলেন। শহরের বিক্ষুব্ধ মানুষ সেদিন দাবী তুলেছিল খাদ্য সরবরাহের। অসংখ্য মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠের অনেক উক্তিই সেদিন তাঁকে ধৈর্যসহকারে হজম করতে হয়েছিল।

খাদ্য-পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। এবারে তিনি এসেই শরণ নিয়েছিলেন জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীধীরেন মৈত্র মশায়ের। শ্রীমৈত্র মশায় জেলা বোর্ডের আফিসে ব্যবস্থা করেছিলেন একটি ছোট্ট সভার। আমন্ত্রিত হয়েছিলেন জিতেন গুহ, মুকুলেশ সান্যাল, চারুচন্দ্র সান্যাল, পরেশ ভৌমিক, নিখিল ঘটক, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আলোচনা হয়েছে জলপাইগুড়ির ভয়াবহ খাদ্য-পরিস্থিতি নিয়ে।

সুখের কথা, পূর্তমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে গেছেন, পূজা পর্যন্ত কোন লোকেরই খাওয়ার অভাব ঘটবে না। নতুন দোকান খোলা হবে। কাউকে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোকানে ধর্ণা দিতে হবে না।

এ-সভা হয়েছিল মাসের প্রথম দিনটিতে। তিন সপ্তাহ হতে চললো, কোন নতুন দোকান জলপাইগুড়ি শহরে এখনও খোলা হয় নি। পূজার বাকী আর মাত্র তিনটি সপ্তাহ। এ-সময়টা কেটে গেল অবশ্যি আর শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য থাকবে না।

শ্রীদাশগুপ্ত আরও মজার কথা শুনিয়ে গেছেন। সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, মজুতদার ও মুনাফাখোর পাইকারদের কেন ধরা হয় না? খগেনবাবু নাকি উত্তরে বলেছেন—পুলিশের বড় অভাব। একথা সত্য হলে, মন্ত্রী মশায়ের তারিফ করতেই হবে। ধান ভানতে শিবের গীত না গাইতে পারলে নাকি আগেরকার দিনে রাজ-রাজড়াদের মন্ত্রী হওয়া যেতো না। আমাদের পূর্ত-মন্ত্রী অন্তত সে ঐতিহ্যটা বজায় রেখেছেন। এরপর তাঁর নিজের শহরের মানুষদের খাদ্যাভাবের কথা বেমালুম ভুলে যাওয়া উচিত, কি না বলা কঠিন। তবে, বগল বাজিয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের মহিমা কেউ প্রচার করলে আমরা বিস্মিত হবো না।

পাঠক মন

প্রথম প্রকাশকাল থেকেই আমি আপনার পত্রিকার একজন আগ্রহী পাঠক। তাই 'পাঠকমন'-এর তাগিদে নিজের মতামত জানানো কর্তব্য মনে করে যৎকিঞ্চিৎ লিখে পাঠালাম। উপযুক্ত বিবেচনান্তে প্রকাশ করলে বাধিত হব।

সংস্কৃতি-রসপিপাসু শিক্ষিত বাঙালীর মনের খোরাক যোগাবার মত পত্র-পত্রিকার অভাব আমাদের দেশে নেই। তবু স্বীকার করতেই হবে কোন একটিমাত্র পত্রিকাই সম্পূর্ণভাবে সেই খোরাক যোগান দিতে পারে নি। কেউ বা পুষ্ট করেছে সাহিত্যরস, আবার কেউ মিটিয়েছে সংবাদপিপাসা। কিন্তু পত্রিকার উচ্চমূল্যের জন্য সেই রস বা পিপাসাও অনেক সময় অতৃপ্ত থেকে গিয়েছে। কেন না আমাদের উপার্জনের সবটুকুই নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে দুর্নীতির একনিষ্ঠ সাধক চাল-তেল-চিনি-মাছ-নুনের কারবারীরা। তাই কপর্দকহীন অথচ শিক্ষিত রুচিবান বাঙালীর সংস্কৃতিরসতৃষ্ণা পুষ্টির অভাবে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে বসেছিল। এমন সময় 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রকাশ সাধারণ বাঙালীর কাছে বাস্তবিকই একটা আশীর্বাদের মত। নামমাত্র মূল্যে সংক্ষিপ্ত অথচ অভিনব পন্থায় সচিত্র সংবাদ এবং তৎসহ সাহিত্য পরিবেশন করে পত্রিকাটি বহুদিনের একটি জরুরী চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়েছে। মনে হয়, এটাই এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। 'আন্তর্জাতিক', 'ভারত-দর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী', 'রঙ্গমঞ্চ ওদেশে ও এদেশে', 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর', 'আজকের মানুষ', শীর্ষক বিভাগগুলি রুচিবান ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই পারে না। এমন নির্ভীক, সময়োপযোগী, বলিষ্ঠ এবং চেতনাসঞ্চারী সম্পাদকীয়ও পত্রিকাটির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। তবুও সত্যের খাতিরে কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ না করলেই নয়।

প্রথমত মুদ্রণ ত্রুটি। ছবির মুদ্রণে ইদানীং কিছু উন্নতি হলেও লেখার ত্রুটি আগের মতই থেকে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত সাহিত্য বিভাগের দুর্বলতা। অধিক সংখ্যক ধারাবাহিক উপন্যাসই এর কারণ। ধারাবাহিক উপন্যাসের সংখ্যা কমিয়ে আরও গল্প এবং দেশের অগ্রণী চিন্তানায়কদের বাস্তবভিত্তিক প্রবন্ধের প্রকাশ খুবই বাঞ্ছনীয়। সম্ভব হলে প্রতি সপ্তাহেই একটি করে ভারতের বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত গল্প ও কবিতা প্রকাশ করলে খুব ভালো হয়। কারণ, বহির্বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা সাধারণ বাঙালীরা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ।

পরিশেষে সম্পাদিকা মহোদয়ার নিপুণ সম্পাদনার প্রশংসা করি। তাঁর সুসম্পাদনায় পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

কৃপাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
লক্ষ্মণপাড়া, কালনা, জেলা—বর্ধমান।

* * *

আপনার সুসম্পাদনায় সাপ্তাহিক বসুমতী দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে—পাঠকমন পড়লে তা বুঝতে পারা যায়। আমিও সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না লিখে পারলাম না।

পেশায় আমি প্রাথমিক শিক্ষক, কিন্তু নেশা আমার বই পড়া। তবে আজে বাজে ডিটেক্টিভ বই—বা সস্তা প্রেমের উপন্যাস, আমার কোন কালেই ভাল লাগে না। ঐতিহাসিক উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, দেশ-বিদেশের গল্প এগুলি পড়তে আমার ভাল লাগে। কিন্তু সহায়-সম্বলহীন, বিষয়-সম্পত্তিহীন দরিদ্র শিক্ষকের ভাল ভাল বই কিনে পড়া সম্ভব নয়। অনেকদিন থেকে 'কলকাতার ইতিহাস' পড়বার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অর্থাভাবে সে আশা সফল হয় নি।

সাপ্তাহিক বসুমতীর কল্যাণে বহুদিনের সে আশা পূর্ণ হয়েছে। 'শহর কলকাতা' প্রবন্ধে শ্রীপদাতিক লিখে যাচ্ছেন কলকাতার ইতিহাস, যা পড়ে মনে হয় অন্য কোন কলকাতার ইতিহাস এত ভাল হ'তে পারে না। পুরনো কলকাতার কথা পড়তে পড়তে মনটা সেই সুদূর অতীতে চলে যায়—তার সুন্দর বর্ণনার গুণে দৃশ্যগুলো যেন চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

শ্রীসুশীল রায় লিখিত 'অনল-আয়তী'র তুলনা হয় না। এমন সুন্দর ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ উপন্যাস বহুদিন পড়ি নি। সার্থক তাঁর লেখা। কিন্তু হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায়—মনে হয় যেন শ্রীরায়ের আর একটু লেখা উচিত ছিল এবং আমরা আরও তৃপ্তি পেতাম। এই ধরণের উপন্যাস লিখছেন বর্তমানে শ্রীমহাশ্বেতা ভট্টাচার্য—'আঁধারমাণিক'। ভাল লাগছে।

'কৃষ্ণচূড়া' উপন্যাসে কোন নূতনত্ব পেলাম না। প্রতি সংখ্যায় কোন রহস্য-গল্প না দিয়ে কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিলে ভাল হয়। আজকের দিনে চাল, তেল, চিনি, মাছ, তরিতরকারী পাওয়াটাই রহস্য। এর বেশি রহস্য আর কি আছে?

এককথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, মাত্র ২৫ পয়সায় আমরা এমন একখানি পত্রিকা পাচ্ছি, যার তুলনা মেলে না। ধনপতি সওদাগরের 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল', শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের 'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী' প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে বহু ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়।

শ্রীকাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায়
বিজুর (বর্ধমান)

রঙ্গজগৎ

● 'দুই পর্বে' কালী ব্যানার্জী

চিত্রতারকাদের খেলা অভিনয়

চিত্রতারকা বনাম প্রধান খেলোয়াড়দের এক চ্যারিটি খেলা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য সাধু—নেহরু স্মৃতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ। এরূপ খেলায় দর্শক সমাগম বেশ ভাল হয়, অনেক সময় টিকিট পাওয়া যায় না। যাঁরা টিকিট কেনেন তাঁরা খেলা দেখা অপেক্ষা তারকাদের দেখা এবং তাঁদের নানা অঙ্গভঙ্গীতে কৌতুক উপভোগ করতে বেশি উৎসাহী। এবার একটা ব্যাপারে দর্শকরা হতাশ হয়েছেন—অভিনেত্রীরা অন্যান্যবারের মত মার্চপাস্ট করেন নি।

ইতিপূর্বে বোম্বাই ও নানাস্থানে নামকরা অভিনেত্রীরা তো ক্রিকেটের ব্যাট ধরেও মাঠে দাঁড়িয়েছেন। আর তাই দেখার জন্য লোকের কি ভিড়। একটা সৎ-উদ্দেশ্য সামনে রেখে এই ধরণের তামাসা সকলে পছন্দ করেন না। এ নিয়ে লেখালেখিও কম হয় নি। কিন্তু সে লেখালেখির তোয়াক্কা কে রাখে? যাঁরা এ ধরণের খেলার নামে তামাসা সংগঠন করেন, আর যাঁরা এরূপ তামাসার টিকিট পাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠেন, এই দু-দল মানুষের মানসিক গঠন প্রায় একরকম।

খেলার নামে এরূপ তামাসা না হওয়া ভাল। খেলাকে তামাসার পর্যায়ে টেনে নামালে ক্রীড়াজগতে এবং মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া খুব শুভ হয় না। খেলা দেখিয়ে যদি অর্থ সংগ্রহ করতে হয় তবে সত্যিকার খেলা হওয়া প্রয়োজন, যা দেখে ক্রীড়ামোদীরা আনন্দ ও উৎসাহ পাবে। খেলার মাঠ খেলার অভিনয়-ক্ষেত্র হওয়া উচিত নয়।

চিত্রতারকারা যদি নেহরু ফাণ্ড সংগ্রহের জন্য সত্যিই উৎসাহী হয়ে থাকেন এবং ফাণ্ড সংগ্রহের উদ্যোক্তারা যদি তারকাদের দিয়ে ফাণ্ড তুলতে চান, তবে যার জন্য তারকারা জনপ্রিয়—তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতার ব্যবহার করেই তা হওয়া উচিত। উত্তমকুমারকে মানুষ ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে বা মীনা-কুমারীকে কেউ ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে চায় না, তাঁদের অভিনয়ের জন্যই পছন্দ করে। সেরূপ ভানু ব্যানার্জীকে কৌতুক খেলোয়াড় অপেক্ষা কৌতুক-শিল্পী হিসাবে লোকে চায়। সুতরাং সিনেমার শিল্পীরা মাঠে নেমে ক্যারিকেচার না করে তাঁদের নিজস্ব প্রতিভা ও ক্ষমতা নিয়ে যদি পাড়ায় পাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন তবে টিকিট কিনে দর্শক সমাগম খেলার মাঠের থেকে কম হবে না। এরূপ অনুষ্ঠানে নেহরু ফাণ্ডের জন্য টাকা যেমন বেশি উঠবে তেমনি তাঁদের প্রতিভারও সু-ব্যবহার হবে। তাঁদের গান, আবৃত্তি ও নৃত্যে তারকা-অনুরক্তরা সত্যিই খুশি হবেন। ময়ূরপুচ্ছধারী কাক অপেক্ষা সত্যিকার ময়ূর সবার আদরণীয়।

—সুজন

চিত্র আলোচনা

মরুতৃষা

(কালিকা চিত্রম : সুরেশ রায়)

'মরুতৃষা' ছবির নির্মাণপর্ব সুরু হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগে। প্রতি বছর বহু ছবির যেভাবে স্টুডিওর সূতিকাগারে মৃত্যু হয়, এই ছবিটিও প্রায় সে পথে গিয়েছিল। কিন্তু নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত যে ছবিটির নির্মাণপর্ব সমাপ্ত হয়েছে, এবং মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে তার জন্য প্রযোজকদের অধ্যবসায় প্রশংসনীয়। এই অধ্যবসায়ের ফলে হাজার হাজার টাকা অপচয় থেকে রক্ষা পেল, লগ্নিদাররা অন্তত একটা অংশ ফিরে পাবার আশা করতে পারেন। তাই ছবিটির মুক্তিলাভে আমরা আনন্দিত।

প্রণয় ও অপরাধ-কাহিনীর মিশ্রণে চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। সুতরাং তিনটি নারীর ভালবাসার সঙ্গে রিভলবার, গুণ্ডা, মদ ও বাইজী ইত্যাদিতে ছবিকে সরস করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রের একজন শিল্পী, আর একজন শিল্পপতি। শিল্পপতি যাকে ভালবাসে সে পতিতার মেয়ে। সে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে শিল্পপতির সামাজিক মর্যাদার কথা ভেবে। এক শঠের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে শিল্পীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই নিয়ে শিল্পীর প্রেমিকার সাথে ভুল বোঝাবুঝি হয়। শেষ পর্যন্ত সব সন্দেহের নিরসন ও প্রেমিক-প্রেমিকাদের মিলন ঘটে। কিন্তু এই মিলনের মাশুল দিতে হয় আর এক নিরপরাধ তরুণীকে, গুণ্ডাদের গুলীতে।

এই গতানুগতিক কাহিনীর ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে দেখা গেছে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সবিতা বসু, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ ও নীতিশ মজুমদারকে। এদের সঙ্গে বাইজী সেজেছেন জয়শ্রী সেন, শিল্পপতি ও প্রেমিকাদের পিতা সেজেছেন বিপিন গুপ্ত.

● 'দুই পর্বে'র নায়িকা জ্যোৎস্না বিশ্বাস

দুটি কৌতুকরস চরিত্রে আছেন জহর রায় ও তুলসী চক্রবর্তী এবং দুই বাড়ির দুই চাকরের চরিত্রে মণি শ্রীমানি ও পঞ্চানন ভট্টাচার্য। চিত্রনাট্যের দোষে চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হয়ে ওঠবার সুযোগ পায় নি।

ছবিটিতে ছটি গান আছে। কালোবরণ পরিচালিত গানগুলি সুগীত, এবং শান্তি দাশগুপ্তার গীত রচনা প্রশংসনীয়। বাস্তবিক পক্ষে ছবিটির একমাত্র উপভোগ্য দিক গানের অংশ। তবে এই গানগুলি যথাযথভাবে প্রযুক্ত নয়।

ডাঃ এস সি রায় অর্থাৎ সুরেশ রায় একাধারে ছবির প্রযোজনা, চিত্র-নাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। চিত্র নির্মাণের ব্যাপারটাকে যাঁরা খেলা-খেলা মনে করেন ছবিটি দেখে মনে হয় ডাঃ রায় তাঁদের একজন। চিত্র নির্মাণে যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, শিল্পবোধ ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন আছে সে কথা যাঁরা জানেন না তাঁদের খেয়ালে কিছু পরিমাণ অর্থ নষ্ট হয়, সত্যিকার চলচ্চিত্র নির্মিত হয় না। আলোচ্য ছবিটিতে চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ পর্যন্ত অনুসরণ করা হয় নি; এ কারণে হয়ে উঠেছে মঞ্চের চিত্ররূপ। ছবির শেষে বালিয়াড়ীতে লেখা মরুতৃষা পর্দায় দেখা যাওয়া ত্রিশ দশকে চললেও বর্তমান সময়ে হাস্যকর ব্যাপার।

আই মিলন কী বেলা

(ফিল্মযুগ : মোহনকুমার)

যাঁরা নাচ-গানে ভরপুর প্রণয় কাহিনীচিত্র পছন্দ করেন, অথবা মেলোড্রামাটিক ছবির সমর্থক তাঁদের জন্য 'আই মিলন কী বেলা' এক পরম আকর্ষণীয় ছবি। ইস্টম্যান বর্ণে রঞ্জিত এই ছবির সবচেয়ে বড় প্রশংসার কথা রঙের ব্যবহার ও তার পরিস্ফুটন এত সুন্দর ও সার্থকভাবে আর কোন ভারতীয় ছবিতে দেখেছি মনে হয় না। তার সঙ্গে রয়েছে বিচিত্র সুরের, সুরেলা কণ্ঠের উপভোগ্য বহু গান। নাচগুলিও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সায়রাবানুর একটি একক নৃত্য, আর একটি বহুজনের মিলিত নৃত্য পরম উপভোগ্য। নৃত্য পরিকল্পনা শিল্পী এ-দুটি নাচের পরিকল্পনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। চিত্র গ্রহণ নৈপুণ্য ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

কাহিনী গড়ে উঠেছে কৃষকদের এক কো-অপারেটিভ কলোনীতে। জমিদার চৌধুরী সাহেবের সমবায় কৃষিক্ষেত্র গড়ার সহায়ক শ্যামের সঙ্গে তাঁর কন্যা বরখার প্রণয় গড়ে ওঠে। সে প্রণয় যখন রঙে রঙে ভরে উঠেছে এমন সময় এলো রণজিৎ—কৃষিক্ষেত্রের ম্যানেজার হয়ে। রণজিতের সঙ্গেও শ্যামের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হল না; বিশেষ করে রণজিৎ সব মানুষকে একভাবে ভাবে। কিন্তু অচিরে মনোমালিন্য দেখা দিল বরখাকে নিয়ে। বরখা শ্যামের হবে—তা রণজিৎ সহ্য করতে না পেরে ওর বিরুদ্ধে কুটিল চক্রান্ত জাল ফেললো। এদিকে চৌধুরী সাহেবকে বাঘে খেয়েছে; সুতরাং রণজিৎ এখন সর্বেসর্বা। রণজিতের সহায়ক হলো এক অসচ্চরিত্রের লোক এবং এক বিভ্রান্তা তরুণী। সচ্চরিত্রের শ্যামের ওপর দুশ্চরিত্রের কলঙ্ক চাপানো হলো। শ্যামকে কয়েদ করে রণজিৎ যখন বরখাকে বিয়ে করতে বসেছে; সেই বিয়ের উৎসবে সেই বিভ্রান্তা নারী সমস্ত চক্রান্ত প্রকাশ করে দিল। বরখাকে নিয়ে পলায়নপর রণজিতের পেছনে শ্যাম ধাওয়া করে। জীপের সঙ্গে ঘোড়ার সে-কি দৌড়-পাল্লা! শ্যাম ও রণজিৎ দুজনে প্রচণ্ড মারামারিতে যখন ক্লান্তিতে ভেঙে

● 'মরুতৃষা' ছবিতে তপতী ঘোষ ও সবিতা বসু

পড়েছে, এমন সময় সদলে শ্যামের মা এসে জানালো—ওরা দুজনে আসলে যমজ ভাই। এতদিন সেকথা বিশেষ কারণে গোপন ছিল। সে কারণ অবশ্য দর্শকরা ছবির সুরুতেই জেনেছে।

সুতরাং কাহিনী অংশ হিন্দী ছবিজগতের গতানুগতিক ধারায় এবং কয়েকটি টিকিটঘর সফল ছবির ছাপ নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। শেষাংশের ঘটনা যুক্তি ও সামঞ্জস্যের দিক থেকে বিশ্বাস্য নয়। শ্যামকে ও বিভ্রান্তা নারীকে একঘরে কয়েদ করা, পুলিশে না দিয়ে অন্যত্র আটক করা, বিবাহ-বাসর থেকে বরযাত্রীর মত শিক্ষিতা মেয়েকে টানতে টানতে রণজিতের পলায়ন ইত্যাদি বর্তমান যুগের আর অতীতের সামন্তযুগীয় চিন্তার এক অপূর্ব (!) মিলন। এরূপ চিন্তা একমাত্র হিন্দী ছবিতেই সম্ভব। এত অবাস্তব ঘটনা ও মেলোড্রামার মধ্যেও পরিচালক জমিদারের অধীনে থেকে সমবায় গঠন করলে কৃষকদের জীবন যে কত সুখের হবে তার এক অতি কাল্পনিক চিত্র এঁকে প্রচারের সুযোগ ছাড়েন নি।

অভিনয়ে রাজেন্দ্রকুমার দিলীপ-কুমারের অনুকরণে, এমন কি গলার স্বর পর্যন্ত নকল করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে ধর্মেন্দ্র, সায়রাবানু, শশিকলা, সুলোচনা প্রমুখ এবং নাজির হোসেন উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শচীন ভৌমিক। সঙ্গীত পরিচালনা—শঙ্কর জয়কিষেণ এবং চিত্রগ্রহণ—ভি বাবাসাহেব।

লেঁ বাস-ফণ্ডস

কির 'লোয়ার ডেপথ'-এর ফরাসী চিত্ররূপ

ফ্রান্সের চিত্রপরিচালক জঁা রেনোয়া চলচ্চিত্র জগতের পুরোধা, স্রষ্টা ও চিন্তানায়কদের অন্যতম। নির্বাক-যুগের শেষপর্বে এবং সবাকযুগে তাঁর অসাধারণ সৃষ্টিক্ষমতায় চলচ্চিত্র দর্শকরা মুগ্ধ। পৃথিবীর সকল দেশে রেনোয়ার ছবি অভিনন্দিত। রেনোয়ার ওপর চার্লি চ্যাপলিনের প্রভাব যে যথেষ্ট তা আমরা পূর্বের ছবিগুলিতে যেমন দেখেছি আলোচ্য ছবিতেও তাই দেখলাম; বিশেষ করে অভিনয়-রীতিতে।

কির 'লোয়ার ডেপথ' বা নীচের মহল নিপীড়িত মানবাত্মার এক অপূর্ব নিদর্শন। রেনোয়ার মত শক্তিশালী পরিচালকের হাতে 'লোয়ার ডেপথ' অসাধারণ শিল্পসুষমায় একক ও সমষ্টিগতভাবে নীচের মহলের এক নিখুঁত চিত্র উপস্থিত করেছে। যেখানে মানুষ অবয়বে হলেও দারিদ্র্যের পীড়নে জীবন যাপন ও যন্ত্রণায় মানবসত্তার বাইরে নেমে এসেছে। শোষণ যেখানে হৃদয়ানুভূতিকে শক্ত করে দিয়েছে সেখানেও এককভাবে মানুষের মধ্যে মহত্বের, প্রেম ও প্রীতির প্রকাশ ঘটে। এত নরকযন্ত্রণার মধ্যে মানুষ পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াতে চায়। এখানে যেমন হতাশা ও আত্মহত্যা আছে, স্ফুলিংগের মত বাঁচার চিন্তা ও বিদ্রোহের শিখা জ্বলে ওঠে। এখানে আমরা দেখলাম পেপেলের মত চরিত্র, নাটাশার মত মেয়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার এক নির্মমচিত্র ধ্বংসোন্মুখ অভিজাত, এবং তার সাথে ঘটনাক্রমে পেপেলের সাক্ষাৎ। দুই-মহলের দুই চিন্তাধারার মুখোমুখি হওয়া। অসাধারণ শেষের দৃশ্যটি—যখন পেপেল জেল থেকে বেরিয়ে এল, তার জন্য জেলের সামনের পথে অপেক্ষা করছে নাটাশা। দু'জনে পথ ধরে, অনেক পথ-খামার অতিক্রম করে এগুতে লাগলো: তারা তখন কাউকে ভয় করে না, না সমাজকে, না পুলিশকে, নতুন জীবনের পথে ওরা অভিযাত্রী।

এই শেষ দৃশ্যটিতে যেমন আমাদের চার্লির 'মডার্ন টাইমস'-এর কথা মনে হয়েছে, তেমনি মনে পড়েছে নায়িকা পলেট গডার্ডকে নাটাশার চরিত্রে জুনী এস্টরের অভিনয়ে। রেনোয়া সেভাবেই নির্দেশ দান করেছেন।

ছবিটির সংলাপ ফরাসী ভাষায়। যদিও ছবি বুঝতে অসুবিধা হয় না, তবুও সংলাপের মাধুর্য উপভোগ করতে না পারার দুঃখ কম নয়। ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার সদস্যদের জন্য সম্প্রতি ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে।

নাটকের কথা

সোমপুরা থেকে শোণপুর

(নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি নাটক)

থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে একটি নতুন নাটক দেখলাম—'সোমপুরা থেকে শোণপুর।' যে অর্থে সাধারণত আমরা নতুনত্বের জন্য প্রশংসা করি অথবা প্রগতিশীল ভাবধারার জন্য অভিনন্দন জানাই; এই নাটক সেই গতানুগতিকতার গণ্ডি অতিক্রম করেছে। যদিও প্রত্ন-তাত্ত্বিক বিষয় অবলম্বন করে নাটকীয় রস ঘনীভূত ও পরিণতিতে পৌঁছেছে; কিন্তু নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতি, অধ্যাত্মবাদ বনাম বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের ব্যাখ্যায়। নাট্যকার যথেষ্ট জোরালো ভাবে ও ভাষায়, অত্যন্ত সাহসের সাথে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। এই বক্তব্য উপস্থিত করতে

● 'সোমপুরা থেকে শোণপুর' নাটকের একটি দৃশ্যে মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুধাংশু দাশগুপ্ত।

● ভারতীর নৃত্যকলা মন্দিরের ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যের দৃশ্য।

গিয়ে তিনি একদিকে ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মুখোস খুলে দিয়েছেন, আর একদিকে বর্তমান সমাজে প্রেম ও বিবাহ-সম্পর্কিত এক নির্মম চিত্র প্রকাশ করেছেন। নাট্যকারের সত্য প্রকাশের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সাহস দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই বাস্তববাদী চিন্তাশীল নাট্যকার সুধাংশু দাশগুপ্তকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

শোণপুর গ্রামের এক মন্দির সংলগ্ন জমি বিক্রির ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাটক বিস্তার লাভ করেছে। কিংবদন্তী অনুযায়ী এই মন্দির অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ বিষ্ণু খৃস্টীয় ৯ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত, এবং পালরাজ যুগের সোমপুরাই বর্তমানের শোণপুর। ইউরোপে গিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য এই মন্দির-সহ জমি বিক্রির উদ্যোগ থেকে দুই চিন্তাধারার নাটকীয় সংঘাত সুরু হয়। এই সংঘাতের নায়ক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাসী এক সরকারী কর্মচারী সুকান্ত। যিনি তাঁরই চিন্তাধারায় শিক্ষিত করে তুলেছেন বোন শর্মিলাকে। শর্মিলা দুই সমাজচিন্তার এক সিনথিসিস; যাকে নিয়ে নাট্যরহস্য সৃষ্টি হয়েছে। আর একদিকে পুরানো চিন্তার মানুষ তাদের পিতা সুরেন্দ্রনাথ। শর্মিলার জন্মকথা জানবার পর যিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন। শেয়ার-মার্কেটের দালাল, পুত্র, পুরোহিত, ব্যবসায়ী ইত্যাদি চরিত্র নাটক গঠনের সহায়ক।

এই চরিত্রগুলিতে যাঁরা রূপদান করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী শর্মিলার চরিত্রে শ্রীমতী মণিদীপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আদর্শবাদী সরকারী কর্মচারী সুকান্তের ভূমিকায় সুধাংশু দাশগুপ্ত। দু-টি টাইপ চরিত্রে চিন্তনাথ চট্টোপাধ্যায় (গজু) এবং অমর দত্ত (গণেশ কর্মকার) প্রশংসনীয়, কিন্তু শেষোক্ত জনের অভিনয়ে কিছুটা আতিশয্য লক্ষ্য করা গেছে। মানসিক ভারসাম্যহীন সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় বিমল গুপ্তের অভিনয় প্রশংসনীয়। অধ্যাপকরূপে গৌর মুখোপাধ্যায় ও পুরোহিতের ভূমিকায় গোকুল ঘোষের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছেন সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত মুখোপাধ্যায়, রবীন পাঠক, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রণয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে অভিনন্দনীয় এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টিতে রসোত্তীর্ণ হয়েও নাটকটিতে দীর্ঘ সংলাপ স্থানে স্থানে বক্তৃতার মত শুনিয়েছে। এরূপ বাস্তবনিষ্ঠ নাটকে বক্তৃতা-প্রাধান্য নাটকের সহজ গতিকে ব্যাহত করে। শশাঙ্কের সংলাপ এবং রূপসজ্জা দুই-ই পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। পরিচালকের সতর্ক থাকা দরকার যাতে নাটকটি কোন রকমেই শিল্পবোধ ছাড়িয়ে উদ্দেশ্যমূলক হয়ে না পড়ে।

নাটকটিকে সার্থক করে তোলবার জন্য সঙ্গীত পরিচালক বেঞ্জামিন গোমেশের নেপথ্য সুরসৃষ্টি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। একটিমাত্র দৃশ্যে নাটকটি অভিনীত হয়েও সুর-বৈচিত্র্যে বিভিন্ন পরিবেশ ও মুহূর্ত নৈপুণ্যের সাথে ফুটিয়ে তুলেছে। এবং এই একটিমাত্র দৃশ্যের সজ্জা শিল্পবোধের পরিচায়ক।

‘সোমপুরা থেকে শোণপুর’ নতুনত্বে আকর্ষণীয় নাটক। আশা করি সামান্য সম্পাদনার পরে নাটকটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। জনশিক্ষার দিক থেকে নাটকটি অভিনন্দনীয়।

সংবাদবর্ণনা

আন্তর্জাতিক উৎসবে ‘কাশ্মীর কী কলি’

লেবাননের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকার ‘কাশ্মীর কী কলি’ ছবিটি পাঠাবেন স্থির করেছেন। ছবিটি নিয়ে উপস্থিত থাকবেন শক্তি সামন্ত, শাম্মী কাপুর, ও পি নায়ার। ১৪ই থেকে ২৫শে অক্টোবর এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ আটচল্লিশ ॥

আপত্তি ও সম্মতি

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) অভিনয়-জগতের একটি স্মরণীয় নাম। যে মানুষটি দিকপাল অভিনেতারূপে একদা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। শৈশবে শ্যামবাজারের জগবন্ধু মোদকের পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উঠে পড়াশোনার ইস্তফা দেন।

দানীবাবু ছিলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। গিরিশচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী প্রমোদিনীর গর্ভে দানীবাবু জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাভগিনী দক্ষিণাকালী দেবীই ছিলেন তাঁর সংসারের কর্ত্রী।

দক্ষিণাকালী অল্প বয়সে বিধবা হন। গিরিশচন্দ্রের পিতামাতার মৃত্যুর পর, দক্ষিণাকালীই গিরিশচন্দ্রকে মানুষ করেন। কাজেই তাঁর কর্তৃত্ব বা কথার ওপর কেউই কিছু বলতে পারতেন না। দানীবাবু ছিলেন দক্ষিণাকালীর অত্যন্ত আদরের। পিসির অতিরিক্ত আদরই দানীবাবুর লেখাপড়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

গিরিশচন্দ্রের অনুজ অতুলবাবু ছিলেন সুশিক্ষিত। আইনজীবী। ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেও সফল হতে পারেন নি।

এদিকে বালক দানী পাড়ার ছেলেদের নিয়ে, কাগজের সিন তৈরি করে থিয়েটার করতে সুরু করেন। গিরিশচন্দ্রের প্রথম গীতিনাট্য 'আগমনী' যখন মঞ্চস্থ হয়, দানীবাবুর বয়স তখন আট বছর মাত্র। ঐ আট বছর বয়সেই 'আগমনী'র অভিনয় দেখে দানীবাবু আকৃষ্ট হন। এবং এরপর থেকে অভিনয়ের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে।

গিরিশচন্দ্র যখন দেখলেন ছেলের লেখাপড়ায় বিশেষ মন নেই, তখন তিনি দানীবাবুকে আর্টস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু অঙ্কনবিদ্যাতেও দানীবাবুর মন বসলো না। আর্টস্কুল ছেড়ে, এখানে ওখানে এ্যামেচার থিয়েটার করতে সুরু করে দিলেন। এই সময়ে সৌখীন দলে দানীবাবুর সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করতেন, তার মধ্যে গঙ্গাধরবাবু, পরবর্তীকালে যিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে খ্যাতিলাভ করেন, তিনিও ছিলেন। 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকে রামের ভূমিকায় গঙ্গাধরবাবু আর লক্ষ্মণের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। এইভাবে এখানে ওখানে দানীবাবুর অভিনয় করার কথা গিরিশচন্দ্রের কানে যখন আসতে লাগলো, গিরিশচন্দ্র পুত্রের জন্য তখন বড়ই চিন্তিত হয় পড়লেন। গিরিশচন্দ্র পুত্রকে অভিনেতা করার মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই ব্র্যাক উড কোম্পানীতে শিক্ষানবীশরূপে তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই দানীবাবু সে কাজে ইস্তফা দেন। এই সব ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র পুত্রের ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও, বড়বোনের জন্যে মুখে কিছুই প্রকাশ করতেন না। এদিকে অভিনয়ের নেশায় দানীবাবু তখন মত্ত।

ছেলের অভিনয়ের প্রশংসা ক্রমশ গিরিশচন্দ্রের কানেও আসতে লাগলো, কিন্তু কোন গুরুত্বই আরোপ করতেন না গিরিশচন্দ্র।

একদিন দক্ষিণাকালী সরাসরি গিরিশচন্দ্রকে বলে বসলেন—দানী ত' সখের দলে ভালই অভিনয় করে, তা নে না ওকে তোদের থিয়েটারে ঢুকিয়ে।

—তোমার সব কথা রাখতে রাজী আছি দিদি, শুধু ঐ অনুরোধটা তুমি আমায় করো না।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

নটশ্রেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

—তাহলে ও কি করবে শুনি ?

—কি করবে তা আমি কি জানি। ও যা ভাল বোঝে করুক।

—কিন্তু ও যে থিয়েটারই করতে চায়।

—করুক। কিন্তু আমাদের থিয়েটারে আমি ওকে নিতে পারবো না।

—ও এখন বড় হয়েছে। অন্য থিয়েটারে কি ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত? তোর ওখানে থাকলে, তবু তোর চোখে চোখে থাকতো—

—তুমি যাই বলো, আর যাই করো, মোট কথা—বাপ হয়ে থিয়েটারে ওকে আমি কিছুতেই ঢোকাতে পারবো না।

গিরিশচন্দ্রের জেদ দেখে দক্ষিণাকালী আর কিছু বললেন না। পিসিমার কাছে সব কথা শুনে দানীবাবু দমে গেলেন। শেষে পিসিমা বলে কয়ে, সে যুগের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের কাছে তাঁকে পাঠালেন। অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। দক্ষিণাকালীর অনুরোধক্রমে একদিন অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের কাছে কথা পাড়লেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র রাজী হলেন না। শেষে অমৃতলাল নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাতেও কিছু হোল না। গিরিশচন্দ্রের সেই একই মনোভাব—বাপ হয়ে ছেলেকে এ লাইনে দেব না। অমৃতলাল কিন্তু দমবার পাত্র নন। তিনি গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে দানীবাবুকে অভিনয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

এই সময় গিরিশচন্দ্র 'চণ্ড' নাটক রচনা করেন। 'চণ্ড' নাটকে 'রঘুদেবের' ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত অভিনেতার সন্ধান করা হচ্ছিল। সুযোগ বুঝে, অমৃতলাল এই সময় গোপনে দানীবাবুকে রঘুদেবের ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য তৈরি করতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন সন্ধান করেও যখন গিরিশচন্দ্র উপযুক্ত কোন অভিনেতা পেলেন না, তখন অমৃতলাল পুনরায় দানীবাবুকে থিয়েটারে নেবার জন্য অনুরোধ করলেন এবং বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—দানীর অভিনয় আমি দেখেছি। রঘুদেবের ভূমিকায় নিশ্চয়ই ও ভাল অভিনয় করতে পারবে। এবার গিরিশচন্দ্র কোন কথা বললেন না বটে, তবে সম্মতিও জানালেন না।

পরের দিন অমৃতলাল দানীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে এলেন এবং গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে রঘুদেবের ভূমিকায় মহলা দেওয়ালেন। গিরিশচন্দ্র দেখলেন, রঘুদেব মঞ্চাবতরণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এবং সেই সঙ্গে এ কথা বুঝতেও তাঁর বাকী থাকলো না যে, অমৃত-সুহৃদ অমৃতলাল সুযোগ বুঝে তাঁকে সম্মত হতে বাধ্য করালেন।

বাংলা ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ (ইং ১৮৯০, ২৬শে জুলাই) 'চণ্ড' নাটকটি স্টার থিয়েটারে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। দানীবাবুর পেশাদারী মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'চণ্ড'।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

অভিনেত্রী বিনোদিনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাঁরই অনুরোধে বিডন স্ট্রীটে জমি ইজারা নিয়ে স্টার থিয়েটারের বাড়ি তৈরি করে গুর্মুখ রায় নতুন থিয়েটার খুললেন। গিরিশচন্দ্র হলেন নাট্যাচার্য—সঙ্গে রইলেন অমৃত বোস, অমৃত মিত্র, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি।

১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই গিরিশবাবুর 'দক্ষযজ্ঞ' নাটক দিয়ে স্টারের উদ্বোধন হোল। দক্ষের ঔদ্ধত্য, দক্ষের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং শিববিদ্বেষ অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে। অমৃত মিত্রও মহাদেবের ভূমিকায় অদ্ভুত অভিনয়ে দর্শকদের চমৎকৃত করে দিতেন। সতীর দেহত্যাগে শিবের বিলাপে সারা প্রেক্ষাগারে যেন বিদ্যুৎশিহরণ বয়ে যেত। আর বিনোদিনীর সতীর তো কথাই নেই। সতীর শিশুজনোচিত সারল্য, সতীর শিবভক্তি বিনোদিনীর চোখে, মুখে এবং বাচনভঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। মেক্ আপের ব্যাপারেও বিনোদিনী ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শোনা যায়, এই সময় প্রায়ই গিরিশবাবুর কাছে আদ্যাশক্তি কালীমূর্তির আবির্ভাব হোত। এর ফলে গিরিশবাবুর মনে এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয় যে, বছর দশেক অবধি তিনি কৃচিৎ-কদাচিৎ শুধু পুরোনো বইতে অভিনয় করতেন। নতুন নাটকে নামতেন না। পরে অবশ্য ম্যাকবেথে আবার নিয়মিতভাবে মঞ্চাভিনয় সুরু করেন। মাঝের সময়টায় নতুন নাটকে বেশির ভাগ সময় তাঁর প্রিয়শিষ্য অমৃত মিত্র নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। কিন্তু এখন থেকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র যেন নট গিরিশচন্দ্রকে পেছনে রেখে ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগলেন।

১২-৮-৮৩তে গিরিশবাবুর ধ্রুব নাটক মঞ্চস্থ হোল। ভূষণকুমারীর ধ্রুব, অমৃত মিত্তিরের উত্তানপাদ, বিনোদিনীর সুরুচি এবং অমৃত বোসের

শিলালি

বিদূষক দর্শকদের কাছে প্রচুর প্রশংসা পেল।

তারপরের নাটক নল-দময়ন্তী—১৫ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ সাল। নল এবং দময়ন্তীর ভূমিকায় যথাক্রমে অমৃত মিত্র এবং বিনোদিনী দর্শকদের মোহিত করে রাখতেন।

ক্রমশ স্টার থিয়েটার বেশ জমে উঠল। কিন্তু মুস্কিল হোল গুর্মুখ রায়কে নিয়ে। তাঁর তখন থিয়েটারের নেশা মিটে গেছে—এদিকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরাও থিয়েটারের ব্যবসায়ে যোগ দেওয়াতে তাঁর উপর বিরক্ত। আবার গুর্মুখ রায় অসুখে পড়লেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠিক হল, ১১ হাজার টাকা পেলে গুর্মুখ রায় থিয়েটার ওঁদের ছেড়ে দেবেন। তারপরেই গুর্মুখ রায়ের মৃত্যু হয়—তার আত্মীয়দের কাছ থেকে থিয়েটার কিনলেন অমৃত বসু, দাসু নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃত মিত্র। গিরিশবাবুর ইচ্ছানুসারেই এই ব্যবস্থা হোল—তিনি নিজে স্বত্বাধিকারী হলেন না, কারণ কয়েক বছর আগে ছোটভাই অতুলকৃষ্ণকে কথা দিয়েছিলেন যে, থিয়েটারের মালিক হবেন না।

এই প্রথম থিয়েটার ধনী-বিলাসী লোকের হাত থেকে মধ্যবিত্ত সত্যিকার মঞ্চ-শিল্পীদের কর্তৃত্বাধীনে এল।

১৮৮৪ সালে গিরিশচন্দ্রের কমলে কামিনী, বৃষকেতু, শ্রীবৎসচিন্তা প্রভৃতি নাটক স্টারে মঞ্চস্থ হয়। পরে বৃষকেতুর সঙ্গে আরও দুটি নাটক একসঙ্গে দেখানো হোত, গিরিশবাবুর 'হীরার ফুল' আর অমৃত বোসের 'চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে'।

এর পরের নাটক গিরিশচন্দ্রের চৈতন্যলীলা। গিরিশবাবু বলতেন—'সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুকচিত্ত বিনোদন।'

চৈতন্যলীলা সারা বাংলা দেশে ভক্তির প্লাবন এনে দিয়েছিল। ঘরে ঘরে সবাই হরিনাম গানে মেতে উঠেছিল। আজকের দিনে অবশ্য এসব ভক্তিরসমূলক নাটক মঞ্চস্থ হয় না—কারণ দর্শক বোধহয় এসব নাটক আর নিতে পারে না। এজন্য তাদের দোষ দেওয়াও যায় না।

এক সময়ে দেশের মানুষ ছিল সহজ, সরল, স্বাভাবিক। মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস, ঈশ্বরে ভক্তি এসব ছিল তাদের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এখন চারিদিকে হা অন্ন, হা অন্ন রব উঠেছে—চাল নেই, তেল নেই, পরবার কাপড়ের অভাব, বাস্তুহারাতে দেশ ভরে গেছে। বেশির ভাগ লোক বেকার—চারদিকে অসাধুতা, শাঠ্য, জোচ্চুরি—রোগীর ওষুধে পর্যন্ত ভেজাল—বাস্তবজীবনে প্রতি পদে পদে আঘাত

পেতে পেতে কোন কিছুতে কি আর সাধারণ মানুষের মনে ভক্তি বা বিশ্বাস আসতে পারে ?

'শিশির-সান্নিধ্যে' বইটিতে আছে নরনারায়ণের আলোচনা প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বলেছিলেন : 'কৃষ্ণ হস্তিনায় সন্ধির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই দ্রৌপদী ঠাট্টা করে বলছেন—ওরা তোমায় বাঁধতে এসেছিল বলে শেষ পর্যন্ত বিরাট হতে হয়েছিল। এত ভয় তোমার।

কথায় কথায় সন্ধি না হওয়ায় দ্রৌপদী নিজের আনন্দের কথা বললেন।

কৃষ্ণ তখন বলছেন যে, ধর্মরাজের সন্ধি স্থাপনের সব চেষ্টা তোমার উষ্ণ নিশ্বাসে মিলিয়ে গেল।

তারপরের এক জায়গায় পড়তে পড়তে বললেন, এই যে এখানে বলছে—

'জাতি যবে মরে অনশনে
সদা হয় নারীর লাঞ্ছনা।'

এই কথাগুলো বোধহয় আজকাল সত্য নয়। জাতি ত' অনশনে মরেছে। নারীর লাঞ্ছনা তো অহরহই ঘটছে। কিন্তু কই ভগবান তো কিছু বলেন না ?'

শিশিরবাবুর অবশ্য বাস্তববুদ্ধি একেবারেই ছিল না—মুখে ওসব কথা বললেও কাজের বেলায় সব গুলিয়ে ফেলতেন। সরকার থেকে খেতাব দিল —কোথায় আনন্দে আটখানা হয়ে উঠবেন, না হঠকারিতার চরম উদাহরণ দেখালেন সে খেতাব প্রত্যাখ্যান করে। ইলেক্‌শনের সময় সুবিধামত দল-বিশেষের প্রতিনিধিদের সভাসমিতিতে গিয়ে আবৃত্তি করবেন, বক্তৃতা দেবেন তা নয়। বাজে আদর্শবাদ ত্যাগ করতে পারলে আর শেষজীবনে অর্থাভাব ভোগ করতে হোত না। এদিক দিয়ে নবনাট্য আন্দোলনের কর্তাব্যক্তিরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান। দেশীয় এপিক জাতীয় নাটকের অভিনয়, ভক্তিমূলক নাটকের অভিনয়, আদর্শবাদ প্রচার করা বা সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক সমস্যার অবতারণা করে আজকের দিনে টাকা আসবে না। একথা তাঁরা বোঝেন। সুতরাং আগে পকেটের দিকে তাকাতে হবে, তারপর আদর্শবাদ, লোকশিক্ষা এসব বিষয়ে ভাবা যাবে। লোককে ভাল করে গরম মসলার তৈরি খাবার পরিবেশন করতে পারলেই সবাই ছুটে আসবে। ঈদিপাশ কম্‌প্লেক্সের কথা তো লোকে ছেলেবেলা থেকেই শুনছে,—সুতরাং নামাও রাজা ওয়েদিপাউস্ (ঈদিপাশ নহে)—চারদিকে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ পড়ে যাবে। আমাদের পুরোনো বন্ধু সমালোচকটি, অর্থাৎ গণপতিবাবু—কাগজে লিখবেন—ওয়েদিপাউসের অভিনয় যা দেখলাম তার সঙ্গে পাল্লা দেবার মত অভিনয় করতে বোধহয়

● মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সোফোক্লিসের সময়ের গ্রীক নটেরাও পারতেন না।

যাক সে চৈতন্যলীলার কথাতেই ফিরে আসা যাক আবার। চৈতন্যর ভূমিকায় অভিনয়ের সময় বিনোদিনীর যে সব অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা হয় সে বিষয়ে তিনি বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন। তার কিছুটা নীচে তুলে দিলাম :

'মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেন না সেই বাল্যলীলার সময়

'রাধা বই আর নাইক আমার,
রাধা বলে বাজাই বাঁশী' বলিয়া

গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম 'কি দেখ মালিনী ?' সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর-পাদপদ্ম যেন দেখিতাম। আমার মনে হইত 'ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ। উনিই তো বলিতেছেন, আমি মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সঙ্গে তর্ক করিয়া বলিতাম 'প্রভু কেবা কার। সকলই সেই কৃষ্ণ' তখন সত্যাই মনে হইত যে, 'কেবা কার।' পরে যখন উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

'গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিছে মধুপান,
কত শত কোটি অশরীরী প্রাণী।'

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহই নহি! আমাতে 'আমি' জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

'কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদ না নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণ নাহি পাবে।'

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈস্বরে কাঁদিতেন যে, আমার বুকের ভিতর গুরগুর করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে, আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্তনকালে—

'হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়
আমি ভবে একা, দেও হে দেখা
প্রাণসখা রাখ পায়।'

(ক্রমশঃ)

খেলা ধুলা

আন্তর্জাতিক টেনিস প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক খেলার খবর বলতে এখন টোকিও অলিম্পিকই বাজার গরম রেখেছে। সব রকম খেলাই প্রায় অলিম্পিকের আওতায় পড়ে, তবে ক্রিকেট আর টেনিস বাদে। ক্রিকেটের আছে দেশে দেশে টেস্ট খেলা, যার আকর্ষণ সকল দেশের ক্রীড়ামোদীদের মাতিয়ে রাখে। এই বছরের অস্ট্রেলিয়া দলের ইংলণ্ড সফর এবং টেস্ট খেলায় রাবার লাভ পাঠকদের স্মৃতিতে এখনও ম্লান হয় নি। এই ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়া দলই ভারতের সঙ্গে অক্টোবর মাসে টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হ... এবং এ সম্বন্ধে ক্রীড়ামোদীদের ... এখন থেকেই যথেষ্ট আগ্রহের ... হয়েছে।

● চা... ন্যাকনলে এবং র‍্যালস্টন

এবার টেনিসের কথায় আসা যাক। ইংলণ্ডের উইম্বলডেন প্রতি-যোগিতা ছাড়া অপেশাদারী টেনিসের আর একটি অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা আছে সেটা হচ্ছে ডেভিস কাপ। এর মর্যাদা বলতে গেলে প্রায় অলিম্পিকেরই সমতুল্য। গত ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে ডেভিস কাপ লাভ করে। এর জন্য আমেরিকাকে যে কঠোর অনুশীলন

শ্রীঅমিতাভ

ও পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তার তুলনা হয় না। আমাদের দেশের অনেক কর্মকর্তা আছেন, যাঁরা দলের ম্যানেজার হিসাবে নির্বাচিত হবার জন্যে লালায়িত—এ সম্বন্ধে তাঁদের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। এঁদের কার্যকলাপ এবং আমেরিকান টেনিস টিমের ম্যানেজার বব কেলেহারের কার্যকলাপ তুলনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বোম্বাইতে গতবার ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে খেলবার জন্য খেলার কয়েকদিন আগেই আমেরিকান দল সেখানে হোটেলে ঘাঁটি গাড়েন। ম্যানেজার হিসাবে বব কেলেহার একদিকে লক্ষ্য রাখেন যাতে খেলোয়াড়রা যথাসাধ্য অনুশীলন করে এবং তাদের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। বোম্বাইয়ে হোটেলে কেলেহার পানীয় জলের ব্যাপারে একেবারে বিশোধন ল্যাবরেটরি খুলেছিলেন। কেলেহারের এই একনিষ্ঠ সাধনা আমেরিকান দলের গতবারের বিজয়ের পশ্চাতে অনেকখানি শক্তি যুগিয়েছিল।

কিন্তু এক বছরেই চাকা ঘুরে গিয়েছে। এবার অস্ট্রেলিয়ার ম্যানেজার হ্যারি হপম্যানের পালা ডেভিস কাপ জিতে স্বদেশে ফেরার। গতবারে ডেভিস কাপ হাতছাড়া হবার পরই অস্ট্রেলিয়া তার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করতে। অস্ট্রেলিয়ার রয় এমার্সন ও ফ্রেড স্টোলে ফরেস্ট হিলের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। এ খেলাটা ডেভিস কাপের ড্রেস রিহার্সাল বলা চলে। তবে মূল খেলার যবনিকা উঠবে আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর আমেরিকার ক্লেভল্যাণ্ডে

রহবে। অসম্ভব কিছু না ঘটলে ডেভিস কাপ এবার অস্ট্রেলিয়ার।

অলিম্পিকের আধুনিক পর্বে ভারত

আধুনিক অলিম্পিকের পবিত্র অঙ্গনে ভারতের প্রথম পদক্ষেপ ১৯০৪ সালে প্যারিস অলিম্পিকে। সেদিন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র নর্মান প্রিচার্ড। প্রিচার্ড ১০০ গজের দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। শোনা যায় যে, প্রিচার্ডের সুঠাম সুগঠিত পেশীবহুল দেহ নাকি, তাঁকে সমবেত ১৫০০ এ্যাথলেটের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেহীরূপে ব্রোঞ্জ মেডেল এনে দিয়েছিল। এর পর থেকে ভারত

● মিলখা সিং

নিয়মিত এ্যাথলেটিকসে অংশগ্রহণ করে আসছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, এত দীর্ঘদিন ভারত অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আজ পর্যন্ত এ্যাথলেটিকসে কোন পদকই লাভ করতে পারে নি। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ৪০০ মিটারে ভারতের স্বর্ণস্বপ্ন উড়ন্ত শিখ মিলখা সিং ফাইন্যালে উন্নীত হয়েও, শেষে চতুর্থ স্থান পেলেন। শুধুমাত্র সান্ত্বনা যে, তিনিও সেবার অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডাম অলিম্পিকে প্রথম আবির্ভাবেই ভারত হকিতে উড়িয়েছে তার বিজয়-পতাকা। দীর্ঘ ৩২ বছর পর ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারতের হকির একচ্ছত্র প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হল, নেমে গেল হকির বিজয়-পতাকা।

প্রতিবারের মত এবারও ভারতের একটি অলিম্পিক দল টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করবে। ভারত এবার এ্যাথলেটিকসে, হকিতে মুষ্টিযুদ্ধে, কুস্তিতে, সাইক্লিংয়ে, ডাইভিংয়ে, ভারোত্তোলনে, সুটিং-এ এবং জিমনাস্টিকে অংশগ্রহণ করবে।

প্রথমে হকির কথা দিয়েই সুরু করছি। অজস্র অর্থব্যয় এবং ট্রেনিং ক্যাম্পের পর চূড়ান্ত হকি দল মনোনীত হয়েছে। ভারতের খেলার মধ্যে লকড়ি-বাজী এবং অযথা বলপ্রয়োগের ছাপ নেই; স্টিকের নিপুণ কলাকৌশল ভারতীয় খেলোয়াড়দের যথেষ্ট রপ্ত আছে। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াধারার পরিবর্তন হয়েছে। নিউজিল্যাণ্ড, পাকিস্তান, জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি দেশ দৈহিক শক্তিকেই খেলার মধ্যে প্রাধান্য দিচ্ছে। এখন হকিতে জোর যার মুলুক তার অবস্থা। বিপক্ষের লকড়িবাজীর উত্তরে ভারত যদি এখন আইনসম্মত উপায়ে এক ঘায়ের বদলে দু ঘা দিতে পারে তবেই হকির হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এ্যাথলেটদের সম্বন্ধে কিই বা বলব; আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় ভারতের মান এতই নিম্নে যে, এ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করাই বৃথা। দু একজন এ্যাথলেট অবশ্য উল্লেখের দাবী রাখেন, তাঁরা হলেন মিলখা সিং এবং মাখন সিং। ভারতের যা কিছু ক্ষুদ্র আশা এই দুজন এ্যাথলেটকে কেন্দ্র করে। মহিলাদের মধ্যে স্টিফ ডি সুজা এবং ডিনা শ্যাম ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন টোকিওতে। মুষ্টিযুদ্ধে লাইট ওয়েটে পদম বাহাদুর মল্লের কোন সম্মান পাবার খুবই সম্ভাবনা আছে। ভারোত্তোলনে ভারতের লক্ষ্মীকান্ত দাস টোকিওর আসরে কোন স্থান পেলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, কারণ আন্তর্জাতিক মানের বিচারে লক্ষ্মীকান্ত দাসের স্থান উচুর দিকেই। কুস্তি দলের মধ্যে থেকে ভারতের পক্ষে পদক লাভ করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অন্যান্য বিষয়ে কোনরূপ আশার কথা চিন্তাই করা চলে না। ভারত শুধু মনে রাখুক পণ্ডিতজীর সেই অমর বাণী 'খেলার জন্যই খেলা,' পুরস্কার পাওয়াটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হল খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে অংশগ্রহণ করা।

সমাচার দর্পণ

আজাদ হিন্দ বাগে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সন্তরণ প্রতিযোগিতা শেষ হল।

● অপু [illegible]

১২ বছরের বালিকা অপু ব্যানার্জীর উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য ছিল এবারের অন্যতম আকর্ষণ।

* * *

লিটল ডুরাণ্ড বা সুব্রত মুখার্জী কাপ স্কুল দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক রাজ্যের সেরা স্কুল দল দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এবার পশ্চিম বাংলার পক্ষে অংশগ্রহণ করবে গতবারের লিটল ডুরাণ্ড-বিজয়ী বাটানগর স্কুল এবং এবার বাংলা স্কুল চ্যাম্পিয়ান নদীয়ার বড় জাগুলিয়া স্কুল।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাস্থ্য গঠনে একান্ত প্রয়োজন

আপনি কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করেন…কাজে উৎসাহ পান না
অথবা সর্দি কাশিতে ভুগছেন…হয়ত খিদে হয়না,
যা খান তা হজমও হয়না।

তা' হলে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খেলে
আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।

মৃতসঞ্জীবনী
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ণ শাঃ-এর ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাপ্তাহিক বসুমতী

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।

৯ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 1st October, 1964 • Vol. 69, No. 1

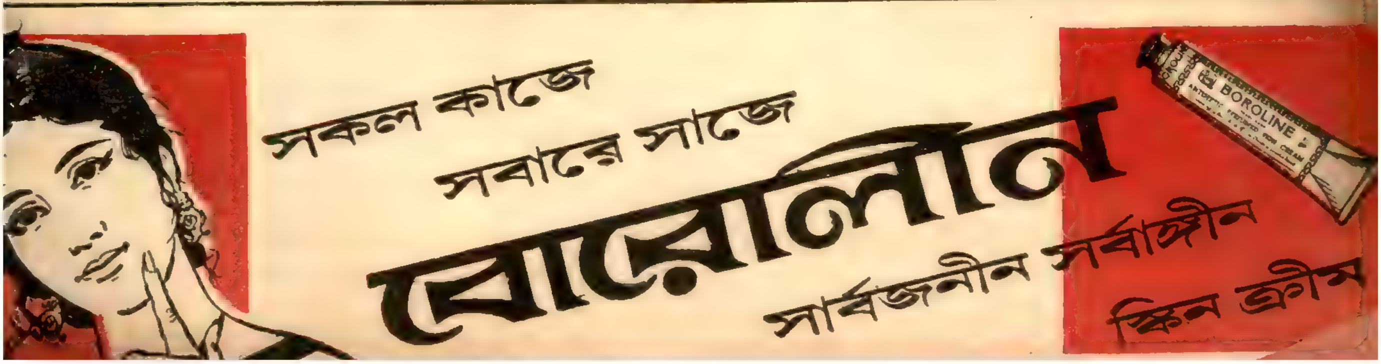

সূচীপত্র

756.3
.003/3
V69 no.14

বিষয়		পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১১৫৫
আজকের মানুষ	...	১১৫৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১১৫৭
সেই কণ্ঠস্বর (প্রবন্ধ)	শান্তিব্রত ঘোষ	১১৬০
ভারতদর্শন	...	১১৬৩
আন্তর্জাতিক	...	১১৬৯
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১১৭৪
সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে গান্ধীজী (প্রবন্ধ)	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১১৭৮
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১১৮১
ফুলগুলি (গল্প)	অজয় ভট্টাচার্য	১১৮৫

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ
। বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ।
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১১৯২
বঙ্গদর্শন	...	১১৯৫
আঁধারমাণিক্য (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১২০০
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১২০৪
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১২০৬
রঙ্গজগৎ	...	১২০৭
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১২১১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	১২১২
পাঠক মন		১২১৪
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১২১৫

প্রচ্ছদ পরিচয় ঃ

১৯৪৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান্ রিলেশনস্ কনফারেন্সে ভাষণরত গান্ধীজী। বামপার্শ্বে উপবিষ্ট শ্রীসরোজিনী নাইডু ও শ্রীনেহরু।

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্বাসিতের আত্মকথা, ঊনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালক কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারী-লালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ

বৃহস্পতিবার, ১৫ই আশ্বিন ১৩৭১

25 Paise

Thursday, 1st October 1964

মহাত্মাজীকে খুঁজে পাবো

কোনো প্রথাগত নিয়মে কিংবা বাঁধাধরা দিনেই নয়,—যথার্থ স্বাধীন মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, সৎ নাগরিকরূপে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার কল্যাণময় ইচ্ছায় মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট প্রতিদিনই স্মরণীয়। যে কর্মযজ্ঞের হুতাশনে দেদীপ্যমান ছিল তাঁর জীবন্যায় নিষ্ঠা, সমগ্র চিন্তা, ভারতীয় ঐতিহ্যপ্রসূত সন্ন্যাসীর ব্রত, বিবেক ও বুদ্ধি এবং অপ্রতিহত আদর্শ—তারই আলোকচ্ছটা আমাদের এই দুর্দিনে পথ দেখাতে পারে। তবু গান্ধীজীর স্মৃতি আজ আমাদের মধ্যে অনেকখানি ম্লান বলে মনে হয়। যে-ভাবনা তিনি ভাবিয়েছিলেন—তা থেকে আমরা যেন ধীরে ধীরে বিচ্যুত হচ্ছি। ইংরেজ শাসনের কঠিন নিগড় থেকে মুক্তি হলেও আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজ-গঠনের পথে তাঁর সেই 'হয় করো, নয় মরো'র মতো কঠিন প্রতিজ্ঞা যেন নেই। স্বাধীনতা লাভের পর যখন সংগ্রাম গভীরতর হওয়া উচিত ছিল, তখনই আমরা হয়েছি নিস্পৃহ। উন্নয়নোন্মুখ জাতির জীবনে এই নিস্পৃহতা বড়ই করুণ এবং নিষ্ঠুর। মহাত্মাজীর অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর মতোই এই অবস্থা একটা বিরাট জাতির জীবনে বড় রূঢ় এবং ভয়ঙ্কর।

সেই কারণেই বর্তমানে গান্ধীজীর আদর্শ অনুধাবন করা আরো বেশি প্রয়োজন। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর মতো মহাপুরুষের স্মৃতি বহন করা অসম্ভব ব্যাপার বলে ধারণা হলেও, একমাত্র তিনিই এই আধুনিক ভারতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত। রামরাজ্যের পরিকল্পক ছিলেন তিনি, সাধারণ মানুষের প্রাথমিক অভাব পূরণের কথা তিনিই প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করে গেছেন। এই কারণে সাধারণ মানুষ কোনো সূত্রযজ্ঞে যোগদান না করেও কোনোদিন মহাত্মাজীকে বিস্মৃত হতে পারবে না। সাময়িক বিস্মৃতির ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন গান্ধীজীর পরিদর্শিত পথেই তারা প্রতিষ্ঠিত হবে। যজ্ঞের সেই আলো প্রতিটি জীবনকে ভাস্বর করে তুলবে।

বর্তমান সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত তথা রাষ্ট্রিক জীবনে প্রধান যে ত্রুটি—তা হচ্ছে এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশ থেকে ত্যাগ যেন বিসর্জিত। একদিকে কালোটাকার পাহাড় জমছে অন্ধকার কোন গোপন গহ্বরে, অন্য দিকে কোটি কোটি মানুষ নিরাশ্রয়, অনাহার ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। স্বাধীন ভারতে দেশের যে এই দশা হবে—তা হয়তো স্বয়ং গান্ধীজী কখনোই কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁর সেই রামরাজ্য যেন আদর্শহীন কয়েকজনের অহঙ্কারে অলীকতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। তবু হীন স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত থেকে রক্ষা করে স্বাধীন ভারতে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কম হয় নি। কেন না নেহরুজীর চলার পথে উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু তাঁরও পথ-পরিক্রমা শেষ হয় নি। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী নেহরুজীরই ভাবশিষ্য। স্বভাবতই তিনি মহাত্মাজীর সেই আদর্শ রূপায়ণে একনিষ্ঠভাবে প্রতিশ্রুত।

একথা ঠিক যে, কোনো মহাপুরুষের তিরোভাবের পর যেমন ভাবের বন্যা পরিবাহিত হয়, তেমনি তার আরো কিছু পরে সেই ব্যক্তির স্মৃতিও স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু এমন একদিন আসে যখন সমগ্র মানুষ নিজেদের স্বার্থে খুঁজে নিতে বাধ্য হয় সেই ভাবাদর্শ। আমাদের দেশে এই ঘটনা নতুন নয়, তাই গান্ধীজীকেও আমরা সেভাবেই খুঁজে পাবো।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আজ রাজা কাল ফকির। অদৃশ্য নিয়তির অঙ্গুলি হেলনে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু, নিজের পায়ে যিনি নিজে কুড়োল মারেন তাঁকে কি বলব? আত্মহন্তা? হ'তে পারে এও এক বিশেষ অর্থে আত্মহনন। কাশ্মীরের একদা প্রধানমন্ত্রী শ্রীবক্সী গোলাম মহম্মদ আজ কারারুদ্ধ। স্বখাত সলিলে ডুব দিয়ে রাজনীতিক বক্সী গোলাম হয়ত আত্মলুপ্তির পথেই এগিয়ে চলেছেন। তাঁর রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপের পায়ে শেকল পরিয়েছেন তাঁরই পূর্বতন সহকর্মী—কাশ্মীরের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সাদিক। এর আগে চারবার বন্দী হ'য়েছেন দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের প্রজা-আন্দোলনের নেতা হিসেবে। এটা তাঁর পঞ্চম জেল-অভিজ্ঞতা।

শ্রীগোলাম মহম্মদ এখন ৫৭ বছরের প্রৌঢ়। আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে ৯ই অগাস্ট তিনি অভিষিক্ত হ'ন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর আসনে। শের-ই-কাশ্মীর দুর্বিনীত শেখ আবদুল্লা তখন জেলে গিয়েছেন। বক্সী গোলামের নেতৃত্বে কাশ্মীর পেরিয়ে চলেছে নানা সংকটসাগর। সে সময়ে কাশ্মীর গণ-পরিষদ এই রাজ্যের সংবিধান অনুমোদন করে। দ্বিধাহীন ভাষায় উচ্চারিত হয় কাশ্মীর ভারতের—একমাত্র ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেইসঙ্গে কাশ্মীরে যাতায়াত ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর থেকেও সব বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হ'ল। সুপ্রীম কোর্টের এক্তিয়ারে এলো এই রাজ্যও। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি রাজ্যের সর্বত্র—প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণকে অবৈতনিক করতে পেরেছিলেন।

বস্তুত সেদিনকার বক্সী গোলামের সঙ্গে আজকের বক্সী গোলামের মিল খুঁজতে গিয়ে বিস্মিত হ'বেন অনেকেই। কিন্তু ওই যে বলেছি এ পরিণতি তিনি ডেকে এনেছেন স্বয়ং। কাশ্মীরে তিনি প্রচুর সুনাম ও সাফল্যের সঙ্গে নেতৃত্ব করেছেন দীর্ঘ দশবছর। এই দশবছরের বিস্তৃত অবকাশের ফাঁকে ফাঁকেই নিজের কাজও তিনি গুছিয়ে তুলছিলেন। ক্রমশ জনে জনে একথা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হ'ল না। বক্সী-সরকারকে লোকে সংক্ষেপে বলল বি, বি, সি,—বক্সী ব্রাদার্স কর্পোরেশন। বক্সী আর তাঁর ভাইরা প্রভূত সম্পত্তি করে ফেলেছেন রাজ্যশাসনের নামে—প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার প্রভাবে। তাঁর বিরুদ্ধে এই চাপা অভিযোগের বিস্ফোরণ হ'ল পবিত্র হজরত-বাল অপহরণের প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষুব্ধ কাশ্মীরের পটভূমিতে। এরই মধ্যে কামরাজ পরিকল্পনার সুযোগ নিয়ে বক্সী তাঁর আসন ছেড়ে দিলেন তাঁরই অনুচর সামসুদ্দিনকে।

তাঁর এ চালাকীতে সাময়িকভাবে শান্ত হ'ল জনতা। কিন্তু শ্রীনগরে বক্সীর এক ভাই-এর একটি চলচ্চিত্রগৃহে উত্তপ্ত জনতার অগ্নিসংযোগের সঙ্গেই কাশ্মীর পরিস্থিতিতে আবার আগুন লাগল '৬৩ সালের ডিসেম্বরের শেষে। বক্সী গোলাম জনতার সামনে দাঁড়াতে সাহস পেলেন না। দিল্লীতে এসে জনতার বিক্ষোভের কারণ হিসেবে এক বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিলেন। বললেন, জনতা আসলে রাজদ্রোহী শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের কৈফিয়ৎ চাইছে। শেখ আবদুল্লার মুক্তি দাবী করছে। আর অধিকার চাইছে গণভোটের। এ খবরে অনেকেই বিচলিত হ'লেন। কিন্তু গোলাম মহম্মদের লোকের চোখে ধূলো দেবার এই চেষ্টা ধরা পড়ে গেলো প্রাক্তন এম-পি মহম্মদ শফির বিবৃতিতে— জনতা বস্তুত বিক্ষুব্ধ হজরতের পবিত্র কেশ অপহরণের ঘটনায়।

ইতিমধ্যেই এম-পি শ্রী এ এম তারিক অভিযোগ জানালেন বক্সী সরকারের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। দাবী করলেন বক্সী-পরিবারের অতুল সম্পদ সঞ্চয় সম্পর্কে তদন্তের। বললেন,

বক্সী গোলাম মহম্মদ

বক্সীকে অপসৃত করতে হবে কাশ্মীর থেকে। আর এ ব্যাপারের দায়িত্ব নেবেন ভারত সরকার। আত্মরক্ষা করতে বক্সী দিল্লীতে পালিয়ে এলেন। শ্রীবক্সীর রাজনৈতিক জীবনের আরোহণ-অবরোহণের ইতিকথা অনেকটা এরকমই। সম্প্রতি সাদিক-মন্ত্রিসভা, এমন কি সদর-ই-রিয়াসতের বিরুদ্ধেও তিনি সম্মিলিত অনাস্থা জ্ঞাপনের উদ্যোগ করছিলেন। বিধানসভার সমর্থনও পাচ্ছিলেন অনেকের। কোন সুপরামর্শেই তাঁকে ফেরানো গেল না। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে সর্বোপরি কাশ্মীরে জনগণের শান্তিরক্ষায় তাঁকে স-পার্ষদ আটক করতে হ'ল। বলা যায়—এ কারাবাস শ্রীবক্সীর যুগপৎ প্রায়শ্চিত্ত আর আত্মশোধনের অনিবার্য সুযোগ।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

আলো জ্বালতেই গুটেনবার্গের একটি ছবি চোখে পড়লো সেদিন। শাদা কাগজে কালির রেখাচিত্র।

ছাপা হরপের সারিতে আলো। সেই আলোতেই গুটেনবার্গের দাড়ি আর টুপি দেখলুম ছবিতে।

১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হবে, বোধ হয়। জার্মানির মেন্‌জ শহরে ছোটো দোকান ছিল একখানি। গুটেনবার্গের দোকান। পাঁচশ বছর আগেকার সেই জোহান গুটেনবার্গের কথা মনে এলো।

প্রথম ছাপার হরপ নাকি তাঁরই আবিষ্কার। হরপের পরে হরপ সাজিয়ে এই ছাপবার কৌশল ক্রমে জার্মানি থেকে ইটালিতে যায়,—সেখান থেকে হল্যাণ্ডে, —ক্রমশ সারা ইউরোপেই তা ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপে বই ছাপবার আয়োজন অন্তত পাঁচশ বছরের নানারকম চর্চা পার হয়ে একালে এসে পৌঁছেচে।

শুনেছি, গুটেনবার্গের জীবনীর তথ্য বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি। জোহান গুটেনবার্গ আজ প্রসিদ্ধ একটি নাম মাত্র। বইয়ের রাজ্যে সে-নাম সকলেই জানেন, যেমন আমাদের বাংলা ছাপার এলাকায় পঞ্চানন কর্মকারের নাম।

একজন লিখেছেন যে, ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র যখনই দেখা দিয়ে থাক্, সাহিত্যের ইতিহাস কিন্তু গুটেনবার্গের পরে যতোটা, গুটেনবার্গের আগে ছিল প্রায় তার দশগুণ সময় জুড়ে।

শুনেছি, প্রথম কাগজ আবিষ্কার করেন চীনারা। সেখান থেকেই সে কৌশল শিখে নিয়ে, আরব-দেশ নাকি পশ্চিমে ইউরোপকে সে-বিদ্যা শিখিয়ে দেয়। খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দশ শতকেই সারা ইউরোপে কাগজের ব্যবহার চালু হয়েছে। তার আগে 'পার্চমেণ্ট' বা 'ভেলাম' ছিল। সে ছিল চামড়ার যুগ।

গো-বৎসের ফরাসী প্রতিশব্দ থেকেই 'ভেলাম'-এর প্রয়োগ। আর, 'পার্চমেণ্ট' শব্দটি এসেছে প্রাচীন এশিয়া-মাইনরের পেরগামাম শহরের নাম থেকে। খ্রীষ্ট-জন্মের শ'দুয়েক বছর আগে সেখানে চমৎকার এক রকম লেখবার চামড়া তৈরি হোতো; তারই নাম 'পার্চমেণ্ট'।

আমাদের দেশে যেমন তুলোট-কাগজ, তালপাতার পুঁথি, ইউরোপে সেই রকম পার্চমেণ্টের ব্যবহার অনেক দিনের। মঠের সন্ন্যাসী বসে বসে পার্চমেণ্টে পুঁথি নকল করেছেন, চমৎকারভাবে সাজিয়ে তুলেছেন শব্দের পরে শব্দ,—লাইনের পরে লাইন।

সময়ের লম্বা করিডরের আলো-ছায়ার আলপনার ওপর সারি সারি সেইসব মগ্ন তার মূর্তি দেখা গেল।

এক কালের লিপি অন্য কালের চোখে পড়ুক, এক মনের অনুভূতি অন্য মনে ছায়া ফেলুক।

সেই বাসনা পূর্ণ হয়েছে নানা চর্চায়, নানা পরীক্ষায়। সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকদের বক্তব্যও নানা-বিধ, বলবার ভঙ্গিও নানা রকম। আমাদের এই বর্তমান জগতে দাঁড়িয়ে,—বর্ষার আকাশ দেখতে-দেখতে সেদিন এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারা মনে এলো।

সে ধারার কতোটুকুই বা আমার নজরে পড়েছে। তারই মধ্যে মনে এলো টমাস হার্ডির জগৎ। সে জগৎ ছায়াচ্ছন্ন, বেদনাভারাতুর।

সেদিন মেঘলা ছিল। ট্রেনে আসছিলুম। সমস্ত পথটাই ছায়াচ্ছন্ন। সেই ছায়ায়-ছায়ায় ট্রেন এসেছে সারারাত। কলকাতার কাছাকাছি এসে সকাল হোলো। মাঠ ভিজে ভিজে। পথে জল-কাদা। রোদ্দুরের চিহ্ন নেই। বোধ হয়, সেই জন্যেই সেদিন স্টিফেন স্পেণ্ডারের সেই কবিতা আমার মনে এলো—যার নাম 'Tom's A-Cold'।

ঐ টম হলেন টমাস হার্ডি। সে-কবিতায় দুনিয়ার সারা আকাশ, সারা মাটি যেন নিরবচ্ছিন্ন বেদনায় একাকার। টমের সমস্ত জীবন যেন সেইরকম বিষণ্ন একটি দিন। মনে পড়লো খুবই একালের চোখে দেখা ঈষৎ দূর-কালের টমাস হার্ডির সেই ছবি।

এ আমাদের একালেরই খবর বটে, তবু টমাস হার্ডি ঠিক আজকের মানুষ নন। উনিশ-শতকের শেষার্ধে সে-দেশে প্রসন্নতাই হয়তো সাধারণ লক্ষণ ছিল। তবু, হার্ডি যে বিষণ্ন ছিলেন, সে তো অবিসংবাদিত সত্য। মনে আছে, একজন বলেছিলেন, হার্ডির জগৎ যেন চিরন্তন এক অপরাহ্ণ-ছায়া। সকাল বেলায় ট্রেনে বসে বসে আমি সেই বিকেলের ছায়া দেখলুম।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় এক বছর আগে জন্মগ্রহণ করে ১৯২৮এ মারা গেছেন টমাস হার্ডি। মানুষের অজ্ঞান আর অন্ধকার দেখে দেখে একটির পর একটি লেখাতে সেই যন্ত্রণার কথাই তিনি লিখে গেছেন। কেন এই যন্ত্রণা? কেন এই জগৎ? এই ছিল তাঁর চিরজীবনের প্রশ্ন। ভিক্টোরিয়ার যুগের মানুষ তিনি। কিন্তু সে-যুগের সর্বসাধারণের মতন

জন। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ছিল। অনেকের মধ্যেও তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

জর্জ মেরেডিথ ছিলেন তাঁরই প্রবীণ সমসাময়িক। তাঁর জন্ম ১৮২৮ এ, মৃত্যু ১৯০৯এ। মেরেডিথ আর হার্ডি দুজনেই প্রধানত কথাসাহিত্যিক। উপন্যাস-চর্চার অবকাশে দুজনেই কিছু কিছু কাব্যচর্চা করে গেছেন। দুজনেরই উপন্যাসে কবিত্বের চিহ্ন আছে। আর, আছে চিন্তা। মানুষ যে নিজের প্রবৃত্তির মার খেতে-খেতে সুস্থ জীবনাদর্শের দিকে কষ্টে হেঁটে চলেছে, মেরেডিথ সে-কথা বলে গেছেন।

হার্ডি ঠিক দার্শনিক ভাবনার প্রবক্তা ছিলেন না বটে, কিন্তু কঠিন, কঠোর অদৃষ্টের কূটচক্রে মানুষ যে ঘড়োই যন্ত্রণা পাচ্ছে,—সে-কথা তিনি গভীরভাবেই বলে গেছেন। নেপোলিয়ঁর যুদ্ধকাল-সংক্রান্ত তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'দি ডাইনাস্টস' লেখা হয় আমাদের শতাব্দীর প্রথম দশকে। আজ এতোকাল পরে,—এই বাংলা দেশে আমাদের আকাশ যখন বর্ষার মেঘভারে আচ্ছন্ন, তখন সেই হার্ডির কথাই বিশেষভাবে মনে এলো। এবং সেই সঙ্গে এ-কথাও যে, তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, ইংলণ্ডে প্রবল আশাবাদী, বিশ্বাসময় কবি রবার্ট ব্রাউনিং তখনো বেঁচে ছিলেন। ব্রাউনিং যেমন প্রবল শুভবাদী, হার্ডি যেন ঠিক তার বিপরীত দিকে গভীর যন্ত্রণাবাদী!

সে-কালের ইংরেজি সাহিত্য-জগতের সেই সুখ-দুঃখের ঢেউয়ের মধ্যেই এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙের সঙ্গে রবার্ট ব্রাউনিঙের প্রণয়ের কাহিনী প্রসিদ্ধ। কবি এলিজাবেথকেই বিবাহ করেছিলেন রবার্ট। সেই বিবাহ তাঁর ব্যক্তিজীবনের বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীবনের বিপুল রঙ্গশালার ঘাত প্রতিঘাতের নায়ক-নায়িকা আমরা সকলেই। কিন্তু ব্রাউনিঙের মতন শুভবাদী, বিশ্বাসী নায়ক কি সবাই হতে পারে? মেরেডিথও সে-রকম নন, হার্ডিও সেরকম নন।

ইউরোপে গুটেনবার্গের ছাপার হরপ আবিষ্কারের আগেকার আমলের যে বিপুল সাহিত্যধারা আজ নিঃশেষে হারিয়ে গেছে,—যার আজ আর কোনো খবরও জানি না আমরা, হয়তো সে-রাজ্যেও এইরকম ভাবনা-চিন্তাই দেখা দিয়েছিল। হয়তো সে-সব অধ্যায়েও সাহিত্যের বিষয়, ভঙ্গি, আঙ্গিক ইত্যাদি ব্যাপারে লেখকরা একালের মতোই অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। হার্ডি যেমন তাঁর উনিশ অঙ্কের, একশ-তিরিশ দৃশ্যের মহানাটক 'দি ডাইনাস্টস'এ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, জগতের অন্তর্লীন ইচ্ছা-শক্তির কাজ চলছে কী রকম?—তাতে যেমন দৃশ্যে দৃশ্যে এই গভীর জিজ্ঞাসাই ব্যক্ত হয়েছিল, সেইরকম হয়তো আগেও আরো অনেকবার অনেকের মনে সেই একই জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। এবং দুনিয়ার সৃষ্টিতত্ত্বের প্রশ্নই শুধু নয়,—শুধু ধাঁধার জবাব খোঁজা নয়,—হার্ডির মতোই মে-মাসকে প্রসন্ন সবুজ পাতার ডানা ঝাপটাতে দেখেছেন অনেকে,—শীতের রাত্রে নক্ষত্র-খচিত আকাশ চোখে পড়েছে অনেকের। জীবনের বিষাদবোধ সত্ত্বেও হার্ডিই তো লিখে গেছেন—

আমি জীবনের জন্যে পরোয়া করি নি
জীবনই আমাকে চেয়েছে।
তাই তো তার জন্যে
কিঞ্চিৎ আনুগত্য আমার।

নাট্যরসে সমৃদ্ধ তাঁর এক জাতের কবিতার সঙ্গে কেউ কেউ ডি. এচ্. লরেন্সের সমধর্মী কোনো কোনো রচনায় মিল দেখিয়েছেন। হার্ডি আর লরেন্স সমসাময়িক বটে, কিন্তু ঠিক এক পর্বের লেখক ছিলেন না তাঁরা। ব্রাউনিঙের মৃত্যুর মাত্র চার বছর আগে ১৮৮৫তে লরেন্সের জন্ম হয়, আর তিনি মারা যান হার্ডির দু' বছর পরে,—১৯৩০ এ। সংসারে মানুষে মানুষে সহজ যে-সব সম্পর্ক, তারই কোনো কোনো ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন দুজনেই। হার্ডির এই রকম একটি কবিতার নাম—কিউরেটের দয়া। তাতে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ আছে। সোজা-সুজি ওয়েসেক্স অঞ্চলের ভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে। লরেন্সও তাঁর স্বস্থান নটিংহামশায়ারের ভাষা ব্যবহার করে গেছেন এ-সব ক্ষেত্রে। বলবার ভঙ্গিতে দুজনের মধ্যে প্রভেদ দেখেছেন সমালোচকরা। এই রকম বিশ্লেষণের শেষ নেই। কতো যে লক্ষণ, কতো যে শ্রেণী। কতো যে বক্তব্য লেখকদের।

লেখক হিসেবে মৃত্যু সম্বন্ধে হার্ডির খুবই আগ্রহ ছিল। কটাক্ষের সঙ্গে এই রকম কোনো কোনো দৃশ্য দেখিয়ে গেছেন তিনি। স্বামীর মৃত্যুর আগেই কে এক মহিলা চমৎকার শোকবাসের ফরমাস দিয়েছেন দর্জিকে। কোন্ এক কৃষি-ফার্মের মহিলা তাঁর স্বামীকে ষাঁড়ে গুঁতিয়ে দিয়েছে দেখে প্রথমেই ভেবেছেন যে তাঁর ঘর অগোছালো হয়ে আছে! এ সবই অবস্থাবৈগুণ্যের কাব্যচিত্র। এও হার্ডির ভঙ্গি। যেমন তাঁর জীবন-বেদনাবোধ, তেমনি তাঁর এই অবস্থা-বৈগুণ্যদৃষ্টি। ব্রাউনিঙের সঙ্গে তাঁর অন্তত এই একটি মিল অনুভব করতে বাধা নেই যে, তাঁরা দুজনেই জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতময় নাট্য-স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। আর, বোধ হয় সেই দৃষ্টির তাগিদেই লরেন্স হাউসম্যানের 'এ শ্রপশায়ার ল্যাড'কে তিনি ইংরেজি ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ সংক্ষিপ্ত নাট্যকবিতা বলে চিহ্নিত করেন।

আমি জানি না হাউসম্যানের আবেদন প্রধানত নাটক ঘনিয়ে-তোলার দিকে, না অন্য কোথাও। শুনেছি অন্য দিকে। শুনেছি

মানুষের মনের ভাবের সঙ্গে বাস্তব ঘটনার সংঘাতই তিনি প্রধানতঃ দেখেছেন। শুনেছি ছেলেবেলায় ম্যাথু আর্নল্ডের 'এম্পিডোকল্‌স্ অন্ এট্‌না' পড়েছিলেন তিনি। পড়ে মুগ্ধ হয়ে বলেন—জ্ঞানের মূল কথা আছে তাতেই।

ম্যাথু আর্নল্ড লোকান্তরিত হন ১৮৮৮তে,—আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' শেষ করেছেন,—রবীন্দ্রনাথ তখন 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে 'নিষ্ক্রমণ' পর্বে পৌঁছেছেন। টমাস হার্ডির বয়স তখন আটাশ বছর। ব্রাউনিঙের চরিত্র-বীক্ষাময় নাট্যকবিতা-মালা 'দি রিং অ্যাণ্ড দি বুক' আর্নল্ডের মৃত্যুর উনিশ বছর আগেকার সংবাদ। আজ সেই সংবাদ নতুন করে শোনাবার কথা ওঠে না,—শুধু এইটুকুই মনে আসছে যে, ইংরেজি কাব্যধারায় মৃত্যুচিন্তা আর নাট্যদৃষ্টির ঝোঁক, দুই-ই ছিল সেকালের লক্ষণীয় লক্ষণ।

'এম্পিডোক্‌ল্‌স্ অন এট্‌না'তে আর্নল্ড আমাদের স্বপ্ন আর নৈরাশ্যের কথা বলেছেন। আর্নল্ডও বিষণ্ণ কবি। চিন্তা আর কর্মের দ্বন্দ্ব,—ভেতরে ভেতরে গভীর এক শূন্যতার বেদনা,—সেই যন্ত্রণা ছিল তাঁর মধ্যে। সমস্ত নিশ্চয়তাবোধ যেন ফুৎকারে নিভে যেতে বসেছিল। তাঁর বিখ্যাত 'দি স্কলার জিপ্‌সি'-তে সেই আধুনিক বিষাদবোধেরই পরিব্যাপ্তি। হাউসম্যান হয়তো সেই বিষাদকেই জীবন-সত্যের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি বলে মেনে ছিলেন।

এডোয়ার্ড ফিটজেরাল্ডও সেই আমলের কবি। ১৮০৯এ জন্ম, ৮৩তে তাঁর মহাপ্রয়াণ। ওমর খৈয়ামের অনুবাদে তিনি সেকালের কবি-মানসলোকের সেই বিশেষ লগ্ন বা আব-হাওয়াই চরিতার্থ করে গেছেন। লেগুই আর ক্যাজামিয়ার লেখা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ম্যাথু আর্নল্ডের সঙ্গেই তাঁর নৈকট্যের কথা আছে। আমি ইংরেজি সাহিত্যের এই সেদিনের সেই সব যন্ত্রণার কবিদের কথা ভাবতে ভাবতে আবার গুটেনবার্গের দাড়ি আর টুপি দেখলুম ছবিতে। মনে হোলো আমাদের দেশেও তুলোটে, তাল-পাতায় কতো মনের কতো নীহারিকা মণ্ডলই না দেখা দিয়েছিল। ইউরোপে কতো ভেলামে পার্চমেণ্টে কতো ভাবজগৎ দেখা দিয়েছে, নিভে গেছে। তারপর ১৪৫০এর এতোদিন পরে, মানবসভ্যতার এই মেঘাচ্ছন্ন বর্তমান পর্যন্ত কতো হার্ডি, ব্রাউনিঙ, আর্নল্ড, ফিটজেরাল্ড হাউসম্যান আসছেন, যাচ্ছেন!

রামেন্দ্রসুন্দর অক্ষয়বট প্রদক্ষিণ করে মনে মনে সেই যে প্রার্থনা করেছিলেন—পৃথিবীতে আর যেন ফিরতে না হয়, সেও কি উনিশ-শতকের যন্ত্রণাবিদ্ধ স্কলার-জিপ্‌সির প্রয়াণ-বাসনা? জীবন-যাত্রার পরিণতিতে পৌঁছে সে কি মানব-মনের চিরকালের সেই গোপন কক্ষের উদ্‌ঘাটন—যেখানে শুধু অন্ধকার আর অবিশ্বাস,—যন্ত্রণা আর সান্ত্বনাহীন শোকোচ্ছ্বাস?

টেনিসন, ব্রাউনিঙ অবশ্য অন্য ধরনের। কিন্তু হার্ডি আর্নল্ড, ফিটজেরাল্ড আমাদের একালেও আমাদের যতো অধিকার করে আছেন, ব্রাউনিঙ কি সে-ভাবে এ-কালকে ধরতে পারেন? টেনিসনকে কি সেভাবে আপন ভাবতে পারি আমরা,—আমরা যারা একালের মানুষ? আমাদের রবীন্দ্রনাথের শেষ কথাগুলিও কি আমরা জীবনের প্রতি পদপাতে সে-ভাবে উপলব্ধি করি?

আলো পড়েছে বইয়ের পাতায়। ছাপা হরপের সারি। জোহান গুটেন-বার্গের রেখাচিত্র দেখতে-দেখতে ছবিতে তাঁর স্বপ্নের ভাবাবেশ খুঁজছিলুম।

কিন্তু এ সে ছবি নয়। তাঁর স্বপ্নাবেশ কোনোদিন কোনো বড় শিল্পী হয়তো তুলি দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করবেন। ইতিমধ্যে শুধু সাহিত্যের পুঁথিতেই নয়, মানুষের অশেষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তহীন গ্রন্থমালায় ছাপা হরপের সারি বেয়ে তাঁর কীর্তির শোভাযাত্রা চলেছে।

মনে সেই শোভাযাত্রা অনুভব করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কোথায় সে অনুভূতি? সে মহিমাবোধের বদলে আমার মনে এলো আর-এক দৃশ্য। সে আর এক সমাবেশ। সেই সমাবেশটি মনে ভেসে উঠছে আজ—

তের বছরের বালক হাউসম্যান। পারিবারিক সাহিত্য-পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা লেখবার জন্যে নিজের ভাই-বোনেদের ক'টি বিষয় বেছে দিচ্ছিলেন। তিনি। প্রথম যে বিষয়টি তাঁর মনে এসেছিল সেদিন, সে আমাদের চিরাভ্যস্ত এই 'মৃত্যু-ই'।

মৃত্যুর ওপর হাউসম্যান নিজে যেদিন কিছু লেখেন নি। কিন্তু তাঁর বোন ক্লিমেন্স লিখে ফেলেছিলেন কয়েকছত্র—

> Death is a dreadful thought
> And every person ought
> To think of it with reverence
> Before they go forever hence

সে-কালের এক বালিকা-কবির কলমে স্বরায় ব্যক্ত এই চিরসত্যের ভঙ্গিটি ভাবতে ভাবতে গুটেনবার্গের ছবির ওপর আমি আলো নিভিয়ে দিলুম।

(ক্রমশঃ)

প্রবীণ রসোপন্যাসিক
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের
অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী
৩খানি বড় উপন্যাস ও ৭খানি নির্বাচিত গল্প। মূল্য তিন টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

কণ্ঠস্বর

শক্তিব্রত ঘোষ

তাঁর পথে তিনটি নক্ষত্র ছিল, সত্য, প্রেম ও শ্রমের আলোয় জ্বালা এবং সেই আলোয় তিনি পথ চলতেন। সারা জীবন ধরে তাঁর পরীক্ষা চলেছে সত্যকে নিয়ে, এবং এই পরীক্ষার পথে তিনি যে পরিণামে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তার ভূমি ছিল দৃঢ় ও নিশ্চিত। এইখানে ন্যায়বুদ্ধির পরমাদহীন অধিকার।

সত্য বিষয়ক পরীক্ষার অপর নাম তাঁর আত্মজীবনী। তাঁর মনের মধ্যে যে সব ছোট ছোট তরঙ্গ আন্দোলিত হতো, তা তাঁর আত্মার কম্পনমাত্র। বিভিন্ন সময়ে বিচিত্র অভিঘাতে এক একটি তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেই সময় ও সেই বিশেষ অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতেই তার সত্য মূল্য যাচাই হওয়া দরকার; সবগুলি তরঙ্গ ধারাবাহিক ও সঙ্গতি-বাহক না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তাকে অসঙ্গতির অভিযোগে তিরস্কার করা যায়? এই সূত্রটির প্রতি অমনোযোগী বলে অনেকে গান্ধীজীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখেছেন, অথচ এই সূত্রেই তাঁর সমস্ত কর্ম, ধ্যান ও উপলব্ধি গরীয়ান হয়ে উঠেছে। অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর মৌলিক বৃত্তি, আত্মোপলব্ধিকে তিনি অপরের মধ্যে মিলিয়ে নিতে চাইতেন, কিন্তু তিনি কি কখনোই সিদ্ধান্তবাদী ছিলেন? অন্তত গান্ধীজী সম্পর্কে কেউ একথা বলবেন না। বস্তুত আত্মার মুক্তি ছিল তাঁর লক্ষ্য; তিনি বলতেন, 'আমি অবশ্যই উন্নতি চাই, আত্ম-প্রত্যয় চাই, স্বাধীনতা চাই, কিন্তু সমস্ত চাওয়াই আত্মার অভিপ্রায়।'

এবং সত্য যাঁর নিরন্তর লক্ষ্য, তাঁকে বোধ হয় নিভৃত হতে হয়। সত্যাভিমুখী আত্মার নিয়মানুবর্তিতার শিক্ষা এই নির্ভৃতিবোধ থেকেই গড়ে উঠতে পারে। বিবেচকের মত বা অবিবেচকের মত, যাই হোক না কেন, সত্য সম্পর্কে 'অভিভাষণ বা স্বল্পভাষণ মানুষের মধ্যে এক স্বাভাবিক দুর্বলতা, এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে নিভৃতির শিক্ষা দরকার। এই বোধ গান্ধীজীর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। মৌনতার ভিতরলোক তাঁর কাছে উন্মাদিত হয়েছিল এক আশ্চর্য প্রসঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার এক ট্রাপিষ্ট। মনাষ্ট্রি একবার দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। অদ্ভুত সুন্দর এক জায়গা, সেখানকার প্রত্যেকে এক মৌন শপথে অঙ্গী-কারবদ্ধ। সেখানকার মুখ্য পুরোহিতকে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই মৌনতা কেন? পুরোহিত বলেছিলেন, এ তো অতি স্পষ্ট। আমরা অতি তুচ্ছ মানুষ, আমরা যখন যা বলি, সে সম্পর্কে অনবহিত হয়ে বলি। আমরা এত কথা বলি যে, সেই কণ্ঠস্বরটি মুছে যায়;—সেই কণ্ঠস্বর, যা অত্যন্ত মৃদু ও শান্ত, যা আমাদের ভিতর লোকে সব সময় কিছু না কিছু উচ্চারণ করে যাচ্ছে।

পুরোহিতের কথা আকর্ষণ করেছিল গান্ধীজীকে; মৌনতার উপ-যোগিতা সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় হয়ে ছিলেন। ধীরে ধীরে ভিতরে বাহিরে মৌনতা তার কাছে অনিবারণীয় হয়ে উঠেছিল। প্রথমে তাকে তিনি কাজের ভিড়ের মধ্যে আংশিক মুক্তির মতো করে গ্রহণ করলেন, তারপর ব্যক্তিগত লেখার জন্যে প্রয়োজন হিসেবে; কিন্তু এটা ছিল তার উপযোগিতা বাইরের দিক; ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক দিকটিও তাঁর কাছে উন্মোচিত হলো, তিনি বুঝতে পারলেন মৌনতা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের মাহেন্দ্র মুহূর্ত। মৌনপরতা অমল আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে আত্মার অববাহিত হবার পথ, বিভ্রান্তির চেহারাটিকে চিনিয়ে দেয়; এবং জীবন যেখানে নিরন্তন সত্যসন্ধান, সেখানে চরিতার্থ পরিণাম অর্জনের জন্য আত্মার বিশ্রাম দরকার।

বস্তুত, ঈশ্বর, প্রেম ও সত্য তাঁর কাছে সমার্থক ছিল। এর যে-কোন একটির উপলব্ধির জন্য মৌনতার বোধ অনিবার্য। ঠোঁট দুটো অনড় হয়ে গেলে এই বোধ গড়ে না, জিভকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেই কি এই বোধ পরিব্যাপ্ত হতে পারে? গান্ধীজী বলবেন, কথা বলবার শক্তি যাঁর আছে, অথচ যিনি শিথিল নন, তাঁর উচ্চারণে, তিনিই সত্যিকারের মৌন ব্যক্তি। কেন না মৌনতার শিক্ষাই মানুষকে প্রগাঢ় করে তোলে এবং সেখানে যে কোন রকমের শিথিলতা পরিত্যক্ত হতে বাধ্য। যখন মহৎ মৌন তার অধিকারের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন ভিতরলোকের সেই কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়, যা একই সঙ্গে উদাত্ত ও গম্ভীর, অথচ যাকে কখনোই সোচ্চার বলা যাবে না। জগতে কোন কোন অনুভব আছে, যার অস্তিত্ব কোন বহিরঙ্গ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল নয়, ভিতরকণ্ঠের উচ্চারণ অনেকটা তেমনি। আপন কর্মব্রতে যখন নিকটতম জনও সাহচর্য প্রত্যাখ্যান করে, এই উচ্চারণ তখনও মশালচী হয়ে পথ দেখায়। রবীন্দ্রনাথ একলা চলার আহ্বান শুনিয়ে গেছেন, কিন্তু যে পথ পিচ্ছিল ও শাণিত, সেই পথে চলবার অধিকার কি সবার? এই অধিকার অর্জন করতে হয়.

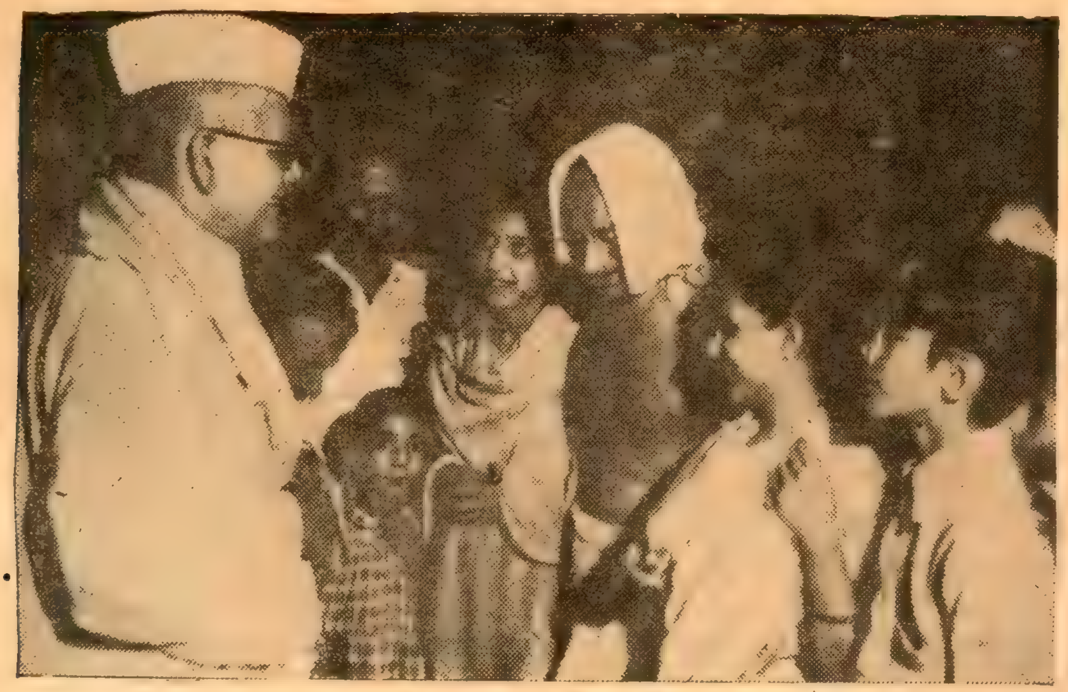

● নয়াদিল্লীতে শরৎচন্দ্র বসু ও গান্ধীজী

ভিতরভাষণের ভাষা চিনে নিতে হয়। গান্ধীজী বলেছেন : আত্মশুদ্ধির জন্য অবিরাম প্রয়াসের মধ্য দিয়ে তিনি সেই কণ্ঠস্বর নির্ভুলভাবে অনুধাবন করবার সামান্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এর ব্যত্যয় তাঁর অস্তিত্বের উপযোগিতার পক্ষে হানিকর।

গান্ধীজীর চেতনায় এই ভিতর-কণ্ঠ বিবেকের সঙ্গে, সত্যের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাকার হয়েছিল। তাঁর কাছে এর প্রত্যেকটিই ছিল নিরাকার এক উপলব্ধি মাত্র। কোন নির্দিষ্ট আঙ্গিকে ঈশ্বরকে তিনি ভাবেন নি কোন দিন, গুণগত দিকটিই ছিল তাঁর অনুধ্যান। এবং তিনি সেই কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, খুব সুদূর কণ্ঠ, তবু যেন খুব নিকট থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। কোন মানুষের কথাবলার মতো করে বলা, নির্ভুল ও অপ্রতিরোধ্য। এই কণ্ঠস্বর শোনার মুহূর্তটিকে তিনি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিলেন, তিনি বলছেন : যখন সেই কণ্ঠস্বর শুনলাম, তখন আমি স্বপ্নাতুর ছিলাম না। শোনবার ঠিক আগে আমার ভিতরে এক কঠিন যন্ত্রণা বোধ করছিলাম। এমন সময় সহসা সেই কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠল, এবং আমাকে আবৃত করে দিল। আমি শুনলাম ; আমার মধ্যে কোন সন্দেহ রইলো না যে, এই সেই কণ্ঠ, আমার সমস্ত যন্ত্রণা ধীরে ধীরে প্রশমিত হলো। আমি শান্ত হলাম। এরপর এক রকম প্রত্যয় গড়ে উঠলো আমার, আর উপবাসের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল- - -

এই নিশ্চিত উপলব্ধিই ছিল তাঁর দলিল, তিনি যে সেই কণ্ঠস্বর শুনেছিলেন, তার প্রমাণ হিসেবে এই দলিল শুধু তিনি মেলে ধরতে পারেন ; তাঁর কাছে তো অন্য কোন স্পর্শগ্রাহ্য প্রমাণ নেই যা দিয়ে তিনি বোঝাবেন যে সেই উচ্চারিত কণ্ঠ তাঁর তপ্ত কল্পনার ফসল মাত্র নয়। অবশ্য তার কিই বা প্রয়োজন , সংশয়বাদীদের বিশ্বাস উৎপাদনে তাঁর [illegible]ন আগ্রহ ছিল না, তিনি তাদের একে আত্মপ্রতারণা বা বিভ্রান্তি বলে মনে করবার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন, কেন না তাঁর উপলব্ধি ছিল খাঁটি, ঈশ্বর-নির্দেশের মত অকম্পিত নির্দ্বন্দ্ব, এবং সারা পৃথিবীও যদি তাঁর এই উপলব্ধিকে অবিশ্বাসীর চোখে দেখে, তথাপি তাঁর করবার কিছু ছিল না, যেহেতু বিশ্বাসের ভিত অত্যন্ত দৃঢ়মূল। এই অবিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত যায় যে, ঈশ্বরও সংশয়ের বিষয় হয়ে ওঠেন ; ঈশ্বর কল্পনার ফসলমাত্র বলে চিহ্নিত হন। এই বিধান যদি সত্য হয়, তাহলে জগতে এমন কোন বস্তু থাকে না, যা বাস্তব, কেন না সবটাই কল্পনা দ্বারা বানানো। অত্যন্ত বাস্তব বলে যাকে মনে হয়, সেটাও মনে রাখতে হবে, মনে-হওয়া ; সমস্ত বাস্তবই তাহলে আপতিক। কিন্তু এই সব ভাবনা আস্তিক্যবুদ্ধিকে কখনোই সহায়তা করে না, ফলে গান্ধীজীর কাছে এর কোন আবেদন ছিল না। তিনি মুহূর্তে নাকচ করে দিতে পারেন অবিশ্বাসীকে, কেন না বিশ্বাসের মহনীয়তা তিনি দেখতে

পেয়েছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস তাঁকে কখনোই প্রতারণা করে নি। শারীরিক অস্তিত্বের চেয়ে তাঁর কাছে ঢের সত্য ছিল ঈশ্বরকণ্ঠ, যার নির্দেশ তিনি শুনতে পেয়েছিলেন, নিছক ব্যক্তিপরতা থেকে বার বার যিনি তাঁকে মুক্তি দিয়ে গেছেন, যিনি আছেন সর্বহৃদয়ে, অথচ যাঁর অভিপ্রায় জানতে হলে কতগুলি নির্দিষ্ট ও প্রাথমিক প্রস্তুতির স্তর অতিক্রম করে আসতে হয়। গান্ধীজী ছিলেন এই ঈশ্বরের স্বেচ্ছাদাস। যত দিন গেছে, তাঁর কণ্ঠ তত স্পষ্ট হয়েছে তাঁর কাছে জীবনের অন্ধকার মুহূর্তগুলিতেও তিনি তাঁর হাতের স্পর্শ পেয়েছিলেন। এইভাবে তিনি মুক্তিকে অর্জন করেছিলেন, আলোময় মুক্তি, আলোময় ভুবনে মুক্তি। আত্ম-মুক্তির এই বোধই ছিল তাঁর কাছে ঈশ্বর বিশ্বাসের ফল, এবং এই ফলের দ্বারাই বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁর অধিকারের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। ঈশ্বর কি প্রমাণের বিষয়? তাহলে তিনি ঈশ্বর কেন? প্রমাণ-অপ্রমাণের বাইরে তাঁর অধিষ্ঠান, বিশ্বাসের চাবি-কাঠিতে সেই জগতের দ্যুতি অর্জন করা যায়, এবং গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে, আত্মনিবেদনের আলোয় এই অধ্যাত্ম-চেতনা দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

এবং বিভ্রান্তির কথাও অপ্রাসঙ্গিক। সত্য-সন্দর্শনের উল্লাস তাঁর এত তীব্র ছিল যে, তিনি সবাইকে এই পথে আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তিনি তাঁর জীবনে প্রত্যয়ে ও প্রতীতীতে যা পেয়েছেন, ধৈর্য ইচ্ছাশক্তি বা অন্যান্য গুণাবলী চর্চার মাধ্যমে তাঁকে প্রত্যেকেই পেতে পারেন। জগতে অনেকেই সেই ভিতরকণ্ঠের উচ্চারণ শুনেছেন বলে দাবী করে থাকেন, এই দাবী সব সময় পাকা না হতে পারে, কিন্তু এই প্রত্যয়ে তাঁদের যে কর্মধারা রচিত হয়, তাতে যথার্থতার গৌরব কম থাকলেও অন্তত ক্ষতি-কারক নয়। যেখানে ভিতরকণ্ঠের নির্দেশ নির্ভুল, তাঁকে চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না, তা এতই স্বাভাবিক ভাবে ধরা দেয়, এত ধ্রুব হয়ে ওঠে, যে সেখানে কোন সংশয় উপস্থিত হতে পারে না। অন্তত মাত্র কয়েক জনের মধ্যে যদি সেই কণ্ঠের নির্দেশ নিজেকে উন্মীলিত করে, আমাদের পক্ষে সেটা বড় লাভ; সেক্ষেত্রে অযথার্থ যদি দাবীগুলিকেও হয়তো খানিকটা সহ্য করা যায়। তিনি ছিলেন নিরন্তর সত্যসন্ধানী, সমালোচকরা তাঁর এই বৃত্তিকে অপবাদে তিরস্কৃত করেন নি, তবে এই সত্যের চেতনাকে যেভাবে তিনি গড়ে নিয়ে ছিলেন, তাকে আচ্ছন্ন ভ্রান্তির নকশে তাঁরা দেখে গেছেন। কিন্তু নিজের মধ্যে ছিল কঠিন আত্মবিশ্বাস। তিনি জানতেন, এই ক্ষেত্রে সতর্কতার অভাব পরিণামে শোচনীয় হয়ে উঠতে পারে। তাই মনের ভারসাম্য রক্ষা তাঁর কাছে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, he has to reduce himself to zero before God will guide him. তাঁর সারা জীবনে তাই বোধ হয় এত কৃচ্ছ্র সাধনা, এত উপবাস, এত মৌন-ব্রত।

আসল কথা, তিনি নিজকে প্রস্তুত করেছিলেন। ভিতরে ভিতরে গভীর মৌনকে গড়ে তুলেছিলেন। সেই মৌনতার অন্তরাল থেকে কখনো উচ্চারিত হয়ে উঠেছিল সেই কণ্ঠস্বর, যা একই সঙ্গে বিবেক, ঈশ্বর এবং সত্য। বিশ্বাসের গাঢ়তায় সেই উচ্চারণ তিনি ধারণ করেছিলেন, সেই উচ্চারণের সততায় নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন বিচিত্র কর্মধারায়, এবং তিনি তাতে কখনো প্রতারিত হন নি। এই বিশ্বাসের ওপর তিনি বার বার প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন, কেন না তিনি মনে করতেন বিশ্বাসই জীবনের স্থপতি, এবং বলতে চেয়েছেন, কাউকে যদি বিশ্বাস না করো, অন্তত নিজেকে তো বিশ্বাস করবে। এই আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠলে ভিতরকণ্ঠের উচ্চারণ শোনা যায়, কেউ যদি তাকে এই আধ্যাত্মিক অভিধায় গ্রহণ করতে না চান, গান্ধীজী বলবেন, অন্তত তাকে 'Dictates of reason' বলেও তো মেনে নেওয়া সম্ভব। এবং এই নির্দেশ অবশ্যই অনুসরণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন এই পথেও ঈশ্বরভাবনার আলোয় না চলেও, মানুষের সমস্ত চর্চা, সমস্ত উদ্যম যে পরিণামে এসে উপস্থিত হতে পারে, সেখানে যা থাকে সেটা সত্য, যিনি থাকেন তিনি ঈশ্বর। কেন না, যে কোন বস্তু, যে কোন অস্তিত্ব ঈশ্বর পরিণামী।

অভিজ্ঞতার পথেই যে কোন রকমের বিশ্বাস গড়ে ওঠে। বিশ্বাসের নির্দেশনামা অমোঘ। তার মধ্যে প্রতারণা নেই। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে বিশ্বাস-শক্তির অলৌকিকত্ব তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে, এবং এই চিরকালীন মশালচী তাঁকে পথনির্দেশ দিয়ে গেছে। হতে পারে, তাঁর তপ্ত কল্পনার আলোয় এই চেতনা রচিত হয়েছে, যদি তাই হয়, গান্ধীজী কল্পনা-বৃত্তির এই মহান ক্ষমতাকে বোধ হয় কখনো বাতিল করে দেবেন না, কেন না তাঁর জীবন-ধারা নিয়ন্ত্রণে তার এক অতিবিস্তৃত অধিকার ছিল। কিন্তু পনেরো বছরে পা দেবার আগেই তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার মৌন গভীর ট্রাপিষ্ট মনাস্ট্রির পুরোহিতের কাছে মানুষের ভিতরলোকের সেই কণ্ঠস্বরের কথা শুনেছিলেন, সেই কণ্ঠ শোনার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, এবং এক পরিব্যাপ্ত চেতনার বিবেক, সত্য এবং ঈশ্বরকে সমর্থক করে ধারণ করতে পেরেছিলেন নিজের মধ্যে। তাঁর জীবন যে আস্তিক্য-পরিণাম অর্জন করেছিলেন তার কারণ তিনি সে কণ্ঠস্বরের উচ্চারণ শুনেছিলেন, যা প্রত্যেকের মধ্যে অন্তরালবর্তী, শুধু কখনো কখনো কারো কারো আপন প্রত্যয়ের প্রভায় নিজেকে উন্মীলিত করে।

ভারত দর্শন

● জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ উইটওস্কি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করছেন।

রাজধানী :

গেল বারে রাজধানীর আকাশের যে-আভাস দিয়েছিলাম তা' এমন অক্ষরে অক্ষরে ফলবে আশাও করতে পারি নি। হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বুধবার শেষ বেলাতেই জমাট বাঁধতে সুরু করে। শুক্রবার সকালের দিকে সুরু হয় ঝিরঝিরে, ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টি। তারপরই আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ে। সারা ভারতে যখন চলেছে ভারত বন্ধ আন্দোলনের উন্মত্ততা, নয়াদিল্লীর মানুষের জীবন তখন বিপর্যস্ত প্রবল বর্ষণের ফলে। রাজপথ জলমগ্ন, বড় বড় গাছ পড়ে গিয়ে মহানগরীর পরিবহন-ব্যবস্থাকে বিকল করে দিয়েছে। মদনপীর, গান্ধীনগর এবং রাজৌরী গার্ডেনের নিকটবর্তী নতুন গড়ে-ওঠা কলোনীর কয়েক শ' গৃহ প্রচণ্ড স্রোতে ভেসে গিয়েছে।

লিংক রোড, মানসিং রোড, তিলক মার্গ, আর্যসমাজ রোড ও আশে-পাশের রাস্তাঘাটে জল জমেছিল হাঁটু পরিমাণ। নয়াদিল্লী থেকে পুরোনো দিল্লী যাবার পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—জল ছিল রাস্তার ওপর। তিলক ও মিণ্টো ব্রীজের সামনে জল জমেছিল প্রায় চার ফুট। পশ্চিম দিল্লীর প্রসাদনগর, গান্ধীনগর, কৃষ্ণাণনগর ও রমেশ-নগরের বহু গৃহে জল ঢুকে পড়েছিল। শহরের বিভিন্ন এলাকায় টেলিফোন সংযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারত বন্ধ আন্দোলনের দিনে প্রকৃতি দেবী একাই দিল্লী বন্ধের উপক্রম করে তুলেছিলেন।

সংসদের অধিবেশনও শেষ হল। বিদায়ী মেঘের শান্তির বারি বর্ষণে দিল্লীর মানুষের জীবনযাত্রা অচল করে দিলেও, এ বর্ষণের প্রয়োজন সর্বাধিক। আগের বারে বলেছি, এর পরই আসে রাজনৈতিক আকাশের সাময়িক প্রশান্তি। এর পর কিছুকাল আর খাদ্য সমস্যার সমাধানের প্রশ্নে বিতণ্ডার অবকাশ থাকে না। তখন আসে নতুন ফসল কাটার দিন—নবান্নের আয়োজন চলতে থাকে।

চক্রাকারে বছরের পর বছর আমাদের রাজনীতির চক্র ঘুরে চলেছে। ভারত বন্ধ আন্দোলনের ফলাফল নিয়ে এখন অবশ্য রাজনৈতিক মহলে কিছুটা উত্তেজনা চলেছে। এক দলের মতে আন্দোলন সফল হয়েছে। সরকারী চাপ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ সাড়া দিয়েছে আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য। আরেক দল মনে করেন, এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রহসনের কোন প্রয়োজনই ছিল না।

কোন পক্ষের যুক্তিই উড়িয়ে দেবার মত নয়। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের আন্দোলন বহুলাংশে সফল হয়েছে নিশ্চয়ই। খাদ্য সমস্যা দিনের পর দিন যে স্তরে এসে নেমেছে, তার প্রতিকারের দাবীতে হরতালের মধ্য দিয়েই গণমনের অভিব্যক্তির প্রয়োজন রয়েছে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায়। হরতাল আংশিক হয়ে থাকলেও তার মধ্যেই ফুটে উঠেছে মুনাফাবাজদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণমানসের ধিক্কার। এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সরকার মুখে আশ্বাস দিলেও মুনাফাশিকারীদের খপ্পর থেকে অন্নক্লিষ্ট মানুষকে রক্ষার বলিষ্ঠ কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারেন নি।

গণতন্ত্রে হরতাল মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুযোগ থাকলেও উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান সেখানে নেই। বেলারীর ঘটনা অত্যন্ত পরিতাপের। উন্মত্ত জনতা খাদ্যশস্যের গুদাম লুঠ করতে গেলে পুলিশকে গুলী চালাতে হয়েছিল। শুধু বেলারী নয়, ভারতের অপরাপর অঞ্চলেও পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়েছে। হরতালের ডাক যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের এদিকটা চিন্তা করা উচিত ছিল। মূল্যবৃদ্ধিজনিত সমস্যার ভারে যাদের জীবন ওষ্ঠাগত তাদের পক্ষে সংযম রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে তখনই যখন সংগঠনশক্তি থাকে অটুট। সে শক্তি বিচার না করে হরতালের ঝুঁকি নেওয়া অন্যায়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী খোলা মন নিয়ে হরতাল না করতে আবেদন জানিয়েছিলেন। বিরোধী দলের নেতারাও জানেন, নতুন ফসল উঠলে সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পেতে বাধ্য। তা' ছাড়া নতুন মন্ত্রিসভার বয়স এখনও চার মাস পূর্ণ হয় নি।

তার কাজের বিচারের সময় আসে নি। এ সব দিক বিবেচনা করে, হরতাল পালনের আহ্বান প্রত্যাহার করলে তাদের মর্যাদাহানি হতো না।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

বিরোধী দলগুলোর নিজেদেরই তালে ঠিক নেই। কমিউনিস্ট পার্টি কোন্ পর্যায়ে নেমেছে অন্ধ্রের অগ্নিকাণ্ডের রায়ই তার প্রমাণ। মায়ে-ছেলে পরামর্শ করে নিজের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে বিপক্ষকে নাজেহাল করার চেষ্টায় থানায় গিয়ে রিপোর্ট দিতে তারা ইতস্তত করে নি। অন্ধ্রে যে দাবানল কমিউনিস্টরা সৃষ্টি করেছিল তা নিভে গেলেও তাদের দলের ঘরে ঘরে সে আগুন নেভে নি—দাউ দাউ করে জ্বলছে। স্বতন্ত্র ও জনসংঘে ভাঙন ধরেছে। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদের সংযোগটা এখনও পাকাপোক্ত হয় নি। বিরোধী দলগুলোর নিজেদের যখন এ অবস্থা তখন দেশের মানুষকে মাতিয়ে না তোলাই উচিত ছিল।

* * *

নাগাভূমির পরিস্থিতিতে উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চেদেমা গ্রামে বিদ্রোহী নাগা নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সুরু হতে-না-হতেই নাগাদের দাবীতে সব আয়োজন ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়েছে। নাগাদের কথাবার্তায় মনে হচ্ছে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র নাগাভূমির আশা ত্যাগ করে নি। রেঃ মাইকেল স্কটের প্রচার এখন মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। নাগারা পরিষ্কার তাকে জানিয়েছিল আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। 'ভারতকে তারা সব দিতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা হারাতে তারা পারবে না।' এ সব কথা স্কট সাহেব ভারত সরকারকে জানিয়েছিলেন কিনা, আমরা জানি নে।

আলোচনার প্রথম দিনেও তারা এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলেছে,

শ্রীশিলু আও

ভারত ও বিশ্বের সঙ্গে শান্তিতে বসবাসই তাদের কামনা। শ্রীআইজ্যাক সু, শ্রীজামেই হুরী এবং শ্রীথিনোচিলি আপত্তি তুলেছে নাগাভূমির মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশিলু আওয়ের উপস্থিতিতে। তাঁকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবেও স্বীকার করতে চাইছে না। প্রতিনিধিরা তাদের নেতাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য সময় নিয়েছেন।

* * *

মে মাস থেকে আগস্ট মাসের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের উদ্বাস্তু শিবিরে ১১৪টি শিশুর জীবনান্ত ঘটেছে। এই অকাল-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য তদন্তের দাবী উঠেছিল লোকসভায়। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে, সময়োচিত চিকিৎসার অব্যবস্থাতেই শিশুদের জীবনদীপ নিভে গেছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। তদন্তের দাবী অগ্রাহ্য করে শ্রীমহাবীর ত্যাগী বলেছেন, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগই শিশুদের মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুর কারণটা বড় কথা নয়। চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা থাকলে এরূপ ব্যাপকহারে শিশুমৃত্যু ঘটতে পারত না। এর দায়িত্ব থেকে শ্রীত্যাগী কোন কারণেই রেহাই পেতে পারেন না। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পূর্ণ দায়িত্ব ভারত সরকারের। অর্থ যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে। সে অর্থ রাজ্য সরকার কি ভাবে ব্যয় করছেন তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর এড়িয়ে যেতে পারেন না।

দণ্ডকারণ্যে রাজ্যহারা রাজপুত্রকে আগলে রেখেছিলেন মহাবীর। রামায়ণের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সেবাপরায়ণ মহাবীরের ত্যাগ ও মহত্ত্বের কথা লিখিত হয়েছে। শ্রীমহাবীর ত্যাগীর হাতে গৃহহারা উদ্বাস্তুরা গৃহ পাবে

শ্রীমহাবীর ত্যাগী

গড়ে তুলবে শান্তির নীড় নতুন করে, এ আশাই সকলে করেছিলেন। কার্যত দেখা যাচ্ছে, দণ্ডকারণ্যের জঙ্গলের

মধ্যে তিনিও জড়িয়ে পড়েছেন। মন্ত্রিত্বলাভের পরও বীরের মতই ক'টা দিন সদর্পে চলেছিলেন। মনে হয়েছিল দণ্ডকারণ্যের জঙ্গল এবার পরিষ্কার হবে, উদ্বাস্তুদের ভাগ্য যাবে ফিরে।

শ্রীত্যাগীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও কার্যকলাপে মানুষ হতাশ হয়ে পড়েছে। তাঁর বীরত্বের দৌড়টা মসজিদ পর্যন্ত, এ ধারণা আমাদেরও ছিল না।

* * *

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রিসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ গ্রেটে উইটকওস্কি দিল্লীতে এসেছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে বহু সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ডঃ উইটকওস্কি উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে আলোচনা করেন।

উত্তরপ্রদেশঃ

পূর্ব ভারতের গোঁড়া সমাজবাদী কংগ্রেসকর্মীদের দ্বিতীয় সম্মেলন হচ্ছে অক্টোবর মাসে এলাহাবাদে। এ সিদ্ধান্ত অবশ্য সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত নয়াদিল্লীর সম্মেলনেই গ্রহণ করা হয়েছিল।

আসন্ন সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রী কে ডি মালব্য। বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল এবং মধ্যপ্রদেশের ছাতারপুর থেকে দু' হাজারের অধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেবার কথা। এ নিয়ে শ্রীমালব্য উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেসের প্রধান শ্রীগোবিন্দ সহায় এবং উপপ্রধান শ্রীআলগুরাই শাস্ত্রীর সঙ্গে একদফা আলাপও করেছেন। আলোচনায় স্থির হয়েছে সম্মেলনের সম্যক ব্যবস্থাপনার জন্য এগারজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে।

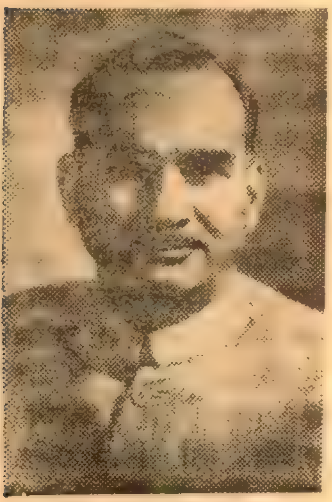

শ্রী কে ডি মালব্য

কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের দুচারজন গোঁড়া সমাজবাদী কংগ্রেসকর্মীদের কাজ পছন্দ না করলেও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এবং তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণ সমর্থন ও আশীর্বাদ পেয়েছেন বলে সমাজবাদীরা দাবী করছেন।

শ্রীআলগুরাই শাস্ত্রী

শ্রীকামরাজ উদ্যোক্তাদের জানিয়েছেন, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মত না থাকলে সম্মেলন ডাকা উচিত হবে না।

* * *

নতুন শস্য প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশের খাদ্য পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয় নি। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, উত্তরপ্রদেশের দরিদ্র মানুষ শস্য খেয়ে বেঁচে আছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ার কথাও তিনি বলেছেন। কেন্দ্রের সাহায্য ঠিক সময়ে এলেই সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা মনে করি না। সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে না পারলে কোন কাজই হবে না। উত্তরপ্রদেশের ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালিকানা নিয়ে দলগত রাজনীতি কত নিম্নস্তরে নেমেছে তার চিত্র আমরা আগেই তুলে ধরেছি।

আশা করি, মুখ্যমন্ত্রীর নজর এদিকে পড়বে।

কাশ্মীর :

জম্মু ও কাশ্মীরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ

● শ্রীসাদিক

আইনসভার চারজন সদস্য—রহমান গাজী, গোলাম নবী সোগামী, পীর ইয়াইয়া শা, গোলাম আহমেদ সফি এবং অপর দুজনকে ২২শে সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সদর-ই-রিয়াসৎ ডঃ করণ সিং রাজ্য আইনসভার অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য মুলতুবী করে দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীসাদিক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতি যাতে শান্তিভঙ্গের পর্যায়ে না উঠতে পারে, সেদিক বিবেচনা করেই এ কাজ করা হয়েছে। বক্সী গোলাম মহম্মদকে পরে হয়তো মুক্তি দেওয়া হবে এবং দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

বক্সী গোলাম মহম্মদের গ্রেপ্তারের ফলে কাশ্মীরের রাজনৈতিক আকাশ কিছুটা পরিচ্ছন্ন হবে ব..ই আশা করা যাচ্ছে। কামরাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে নেমে এসেই বক্সী আবার পরিত্যক্ত আসন ফিরে পাওয়ার আশায় ঘৃণ্য দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি জাতীয়তা বিরোধী শক্তিগুলোর সঙ্গে আঁতাতের চেষ্টাও কম করেন নি। শেখ আবদুল্লাকেও দলে টানতে চেয়েছিলেন। শেখ সাহেব তখন ঘৃণাভরে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তাঁর গতিবিধি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে পূর্বে জানিয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের প্রয়োজনের কথাও নাকি রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের সময়টাই কেবল কেন্দ্রীয় সরকার জানতেন না।

বক্সীর গ্রেপ্তারের পর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান জোরদার হবে বলেই রাজনৈতিক মহল আশা করেন। এই ভয়টাই প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রীকে পেয়ে বসেছিল। ভয় ছিল, সাদিক-মন্ত্রিসভা তাঁর বিগত কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটিত করে দেবে এবং মামলা রুজু করবে তাঁর বিরুদ্ধে। কেন্দ্রের তিনি একান্ত অনুগত এই ভাবটা বরাবর বজায় রেখে কেন্দ্রের সাহায্যে শ্রীসাদিককে প্রভাবিত করার চেষ্টাও নাকি তিনি অনেকবার করেছেন। জাতীয় সম্মেলনে তাঁর অনুগামীরা একের পর এক তাঁকে ছেড়ে যেতে সুরু করলে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। তখন বক্সীপন্থীরা সুরু করেন বিরোধীদের ভীতি প্রদর্শন করতে।

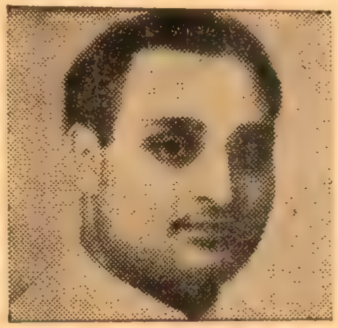

● সদর-ই-রিয়াসৎ করণ সিং

বক্সীর এককালের দক্ষিণ হস্ত, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা সামসুদ্দিন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, বক্সীর দল থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তোলার জিগিরও নাকি বক্সীপন্থীরা তুলেছিল।

● শেখ আবদুল্লা

প্রকাশ, এ সব ঘটনাও কাশ্মীর সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন।

বক্সী ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে সক্রিয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে কাশ্মীর সরকার অদূর ভবিষ্যতে জন-সাধারণের সমর্থন হারাতেন। শ্রীসাদিক নাকি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন যে, বক্সীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করতে পারলে কাশ্মীরের আস্তাবল পরিষ্কারের কাজে সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া সম্ভব নয়।

মহারাষ্ট্র :

শ্রীপলাশপাগর এখন আর মুখ-রোচক আলোচনার কেন্দ্র নন। তবে, তাঁকে সামনে রেখে যে রাজনৈতিক জট পাকিয়ে উঠেছিল তা আরও জটিল হয়েই উঠছে। পলাশপাগরের ব্যাপারটা ছিল নিছক পারিবারিক কলহ। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগটা অবশ্য গুরুতর। সে অভিযোগের একটা ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত একজন

● শ্রীপলাশপাগর

মন্ত্রীর পক্ষে গদী আঁকড়ে থাকা সমীচীন নয়। তাঁর এ ব্যাপার নিয়ে গণমনেও বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পলাশপাগরের পেছনে ছিল শক্ত খুঁটি। শ্রীমোরারজী দেশাই এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি এস দেশাই নাকি তাঁকে আগলে রাখতে চেয়েছিলেন। বসন্তরাও—বিরোধী দল, তাই এ ঘটনা নিয়ে জল ঘোলা করে তুলেছিলেন। টেকচাঁদ কমিটির সামনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসন্তরাওয়ের মাদকতা-বর্জন নীতির বিরোধিতা করাতেই মুখ্যমন্ত্রী পলাশপাগরকে শাস্তি দিয়েছেন বলে প্রচারকার্য চালানো হয়েছিল।

মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়ে পলাশপাগর যে-বিবৃতি দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর ভাষা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। বিধানসভার তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কে এমন সব বিষয় নাকি তিনি ফাঁস করে দেবেন যাতে মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে গুজবের অভাব নেই। শ্রীপলাশপাগর হয়তো সে গুজব নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। এতে পারস্পরিক কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছুই হবে না।

* * *

রাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর এই কোন্দল দেখে মজুতদার ও পাইকাররাও

ধাক্কা পাচ্ছে। খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ীরা এখন সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পথে নেমে পড়েছে। গেল জানুয়ারী মাসের মত তারা খাদ্যশস্য মুনাফা বিধি অনুযায়ী ত্রিমাসিক হিসেব দিয়ে ব্যবসা চালাতে নারাজ। বাজার থেকে খাদ্যশস্য ক্রয় আর তারা করছে না এবং গুদামজাত খাদ্যশস্য খেয়ালখুশিমত বিক্রি করে দিচ্ছে। গত জানুয়ারীতে শিক্ষালাভের পর এবার সরকার অনেকটা তৎপর হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়েছেন, ব্যবসায়ীরা হুঁশিয়ার না হলে তার ফল ভোগ করবে। সরবরাহ-ব্যবস্থা বজায় রাখতে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকার দ্বিধা করবেন না।

আসাম :

রাজধানী শিলংয়ের মানুষ পর্যন্ত সরকারের খাদ্য ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। মানুষের খাদ্যের অযোগ্য চাল সরবরাহ হচ্ছে কয়েক সপ্তাহ ধরে। দুর্গন্ধে তার ভাত মুখে তোলাই দায় হয়ে ওঠে। চালের সঙ্গে ধুলো, বালি, কাঁকর ছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ এক শ্রেণীর দানা, যা' হাঁস ও মুরগীর খাদ্য হতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধৈর্যসহকারে চেষ্টার পর চাল সিদ্ধ হলেও, দানাগুলো কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না। প্রতি কিলোগ্রামে এই দানার ভাগ কম হলেও এক তৃতীয়াংশ। এগুলো বেছে বের করা শুধু সময়-সাধ্যই নয়, রীতিমত দুঃসাধ্য কর্ম। এ চালের দাম দিতে হচ্ছে প্রতি কিলোগ্রামে ৭২ পয়সা। দু'সপ্তাহ এ চাল সরবরাহের পর ঠিক হয়েছে ভাল চাল দেওয়া হবে অর্ধেকটা এবং বাকিটা নিতে হবে ৭২ পয়সার এই চাল।

এ ছাড়া, আরেক ধরণের চালও সম্প্রতি এসে পড়েছে। পোকার আক্রমণ বাঁচাতে গিয়ে এতে নাকি এমন রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয়েছিল, যার ফলে এ চালের ভাত খেয়ে মানুষকে পেটের রোগে ভুগতে হচ্ছে। এ ধরণের চালটা মানুষের রসুইখানায় না গিয়ে

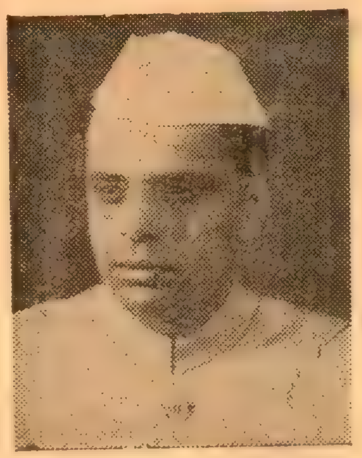

● শ্রী ডি এস দেশাই

বেশির ভাগ চলে যাচ্ছে ভাঁটিখানায়। একমাত্র খাশি-জয়ন্তিয়া পাহাড়েই নাকি অনুমোদিত ও অননুমোদিত ভাঁটিখানার সংখ্যা হাজার পাঁচেক। ভাঁটিখানার মালিকের কাছে চাল বিক্রি করা অধিক লাভজনক। দাম দেয় বেশি এবং নিজেদের স্বার্থে সব ব্যাপারটাই তারা গোপন রাখে।

ভাল চাল পাওয়া যায় না এমনও নয়। হোটেলের মালিক এবং বিত্তবান গৃহস্থের ঘরে সরু, কাঁকরবিহীন চালই যাচ্ছে। তার মূল্য প্রতি কে-জি দেড় টাকা।

সীমান্ত অঞ্চলের অবস্থা অপেক্ষা-কৃত ভাল। কোন কোন সীমান্ত এলাকায় চালের দাম সরকারের নির্দিষ্ট দামের চাইতেও কম। সম্ভবত ওপারে চাল গোপন পথে আসার দরুণই এসব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাল চাল পাওয়া যাচ্ছে। পাকিস্তানের রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় এবার ধান ভাল হয় নি। সম্প্রতি এই দুটি জেলা থেকে উদ্বাস্তু চলে আসায় পাক সৈন্য মোতায়েন রয়েছে সীমান্তে। কাজেই গারো পাহাড়ের মানুষ অন্যান্য সীমান্ত অঞ্চলের মানুষের মত অঢেল সরবরাহ পাচ্ছে না।

গম, ময়দা, চিনি, কেরোসিন, সরষের তেল এবং ডালের সরবরাহও আসামে নিয়মিত নয়। একটা-না-একটা মাঝে মাঝেই বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে যায়। সেই সুযোগে চোরাকারবারীরা খুশিমাফিক মুনাফা লুঠে নেয়। আসামের কোন জেলাতেই এখন সহজ পথে আটা ও গম পাওয়া যাচ্ছে না। নওগাঁ, গৌহাটি, শিলং ও শিলচরে আটা পাওয়া যাচ্ছে না।

আটা না পাওয়ার একটা চলনসই ব্যাখ্যা দিচ্ছে সরবরাহ দপ্তর। তাঁদের মতে বিহারের বন্যাপীড়িত অঞ্চলে চলে গিয়েছে আসামের জন্য বরাদ্দ গম। কলকাতা থেকে গম না আসাতে তাঁরা চাকীর মালিকদের গম সরবরাহ করে উঠতে পারছেন না। গম এখন আসতে সুরু করেছে। দু'দিন বাদে আর আটার অভাব থাকবে না। চিনি, ডাল ও সরষের তেল আসে ভিন্ন রাজ্য থেকে। আমদানী না থাকলেই সৃষ্টি হয় অভাবের।

কেরোসিনের জন্য কিন্তু আসাম পরমুখাপেক্ষী নয়। পাইকারদের কারসাজিতে কেরোসিনও মাঝে মাঝে বাজার থেকে একেবারে উবে যায়। বছর কয়েক আগে কেরোসিনের অভাব সম্পর্কে তদন্তের জন্য সরকার একটি কমিটিও নিয়োগ করেছিলেন। কমিটী সম্পূর্ণ দোষ পাইকারদের বলে রায় দিয়েছিলেন। কোন কোন পাইকারের নামও কমিটীর রিপোর্টে ছিল। সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি।

• • •

গত ফেব্রুয়ারী মাসের পুলিশের গুলীচালনা সম্পর্কে নিযুক্ত নাইডু কমিশনের রিপোর্ট নাকি সরকারের হাতে এসে গেছে। প্রকাশ, কমিশন পুলিশের কাজ সমর্থন করে রায় দিয়েছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য ও রিপোর্ট রয়েছে। কমিশন নাকি সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণের পর এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, গুলীচালনার পর পুলিশ নিজেদের পথটা পরিষ্কার রাখার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। আহতদের দিকে নজর দেবার—তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং হাসপাতালে পাঠাবার আয়োজনের ফুরসৎ তখন পুলিশের ছিল না।

আন্তর্জাতিক

● ডি ভ্যালেরার সঙ্গে আলাপরত ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ

ন'দিনব্যাপী সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ লণ্ডন হয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে পৌঁছন। আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঁচদিনব্যাপী শুভেচ্ছা-সফর সমাপ্ত করে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ২৭শে সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে ফিরে এসেছেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের আয়ার্ল্যাণ্ড সফর অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই প্রথম কোন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি আয়ার্ল্যাণ্ডে গেলেন। আইরিশ জনসাধারণ সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। সরকারী সৌজন্যের বাধা গণ্ডী অতিক্রম করে জনসাধারণের অন্তরকে স্পর্শ করেছেন ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

ভারতের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ড উভয় দেশেই জনসাধারণকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। দুই দেশের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিনেই মৈত্রীবন্ধন গড়ে ওঠে। ভারতবাসী উৎসাহের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করেছে। দুই দেশেই স্বাধীনতা আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে। ইংরেজের বিভেদনীতির শিকার হয়েছে দুই দেশই—শাসন তুলে নেবার পূর্বক্ষণে দুই দেশকেই বিভক্ত করে রেখে গেছে ইংরেজ।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ডাবলিন থেকে কয়েক মাইল দূরে আরবার হিলে গিয়ে ১৯১৬ সালের ইস্টার বিদ্রোহের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বীর আইরিশ মুক্তি-সংগ্রামীদের উদ্দেশে সকল ভারতবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতির শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ আইরিশ মানুষকে এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে অভিভূত করেছে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্ষীয়ান রাষ্ট্রপতি ও আইরিশ মুক্তি-সংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা ইমন ডি ভ্যালেরা, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী সিয়েন লেমাস ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দুই দেশের সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

কাশ্মীর সম্পর্কে আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতৃবৃন্দের মনে অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ভারত সরকারের বহির্দেশীয় প্রচার-ব্যবস্থা সর্বত্রই এত দুর্বল যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের বক্তব্য কোথাও ঠিকমত তুলে ধরা হয় নি। আয়ার্ল্যাণ্ডেও ভারতের বক্তব্য যথাযথ-ভাবে রাখা হয় নি। তাই দেখা যায়, দু' বছর পূর্বে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যখন কাশ্মীর প্রসঙ্গ ওঠে তখন আয়াল্যাণ্ড ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে সমর্থন করে নি—পাকিস্তানের দাবীর প্রতিই তার সমর্থন জানিয়েছিল।

এবার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিস্তৃতভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা, প্রধানমন্ত্রী সিয়েন লেমাস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক আইকেনের সঙ্গে কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে আইরিশ নেতৃবৃন্দ ভারতের বক্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। সফর শেষে প্রদত্ত যুক্ত-বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ড উভয়েই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব সমর্থন করে। আইরিশ নেতৃবৃন্দ এর দ্বারা ভারতের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছেন।

যুক্তবিবৃতিতে নিরস্ত্রীকরণের দাবী করা হয়েছে, এবং আংশিক নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিকে সমর্থন করা হয়েছে। ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে অধিকতর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করার বিষয়েও আলোচনা হয়। কঙ্গোয় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীতে ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সৈন্য একত্র পাশাপাশি কাজ করায় উভয় দেশের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, নেতৃবৃন্দ সে বিষয়ে উল্লেখ করেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণকে আইরিশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা

জানানো হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি নাগরিক অনুষ্ঠানে তিনি যোগ দেন।

ঘোষণা করা হয়েছে, ইমন ডি ভ্যালেরা বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও ভারত পরিভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীও ভারতে আসবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্র্যাঙ্ক আইকেন অল্পদিনের মধ্যেই ভারতে আসবেন বলে জানা গিয়েছে।

নেহরু-উত্তর ভারতে পারস্পরিক প্রীতিসম্পর্ক স্থাপনের যে নতুন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, তার মধ্যে আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্থান দিয়ে ভারত সরকার বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আয়ার্ল্যাণ্ড ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বহীন নয়। ভারতের মতই আয়ার্ল্যাণ্ড শান্তিপ্রিয় ও জোট-নিরপেক্ষতার নীতিতে বিশ্বাসী। আর সবচেয়ে বড় কথা, স্বাধীনতা-আন্দোলনের দিনের মৈত্রীসম্পর্কের জন্য এখন অনায়াসেই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সফর নিশ্চিতভাবে ভারত ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে এই মৈত্রীবন্ধনকে দৃঢ় করেছে।

বৃটেন ঃ

আগামী ১৫ই অক্টোবর বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই হবে বৃটেনের ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন।

কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টি, উভয় দলই বর্তমানে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ব্যস্ত। লিবারেল পার্টিও অন্তত ৮।১০টি আসনে জয়লাভের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এ পর্যন্ত কোন নির্বাচনে একটি আসনেও জয়লাভ না করা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টিও ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

১৯৫১ সালে কনজারভেটিভ পার্টির হাতে পরাজিত হয়ে শাসনভার ছেড়ে দেবার পর এই প্রথম বৃটেনের নির্বাচনে আবার লেবার পার্টির জয়ের সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। ৪৭ বছর বয়স্ক হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি এবার জয়লাভ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। উইলসন মাত্র ৩১ বছর বয়সে এটলী-মন্ত্রিসভায় বাণিজ্য-মন্ত্রিরূপে যোগ দেন—ছোট পিটের পর এত অল্প বয়সে আর কেউ বৃটেনের মন্ত্রী হন নি। উইলসনের নেতৃত্বে লেবার পার্টি নিজেদের সব অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জয়লাভের চেষ্টা করছে।

কনজারভেটিভ পার্টির নেতা ৬১ বছর বয়স্ক বর্তমান প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার ডগলাস হিউম নিজ দলের শাসন বজায় রাখবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এ কথা ঠিক, ম্যাকমিলান পদত্যাগ করার সময় প্রফিউমো কেলেঙ্কারী ও অন্যান্য কারণে কনজারভেটিভ পার্টির যে দুর্গতি হয়েছিল, বর্তমানে দল সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। হিউম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণ আস্থা নিয়ে নির্বাচক-মণ্ডলীর সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি লেবার পার্টির নেতৃত্বকে 'দায়িত্ব-জ্ঞানহীন' বলে অভিহিত করেছেন, এবং 'বৃটেনের সমৃদ্ধি রক্ষার জন্য' কনজারভেটিভ পার্টিকে জয়যুক্ত করার জন্য নির্বাচকদের কাছে আবেদন করেছেন। হিউম বৃটেনকে একটি পরমাণু-শক্তিরূপে গড়ে তুলতে চান বলে ঘোষণা করেছেন।

হ্যারল্ড উইলসন 'নতুন বৃটেন' গঠনের জন্য লেবার পার্টির পরিকল্পনা নিয়ে নির্বাচকদের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। কনজারভেটিভ পার্টির শাসনে বৃটেন তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়েছে, সাধারণ বৃটেনবাসীর জীবনযাত্রার মান নেমে গেছে, এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞানে বৃটেন পিছিয়ে পড়েছে। তাই বৃটেনকে বাঁচাবার জন্য আজ লেবার পার্টিকে জয়যুক্ত করা প্রয়োজন।

তবে কিছুদিন পূর্বে লেবার পার্টির জয়লাভ সম্পর্কে যেরূপ নিশ্চিত ভাব ছিল, বর্তমানে তা কিছুটা কমে গেছে বলে মনে হয়। পূর্বের 'গ্যালপ পোলে' লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ে শতকরা ১৩টি বেশি ভোট পাবে বলা হয়েছিল, আর বর্তমানে বলা হচ্ছে লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টির চেয়ে মাত্র শতকরা ২.৫ ভোটে

• হ্যারল্ড উইলসন

● করমর্দনরত আলেক ডগলাস হিউম ও ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

এগিয়ে আছে। অবশ্য এ সবই অনেকাংশে কাল্পনিক। তবু কে নির্বাচনে জিতবে, এখনই জোর করে বলা শক্ত।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

মস্কোতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে চীনের প্রতিনিধিরা অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের কাছে ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছেন।

ওয়ার্লড্ ইয়ুথ ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ১০০০ প্রতিনিধি যোগ দেন।

চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা লিয়াং কেং তাঁর বক্তৃতায় ক্রুশ্চভের প্রতি কটাক্ষপাত করায় অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা তাঁকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেন এবং 'ম্যাঁও', 'ম্যাঁও' শব্দ করে তাঁকে বিদ্রূপ করে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রীপূরণ সিং আজাদ তাঁর বক্তৃতায় চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের নিন্দা করায় লিয়াং কেং ভারতের বিরুদ্ধেও বিষোদ্গার করেন। তিনি বলেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় ভারত চীনকে আক্রমণ করেছে।

সম্মেলনের অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাঁদের বক্তৃতায় চীনের সমালোচনা করেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, চীন ও তার সমর্থকদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীন-ভারত বিবাদ নিষ্পত্তির প্রস্তাব এই সম্মেলনে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। সিংহল ও ঘানা কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবে বলা হয়, চীন-ভারত বিবাদের জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সুতরাং কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে অবিলম্বে উভয় রাষ্ট্রের পক্ষেই বিবাদটি মিটিয়ে ফেলা উচিত। প্রস্তাবের পক্ষে ১১৯টি ভোট এবং বিরুদ্ধে মাত্র ৮টি ভোট পড়ে। ২১টি সংগঠন ভোটদানে বিরত থাকে। চীন, ইন্দোনেশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও উত্তর ভিয়েৎনাম মাত্র এই ৪টি দেশের ৮টি সংগঠন (৮ ভোট) প্রস্তাবের বিরোধিতা করে।

ভারত বরাবরই বলে এসেছে, কলম্বো প্রস্তাব ভারত গ্রহণ করেছে, সুতরাং কলম্বো প্রস্তাবের ভিত্তিতে চীনের সঙ্গে আলোচনা করতে সে সব সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু চীন কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। তাই মস্কো সম্মেলনের এই প্রস্তাব ভারতের পক্ষে এক মস্ত বড় জয় বলতে হবে।

আরও উল্লেখযোগ্য, এই সম্মেলনে আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা প্রায় সবাই এবার ভারতকে সমর্থন করেছেন। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া—সর্বত্র চীনের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ছে, মস্কো সম্মেলন সে কথাই প্রমাণ করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য নির্বাচনের মহড়াও জোর এগিয়ে চলেছে। নিউ ইয়র্ক থেকে সেনেট-আসনের নির্বাচনে ববি কেনেডির প্রতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

মার্কিন রাজনীতিতে কেনেডি-পরিবার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির মৃত্যুতে তা সাময়িকভাবে হ্রাস পেলেও প্রাক্তন এ্যাটর্নি জেনারেল ববি কেনেডির সেনেট-আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেই প্রভাব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা। ইতিপূর্বে ববি ডেমোক্র্যাটিক দলের পক্ষ থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লিণ্ডন জনসন তাঁর মনোনয়ন সমর্থন করেন নি। তাই শেষ পর্যন্ত সেনেট-আসন নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট হতে হয়েছে। তবে সেনেটে নির্বাচিত হলে তিনি অদূর ভবিষ্যতে উপরাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাববেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ববি কেনেডির নির্বাচনে সাফল্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। জন কেনেডির ভ্রাতারূপে এবং এ্যাটর্নি জেনারেলরূপে নিজের কৃতিত্বের জোরে তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়। নিউ ইয়র্কের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতারা উৎসাহের সঙ্গে ববিকে সমর্থন করছেন। তাছাড়া নির্বাচনে জয়লাভের জন্য যে অর্থ ও সংগঠন প্রয়োজন, দুই-ই কেনেডি পরিবারের যথেষ্ট রয়েছে। নিউ ইয়র্কের বিপুল সংখ্যক নিগ্রো ও আইরিশ

ক্যাথলিক ভোটারের ওপর ববি যথেষ্ট ভরসা রাখেন। ইতালীয় ক্যাথলিকরা অবশ্য তাঁর বিরোধিতা করবে।

তবে ববি কেনেডির প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির বর্তমান সেনেট-সদস্য কেনেথ কিটিং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রার্থী। তাঁর জনপ্রিয়তা যথেষ্ট, এবং সেনেটের তিনি একজন প্রভাবশালী সদস্য। নাগরিক অধিকার বিলের সমর্থন করায় এবং গোল্ডওয়াটারের মনোনয়নের বিরোধিতা করায় উদারনৈতিক নিউ ইয়র্কবাসী ও নিগ্রোদের অনেকেরই সমর্থন তিনি পাবেন। এই অবস্থায় নিউ ইয়র্কের রাজনীতিতে নতুন ববি কেনেডির পক্ষে কেনেথ কিটিং-কে পরাজিত করা সম্ভব হবে কিনা বলা শক্ত।

মাল্টা :

১৬৪ বছর বৃটিশ শাসনে থাকার পর গত ২১শে সেপ্টেম্বর ক্ষুদ্র দ্বীপ মাল্টা স্বাধীনতা লাভ করেছে। এই উপলক্ষে মাল্টার রাজধানী ও প্রধান শহর ভ্যালেটিয়ায় এক জাঁকজমক-পূর্ণ অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে মাল্টার নতুন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

এই অনুষ্ঠানে ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে উপনিবেশ ও কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডস এবং রাণী এলিজাবেথের পক্ষ থেকে ডিউক অব্ এডিনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মাল্টার প্রধান-মন্ত্রী স্যার বর্গ অলিভারের কাছে এক শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন।

সংলগ্ন আরও দুটি ক্ষুদ্র দ্বীপ গোজো ও কোমিনো নিয়ে মাল্টা কমনওয়েলথের ১৯তম সদস্য হবে। ১২২ বর্গমাইল এলাকার এই দ্বীপের লোকসংখ্যা মাত্র ৩,৩০,০০০। ১৮০২ সালে এখানে প্রথম বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়, আর ১৮১৪ সালে পুরোপুরি দ্বীপটিতে বৃটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাল্টা স্বাধীন হলেও আপাতত এখানে ইংরেজ সামরিক ঘাঁটি থাকবে বলে স্থির হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমত ফাঁপরে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে ও বহু সহস্র মার্কিন সৈন্য নিয়োগ করেও কমিউনিস্ট ভিয়েৎ কং বিদ্রোহীদের দমন করা যায় নি। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ভিয়েৎ কং-কে সমর্থন করে, তাছাড়া উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের সাহায্য তারা পাচ্ছে। এই সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করা মার্কিন সাহায্যপুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

অপরদিকে আবার দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের ঘরোয়া রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্বও মার্কিন কর্তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। দীর্ঘকাল তাঁরা নগো দিন দিয়েমকে সমর্থন করে আসছিলেন। কিন্তু গত বছরের বিদ্রোহে দিয়েম সরকারের উচ্ছেদের সময় মার্কিন সরকারেরও প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল এই বিদ্রোহের পশ্চাতে। তারপর থেকে আরও তিনবার ক্ষমতার অদল-বদল হয়েছে। মার্কিন কর্তারা এখন জেনারেল নেগুইন খানকে সমর্থন করছেন। নেগুইন খানের বিরুদ্ধে দেশবাসীর মনে ব্যাপক বিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও মার্কিন সাহায্যের জোরে এখনও তিনি টিকে আছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে বৌদ্ধ ও ক্যাথলিক সাম্প্রদায়িক বিরোধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিব্রত ও বিচলিত।

দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর মার্কিন কর্তারা আজ বুঝেছেন, সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভিয়েৎ কং-কে দমন করা যাবে না। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দুর্বল ও অক্ষম সরকারের দ্বারা কোন শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। তাছাড়া যে ১৮,০০০ মার্কিন সৈন্য বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে রয়েছে, তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবীও ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর ওয়াশিংটনে সরকারী কর্তাদের সঙ্গে এই বিষয়ে চারদিন ধরে আলোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি কর্তাদের

• ববি কেনেডির নির্বাচনী সভা

এই কথাই বুঝিয়েছেন, যুদ্ধের পথে নয়, একটি রাজনৈতিক আপোষ-নিষ্পত্তির দ্বারা ভিয়েৎনাম সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা উচিত। সায়গন ফেরার পূর্বে ম্যাক্সওয়েল টেলর সাংবাদিকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেন: 'সব যুদ্ধের শেষেই রয়েছে আপোষ-আলোচনা।'

ভিয়েৎনাম প্রসঙ্গে আপোষরফা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে খুব একটা আপত্তি হবে না বলেই মনে হচ্ছে। তবে এমনভাবে আপোষ করতে হবে, যাতে মার্কিন মর্যাদা রক্ষিত হয়, এবং ভিয়েৎনামকে উপলক্ষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের আর সম্প্রসারণ না হয়। এখন প্রশ্ন হল, আপোষের উদ্যোগ গ্রহণ করবে কে?

পাকিস্তান:

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আয়ুব খাঁর সঙ্গে ৭০ মিনিট ধরে আলোচনার পর এক যুক্তবিবৃতিতে কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বলেছেন, কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছানুসারে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। 'গণভোট' কথাটি ব্যবহার না করলেও রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের উল্লেখ করে সোয়েকার্নো গণভোটের দাবীর প্রতিই প্রকারান্তরে সমর্থন জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক নির্লজ্জভাবে মালয়েশিয়া আক্রমণে ভারত ক্ষুব্ধ এবং মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি ভারত অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। তাই সোয়েকার্নো ভারতের ওপর খাপ্পা হয়ে রয়েছেন। এ অবস্থায় তিনি যে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাবেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে? পাকিস্তান মালয়েশিয়াকে সমর্থন করে নি, তাই তার পুরস্কার সে পেয়েছে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে।

• রাওয়ালপিণ্ডিতে আয়ুব-সোয়েকার্নো মোলাকাত

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল সংবাদপত্রের ওপর নির্দেশ জারী করেছেন, ছাত্র আন্দোলন সংক্রান্ত কোন সংবাদ একমাস দৈনিক, সাপ্তাহিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, কোন পত্রিকায় ছাপা চলবে না।

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছেন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। পাকিস্তানে যে সামান্য গণতন্ত্রও সহ্য করা হবে না, এ ঘটনা তারই প্রমাণ। তবে এত করেও বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানকে দমন করা যাবে না।

* * *

আয়ুব খাঁর নিদ্রা টুটে গেছে। ২০শে সেপ্টেম্বর মিস ফতেমা জিন্নার প্রথম নির্বাচনী সভায় করাচীতে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছে। উচ্ছ্বসিত জনতা যেভাবে ৭০ বছর বয়স্কা এই বর্ষীয়সী মহিলাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, তা পাকিস্তানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। জনতা মুহুর্মুহু 'মাদার-ই-মিল্লাত' বা 'জনসাধারণের মাতা' বলে মিস জিন্নাকে স্বাগত জানায়।

মিস জিন্না এই সভায় আয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য তিনি জনসাধারণকে উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান।

যেভাবে মিস জিন্নার প্রার্থীপদ পাকিস্তানের সমস্ত বিরোধী দল ও জনসাধারণ সমর্থন করছে, তাতে আয়ুব খাঁ ও তাঁর সমর্থকেরা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখন তাঁরা প্রচার সুরু করেছেন, কোন মহিলার পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলাম-বিরোধী, এবং বার্ধক্যপীড়িত মিস জিন্নার পক্ষে রাষ্ট্রপতির কঠোর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু এ সব প্রচারে বিশেষ কোন ফল হবে বলে মনে হয় না।

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ পঁচিশ ॥

কলেজ খুলেছে, কাজের চাপ বেড়েছে শর্মিলার। বইটার কাজও খানিকটা এগিয়েছে। তা ছাড়া থীসিসটা শেষ করবার ভাবনাও পেয়ে বসেছে নতুন করে। প্রভাকর এর ভেতরে আর রাঁচীতে আসেন নি, কিন্তু চিঠিপত্রে শর্মিলার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। প্রভাকর কিছু নতুন তথ্য দিয়েছেন, অনেকগুলো ভালো বইয়ের সন্ধান জানিয়েছেন।

গায়ত্রীর সঙ্গে এক সময় যে ঘনিষ্ঠতাটা বেড়ে উঠেছিল, সম্প্রতি একটু ভাঁটা পড়েছে তাতে। শর্মিলা কাজ করতে চান, রিসার্চ করতে চান। নিজের নিঃসঙ্গ মনের ভেতরে যে কৃষ্ণচূড়ার আলো জ্বলছে, তার দরজাটা বন্ধ করে রাখতে চান; গায়ত্রীও মিস্টার শর্মার চিঠিকে ভুলে থাকতে চান—যে জীবন একদিন তাঁকে বঞ্চনা করে চলে গেছে, তার সব প্রলোভনকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে চান তিনি। একদিন একই বেদনার সূত্রে দুজনে এক সঙ্গে মিলেছিলেন, গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব যেন কিছুক্ষণের জন্যে শর্মিলার ওপর মোহও ছড়িয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে ডক্টর প্রভাকর ভৌমিক এসে সব অন্যরকম করে দিয়েছেন। কিরণ বসু শর্মিলাকে এক নিভৃত বেদনার বৃত্তের মধ্যে নির্বাসন দিয়েছিল, প্রভাকর তাঁকে একটা পরিব্যাপ্ত চিন্তা আর কাজের জগতে মুক্তি দিয়েছেন।

শর্মিলা ভেবেছেন, এই-ই ভালো। কাজ—কাজ—কাজ। রাত্রির পর রাত্রি অনিদ্র জাগরণ, অর্থহীন যন্ত্রণায় বার বার পীড়িত হতে থাকা, অমিতাভর স্মৃতিকে তিনি অসম্মান করছেন—দিনের পর দিন এই গ্লানিবোধ—এ সমস্ত দুঃসহতা থেকে তাঁকে উদ্ধার করেছে প্রভাকরের একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এখনো এক-একটা রাত স্মৃতিতে মন্থর হয়ে ওঠে, এখনো সেই পাহাড়, সেই ফুল আর সেই মানুষটি নেশা-জড়ানো স্বপ্নের মতো চেতনাকে অভিভূত করে। শর্মিলা লজ্জা পেয়েছেন, নিজেকে ধিক্কার দিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত ভেবেছেন, থাক। মনের অ্যালবামে মানুষ অনেক ছবি জমিয়ে রাখে, এও থাক। মাঝে মাঝে পুরোনো ছবিগুলো দেখতে দেখতে যদি কিছুক্ষণের মগ্নতা আসে, তাতে কোনো অপরাধ নেই। কাজের জীবনটা তো সামনে পড়েই রইল।

আপাতত এই ভাবেই একটা সমাধান এসেছে। শর্মিলা কলেজের ক্লাস, পাবলিশরের কপি আর ক্যাকটাসের জীবন-রহস্য নিয়ে যথাসম্ভব ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু গায়ত্রীর সঙ্গে একান্তে বসবার আর সুযোগ হয় নি। গায়ত্রী আবার নিজের যোগবাশিষ্ঠে ডুব দিয়েছেন, শর্মিলার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে মৃদু হাসির বিনিময় ছাড়া আর বিশেষ কোনো কথা হয় না। এক সঙ্গে 'রামচরিত মানস' পড়বার পরিকল্পনাও সূচনাতেই শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া মেসে অন্যান্য প্রফেসারেরাও এসে গেছেন,

দুজনের জন্যে কিছুক্ষণ নিভৃত অবসরও খুঁজে পাওয়া কঠিন।

কলেজের ল্যাবরেটরীর জন্যে কিছু রিকুইজিশন দিয়েছিলেন শর্মিলা। কতকগুলো স্পেসিমেন দরকার, কিছু যন্ত্রপাতিও চাই। সেই সূত্রেই প্রিন্সিপ্যাল ডেকে পাঠালেন।

—মিসেস রায়চৌধুরী, কাল সেক্রেটারী কলকাতা যাচ্ছেন তিন দিনের জন্যে। আপনার ল্যাবরেটরীর জিনিসপত্রগুলো কেনবার জন্যে দরকার হলে আপনিও সঙ্গে যেতে পারেন।

শর্মিলা একটুখানি ভাবলেন। এ-সব ব্যাপারে নিজে যাওয়াই সুবিধে। দেখে শুনে নেওয়া যায়।

প্রিন্সিপ্যাল আবার বললেন, শেষে আপনিই কমপ্লেন করবেন, এটা ঠিক হল নি, ওটা এল না। আমি ও-সব ঝামেলার মধ্যে যেতে চাই না। আপনার ডিপার্টমেন্টের জিনিস আপনিই পছন্দ করে নেবেন।

—বেশ, যাব।

—তা ছাড়া আর একটা কাজও করতে হবে। কলেজে এত বাঙালী স্টুডেন্ট, অথচ ওরা বলে, লাইব্রেরীতে ভালো বাংলা বই নেই। আমি তো বাংলা বইয়ের খবর কিছু জানি না, আপনি বাংলার প্রফেসারের সঙ্গে কথা বলে একটা লিস্ট করে নিয়ে যান। শ' পাঁচেক টাকার মতো একটা অর্ডার দিয়ে আসবেন।

—তাই হবে।

শর্মিলা খুশি হয়ে চলে এলেন। বছর তিনেক কলকাতা যাওয়া হয় না—সেদিক থেকে একটা আকর্ষণ আছেই। বড়ো মামা কলকাতায় আছেন, শর্মিলাকে ভারী ভালো-বাসেন, তাঁর ওখানেও আনন্দে দুটো দিন কাটিয়ে আসা যাবে। অবশ্য কেনা-কাটার হাঙ্গামে বেশি সুযোগ-সময় পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেটুকু পাওয়া যাবে, তাই লাভ।

আর—সারা শরীর-মন শিউরে দিয়ে আর একটা কথা চমকে উঠল। কিরণের সঙ্গেও তো একবার দেখা হয়ে যেতে পারে।

শর্মিলা করিডোরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তের মধ্যে মাতলামি সুরু হল হৃৎপিণ্ডে। জানতেও পারলেন না, মুখের রঙ তাঁর বদলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি।

লক্ষ্য করলেন আর একজন। রেজিস্ট্রী নিয়ে ক্লাসে চলেছিলেন ইকনমিক্সের মিস্ সেন। শর্মিলার দিকে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হল আপনার শর্মিলাদি? এমন করে দাঁড়িয়ে যে?

শর্মিলা লজ্জায় চকিত হয়ে উঠলেন। বললেন, না—কিছু নয়।

পাশেই জুয়োলজীর ল্যাবরেটরী। পর্দা সরিয়ে শর্মিলা ঢুকে পড়লেন তার ভেতরে। এখন কোনো প্র্যাক-টিক্যাল ক্লাস নেই, দুজন অধ্যাপিকা অফ পিরিয়ডে বসে সেখানে চা খাচ্ছিলেন এবং আড্ডা দিচ্ছিলেন। তাঁর একজন সদ্যোবিবাহিতা এবং আর একজনের পূর্বরাগ চলছে। সুতরাং আলোচনাটার সঙ্গে জুয়ো-লজীর বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

তাঁকে দেখেই বিবাহিতা পাঞ্জাবী মেয়েটি কলধ্বনি করে উঠলেন।

—আসুন শর্মিলাদি, আসুন। আপনি ইলার একটা প্রবলেম সল্ভ্ করে দিয়ে যান।

কুমারী ইলার মুখ সিঁদুরের মতো রাঙা টকটকে হয়ে উঠল।

—কী হচ্ছে কমলেশকুমারী। না শর্মিলাদি, ও বড্ড বাজে বকে, ওর কথায় কান দেবেন না।

কমলেশকুমারী বললেন, চালাকি নয়, শর্মিলাদি বোঝবার লোক। ওঁর কাছ থেকে একটা অনেস্ট অ্যাডভাইস পাওয়া যাবে। শর্মিলাদির এখন ক্লাস নেই তো? ভেরী গুড। আসুন—হ্যাভ এ কাপ অফ টী উইথ আস, তারপর ইলাকে একটুখানি ভরসা দিয়ে যান।

ইলা পালাতে চাইছিল, কমলেশ-কুমারী তাঁর টেনিস-খেলা শক্ত মুঠোতে ইলার বাহু চেপে ধরলেন।

—উঁহু, পালালে চলবে না, দ্য ম্যাটার ইজ ভেরী আর্জেন্ট।

মৃদু হেসে একটা চেয়ার টেনে শর্মিলা বসে পড়লেন। তারপর হাসিতে গল্পে যে আলোচনা চলতে লাগল, তা অ্যাকাডেমিক নয়, একস্ট্রা অ্যাকা-ডেমিক নয়, একান্তই মেয়েদের। সে আলোচনা সম্পর্কে পুরুষের কৌতূহলের অন্ত নেই, আর সৃষ্টির আদিম কাল থেকে সেই আলোচনায় চিরদিন পুরুষের শ্রুতি-নিষিদ্ধ।

আর ধীরে ধীরে শর্মিলার রক্ত

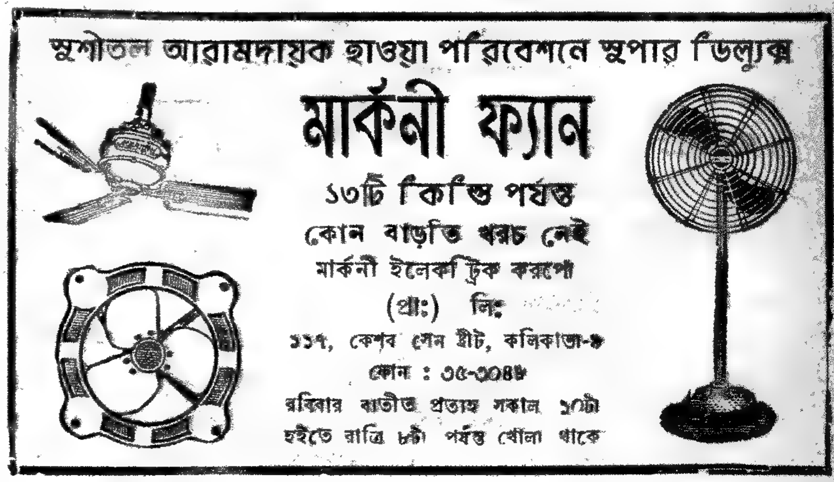

নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল, বুক ভরে যেন ফুটে উঠতে লাগল কৃষ্ণচূড়া। কলকাতায় গেলেই কিরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হতে পারে। কিন্তু দেখা করা উচিত হবে? যে সুখে ঝলমল করছে সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী কমলেশকুমারী, কিশোরী মেয়ের মতো ছোটখাটো ইলা যে স্বপ্নে তন্ময়, তাতে কতটুকু দাবি আছে শর্মিলার? হাসি-গল্পের ক্ষেত্রে কড়া পিউরিটান তিনি নন, ধর্ম নিয়ে যেমন সহজেই আলাপ করতে পারেন গায়ত্রীর সঙ্গে, তেমনি সম্পূর্ণ বিজাতীয় আলোচনাতেও তাঁর সেই নিরাসক্ত সান্নিধ্য আছে। অন্তত এতদিন এমনি করেই চলছিল। কিন্তু আজ কমলেশের প্রতিটি রসিকতা তাকে স্পর্শ করছে, ইলার লজ্জার রঙ ছড়িয়ে পড়ছে তাঁরও মনে।

কিরণের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। দেখা করা উচিত নয়। এ সেই আদিম বন্য আকর্ষণ—যা অমিতাভর স্মৃতি থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে আনে, যা প্রভাকরের কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত প্রেরণাকে ভুলিয়ে দেয়, যা মহাকাল মন্দিরের ঝর্ণায় পা পিছলে যাওয়ার মতো একটা মৃত্যুর অতলে তাঁকে আকর্ষণ করে।

কমলেশ উঁচু গলায় হেসে উঠেছিলেন। কিন্তু শর্মিলা আর কোনো কথা শুনতে পেলেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে সামনের কাচের জারের দিকে। একটি ছোট অক্টোপাশ ফর্মালিনের মধ্যে ডুবে আছে—যেন শর্মিলার দিকেই বাড়িয়ে রেখেছে একটি শুঁড়—দেখা যাচ্ছে অসংখ্য ভ্যাকুয়াম বিবর—যার হাত থেকে শিকারের কোনোদিন নিষ্কৃতি মেলে না।

শর্মিলা কিরণের সঙ্গে দেখা করতে চান না। কিন্তু সামলাতে পারবেন প্রলোভন?

হঠাৎ মনে হল, অক্টোপাশের শুঁড়টা যেন নড়ে উঠল একবার। শর্মিলা চমকালেন। না—মনের ভুল। দু'বছর ধরে অক্টোপাশটা ওইভাবেই ফর্মালিনের ভেতরে তলিয়ে আছে।

শর্মিলা ঘড়ির দিকে তাকালেন। আর মিনিটদশেক দেরি আছে ঘণ্টা পড়তে।

—উঠি, ক্লাস আছে।

কমলেশ বললেন, কিন্তু অ্যাডভাইসটা কী হল, শর্মিলাদি?

শর্মিলা জোর করে হাসলেন। বললেন, ভেবে দেখব।

ল্যাবরেটরীর বাইরে এসে একবার ভাবলেন, এখুনি প্রিন্সিপ্যালকে গিয়ে বলবেন, কাল তিনি কলকাতায় যেতে পারবেন না, তাঁর শরীর ভাল নেই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ছিঃ—ছিঃ এতটুকু আত্মবিশ্বাস নেই তাঁর?

কলকাতায় তিনি যাবেন। কিন্তু কিরণের সঙ্গে দেখা করবেন না। না, কিছুতেই নয়।

রাজেনবাবু বলছিলেন, বেশ ইণ্টারেস্টিং তো।

বিমর্ষ ক্লান্ত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কিরণ। তারপর বললে, হ্যাঁ এও একরকম শক-থেরাপী। তবে মারাত্মক শক। সামলে উঠতে বেশ সময় লাগবে।

—তা লাগুক, কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ডাক্তারেরা বলছেন, আপনার স্ত্রীর মেমোরি রিভাইভ করবে? সেরে উঠতে পারেন?

—অসম্ভব নয়। অল্প অল্প লোক চিনতে পারছে মনে হয়।

—অদ্ভুত ব্যাপার।

—খুব অদ্ভুত কিছু নয়।—কিরণ শীর্ণভাবে হাসল: মেণ্টাল শকে পাগল হয়ে গিয়েছিল, ভায়োলেণ্ট ফিজিক্যাল শক আবার এলোমেলো যন্ত্রটাকে চালু করে দিয়েছে। অনেক সময় যেমন বন্ধ ঘড়ি হঠাৎ ঝাঁকুনি লেগে আবার চলতে সুরু করে দেয়।

—তা হোক। ভালো হওয়া নিয়ে কথা। আপনি জীবনে সুখী হোন মশাই, এই কামনাই আমরা করি।

—সুখ? কিরণ আবার হাসতে চেষ্টা করল: ও জিনিসটা ঠিক বুঝি না, মানুষ কোথা থেকে কী ভাবে যে পায় তাও জানি না। কিন্তু প্রতিমা সেরে উঠলেই কি সব কিছুর জট খুলে যাবে? তার যে মনটা এমন করে তাকে পাগলামির অন্ধকারে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, সে মন তো বদলাবে না। আবার কোথায় একটা নতুন ঝাঁকুনি লাগবে, চলতি ঘড়িটা হয়তো ফের এক সময় বন্ধ হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে রাজেনবাবু বললেন, কিছু মনে করবেন না। সেই ঝাঁকুনিটা যাতে না লাগে সেদিকে তো আপনিও দৃষ্টি দিতে পারেন, মানে সাধ্যমতো সজাগ থাকতে পারেন।

কিরণ বললে, পারি। কিন্তু পৃথিবীর সবই কি ঠেকাতে পারি আমি? কোনো গাছ যদি বাতাস থেকেও বিষ টেনে নিয়ে নিজের ডালে পাতায় ছড়িয়ে দেয়, তাকেও কি রক্ষা করবার শক্তি আমার আছে?

কথাটা রূপকের মতো ঠেকল। রাজেনবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিরণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ঠিক এমনি সময় পাশের টেলিফোনটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

রাজেনবাবু রিসিভার তুললেন।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস মূল্য ৩।০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস মূল্য ৩।০
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

—মেট্রোপলিস পাবলিশার্স। রাজেন ব্যানার্জী বলছি।

ফোনের আর একপ্রান্ত থেকে মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল: আপনাদের একজন অথরের অ্যাড্রেস আমাকে দিতে পারেন?

—বলুন।

—আমি — আমি—কিরণ বসুর ঠিকানা চাইছি—।

কিরণের দিকে মাথা ঘুরিয়ে রাজেনবাবু হাসলেন। বললেন, কিরণবাবু এখন এখানেই বসে আছেন। তাঁকেই ফোনটা দেব কি?

ফোনের ওধারে হঠাৎ স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। কয়েক সেকেণ্ড পরে ভীরু অনিশ্চিত গলায় মেয়েটি বললেন, না—থাক, তাঁকে আর বিরক্ত—আচ্ছা, দিন একবার।

রাজেনবাবু কিরণের দিকে রিসিভার বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আপনারই ফোন।

—কে ডাকছে?

—একটি মহিলা। আপনার অ্যাড্রেস চাইছিলেন।

—অ্যাড্রেস দিলেই পারতেন, আবার ধরিয়ে দিলেন কেন? মেয়েরা কথা কইতে সুরু করলে আর ছাড়ে না—বিরক্ত হয়ে কিরণ রিসিভার টেনে নিলে। কিরণ বোস বলছি।

ফোনের ওপারে আবার কয়েক সেকেণ্ড অনিশ্চিত স্তব্ধতা জমে রইল। তার একটা দ্রুত নিঃশ্বাসের সঙ্গে শোনা গেল প্রায় অস্পষ্ট গলার স্বর: আমি—আমি শর্মিলা।

—কে? —সমস্ত স্নায়ুকে উদগ্র চঞ্চল করে কিরণ জিজ্ঞেস করল: কে?

—শর্মিলা। শর্মিলা রায়চৌধুরী।

রাজেনবাবু কী ভাবছেন, কী অর্থ করে নিচ্ছেন—তার কোনো কিছু কিরণ চিন্তা করতে পারল না। রুদ্ধশ্বাসে বললে, আপনি—তুমি কলকাতায়?

—কাল এসেছি। —আবার টেলিফোনে কয়েকটা দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ল: আজ সন্ধ্যায় একবার দেখা হতে পারে?

—নিশ্চয় পারে। দেখা আমায় করতেই হবে। তুমি কোথায় আছো?

—আমার মামাবাড়িতে। সেভেনটি ফাইভ ওয়ান এ একডালিয়া রোড। ধরুন, সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ—

—আমি আসব, আমি আসব। কিন্তু তুমি ফোনটা ছেড়ে দিও না—একটু ধরো, ঠিকানাটা আমি লিখে নিচ্ছি।

(ক্রমশঃ)

সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে গান্ধীজী

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

॥ ১ ॥

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কণ্ঠে হঠাৎ সমাজতন্ত্রবাদের কথা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি। আবাদি কংগ্রেসে কিছু শোনা গেছল ঠিকই, কিন্তু তা নির্দিষ্ট কোন অর্থ বহন করে নি। কংগ্রেস যদি গান্ধীবাদের আদর্শকে অন্তরের সংগে মেনে নিয়ে থাকে এবং সেই আদর্শকে বাস্তবে কার্যকরী করা যদি তার প্রকৃত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে, অর্থাৎ এক কথায়, কংগ্রেস আজও যদি গান্ধীবাদের আদর্শে ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে চায়, তবে সেক্ষেত্রে কি সমাজতন্ত্রবাদের মূল ও অন্তর্নিহিত আদর্শ উপেক্ষিত হয়? সমাজতন্ত্রবাদ কি গান্ধীবাদের (প্রচলিত অর্থে, কারণ গান্ধীজীর মতে 'গান্ধীবাদ' বলে কোন মতবাদ তিনি সৃষ্টি করেন নি) চেয়েও মহত্তর আদর্শের প্রতীক? প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদের সংগে গান্ধীবাদের দূরত্ব, আদর্শের না আওয়াজের? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণ করে থাকেন, তবে তাঁরা উভয় মতবাদের চরিত্রের মধ্যে কোন না কোন পার্থক্যের নির্দিষ্ট চিহ্ন নিশ্চয়ই আবিষ্কার করেছেন। অতএব সে চিহ্নটি কি?

নিরপেক্ষ চিন্তাশীল মানুষের মনে আজ এই প্রশ্নগুলি আসা স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সত্য মনে রাখা উচিত যে, কোন প্রিয় ও প্রচলিত আওয়াজ গ্রহণ করা প্রগতিশীলতার একমাত্র উপাদান নয়। কেবল পোষাক রাঙিয়ে জীবনকে আদর্শের রঙে রাঙানো যায় না। কারণ আদর্শ অন্তরের জিনিস; আদর্শের জয়ধ্বনি ও কোলাহল যত বেশি উচ্চকণ্ঠ হবে, সাধারণত তত বেশি আমরা সেই আদর্শের উপকূল থেকে দূরে সরে যাব।

আজকের এই সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ সম্পর্কে গান্ধীজী ঠিক এই ধরণের মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর সারা জীবনের বিক্ষিপ্ত মন্তব্য এবং লিখিত প্রবন্ধ থেকে এই প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

মহাভারতের শান্তিপর্বের প্রস্তুতির মত তাঁর শেষ জীবনের সেই বিভিন্ন দিনগুলি। সারা জীবনের সাধনা, তাঁর জীবিতকালের সীমানার মধ্যেই প্রতিদিন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক

● 'শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধী'

মৈত্রী স্থাপিত হল না, দেশ-ভাগ হয়ে গেল, বাংলায় বিহারে পাঞ্জাবে ধর্মের নামে নরহত্যার সে কী কলঙ্কিত নৃশংস আয়োজন। তাঁর হাতেগড়া কংগ্রেস তাঁর অতিপ্রিয় অনুগামী দল সব তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। বাইরে নয়—আদর্শের দিক থেকে তাঁরা গান্ধীজীকে অচল মুদ্রার মত দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। যাঁরা ক্ষমতায় গেলেন, দেখা গেল তাঁরাও অন্য মানুষ—তাঁদের মধ্যে গান্ধীজীর আজ আর কোন উজ্জ্বল চিহ্ন অবশিষ্ট নেই।

একটি বিরাট সমুদ্র-মানুষের অন্তিম দৃশ্য রচনার সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিনি তখন বিহারে। একদিন একদল ছাত্র তাঁর সংগে দেখা করতে এল। তারা নাকি সোশ্যালিস্ট। মৌন ছিলেন বলে, গান্ধীজী লিখে লিখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তিনি বলছেন, 'সমাজতন্ত্রের আদর্শ কোন নতুন আবিষ্কার নয়। গীতায় এই আদর্শের উল্লেখ আছে। এর অর্থ, আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন ছাড়া তার বেশি আমরা নেব না—এবং বেঁচে থাকার উপাদান আমরা সকলে সমান ভাগ করে নেব। এই আদর্শ উপলব্ধির জন্য কোন বিরাট সংস্কার প্রয়োজন নেই। • • এই আদর্শের সংগে ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক একাউণ্ট সামঞ্জস্যহীন। • • ব্যক্তিগত জীবনে একজন যদি এই আদর্শ অনুসরণ করে চলেন, তবে সমাজ তাতে নতুন রূপ নেবে। • • • সম্পদ ও প্রতিভার প্রকৃত অছি (Trustee) হলেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ সত্য হয়ে ওঠে। আজ সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হ'ল, অপরের সম্পদ জোর করে দখল করে নেওয়া। এ কাজের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে শুধু উপহাস করা হয় মাত্র।'

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন গান্ধীজী, 'তোমাদের বাড়িতে চাকর আছে?' জানা গেল, প্রত্যেকের বাড়িতে গড়ে একজন করে চাকর আছে। 'কাজেই তোমরা নিজেরা যখন অপরকে চাকর করে রেখেছ, তখন তোমরা সমাজতন্ত্রবাদের কথা বলতে পার না।'

তারপর বললেন, 'তোমাদের এই ধরণের কিম্ভূতকিমাকার সমাজতন্ত্রবাদ (Queer kind of socialism) আমি বুঝতে পারি না। • • সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম পদক্ষেপ হ'ল নিজে কাজ কর। যতদিন সমাজে ক্ষুধা, বেকার সমস্যা, শোষণ, উঁচু-নিচু ভেদাভেদ থাকবে—ততদিন সমাজতন্ত্রবাদের বুলি আওড়ানোর আমাদের কোন অধিকার নেই।'

তারপর তিনি ছাত্রদের ৮ দফা কার্যসূচীর কথা বললেন। তারা চলে যাবার পর গান্ধীজী বলে উঠলেন, 'আগে নিজেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করতে হয়। তারপর অপরকে। এবং অপরের এই রূপান্তরের জন্য কোন প্রচার দরকার হয় না। নিজের দৃষ্টান্ত সেই কাজ করবে।'

১৯৪৭ সালের ২৭শে মে। গান্ধীজী

● দক্ষিণ আফ্রিকায় (দারবানে) মহামতি গোখালের সঙ্গে উপবিষ্ট গান্ধীজী (বাম থেকে দ্বিতীয়)

তখন দিল্লীতে। কংগ্রেসের মধ্যে একদল সোশ্যালিস্টপন্থী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, 'ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেই যে একেবারে হাতে নতুন স্বর্গ আসবে তার কোন মানে নেই। * * যদি তোমরা প্রকৃতই সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তবে, গ্রামে গিয়ে, সেখানে মানুষ যেমন করে বাস করে তেমনি করে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, পরিশ্রম করে, বাস কর। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এইটিই দ্রুততম এবং সরলতম পথ।'

কথায় কথায় অহিংসা সম্পর্কে আলোচনা উঠল। গান্ধীজী বললেন, 'গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রবাদ কোনটিই নির্ভেজাল অহিংসা ছাড়া রূপায়িত হতে পারে না।' আলোচনার সময় লুই ফিশার ছিলেন। গান্ধীজী যখন সমাজতন্ত্রীদের পদ্ধতি এবং আদর্শের মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর নির্দিষ্ট মতভেদের কথা বলছিলেন, তখন লুই ফিশার প্রশ্ন করলেন, 'আপনিও সমাজতন্ত্রী এবং তেমনি ওরাও সমাজতন্ত্রী।'

গান্ধীজী বলে উঠলেন, 'আমি সমাজতন্ত্রী—ওরা নয়। * * আমার সমাজতন্ত্রের দাবি বেঁচে থাকবে কিন্তু সমাজতন্ত্র মরে যাবে।'

'আপনার সমাজতন্ত্র বলতে আপনি কি বলতে চান?'

'অপর সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। নিজের দেহ, নিজের ইচ্ছা তাও নিজের নয়।

সমাজতন্ত্রবাদ এক ধরণের একনায়কত্ববাদ অথবা কেবলমাত্র বিলাসী দর্শনমাত্র। এবং সাম্যবাদ এই সমাজতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত, (natural corollary) আমার সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে।

১৯৩৩ সালে একদল সোশ্যালিস্ট গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেছিলেন, উৎপাদনের সমস্ত উৎস, (জমিসহ) বণ্টন ও বিনিময়ের পদ্ধতির জাতীয়করণ কি আপনি সমর্থন করেন? গান্ধীজী তার উত্তরে বললেন,

'The progressive nationalization of all the instruments of production, distribution and exchange' is too sweeping to be admissal Rabindranath is an instrument of marvelous production. I do not know that he will submit to be nationalized. কিন্তু আমি মূল ও প্রধান প্রধান শিল্পের জাতীয়করণে বিশ্বাস করি। উৎপাদনের সমস্ত উৎস জাতীয়করণ আমি পছন্দ করি না।'

॥ ৩ ॥

সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে, গান্ধীজীর মতবিরোধ ছিল না। তিনি 'সমাজতন্ত্রবাদ' এই সুন্দর শব্দটি সম্পর্কে বুঝতেন, 'সমাজের সকল লোক সমান। মাথাটা উঁচুতে আছে বলে তা বড় এবং যেহেতু পা মাটিতে লেগে থাকে বলে তা ছোট—এ সত্য নয়। যিনি অহিংস, যাঁর অন্তর পবিত্র, তিনিই ভারতে তথা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।' * * তিনি বলেছিলেন, 'অহিংস সমাজ রচনার পক্ষে, অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা-ই হ'ল মূল চাবিকাঠি। বস্তুত সমাজতন্ত্রের মূল ভিত্তি এখানেই নিহিত। ভারতের পক্ষে যা প্রয়োজন তা হ'ল এই যে, মূলধন মুষ্টিমেয় কয়েকজন হাতে সঞ্চিত না হয়ে তা ৭ ১/২ লক্ষ গ্রামের মধ্যে প্রবাহিত হবে। ধনিক শ্রেণীকে একথা সত্য সত্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, প্রজা ও শ্রমিকদেরও তাঁদেরই মত জীবন আছে। কেবল টাকার মালিক বলে তারা বড় নন বা আধিপত্য করার অধিকারী নন। আমার মতে প্রকৃত পক্ষে কৃষকরাই জমির মালিক এবং তারা যা উৎপাদন করে সেই উৎপন্নদ্রব্যেরও তারা মালিক। তারাই 'salt of the earth'। ভূমিহীন শ্রমিকদের মজুরী নিশ্চয়ই ভালভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত হতে হবে।'

উপরের উদ্ধৃতিগুলিকে গান্ধীজী কেবল বক্তৃতা বা প্রবন্ধের জন্য রচনা করেন নি, তিনি এগুলি সত্য বলে জানতেন এবং ব্যক্তিজীবনেও সেগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। তাঁর জীবনের মধ্যে, আমরা ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের সত্য স্পর্শ পেয়েছি, তিনি নিজেকে তাদের সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করতে দ্বিধা বা লজ্জা করতেন না বরং গর্ববোধ করতেন। ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্রের আদর্শ আমদানির পূর্বে, গোলটেবিল কনফারেন্সের সময় তিনি নিজের জীবনের মধ্য দিয়ে এই কথা জানিয়েছিলেন যে, তিনি ভারতবর্ষের অর্ধভুক্ত দরিদ্র মানুষেরই প্রতিনিধি।

অর্থাৎ আমরা গান্ধীজীর মধ্যে প্রকৃত নির্ভেজাল এবং সত্য একজন সমাজতন্ত্রীকে পেয়েছিলাম—যদিও তাঁকে আমরা সোশ্যালিজমের 'ইউনিফর্ম' পরতে দেখি নি। গান্ধীবাদের মধ্যেও আমরা সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ এবং সেই মূল আদর্শে পৌঁছবার মত উন্নততর এবং নিশ্চিততর পথও পেয়েছিলাম, যদিও সে পথে রোমাঞ্চ ছিল না। তিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সে পথ আমরা অনুসরণ করতে পারলাম না। তার কারণ, আদর্শ নয়—আদর্শকে কাজে রূপ দেবার মত খাঁটি মানুষের দুর্ভিক্ষ, স্বাধীনতার পরে বড় বেশি উদগ্র হয়ে উঠেছে। এতদিনে জানা গেছে, গান্ধীজীর কংগ্রেসে মেকি মানুষের ভিড় বেশি ছিল, যাঁরা আজ ইতিহাসে বেশি উজ্জ্বল হবার সুযোগ-সুবিধা ছলে-বলে করে নিয়েছেন।

॥ ৪ ॥

কাজেই যেখানে সত্যিকারের মানুষের অভাব, যেখানে প্রশাসনিক যোগ্যতা সংশোধনহীনভাবে দুর্নীতিযুক্ত, সেখানে কেবল সমাজতন্ত্রের বুলি, আমাদের অন্তহীন দুঃখ-দারিদ্র্যের কোনরূপ প্রতিকার নয়, তবে তা বড় ডাক্তারের প্রেসকিপশনের প্রলেপ। সমাজতন্ত্র বলতে কংগ্রেস এখন উৎপাদনের কোন কোন উৎসকে এখন জাতীয়করণ করার কথা ভাবছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সরকারের কোন জাতীয়করণ-প্রচেষ্টা (সীমিত ব্যতিক্রম ছাড়া) সফল হয় নি। শিল্পে উৎপাদন কমেছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অযোগ্যতা ক্ষমাহীন স্তরে পৌঁছেছে।

গান্ধীজীর সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে, আমরা এই ত্রুটিগুলি দূর করার সুযোগ পেয়েছিলাম। ক্ষমতা যত কেন্দ্রীভূত হবে, (যা সমাজতন্ত্র আমাদের শেখাবে) দুর্নীতি, অবিচার, অপরাধ তত শক্তিশালী ও দুরারোগ্য হয়ে উঠবে, সরকার তখন হৃদয়হীন যন্ত্র (Soulless machine) হয়ে দাঁড়াবে। এই তথাকথিত সমাজতন্ত্রের আওয়াজ, আমাদের সেই দুঃখের দিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

• উদ্ধৃতিগুলি, 'Mahatma Gandhi—The last phase'—Pyarelal এবং 'My Socialism'—M. K. Gandhi থেকে নেওয়া হয়েছে।

শহর কলকাতা

গুরুসদয় দত্ত রোডে অবস্থিত বিড়লা মিউজিয়াম

॥ নানাকালের মানচিত্রে পুরোনো বালিগঞ্জ ॥

যে-কালের বিলসন প্রতিষ্ঠা ছিল কিছু কম দেড় হাজার বছর আগে, তারই শরণাঙ্কে ধনুকবন্দী বিস্তার ছিল বিদ্যাধরীর। একদিকে ভাগীরথী, অন্যদিকে ইছামতী—এ দুয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বে নিজেকে স্থাপন ক'রে, তিনজনের মধ্যে সখীত্ব রচনা করেছিল সেই। এই তিন সখীর আনুকূল্যেই একদিকে সদম্ভ অধিষ্ঠান ছিল তাম্রলিপ্তের, ললিত অবস্থান ছিল চন্দ্রকোণার এবং অন্যদিকে বিদ্যাধরীর উত্তর বেলাভূমিতেই সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল দেবালয়-দেগঙ্গার। দেগঙ্গা বন্দর এবং দেবালয় তারই প্রতিবেশী সমৃদ্ধ নগর—যেখানে প্রজানুরঞ্জনের অঙ্গীকার গ্রহণ ক'রে সপ্রতাপে রাজধানী স্থাপন করেন মহারাজ চন্দ্রকেতু। বসিরহাটের পথেই যে-অঞ্চল আজ বেড়াচাঁপা নামে অভিহিত—দেবালয়-নগরীর সুচারু বিন্যাস ছিল সেখানেই। তখন ভাগীরথীর উর্মিল বক্ষদেশ থেকে যাত্রা সুরু ক'রে, বর্তমান পুরোনো বালিগঞ্জের দক্ষিণ ভূ-ভাগ হয়ে এবং সেকালের সৌখীনতম দেবালয়-নগরীকে উত্তরতটে রেখে ইছামতীকে আলিঙ্গন করেছিল বিদ্যাধরী। তাই আধুনিক অধ্যায়ে যে-অঞ্চল বিলাসী বিত্তবানদের উদ্যান-খচিত বসতবাটির সুরম্যে পুরোনো বালিগঞ্জ নামে পরিচিত, কিছু কম দেড় হাজার বছর আগে তা ছিল বিচিত্র তরুশ্রেণীর ছায়ায় লালিত প্রশস্ত বেলাভূমি বিদ্যাধরীর।

তদানীন্তন তাম্রলিপ্ত থেকে যে-সমস্ত সওদাগর তাঁদের বাণিজ্যের ময়ূরপঙখী ভাসিয়ে, বিদ্যাধরীর পথেই দেবালয়-নগরীর ঘাটে এসে ভিড়তেন, তারপর দেবালয়-নগরী থেকেও আবার ইছামতীর পথে যাঁরা ছিলেন সাগরদেশের অভিযাত্রী—তাঁরা আসা-যাওয়ার পথে বর্তমান পুরোনো বালিগঞ্জের তৎকালীন বেলাভূমিতেও বাণিজ্য-পোতের নোঙর তুলতেন মাঝে মাঝে। উদ্দেশ্য: বিশ্রাম। প্রথমত তাঁদেরই বিশ্রামের জন্য সেখানে একটি পান্থশালার প্রতিষ্ঠা করেন তাম্রলিপ্তের নিশাপতি সওদাগর—এমন প্রবাদ আছে। পরে উক্ত পান্থশালাকে কেন্দ্র করেই নাকি বিকাশপ্রাপ্তি ঘটে একটি হাটের। তারপর ক্রমানুয়ে সেই হাটেরই আবার রূপায়ণ ঘটে

শ্রীপদাতিক

বসতিতে। এই বসতি-অঞ্চলের ঘাটে এসেই যেদিন সাময়িক যতিলাভ করতো বিচিত্র বাণিজ্যপোতের বাহারী শোভাযাত্রা, সেদিন সারা বসতি জুড়েই এক স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবের মূর্তি প্রকাশ পেতো শোনা যায়। কারণ সওদাগরদের ময়ূরপঙখী এসে ভিড়লেই উক্ত বসতি-অঞ্চলের এক প্রশস্ত ময়দানে প্রতিষ্ঠা পেতো শুভ্র চাঁদোয়া। তারপর পুরোভাগের ময়ূরপঙখী থেকে চাঁদোয়ার তলে এসে আসন গ্রহণ করতেন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সোনার বিগ্রহ। স্বল্প সময় হলেও, বেশ ধুমধামের সঙ্গেই সেখানে তাঁর উপাসনার আয়োজন করতেন সওদাগরেরা। তারপর পূজান্তে পরমান্নরূপ প্রসাদ বিতরণ করা হতো সাধারণের মধ্যে। এই প্রসাদ গ্রহণ করার জন্যেই সেদিন চাঁদোয়ার তলে এসে সমবেত হতো দূর-দূরান্তের কৃষক, কুম্ভকার, তন্তুবায় এবং সূত সম্প্রদায়। তাঁদের সানন্দ উপস্থিতির নির্মল মুখরতাই সেদিন উৎসবের আত্মপ্রকাশে দান করতো সার্থকতার বর।

কিছু কম দেড় হাজার বছর আগে, উক্ত অজস্র উৎসবের লগ্নলোকে ধন্য হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বর্তমান পুরোনো বালিগঞ্জের তদানীন্তন বেলাভূমি। শোনা যায়: একদিন এমন এক উৎসবের লগ্নেই যখন নিজহস্তে প্রসাদ বিতরণে ব্যস্ত ছিলেন নিশাপতি সওদাগর, তখন নাকি আকস্মিকভাবেই একবার অপহৃত হন বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সোনার বিগ্রহ। সেকালে এই বিগ্রহ হারিয়ে যাওয়ার অর্থই বাণিজ্য-ভাগ্যে কুলক্ষণের প্রকাশ—এমন বিশ্বাস পোষণ করতেন সওদাগরেরা। সুতরাং বিগ্রহ হারিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত

বিচলিত হয়ে পড়েন নিশাপতি। সর্বসমক্ষে তিনি ঘোষণা করেন: যে-ব্যক্তি তাঁর বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সন্ধান দিতে পারবে—তাকে তিনি তরী-বোঝাই সুবর্ণ এবং কাঞ্চনাদি দান করবেন। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর সোনার বিগ্রহের মূল্যের তুলনায় তরী-বোঝাই সুবর্ণ এবং কাঞ্চনাদির মূল্য লক্ষ গুণেরও বেশি। সুতরাং সেই লোভেই নাকি একজন স্বর্ণশিল্পী রাতারাতি অনুরূপ একটি সোনার বিগ্রহ নির্মাণ ক'রে নিশাপতির হস্তে অর্পণ ক'রে এবং বলে: বিগ্রহটিকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে নদীতীরের এক অগভীর অরণ্যে। বিগ্রহ হারিয়ে যাওয়ায় যেমন উত্তেজিত হয়েছিলেন নিশাপতি, তেমনই তা ফিরে পেয়েছেন ভেবেই অস্বাভাবিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন তিনি। সুতরাং সুস্থভাবে বিচার করার মতো কোনো ক্ষমতা তখন তাঁর ছিল না। তিনি সরল বিশ্বাসেই বিগ্রহ গ্রহণ ক'রে উক্ত স্বর্ণশিল্পীকে দান করেন তাঁর প্রতিশ্রুত তরী-বোঝাই সুবর্ণ এবং কাঞ্চন। কিন্তু তারপর তিনি যখন সেখান থেকে দেবালয়-নগরে আসেন, তখন অকারণেই তাঁর এক ময়ূরপঙখীর ভরাডুবি ঘটে বিদ্যাধরীর বুকে। অকস্মাৎ এমন ঘটনা ঘটায় তিনি পুরোভাগের ময়ূরপঙখীতে এসে নতজানু হন বিগ্রহের সামনে। কিন্তু নতজানু হতেই তিনি বুঝতে পারেন: বিগ্রহ তাঁর আগের মতো উজ্জ্বল নয় এবং আকৃতিতেও তা বেশ খানিকটা ছোটো বলেই তাঁর মনে হলো। তিনি শংকিত এবং কম্পিত দৃষ্টিতে বার বার পরীক্ষা করেন। তারপর সত্যই বুঝতে পারেন বিগ্রহ নকল। অতএব নকল বুঝতে পেরেই তিনি ভেঙে পড়েন সম্পূর্ণ। ভাবেন: ভাগ্যে তাঁর কুগ্রহের জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। লক্ষ্মী নেই। সুতরাং একে একে তাঁর তলিয়ে যাবে সবই; দিনে দিনে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন হতে হবে ধনপতি সওদাগরদের কাছে। সে আর বেঁচে থাকবে কোন্ মুখে?---এভাবে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই দেবালয়-নগরে কেটে যায় তাঁর সেদিনের নির্ঘুম রাত। পরদিন প্রাতঃপর্বেই পূর্বদিগন্তের রক্তিমাভা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুঃসহ দুঃখতার আরক্ত হয়ে ওঠে গভীর যন্ত্রণায়। এ-যন্ত্রণার অবিরাম দংশন আর সইতে পারলেন না নিশাপতি। তিনি ঝাঁপ দিলেন বিদ্যাধরীর বুকে। আর উঠলেন না। সুতরাং সেদিনের বিদ্যাধরীর দুরন্ত স্রোতেই চিরকালের মতো ভেসে গেল নিশাপতির যুগ।

তারপর? সময়ের চির-চঞ্চল বিধানেই অপসরণ ঘটে ভুজঙ্গ কালের। এক-একটি শতাব্দীর অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক সংকোচনের ফলে শীর্ণধারা বিদ্যাধরী স'রে যায় কিছু দক্ষিণে। উত্তরে রেখে যায় বালিয়াড়ি প্রান্তর। আর বর্তমান পুরোনো বালিগঞ্জের তদানীন্তন বেলাভূমির যে-বসতি-অঞ্চল—প্রাকৃতিক বিবর্তনে অবলুপ্তি ঘটে তারও। বিনিময়ে সেখানে বাড় বিস্তার করে বাধাহীন অরণ্য। সম্ভবত এভাবেই একাধিক শতাব্দীর যবনিকা পতনের পর পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলিম শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশের সর্বত্রই। এই পঞ্চদশ শতাব্দীরই কোনো এক বিশেষ অঙ্কে বর্তমান পুরোনো বালিগঞ্জের তৎকালীন বসতি-অঞ্চলের স্থলাভিষিক্ত যে বনাঞ্চল—তার আশে-পাশে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায় মিশ্রিত জাতির কয়েকটি বিক্ষিপ্ত গ্রাম। তারপর এই গ্রামগুলির প্রয়োজনেই সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি গঞ্জের প্রতিষ্ঠা ঘটে বিদ্যাধরীর পরিত্যক্ত বালিয়াড়ি প্রান্তরে। একাধিক পুরাতাত্ত্বিকের মতে: পরে বালিয়াড়ি প্রান্তরে এই গঞ্জ থেকেই 'বালিগঞ্জ' নামটির প্রচলন সুরু হয়—যে-নামের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি শহর-কলকাতার আধুনিকতম যুগেও।

সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে অথবা তার কিছু আগেই বিদ্যাধরীর শীর্ণ রেখাও হারিয়ে যায় চিরতরে। ফলে তার পরিত্যক্ত বিস্তৃত ভূমি যখন সমতলের অনুকূল পরিবেশ ধারণ

● বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত ত্রিপুরার মহারাজ ভবন

করে দিনে দিনে, তখন একদিকে যেমন পত্তন ঘটে আরও কয়েকটি গ্রামের, তেমনই অন্যদিকে কৃষক-সমাজের পরিচর্য্যাগুণেই আত্মপ্রকাশ করে আবাদী অঞ্চল॥ তারপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসার পর, এই আবাদী এবং বসতি-অঞ্চল বিশেষ এক জরাজীর্ণতার পরিবেশে দাঁড়িয়ে ধারণ করে বিপর্যস্ত রূপ। পার্শ্ববর্তী অরণ্য দুর্গম হয়ে ওঠে আরও এবং অরণ্যের গভীর অংশে ঘাঁটি স্থাপন করে দুর্ধর্ষ দস্যুদল॥ শোনা যায়: এই দস্যুদলের অত্যাচারেই বসতি লোপ পায় অনেকাংশে এবং সেকালের যে-ভূস্বামী-পরিবার বসবাস করতেন সপ্রতাপে দস্যুভয়ে তাঁরাও স'রে যান দূরবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে। ফলে অরক্ষিত অঞ্চল আরও বেশি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে দিনে দিনে।

তবে ইংরেজ আধিপত্যের আদি-পর্ব থেকেই আবার সংস্কার সুরু হয় এ-অঞ্চলের। অরণ্যচারী দস্যুর দল মাঝে মাঝে ইংরেজপল্লীতেও হানা দিতো ব'লে শেষে ইংরেজরাই তাদের উচ্ছেদ ঘটায় সবংশে। ফলে একদিকে যেমন অরণ্যের নির্বাধ গতি এবার বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনই সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এবার এক অবিচ্ছিন্ন বসতির নবীন পরিবেশ পক্ষবিস্তার করে নিরলস গতিতে॥ তবে এই নবীন বসতির যারা বাসিন্দা—শ্রেণী-গত দিক থেকে তারা নিম্নশ্রেণীর বলেই বিবেচ্য সভ্যতার বিচারে। এ-অঞ্চলে উচ্চমহলের পদার্পণ ঘটে নি তখনো। কেবল ইংরেজ-পুষ্ট দু-একজন বিত্তবানের দু-একটি বাগান-বাড়ির প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল এদিকে-ওদিকে—যেখানে নৈশাভিসারিণীর নূপুর নিক্কণে আতুর হতো রাত্রির প্রতিটি প্রহর।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অঙ্কে এ-অঞ্চল থেকে সমূলেই অপসারণ ঘটে অরণ্যের। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে নতুন বসতির ঘটেছিল বিস্তার—উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তা শহর সমীপবর্তী বস্তি-অঞ্চলরূপেই পরিগণিত হয়॥ তবে বস্তি-অঞ্চলের আশে-পাশে বিস্তীর্ণ পতিত জমির অবস্থান ছিল অনেক॥ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে এবং ইউরোপ থেকেও যে-সমস্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে কলকাতায়—প্রথমত উল্লেখিত পতিত জমিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁদেরই। তারপর তাঁরাই এসে একে একে পতিত জমিগুলির অধিকাংশই নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে অধিকার ক'রে প্রতিষ্ঠা করেন উদ্যান-খচিত বসতবাটি। সম্ভবত তাঁদেরই অনুসারীরূপে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে বাঙালী বিত্তবানদেরও আগমন সুরু হয় এদিকে। আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে সম্ভবত বাঙালী বিত্তবানরাই এ-অঞ্চলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ॥

যাই হোক, বিত্তবান মহাজনদের

ADSEN/KING—12

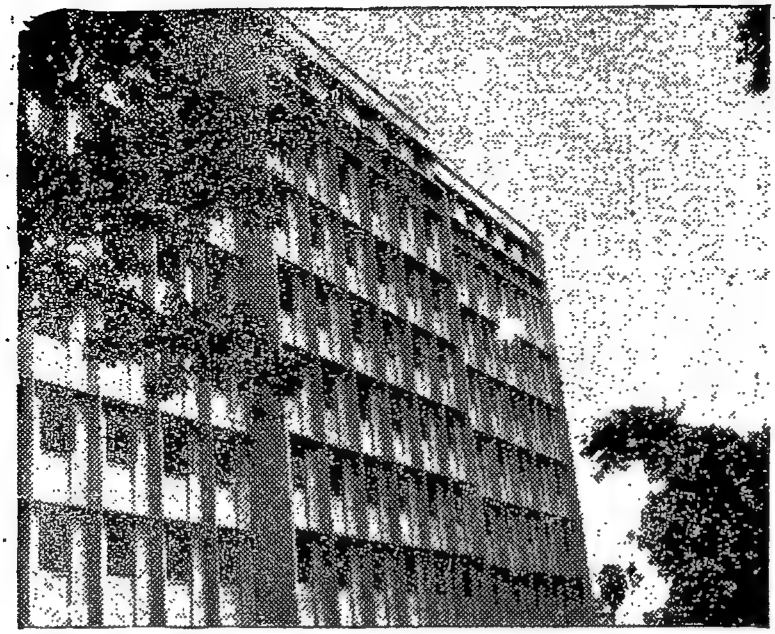

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত সাইন্স কলেজ

রুচিবান বসতবাটির বিন্যাসে অনাদৃত বস্তি-অঞ্চল ক্রমানুয়ে পিছিয়ে যায় পুরোনো - বালিগঞ্জ থেকে। দিনে দিনে বিত্তবানদের তাগিদেই পৌর-সভাব সযত্ন প্রচেষ্টায় সমগ্র পুরোনো বালিগঞ্জে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করে পরিমার্জিত সরণী, সুশোভন পার্ক এবং নির্বাচিত তরুলতার অভিরাম পরিবেষ্টনে অসংখ্য উপ-রাজপথ। সব মিলিয়ে আজ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে-মনোহারী পরিবেশের বিন্যাস ঘটেছে পুরোনো বালিগঞ্জে—সাবিক সত্তা তার অনায়াসেই কটাক্ষ করতে পারে আরও দক্ষিণের আধুনিক বা সৌখীন বালিগঞ্জকে।

পুরোনো বালিগঞ্জের একদিকে গুরুসদয় দত্ত রোড, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, রেইনি পার্ক, সানি পার্ক প্রভৃতি অঞ্চল যেমন সুনিয়ন্ত্রিত লাবণ্যে অনুপমেয়, তেমনিই আরেক দিকে বালিগঞ্জ পার্ক রোড, আয়রন সাইড রোড, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, মেফিয়ার রোড এবং তৎসমীপবর্তী পাম প্লেস ও পাম এভিনিউ অঞ্চলে কৃত্রিম প্রকৃতির অতুল ছন্দের অনুরণনে কোনো ষতি নেই। এ-সমস্ত অঞ্চলে মহানগরীর আদর্শ পরিবেশ সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ নির্লিপ্ত গ্রামের মতোই এদিকে তরুশ্রেণীর পাতায় পাতায় মর্মর জাগে, শাখায় শাখায় পাখি ডাকে এবং সারিবন্দী সুরম্য বসতবাটির তোরণে তোরণে দোল খায় ঘুম-পাড়ানি ছায়া। আর প্রতি প্রত্যূষের স্নিগ্ধ বীক্ষণ ফুল ফোটায় বিচিত্র বর্ণের। তাই মনে হয়: জীবন এখানে সুখী, শান্ত এবং নির্দ্বন্দ্ব।

পুরোনো বালিগঞ্জের বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত অধিকাংশ বাড়িই বিস্তীর্ণ উদ্যানের রমণীয় পরিবেষ্টনে নিদর্শনযোগ্য। এ-সমস্ত বাড়ির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখের দাবি রাখে ত্রিপুরার মহারাজ ভবন, আইন-বিশারদ শ্রীশচীন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি, এ্যাটর্নী ভগবতীদাস খৈতানের শুভ্রকান্তি মহল, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পৈতৃক বসতবাটি, আইনজীবী শ্রীরণদেব চৌধুরীর কটেজ-প্রতিম আবাস-গৃহ এবং বিত্তবান ব্যবসায়ী কর্তৃক বিরচিত আরও কয়েকটি সমাহৃত নিকেতন। আর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ, বালিগঞ্জ হাই স্কুল এবং সাইন্স কলেজের উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের উচ্চতম ভবন।

গুরুসদয় দত্ত রোডেও অনুরূপ অজস্র মহলের পাশাপাশি সর্বাপেক্ষা নিদর্শনযোগ্য বিড়লা পার্ক। বিড়লা পরিবার একদা বসবাস করতেন এখানেই। বর্তমানে এই বিশাল ভবনের রূপায়ণ ঘটেছে বিড়লা মিউজিয়ামে। মিউজিয়াম পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন। এখানে আজকাল প্রায় প্রত্যহই কৌতূহলী দর্শনার্থীদের সমাগম ঘটে আসন্ধ্যা-সকাল।

মেফিয়ার রোডের প্রথম ভাগেই অবস্থিত নদীয়ার মহারাজ ভবন। এ-ভবন প্রাচীন বলেই আধুনিক সৌকর্যের কোনো স্বাক্ষর নেই তার অবয়বে। তবু ঐতিহ্যে সে হার মানায় আধুনিককালের অধিকাংশ ভবনকেই।

মেফিয়ার রোডের অন্যান্য অংশে এবং সেই সঙ্গে বালিগঞ্জ পার্ক রোড, আয়রন সাইড রোড এবং পাম প্লেস প্রভৃতি রাস্তায় একই সুযুপ্ত পরিবেশে চিরস্থায়ী আসন পেতেছে সর্বাপেক্ষা সুখী এবং বিলাসী পরিবারসমূহের অনিন্দ্য নিকেতন—যার সাবিক সৌন্দর্যের মূর্তিমতী সত্তার কাছে সম্ভবত মাথা হেঁট করবে শহর-কলকাতার লাবণ্যের রাণী চৌরঙ্গীও।

সোনার আনারস
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত
মূল্য: এক টাকা
কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।
উপহার দিবার মত বই
দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা-১২

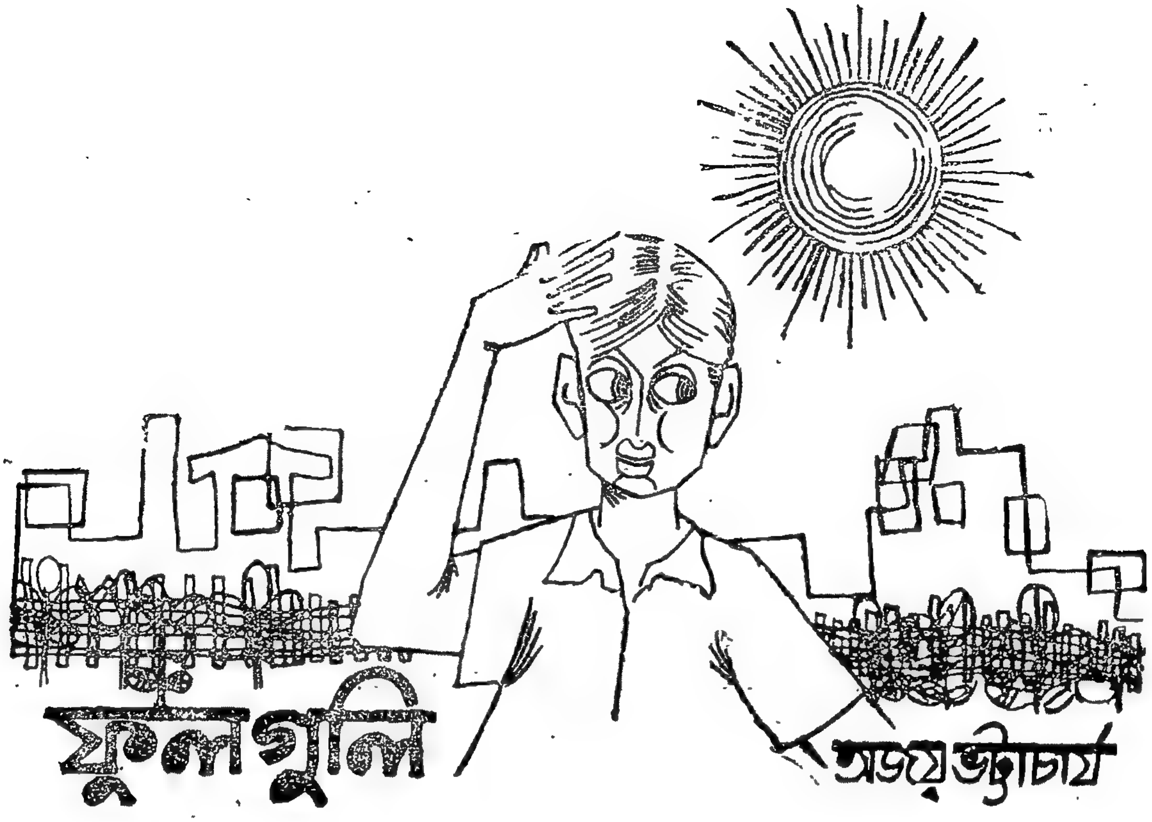

ফুলগুলি

অজয় ভট্টাচার্য

এখন অনেক ভিড়। অফিস-ফেরতা বিবর্ণ লোকগুলো এখন হন্যে হয়ে বাড়ির দিকে ছুটছে। এখানে অনেক ভিড়। এখানে—এই অফিস-পাড়ায়।

আমি এখন ফিরব না। বরং এখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পড়ন্ত রোদের স্পর্শ নেব গায়ে। তারপর জোয়ারের জল নেমে গেলে ফিরব। রাস্তার বহুমুখী স্রোতের দিকে তাকিয়ে বিমল মনে মনে সিদ্ধান্ত করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্লান্ত লোকগুলোর ব্যস্ততা দেখল ও। এই হঠাৎ-জোয়ারে এখন সবাই এক-একটি ঢেউ হয়ে গেছে। স্রোতের টানে ঢেউগুলো দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। নৌকায় আশ্রয় নিচ্ছে। জনতার অতিরিক্ত চাপে বিপন্ন আর বিরক্ত ট্রামবাস-গুলোকে ওর ঝড়ের সমুদ্রে অসহায় নৌকার মত মনে হল। দুলছে, বেঁকছে আর এগোচ্ছে। গতি নিচ্ছে, আবার থামছে। অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে অলস ভঙ্গিতে বিমল এই সব দেখছে আর ভাবছে। ওর পাশ কাটিয়ে কয়েকজন প্রৌঢ় সামনে এগিয়ে গেল।

এরা সবাই এতক্ষণ একটা খাঁচায় আটকা ছিল। ছাড়া পেতেই এখন আশ্রয়ের দিকে ছুটছে। সকলের মুখেই মুক্তির উল্লাস প্রকট ছাপ ফেলেছে। তাই সাতঘণ্টার খাঁচায় জুড়িয়ে যেতে যেতে বিবর্ণ মুখগুলো আবার জ্বলে উঠেছে। বিমল বুকের মধ্যে মুক্তির এই প্রাত্যহিক উল্লাস অনুভব করল। কিন্তু রোজকার মত ঘরে ফেরার তাড়া অনুভব করছে না। সামনে একবার তাকাল। ময়দানটা যেন ওয়েসিস মনে হল।

ময়দানে অনেক হাওয়া। আমার এককুঠরী ঘরে হাওয়ারা আসে না। শুধু গুমোট অন্ধকার। আমি কিছুক্ষণ অন্তত হাওয়ার জোয়ারে ডুবে থাকব। আমার ক্লান্ত জানালায় কাঙ্ক্ষিত রোদ নামে না। আলো নেই। আমার ঘরের কোণে কোণে অবিবেকী অন্ধকারের অব্যয় ছাপ। এখন কিছু পড়ন্ত রোদের কণা গায়ে মাখব।

বিমল পায়ে পায়ে ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অসুস্থ ছায়াগুলো সরিয়ে ও এখন সবুজের কাছাকাছি হতে সচেষ্ট। ভাবছে, জীবনটা এমনি আলো-হাওয়ায় অবারিত হলে বেশ হয়। ভাবনাটা ওকে যেন নেশার মত পেয়ে বসল। মৃদু বাতাসের মত একটা সবুজ কোমলতা এখন ওর নিবিড় চেতনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে।

ঘাসের সবুজে গা ডুবিয়ে শুলে একটা নিবিড় আত্মনিমগ্নতা আসে। বিমল মনের গভীরে ডুবুরী হল। ভাবনার সমুদ্রে ডুবে অনেক গভীরে নেমে গেল ও। কিন্তু সেখানে আত্ম-সংগ্রামের ধূসর ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। যন্ত্রণার পাণ্ডুলিপি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগছে না। ভাল লাগছে না, কারণ সবুজের প্রশান্তিতে ও এখন একটা আলোকিত ফুল খুঁজছিল। কিন্তু ধূসর অন্ধকারে অব্যয় শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না। অগত্যা পকেটের টাকাগুলো তৃষ্ণার্তহাতে অনুভব করল। স্থির

হয়ে-আসা বিষণ্ণ চেতনায় কিছুটা উত্তাপ সঞ্চার করতে চাইল ও। মাসের প্রথম দিনটাকে ওর নিকট বন্ধু বলে মনে হল। ভাবল, অন্তত আজকের দিনটা সংসারের সব বিষণ্ণতা আর অন্ধকার উৎসবের জোয়ারে সাময়িকভাবে মুছে দেওয়া যায়।

আমরা যেন আজ নিস্তরঙ্গ ডোবা। স্রোত নেই। স্তব্ধ। তবু খণ্ড খণ্ড অনেক মুহূর্তে আমরা জীবনের স্বাদ খুঁজে পাই। মাঝে মাঝে হঠাৎ-উষ্ণতায় উজ্জীবিত হই। তাই নিস্তরঙ্গ জীবনে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাই। আমরা প্রাণপণে বাঁচি।

একটা কচি ঘাস তুলে নিল। স্নায়ুতে সবুজ কোমলতার স্পর্শ নিচ্ছে। কোমল গভীরতায় ডুবে যেতে ইচ্ছে করছে ওর। ঘাসটা নাকের কাছে ধরল। দেখল। তারপর আকাশে মুখ তুলে তাকাল। আকাশ দেখল। কিছু উদাসীন মেঘ আর প্রশান্ত গম্ভীর নীলের স্রোত। নীলের গভীরে একটা নিবিড় উৎসবের খোঁজ পেল ও। উৎসবের খেয়ালে আকাশ এখন এক আশ্চর্য রূপ নিয়েছে। একটা নরম সুন্দর আলো নীল ঢেউগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আকাশের ক্যানভাসে আঁকা সাম্প্রতিক ছবিগুলো যেন এক মহান সৌন্দর্যের প্রতীক। আচ্ছন্নের মত বিমল কিছুক্ষণ ওপরে তাকিয়ে থাকল। আকাশ কি বহুরূপী। ভাবল।

বিমল হঠাৎ টের পেল, মন থেকে সব বিষণ্ণতা কখন মুছে গিয়েছে। আকাশের মহান সৌন্দর্য একাগ্র চেতনায় ধরে রাখায় সমগ্র অনুভবে যেন কোমল প্রফুল্লতা ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। ওর চোখে ভোরের আলোর মত একটা সুন্দর হাসি ফুটে উঠল। আশপাশে যুবক-যুবতীরা কথা বলছে, হাসছে। দেখে ভাল লাগছে। দু-এক কলি গান ভেসে এল কাছ থেকে। সুরগুলো মনের গভীরে ছড়িয়ে গেল। এবং ছন্দিত প্রতিধ্বনি তুলল। ময়দানের চারিধারে গভীর চোখে তাকাতে তাকাতে ও এখন মিনতিকে ভাবনায় স্থান দিতে পারছে।

'আজ ত' মাসের প্রথম, না?' সকালে চা খেতে-খেতে মিনতি আজ শুধিয়েছিল। বিমল এখন কথাটার একটা গভীর তাৎপর্য খুঁজে পেল। এটা নেহাতই অবান্তর প্রশ্ন। মিনতি জানে, আজ মাসের প্রথম। তবু শুধিয়েছিল। আসলে ও যেন কিছু মনে করিয়ে দিতে চেয়ে এই ইঙ্গিত করেছিল।

মিনু, তুমি জানতে, আজ মাসের প্রথম। আজ ব্যতিক্রমের দিন। তুমি চেয়েছিলে, আজ প্রাত্যহিকের ব্যতিক্রম হোক, সব বিষণ্ণতা মুছে উৎসবের আলোয় আমরা হেসে উঠি। মনে মনে এখন আমিও তাই চাইছি।

বিমলের চোখ দুটো এখন গভীর তৃপ্তিতে মৃদু মৃদু হাসছে। অন্যমনস্ক-ভাবে একটা সিগারেট ধরাল ও। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। যেন এক ফুৎকারে সব বিষণ্ণতা উড়িয়ে দিতে চাইল। যেন কাউকে সম্বোধন করে বলল, আজ দুজনের যুগ্ম-জন্মতিথি পালন করব। আমার আর মিনতির। কিছু ফুল নিয়ে যাব, আর সম্ভব হলে মহার্ঘ কিছু ভোজ্য। জানি, মাসিক বাজেটে টান পড়বে। কিন্তু কি করি, প্রতি মাসে এই ত' একটা দিন। এই একটা দিনই আমরা যেন নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে উঠি। প্রতি মাসের প্রথমে আমরা নতুন করে জন্ম নিই। আজ আমাদের দুজনের জন্মদিন।

এতক্ষণে বিমল উৎফুল্ল হতে পারল। ওর চারপাশে কিছু লোক—বসে এবং দাঁড়িয়ে এবং পায়চারীরত। দূরে জোয়ারের শেষ রেশ—অফিস-ফেরতা ক্লান্ত জনতার বিক্ষিপ্ত টুকরো ছবি। আশপাশে তাকাল। সকলকেই ওর বড় ভাল লাগল। সকলেই যেন নিতান্ত পরিচিত সুহৃদ।

মিনতির কথা ভাবল ও। ভাবনায় ফুটে ওঠা মিনতির মুখচ্ছবি এখন ক্রমেই উজ্জ্বলতর। আর এই হাসি-মুখটা চেতনায় ধরে রেখে বিমল আজকের অনাগত নিবিড় মুহূর্ত-গুলোর স্পর্শ নিচ্ছে। এই অনুভব নিয়ে সম্ভাব্য কিছু সংলাপ রচনায় মগ্ন হল ও।

মিনু, তোমাকে আজ ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। তুমি যেন এখন সকালের আলোকিত নদী।

যে নদী তোমার সাগরে এসে মিশেছে।

মিনু, তোমার কণ্ঠ যেন নদীর প্রথম তান।

আমাকে নিবিড় সুরে বাজাও—বাজাও। তোমার বাঁশী হতে বড় সাধ।

তোমার মতই আমি বেজে উঠেছি।

সামনের প্রসারিত হাত সব তরঙ্গ মুছে দিল। 'দাদা, ম্যাচিস হবে?'

'না।' স্বপ্নোত্থিত বিমল কঠোর স্বরে প্রত্যাখ্যান করল। ভাবনাটুকু মুছে যাওয়ায় লোকটাকে ঘাতকের মত মনে হ'ল। এই মুহূর্তটুকু ভারি বিচ্ছিরি লাগছে ওর। লোকটা এখন দূরে সরে গেছে। কিন্তু ক্ষণকালের জন্য একটা অভাববোধের ছাপ এখানে রেখে যেতে পেরেছে। ওর কাছে সামান্য দেশলাইও নেই। এই 'নেই' শব্দটা একটা শূন্যতার প্রতীক হয়ে ওর ভাবনায় ছড়িয়ে গেল। ক্ষণপূর্বের স্বপ্নের মত নিছক কাব্যিক ভাবনার কথা ভেবে ওর হাসি পেল। ভাবনায় জন্ম নেওয়া একটু আগের ছন্দিত কথাগুলো যেন এক মায়াময় স্বপ্নের জগৎ থেকে নেমে এসেছিল। তাই স্বপ্নের মতই মিলিয়ে গিয়েছে।

জীবন কি কখনো নদী হয়। বিমল তবু মৃদু সংশয়ে দুললো। তারপর সরব দীর্ঘশ্বাসে শূন্যতা ধ্বনিত হল।

আমরা অনেকদিন গান গাই নি। বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে মিনতি গাইত। ওর মনে তখন কিছু তরঙ্গ

ছিল। আমারও। কিন্তু আমরা পূর্ণতার সমুদ্র পেলাম না। অভাব আর যন্ত্রণার মরুতে শুকিয়ে গেলাম।

রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে বিমল নক্ষত্র দেখছিল। আর নক্ষত্রের মত অগুন্তি কথা ওর মনে ভিড় করছিল। এই ভাবনার যেন আর শেষ নেই। আমৃত্যু অজস্র ভাবনা মনের গভীরে ক্রিয়াশীল। ভাবল বিমল। ময়দানে লোকজন যত কমে আসছে, পুরোনো দিনগুলো তত বিমলের কাছাকাছি হচ্ছে। এই মুহূর্তে কয়েক বছর পিছিয়ে গিয়েছে ও।

'শহরের এই ভিড় আমার ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে ভারি অসহ্য লাগে।' প্রথম দিনগুলোর মিনতি বলেছিল।

বিমল সস্নেহ প্রশ্রয়ে ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, 'আমারও ঠিক তাই। মনে হয় নির্জনে কোথাও যাই; ছোট্ট বাসায় দুজনে শান্তিতে থাকি। জানো মিনু, শহরের এই ভিড়ে ডুবে থেকেও আমি শুধু শান্ত নির্জন একটা বাসার কথা ভাবি।'

'বাসার কথা বলছো?'

'ধরো তাই।'

'কিন্তু বাসা কেন? নিজেদের বাড়িও ত' হতে পারে।'

'হতে পারে মানে। তুমি জেনে রেখো মিনু, বাড়ি আমাদের হবেই।' স্থির আত্মপ্রত্যয়ে বিমল বলেছিল।

'কিন্তু এখানে নয়। আমার বাপু শহরতলীই পছন্দ।' মিনতির গলায় একটা বাসনার সুর বেজেছিল। দুচোখে শহরতলীর ছবি এঁকে ও বিমলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসেছিল।

'আমারও তাই ইচ্ছে। ভাবছি, আশে-পাশে কোথাও একটু জমি কিনে ফেলব।'

খুশিতে মিনতি বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠেছিল। 'কী মজাই না হবে। ট্রাম-বাসের শব্দ নেই। দিনরাত অবারণ আলো আর বাতাস। আহা, স্বর্গের উপমা মনে আসছে আমার।'

'আধুনিক কাব্যে কিন্তু আরো সুন্দর উপমা আছে।'

মিনতি মুখিয়ে উঠেছিল, 'কেন, স্বর্গের উপমা কি খারাপ হল?'

'খারাপ নয়। তবে আধুনিক কাব্যে আরো কিছু ভাল কথা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। সে কথাই বলছিলাম।'

একটা দমকা হাওয়ায় চমক ভাঙল বিমলের। বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ময়দানে এখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। বিমল অন্ধকার অতিক্রম করতে সুরু করল। একটা নির্জন ছোট্ট বাসার স্বপ্ন দেখছিল ওরা। স্বপ্নটা এখন সচেতনভাবে ভাবনায় ঝালিয়ে নিয়ে ওর হাসি পেল। হাসি পেল, কারণ, যেতে যেতে হঠাৎ গতকালের স্মৃতি মনে জাগছে।

'মিনু, সেদিনের স্বপ্নের কথা মনে আছে? সেই একটা ছোট্ট বাসার স্বপ্ন? স্বপ্নটা এবার বোধহয় সফল হবে।' সন্ধ্যার আলোছায়ায়রসে বিমল বলেছিল।

'বাসা। কিন্তু তুমি ত' —মানে—' বিস্ময়ে মিনতি কথাটা শেষ করতে পারে নি। অবাক হয়ে বিমলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

ম্লান হেসে বিমল মাথা নীচু করেছিল। 'হ্যাঁ, এ বাসা এবার ছাড়তে হবে। পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে। ---অবশ্য বেলেঘাটার দিকে একটা বাসার খোঁজ পেয়েছি। অল্প ভাড়া। আর ওদিকটা ত' বেশ নির্জন, তাই না?'

'এ বাসা ছেড়ে দিতে হবে?' আশঙ্কায় মিনতির গলা কেঁপে গিয়েছিল।

'হুঁ, মামলা লড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।---আর তা ছাড়া, বেলেঘাটা জায়গাটা ত' মন্দ না। তুমি ত' নির্জনতা চেয়েছিলে। তা' কিছুটা পাবে।'

ভাবনায় দুলতে দুলতে বিমল সামনে তাকাল। দূরে কিছু আলোকিত

বেঙ্গল কেমিক্যালের
গোল্ডেন
আমলা

হেয়ার অয়েল
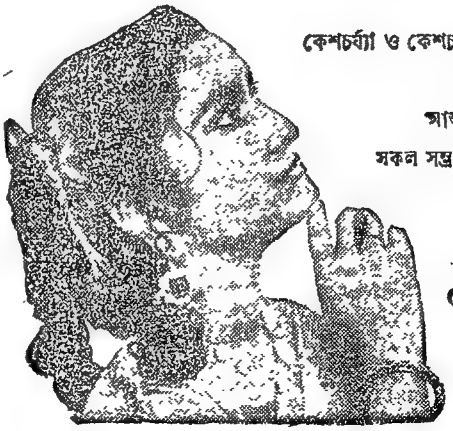
কেশচর্য্যা ও কেশচর্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। বর্ণে, গন্ধে ও গুণে অতুলনীয়।
আজই ব্যবহার আরম্ভ করুন।
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর

দ্বীপ। সেখানে ব্যস্ত মানুষের ভিড়। বিমল আলোর দিকে এগিয়ে চলল।

আজ কিছু ফুল কিনব। আর সম্ভব হলে একটা আয়না। আমাদের ধূসর আয়নাটায় অনেক শূন্যতার ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে অজস্র দুঃখের আঁচড়ে আমাদের যন্ত্রণা বিম্বিত হয়। আজ সে প্রতিচ্ছবি সহ্য হবে না। আজ নতুন আয়নায় মিনতির আলোকিত ছবি দেখব।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য বিমল ময়দানের অন্ধকার প্রত্যক্ষ করল। তারপর দৃঢ়পায়ে রাস্তা পার হল। ওর চোখে-মুখে এখন একটা আলোকিত প্রত্যয় গাঢ় ছাপ রেখেছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সহস্র মুখে নিয়নের নগ্ন আলোর উজ্জ্বল প্রতিফলন। বিমল এই সমুদ্রের একটি ঢেউ হল।

'আরে বিমল না?' মেয়েলি গলার ডাকে বিমল চমকে ফিরে তাকাল।

'একি সুরমা। কবে এলে?' স্রোতের আবর্তে একটা পরিচিত পুরোনো দ্বীপ খুঁজে পেয়ে বিমল এখন বেশ খুশি। সঙ্গত কারণেই গলায় একটা আনন্দের সুর বাজল। এবং শোভন হাসির স্নিগ্ধতায় সুরমার মুখোমুখি হল।

খুশিতে চোখের পাতা কাঁপিয়ে সুরমা বলল, 'উঃ কতদিন পর, তাই না?'

ভাবনার তরঙ্গে কথাগুলোর প্রতিধ্বনি শুনে বিমল এক মুহূর্ত চুপ থাকল। তারপর সময়ের শূন্যতাটুকু পরিমাপ করল ও, 'তা প্রায় বছর চারেক হবে।'

'চার বছর। তা হবে।' সুরমা বলল, 'তারপর তোমার খবর কি?'

মুহূর্তেই বিমল যেন একটু বিষণ্ন হল। 'আমার আর খবর কি! সেই স্ত্রী-পুত্র-সংসার।—সুরমা, তুমি কি এখন কানপুরেই আছ?'

সুরমা মৃদু হাসল। 'না, উনি এখন পাটনায় বদলী হয়েছেন।'

'ও।' ঠোঁটে একটা অস্ফুট শব্দ বাজিয়ে বিমল মনে মনে বলল, সুরমা, তোমাকে আজ ভারি উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আমার পাশে তোমাকে দেখে আশপাশের মানুষেরা হিংসার চোখে তাকাচ্ছে। তুমি আজ খুব সেজেছ। অবশ্য মেয়েরা সাধারণত সাজতে খুব ভালবাসে। তুমি তার ব্যতিক্রম নও। চারবছর পর তোমাকে দেখছি। কিন্তু আশ্চর্য, আজও তুমি একটুও অনুজ্জ্বল নও। তেমনি প্রস্ফুটিত আছ। সুরমা, তুমি এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। তুমি এখন হাসছ আর কথা বলছ। তোমার গলায় যেন পুরোনো দিনের গান বেজে উঠছে। আমার একাগ্র চেতনায় শব্দের এই নিবিড় সুরগুলো ধরে রাখছি। তোমার শরীরীরূপে এখন অনেকের দৃষ্টি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতই আমি এখন বেশ গর্বিত।

'কি ভাবছো?' সুরমা প্রশ্ন করল।

'কিছু না। চল, একটু চা খাওয়া যাক।'

কেবিনে বসে পর্দাটা টানতে যাচ্ছিল বিমল। কি যেন ভেবে নিরস্ত হল। সুরমা এখন চুপচাপ বসে। কি যেন ভাবছে। সম্ভবত পুরোনো দিনের কথাই। কেবিনের এই নির্জন পরিবেশে বসে ও হয়ত কলেজের সেই পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছে। বিমল অনুমান করল। ওর মনে হল, একটা নরম সুন্দর আলো এখন সুরমার চোখে তিরতির করে কাঁপছে। সন্ধ্যাপ্রদীপ যেমন প্রসন্ন হাওয়ায় মৃদু মৃদু কাঁপে। কিংবা নদীর জলে ভোরের প্রথম আলো। একথা ভাবতে বিমলের খুব ভাল লাগছে। মনের গভীরে দু-একটা সুন্দর অনুভূতির ক্রিয়া টের পেল ও। সুরমার উজ্জ্বল উপস্থিতিটুকু ওর আজ খুব ভাল লাগছে। এই মুহূর্তে সুরমার মতই ও কলেজের তরঙ্গিত ভারমুক্ত জীবনে ফিরে গিয়েছে। স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে ও সুরমাকে একনজর দেখল।

'আজ ভারি সুন্দর হাওয়া।' শব্দের হাতুড়ি দিয়ে বিমল শিশুর স্তব্ধতা ভাঙল।

'হাওয়া কোথায় পেলে?—ও, ফ্যানের হাওয়া তোমার বুঝি বেশ ভাল লাগছে?' মৃদু হেসে সুরমা বলল।

বিমল এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। সামনের দিকে তাকাল ও। কাঠের পার্টিশন দেখল। তারপর আবছা গলায় বলল, 'তা নয়। ময়দানে ছিলাম এতক্ষণ। ভারি সুন্দর হাওয়া বইছে আজ।'

'এখানেও প্রচুর হাওয়া।' ঘুরন্ত সিলিং ফ্যানের দিকে সুরমা কটাক্ষ করল।

সুরমার দৃষ্টি অনুসরণ করে বিমল ঘুরন্ত ফ্যানটা দেখল। বলল, 'ফ্যানের হাওয়ায় আমার মন ভরে না সুরমা।'

'উপায় কি বল। এখানে বাইরের আলো আসে না, বাধার প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায়। কাজেই ফ্যানের হাওয়াকেই আমি এখন বন্ধু বলে মনে করছি।'

'কত অল্পেই তুমি সুখী হও।'

'তুমি কি সুখী নও বিমল? তোমার কথায় যেন অতৃপ্তির ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।'

'একথা এখন থাক সুরমা।' বিমল অন্য পথে বাঁক নিল। 'তোমার কথা বল। কেমন দিন কাটছে?'

'কেমন আবার কাটবে। যেমন কেটেছে এতদিন। রোজ সকালে উঠি। সারাদিন সংসারের কাজ। তারপর বিকেলে একটু বেড়ানো। তবে জানো বিমল, ব্যতিক্রমের মধ্যে আজকাল অনেক কবিতা ভুলে গেছি। পড়া হয় না তেমন।'

চা আসতেই সুরমা ফুলের তোড়াটা টেবিলে রেখেছে। বিমল দেখল, গোলাপগুলো এখনো তাজা।

লাল আর সাদা, আর গোলাপী। আর কিছু স্বর্ণ সবুজ পাতার বর্ডার। লোভীর মত ফুলগুলোর দিকে তাকাচ্ছে বিমল। আর সুরমার দিকে।

সুরমা ঠিক তেমনি আছে। তেমনি চঞ্চল, হাসি-খুশি। কতদিন কত দোকানে চা খেয়েছি। আমি আর সুরমা। কখনো প্রদীপ বা শঙ্কর। কিংবা কমলা। আজ এখানে বসে সেইসব আশ্চর্য দিনগুলোর কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছে। পুরোনো দিনের সুরমার কথা ভাবছি। আর আমারও। দিনগুলোকে এখন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। স্বপ্নের মত সুরমা এখন আমার সামনে বসে। ও এখন আমার বড় কাছাকাছি। আহা, আজকের এই সন্ধ্যেটা।---

চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে সুরমা বলল, 'তুমি ঠিক তেমনি আছ।'

ভাবনাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বিমল বলল, 'অথচ কত যে বদলে গেছি।'

'তাই না কি? আমি ত' কোনো বদল দেখি না। ঠিক তেমনি অশান্ত চোখ, মাঝে মাঝে এলোমেলো ভাবনায় ডুবে থাকা। আচ্ছা, মাঝে মাঝে কি এত ভাব, বলত?'

'কই কিছু না ত'।' সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমল হাসল।

মৃদু হাসল সুরমা। 'কবিতা লেখ না আর?'

'কবিতা! জান সুরমা, কবিতা ভালবাসতাম এত। দুজনে কতদিন রবীন্দ্রনাথে ডুবে থেকেছি। অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থে। তুমি আর আমি। অথচ আশ্চর্য, কবিতার কথা ভাবলে আজ কেন যে এত হাসি পায়। হাসি। বেশ টের পাই হাসির আড়ালে কি যেন বিষণ্ণতা লুকিয়ে থাকে। সুরমা সেদিনগুলোর কথা প্রায় ভুলেছি। ভুলতে বাধ্য হয়েছি।' এই সব কথার সশব্দ উচ্চারণের শেষে নির্জন মৌনতায় বিমল ভাবে আমি এক বৃন্তচ্যুত করুণ কুসুম। ম্লানতা সর্ব অবয়বে। অবলম্বনহীন, রিক্ত, তিক্ত, বিরক্ত। ফলত নৈরাশ্য, অনিদ্রা, নৈরাজ্য। কবে সেই সবুজ শস্যক্ষেত্র পার হয়েছিলাম। মনে নেই, কিছু মনে নেই।

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য গানগুলি? আমি ত' দুঃখ পেলে আজো গাই, বড় শান্তি পাই বিমল।'

কথাগুলো স্থির একাগ্রতায় শুনলো বিমল। ওর মনে হল যেন কোন্ ধূসর হয়ে আসা স্বপ্নের ছবি ওর দৃষ্টির কাছাকাছি। মৃদু হাসল ও। বলল, সব ভুলে গেছি। এখন ক্রমেই যেন জুড়িয়ে যাচ্ছি।'

'বিমল, তুমি যেন বিষণ্ণতায় ঝাঁক নিচ্ছ। এতদিন পর দেখা, এখন এ সব কথা নাই বা তুললে।'

'এখন কিন্তু আমার কোন দুঃখ নেই। কতদিন পর তোমাকে দেখছি। সেই পুরোনো দিনগুলোর মত চায়ের দোকানে কিছু সময় কাটানো। বিশ্বাস কর সুরমা, এই মুহূর্তে আমি আজ বড় খুশি। আমার বড় ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, পুরোনো দিনগুলো এই ছোট্ট কেবিনে আবার ফিরে এসেছে।'

'বিমল—' সুরমা মৃদুস্বরে ডাকল।

'উঁ—।'

এক মুহূর্ত টেবিলে চোখ নামিয়ে সুরমা কি যেন ভাবল। বলল, 'বিমল কলেজের দিনগুলো কেন যে এত মনে আসে। ভুলতে চেষ্টা করি, পারি না।'

ম্লান হাসল বিমল। ভাবনার গভীরে কথাগুলোর প্রতিধ্বনি উঠতেই বলল, 'ভুলতে পারলেই শান্তি।'

সুরমা কিছু বলতে চেয়ে নীরবতার আশ্রয় নিয়েছে। এবং এক টুকরো কাটলেট কাঁটার আয়ত্তে আনার সাধনায় মগ্ন আছে। কিন্তু এই নীরব মুখরতাটুকু চেতনায় সঞ্চারিত করে বিমল মনে মনে বলল, অনেক দিন তোমাকে দেখি নি। কদাচিৎ মনে পড়ত তোমার কথা। কোন তরঙ্গ ছিল না। কিন্তু আবার এলে। আমাকে জাগালে। আমি এখন নদীর মত প্রবাহিত।

'আর কিছু নেবে? ডিম বা মাংসের প্রিপারেশান?' সুরমার প্রশ্নে অনুরোধের সুর বাজল।

এই অনুরোধটুকু বিমলের বেশ ভাল লাগল। সুরমার কণ্ঠে পুরোনো উত্তাপ রয়েছে। অনেক দিন আগের ভুলে যাওয়া একটা গানের কলি মনে পড়ছে। সুরটা প্রাণের গভীরে বাজাতে বাজাতে বলল, 'নেব, আর তুমিও কিছু নেবে।'

একটা নাচের মুদ্রায় সুরমা হাত তুলল, 'আমার আর ইচ্ছে নেই মোটে। ক্ষিদেও নেই।'

'আমার কিন্তু আজ বেশ ক্ষিদে পেয়েছে।' মৃদু আবদারের ভঙ্গিতে বিমল সহজ হতে চাইল।

মুহূর্তেই সুরমার চোখ দুটো নরম হল। গলায় সেই কোমল গভীরতা ছুঁইয়ে বলল, 'পাওয়াটাই স্বাভাবিক। অফিস থেকে বোধহয় বাড়ি ফেরা হয় নি। সোজা চলে এসেছ এখানে।'

'ঠিক তাই। আশ্চর্য সুরমা, খাওয়ার ব্যাপারে তুমি ঠিক তেমনি অন্তর্যামী আছ।' মৃদু বিস্ময়ে বিমল একটু উচ্ছ্বসিত হল।

দু-একটা খাবারের অর্ডার দিল বিমল। তারপর সুরমার দিকে তাকাল। ওর মনে হল, সুরমা কেন এখন কিছু ভাবছে। সম্ভবত তার কথাই। মুহূর্তের স্তব্ধতায় একথা বিমলের মনে হল। সুরমা পর্দার রঙ দেখছে। নক্সা দেখছে। সেদিকে তাকিয়ে বিমল মনে মনে বলল, কলেজে ও উৎসের নদী ছিল। চঞ্চল, তরঙ্গমুখর। রোজ নানান রঙের শাড়ি পরে আসত। আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখতাম। আমি, প্রভাত, শ্যামল। আমি ওদের হিংসা করতাম। সুরমাকে মনে হত রঙীন প্রজাপতি। ওকে প্রতিদিন নানান রূপে দেখতাম। ভাল

লাগত।' এখনও দেখছি, এই উজ্জ্বল চায়ের দোকানের ছোট্ট পরিসরে। তেমনি ভাল লাগছে। কলেজের সেই নিবিড় দিনগুলির উষ্ণতা অনুভব করছি। যদিও সুরমা এখন মোহানার নদী, অন্য সাগরে পূর্ণতা পেয়েছে। সব চঞ্চলতার ঢেউ মুছে গভীর স্থির। তবু আজকের এই সন্ধ্যেটা আমার বড় ভাল লাগছে।

টেবিলে ঠক্ করে শব্দ হতেই বিমল চমকে উঠল। এবং অপসৃয়মান বয়টাকে দেখে নতুন খাবারে সচেতন হল। 'তারপর ক'দিন আছ?' নীরবতা ভঙ্গ করে শুধালো।

বিষণ্ণতায় সুরমা একটু ম্লান হল। 'মাত্র আজকের দিনটা। কালই পাটনায় ফিরে যাব।'

'সে কি । কালই? উনি বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন?' ঠাট্টার সুরে বলল বিমল। বলল, কিন্তু নিজের কাছেই কথাগুলো বড় নিষ্প্রাণ ঠেকল। ওর মনে হল, এই বিষণ্ণ হাসিটার নগ্ন রূপ সুরমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। একটু বিব্রত হয়ে ও এখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। কিন্তু চা'টা হঠাৎ ওর বড় বিস্বাদ ঠেকল। কাপটা নামিয়ে রাখতে-রাখতে ও সুরমাকে লক্ষ্য করল।

একঝলক হেসে সুরমা বলল, 'তা একটু হয়েছেন।'

কথাটা শুনে বিমল ক্ষণকাল স্তব্ধ আছে। হাওয়ায় পর্দাটা উড়তেই ও বাইরের পৃথিবী দেখছে। টেবিলে টেবিলে বয়দের ব্যস্ত আনাগোনা। দেয়ালে একটা চড়া রঙের ক্যালেণ্ডার নজরে এল ওর। ছবিটার দিকে মুহূর্তকয় তাকিয়ে থাকল। দেখল। বাগানে একটা গাছ। গাছের একমাত্র ফুলটা একটা শিশুর আয়ত্তে। ম্লানমুখে ওর পাশে আর একটা ছেলে। ম্লানমুখ ছেলেটার সঙ্গে নিজের একটা অদ্ভুত মিল খুঁজে পেল বিমল।

পর্দাটা এখন স্থির। ছবিটা আর দেখা যাচ্ছে না। বিমল টেবিলের প্রান্তে দৃষ্টি সংহত করল। সুরমাকে দেখল। সুরমা এখন অন্যমনে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। চুমুক দেওয়ার এই ভঙ্গিটা দেখল ও। তারপর এক আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল। সুরমার মুখের কেন্দ্রে দৃষ্টি রেখে নরম গলায় বলল, 'ঠিক এমনি ব্যস্ত থাকত একজন। সে-এক অন্য যুগের কথা, তাই না?'

সুরমা যেন একটু কেঁপে উঠল। গলায় নরম মৃদুতা ঢেলে বলল, 'একটু আগেই বলছিলে, ভুলতে পারলেই শান্তি। কিন্তু স্মৃতির হাতে তুমিই বোধহয় বেশি মার খাচ্ছ।'

'কথাটা ঠিক। ভুলতে পারলেই শান্তি। কিন্তু আসল কথা কি জান, এই ভোলাটা বড় সহজ নয়। অন্তত আমি ত' পারি নি। আর হয়ত তুমিও।'

সুরমা একবার বিমলের মুখের ওপর চকিতদৃষ্টি রেখেই নামিয়ে নিল। কি যেন বলতে চাইল ও। কয়েক মুহূর্ত দ্বিধায় দুলল। তারপর খুব আস্তে বলল, 'সময়ের কুয়াশায় সব তরঙ্গ ঢাকা পড়ে যাবে।'

মাত্রাতিরিক্ত জোরে হেসে উঠল বিমল। 'বেশ বলেছ সুরমা—সময়ের কুয়াশায় সব তরঙ্গ ঢাকা পড়ে যাবে।'

এই উচ্চকিত হাসির শব্দে সুরমা একটু বিব্রত হল। মৃদুস্বরে বলল, 'এত হাসির কি আছে। এটাই ত' স্বাভাবিক।'

'কিন্তু সুরমা, নতুন আলোয় বিস্মৃতির কুয়াশা মাঝে মাঝে সরে যায়। মাঝে মাঝে তোমার কথা ভাবি।'

বিমলের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। ভারি বিব্রত হল সুরমা। বিমলের মুখের দিকে এখন আর চাইতে পারছে না। নিজেকে এই মুহূর্তে বড় দুর্বল মনে করছে ও। টেবিলে আঁচড় কাটতে কাটতে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'বিমল, কী সুন্দর আলোটা দেখছ। কী আশ্চর্য নরম গভীর নীল।'

বিমল ওপরে তাকাল। আলোটা দেখল। আলোটা নরম গভীর নীল। ভাবল। কিন্তু ওর চোখে বিন্দুমাত্র বিস্ময় কাঁপছে না। ওর মনে হচ্ছে, এই আলোর আড়ালে সুরমা পুরোনো ক্ষতগুলো ঢেকে রাখতে চায়। তাই সহসা নরম গভীর নীল আলোয় ও বাঁক নিল। বিমল দেখল, আলোর সহস্র হাত প্রাণপণে অন্ধকার মুছে দিচ্ছে। কিন্তু নাগালের বাইরে তবু অনেক অন্ধকার। অন্ধকারে নগ্ন হৃদয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, স্বতই তখন গভীর আত্ম-নিমগ্নতা আসে। ময়দানের অন্ধকার কোণটার কথা মনে পড়ছে, খানিক আগে যেখানে বসে রাত্রির বিচিত্র রূপে মগ্ন ছিল ও।

বিমল একনজরে সুরমার বিপন্ন মুখ দেখল। মনে মনে বলল, সুরমা, তুমি এখন কি ভাবছো জানি। ভাবছো, পুরোনো স্রোতের মুখে একটা পাথর চাপা আছে। সমস্ত আবেগ এখনও সংহতির শান্ত মহিমায় গাঢ় এবং স্থির। তোমার ভয়, এই জাগরুক স্মৃতির খোঁচায় পাথরটা সরে যাবে, আর অবরুদ্ধ নিবিড় স্রোত মুহূর্তেই স্রোতল নদী হয়ে যাবে। আমরা ভেসে যাব। তোমার আশঙ্কা, এই জোয়ারের টানে আমরা ভেসে যাব। তোমার এত ভয়, অথচ জানো না, সেই উৎসের বাধাটা কখন সরে গেছে। আমি প্রাণের গভীরে এক নিবিড় স্রোতের টান অনুভব করছি।

সুরমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করল। পর্দায় চোখ রেখে আস্তে বলল, 'রাত অনেক হল।'

'হ্যাঁ, আটটা প্রায় বাজে। চল, ওঠা যাক।'

'ফুলগুলি তুমি নাও।' সুরমা বিমলের হাতে ফুলের তোড়াটা এগিয়ে দিল।

ওরা দুজনে বাইরের সমুদ্রে এসে দাঁড়াল।

বুকের গভীরে অনেক নদীর তরঙ্গ নিয়ে বিমল ফিরছিল। ওর চারপাশে অজস্র আলোর উজ্জ্বল সমারোহ। আলোর স্রোতে প্রতিদিনের রাস্তা যেন এখন নিবিড় নদী হয়ে গিয়েছে।

বিমল যেন নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে। ওর ভারি ভাল লাগছে এই আলো আর উজ্জ্বলতা। এই মুহূর্তে একা হতে পেরে ও খুব খুশি। এই খুশিটুকু ও এখন নির্জন ভাবনায় চিত্রিত করতে চায়। বিমল একা-একা ফিরছে। পুরোনো দিনের অজস্র টুকরো ছবি এখন ওর ভাবনায় ঘোরাফেরা করছে।

'সুরমা, আমরা সুখী হব।' চার বছর আগে বিমল বলেছিল।

'আমরা শান্তির উৎস খুঁজে পেয়েছি।' সুরমা বলেছিল।

সুখের উত্তাপ এখন আবার অনুভব করছি। যেতে যেতে বিমল মনে মনে বলল। আমি আজ গানের মত বেজেছি। বিস্মৃত সেই গ.নটা আজ আবার গাইব—জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে। আমি গাইব। একটা আশ্চর্য গভীরতায় বিমলের ভাবনাটুকু এখন প্রবাহিত হচ্ছে। ফুলের তোড়াটা না কর কাছে ধরল। রাত্রির এই ভাবনাটুকুও ফুলের গন্ধে সুরভিত করতে চাইল।

আর তখনি একটা তীব্র কটু গন্ধ তীক্ষ্ণ বর্শার :ত নাকে বিঁধেছে। আমূল চমকে উঠেছে ও। তীব্র কটু গন্ধের ধাক্কায় নিবিড় স্নায়ুগুলো এখনো প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে। সামনে তাকাতেই দেখল, কখন বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। এতক্ষণ আলোর অজস্রতায় ডুবেছিল। বাতাসের নিবিড় আত্মী.তায় সুখী ছিল ও। প্রাত্যহিকতার সব যন্ত্রণা ভুলে ছিল। এখন অন্ধকার। বাতাস নেই। স্তব্ধ গহন অন্ধকারে কেমন যেন ভয় করছে। খাটালের পচা দুর্গন্ধে ও নাকে রুমাল দিল। এতক্ষণ যেন একটা স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছিল। ঘোর কাটতেই পুরোনো অ-কারে ফিরে এল ও। মিনতির কথা ম' পড়ল। পিঙ্কুর ছোট্ট মুখটা যেন নি:শব্দ ভ্রূকুটিতে ওকে বিদ্ধ করছে। বুকে. মধ্যে হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা অনুভব করল বিমল।

মিনতি আজ পিঙ্কুর ওষুধ আনার জন্যে বলেছিল। মনে নেই। আনি নি। বিকেলের বাজার করা হয় নি। ভুলে গেছি। - - - আমাদের একমাত্র ঘরটা বড় অন্ধকার। অন্ধকার আর ঘুপচি। ছোট ছোট জানালা। জানালা খুললে খাটালের পচা গন্ধ। তাই বেশির ভাগ সময় বন্ধ থাকে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।- - - এতক্ষণ আলো-হাওয়ার জোয়ারে ভেসেছিলাম।

একটা সুন্দর স্বপ্নের মৃত্যুর আশঙ্কায় বিমল কেঁপে উঠল। নিজেকে ও বড় অসহায় মনে করছে। অসহায় আর ক্লান্ত। ক্ষণপূর্বের সঞ্চিত মাধুর্যটুকু নিয়ে যেন এতক্ষণ স্বপ্নের জগতে হাঁটছিল। ধূসর অন্ধকারে পা দিতেই ও এখন মেঘলা আকাশের মত বড় বিষণ্ণ ও ম্লান।

অফিসের বাইরে এসে কত কি ভেবেছি। রাস্তায় এখন অগুন্তি মানুষের স্রোত। ভেবেছিলাম, জোয়ারের জল নেমে গেলে ফিরব। সে কথা প্রায় ঠিক হল। খানিক আগে আমি জোয়ারের নদী হয়েছিলাম। কিন্তু এখন ভাঁটার কাল। আমি ফিরছি।

একবার পিছনে তাকাল বিমল। ফেলে-আসা আলোর জগৎটা দৃষ্টির নাগালে আনতে চাইল। ওর করুণ চোখে এখন একটা বিপন্ন আর্তি ফুটেছে। একটা অমোঘ আশঙ্কায় ফুলগুলি বুকের কাছে তুলে ধরল ও। আর আশ্চর্য, অমনি কয়েকটি পাপড়ি অন্ধকারে ঝরে গেল। পাপড়িগুলো ঝরে গেল।

মহাযোগী—ত্রিলোকের মহাতান্ত্রিক—সাধকশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের শ্রীমুখনিঃসৃত—কলির মানবের মুক্তির ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভের একমাত্র সুগম পন্থা—অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া সারাৎসার সঙ্কলনে—প্রত্যক্ষ সত্য—সদ্যফলপ্রদ সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়

তন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ আগমবাগীশ শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দের

বৃহৎ তন্ত্রসার

—সুবিস্তৃত বঙ্গানুবাদসহ বৃহৎ সংস্করণ—

তন্ত্র-মন্ত্র ও তন্ত্র-রহস্য পঞ্চমকার সাধনা কিরূপ? গুপ্তসাধন কাহার নাম। অষ্টসিদ্ধির সকল প্রকারের সাধনা—তান্ত্রিক সাধনায় শাক্তভক্তগণের সকল সিদ্ধিই তন্ত্রসারে সন্নিবেশিত।

সরল প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ—নূতন নূতন যন্ত্রচিত্রে সুশোভিত—তন্ত্রানুষ্ঠানপদ্ধতি সম্বলিত।

বহু সাধকের আকাঙ্ক্ষায়—বহুব্যয়ে—আনুষ্ঠানিক তান্ত্রিক পণ্ডিতমহাশয়গণের সহায়তায়—কাশী হইতে পুঁথি আনাইয়া বসুমতী সাহিত্য মন্দির পরিশোধিত পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, যাগযজ্ঞ, বলিদান, সাধনা, সিদ্ধি, মন্ত্র, জপ, তপ, তন্ত্রসারে কি নাই? হাইকোর্টের জ্ঞানবৃদ্ধ বিচারপতি—অসংখ্য আইনগ্রন্থ-প্রণেতা উডরফ সাহেবের তন্ত্রানুশীলন—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের অনুবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশ কালাবধি তন্ত্রগ্রন্থের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে; তাঁহারা দেখিবেন কি অলৌকিক সাধনার সিদ্ধি—অতীন্দ্রিয় অনুষ্ঠান সমাবেশ—সর্ব্বতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয় কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যত যন্ত্র আছে সকলেরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্য দশ টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ত্রয়োদশ প্রবাহ ॥

"দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জে একদিন বাঙালীর বাণিজ্য বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল।"

আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে আসুন। দিনাজপুর জেলা। এই সু-প্রাচীনকালের জেলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে আগেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

দিনাজপুরের সঙ্গে একটি বিচিত্র খাদ্যবস্তুর নামের মহিমা জড়িয়ে রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যটির নাম 'কাটারী ভোগ' চিড়া। দিনাজপুর কথাটা উচ্চারণ করলেই যেন চিনি সক্কর আর আতপচালের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। প্রাচীন পুঁথিতে লিখছে, এখান হইতে ধান, চাউল বাংলার বিভিন্ন স্থানে ও কলকাতার পথে বিদেশে রপ্তানী হয়।

আজ বাংলা দেশের আরও অনেক জেলার মত এ জেলা কবন্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুরগাঁও, বীরগঞ্জ, চিরির বন্দর, একদা ব্যবসায় ধনে ও জনে উচ্ছল জনপদ আজ বিদেশী রাষ্ট্রের অধীন। একদিন এই জেলার গ্রামে-গ্রামে নগরে-বন্দরে জনপদে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করেছিল। এক শহরের উৎপন্নদ্রব্য আর এক শহরে বিক্রি হতো।

রাজবংশীরা তাঁতের মোটা কাপড় বুনতো। পাট আর তুলোর সুতো দিয়ে মেশানো। সেকালে এই জেলার তাঁতী, যুগী, জোলাদের অপরিমিত স্বাস্থ্যের সম্পদ ছিল। তারা পরনের কাপড়ের জন্য বিদেশের বাজরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতো না।

সুদূর পৌরাণিককালে দিনাজপুরের আর এক নাম ছিল মৎস্য-দেশ। হয়তো প্রচুর মৎস্য এখানকার খালে, বিলে পাওয়া যেত বলই এই নামকরণ হয়েছিল। পুরানো কালের এই নামের মহিমা কিন্তু বজায় রেখেছে দিনাজপুর—কেন না ১৯০৮ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, সাত হাজার কি আট হাজার মণ মাছ রপ্তানী করা হয়েছিল এই দিনাজপুর থেকে।

বড় বড় পুষ্করিণী আর দীঘির দেশ এই দিনাজপুর। কোন সুদূর অতীতে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধার জন্য খনন করা হয়েছিল। আজও পুরানো দিনের মত জলের ঐশ্বর্যে টলমল করছে প্রাচীন এই জলাশয়গুলি। এই সব পুকুরের সুস্বাদু জলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। পুরানো দীঘি, যেমন মহীপালের দীঘি, ধল দীঘি কালোদীঘির মাছ সম্বন্ধে—ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার বলে Uneatable. Too much Oily and Fleshy.'

এখানে কৃষকরা বছরে ছয় মাস মাঠে কাজ করে। আরও ছয় মাস তারা

মাঠে মাঠে মাছ ধরে। জেলার বাজারে, হাটে, বন্দরে চালান দেয়।

এই জেলার নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীরা এককালে মাদুর, মোড়ার সুদক্ষ কারিগর ছিল। বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি করতো ঘরের ছাউনী দেওয়ার চাটাই। গুড়ের ব্যবসাও ছিল উল্লেখযোগ্য। গ্রামে গ্রামে ফলতো অপর্যাপ্ত ইক্ষু। গ্রামের বটতলায় কি কারো খলাবাড়িতে আখমাড়াইয়ের কল দেখা যেত। একেবারে গোড়ার দিকে বাঁশের তৈরি আর বলদ দিয়ে ঘানির মত ঘুরানো দেশী যন্ত্র ছিল। তারপর কুষ্টিয়ার 'রেনইক এ্যাণ্ড কোম্পানী' আখমাড়াইয়ের কল তৈরি করতে সুরু করল। একে গেজেটিয়ার বলেছে 'আইরন মেশিন'। দুটো বড় বড় লোহার রডের ভেতরে আখ ভরে দিতে হতো। রড দুটো ঘুরতো। আর এক দিকে এক বড় কড়াইয়ের মত পাত্রে অঝোরে রস পড়তো। গুড় প্রস্তুত করা হতো সেই রস জাল দিয়ে। গুড়ের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে যেত। দূর দূর দেশে চালান হতো সেই গুড়।

অনেক গ্রামে ধান থেকে চাল প্রস্তুত করার জন্য হাস্কিং মেসিন ছিল। আজ ধানকল হয়ে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন পুঁথিতে উল্লেখ আছে, আত্রাইয়ের তীরে, চাঁদগঞ্জ, কুমারগঞ্জ সমঝিয়া, পতিরাম, বালুরঘাট আর পুনর্ভবার ধারে নয়াবাজার ব্যবসা কেন্দ্র ছিল। কিন্তু—

আছে আত্রাই। আছে পুনর্ভবা। তাদের স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসছে, ভরাট হয়ে আসছে তাদের বুক। আজকের গরীবের ঘরের কৃশ-করুণ মেয়ের মত আত্রাই, পুনর্ভবার দিকে তাকালে যেমন তাঁদের অতীত গৌরবের কথা কল্পনা করা যাবে না, তেমনি আধুনিক কালের বালুরঘাট পতিরামের আর কোথাও আখমাড়াই ও ধানকোটার সেই উচ্ছ্বসিত উৎসবমুখর দৃশ্য দেখা যাবে না।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যাবতীয় রচনা দুই খণ্ডে সঙ্কলিত)

উভয় খণ্ডই সম্পাদনা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের গবেষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এবং তৎকর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত ও প্রতিটি বই বিশ্লেষিত।

প্রথম খণ্ডের সূচীঃ

নাটক॥ পাষাণী। তারাবাই। রাণা প্রতাপসিংহ। দুর্গাদাস। সাজাহান। মেবার-পতন। **প্রহসন॥** কল্কি-অবতার। বিরহ। প্রায়শ্চিত্ত। **কবিতা॥** আর্য্যগাথা (১ম)। আর্য্যগাথা (২য়)। আষাঢ়ে। হাসির গান। **গদ্য রচনা॥** একঘরে। কালিদাস ও ভবভূতি। **পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী।**

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচীঃ

নাটক॥ সীতা। ভীষ্ম। সোরাব রুস্তম। নুরজাহান। চন্দ্রগুপ্ত। সিংহল বিজয়। পরপারে। **প্রহসন॥** বঙ্গনারী। ব্রাহ্মস্পর্শ। পুনর্জন্ম। আনন্দ-বিদায়। **কবিতা॥** মন্দ্র। আলেখ্য। ত্রিবেণী। গান। **গদ্য রচনা॥** বিলাতের পত্র। চিন্তা ও কল্পনা। **ইংরেজী কবিতা॥** LYRICS OF IND। **পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী।**

প্রথম খণ্ডঃ সাড়ে বার টাকা

দ্বিতীয় খণ্ডঃ পনর টাকা

প্রথম খণ্ড পূর্বেই বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হইল। উভয় খণ্ডই লাইনো হরফে মজবুত কাগজে ঝরঝরে ছাপা; কয়েকটি সুন্দর ছবি সমন্বিত। স্বর্ণাঙ্কিত রেক্সিন বাঁধাইঃ সুন্দর প্রচ্ছদপট ও শোভন সংস্করণ। সংগ্রহে রাখার মত বই।

রচনাবলী সিরিজের আমাদের আর কয়েকটি বইঃ

বঙ্কিম রচনাবলী ১ম

সমগ্র উপন্যাস একত্রে [১২·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী ২য়

উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র সাহিত্য [১৫·০০]

রমেশ রচনাবলী

সমগ্র উপন্যাস একত্রে ৯·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত।

বৈষ্ণব পদাবলী

প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন [২৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা ৯

এবার রাজশাহী।

এ জেলাতেও দিনাজপুরের মত আদিমতম ব্যবসা কৃষিকার্য। কৃষির কাজে সঙ্গীতের স্বরের মত বাঁধা তাল-লয়ের একটা নিয়ম আছে। ধান পাকে অগ্রহায়ণে। পৌষ-মাঘ মাসে ধান গোলায় ওঠে। আর গঞ্জে গঞ্জে বিক্রয় হয়ে যায়। কিম্বা দূরদেশে রপ্তানী হয়। উত্তরবাংলার প্রায় সব জেলাতেই একই রকম। কিন্তু ধান ছাড়াও এই দেশে একদিন রেশমের ব্যবসার সমারোহ ছিল। গেজেটিয়ার বলছে,

Silk spining and weaving once so important in the economic life.---

ঠিকই বলেছে। শত শত শতাব্দী পূর্বের সিল্ক-ব্যবসার সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের স্মৃতি বুকে নিয়ে রামপুর বোয়ালিয়ায় আজও পড়ে রয়েছে। পর্তুগীজদের রেশমকুঠির ধ্বংসাবশেষ। আছে শরদহে, মতিহারে সিল্কের কারখানার বিলুণ্ঠিত ভগ্নস্তূপ কাঁটাগাছ আর জঙ্গলে ছেয়ে গিয়েছে। কিন্তু একদিন সহস্র মানুষের পদশব্দে মুখরিত হয়ে থাকতো সিল্কের এই সব কারখানা বাড়ি। একজন ভারতপ্রেমিক বিদেশী ভদ্রলোক মিঃ হলওয়েল বলেছেন,

In 1759 six kinds of cloth and raw silk as being exported from Nator both to Europe and the markets of Bussora. Mocha, Pegu and Malacca.

খৃস্টীয় ১৭৫৯ সালে ছয় রকমের কাপড় এবং মোটা সিল্ক নাটোর থেকে ইউরোপে রপ্তানী হতো। ইউরোপ থেকে চলে যেত মধ্য-প্রাচ্যের বসোরা, মক্কা পেগু মালাক্কায়। নাটোরের সিল্কের কাপড় বসোরার বাজারের শো-কেশে ঝলমল করতো। কথাটা কেমন রূপকথার মত শোনাচ্ছে। আজ যেটা দীর্ঘ কালের ব্যবধানে অবাস্তব মনে হচ্ছে, একদিন সেইটাই সত্য ছিল—সেইটাই এ জেলার মানুষের জীবিকানির্বাহের উপায় ছিল।

শুধু কি রেশম? একদিন নাটোর মহকুমার একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম কলমগ্রামে একশো দুশো পরিবার শুধু পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি করেই পেটের ভাত জোগাতো। কাঁসারীরা বাসন তৈরি করে বড় বড় বজরায় তুলতো। তারপর নদীর ঢেউ পাড়ি দিয়ে দিয়ে চলে যেত দূরদূরান্তরে। চলনবিল থেকে নৌকো করে একেবারে আত্রাইয়ের উত্তাল স্রোতের উজান ঠেলে চলে আসতো বালুরঘাটে, পতিরামে কুমারগঞ্জে। কোন জনবহুল শহরে বজরা নোঙর করে তারা পাড়ায় পাড়ায় বাসন ফেরী করে বিক্রি করতো। নিস্তব্ধ দুপুরে কাঁসরের আওয়াজ উঠতো আচমকা ঠং—ঠং ঠং, সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলার ডাক শোনা যেত — পিতল-কাঁসার—বাসন নেবেন—মা—

গঙ্গা, চলনবিল আর আত্রাইতে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছ নৌকো বোঝাই হয়ে দূর দেশে দেশে চলে যেত। শুধু পদ্মা থেকে ১৯০৮ সালে দু' লাখ টাকার মাছ রপ্তানী হয়েছিল।

ভাগলপুর ও কলকাতা থেকে আমদানী হত ভেড়ার লোম। এই লোম দিয়ে কেশবপুর গ্রামে কম্বল তৈরি হতো। গ্রামের নাম হয়ে গিয়েছে কেশবপুর—ভেড়ীপাড়া গ্রাম। রাজশাহীতে দেশী ভেড়ার লোম থেকে সুন্দর সুন্দর কম্বল তৈরি হয়। আর—

পাওয়া যেত অনেক কিছু। কিন্তু রাজশাহীর অতীত ইতিহাস পর্যালোচনার আর কোন অর্থ হয় না। আজ সেই পদ্মার তীরের চরঘাট, বড়ালের পাশে গুরুদাসপুর আকাশের নক্ষত্রের মত সুদূর হয়ে গেছে।

ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা আর ধারিয়ার তীরে বিখ্যাত বর্ধিষ্ণু রংপুরের তামাক একদিন বিখ্যাত ছিল। রংপুরের তামাক দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যেত। ডোমার, দারবানী, সৈদপুর ও রংপুর শহর পাটের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল ছিল।

পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটিতে উর্বর ছিল পাবনা জেলার মাটি। পাবনা, সিরাজগঞ্জের পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর পাট জন্মাতো। নদী-মাতৃক জেলা। নদীর স্রোত কেটে কেটে স্টিমার চলে। এ জেলার পাট, কলাই ও সরিষা এখান থেকে বহু দূর দেশে রপ্তানী হতো। পাবনা সদর শহর, সিরাজগঞ্জ, বেরা, উল্লাপাড়া, ধাপারি আর পাভাশী, এই জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। একদিন বগুড়ার কার্পাস ও রেশমশিল্পের খুব প্রচলন ছিল। গুড়, মাদুর, মৃৎ-পাত্র, কাঠের আসবাবপত্র বগুড়া জেলায় খুব পাওয়া যেত।

ঢাকা। ঢাকাই কাপড়—ঢাকার মসলিন আর কাশিদা ও ঝাপান কাপড়ের খ্যাতি ছিল কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে। এই জেলার শাঁখা আর কাঁসার পিতলের বাসন একদিন বাংলার জেলায় জেলায় রপ্তানী হতো। ফরিদপুরের ইলিশ মাছ, আর বাখরগঞ্জের বালাম চাল ও সুপারী আজ আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে গিয়েছে। কিন্তু একদিন পূর্ব পাকিস্তানের এই সব পণ্যসম্ভার ভারতবর্ষের বহু দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যেত। এই সব আন্তর্জেলার বাণিজ্যের যাবতীয় পণ্য উৎপন্ন করতো বাঙালীরা, করতো রপ্তানী বাঙালীরা—আমাদের অতীত বংশধররা কখনো বাণিজ্যবিমুখ ছিলেন না—

(ক্রমশঃ)

● হরতালের দিনে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়

রাজধানী:

ভারত বন্ধ আন্দোলন বন্ধ করার জন্য পশ্চিম বাংলা সরকারের আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। এমন নিখুঁত সরকারী ব্যবস্থাপনা সাম্প্রতিক-কালে মানুষের নজরে পড়ে নি। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বাজারে বাজারে ছিল কড়া পুলিশ প্রহরা। পুলিশের প্রহরাধীনেই চলেছিল রেল এবং কিছুসংখ্যক বাস ও ট্রাম। সরকার এবং বণিকসভাগুলো কর্মচারীদের আফিসে আসার জন্য চাপ দিয়ে সার্কুলার জারী করেছিলেন। বিরোধী দলের নেতাদের আগেভাগেই নিক্ষেপ করা হয়েছিল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

হরতালের চারদিন আগেই কলকাতায় এসেছিলেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। মহানগরীর মানুষ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক অভিনন্দন সেদিন জানিয়েছেন। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল ভিন্ন এমন অভিনন্দন আর কেউ পান নি। ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী আকুল আগ্রহে শুনেছে প্রধানমন্ত্রীর মনখোলা হৃদয়স্পর্শী ভাষণ। তিনি গরীবের ঘরের ছেলে. গরীবের জন্য তাঁর মমত্ববোধ সমধিক এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের কথা সামনে রেখেই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপায়ণ চলেছে প্রভৃতি যে-সব কথা সেদিন ময়দানে বলেছিলেন তা' জনচিত্ত স্পর্শও করেছিল। ঘন ঘন করতালি দিয়ে সমবেত নরনারী মনের কথাটা ব্যক্ত করেছে। ময়দানের সেই সমাবেশেই প্রধানমন্ত্রী ভারত বন্ধ আন্দোলনে সাড়া না দিতে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের সঙ্গে তিনি দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাও বলেছিলেন। আগামী দু'মাস পরে খাদ্যসঙ্কট কেটে যাবে বলেও আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদন, পশ্চিম বাংলা সরকারের ত্রুটিহীন ব্যবস্থাপনায় কাজ হয় নি। সাধারণ মানুষ ২৫শে সেপ্টেম্বর হরতাল পালন করেছে কলকাতা শহরে ও বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেদিন কর্মচঞ্চল কলকাতার জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দোকানপাট, বাজার সবই প্রায় বন্ধ ছিল। বেলা চারটে পর্যন্ত রাজপথ ছিল একেবারে জনবিরল। জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকার তাগিদে অর্থাৎ অন্ন সংস্থানের পথটি চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে যারা চাকুরীস্থলে আসতে বাধ্য হয়েছিল তারা এবং পুলিশের লোকজন ও কৌতুকপ্রিয় কিছুসংখ্যক তরুণের দল ভিন্ন কেউ সেদিন রাস্তায় নামে নি। নামতেও পারে না। প্রধানমন্ত্রী যত আশ্বাসই দিন না কেন, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁর প্রতিফলন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ আর কোন আশ্বাসেই আস্থা স্থাপন করতে পারছে না।

দু'মাস পর খাদ্য সমস্যা থাকবে না। নতুন চাল, গম, বাজরা, ভুট্টা প্রভৃতি বাজারে উঠলে সমস্যা কিছুটা কাটবে বইকি। প্রতি বছরই তা হয় এবং দেশের নেতারা—কেউ না কেউ, ধান কাটার কাছাকাছি সময়ে এমনি আশ্বাস দিয়ে থাকেন। এবার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, গেল বছর শুনিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সে আশ্বাসে কোন কাজ হয় নি। এপ্রিল মাস পড়তে-না-পড়তেই পশ্চিম বাংলায় খাদ্যসঙ্কট এবারে সুরু হয়েছে। সে মাস থেকে তা তীব্র আকারে দেখা দিয়েছে।

কলকাতার বাজারে পটল দেড় টাকা, আলু এক টাকা দশ পয়সা

থেকে পাঁচ সিকে, চাল খোলাবাজারে পাঁচ সিকে, তেল চার টাকা থেকে পৌনে পাঁচ টাকা এবং চার টাকার নীচে কোন তাজা মাছ নেই। সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কালোবাজার জেঁকে বসেছে। সরকার নীরব দর্শক। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সমাজ-জীবনে মান-মর্যাদা রক্ষা করে চলা দায় হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষের মনের বিক্ষোভ প্রকাশের একমাত্র হাতিয়ার—হরতাল। এ আন্দোলন গণতন্ত্রসম্মত। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাই মানুষ হরতাল পালন করতে বাধ্য হয়েছে।

রেল, ট্রাম ও বাস চলার পরও এমন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পূর্বে খুব কমই হয়েছে কলকাতা শহরে। দোকান বন্ধ করার জন্য কোন স্বেচ্ছাসেবককে এসে অনুনয়-বিনয় করতে হয় নি, বাজারে বাজারে কোন পিকেটিং হয় নি। শান্তি ও শৃঙখলাভঙ্গের মত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব পর্যন্ত হয় নি। মানুষ নীরবে ঘরে বসে প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের খাদ্যনীতির। মজুতদার-জোতদার ও মুনাফাশিকারীদের জানিয়েছে অন্তরের ঘৃণা।

সরকার যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে হরতাল বানচালের আয়োজন করেছিলেন গণমনে তারও প্রতিক্রিয়া কম হয় নি। হরতালের দিন পুলিশ তড়িদ্গামী হয়ে উঠেছিল। সামান্য দুজন মানুষকে রেললাইনের কাছে দেখলেই, মোড়ের মাথায় দুটি ছেলেকে দাঁড়াতে দেখলেই রিভলবার, পিস্তল, বন্দুক ও লাঠি উঁচিয়ে দৌড়তে দেখা গেছে পুলিশকে। মানুষের জিজ্ঞাসা, এই কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ-বাহিনীকে কালোবাজারের বিরুদ্ধে কেন নিযুক্ত করা হচ্ছে না? কালোবাজারে নয়, প্রকাশ্যে তেল ও মাছ বিক্রি হচ্ছে কালোবাজারের দামে। পুলিশ, সরকারী কর্মচারী, এমন কি, মন্ত্রীরাও সেই মূল্য দিয়েই কিনছেন। সাধারণ মানুষ যেখানে হানা দিয়ে তেল-চাল ও মাছ আটক করতে পেরেছে সেখানেই পুলিশ হাজির হয়ে আটক মাল বিক্রির ব্যবস্থা করেছে ন্যায্যমূল্যে। যে-কাজ সাধারণ মানুষ পারে সে কাজ পুলিশের দ্বারা হয় না কেন? তবে কি এর পেছনে কোন গোপন হাতের লীলা চলছে?

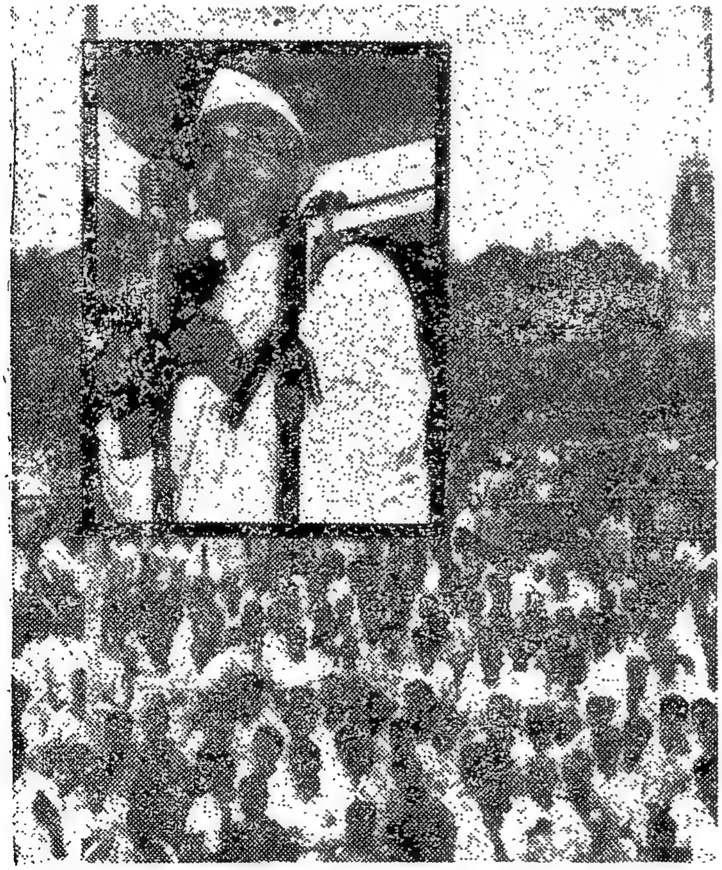

৩. ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিরাট জনসভায় ভাষণরত শ্রীশাস্ত্রী

হরতাল বিফল করতে সরকার উঠে পড়ে লেগেছিলেন। প্রশাসন-যন্ত্রকে এ কাজে নিয়োগ না করে শাসকগোষ্ঠী যে দলের প্রতিনিধি সে দল অথবা সরকারের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের কাছে যাবার সুযোগ ছিল। সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস বা সরকার সে দায়িত্ব পালন করেন নি। চোরাকারবারীদের খুজে বের করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কোন চেষ্টাই তাঁরা করেন নি। কাজেই হরতাল না করার জন্য আবেদনের পেছনে সাধারণ মানুষ কোন বলিষ্ঠ যুক্তি খুঁজে পেতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের কথার ফানুস ছাড়লে সে ফানুস হাওয়ায় বিলীন হয়েই যাবে—মানুষের মনে কোন দাগ কাটতে পারবে না।

* * *

শেষ পর্যন্ত কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষের সুমতি হয়েছে। তাঁরা ২৬ হাজার পৌর কর্মচারীর অধিকাংশ দাবী মেনে নিয়েছেন এবং পৌর কর্মীদের পাঁচদিনব্যাপী ধর্মঘটের অবসান ঘটেছে। পৌর কর্মীদের দাবী দীর্ঘদিনের। গেল বছরও এ নিয়ে একদফা হৈ-চৈ কম হয় নি। এঁদের এমন সব দাবীও রয়েছে যা মেটাতে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়

না। তথাপি সবটাই কর্তারা চাপা দিয়ে রেখেছেন আবর্জনাস্তূপের ভেতরে। জঞ্জাল পরিষ্কার করে তাকে টেনে বের করতে যেতেই মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন মেয়র। পুলিশ ডেকে সায়েস্তা করতে চেয়েছিলেন কর্মীদের। ফলে, আগুন জ্বলে উঠেছিল। সে আগুনে মেয়র পর্যন্ত ঝলসে উঠেছেন। দাবী উঠেছিল তাঁর পদত্যাগের।

কলকাতা করপোরেশন সরকারেরই ছোট সংস্করণ। কর্মীদের ডেকে এনে, তাদের সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অনেক আগেই একটা মীমাংসায় আসা যেতো অনায়াসেই। তা' না করে করপোরেশন দমননীতি অবলম্বনই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ন্যায়ের পথে, যুক্তির পথে না গিয়ে মাথায় হাতুড়ি মেরে মানুষকে দাবিয়ে রাখার যুগ চলে গেছে। দমনের পথ কেবল দাবানলেরই সৃষ্টি করতে পারে, তাতে কোন সমস্যার সুরাহা হয় না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় সে নজীরের অভাব নেই। মানুষের ইতিহাসকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ কথাটা যেন আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ বেমালুম ভুলে না থাকেন।

পৌর কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে শহর কলকাতার দুঃসহ অবস্থা।

জলপাইগুড়িঃ

জলপাইগুড়ি শিলিগুড়ি বাস-সিণ্ডিকেটের যাত্রীবাহী বাসে যাঁরা একবার চেপেছেন তাঁরা ভিন্ন কোন উপায় থাকলে দ্বিতীয়বার বাসের ধারে-কাছে যেতেন না। কলকাতা শহরের বাসের যাত্রীদের কষ্ট কম নয়। জলপাইগুড়িতে এসে একবার বাসে চাপলে কলকাতার বাসযাত্রী বুঝতে পারবেন বাসের খোলের মধ্যে কি পরিমাণ মানুষ গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করে পুরে দেওয়া যায়।

তা ছাড়া, বাসের দৌরাত্ম্যে পথচারী ও রিক্সাওয়ালাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। জনবহুল রাস্তাকে তারা পরিণত করেছে। প্রায়ই বাসগুলো রাস্তা আটক করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এ বিষয়ে আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বাসে যাত্রী ক'জন বসবে এবং ক'জন দাঁড়িয়ে থাকবে তার একটা সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া রয়েছে। সে সংখ্যা যাত্রীর ভিড়ে সর্বত্র মেনে চলা সম্ভব হচ্ছে না বলেই এমন কাজ করা উচিত নয়—যাতে দীর্ঘপথের বাসযাত্রীর কষ্টও মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে।

* * *

আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচন নিয়ে দুটি দলের মধ্যে লড়াই চলেছে। সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে এক জটিল পরিস্থিতি। একদফা হৈ-হল্লার পর এক দলের আবেদনে ইনজাংশন জারী হয়েছে অপর দলের ওপর—বাতিল হয়েছে নির্বাচন। কোতয়ালী থানায় গিয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিবদ্ধ করেছে। ওরা তাদের বিপক্ষ মারমুখী হয়ে মারপিট করতে পারে।

কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন গঠন সকলেরই কাম্য। ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ছাত্রদের সাংগঠনিক প্রতিভা। ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা তাদের এখানে। কিন্তু সে সূচনা এত ক্লেদাক্ত হবে, কেউ ভাবতেও পারেন নি। ছাত্রসমাজ আজ কোন্ স্তরে নেমেছে আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্রদের কার্যকলাপই তার সাক্ষ্য দেবে। আদালত-পুলিশ না করে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সহায়তায় বিরোধের নিষ্পত্তি তারা অনায়াসে করতে পারতো।

এর জন্য ছাত্রসমাজকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমাদের সমাজের মাতব্বরদের এবং দেশের বর্তমান নেতাদের কাজের একটা পরিষ্কার প্রতিবিম্বই আমরা ছাত্রদের মধ্যে

দেখতে পাচ্ছি। ক্ষমতালাভের জন্য, ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যে কোন পন্থা অবলম্বনে দ্বিধা বোধ করছেন না। নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নেতারা ছাত্রদের কাজে লাগাতেও অনেক সময় কসুর করেন না। এরপর ছাত্রসমাজের একটা অংশের একটু বেসামাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। দেশের কর্ণধারগণ, শিক্ষক, অধ্যাপক ও অভিভাবকগণ যতদিন ছাত্রসমাজের সামনে বলিষ্ঠ আদর্শ তুলে ধরতে পারবেন না—ততদিন এর প্রতিকারের আশা দুরাশা মাত্র। আইন করে, শাস্তি দিয়ে এবং নীতিবাক্য শুনিয়ে মানুষ গড়া যায় না। একথা যেন তাঁরা ভুলে না যান।

২৪ পরগণা :

ইলিশ ধরতে এসে মৎস্যদপ্তরের ময়ূরপঙখী নৌকোগুলো পাখনা মেলে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা, স্থানীয় লোক তার হদিস রাখে না। ইলিশ মাছ কিন্তু আবার হানা দিয়েছে সুন্দরবনের নদীনালাতে। ধরাও পড়ছে প্রচুর জেলেদের জালে। মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চোরাকারবারীরা কলকাতার অলি-গলিতে সে মাছ বিক্রি করছে বারো থেকে আঠারো টাকা করে। আঠারো টাকা কে-জি ইলিশ মাছের দাম নেবার অভিযোগে সেদিন কলকাতার আদালতে একজন ফলওয়ালা সোপর্দ হয়েছে। শুধু ফলওয়ালা নয়, কলকাতার প্রায় প্রতিটি বাজারে আলু, বেগুন ও অন্যান্য সব্জীর ব্যবসায়ী ক্যানিংয়ের তাজা, টাটকা মাছ বিক্রি করছে। চারটাকা তার সর্বনিম্ন দাম। ট্যাংরা, পারশে, বাগদা চিংড়ি, ছোট পোনা প্রতি কে-জি চারটাকা। ভেটকি ও বড়পোনা পাঁচটাকার কমে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সব মাছ কলকাতায় আসছে গোপন পথে। শুধু অলি-গলিতে ও বাজারের আলু-পটলের দোকানেই বিক্রি হচ্ছে না। বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে সকাল ছ'টার মধ্যে।

মৎস্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এ সব খবর পেয়েছেন। পেয়ে না থাকলে সাধারণ গৃহস্থের সাহায্য নিতে পারেন। মন্ত্রীদের ঘরে সে মাছ যাচ্ছে কিনা এবং তাঁদের আত্মীয়-পরিজনরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কিনা হলপ করে বলতে পারবো না। পয়সার যাদের অভাব নেই তাদের কিনতে দেখে এখন মধ্যবিত্ত ঘরের বাবুরাও মাসের প্রথম দিকে এই কালোবাজারের মাছ কিনছেন। না কিনেই বা করেন কি। দু'টাকায় আধ কিলো মাছ কিনলে কোনরকমে দু'বেলা চলে যায়। দু'টাকায় দু'বেলা চালাবার মত বিকল্প আর কিছুই বাজার থেকে ঘরে তোলা যায় না।

সব দিক ভেবেচিন্তে সাধারণ মানুষ মৎস্যমন্ত্রীর ওপর বিরূপ হয়ে পড়েছে। তিনি একটু ধৈর্য ধরে কান

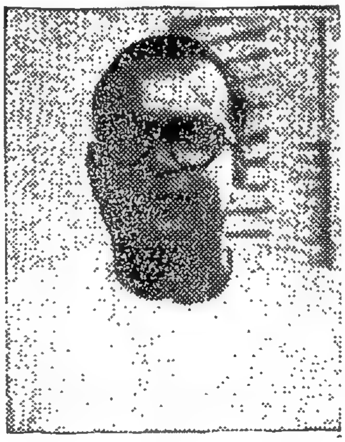

● শ্রীফজলুর রহমান

পাতলেই এ বিক্ষোভের ধ্বনি শুনতে পাবেন।

সবাই বলছে, মাছের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই তাকে আগলে বসে থাকা অর্থহীন। তিনি যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানেই ব্যর্থ হয়েছেন। ক্যানিং বাজারে তিনি জাল ফেলে সতেরো জন ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করেছিলেন। তারপর থেকেই এ অঞ্চলের সাত থেকে প্রায় আট শ' মণ মাছ পাচার হচ্ছে চোরা পথে।

আমরা অনেকবার বলেছি, দু-চারটে গ্রেপ্তার করে লাভ হবে না। ঘুঘুদের ফাঁদে ফেলতে না পারলে সব ফস্কে যাবে। তা' ছাড়া, সরবরাহ বজায় রাখার ব্যবস্থাটাও করা দরকার আগেভাগে। তার জন্য প্রয়োজন বিরাট সংগঠন ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। উৎপাদন বৃদ্ধি রাতারাতি সম্ভব নয়। যে মাছ পশ্চিম বাংলার খালে, বিলে ও নদীনালাতে রয়েছে তা' ধরে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থাটা অন্তত সরকার করতে পারতেন। জেলেদের সমবায় গঠন করেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে জেলের হাতে জাল, নৌকো ও কিছু টাকা দাদন দিলেই এ কাজ করা অসম্ভব হতো না। সেই সঙ্গে মাছের ভেড়িগুলো সহজেই সরকার নিয়ে নিতে পারতেন। এর কোনটাই তিনি আগে করে ঘাঁটি সামলাবার ব্যবস্থা করেন নি। এখন শোনা যাচ্ছে, তাঁর কিছুটা শুভবুদ্ধির উদ্রেক হয়েছে। ভেড়ি দখলের কথাটা ভাবতে সুরু করছেন। সে কাজেও তিনি কতদূর সফল হবেন, ভবিষ্যতের সরকারী কর্মপদ্ধতি না দেখে বোঝা যাচ্ছে না। সোজা কথা, রহমান সাহেব চোরাকারবারীদের রণকৌশলের সঙ্গে পেরে উঠছেন না। জয়-পরাজয় আছেই। পরাজয় স্বীকারে তাঁর এত কুণ্ঠা কেন, আমরা বুঝে উঠতে পারছি নে। তিনি রণে ভঙ্গ দিলে সাধারণ মানুষকে অন্তত অসৎ পথে চলতে হবে না। যাদের পকেট ভারী তারা এখন কিনছে চোরাবাজারে। মৎস্যমন্ত্রী দণ্ড সম্বরণ করলে, কমে না হলে, এ দামেই কিনতে পারবে খোলাবাজারে। তা' ছাড়া পচা-গলা মাছ বাজারে ওঠা বন্ধ হবে। কলকাতার বাজারে নির্দিষ্ট মূল্যে যে-মাছ বিক্রি হচ্ছে তার প্রায় সবটাই তো পচা।

মৎস্যমন্ত্রীর কেরামতীতে পচা মাছ বিক্রি এখন আর দণ্ডনীয় অপরাধ বলেই গণ্য হচ্ছে না।

বর্ধমান :

কাটোয়া থানার সর্বত্রই আমন ধানে ব্যাপকভাবে মেজেরা রোগ লেগেছে। ভাদ্রমাসের শেষের দিকেই রোগ ধরা পড়েছে। পশ্চিম বাংলা সরকারের প্যাকেজ প্রোগ্রামের কল্যাণে জীপ গাড়ি থেকে স্বরু করে লোক-জনের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে না কিছুই। সম্প্রতি বিনামূল্যে গ্যামাক্সিন বিতরণের কথা প্রচার করা হচ্ছে জোর গলায়। পরিমাণ তার প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী গ্যামাক্সিন দেওয়ার কথা প্রতি বিঘায় দু' কিলো। যে গ্রামে তিন হাজার একর জমিতে রোগ লেগেছে সে গ্রামে গ্যামাক্সিন দেওয়া হয়েছে মাত্র পাঁচ কুইন্টাল পঞ্চাশ কিলোগ্রাম।

মাঠের ধান মাঠে মারা যাওয়ার যখন উপক্রম হয়েছে, তখন জেলার কর্তারা প্রতিকারের চেষ্টা না করে বসে বসে হিসেব কষছেন আমন ধানের ফলন কতটা হবে। এ এক তাজ্জব কারবার। ধান মাত্র ডানা মেলতে স্বরু করেছে। এর মধ্যেই হিসেব কষে ঠিক করা হয়ে গেল আমন ধান জেলায় কত হবে। ধানগাছ কিন্তু পোকার আক্রমণে লাল হয়ে উঠছে। সেদিকে কারও নজর নেই। নজর দেওয়ার কথাও হয়তো নয়। এ কাজ করতে হলে যেতে হবে মাঠে। হিসেব দেওয়াটা সহজ। ঘরে বসেই সে কাজ সেরে ফেলা সম্ভব।

* * *

বর্ধমানের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র কলেজ হ'ল শ্যামসুন্দর কলেজ। এ-কলেজ কমিটির সভাপতি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে কার্যনির্বাহক কমিটির প্রধান সেখানে কাজ ভালভাবেই নির্বাহ হওয়ার কথা। ভাল হওয়া তো দূরের কথা, ছেলেদের পড়াবার উপযুক্ত অধ্যাপকই নাকি সেখানে নেই। প্রায় দু'মাস সেখানে ইতিহাসের কোন অধ্যাপক নেই। ইংরেজীর অধ্যাপক তিনজনের জায়গায় একজনে ঠেকেছে। দর্শনের অধ্যাপক দুজনের মধ্যে আছেন একজন। ফলিত ও রসায়ন বিজ্ঞানে আছেন মাত্র একজন। অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন তিনজন; এখন আছেন একজন। এ ছাড়া ছ'জন সিনিয়র অধ্যাপকের পদ খালি পড়ে আছে তিনবছর ধরে।

কলেজে ছাত্রের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। ছাত্রদের পক্ষ থেকে পড়া-শুনার অসুবিধার কথাও বারবার অধ্যক্ষের কাছে নিবেদন করা হয়েছে। কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁদের অনেকেই নাকি এখনও নিয়োগপত্র পান নি।

বিষয়টি সম্পর্কে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অভিযোগগুলো সত্য হলে, তার প্রতিকার অবিলম্বে করা উচিত। দেশের যারা ভাবী নাগরিক তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অত্যন্ত অন্যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের কোন অসুবিধা থাকলে তাও প্রকাশ করা উচিত। তাঁরা চালাতে না পারলে, মুখ্যমন্ত্রীকে মাথায় বসিয়ে শোভাবর্ধনের পরিবর্তে কলেজ পরিচালনার ভার সরকারের হাতেও তুলে দিতে পারেন।

* * *

কালনা শহরের অম্বিকা পাঠাগারের বয়স ৯২ বছর। ১৮৭২ সালে 'ইয়ং বেঙ্গলের' যুগে স্থানীয় যুবক ও শিক্ষাব্রতীদের চেষ্টায় পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতদিনের এই পাঠাগারটি কালনা রবীন্দ্রসদনের কর্মকর্তাদের হাতে পড়ে বন্ধ হয়ে আছে।

উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের মহৎ। ছোটকে তাঁরা চেয়েছিলেন বড় করতে, তার জন্য পাঠাগারের পুরোনো ঘরের ওপরে একটি ঘরও নির্মিত হয়েছে। পাঠাগারের বই ও আসবাব-পত্র সেখানে এখন অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে আছে। আলোর অভাব—বিজলীর সংযোগ এখনো ঘটে নি। পাঠকদের অভিযোগের অন্ত নেই। তাদের জমা টাকা তুলতেও নাকি দেওয়া হচ্ছে না। একবছর হতে চলেছে কর্তারা একেবারে নীরব।

* * *

বর্ধমানে এখন আটার আকাল চলেছে। ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে পরিবার পিছু দু' কে-জি করে আটা দেওয়া হচ্ছিল। গেল সপ্তাহে কেউ ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে আটা পান নি। চাল উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বর্ধমান। কিন্তু বর্ধমানের ঘরে ঘরে আজ চালের জন্য হাহাকার উঠেছে। এবারে আটাও যেতে বসেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আমাদের মুখ পাল্টাতে উপদেশ দিয়েছেন অনেকবার। বলেছেন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের অভ্যাস বদলানো আবশ্যক। গম ও আটার অভাব কোনদিন হবে না, এ আশ্বাস শুনেছি। দেখা যাচ্ছে, কোন কথাই তিনি ঠিক রাখতে পারছেন না। সোজা কথা, ব্যবসায়ীদের সায়েস্তা করার ক্ষমতা সরকারের নেই। তা' না হলে, গম ও আটার চাহিদা বৃদ্ধির পর বাজারে আটার কৃত্রিম ঘাটতি হতে পারতো না।

* * *

কৃষির উন্নতি সাধনে, অধিক শস্য উৎপাদনের ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্যের অন্যতম নজীর অজয় নদের তীরবর্তী বিলমণ্ডা, বক্সীবাদ, বুধুরা প্রভৃতি কয়েকটি মৌজা। এসব মৌজায় ২৫ হাজারের অধিক জমি এখনও অনাবাদী। জলের অভাবে এককালের উর্বর জমি পরিণত হয়েছে ঊষর ভূমিতে। গভীর নলকূপের গালভরা বিবরণ আমরা পেয়ে আসছি প্রতি বছরই। এখানে গভীর নলকূপ থাকলে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতে পারে।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

আঁধারমাণিকে বর্গীরা থাকতে আসে নি। তারা ক্রমাগত উত্তরে যায়। যত উত্তরে যায় গ্রাম তত বর্ধিষ্ণু, রাজধানীর কাছে হলে যা হয়। তাই বর্গীরা থামে না। উত্তরে অজয়নদ, কিন্তু চৈত্রের অজয় বিষদাঁত ভাঙা সাপ, দহে ডোবা হাতী। এ নদ এখন শেয়ালে পার হয়, গ্রামের বউ-ঝিয়াড়ী বিকেলে বালির বুক খুঁড়ে রেখে যায়, বালির বুক চুয়ে বিন্দু বিন্দু জলে গর্ত ভরে ওঠে, ভোরে এসে তারা পানীয় জল সংগ্রহ করে। চৈত্রের অজয় বালির অজগরের মতই পড়ে থাকে, বর্গীরা তা স্বচ্ছন্দে পার হয়ে গেল।

তারপর আর কোথাও কিছু নেই, চৈত্রের নির্মেঘ আকাশ, শুধু শ্মশানতলার মাঠে খড়ের বৃহৎ টালটি দু'তিনদিন ধরে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জলল, রামাইয়ের শালা যতন বাগদী পেটে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় বর্শা নিয়ে দু'দিন পড়ে রইল সেখানে। মড়া নিতে এসে তার বাবা যখন ছেলের কথা ভুলে কেবলই শবযাত্রীদের বলতে লাগল, 'পোয়ালে আগুন ত্যাতক্ষণ জলে? ই দেখে আশ্চজ্জি যেছি গো। পোয়ালে আগুন ত্যাতক্ষণ ধূমায়? ই দেখে মুখে বাক্য হর‍্যেছি গো!' তখন, সে অসংলগ্ন কথা শুনে রামাই অন্যদের বললে, 'ছেলের শোকে কি পাগল হল্যে না কি? পোয়ালে আগুন দেখে নাই?'

শ্মশান থেকে এসেও যতনের বাপ বললে, 'কেন্দ্যে কেনে যতনের মা? আমি কেন্দ্যে নে। শ্মশানতলার মাঠে যেয়্যে দেখলাম পোয়ালে আগুন শুধু ধূমায় আর ধূমায়, ই দেখে আশ্চজ্জি যেছি।'

এখন আর বুঝতে বাকি রইল না উপযুক্ত ছেলের শোকে উদ্ধব বাগদীর মাথায় দোষ হয়েছে। সকল মন্দের মধ্যে ভাল কতটুকু, তা না দেখলে মানুষ বাঁচে না, তাই অন্য ছেলেরা বললে, 'বাবার দয়া, নইলে কারো প্রাণে বাঁচবার কথা নয়, এক দাদার প্রাণটা লিয়্যে গেল। এমন সর্বনাশ আল্যে দেশে।'

যতনের মা'র মন তাতে প্রবোধ মানল না। ঘর ছেড়ে উঠোনে ধানের কুঁড়ো ও কলাইভূষির মধ্যে গড়াগড়ি খেয়ে সে গলা ছেড়ে কাঁদলে, 'এমন সর্বনাশ আল্যে দেশে, যতনকে লিয়ে গেল্যে, তোরা সব কোথায় ছিলি!' সকালে, উদ্ধবের অঙ্গনে শবযাত্রীরা দাহশেষে ভিজে কাপড়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। যতনের মা'র শোকের সান্ত্বনা হয় না, কেন না যতন আর ফিরবে না। রামাইয়ের পিসী বলে, 'কেন্দ্যে মন খোলসা করুক গা! তোরা কথা কইতে যেছিস কেনে? কি হয়ন্যে, কি হত, তা শুনে কি ওর মন মানবে?'

পরে বাতাসে ছাই ওড়ে, পাখী আবার বাসা খোঁজে, ডালে গিয়ে বসে, দ্রুত গ্রামের কোলাহল শান্ত হয়, আনন্দীরাম বাইরে আসেন। দেহ অবসন্ন, মন বিবশ, বাইরে এসে সজনে গাছের ছায়ায় বসেন।

দু'দিন আগে অবধি আনন্দীরাম ছিলেন জীবনে বিপর্যস্ত, ক্লান্ত। সংসারে রুচি নেই, ভারবহনে অপারগ, মা পিসীমা, মামা, এমন কি বৃন্দকেও মনে হয়েছে বোঝা, এই প্রাচীন ও জীর্ণ বাড়ি থেকে মনে মনে কষ্ট পেয়েছেন। কেন না এই সেদিনও তিনি গোবিন্দপুরে ছিলেন। সেখানে কুঠি, বাড়ি, শেঠেদের পল্লী, গন্ধবণিকদের ব্যবসা দিনে দিনে বাড়ে। ফিরিঙ্গী কুঠিয়ালদের সমৃদ্ধির অন্ত নেই।

আনন্দীরামের চোখে সতত অন্য জায়গার সে কর্মব্যস্ততা ভাসে। উঠোনে লঙ্কা-মরিচের স্তূপের চেয়ে, গোলা ভরা ধানের চেয়ে, ইট পাঁজা পুড়বার দৃশ্য তাঁর চোখে মনোহর লাগে। কোনমতে দিনযাপন ও পরনিদ্রায় সময় ক্ষয় করতে ভাল লাগে না। শরীরের সকল রক্ত-মাংস যেন প্রতিবাদ জানায়। কাজ করতে ইচ্ছে যায়। এখানে নয়, অন্যত্র।

তাই বিশালাক্ষী যখন কাশিমবাজার যেতে প্ররোচনা দেন, উৎসাহিত করেন, তখন আনন্দীরামের চোখ মাটির দিকে থাকে, কণ্ঠ থাকে নীরব, কেন না ঐ প্রস্তাবটি তাঁর অন্তরে আশ্চর্য অস্থিরতা আনে। মনে হয় একটি পথ পেলে নিমেষে সব ফেলে চলে যেতে পারেন। এই চলে যাবার, কাজ করবার, বড় হবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর একটি গোপন বেদনার যোগ আছে। 'আমার যোগ্য ঘরদোর, অবস্থা ক'রে তবে আমায় আনতে চেও, অন্যথায় নয়'; এ দর্পিত উক্তি তাঁর অন্তরে সর্বদা নতুন আখরে লেখা থাকে, অলক্ষ্যে আনন্দীরামকে জ্বালা দেয়। জ্বালা থেকে অসন্তোষ এবং নিজের অবস্থায় তৃপ্তি না পেয়ে অবস্থান্তর ঘটাবার ইচ্ছে আনন্দীরামের মনে ক্রমশ দেখা দিয়েছে।

দু'দিন আগেও এ-অবস্থা ছিল। দু'দিন বাদে, গ্রামের অবস্থা শান্ত হ'ল জেনে অবসন্ন আনন্দীরাম সজনে-গাছের নীচে বিশ্রাম নিতে যান। এটি তাঁর প্রিয় স্থান, বাঁশের নীচু মাচা এ-জায়গায় বারোমাস বাঁধা থাকে, আনন্দীরাম বসেন।

এ দু'দিন তিনি মনে মনে বড় কষ্ট ভোগ করেছেন। যে বাড়ি, মানুষ, সংসারে তাঁর রুচি ছিল না, বিপদের সময়ে তাদের বাঁচাবার জন্যেই আকুল হয়েছিলেন। একটি মানুষের এতটুকু আঘাত লাগলে তাঁর সইত না, এ বাড়ির একটি ইট খোয়া গেলে তাঁর বুকে লাগত। বিপদ-অন্তে সে-সব কথা মনে হয়। শরীর মনে শূন্যতা বোধ, নীচে এসে বসেন। আসলে তিনি অতি দুর্বলচিত্ত, এটি সঙ্কট-সময়ে আবিষ্কার করে আনন্দীরাম দুঃখ পেয়েছেন। দরকার হলে সব পেছনে ফেলে যাবার মত মনের জোর না পেলে তিনি উন্নতি করবেন কি ক'রে?

'গোপাল, এস, জল খাও।'

ছোটর ধীর কণ্ঠ শুনে, শান্ত-মূর্তি দেখে আনন্দীরাম অবাক হন। আরক্ত চোখ তুলে চেয়ে থাকেন।

বিপদে সঙ্কটে ছোট চিরদিনের মতই অবিচল, সংসারের স্বাভাবিক নিয়মটি রেখে চলেছেন। কোনদিন আনন্দীরাম ব্যতিক্রম দেখলেন না।

'চল গোপাল। ঘরে এস।'

ছোট তাঁকে ঘরে ডাকছেন। যেন দু'দিন ধরে গ্রামের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায় নি। অজানা দেশের সৈন্যদল দস্যুর মত এসে পড়ে নি। যেন তাদের আসবার এবং যাবার পথে আর্তনাদ, ধোঁয়া, অগ্নিকাণ্ড, হাহাকার ওঠে নি। সব যেন ঠিক আছে। কেন না ছোট বলছেন, 'চল গোপাল, ঘরে এস।'

'ঘরে এস।' এ কথাটি এ দুর্যোগে একমাত্র ভরসা। কি হয়ে গেল, বিপদের মাশুল দিতে হল কত, তা এখনো আনন্দীরাম জানেন না। শুধু জানেন, যা হ'ল তা রাজার নীতি, ধর্মনীতির বাইরে। নিরীহ গ্রামের ওপর এমন করে এসে পড়া, এমন অত্যাচার করা, এ কোন্ নীতিতে বলেছে? তিনি জানেন সংসারের জীবনযাত্রা এখন ভেসে গেছে। কিছুই যেন স্বাভাবিক নেই।

এমন অবস্থায় কেমন করে দেহে শক্তি, মনে জোর পাবেন? অনেক চেষ্টাতেও ভগবানের অষ্টোত্তর শতনাম কাল সম্পূর্ণ মনে আসে নি। মন খুলে ভগবানকে ডাকতে পারেন নি, কেন না

তিনিও এই সংশয়ের যুগের মানুষ। হাতে শালগ্রাম নিয়ে বর্ষার গঙ্গা পেরোতে পারেন, মনে সে বিশ্বাস কই? অথচ তা নাকি নাটোরের রামকৃষ্ণ রায়ের ছিল। শোনা কথা। একই যুগে, একই সময়ে, সংশয়ী ও বিশ্বাসী দুজনকেই বাঁচতে হয়। বিপদে বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাস বাঁচায়, সংশয়ী কি করবে?

নিজের বাহুবল? আনন্দীরাম জেনেছেন এবার, বড় বিপদে একলার বাহুবল কোন ভরসাই নয়। তার জোরে অন্যকে দূরের কথা, নিজেকেও বাঁচানো কঠিন।

তবে তাঁকে কিসে বাঁচাবে? এখন কেন মনে জোর পাচ্ছেন? যেন বালির গর্তে চুয়ে চুয়ে ভরে উঠছে তৃষ্ণা জুড়োবার জল। ছোটর কথাটুকু কি এমনই আশ্চর্য?

আনন্দীরাম চেয়ে থাকেন। হ্যাঁ, 'ঘরে এস' কথা দুটিতে আশ্চর্য শান্তি আছে, মনে জোর পাচ্ছেন। শুধু ঘরে গেলে হবে না। এখন তিনি বাইরে থেকে হাত-মুখ ধুয়ে শুদ্ধ হয়ে ঘরে যাবেন। দেবতাকে ফুলজল দেবেন। তারপর জলযোগ, তারপর সিন্দুক, বাসন-কোসনের বিলি-ব্যবস্থা, সংসারের সব কাজ আবার মাথায় নেওয়া।

সংসার আছে, কাজ আছে, সর্বনাশ ঘটে গেলেও তারপর ঐ পেটের চিন্তা করতে হয়, আনন্দীরাম যেন বুঝলেন সাধারণ মানুষ এই জন্যেই শক্তি পায়, বাঁচে। সর্বনাশটা সত্যি নয়, স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম। এদিকে স্বাভাবিক নিয়মে সংসার চলবে, এটি আছে বলেই মানুষ বাঁচে। ভগবানের সংসারে যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, দাবানল সব ঘটে, কিন্তু তাঁর কাজে ছেদ পড়ে না। এক নিয়মে সূর্য ওঠে, নদীতে জোয়ার হয়, ধানগাছের গোড়ায় রসসঞ্চার হয়, কিছুই থেমে থাকে না।

আনন্দীরামের মনে হল ছোট তাঁকে সেই দিকের পথটি দেখিয়ে দিচ্ছেন। প্রণাম করতে সাধ গেল, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেন আনন্দীরাম। বিমাতার সঙ্গে তাঁর প্রণামের সম্পর্ক, কিন্তু বয়সে তাঁরা এমন কাছাকাছি, সেই যে দু'পায়ের ঘা ছোট ধুয়ে ধুয়ে মলম লাগিয়ে দিতেন, তখন হিসেব করে ছোটর শত শত প্রণাম পাওনা হয়েছিল, কিন্তু কেন যেন সেই থেকেই প্রণাম করাটাও কমে এল।

আনন্দীরাম নিশ্বাস ফেলে উঠলেন। বললেন, 'পরে জল খাব। আচ্ছা, এক ঘটি জল আর এক ডেলা গুড় দাও, আর লাঠিখানা দাও, খোঁজ নিয়ে আসি গ্রামে কোথায় কি হল।

যাও, তবে মুনিষদের সঙ্গে নিও।'

'নেব। চল, ভেতরে যাই।'

আনন্দীরাম ভেতরে এসে জল খেয়ে ঘটি নামিয়েছেন, এমন সময়ে তাঁর মামা উত্তেজিত হয়ে এলেন। বললেন, 'এক বেটাকে ধরেছি।'

আনন্দীরামের দরজার কাছে অবসন্ন, রক্তাক্ত দেহে সে নেড়ামাথা বৈরাগী বসেছিল। মাথাটি সামনে নোয়ানো, ঘাড়ে, কাঁধে, হাতে বিভিন্ন আঘাতের চিহ্ন। এ বৈরাগীকে দয়ারামের ঘরে সুরকণ্ঠ দেখেছিলেন, তখন সে উঁচু গলায় সৈন্যদের কথা গেরস্তদের শোনাচ্ছিল।

এখন তার গলার স্বর ক্ষীণ। কাছ থেকে দেখা যায় সে বয়সে প্রৌঢ়, পুঁথিবাঁধা পাটার মত সিড়িঙ্গে শরীর, এখন পাঁজরার নীচে হৃৎপিণ্ড ঘনঘন লাফায়। আনন্দীরামের মামা ঘরের দোরে একজন অচেনা আহত মানুষকে পেয়ে আস্ফালন করতে চেষ্টা পেলেন, 'কে রে বেটা, নেড়া মাথা, কথা ক'স না যে? এখানে বসে আছিস যে বড়?' ইত্যাদি।

আনন্দীরামকে বললেন, 'তুমি সাবধানে ওর সঙ্গে কথা কও বাপু, নয়ত ওকে তাড়াও। চোরের আগে খুঁজিয়াল যায়, তারপর আসে টাকা-পয়সার। কেমন করে জানছ এ-বেটা ওদের লোক নয়?'

লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'জল!' কিছু আগে অবধি সে আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়েছে 'দয়াময়, দোর খোল! কে আছ, আমায় বাঁচাও।' এখন তার গলায় আর জোর নেই। মানুষ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বেশি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এখন সে চোখ মেলে আনন্দীরামের মুখ আতিপাতি দেখে, যেন বুঝতে চেষ্টা করে এ কোথায় এল, এরা তাকে রাখবে না মারবে।

মামা উসখুস করছিলেন। বলেন 'দাও বেটাকে দূর করে, দেখছ না চোখের চাউনি কি রকম?'

'দয়াময়!' লোকটির দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়। সে চোখ বোজে। তার প্রৌঢ় আর্ত, ভয়ার্ত মুখের ওপর যেন চাঁদ অস্ত গেল।

'মামা, সরুন, ওকে ভেতরে নিই।'

'কি যে কর, ওকে তুমি ভেতরে নেবে?' মামা হঠাৎ ভেতর থেকে জোর পান, চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কোথাকার কে, জাতের ঠিক নেই?'

'তা ব'লে ঘরের দোরে একটা লোক মরবে, আর আমি তাই দেখব?'

মামা ভাগ্নের দিকে চান। এর আশ্রয়ে আছেন, এ বিনে তাঁর গতি নেই, সব কথাই সত্যি, কিন্তু তা ব'লে কেমন করে সব অনাচার সহ্য করেন?

'ধরুন, আপনি মাথার দিকে ধরুন।'

'বলি হ্যাঁ হে বাপু, তুমি কি পাগল হয়েছ? তোমার ত আস্পদ্দা কম নয়। ওর গায়ে তুমি আমার হাত দিতে বল কোন আক্কেলে?' মামা রীতিমত চটে ওঠেন, তাঁর গলা দূর হতে শোনা যায়, 'এখানে পড়ে আছি শুধু দিদির মুখ চেয়ে। নইলে তোমার অন্ন আমি খাই? তুমি আমায় সম্মান কর না, যা মনে হয়, তাই-ই বল, কেন?'

'কি অন্যায় কথা বললাম ?' আনন্দীরাম চটেছেন।

'এই বেটাকে ধরতে বলছ, আবার কি!'

'বেশ ধরবেন না।' আনন্দীরাম একজন মুনিষকে ডেকে লোকটিকে ভেতরে নিয়ে যান। দাওয়ায় শুইয়ে তার চোখে মুখে জলঝাপটা দেয়া হল, আনন্দীরাম ঘন ঘন বাতাস করেন। এ বৈরাগীর দেহে স্থানে স্থানে এখনো রক্তচিহ্ন, জলসেক করেন। আঘাত দেখে মনে কত কি ভাবেন, বৃদ্ধ মুনিষ আশ্বস্ত করে, 'পথে গায়ে ছড় গেছে, কাঁটা ঝোপের পথে হেঁচড়ে এসেছে।'

'কিন্তু কাঁধের দাগ দেখ, চামড়া উঠে এসেছে।'

'এ দাগ সদ্য নয়, দেখ না রক্ত শুক্যে, যেছে। তুমি তেলপড়া দাও।'

'কোথায় পাব?'

'কবরেজের তেল ছোট মা'র কাছে আছে, আনলে আমি পড়া করে দিই।'

সে আনন্দীরামের দিকে চায় ও নাকের পাটা একটু ফোলায়। কাটা ছেঁচা-পোড়া ঘা তেলের গুণে সারে, না পড়ার গুণে, এ নিয়ে এক সময় বালক আনন্দীরাম এ মুনিষের সঙ্গে তকরার করতেন। যে জন্যেই সারুক, তাঁর ব্যথা আরোগ্য হলেই এ অন্দরে যেত, 'এ তেলপড়া কত কষ্ট করো, শিখা গো।' ব'লে জাঁক করত, মা ও ছোটর কাছ হতে বড় বড় সিধা নিয়ে বাড়ি যেত।

তাঁর শৈশবে মাছ ধরবার প্রথম ছিপ এর দেওয়া। তিনি যখন শিশু তখন এ প্রৌঢ় ছিল, কোলের আছে বসলে বুকের ঘন লোমের মধ্যে দু'একগাছি পাকা চুল দেখা যেত। তখন এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল প্রতিদিনের।

আঁধারমাণিক গ্রামে বহু পুষ্করিণী, দীঘি, দহ। যে যার বাড়ির সন্নিধানের পুকুরে জল সরে, তবু গ্রামে মাঝে মাঝে ইতস্তত ঘাটলা বাঁধা উৎসর্গ করা জলাশয়ের অন্ত নেই। যত জলাশয়, তত তার প্রতিটির রকম রকম কাহিনী। এ গ্রামে গাছ, মানুষ নুড়ি, পাথর, এমন কি গোধূলিতে গ্রামের আকাশে সাঁতারকাটা লক্ষ্মী পেচারও গল্প আছে। কিংবদন্তী এ-দেশে অজস্র জন্মায়, স্নেহে যত্নে লালিত হয়, চিরদিনের মত বেঁচে থাকে এ-গ্রামের মানুষ সন্তানস্নেহে কিংবদন্তীকে জীইয়ে রাখে।

ছোট ও বড় জলাশয়ের সঙ্গেও কত কিংবদন্তী, গল্প কথা, কোনটি ভয়ের, কোনটি দুঃখের, 'হালদারদের পূর্বপুরুষ নিজের আট বছরের মেয়েকে গলায় পাথর বেঁধে ডুবয়্যে মারলে, তা বোন, হালদারপুকুরে জলের কমতি নেই, কিন্তু এখনো জলের নীচে সে কন্যা কাঁদে' প্রাচীনারা বলেন।

আবার কত কথা পুণ্যের, ভক্তির, 'এর তলে স্বয়ং শিবের বাস, আমাদের দুধেশ্বর শিবলিঙ্গ জলে ডুবয়্যে রেখে কর্তাঠাকুমা দেহ রাখলেন বউ, ইচ্ছে-মরণ হয়েছিল, এ-জল মাথায় দাও, ইনি আমাদের গ্রামখানি বেঁচয়্যে রাখেন।'

এমন এক উপকথার পুকুরে আষাঢ়ের দুপুরে, আনন্দীরামকে নিয়ে এ-মুনিষ গিয়েছিল। প্রথম ছিপ ফেলা এবং প্রথম মাছ আনা, রহস্যময় উত্তেজনার সে আশ্চর্য অনুভতি আজ স্মৃতিমাত্র, কিন্তু আনন্দীরাম মুনিষের চোখে সে সকল স্মৃতির ছায়ামাত্র দেখতে পান।

'কই তেল চেয়্যে আন, আন আমি প'ড়ে দিই।'

মুনিষের কথায় আনন্দীরামের সম্বিৎ আসে।

(ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গোহাটী

'লতিকা দত্তের এপেসোড শেষ হয়ে গেল'---ডাঃ বসাক করুণভাবে হাসলেন।---'আসল গল্পটার সঙ্গে ওর কোনই যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু ঘটনাস্রোত নদীর মত বয়ে যেতে যেতে দু'ধারের মাটিকে ছুঁয়ে যাবেই।'

'দেখুন মশাই'---বিচিত্র মুখভঙ্গি করলেন রামদুলাল দত্ত---'ডিটেকটিভগিরি করে, সে তবু সহ্য হয়। কিন্তু সমস্ত রাত চরকির মত ঘুরে আপনার ঐ কাব্যি শোনা পোষাবে না। এক-একবার ভাবছি আপনাকেই ধরে চালান করে দিই।'

রসিকতাটুকু উপভোগ করার সময় বা সুযোগ হোল না আগন্তুকের আবির্ভাবে। সত্যজিৎ সামন্ত বিনা নোটিশে ঘরে ঢুকে বললেন---'আমাকে নাকি কাল সন্ধ্যার দিকে খোঁজ করেছিলেন ডাঃ বসাক। ব্যাপার কি বলুন তো।'

'ব্যাপার আর কি?'---রামদুলাল দত্ত পেপার ওয়েট দিয়ে টেবিলে বার কতক বেশ জোরে জোরে ঠুকলেন ---'আগে বিশ্বাস করতাম না, এখন দেখছি ডিটেকটিভ থাকলেই কেস বাঁকা দিকে মোড় নেয়, চটপট করে খুন হতে থাকে, আর যে খুনী, সে ব্যাটা দিব্যি সাধু সেজে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশের বাপেরও সাধ্যি নেই যে তার টিকি ছোঁয়। এবার থেকে ডিটেকটিভদের এড়িয়ে চলব ঠিক করেছি।'

ডাঃ বসাক কিন্তু কোন মন্তব্য প্রকাশ না করে কড়িকাঠের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন---'আচ্ছা মিঃ সামন্ত, উইলটা এবারে তাড়াতাড়ি করে ফেলাই সঙ্গত, কি বলেন?'

'কোন্ উইল?'---আকস্মিক প্রশ্নে কেমন থতমত খেলেন ভদ্রলোক। তারপরেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন---'ও, আপনি সমরেশের উইলের কথা বলছেন। বেশত, বেশত---সমরেশ আর একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে।

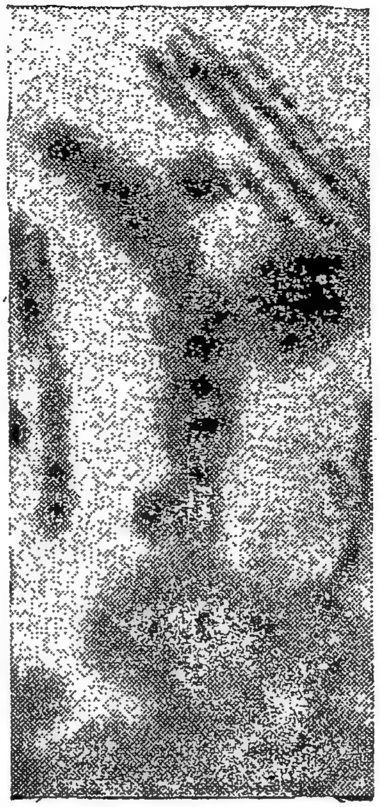

রূপালী বিলীন

বিশু দত্ত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এখন তো আর প্রবলেম কিছু রইল না। ওয়েস্ট জার্মানীতে ওর যে বোনপো থাকে, সেই তো একমাত্র ওয়ারিশ। একটি লাইনেই উইল কমপ্লিট।'

'সমরেশবাবু কিন্তু উইল করে ফেলার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, আমাকে সেদিন বললেন---এবারে ওর পালা।'

'পাগলের প্রলাপে কান দিচ্ছেন কেন'---সত্যজিৎ সামন্ত ঘড়ির দিকে চোখ রেখে কপালের ঘাম মুছলেন---'এই নার্সটির সম্পর্কে কি মনে হয় আপনাদের।'

'ও কিছু না।'---তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন ডাঃ বসাক---'তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। হৃদয়ঘটিত ব্যাপার আর কি। কে এক ডাক্তারের সঙ্গে বুঝি ভাব হয়েছিল---তারপর যা হয়।'

রামদুলাল দত্তের মুখ ক্রমশ হাঁ হয়ে যাচ্ছে দেখেও দেখলেন না ডাক্তার বসাক।---'সমরেশ কিন্তু খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে খবরটা পেয়ে। ওর ইচ্ছে আপনি এস্টেট থেকে পাঁচ হাজার টাকা ওর মায়ের নামে এখনি লিখে দিন। এছাড়া যতদিন ছেলে উপার্জন না করতে পারছে, ততদিন মাসে একশ' টাকা মাসোহারা দেওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। আপনি ওর অ্যাটর্নি হিসেবে ভদ্রমহিলাকে যদি একটা চিঠি লিখে দেন, তাহলে বেচারী সত্যিই একটু আশা পায়।'

'বেশত---বেশত।'---উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন সত্যজিৎ সামন্ত---'টাকাকড়ির ব্যাপারে চিরকালই সমরেশের মন খুব উদার। তবে মুখেই জানিয়ে দিন না, চিঠি লেখালেখির কি দরকার।'

ডাঃ বসাক চিঠি লেখার স্বপক্ষে কিছুটা জোর দিয়েই বললেন, কারণ মুখের কথা হয়তো পুরোপুরি বিশ্বাস হবে না। যতই হোক, আর্থিক দুরবস্থা থেকে সমূহ রেহাই পেলে শোকের নিদারুণ যাতনাও মানুষ সহ্য করতে পারে।

'না, না ইংরিজিতে লিখলে হবে না মিঃ সামন্ত। ভদ্রমহিলা যাতে নিজে পড়তে পারেন---তাই কষ্ট করে বাংলায়ই লিখুন। এক-আধটুকু বানান ভুল হলে কোন ক্ষতি হবে না।'

বাংলায় লেখার প্রস্তাবে সরব আপত্তি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎ সামন্ত চিঠিটা লিখে ফেললেন। ভাষা অবশ্য ডাঃ বসাকের। আশ্চর্য, এই লোকটি জীবনের অর্ধেকের বেশি অংশ দেশের বাইরে কাটিয়েও মনেপ্রাণে এই দেশের মানুষই রয়ে গেছেন। ভাষাটা পর্যন্ত ভোলেন নি।

'ভুলে গিয়েছিলাম---' চিঠিটা ভাঁজ

ফুরে পকেটে পুরে অনলজ্জ হাসি ফুটিয়ে তুললেন—'কিন্তু দেশে ফিরে এসে আবার গোড়া থেকে শিখেছি, বিশেষ করে আমার রুগীদের জন্যে। বিদেশী ভাষা দিয়ে মনের কথা বোঝানো অসম্ভব।'

চিঠি লেখানোর পরে উইলের তাগাদা। সমরেশের নিজের হাতে লেখা ও স্বাক্ষর করা একটি কাগজ দেখিয়ে ডাঃ বসাক বললেন—'আমি, রামদুলালবাবু আর আপনি এখানে সই করে দিলেই তো উইটনেসের কাজ হয়ে যায়।'

'সে হয় না'—সত্যজিৎ সামন্ত মাথা নাড়লেন—'লিগাল পয়েণ্টস সব খুঁটিয়ে দেখতে হবে। তা ছাড়া মাধবীর সম্পত্তি নিয়েও গোলমাল হতে পারে। আপনারা এখনও বসন্ত মল্লিকের থেকে সেই টাকাগুলো উদ্ধার করতে পারেন নি—মানে সময় পান নি। যে গয়নাগুলো মাধবী তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছিল, অন্য দাবীদার নিজেদের পাওনা হিসেবে সেগুলো দাবী করতে পারে। আমার মনে হয় সমরেশ ভালো হয়ে উঠুক, তারপরে সবাই মিলে বসে—'

'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না মিঃ সামন্ত'—বরুণেন্দ্র বসাক অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন—'সমরেশের মানসিক অসুস্থতা বেড়েই চলেছে।' যে কোনদিন আত্মহত্যা করে বসা ওর পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়। ঘরে যাতে ছুরি, ব্লেড বা ধারালো কোন কিছু না থাকে, সেদিকে নজর রাখার কথা। তবু বলা কি যায়।'

'আপনারা কি কাউকে সন্দেহ করেছেন?'—সত্যজিৎ সামন্ত কিছুক্ষণ ইতস্তত করে প্রশ্ন করলেন—'মানসিক অসুস্থতা মানে হোল মেণ্টাল আনব্যালেন্স। এ অবস্থায় পড়লে মানুষ এমন সব কাজ করতে পারে, যা স্বাভাবিক মানুষের কল্পনারও বাইরে। আমি এ বিষয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা করেছি। ডাঃ বসাককে অবশ্য বলার কোন অর্থ হয় না, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে লণ্ডনে একজন আইরিশ নোবলম্যান যেভাবে তার স্ত্রীকে এবং বন্ধুকে এক সঙ্গে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছিল তা একটু খুঁটিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়—ঈর্ষা মানুষকে সম্পূর্ণ বিবেচনাহীন করে ফেলে।'

'অর্থাৎ আপনি কি বলতে চাইছেন?' রামদুলাল দত্ত অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে তাকালেন।

সত্যজিৎ সামন্ত সোজাসুজি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গল্পটা বলতে সুরু করলেন। আইরিশ ভদ্রলোকটি বেশি বয়সে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী মেয়ের প্রেমে পড়ে। মেয়েটির নাম বেসি জেমস। অভিজাত বংশের নাম ও ধনসম্পত্তির লোভে বেসি বিয়েতে সম্মত হয়, কিন্তু সতীলক্ষ্মী হয়ে ঘর করা তার কুষ্ঠিতে লেখে নি। আয়ারল্যাণ্ডের গ্রামের সেই প্রকাণ্ড দুর্গের মত বাড়িতে আর কোন সঙ্গী ছিল না, এক স্বামীর বিশ্বস্ত বন্ধুটি ছাড়া। ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে সেই বন্ধুর সঙ্গেই প্রেমের অভিনয় সুরু করাতে ভদ্রলোক মেণ্টাল ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে কি যেন একটা বিষাক্ত 'বেরি' বা ফলের রস প্রথমে স্ত্রীর ও পরে বন্ধুর সুরার পাত্রে মিশিয়ে দেয়। স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রচার করা সত্ত্বেও কিন্তু লোকের মুখ চাপা দেওয়া যায় নি। পরে পুলিশের নির্দেশে কবর খুঁড়ে পোস্টমর্টেম হলে সব কিছু জানা যায়। তারপরে অবশ্য অনুতপ্ত ভদ্রলোক নিজেও সেই একই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন, পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগেই।

'এই গল্পটির সঙ্গে সমরেশের জীবনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আপনারা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়।'—সত্যজিৎ সামন্ত অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

ডাঃ বসাক সম্মতিসূচক ইঙ্গিত দিতেই তিনি উৎসাহিত হয় বললেন—'ওকে খুব সাবধানে আপনাদের রাখা দরকার। বলা যায় না, কোন সূত্র থেকে সেই একই বিষ যোগাড় করে একটা কাণ্ড না বাধিয়ে বসে।'

সত্যজিৎ সামন্ত চলে যাওয়ার পর রামদুলাল দত্ত ক্লান্ত স্বরে বললেন—'কি যে বাজে বকে সময় নষ্ট করেন। এইভাবেই কি সব সমস্যা মিটে যাবে ভাবছেন।'

ডাঃ বসাকের মুখের ভাবে সাধারণত কোন রকম আবেগ-উচ্ছ্বাসের চিহ্ন ফুটে ওঠে না। নির্বিকার মানুষটি হঠাৎ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে রামদুলাল দত্তের পিঠ চাপড়ে বললেন—'সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।'

'রাখুন মশাই আপনার ডিটেকটিভ-সুলভ হেঁয়ালী'—রামদুলাল বিরক্ত হয়ে উঠলেন—'এক কথায় জবাব দিতে পারবেন—খুনী কে?'

'আপনি যাকে সং বলে ভাবছেন, আপনার সেই বন্ধুটি।'

এক সঙ্গে উপহাস ও অবিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠল রামদুলাল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গিমায়।

(ক্রমশঃ)

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

গ্রন্থ মেলা

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ : প্রথম খণ্ড ।। হরপ্রসাদ মিত্র ।। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২নং কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য : নয় টাকা ।।

বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ শাখাটি যে সকল শ্রদ্ধেয় সমালোচক ও প্রবন্ধকারের লেখনীতে উন্নত ও বিশেষ সমৃদ্ধি ও পুষ্টিলাভ করেছে; শ্রদ্ধেয় প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ মিত্র তাঁদের অন্যতম। বহু কঠিন বিষয়কেও তিনি তাঁর অনায়াসলব্ধ লেখনীর সরলতায় এত সহজ ও সুন্দর করে তোলেন, যা শুধু গবেষক-অধ্যাপকের বিষয় হয়েই দূরে সরে যায় না, উপরন্তু তা সাধারণ পাঠক-চিত্তকেও পাঠে গভীর মনোযোগী করে তোলে। আর প্রাবন্ধিক-সমালোচক ও কবি হরপ্রসাদ মিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও এইখানেই।

রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টি-প্রতিভাকে পাঠক সমক্ষে সার্থকভাবে তুলে ধরার পক্ষে গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই 'আদিকথা' নামে যে অধ্যায়টি সংযোজিত হয়েছে তাতে কবি জীবনের সূচনাপর্বের কাহিনী-রচনা, কবি জীবনের বিচিত্র স্রোতধারার পরিচয় সমুদ্ভাসিত হয়েছে। কবি জীবনের সমগ্রতা উপলব্ধি করার পক্ষে তাঁর রুচি—মন ও মনন, ধ্যান ধারণার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে এসেছে 'রবীন্দ্র সমালোচনার আদর্শ' এমন কি, 'সাহিত্য ইন্দ্রিয়' পর্যন্ত—বাংলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্যে যা বিরল।

রবীন্দ্রনাথের পদ্যে লেখা উপন্যাস 'বনফুল' প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালে। ইতোপূর্বে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে ছাপা হয় 'কবি কাহিনী'। 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনীর' মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কল্লোলিত প্রতিভার স্রোতধারা যেভাবে পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে, তাকে নিপুণভাবে যুক্তি ও উদ্ধৃতির মাধ্যমে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। তাই সাহিত্য উপলব্ধি করার পক্ষে সমালোচনার ধারা বিশেষ প্রয়োজন। তাই এইদিকে দৃষ্টি রেখেই অ্যানাতোল ফ্রান্সিস বলেছেন :

'Literature helps us to understand life, and Giticism helps us to understand literature,' যারই পূর্ণায়ত অভিনিবেশ রয়েছে 'রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ' শীর্ষক বৃহত্তম ও মহত্তম গ্রন্থে।

রবীন্দ্র জীবনের কয়েকটি ব্যক্তিগত দিক' 'রবীন্দ্রায়ণ', 'আকাশ ও রঙমহাল', 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র-সমাজ-ধর্মচিন্তা', 'শৃঙ্গার ও রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি বিষয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেমন নতুন বোধির উৎপত্তি করে, তেমনি উক্ত বিষয়গুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা সমালোচনা সাহিত্য কতো উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে।

'শেষ পর্বের কবিতা—প্রৌঢ় ঋতুর যৌবন' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুচেতনা এবং শেষ পর্বের রচনাতেও যে তাঁরই মধ্যে ছুঁই ছুঁই বসন্তের কথা প্রকাশিত হচ্ছিল সে-সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে আলোচ্য অংশটিতে। রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক সৃষ্টি প্রতিভা উপলব্ধি করার পক্ষে অনুরূপ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ছিলো।

জয়শ্রী সেন

বার্ষিক শিশুসাথী (১৩৭১)— সম্পাদিকা : শ্রীমতী দাশগুপ্ত। প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড। স্বত্বাধিকারী : আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২+৩২০+১০। মূল্য : ৪ টাকা ৫০ পঃ

পূজোর সময় সব কিছু চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বড় কিছু পাওয়ার সৌভাগ্য যার থাকে সে পায় 'বার্ষিক শিশুসাথী'। এবারে পূজোর বেশ কিছু আগেই 'বার্ষিক শিশুসাথী' বের হয়ে আমাদের অবাক করে দিয়েছে। পূজোর আগে স্কুলের পরীক্ষার পর মনটা যখন বাঁধন-ছেঁড়া হয়ে নীল আকাশের ঠিকানা খোঁজে, পৃথিবীর বিস্ময় খুঁজতে সে বের হতে চায়, রূপকথা শোনার জন্য মন উসখুস করে, দেশ-বিদেশের ভ্রমণ কথায় কানটা খাড়া হয়ে ওঠে, কিম্বা মিষ্টি কবিতা, সুন্দর ছড়া, ভূত-প্রেত আর ডিটেকটিভের গল্প ও দানব-পাখির আজব কাহিনীর জন্য ইচ্ছেটা ওৎ পেতে থাকে তখন সব সাধ মেটাতে পারে একমাত্র 'বার্ষিক শিশুসাথী।' পূজোর সময় যারা নাটক-নাটিকা মঞ্চস্থ করতে চায়—তারাও পাবে এতে ভালো নাটিকা। এমন কি পূজোর উৎসবে দেখানোর জন্য নতুন রকম ম্যাজিক জানতে হলে, তা একমাত্র বার্ষিক শিশুসাথী থেকেই শেখা যাবে। এ ছাড়া রয়েছে নামকরা শিল্পীদের চোখ-জুড়ানো নানান রঙের ছবি, লোক চমকানো কার্টুন, ছেলে-ভুলানো রেখার কায়দা, বড়দের আশ্চর্য করে দেবার মতো শিকারের ছবি আর অসংখ্য আলোকচিত্র। ছোট-বড় লেখার সংখ্যাই ৭২। শুধু একটা পূজোর ছুটিতে সম্ভব নয়, পরের ছুটিতে পড়ে শেষ করার জন্য একমাত্র সঞ্চয় করার মতো পত্রিকা হচ্ছে 'বার্ষিক শিশুসাথী'। এতে যাঁরা লিখেছেন, যাঁরা এঁকেছেন সবাই বাংলা দেশের সেরা লেখক ও প্রিয় লেখক। কুমুদরঞ্জন, কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, জসীম উদ্দীন, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, পি সি সরকার, মনতোষ রায়, রেবতীভূষণ, মন্মথ রায়, বাণী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশা দেবী, বন্দে আলী মিয়া, মনোরম গুহঠাকুরতা, সুনন্দা দাশগুপ্ত প্রভৃতির লেখা যারা পড়বে তারা তা কখনোই ভুলবে না। পুলক বিশ্বাসের প্রচ্ছদচিত্র চমৎকার।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে প্রকাশিত গ্রন্থমেলার দ্বিতীয় স্তম্ভের একুশ পঙক্তিতে 'অপ্রাসঙ্গিক হয়েছেন' স্থলে 'অপ্রাসঙ্গিক হন নি' পড়তে হবে।

রঙ্গজগৎ

● সুচিত্রা সেন
'সন্ধ্যাদীপের শিখা'র নায়িকা।

সংযুক্ত আরবে চলচ্চিত্র-শিল্পের জাতীয়করণ

সংযুক্ত আরব প্রজাতান্ত্রিক সরকার সম্প্রতি স্টুডিও নাহাস এবং দু-টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন চিত্র-পরিবেশক সংস্থাকে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন করেছে। এইটিই ছিল সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শেষ স্টুডিও। কিছুকাল পূর্ব থেকে সংযুক্ত আরব সরকার চলচ্চিত্র-শিল্পকে জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। স্টুডিও নাহাসকে রাষ্ট্রের পরিচালনায় নিয়ে আসায় ব্যক্তিগত মালিকানায় আর কোন স্টুডিও আরবে থাকলো না।

সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে বছরে ৫০টির মত পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরি হয়। জাতীয়করণের পরে উৎপাদনসংখ্যা একই রকম রয়েছে। জাতীয়করণের পরে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র বিদেশী চিত্র-প্রযোজকদের আহ্বান জানিয়েছে আরবে এসে যুক্তভাবে চিত্র নির্মাণের জন্য। যুক্তভাবে ছবি তৈরির ব্যাপারে রাষ্ট্র সর্বতোভাবে সহায়তায় প্রস্তুত। এযাবৎ কাল আরবে আমাদের দেশের মত বিদেশে তৈরি ছবি দেখান হতো এবং বিদেশীরা ছবি দেখিয়ে প্রচুর মুনাফা তুলে নিত। সে সব ছবির সব ক'টি যে আরবের পক্ষে উপযোগী ছিল এমন নয়। ১৯৬৪ সালে সংযুক্ত আরবে ২৬৪টি বিদেশী ছবি দেখান হয়েছে, তার মধ্যে ১৮২টি আমেরিকান, ৩৬টি রাশিয়ান, ৩১টি ইতালীয় এবং ৮টি বৃটিশ। জাতীয়করণের পরে সংযুক্ত আরব সরকার বিদেশী ছবি আমদানীর অপেক্ষা যুক্তভাবে ছবি তৈরির নীতি গ্রহণ করেছেন। তাতে চলচ্চিত্র-শিল্প থেকে সরকারের এবং দেশীয় শিল্পীদের ভাল আয় হবে। সরকারী সংস্থা ইজিপ্সিয়ান জেনারেল কোম্পানী ফর ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম প্রোডাকসন্স ইতিমধ্যে ইতালী, জার্মান, পোল্যাণ্ড, আমেরিকা, বৃটিশ প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রযোজকের সাথে ২৪টি কাহিনীচিত্র যুক্তভাবে নির্মাণের চুক্তি সম্পন্ন করেছে। সংযুক্ত আরবে এসে বিদেশীদের চিত্র নির্মাণে উৎসাহিত করার জন্য সরকার এক 'সিনেমা নগর' স্থাপন করছে কায়রোর নিকটবর্তী পিরামিডের নিকটে। এই নগরে স্টুডিও, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, উদ্যান, হোটেল রেস্তোরাঁ, শিল্পী ও কারিগরদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা ইত্যাদি থাকবে। এই ব্যবস্থায় মধ্যপ্রাচ্যে এক নতুন হলিউড গড়ে উঠবে; এবং এই হলিউড থেকে সংযুক্ত আরব সরকারের মোটা রকমের আয় হবে। আর চলচ্চিত্র-শিল্প মুনাফালোলুপ ব্যবসায়ী ও কালো টাকার কারবারীদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে।

প্রসঙ্গত মনে প্রশ্ন জাগে, সংযুক্ত আরব সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন আমাদের সরকার তা পারেন না কেন? —স্বজন।

চিত্র আলোচনা

দুই পর্ব

(মুভি ফাইনান্সিয়ার্স এণ্টারপ্রাইজ
—বিনু বর্ধন)

আর ডি বনশাল প্রযোজিত 'দুই পর্ব' একটি সামাজিক কাহিনীচিত্র। কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়; পরিচালনা করেছেন বিনু বর্ধন।

কাহিনীর নায়ক বিজয়কে তার মা মানুষ করার জন্য কলকাতা নিয়ে এসেছিল। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বসন্ত গ্রামেই ছিল। বিজয় শহরে এসে টাকা-পয়সার দিক থেকে অর্থাৎ আর্থিক মর্যাদায় মানুষ হয়েছিল, কিন্তু শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের দিক থেকে মানুষ হতে পারে নি। জাল ওষুধের কারবার, মদ ও নারীর আসক্তিতে সে অধঃপাতে

যায়। একদিন হঠাৎ খেয়ালবশে বন্ধু বসন্তকে গ্রামের বাড়ি থেকে সে নিজের কাছে নিয়ে আসে এবং তাকেই নিজের গাড়ি চালাবার দায়িত্ব দেয়। কিন্তু বসন্ত ছিল ধর্মগতপ্রাণ এবং সৎবুদ্ধিসম্পন্ন। বিজয়ের চরিত্রের কথা জানতে পেরে তার পক্ষে বেশিদিন সেখানে থাকা সম্ভব হয় না। সে চলে যাবার পরে বিজয় সর্বস্ব হারিয়ে খুনের দায়ে জেলে যায়। এই হচ্ছে প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল, ঠোঙার কাগজে এই দুঃসংবাদ পড়ে বসন্ত ছুটে এসে বিজয়ের পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে বিজয়ের এতদিনের স্বপ্ন সার্থক করে; পুত্রকে ডাক্তার করে তোলে। বিজয়ও জেল থেকে মুক্ত হয়ে ডাক্তারখানার কাছে এক বাড়িতে আশ্রয় পায় এবং পরে পুত্রের ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার হিসাবে চাকরী নেয়। যে বাড়িতে বিজয় আশ্রয় পেয়েছিল সেই বাড়ির পালিতা কন্যার সাথে পুত্রের প্রেম এবং বিবাহের পরে বসন্তর মধ্যস্থতায় পিতাপুত্রের মিলন ঘটে।

এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, এবং পাপের শাস্তি পেতেই হবে ইত্যাদি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার মানষ হওয়ার দৃষ্টান্ত ও বন্ধুপ্রীতির যে নিদর্শন দেখান হয়েছে—তাতে ছবিটির নাম বিজয়-বসন্ত রাখাও চলতো। চিত্রনাট্যকার দর্শক মনোরঞ্জনের দিকে এতটা লক্ষ্য রেখেছেন যে চরিত্রগুলি প্রায় অবাস্তব হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম চরিত্রের ভিড় দ্বিতীয় পর্বেই ঘটেছে বেশি। এই পর্বে পাশাবাবু বা চারু চ্যাটার্জীর মত চরিত্র দেখা গেছে, যে কুলশীল না জেনেই পথের পাগলাটে একটা লোককে বেয়াই সম্বোধন করে, কন্যাকে দেখাতে নিয়ে আসে। মায়াকে দেখেই জয়ের প্রেমে পড়ে যাওয়া, তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দু-জনার অর্থহীন এক গান গাওয়া ইত্যাদি ঘটনায় চরিত্রগুলি ফরমায়েসী হয়ে উঠেছে। তুলনামূলকভাবে প্রথম অংশ ছিল স্বাভাবিক। বসন্তর মত লোক বিজয়কে কেন পরিচয় গোপন রাখতে বলবে তাও দুর্বোধ্য। এই দুর্বোধ্য অংশ বাদ দিলে ছবিটির অপ্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য কিছুটা কমতো।

অভিনয়াংশে বিজয়ের ভূমিকাকে কালী ব্যানার্জী যথার্থভাবে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য দ্বিতীয়াংশে তাঁকে দিয়ে পরিচালক অতি অভিনয় করিয়েছেন। জহর গাঙ্গুলীর পাশাবাবু চরিত্রটি দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছে। অসিতবরণের বসন্ত চরিত্র দর্শকদের আন্তরিক সমর্থন লাভ করেছে। জ্যোৎস্না বিশ্বাসকে ভাল লাগে, তবে পরিচালক এবং ক্যামেরাম্যান তাকে আশানুরূপ কাজে লাগাতে পারে নি।

চারণ কবি মুকুন্দদাস' চিত্রে সবিতাব্রত দত্ত

● বলাকার 'পথের দাবী' নাটকের একটি দৃশ্য

বিজয়ের পুত্র , জয়ের চরিত্রে সুমন মুখোপাধ্যায় আড়ষ্ট, সময় সময় চোখের কোন অভিব্যক্তি দেখা যায় নি। অন্যান্য চরিত্রে অপর্ণা দেবী, অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, গীতা দে, ভারতী দেবী যথাযথ অভিনয় করেছেন।

সঙ্গীতাংশে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত 'বুক চিপ চিপ'-এর মত গান নিম্নরুচির পরিচায়ক। সঙ্গীতের কাজ মোটামুটি ভাল।

নাটকের কথা

বলাকার 'পথের দাবী'

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর নাট্যমঞ্চে বলাকা মহিলা নাট্যসংস্থার অভিনীত শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর মঞ্চরূপায়ণ দেখে এলাম। কি অভিনয়, কি দৃশ্য-সজ্জা, আলোকসম্পাত, রূপসজ্জা, কম্পোজিসন—সবদিক দিয়েই বলাকার এই মঞ্চরূপায়ণ হয়েছিল প্রায় নিখুঁত। তবে একটা দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। শ্রীমতী মীনাক্ষী গোস্বামী সব্যসাচীর ভূমিকায় জায়গায় জায়গায় একটু বেশি ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন—এই ভাব-প্রবণ ভাবটা একটু কমিয়ে দিলে সব্যসাচীর চরিত্ররূপায়ণ আরও নিখুঁত হবে। ভবিষ্যতে পরিচালককে এদিকে একটু নজর দিতে অনুরোধ করি।

সবদিক দিয়ে বিচার করে শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের কৃতিত্ব দিই অপূর্বের ভূমিকায় শ্রীমতী ভারতী দাশগুপ্তকে। ট্রায়াল সিনে তাঁর ভীত, সন্ত্রস্ত এবং হতভম্ব ভাব সমবেত দর্শকদের মোহিত করেছিল। কিন্তু এ দৃশ্যেও সব্যসাচী চারিত্রিক গাম্ভীর্য রেখে অভিনয় করতে পারেন নি। একটু বেশি ছটফট করছিলেন। সুমিত্রা এবং ভারতীর অভিনয়ও ভালই হয়েছিল।

নাটকটি আরও কয়েকবার মঞ্চস্থ হওয়া উচিত। তবে ভবিষ্যতে শহরের কোন ভাল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হলেই ভাল হয়—কারণ সামনে মাইক ঝুলিয়ে অভিনয় করতে গেলেই স্টেজ কম্পোজিসন নষ্ট হয়ে যায়।

● দিল্লীতে অভিনীত 'মুখোস'-এর 'রজনীগন্ধা' নাটকের একটি দৃশ্য

দিল্লীতে মুখোস দলের অভিনয়

গত ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে কলকাতার খ্যাতনামা নাট্যগোষ্ঠী মুখোস ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা বহু প্রশংসিত দুটি নাটক 'নিশাচর' ও 'রজনীগন্ধা' AIFACS মঞ্চে এক সপ্তাহব্যাপী মঞ্চস্থ করেন। প্রথম রজনীতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়গুলির প্রভূত দানের কথা উল্লেখ করেন। ঐ প্রসঙ্গে বাংলার নবনাট্য আন্দোলন ও মুখোসগোষ্ঠীর কার্যাবলীর প্রশংসা করেন।

'নিশাচর' রহস্য নাটক হিসাবে ইতিমধ্যে কলকাতায় যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। দিল্লীতেও এই নাটকটি দর্শক এবং সমালোচকদের কাছ থেকেও সেই পরিমাণ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছে। প্রতিটি শো'তে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল।

ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রজনীগন্ধা' সম্পূর্ণ ভিন্ন রসের নাটক। 'রজনী-গন্ধা' বাংলা দেশের নিজস্ব ফুল। কিন্তু দিল্লীতেও তার সুরভি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। মাত্র চারটি চরিত্র সম্বলিত এই নাটকটি অতি-সহজেই দিল্লীবাসীর হৃদয় জয় করেছে।

দুটি নাটকই পরিচালনা করেন তরুণ রায় এবং তিনি দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপদানও করেছেন। দুটি নাটকেরই বৈশিষ্ট্য যে, একটি মাত্র স্ত্রীচরিত্র। এই দুটি বিভিন্নধর্মী চরিত্রে অভিনয় করে দীপান্বিতা রায় নিজ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দিল্লীর নাট্যসংস্থা 'রঙ্গমঞ্চ' মুখোস দলের এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

সংবাদ সমনা

মণ্ট্রিল উৎসবে 'গোদান'

মণ্ট্রিল চলচ্চিত্র উৎসবে গত ১২ই আগস্ট জেটলী ফিল্মসের 'গোদান' হিন্দী ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটিতে ফরাসী সাব-টাইটেল যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। প্রযোজক ত্রিলোক জেটলী এবং অভিনেতা রাজকুমার ও কামিনী কৌশল উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসব প্রতিযোগিতা-মূলক না হওয়ায় কোনরূপ পুরস্কারের

ব্যবস্থা ছিল না। 'গোদান' ছবিটি দর্শক ও সংবাদপত্র দ্বারা উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ-সংখ্যা

গত বছর জাপানে ৩৬৩টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র নির্মিত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা সর্বোচ্চ। ভারতের স্থান এশিয়ায় দ্বিতীয়; গত বছর ভারতে নির্মিত হয়েছে ২৯৪টি ছবি; হংকং ১৯০টি নির্মাণ করে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। অস্ট্রেলিয়া সারা বছরে মাত্র একটি ছবি নির্মাণ করেছে।

চিত্রকল্প: সিনে ক্লাবের মুখপত্র

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটার ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'চিত্রকল্প'র দ্বিতীয় সংখ্যা পাঠ করে আমরা খুশি হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে চলচ্চিত্র-আন্দোলনে ইতিমধ্যে সিনে ক্লাব যথেষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সিনে ক্লাবের উদ্যোগে আমরা এমন কয়েকটি বিশ্ববিখ্যাত ছবি দেখেছি, নতুন নতুন চিত্রস্রষ্টাদের কাজের সাথে পরিচিত হয়েছি, যা চিত্র-ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করে কোন কালেই সম্ভব হতো না। ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের ফলে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চলচ্চিত্র দর্শক তৈরি হচ্ছে, এরূপ দর্শকরাই আমাদের চলচ্চিত্র বিকাশের সহায়ক।

সিনে ক্লাব 'চিত্রকল্প' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে চলচ্চিত্র-চিন্তার বিকাশে আর এক পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েছে। আমরা এই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানাই। 'চিত্রকল্প' আমাদের দেশের মামুলী সিনেমা পত্রিকার বহু উর্দ্ধে; তথাকথিত বহুল প্রচারিত সিনেমা পত্রিকাগুলির মত পাঠকদের দুর্বল চিন্তায় সুড়সুড়ি দেবার মত কোন কু-প্রবৃত্তি এই পত্রিকায় স্থান পায় নি। তথ্যে ও মননশীলতায় পত্রিকাটি একটি বিশিষ্ট চরিত্র লাভ করেছে; লেখাগুলি চলচ্চিত্রে শিল্পবোধ এবং সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। এরূপ প্রবন্ধ চলচ্চিত্র দর্শকদের ছবির অন্তর্নিহিত রস উপলব্ধির সহায়ক। আলোচ্য সংখ্যাটিতে বিশেষভাবে পোলিশ ও সুইডিশ চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং কয়েকজন স্রষ্টা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া সমিতির সদস্যগণের লেখা কয়েকটি দেশী ও বিদেশী ছবির আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলির তুলনায় চিত্র সমালোচনা দুর্বল। বিশেষ করে গোল্ডরাশ, প্রতিনিধি ও চারুলতা সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তৃত আলোচনা আশা করেছিলাম; ছবির ওপর বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক আলোচনা থাকা দরকার। চিত্র সমালোচনা যেখানে বিজ্ঞাপনের ঢৌপ ফেলার মত ব্যাপার না হয়ে পারে সেখানে সমালোচনাকে স্পষ্ট এবং শিক্ষণীয় করে তোলার সুযোগ থাকে।

পত্রিকাটিতে চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত এবং কয়েকটি দেশী চলচ্চিত্রের স্থিরচিত্র দেওয়া হয়েছে, ছবির ছাপা আরো ভাল হওয়া উচিত। সদস্যদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য একটা আলোচনা বিভাগ থাকলে সম্ভবত আরো আকর্ষণীয় হতে পারে।

'চিত্রকল্প' সিনে ক্লাবের অফিস ৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত হয়।

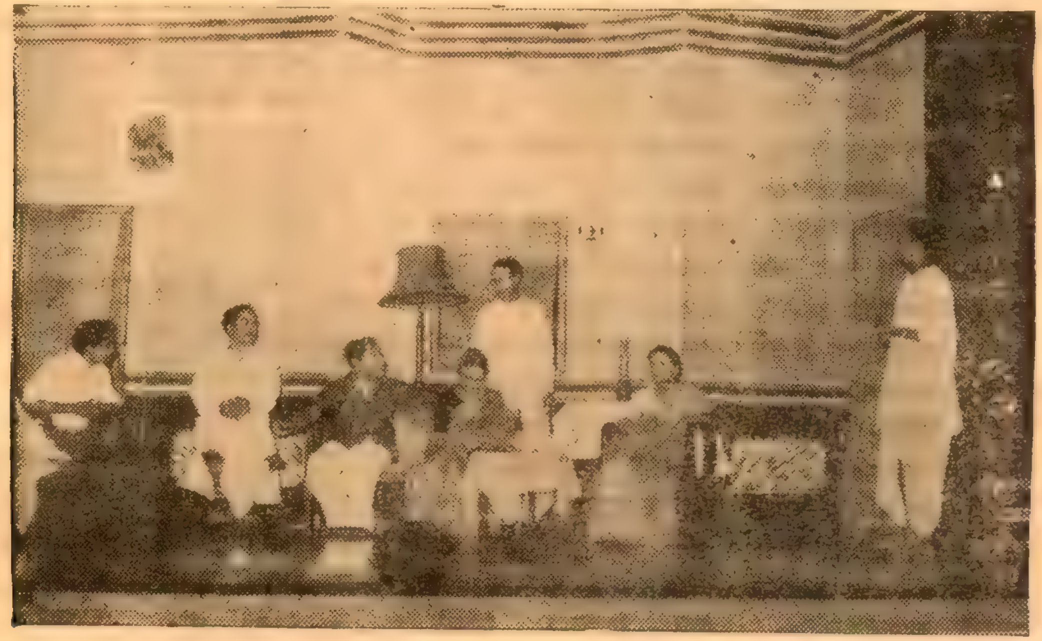

● সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবর রঙ্গমঞ্চে আরবান হেলথ সেণ্টার রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক প্রযোজিত 'বড়ো পিসীমা' নাটকের একটি দৃশ্য। তরুণ মৈত্র, এস এস পাল, ডাঃ বি সি সান্যাল, শ্রীমতী পি সরকার, দেবব্রত বসু, নীলা দাশগুপ্তা ও পরীক্ষিৎ বসু।

নটনটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ উনপঞ্চাশ ॥

একটি স্মরণীয় নাটকের বরণীয় কাহিনী

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ যখন আন্দোলিত, সেই সময় বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই সময় গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল পর পর কয়েকখানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন।

১৯০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হয়।

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকা-লিপি ছিল এই রূপ :—সিরাজ—দানীবাবু, মোহনলাল—তারক পালিত, ক্লাইভ—ক্ষেত্রবাবু, করিম চাচা—নাট্যকার স্বয়ং, দানশা ফকির—প্রথম রাত্রিতে অতুল গাঙ্গুলী অভিনয় করেন। দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি দর্শকদের অভিবাদন জানান।

মিনার্ভা থিয়েটার 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় করে ঐ সময়ে জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করে।

একদিকে দেশব্যাপী আন্দোলন, অন্যদিকে মঞ্চের মাধ্যমে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয় ইংরেজ সরকারকে বেশ বিব্রত করে তুলেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রাজরোষে পতিত হয়। মিনার্ভা থিয়েটার 'সিরাজদ্দৌলার' অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সম্পর্কে দুটি মজার কাহিনী শোনা যায়। একটি মহলার কাহিনী। অপরটি অভিনয়ের কাহিনী।

দানীবাবুকে 'সিরাজের' ভূমিকায় মহলা দেওয়ানোর সময় সিরাজের সিংহাসনে বসা এবং সিংহাসন থেকে নেমে আসার ভঙ্গিমা গিরিশচন্দ্রের কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না।

একদিন সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে দানীবাবুকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর ইতিমধ্যে মহলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দানীর সিংহাসনে বসা এবং সিংহাসন থেকে নেমে আসাটা তোমার ভাল লাগছে না কেন?

—নবাবী চালের অভাব হচ্ছে।

—মোটেই হচ্ছে না। ঠিক আছে। কালিদাসকে আর তুমি খাটিও না।

অর্দ্ধেন্দুশেখর বলতেন, কালিদাসের জিহ্বায় যেমন সরস্বতী বিরাজ করতেন, তেমনি দানীবাবু বিশেষ কিছু লেখাপড়া না শিখলেও অভিনয়-বিদ্যাটি সহজেই আয়ত্ত করেছেন। তাই দানীবাবুকে অর্দ্ধেন্দুশেখর কালিদাস বলে ডাকতেন।

অর্দ্ধেন্দুশেখরের মন্তব্য শুনে গিরিশচন্দ্র পুত্রকে সিংহাসনে বসা সিংহাসন থেকে নেমে আসার মহলা থেকে রেহাই দিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয় সম্পর্কে। দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে অর্দ্ধেন্দুশেখর দানশা ফকিরের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

একদিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর জনৈক দর্শকের হাত থেকে অল্পের জন্যে রেহাই পেয়ে যান।

দানশা ফকিরের চরিত্রটি দর্শকদের কাছে মোটেই সহানুভূতি পাবার চরিত্র নয়। কেন না দানশা ফকির কোম্পানীর লোকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সিরাজকে ধরিয়ে দেয়। দানশা ফকির যেখানে কোম্পানীর লোকদের পথের সন্ধান দিচ্ছে, সেই জায়গাটায় যখন অর্দ্ধেন্দুশেখর একদিন অভিনয় করছেন, সহসা জনৈক মুসলমান দর্শক আসন থেকে উঠে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে মারতে উদ্যত হল। অন্যান্য দর্শকেরা মুসলমান দর্শকটিকে ধরে ফেললেন। এবং এটা যে অভিনয় সেই কথাটা অনেক করে বুঝিয়ে তবে তাঁকে শান্ত করেন।

আজকের দিনে দর্শক এবং শিল্পীদের কাছে এটা গল্পকথা বলে মনে হলেও—কাহিনী বাস্তব সত্য।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক
রচিত কয়েকখানি
ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী
৬ষ্ঠ ভাগ—।।০

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর
গ্রন্থাবলী
মূল্য—বার আনা

মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে ৷৷০
সরসীবালা বসুর—
শিবানী ।।০
বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ।।০
চারুবালা বসুর—
পতিব্রতা ।।০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

গানটি গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয়স্থান খুঁজিত।'

চৈতন্যলীলার সঙ্কীর্তনের দৃশ্যে অনেক সময় ভাবাবেগে নাচতে নাচতে বিনোদিনী অচৈতন্য হয়ে পড়তেন।

অপরেশচন্দ্র তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'এ বইটিতে লিখেছেন—'গিরিশচন্দ্র চৈতন্যলীলা লিখিলেন—সে কি সমারোহ, সে কি ভাববন্যার দুকূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস। ইংরাজী শিক্ষার বিষে জর্জরিত বাঙালীর বিস্মৃত হৃদয়ে সে কি নবজাগরণের অরুণোদয়। বারাঙ্গনা লইয়া অভিনয়, ইংরাজী রুচিবাগীশ ভাবের প্রেরণায় সেকথা ভুলিয়া গেলেন। সংস্কৃত শিক্ষাভিমানী আচার-নিষ্ঠ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভক্তির পুণ্য স্পর্শে বারাঙ্গনা-স্পর্শ হীন বলিয়া মনে করিলেন না,—যে অভিনেত্রী চৈতন্যের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মবিস্মৃত হইয়া তাঁহার পাদস্পর্শের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের চরণস্পর্শে বাঙলার নাট্য-শালা তীর্থে পরিণত হইল। অলক্ষ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বাঙালীকে ভাবানুকারী হইলেও বাঙালী—বাঙালী। তাহার অন্তরের অন্তর তাহার অজ্ঞাতে পাশ্চাত্য কলাবিদ্যার মোহকরী বসন দূরে ফেলিয়া—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রস-মাধুর্যে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—তাহা সে নিজেই জানে না! নাট্যশালাকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীর এই নবজাগরণের পুরোহিত গিরিশচন্দ্র।

চৈতন্যলীলার পর হইতেই গিরিশ-চন্দ্রের প্রতিভা যেন পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিল।

চৈতন্যলীলা বাংলা দেশে নতুন করে ধর্মের প্লাবন বইয়ে দিয়ে গেল।

শিলালি

প্রত্যেক অভিনয় রাত্রে প্রেক্ষাগৃহ লোকে একবারে ঠাসা থাকতো। বাংলার ঘরে ঘরে আবার নিরবিচ্ছিন্ন-ভাবে কীর্তন গান সুরু হয়ে গেল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত চৈতন্যলীলা দেখতে এসেছিলেন—অভিনয় দেখতে এসে ভাবাবেগে মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন। অভিনয়ের পর বলে-ছিলেন—'আহা, আসল নকল এক দেখলাম।'

গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের কৃপা-লাভ করলেন—ঠাকুর বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করলেন 'তোর চৈতন্য হোক।' এই জন্যই বিনোদিনী পরে বলেছেন—'আমার থিয়েটার, কার্যকরী করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেন না আমি জানি যে পরমারাধ্য পরম পূজনীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আমায় কৃপা করেছিলেন।'

চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে রসরাজ অমৃতলালের প্রশস্তি তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না—

'লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল শিলা,
নাট্যশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসীর নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়
ছুটিল নামের বন্যা ধরণী হইলেন ধন্যা
গণিকা গুণির গণ্যা কেঁদে লুটে কৃষ্ণপায়
গিরিশের এ সাধনা হীনাসনে আরাধনা
দেখেন বেদনাহারী হরি রামকৃষ্ণ চক্ষে
শ্রীগুরু দেখান ইষ্টে গুরুরূপে ধরাপৃষ্ঠে
সেই ইষ্টে দৃষ্টি করে কবি ব্যাকুলিত চক্ষে
জপতপ পূজাকর্ম জ্ঞানভক্তি ধর্মাধর্ম
মর্মের নৈবেদ্যপদে ধীর ধরিলেন ডালি
দেখে রাম রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ সেই কৃষ্ণ
রামকৃষ্ণ সৃষ্টা সৃষ্ট প্রভু রামকৃষ্ণকালী।'

অমৃতলাল বলেছেন: 'নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সঙ্কীর্তন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। গীতা ও চৈতন্যচরিতের বিভিন্ন সংস্করণে দেশ ছাইয়া পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্বে আপনাকে হিন্দু—হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।'

বাংলা থিয়েটারকে চৈতন্যলীলা যে কত দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছিল তা লিখে শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে অভিনেত্রীরা আসতেন একটা বিশেষ শ্রেণী থেকে—এই জন্যই অনেকে থিয়েটার দেখা ব্যাপারটাকে নরকে যাবার মতই মনে করতেন। চৈতন্যলীলার সমালোচনা প্রসঙ্গে এই ধরণের মতামতের অসারতা দেখাবার জন্যই তদানীন্তন একটি বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন: 'স্টারে চৈতন্যলীলা দেখে আমাদের এই

নৈতিক অবনতি ঘটে না, বরং মানসিক উন্নতিই হয়।'

কর্নেল অলকটও থিয়েটারে চৈতন্য-লীলা দেখে উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলেছিলেন—

'As for the Chaitanya Lila I unheritatingly affirm that it is impossible for any one to witness the play without a rush of spiritual feeling and religious fervour. The poor girl who played Chaitanya may belong to the class of unfortunates (alas! how unfortunate these victims of man's brutishness), but while on the scenes she throws herself into her role so ardently that one only sees the Vaisnava saint before him. So thoroughly does the Star actress feel the emotions of the saint she personates so intensely arouses in her own bosom the religious ecstasy of Bhakti Yoga, she fainted dead away between the acts the evening I was there, and a medical man who shaved my boy had to go behind the scenes each time to administer restoratives.

আগেই বলা হয়েছে চৈতন্য-লীলা মঞ্চস্থ হবার পর থেকেই বাংলার আপামর সাধারণ আবার নতুন করে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য মর্মে মর্মে অনুভব করতে শিখল। এই নাটক দেখতে এসেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পবিত্র পাদস্পর্শে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে কৌলীন্যের স্তরে তুলে ধরলেন। বাংলা থিয়েটারের সৃষ্টি, সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, নাট্য রচনা, অভিনয়, শিক্ষাদান ইত্যাদি সব বিষয়েই গিরিশচন্দ্রের অবদানের তুলনা হয় না। এই সব কথা ভেবেই অপরেশচন্দ্র লিখেছিলেন—'এই জন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the Native Stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনো দিন ছিল না।'

গিরিশচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় শিশিরকুমারের অভিনয়ের মাধ্যমে। সে অভিনয়ের বর্ণনা যথা স্থানে করবো। এইখানে এইটুকু বলি—শিশিরবাবুর যোগেশ এবং করুণাময় দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম—কিন্তু তিনি আমাকে বলেছিলেন—গিরিশবাবুর অভিনয় তো তোমরা দেখ নি—যদি দেখবার সৌভাগ্য হোত, তাহলে বুঝতে এ সব ভূমিকায় অভিনয় আরও কত ভাল হতে পারে। শিশিরকুমারের মত গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার অনুরাগী আমি খুব কমই দেখেছি। নট, নাট্যকার এবং বিদগ্ধ

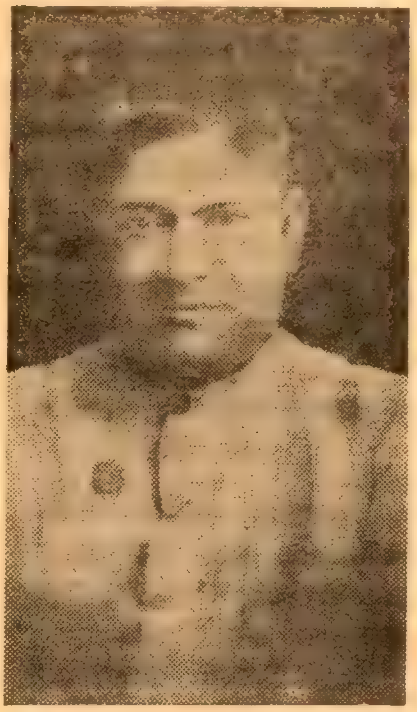

প্রবীণ নাট্যাচার্য শ্রীযুত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সমালোচক হিসাবে গিরিশবাবুর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম।

আজকের দিনের থিয়েটারের কেষ্টবিষ্টুরা অবশ্য কি শ্রীরামকৃষ্ণ, কি গিরিশচন্দ্র বা কি শিশিরকুমার সবাইকে একেবারে নস্যাৎ করে দেন। একটি নমুনা দিচ্ছি—শ্রীশম্ভু মিত্র তাঁর 'অভিনয়, নাটক, মঞ্চ' বইতে এক জায়গায় লিখছেন: 'সেকালে ছিল তাকিয়া আর শটকার নল, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত তার অবশেষ দেখতে পাওয়া যেত কোনও কোনও থিয়েটারে। সেখানে অভিনেতাদের ঘরে গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের ছবি। পরমহংস থিয়েটারের গার্জেন সেণ্ট হয়ে গিয়েছিলেন কিনা।'

বলবার ধরণটা একবার লক্ষ্য করুন। অর্থাৎ গিরিশ ঘোষ বা শ্রীরাম-কৃষ্ণের ছবি রাখাটা মহা অপরাধ। সে জায়গায় মাও-সে-তুং, চু-এন-লাই বা স্ট্যালিন অথবা স্তানিসলভস্কির ছবি টাঙিয়ে দিলেই এঁরা বোধহয় খুশি হন। 'পরমহংস থিয়েটারের গার্জেন সেণ্ট ইত্যাদি'—একেবারে Shairan style-এর sarcasm আর কি! Bravo! Bravo! বলে হাততালি দিতে ইচ্ছা করে। সত্যিই তো। গিরিশবাবু আর শিশির ভাদুড়ী ফিউড্যালী মনোভাব নিয়ে যত সব আজে-বাজে নাটক চৈতন্য-লীলা আর সীতা দেখিয়ে লোককে বিপথগামী করেছেন। প্রগতিবাদী শম্ভুবাবু করছেন সোফোক্লিসের ওয়েদিপাউস (ইদিপাস নহে)। আজকের দিনে জনসাধারণ যখন কু-ব্যবস্থা এবং কুশাসনের ফলে দুর্দশার চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে। তখন মঞ্চ থেকে শম্ভুবাবু লোকশিক্ষার জন্য প্রচার করছেন (অবশ্য সোফোক্লিসের সাহায্যে) মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল মাত্র—তার নিজের কিছু করবার নেই—সব কিছু তাকে মেনে নিয়ে অন্ধের মত এগিয়ে চলতে হবে।

যাক্ গে, আবার আগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক্।

ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে গিরিশ-চন্দ্রের প্রহ্লাদচরিত্র মঞ্চস্থ হয়—পরে এই নাটকের সঙ্গে রসরাজ অমৃত লালের বিবাহ-বিভ্রাট জুড়ে দেওয়া হয়। প্রহলাদ চরিত্র জনপ্রিয় হয় নি। কিন্তু বিবাহ-বিভ্রাট খুব জমে যেত। এরপর ক্রমে ক্রমে গিরিশচন্দ্রের নিমাই-সন্ন্যাস (চৈতন্যলীলার দ্বিতীয় পর্ব), প্রভাসযজ্ঞ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়। (ক্রমশঃ)

পাঠক মন

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার পক্ষে একটি বছর হয়ত তেমন দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু যে কলেবরে তার চলন ও প্রকাশন তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মত। সত্যি কথা বলতে কি, মাত্র এইটুকু সময়ের মধ্যে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রখ্যাত বাংলা সাপ্তাহিকগুলির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসারই শুধু জায়গা করে নিয়েছে তাই নয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে, নিজস্ব ভাবধারায় আর আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে।

প্রকৃত সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায় তা আপনাদের পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর বুঝতে পেরেছি। তার আগে আমাদের দৃষ্টি ছিল ঘোলাটে, চিন্তাশক্তি ছিল স্থূল এবং বিচারবুদ্ধি ছিল অস্বচ্ছ। বিজ্ঞাপন আর সাংবাদিকতার নামে সস্তা রচনায় সমৃদ্ধ (?) কতকগুলি সাপ্তাহিক বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে রূপের নামে অশালীনতা, গন্ধের নামে পক্ষপাতদুষ্টতা ছড়ানোয় আত্মনিয়োগ করেছিল। সুখের বিষয়, আপনাদের পত্রিকার বেলায় উপরোক্ত প্রত্যেকটি কথাই অপ্রযোজ্য।

জাতির ধ্যান-ধারণার অন্যতম বাহন তার সাহিত্য। তবে তা নিশ্চয়ই গঠনমূলক তথা উদ্দেশ্যপূর্ণ হওয়া উচিত। একটা জাতির ভবিষ্যৎ গঠনে সাহিত্য যে অপরিসীম ভূমিকা নিতে পারে তা নিঃসন্দেহে বিচারের উর্ধ্বে। আর সেই ভূমিকা সফল রূপ পায় যখন তা জনসাধারণের মনের কথাকে দেয় ভাষা, শুদ্ধতাকে দেয় নেতৃত্ব। সগৌরবে বলা যায় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' উল্লিখিত গুণরাজিতে ভূষিত। পেটোয়া রাজনীতি আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র তার শ্লোগান নয়।

'আজকের মানুষ'টি সত্যি যেন মনের মানুষ। শ্রীপদাতিককে আমাদের অনেক ধন্যবাদ তাঁর পরিশ্রম করে 'শহর পরিক্রমা'র জন্য। বর্তমানের মধ্য দিয়ে অতীতের রোমন্থন যা পদাতিকের মূল উপজীব্য, নিঃসন্দেহে অননুকরণীয়। বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যকে আমার অনুরোধ—দিল্লী থেকে যেন তিনি ওখানকার সমাজ-ব্যবস্থা আর তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেন। 'বঙ্গদর্শন' যেন আমাদের আত্মদর্শন। প্রতিবিম্বতেও বোধ করি এত সুন্দর ও পরিষ্কার দর্শন হয় না। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল 'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী'। নাট্যকারদের মঞ্চের আড়ালে যে জীবন তার রস বিতরণের জন্য দেবনারায়ণ গুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই। চিত্রস্থাপনে আপনাদের আরো সতর্কতা কাম্য।

পরিশেষে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'কৃষ্ণচূড়া' উপন্যাস আর 'পাঠক-মন' বিভাগটির জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সুশীল ভট্টাচার্য,
১১ পঞ্চাননতলা রোড, বেলঘরিয়া,
২৪ পরগণা।

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র অগণিত পাঠককুলের মধ্যে আমি একজন। এর সুস্থ এবং আদর্শমণ্ডিত সংবাদ পরিবেশনে আমি পরিতৃপ্ত।

এর নিয়মিত বিভাগ—যেমন 'আজকের মানুষ', 'আন্তর্জাতিক', 'শহর কলকাতা', 'বঙ্গদর্শন', 'ভারত-দর্শন' ইত্যাদি বিভাগগুলি ইদানীং-কালে প্রচলিত এবং ততোধিক প্রচারিত সাময়িক পত্রিকাগুলির চেয়ে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ব'লে দাবী করতে পারে।

প্রবন্ধের মধ্যে যেমন 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' সাহিত্যজগতে একটি নব অবদানের স্বীকৃতি।

উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী গল্পের অনুবাদ থাকলে ভাল হয়। খেলাধূলার আসরটি ঠিক হয়ে ওঠে না—ও বিভাগের আরও একটু বিস্তৃতি প্রয়োজন।

'প্রচ্ছদপট' সাপ্তাহিক সংবাদের প্রচ্ছদপটই বটে, তবে তার স্বচ্ছতার দিকে নজর দিতে হবে—অর্থাৎ ছাপার দিকে ভিতরেও নজর দেওয়া দরকার—বিশেষ করে 'টাইপ'গুলো বদলানো দরকার। ভেতরের কাগজ ক্রমে ক্রমে হোক ক্ষতি নেই, তবে প্রচ্ছদপটের কাগজ অতি শীঘ্র পরিবর্তন করা দরকার।

সব শেষে অনুরোধ পাঠকমনের মাধ্যমে পাঠকবর্গের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং ধন্যবাদ যেমন আপনারা পেয়ে থাকেন, তেমন তার পরিবর্তে তাদের সমালোচনার সম্ভাব্য সংশোধন করার চেষ্টা করবেন—তবেই 'পাঠকমন' বিভাগের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সফল হবে।

দীপ্তা গুপ্ত,
দার্জিলিঙ।

* * *

আমি আপনার 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন পরম আগ্রহী ভক্ত। প্রতি বৃহস্পতিবার এলেই তাকিয়ে থাকি ডাকঘরের দিকে কখন সাপ্তাহিক বসুমতী পাব। কিন্তু যখন পাই তখন ধৈর্য হারিয়ে অধৈর্য হয়ে পড়ি। কারণ অনেক সময় প্রায়ই বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত সংখ্যাটি পরের সোমবার পাই, তাই দয়া করে যদি Late Morning Edition-এর মত বৃহস্পতিবারের সংখ্যাটি ঐদিন ভোরের ডাকে পাঠান তবে শুক্রবার বা শনিবার পাই।

দ্বিতীয়ত প্রতিটি সংখ্যাই ছেঁড়া অবস্থায় পাচ্ছি। প্রতিটি সংখ্যাই মোড়কের ভেতর মাঝখানে পত্রিকার কাগজ ছেঁড়া—এতে খুব আঘাত পাই।

'সম্পাদকীয়' ও 'রঙ্গমঞ্চের' পরিমাণ আরো কিছুটা বাড়লে ভাল হয়। পত্রিকাটিতে দুটো জিনিসের খুব অভাববোধ করছি—একটি 'সংক্ষিপ্ত সমাচার' নামে সপ্তাহের আকর্ষণীয় খবরের বিভাগ, যাতে করে একনজরে সপ্তাহের মূল খবরগুলি দেখে নেওয়া যায়। অন্যটি হল সমাজের আলোচ্য বিষয় নিয়ে আঁকা কার্টুনচিত্র।

শ্রীঘনশ্যাম মান্না,
গোলগ্রাম (মেদিনীপুর)।

খেলা ধুলা

● পিটার বার্জ

ক্যাঙ্গারুর দেশের ক্রিকেটার

শ্রীঅমিতাভ

সিম্পসন তাঁর দলবল নিয়ে যেদিন জাহাজ থেকে ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, সেইদিন থেকেই বিলেতের কাগজগুলো তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। ওখানকার কয়েকজন বিশ্বনিন্দুকের মতে সিম্পসনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ান দলের মত দুর্বল দল নাকি ইতিপূর্বে ইংলণ্ড সফরে আসে নি। ক্রমাগত একসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরূপ সমালোচনার পশ্চাতে একটা নীচ উদ্দেশ্য ছিল। ব্যাটে বলে সিম্পসনের দলবলকে যদি কাবু করতে পারা না যায়, তাই কলমের খোঁচায় যদি তাদের দৃঢ় মনোবল ভঙ্গ করা যায়।

প্রথম টেস্ট এবং লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া সত্যই একটু বেকায়দায় পড়েছিল, ইংলণ্ড দল প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের জয়ের একটা সুন্দর সম্ভাবনাকে বৃষ্টি এসে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। অস্ট্রেলিয়ার সমালোচনার সুর বিলিতি কাগজগুলো সপ্তমে চড়িয়ে দিল, আর ইংলণ্ডের প্রশংসায় তাঁরা হয়ে উঠলেন পঞ্চমুখ। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল, হেডিংলের তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ডকে সাত উইকেটে পরাজিত করে সিম্পসন বাজীমাৎ করে দিলেন। শেষের দুটি টেস্ট ড্র হল 'এ্যাসেজ' সিম্পসনের দলবলের সংগে অস্ট্রেলিয়ার পথেই যাত্রা করল।

দেশে ফেরার পথে কিছুদিনের জন্ত ভারতের আতিথ্য গ্রহণ করবে ক্যাঙ্গারুর দেশের ক্রিকেটাররা। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলকাতায় তিনটি টেস্ট খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেস্টের আসর বসবে আগামী ১৭ই অক্টোবর। এবারের অস্ট্রেলিয়ান দলের মধ্যে পরিচিত মুখ আমরা অল্প কয়েকটিই দেখতে পাব। ১৯৫৯-৬০ সালের সফরের খেলোয়াড়দের মধ্যে এবার আছেন ব্যারী জার্মান, নরম্যান ও'নীল, পিটার বার্জ, ওয়ালী গ্রাউট।

নিউ সাউথ ওয়েলসের ২৮ বৎসর বয়স্ক খেলোয়াড় ববি সিম্পসনের ওপর অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়কত্বের গুরু-দায়িত্ব ছাড়াও এসে পড়েছিল মান-সম্মানের একটি বিরাট বোঝা, পূর্ববর্তী

ক্ষমা প্রার্থনা

মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর হইতে আমরা সুলেখা স্পেশাল ফাউন্টেনপেন কালির কার্টনে তাঁহার স্মরণোদ্দেশ্যে সহস্র-হৃদয় আলোড়িত অমর বাণী সম্বলিত প্রতিকৃতি দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ভারত সরকার তাঁহার প্রতিকৃতি ব্যবহারে আপত্তি করায় আমরা অনন্যোপায় হইয়া সুলেখা স্পেশাল কার্টনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি দেওয়া বন্ধ রাখিতে বাধ্য হইতেছি। মহাত্মাজীর আশীর্ব্বাদ-ধন্য "সুলেখা" এজন্য অগণিত সুলেখানুরাগীদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থী।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২

অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিনায়ক বেনোর অর্জিত সমস্ত অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সিম্পসনের দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়েরই বিদেশের মাঠের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। কিন্তু সেই সমস্ত তরুণ নবাগত খেলোয়াড় এবং নবাগত অধিনায়ক সিম্পসন নিজও তাঁদের ওপর অর্পিত গুরুদায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়া দলের একজন নির্ভরযোগ্য শক্তিশালী ডান হাতের ব্যাটস্‌ম্যান। অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব মাথায় এলে বহু ভাল খেলোয়াড়েরও খেলা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ইংলণ্ড সফরে সিম্পসন অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নিয়েও তাঁর স্বাভাবিক ব্যাটিং-নৈপুণ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। সফরের শেষে দেখা গেল, ৫৭'১৩ করে ব্যাটিং তালিকার শীর্ষে তিনিই স্থান পেয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার বোলিং শক্তির পুরোভাগে আছেন গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। অস্ট্রেলিয়া দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ম্যাকেঞ্জির বয়স মাত্র ২২ বছর। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার স্কুল-শিক্ষক, এই তরুণ খেলোয়াড়ের টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা খুব বেশিদিনের নয়, কিন্তু নতুন বলে দলের বোলিং আক্রমণধারা রচনায় তিনিই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ভরসা। ইংলণ্ড সফরে ৮৮টি উইকেট সংগ্রহ করে তিনি বোলিং তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন। মিডিয়াম পেস বোলার নীল হক ইংলণ্ড সফরে বোলিং তালিকার শীর্ষে স্থান পেয়েছেন। হক বাতাসে মাঝে মাঝে বল ঝুলিয়ে ব্যাটসম্যানদের বেশ বেকায়দায় ফেলে দেন। গ্রাহাম কোরলিং এবং অ্যালান কনোলীর মধ্যে একজনই অস্ট্রেলিয়া দলের বোলিং আক্রমণধারা রচনার ভার পাবেন। অফ-স্পিনার ভাইভার্স বেশ মাথা খাটিয়েই বল করেন, ভারতের মাঠে তাঁর বল বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে হয়। মার্টিং অফ-ব্রেকের সঙ্গে গুগলী দেন আর সেলার লেগ-ব্রেক আর গুগলী সমানভাবে দিতে পারেন।

● খেলার পূর্বে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী ও সুকুমার সমাজপতির করমর্দন।

ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সিম্পসন, লরী, ও-নীল, বার্জ এবং বুথ পরিণত এবং দক্ষ ব্যাটসম্যান—তাঁদের দক্ষতার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। রেডপাথ, পটার এবং কাউপার টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা খুবই কম। কিন্তু তাঁদের উন্নত ধরণের ব্যাটিং-নৈপুণ্য দেখে আশা করা যায় যে, ও-নীল, বার্জ, সিম্পসনদের ভবিষ্যতের শূন্যস্থান পূর্ণ করার তাঁরাই যোগ্য প্রতিনিধি। গ্রাউট এবং জার্মান এবারও উইকেটরক্ষক হিসাবে দলের সঙ্গে সফর করছেন। এ্যাসেজের সঙ্গে ভারত থেকে রাবার নিয়ে দেশে ফেরার দৃঢ় বিশ্বাস সিম্পসন রাখেন।

লঘু পাপে গুরু দণ্ড

আই-এফ-এ শীল্ডের ফাইন্যালে সেই দুই প্রধান মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। এবার শীল্ডের আসরটা ঠিক জমল না। ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল প্রথমে গোল দিয়ে অগ্রগামী থেকেও শেষে পেনাল্টিতে খাওয়া একটি গোলের জন্য জয়লাভে বঞ্চিত হল। যে পেনাল্টিতে গোল দিয়ে মোহনবাগান পরাজয় এড়িয়েছে, সেই পেনাল্টি ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে লঘু পাপে গুরু দণ্ডই হয়েছে। রেফারীর এই পেনাল্টি যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে ক্রীড়া-মহলে। ভারতের ফুটবল অধিনায়ক চুণী গোস্বামী সেদিন মাঠে যে দৃশ্যের অবতারণা করেছেন তা সত্যই সত্যকারের ক্রীড়ামোদীদের মাথা হেঁট করে দেয়। খেলার মাঠ থেকে অবসর নেবার আগে, তাঁর মত খেলোয়াড়ের এই ধরণের অখেলোয়াড়ী মনোভাব প্রদর্শন করা কোন মতেই উচিত হয় নি। বর্তমানে খেলা নিয়ে যেভাবে ছেলেখেলা চলছে ময়দানে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা ফুটবলের মান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও খারাপ লাগে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-৮
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Tiny Tots.. Teen-agers... Grown-ups...
THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS
Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast...Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ...there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics...in attractive designs and eye catching colours. ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!
Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth
The Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.
32, NICOL ROAD, BALLARD ESTATE, BOMBAY 1.

6 OCT 1964

সাপ্তাহিক
বসুমতী

পূর্ব পাকিস্তানে তরুণ-বাংলার বিদ্রোহী আত্মা
আজ আয়ুব-স্বৈরতন্ত্রের দুর্গম সরণী-জুড়ে
জীবনের যে-জয়মন্ত্রের অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ—
তার সার্থক চিত্রার্পণে
ইতিহাসের উজ্জ্বল গতিবিবর্তন কি সুনিশ্চিত ?

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৬৯ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • • • 8th October, 1964 • Vol. 69, N

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

খাটাউ ভয়েল
কিনতে গিয়ে…
খাটাউ ভয়েল কিনতে গিয়ে সত্যি আনন্দ পাবেন, কত অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ—আর কত অপরূপ ছাপ ও বাহারের ছড়াছড়ি। একমাত্র খাটাউই এই অনৈসর্গিক সৌন্দর্যসম্ভার অতি সামান্য মূল্যের ভিতর আপনাকে পরিবেশন করতে সক্ষম।
দি খাটাউ ম্যাকেন্‌জি স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিমিটেড
হেড অফিস:—লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বম্বে-১
মিলস্:—হাইনস্ রোড, বাইকুলা, বম্বে-২৭
পাইকারী বস্ত্রের দোকান:—গোবিন্দ চৌক্, মুলজী জেঠা মার্কেট, বম্বে-২
প্রতি মিটার অন্তর কিনারায় খাটাউ মিলের ছাপ দেখে নেবেন
দেখুন আজকের সব চাইতে জনপ্রিয় গাঢ় বাদামী রঙের জমির উপর কি মনমাতানো—অথচ কত আধুনিক ছাপের সমাবেশে খাটাউ এই অতুলনীয় ভয়েলটি সৃষ্টি করেছে।
যে কোন বেলায়
যে কোন জায়গায়
যে কোন অনুষ্ঠানে
খাটাউ ভয়েল
আপনাকে শ্রী ও লাবণ্যে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলবে
SISTAS KMS 335
রিটেল শো-রুম: ১৮-এল, পার্ক স্ট্রীট, প্রবেশ পথ মিডিলটন রো, কলিকাতা—১৮
১৪৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

সূচীপত্র

756.3
'003/3
V. 69
no. 20

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১২১৯
আজকের মানুষ	...	১২২০
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১২২১
ইংরেজী পাঠ (কবিতা)	নচিকেতা ভরদ্বাজ	১২২৩
ছায়াচক্রে (কবিতা)	কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী	১২২৩
ভারতদর্শন	...	১২২৪
আন্তর্জাতিক		১২৩০
এ মাসের বৃটেনে	জি. এ. জনসন	১২৩৪
কলকাতা, তোমাকে (কবিতা)	রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	১২৩৫
আবর্তন (কবিতা)	অসীম মুখোপাধ্যায়	১২৩৫
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৩৬

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১২৩৯
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১২৪২
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১২৪৩
পানীয় জলের কাহিনী (গল্প)	কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪৯
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১২৫৪
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১২৫৬
অনির্বাণ আয়তী (গল্প)	তীর্থংকর	১২৫৯
বঙ্গদর্শন	...	১২৬৩
বৈরাগী তলার মেলা (প্রবন্ধ)	দিলীপ মুখোপাধ্যায়	১২৬৭
রঙ্গজগৎ	...	১২৭১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদি	১২৭৫
পাঠক মন	...	১২৭৬
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১২৭৭
অলিম্পিক—প্রাচীন ও নবীন	পীযূষকান্তি কুণ্ডু	১২৭৯

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্‌টর বধ ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০   ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০   ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২২শে আশ্বিন ১৩৭১ Thursday, 8th October 1964

পূজোর প্রাক্কালে

শারদোৎসব আগতপ্রায়। জাতীয় জীবনে আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে এই উৎসব কতোখানি শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে, তার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্যে কোনো গণৎকারের দরকার হয় না। চাল, ডাল, চিনি, আটার সন্ধানে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। পূজোর সময় চাল ও চিনির বরাদ্দ যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হবে। এমনি অবস্থাতেই যা বরাদ্দ আছে তা নৈরাশ্যজনক, পূজো উপলক্ষে অতিরিক্ত পরিমাণ লাভের আশায় নৃত্য করার মতো কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের অসংখ্য দরিদ্র মানুষের কথা আমাদের সরকার যেভাবে চিন্তা করেন তা কার্যক্ষেত্রে ফলপ্রসূ নয়। যেহেতু তাঁদের কথা যুক্তির সাহায্যে সোচ্চারে বলার মতো ব্যক্তির অভাব। সেই কারণে তাঁরা কী খাচ্ছেন বা পাচ্ছেন সেকথা ভেবে দেখার মতো তেমন কোনো প্রয়াস নেই। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস পালন করার অব্যবহিত পরেই এই শোচনীয় সরকারী নিস্পৃহতা শুধু অপরাধজনক নয়, জনসাধারণের কাছে অমার্জনীয়।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তিনি জাতীয় উৎসবের প্রাক্কালে গ্রামের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করুন। মজুতদার ও মহাজনদের কবল থেকে উদ্ধার করে সাময়িক ঋণদানের ব্যবস্থা ও চাল সরবরাহের দ্বারা পূজোর আনন্দ উপভোগের কিছুটা সুযোগ তাঁদেরও দান করুন। গ্রামে যাঁরা বাস করেন তাঁদের অধিকাংশই হয়তো শরৎকালে দেখতে পাচ্ছেন যে, কিভাবে হাওয়ার মৃদু তালে সোনার মতো শস্যমঞ্জরী নৃত্য করছে। কিন্তু ধান কাটার এখনো অনেক বাকী। বর্তমান সময় তাঁদের কাছে বড়ই দুঃসহ। ধান কাটার পরও তাঁদের ভাগ্য কি ফেরে? কিম্বা আমাদের সরকার সেই সনাতনী ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে তাঁদের উদ্ধারের জন্য কোনো প্রোগ্রাম কি গ্রহণ করেন?

স্বাধীনতা লাভের পর এদিকে সরকার একপা-ও অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেই কারণে এই দুরবস্থার মধ্যে শারদোৎসব যখন আসে তখন এই দুশ্চিন্তায় মন কম্পিত হয় যে, ছোট ছোট নির্দোষ শিশুগুলিকে এই উৎসবের আনন্দ কিভাবে দান করবো। আর অল্প বয়সেই উৎসবের আনন্দ থেকে তারা যদি বঞ্চিত হয়, তা হলে জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে তা কল্যাণ-জনক নয়। উৎসবের আনন্দে, বিশেষত শিশুদের অন্যতম প্রধান উল্লাস নিহিত থাকে নতুন বসন-ভূষণে। ভূষণের কথা আমরা ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু নতুন জামা, ধুতি, প্যাণ্ট যোগানোর সাধ্য ক'জনেরই বা আছে। পূজোর পর ধুতিবস্ত্রের দর নির্দিষ্টকরণের সরকারী সিদ্ধান্ত শারদোৎসবে মিল-মালিকদের যেন দর বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ উপহার দিয়েছে!

অবশ্য এই দুর্দশা হয়তো আমাদের বেশিদিন ভোগ করতে হবে না। কেন না, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সদাচার সমিতি গঠিত হয়েছে। শারদোৎসবের প্রাক্কালে সাধারণ হরতাল, শিক্ষকদের অনশন প্রভৃতির মতো দুঃসংবাদের মধ্যে এটাই হয়তো একমাত্র সুসংবাদ। কিন্তু এখানেও আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, সদাচার সমিতি অভিযোগ শ্রবণ, গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন; এই সমিতি দুর্নীতি প্রতিকারের শক্তি থেকে বঞ্চিত। তবু এ বছর যে শক্তিপূজোর মানসিক আয়োজন হয়েছে, তা থেকে কি নিজেদেরও বঞ্চিত করবো?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ঋজু, দৃপ্ত। শুভ্র আবরণের আড়ালে এক সুতীক্ষ্ণ ইস্পাত। অগণিত জনতার ভিড়ে দাঁড়িয়েও যে-কোনো জায়গা থেকেই ওই গাঢ় উজ্জ্বল চোখ দুটো চিনতে মোটেই অসুবিধা হয় না। ওই অনিবার্য চোখ দুটোই আজ হাজার হাজার গণতন্ত্র-প্রেমিককে নতুন সংকল্পের আশ্রয়ে ডেকে এনেছে। যথার্থ ই পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানের প্রেরণা এই নাম,—গণতন্ত্রঘাতী আয়ুব-শাসনের বিরোধিতায় দেশব্যাপী জনচেতনার দৃঢ়প্রত্যয়ের ছবি এই ফতিমা জিন্না। এ চেহারা সকলের চেনা। পাকিস্তানের বাস্তবিক জনক ও প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল শ্রীকায়েদ-ই-আজম জিন্নার বিখ্যাতা ভগ্নী তিনি। কায়েদ-ই-আজমের সহধর্মিণী শ্রীমতী রুত্তেন যখন তাঁকে পরিত্যাগ করলেন এবং পরিশেষে যখন ইহলোকের সঙ্গেও সব সম্পর্ক তাঁর চুকে গেল, তখন দুর্ধর্ষ জিন্নার অসহায় হতাশ জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিলেন ভগ্নী ফতিমাই। অহংকারী অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিভাবান রাজনীতিক জিন্নার মনের নিভৃতে যে হাহাকার নিয়তই বাজত, তা একমাত্র তাঁর কানেই পৌঁছেছিল। জিন্না শুধু তাঁর ভাই নন—আদর্শ আরাধ্যও। ব্যাপকতর রাজনীতিতে যেদিন জিন্না চিহ্নিত, প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন, সেদিন থেকেই অবিভক্ত ভারত—বিশেষত পরবর্তীকালের পাকিস্তানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে 'ফতিমা জিন্না' এক বহুউচ্চারিত নাম।

১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম করাচীর এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। দুর্বিনীত অগ্রজের প্রায়শ নিরুৎসাহ মনকে উজ্জীবিত করতে তিনি সব সময় নিজেকে বঞ্চিত করেছেন ব্যক্তিগত আরাম বা বিলাস থেকে। কুমারী রয়েছেন আজও।

তাঁকে বাদ দিয়ে জিন্নার কথা পাকিস্তানের জনসাধারণ কখনও ভাবে নি। তাই '৪৮ সালে জিন্নার লোকান্তরের পর থেকে তাঁরই ভরসাতে পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ জিন্নার ভাবধারাকে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। তিনি জিন্নার রহস্যময় জীবনের একমাত্র ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বাসযোগ্যা ছিলেন।

তিনি নিজেও কম চমকপ্রদা নন। জিন্নার সঙ্গে তিনিও সরকারী সম্বর্ধনায় বিপুলভাবে সম্মানিত হ'য়েছেন, কিন্তু কখনও কোনও সরকারী ক্ষমতালাভের স্পৃহা তাঁর ছিল না। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনধন্যা হ'য়েও রাজনীতির আসরের বাইরে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। (হয়ত হ'বে—সহজলভ্য জিনিসের ওপর তাঁর আসক্তি নেই)। বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করেই ফতিমা আত্মীয়তা স্থাপন করেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। লোকে তাঁকে বলে মাদার-ই-মিল্লাত। তাঁরই নামে লাহোরের লরেন্স উদ্যানের নাম হ'য় বাগ-ই-জিন্না। তাঁরই নাম [illegible] ফতিমা—গোলাপ-বাগের ফুল ফুটছে।

মিস ফতিমার প্রগতিশীল চিন্তাধারা আর গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় করে তুলছে। বস্তুত গণতন্ত্রবিরোধী আয়ুব সরকারের রাজত্বে 'ফতিমা জিন্না' এক অবিসংবাদিত 'ওয়েসিস'। তিনি মোল্লাতন্ত্রকে প্রকাশ্যে ধিক্কার দেন। জঙ্গীবাদী আয়ুবের মিলিটারী শাসনের হুমকিকে পরোয়া বা বরদাস্ত করেন না। পাকিস্তানের নব গণজাগরণ এমনই একজনের নেতৃত্ব কামনা করছিল। ফতিমা তাতে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছেন, সংগ্রামী মন নিয়ে এতদিনে নামছেন রাজনীতিতে। আসছে বছর মার্চে তাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আমরা সমগ্র বিরোধী দলের কাণ্ডারীর ভূমিকায় বর্তমান প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হ'তে দেখব।

তাঁর সাফল্য প্রতিটি গণতন্ত্র-প্রেমিকেরই কাম্য। কিন্তু

ফতিমা জিন্না

রাজনীতির আবহাওয়ার পূর্বাভাস বড় সহজ নয়। আপাতত সে প্রসঙ্গ মুলতুবী রইল। হাতে যথেষ্ট সময় আছে। ঘটনার চাকা এখনও অনেক এগুবে।

সুতরাং সুরুতে যে কথা বলেছি শেষেও তারই পুনরাবৃত্তি করি: ফতিমা জিন্না সত্যিই ইস্পাত। এবং এ ইস্পাতে জং ধরে না। (অন্তত এখনও ধরে নি)। তাই এ ইস্পাত যখন ঝলসে উঠেছে তখন এ কথাও নির্ভাবনায় বলতে পারি যে, পাকিস্তানের মানুষের আত্মচেতনার সূচনা এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় গণতন্ত্রের অভিযাত্রার অংকুর অচিরেই মহীরুহে রূপান্তরিত হবার অব্যর্থ অঙ্গীকার আনবেই আনবে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারে সেই অন্য পক্ষকে বলতেই হোলো কিছু। সেই অন্য পক্ষও আমিই,—আমারই আর-এক দিক,—সেও আমার নিজেরই মন।

বললুম : 'বড়ো বেশি মৃত্যুর কথা বলছেন আপনি।'

তিনি বললেন : 'মৃত্যু যে পদে, পদে। দেশ-দেশান্তরে মৃত্যুই তো জীবনের ধ্রুব পরিণতি।'

বললুম : 'তা হোক্,- - -তবু চলতে চলতে ফুরিয়ে যাবার ভাবনা এতো বেশি আসছে কেন? পৃথিবীতে কতো পাহাড়, প্রান্তর,—কতো নদী, সমুদ্র। কতো ফিরে ফিরে জীবনেরই জয়গান গাওয়া।'

মন বললে : 'হয়তো কেউ কেউ পাহাড়ের সামনে চুপ করতে ভালোবাসে,—সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে নারাজ হতে পারে কেউ কেউ। হয়তো মৃত্যু সেই পাহাড়, সেই সমুদ্রই হয়তো।'

অন্ধকারে সেই স্বগত সংলাপের মধ্যেই দেখা দিল একটি জাপানী-কবিতার কয়েক ছত্র অনুবাদ।

কবির নাম কাতো শুসন। তাঁর জন্ম ১৯০৫এ।

যুদ্ধকালের জাপানে এক নৈশ বিমান-আক্রমণের ভূমিকা তার সঙ্গে জড়িত। সেই জাপানের কবি কাতো শুসন জানিয়েছেন—গভীর রাত্রে প্রচণ্ড এক বিমান-আক্রমণ হয়ে গেল। আমার অসুস্থ ভাইকে পিঠে নিয়ে আগুনের মধ্য দিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমি আমাদের ছেলেমেয়েদের খুঁজতে লাগলুম।

তারপর এই কয়েক ছত্র কবিতা—

অগ্নিশিখার গভীরে
আমি দেখলুম
পিওনি ফুল কী ভাবে টুকরো টুকরো
হয়ে শেষ হয়।
শীতের ঠাণ্ডা ঝড়
পোড়া মাটির একান্তে নিরাপদ এক দরজা
বাতাসে ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্ করে।

শীতের সমুদ্রপাখি—
জীবিত অবস্থায় সে নিরাশ্রয়।
মরলে তার কবর জোটে না।

জীবন আর মৃত্যু,—এই দু'তরফের পক্ষ-প্রতিপক্ষের সামনে আমাদের এই বিশ-শতকের দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্ধকার যেন আর একবার ঘনিয়ে এলো।

আমি বললুম : 'থাক্ থাক্। বরং টমাস হার্ডির কথাই হোক্। আমাদের শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বোধ হয় সত্যিই তাঁর মনের মিল ছিল- - -?'

তিনি বললেন : 'মিল তো সকলের সঙ্গেই সকলের। যে দেখতে চায়, তারই চোখে পড়ে।'

বললুম : 'তাই কি? কীট্‌সের সঙ্গে নজরুল ইসলামের মিল আছে,—কাফ্‌কার সঙ্গে বিভূতি বাঁড়ুজ্যের?'

তিনি বললেন : 'আপনি রাগ করে বিমুখ হচ্ছেন। আমি কি তাই বলেছি? শরৎচন্দ্রই বলুন, বিভূতিভূষণই বলুন টমাস হার্ডির সঙ্গে,—ইচ্ছে করলে এঁদের দুজনেরই মিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও কি হার্ডির কোনো কোনো মুহূর্তের মিল ছিল না?'

আমি বললুম : 'কী রকম?'

তিনি বললেন—'শুনুন তবে'—

এই বলে তিনি আমাকে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের কথা ভাবতে বললেন।

আমি তাঁর কথা ঠিক ধরতে পারি নি প্রথমে। টমাস হার্ডির সঙ্গে আমাদের এই বিশ-শতকের ষাটের দশকের সম্পর্কই বা কী? পরিস্থিতিটি জটিল বলে মনে হোলো।

তিনি বললেন : 'রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' মনে আছে তো? তারই পাশে রেখে অনুভব করুন টমাস হার্ডিকে। হার্ডির সে-কবিতার নাম '১৯৬৭'। ১৬ নম্বর ওয়েস্টবোর্ন পার্ক ভিলা থেকে ১৮৬৭তে হার্ডি তাঁর সে-লেখাটি উপহার দিয়ে গেছেন ১৯৬৭র পাঠক-পাঠিকাকে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছ-সাত বছরের বেশি ছিল না।'

কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ তো আমারই আর-এক মন। সমস্ত কবিতাটি তিনি যে তাঁর অন্য পক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মনে রেখেছেন, সে তো হতেই পারে না। অতএব কোনো স্মৃতির ওপর নির্ভরের কথা নয়,—আলো জ্বাললুম আবার। টমাস হার্ডির সেই '১৯৬৭' কবিতাটি দেখলুম।

তাতে হার্ডি বলে গেছেন—'আর পাঁচ-কুড়ি বসন্তের পরেই দেখা যাবে—সবাই নতুন। সব নতুন চোখ, নতুন মন, নতুন ভঙ্গি। জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরাও নতুন,—নির্বোধ যারা, তারাও নতুন। তখন নতুন দুঃখের জন্যে কান্না, নতুন সুখের জন্যে কামনা।

বলেছেন—'সেই জীবিত আগামী শতাব্দের প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তোমার-আমার কোন্ চিহ্ন থাকবে বলো,—দু-এক চিম্‌টি ধুলো ছাড়া আমাদের আর কোন্ চিহ্ন বলো?'

তিনটি ছত্রের এক-একটি স্তবক এই কবিতার। মোট চার স্তবকের প্রথম দুটি স্তবকের বক্তব্য এইটুকু। রবীন্দ্রনাথের 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' সত্যিই অন্য মন, অন্য কণ্ঠস্বর! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই লেখাতে কালের গতির কথা বলেছিলেন বটে, অন্য কালের কবির জন্যে কৌতূহল ছিল তাতে। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের '১৪০০ সাল' আর টমাস হার্ডির '১৯৬৭'.—এ দুয়ের মিলের ভাবনা গভীর নয়! কারণ, হার্ডি দূরের ভবিষ্যৎ থেকে তাঁর কাছের বর্তমানে ফিরে গিয়েছিলেন খুবই তাড়াতাড়ি। শেষ দুটি স্তবকে বলেছিলেন—

A century which if not sublime
Will show I doubt not at its prime
A scope above this blinkered time

—Yet what to me how far above
For I would only ask therof
That thy worm should be my
worm, love.

তোমার আমার দেহাবসানের কীট এক হয়ে যাক্—মিলুক, মিলুক, মিলুক সব।

দেশে দেশে লেখকদের মন এই-ভাবে মৃত্যুর কথা বার বার ভেবেছে। ভেবেছে, বলেছে,—'হায় হায়' করেছে। তবু আবার জীবনের দিকেই চোখ তুলে দাঁড়িয়েছে।

এই মৃত্যু-ভাবনা আর জীবন-ভাবনাই তো বিশ্বসাহিত্য। নানাকালের নানা ভাষায় সে-সাহিত্য লেখা হয়েছে। আর, যোগ্য অনুবাদই সেই দেশ-দেশান্তরের পথ।

সেদিন ঘরে বসে আলো জেলে, —নিজের সঙ্গে নিজের বন্ধু থেমে যাবার পরে তাই আমার অনুবাদের কথা মনে এলো।

ইউরোপে শোনা যায়, গ্রীক ক্রীতদাস লিভিয়াস অ্যাণ্ড্রোনিকাস ছিলেন প্রথম অনুবাদক। খ্রীস্টজন্মের দু'শ চল্লিশ বছর আগে ল্যাটিন ভাষায় হোমারের 'অডিসি' অনুবাদ করেন তিনি। কেউ কেউ বলেছেন যে, হয়তো সত্যিই তিনি কোনো অনুবাদ করেন নি। কিন্তু অনুবাদের আদি-প্রয়াসীদের মধ্যে তিনি যে একজন, তাও মেনেছেন তাঁরা। শোনা যায়, হোরেস জানতেন এই লিভিয়াস অ্যাণ্ড্রোনিকাসের সে-প্রয়াসের খবর।

আদিকালে ল্যাটিন ভাষায় যাঁরা সাহিত্যচর্চা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে ইউরিপিডিস-এর আদি অনুবাদক হিসেবে নিভিয়াস আর এন্নিয়াসের (Neavius ও Ennius) নাম শোনা যায়। শোনা যায়, রোমে হেক্সামিটার পদ্যরীতি তাঁরাই আমদানি করেন। কিকেরো এবং ক্যাটাল্লাসও (Cicero ও Catullus) ছিলেন অনুবাদচর্চায় আগ্রহী।

খ্রীস্টাব্দের অষ্টম-নবম শতকে আরবদেশে গ্রীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুবাদ খুবই ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়। সিরিয়ার পণ্ডিতরা তাঁদের অনুবাদকর্মের মধ্য দিয়ে সেই গ্রীক পাণ্ডিত্য ছড়িয়ে দেন। তাঁরাই নাকি বাগদাদে গিয়ে অ্যারিস্টটল, প্লেটো, গ্যালেন, হিপোক্রেটিস ইত্যাদি মনীষীর রচনা অনুবাদ করেন আরবী ভাষায়। আরব-দেশের অনুবাদ-আগ্রহীর দল তাতে খুবই উৎসাহিত হন।

তারপর আরব থেকে অনুবাদের তীর্থ সরে যায় স্পেনে,—বাগদাদ থেকে টোলেডো-তে। সেখানে আরবী অনুবাদ-গুলি আবার ল্যাটিনে অনূদিত হতে থাকে। ঠিক টোলেডো-র সেই অনুবাদ-গৌরবের উদাহরণ না-হলেও, সেই পর্বেরই,—অর্থাৎ বাগদাদের মহিমার প্রায় তিনশ বছর পরের অনুবাদ—Liber gestorum Barlaa met Josaphat-এর খ্যাতি আছে। সে-লেখার মূল ছিল গ্রীক ভাষায় লেখা বুদ্ধের একখানি জীবনী—যা খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের পঠনীয় খ্রীস্টকথার রীতিতে রচিত। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় তার প্রচলন ছিল, পাঠকও ছিলেন অজস্র। শোনা যায়, ল্যাটিন-গির্জার যাজকরা সেই বারলাম আর জোসফেট-কে সাধু সন্ত বলে মেনেও নিয়েছিলেন।

খ্রীস্টাব্দের দ্বাদশ শতকে অনুবাদের উচ্চ গৌরবের দিন গেছে। সেমেটিক ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের অনুবাদ করেছেন উইক্লিফ; তারপর টিণ্ডেল এবং কভার-ডেলের বাইবেল অনুবাদ দেখা দিয়েছে। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেছেন মার্টিন লুথার। লুথারের জন্ম হয় ১৪৮৩তে. মৃত্যু ১৫৪৬এ। মার্টিন লুথারের অনুবাদ খুবই চমৎকার, আগেকার অনুবাদগুলির সঙ্গে তার তুলনা চলে না। সেই ষোড়শ শতকের শেষ দিকে,—মার্টিন লুথারের মৃত্যুর প্রায় তের বছর পরে ১৫৫৯এ অক্সার-এর (Auxerre) বিশপ আমিয়ট (Jacques Amyot) প্লুটার্কের অনুবাদ রেখে গেছেন—Lives of Famous Greeks and Romans; ১৫৭৯তে সার টমাস নর্থ সেই উৎসেই ঋণী হয়ে তাঁর অনুবাদ রচনা করেন এবং শেক্সপীয়রের করায়োলেনস, জুলিয়াস সীজার, অ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা শোনা যায় নাকি সেইসব অনুবাদের প্রেরণাসূত্রেই লেখা হয়।

সেই ষোড়শ শতকের শেষ দিকে, সপ্তদশের প্রথমে, বেরিয়েছিল জর্জ চ্যাপম্যানের হোমার। জন ফ্লোরিওর মতাঁর (Montagne) প্রবন্ধ-মালার অনুবাদ বেরোয় সেই সময়ে—১৬০৩এ। শোনা যায়, শেক্সপীয়রের টেম্পেস্টে সেই অনুবাদের কিছু কিছু ছায়া আছে, প্রতিধ্বনি আছে। শোনা যায় ইংরেজি সাহিত্যে সাহিত্য-প্রকার হিসেবে প্রবন্ধের চল শুরু হয় সেই তখন থেকেই। সেইসব অনুবাদের কাছাকাছি আর একটি প্রসিদ্ধ অনুবাদ হোলো টমাস শেলটনের ডন কুইকসটের অনুবাদ। ১৬১২তে বেরোয় সে-লেখা। আবার, টমাস নিকলস অনুবাদ করেন থুকিদিদিসের গ্রীক ইতিহাস। ফিলেমন হল্যাণ্ড অনুবাদ করেন জেনোফন, লিভি, প্লিনি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রাচীনদের রচনা।

সপ্তদশ শতকের শেষ দশকে বেরিয়েছে ড্রাইডেনের জুভেনাল আর ভার্জিলের অনুবাদ। আঠারোর শতকে পোপ আর কুপারের অনুবাদ প্রসিদ্ধ। ১৭১৫ থেকে ১৭২০র মধ্যে পোপের 'ইলিয়াড'-এর ইংরেজি অনুবাদ বেরোয়, —১৭২৫-২৬এ 'অডিসির' অনুবাদ। উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ ইংরেজ অনুবাদকদের মধ্যে কার্লাইলের নাম

সকলেরই মনে পড়বে। সেই সঙ্গে এডওয়ার্ড ফিট্জেরাল্ডকেও। ১৮২৪এ কার্লাইলের গ্যেটের 'Wilhelm Meister'-এর অনুবাদ ছাপা হয়, ১৮৫৪তে ফিট্জেরাল্ড স্পেনের নাট্যকার ক্যালডেরনের ছ'টি নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদ-এর তারিখ তার পাঁচ বছর পরে—১৮৫৯এ।

কবিদের মধ্যে শেলী, বায়রন প্রভৃতি কয়েকজন কিছু কিছু অনুবাদ রেখে গেছেন। আর, হোমর অনুবাদ সম্পর্কে ম্যাথু আর্নল্ডের প্রসিদ্ধ একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল ১৮৬১তে। তাতে অনুবাদের আদর্শের কথা ছিল। কবিতার অনুবাদে কবিত্ব থাকা চাই—এ তাঁরই মত। কেউ কেউ বলেছেন যে কবিতা অনুবাদের আদর্শ বা রীতির বিশ্লেষণে তাঁর মতন নৈপুণ্য নেই আর কোনো লেখকের আর কোনো রচনায়। মূল কবিতার আবেদন বজায় রাখতে হবে অনুবাদে—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কার্ডিন্যাল নিউম্যানের ভাই অধ্যাপক এফ, ডব্লিউ নিউম্যানের এক হোমর-অনুবাদের সমালোচনা করে গেছেন ম্যাথু আর্নল্ড। দুজনের মতামত ছিল পরস্পরের বিপরীতমুখী। অনুবাদের যে-আদর্শে ম্যাথু আর্নল্ডের বিশ্বাস, নিউম্যান ছিলেন তার উল্টো মতের পথিক। তাঁরা মেনেন নি কিছুতেই। কিন্তু সে-ধরনের আলোচনা নিতান্তই পণ্ডিতদের এলাকায় পড়ে। সাহিত্য আস্বাদনের আসল শর্তের মূল অন্যত্র,—একেবারে অন্য ক্ষেত্রে, অন্য বিশ্বাসে, অন্য ধারণায়।

অনুবাদ-চর্চার পরিশ্রমের দিকটা মানতেই হবে; কিন্তু শুধু পরিশ্রমে কাজ হবে না। চাই অনুভূতির অনুবাদ। ম্যাথু আর্নল্ড সেই কথাই বলে গেছেন। শুধু তথ্যের ফিরিস্তি নয়, শুধু বস্তুর তালিকা নয়।

এইসব চিন্তার স্রোত থেকে আবার আমার মন সরে এসে অন্য তীরে উঠতে চাইলো। আমি আবার সেই জাপানী কবিতার ছত্রগুলি অনুভব করলুম। দুরন্ত বিমান-আক্রমণে পিওনি-ফুলগুলি যেন অগ্নিশিখায় কুঁকড়ে পুড়ছে ছাই হয়ে যাচ্ছে দেখতে পেলুম। (ক্রমশঃ)

ইংরেজী পাঠ

(পাস্টেরনাকের 'English Lesson' কবিতার অনুবাদ)

নচিকেতা ভরদ্বাজ

যখন ডেসডিমোনা গান গেয়ে গান গেয়ে আহা
মরে পড়ল,—কত স্বল্প সময় জীবন
পেল এই পৃথিবীতে,—প্রেমের সম্পর্কে সুরাহা
হল না, তার ভাগ্য—নীল কান্নারা তখন
বাসন্তী ব্যথায় যেন মঞ্জরিত হয়ে—ফিরে এল.
উইলোকে নিয়ে তবু সব যেন উইলো গাছের
অন্তর্জালা। সঙ্গীতে উচ্চকিত ডেসডিমোনা যখন প্রভাতে
সত্যি বিদীর্ণ তার কণ্ঠস্বর পূর্ব ফিরে পেল,
যখন সে নিবেদিত কৃষ্ণবর্ণ করুণ দিনের
বেদীতে, এবং ঘোর মসীময় দানবের হাতে,—
কান্নার নদীর স্রোতে স্তোত্র হয়ে গেল।

এবং যখন ক্লান্ত ওফেলিয়া গান গেয়ে গেয়ে
সমর্পিত কতটুকু পেল এই মুহূর্তের—জীবন-প্রহরে
এবং এ জীবন তার চেতনার নগ্ন ধূসরতা
নিয়ে গেল ভাসিয়ে, উড়িয়ে
খড়ের গুচ্ছের মত—খড়ের গাদার থেকে প্রমত্ত ঝড়ে।

এবং যখন ক্লান্ত ওফেলিয়া গান গেয়ে গান গেয়ে করুণ আর্ত
স্বপ্নের তিক্ততা তাকে অতটা ক্ষুব্ধ উত্তেজিত
করেছিল: এবং কী জয়চিহ্ন নিয়ে কোন বিজয়ী প্রাণের
স্মৃতি নিয়ে ডুবল সে। একগুচ্ছ উইলো শাখা এবং বটের।

তাদের বাসনা সব ফেলে দিয়ে কাঁধ থেকে যেন উন্মোচিত
ছিন্ন কন্থা, নিমগ্ন হৃদয় নিয়ে তারা চলে গেল
বিশ্বের বিশাল হ্রদে অন্ধকারে নীল স্তব্ধতার
অন্তরালে এবং তাদের মুগ্ধ জাগতিক প্রেম-প্রতিমার
ধীরে ধীরে বিসর্জন হল ॥

ছায়াচক্রে

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী

উড়ে যায় কাক—;
গম্ভীর আবহাওয়ায় নিষ্কম্প বকুলের শাখায়
একদিন বুনেছিল বাসা। আকাশের নিভৃতে তার
ছিল ছুটির প্রবাস।

মৌসুমি বাতাসের পরিসিক্ত ঘ্রাণ
অবাক ঐশ্বর্যময়; ঊর্ধ্বমুখী ঘাসে ঘাসে
ভিজা ভিজা অনুভূতি; যেখানে বাদলী পোকা
রেখে যায় পাখা—, কাক সেখানেই পেয়েছে আহার।

ছুটিরও প্রয়োজন;
প্রতিদিন একটানা অফিস ও ঘর
আর কত ভাল লাগে, সূর্যমুখী নুয়ে গেছে
মাটির ঈপ্সায়;

এখানেতে ছায়াচক্রে বিষণ্ন আকাশ,
দিনের ফেনিল সূর্য অশ্বত্থের শিরে
রেখে যায় আশীর্বাদ। সূর্যেরও ছুটি।

উড়ে যাক কাক,
ব্যাকুল গোধূলি গন্ধে নির্মম অভীপ্সা
কখনো সম্পূর্ণ হয় গোপন কালে।

ছুটির প্রয়োজনও ফুরিয়ে গিয়েছে
যখন আকাশে ঝরে সূর্যের উত্তাপ,
এবং উড়েছে কাক ॥

● কায়রো যাত্রার প্রাক্কালে পালাম বিমান বন্দরে সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবসহ প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী।

রাজধানী :

শরতের স্মিতহাসিতে নয়াদিল্লী এখন উদ্ভাসিত। সংসদের অধিবেশনও শেষ হয়েছে। সদস্যরা এখন ঘরমুখো। অনেকেই এর মধ্যে দিল্লী ত্যাগ করেছেন। বাকী যাঁরা আছেন তাঁরাও দশহরার কাছাকাছি ফিরে যাবেন যে-যাঁর ঘরে।

শারদীয় উৎসবের আয়োজনও সমাপ্তপ্রায়। বাঙালী পাড়ায় এর মধ্যেই বেজে উঠেছে উৎসবের কাঁসর-ঘণ্টা। রামলীলা ময়দানের উদ্যোগ-পর্বও শেষ হয়ে এলো। রাক্ষসরাজ দশানন বধের মহড়া চলেছে সেখানে। দিল্লীর আকাশে-বাতাসে এখন চলেছে শারদলক্ষ্মীর আগমনী গান।

২রা অক্টোবর আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পালন করেছি জাতির জনক মহামানব মহাত্মা গান্ধীর পুণ্য জন্ম-দিবস। শারদ ঋতু আমাদের এই দিনটিতে দিয়েছিলেন দু'জন পুরুষকে উপহার। একজন জাতীয় জীবনের স্রষ্টা; আর একজন তাঁর উত্তর-সাধক---ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী শরতের নির্মল, স্নিগ্ধ-সহাস্য প্রভার মতই ব্যক্তিত্ব, শুভ্র সমুজ্জ্বল।

গান্ধীজী অসাধারণ পুরুষ। শুধু ভারত নয়, বিশ্বের কাছেও তিনি পরম বিস্ময়। তাঁর একটি অঙ্গুলীহেলনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরেছিল। কিন্তু সে ব্যক্তিত্বে ছিল না উগ্রতা ও উন্মত্ততা, ছিল না কোন ছলনার মারপ্যাচ। শরতের শুচিশুভ্র, স্বচ্ছ পরিবেশের মতই মহাত্মার উজ্জ্বল আত্মিকশক্তি ও বিশুদ্ধ চরিত্র আকর্ষণ করেছে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে প্রতি মানুষকে। তাই তিনি এত মহান।

এই জন্যই রাজদরবার থেকে সুরু করে ভাঙ্গী কলোনীর মূক মানুষটি পর্যন্ত তাঁর জয়গানে মুখর হয়ে উঠেছিল। আজকের দুর্দিনে, কালোবাজারের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সাধারণ দরিদ্র মানুষ তাদের মুক্তিদাতা মহাপুরুষকে আরও বেশি করে স্মরণ করছে। কাজেই গান্ধীঘাটে, ভারতের বিভিন্ন অংশের প্রধান শহরগুলোতে ঘটা করে রামধুন গেয়ে, শাস্ত্র পাঠ করে, চরকায় সুতো কেটে, পুজার ঘটে ফুল-বেলপাতা দেওয়ার মত নমঃ নমঃ করে বাহ্যিক ঠাট বজায় রাখলেই-মহামানবের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন সুসম্পন্ন হতে পারে না। এ-কথাটা স্মরণ করবার সময় এসেছে।

মহাত্মার উত্তরসাধক শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীও অজাতশত্রু। তিনি একেবারে মাটির কাছের মানুষ। তাই সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর এত মমত্ব। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর দারিদ্র্য ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান ঘোষণা করেছেন। গ্রামসেবকদের জীপ-গাড়ি ত্যাগ করে মাটিতে পা ফেলে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে বলেছেন মাটির মানুষের অতি কাছে। বড় বড় পরিকল্পনার পরিবর্তে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাবার পরি-কল্পনার রূপায়ণে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। চার মাসের মধ্যেই শারদ-শশীর পরিচ্ছন্ন হাসিতে তিনি সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করেছেন অনেকখানি। তারাও শাস্ত্রীজীর জন্মদিনে জানিয়েছে তাঁকে হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত অভিনন্দন।

• • •

উত্তরপ্রদেশের আইনসভা ও হাইকোর্টের ক্ষমতার এক্তিয়ারের

বিরোধ সম্পর্কে যে-রায় সুপ্রীম কোর্ট দিয়েছেন, তা নিয়ে নয়াদিল্লীতে ক'দিন আলোচনাটা বেশ জমে উঠেছিল। এই ঐতিহাসিক রায় সংসদেও গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এ রায়ের পর

● শ্রীঅশোককুমার সেন

আইনসভার অধিকারের ভাঙন প্রতিরোধের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন পর্যন্ত উঠেছে। আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন সংসদে বলেছেন, আইনের খুঁটিনাটি প্রশ্নটি বাদ দিলেও সুপ্রীম কোর্টের রায়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে সংসদের অধিকারের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ভাঙন ধরবে। এই ক্ষয় কতটা পূরণ করা যেতে পারে, তা সংসদকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

স্পীকার শ্রীহুকুম সিং বলেছেন, আইনসভার অবমাননার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের দণ্ড দেবার অধিকার হারালে সংসদের কর্তৃত্ব ও সংহতির সমাধি ঘটবে।

আইনমন্ত্রী ঠিকই মন্তব্য করেছেন। সুপ্রীম কোর্টের এ রায়ের প্রতিক্রিয়া হবে সুদূরপ্রসারী। কেবল ভারত নয়, বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছেও এর গুরুত্ব কম হবে না। কাজেই এর গুরুত্ব সমধিক। সেদিকে নজর রেখেও বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতকে এবিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রধান বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্র গাদকর, বিচারপতি সুব্বারাও, বিচারপতি ওয়াঞ্চু, বিচারপতি হিদায়েতুল্লা, বিচারপতি শাহ, বিচারপতি আয়েঙ্গার এবং বিচারপতি সরকারকে নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চ সংবিধানগত মৌলিক প্রশ্নের বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টের অধিকার ভারতীয় সংসদ পেতে পারে না। সেখানে কোন সাংবিধানিক নির্দেশ ভারতের মত নেই। ভারতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব অনস্বীকার্য হলেও সংবিধানকে অতিক্রম করার অধিকার তার নেই।

বিচারপতি সরকার ভিন্নমত প্রকাশ করে বলেছেন, আইনসভার অধিকার ভঙ্গ করার জন্য স্পীকার কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে তার ওপর হস্তক্ষেপের অধিকার হাইকোর্টের নেই। কিন্তু অপর বিচারপতিগণ এ বিষয়ে একমত

● শ্রীহুকুম সিং

হয়েছেন যে, উত্তরপ্রদেশের বিধান-সভার স্পীকার শ্রীকেশব সিংকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়ে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেবার আদেশ দিয়ে লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় আইনসভার অধিকারের কোন অবমাননা করেন নি। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চও বিধানসভার

● শ্রীগজেন্দ্র গাদকর

নির্দেশ কার্যকরী না করার আদেশ স্পীকারের ওপর জারী করে বিচার-সভার ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই করেন নি।

আইনের কচকচি ও তার চুলচেরা বিচার আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের কাজ। সাধারণ মানুষের মনে এ নিয়ে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে তা বিচার করলে দেখা যাবে, সুপ্রীম কোর্টের রায়কে তারা কিছুটা মেনেই নিয়েছে। আইনমন্ত্রীর ক'মাস আগের মন্তব্য দিয়েই তারা বিষয়টি বিবেচনা করছে। সরকারের তিনটি বাহু—বিচারসভা, আইনসভা এবং শাসনযন্ত্রের ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগের একটা সীমা থাকা আবশ্যক। আইন-সভার সার্বভৌমত্ব অনস্বীকার্য। সেখানে কোনদিন স্বৈরাচার প্রবেশ করবে না, এ কথা কেউ হলপ করে বলতে পারেন না। সেক্ষেত্রে মানুষ তার সংবিধানগত মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য সুবিচারের

আবেদন কোথায় করবে? আইনসভায় প্রণীত আইনের বিচার-বিশ্লেষণ করার অধিকার রয়েছে আইনসভার। বিচারসভায় বিচারাধীন কোন মামলার কোনরূপ সমালোচনা না করার রীতিও স্বীকৃত হয়েছে আইনসভায়। কাজেই সর্বকালে সকল সময়ে যে-কোন অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচারের আশা সাধারণ মানুষ বিচারসভার কাছেই করে আসছে। সে আশা যাতে ধূলিসাৎ না হয়, সেদিকেও সাধারণ মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নজর রাখা অবশ্যক হবে।

* * *

রাজধানীতে রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্রে বর্তমানে কাশ্মীর আর কেরালা আসর মাতিয়ে রেখেছে। কেরালায় আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি কংগ্রেস-বিরোধী নির্বাচনী ঐক্যে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দলের মধ্যে যে কিছুটা মতানৈক্য আছে তা সম্প্রতি দলের চেয়ারম্যান শ্রী এস এম যোশীর বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযোশী বলেছেন : নির্বাচনে সম্মিলিত মোর্চা গঠনের অর্থ পরস্পর যুক্তভাবে দায়িত্ব গ্রহণ। কিন্তু সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি কেরালার ব্যাপারে যে পথ নিয়েছে, তা সম্মিলিত মোর্চা

শ্রী এস্ এম যোশী

বা ফ্রণ্ট গঠন নয়, কেবলমাত্র নির্বাচনের খাতিরে কিছুটা বোঝাপড়া। যোশীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল চূড়ান্ত দক্ষিণ ও চূড়ান্ত বামের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়া বা আপোষ না করার জন্য দলের যে সিদ্ধান্ত ছিল, তা থেকে তাঁরা কিছুটা সরে এলেন কি না। জবাবে শ্রীযোশী পরিষ্কার জানিয়েছেন—না। এটা সাময়িক বোঝাপড়া মাত্র। একে বলা যেতে পারে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য 'কৌশল'।

কাশ্মীর :

কাশ্মীরের ব্যাপার যে কত ঘোরালো হয়ে উঠেছিল, সম্প্রতি তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীত্রিলোচন দত্তের বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সাদিক-মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। একদিকে তিনি অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য ভোট সংগ্রহ করছিলেন। এবং ভোট সংগ্রহের ব্যাপারে ও সাদিকের বিরুদ্ধে জোট পাকাবার জন্য কোনরূপ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণে তিনি দ্বিধা করেন নি। আর একদিকে দিল্লীতে তাঁর ভাই বক্সী আবদুল রসিদও অন্যান্য অনুগতদের পাঠিয়ে রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রবর্তন করার পক্ষে চেষ্টা করেছিলেন। এমন কথাও শোনা গেছে, বক্সীর এই চক্রান্তে জনৈক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কিছু হাত ছিল। তিনি নাকি বক্সী গোলামের সমর্থনে যেন কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন। বক্সী গোলামের অনুগতরা প্রচার করছে—বক্সীর বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করতে না পেরে গদী রক্ষার জন্য সাদিক অন্যায়ভাবে বক্সীকে বিনা বিচারে আটক করেছে। সাদিক যে গণতন্ত্রকে ভয় করেন, এ ঘটনা তার প্রমাণ।

কিন্তু কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি পি ধর এই প্রচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছেন। তিনি দিল্লীতে

শ্রী ডি পি ধর

সরকারী ও বে-সরকারী সকল পর্যায়ের লোকের সঙ্গে দেখা করে কাশ্মীরের পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, বক্সী যে কোন উপায়ে, এমন কি জোর করে (ক্যুপ) ক্ষমতা দখলের পথে অগ্রসর হয়েছিল। তার জন্য যারা ভারতবিরোধী, তাদের সঙ্গেও হাত মেলাতে ইতস্তত করে নি। যে শেখ আবদুল্লা তাঁর মন্ত্রিত্বকালে বন্দী ছিল, এবার তিনি সেই শেখের সঙ্গেও আঁতাত করার উদ্দেশ্যে 'মুজাহিদ মঞ্জিল' বাড়িটি ও দলের মুখপত্র 'খিদামত' কাগজটি ছাপাখানাসহ ঘুষ দিতে চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া মন্ত্রিত্ব করার ক'বছরে বক্সী কি করে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন—সেকথা প্রত্যেক কাশ্মীরবাসীর জানা।

এখন বক্সীর সমর্থকরা বলছে, কেরালায় যদি রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রবর্তন করা যায়, কাশ্মীরে যাবে না কেন? কিন্তু দিল্লীতে এ ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হয় নি। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ দু'জনেই কাশ্মীরে বর্তমানে রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রবর্তনের বিরোধী। তাঁরা মনে করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে শান্তি ও শৃংখলা রয়েছে, এবং ভোটে সাদিক সরকার পরাজিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সাদিক সরকারের কাজে হস্তক্ষেপের কোন প্রশ্ন ওঠে না। তাঁদের মতে সাদিক সরকারের উচিত হবে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করে সাদিক সরকারের শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করা।

পাঞ্জাব :

দাশ-কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঞ্জাবের শাসন-ব্যবস্থায় জঞ্জাল অপসারণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। উদ্দেশ্য : শাসনযন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করে সুস্থ রাজনৈতিক জীবন ফিরিয়ে আনা। এই অভিযানের সাফল্য কতদূর হবে এখন বলা যায় না, তবে সূচনা ভালভাবেই হয়েছে। অনেক নতুন নতুন তথ্য ও দুর্নীতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারী শাসন-যন্ত্রে, বিশেষ করে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, সেচ এবং সমবায় বিভাগে হাত লাগানো হয়েছে। এই অনুসন্ধানকাজে প্রকাশ পেয়েছে অসংখ্য ভুয়া সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা। কায়রোঁর নিজের জেলা অমৃতসরে এমন তিনজন লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা সমবায়ের নাম করে একলক্ষ থেকে দু-লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়েছে, কিন্তু তারপরে আর তাদের পাত্তা মেলে নি। ১৯৬১ সালের দু'টি চুরির ঘটনার পুনঃ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। প্রথমটি কোন পুল তৈরির সময় ১৫০ মণ লোহবার চুরি, দ্বিতীয়টি পি ডবলিউ ডি রেস্ট হাউস থেকে ৩০১ মণ লোহবার চুরির ঘটনা। তদন্তকারী অফিসাররা

শ্রীকায়রোঁ

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, লোহবার-গুলি পাতিয়ালায় আনা হয়েছিল এবং কায়রোঁপুত্র সুরেন্দর সিংয়ের সিনেমা হল, তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। এই মামলা চেপে রাখা হয়েছিল, এখন পুনরায় আরম্ভ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আর একদিকে সরকারী কর্মচারীদের হাজার হাজার চিঠি সরকারী দপ্তরে এসে উপস্থিত হয়েছে। এসব চিঠিতে কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে

● শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র

প্রমোশন, পদাবনতি, বরখাস্ত ইত্যাদির অভিযোগ করা হয়েছে। এস্টাবলিসমেণ্ট বোর্ডকে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার, এমন কি প্রয়োজনবোধে সহকারী সেক্রেটারী পর্যায়ের কর্মচারীদের পর্যন্ত বরখাস্ত করার জন্য বলা হয়েছে। শ্রমদপ্তরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র আগেকার শ্রমদপ্তরকে মালিকদের সহযোগীরূপে অভিযুক্ত করেছেন। মালিকতোষণ নীতির জন্য কায়রোঁর মন্ত্রিসভা শ্রমিকদের কোন দাবি মেটাতে পারে নি।

বর্তমান মন্ত্রিসভার আসল পরীক্ষা হবে পাঞ্জাবের কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে। পাঞ্জাব সারা ভারতের শস্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। এখানে বিদ্যুৎ-কর কমাতে হবে, ১৫ হাজার নলকূপ বসাতে হবে, নলকূপের জন্য ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবস্থা করতে হবে, কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে। সরকারের পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী এই কাজগুলো সম্পূর্ণ করার ওপর মন্ত্রিসভার সাফল্য নির্ভর করছে।

বিহার :

স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের নিয়ে বিহারের কংগ্রেস রাজনীতিতে এক মজার খেলা চলেছে। বিহারের স্বতন্ত্র পার্টির নেতা রাজাবাহাদুর কে এন সিংয়ের নেতৃত্বে ৩৯জন স্বতন্ত্র এম-পি ও এম-এল-এ কংগ্রেসে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে আবেদন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায় এঁদের কংগ্রেসে গ্রহণ করতে রাজী নন। তাঁর বিরোধিতা এত তীব্র যে, তিনি দিল্লীতে গিয়েও ধরাধরি করেছেন, যাতে স্বতন্ত্রদের কংগ্রেসে আসা সম্ভব না হয়। কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টির রাজাবাহাদুর মনে করেন ১০ই অক্টোবরের মধ্যে তাঁরা কংগ্রেসে আসতে পারবেন।

১২ জন স্বতন্ত্র দলের সদস্য ইতিপূর্বে দলত্যাগ করে কংগ্রেসের সদস্য হবার জন্য আবেদন করেছেন। বর্তমানে রাজাবাহাদুরের নেতৃত্বে ৩৯জন কংগ্রেসে আসতে চান। এঁরা যদি কংগ্রেসে আসেন, তবে বিহারে আর স্বতন্ত্র পার্টির অস্তিত্ব থাকবে না; বাস্তবিকপক্ষে স্বতন্ত্র পার্টি কংগ্রেসের মধ্যে মিশে যাবে। ওদিকে সারা ভারত স্বতন্ত্র পার্টি বিহার শাখাকে বাতিল ঘোষণা করেছে নিজেদের মান বাঁচাবার জন্য। রাজা-বাহাদুরের কাজে বোঝা যাচ্ছে, তিনি স্বতন্ত্র দলের শৃংখলা মেনে কাজ করতে রাজী নন, তাঁর আনুগত্য একমাত্র তাঁরই প্রতি, এবং তাঁর অনুচররা নানা কারণে তাঁর মতের বাইরে যাবার সাহস রাখেন না। সারা ভারত স্বতন্ত্র পার্টির পক্ষ থেকে শ্রীমিনু মাসানী এবং শ্রীদয়াভাই প্যাটেল নতুন করে স্বতন্ত্র পার্টি বিহারে করা যায় কি না সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। মুখে তাঁরা আশা প্রকাশ করলেও অবস্থা তাঁদের অনুকূলে নয়, কারণ

● শ্রী কে বি সহায়

বাসানীর সভায় যথেষ্ট লোক আশা করলেও কার্যত উপস্থিত ছিলেন অতি অল্প। তাঁরা একটা এড-হক কমিটী পর্যন্ত গঠন করতে পারেন নি।

স্বতন্ত্র পার্টির সদস্যদের কংগ্রেসে গ্রহণ করতে মুখ্যমন্ত্রী সহায়ের আপত্তি। তিনি বলেছেন, তাঁর এই আপত্তি আদর্শগত। তাঁর মতে স্বতন্ত্ররা সমাজ-তন্ত্রে বিশ্বাসী নন, এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিরোধী। সুতরাং তাঁরা কংগ্রেসে এলে সমাজতান্ত্রিক কাজে বাধা সৃষ্টি হবে। কিন্তু বিহারের কংগ্রেসী এম-এল-এ-রা ভোলেন নি রাজাবাহাদুরের আবেদনের পূর্বে যে ১২জন স্বতন্ত্র পার্টির সদস্য কংগ্রেসে এসেছেন, তাঁদের পক্ষ হয়ে শ্রীসহায় ওকালতি করে-ছিলেন। তখন তাঁর বিরোধীরা যে যুক্তিতে আপত্তি তুলেছিল, আজ তিনি বিরোধীদের সেই একই যুক্তি উচ্চারণ করছেন। তার অবশ্য একটা কারণ আছে। সে সময় ১২জন স্বতন্ত্রকে তিনি নিজের দলে পাবার আশা করেছিলেন। মন্ত্রী-সমর্থক গ্রুপের শক্তি বৃদ্ধির আশায় তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন। সে সময় পণ্ডিত বি এন ঝা ছিলেন তাঁর বিরোধী; তিনি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টকে চিঠি লিখেছিলেন স্বতন্ত্রদের বিরোধিতা করে এবার সেই পণ্ডিত ঝা স্বতন্ত্রদের কংগ্রেসে

● শ্রীমিনু মাসানী

আসতে দেবার জন্য তাঁদের পক্ষে ওকালতি করছেন। সুতরাং শ্রীসহায় অথবা পণ্ডিত ঝা, কেউই আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। সেকথা নেহাৎ ভাঁওতামাত্র। আসল ব্যাপার হয়েছে দু-পক্ষ স্বতন্ত্রদের নিয়ে দলভারী করার মতলব করছে।

কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহল মনে করছে, বিহারের রাজনীতিতে একটা বিরাট ওলট-পালটের সঙ্কেত দেখা যাচ্ছে। স্বতন্ত্ররা সকলেই যদি কংগ্রেসে আসতে পারেন, তবে তাঁরাই একটা শক্তিশালী ব্লকে পরিণত হবেন, এবং কংগ্রেস-রাজনীতির ভারসাম্য রক্ষা ওঁদের হাতে থাকবে।

স্বতন্ত্ররা কেন কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন, এই প্রশ্নের জবাবে রাজাবাহাদুর কে এন সিং বলেছেন, তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন না, কংগ্রেসই তাঁদের গ্রহণ করছে। কারণ কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র পার্টির কার্যসূচী গ্রহণের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তিনি কংগ্রেস আর স্বতন্ত্রের মধ্যে কোন তফাৎ দেখছেন না।

● শ্রী বি এন ঝা

আসাম :

'ভদ্রলোকের এক কথা'র মত সরকার একই কথা বলে চলেছেন—আসাম খাদ্য-শস্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য, এখানকার খাদ্য-পরিস্থিতি সন্তোষজনক। সাধারণ মানুষ বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন পরিচয়ই পাচ্ছে না। তাদের মতে ১৯৫০ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পের পর আসামে খাদ্য-সঙ্কট এত তীব্র আর কোনদিন হয় নি।

আসামের চারটি পার্বত্য জেলা কিন্তু চিরকালই নির্ভর করে আসছে বাইরের আমদানীর ওপর। বাকীটা অবিশ্যি খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নওগাঁ অতিরিক্ত শস্য যা উৎপন্ন করে, তা যায় ঘাটতি অঞ্চলগুলোতে। স্বাধীনতালাভের আগে পার্বত্য জেলাগুলোর চাহিদা পূরণ করতো শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও আংশিকভাবে ব্রহ্মদেশ।

১৯৫০ সালের ভূমিকম্প পাল্টে দিয়েছে আসামের চেহারা। ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-উপশাখা গতিপথের পরিবর্তন ঘটেছে। ব্রহ্মপুত্রের গভীরতা গেছে কমে। সে আগের মত জলভার বহন করতে না পেরে, কূল ছাপিয়ে প্রতি বছর প্লাবিত করে দিচ্ছে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটি বালুময়। তাতে শস্যহানি হচ্ছে বছরের পর বছর। গেল বছর পর্যন্তও ১৯৫০ সালের আগের উৎপাদনের কোঠায়

গিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হয় নি। এ ছাড়া, বিগত দশকে আসামের জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ সত্ত্বেও সম্প্রতি আসামের খাদ্যমন্ত্রী যে পরিসংখ্যান পেশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় দু'লক্ষ ন'হাজার টন অধিক খাদ্য-শস্য আসামে উৎপন্ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকেও আসাম বিপুল পরিমাণ গম ও আটা পেয়েছেন। এ সব সত্য হলে আসামে খাদ্য-শস্যের অভাব হতে পারে না।

আসামের মানুষ আজ দু'বেলা পেটপুরে খেতে পাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলের মানুষের মতে ১৯৫০ সালের পর আসামের বুকে এমন দুর্ভিক্ষের ছায়াপাত আর হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহার নিজের জেলা শিবসাগরের গ্রামাঞ্চলে চাল কদাচিৎ পাওয়া যায়। দাম তার প্রতি মণ চল্লিশ টাকা। দরিদ্রের পক্ষে এ মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। চাষী আজ নিঃস্ব। ধান যা' পেয়েছিল জানুয়ারী মাসে মহাজনের দেনা চুকিয়ে দিতে বেচতে হয়েছে ন'টাকা করে। এখন ধানের দাম আঠারো থেকে বিশ টাকা।

শহরাঞ্চলের অবস্থাও খুব ভাল বলা চলে না। লখিমপুরের বাণিজ্যকেন্দ্র তিনসুকিয়ার মানুষ সম্প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে, চালের সরবরাহের দাবীতে। বিক্ষোভের আগের দু'টো দিন তিনসুকিয়ার বাজারে নাকি এক কণা চালও ছিল না। চালের অভাবের কথাটা সরবরাহদপ্তর অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা অপরাধটা অসাধু ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় লোকের ধারণা—সরবরাহ-দপ্তরের কর্মীরা একেবারে নিরপরাধ নন। চোরাকারবারীদের সঙ্গে এঁদের গোপন আঁতাত রয়েছে। একজন ইন্সপেক্টর সততার পরিচয় দিতে গিয়ে বিপদেও পড়েছিলেন। তিনি চালকলের এক মালিকের গুদামে হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণ চাল আটক করেছিলেন। এ ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তারযোগে শিলং থেকে তাঁর বদলির নির্দেশ আসে।

গোহাইগাঁও, মাছখোয়া, নাকুয়া-খানা প্রভৃতি অঞ্চলের দুরবস্থার কথা সরকারী মুখপাত্ররাও উড়িয়ে দিতে পারছেন না। তাদের মতে বন্যায় পরিবহনের অসুবিধাতে এই সঙ্কট-সৃষ্টি হয়েছে। যে-কারণেই হোক না কেন, এসব এলাকার মানুষের কাছে চাল এখন দুর্লভ সামগ্রী। আটা মেলে কখনও কখনও। দরিদ্র পরিবারের মানুষের প্রধান খাদ্য হয়েছে এখন মেটে আলু (আকুম) এবং মাটি কলাই। মাটি কলাই গরুর খাদ্য। সে খাদ্যই এখন মানুষের সম্বল হয়ে উঠেছে।

গৌহাটি আসামের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। গৌহাটিতে ন্যায্যমূল্যের

● শ্রীচালিহা

দোকানে, সরকারের অনুমোদিত অন্য দোকানে চাল পাওয়া যাচ্ছে। অনুমোদিত দোকান থেকে দু' থেকে পাঁচ কিলো চাল দেওয়া হচ্ছে ৬৬ পয়সা থেকে ৯৮ পয়সা মূল্যে। ৯৮ পয়সার চালও কাঁকর, তুষ এবং কুঁড়ো-মুক্ত নয়। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি গৌহাটির মানুষ দিন-কয়েক চালের মুখদর্শন করতে পারেন নি। বিরাট বিক্ষোভ-মিছিল তখন হয়েছিল গৌহাটিতে। স্থানীয় সংবাদপত্রে কঠোর ভাষায় সমালোচনা হয়েছিল সরকারের সরবরাহ ব্যবস্থার।

সরকারী পরিসংখ্যান মেনে নিতে হলে, সরকারের বণ্টন-ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে সমাজবিরোধী চোরাকারবারীরা।

নতুন ধান বাজারে উঠতে সুরু করেছে। বন্যার জলও শুকিয়ে যাবে দু'দিন পরেই। এবারের মত সঙ্কট হয়তো কেটে যাবে। কিন্তু সরকারের নীতির আমূল পরিবর্তন না হলে, চোরা-কারবারীদের খপ্পরে আবার পড়তে হবে মন্দার বাজার এলেই।

রোমাঞ্চ-রহস্য গ্রন্থ

রক্তনদীর ধারা

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

রক্তনদীর ধারা মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। রোমান্স ও রোমাঞ্চের সত্য ঘটনায় বইটির আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ। রক্তনদীর ধারা জীবনের অভিজ্ঞতা নয়; জীবনপথের দিক-নির্দেশ। তাই প্রবঞ্চনা: ছলনা ও প্রেমের লীলার চাঞ্চল্যকর বইটি চাঞ্চল্য তুলেছে সকল সমাজেই। লোম-হর্ষক সামাজিক কাহিনী।

দাম চার টাকা

বিগতকালের বরেণ্য সাহিত্যস্রষ্টা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

ফোকলা দিগম্বর, পাপের পরিণাম, ডমরুচরিত।

মূল্য এক টাকা

২য় ভাগে—

ভূত না মানুষ, কঙ্কাবতী, মজার গল্প, মুক্তামালা।

মূল্য: দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

আন্তর্জাতিক

• ভেনিজুয়েলার ক্যারাকাস শহরে দ্য গল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

অবশেষে কেনেডি হত্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। গত ২২শে নভেম্বর ডালাসে আততায়ীর হস্তে রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি নিহত হবার পর নতুন রাষ্ট্রপতি লিণ্ডন জনসন এই তদন্ত কমিশন গঠন করেন।

সাতজন সদস্যবিশিষ্ট এই তদন্ত কমিশনের সভাপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেন ৮৮৮ পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ রিপোর্টটি রাষ্ট্রপতি জনসনের নিকট পেশ করেছেন।

তদন্ত কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কেনেডি হত্যার পেছনে কোনরূপ ব্যাপক চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র ছিল না। লি হার্ভে অসওয়াল্ড সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে

ল্যাটিন আমেরিকা :

ফ্রান্সের ৭৩ বৎসর বয়স্ক রাষ্ট্রপতি চার্লস দ্য গল গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তাঁর ল্যাটিন আমেরিকা সফরের প্রথম পর্যায়ে ভেনিজুয়েলার ক্যারাকাস শহরে এসে পৌঁচেছেন। ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি রাউল লিওনি সহ কয়েক সহস্র নরনারী বিমানঘাঁটি ও পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে ফরাসী নেতাকে সম্বর্ধনা জানায়।

দ্য গল ২৭ দিন ধরে দক্ষিণ আমেরিকার ১০টি রাষ্ট্রের ১৫টি শহর সফর করবেন। এই বয়সে এই কষ্টকর সফরের ধকল তিনি কি করে সহ্য করবেন তাই আশ্চর্য হয়ে ভাবতে হয়। তা ছাড়া মাত্র ৫ মাস পূর্বে দ্য গলকে একটি গুরুতর অপারেশন করতে হয়।

এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরেও দ্য গল ল্যাটিন আমেরিকায় দৌড়ে এসেছেন। কারণ, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্সের নিজস্ব প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিকে তিনি বিশেষ উপযোগী বলে মনে করেছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে স্পেন, পর্তুগাল এবং স্প্যানিস-পর্তুগীজ অধ্যুষিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির পুরোন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা দ্য গল নতুন করে তুলে ধরেছেন। ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সব দেশের ছাত্রদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা, বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা, এবং অনুন্নত ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে দ্য গল ল্যাটিন আমেরিকায় এসেছেন। এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব হ্রাস করার জন্যও তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করছেন।

ফ্রান্সের সঙ্গে পুরোন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের জন্য সর্বত্র সাধারণ মানুষ দ্য গলকে স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানিয়েছে। কলম্বিয়ার বোগোটা, ইকুয়েডরের কুইটো ও পেরুর লিমা থেকে দ্য গলের বিপুল সম্বর্ধনার খবর এসেছে।

কিন্তু এ সব দেশের পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব অতিক্রম করা কতটা সম্ভব হবে বলা শক্ত। কলম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি লিওঁ ভ্যালেন্সিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় দ্য গলকে জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রেখে তাঁরা চলবেন।

• লি হার্ভে অসওয়াল্ড

• ওয়ারেন কমিশন জনসনের নিকট তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ করছেন

ইতিমধ্যেই সম্মেলনের প্রস্তুতিকার্য সুরু হয়েছে। ১লা অক্টোবর কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় হলে ৪৪টি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্রারম্ভিক আলাপ-আলোচনা সুরু করেন। ভারতের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। মূল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচনা হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, নিরস্ত্রীকরণ, অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা প্রভৃতি সম্মেলনের আলোচনায় গুরুত্ব লাভ করবে। কঙ্গোর টি শোম্বেকে সম্মেলনে যোগ দিতে দেয়া হবে কিনা, এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তবে কঙ্গো সমস্যা যে সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হবে, এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, বিশেষ করে লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনামের সমস্যাও আলোচনা করতে হবে। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনায় সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান-দরদী কোন কোন রাষ্ট্র কাশ্মীর প্রশ্ন

নিজ খুশিমত কেনেডিকে হত্যা করেছে। জ্যাক রুবি অসওয়াল্ডকে এই হত্যার কাজে সহায়তা করেছে।

অসওয়াল্ড দীর্ঘকাল সোভিয়েট ইউনিয়নে ছিল, এবং তার স্ত্রী একজন রুশ মহিলা। এই কারণে অনেকের ধারণা হয়েছিল, কেনেডি হত্যার পেছনে সোভিয়েট ইউনিয়নের হাত আছে। তদন্ত কমিশন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এই হত্যাকাণ্ডে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনরকম হাত ছিল না।

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে তদন্ত কমিশন তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং এই বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য তাঁরা কয়েকটি সুপারিশ করেছেন।

১০ মাস ধরে তদন্ত কমিশন কাজ করেছেন, এবং প্রায় ৫৫২জন সাক্ষীর সাক্ষ্য তাঁরা গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া এই তদন্ত উপলক্ষে 'ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' প্রায় ২৫,০০০ লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে।

সুতরাং যতটা ব্যাপকভাবে তদন্ত করা সম্ভব, তা করে ওয়ারেন কমিশন তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কমিশনের রিপোর্টের ফলে গুজব ও অনুমানের পরিসমাপ্তি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

৫ই অক্টোবর থেকে কায়রোতে দ্বিতীয় জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথম সম্মেলন বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, যুগোশ্লাভিয়া ও সিংহলের সঙ্গে ভারতও এই জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

• কায়রোর 'কুবে প্রাসাদে' রাষ্ট্রপতি নাসের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

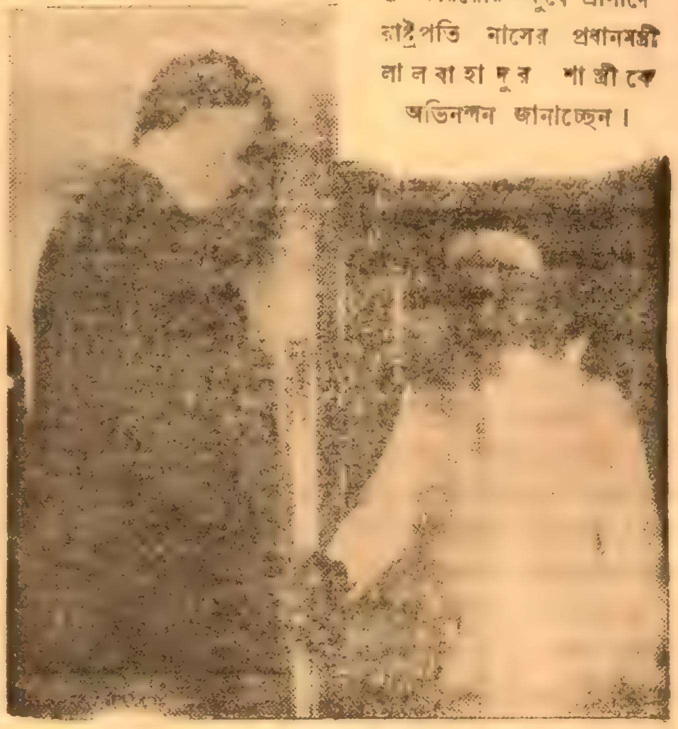

• সিরিমাভো বন্দরনায়ক

তুলতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে। ইন্দোনেশিয়ার পক্ষ থেকে মালয়েশিয়ার কথাও হয়তো তোলা হবে।

কোন আন্তর্জাতিক জোটে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের দ্বারা শান্তি ও মৈত্রীর পথ প্রশস্ত করা যায়, এবং উভয় জোটের মধ্যে প্রয়োজন-বোধে বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সাহায্য করা যায়, এই হল জোটনিরপেক্ষতার মূল কথা। কায়রো জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের ফলে এই নীতি নিশ্চিতভাবে আরও জোরদার হবে।

বেলগ্রেড সম্মেলনে শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, আর এবার কায়রো সম্মেলনে প্রাধান্য লাভ করবে নিরস্ত্রীকরণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্ন।

কায়রো জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারত এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে ভারত সম্মেলনে জোরের সঙ্গে দাবি জানাবে। ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। অসুস্থতার জন্য গত জুলাই মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীশাস্ত্রী যোগ দিতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রিরূপে শ্রীশাস্ত্রী কায়রো সম্মেলনে প্রায় অর্ধশত রাষ্ট্রের প্রধান শাসকের সঙ্গে মিলিত হবেন, এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে পারবেন। নেহরু-উত্তর ভারতের সা´ক কূটনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই কায়রো সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের ওপর শাস্ত্রীজী কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন, তার ওপর নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ কূটনৈতিক মর্যাদা ও ক্ষমতা।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসেরের আমন্ত্রণে সম্মেলনের পূর্বে তিনদিনের জন্য সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সফর করছেন। সর্বত্র শ্রীশাস্ত্রী বিপুল-ভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন। স্বয়ং নাসের বিমানঘাঁটিতে এসে শ্রীশাস্ত্রীকে স্বাগত জানিয়েছেন। জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের পূর্বেই প্রধান প্রধান বিষয়ে নাসের শ্রীশাস্ত্রীর সঙ্গে মতবিনিময় করতে চান। অবশ্য বলা বাহুল্য, প্রায় সব বিষয়েই ভারত ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের মত অভিন্ন। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক ও আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বেন বেলাও নাসেরের আমন্ত্রণে সম্মেলনের পূর্বে কায়রো উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে সম্মেলনপূর্ব যে আলোচনা হবে, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের ওপর তার প্রভাব অনেকখানি পড়বে।

কঙ্গো ঃ

কঙ্গো নিয়ে আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়কগণ রীতিমত সমস্যায় পড়েছেন। লুমুম্বা হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত টি শোম্বেকে কায়রোয় দ্বিতীয় আফ্রিকীয় শীর্ষ-সম্মেলনে যোগ দিতে দেয়া হয় নি। তবে 'আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা' কঙ্গোর ব্যাপারে একটি মীমাংসা করার জন্য কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী জোমো কেনিয়াট্টার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেছে।

গত সপ্তাহে নাইরোবিতে জোমো কেনিয়াট্টার সভাপতিত্বে এই কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কঙ্গোর সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথম প্রয়োজন—কঙ্গো থেকে সকল মার্কিন সৈন্যের অপসারণ। মার্কিন কর্তাদের এই কথা বোঝাবার জন্য জোমো কেনিয়াট্টা কমিশনের পক্ষ থেকে কয়েকজনকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছেন। কেনিয়াট্টার অভিমত, কঙ্গো থেকে সর্বপ্রকার বিদেশী হস্তক্ষেপ তুলে না নেয়া পর্যন্ত সেখানকার কোন সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

এই খবর পেয়ে টি শোম্বে খুবই

• কায়রোয় ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিওর সঙ্গে স্বরণ সিং

• জোমো কেনিয়াট্টা

ছুটে গেছেন। তাঁর বক্তব্য : কেনিয়াট্টা কমিশন চীনা সাহায্যপুষ্ট বিদ্রোহীদের কথা ভুলে গিয়ে কেবল মার্কিন সৈন্যের কথাই বলছেন—এর দ্বারা কমিশন পরোক্ষভাবে বিদ্রোহীদের সমর্থন করছেন। আফ্রিকা ঐক্য সংস্থা বিদ্রোহ দমনে কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে কমিশন গঠন করেছিলেন, কিন্তু কমিশন সে কাজ না করে ঠিক তার বিপরীত কাজ করেছেন। টি শোম্বে কমিশনের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা না করার কথাও বলেছেন।

কেনিয়াট্টা কমিশন কঙ্গোয় মার্কিন হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই কিন্তু এ ব্যাপারে একটি নিষ্পত্তির আগ্রহ দেখাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ওয়াশিংটন থেকে বলা হয়েছে, মার্কিন কর্তারা কেনিয়াট্টা প্রেরিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কঙ্গো পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে রাজী আছেন, তবে এই আলোচনায় কঙ্গো সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে দিতে হবে। কেনিয়াট্টা এতে স্বীকৃত হয়েছেন।

দেখা যাক, ওয়াশিংটন আলোচনার ফলে কঙ্গো সমস্যার কোন সমাধান হয় কিনা।

পাকিস্তান :

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র 'জুলুম বিরোধী দিবস' পালন করা হয়। ঢাকায় ছাত্রদের ওপর পুলিশের নৃশংস আচরণের প্রতিবাদে সব ক'টি বিরোধী দল যুক্তভাবে এই দিবস পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই দিবসে রাজ্যের সর্বত্র হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। স্কুল-কলেজ, হাট-বাজার, অফিস-কাছারী তো বটেই, কারখানা, যানবাহন, সব কিছু ঐদিন বন্ধ ছিল। নারায়ণগঞ্জ এলাকায় কোন কারখানার চাকা ঘোরে নি, খুলনা থেকে কোন জাহাজ ছাড়ে নি, রেলগাড়ি কোথাও চলে নি।

হরতাল শেষে ঢাকায় পল্টন ময়দানে দু'লক্ষ লোকের এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

'জুলুম বিরোধী দিবস' পালন উপলক্ষে চট্টগ্রাম থেকে একটি হাঙ্গামার খবর পাওয়া গেছে। হরতাল সমর্থকদের ওপর আয়ুব সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডারা আক্রমণ করার ফলে ১৬০ জন আহত হয়েছে—তার মধ্যে ২০ জনের অবস্থা গুরুতর। এত চেষ্টা করেও হরতাল বন্ধ করা যায় নি।

পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এই স্বতঃস্ফূর্ত হরতালকে বিরোধী নেতৃবৃন্দ আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে জনতার রায় বলে ঘোষণা করেছেন।

চীন :

চীন কি শীঘ্রই পরমাণু বোমা তৈরি করবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক সম্প্রতি এরূপ সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

কিছুদিন পূর্বে পিকিং-এ চীনের বৈজ্ঞানিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে চীনা বৈজ্ঞানিকরা পরমাণু বোমা প্রস্তুত সম্পর্কে কতদূর অগ্রগতি হয়েছেন, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

চীন-সোভিয়েট মতবিরোধ সুরু হবার প্রথম পর্যায়েই মাও-সে-তুং চীনের বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশ দেন—যত শীঘ্র সম্ভব চীনে পরমাণু বোমা তৈরি করো। এই বোমা হাতে থাকলে ভয় দেখিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব স্থাপন করা যাবে—সোভিয়েট ইউনিয়নকেও হুমকী দেয়া যাবে। এখন শোনা যাচ্ছে, আর বছরখানেকের মধ্যেই চীন এই বোমা তৈরি করে ফেলবে। সিংকিয়াং অঞ্চলে নাকি প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে। পরমাণু বোমা প্রস্তুতের জন্য ইউরেনিয়ামের বিশেষ প্রয়োজন। সিংকিয়াং-এর উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল থেকে ইউরেনিয়াম সংগ্রহের সুবিধার জন্য ইতিমধ্যেই অনেক রাস্তা-ঘাট তৈরি হয়েছে।

লাদাকের উত্তরে আকশাই চীন অঞ্চলেও প্রচুর ইউরেনিয়াম রয়েছে বলে জানা গেছে। কলম্বো শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বারেবারে চাপ দেয়া সত্ত্বেও চীন এই ভারতীয় অঞ্চল থেকে তাদের ঘাঁটি সরাচ্ছে না। তার আসল কারণ হল, চীন এই ইউরেনিয়ামের ওপর দখল ছাড়তে চায় না।

চীন নিরস্ত্রীকরণ সমর্থন করে না। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে পরমাণু বোমার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে আংশিক নিরস্ত্রীকরণের চুক্তি হয়, চীন তার বিরোধিতা করেছে। বর্তমানে সে পরমাণু বোমা প্রস্তুতের জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করে চলেছে। শান্তি নয়, যুদ্ধ। এবং পরমাণু যুদ্ধের মারফৎ মানব-জাতির পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ, এই বোধহয় চীনা কমিউনিস্টদের লক্ষ্য।

• মাও-সে-তুং

এ মাসের বৃটেনে

— জি. এ. জনসন —

পার্লামেন্ট ভাঙার কাল সমাগত, এদিকে রাজনৈতিক প্রচারপত্র ও দলীয় ঘোষণা-পত্রও জনসাধারণের সামনে ক্রমশই ঝরতে আরম্ভ করেছে। নির্বাচন দিনটি এখনও কিন্তু বৃটেনবাসীর কাছে খুব চিন্তা ও আলোচনার আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। নির্বাচকমণ্ডলী আজো সূর্যস্নাত মনোরম গ্রীষ্মের রেশটুকু মন থেকে মুছে ফেলে নি।

ইতিমধ্যেই সার ডগলাস হিউম বৃটেনবাসীদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, আপন দেশ সম্পর্কে গভীর প্রত্যয় নিয়ে উচ্ছল, প্রাণপূর্ণ বৃটেনবাসীরা নবীন কর্মোদ্যমের পথে যেন আগামী দিনের দিকে অগ্রসর হয়। চমকপ্রদ ঘোষণা এবং বিরূপ সমালোচনার দ্বারা তারা যেন বিভ্রান্ত না হয়। মানবিক রাজনীতিই বরণীয় (অবশ্য উদারনৈতিক দলনেতা শ্রী গ্রীমণ্ডের মতে পাকশালার উত্তাপ ও গন্ধের মধ্যে রাজনীতির চেহারা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে)।

সরকারী সাফল্যের বহুতর ঘোষণার প্রতি শ্রী উইলসন ভ্রূকুটি করেছেন। তিনি বর্তমান সরকারের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেন, ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শনের চেয়ে এখন প্রকৃত রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। শ্রী উইলসনের মতে, সরকার বহু সুযোগ সুবিধা (এমন কি কয়েকটি কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্প্রীতি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও) সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারে নি।

সার এলেকের মতে, পার্লামেণ্ট অধিবেশনের সমাপ্তিকাল এবার অনেকটা প্রশান্ত পরিবেশে সার্থকতার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এমনটি বহু রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-বক্তারা হয়ত কল্পনাও করতে পারেন নি।

বিমান-পরিবহন ব্যবস্থা এবং বি-ও-এ-সি'র পূর্বতন চেয়ারম্যানের প্রশ্নে সর্বশেষ উষ্ণতা সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তবুও রাজনীতির ক্ষেত্রে সেই পুরাতন মূল প্রশ্নটি রয়ে গেছে: জাতীয় কর্পোরেশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প লাভের দিকে দৃষ্টি রেখে পরিচালিত হওয়া কি উচিত নয়? রক্ষণশীল দল মনে করে লাভের দিকে দৃষ্টি রাখা ভাল, তবে বি-ও-এ-সির বিমানপোত নির্মাণ শিল্পের ঘটনা ও রেলপথের বিভিন্ন শাখা লাইনের বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনার প্রতি তারা কিছুটা অন্তর্মুখী দৃষ্টি আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রমিকদলের চিন্তা অবশ্যই বিপরীত। যদিও নির্বাচনে জয়লাভ করলেও বিভিন্ন শিল্প জাতীয়-করণ আরো অগ্রসর হবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ কতকগুলো আশু সমস্যা ও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—যথা, গৃহনির্মাণ, বাড়িভাড়া, উন্নয়ন ও বাধ্যতামূলক ক্রয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় করারোপ (এবং করধার্যের প্রশ্নে উদারনৈতিক দলেরও যথেষ্ট বক্তব্য রয়েছে)। এবং সবচেয়ে কঠিনতম প্রশ্ন, জীবনধারণের ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতি।

শ্রমিকেরা ধর্মঘটের অধিকারের প্রশ্নে অত্যন্ত সচেতন। রুক্স বনাম বার্নার্ড মামলা এ ব্যাপারে কিছুটা অস্বস্তির ছায়া বিস্তার করেছে। শ্রমিক সংস্থাগুলো বাহিরের হস্তক্ষেপ দ্বারা পুনর্গঠনের তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে—বর্তমান সরকারের শ্রমিক সংগঠন আইন সম্পর্কে প্রস্তাবিত অনুসন্ধান প্রচেষ্টা নিন্দিত হয়েছে। শ্রমিক সরকার হয়ত এতদূর অগ্রসর হ'তে সাহস করবে না। তবে তারাও বেপরোয়া ধর্মঘটের পক্ষপাতী নয়.

প্রস্তাবিত ডক-শ্রমিক ধর্মঘট সাধারণ নির্বাচনের সময়েই হওয়ার কথা। এবং এর ফলে শ্রমিক দলের নিরপেক্ষ ভোটদাতাদের সহানুভূতিচ্যুত হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। শ্রী উইলসন এবং তাঁর সহকর্মীরা এই ধর্মঘট রোধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বলেই অনুমান করা যাচ্ছে। শ্রমিকরা মনে করছে, সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কাজ করলেও আয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নীতি এবং অধিকতর যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়ার প্রয়োগ-পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অধিক বিশ্রামজনিত বিরক্তি অথবা 'ওভার-টাইম' করা কি শ্রমিকের পক্ষে শুভ হবে?

শ্রী গ্রীমণ্ড অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে, সম্প্রতি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে সংঘবদ্ধভাবে অপরাধ বেড়েই চলেছে এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রয়োজনানুসারে দৃঢ় হ'তে পারছেন না। এ সম্পর্কে অবসরপ্রাপ্ত লণ্ডনের গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান কমাণ্ডার জর্জ হ্যাথরীলের বক্তব্য নিশ্চিত মূল্যবান ও আকর্ষণীয়। কিন্তু শ্রী গ্রীমণ্ডের অর্ধ-উপহাসোচ্ছল অভিযোগের মধ্যেও কিছুটা সত্যতা কাছে বলে মনে হয়। জেলখানা থেকে আসামীর পলায়ন (একজন মেল-ট্রেন দস্যুও এর মধ্যে রয়েছে), জেলের অভ্যন্তরে হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা পুলিশ এবং জেলখানার শৃঙ্খলা সম্পর্কে চিন্তার কারণ হয়েছে। যেন-তেন-প্রকারেণ এবং যত শীঘ্র সম্ভব অর্থবান হওয়ার ঝোঁক ক্রমশই একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বেড়ে চলেছে।

বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্য-কলাপের জন্য অনেকে টেলিভিশনকে দায়ী করছেন। এর কারণ হয়ত দামী টেলিভিশন সেট সংগ্রহ করা, চুরি ও বিক্রয় করার ঝোঁকের জন্যও বটে। কিন্তু নৈতিক অবনমনের জন্য সম্প্রতি

উইলসন ও হিউম

দোষ দেওয়া হয়েছে নোংরা নাটকগুলির ওপর। রয়াল শেক্সপীয়র থিয়েটার এবং অপর একটি থিয়েটার বুকিং এজেন্সীর দুই বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ ধরণের 'হিংসাত্মক নাটকের' সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন।

এদিনে বৃটেনে খেলার মাঠে ক্রিকেট থেকে ফুটবলের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ফুটবলের জন্য অর্থব্যয় করছে। ট্রুম্যান সম্পর্কে সার লিয়োনার্ড হাটন যদিও বলেছেন তিনি মাত্র ৩০০ উইকেট সংগ্রহ করেছেন কারণ 'পীচ' সম্পর্কে তিনি সংশয়াতীত ছিলেন না, তবু বর্তমান খেলার মরশুম মন্দ কাটে নি।

লণ্ডনের স্টক-এক্সচেঞ্জের সাম্প্রতিক এক বিবৃতি লগ্নীকারীদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে। বিবৃতিতে বিভিন্ন ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে তার আয়, ব্যয়, সম্পদ, মূলধন ও দেয় অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে একটি সুসঙ্গত রিপোর্ট বছরে দু'বার অথবা চারবার প্রকাশের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতি-দিনের স্টক এবং শেয়ারের রিপোর্ট প্রকাশের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

কবিতা, তোমাকে

রেবন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

অবাঞ্ছিত বৃত্তিগুলো বেড়ে চলে চক্রবৃদ্ধি হারে
কোথায় শিল্পের ছোঁওয়া কোথায় বা কাম্য পরিণতি।
জীবিকার লোভে লোভে ছুটোছুটি ; অচেনা বাহারে
নিজেকে সজ্জিত রাখা দুর্বিষহ অবার্থ প্রগতি !
দুঃস্বপ্ন প্রতীক্ষা কত ; সাবধানী প্রেমিকা আহারে
যুক্তিহীন অক্ষমতা ! (অম্লান আনন্দে কারো অতি
সাধ্বী সতী পাশে শুয়ে বিগলিত নিরন্ধ্র আঁধারে ;
হৃদয় জয়ের মত্ত নেশায় এ-কেমন দুর্মতি !)

মনে মনে সংক্রমণ ; আনন্দ-প্রতীকে মুগ্ধ মন
স্মৃতির কুলায় নিজে আপন দুঃখের টানে বৃত :
নীরব শব্দের ছবি ; অন্তরঙ্গ হৃদয়ের কোণ
ভ'রে ওঠে ; পরবাসে যন্ত্রণার হয়েছে আনীত।

আশ্চর্য জীবন এই : জীবিকার আশ্চর্য লীলায় ;
স্বাভাবিক মমতায় ভুলেছি কি কবিতা, তোমায় ॥

আবর্তন

অসীম মুখোপাধ্যায়

চিরনতুন শক্তিসঞ্চয়ী সংগ্রামী মন
ফেরে আত্মকেন্দ্রিকে,---ঘোরে আবর্তনে প্রত্যুষে।
শূন্যে মেলে কি মেলে না বস্তু
দেখি যদি হঠাৎ-ই এক বিন্দু
হেস্তনেস্তের চাহনি নিয়ে
এল যৌবন।
মেরামতের জন্যে ঠিকঠাক সব কিছু
অনন্তে বাসা বাঁধার অফুরন্ত আশা !
সেই এক বিন্দু কেন্দ্রাতীত।
এখন স্মৃতি অনুতপ্ত, কেবল হতাশা
কেন্দ্র ঘিরে ঘোরে বারেবারে
সীমিত গম্ভীর তিলক।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সাতাশ ॥

কলকাতায় আসবার সময় হাওড়া স্টেশনে নেমেই চমকে গিয়েছিলেন শর্মিলা। সামনের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট থেকে নামছেন প্রভাকর।

—ডক্টর ভৌমিক—আপনি?

প্রভাকর হাসলেন: পৃথিবী গোলাকার।

কলেজের প্রেসিডেন্টও প্রভাকরকে ভালো করেই চিনতেন। বললেন, কখন উঠলেন, দেখি নি তো?

—মুরিতে। রায়গড় গিয়েছিলুম, ওখানে টেলিগ্রাম পেলুম, একটা জরুরি কনফারেন্স আছে কলকাতায়। আপনারা?

—কতকগুলো পার্চেজের জন্যে। মিসেস রায়চৌধুরীর ডিপার্টমেন্টের অনেক জিনিসপত্র কিনতে হবে, তাই ওঁকেও সঙ্গে করে আনলুম।

—খুব ভালো।—প্রভাকর হাসলেন, স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শর্মিলার দিকে। শর্মিলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

তিনজনে তিন জায়গায় উঠবেন। প্রেসিডেন্ট যাবেন বড়বাজারের একটা হোটেলে, শর্মিলা যাবেন একডালিয়া রোডে বড়মামার বাড়ি, প্রভাকর যাচ্ছেন তাঁর কাকার ওখানে। স্টেশনে প্রভাকরের জন্যে গাড়ি এসেছিল।

প্রভাকর বললেন, বাইরে গিয়ে আবার ট্যাক্সির জন্যে কিউ করবেন কেন? আমার গাড়ি তো খালি, ড্রাইভার ছাড়া কেউ নেই। চলুন, পৌঁছে দিই আপনাদের।

বুড়ো প্রেসিডেন্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন: থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর ভৌমিক—আপ মুঝে বচা দিয়া। কলকাত্তেমে ই ট্যাক্সি বিজনেস—বড়া খতরনাক। এই জন্যেই আমার এখানে আসতে ইচ্ছে করে না।

শর্মিলা তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা সংকোচের আড়াল কিছুতেই যেতে চাইছে না।

প্রভাকর বললেন, কী হল?

—আমি বরং একটা ট্যাক্সি—

—একটি ঘণ্টা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওদিকের শেডের তলায়। কেন মিথ্যে কষ্ট করবেন?

প্রেসিডেন্ট বললেন, ঠিক বাত। ডক্টর ভৌমিক ভি তো বালীগঞ্জ জা রহা হ্যায়। চলিয়ে মিসেস রায়চৌধুরী—ঝুটমুট ঘণ্টাভর কেঁও ঠহরেগী?

শর্মিলা চুপ করে রইলেন। এর ওপর তর্ক চলে না। প্রভাকর কুলিদের ডাক দিয়ে বললেন, উঠাও সামানা—কার পার্কমে চলো।

শর্মিলাকে মামার ওখানে নামিয়ে দিয়ে প্রভাকর চলে গেলেন হিন্দুস্থান পার্কে। গাড়িতে যে সামান্য দুটো-চারটে কথা হয়েছিল, তারই জের টেনে বললেন, তা হলে দিন তিনেক আছেন?

—হ্যাঁ, বুধবারে ফিরে যাবো। আপনি?

—আমার কিছু ঠিক নেই। দু'দিন কনফারেন্স—অন্য কাজ না জুটলে পরশুই ফিরে যাবার ইচ্ছে আছে। যদি সময় পাই, দেখা করে যাব আপনার সঙ্গে।

—নিশ্চয় আসবেন, খুব খুশি হবো।

—দেখি—মৃদু হেসে প্রভাকর চলে গেলেন।

দুটো দিন কেনাকাটার ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল শর্মিলার। প্রভাকরের কথা আর মনে পড়ল না। কিন্তু একটা চাপা অস্বস্তি, রক্তের ভেতরে একটা মৃদু মর্মর সব সময় বেজে চলতে লাগল; একদিন যে মানুষটার আদিম বন্য আকর্ষণে শর্মিলা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে তারই কত কাছে চলে এসেছেন তিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের এই কলকাতা—পথেঘাটে দম আটকানো ভিড়, ট্রাম-বাস-মোটরের দিগবিদ্বিক্ ছুটোছুটি, তবু এরই ভেতরে—যে কোনো একটা চকিত মুহূর্তে কিরণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে যেতে পারে। কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বই কিনতে গিয়ে রক্তের সেই মৃদু মর্মর যেন ঝড়ের অরণ্য হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর। এই তো সারি সারি প্রকাশকের দোকান—এখানে লেখকদের সব সময় আনাগোনা, এখানে যে-কোনো মুহূর্তে—

নিঃসন্দেহ, যে-কোন মুহূর্তে। ওই যে সোনার ফ্রেমের চশমা, রোগা কালো মানুষটি গাড়িতে উঠলেন—শর্মিলা রোমাঞ্চিত হয়ে চিনলেন: তারাশঙ্কর। অনেকবার অনেক ছবি দেখেছেন, ভুল করবার কারণ নেই। ফুটপাথে যে ছোটখাটো প্রশান্ত চেহারার লোকটিকে ঘিরে পাঁচ-ছ'টি ছেলে কথা কইছে—উনি প্রেমেন্দ্র মিত্র। রাঁচীতেই একটা সাহিত্য-সম্মেলনে ওঁকে দেখেছিলেন শর্মিলা। এঁদের মাঝখানে কখন আর একটি মানুষ—

প্রেসিডেন্টের কথায় তাঁর চমক ভাঙল।

—কী হল মিসেস রায়চৌধুরী? দাঁড়িয়ে গেলেন কেন?

লজ্জিত হয়ে শর্মিলা বললেন, না—কিছু নয়।

দু'দিন এইভাবে কাটল, কিন্তু তৃতীয় দিনে মন আর বশ মানল না। সব চেষ্টা, সমস্ত বিচারবোধকে ছাপিয়ে একটা অন্ধ আবেগের উচ্ছ্বাস উঠে তিলে তিলে তাঁকে গ্রাস করতে লাগল। ফিরে যাবেন? অন্তত একটিবারও দেখা না করে ফিরে যাবেন? হয়তো আর পাঁচ বছরের ভেতরেও তাঁর কলকাতা আসা সম্ভব হবে না, হয়তো এই তাঁর শেষ সুযোগ!

নিজের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন শর্মিলা, নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিতে চাইলেন, ইচ্ছে করল যে-কোনো একটা নিষ্ঠুর শারীরিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে এই আবেগটা তিনি স্তব্ধ করে দেন। কিন্তু কিছুই হয়ে উঠল না। অন্ধ ইচ্ছার আকুলতা শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তি ঠেলে তুলল মনের সামনে।

ভারি অন্যায় হয়েছে, অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করা হয়েছে কিরণের সঙ্গে। লোক সে যেমনই হোক, যে চোখেই সে মানুষকে দেখুক, একটা উপন্যাস ছাপা হয়ে গেলে তাকে ভুলে যাওয়ার মতো কৃষ্ণচূড়ার দিনগুলোকে সে যেমন করেই পেছনে ফেলে যাক—শর্মিলা তো তাঁকে কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আসবেন নদীর ধারে, দেখা করবেন তার সঙ্গে। কিন্তু নিজের মনের তাড়নাতেই শর্মিলা কথা রাখেন নি, পালিয়ে গেছেন ভীতুর মতো, কয়েক লাইন সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্য দিয়ে নিজের দুর্বলতার চেহারাটাই কিরণের কাছে মেলে ধরেছেন।

তার অর্থ, হার মেনেছেন শর্মিলা। ছোট হয়ে গেছেন কিরণের কাছে। কিন্তু এ-ভাবে পরাজয় স্বীকার করা নয়। তিনি দেখা করবেন কিরণের সঙ্গে, সহজভাবে ভদ্রতার আলাপ করবেন, সেই কয়েকটা দিনের দুর্বল দীনতাকে কাটিয়ে উঠেছেন—পরোক্ষভাবে সেইটেই তাঁকে জানিয়ে যাবেন। নিজের কাছ থেকে মুক্তি পাবেন, দূরে থেকেও কিরণের অদৃশ্য আকর্ষণ আর তাঁকে বিড়ম্বিত করবে না।

যুক্তিটা ক্রমশ একটা সুস্পষ্ট আকার নিতে লাগল। তৃতীয় দিনে ডিরেকটারী খুঁজে ফোন করলেন কিরণের প্রকাশককে।

দ্বিধা এল, গলা কাঁপল, তারপর বুকের স্পন্দন যেন থেমে যেতে চাইল। লাইনের ওপার থেকে ভেসে এল কিরণের গলার স্বর। সমস্ত যুক্তিতর্ক তলিয়ে গেল সেই বন্যার আড়ালে, একটা তারবাঁধা যন্ত্রের মতো তাঁর সারা দেহমন একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল।

কী বললেন ভুলে গেলেন শর্মিলা, কিরণের সব কথাগুলো যেন স্পষ্ট করে শুনতেও পেলেন না তিনি। ফোন নামিয়ে রেখে বসে পড়লেন সোফার ওপর, দু'হাতে নিজের কপালটা চেপে ধরলেন। মাথার ভেতরে সব ঝাপসা হয়ে গেছে, শুধু নিয়নের চঞ্চল আলোর মতো দপ দপ করে একটি উপলব্ধি: কিরণ আজ আসবে, আসবে সন্ধ্যা ছ'টার পরে।

কিষান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

শেষবার তার শুভচেতনা বলে উঠল—পালানো উচিত, ছ'টার আগেই কলকাতা ছেড়ে পালানো উচিত। একটা দারুণ দুঃখের নিয়তিকে তিনি অকারণে আহ্বান করে আনছেন, এ তাঁকে কোথাও নিয়ে যাবে না।

কিন্তু—

কিরণ ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, সাড়ে চারটে। মেডিক্যাল কলেজ কাছেই, একবার প্রতিমাকে দেখে আসা যেতে পারে। সওয়া পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বেরুলেই সময়মতো শর্মিলার ওখানে পোঁছোনো যাবে।

প্রতিমার এতদিনের বিলুপ্ত চেতনা একটা সন্ধিলগ্নে এসে দুলছে এখন। মাথায় সেই চোটটা লাগবার ফলে বিকল যন্ত্রটা যেন একটু একটু করে চলতে সুরু করেছে, অল্প অল্প মানুষ চিনতে পারে মনে হয়। সেই শূন্য অর্থহীন দৃষ্টিতে থেকে থেকে কিসের ছায়া পড়ে, চোখ পিট পিট করে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে, যেন কিছু একটা বুঝতে চাইছে সে।

ডাক্তারেরা বলেছেন, একটা ভায়োলেণ্ট শক-থেরাপী হয়ে গেছে। এখনো কিছুই বলা যায় না। হয়তো সাময়িকভাবে ভালো হয়ে যেতে পারেন, একেবারে ভালো হতে পারেন, আবার যেটুকু চেতনা কিছুক্ষণের জন্যে ভেসে উঠেছে, তা আবার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে।

কী চায় কিরণ?

আজ ক'দিন ধরেই নিজেকে প্রশ্ন করেছে, সে কী চায়? প্রতিমা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাক? বিয়ের পর দুটি বছর যেমন করে সুধায় ভরে দিয়েছিল, তেমনিভাবে আবার উজ্জ্বল-বিকশিত হোক? আর তা যদি না হয়? যদি আবার সেই অবিশ্বাস আর সন্দেহের কালো ছায়াটা ঘনিয়ে আসতে থাকে, আবার যদি নিজের বিষে তিলে তিলে সে জ্বলতে আরম্ভ করে, তা হলে—

তা হলে যন্ত্রণার সেই কুম্ভী-পাকের চাইতে এই অচেতনাই তার ভালো। সেই প্রতি পলের মৃত্যুর চেয়ে এই জীবন্ত মৃত্যুই তার পক্ষে সুখের। কিরণের পক্ষেও।

ভাবতেই কিরণ চমকে উঠল। এই কি তার অবচেতন মনের কামনা? সে কি চায় না—প্রতিমা আর কখনো ভালো হয়ে উঠুক? অরবিন্দের সেই ডিভোর্স প্রস্তাবে মুখে সে যাই বলুক, তার মনের কথাটা সম্পূর্ণ আলাদা।

কিরণের পিঠে কে যেন চাবুক হানল। এক মুহূর্তের জন্যে তার পা থমকে গেল মেডিক্যাল কলেজের গেটের সামনে।

হাতের ঘড়িতে চারটে সাঁইত্রিশ। ছ'টার মধ্যেই শর্মিলার ওখানে তার যাওয়ার কথা। তার আগে তার প্রতিমাকে অন্তত কিছুক্ষণ দেখে যাওয়া উচিত। সেটা তার কর্তব্য।

শুধুই কর্তব্য?

কিরণ জোরে পা চালিয়ে দিল ভিতরে। আর কোনো কথা সে ভাববে না।

কেবিনে অরবিন্দ বসেছিল। কিরণকে দেখেই উঠে দাড়ালো।

—এসো, সাহিত্যিক।—তারপর গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললে, অনেকটা নর্ম্যাল।

—নর্ম্যাল?

প্রতিমা পাশ ফিরে শুয়েছিল, হঠাৎ উঠে বসল। তার সেই আচ্ছন্ন আবিষ্ট চোখের ওপর দিয়ে যেন পর পর বিদ্যুৎ চমকে গেল খানিকটা। তারপর তীব্র, তীক্ষ্ণ স্বরে বললে, তুমি—তুমি!

কিরণ শক্ত হয়ে গেল।

—আমাকে চিনতে পারছ প্রতিমা?

—কেন চিনতে পারব না, আমি কি পাগল?—চোখের বিদ্যুতের ওপর চকিতে কয়েকটা বৃষ্টির বিন্দু ঘনিয়ে এল: আমার খুব অসুখ—আমি দেখতে বিশ্রী হয়ে গেছি, তাই তুমি আমাকে ঘেন্না করো, না? তাই বুঝি আমার কাছে তুমি আসতে চাও না?

—কে বলেছে, আমি আসি না? প্রায় রোজই তো আসি। তুমি ঘুমিয়ে থাকো, তাই আমাকে দেখতে পাও না।

—আর আমি ঘুমোব না।—একটা আকুল উত্তপ্ত মুঠোতে, শীর্ণ আঙুলে প্রতিমা কিরণের হাত চেপে ধরল: আজ তোমাকে আমার কাছে ধরে রাখব, কোথাও যেতে দেব না। তুমি বোসো, বোসো আমার কাছে।

রোগা শরীরের সব শক্তি দিয়ে প্রতিমা তাকে টেনে বিছানার ওপর বসিয়ে দিলে।

গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অরবিন্দ। সমস্ত মুখ তার উজ্জ্বল আর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে, আচ্ছা—তুমি একটু তা হলে ওর কাছে বোসো সাহিত্যিক, আমি বাইরে থেকে একটা সিগরেট খেয়ে আসছি।

ছ'টা—সাড়ে ছ'টা—সাতটা—সাড়ে সাতটা—

অনেকক্ষণ ধরে বারান্দায় পায়চারি করে, রেলিং ধরে রাস্তায় ঝুঁকে থেকে থেকে সাড়ে সাতটায় শর্মিলা এসে আবার বসে পড়লেন সোফার ওপর। আবেগের বন্যাটা এখন গ্লেসিয়ারের মতো স্তব্ধ আর শীতল হয়ে গেছে। এখন নীচের ঠোঁট দিয়ে রক্ত পড়ছিল শর্মিলার। ঠিক হয়েছে, এই ঠিক হয়েছে। কিরণের সামনে নিজের দীনতাকে কাঙালের মতো মেলে ধরেছিলেন, আর চূড়ান্ত অপমানে সে তার জবাব দিয়েছে। একদিন তাকেও নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, সেই ঋণ আজ সে শোধ করে নিয়েছে।

কেন টেলিফোন করেছিলেন? কেন কিরণকে তাঁর কাছে আসবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন? লজ্জায় অপমানে তাঁর মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। সব জেনে, সব বুঝে কেন এত বড়ো গ্লানি শর্মিলা টেনে নিলেন নিজের ওপর? কী লাভ হল, কী পেলেন?

নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে চাইলেন নিজেকে, একটা ভয়ঙ্কর কোনো শারীরিক যন্ত্রণা কামনা করলেন, সামনের টেবিল থেকে পেতলের ফুল-দানিটা তুলে নিয়ে আঘাত করতে চাইলেন মাথার ওপর। এরপরে নিজের মুখোমুখি কেমন করে আর দাঁড়াবেন শর্মিলা, এ গ্লানি তিনি কেমন করে ভুলবেন? শর্মিলার মনে হল, বিশ্রীভাবে একটা চিৎকার করে উঠবেন তিনি। ঠিক সেই সময় মামা এসে ঘরে ঢুকলেন।

—খুকু, এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন তোর সঙ্গে।

শর্মিলার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

—কে?

—বললেন, রাঁচীর লোক। প্রভাকর ভৌমিক।

প্রভাকর! নিস্তব্ধ গ্লেসিয়ারে যেন কেউ এক ঝলক আগুন ছিটিয়ে দিলে। যেন একটা দুরন্ত শক্তি এসে সবেগে অন্ধকারের রুদ্ধ দুয়ার খুলে ফেলল। তীরবেগে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে শর্মিলা বললেন, ডেকে আনো মামা, ডক্টর ভৌমিককে ডেকে আনো এখানে।

(ক্রমশঃ)

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ তোমার মাঝারে বাপ, আমি বেঁচে রই ॥

মানুষটির শুশ্রূষায় বৃদ্ধ মুনিষকে রেখে আনন্দীরাম লাঠি হাতে বেরোলেন। এখন তাঁর মনে নানা ভাব আসে যায়। তিনি সপরিবারে রক্ষা পেয়েছেন এজন্য রাধামাধবের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই, কেন না এখন তাঁর অবস্থা বড়ই অসহায়। পিতা যতদিন বেঁচে-ছিলেন, স্থবির, রুগ্ন, পিত্তশূলে প্রায় সময় শয্যাশায়ী, তাঁকে মনে হত সংসারে আর একটি প্রাণীমাত্র, আনন্দীরামের আর একটি দায়িত্ব, কেন না পিতা শরীর পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসার হতে মন তুলে নিয়েছিলেন।

এমন নির্লিপ্ততা দেখে আনন্দীরাম বিস্মিত হতেন, এখনো সে-কথা মনে করলে অভিভূত হন, যেন জীবনের সে আর এক রহস্য, মানুষ বড় বিচিত্র।

তাঁর বাবা ছিলেন স্নেহে অন্ধ, সংসারে আসক্ত, এ-সংসারে অনেক সমস্যাই তাঁর হাতে গড়া। অনেক ভুল করেছিলেন, সবার চেয়ে বড় ভুল বোধ হয় ছেলের চেয়ে পাঁচ বছরের বড় বিশালাক্ষীকে বিয়ে করা, আনন্দীরামের কানের লতিতে তখনো উপনয়নের কর্ণবেধের ঘা শুকোয় নি। এমন সময়ে পিতা বিশালাক্ষীকে নিয়ে এলেন। অবজ নাপিত আগে এসে সংবাদ দেয়, আর এক সতীন আসছে শুনে আনন্দীর মা পা ছড়িয়ে কাঁদতে গেলেন, আনন্দীর পিসী পাছদুয়োর দিয়ে বেরিয়ে আচার্যবাড়ি গেলেন। পাতানী পিসীর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সেখানে আতপ চালের মিহি গুঁড়ো কোরা কাপড়ের পুঁটুলিতে সর্বদা থাকে। পাতানী পিসী পাঁচ-সাতটি এয়ো নিয়ে এলেন, চালের গুঁড়ো গুলে উঠোনে যেমন তেমন বৌ-ছত্তর আঁকলেন।

কুলীনঘরের পুরুষ যথেচ্ছ বিয়ে করে, কিন্তু বউ আসে কম, কেন না কুলীনসন্তানের আগের নৌকোর পরামাণিক যায়, গঙ্গাতীরে গ্রামে গ্রামে সম্বন্ধ করে। পাছের নৌকোয় বর আসে, কি রাঢ়ে কি বঙ্গে, কি গঙ্গাতীরে কি বড়গাঙের কূলে, কুলীনের মেয়ের কিংবদন্তী কেউ ফিরে দেখে না। নতুন কিছু নেই সেই গল্পে, সবই পুরনো, অনেক পুরনো। কুলীনকন্যার দুঃখ কোনদিন ঘোচে না। গৌরী হোক ঝিয়ারী মেয়ের কপালে চিরদিন বুড়ো বর জোটে, তারা কোনদিন স্বামীর ঘর করে না, মাঝে মাঝে শুধু গঙ্গাতীরে কুলীনস্বামীর মৃতদেহ দই-হলুদে জীইয়ে রাখা হয়, আর নৌকোয়, পালকীতে, গরুর গাড়িতে সাধ্বীরা এসে পৌছলে চিতা জ্বলে। এ কাহিনীর আদি আছে, অন্ত নেই।

বিশালাক্ষীর বিয়েতে বৈচিত্র্য ছিল। কেন না বিয়ে, সে ত' কপালের লেখা, হবার ছিল, হ'ল। কিন্তু ঘর করতে এলেন

বিশালাক্ষী, এটিই বিচিত্র। শিবকালী গাঙ্গুলীর নাম এখন রাঢ়ে বঙ্গে সবাই জানে। কারো নাম বংশের জন্যে বিখ্যাত, বিনা চেষ্টায় তিনি খ্যাতি পান। কেউ ইমারত গড়বার মত করে একটু একটু ক'রে নাম গড়ে তোলেন, শিবকালী গাঙ্গুলী তেমনি এক উদ্যোগী পুরুষ। একমাত্র বোনকে এমন বিয়ে দিলেন, এ বড় আশ্চর্য কথা। কেন না ইচ্ছে হলে কি তিনি একটি সদ্বংশের সুপাত্র সন্ধান করে তাকে বাড়িতে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারতেন না? বিয়ে দিলেন, আবার ঘর করতে পাঠালেন বোনকে? এই ঘর করতে আসাটি হ'ল বৈচিত্র্য, কেন না বিশালাক্ষীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক যৌতুক, স্ত্রী-ধন, দাসী আসে।

এই সব প্রশ্নের সদুত্তর বিশালাক্ষীর কাছে ছিল, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন নি, শুধু তাঁর চোখে বিষাদ লেখা ছিল। সম্ভবত সে-কারণেই, চোখের ঐ বিষাদমাখা কান্নার জন্যে মুখোটি বাড়ির অঙ্গনে জ্যৈষ্ঠের সে-প্রভাত গম্ভীর ও সংযত শোভা পায়। বউ দেখতে উৎসুক নগ্ন শিশুরা ছাড়া আর সকলেই স্থির। পুরাঙ্গনারা করতে হয় তাই স্ত্রী-আচার করছেন, সার সার গরুর গাড়ি থেকে ভার ভার যৌতুক নামছে ত' নামছেই। মাঝে বিশালাক্ষী, যে-যা বলে শুনে শুনে একবার হাতে মাছ নেন, জলভরা কলসের দিকে চান, কিন্তু তাঁর সর্বাঙ্গে রূপোর গহনা, নৈমরক্কের সোনার চিহ্ন এখানে ওখানে চিকচিক করে মাত্র।

পাতানী পিসী এ দৃশ্যের সুন্দর লাবণ্য ভেঙে খনখন ক'রে বলেন, 'দিগনগরের শিবকালী গাঙ্গুলীর শুনতে পাই একমাত্র বোন, তা সে দেশে কি সোনা জোটে না?'

এ-কথার উত্তরে বৃদ্ধাদাসী বলে, 'দস্যু ডাকাতের ভয়ে গায়ে দেয় নি মা ঠাকরোণ, সব ঝালি ভরো দিয়েছে আমার কাছে।' বিশালাক্ষী এ-কথা শুনে চোখ তুলে চান মাত্র, সুখে-আলতার পাথরে পা রাখেন। তাঁর পায়ে রূপোর চরণপদ্ম, গুজরীপঞ্চম, বড় কোমল ও সুশ্রী পা, এ পায়ে রূপোর তোড়ার লবঙ্গ বিঁধলে শিবকালী গাঙ্গুলী দুঃখ পান। মুখোটি বাড়ির প্রাচীন, তেলতেলে, সুমসৃণ গয়েশ্বরী কালো পাথরের থালায় সে কোমল কমলচরণ আনন্দীরামের শৈশবে জ্যৈষ্ঠের প্রভাতে আশ্চর্য শোভা ধরেছিল, তা দেখে রামাই বাগদীর পিসী অসাবধানে বলে 'হায় মা গো, তোদের জেতের ছার নিয়ম, এমন প্রতিমাকে বুড়ো বরের হাতে দেয়।' সবাই এ-কথা শুনে তাকে 'চুবো মাগী, চুপ যা!' ব'লে ধমক দেয়। বিশালাক্ষীর পাশে প্রৌঢ় বরকে দেখে কারো মনে লাগে নি। এমন বিয়ে তাঁরা নিয়ত দেখেন।

পিতা কি শুধু ভোগলালসায় বিয়ে করেছিলেন? এমন কথা আনন্দীরাম মেয়েদের কাছে সতত শুনতেন। উপনয়নের পর বালককে নিয়মে রাখেন মেয়েরা, তাই মেয়েদের কাছে কাছে তাঁর থাকা। 'রূপের গরম দেখে বুড়ার মন টলে গেছিল গো!' তাঁর মা সাশ্রুচোখে ননদকে বলতেন।

কিন্তু আনন্দীরাম এখন বোঝেন, যদিও পিতার তখন প্রৌঢ় বয়স, ঘরে বারো বছরের ছেলে, আগপক্ষের মেয়ে, তবু বিশালাক্ষীকে তাঁর বড় প্রয়োজন ছিল। মুখোটি বাড়িতে মেয়েরা সংসার করতেন না। আনন্দীরামের পিসী, মা—সবাই থাকতেন আলগা হয়ে। আশ্রিতা এক মামীমা ছিলেন, নইলে দু'বেলা রাঁধাভাত জুটত না কারো। এ বাড়িতে গোলায় ধান, ডাল, মটর, মুগের কলাই, ক্ষেতে তরিতরকারী, গোহালে গরু, কিন্তু সব থেকেও কিছু নেই।

পিসী আর মা সদাই কচকচি করেন। এ সংসারের আকাশের পথে যেন নারদ-ঠাকুরের নিত্য আনাগোনা। ভাঁড়ারে ঘি পচে যায়, কেউ যত্ন রাখেন না। ভাতপাতে ঘি দিতে হলে বাটি হাতে প্রতিবেশী বাড়ি দৌড়য় কেউ। ছেলে কাঁদলে মিছরীটুকু চাইলে মেলে না, অনাদরে লক্ষ্মীপুজোর ধান মণ্ডপে পড়ে থাকে ও গাছ গজায়। মা কথায় কথায় কেঁদে বুক ভাসান ও 'এক গাছ দড়ি দাও, আমি মরব গো!' ব'লে গলা ছেড়ে কাঁদেন।

এই ছিল পিতার সংসার। অথচ তিনি স্নেহবৎসল সংসারী মানুষ। তেল না ফুরোতে কলুবাড়ি থেকে তেল ভাঙান, ছাওয়া-ঘর আ'রে ছাওয়ান, মাটির দাওয়া নিত্য বাঁধান, সংসারের ওপর কারো মন নেই দেখে দুঃখ পান।

আনন্দীরাম জানেন, বিশালাক্ষীর পেছন পেছন এ সংসারে শান্তি, শৃঙ্খলা, শ্রী এল।

বাবার এ-সংসারের ওপর আশ্চর্য মমতা ছিল। পরে, তিনি রুগ্ন হবার পর আনন্দীরামের মনে হত বাবা একটি দায়িত্বমাত্র, এ বাড়ি, সংসার, তাঁর পায়ে বেড়ী।

'যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, এ সংসার কেউ করে?' এই বুলি তাঁর মুখে সবসময় শোনা যায়, সেদিনও বলেছেন। বাড়ির দিকে চেয়ে বলেছেন 'ভীমরতি হয়েছিল বাবার, তাই বাড়ি বাড়ি করতেন।'

বাবাকে শেষ সময়েও বলেছেন 'আমার উন্নতির পথে আপনি অন্তরায়।'

বৃদ্ধ ঈষৎ হেসেছেন।

'আপনি যা বললেন, তাই শুনতে হল। বড়গাছে নৌকো বাঁধতে গিয়ে আমায় ভাসিয়ে দিলেন নইলে আজ আমি জগৎশেঠের ঘরে ছোট মুন্সী হই, আমার অন্ন তখন খায় কে? বাড়ি বাড়ি, সংসার সংসার এই ক'রে আমার পায়ে বেড়ী পরালেন!'

'চলে যাও!' বৃদ্ধ নির্লিপ্তভাবে বলেছেন।

'চলে যাব!' বাবার আচরণে আনন্দীরাম ব্যথিত। এমন আলগা ক'রে কথা কইবার সম্পর্ক তো নয়। আসলে পিতাপুত্রে যথেষ্ট হৃদ্যতা আছে।

'তোমার যদি অসহ্য হয় তবে যাবে বইকি।'

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে আনন্দীরাম বলেছেন 'আপনি অসুস্থ, কথা কইব না।'

বাবা বলেছেন 'অসুস্থ তাতে তোমার কি বাবা? রাধামাধব আছেন, তিনিই দেখবেন।'

আনন্দীরাম কিছু বলেন নি। রাধামাধব দেখবেন। এ-বিশ্বাস তাঁর বাবার থাকতে পারে, কেন না রাধামাধবকে মাথায় রেখে তস্য পিতা, আনন্দীর পিতামহ দামোদরের বান পার হয়েছিলেন, বুকে ছিল শিশুপুত্র। পিতার এ-বিশ্বাস থাকতে পারে কেন না আনন্দী যখন শিশু, সান্নিপাতিক জ্বরে মারা যান যান, ছেলেকে নিয়ে বাপ রাধামাধবের পায়ের কাছে রেখেছিলেন। বিচক্ষণ বৈদ্য শশিনাথ সেন পর্যন্ত 'এলে' দিয়েছিলেন আনন্দীকে। বলেছিলেন 'আর কেন মুখোটি মশায়, আশা ছাড়ুন।'

কিন্তু একমাত্র ছেলের বাবা কি আশা ছাড়তে পারে? 'দয়াময়! দয়াময়!' বাবা ডেকেছিলেন, 'আমার ছেলেকে তোমার হাতে দিলাম!'

'দয়াময়!' এখন, এতদিন বাদে, দুর্যোগের প্রভাতে, এক বিদেশীকে আশ্রয় দিয়ে গ্রামে বেরোবার আগে বাবার কথা মনে হয় কেন? বুকের ভেতর কোথায় কি বাজে?

রাধামাধবের অপার ক্ষমতায় বাবার বিশ্বাস ছিল। আনন্দীর সে বিশ্বাস কোথায়? তিনি এ-যুগের ছেলে, নতুন হাওয়ার মানুষ, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নন, কিন্তু মনে সে প্রজ্বলন্ত ভক্তি কোথায়?

বাবা যেন আনন্দীর মুখের দিকে চেয়ে সব বুঝেছিলেন। সব মনের কথা। 'বাছা, দুঃখ ক'র না,' ধীরে বলেছিলেন 'এখন তোমার সামনে অনেক সময়। এতগুলো নাবালক, বিধবার দায়িত্ব তোমায় দিয়েছি, দায়িত্ব না নিতে শিখলে মানুষ হওয়া যায় না। তোমার 'পরে আমি এমন অবিচার করি নি।'

আনন্দীরাম নতনেত্র, চুপ।

'সেই বিয়ে? ছি গোপাল, একটা বিয়ে যেমন তেমন হল ব'লে কি পুরুষমানুষ ভেঙে পড়ে?'

আনন্দীরাম পিতার দিকে চান। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকেন। পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ, কিন্তু বাপ আর ছেলে এক সময়ে বন্ধু, সমব্যথী, সবচেয়ে আপনার জন।

'বাবার দায়িত্ব ছেলেকে দেয়। সংসারের এই-টি হ'ল নিয়ম। কলাগাছ দেখিস নি? দেখিস নি গোপাল?' উপযুক্ত ছেলেকে বাবা শিশুর মত শুধোন, 'দেখিস নি, একটি মরে আরটি পাশ দিয়ে বেরোয়, এমনি করে ভগবান জগৎ বাঁচান। রাধামাধব। দায়িত্ব ফেলে দিও না বাবা। আর তোমার ছোট মা।'

বৃদ্ধের চোখে আশ্চর্য কোমলতা, করুণা, বিষাদ দেখেন আনন্দীরাম। নামমাত্র উচ্চারণে। এ ভাবান্তরের পবিত্রতার সামনে তাঁর মন নম্র হয়ে পড়ে। বালকের মত বলেন, 'ছোটকে আমি মাথায় রাখব বাবা। আপনি ভাববেন না।'

'কানাই-এর নাম সে ভ্রমে করে না, বুকে চেপে থাকে।'

'হ্যাঁ বাবা।'

'মেয়েমানুষের মরণ ওখানে। পুরুষ এত সহজে কাতর হয় না।'

এ-কথার উত্তর সেদিন আনন্দীরামের কাছে ছিল না।

পিতা গেছেন আজ দেড় বছর। বাবাকে যে কথা দিয়েছিলেন আনন্দীরাম, তা রেখেছেন। কিন্তু অন্তরে সে প্রসন্নতা কই, এ বাড়িকে মনে হয় ইটের স্তূপ, মা, পিসী সকলকে মনে হয় বোঝা, পায়ে বেড়ী। মনে হয় এঁদের পালন করে তাঁর জীবন বয়ে যাচ্ছে, অথচ তাঁর অন্য কাজ আছে। জীবনে বড় হতে হবে, বিদেশ যেতে হবে, নিজের চেষ্টায় ওপরে উঠতে হবে, কেন না তাঁর পৌরুষে ঘা দিয়ে অপমান ক'রে বড়বউ বাড়ি ছেড়ে গেছে। পরিবারের দিকে চেয়ে তাঁর জীবন নষ্ট হল।

কিন্তু কাল রাতে, আঁধারমানিক গ্রামে যখন কান্নার কলরোল, আগুন বাতাসে ছড়ায়, তখন আনন্দীরাম নীরবে শুধু যন্ত্রণার পীড়নে কাতর হয়েছেন। মুহূর্তে বুঝেছেন বিরক্তি, বিষাদ এ হ'ল ওপরের ফেনা। ফেনা সরালে গভীর জল। আসলে তাঁর মনে গভীর মমতা। কাল, দস্যুর হাতে এ বাড়ির একটি ইট খসলে বুক ভেঙে যেত। স্বার্থপর, নির্বোধ মা, পিসী, মামা কেউ মারা গেলে তিনি সইতে পারতেন না। আনন্দীরামের শুধু মনে হয়েছে যেমন করে পারেন সবটুকু আগলে রাখেন। বাপ বুঝি এমনি করেই সকলকে ভালবাসতেন। এমনি করে বুঝি আনন্দীরামের মধ্যে বাবা বেঁচে আছেন।

'দয়াময়।' বেরুবার সময় লোকটির গলা আবার শুনতে পান। তাঁর বাবার মুখেও এই কথাটি লেগে থাকত।

আনন্দীরাম বেরুবার মুখে ছোট সামনে এলেন। বললেন 'বিলম্ব ক'রো না। চিন্তায় থাকব।' (ক্রমশঃ)

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

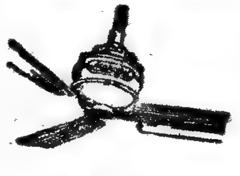

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

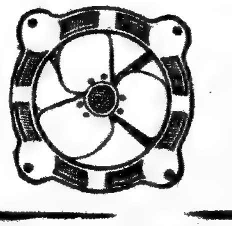

গ্রন্থ মেলা

মধুমালতী : সম্পাদনা : আল্‌-কামাল আবদুল ওহাব। প্রকাশক : আনওয়ারুল হক, আদিল ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, পাটুয়াটুলী, ঢাকা—১। দাম : পাঁচ টাকা।

পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মিলিত সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারা অজর এবং অমর। ঢাকা থেকে প্রকাশিত মধুমালতী পড়ে সে কথাটাই বারবার মনে হলো। বৃহদাকার এই সচিত্র কিশোর বার্ষিকীটি হাতে পেলে পশ্চিম বাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থেকে বয়স্করা পর্যন্ত অনুভব করবেন যে, বাংলা সাহিত্য কিভাবে দুই বাংলার মানুষকে এক করে দিতে পারে। বাংলা দেশের ঐতিহ্য, ইতিহাস, পুরাণ, জীবন-কথা, জীবনী—সব কিছুই রয়েছে মধুমালতীতে।

এমন সুন্দর গল্প, কবিতা যেন অনেকদিন পড়ি নি, দেখি নি বহুদিন এমন সুন্দর সুন্দর ছবি। ৩৭২ পৃষ্ঠার এই বার্ষিকীটিতে রচনার সংখ্যা ৭৬টি। প্রায় সারা বছর ধরে পড়ার মতো খোরাক এতে আছে। আর এমন সব রচনা রয়েছে, যা চিরকাল ধরে মনে রাখার মতো। তা ছাড়া এত গল্প ও কবিতার মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন স্বাদের রচনা। যেমন, জীবন-কথা, জীবনালেখ্য, নাটিকা, কাহিনী-কাব্য, ছড়া, ইতিহাসের কাহিনী, রহস্য-গল্প, রূপকথা, খ্যাতিমান লেখকদের অপ্রকাশিত রচনা, প্রবন্ধ, রূপক গল্প, ইতিহাসের গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, ভৌতিক গল্প, ব্যায়ামের কথা, বিজ্ঞানের কথা, ইন্দ্রজাল, ছবির কথা, হাসির গল্প, আরব দেশের আদবকায়দা, এক লেখকের একদিন, বড়ো গল্প, অভিনব প্ল্যানচেট, দুঃসাহসিক ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি। ভালো ভালো লেখার গুণে ছোট-বড় লেখক বিচার করাও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবু উল্লেখ করতে হয়—কাজী নজরুল ইসলামের নাম, আর তাঁর হস্ত-প্রতিলিপির। এ ছাড়া কাদের নওয়াজ, বন্দে আলী মিয়া, জসীম উদ্দীন, দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি নাম ত' কিশোরদের অতি প্রিয়। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ লেখককে একত্রে মধুমালতীতে পেয়ে আমরা গভীর আনন্দ লাভ করলুম।

জয়ন্তী সেন

বিবেকানন্দ-যুগ : ডাঃ নরেশ-চন্দ্র ঘোষ। সাধনা প্রকাশনী, ৩৬ সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনানগর। কলকাতা-৪৮। দাম : দুই টাকা।

মাত্র একশত পৃষ্ঠার গ্রন্থে বিবেকানন্দ-যুগকে সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষ বিবেকানন্দ-যুগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত থাকায় স্পষ্টই লিখেছেন, 'এই গ্রন্থখানি—অলোকসামান্য যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের চিন্তা-ভাবনার কথঞ্চিৎ আলোচনা। সৎ-সাহিত্য চিন্তার পরিবেশ দেশে বিস্তার করার অনুপ্রেরণাতেই গ্রন্থকার অনুপ্রাণিত।'

বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গ্রন্থ অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি। উক্ত কারণে খ্যাতিমান প্রাবন্ধিকের সৎ অনুপ্রেরণার প্রতি পাঠকসাধারণ স্বভাবতই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন। গ্রন্থটিতে যোলটি প্রবন্ধ পরস্পর ভাবসাযুজ্যের দ্বারা সংযোজিত হয়েছে। স্বামীজীর রচনাসমূহের বিশ্লেষণ ও তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনচর্চার সঙ্গে পরিপূর্ণ সংগতি রেখে প্রবন্ধগুলি রচিত হওয়ায় সেগুলি যেমন সহজ, তেমনি সরল হয়েছে। দার্শনিকের মতো শ্রীঘোষ নিজেও কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন নি। এইসব কারণে গ্রন্থটি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

রিপোর্টার : সম্পাদক : কল্যাণ রায়, ৩২-বি, গ্রে স্ট্রীট, কলকাতা-৫।

স্বল্প মূল্যের ছোট ছোট সংবাদ-সাপ্তাহিকের প্রয়োজন বাংলা দেশে রয়েছে। কেন না এই সব পত্রিকার মাধ্যমে এমন অনেক সংবাদ প্রকাশিত হয়, যা অন্যত্র সবসময় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। 'রিপোর্টার' পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যাতেই এমন সব মনোযোগ আকর্ষণকারী চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'রিপোর্টার' পত্রিকাটিতে ঐ ধরণের সংবাদ ছাড়াও রাজনীতির পর্যালোচনা রয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে জনসাধারণের কল্যাণের দিকে এই পত্রিকা আহ্বান। তথাপি বলা প্রয়োজন, স্থানীয় ঘটনাকে আরো প্রাধান্য দিলে পত্রিকাটির চাহিদা অনেক বাড়বে।

॥ প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ॥

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

শহর কলকাতা

● স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে গঙ্গার জল-জাহাজ খচিত একটি অভিরাম দৃশ্য

॥ স্ট্র্যাণ্ড রোড অঞ্চলের আদি-অধুনার আলেখ্য ॥

সাবর্ণ চৌধুরীদের আদিপুরুষ কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিই তাঁর শিষ্য-চূড়ামণি মানসিংহ কর্তৃক গ্রহণ করেন চৌধুরী উপাধি। তারপর জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন সুতানূটী, গোবিন্দপুর এবং তৎসঙ্গে আরও প্রায় দ্বাদশাধিক জনপদ। যে-দূরাতীতের দিনে, বর্তমান ডালহৌসী-অঞ্চলের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডে কাছারী প্রতিষ্ঠা করেন কামদেব, গঙ্গা তখন স্ফীতকায়া হলেও, তার লীলাচঞ্চলা তনুর অবস্থান ছিল অনেক পশ্চিমে। তাই কামদেব-প্রতিষ্ঠিত মন্দির-শ্রেণীর দ্বারদেশ থেকে, তখন পদব্রজে মাইল-খানেক পথ অতিক্রম করার পর গঙ্গার ঘাটে আসতেন স্নানার্থিগণ। কিন্তু চিরকাল এমন অবস্থা থাকে না গঙ্গার। কামদেবের মৃত্যুর পর শতাব্দীকাল কেটে যেতেই, হঠাৎ একদিন এই বিচিত্র লীলাময়ী সমুদ্রদয়িতার গতি-বিবর্তন সুরু হয়। ধাপে ধাপে পশ্চিমে চড়া ফেলে, দিনে দিনে সে তার বিপুল দেহভার এলিয়ে দেয় পূর্বদিকে। ফলে মন্দির-শ্রেণীর সোপানদেশ একদিন অজস্র ঢেউয়ের মুখর দোলায় যেন সুযোগ লাভ করে লুকোচুরি খেলার।

দিন কেটে যায়। মন্দির-শ্রেণীর পাদদেশেই রুদ্ররূপিণী গঙ্গা তার খেয়ালি-অস্তিত্ব বজায় রাখে জোয়ার-ভাঁটায়। ওলন্দাজ বণিকদের Bank-zoll প্রতিষ্ঠার কিছু আগে, গঙ্গা আবার তার খেয়ালবশতই খানিকটা পশ্চিমে স'রে গেলেও, উক্ত বণিকদের তাগিদেই সে আবার ফিরে আসে যথাস্থানে। তারপর অনেককাল, আর কোনো গতি-বিবর্তনের অভীপ্সায় পাশ ফিরে শয়ন করার প্রয়োজন বোধ করে নি সে।

একে একে অজস্র বর্তমান পিছিয়ে অতীত হয়ে যায় দেখতে দেখতে। গঙ্গার কূলে কূলে নিরলস বিন্যাস ঘটে তরুশ্রেণীর। চৌধুরীদের মহল, মন্দির এবং কাছারীবাড়ির উত্তরে-দক্ষিণে, জন-বসতির বিরামহীন সংস্থাপনে মাথা তুলে দাঁড়ায় এক বর্ধিষ্ণু জনপদের স্থায়ী পরিবেশ। চৌধুরীদের স্বভাবসিদ্ধ সদাচারে এবং নির্দ্বিধা দাক্ষিণ্যে প্রজা-সাধারণের জীবন হয় সুখী, সংসার হয় সমৃদ্ধ এবং চরিত্র গ'ড়ে

শ্রীপদাতিক

ওঠে নবোদ্ভিন্ন শস্যক্ষেত্রের আপক্ক বিস্তারের মতো।

ঠিক এমনই দিনে, কোনো এক মন্দিরের অদূরবর্তী গঙ্গাতীরে যে-প্রশস্ত ঘাট প্রতিষ্ঠা করেন চৌধুরীরা—তারই উপকণ্ঠের এক জঙ্গলাকীর্ণ জমি সংস্কার ক'রে একটি দোকান-ঘর নির্মাণ করেন চন্দ্রপাল মুদী। চন্দ্রপাল প্রথমদিকে ছিলেন একজন প্রতিমা-শিল্পী। পূজো-পার্বণ উপলক্ষে কেবল চৌধুরীদেরই নয়, সুতানূটী থেকে গোবিন্দপুরের বিভিন্ন বিত্তশালীর মৃৎ-বিগ্রহ রচনা ক'রে, এককালে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন যথেষ্টই। এমন এক জন্মগত পেশা বর্জন ক'রে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে এক মুদীর দোকানের মুদী হয়ে অতিক্রম করতে হবে বাকি জীবনের অনিশ্চিত সাঁকো—তা কোনোদিন কল্পনাও করেন নি চন্দ্রপাল। কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মী হঠাৎ একদিন অকারণেই তাঁকে শরণচ্যুত করায়, তিনি বাধ্য হন তাঁর এই স্রষ্টার জীবনে ইতি টানতে। এ-সম্পর্কে বেশ একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর প্রচলন আছে। আজও কথায় কথায় এ-কাহিনীর উল্লেখ ক'রে থাকেন কুমারটুলি অঞ্চলের প্রবীণ প্রতিমা-শিল্পীদের কেউ কেউ। বর্তমান নিবন্ধকারের ভাষায় কাহিনীটি সংক্ষিপ্তাকারে এই :

চন্দ্রপাল যখন প্রতিমা-শিল্পিরূপে শীর্ষাসনের সদম্ভ অধিকারী, তখন একদিন হুগলি-অঞ্চলের এক শাক্ত-পরিবার তাঁকে আহ্বান জানান এবং অনুরোধ করেন তাঁদের আরাধ্য শক্তিদেবীর মৃৎ-প্রতিমা রচনা করার জন্য। এ-আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে উক্ত পরিবার-গৃহে সানন্দেই উপস্থিত হন চন্দ্রপাল। তারপর একাধিক দিনের মাত্রাহীন পরিশ্রমে তিনি নির্মাণ করেন সেই বিশাল প্রতিমা শক্তিদেবীর।

তারপর যথাসময়ে পূজার লগ্ন আসে। চন্দ্রপালের উপস্থিতিতেই সেদিন শক্তিদেবীর উপাসনা পরিচালনা করেন উক্ত শাক্ত-পরিবারের প্রবীণ কুলগুরু এক ব্রাহ্মণ। তখন নাকি রীতি ছিল :

উপাসনার প্রধান পুরোহিত যিনি, দেবী-সমীপে পশুবলি নিবেদন করবেন তিনিই। সুতরাং পূজার লগ্নে বলিদানের নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণ করেন উক্ত প্রবীণ কুলগুরুই। কিন্তু হাঁড়িকাঠে সংস্থাপিত পশুর স্কন্ধে তিনি সজোরে তাঁর খড়্গ নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ শিরশ্ছেদ হলো না পশুর। কেবল কর্তিত হলো স্কন্ধের আংশিক। এ-লক্ষণ শাক্ত-পন্থীদের পক্ষে শুভ নয়। এক অনাগত বিপদের আশঙ্কায় শিউরে ওঠেন উক্ত শাক্ত-পরিবারের সবাই। সেই কুলগুরু ব্রাহ্মণকে তাঁরা সভয়ে প্রশ্ন করেন : কেন এমন হলো?

কিন্তু ব্রাহ্মণ খানিকক্ষণ নীরব থাকার পর নির্বিবাদেই দোষারোপ করেন চন্দ্রপালের ওপর। তিনি বলেন : চন্দ্রপাল শুদ্ধচিত্তে প্রতিমা রচনা করেন নি। তাই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি প্রতিমার। এমন নিষ্প্রাণ প্রতিমার চরণে বলিদান গর্হিত বলেই আজ শিরশ্ছেদ হলো না পশুর। সুতরাং আজকের উপাসনার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ। এ-অপরাধ হয়তো কোনো-দিনও আর ক্ষমা করবেন না দেবী।

এই ব্রাহ্মণ একজন প্রবীণ কুলগুরু উক্ত শাক্ত-পরিবারের। অতএব তাঁর কথাই বেদবাক্যরূপে বিশ্বাস করেন গ্রামবাসী প্রতিজন এবং চন্দ্রপালকে তাঁরা নানা-ভাবে লাঞ্ছিত ক'রে সে-অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন তৎক্ষণাৎ। অপমানিত চন্দ্রপাল ফিরে আসেন তাঁর স্বগ্রামে। কিন্তু দিনে দিনে সেখানেও প্রচার হয়ে পড়ে হুগলির সেই সংবাদ। তাই সম্ভবত সংস্কারবশতই প্রতিমা রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে এক অযোগ্য ব্যক্তি ব'লেই ভাবতে সুরু করেন প্রত্যেকে।

কাজেই, প্রতিমা-শিল্পীরূপে শীর্ষ-স্থানীয় হয়েও, চন্দ্রপালকে কেউ আর প্রতিমা রচনার জন্য আমন্ত্রণ জানায় না। ফলে দিনের পর দিন অর্থাভাবে অত্যন্ত হতবল হয়ে পড়েন চন্দ্রপাল। তাঁর স্বগ্রামে তিনি যেন এক অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। তাঁকে যে-ই দ্যাখে, সে-ই মুখ ফেরায়। ভূ-স্বামী চৌধুরীরাও তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ বিমুখ। তাই মনের দুঃখে তিনি গ্রাম ছেড়ে এক দূরবর্তী শ্মশানে এসে উপস্থিত হন এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন উক্ত শ্মশানেরই অধিবাসী এক ভৈরব বাবাজীর। কিন্তু বিধি তাঁর এখানেও বাম। শ্মশানে অবস্থানকালেই একদিন গভীর রাত্রে ঘুমন্ত চন্দ্রপালের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভৈরব বাবাজীর ভৈরবী। ভৈরবী তাঁকে আবেদন জানায় গভীরভাবে। কিন্তু চন্দ্রপাল তখন তাঁর চিত্তকে শুদ্ধ করার সাধনায় মগ্ন। সুতরাং তিনি নির্মমভাবেই প্রত্যাখ্যান করেন ভৈরবীকে। ফলে যা হবার তাই হয়। পরদিন ভৈরবীর ইঙ্গিতে ভৈরব বাবাজীও তাঁকে বহিষ্কার করেন শ্মশান থেকে।

হতাশ চন্দ্রপাল আবার ফিরে আসেন তাঁর স্বগ্রামে। দিন-কয়েক এ-পথে সে-পথে আনমনে বিচরণ করার পর, এবার গঙ্গার তীরে ব'সেই জীবনধারণের জন্য গ্রহণ করেন ভিক্ষাবৃত্তি। তারপর একদিন, ভূ-স্বামী চৌধুরীদের কেউ একজন তাঁকে এভাবেই ভিক্ষা করতে দেখে সম্ভবত সদয় হন এবং দান করেন কিছু অর্থ—যে-অর্থে পরে ঘাটের সমীপবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ জমি সংস্কার ক'রে একটি দোকান-ঘর প্রতিষ্ঠা করেন চন্দ্রপাল।

তারপর ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিপথেও ঘনিয়ে আসে আকস্মিক বিবর্তনের যুগ। ঘাটের সন্নিকটে চন্দ্রপালের দোকান-ঘর গ'ড়ে ওঠার বছর-কয়েক বাদেই, একদিন চৌধুরীদের এতদঞ্চলের সমুদয় সম্পত্তি হঠাৎ হস্তান্তরিত হয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলেই বসাত স্থাপন করেন নিজেদের এবং দেখতে দেখতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গেরও নির্মাণকার্য সমাধা করেন তাঁরা। চন্দ্রপাল কিন্তু তখনও বেঁচে ছিলেন। তাঁর দোকান-ঘরের সন্নিকটস্থ ঘাটের কোনো নাম ছিল না। কিন্তু যেহেতু চন্দ্রপাল সেখানে বাস করেন, ঠিক সেই হেতু পরে জনসাধারণই ঘাটের নামকরণ করে 'চন্দ্রপাল ঘাট'। তারপর আরও কিছু পরবর্তীকালে ইংরেজ জন-সাধারণের মুখে মুখেই 'চন্দ্রপাল ঘাট' অপভ্রংশ হয়ে রূপান্তর লাভ করে চাঁদপাল ঘাটে। পরে নামের দিক থেকে, অবশ্য চাঁদপাল ঘাটই স্থায়িত্বের মর্যাদা লাভ করে স্বাভাবিক গতিতে।

এই চাঁদপাল ঘাট কেবল প্রাচীন নয়, ঐতিহ্যগত দিক থেকেও তা অবিস্মরণীয় নিঃসন্দেহে। এককালে জব চার্নক যেমন এ-ঘাটে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন প্রথম, তেমনই সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান-বিচারপতি স্যার ইলিজা ইম্পেও জাহাজ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এখানে। যেদিন তিনি উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে এসে নামেন, সেদিন ধূলি-ধূসর নগ্নদেহে ঘাটের সর্বাংশেই ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল এ-দেশীয় জনসাধারণ। তাই ইম্পে সেদিন এই অশিক্ষিত এবং দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বলে-ছিলেন :

'See brothers! the wretched victims of tyranny! The Crown Court was not surely established be ore it was needed. I trust it will not have been in operation six months before we shall see all these poor creatures comfortably clothed in shoes and stockin~s.'

এই প্রতিশ্রুতি কিন্তু রক্ষা করতে পারেন নি ইলিজা ইম্পে। বরং এ-দেশীয়দের দারিদ্র্যই আরও চতুর্গুণ বিস্তৃত ক'রে বেনিয়া ইংরেজদের সবিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সুযোগ

সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। তিনিই বিচারের এক প্রহসন সৃষ্টি ক'—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ প্রদান করেছিলেন হেস্টিংসের ইঙ্গিতে।

ইম্পে ছাড়াও চাঁদপাল ঘাটে এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন কাউন্সিলের বিশিষ্টতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে তোপধ্বনি হওয়ার কথা ছিল উনিশবার। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস চাঁদপাল ঘাটের সুসজ্জিত সোপানে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রাপ্য সম্মান-সূচক তোপধ্বনি গণনা করেন একে একে সতেরোবার। সতেরোবারের পর আরও দু'বার তোপধ্বনি শ্রবণ করার ব্যগ্রতায় বৃথাই উৎকর্ণ হন তিনি। কারণ তোপধ্বনি সতেরোর সংখ্যাতে উঠেই যতিলাভ করে স্থায়ি-ভাবে। অতএব তিনি বুঝতে পারেন: তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যেই ফোর্ট উইলিয়ামকে সতেরোবার তোপধ্বনি করার নির্দেশ দিয়েছেন হেস্টিংস।

হেস্টিংসের এই ইচ্ছাকৃত অসম্মান প্রদর্শনে সবিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ফ্রান্সিস। সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি শপথ নেন: যেভাবেই হোক, একদিন এর চরম প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করবেনই। অবশ্য চরম প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করেছিলেন সত্যই। একবার কাউন্সিল-কক্ষেই হেস্টিংসকে বিশেষভাবে আহত করেছিলেন প্রচণ্ড ঘুসি মেরে, আর একবার মনীষী এডমণ্ড বার্কের সহায়তায় হেস্টিংসকে দস্যুবৃত্তি এবং জালিয়াতির দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিলেন ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে।

যে-কালে ইম্পে বা ফ্রান্সিস কলকাতায় আগমন করেন, সে-কালে উত্তরে-দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ স্ট্র্যাণ্ড রোডের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে সংকুচিত গঙ্গা যখন পূর্বভাগে চড়া ফেলে পশ্চিম-ভাগে আবার সরে যায় খানিকটা, স্ট্র্যাণ্ড রোড নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখনই।

বর্তমান স্ট্র্যাণ্ড রোডের একাংশের দৃশ্য

ঐতিহাসিকদের মতে Calcutta Lottery Committee কর্তৃক স্ট্র্যাণ্ড রোডের পত্তন ঘটে ১৮২৩ খৃস্টাব্দে। এই স্ট্র্যাণ্ড রোড সম্পূর্ণরূপে গ'ড়ে ওঠার পরেই প্রতিষ্ঠালাভ করে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘাট এবং সেইসঙ্গে পোর্ট কমিশনার্স-প্রতিষ্ঠান। পোর্ট কমিশনার্সের ঐকান্তিক যত্নেই দিনে দিনে আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে স্ট্র্যাণ্ড রোডের ভিত্তি। দক্ষিণ থেকে মধ্যভাগে স্থাপিত হয় Hydraulic Crane Power এবং জেটি। আর উত্তরভাগে রাস্তার একাংশে সংস্থাপন ঘটে রেলপথের। পরে আবার উত্তরের হাটখোলা থেকে দক্ষিণের ইডেন গার্ডেনের সীমানা ছাড়িয়েও বিস্তারলাভ করে এই দৃঢ়তর স্ট্র্যাণ্ড রোড। ফলে সমগ্র অঞ্চলের পরিবেশ যেমন মনোহারী রূপ ধারণ করে দিনে দিনে, তেমনই তার আবহাওয়াও সুস্বাস্থ্যের অনুপন্থী হয়ে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে গভীর-ভাবে। আজও এ-পথেই অবস্থিত প্রাচীন টাঁকশালগৃহ, মেয়ো হাসপাতাল, সেকালের কাস্টমস হাউস, ইস্টার্ন রেলওয়ে ও পোর্ট কমিশনার্সের কার্যালয়, এবং সেইসঙ্গে ইডেন গার্ডেন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘাট। কলকাতার বিত্তশালী ব্যবসায়ীদেরও কেন্দ্রস্থল এই সুদীর্ঘ সরণী। তাই তার এক বিশেষ অংশ অবিরাম মুখর হয়ে থাকে দিবা-রাত্রি।

ঐতিহাসিক ঘাটসমূহের মধ্যে চাঁদপাল ঘাটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আগেই। তা ছাড়া বাবুঘাট, আউটরাম ঘাট এবং প্রিন্সেপস ঘাটও ঐতিহ্যগত দিক থেকে কোনো অংশেই উপেক্ষার নয়। রাণী রাসমণির ধর্মপ্রাণ স্বামী বাবু রাজচন্দ্র দাশ মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থেই বাবুঘাটের পত্তন ঘটে ১৮৩৮ খৃস্টাব্দে। বাবু রাজচন্দ্র দাশের প্রদত্ত অর্থে যে-ঘাট প্রতিষ্ঠিত—তা স্মরণ বা দর্শন করে বদান্যতার প্রতি জনসাধারণের উৎসাহ বর্ধন করার উদ্দেশ্যেই তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের নির্দেশেই উক্ত ঘাটের নামকরণ হয় বাবুঘাট বা বাবু রাজচন্দ্র দাশের ঘাট। আজও

ঘাটের এক প্রস্তর-ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে :

'The Right Hon'ble Lord William Cavendish Bentinck, Governor General of India, with a view to encourage public munificence to works of public utility, has been pleased to determine that this Ghat, erected at the expense of Baboo Rajchunder Doss in 1838, shall hereafter be called Baboo Rajchunder Doss's Ghat.'

প্রিন্সেপস ঘাট আজও বহন ক'রে চলেছে যাঁর স্মৃতি—নাম তাঁর জেমস প্রিন্সেপ। টাঁকশালের এসিস্ট্যান্ট এ্যাসে মাস্টারের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন ১৮১৯ খৃস্টাব্দে। তাঁর কর্মময় জীবন সত্যই বিস্ময়কর। তিনি একাধারে যেমন কাশী এবং কলকাতার টাঁকশালের উন্নতিবিধান করেন প্রভূত, তেমনই একজন কারিগররূপে তিনি সেতুবন্ধ রচনা করেন কর্মনাশা নদীতে, গবেষকরূপে তিনি উদ্ধার সাধন করেন সম্রাট অশোকের আমলের নানাবিধ শিলালিপি এবং ঐতিহাসিকরূপে সম্রাট ঔরঙ্গজেব-নির্মিত দাক্ষিণাত্যের জরাজীর্ণ মসজিদের ভগ্নপ্রায় মিনারসমূহ সংস্কার ক'রে রক্ষা করেন ইতিহাসকে। বিজ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সে-যুগের একজন বিরল দৃষ্টান্ত। 'গ্লিনিংশ অব সাইন্সেস' নামে যে-পত্রিকা পরে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামে অভিহিত হয়, এককালে তিনিই ছিলেন তাঁর সুযোগ্য সম্পাদক। উক্ত পত্রিকার প্রধান পরিচালকের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন ১৮৩২ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৩৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তা ছাড়া তিনি ছিলেন একজন সঙ্গীত-প্রিয় ব্যক্তি। কোম্পানীর মুদ্রা হবে কী ধরণের—এক সময় তার পরিকল্পনা করেন তিনি পিয়ানোর ওপর হাত রেখেই। Victor Jaquemont তাঁর 'Travels in India' নামক গ্রন্থে প্রিন্সেপ সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেছেন :

'He devotes his mornings to architectural plans and drawings, his days to assaying at Mint and his evenings to musical concerts.'

সম্ভবত অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে হঠাৎ মস্তিষ্ক-রোগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৪০ খৃস্টাব্দে। প্রিন্সেপস ঘাটে তাঁর স্মৃতি-ফলকে আজও একইভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে :

'One of the most eminent men of his day, who, after a short and brilliant career, fell a sacrifice to his ador in the persuits of science,'

প্রিন্সেপস ঘাটের পরিবেশ অত্যন্ত রমণীয়। একদিন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এবং তৎপুত্র সম্রাট পঞ্চম জর্জ সপত্নীক এসে জাহাজ ভিড়িয়েছিলেন এখানেই। এর অপর দিকেই অবস্থিত লর্ড নেপিয়ার অব ম্যাগডালার মর্মর-মূর্তি এবং ফোর্টের ওয়াটার গেট। ওয়াটার গেটের সম্মুখভাগেই অবস্থিত গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে গোয়ালিয়র যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন যে-সমস্ত সৈনিক—এই মনুমেণ্ট আজও স্মৃতি রক্ষা করছে তাঁদেরই। মনুমেণ্টটি শত্রু-সৈন্যের অজস্র বন্দুকের ধাতুর সংমিশ্রণে নির্মিত। তার উচ্চতা ৫৮ ফুট ৬ ইঞ্চি।

অবস্থানগত দিক থেকে আউটরাম ঘাটেরও কোনো তুলনা নেই—যদিও এ-ঘাট আজও নির্লজ্জ স্মৃতি বহন করছে সেই কুখ্যাত যুদ্ধবাজের। আজ যে-স্থানে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ-মূর্তি সংস্থাপিত, কিছুকাল আগেও সেখানে ছিল অশ্বারূঢ় বিশাল মূর্তি আউটরামের। যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত ধুরন্ধর ছিলেন আউটরাম। তিনি নিষ্ঠুর-ভাবে দমন করেন এ-দেশীয় স্বাধীনতা-প্রিয় বিদ্রোহীদের। কাবুল, কান্দাহার এবং গজনী থেকে সুরু ক'রে হিন্দুকুশ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে একাধিকবার যুদ্ধযাত্রা ক'রে তিনি সম্পূর্ণ শত্রু-মুক্ত করেন বৃটিশরাজকে। বিশেষ ক'রে সুচতুর কৌশলে তিনি সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে বৃটিশ-শাসকদের শঙ্কিত হৃদয়ে যে-অভয়দান করতে সক্ষম হন—তাতেই তিনি পরে 'ব্যারোনেট' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন অনায়াসে। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কাউন্সিলের মিলিটারী সদস্য-পদে বহাল্ ছিলেন। সম্ভবত ১৮৬১ খৃস্টাব্দে তিনি কে সি এস আই এবং ডি সি এল উপাধি গ্রহণ ক'রে ১৮৬৩ খৃস্টাব্দেই পরলোকগমন করেন।

যাই হোক, যদিও আউটরামের স্মৃতি আজও বহন ক'রে চলেছে আউটরাম ঘাট, তবু তার মনোহারী পরিবেশ এড়িয়ে চলা খুব একটা সহজসাধ্য নয় কারো পক্ষেই। তার পরিবেশগুণেই সংলগ্ন স্ট্র্যাণ্ড রোডের প্রশস্ত বুকে আসন্ধ্যা-সকাল এসে পায়চারী করে স্বাস্থ্যান্বেষী রোগী, বায়ু-বিলাসী ধনকুবের, নিশ্চিত এবং অনিশ্চিত গতি কবি-সাহিত্যিক এবং ভিক্ষান্বেষী অনিকেত জনসাধারণ। তা ছাড়া দূর-দূরান্তর থেকে আগত বিচিত্র জাহাজ বা স্টিমারের নোঙর-তোলা দৃশ্য দেখতেও আসেন অজস্র দর্শনার্থী।

উল্লেখিত ঘাটসমূহ ছাড়াও, আরও একাধিক ঘাট অবস্থিত স্ট্র্যাণ্ড রোডেই। যেমন জগন্নাথ ঘাট, নিমতলা ঘাট প্রভৃতি। প্রাচীন টাঁকশাল-গৃহের পার্শ্ববর্তী স্থানে জগন্নাথ মন্দির অবস্থিত। এই জগন্নাথের নাম থেকেই মন্দির সম্মুখবর্তী ঘাটের নামকরণ হয়েছে জগন্নাথ ঘাট। নিমতলা ঘাট অবস্থিত আরও উত্তরে—যেখানে শহর-কলকাতার ঐতিহাসিক শ্মশান বর্তমান। এখানেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-চিহ্নিত স্থান আজ অরক্ষিত অবস্থায় দিন গুণছে এই কাপুরুষ এবং কৃতঘ্ন যুগের।

স্ট্র্যাণ্ড রোডে আজ যা State Bank of India, এককালে তা'ই ছিল ইংরেজ সরকার পরিচালিত

The Government Bank of Calcutta. অবশ্য ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তা Bank of Bengal-এ নামান্তরিত হলেও, The Government Bank of Calcutta নামেই তার প্রতিষ্ঠা লাভ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে। তখন লর্ড মিণ্টো ছিলেন গভর্নর জেনারেল। এ সম্পর্কে হেনরী কটন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'In the centre of old Calcutta there is much to puzzle the visitors today. There is no Bank of Bengal on the Strand Road: it commenced its career in 1806 as the Government Bank of Calcutta, and did not receive its charter and present name until 1809, when Lord Minto had been Governor General for two years.'

স্ট্র্যাণ্ড রোডের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য স্থান ইডেন গার্ডেন। এমন গার্ডেন বা উদ্যান কেবল শহর-কলকাতায় নয়, সে-যুগে সারা বাংলা দেশের কোনো প্রান্তেই ছিল না তার দোসর। লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে ইডেন গার্ডেনের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরই দুই ভগ্নী। এ-ব্যাপারে জ্যেষ্ঠাভগ্নী এমিলি ইডেনই ছিলেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রথমা।

শোনা যায় : সেকালে ইংরেজ নরনারী এবং এ-দেশীয় সম্ভ্রান্ত জনের বৈকালিক বিহারক্ষেত্র ছিল একমাত্র লালদীঘি-অঞ্চল। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সে-স্থান অস্বাভাবিক ভিড়ে বিপর্যস্ত হতো প্রত্যহ। তবু অপরাহ্নে একবার প্রত্যেককেই আসতে হতো সেখানে। লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগ্নীদ্বয়ও আসতেন মাঝে মাঝে। কিন্তু একদিন এভাবেই বেড়াতে এসে অনিয়ন্ত্রিত ভিড়ে অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন জ্যেষ্ঠাভগ্নী এমিলি ইডেন। ক্লান্ত হয়ে নিরিবিলিতে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি। কিন্তু সে-উদ্দেশ্যে কোথাও পেলেন না তিলার্ধ স্থান। কেবল ভিড় আর ভিড়। বার বার সমগ্র লালদীঘি

● একালের ইডেন গার্ডেন

পরিক্রমা করেও, কেবল মুহূর্তকাল উপবেশনের তরে কোনো আসনের সামান্যতম অংশও তিনি মুক্ত পেলেন না তাঁর অনুকূলে। ফলে অত্যধিক ক্লান্তির কারণেই হোক, অথবা বিরক্তির মাত্রা অতিমাত্রার চরমে ওঠার দোষেই হোক, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অবশ্য জন-কয়েকের ত্বরান্বিত সেবার গুণে জ্ঞান ফেরে তাঁর তখনই। কিন্তু বুকের যন্ত্রণা কমে না। অশেষ যন্ত্রণা নিয়েই তিনি ফিরে আসেন তাঁর গৃহে। তারপর সেদিন রাত্রেই ভ্রাতা অকল্যাণ্ডের সমীপে তিনি প্রস্তাব পেশ করেন এক অভিনব উদ্যান প্রতিষ্ঠার। লর্ড অকল্যাণ্ড সানন্দেই স্বীকৃতি দান করেন এ-ব্যাপারে এবং যথাযোগ্য অর্থ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উক্ত ভগ্নীদ্বয়ের স্কন্ধেই অর্পণ করেন উদ্যান প্রতিষ্ঠার আশু-দায়িত্ব।

অতএব, ভগ্নীদ্বয় বিশেষ ক'রে জ্যেষ্ঠাভগ্নী এমিলি ইডেন, গঙ্গার তীরবর্তী এক বিস্তৃত অঞ্চল নির্বাচন ক'রে অজস্র মালী এবং শ্রমিকের সহায়তায় তাঁর পরিকল্পিত উদ্যান প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করেন নিজেকে। এভাবেই প্রায় বছর-তিনেক অবিরাম পরিশ্রমের বিনিময়ে, ফুলে-ফলে এবং নির্লিপ্ত আলো-ছায়ার বিচিত্র বাহারে, অভিরাম মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে যে-পল্লব-খচিত বিস্তীর্ণ উদ্যান—লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁর ভগ্নী ইডেনের নামেই তার নামকরণ করেন ইডেন গার্ডেন।

ইডেন গার্ডেন অলৌকিক ইডেন বা স্বর্গের অনুকরণে গ'ড়ে না উঠলেও, এককালে পার্থিব স্বর্গোদ্যানের মতোই তার মোহিনী মায়ার বিন্যাস ছিল সর্বত্র। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের স্বাধীন সরকার একদিকে অজস্র বৃক্ষের মূলোৎপাটন ঘটিয়ে এবং আরেকদিকে বেতার-কার্যালয়ের উদ্ধত ভবন নির্মাণ ক'রে সমগ্র উদ্যানের প্রকৃত পরিবেশ নিধন করলেও, সৌন্দর্য তার আজও বজায় আছে খানিকটা। আজও এখানে

দাঁড়িয়ে আছে বর্মীর প্যাগোডা—যা রেঙ্গুনস্থ প্রোম-অঞ্চল থেকে আমদানী ক'রে, ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের এক যুদ্ধোত্তর সময়ে এখানে স্থাপন করা হয়। সেকালের মৃণাল-খচিত সরোবরের অস্তিত্ব বজায় আছে আগের মতোই। আর পাখির কলালাপে জেগে আছে মুক্তি এবং আছে পুষ্পিত তরুলতার আলো-ছায়ার বাহার—যা প্রতি বিকেলেই গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবীন-নবীনাদের এবং প্রবীণ-প্রবীণাদেরও।

সেকালের যে-মহিলার নামে নামকরণ ঘটেছে ইডেন গার্ডেনের—সেই এমিলি ইডেন ছিলেন বহু গুণের আধার। একজন সুলেখিকারূপেও তিনি স্মরণযোগ্যা সর্বকালে। ইডেন গার্ডেন প্রতিষ্ঠার পর একে একে তিনি রচনা করেন একাধিক গ্রন্থ। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁর 'Portraits of the People and Princes of India', 'Up the Country', 'Letters from India', 'The Semi-detached House.' এবং 'The Semi-attacked Couple.' তাঁর স্বলিখিত দুই খণ্ডে প্রকাশিত পত্রগুচ্ছে ভারতবর্ষ এবং বিশেষ ক'রে কলকাতার তদানীন্তন চিত্রের সমাহার ঘটেছে প্রভুত পরিমাণে—বর্তমান যুগে বা নবীন গবেষকবৃন্দের কাছে অমূল্য সম্পদ বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

স্ট্র্যাণ্ড রোড অঞ্চলের আরেক বিশেষ দ্রষ্টব্য ফোর্ট বা কেল্লা। এ-কেল্লা তদানীন্তন লালদীঘি-অঞ্চল থেকেই স্থানান্তরিত হয় এখানে। সমগ্র কেল্লা অষ্টকোণাকৃতি। দু'লক্ষ স্টার্লিং ব্যয়ে কেল্লার নির্মাণকার্য সমাধা হয় পলাশীর যুদ্ধের ঠিক পরবর্তী সময়ে। সমগ্র কেল্লা বিশেষ এক পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত—যা প্রয়োজন বোধে গঙ্গার ধারায় পরিপূর্ণ করার ব্যবস্থা আছে। কেল্লার ছয় দিকে ছ'টি গেট—যথা সেণ্ট জর্জেস গেট, দি ট্রেজারী গেট, চৌরঙ্গী গেট, দি পলাশী গেট, ক্যালকাটা গেট এবং ওয়াটার গেট। প্রতি তোরণবর্তী অংশেই শীর্ষতম সেনানায়কদের আবাসগৃহ বর্তমান। কেল্লার অন্তরদেশে অবস্থিত সেণ্ট পিটার্স চার্চ এবং সেণ্ট পেট্রিকের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত রোমান ক্যাথলিক চার্চ। তা ছাড়া সৈনিকদের কুচকাওয়াজ করার প্রশস্ত ময়দান যেমন আছে, তেমনই আছে সামরিক জেলখানা। এই জেল-সংলগ্নই একটি গুদামঘরের অবস্থিতি চোখে পড়ে—যার প্রস্তর-ফলকের উৎকীর্ণ লিপি হলো এই :

'This building contai s 51,258 maunds of rice, and 20,023162 maunds of paddy which were deposited by order of the Governor Gener l and Council under the inspection and charge of John Belli, agent for providing victualling stores, to this garrisson, in the months of pril and May, 1852.'

এক অস্ত্রাগারী-কক্ষেরও অবস্থিতি ঘটেছে কেল্লার অন্তরদেশে—যেখানে ইংরেজ-শত্রু-সৈন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রাদি, যাবতীয় পোষাক এবং পতাকাদিই সযত্নে রক্ষিত আজও—যদিও বর্তমানে কেল্লা আর ইংরেজদের অধিকারে নেই।

আজ যেখানে কেল্লা, কয়েক শতাব্দী আগে সেখানেই এক শান্ত প্রকৃতির ছায়াতলে অবস্থিতি ছিল বর্ধিষ্ণু গোবিন্দপুরের। এই গোবিন্দপুর গ্রামেই, বর্গী দস্যুদের উৎপাতমুক্ত হয়ে অনির্বেদ পরিবেশে বসবাস করছিলেন তদানীন্তন বিত্তশালীদের একটি বিশেষ শ্রেণী। এমন কি, বিশ্ব-বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদি-পুরুষেরও অধিবাসক্ষেত্র ছিল এখানে। তাঁদের আদি-পুরুষদ্বয়ের নাম মহেশ্বর এবং শুকদেব। গোবিন্দপুরে অবস্থানকালে একদল ধীবর কর্তৃক তাঁরা ঠাকুর আখ্যা লাভ করেন। তারপর সে-ই থেকে ঠাকুর শব্দটিই সসম্মানে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তাঁদের প্রসিদ্ধ পদবীরূপে। তা ছাড়া মনীষী রাজনারায়ণ বসুর পূর্ব-পুরুষও বসবাস করতেন গোবিন্দপুরেই। এ-সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্ম-চরিতে নিজেই উল্লেখ করেছেন :

'আমার পূর্ব-পুরুষদিগের নিবাস গড়গোবিন্দপুরে ছিল। ইংরেজেরা যখন ঐ স্থানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করেন, তখন তাহার এওয়াজী জমি কলিকাতার বাহিরে সিমলা পল্লীতে আমার পিতৃ-পুরুষদিগকে দেন।'

ঠিক এভাবেই দুর্গ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে গোবিন্দপুর ত্যাগ করেন আরও অজস্র ঐশ্বর্যশালী পরিবার। তাঁরা কেউ সুতানুটী, কেউ সিমলা-পল্লী, কেউ খিদিরপুর এবং কেউ বা আরও দূরবর্তী অঞ্চলে স'রে গিয়ে স্থাপন করেন তাঁদের নতুন বসতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁদের সেই নতুন বসতিও আজ প্রাচীনতম ব'লেই প্রতীয়মান হবে আমাদের কাছে। কারণ যুগের পর যুগ কেটে গেছে অনেক। দুর্গ-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আত্মপ্রকাশ করেছিল যে-নতুন, আজ তার বয়স বেড়েছে নিঃসন্দেহেই। সুতরাং সেও আজ অতীত। এবং অতীত বলেই হয়তো আজ তার উদ্দেশেও গবেষণার গভীর সমীক্ষণ সুরু হয়েছে এ-যুগের নবীনতম কৌতুহলীদের।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী
১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩॥০ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩॥০
বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

পানীয় জলের কাহিনী

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

চাঁদের আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে তাজমহলকে।

আগ্রা দুর্গের এই অলিন্দে এসে দাঁড়ালে তাজমহলকে পরিষ্কারভাবে দেখা যায়। স্থবির শাহজাহান বুভুক্ষুর মত তাকিয়ে আছেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর স্মৃতিসৌধের দিকে। আজ তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দী। যাঁর একটিমাত্র অঙ্গুলি সঙ্কেতে কত অবিশ্বাস্য ঘটনা সংঘটিত হত, আমীর-ওমরাহবর্গ তটস্থ হয়ে উঠতেন, প্রজারা সদাশয়তার জন্যে জয়ধ্বনি দিত—হিন্দুস্থানের সেই একচ্ছত্র সম্রাট শাহজাহান আজ বন্দী। তাঁর তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করে রেখেছেন এই আগ্রা দুর্গে।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শাহজাহান তাজমহলের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। মমতাজ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছেন বহুদিন। এই অলস অবসরে প্রিয়তমা পত্নীর বহু কথা মনের আনাচে-কানাচে ভিড় করে এলেও, আজ মমতাজের একটি কথাই বারংবার মনে পড়ছে। ঈদ উৎসব উপলক্ষে তিনি বালক আওরঙ্গজেবকে জামা-কাপড় পরিয়ে দিচ্ছিলেন।

জাহাঙ্গীর পৌত্রদের নিয়ে যাবেন নামাজে। যুবরাজ খুরম কক্ষে প্রবেশ করলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মমতাজ বললেন, জরির শেরওয়ানি পরে আওরঙ্গজেবকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে দেখো।

খুরম বললেন, সত্যি ভাল দেখাচ্ছে। তোমারই মত রং পেয়েছে ও। মুখের আদলেও তোমার সঙ্গে মিল রয়েছে।

—তুমি দেখে নিও আমার এই ছেলে বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মমতাজের সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে রেখেছে আওরঙ্গজেব। জন্মদাতাকে চূড়ান্ত অপমানের পর বন্দী রেখে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। মমতাজের সৌভাগ্য যে তিনি এই দৃশ্য না দেখেই পরপারে চলে যেতে পেরেছেন।

—দাদু!

—কে?

শাহজাহান মুখ ফিরিয়ে দেখলেন গুলরুখবানু এসে দাঁড়িয়েছে। সুজার মেয়ে গুলরুখ। আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হতভাগ্য সুজা সুদূর বিহারের মুঙ্গের নগরে আশ্রয় নিয়েছেন। এই বিশৃঙ্খলার দরুণ গুলরুখের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তাঁর। অসহায়া মোগল-কুমারী যখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় তার উদ্ধারকারিণী দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলেন—তিনি আর কেউ নন, সম্রাটনন্দিনী জাহানারা।

এই বন্দীশালায় এসে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে জাহানারা অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন আওরঙ্গজেবের কাছে। মদগর্বী আওরঙ্গজেব সাক্ষাৎ করতে আসেন নি। পরিবর্তে পাঠিয়েছিলেন এক দীর্ঘ পত্র। তাতে লিখেছিলেন, পিতা যদি তাঁকে ক্ষমা করে, হিন্দুস্থানের সম্রাটরূপে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত আছেন। বলা বাহুল্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে শাহজাহান মত প্রকাশ করেন নি। জাহানারা তখন স্বয়ং আওরঙ্গজেবের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে কোন সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি। জাহানারা অনেক বোঝালেন। বললেন, পিতা আর ক'দিনই বা বাঁচবেন। তাঁকে বন্দী করে রেখ না। ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ বন্ধ কর।

আওরঙ্গজেব এই কথায় কর্ণপাত করলেন না। বরং তাঁকে বললেন, সারা জীবনই তো আপনি পিতার সেবা করলেন, কি লাভ হয়েছে তাতে আপনার? বৃথা তাঁকে আঁকড়ে রয়েছেন। আমার পক্ষে যোগ দিয়ে অন্যান্যদের মত সুখে থাকুন।

ঘৃণাভরে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন জাহানারা—রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, তোমার স্পর্ধার প্রশংসা করি আওরঙ্গজেব। পিতাকে সেবা করি আমি অন্তর থেকে, লাভ-লোকসানের প্রশ্ন এখানে গৌণ। সুখের দিনে আমি তাঁর কাছে ছিলাম, আজ দুঃখের দিনেও তাঁকে পরিত্যাগ করব না।

জাহানারা শিবির থেকে বেরিয়ে এলেন। আওরঙ্গজেব শিবিরের দ্বার প্রান্তে এসে বললেন, অন্য কেউ এই ভাবে কথা বললে আমি তার শাস্তির ব্যবস্থা করতাম। কিন্তু আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনাকে আমি মান্য করি।

—নিজের ভাগ্যের প্রতি আমি নিজেই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ছি।

—বিদ্রূপ করছেন? করুন। পিতার কথা ছাড়া আর যদি কোন কথা থাকে বলুন, আমি তা রাখব।

একটু চিন্তা করে জাহানারা বললেন, সংবাদ পেয়েছি সুজার কন্যা গুলরুখ এই আগ্রাতেই দীনভাবে জীবন যাপন করছে। তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে উপকৃত হব।

—গুলরুখ!

—ওইভাবে বাস করলে ও নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে। আমাদের বংশগৌরব তাতে আহত হবে।

—অনুসন্ধান করে তাকে আগ্রা দুর্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এরপর থেকেই গুলরুখবানু শাহজাহান ও জাহানারার কাছে রয়েছে। পৌত্রীর সুন্দর মুখের দিকে তাকালেই মমতাজের ছায়া দেখতে পান সম্রাট। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমায় তুমি কিছু বলবে?

—এই ফলের রসটুকু খেয়ে ফেলুন। গুলরুখ ফলের রসের পাত্র এগিয়ে ধরল। শাহজাহান পাত্রটি হাতে নিয়ে পান করলেন।—এখন কেমন আছেন?

—ভাল থাকবার তো আর উপায় নেই। আছি একরকম। জেহান কোথায়?

—নামাজে বসেছেন।

—নামাজ হয়ে গেলে আমার কাছে আসতে বল।

গুলরুখ নিষ্ক্রান্ত হল। কিছুক্ষণের মধ্যে জাহানারা এলেন। চাঘতাই কুমারীর মুখে বয়সের ছাপ পড়েছে। চুলে হীরক-আভার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁকে দেখে শাহজাহান বললেন, আমি অত্যন্ত অস্থির বোধ করছি জেহান।

—কেন পিতা?

—দারা গেছে। আমার প্রিয় পুত্র দারাকে হত্যা করেছে আওরঙ্গজেব। সুজা আর মুরাদ সম্বন্ধে নিয়ত আমার মনে অস্থিরতা। ওদের বিষয় কিছু জান?

কম্পিতকণ্ঠে জাহানারা বললেন, আমি কিছু শুনি নি।

—আমার অভিজ্ঞ শ্রবণশক্তিকে প্রতারিত করো না। তোমার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। আমার কাছে লুকিয়ো না। যে কোন দুঃসংবাদকে আমি সহজভাবে গ্রহণ করব।

—মুরাদ- - -মুরাদ আর- - -জাহানারা নিজের কথা শেষ করতে পারেন না। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

—মুরাদও চলে গেল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক লহমা নীরব রইলেন শাহজাহান। তারপর বললেন, আওরঙ্গজেব আমাকে কেন হত্যা করছে না জেহান। আমার প্রতি তার এই অনুগ্রহ কেন?

কি উত্তর দেবেন জাহানারা। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন শাহজাহান। অলিন্দের এক স্তম্ভ আঁকড়ে ধরে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে বললেন, বানু তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তোমারই রক্তে গড়া আওরঙ্গজেবের তৈমুরের রক্ত নিয়ে মাতামাতি।

তাঁর কথার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতান উপস্থিত হল। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় মহম্মদ সুরূপও। ভ্রূকুঞ্চিত করে জাহানারা বললেন, আমরা দুর্গ থেকে বাইরে যাবার কোন চেষ্টা করছি কিনা, তুমি বোধহয় তাই দেখতে এলে?

সুলতানের গৌরবর্ণ মুখ আরো গৌর হয়ে উঠল। সে সসঙ্কোচে বলল, আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আমি আজ্ঞাবহমাত্র।

—তুমি পিতৃভক্তও বটে। আমার পুত্ররাও সময়কালে পিতৃভক্ত ছিল। সম্রাট বলে চললেন, তারপর তাদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এমন দিন কি আসবে না মহম্মদ, যেদিন তুমিও তোমার পিতাকে বন্দী করে একের পর এক সহোদরকে হত্যা করবে তখতের জন্যে?

—দাদু—

—আমার কথার উত্তর দাও?

—আমার সুবিখ্যাত পূর্বপুরুষ আকবর, জাহাঙ্গীর ও আপনি যে আসনকে অলঙ্কৃত করেছেন, যোগ্যতার বিচারে তাতে বসবার অধিকার আমার কোথায়?

—সাবাস। পৌত্রের এই কথা শুনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শাহজাহান। বললেন, তোমার পিতাকে কখন এই কথা বলেছো?

—না। একটু ইতস্তত করে সুলতান বলল, পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন সেই শর্তটির সম্পর্কে আপনার মতামত জেনে নিতে।

নিজের জানুতে মুষ্ট্যাঘাত করে শাহজাহান বললেন, অর্থাৎ আমি যদি সর্বজনসমক্ষে তার মাথায় তাজ পরিয়ে দিয়ে তাকে সম্রাট বলে স্বীকার করে নি। তা হবার নয় মহম্মদ। এই প্রস্তাবকে আবার আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলাম।

কুর্নিশ করে মহম্মদ সুলতান অলিন্দ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। আগ্রা দুর্গের এই বিখ্যাত জেনানামহল আজ নিঝুম নিস্তব্ধ। চতুর্দিকে অন্ধকারের রাজত্ব। কক্ষের পর কক্ষ ও অলিন্দ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল সুলতান। দুর্গ থেকে বেরিয়ে তাকে আওরঙ্গজেবের শিবিরে যেতে হবে। তিনি অপেক্ষা করছেন শাহজাহানের উত্তরের। একটি কক্ষে প্রবেশ করে সুলতান বিস্মিত হল, কক্ষটি অন্ধকার তো বটেই, বেরিয়ে যাবার দ্বারও রুদ্ধ। অথচ এই পথ খোলা না থাকলে দুর্গপ্রাঙ্গণে নামবার উপায় নেই। কে এই কাজ করল! কার এত সাহস? সুলতান এগিয়ে গিয়ে দ্বারের অর্গল উন্মুক্ত করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। এই সময় কার স্পর্শ পেল বাহুতে।

—কে?

নরম মিষ্টি কণ্ঠে উত্তর এল, আমি—

বিস্মিত সুলতানের মন মুহূর্তের মধ্যে রসসিক্ত হয়ে উঠল। দু'হাত দিয়ে গুলরুখকে নিজের কাছে আকর্ষণ করল। —গুল, তুমি—!

গুলরুখবানু প্রিয়তমের বুকের উপর তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছে।

—কি হয়েছে বানু?

—আমার ভীষণ ভয় করছে।

—ভয়! কিসের ভয়?

আরো নিবিড়ভাবে মহম্মদ সুলতানকে জড়িয়ে ধরে গুলরুখ বলল, পিতা তখত পাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। মৃত্যুবরণ তাঁকে করতেই হবে। দাদুও আর বেশিদিন নেই—আমি তখন কোথায় যাব? কে আমায় আশ্রয় দেবে?

—আমি তোমায় আশ্রয় দেব। যদিও আমার জন্মদাতা তোমার পিতাকে হত্যা করার জন্যে ব্যগ্র। তুমি আমাদের শত্রুকন্যা। তবু আমি তোমাকে বিয়ে করব।

—আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না।

—মহম্মদ সুলতান কখনও কাউকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেয় নি। আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। নিজের কথা প্রাণ দিয়ে রাখব।

এই সময় এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল। জাহানারা উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে রৌপ্যনির্মিত একটি বাতিদান। ঝটিতে সুলতানের কাছ থেকে সরে এল গুলরুখ। লজ্জায় লাল হয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। সুলতানেরও সেই এক অবস্থা। তিনি দুজনকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, অন্ধকার ঘরে একটি অসহায়া কুমারীকে স্তোক দেওয়া এক কথা, আর তাকে বিয়ে করে সুখী করা আরেক কথা মহম্মদ।

কোনক্রমে নিজের সঙ্কোচ কাটিয়ে সুলতান বলল, আমি নিশ্চয় নিজের কথা রাখব।

—তুমি গুলরুখকে যা বলেছো আমি দৈবাৎ তা শুনে ফেলেছি। এখন যা বললে তাও শুনলাম। কিন্তু তোমার এই নিশ্চয়তা যে মূল্যহীন নয় তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আমার দৃঢ় ধারণা আওরঙ্গজেবের এই বিয়েতে মত হবে না। তার অমতে তুমি নিজের কথা রাখবে কি ভাবে?

সুলতান দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, তিনি অমত করবেন না। যদি অমত করেন তবুও আমার কথার নড়চড় হবে না।

জাহানারা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নিজের দু'হাত প্রণয়ীযুগলের স্কন্ধের উপর ন্যস্ত করে বললেন, অসম সাহসই আবহমান চাঘতাই পুরুষদের জয়যুক্ত করেছে।

তোমার সাহস প্রশংসনীয়। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন।

আলোয় ঝলমল করছে শিবিরের অভ্যন্তর। চিন্তান্বিত আওরঙ্গজেব পদচারণা করছেন। অপেক্ষা করছেন মহম্মদ সুলতানের। দারা ও মুরাদকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়েছেন। এখন সুজাকে হত্যা করতে পারলেই নিষ্কণ্টক হন। তবে তার পূর্বে শাহজাহান যদি তাঁকে সম্রাট হিসেবে স্বীকার করে নেন—সুজাকে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই সুদূর বিহারে গিয়ে সুজাকে পরাস্ত করার চেয়ে তখ্‌তে বসে, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সৈন্য প্রেরণ করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করছেন। সুলতান শিবিরে প্রবেশ করল।

আওরঙ্গজেব গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, কি সংবাদ নিয়ে এলে মহম্মদ?

—আপনার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন না।

—আবার প্রত্যাখ্যান। বন্দী বৃদ্ধের এখনও এত তেজ। এই তেজ কি-ভাবে ধূলিসাৎ করতে হয় তাও আমি জানি। হায়দার—

বিশালদেহী শেখ হায়দার কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল।

—হায়দার, তুমি আগ্রা দুর্গে কর্মরত ছিলে কিছুদিন। দুর্গটি সম্পর্কে তোমার নিশ্চয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আছে?

—আছে জনাব।

—দুর্গের অভ্যন্তরে পানীয় জল নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা আছে?

—যমুনার সঙ্গে নালার যোগাযোগ ঘটিয়ে পানীয় জল দুর্গের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া হয়।

—আমারও সেই ধারণা ছিল। যাক, আজই জল যাওয়ার সেই পথ রুদ্ধ করে দেবে। লক্ষ্য রাখবে এক-ফোঁটা জলও যেন দুর্গের মধ্যে প্রবেশ না করে।

শেখ হায়দার অত্যন্ত বিস্মিত হলেও, মুখে বিস্ময়ের ভাব না ফুটিয়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল। আওরঙ্গজেবের আদেশ শুনে সুলতান স্তম্ভিত হয়ে গেল। পানীয় জলের পথ রুদ্ধ হবার পর দুর্গের অভ্যন্তরে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তার নিখুঁত চিত্র এখনই তার চোখের উপর ভেসে উঠল। কাতরকণ্ঠে বলল, পিতা—

তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে আওরঙ্গজেব বললেন, তোমার কণ্ঠস্বরে কাতরতা প্রকাশ পাচ্ছে মহম্মদ। আমার এই আদেশে সন্তুষ্ট হও নি?

—আপনি এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিন।

—কোন আদেশ দেবার পরমুহূর্তে আমি তা প্রত্যাহার করি না। তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধ এবার প্রস্তাবে সম্মত হবেন, এ তো সুখের কথা।

—এত কঠোর হবেন না পিতা।

মৃদু হেসে আওরঙ্গজেব বললেন, আমার পর তুমি হিন্দুস্থানের তখ্‌তে বসবে মহম্মদ। ভাবী সম্রাটের এত কোমল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যাও বিশ্রাম কর গিয়ে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতার মুখের উপর আর কিছু বলা সম্ভব হল না। কিছুটা বিরক্ত ভাব নিয়েই ওখান থেকে নিজের শিবিরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল মহম্মদ সুলতান।

প্রথমে কিছু বুঝতে পারা যায় নি। দুঃসংবাদটি জাহানারার কানে পৌঁছল সন্ধ্যার সময়। তিনি নামাজ শেষ করে পিতার কাছে যাচ্ছিলেন, পথেই সুলতানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। সে গম্ভীর গলায় বলল, একটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি।

—দুঃসংবাদ।

—দুর্গে পানীয় জল আসার পথটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

স্তম্ভিত হয়ে যান জাহানারা। কিছু-ক্ষণের জন্যে তাঁর বাকরোধ হয়ে যায়। শেষে তিনি বলেন, উঃ আল্লাহ। আওরঙ্গজেবকে কি দিয়ে নির্মাণ করেছিলেন তিনি জানেন। পিপাসা-কাতর পিতা তাকে সম্রাট হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হবেন, এই পরি-কল্পনার উদ্দেশ্য বোধহয় তাই। কিন্তু সংবাদটি আমাদের জানাতে আসার তোমার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে মহম্মদ।

—পিতার সংবাদবাহক হিসেবে আসি নি। তাঁর অজ্ঞাতসারেই এসেছি। আপনাদের সাহায্য করতে।

—সাহায্য। কি সাহায্য তুমি আমাদের করতে পার?

—অন্য পথ দিয়ে জলের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—তোমার সাহস আছে। কিন্তু এই উপকার নেওয়া সম্ভব হবে না। তুমি তোমার জন্মদাতাকে ভালভাবে না চিনলেও আমরা চিনি। তোমার সাহায্য দানের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। যৌবনে কেন নিজের মৃত্যুকে আহ্বান করছো?

উত্তরে কিছুই বলতে পারল না সুলতান। জাহানারা আবার বললেন, আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি। আওরঙ্গজেবের কার্যকলাপকে সমর্থন করতে পারছো না। যদি বাঁচতে চাও, আগ্রার এই বিষের হাওয়া থেকে দূরে চলে যাও। গুলরুখবানুকে সঙ্গে নিয়ে অনেক দূরে গিয়ে শান্তিতে বাস কর।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। এই অভুতপূর্ব সংবাদ শুনে শাহজাহান হতবাক হয়ে গেলেন। সমরখন্দ, পারস্য ও কাবুলের আঙুরের রস ও বসরার গোলাপ দিয়ে প্রস্তুত জল ছাড়া আর কোন পানীয় যিনি গ্রহণ করেন নি, সেই হিন্দুস্থানের সম্রাট যমুনার এক-ফোঁটা জল থেকেও বঞ্চিত হলেন। কি বিচিত্র পরিহাস। নিজের হতবাক ভাবকে কাটিয়ে নিয়েও শাহজাহান এ সম্পর্কে কিছুই বললেন না। নির্নিমেষ

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের দিকে।

সে রাত কাটল কোন রকমে। তীব্র জলের অভাব অনুভূত হল পরের দিন দুপুর থেকে। পিপাসায় সকলের গলা শুকিয়ে উঠল। বেগমরা বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। করুণকণ্ঠে শাহজাহান বললেন, আমরা কোথায় আছি জেহান, মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে, না আগ্রা দুর্গে।

তিক্তকণ্ঠে জাহানারা বললেন, আমরা আওরঙ্গজেবের রসিকতার রাজ্যে আছি পিতা। চোখের উপর যমুনা বয়ে চলেছে আর একফোঁটা জলের জন্য আমরা হাহাকার করছি।

—আমি লিখব। সেই দুরাত্মাকে এখুনি আমি পত্র লিখব জেহান। তার ব্যবস্থা কর।

পিপাসার্ত শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে পত্র পাঠালেন। পত্রে তিনি লিখলেন, পিপাসার জল বন্ধ করে দিয়ে তুমি যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়েছো তা অভূতপূর্ব। পিতাকে বন্দী করে, পদে পদে তাকে হীন প্রতিপন্ন করে তুমি কি আনন্দ লাভ করছো আমি জানি না। আমি বৃদ্ধ, বেশিদিন জীবিত থাকার সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে আমার মৃত্যুর পর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করলে ভাল করতে। তোমার যে স্বরূপ বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে তার দৃষ্টান্ত আমাদের বংশে আর নেই। যা হোক, একবিন্দু জলের জন্যে আমরা লালায়িত। আমার প্রতি যদি করুণা করতে না চাও, করো না। তোমার মাতৃস্থানীয়া মোগল-পরিবারের যে সমস্ত মহিলা এখানে রয়েছেন তাঁদের প্রতি করুণাপ্রবণ হও, জলের ব্যবস্থা করে তাঁদের জীবন দান কর।

গভীর মনঃসংযোগে আওরঙ্গজেব চিঠিখানা পড়লেন। সুলতান নিকটে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে আওরঙ্গজেব বললেন, শাহনশাহকে শেষ পর্যন্ত মিনতি করে চিঠি দিতে হল।

—আর ওদের মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না পিতা। যমুনার জল দুর্গে প্রবেশ করবার অনুমতি দিন।

—মহম্মদ, তোমার এই ব্যস্ততার কারণ পিতামহর প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা, না অন্য কিছু?

—অন্য আর কি কারণ থাকতে পারে?

—পারে বইকি। তোমার এই অত্যধিক ব্যস্ততার কারণ আমি অনুসন্ধান করেছি। জলের অভাবে আর সকলের সঙ্গে গুলরুখও পিপাসায় কাতর, এই কারণেই তুমি এত বেশি উতলা হয়ে পড়েছো, তা আমি জানি মহম্মদ।

সুলতান মাটির সঙ্গে মিশে গেল।

পরমুহূর্তে ক্রোধে ফেটে পড়লেন আওরঙ্গজেব।—মূর্খ যুবক। নিজের হিত সম্পর্কে এত অজ্ঞ তুমি। শত্রু-কন্যাকে পত্নীরূপে পেতে চাও!! অপদার্থ। যাও এখান থেকে, নিজের চরিত্রকে সংযত কর গিয়ে।

সন্ধ্যা অতিক্রম করেছে কিছুক্ষণ পূর্বে। ঝড়ের বেগে গুলরুখবানুর কক্ষে প্রবেশ করল মহম্মদ সুলতান। সুজার আদরিণী কন্যা গুলরুখ তখন পিপাসায় নিমীলিত নেত্রে নির্জীব অবস্থায় শয্যায় পড়েছিল। সুলতান ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, ওঠ বানু। এস, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সুলতানের বাহু দু'হাত দিয়ে আকর্ষণ করল গুলরুখ। নিস্তেজকণ্ঠে বলল, কোথায়?

—আমি জানি না। তবে এখান থেকে দূরে—অনেক দূরে। গুপ্তদ্বার দিয়ে বাইরে যাব আমরা। সেখানে ঘোড়া অপেক্ষা করছে। এস বানু—

—আমি----আমি যে উঠতে পারছি না।

নিজের দুই বলিষ্ঠ হাত দিয়ে গুলরুখকে তুলে নিল সুলতান। ওর সুন্দর মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্যে দৃষ্টিপাত করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। সেই সময় শেখ হায়দার উত্তর-পত্র নিয়ে উপস্থিত হল শাহজাহানের কাছে। আওরঙ্গজেব লিখেছেন—

আপনার পত্রের বক্তব্যে ব্যথিত হলাম। আপনি লিখেছেন বর্তমানে আমার যে স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত নাকি আর নেই। অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না, বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষ মাননীয় হুমায়ুনের রাজত্বকালে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সূত্রপাত প্রথম হয় এবং প্রাতঃস্মরণীয় আকবরের আমলে পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের অভ্যুত্থানের ইতিহাস জানা যায়। অধিক দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, আপনিও নিজের পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সুতরাং আমার কার্যকলাপে বংশের ঐতিহ্য রক্ষিত হয়েছে বলা চলে। যা হোক, আপনি পানীয় জলের জন্যে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছেন। আপনাকে ঐভাবে হত্যা করার কোন অভিপ্রায় আমার নেই। পুনরায় যমুনার জল দুর্গে যাতে প্রবেশ করতে পারে সে আদেশ দিয়েছি। ভরসা আছে, আপনি হিন্দুস্থানের শাহনশাহরূপে আমাকে স্বীকার করবেন।

পত্রপাঠ শেষ করে শাহজাহান কেমন অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেলেন। জাহানারা নিকটেই ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কিসের শব্দ হচ্ছে জেহান?

—নালা দিয়ে আবার যমুনার জল দুর্গে প্রবেশ করছে পিতা। যাই, আপনার জন্যে জল নিয়ে আসি।

অন্যমনস্কভাবে এই কথা বলে প্রস্থানোন্মুখ জাহানারা আবার দৃষ্টিপাত করলেন চন্দ্রালোকিত যমুনার দিকে। তখনও দেখা যাচ্ছে নদীর তীর ধরে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে একটি অশ্ব। অশ্বের আরোহী অনির্দিষ্ট পথের যাত্রী দুই তরুণ হৃদয়—মহম্মদ সুলতান ও গুলরুখবানু।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মোগল-কুমারী পিতার জন্যে জল আনতে চললেন।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চতুর্দশ প্রবাহ ॥

"শুধু নবদ্বীপ নয়—শান্তিপুরের কাপড়ের ব্যবসারও খ্যাতি ছিল। বস্ত্র-ব্যবসায়ে বাঙালীর নিপুণতার বিস্ময়কর ইতিহাস খুঁজলে আসতে হবে নদীয়ায়।"

ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ আর—ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালী—একদা ধনে জনে, বিদ্যায় সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধশালী অবিভক্ত বাংলার এই জেলাগুলো ছিল জীবন-সরণী। আজ আমাদের কাছে এইসব অতি কাছের দেশ বহুদূর হয়ে গেছে, আজ এরা ভূগোলের শুধু নামমাত্র। তবুও—

তবুও বাংলার অতীত বাণিজ্যের ইতিকথায় পদ্মা-মেঘনার দেশের কথা বারে বারে এসে যায়। এটাই স্বাভাবিক। সেই দীর্ঘ বিস্তীর্ণ সবুজ উর্বরা মাটির দেশ ময়মনসিংহ জেলার কথা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যেদিকে তাকাও পলিমাটি। অপর্যাপ্ত শস্যভরা প্রান্তরে ভূমিলক্ষ্মীর হাসি ছড়িয়ে পড়ছে। দূর থেকে মনে হয়, কেউ যেন ঘন সবুজের ছবি এঁকে রেখেছে। এই—

ময়মনসিংহ। এ জেলার পাট, নেত্রকোণার এড়ির কাপড়, টাঙ্গাইলের এড়ির কাপড়, ফরাসডাঙ্গার ধুতি, কার্জন আর বাজিতপুরের ছুরি-কাঁচির একদিন দেশ জুড়ে খ্যাতি ছিল। কুমিল্লার অতি মসৃণ কালো রঙের হুঁকা, খড়ম, ছড়ি, পিতল-কাঁসার বাসন, রামদা। নোয়াখালীর তাঁতের কাপড় তৈরিতে আর চট্টগ্রামের সামুদ্রিক বাণিজ্যে আমাদের পূর্বসূরীদের অবদানের ইতিহাস একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। একালের বাঙালীরা ভুলে গেছে, ভুলে যাবে যে একদা বাঙালীর ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প ছিল, ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। যে কারিগর ছুরি-কাঁচি তৈরি করতো, তার ছেলে—শুধু ছেলে কেন, অতি দূর-ভবিষ্যৎ বংশধররা পর্যন্ত ছুরি-কাঁচির নিপুণ কারিগর হওয়ারই স্বপ্ন দেখতো। যুগ যুগ ধরে তাদের রক্তধারায় তীব্র একটা পূর্বপুরুষের বৃত্তির নেশা। তারপর—

তারপর একদিন ভানুমতীর কুহকের মত সব পাল্টে গেল। এল ইংরেজ। ধুরন্ধর শাসনকর্তা কর্নওয়ালিশ প্রবর্তন করলেন জমিদারী প্রথা। জমির চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগে কতকগুলো অবস্থাপন্ন লোক বসে বসে অনুপার্জিত অর্থে জীবনের বিলাস-ব্যসনকে বেশ মধুময় করে তুলতে লাগল। এই সামন্ততান্ত্রিক যুগেই বাঙালীর বাণিজ্যের অবনতি ঘটতে সুরু করল। তারপর—

এল ইংরেজরা। প্রবর্তন হলো বিদেশী শাসনের। বাঙালীর ছেলেরা ইংরেজী পড়াশুনা করে তাদের দপ্তরে·

রাইটার অর্থাৎ কেরাণী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে সুরু করল। যাক এসব কথা—

বাঙালীর বাণিজ্য-বিমুখতার কারণ নিয়ে এই নিবন্ধ নয়—অতীতকালে এই বাঙালী জাতিরই কী বিস্ময়কর বাণিজ্যিক নিপুণতা ছিল, সেই ইতিবৃত্তের বিস্ময়কর কাহিনী ছড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায়।

নদীয়া জেলা। এই জেলার মাটি শ্রীচৈতন্যের পদরেণুরঞ্জিত পুণ্য মাটি। কিন্তু নবদ্বীপের নাম যেমন শোনা যায় তেমনি খ্যাতি আছে শান্তিপুরের। গেজেটিয়ার বলছে—It was of sufficient importance to be the head quarters of resident under East India Company.

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদর অফিস ছিল একদিন শান্তিপুরে। কোম্পানী একদিন দেড়শো হাজার পাউণ্ডের কাপড় কিনতো শান্তিপুরের - বাজার থেকে। কিন্তু আজ থেকে শত শতাব্দী পূর্বে ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না পেরে নদীয়ার বস্ত্রশিল্প ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যেতে লাগল। সাগরপার থেকে আসতে লাগল সুতো। যাকে বলা হতো বৃটিশ থ্রেড। এই বিলেতী সুতো দেশী সুতোকে একেবারে কোন্ অজানা অন্ধকারের রাজ্যে নির্বাসিত করে দিয়েছিল। কিন্তু—

তাঁতবস্ত্র বয়ন, বস্ত্রশিল্প অপসারিত হলেও—তার ওপরে দুর্যোগের অন্ধকার নেমে এলেও একমাত্র শান্তিপুরের বাঙালী তাঁতীদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলতে লাগল। তারা মসলিন বস্ত্রের কাজ অব্যাহত রেখেছিল এই সেদিন পর্যন্ত। ১৮৯৮ সালের হিসাবে দেখা যায় সাড়ে তিনলক্ষ টাকা মূল্যের কাপড় তৈরি হয়েছিল।

নবদ্বীপের আর মেহেরপুরের কাঁসারীরা একদিন পিতল আর ভরনের বাসন তৈরি করতো। আর এ জেলার অজস্র নদী আর খাড়ি বেয়ে পণ্যদ্রব্য চলে যেতো দূর-দূরান্তরে।

তালরস থেকে গুড় তৈরি করা একদিন বাঙালীর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। খানিকটা খেজুরগাছ কাটার মত করেই তালগাছের নতুন ডাল কেটে দিত চাষীরা। তারপর ইংরাজী 'ভি' অক্ষরের মত করে নিপুণ হাতে কাটতো তারা। এইখান দিয়েই বেরিয়ে আসতো রসের নির্ঝরধারা। ভাঁড়ে ভাঁড়ে রস নামাতো। তারপর উনানে জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হতো। নদীয়ার গুড়ের খ্যাতি ছিল। সারা বাংলা দেশে।

কুষ্টিয়ায় ছিল রেনুইক কোম্পানীর একটি ফ্যাক্টরী। এই কারখানার কথা হয়তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। মাছের ব্যবসাও চলতো পুরাদমে। এই জেলা থেকে রপ্তানী হতো প্রধানত পাট আর হাজার হাজার বস্তা তৈরি হয়ে বাংলা দেশের জেলায় জেলায় রপ্তানী হয়ে যেত। আর রপ্তানী হতো গুড়।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের ব্যবসার কথা না বললে বাঙালীর ব্যবসার ইতিহাসে ত্রুটি থেকে যাবে। কৃষ্ণনগরের পুতুলের খ্যাতি আছে লণ্ডনে, খ্যাতি আছে আমেরিকায়। এক তাল মাটি। আর কিছু নয়। কিন্তু এ মাটিকে কুরে কুরে কৃষ্ণনগরের বাঙালী কারিগর নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় অপরূপ মূর্তি সৃষ্টি করেছে। মূর্তিগুলো যেন কথা বলে। মনে হয় এই বুঝি জীবন্ত হয়ে হেঁটে চলে বেড়াবে। বহু টাকার মূর্তি, খেলনা বিক্রি হয় দেশে দেশে। কারিগররা দু'পয়সা পায়।

বাঙালীর ব্যবসার আরও একটি নজীর দেখিয়ে নদীয়া প্রসঙ্গ শেষ করবো। নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমা আজ বিদেশী রাষ্ট্র—কিন্তু মোহিনী মোহন মিলস লিমিটেডের চিমনীর ধোঁয়া আকাশে-বাতাসে প্রসারিত হয়ে গিয়ে আজও ঘোষণা করে বাঙালীর ব্যবসা-বুদ্ধির বিস্ময়কর প্রখরতা।

(ক্রমশঃ)

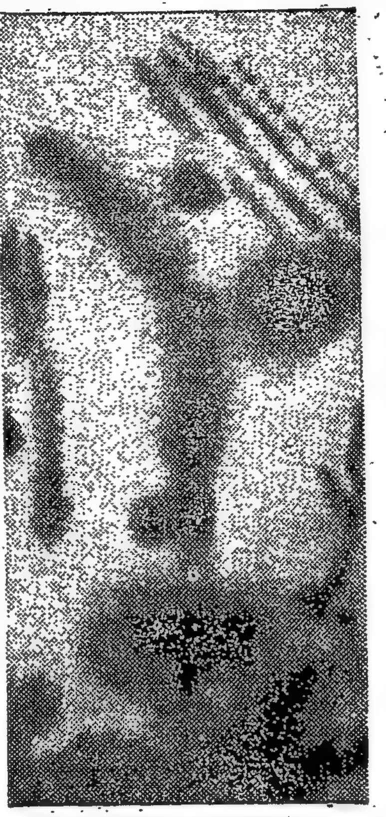

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনেকদিন পর আজকে আবার বড় হলঘরের ঝাড়লণ্ঠনগুলো ঝলমল করে জ্বলছে। সময় দেওয়া ছিল সন্ধ্যা সাতটা, কিন্তু তার আগেই সকলে এসে জমা হয়েছে অস্বস্তি আর উদ্বেগ-ভরা মনে। রহস্যের কিনারা হয় নি, হয়তো হবেও না। কিংবা এও বোধ করি, এক ধরণের নির্মম তামাসা। সেই কুলগ্নে যারা যারা উপস্থিত ছিল, তাদের মধ্যে অনেককেই দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে প্রথমে এসেছেন ডাঃ বরুণেন্দ্র বসাক। রামদুলাল দত্তের সঙ্গে একই গাড়িতে। তাঁরই নির্দেশে অভ্যাগতদের জন্য কফি, শরবত ও রূপোর ট্রে-বোঝাই বাদাম, কিসমিস, স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি পরিবেশন করার ব্যবস্থা হয়েছে।

'কিন্তু এসবের অর্থ কি ?'—অপর্ণা লাহিড়ী প্রশ্ন করল। চেহারা ফ্যাকাশে হলেও চোখে যেন বিদ্রোহের ফুলকি জ্বলছে।

'অত ব্যস্ত হবেন না মিসেস লাহিড়ী। সবাই একসঙ্গে হলে রামদুলালবাবু আমাদের ওঁর নিজস্ব মতামত কিছু জানাবেন—' আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাসলেন ডাঃ বসাক।

কমলেশ বসুও এসেছে। একই সঙ্গে। হরিণের চামড়া মোলানো সোফা সেটে পাশাপাশি বসেছে দুজনে। নীচু গলায় কথা বলছে।

'আমি তখনই বলেছিলাম—এসবের মধ্যে থেকো না।' বসন্ত মল্লিকের ভীতু ভীতু চেহারা দেখে আরও অকরুণ হয়ে উঠলেন মিসেস মল্লিক—'ভালো পরামর্শ কেই বা শোনে। এখন ঠ্যালা সামলাও। সে রাত্তিরে যদি আমার মাসতুতো বোনের ননদের মেয়ের অন্নপ্রাশনে যেতাম, তাহলে কি আর পুলিশে এত টানা-হ্যাঁচড়া করতে পারত।'

'আমি মানে তুমিই তো তখন মাধবীর'—হঠাৎ তোৎলা হয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্টভাবে কি বলতে চাইলেন বসন্ত মল্লিক।

'জানি—জানি, তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাও, সে খবর আমার আর জানতে বাকি নেই। নইলে মাধবীর সঙ্গে লুকিয়ে অফিসঘরে বসে ভাব জমাতে চেষ্টা করতে না—'

'ছি ছি—' বসন্ত মল্লিকের মুখের ভাবে অসহায় কাতরতা স্পষ্ট হয়ে উঠল—'ও আমার ছোট বোনের মত ছিলো। তুমি এসব কি বলছ।' কথা বলতে বলতে ডাঃ বসাকের দিকে চোখ পড়তেই বসন্ত মল্লিকের মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিলো। হয়তো এখনই কেসের কথা তুললে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। মাধবী যে তার কাছে চিঠিপত্র, গয়না, নগদ টা সব গচ্ছিত রেখেছিলো এবং এ সেসব পুলিশের জিম্মায় আছে, এক বাড়িতে বেমালুম চেপে গেছেন ব ভয়ে তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো

অনিল বিশ্বাস একপাশে নীচু করে বসে। পাশে একটি ই চেয়ারে সমরেশ ক্লান্ত অবসন্ন শরী চুপ করে শুয়ে আছে। ওঁর চোখে দৃষ্টি কেমন শূন্যতায় ভরা। সুর বিশ্বাস নামে সেই নার্সটিও একধা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। ডো ডিসুজা ভাঙা ভাঙা বাংলায় ও আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, নইলে এখা এ পরিবেশে ডাঙায় তোলা মাছে মত নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নি পারত না।

'ওই মেয়েটি কি সমরেশের নার্স ? সত্যজিৎ সামন্ত ঘরে ঢুকে সামান ইতস্তত করে বললেন—'আজকে আমাদের কেন ডাকা হয়েছে জানি না তবে এখানকার ঘরোয়া কথাবার্তা মধ্যে বাইরের লোকের থাকা কি উচিত ?'

ডাঃ বসাক মাথা নেড়ে বললেন—'এসব আলোচনা দিনের পর দিন কাগজে বেরিয়েছে। কাজেই এর মধ্যে লুকোচুরির কিছু নেই। আপনারা যখন সবাই এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমার বক্তব্য সুরু করা যাক। ভূমিকা বড় করব না, তবে রামদুলালবাবু আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, গোড়া থেকেই এ কেসটি বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। পর পর তিনটি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে আমাদের। তার মধ্যে দুটিকে যদি বা আত্মহত্যা বলে ধরে নিই, তাহলেও সুনন্দ মিত্রকে ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাক্রমে মেরে ফেলা হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এই তিনটি মৃত্যুকে আমরা হত্যাকাণ্ড বলে ধরে নিই, তাহলে কে বা কারা এই কাজ করেছে ? এদের মধ্যে কি কোন যোগ সূত্র আছে, না এগুলো সবই বিচ্ছিন্ন ঘটনা ? অনর্থক কেউ কাউকে খ

করে না। মাধবী সরকারের বেলায় মোটিভ খুঁজতে গিয়ে আমাদের এক বিশাল সমস্যার সামনে পড়তে হয়েছিল। এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই কোন না কোন কারণে আমরা সন্দেহ করতে বাধ্য হই।'

'আমার কিন্তু একটা প্রশ্ন আছে'—সত্যজিৎ সামন্ত কপালের ঘাম মুছে প্রশ্ন করলেন।

'এখন তো সবে ভূমিকা আলোচনা করছি এর মধ্যেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' সত্যজিৎ সামন্ত ঈষৎ বিকৃত সুরে বললেন—'ক্রাইম সম্পর্কে মুখরোচক আলোচনা ড্রইংরুমে বসে করতে মন্দ লাগে না, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশ কেস যখন ঝুলছে, তখন এই ধরণের আলোচনা আপনি কি উদ্দেশ্যে করছেন। রামদুলাল দত্তের কথা কথানুযায়ী আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি, আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য নয়, তাছাড়া আপনি কে?'

'ডাঃ বসাককে এই সব আলোচনা করতে আমিই ডেকেছি—' রামদুলাল দত্ত প্রায় হুমকি দিয়ে উঠলেন—'কথার মাঝখানে ডিসটার্ব করবেন না কেউ। আমরা যদি কোন প্রশ্ন করি, তাহলে শুধু তার জবাবটুকু দেবেন।'

শ্রোতারা এবারে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে হয়ে গেলো। ডাঃ বসাককে পুলিশের লোক বলে মেনে নিতে আর কোন দ্বিধা রইল না।

'কি বলছিলাম যেন'—হারিয়ে ফেলা কথার খেই ধরলেন ডাঃ বসাক সামান্য ইতস্তত করে—'হ্যাঁ, মাধবী সরকারের কথা। সন্দেহভাজনদের মধ্যে প্রথমেই সমরেশ সরকারের নাম মনে পড়ে যায়। কারণ বিশ্লেষণ করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি করব না, এ নিয়ে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গেছে।

'তারপর সুনন্দ মিত্র। ব্ল্যাকমেইলের ভয় ছিল তার। এর পরের নামটি হোল অপর্ণা লাহিড়ী। ঈর্ষার দাহ ওর মনে যথেষ্ট ইন্ধন যোগাচ্ছিল। বসন্ত মল্লিককে আমরা ভুলে যেতে পারি না। হ্যাঁ; তাঁর বিরুদ্ধেও প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। মাধবী সরকার মিঃ মল্লিকের কাছে যে সম্পত্তি গচ্ছিত রেখেছিল, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হবে না।

'মিসেস মল্লিক, আপনাকে এই অপ্রিয় খবরটুকু দিতে বাধ্য হচ্ছি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। এর ফলে আপনাদের পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে জেনেও একথা আমাকে তুলতেই হোল। নগদ ও গয়না মিলিয়ে প্রায় তেইশ-চব্বিশ হাজার টাকা মিসেস সরকার মিঃ মল্লিককে জমা রাখতে দেন। ইদানীং দু'বার রেসের মাঠে ভুল ঘোড়ার উপর বাজি ধরে কাউকে না জানিয়ে প্রায় কুড়ি হাজার টাকা আপনি নষ্ট করেছিলেন, তাই না মিঃ মল্লিক। নিজের স্ত্রীর কাছে কথা গোপন রাখা কিন্তু খুব অন্যায় কাজ। যাই হোক, এমনও হতে পারে সেই টাকাটা ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনি সেদিন রাত্রিবেলা মাধবী সরকারের শরবতের গ্লাসে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিলেন।'

'আমি—মানে না, কখনই এমন কাজ আমি করি নি—' বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন বসন্ত মল্লিক। —'মাধবী আমাকে টাকা দিয়েছিলো ঠিকই মিথ্যা কথা বলবো না, মনের মধ্যে এক-আধবার ভেবেছি যে এখনকার মত ওটা নিয়ে নিলে আমার মান-ইজ্জৎ বেঁচে যায়। কিন্তু মানুষ খুন আমি করি নি।'

বসন্ত মল্লিকের দিকে রামদুলাল দত্ত কঠোর ভঙ্গীতে তাকালেন। আবেগ-উচ্ছাসকে সংযত করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ ভেবে বসন্ত মল্লিক চুপ করে গেলেন তখনকার মত।

'মাধবী সরকারকে বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখলো অনিল বিশ্বাস। কিন্তু সেকথা সে বেমালুম চেপে গেলো। পুলিশের কাছে মিথ্যা কথা বলার পরিণাম যে তার অজানা ছিলো, তা নয়। তবে তারও কোনো মোটিভ আছে? এমন হতে পারে সমরেশ সরকারকে বাঁচানোর জন্য মাধবীদেবীর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা সে করেছিলো। সমরেশ সরকারের প্রতি তার ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসার কথা আমাদের সকলের জানা আছে।

'এই রকম একটা গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বিব্রত হয়ে আছি, এমন সময় ঘটল দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড। যাকে আমরা সন্দেহের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান দিয়েছি। সেই সুনন্দ মিত্র সমরেশ সরকারের দেওয়া জলের গ্লাসে সায়ানাইড মেশানো থাকার ফলে প্রাণ হারালো। সমরেশ সরকার কি তাকে ইচ্ছা করে বিষ দিয়েছে? প্রতিশোধ নেবার বাসনা কি তার মনের গোপনে কাজ করে চলেছিল? আর কে সুনন্দ মিত্রর মৃত্যু কামনা করত? ভেবে দেখতে গেলে কেউ না। বরং জলের গ্লাসটা রাখা ছিলো সমরেশ সরকারের জন্যেই। অতএব যে বিষ মিশিয়েছে, তার লক্ষ্য সুনন্দ মিত্র নয়, সমরেশ সরকার। অপর্ণা লাহিড়ী ও বসন্ত মল্লিক দুজনেই সেদিন দোতলায় সমরেশবাবুর ঘরে গিয়েছিল। অপর্ণা লাহিড়ীর সঙ্গে সায়ানাইড ছিলো, আর ছিলো—'

'বলেন কি ডাঃ বসাক?'—সত্যজিৎ সামন্ত বলে উঠলেন। উপস্থিত সকলের মধ্যে মৃদুগুঞ্জন সুরু হয়ে গেল।

'এখনই আমার কথা শেষ হয় নি।' ডাঃ বসাক জোর দিয়ে বললেন—'অনেক কিছু বলার রয়েছে। হ্যাঁ—অপর্ণা লাহিড়ীর হাতে বিষও ছিলো, মনে ইচ্ছাও ছিলো সেই বিষ সে মিশিয়ে দেয়। কিন্তু—। আমরা এখনও স্থির বলতে পারছি না সে অপরাধী কি না। তারপরে অনিল বিশ্বাস। সুনন্দ মিত্রের হাতে ধরা গ্লাস সে বদলে দিয়েছিল। কেন? মনে হয় সেই একই কারণে, অর্থাৎ সমরেশ সরকারকে বাঁচানোর তাগিদে তার এই অদ্ভুত আচরণ।

'আমরা কিন্তু আবার সেই একই সমস্যার স্রোতে ভেসে গেলাম, সমাধানের কূল-কিনারা মিলল না কোথাও। কে অপরাধী, সমরেশ সরকার, অপর্ণা লাহিড়ী, বসন্ত মল্লিক না অন্য কোন নিজেকে লুকিয়ে রাখা বুদ্ধিমান মানুষ।

'রামদুলাল দত্ত আমাকে এ কেস সমাধানে প্রচুর সাহায্য করেছেন। তাঁরই পরামর্শে সমরেশ সরকারকে আমি নার্সিংহোমে সরিয়ে ফেলি। বাড়িতে বাস করা ওঁর পক্ষে হয়তো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াবে, এই ভয় আমাদের ছিলো। কাউকে বিশ্বাস নেই বলে তিনতলার একদিকে চোদ্দ নম্বর ঘরটি বেছে নিয়ে সমরেশ সরকারকে সেখানে আলাদা করে রাখা হোল। বাইরে নোটিশ টাঙানো—প্রবেশ নিষেধ। ডে নার্সের কাজ আমি ইচ্ছে করেই ডোরা ডিসুজাকে দিলাম, আর রাত্রিবেলা মেট্রন নিজে দেখাশোনা করার ভার নিলেন। তাঁকে অবশ্য খুলে বলি নি, তবে আভাস দিয়েছিলাম কিছুটা। তাই অতন্দ্র প্রহরীর মত দরজার গোড়ায় তিনি বসে থাকতেন।

'তারপরেই ঘটল আর একটি নির্মম ট্র্যাজিডী। যে সমরেশ সরকারের মৃত্যু কামনা করেছিল, তার তখন মানসিক অবস্থা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যে করেই হোক, মেট্রনকে ধোঁকা দিতেই হবে। একটা পাতা নড়লেও যার নজর এড়ায় না, তার জন্য খুব কড়া ঘুমের ওষুধের দরকার। তারপর মিক্সচারের শিশিতে বিষ মিশিয়ে দিলেই কাজ হাসিল। সকালে ডোরা নিজে এসে ওষুধ খাওয়াবে, অ্যালিবাই-এর কোন চিন্তাই নেই এক্ষেত্রে।'

'কিন্তু—' সত্যজিৎ সামন্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে—'নার্স তো আত্মহত্যা করেছে।'

'আমরা তখন তাই বলেছিলাম।' ডাঃ বসাক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন—'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুরভাবে ওকে মার্ডার করা হয়েছিল। টাকার লোভে অবশ্য মেট্রনের কফিতে ঘুমের ওষুধ লতিকা দত্ত নিজেই মিশিয়ে দেয়, কিন্তু বিষ মেশানোর সময়ে বিবেকের দংশন মেয়েটিকে অস্থির করে তোলে বলে রামদুলালবাবুকে টেলিফোন করে ও সব কথা খুলে বলতে চেয়েছিল। পেছনে যে মৃত্যুর ছায়া এগিয়ে আসছে, টের পায় নি বেচারী। তারপর কে ওকে লোভ দেখিয়েছে তার নাম বলার মুহূর্তে অপরাধী মেয়েটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রেলিঙের লোহার শিকে মাথার পেছন দিকটা চূর্ণ করে দেয়। তারপর অচৈতন্য শরীরটা নীচে স্তূপ করা ইটের পাঁজার মধ্যে ফেলে দিতে কোনই অসুবিধে তার হয় নি।'

ক্ষণর্ধ বাদে ডাঃ বসাক কফির পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে সকলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। সারা ঘরময় এক নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা। একটা আলপিন পড়লেও বুঝি শব্দ শোনা যাবে।

অপেক্ষা করে আছে সকলে।

তারপর? তারপর গল্পের শেষটুকু কখন শোনা যাবে? কি আছে গল্পের শেষে?

[ক্রমশঃ]

অনির্বাণ আয়ু

—তীর্থংকর

যাতায়াতের পথে মওকা পেলেই রঙটঙয়ে নেমে পড়ি। ছোট পাহাড়ী স্টেশন। স্টেশন থেকে মাইলখানেক হাঁটলেই সুব্রতর কাঠের বাংলো-বাড়ি। কুলি-কামিনরা বলে, 'ডাগদার সাবকো কোঠি।' সুব্রত রায় ডাক্তার, এক চা-বাগানের চীফ মেডিক্যাল অফিসার।

শাল-পাইনের নিরিবিলি চৌহদ্দির নির্মম নিঃসঙ্গতা সুব্রতর জীবনে যেন ওৎ পেতে পাহারা দেয়। রাতুল চারু চরণের চিহ্ন-রেখা ডাক্তার সাহেবের কোঠিতে তাই বুঝি আজও পড়ে নি। শুধু আছে কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড কিষণলাল। একাই সে দু'মহলের কর্ণধার। অন্দর-মহল আর বার-মহল।

অন্দর-মহলে হাঙ্গামা একেবারেই নেই। কিন্তু বার-মহলের ঝক্কি সামলাতে কিষণলালের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বাইরেও চাকরির দায়-দায়িত্ব থেকে সুব্রতর নিস্তার নেই। কোঠিতে অনবরত আনাগোনা করেন দপ্তরের ফাইল হাতে ডাক্তার আর অফিস-ক্লার্করা, রোগের বিভিষিকা মুখে চা-বাগানের বড়সাহেব থেকে আরদালী পর্যন্ত। এ ছাড়া, সময়ে অসময়ে হপ্তায় বার তিন-চার হানা দিতে অনিবার্যভাবে আমি তো আছি।

এবার লাইন-ডিউটি নিয়ে এসে-ছিলাম শুক্‌নায়। কাজের ঝামেলা আধা চুকিয়েই মন বেঁকে বসলো। বায়না ধরেছে সুব্রতকে একবার দেখে আসি। আর যাই হোক, অন্তত নাছোড়বান্দা মনের ওপর খবরদারি চলে না। অগত্যা বকেয়া কাজগুলো পরের দিনের জিম্মায় জমা রেখে সোজা রওনা হলাম রঙটঙয়ের দিকে। রাত ভোর হলে আবার হাজির হবো ডিউটি-স্পটে।

সারাদিনের ক্লান্তি বয়ে অপরাহ্ন-সূর্য তখন সায়াহ্নের ছায়ায় বিশ্রামের আয়োজন করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের সব আলোটুকু নিভিয়ে অন্ধকারকে ঠাঁই করে দেবে পৃথিবীতে।

বারান্দা থেকেই দেখলাম সুব্রত বাইরের ঘরে অফিস-ওয়ার্ক করছে, সামনে একরাশ ফাইলের স্তূপ। চুপচাপ সেইদিকে তাকিয়ে একটু তফাতে বসে আছেন নীতীশ হাজরা, হাসপাতালের একজন ডাক্তার। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়েস। একহারা লম্বা গড়ন, গায়ের রং শ্যামবর্ণ। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে এইখানেই দেখা হয়, পরিচয়ও হয়েছে। কিন্তু আজকের মত ওঁর এমন হতশ্রী চেহারা আগে কখনো দেখি নি,—একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় আলুথালু চুলগুলো রুক্ষ, আর দু'চোখের কোণে অতন্দ্রতায় জমেছে কালি।

পায়ের শব্দে দরজার দিকে তাকিয়ে আমায় দেখেই সুব্রত স্মিত মুখে বললো, 'আরে, এই যে এসে পড়েছো, একটু বস। হাতের কাজটা চট করে সেরে ফেলি, তারপর কথা হবে।'

'তথাস্তু', বলে একখানা বেতের চেয়ার দখল করলাম। নিঃশব্দে নীতীশ আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন। শিষ্টতার খাতিরে হেসে তাঁর দিকে চাইলাম, 'কেমন আছেন।'

জবাব না দিয়ে ঘাড় নাড়লেন, 'ভাল।'

'বললাম, আপনার চেহারা ত' দেখছি বেশ খারাপ হয়ে গেছে। অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি?'

'কই, না তো।'

'তবে কাজের চাপে খুব খাটা-খাটুনি যাচ্ছে বোধ হয়?'

'হঁ্যা, তা একরকম বলতে পারেন।' হেসে বললেও আমার মনে হল উনি কোনরকমে উত্তর দিয়ে দায় সারছেন।

প্রসঙ্গ বদলে ফেলে নিজের কথা তুললাম। বড়সাহেবের হম্বিতম্বি আর বেয়াড়া ডিউটির গুঁতোয় নাজেহাল অদৃষ্টের নালিশ জানাতে জানাতে কখন যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, দুজনের কারোরই খেয়াল নেই। কেউই লক্ষ্য করি নি, সুব্রত ইতিমধ্যে ফাইল বাঁধতে সুরু করেছে। হুঁশ হল ওর কথা শুনে, 'এই নাও, প্রত্যেকটা কেসের ওপরে আমার স্টেটমেণ্ট লিখে দিয়েছি। কালকেই পিয়নকে বলো ম্যানেজারের ঘরে দিয়ে আসতে, ভুলো না যেন।' বলে ফাইলের বাণ্ডিলটা নীতীশের দিকে এগিয়ে দিল।

'না, ভুল হবে না, কালই পাঠিয়ে দেবো।' ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন।

আমার প্রতি ফিরে চেয়ে একটু হেসে দরজা পর্যন্ত যেতে না যেতেই ডাক্তার বলে উঠলো, 'ও, বাই দি ওয়ে, অণিমার চিঠি পেয়েছো কিনা কিছু বললে না তো?'

নীতীশের ক্লান্ত চোখ দুটো মুহূর্তের জন্যে আনন্দে নেচে উঠলো।

'হুঁ, পেয়েছি,—লিখেছে, হাতে ওর এত অবসর যে, কিভাবে খরচ করবে তা ভেবে পাচ্ছে না।'

'ঝগড়া করতে বারণ করে নি?'

আমার সামনেই সুব্রত এই বেসরম প্রশ্ন করাতে বারকয়েক ঢোক গিলে নীতীশের কাচুমাচু মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। একরকম সামলে নিয়ে বললেন, 'তাও করেছে। তবে কথাটা কাজে করার চেয়ে মুখে বলা অনেক সোজা। অবশ্য ওর কিছুদিনের জন্যে চেঞ্জ দরকার জানি, কিন্তু সুব্রতদা, এদিকে সবদিক ঠেকাতে আমি একলা যে পেরে উঠছি না। ভয়ংকর অসুবিধে হচ্ছে।'

তারপরেই আমার দিকে তাকালেন, 'কিছু মনে করবেন না। স্ত্রী বাড়িতে নেই বলে বড্ড মুশকিলের মধ্যে পড়েছি। বিয়ের পর এই প্রথম ছাড়াছাড়ি হল, সেই ধাক্কার চোটে দু'চোখে অন্ধকার দেখতে হচ্ছে।'

এতক্ষণ ওদের আলাপের মধ্যে কথা বলা ভব্যতার বারণ ছিল। কিন্তু নীতীশ তাকে লংঘন করবার ছাড়পত্র আমার হাতে দেওয়াতে নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললাম, 'কতদিন বিয়ে করেছেন?'

দু'দণ্ড নীতীশ কি যেন ভাবলেন। তারপর বেশ হেসেই বললেন, 'কথাটা বরং একটু গূঢ় অর্থে বলি, তাহলেই ঠিক হবে। আমরা বিয়ে করেছি,—তা ধরুন, বছর দশেক ত' বটেই।'

আচম্বিতে সুব্রত চারিদিক কাঁপিয়ে হেসে উঠলো। তার সঙ্গে নীতীশও তাল দিতে ছাড়লেন না। উত্তর শুনে আমি শুধু হতভম্ব হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে ওদের দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম।

'কি বাজে কথা বলছো?' বলে গম্ভীর হয়ে সুব্রত আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ওর কথায় তুমি কান দিও না, পাঁচবছর হল ওদের বিয়ে হয়েছে।' আমার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে অকেজো একটা অজুহাত দিয়ে নীতীশ হাজরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে।

ওঁর যাওয়ার পথের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সুব্রত। চেয়ে দেখলাম, সারা মুখে সহানুভূতির ম্লান ছায়া নেমেছে। দু' ঠোঁটের মাঝখানে মৃদু হাসি। তন্ময় হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে কার চিন্তায়।

মৌন হয়ে আপনমনে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। হঠাৎ স্তব্ধতার গুমোট ভেঙে, মুখের ঈষৎ হাসি না মুছে সুব্রত বললো, 'জান, নীতীশকে যত বোঝাই, একলা রয়েছো তাতে হয়েছে কি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। অভিমান করে অণিমা বাপের বাড়ি গেছে বলেই নীতীশ মহাখাপ্পা। ঠুনকো কারণ নিয়ে কথা কাটাকাটি। অণিমা পাড়ায় যেন কার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। সময়মত ফিরতে পারে নি। এদিকে নীতীশ অফিস থেকে বাড়ি এসে দ্যাখে দরজায় তালা ঝুলছে। বাড়ির বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাতে মেজাজ চড়ে গেল। পরিণতি বুঝতেই পারছো, তুমুল ঝগড়া।'

ডাক্তার একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল। কেস থেকে আমিও একটা তুলে নিলাম। জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি সমেত হাতটা বাড়িয়ে আমার সিগারেটেও আগুন ধরিয়ে দিল। অ্যাশ-ট্রের ভেতর নিভন্ত কাঠিটা গুঁজে দিতে দিতে আবার সুরু করল বলতে, 'এখন অণিমার অভাবটা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্ছে। তা ছাড়া, সংসারের পুরো ভার কাঁধে চাপাতে আর দিশে খুঁজে পাচ্ছে না।'

'এমন স্বামী যখন, ওঁর স্ত্রীর খুব সৌভাগ্য বলতে হবে।' আমি বললাম।

'অণিমারও তুলনা হয় না। রূপে গুণে অমন মেয়ে একালে কৃচিৎ কখনো মেলে।---ওহো দেখেছো, তোমাকে চা দিতে বলতে একবারে ভুলে গেছি,---কিষণলাল, কিষণলাল—' —সুব্রত ব্যতিব্যস্ত হয়ে হাঁকডাক দেওয়ার মাঝেই জিজ্ঞাসা করে উঠলো, 'রাত্রে আজ থাকছো তো?'

কিষণলাল চা দিয়ে গেছে। চলে যাওয়ার সময় সুব্রতর কথায় একটু দাঁড়িয়ে গেল, 'বাবুজী রাতে থাকবে বুঝেছো।' কিষণলাল বলতে না পারলেও বাংলা বোঝে।

'হাঁ, যা বলছিলাম', সুব্রত আবার ফিরে এলো অসমাপ্ত কথায়, 'অণিমার সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে ওর ব্যবহারে তুমি নিশ্চয় মুগ্ধ হোতে। সহজ মেলামেশা আর আদর-আপ্যায়নের বহর দেখলে প্রশংসা না করেও পারতে না। অথচ মন কিন্তু নিষ্পাপ সরল। অণিমার আর একটা গুণ, অপরিচিতকে চট করে আপন করে নিতে পারে।'

সুব্রতকে একটা অবাঞ্ছিত কারণে থামতে হল। 'নাও, তোমার চা-টা খেয়ে নাও, ফেলে রেখে যে ঠাণ্ডা জল হয়ে যাচ্ছে।'

'তা নিচ্ছি,—তারপর বলো।' সাগ্রহে বললাম আমি।

'ওদের বিয়ের আগে একটা একতরফা মাঝারি গোছের লুকোচুরি খেলার ইতিহাস আছে।' সুব্রত হাসলো। 'বিয়েটাও আকস্মিক ঘটনা বলতে পারো। নিজের ভুলে মনের দোটানায় পড়ে নীতীশ জীবনে একটা বিরাট ভুল করতে যাচ্ছিল। ভুলেও ভাবে নি, ও যা ভাবছে, তা কখনোই সত্যি হতে পারে না। তাহলে অনেকদিন আগেই দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেত।'

'কি যে বলছো মাথামুণ্ডু, আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' সুব্রতর হেঁয়ালি কথাবার্তায় বিরক্ত না হয়ে পারলাম না।

'তবে ত' এক-এ চন্দ্র থেকে সুরু করতে হয়। আচ্ছা, না হয় তাই বলি শোন—'

ডাক্তারের মুখে এক তিক্ত-মধুর কাহিনী শুনলাম।

ছেলেটার দৌরাত্ম্যে গাঁয়ের লোক নাস্তানাবুদের একশেষ। নিতুর দুরন্তপনা দিন দিন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কেউ বলে: 'গাছে একটি আমও রাখে নি, আপনার ছেলে।' কারো দুঃখ: 'শশাগাছের চারা উপড়ে পড়ে রয়েছে।' একদিন পোস্ট-মাস্টারবাবু এসে বললেন: 'মাস্টার মশায়, একি অন্যায় কথা, বলুন তো? একে আপিসে ঢুকে বালি ঢেলে সরকারী কাগজপত্র নষ্ট করেছে, তার ওপর আবার আমার মেয়ে অনু যেই বলে দেবে বলেছে, অমনি তাকে দু-চারটে কিল-চড় বসিয়ে এসেছে।' রোজই হেড-মাস্টার মশায়ের বাড়িতে জমা হয় রাশি রাশি নালিশ। সারাদিন মাস্টার মশায় সকলের কথা চুপ করে শোনেন, মুখে রা-শব্দটিও করেন না। শুধু সন্ধ্যাবেলায় চেঁচিয়ে ওঠেন, বেতের দাপটে নিতুর কাছে চান সব নালিশের কৈফিয়ৎ। কান্নার আর্তনাদে লোক জড়ো হয় বাড়ির বারান্দায়।

এমনি অশান্তির মধ্যেই মাস্টার মশায়ের সংসারে কেটে যায় দিনের চব্বিশ ঘণ্টা, বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন।

এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সত্ত্বেও সবাইকে আশ্চর্য করে সসম্মানে নিতু একদিন পাশ করল স্কুলের শেষ চূড়ান্ত পরীক্ষায়। জনে জনে তখন তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নালিশ করতে যাঁরা আগে আসতেন, একে একে তাঁরাই এলেন মুখ ফ্যাকাশে করে অভিনন্দন জানাতে।

অনুও বললো, 'কি করে তোমাকে বোঝাই বলত? আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।'

নিত্য-নিপীড়ন থেকে এবার পাড়া জুড়ালো। নিতুর কলেজ-জীবন সুরু হবে। পদ্মাপারের ছোট গ্রাম ছেড়ে গঙ্গাতীরের মস্ত বড় শহরে এসে পৌঁছলো সে। শিমুরালি থেকে কলকাতায়। অঙ্গে তার সেদিন লেগেছে চৈতী হাওয়ার ঘোর।

বছর দশেক আগে, ব্যাপারটা লোক জানাজানি হয়ে গেল। তাই নিয়ে কানাকানি করতেও ছাড়লো না সারা গাঁয়ের লোক। নিতু সবে তখন মেডিক্যাল কলেজে হাউস-ফিজিসিয়ান হয়েছে। অনুও এ খবর চিঠির ভাষায় প্রকাশ করল নিতুর কাছে, 'ধরা পড়ে গেছি।'

কিন্তু কোন অপবাদ, আপত্তির বাধা মানতে তখন তারা দুজনেই বাধ্য নয়। প্রস্তুত হয়ে রয়েছে, অনেকদিনের দুটি মনের নিভৃত-স্বপ্নকে অনাগত দিনের আলোয় সার্থক করে তুলবে। সেদিন দুজনেই তারা দুজনের কাছে প্রতিশ্রুত, —'একজনের জীবনে আর একজনকে চাই-ই।'

কিন্তু নিয়তিঠাকুর বাদ সাধলেন। ভাঙা-গড়ায় নিত্যানন্দ, সানন্দে ভেঙে চুরমার করে দিলেন তিলে তিলে গড়ে ওঠা দুটি জীবনের স্বপ্নসৌধকে। হঠাৎ গাঁয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলো। প্রাণের দায়ে রাতারাতি দলে দলে লোক পালালো যে যার পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। হেড-মাস্টার মশায়ও নিজের সংসার গুটিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। কিন্তু পোস্ট-মাস্টারবাবুর সংবাদ কেউ দিতে পারলো না। নিতু অনেক খোঁজখবর করেও খুঁজে পেলো না কারোর কাছে অনুর পরবর্তী ঠিকানা। নিঃশেষে বিশাল জন-সমুদ্রের নিঃসীমে নিতুর বাঁধন খুলে মিশে গেল নিঃসঙ্গ অনু।

তারপর কালের অবক্ষয়ী নিয়মে ধীরে ধীরে অনুর স্মৃতি মুছে গিয়ে পড়ে রইল বিস্মৃতি। হয়ত বোশেখের দগ্ধতাপে সেই সুন্দর স্বপ্নের অপূর্ব কামনা-বাসনা জলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। কিংবা বর্ষার অঝোর ধারায় ধুয়ে-মুছে দুজনার মাঝখানে জেগে উঠলো অপার শূন্যতা। ভাদ্র-অঘ্রাণ মাঘ-ফাল্গুন সেই শূন্যতায় না পেলো একফোঁটা ঠাঁই, না কুড়ালো একমুঠো আনন্দ। নিতু চাকরি নিয়ে চলে গেল দূর ভারতের এক ছায়া-নির্জন আধা-শহর, আকোলায়।

অফুরন্ত কাজ নিয়ে ডুবে রয়েছে সে। আর্তের সেবায় ব্যাপ্ত নিতুর অন্য কোনদিকে ভুলেও চাইবার ফুরসৎ নেই। রোগ আর দাবাই-এর লড়াইয়ের জয়-পরাজয়ের ওপর নির্ভর করে তার নিজের হারজিৎ। রোগ জিতে গেলেই রোগীকে নিয়ে সরে পড়বে—তা সে কখনই হতে দেবে না। তবুও, কতো জীবনের করুণ কান্না, কত মৃত্যুর অট্টহাসি শুনে শুনে নিতুর ক্লান্ত হৃদয় যেন পাথর হয়ে গেছে।

জীবন এমনি ছন্দেই আরও চার-বছর পার হয়ে গেল।

সেদিনও সকাল থেকে রাত দশটা অবধি ডিউটি করে নিতু ফিরে এলো নিজের আস্তানায়,—সঙ্গে কিছু চিঠি-পত্তর। শোবার আগে এক-এক করে চিঠি পড়তে বসেছে।

'না. না. এ অসম্ভব।'—হাতে

চিঠিখানা ধরে হঠাৎ চমকে উঠে নিতুর মন যেন সবিস্ময়ে বলে উঠলো। অনু নিতুকে পাতার পর পাতা ভরে চিঠি দিয়েছে,—সেই চারবছরের বেঁচে থাকার ইতিহাস।

দাঙ্গার সময় ওরা চলে যায় খুলনায়, এক আত্মীয়ের বাড়িতে। চারিদিকেই অবাধে চলছে তখন খুনজখম, লুঠতরাজ। চিঠিপত্তরও আসা-যাওয়া বন্ধ। তাই অনেকদিন নিতুকে কোন চিঠি দিতে পারে নি সে। শেষে যখন লিখলো, নিতু তখন মেডিক্যাল কলেজে নেই। গোলমাল থামলে পোস্টমাস্টারবাবু ধরে-কয়ে পোস্টিং-অর্ডার করিয়ে নিলেন খুলনা টাউনে। তিনবছর কাটালেন সেখানে। তারপর রিটায়ার করে সংসার পাতলেন কলকাতায়। কিন্তু ছ'মাস পরেই নিজেই সংসার থেকে হলেন অপসৃত। তাই মা আর ছোট দুই ভাইবোনকে নিয়ে অনুকেই ধরতে হয়েছে সংসারের হাল। আই-এ পাশ বলে একটা চাকরি খুঁজে-পেতে নিয়েছে।

চিঠি পেয়েও নিতু তার কোন উত্তর দিল না। অন্তর্দ্বন্দ্বে সে তখন ক্ষত-বিক্ষত। সংশয়মনে ভাবে, 'অনু কিছুতেই এখন তেমনটি আর নেই। চারবছরে নিশ্চয় সে অনেক বদলে গিয়েছে, তার পছন্দ-অপছন্দের কথা সে আজ আর জানে না। সেদিনকার অনুর সঙ্গে আজকের অনুর কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।'

তবুও, বার বার অনুর চিঠি আসে। 'উত্তর দাও না কেন? অনুর কথা কি ভুলে গিয়েছো? এত তাড়াতাড়ি আমাকে মুছে ফেলতে পারলে? প্রতিশ্রুতি তবে মিথ্যে হয়ে গেল, বল?'—

এত অনুনয়ের পরেও অচল, অটল নিতু নিস্তব্ধ। তার মুখে কোন কথা নেই।

শেষ পর্যন্ত অনুর চিঠির হাত থেকে রেহাই পেতে নিতু সে চাকরি ছেড়ে দিল। এলো রঙটঙয়ের হাসপাতালে। দু-একাদন নিবিঘ্নে কেটে গেল। তারপরেই আবার সেই একই যন্ত্রণা সুরু হল। অনু এখানেও চিঠি পাঠিয়েছে। পর পর কয়েকখানা চিঠির আঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে নিতু ছুটি নিয়ে ছুটলো দার্জিলিঙ্। কিন্তু সেখানেও নিস্তার পেলো না। এদিকে সময়ের চাকা ঘুরে বছর পূর্ণ হল।

ছুটির পর চাকরিতে ফের জয়েন করেছে নিতু। এমন সময় বাবা জানালেন, 'অ্যারিভ পজিটিভ্লি বাই টোয়েনটি-সেভেনথ, নেলি'জ ম্যারেজ অন টোয়েনটি-এইটথ।' তার করেছেন বাবা। তা ছাড়া, একমাত্র ছোট বোন নীলিমার বিয়েতে না গিয়ে উপায় নেই। ছুটির জন্যে দরখাস্ত করল নিতু। সৌভাগ্যবশত মঞ্জুরও হল ছুটি।

এমনভাবে যে সে অপদস্থ হবে, নিতু স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। সাতাশ তারিখ ছিল রবিবার। সকালে বাড়ি পৌঁছে দরজার কাছে অনুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে যেন আঁতকে উঠলো। পাশে নীলিমা দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু আশেপাশে কোথাও নিতুর আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এমন কি তার মা-বাবাও না। নিতু বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছে।

'কিরে নেলি, তোর বিয়ের ত কোন লক্ষণই দেখছি না। কি ব্যাপার বলতো?'

'ব্যাপার আবার কি? বিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

'কেন?' নিতু থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

'অতশত আমি জানি নে বাপু।' নীলিমা লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেয়।

'তা বাবা-মার কথা ত জানিস, তাঁদের সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না কেন?'

'ঠাকুর দর্শন করতে কালীবাড়ি গেছেন।'

'তাই বল,'—মুখ ঘুরিয়ে নিতু এগিয়ে যায় অন্য ঘরের দিকে।

'ও মা চললে কোথায়!' নীলিমা হাসতে হাসতে বলে, 'নাও তাড়াতাড়ি, তোমরা দুজনে যা হয় বোঝাপড়া করে নাও। বাবা-মা এসে পড়লেই বিপদ হবে, আমি বরং ততক্ষণ তোমার জলখাবারের জোগাড় করি গে।'

'মানে,'—নিতু ভ্রূ কুঁচকে চেঁচিয়ে ওঠে। কিন্তু সে কথার জবাব দেওয়ার জন্যে নীলিমা সেখানে আর দাঁড়িয়ে নেই। শুধু অনু ভয়ে জড়সড় হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে নিতুর দিকে।

পরে অনু নিতুর কাছে আগাগোড়া ব্যাপারটা ফাঁস করে দিতে বাধ্য হয়। নীলিমার সঙ্গে অনুর হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। অনু অফিস যাচ্ছে, নীলিমা কলেজ থেকে ফিরছে, তারপর থেকেই চলে দুজনের শলা-পরামর্শ। টেলিগ্রাম করেছিল নীলিমা নিজেই, নিতুর বাবা নয়। ভয়ে অনু বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও শোনে নি। হেসে বলেছিল, 'তুই চুপ কর, সাতাশ তারিখ যখন মেনশান করেছি, দেখিস, দাদা ঠিক ওই সাতাশের সকালেই আসবে। চাকুরে লোক কে —র দশদিন আগে থেকে এসে বসে থাকে?'

নিতুর বাবা-মা হপ্তাখানেক আগেই ঠিক করেছিলেন, তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মিলে ওই দিনটিতে কালীবাড়ি যাবেন। ভুয়ো বিয়ের অছিলায় এই নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের অবতারণা করবার জন্যে নীলিমা ওই দিনটিই তাই সুবিধাজনক বলে বেছে নিয়েছিল।

'আলোটা নিভিয়ে দিয়ে এসো।'

কিষণলালের ডাকে খানা খেতে সুব্রতর পিছন পিছন পাশের ঘরে যাওয়ার আগে বাইরের ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিলাম।

(W. Somerset Maugham রচিত MABEL-এর ভাবানুবাদ)

রাজধানী :

রাজধানী এখন আনন্দমুখর। শুধু রাজধানী নয়, সারা পশ্চিম বাংলায় নেমেছে আনন্দের ঢল। দিন তিনেক অঝোরে বর্ষণের পর বেসামাল প্রকৃতি প্রকৃতিস্থা হয়েছেন। রোদ হয়ে উঠেছে কিছুটা মিঠে-কড়া। গ্রামের কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথের রূপ গেছে বদলে। শহরের মাটিও ঠনঠনে। চটি পায়ে, উঁচু গোড়ালীর জুতো পায়ে খটাখট আওয়াজ তুলে মেয়েরা জামা-কাপড়ের দোকানে দোকানে ভিড় করছেন। অনেকেরই সওদা প্রায় শেষ।

কুমারটুলীর কর্মীদের চোখে ঘুম নেই। দিবারাত্রি একনাগাড়ে দু'হাত চালিয়ে কাজ করছে তারা। দোমেটের কাজ শেষ করে প্রাথমিক রঙের কাজও শেষ করে এনেছে। বাকী প্রতিমার অঙ্গরূপ। সেটুকু শেষ করতে পারলেই মৃন্ময়ী হয়ে উঠবেন চিন্ময়ী। প্রতিটি পল্লীর মানুষ এখন জাতীয় উৎসবের আয়োজনপর্বের কাজে নেমে পড়েছে। ব্যস্ততার সীমা নেই। মণ্ডপ রচনাও সমাপ্তপ্রায়। আর তিনটি দিন মাত্র বাকী। তারপরই উৎসবের বাঁশী বেজে উঠবে প্রতি ঘরে। সুরু হবে দনুজদলনী অসুরবিনাশিনী মায়ের বোধন।

এবারে মা আসছেন গজে চড়ে। ধরণীকে তিনি করে দিয়ে যাবেন শস্যশ্যামলা। পশ্চিম বাংলার শস্যের অবস্থা ভাল। শ্যামল শোভায় ভরে উঠেছে পল্লীবাংলা। চাষীর মনে সঞ্চার হয়েছে নতুন আশা। বিদায় বেলায় মায়ের বাহন মদমত্ত না হলে ফসল ভাল হওয়ারই কথা। একবার শুঁড় তুলে বৃংহণ তুললেই মুস্কিল। আশ্বিনে সেই ভয়টা থেকে যায়। তা' ছাড়া শরতের সব ভাল। তার শেষ বর্ষণেও থাকে অমৃতধারা। সে অমৃতধারা ধানের চারাকে করে তোলে সতেজ। ভয়টা শুধু তুফানের। আশ্বিনের তুফান বড় মারাত্মক। তার তাণ্ডবে সব একাকার হয়ে যায়---শস্যহানি হয় বিপুল পরিমাণে, প্রাণহানিতে সে কম যায় না। এবারে

● পশ্চিমবঙ্গে প্রচার সমিতির উদ্বোধনী সভা

তার আবির্ভাবের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আপনভোলা জাতির আনন্দের দিনে, তার জাতীয় উৎসব পালনের মুহূর্তে দুঃখদৈন্যের চালচিত্র আর তুলে ধরতে চাই নে। তা' ছাড়া, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের সুযোগও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন করে দিয়েছেন। পুরো রেশন পাওয়া যাচ্ছে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে। আরও দু'সপ্তাহ এ বরাদ্দ বজায় থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এ ব্যবস্থায় সকলেই খুশি। এমন কি, দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করতেও তারা উদ্যত হয়েছিল। রেশনের বরাদ্দের সঙ্গে খাস্তা মাল, তেতো আটা-ময়দা পাচারের চেষ্টাতেই হাত অর্ধেকটা শূন্যে তুলেই নামাতে বাধ্য হয়েছে। সব দোকানে আবার নিয়মিত-ভাবে সব দিন আটা, ময়দা, সুজি, গম ও চাল মিলছেও না।

* * *

শ্রীসেনের উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি ডালের ব্যবসায়ীদের ওপরও অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছেন।

হাওড়া ও কলকাতায় অধিক মূল্যে ডাল বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিরিশজন ব্যবসায়ীকে। ডাল এখন অপরিহার্য খাদ্য। মাছ বাজার থেকে লোপাট হয়ে যাওয়ার পর ডালের চাহিদা গিয়েছে বেড়ে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ওৎ পেতেই ছিল। সুযোগ পেয়ে গেল তিনমাসে ডালের দাম বাড়িয়েছে প্রতি কে-জি ৭০ পয়সা। সরকার এদের সায়েস্তা করতে পারবেন কি না, জানি নে। তবে ডালের বাজারে একটা সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে।

একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তিতে মনে আসে ক্লান্তি, চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তবু, না বলে পারছি নে। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে রঙ্গমঞ্চে নেমে নর্তন-কুর্দন ছাড়া আর বেশি কিছু লাভ হয় না। ডালের বাজারে সামাল সামাল রব উঠলেও ডালের দাম কমে নি একটি পয়সা।

* * *

চোরকে চুরি করার সুযোগ দিয়ে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার রীতি তাদের চিরন্তন। ১৫ই অক্টোবরের পর ভারত সরকার কাপড়ের দাম বেঁধে দিচ্ছেন। খুব ভাল কথা। এ কাজটা আগেভাগে করলে---অন্তত একটা মাস আগে করলে পূজার মুখে বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা মুনাফা

লুঠে নিতে পারতো না। সাধারণ মানুষও একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। এ-নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। মুনাফা শিকারের পথ খোলা রেখে মুনাফাখোরদের এমনি ধারা একদফা মুনাফা লুঠের সুযোগ দিয়ে তারপর সরকার যতই বজ্র আঁটুনি দিন কেন, কোন- লাভই তাতে হবে না। সাধারণ মানুষের মনেও এতে আস্থা ফিরে আসতে পারে না। তারা আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে না সরকারের পেছনে। মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন না পেলে সদাচার সমিতি খুলেও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ ভ্রষ্টাচার দমন করতে পারবেন না—ভ্রষ্টাচারীরা আরও বেশি করে বাজার গুলজার করে তুলবে। সব জিনিসটা নির্ভর করছে সমাজের মাতব্বরদের আন্তরিকতা ও সরকারের বলিষ্ঠ-নীতির ওপর। তা না হলে দীর্ঘ-কালের ঘুণে ধরা সমাজদেহকে ঝেড়ে পুঁছে পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব নয়। মাথায় তীব্র যন্ত্রণার সূত্রপাত ঘটলে যেমন দেহের সকল শিরা-উপশিরাই নিস্তেজ হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি অবস্থা ঘটে সমাজদেহেও। সমাজের মাথা বিকারগ্রস্ত হলে, রাষ্ট্রনায়কদের পদক্ষেপ দ্বিধা ও কুণ্ঠাজড়িত হলে গোটা সমাজদেহ বিকল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। গেল সতের বছরের খতিয়ান ঘাঁটলে দেখা যাবে গোটা সমাজদেহে ফুটে উঠেছে অসংখ্য দুষ্ট ব্রণ। আগে যা' ছিল পুলিশের মহলে ও আদালতের চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এখন তা' বিস্তার লাভ করতে করতে বিদ্যামন্দির কলুষিত করে তুলেছে।

* * *

পশ্চিম বাংলাতেও শেষ পর্যন্ত সদাচার সমিতি সম্ভব হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় নবগঠিত সমিতির চেয়ারম্যান হয়েছেন। সদাচার সমিতির এক্তিয়ার, তার জন্মের অধিকারের প্রশ্ন তুলে যি এক সময়ে তার গঙ্গাযাত্রার পথটা পরিষ্কার করার উপক্রম করে-ছিলেন তিনিও—শ্রীঅতুল্য ঘোষও পশ্চিম বাংলার সদাচার সমিতির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ব্যক্তিগত-ভাবে ও কংগ্রেসকর্মী হিসেবে সর্বান্তঃ-করণে সমিতির কাজে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শ্রীনন্দ দেশে দুর্নীতিমুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

খুবই সত্যি কথা, সকলের সক্রিয় সহযোগিতা ভিন্ন দুর্নীতির দমন সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি, দুর্নীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে না পারলে, তার উৎসকে বিনষ্ট করতে না পারলে সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসতে পারে না। হাসপাতালে মরণাপন্ন রোগী নিয়ে গিয়ে ভর্তির কোন সম্ভাবনা না দেখলে, রোগীর পিতা বা আত্মীয়-পরিজন বাধ্য হয় দুটি টাকা ব্যয় করতে। সেই মুহূর্তে তার কোন পথ সে খুঁজে পায় না। তারপর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করার ঝামেলাও কম নয়। সরকারের চাকা নড়ে না সহজে। কাজেই এ-বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অযথা টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়তে কেউ চায় না। অনেক সময়েই দেখা যায় ঊর্ধ্বতন মহলে যাদের দহরম-মহরমটা বেশি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে কোন ফল তো হয়-ই না বরং অভিযোগ-কারীর অবস্থাটা হয়ে ওঠে কাহিল। কাজেই আগে ঠিক করা প্রয়োজন ওপরতলাটা। সে তলাটা নিশ্ছিদ্র না হলে নীচের তলায় তলানী থাকে পড়বেই—কেউ তা' রোধ করতে পারবে না।

সদাচার সমিতির জন্মকাল থেকে তার পরের অবস্থাটাই তার সাক্ষ্য। সমিতি একটু মাথাচাড়া দিয়ে উঠতেই দু'বাহু বিস্তার করে সে বড় বড় বিষবৃক্ষ ধরে টান দিতে চেয়ে-ছিল। এইটাই তার বড় অপরাধ। তা' না করে নীতিবাক্য প্রচারের ময়দানবৃত্তে তার কার্য সীমিত রাখলে

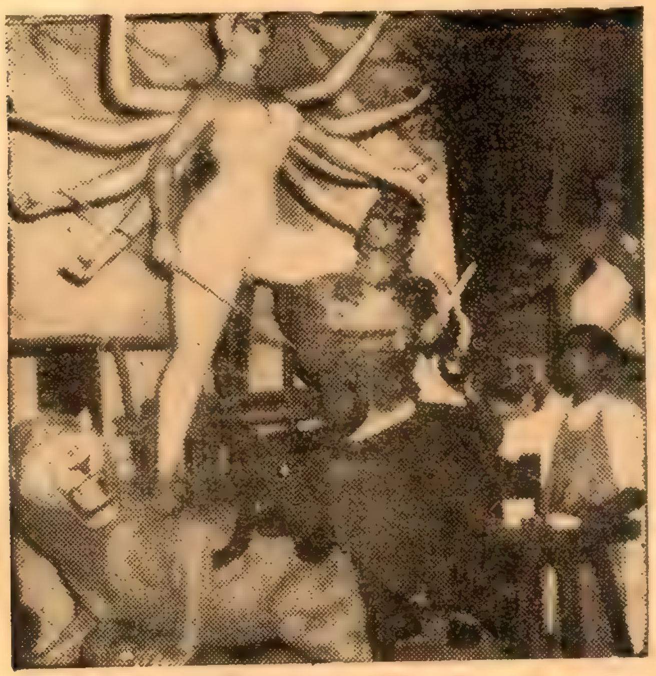

● শিল্পীর তুলিতে রূপায়িত হয়ে উঠেছে দেবীপ্রতিমা

দুর্নীতি দমনের নামে বাড়াবাড়ির ধুয়া কেউ তুলতেন না। মূল গায়েনরাও এমন নেচে-কুঁদে সদাচার সমিতির সমাধি রচনা করতে চাইতেন না।

* * *

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর শুভ জন্মদিনে পশ্চিম বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পঞ্চায়েতরাজ। মূক জনতার মুক্তিই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। তাঁর জন্মদিনে পঞ্চায়েতের পত্তন খুবই আশার কথা। গান্ধীজীর চরিত্র-মাধুর্য ও তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সামান্য প্রভাবও পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাদের মধ্যে পড়লে নিশ্চয়ই গ্রামীণ সমাজের চেহারা ফিরে যাবে।

পঞ্চায়েতের পত্তন হল, সদাচার সমিতিও গঠিত হল। ভালভাবে পরিচালিত হলে দেশের মানুষ উপকৃত হবে। এদিকে দশ প্রহরণ-ধারিণী মা আসছেন। তিনি অসুরের বিনাশ সাধন করে সুরের রাজ্য, কল্যাণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবেন এই প্রার্থনাই আমরা করে আসছি চিরকাল। তবু, মায়ের অস্ত্র উদ্যত হচ্ছে না শত্রু বিনাশের জন্য, তাঁর মুখে ফুটে উঠছে না বিজয়গর্বের মধুর হাসি। তবে কি মা আমাদের পূজা গ্রহণ করছেন না। হয়তো তাই। শক্তি পূজায় প্রয়োজন সংযম, সংহতি, শক্তি এবং সর্বোপরি আত্ম-প্রত্যয়। বাঙালী জাতি সবই হারিয়েছে। চিত্ত তার দৈন্যে ভরা। সংহতির অভাব তার সর্ব ঘটে। তাই অসুরের দল নাচছে তার চারদিক ঘিরে তাথৈ তাথৈ করে। তারাই আজ বলীয়ান। এই অসুরের দলকে পর্যুদস্ত করতে হলে মাতৃপূজার নতুন প্রস্তুতি প্রয়োজন। সে প্রস্তুতির জন্য চাই আত্মশুদ্ধি। জাতীয় জীবনে সেদিন কবে আসবে, বলা শক্ত। তরুণ-সমাজের মধ্যেও তার উদ্যোগপর্বের অভাবটাই বেশি। আজকের দিনে জগজ্জননীর কাছে তাই প্রার্থনা জানাই—মা চিত্তদৈন্য মোচন করো, আমাদের তোমার পূজার উপযোগী করে তোলো।

● মহাত্মাজীর জন্মদিনে

হাওড়া :

হাওড়া জেলার বালিকা বিদ্যালয়গুলির জেলা-পরিদর্শিকার যে অফিস মেদিনীপুরে অবস্থিত, সে অফিসের অব্যবস্থার দরুণ বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ দারুণ অর্থ-সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। শিক্ষা বিভাগের নিয়ম-অনুসারে বর্তমান বছর থেকে প্রত্যেক বালিকা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়-পরিদর্শিকার অফিস থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালের গ্রাণ্ট-ইন-এড দেওয়ার কথা। কিন্তু হাওড়া শহরের বহু বিদ্যালয় এখনও উক্ত টাকা পায় নি। কোন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ জেলা সিলেকসন কমিটির দ্বারা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৬২ সাল থেকে বর্ধিত বেতন শিক্ষা বিভাগ থেকে পান নি। তাঁদের এক-একজনের প্রাপ্য হাজার টাকারও বেশি। এ ছাড়া যে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের বেতন কেবলমাত্র ছাত্রী বেতন থেকে দেওয়া সম্ভব হয় না—সরকারী সাহায্য অর্থাৎ প্রতি বছর 'গ্রাণ্ট-ইন-এড'-এর ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়। সে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণের বেতন প্রায় তিন-চার মাস বাকী পড়েছে। অথচ গ্রাণ্ট ও বর্ধিত বেতন বাবদ রাজ্য সরকার বহুদিন আগেই নাকি সকল জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শিকার নিকট প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাওড়া জেলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা মহোদয়ার শিক্ষিকাগণের আর্থিক কষ্ট লাঘবের ব্যাপারে কি কিছুই করণীয় নেই?

আমরা আশা করি, গ্রাণ্ট ও বর্ধিত বেতন যাতে পূজার পূর্বে পাওয়া যায় তার জন্যে কালবিলম্ব না করে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এ-প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিদ্যালয়ের

● বিদ্যানগরে পঞ্চায়েতরাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠান

সংখ্যা যেরূপ দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, তাতে হাওড়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর---এই তিনটি জেলার বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ভার একজন পরিদর্শিকার ওপর অর্পণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না, তা অবিলম্বে রাজ্য শিক্ষা-দপ্তরের বিবেচনা করে দেখা উচিত।

● শ্রীরবীন্দ্রলাল সিং

রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিং হাওড়া জেলা তথা হাওড়া শহরের অধিবাসী, হাওড়ার বিদ্যালয়সমূহের অভাব-অভিযোগ তাঁর কাছে অজানা থাকার কথা নয়। তাই আশা করব, তিনি সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত বিষয়টা অনুধাবন করবেন।

চব্বিশ পরগণা ঃ

রাজারহাট থানার অন্তর্গত দমদম-লাউহাটি রোডের বিষ্ণুপুর বটতলা থেকে রাজারহাট ও পাথরঘাটা অঞ্চলের মাঝ দিয়ে খুনী যাত্রাগাছি ড্রেনেজ খাল পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মাইল দীর্ঘ যে কাঁচা রাস্তাটি চলে গেছে, তাই এতদঞ্চলের প্রায় অর্ধ লক্ষ গ্রামবাসীর চলাচলের প্রধান রাস্তা। কলকাতা এবং মহকুমা শহর বারাসতের সঙ্গে এই এলাকার সংযোগ রাখারও এটাই একমাত্র পথ। চাকুরীজীবী ও ব্যবসায়ীদেরও জীবিকা অর্জনের জন্য প্রতিদিন এই রাস্তার ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ পাথরঘাটা অঞ্চলের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি দীর্ঘকাল নিতান্ত অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বিশেষভাবে বর্ষাকালে গ্রামবাসীদের দুর্গতির অবধি থাকে না। ঐ সময় রাস্তাটি এমনি কর্দমাক্ত থাকে এবং এর স্থানে স্থানে এরূপ বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয় যে, মানুষের চলাচল দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। উল্লেখযোগ্য যে পাথরঘাটায় একটি সরকারী স্বাস্থ্য-কেন্দ্রও আছে। গুরুতর ধরণের রোগীদের এখান হ'তে অনেক সময় কলকাতায় স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাস্তার অভাবে প্রয়োজন সত্ত্বেও, তা সম্ভব হয় না, যার পরিণতিতে বিপদ পর্যন্ত ঘটে। আসন্নপ্রসবা রোগীদেরও এরই দরুন কখনো কখনো প্রাণহানি হয়।

রাস্তাটিকে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এ-অঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়ন ও জন-কল্যাণ সংস্থার পক্ষ থেকে কতৃপক্ষের কাছে বহুবার আবেদন নিবেদন করা হয়। কিন্তু আজও পর্যন্ত কোনরূপ সাড়া মেলে নি। জনসাধারণের দীর্ঘদিনের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য এই রাস্তাটি অবিলম্বে পীচের রাস্তায় পরিণত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সুব্যবস্থার আশায় আমরা মুখ্যমন্ত্রী ও পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রফুল্ল
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।
মূল্য দুই টাকা মাত্র
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বৈরাগী তলার মেলা

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

কেউ যদি মানুষ হ'তে খোঁজ
তবে মানুষে মানুষকে ভজ
দাস নিত্য বলে—মানুষ যাই ভ্রমণে
মানুষে দেখিতে
আছে আছে রে মানুষ
এই মানুষেতে।

যদি মানুষ হ'তে চাও—যদি মানুষ দেখতে চাও—তবে মানুষের ভিড়ে মিলে যাও। চলে এসো—গ্রামদেশের পূজা-পার্বণে, মেলা-খেলায়। সেই মেলায় যেখানে 'মেলা' মানুষ মেলে, হাজারো মানুষের মন মিলে যেখানে ঐক্যতান রচনা করে—সেখানে মেলাও তোমার মন। শুধু মনটি যেন রসিক হয়। বাংলা দেশে অভাব নেই মনের মানুষের, অভাব শুধু মেলামেশার সুযোগের—চাই এই মেলা। মেলায় এসে মিলবে নানাজনে। ক'দিনের এই বিকিকিনির খেলায় মেতে উঠবে সকলেই। রসের ভিয়ানে রসনা সিক্ত হ'বে।

উত্তর রাঢ় অঞ্চলের মেলা যত বেশি—তত বোধ হয় বাংলা দেশে আর কোথাও নেই। ধানের শীষ পাকে—সোনা-রঙ আনে প্রাচুর্যের সুখ। সুরু হয়—শান্তি-নিকেতনের মেলা, জয়দেবের মেলা। চললো পর পর। কোন ক্ষেত্রে শুধু সামাজিক উৎসবে, কোথাও বা গ্রামীণ কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সূত্রে—কখনও বা মহাপুরুষের স্মৃতিতর্পণে। বর্ধমানে বৈরাগীতলার মেলা বাংলা দেশের বিখ্যাত এক মেলা। ধর্মীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই বোধ হয় বাংলা দেশের সর্ববৃহৎ মেলা। এই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রামীণ মেলা। 'মেলা' অর্থে মেলা। কোন প্রদর্শনী নেই। কোন সরকারী বা বেসরকারী প্রচার নেই। প্রায় দু'শো বছর পূর্বের এক স্মৃতি-সুখ-বিজড়িত—এই তীর্থস্থানে কত শত যাত্রীর পদরেণু মেলার আয়োজনকে সার্থক করে তোলে।

আমোদপুর কাটোয়া রেল লাইনে রামজীবনপুর স্টেশন। অখ্যাতনামা। টাইম টেবিলে নামের দেখা পাবেন। স্টেশন হ'তে মাইল ছয়-সাত দূরে দধিয়া গ্রাম। মাঘী সপ্তমীর দিন এই মেলা সুরু—অনুষ্ঠান চলে তিনদিন। মেলা কিন্তু তার পরেও দিন কয়েক থাকে। শোনা যায়, সিদ্ধপুরুষ গোপালদাস বৈরাগী এই মেলার প্রবর্তক। সেই মহাপুরুষের স্মৃতি আজও বহন করে

● গোপালদাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির

চলেছে বৈরাগীতলার 'মেলা'। কবে এই মেলা সুরু হয়েছে তার সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারে না। সকলেই পুরুষানুক্রমে এই মেলা দেখে আসছে। তবে শোনা যায় সেই সিদ্ধপুরুষ গোপাল-দাস বাবাজী আনুমানিক দু'শো বছর আগে আবির্ভূত হন। গোপালদাস সাধনে, ভজনে, আচার-নিষ্ঠায় প্রকৃত বৈষ্ণব ছিলেন। আউল বাউল-এর মত তাঁর জাতবিচার ছিল না। মানুষের আবার জাত কি? তার হৃদয়-দেউলে যে প্রেমের দেবতা—সেখানে অগণিত মানুষের ভিড় জমেছিল। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী সকলেই জাতিধর্মনির্বিশেষে গোপালদাসের ভক্ত ছিল।

সেই সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে কিছু কিছু প্রবাদ আছে। অবিশ্বাসীর মন হতে সন্দেহ দূর করার জন্য পুকুর হ'তে শোলমাছ সংগ্রহ করে আর অসময়ে গাছ হ'তে আম পেড়ে আমশোল খাইয়েছিলেন। বিরাট দীঘি তিনি খড়ম পায়ে হেঁটে পার হয়ে গিয়েছিলেন। মাঘী সপ্তমীর দিন বাবাজী দেহরক্ষা করেন। দু'শো বছর পরে আজও তাঁর স্মৃতি সমান শ্রদ্ধার সাথে জাগরুক হয়ে আছে। আজও সেই দিনে বাবাজীর স্মরণে হাজার হাজার গ্রাম্য তীর্থযাত্রী বৈরাগীতলায় সমবেত হয়।

মেলার উত্তর-পূর্ব কোণে সাধক গোপালদাসের পূত সমাধি-মন্দির। শ্বেত মার্বেল পাথরের মত সুন্দর ধব্‌ধবে এই মন্দির। ততোধিক সুন্দর তার চূড়া। রেলিং দেওয়া ছোট্ট বারান্দা। এই গোলাকৃতি বারান্দার ভেতরে ঈষৎ অন্ধকার পূতস্থানে গোপালদাসের সমাধি। বাবাজীর মোহান্তরা পশ্চিম দেশীয়। তাঁরা দাবী করেন—গোপালদাস পশ্চিম দেশ হ'তে এখানে এসেছিলেন। বাবাজীর প্রায় একশো বিঘা সম্পত্তি মোহান্তরাই ভোগ করেন। স্থানীয় অধিবাসীদের অভিযোগ—এই সম্পত্তি বাবাজী সাধারণের কার্যে সদ্ব্যয় করার জন্য দিয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানে এই সম্পত্তি মোহান্তদের কুক্ষিগত। বাবাজীর নিত্য সেবায় যা ব্যয় হয় তা নাকি সামান্যই। কেউ কেউ বলেন—বাবাজী

নিকটবর্তী পাকুরহাঁস গ্রামের অধিবাসী। সেই গ্রামের অনেক অলৌকিক কাহিনীর সাথে তাঁর নাম জড়িত। বাবাজী এই অঞ্চলের অধিবাসী হ'লে মোহান্তরা পশ্চিমদেশীয় কেন হ'ল একথা রহস্যজনক। তবে একথা অনুমান করা যেতে পারে—বাবাজী ঐ পাকুর-হাঁস গ্রামে কোন ভক্তের গৃহে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। বর্তমানে সম্পত্তির গোলযোগের জন্য শোনা গেল—মোহান্তরা শাহ আলম বাদশাহের প্রদত্ত আরবী ভাষায় লিখিত দলিল বের করেছেন। বাবাজীর কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নেই।

রামজীবনপুর স্টেশনে নেমেই কান্দরা গ্রাম। বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাসের সিদ্ধপীঠ। তারপর রাজুর আর এহিয়াপুর গ্রামকে পাশে রেখে এগিয়ে গেলেই দধিয়া গ্রাম।

বিরাট এক দীঘির চারপাশ জুড়ে এই মেলা। সরস্বতী পূজোর পূর্বেই হিসাবী দোকানী তার রঙ-বেরঙের রকমারী পসরা নিয়ে ভিড় জমায়। ভাল জায়গাটি চাই। ট্রাক আর গরুর গাড়ি বোঝাই করে চলে বিচিত্র বিপণি সম্ভার। বাঁশ, টিন আর চট দিয়ে তৈরি হয় অস্থায়ী দোকানঘর।

বাংলা দেশের এপ্রান্তে মেলার যে এতবেশি প্রচলন—তার সামাজিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। তার চেয়েও বড় কারণ গ্রামের পরিবার তার সোনার লক্ষ্মী ঘরে আনার পর তাদের ব্যবহারিক জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব মেটাবার সুযোগ পায়। কুলবধূ সারা বছর ধরে একটু একটু ক'রে যে সামান্য ধন সঞ্চিত করেছে—তাই নিয়ে আসে মেলায়। গ্রামের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী পরিবারের জীবনে জীবিকার প্রয়োজনে যা লাগে—সবই পাওয়া যায় এই মেলায়। তাদের বেচাকেনার কেন্দ্র এই মেলা। কৃষিজীবী পরিবারের হাতে অর্থ, মুখে হাসি। আগামী মরসুমের জন্য তারা কৃষিকার্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি কিনে রাখে এই মেলাতে। তাই এই 'বৈরাগী-তলার মেলা' যে-কোন গ্রাম্য পরিবারে সাধারণ স্বচ্ছল গার্হস্থ্য জীবনে বাৎসরিক যা প্রয়োজন সবই এনে দেয়। প্রকৃত গ্রামীণ অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে বাংলা দেশে এমন মেলা আর একটিও নেই।

সপ্তমীর দিন ভোর না হতেই দেখা যায়—যাত্রী আর গরুর গাড়ির সারি। সীমাহীন শ্রেণীবদ্ধ এক চলমান জনতা। এ চলার শেষ নেই। পথের ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে একটির পর একটি গরু মহিষের গাড়ি। রামজীবনপুর স্টেশনে ট্রেন থামলেই বিরাট এক কোলাহল। তীর্থযাত্রীর দল। শীত কমে গেছে। বসন্ত পড়ি পড়ি ভাব। অচেনা, অজানা লোকের ভয় নেই। দিনে বা রাত্রে যখনই এসো না কেন, শুধু সেই চলমান জনতার সাথে নিজেকে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারলেই হ'ল। এমন আর কোথাও দেখা যায় না। মেলার প্রথম দিন চিঁড়ে ভোগ, দ্বিতীয় দিন অন্নমহোৎসব, তৃতীয় দিন ধুলোট।

চারপাশের প্রতিটি গ্রাম হ'তে বোঝাই করে কাঠ চাল আর তরিতরকারী নিয়ে তীর্থযাত্রীর দল যাচ্ছে। দীঘির চারপাশে প্রতিটি গ্রামের জন্য নির্দিষ্ট আখড়া থাকে। আখড়ায় আখড়ায় জ্বলে ওঠে উনুনের আগুন—সুরু হয় মহোৎসবের কলরোল। সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের চারিদিকে চলে ভোগপ্রসাদ রান্নার প্রস্তুতি। এক-একটি আখড়া যেন এক একটি জমিদারবাড়ির দুর্গোৎসব। গ্রামেরই হও—আর ভিন গ্রামেরই হও—পাতা নিয়ে বসে গেলে প্রসাদ পাবেই। অগণিত আখড়ায় 'মচ্ছব' চলেছে। সকলের সাথে আখড়ায় বসে পঙক্তিভোজনের অপরিমেয় তৃপ্তি, এসো—সকাল হ'তে মেলা দেখো—ক্ষিদে লাগলেই চলে এসো যে-কোন আখড়ায়। সকলের দ্বার খোলা। সন্ধ্যা পর্যন্ত সকলেই প্রসাদ নিয়ে প্রস্তুত। এ যেন আদিযুগের কোন যজ্ঞক্ষেত্রে এসে পড়েছি। কিসের যজ্ঞ—কে এই যজ্ঞের নায়ক—এ কেউ জানে না। সকলেই এই যজ্ঞের হোতা—সকলেই আহুতি দেবে। আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্মনির্বিশেষে।

গোপালদাস বাবাজীর সমাধি-মন্দির আর আখড়ার চারপাশে একটু ফাঁকা জায়গায় ভিড় জমিয়েছে বৈরাগী, বৈষ্ণব বাউল। একটি ছোট্ট ছেলেকে কৃষ্ণ সাজিয়ে একদল বৈষ্ণব বাউল বিচিত্র পোষাক পরে গান গেয়ে ভিক্ষা করছে।

মেলা দেখতে চাও? তবে এগিয়ে চল। কান্দরা গ্রাম ছাড়িয়ে শস্যশূন্য বিস্তৃত মাঠের মধ্য দিয়ে—পায়ে চলা পথ। জমির আল কেটে গরুর গাড়ি যাওয়ার রাস্তাও একটি আছে। দু'পাশে দূরে দূরে গ্রামের ইসারা। বাতাসে আমের মুকুলের গন্ধে মদির। কুবিনাথ প্রাচীন বট অশ্বত্থের পাতার সরসরানীতে আগামী চৈত্রের প্রস্তুতি। কিছুটা এগিয়ে গেলেই দুটি পথ এক হয়ে গেছে। অগণিত গাড়ির চাকার পেষণে মাঠের ঢেলামাটি ধুলো হ'য়ে গেছে। মেলায় পৌঁছনোর তাগিদে, চালক একটু জোরেই গাড়ি ছোটাচ্ছে—ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে পথ। পায়ে চলা যাত্রীর সর্বাঙ্গ ধূসর হয়ে যাচ্ছে সেই ধুলোয়। তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের—ধুলো তো নয়—এ যে লক্ষ তীর্থযাত্রীর স্পর্শপূত ব্রজরেণু।

দুপুরের কড়া রোদে পোড়া মানুষগুলির চোখে দূরের ছায়াচ্ছন্ন রাজুর গ্রামের স্নিগ্ধতা। পথ শেষ হ'য়ে এলো। দিগন্তবিস্তৃত ধানজমির দিকে চাইলে দেখা যাবে চারিদিক থেকে আসছে অগণিত মানুষ সারি বেঁধে। তাদের এই শৃঙ্খলা-বদ্ধতা শুধু মেলার তাড়ায়। 'বৈরাগী-তলার মেলা' তাই মানুষের মেলা। এবার এহিয়াপুর গ্রাম পেরোলেই মেলার কোলাহল কানে আসবে।

রামজীবনপুর হ'তে মেলার উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে যাওয়া যাক।

প্রবেশপথে প্রথমেই বিস্মিত হয়ে দেখবে এ আর এক মেলা। গরুর গাড়ির মেলা। যেন প্রদর্শনী। উত্তর আর পূর্বদিক ঘিরে গরুর গাড়ি ভিড় করে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির চাকার সাথে গরু বেঁধে চালক আর আরোহীর দল চলেছে মেলা দেখতে। কত বিচিত্র ধরণের 'টপ্পর' (গাড়ির আচ্ছাদন)।

প্রথম লক্ষ্যস্থল সমাধি-মন্দির। প্রবেশ করলেই প্রথমে ডানদিকে কাঠের তক্তা, দরজা, জানলা, গাড়ির চাকা, ঈশ, তক্তপোষ—সারা মাঠ জুড়ে দেখতে পাবে। বাঁদিকে তেলেভাজার দোকান। তারপর দু'পাশে মিষ্টির দোকান। ছেঁড়া-পাতায় আর জলে পিচ্ছিল পথ দিয়ে সাবধানে চলতে গিয়ে বুঝতে পারবে নিজের ইচ্ছামত পথ চলা তোমার আর চলবে না। হারিয়ে গেছ রসিকপ্রাণের ভিড়ে। মানুষের মেলায় নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে চল—গন্তব্যস্থল যে সকলেরই এক। কয়েকটা দোকান পেরোলেই দু'পাশে শুধু জুতোর দোকান—রঙ-বেরঙের জুতো। থমকে দাঁড়াবে না, এখন শুধু এগিয়ে চলা। এরপর সুরু হ'ল শিল-নোড়া আর পাথরবাটির দোকান, বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে এর এলাকা।

মাঝে বেশ কয়েকটি টিনের, মনোহারী, মিষ্টির ও শঙ্খের দোকান ছাড়ালেই বাবাজীর মন্দির। পথের দু'পাশে বাতাসার দোকান। যাত্রীর দল সেই বাতাসা কিনে মুঠো করে ছুঁড়ে দেয় বাবাজীর মন্দিরের চূড়ায়। কিছু বাতাসা চূড়ার নীচে কার্নিশে রয়ে যায়—কিছু গড়িয়ে পড়ে নীচে। ভক্তের দল সেই বাতাসা কুড়িয়ে নিতে মেতে ওঠে। ভক্তের দেওয়া বাতাসায় আচ্ছাদিত হ'য়ে যায় মন্দিরচূড়া। অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলির স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মন্দির। সমাধি-মন্দিরের সামনে তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামস্থল। আরও এগিয়ে গেলে অন্নমহোৎসবের আখড়া।

এবার মেলার আরও ভেতরে প্রবেশ করা যাক। মেলা নয়—যেন গোলকধাঁধা। তবু অনেকেই বলছে সে মেলা আর নেই। বিরাট এলাকায় এখন কিছু বসতবাড়ি হয়েছে। পশ্চিমে সেই আমবাগান আর নেই। তবু এখনও যা ভিড়—কল্পনা করা যায় না।

প্রথমে দীর্ঘ এলাকা জুড়ে শুধু এলুমিনিয়মের বাসন, কাঁচের চুড়ি, শাঁখা আর ফটো বাঁধাই-এর দোকান। ফটোর দোকানে চলচ্চিত্রের নাম-করা অভিনেত্রীর পাশে মহিষমর্দিনীর সহাবস্থান। এপাশে শুধু মেয়েদের ভিড়। চুড়ির দোকানে বাচ্চা মেয়ের বায়না সুরু হয়। এক সাথে সব চুড়িই হাতে পরার সাধ তার—বাঁশবনে ডোম কানা। দোকানদার জানে শিশুর মনস্তত্ব। ঠিক পরিয়ে দেয় মনোমত চুড়ি।

এরপরেই 'লে লে বাবু সাড়ে ছ' আনা'। কানের পাশে হাতের তালু রেখে ওস্তাদি গান গাওয়ার ঢঙে সমানে চীৎকার করে চলেছে 'হরেক মাল সাড়ে ছ' আনা।' সত্যিই হরেক রকমের মাল। চারিপাশে অনেক মনোহারী দোকান তাদের রকমারী পসরা সাজিয়ে। তবু যেন সাড়ে ছ'আনা আর আর দশ পয়সার প্লাস্টিকের দোকানে ভিড়ই বেশি। এর মাঝে এক দর্জি তার সেলাই মেশিন নিয়ে বসেছে। পথের ধারে মাটিতে চট বিছিয়ে বই-এর দোকানদার সাজিয়েছে—সামান্য সংগ্রহ তার। মোড়েই আর একটি বড় বই-এর দোকানে দেবসাহিত্য কুটীর আর অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশকদের যৌনগ্রন্থ হতে সুরু করে শাস্ত্রগ্রন্থ পর্যন্ত সবই ছড়িয়ে আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল আর চামড়ার কাজের দোকানও এসেছে। ঘর সাজানো সৌখিন দোকান একটি। মাঝে দুই সার শুধু কাটা পোষাক, ধুতি শাড়ি আর মাদুরের দোকান।

এর পরই আবার সুরু হয় মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁ। এ লাইনের দোকান শেষ হ'লেই দেখা যাবে—চিড়িয়াখানা, যাদুবিদ্যা আর দেহকৌশল প্রদর্শনের ছোট ছোট কয়েকটি আস্তানা। শ্রোতা আর দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্য কি বিচিত্র কৌশল। রঙ-বেরঙের বেশ-ভূষায় 'সঙ' সেজে চীৎকার করে

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ

প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ দিল্লী - নাগপুর

বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

চলেছে। মেলার সব চেয়ে আকর্ষণীয় প্রমোদকেন্দ্র পুতুলনাচ। নদীয়া জেলা হ'তে দুটি দল এসেছে। একটানা দোকানের মাঝে কিছুটা রঙ বদল হল। এর পর লোহার তৈরি গৃহস্থালী আর কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় জিনিস-এর কয়েকটি দোকান পেরোলেই আবার প্রমোদকেন্দ্রের ভিড়।

মেলার দক্ষিণদিক জুড়ে বসেছে বিরাট সার্কাস দল দুটি—আর ম্যাজিকও দুই দল। এই চার দলের সুবিস্তৃত তাঁবুকে ঘিরে যে কোলাহল—মাইকের চীৎকারও তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি।

দক্ষিণদিক ঘুরে আবার পূর্বদিকে এগিয়ে চল। এখানে সারি সারি খাবারের দোকান। কাঠের বাসন আর ছোট ছোট আসবাবপত্রের দোকান। দোকানদারদের কারবার গ্রাম্য গৃহিনীদের সাথে। তাই আট আনা দামের জিনিস তারা নির্বিবাদে বারো আনা বলছে। দাম কমিয়ে সেই জিনিস দশ আনায় কিনে গৃহিণীর মুখে ফুটে উঠেছে জিতে যাওয়ার হাসি।

তারপরের দোকানে বৈষ্ণবীর ভিড় জমেছে। দেখবে এক মাঝবয়সী বৈষ্ণবী আর এক কমবয়সী বৈষ্ণবীর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। গলার মালা কিনছে তাই এত রস। দেখতে পাবে টিনের তৈরি গৃহস্থালী সামগ্রী। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াবে, গাছের গুঁড়িতে নোটিশ দেখবে—'হরকালী ঔষধালয়ে' গাঁজা পাবেন—বুঝবে—এ রসের নাগরও আছে মেলায়। এরপর বিরাট মাঠ জুড়ে মাটির বাসনের স্তূপ। মাটির বিরাট জালা হতে সুরু করে বিয়ের ছোট্ট ভাঁড় পর্যন্ত পাওয়া যাবে। বিনুনীকরা বাবুই ঘাসের বোঝার কাছে মানুষের ভিড়। সোনারঙ খড়ে ঘর ছাইবার দিন এসেছে। বাবুই দড়ি না হলে বাঁধন দেওয়া হবে কিসে।

এত লোক এসেছে—থাকবে কয়েকদিন। তাদের দৈনন্দিন রান্নার জন্য পাবে কাঁচা তরিতরকারী, মাছ আর মশলার বেশ কয়েকটি দোকান।

এছাড়া পথে বিপথে ছড়িয়ে আছে —হুঁকো কলকে ও খড়মের দোকানের বৈচিত্র্য। মানুষের ভিড়েই শুনতে পাবে —'এই যে বাবু পালিশ', 'এই যে স্যার আপনার ফটো তুলে দিই', 'আসুন—বোম্বাই কা রাণী ছিল, বারো হাত তার চুল ছিল'—ইত্যাদি।

এবার এসো দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে। দেখবে কাঠের তৈরি চেয়ার টেবিল হ'তে সুরু করে প্রায় সব আসবাবপত্রই পাওয়া যায়। বাঁদিকের বিদ্যালয়ে আশ্রয় নিয়েছে ও জেলার পুলিশ কর্তৃপক্ষ। আর আছে কংগ্রেস সেবাদল। দেখবে—ঘুরে ফিরে আবার কখন পৌঁছে গেছ বাবাজীর সমাধি-মন্দিরে। মেলা দেখা শেষ করে দূরের একদল মহিলা যাত্রী এখানে একপাশে পা ছড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ওপাশে দীঘির ধারে এক বিরাট অশ্বত্থগাছের তলায় এক বৈষ্ণবী গান জুড়েছে। বয়সের ভারে জীর্ণ। চোখ মুদে গান করে চলেছে। বেশবাসের জীর্ণতার সাথে বার্ধক্যের অসহায়ত্ব কণ্ঠস্বরকে কোন কিছুই ম্রিয়মাণ করে নি। কয়েক জন বৃদ্ধা আর শিশু তার পাশে ভিড় জমিয়েছে—গানের পদও ভারী মধুর।

গৌর নাম আর ভুলবো না না—
আমি হব গৌর কলঙ্কী
যে যা বলবে সে তাই বলুক—
পরের কথায় হবে কি
যেদিন হতে রূপ হেরেছি
—আমাতে কি আমি আছি
কুলমান সব দিয়েছি—
ঐ গৌর পদে প্রাণ দিতে
আর বাকী কি।

যারা তিনদিনের জন্য এসেছে—মন্দিরের পাশেই তাদের রাতের আস্তানা। খোলা আকাশের নীচে বৈষ্ণব বাউলের গানই তাদের রাতের দোসর।

এবার ফেরার পালা। ফিরতি পথে পায়ে চলা যাত্রী—হাতে মিষ্টির হাঁড়ি। যারা আসতে পারে নি তাদের খুশি খুশি মুখ দেখার কল্পনায় যাত্রীর মুখ উজ্জ্বল। সব দেখা শেষ হ'লে উজান টানে গা ভাসিয়ে দাও। কোথাও বাধা নেই।

শুক্লপক্ষের রাত আর বসন্তের আমেজ। মেলাতে রাত কাটিয়ে ভোর রাতে চলার সুরু। বিদায়ী শীত আর আগুসারি বসন্তের হঠাৎ দেখা মিষ্টি আবহাওয়ায় যেতে যেতে বাউলের গান ভেসে আসে। সাথে একতারা, ডুবকি আর খঞ্জনির ঐক্যতান। বাউলের সুন্দর সুমোহন মূর্তি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। গান ধরেছে:

'ডাকার মত ডাকলে পরে
কানে কানে কথা বলে।'

তুমি যাকে ডাকো তোমার কাছেও তার ডাক আসে। সে ডাকার টানেই তো মেলায় জমায়েৎ। কতশত মানুষের সাথে দেখা হয়—মনে হয় কতকালের চেনা। বিচিত্র রসের কারবারী মন মানুষেরই রস খোঁজে। বৈরাগীভাবের ছোঁয়া লাগে মনে। মানুষের ভজনা মানুষে করে—প্রেমের লীলা চলে মানুষকে ঘিরে।

আবার সেই ছোট লাইনের স্টেশন—অপেক্ষমাণ জনতা। পিছু ফিরে চাইছো কেন? মন প'ড়ে রইল বুঝি বৈরাগীতলার মেলাতে। বেশ তো আগামীবার আসা যাবে—শুধু মনে রেখো—দথিয়া গ্রাম—আর মাঘী সপ্তমীর দিনটি।

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রঙ্গজগৎ

● উত্তমকুমার—'মোমের আলো' ছবিতে

ভারতে প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

ভারতে তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন সুরু হয়েছে। প্রথম আন্তর্জাতিক ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উৎসব ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পে নতুন এক প্রাণশক্তি এনে দিয়েছে। এই দুটি উৎসবে আমরা বিশ্ব-চলচ্চিত্রের গতিশীলতা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে প্রথম আন্তর্জাতিক উৎসব যেরূপ কার্যকরী হয়েছিল, দ্বিতীয় উৎসব সেরূপ হতে পারে নি। তার কারণ কারো অজানা নয় ;—আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি। এবারের উৎসব অন্যান্যবারের তুলনায় স্বতন্ত্র, গুরুত্বও অনেক বেশি। আগের বার ছিল প্রতিযোগিতাবিহীন। এবার প্রতিযোগিতামূলক উৎসব। এই তৃতীয় উৎসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুতরাং ভারতের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে।

উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিটী, উপদেষ্টা বোর্ড ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। উৎসব পরিচালনার জন্য একটি ডাইরেক্টরেট অব ফেস্টিভ্যাল কেন্দ্রে গঠিত হয়েছে। এসব কমিটীতে আমরা অনেক যোগ্য লোকের নাম দেখেছি। তা সত্ত্বেও আমাদের মনে হচ্ছে, উৎসব পরিচালনা এবারও অন্যান্য বারের মত সরকারী আওতার বাইরে আসতে পারবে না। অথচ তৃতীয় উৎসবের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভে এতদিন প্রধান অন্তরায় ছিল উৎসবের সরকারী চরিত্র। কেবলমাত্র সরকারী কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করে উৎসবের প্রতিযোগিতামূলক কাজ চালানো যায় না। উৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য স্টুডিও-কর্মী থেকে চলচ্চিত্র-সমালোচক পর্যন্ত চলচ্চিত্র সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেন, এমন সকল স্তরের লোকের সহায়তা প্রয়োজন। কিন্তু স্টুডিও-কর্মী ও পরিচালকদের এই ব্যাপারে এখনো আহ্বান জানান হয় নি ; এমন অনেক চিত্র-সমালোচক ও পরিচালক কমিটীতে স্থান পান নি, যাঁরা বহু আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদান করেছেন এবং আন্তর্জাতিক উৎসব পরিচালনার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে। ফিল্ম সোসাইটিগুলির যথার্থ প্রতিনিধিও কমিটীতে স্থান পায় নি। উৎসব কমিটীগুলি আরো প্রতিনিধিমূলক হওয়া এবং চিত্র নির্বাচন কমিটী যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত, যাতে আন্তর্জাতিক উৎসবের তাৎপর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশে যে রীতিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হয়, সেই অভিজ্ঞতাতেই আমরা কিছুটা শঙ্কিত।

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

মোমের আলো

(মাধবী পিকচার্স : সলিল দত্ত)

মানুষের জীবনের সুন্দর দিকগুলি বিকশিত করে তোলে প্রেম ; হতাশকে আশার আলোয় উদ্বুদ্ধ করে, এগিয়ে চলার শক্তি জোগায়। প্রেমহীন জীবন দুর্বিষহ, নানা জটিলতায় ভারাক্রান্ত, চলার বেগ হয়ে যায় মন্থর। মনস্তাত্ত্বিক কাহিনীচিত্র 'মোমের আলো' প্রেম-তৃষ্ণাতুর এক তরুণীর জীবনে বিপর্যয়ের করুণ চিত্র পর্দায় প্রকাশ করেছে। দৃশ্য গ্রহণের নৈপুণ্যে, সু-পরিকল্পিত সম্পাদনায়, হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতে এবং অভিনয়গুণে এই ছবি দর্শকদের সন্তুষ্ট করবে। পরিচালক ও চিত্রনাট্য রচয়িতা সলিল দত্ত পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব অভিজ্ঞ না হলেও এই ছবিতে তাঁর কাজ যথেষ্ট প্রশংসা পাবার যোগ্য। বিশেষ করে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় তিনি ছবিতে একটা স্নিগ্ধ মেজাজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন, যাতে ছবিটি বেশ দৃষ্টিসুখকর হয়ে উঠেছে।

নায়িকা দীপা এক অনুষ্ঠানে নাচতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে যায়। তারপর থেকে সে পঙ্গু হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে ; এবং অপ্রকৃতিস্থ। কোন ডাক্তার তাকে সুস্থ করতে পারে নি। এবার নতুন ডাক্তার সুরজিতের পালা। সুরজিৎ দীপাকে পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারলো, শরীরের অসুখের চেয়েও তার মনের অসুখটাই আসল। সে দীপার বিশ্বাস অর্জন করে, তাকে

ভালবাসা দিয়ে রোগের মূল কারণ বুঝতে পারে। দীপা নিজের মুখেই বলে—সে এক তরুণকে ভালবেসেছিল, কিন্তু সেকথা সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। তার নাচের দিন তারই এক আবদার রাখতে গিয়ে সেই তরুণ মারা যায়। তারপর থেকে দীপা মানসিক বৈকল্যে ভুগছে। যে প্রেমের অবলম্বনে সে জীবনকে বিকশিত করতে চেয়েছিল, সে অবলম্বন হারিয়ে মনের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনটাই পঙ্গু হয়ে যায়। সুরজিতের ভালবাসা পেয়ে আবার তার জীবনীশক্তি যখন ফিরে এসেছে—নতুন করে সুরজিৎকে নিয়ে তার কুমারীমনে জীবনের স্বপ্ন রঙিন হয়ে উঠেছে, এমন সময় সুরজিতের বাগদত্তা রুণা এসে উপস্থিত। সুরজিতই তাকে ডেকে এনেছে, নিজের আত্মরক্ষার জন্য। কারণ সুরজিৎ চিকিৎসার জন্য তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করলেও অগোচরে সেই অভিনয় তার মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে। যেদিন রুণার কাছে সুরজিৎ তার মনের কথা প্রকাশ করল, অন্তরাল থেকে সেকথা শোনার পর দীপা আবার তার পুরোনো ইনভেলিড চেয়ারে

● 'মোমের আলো' ছবির একটি দৃশ্যে ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গিয়ে বসলো; প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীবিত জীবন প্রেমের অভাবে মোমের আলোর মত ক্ষণিক জ্বলে নিভে গেল।

ফ্রয়েডের বিখ্যাত অবদমিত বাসনাতত্ত্বকে পরিচালক কাহিনী-বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছেন। এই ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের সাথে অনেকে একমত হয়তো হবেন না। অবদমিত কামবাসনা যে জীবনকে পরিচালিত করে একথা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হলেও এই কাহিনী দর্শকমন স্পর্শ করবে। কাহিনী বিন্যাসে চিত্রনাট্যকার একমাত্র রবি ঘোষ অভিনীত চরিত্রটি ছাড়া আর সব চরিত্রই বিশ্বাসযোগ্যরূপে উপস্থিত করেছেন। উল্লেখিত কৃত্রিম চরিত্রটি যে কেবলমাত্র দর্শকদের হাসাবার জন্য উপস্থিত করা হয়েছে, চরিত্রটি যে কাহিনীর অঙ্গ নয়—সেকথা দর্শকমাত্র বুঝতে পারবেন। দীপার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় ছবিটির বিশেষ আকর্ষণ। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় এক প্রেমহীনা নারীর মানসিক উদ্বেগ ও হতাশার দিকগুলি সাফল্যের সাথে প্রকাশ করেছেন। সুরজিতের চরিত্রে উত্তমকুমার যথাযথভাবে চরিত্র প্রকাশ করেছেন এবং রুণার উপস্থিতিকালে উভয়সঙ্কটের মুহূর্তটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিচারিকার ভূমিকায় গীতা দের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় ললিতা চ্যাটার্জী, উৎপল দত্ত, সুধীর সেন, রবীন মজুমদার, রবি ঘোষ যথাযথ অভিনয় করেছেন। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্ররূপায়ণ কিছুটা আতিশয্যপূর্ণ।

রবীন চ্যাটার্জীর সঙ্গীত পরিচালনা প্রশংসার দাবি রাখে। আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে অনিল গুপ্তের পরিচালনায়।

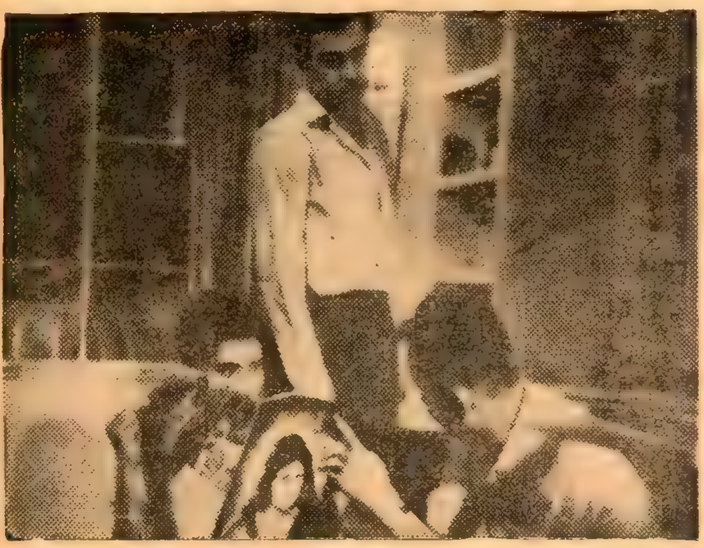

● 'তৃষ্ণা' ছবির স্যুটিং-এ অসিত সেন জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও শ্যামল ঘোষালকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

● 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবির স্যুটিং-এ সত্যজিৎ রায় মাধবী মুখার্জীকে নির্দেশ দিচ্ছেন

সন্ধ্যাদীপের শিখা

(চিত্রমন্দির : হরিদাস ভট্টাচার্য)

'সন্ধ্যাদীপের শিখা' গল্পের লেখক তরুণ ভাদুড়ী। এই গল্পের পটভূমি কাশ্মীর, দিল্লী, আগ্রা এবং শেষ পর্যন্ত চীন-ভারত সংঘর্ষের স্থান চুশুল। কাহিনী গড়ে উঠেছে দুই মিলিটারী মেজর ও তাদের সঙ্গে এক সাংবাদিককে নিয়ে—ভাগ্যবিড়ম্বিতা এক নারীর জীবনকে কেন্দ্র করে। এই নারী জয়ন্তী,—মেজর অনুপমকে নিয়ে সুখের নীড় বাঁধার স্বপ্নে হাসি-আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিন্তু বিয়ের একবছর না ফুরোতেই, তাদের বিবাহ বার্ষিক অনুষ্ঠানে অনুপমের উপস্থিতির পরিবর্তে উপস্থিত হয় এক দুঃসংবাদ। অনুপম যুদ্ধে নিহত হয়েছে। জয়ন্তী শ্বশুরবাড়িতে আশ্রয় পায় না। শোককাতর ও স্বামীর প্রেমে একাগ্র স্ত্রী জীবনের পথ হারিয়ে ফেলে।

একদিন যাকে অনুপমের বন্ধু আলতাফ অনেক সাধ্য-সাধনায়ও মদ ছোঁয়াতে পারে নি—এখন সে বারে বসে মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকে, জীবনকে ভুলতে চায়। একদিন মাতাল অবস্থায় সে দিল্লীতে সাংবাদিক তরুণের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু তরুণের শত চেষ্টা ও বন্ধুত্ব তাকে ধরে রাখতে পারে নি, আবার নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। পথে দেখা মেজর আলতাফের সঙ্গে। আগ্রায় সে আলতাফের কাছেই খবর পায় চুশুলের কোন সমভূমিতে অনুপমের দেহ শায়িত আছে। এবার তার মন আরো বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে; স্বামীর শেষ চিহ্নটুকুও আজ নাগালের মধ্যে নেই—যাতে দুটো ফুল রেখে মনের তাপ শান্ত করতে পারে। এই বেদনা থেকে সে যেন জীবনপথের লক্ষ্য স্থির করে ফেলে। আবার সে নিরুদ্দেশ- - -।

তারপরে শেষবার তাকে দেখা গেল চুশুলের তুষারাচ্ছন্ন প্রস্তরাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে সে একাকী চড়াই-উৎরাই পার হচ্ছে। স্বামীর কবরে পৌঁছবার পূর্বমুহূর্তে চীনা সৈন্যের বুলেটবিদ্ধ হয় তার শরীরে; রক্তাক্ত দেহ নিয়ে গড়াতে গড়াতে স্বামীর কবর স্পর্শ করে জয়ন্তী শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক একটা মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ছবিটি পরিচালিত করেছেন। সেই উদ্দেশ্য চীনের সীমান্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘৃণা জাগ্রত করা এবং জনমতকে প্রতিরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা। সুরুতে পরিচালক বেশ এক আমুদে পরিবেশে কাহিনীর সূত্রপাত করেছেন। কাশ্মীরের সুন্দর দৃশ্যে ও কৌতুকাত্মক কথায় এই উদ্যোগপর্ব উপভোগ্য। তারপরেই কাহিনী কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে একমাত্র জয়ন্তীকে নিয়ে। স্বামীর প্রতি ভালবাসার আবেগ জয়ন্তীকে প্রায় অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে, এবং স্বামীহারা নারীর জীবন যে অর্থহীন একথা পরিচালক বোঝাতে চেয়েছেন।

স্বামীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার বাসনায় জয়ন্তীকে আমরা নারীবাহিনীতে যোগ দিতে, প্রতিরক্ষার

● 'ঈডিপাস' নাটকে রাণী যোকাস্টা ও কোরাসের দল

উদ্দেশ্যে চাঁদা তুলতে অথবা জোয়ানদের সঙ্গে সেবামূলক কোন কাজে দেখি নি। এমন কি সে রেডক্রশের সদস্যা হওয়া সত্ত্বেও রেডক্রশের কাজ নিয়ে ফ্রণ্টে যেতেও তাকে দেখা গেল না। জয়ন্তী একাকী পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে তুষার মরু, চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে উপস্থিত হলো চুশুলে শুধুমাত্র স্বামীর কবরে প্রাণ রাখতে। এই শেষাংশ অপরিণত চিন্তাপ্রসূত এবং জয়ন্তীর চরিত্রকে মানবিক দিক থেকে করে তুলেছে সঙ্কীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক। বিশ্বাস্যতার দিক থেকে বিচার করলে জয়ন্তীর একাকী চুশুলে উপস্থিত হওয়া অবিশ্বাস্য। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ভৌগোলিক ও আবহাওয়া কোন দিক থেকেই নয়। আসলে জয়ন্তী একটি কৃত্রিম ও ফরমায়েসী চরিত্র হয়ে উঠেছে। সুতরাং পরিচালক দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ নিয়ে ছবিটি পরিচালিত করলেও প্রচারমূলক দিকের স্থূলতার জন্য শিল্পমূল্য গৌণ হয়ে পড়েছে।

জয়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেন সুচিত্রা সেন। সুরসিকা স্ত্রী ও পানোন্মত্তা নারীরূপে তিনি সু-অভিনয় করেছেন। আর তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, অনিল চ্যাটার্জী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়। সুচিত্রা সেনের পাশে বিকাশ রায়কে একটু বেশি বয়সের মনে হয়েছে, অনিল চ্যাটার্জীর হিন্দী বাংলা মিশ্রিত ভাষায় তাকে যতটা বাঙালী মনে হয়েছে ততটা অবাঙালী মনে হয় নি।

আলোকচিত্র গ্রহণের কাজ প্রশংসনীয়।

সংবাদবন্যা

ভারতে চার্লি চ্যাপলিন আমন্ত্রিত?

দিল্লীতে এরূপ শোনা যাচ্ছে যে, ভারতে তৃতীয় অন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানের জন্য চার্লি চ্যাপলিনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। একথা সত্য হলে ভারতবাসীমাত্রেই আনন্দিত হবে।

কাজী সব্যসাচী

বাংলা দেশের মানুষের কাছে এই নামটি অপরিচিত নয়। অনেক সাধ করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জ্যেষ্ঠপুত্রের নামকরণ করেছিলেন সব্যসাচী। কিছুদিন আগেও এই নাম নির্বাচন নিয়ে প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে কাজী সব্যসাচী সমাদরে উল্লিখিত হয়েছেন।

শুধু নামেই নয়, নামের অর্থ ব্যঞ্জনায় সব্যসাচী পিতার আশা পূর্ণ করেছেন। সংস্কৃতির যাবতীয় ক্ষেত্রে সব্যসাচীর জুড়ি পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। আবৃত্তির দ্বারা কাব্যের রস ঘনীভূত তিনি সহজেই করতে পারেন, কিন্তু

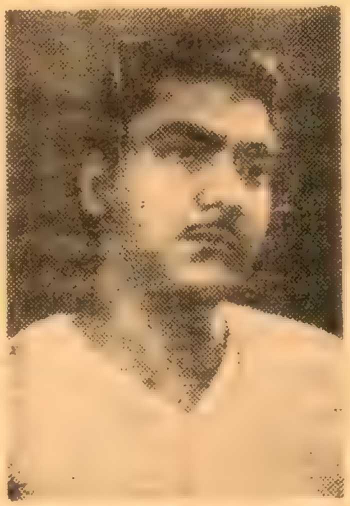

● কাজী সব্যসাচী

তাঁর প্রবন্ধ আবৃত্তি যিনি শুনেছেন তিনি উদ্দীপ্ত না হয়ে থাকতে পারেন না। শুধু বিশেষ সভানুষ্ঠানেই নয়, আকাশবাণীতে তাঁর কণ্ঠ কেইবা শোনেন নি। সিনেমাতেও ঘোষিত হয় তাঁর নেপথ্য কণ্ঠ। বাংলা দেশ তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক পাবার আকাঙ্ক্ষা করে।

নাটকের কথা

ঈডিপাস রেকস

দিল্লীতে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এণ্ড এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউটের ছোট থিয়েটার-হলে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনীত 'ঈডিপাস রেকস' নাটকটি সেপ্টেম্বর মাসে অভিনীত হয়েছে। নাটকটির প্রযোজক উক্ত স্কুলের পরিচালক শ্রী ই এলকাজী। অভিনয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আগাগোড়া একটা এপিক গ্রানজারের ভাব। ওম শিবপুরী ঈডিপাসের ঔদ্ধত্য, ব্যক্তিত্ব এবং শেষের বিষাদময়তার ভাব অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যোকাস্টার ভূমিকায় সুধা শর্মা বিশেষভাবে শেষের দিকে দর্শকদের মোহিত করে রেখেছিলেন। কোরাস অভিনেতাদের মুখোসগুলি চমৎকার এফেক্ট সৃষ্টি করেছে। নার্সের ভূমিকায় মোহিনী রায়নার মূকাভিনয় সকলকে মুগ্ধ করেছে।

দশরূপক-এর 'গৈরিক পতাকা'

বাংলা নাট্য আন্দোলনে অপেশাদার নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্যান্য দেশের মতো বাংলা নাট্য উন্নয়নের পথিকৃৎ এ দেশের প্রগতিশীল অপেশাদার নাট্য সম্প্রদায়গুলি এতে দ্বিমত নেই। পেশাদার মঞ্চের মতো স্থূল রুচির কাছে আত্মসমর্পণের বদলে এরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নবনাট্য আন্দোলনে প্রগতিশীল চিন্তার যোগান দিয়ে চলেছে।

দশরূপক নাট্য প্রতিষ্ঠান এই নবনাট্য আন্দোলনের বিশেষ অংশীদার। এদের 'কালপুরী', 'অগ্নিকোণ', 'রাজা রাবণ', 'ডানাভাঙার পাখি', নাটকগুলি নতুনত্বের দাবি রাখে। কিন্তু এবার নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক 'গৈরিক পতাকা' নিয়ে দর্শকদের সামনে এসেছে। মুক্ত অঙ্গনে কয়েকটি রজনী অভিনয়ে দশরূপকের সুনাম অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা যেতে পারে। শিল্পীদের সমষ্টিগত অভিনয়ে নাটকটি সুন্দর হয়েছে। একক অভিনয়ে শিবশঙ্কর ঘোষ (আদিল শাহ), তারক ধর (ঘোড়পুরে), শিবনাথ ধর (শিবাজী), পান্না চট্টোপাধ্যায় (রামদাস স্বামী)। অরুণ দত্ত (তানাজী) ও দিলীপ গুপ্তের অভিনয় প্রশংসার দাবি করে। মঞ্চস্থাপত্যে, আলোকসম্পাতে ও সঙ্গীতে উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া গেছে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

বুদ্ধদেব নাটকে অমৃত মিত্রের বুদ্ধ এবং বিনোদিনীর গোপা চরিত্রে অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

Edwin Arnold-এর Light of Asia-র উপর ভিত্তি করেই বুদ্ধদেব নাটকটি রচিত। এই সময়ে Edwin Arnold আবার ভারতে এসেছিলেন এবং বুদ্ধদেব নাটকটির অভিনয় দেখেছিলেন—তাঁর India Revisited প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন :

'Another singular pleasure was to witness a performance of the Light of Asia played by a native company to an audience of Calcutta Citizens who close attention to the long soliloguies and quick appreciation of all the chief incidents of the story gave an idea of their intelligence and proved how metaphysical by nature these Hindu people are. The stage-appliances were deficient to a point incredible for a London manager and the mise en scene sometimes almost laughable in simplicity. Nevertheless, there was a refinement and imaginativeness in acting as well as an artistic sense entirely remarkable, and the female performers proved quite as good as the male.'

১৮৮৬ সালের ১২ই জুন গিরিশ-চন্দ্রের বিল্বমঙ্গল মঞ্চস্থ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কৃপালাভের পর তাঁরই প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের এই প্রথম নাট্য-রচনা। সেই কারণেই ভক্তিরস এত জমাট বেঁধে উঠেছে এই নাটকে। নাটকটি দেখবার সময় দর্শক এবং শ্রোতারাও যেন আর সব কিছু ভুলে গিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, তিনি পঞ্চাশবার নাটকটি পড়েছেন এবং প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু নতুন আলোক পেয়েছেন। সিস্টার নিবেদিতারও বিল্বমঙ্গল এত ভাল লেগেছিল যে, এর অনেকাংশই তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ পর্যন্ত করেছিলেন। নামভূমিকায় নামতেন অমৃত মিত্র। চিন্তামণি বিনোদিনী এবং পাগলিনী গঙ্গামণি। সাধক-চরিত্রে বেলবাবুর

শিলালি

অভিনয় খুবই ভাল হোত—কিন্তু পরে যখন গিরিশবাবু এই ভূমিকায় নামতেন, তখন যেন সাধক-চরিত্রের গভীরত্ব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতো দর্শকদের কাছে। বিনোদিনীর চিন্তামণির থেকে কিন্তু গঙ্গামণির পাগলিনীর অভিনয় জন-সাধারণের প্রশংসা পেল অনেক বেশি। এর ফলে একটা ভুল ধারণা দেখা দিল বিনোদিনীর মনে। তাঁর মনে হোল গিরিশবাবু ইচ্ছা করেই তাঁকে লোকের কাছে নামিয়ে আনবার জন্য ঐভাবে তাঁকে পার্ট শিখিয়েছেন। অভিমানে থিয়েটারের চাকরী ছেড়ে দিলেন। চিন্তামণির ভূমিকাই বিনোদিনীর নতুন নাটকে শেষ ভূমিকা। কিন্তু এ অভিযোগের পেছনে এতটুকুও যুক্তি ছিল না। আসলে তাঁর অহংবোধ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, গিরিশচন্দ্রও ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। বড়দিনের সময়ে বেল্লিকবাজারে রঙ্গিণীর ভূমিকায় অভিনয় করেই তিনি মঞ্চাভিনয় থেকে অবসর নেন।

রূপসনাতনই এখানকার শেষ নাটক। এ নাটকে চৈতন্যের রোলে বেলবাবুর অভিনয় সবারই প্রশংসা পেয়েছিল।

স্টার থিয়েটার এই সময়টায় গৌরবের উচ্চশিখরে—কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এক বিপদ দেখা দিল।

গোপাললাল শীল ছিলেন একজন বিখ্যাত ধনকুবের। স্টার থিয়েটারের নামডাক দেখে তাঁর ইচ্ছা হোল এই থিয়েটারটি তিনি কিনে নেবেন এবং সম্প্রদায়ের অভিনেতা, অভিনেত্রীদের বেশি পয়সা দিয়ে ভাঙিয়ে নিজের থিয়েটারে নিয়ে আসবেন। তাঁর তরফ থেকে যখন থিয়েটার কিনে নেবার প্রস্তাব এল—গিরিশচন্দ্র এবং তাঁর শিষ্যবর্গ পড়লেন মহা মুস্কিলে। কাপ্তেনী থিয়েটারে সত্যিকার নাট্যোন্নয়নের বা নাট্যশালার পরিপুষ্ট প্রচেষ্টা যে কিভাবে পদে পদে ব্যাহত হয় এ অভিজ্ঞতা প্রতাপ জহুরী এবং গুর্মুখ রায়ের আমলেই তাঁদের হয়েছে। অথচ গোপাল শীলের সঙ্গে শত্রুতা করে থিয়েটার চালানো সম্ভব হবে না—থিয়েটারের জমি আগেই গোপালবাবু পূর্ব মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করা হোল থিয়েটারের বাড়ি বিক্রি করা হোক, কিন্তু স্টারের নাম বা গুডউইল ছাড়া হবে না। থিয়েটার বাড়ি বেচে যে টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে অন্য কোনও জায়গায় নতুন করে স্টার মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা এইভাবেই হোল—স্টারের বাড়ির নাম বদলিয়ে গোপাল শীল যে নতুন থিয়েটার খুললেন তার নাম হোল এমারেল্ড থিয়েটার। অমৃতলাল প্রভৃতি হাতীবাগানে জায়গা কিনে আবার স্টারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

(ক্রমশঃ)

পাঠক মন

প্রথমেই 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ও পরিচালক কর্মিবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই পত্রিকার গত সংখ্যার 'পাঠক-মন' শীর্ষে শ্রীরণধীররঞ্জন দাসের চিঠির জবাবে—আমার কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি।

পত্রলেখকের প্রথম তিনটি মন্তব্য সুস্পষ্ট ও সঙ্গত। কিন্তু তারপর তিনি জানিয়েছেন 'আর রঙ্গমঞ্চ? এত সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ যে অনেক সময়ে বিরক্তির কারণ ঘটে থাকে। কথাটা আমার ভালো লাগে নি। তাই আমার বক্তব্য হ'ল যে, অন্যান্য পত্রিকায় যেখানে শুধু—চলচ্চিত্রজগৎকে নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে, সেক্ষেত্রে 'বসুমতী' পত্রিকায় শিলালির 'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' দেবনারায়ণবাবুর 'নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী' ও 'রঙ্গজগৎ'—এই তিনটি বিষয়ের আশ্চর্য সংযোজন সমস্ত আলোচনার ঊর্ধ্বে। কারণ, এ তিনটি বিষয়ের সমষ্টিগত আলোচনা সমস্ত অভাব পূর্ণ করে দেয়।

রণধীরবাবুর ৪নং বক্তব্য—বিশেষত কবিতাপ্রিয় পাঠক হিসাবে মেনে নিতে পারি নি। কারণ এ-যাবৎ এ পত্রিকায় যে সব নবীন ও প্রাচীন কবিদের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, তা সবই সময়োপযোগী ও সুবিবেচনার যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। তবে খ্যাতিমান কবিদের কবিতা খুব অল্পই প্রকাশিত হওয়ায় যদি পত্রলেখক উক্ত মন্তব্য করে থাকেন—তবে সে বিষয়ের ভার সম্পাদিকা মহাশয়ার নিজের উপর।

কথাশেষে, পত্রলেখকের স্বপক্ষে কিছু বলব—পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত সুদূর গ্রামাঞ্চলের অন্ধকারে যে সব সর্বহারা মানুষ দিনের পর দিন মূক হয়ে অভাব ও অত্যাচারের গ্লানি বহন করে চলেছে, তাদের কথা এ পত্রিকার মধ্য দিয়ে আধুনিক সভ্য মানুষের কানে পৌঁছে দিতে হবে।

এছাড়া সম্পাদিকা মহাশয়ার 'গ্রন্থমেলা'র কলেবর আরো বৃদ্ধি পেলে আনন্দিত হই। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত ও উৎসুক পাঠক হিসাবে, সবশেষে এ কথাই বলব যে, মাত্র ২৫ পয়সার বিনিময়ে সারা দুনিয়ার রূপ, রস, গন্ধ এমনভাবে সাধারণ মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে অন্য কোন পত্রিকা সক্ষম কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্যামল সেন

২।৩ রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা—৩

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী' নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশের পর থেকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে এর প্রত্যেকটি সংখ্যা পর পর পড়ে আসছি। 'বসুমতী সত্যি কৃপণা নন'—এই কাগজখানি পাঠ করে—এই কথাই বার বার মনকে দোলা দেয়। 'শহর কলকাতা' থেকে যাত্রা সুরু করে 'বঙ্গদর্শন' 'দিল্লী থেকে' 'ভারতদর্শন' ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করে এই পত্রিকার গতি ছড়িয়ে পড়েছে 'আন্তর্জাতিক জগতে'। একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা, সুলভ মূল্যে, এতো বিচিত্র ও বিপুল কর্মভার বহন করছে যা সত্যিই দুর্লভ। 'আজকের মানুষ' বিভাগটি এই পত্রিকার একটি বিশেষ আকর্ষণ। এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই—'আগের মানুষ' বলে পৃথিবীর মহামানবদের জীবনের ওপর রচনা, যা উক্ত সময়ের চিন্তার উপযোগী তা প্রকাশ করলে কেমন হয়? আর একটি কথা, ক্রমশ রচনার প্রকাশ একটির বেশি অল্পপরিসর পত্রিকায় ভাল লাগে না, কারণ এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিশেষ প্রকাশে রচনার পুষ্টি জমে ওঠে না। উপরন্তু রসধারা হয় ব্যাহত।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র দে

নিউমাল জংশন

পোঃ মাল জেঃ জলপাইগুড়ি

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন নিত্য আগ্রহশীল পাঠক।

অল্প পয়সায় সুসংগঠিত ও সুন্দরভাবে আপনারা জনসাধারণকে জ্ঞানলাভের যে পথ দেখিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার্হ। 'আজকের মানুষ' পাঠকদের জীবনকে পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীদের বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে রশ্মিময় করে তুলতে যোগ্য নেতৃত্বই দেবে। 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোগ্রাহী। 'ভারতদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'বঙ্গদর্শন', 'আজকের পশ্চিম জার্মানী' প্রভৃতি থেকে আমরা দেশ-বিদেশের অনেক খবর সংক্ষিপ্তভাবে অল্প কথায় মনের মুকুরে গেঁথে রাখতে পারি। শিলালি ও দেবনারায়ণ গুপ্তের রঙ্গজগৎ সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি পাঠকসাধারণের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। গত ৬ষ্ঠ ও ৮ম সংখ্যায় 'রাতপাখীর কান্না' ও 'রৌদ্র-ছায়ায়' গল্প দুটি খুব ভাল লেগেছে। শ্রীপদাতিকের 'শহর কলকাতা' পাঠান্তে কলকাতার কত অপরিচিত অলি-গলির সাথে পরিচিত হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেছি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি শহর কলকাতার বিভিন্ন স্থানের যে বাস্তবালেখ্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই অনবদ্য।

আর অবশেষে কয়েকটি অনুরোধ করবো: পত্রিকাটির মুদ্রণ ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন অবশ্য কর্তব্য। অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণের জন্য লেখাগুলোর বক্তব্য বিষয় পাঠক ও লেখকের মধ্যে মাঝে মাঝে বিন্ধ্যপর্বত হয়ে দাঁড়ায়। প্রচ্ছদপটের কাগজ আর একটু ভাল দেওয়া উচিত। অবশেষে মাত্র পঁচিশ পয়সায় জীবনী, ইতিহাস, সংবাদ, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ-এর মাধ্যমে দেশের শিক্ষার অগ্রগতি সাধনে আপনারা যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তার সফলতা কামনা করে এখানেই আমার বক্তব্যের ইতি দিলাম।

অসীমজ্যোতি দাশ

গ্রন্থাগারিক, প্রগতি সংঘ

দুর্গাবাড়ি নালিয়াপুল

ডিব্রুগড় (আসাম)

খেলা ধুলা

একটি অবিস্মরণীয় ডেভিস কাপ কাহিনী

শ্রীঅমিতাভ

এ ঘটনাটি ঘটেছিল আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া শহরে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস, ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা। সকলেরই ধারণা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে আমেরিকা এবার হাসতে হাসতে জিতবে ডেভিস কাপ। এই ধারণা বদ্ধমূল হল যখন প্রথম দিনের খেলায় আমেরিকার ববি রিগস আর ফ্র্যাঙ্ক পার্কার অস্ট্রেলিয়ার জন ব্রমউইচ এবং কৌশলী খেলোয়াড় ডন কুইস্টকে সিঙ্গলস খেলায় হারিয়ে দুই খেলায় অগ্রগামী থাকল। আমেরিকার কাগজগুলো সংক্ষেপে লিখল ডেভিস কাপ আমেরিকার পকেটে, বাকী তিনটে খেলার একটি জিততে আমেরিকার কোন বেগই পেতে হবে না। তা ছাড়া আমেরিকার ববি রিগস সেবার উইমবলডেন বিজয়ী।

প্রথম দিনই যে দল দুটো খেলায় হার স্বীকার করেছে তাদের পক্ষে ডেভিস কাপ জেতার নজীর টেনিসের ইতিহাসে নেই। তবে দ্বিতীয় দিন ভাগ্যদেবী অস্ট্রেলিয়ার প্রতি সদয় হলেন। অস্ট্রেলিয়ার ব্রমউইচ ও কুইস্ট জুটি জ্যাক ক্রেমার ও জো হান্টকে হারিয়ে দিলেন। অজেয় রিগসের জয় সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিত। এই পটভূমিকায় শেষ দিনের খেলা শুরু হল। প্রাকৃতিক আবহাওয়া অতি মনোরম, কিন্তু মাঠের হাওয়া গরম, চারিদিকে চাপা উত্তেজনা। ওদিকে ইউরোপে নাজী বাহিনী পোল্যাণ্ডের বুকের ওপর চেপে বসেছে। বহুদূর হলেও যুদ্ধের সেই ঢেউ যেন টেনিস মাঠের ওপর আছড়ে পড়ছে। এই রণোন্মাদনা দু'দলের খেলোয়াড়দের মধ্যেও যেন সংক্রামিত হল। পরিশ্রম লাঘবের জন্য ববি রিগসকে ডাবলস খেলা থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। রেসের ঘোড়ার মত রিগস তখন টগবগ করছে। আর এড্রিয়ান কুইস্ট, বেচারী তিনদিন পরপর অবিশ্রান্ত খেলে চলেছে। কুইস্ট নিজের সার্ভিস গেম খেলায় শুরুতেই হারাল। দর্শকরা ভাবল কুইস্ট গো-হারা হারবে। কিন্তু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটতে লাগল, দর্শকরা তাজ্জব। কুইস্ট যেন দানবে পরিণত হল আর বিপক্ষে রিগস যেন বালখিল্য। কুইস্টের মারের চোটে কোর্টের এদিক থেকে ওদিক বেচারী রিগস পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগল। টেনিস কোর্টে রিগসের এমন দশা কেউ দেখে নি। কুইস্ট প্রথম সেট ৬-১ গেম, দ্বিতীয় সেট ৬-৪ গেমে জিতল। উইমবলডেন বিজয়ী রিগসের একি দুর্দশা!

কিন্তু রিগস ধীরে ধীরে খেলার মোড় ঘোরালেন। ধান-চাল দিয়ে তিনি উইমবলডেন জেতেন নি। এই উত্তেজনাময় মুহূর্তে কুইস্ট পা হড়কে পড়ে গেলেন, কুইস্টের এই পতনে দর্শকরা ভাবল তিনি আর সামলে উঠতে পারবেন না। ববি রিগস অবলীলাক্রমে ৩য় এবং ৪র্থ সেট জিতল। কুইস্ট একেবারে ভেঙে পড়েছেন, দর্শকরাও নিশ্চিত যে তাঁর পরাজয় আসন্ন। অস্ট্রেলিয়ার ডেভিস কাপ জেতার আশা ক্রমে দূরীভূত হচ্ছে। ৫ম সেটে পরিশ্রান্ত কুইস্ট তাঁর শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে খেলায় নামলেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে রিগস ভেঙে পড়ল, এক অবিস্মরণীয় খেলায় কুইস্ট রিগসকে ৬-৪ গেমে হারাল। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া সমান সমান। শেষ খেলায় ব্রমউইচ সহজেই পার্কারকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৩৯ সালের জন্য ডেভিস কাপ বিজয়ী করল।

এ বছর ডেভিস কাপ খেলার পরিস্থিতি ১৯৩৯ সালের মত দাঁড়িয়েছিল। প্রথম দিন খেলার মধ্যে একটিতে এমার্সন র‍্যালস্টনকে হারাল, অন্যটিতে আমেরিকার ম্যাকিনলে জিতল। ডাবলস খেলায় জিতে আমেরিকা ২-১ খেলায় অগ্রগামী হল। শেষদিনের খেলায় একটি মাত্র সিঙ্গলস ম্যাচ জিততে পারলেই ডেভিস কাপ আমেরিকার। অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলে একটি চিত্তাকর্ষক খেলায় আমেরিকার র‍্যালস্টনকে পরাজিত করলেন। দুই দেশ তখন সমান সমান। শেষ খেলার ওপর সব কিছুই নির্ভর করছে। ডেভিস কাপের সিঙ্গলস খেলায় আজ পর্যন্ত এমার্সন পরাজিত হন নি। শেষ খেলায় এমার্সন চ্যাক ম্যাকিনলেকে হারালেন। আমেরিকা থেকে ডেভিস কাপ আবার ফিরে এল অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৩৯ সালের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলা চলে।

ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রসঙ্গে

ভারতের ১৯৬২ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে দ্বিতীয় টেস্টে অধিনায়ক নরি

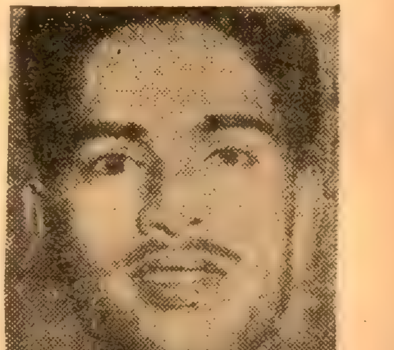

চান্দু বোরদে

…ট্রাটার আহত হবার পর ভারতের অধিনায়ক সমস্যার উদ্ভব হয়। সাময়িকভাবে অবশ্য সহ-অধিনায়ক পতৌদির নবাব দলের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। গত মরশুমে মাইক স্মিথের নেতৃত্বে এম-সি-সি'র ভারত সফরের প্রাক্কালে ভারতীয় দলের অধিনায়ক সমস্যা প্রকটরূপ ধারণ করে। অধিনায়ক-পদের প্রার্থী তিনজন—পতৌদি, বোরদে এবং জয়সীমা। সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান করে নির্বাচকমণ্ডলী অবশেষে পতৌদির ওপর নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেন। অধিনায়কের ভূমিকায় পতৌদি গতবার ভালোভাবেই উৎরে গিয়েছেন।

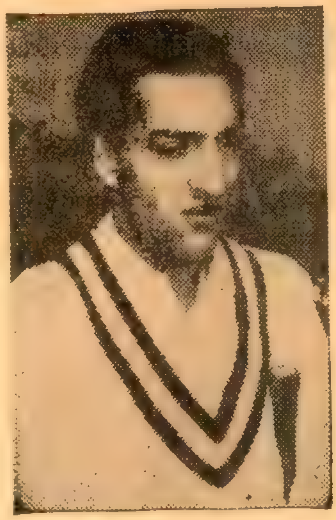

● পতৌদির নবাব

● জয়সীমা

এবার ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে পতৌদিকেই পুনর্বার অধিনায়ক-পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। গতবারের এম-সি-সি দলের দলের তুলনায় এবারের সিম্পসনের ক্রিকেট-বাহিনী সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিশালী। সমস্ত ইংলণ্ড বিজয় সমাপ্ত করে মনোবল তাদের অটুট; ব্যাটিংয়ে তারা দুর্ভেদ্য, বোলিংয়ে তারা অপ্রতিরোধ্য। তাই অধিনায়ক হিসাবে এবার পতৌদির দায়িত্ব অসীম।

মাদ্রাজ টেস্টে ভারতীয় দল নির্বাচিত হয়েছে। তরুণ স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর এবার আশ্চর্যভাবে দল থেকে বাদ পড়েছেন। নির্বাচকমণ্ডলীর মতে বর্তমানে চন্দ্রশেখর তাঁর বলের গতি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করার ফলে, তাঁর ক্ষুরধার স্পিন অনেকাংশে নষ্ট করে ফেলেছেন। সুইং বোলার বসন্ত রঞ্জনেকে দিয়ে এবার ভারতীয় দলের বোলিং আক্রমণ শুরু করা হবে। রঞ্জনে ইন সুইং এবং আউট সুইং সমানভাবে দিতে পারেন। ভারতীয় দলে নবাগত হলেন সৌরাষ্ট্রের তরুণ উইকেট-রক্ষক ইন্দ্রজিৎ সিংজী। ইন্দ্রজিৎ আর জয়সীমা ভারতের পক্ষে ইনিংস উদ্বোধন করবেন। অল রাউণ্ডার দুরানী, বোরদে, নাদকার্নি আছেন, ব্যাটে আছেন পতৌদি, হনুমন্ত এবং সরদেশাই। এবার ভারতীয় দলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকলেই ব্যাটে পোক্ত। অবিশ্বাস্য কোন ঘটনা না ঘটলে এবং জয়লক্ষ্মীর অকৃপণ কৃপা লাভ না করলে ভারতের জয়লাভ করা অসম্ভব।

সমাচার দর্পণ

ইন্দোনেশিয়ার ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রী মালাডি ৬০ জনের এক অলিম্পিক-বাহিনী নিয়ে টোকিওতে উপস্থিত হয়ে এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব করেছেন। এই দলে এমন কয়েকজন এ্যাথলেট আছেন যাঁদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংস্থা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে

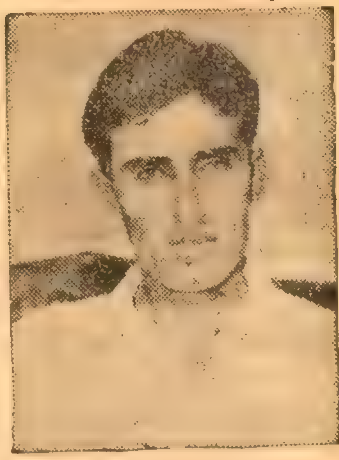

● সেলিম দুরানী

এবং তাঁদের অলিম্পিক গ্রামে প্রবেশের অধিকার নেই। এখন এই ঘটনাকে নিয়ে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করাই ইন্দোনেশিয়ার প্রধান লক্ষ্য মনে হচ্ছে।

• • •

বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দল উন্নীত হয়েছে। ফাইন্যালে কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়।

• • •

এশীয় টেবিল টেনিসে জাপান বিজয়ী হয়েছে। ভারতীয় দল লাভ করেছে চতুর্থ স্থান।

• • •

আই এফ-এ'র একটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শীল্ড ফাইন্যাল খেলা অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে গিয়েছে।

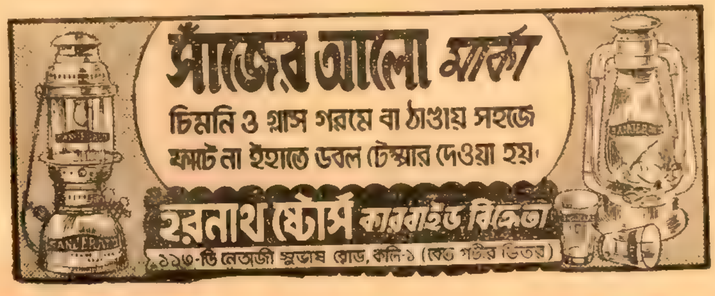

॥ অলিম্পিক—প্রাচীন ও নবীন ॥

ইতিহাস, হ্যাঁ ইতিহাসই তৈরি হচ্ছে---খেলার ইতিহাস, ঠিক কয়েকদিনের মধ্যেই বসছে সেই আন্তর্জাতিক খেলার আসর---অলিম্পিক গেমস এবার এশিয়ার মাটিতে, টোকিওয় এই সর্বপ্রথম।

পৌরাণিক কথা : অলিম্পিক ক্রীড়ার আদিভূমি গ্রীস, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গ্রীসের অলিম্পিয়ার মাটি অবধি খুঁড়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন---এ তথ্য সর্বাংশে সত্য। তবে ইতিহাস যেখানে নীরব, পুরাণ সাহিত্য সেখানে সোচ্চার। কেউ বলে হারকিউলিস এলিসের রাজা অজিসকে হারিয়ে দেওয়ার পর বিজয়োল্লাসের স্মারক হিসেবে তার চার ভাই-এর মধ্যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। দূরত্ব একশো বিরানব্বই মিটার। আর আজও স্ট্যাণ্ডার্ড অলিম্পিক স্টেডিয়ামের দৈর্ঘ্যও তাই। দ্বিতীয় মতে গ্রীস দেবতা জিউস তার বা ক্রোনসের পৃথিবী দখলের যুদ্ধে জয়লাভের কথা চিরজাগরুক করার ইচ্ছাতেই নাকি এ খেলার আয়োজন করেছিলেন। তৃতীয় দলের পক্ষে যাঁরা যুক্তি দেখান তাঁরা বলেন---গ্রীক বীর পেলোপসই নাকি অলিম্পিক ক্রীড়ার জনক।

ইতিহাসে লিখিত তারিখ থেকে জানা গেছে যে, খৃস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে এক বিরাট পায়ে হাঁটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়---আর সে রেসে জয়ী কোরাবাসের মাথায় জয়ের মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বন্য অলিভ গাছের পাতায় তৈরি মালা দিয়ে।

এর পরে প্রতি চারবছর অন্তর এই ক্রীড়ার আসর বসত। প্রথমে অবশ্য এ ক্রীড়ায় যারা অংশ গ্রহণ করত তারা সকলেই গ্রীসের ডরিস প্রদেশের অধিবাসী। শীগগিরই প্রতিযোগীরা আসতে আরম্ভ করে গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, আর তাতে খেলার অনুষ্ঠানসূচীও গেল বেড়ে। কিন্তু অলিম্পিক ক্রীড়ার এ জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে নি। গ্রীস রোমানদের দ্বারা বিজিত হলে এর দাম ও মান দুই গেল কমে। অবস্থার আরও অবনতি ঘটল যখন আইন করে রোমসম্রাট থিয়োডোসিয়াস এ খেলা বন্ধ করলেন। তাঁর কথায়---'অলিম্পিক খেলা, আরে ওতো প্রকাশ্য একটা নোংরামি ছাড়া আর কি?'

কিন্তু ইতিহাসের গতি রুদ্ধ থাকে না। যতির মানেই নয় ইতি। মানুষের তৈরি আইন আবার মানুষই দিল নস্যাৎ করে। এই ভাঙা—না, শুধু ভাঙা নয়---গড়ারও কাজে যিনি এগিয়ে এলেন তিনিই আধুনিক অলিম্পিকের জনক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্তিন। অলিম্পিকের নবরূপায়ণ কেবলমাত্র এই একটি মানুষের আজীবন অনলস কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস।

সম্ভাবনাময় এক সৈনিক-জীবন ত্যাগ করে সেদিন এ ফরাসী যুবক নেমে পড়লেন ফ্রান্সের যুবসমাজের দেহমনের বিকাশসাধনে। সমসাময়িককালে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গ্রীসের অলিম্পিয়ার গ্রাম খুঁড়ে যখন অলিম্পিক ক্রীড়ার অনেক আশ্চর্য সব নিদর্শন আবিষ্কার করল---তখনই কুবার্তিনের মাথায় চিন্তা এল, অলিম্পিকের নবরূপায়ণ করতে হবে। যা ভাবা তাই কাজ। দেশ-বিদেশের স্বাস্থ্যচর্চার কেন্দ্রগুলো একনাগাড়ে সরেজমিনে তদন্ত করে ফেললেন তিনি। সফরের শেষে কুবার্তিন বললেন---'পরিচ্ছন্ন জীবন, কর্মে সাহস, দৈহিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশ এ সবই অলিম্পিকের মাধ্যমে সম্ভব।'

● পিয়ের দ কুবার্তিন

১৮৯২ সালে প্যারিসে এক সভায় কুবার্তিন অলিম্পিক ক্রীড়ার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা পেশ করেন। কিন্তু সভায় যোগদানকারী প্রায় সব দেশই পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তবুও দমলেন না কুবার্তিন। আরদ্ধ কাজের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে ডুবে গেলেন। এর ফলশ্রুতি—১৮৯৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক কংগ্রেসের প্রথম সভা। সভায় অংশ-গ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ: গ্রীস, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, রাশিয়া, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি উনসত্তরটি দেশ। ঠিক এর দু'বছর পরে—১৮৯৬ সালে গঠিত হয় আন্তর্জাতিক অলিম্পিক ক্রীড়া কমিটী (আই-ও-এ)। এর সদস্য-সংখ্যা তখন বারো, আর কমিটীর তত্ত্বাবধানেই বিস্মৃতপ্রায় অলিম্পিকের আসর বসল ঐ সালেই এবং গ্রীসে—প্রাচীন অলিম্পিকের আদিভূমিতে।

৫ই এপ্রিল গ্রীকরাজ প্রথম জর্জ এথেন্সে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আশি হাজারেরও বেশি লোক সেদিন অভিনন্দন জানাল এই ক্রীড়াবাসরকে।

খৃস্টীয় ১৯০০ সাল। এবার প্যারিসের পালা, যে দ্বিতীয় অলিম্পিকের কেন্দ্রমণি। এ আবার কুবার্তিনের দেশ, তবু যেন ছন্দপতনের আভাস পাওয়া গেল। যে পরিমাণ উৎসাহ আর উদ্দীপনা আশা করা গিয়েছিল, তা কিন্তু হ'ল না। হবেই বা কি করে? ওদিকে যে একই সময়ে ফ্রান্স সরকার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর দুয়ার খুলে দিয়েছেন। আর অলিম্পিক ক্রীড়া সে তো প্রদর্শনীরই বাড়তি আকর্ষণ মাত্র। সব প্রচার আর জল্পনা-কল্পনা ত' অলিম্পিককে ঘিরে নয়, প্রদর্শনীকে ঘিরে। আমেরিকায় পরবর্তী তৃতীয় অলিম্পিকের অবস্থাও তথৈবচ। আবার আন্তর্জাতিক মেলা আর তার ঢক্কানিনাদ। অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন ত' দুয়োরাণী—প্রদর্শনী মুখ্য, ক্রীড়াক্ষেত্র গৌণ।

অবস্থা চিরকাল এক থাকে না। যাতে সত্য আছে তার গতিতেও মাঝে মাঝে প্রতিকূল হাওয়ার ঝাপটা লাগে বটে, কিন্তু তার গতি রুদ্ধ হয় না, অবলুপ্তি ঘটে না তার। অলিম্পিক সম্পর্কেও সেই কথা, উদ্যোক্তারা পিছু হঠবার লোক নয়; কুবার্তিন ত' বলতে গেলে যোদ্ধা। ১৯১২ খৃস্টাব্দে সুইডেনের স্টকহোমে পঞ্চম অলিম্পিকের গতি অন্য খাতে বইল। উদ্যোক্তারা অলিম্পিকের আদর্শ যথাযথ অনুসরণ করার প্রয়াস পেলেন এবার।

শারদোৎসব উপলক্ষে আগামী ২৯শে আশ্বিন, ১৩৭১ (ইং ১৫ই অক্টোবর, ১৯৬৪) তারিখের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রকাশিত হবে না।

—সম্পাদিকা

প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে অলিম্পিক গেমস বন্ধ করে দেওয়া হোল। অবশ্য যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯২০ সালেই অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ল বেলজিয়ামের অ্যান্টিওয়ার্পে। অলিম্পিকের বর্তমান পতাকা এই অ্যান্টিওয়ার্পেই ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৯২৪ সাল, আবার ফ্রান্সের পালা। প্রতিযোগিতার কেন্দ্র এবারও প্যারিস। বিয়াল্লিশটি দেশের সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হ'ল প্যারিস অলিম্পিক। এবার উদ্যোক্তাদের প্রদর্শনীর মুখোমুখি হতে হয় নি। পূর্বকৃত অপরাধের ষোলআনাই স্খালন করল প্যারিস।

১৯৩৬ সালে পঞ্চাশটি দেশের ক্রীড়া-প্রতিনিধি জমায়েত হ'ল বার্লিন অলিম্পিকে। ১৯৩৭ সালে আধুনিক অলিম্পিকের জনক (অ্যাপসল অব মডার্ন অলিম্পিক) মারা যান। মৃতুকালে অবশ্য কুবার্তিন এই বিশ্বাস নিয়ে মরেছেন যে, আর কোন থিয়োডোসিয়াসই অলিম্পিকের পূতাগ্নি ফতোয়া জারী করে নিভিয়ে দেওয়ার সাহস করবে না।

কিন্তু আইন নয়, যুদ্ধই আবার পথ আটকে দাঁড়াল অলিম্পিকের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৪৮ সালে এ বিরতির অবসান ঘটে লণ্ডন অলিম্পিক দিয়ে। ভারতবর্ষের এ অলিম্পিকের কথা মনে থাকা উচিত। কেন না আন্তর্জাতিক খেলার আসরে ভারতীয় খেলোয়াড়েরা এই প্রথম স্বাধীন দেশের প্রতিনিধিরূপে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ এবং ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে হেলসিংকি ও মেলবোর্ন অলিম্পিক্স্ অনুষ্ঠিত হয়েছে, আর ১৯৬০ সালে রোমে। রোমের অলিম্পিকও আমাদের মনে থাকবে। ১৯২৮ সালে আমস্টার্ডামের অলিম্পিকে ভারত হকিতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করেছিল; আর এ জয়ের সম্মান করতলগত করে রেখেছিল পরবর্তী পাঁচটা অলিম্পিক খেলার আসরেও। আর রোমের অলিম্পিক কালিমা মাখিয়েছে সেই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পাতায়। আমাদের হটে আসতে হয়েছে পাকিস্তানের কাছে। আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতীয় দল টোকিওর পথে রওনা হবে। এখনও ঐ একই আশা—হকি। দেখা যাক বিজয়লক্ষ্মী মুখ তুলে চান কিনা।

—পীযুষকান্তি কুণ্ডু

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিন এবং রাত্রির
জন্য সৌন্দর্য্য
চর্চ্চা - -
আফগান
কোল্ড ক্রীম
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর
পরিষ্কার ও ঔজ্জ্বল্য আনিয়া
গাত্রবর্ণ সুন্দর করে।
ভাল কাজ পাইতে হইলে
আফগান
কোল্ড ক্রীম
বেশ ভাল করিয়া মুখে,
হাতে এবং ঘাড়ে লাগাইয়া
সারা রাত্রি রাখিয়া দিন।
AFGHAN COLD CREAM
AFGHAN SNOW
দিনের বেলায় লাগান
আফগান স্নো
ইহাতে সূর্য্যতাপ ও ধূলার হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। এই
প্রসাধনীতে সারাদিন আপনার ত্বক নরম ও মোলায়েম থাকিবে।
E. S. PATANWALA, BOMBAY-77.

স্বাস্থ্য গঠনে একান্ত প্রয়োজন

আপনি কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করেন···কাজে উৎসাহ পান না
অথবা সর্দি কাশিতে ভুগছেন···হয়ত খিদে হয়না,
যা খান তা হজমও হয়না।

তা' হলে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খেলে
আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।

মৃতসঞ্জীবনী
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস,
(লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা),
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের
ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য।

সাপ্তাহিক
বসুমতী

কায়রোয় শুভেচ্ছা বিনিময়রত দুই রাষ্ট্রপ্রধান—শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীগামাল আবদেল নাসের।

৯ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৫ই কার্তিক, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 22nd October, 1964 • Vol. 69, No

সূচীপত্র

756.3 ·003/3 V.69 no.21

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১২৮৩
আজকের মানুষ	...	১২৮৪
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১২৮৫
ভারতদর্শন	...	১২৮৮
আন্তর্জাতিক	...	১২৯৪
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১২৯৯
কুহেলী বিলীন (ধারাবাহিক রহস্য-গল্প)	বিভা বসু	১৩০২
কান্নার ট্রেন (গল্প)	রঞ্জিত রায়চৌধুরী	১৩০৫
স্বজন সমীপে (কবিতা)	দুর্গাদাস সরকার	১৩০৯
আহত পাখির নামে (কবিতা)	সামসুল হক	১৩০৯
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৩১০
সবুজ মাঠ (গল্প)	বিজনকুমার ঘোষ	১৩১৩

রক্তযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বালন্ত কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভদ্রের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নয়জন কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগে—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৩১৫
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৩১৮
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৩২০
একটি কবিতার জন্ম (কবিতা)	সুধীর চৌধুরী	১৩২১
বঙ্গদর্শন	...	১৩২২
আজকের পশ্চিম জার্মানী	মৈত্রেয়	১৩২৭
চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৩১
পাঠক মন	...	১৩৩৪
রঙ্গজগৎ	...	১৩৩৫
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৩৩৮
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৩৩৯
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৩৪২

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০

৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CALCUTTA

৬১ বর্ষ, ২১শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ | 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ৫ই কার্তিক ১৩৭১ | Thursday, 22nd October 1964

আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কি কেবলি খেলা।

বিজয়া দশমী উপলক্ষে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধু, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, সমালোচক ও পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। দেশ ও কাল অনেক পুরোন আদর্শ ত্যাগ করেছে, নতুন রীতি অবলম্বন করেছে, তবু বিজয়ার মহৎ ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আজো আমরা সম্মিলিত হই; এই দিনটিতে শত্রুও মিত্র হয় এবং মিত্রও পরম মিত্ররূপে পরিগণিত হয়। যুগের হাওয়ায় বাইরের পরিবর্তন যতোই ঘটুক না কেন, আগামীকালের সমস্ত মানুষ ঐক্যভাবে আরো দৃঢ়বদ্ধ হবে। সেই ভাবের সঞ্চার হয়েছে একদা এই ভারতের মাটিতে বিজয়ার দিনটিকে অবলম্বন করে।

অতীতের কথা থাক; কিন্তু একালের কথায় আজকের হতভাগ্য বাঙালীর দশা সোচ্চারে বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু আমরা শারদোৎসব করেছি। এই উৎসবে দেবী দুর্গাকে আমরা কোন অর্ঘ্য উপহার দিয়েছি, তা আমরাই জানি। রেশনের চাল, আটা ও চিনির ওপর নির্ভর করে আমরা নৈবেদ্য সাজাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, হয়তো নৈবেদ্যের থালা ভর্তি হয় নি, মনের খেদ মনেই রয়ে গেছে, তবু দেবী দুর্গা হয়তো এই কারণে বিরাগ দেখান নি যে, আজ তার যে সব সন্তান অর্ঘ্য সাজিয়েছে, তারা নিজেরাও ক্ষুধার্ত; অপূর্ণ থালার প্রসাদী অন্নে ক'জনেরই বা পেট ভরে। এমনই বিস্ময়ের ব্যাপার, এবার ঠিক পূজোর সময় যজ্ঞে আহুতি দেবার ঘৃত বাজার থেকে উধাও হয়েছিল। শক্তির সেবক আমরা অনেকেই সেই ঘৃত সঞ্চয় করতে পারি নি; বিনিময়ে আহুতি দিয়েছি দরবিগলিত অশ্রু। আমাদের এই অশ্রু কি অসার্থক হবে? বিজয়া দশমীর দিনে এবার সাধারণ মিষ্টান্নের দোকানে কোনোরকম আড়ম্বর বা ভিড় দেখা যায় নি। চিনির অভাবে মিষ্টান্ন তৈরি করার অসামর্থ্যের কথা স্বীকার্য হলেও সাধারণ ক্রেতাদের অধিক মূল্যে ক্রয় করার অক্ষমতাও বিজয়ার দিনটিতে প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। সামান্য উপকরণ নিয়ে অভ্যাগতদের আমরা কিভাবে বরণ করেছি তা আমরাই জানি।

এই নিদারুণ অভাবের মধ্যেও আমরা তবু কোনোমতে পূজো মণ্ডপ সাজিয়েছি, দশজনকে আহ্বান করে আনন্দ বিতরণ করেছি। কেন না পূজোকে উপলক্ষ করে একালে আমাদের প্রধান লক্ষ্য শারদোৎসব। সারা বছরের দুঃসহ গ্লানি, জ্বালা ও সাংসারিক অর্থ-কৃচ্ছ্রতার হাত থেকে মুক্তির জন্য এই শারদোৎসবের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই শারদোৎসবই আমাদের দান করেছে বিজয়ার অপার বেদনার সঙ্গে সার্বিক মানুষের মিলনের অপরিসীম আনন্দ। এই মিলিত শক্তির আনন্দে আমাদের যাত্রা হোল সুরু। যেখানে অন্যায় সেখানেই হবে আমাদের বিজয় অভিযান। একের মনোবেদনা বা দুঃখই নয়—সকলের মনোবেদনা ও আর্থিক দুঃখ দূর করে আমরা যেন বিজয়কেতন উত্তোলন করতে পারি—এই হোক আজ আমাদের শুভেচ্ছা ও একান্ত কামনা।

সম্পাদকীয়

আজকের —— মানুষ

ইয়র্কশায়ারের লোক। কিন্তু কোনোরকম দাম্ভিকতা বা গোঁড়ামি নেই মনে। বরং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের যে-কোনো সাধারণ ব্যক্তির মতোই বিনয়ী, ভদ্র এবং মুখে একগাল হাসি।

এই হাসিভরা মুখ নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে নিজের ছোট্ট বাড়িখানি পেছনে ফেলে রেখে যিনি বৃটেনের প্রধানমন্ত্রিরূপে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটে গিয়ে বিনয়নম্র চিত্তে প্রবেশ করলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীহ্যারল্ড উইলসন।

১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটে এসে বসবাসের সৌভাগ্য ক'জনেরই বা হয়? বিশেষত একজন নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কল্পনা করাটাই প্রায় বাতুলতার নামান্তর। কিন্তু বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখনই ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হবার কল্পনা করেছিলেন উইলসন নিজে। এ যেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার চেয়ে আরো---আরো অনেক কিছু বেশি লাভের বাসনা। তবু এই কল্পনাই আজ সত্য হোল।

এও কি সম্ভব। ইংলণ্ড একালের এমন একটি দেশ যেখানে উত্তরাধিকারসূত্রেই আজো রাজত্ব মেলে। প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করা আরো দুরূহ ব্যাপার। জনসাধারণের চুল-চেরা বিচার। বিচারের তৌলদণ্ডে কিন্তু উইলসনের দিকটাই ভারী হোল। তাঁর দুর্নিবার সাধনা এনে দিল তাঁকে দুর্লভ সম্মান। অবশ্য এই দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হবার মতো বংশ-পরম্পরা কোনো আভিজাত্য ছিল না উইলসনের। উইলসনের পূর্ববর্তী রক্ষণশীল দলের দুই প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলান বা ডগলাস হিউমের মতো রূপোর চামচ মুখে নিয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। সাধারণ ঘরের অতি সাধারণ একটি ছেলে। এই ছেলে রাস্তার পাশের একজন সাধারণ মানুষের মতই হেঁটে চলে, সাধারণ মধ্যবিত্ত সংসারের বরাদ্দ খাদ্যতালিকার মতোই তার খাদ্যতালিকা। বড় জোর মাছটা যেদিন পাতে পড়ে সেদিন মুখটা খুশিতে চকচক করে ওঠে।

এই সব কারণে উইলসনকে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছবার জন্য নতুন কোনো কেরামতি দেখাতে হয় নি। আর সমাজতন্ত্র শেখবার জন্য নতুন করে কোথাও পাঠ গ্রহণ করতেও হয় নি। অবশ্য পড়াশুনোয় তাঁর মতো একাগ্র ছাত্র পাওয়াও দুর্লভ। কিন্তু অন্যান্য ছেলেদের মতোই তিনি পড়াশুনো সুরু করেছিলেন। তারপর অক্সফোর্ডে স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় স্বরূপ বৃত্তি লাভ করায় তাঁর মানসিক গঠন দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। পারিবারিক প্রতিপত্তি তাঁর ছিল না---একমাত্র যা মূলধন ছিল তা হচ্ছে অসাধারণ প্রতিভা। মাত্র একুশ বছর বয়সে দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স লাভ করা কম বিস্ময়ের ব্যাপার নয়! এরপর একের পর এক বিস্ময়! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সিভিল সার্ভিসে তাঁর কাজের তৎপরতা ও বুদ্ধিমত্তা দেখে সবাই হতবাক। সেখানে থেকেই হয়তো ক্ষুরধারবুদ্ধি উইলসন শাসনযন্ত্রের নাড়ী-নক্ষত্রের খবর সঞ্চয় করেন---যা তাঁর পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের অমূল্য সম্পদ।

এইবার শ্রমিক নেতা অ্যাটলিও বিস্মিত হলেন। বিস্ময়ের কারণ, কয়লা-শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ নিয়ে উইলসনের একখানি বই। নাম: 'নিউ ডীল ফর কোল'। এই বই পড়েই যেন অ্যাটলি চিনে ফেললেন সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা উইলসনকে। এরপর থেকে তাঁর ভাগ্য হোল সুপ্রসন্ন। দায়িত্বের সঙ্গে গৌরবেরও অধিকারী হলেন তিনি। ১৯৪৫ সালে শ্রমিক দল যখন শাসন ভার গ্রহণ করলো, তখন অ্যাটলি তাঁকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। তখন বয়স মাত্র ৩১। ইতিহাসখ্যাত উইলিয়ম পিটের পরে এতো অল্প বয়সে একমাত্র উইলসনই এই গৌরবের অধিকারী হলেন।

এরপর জীবনে অনেক ডামাডোল গেছে। নীতিগত কারণে বিভানের সঙ্গে একমত হয়ে মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করেছেন। আবার অ্যাটলির উদারতাই তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে গেছে---কেন না, জীবনের সুরু থেকেই যিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তাঁকে ছাড়া দেশের ও দশের কল্যাণের কথা চিন্তা করাই যায় না। তাই ১৯৬৩ সালে গেটস্কেলের মৃত্যুর পর উইলসন যখন শ্রমিক দলের নেতৃত্ব লাভ করেন তখন অ্যাটলি সানন্দে বলেছিলেন: **'He has not put a foot wrong.'**

হ্যারল্ড উইলসন

তাঁর কথা মিথ্যা হয় নি। এখন নিয়মতান্ত্রিক রাণীর পর তিনিই বৃটেনের ভাগ্যবিধাতা। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে এই গৌরব অকল্পনীয়। মুখে পাইপ নিয়ে বই পড়ায় যিনি মত্ত থাকেন, গল্ফ্ খেলার মাঠে যাঁর হাসি কখনো মিলিয়ে যায় না---আজ তিনিই সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায়, আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রধানমন্ত্রী।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

আপনারা এত বিষাদের কথা বলছেন কেন?

বয়স কতো হলো?

দুনিয়ায় কিছুই কি পান নি?

রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য যৌবন ছিল, ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখুন, সাহিত্যে আমরা পাঠকরা কি শুধুই সাহিত্যিকদের কান্না শুনবো?

এইরকম আরো অনেক প্রশ্ন শুনতে পেলুম ইতিমধ্যে।

আমি বললুম: বেশি বিষাদ ভালো নয়, বেশি সাহিত্যও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

একজন বললেন: সাহিত্য মানে?

বললুম—নির্জীবের কল্পনার ফসল যা,—যা কেবল যশের লোভে লেখা,—টাকার কামনায় পাওয়া। বঙ্কিম ও-বিষয়ে সার কথা বলে গেছেন বলে মনে করি।

বললুম: রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখনকার লেখকদের যাঁরা চালাও এক আসনে বসতে দিয়ে, বিরক্ত হয়ে, নিজেরাই আবার গালাগালি করেন, তাঁদের নেমন্তন্ন আমি চাই না। যাঁরা তা নেন, তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে নেন। তাঁদের কৃতকর্মের জবাবদিহি আমার নয়।

বললুম: দুনিয়ায় কী পাচ্ছেন, আপনারা, তা আপনারাই জানেন। তবে, আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলবো,—সুখও পাচ্ছি, দুঃখও পাচ্ছি। তবে, সাহিত্যিকরা বোধ হয়, সবচেয়ে যা বেশি পেতে চান, সেটা সুখও নয়, দুঃখ তো নয়ই,—তাঁরা চান তাই-ই, যা সাহিত্যের বিষয়,—এবং যা তাঁদের সৃষ্টির প্রেরণা।

প্রশ্নকর্তারা উঠে যাচ্ছিলেন।

তাঁদের ফিরিয়ে এনে বললুম: বয়সের কথাটাও শুনে যান। বয়স একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। কোনো কোনো মানুষ বুড়ো হয়ে জন্মায়। কারও কারও কিছুতেই বয়স হয় না। সাহিত্যিকদের মধ্যে কারও কারও সত্যিই বয়স হয়েছে বলে পাঠক যদি শ্রদ্ধা করেন, তাহলে দেশের সৌভাগ্য বলতে হবে, আর লেখকদের বয়সের ভার যদি পাঠকের মনে বোঝা হয়ে ওঠে, তাহলে সেটা ভাববার কথা। আপনারা কী বলতে চাইছেন?

একজন জবাব দিলেন: লেখকরা হয় 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' লিখছেন, না-হয় কেবলই নিরানন্দ পদ্য বা কী-বলে-মশাই, আধুনিক-কবিতা লিখছেন। সেজন্যেই দুঃখু হয়েছিল আমাদের। তা আপনি তো অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন।

আমি বললুম: আমাকে মাপ করবেন। আমি এই ভঙ্গিতেই কথা বলি। আমাকে অনেকেই ভুল বোঝেন, আপনারা পাঠকরা আমার সহযোগী, আপনারাও যদি ভুল বোঝেন, তাহলে দাঁড়াই কোথায়?

তাঁরা একবাক্যে বললেন: না, না, না, আপনাকে আমরা ভুল বুঝি নি, আপনিও আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমাদের সাহিত্যে আজকাল আনন্দের কথা বা সত্যিকার উৎসাহের কথা শুনতেই পাই না। অথচ, এই আমাদের সাহিত্যেই একদিন শরৎবাবুর নতুন নতুন লেখা বেরিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কতো কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস বেরিয়েছে,—এই সেদিন মাত্র তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম বিভূতিবাবুর গল্প-উপন্যাস বেরিয়েছে,—সে সবের জন্যে প্রতীক্ষা থাকতো মনে মনে। কতো আগ্রহ নিয়ে পড়তুম সে-সব! কিন্তু আজকাল এ কী হোলো মশাই,—এই দেখুন না, সবাই দুঃখের কথা বলছেন,—এমন কি সেদিন আপনিও অনুবাদ-সাহিত্যের কথা তুলে বিশ্ব-পরিক্রমা করতে করতে হঠাৎ একটি দুঃখের জাপানী কবিতার কথা তুললেন।

আমি বললুম: আপনার কথা বুঝতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে। আমরা আজকাল যে সাহিত্যজগতে বাস করছি, তাকে আপনি দুঃখের মহাদেশ বলে মনে করছেন---

আমার কথা শেষ হবার আগেই তিনি বললেন, সত্যিকার সাহিত্য-মহাদেশ যদি হোতো, তাহলে তাতেই বা আমাদের আপত্তি হবে কেন? আমরা কি রামায়ণ মহাভারত জানি না? আমরা কি জীবনের স্বাদ না পেয়েছি? জীবন যে শেষ পর্যন্ত বেশির ভাগ লোকের কাছেই চোখের জলের নোনা স্বাদ, সে কি আমরা অস্বীকার করেছি কখনো?

আমি বললুম: তাহলে আপনারা বলছেন---

তিনি বললেন: আমরা বলতে চাই যে, আজকাল এ আসরে আর আনন্দের আসাও নেই, বেদনায় চলে যাওয়াও নেই। সবই কেমন যেন খবর দেবার কায়দা, কিংবা খুশি না হবার দুরবস্থা!

হঠাৎ লজ্জিত হয়ে বললেন—কী যে বলছি আমি, মাপ করবেন;

—আমরা কি আপনাদের মতন গুছিয়ে বলতে পারি কিছু ?

আমি বললুম : আপনার কথা আমি চমৎকার বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার মনে হয় এ রকম অতৃপ্তির ভাব সব যুগেই কিছু না কিছু পরিমাণে দেখা দিয়ে থাকে।

তিনি বললেন : ঠিক এ রকম নয় বোধ হয়,—এ রকম সমস্যা আগে কি ঘটেছে কখনো ?

আমি বললুম : আপনি কি একালের বাংলা সাহিত্যে ভাবের শূন্যতার কথা বলছেন,—নাকি সমস্যার আতিশয্যের কথা ? কোন্ দিকটার ওপর জোর দিতে চান আপনি ?

তিনি বললেন : দুই-ই, দুয়েরই কথা। দু' দিকেই জোর দিয়ে বলতে চাই।

আমি বললুম : শুনুন, তাহলে। শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের বিপুল ঐশ্বর্যের যুগ সেটা। তখনে সমস্যা ছিল। কিন্তু ভাবের শূন্যতা অন্য জিনিষ। সেকালে সেটা ছিল না বটে। কিন্তু সমস্যার কথা যদি বলেন, —১৩২৮এ আট-আনা-সংস্করণ কোহিনূর গ্রন্থাবলী পর্যায়ে যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জনের 'সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা' বেরিয়েছিল। সময় যে নিয়ত বদলে যাচ্ছে, সেই অনিবার্য ব্যাপারটিতে বড়োই বিক্ষুব্ধ হয়ে সমাজের কল্যাণ-কামনায় সেই ১৩২৭-এর 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামে এই লেখাগুলি তিনি প্রথম লেখেন। তাঁর তারিফও হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইখানির বেশ প্রশস্তি লিখেছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাংলা কথা-সাহিত্যের ধারায় বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম, বারবনিতার প্রেম ইত্যাদি প্রেম-বর্ণনার বিচিত্রতা অনুসারে তাঁর বক্তব্য সাজিয়েছিলেন। 'বিধবার প্রেম' অংশে তিনি তাঁর এই কথা জানান যে, রামায়ণে বালির পত্নী তারা বা রাবণ-বনিতা মন্দোদরীর কাহিনীতে দেখা গেছে যে, তাঁরা তখনকার রীতি অনুসারে নিজের নিজের দেবরের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধা হন। যতীন্দ্রমোহন বলেন যে, তাঁদের এই দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারটা পাওয়া গেলেও একথা পাওয়া যায় না যে, তাঁরা প্রেমে পড়ে এই সব দ্বিতীয় বিবাহে রাজি হন। কিন্তু—'আধুনিক বাঙালা সাহিত্যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই কুন্দ-নন্দিনীর সৃষ্টি করিয়া ইহার পথ দেখাইয়াছেন। কুন্দনন্দিনীর পরে রোহিণীও তাঁহার সৃষ্টি।'

তাঁরা চুপ করে আমার কথা শুনলেন।

আমি বললুম : তারপর 'চোখের বালির' বিনোদিনীর কথা উঠেছিল। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে যতীন্দ্রমোহন লেখেন—'গ্রন্থকার একজন হিন্দু বিধবাকে এইরূপ পরপুরুষের প্রেমে তপস্বিনী সাজাইয়া ও তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করিয়াছেন।' শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' এবং 'বড়দিদির' কথা এইসূত্রেই মনে পড়েছিল তাঁর।

সধবার প্রেম সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'চন্দ্রশেখরের' শৈবলিনীর উল্লেখ করেন। এবং কথায়-কথায় শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস'-এর কথা ওঠে। পার্বতীর পাশাপাশি শরৎচন্দ্র যে বারবনিতা চন্দ্রমুখীর মধ্যে আর একটি নিঃস্বার্থ প্রেমের ছবি রেখে গেছেন, তিনি তাও স্মরণ করেন। তারপর 'স্বামী'-তে সৌদামিনী যে তার মামার শিক্ষায় agnostic হয়েছিল,—বিয়ের আগে প্রতিবেশী যুবক নরেন্দ্রের সঙ্গে তার প্রণয় হয়, এবং মামার মৃত্যুর পরে ঘনশ্যামের সঙ্গে তার বিয়ে হ'য়ে যায়, সে-সব কথাও তিনি জানিয়ে গেছেন।

এজন্জনের পরিণীতা স্ত্রী পরপুরুষে আকৃষ্ট হয়েছেন,—এরকম উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-এর উল্লেখ করে বলেন যে, নষ্টনীড়ে যা ছিল অঙ্কুরমাত্র, 'ঘরে বাইরে'তে সেই সম্ভাবনারই বিস্তার ঘটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এসব সমস্যা ঘোর সামাজিক-পারিবারিক দুর্যোগ যে, সে-বিষয়ে মতান্তর হবে না। কিন্তু সভ্যতা যতোই শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে নজর দিক, মানুষের মন যে ভয়াবহ-ভাবে প্রবল, উৎকেন্দ্রিক, জটিল, আইন-অমান্যকারী এক কিম্ভুত শক্তি,—যতীন্দ্রমোহন নিজে মনে মনে সে-সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বলেই শঙ্কিত হন। তাঁর নিজের কথায়, সে কালের বাংলা কথা-সাহিত্যে এই সব অবতারণার দুশ্চিন্তা ব্যক্ত করাই সংগত। তিনি লেখেন—'আবার রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় ও চোখের বালির একটা মিলিত সংস্করণ বাহির হইয়াছে—তাহার নাম শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন'। দিবাকরের সহিত কিরণময়ী নষ্টনীড়ের চারুলতার ন্যায় ঠাকুরপো সম্পর্ক পাতাইয়া লইল।'

সাধুভাষায় লেখা তাঁর সে-সব মন্তব্যের সুর বড়োই গম্ভীর। বোধ হয়, তিনি লিখেছিলেন—'বিনোদিনী যেমন বেহারীর জন্য পাগল হইয়া মহেন্দ্রের স্কন্ধে চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছিল, কিরণময়ীও দিবাকরের সঙ্গে 'বাহির' হইয়া পূর্বদেশে অর্থাৎ আরাকান যাত্রা করিল।'

তিনি লিখেছিলেন—'কিরণময়ীকে গৃহস্থ নারী ও বারনারীর মধ্যবর্তী সেতু মনে করা যাইতে পারে।'

এইসব কথার মধ্যেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার প্রশ্নকর্তারা সকলেই উঠে গিয়েছিলেন একে একে।

একজনই কেবল শুনছিলেন বসে বসে। তিনি বললেন: 'চরিত্রহীন' যে দেশে যে-কালে ঘটেছিল একটা সাহিত্যিক সমস্যা ছিল, আমরা ইতিমধ্যে সে দেশ, সে-কাল ছেড়ে এসেছি----

আমি বললুম: তবেই দেখুন, আমাদের এই অবস্থান্তরটা বিবেচ্য। আজ আমাদের সেই দেশই অন্য দেশ। আমরা এখন অন্য কালে বাস করছি।

তিনি বললেন: তাই তো, আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি। অনেক রাত হয়ে গেল মশাই।

তিনি চলে যাবার পরে আমার মন গুন গুন করলো নির্জনে—

আমাদের শুকনো কণ্ঠস্বর
যখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে
ফিশফিশ করি
কেমন শান্ত আর অর্থহীন,
যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের
শিরশির'
যেন ভাঙা কাঁচে ইঁদুরের হাঁটা
আমাদের---

এলিয়টের ফাঁপা-মানুষের কবিতা মনে পড়লো।

তারপর ঘরে এলেন জয়পুরের সেই ভদ্রলোকটি যাঁর সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনোদিনই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে নি।

কলকাতায় তাঁর ছোটোখাটো কী যেন ব্যবসা আছে বলে জানতুম। স্পষ্ট করে সে-বিষয়ে কিছুই জানা হয় নি।

হিন্দীতে অনর্গল নানা কথা বলে যেতেন তিনি, আমি অতি সহিষ্ণু শ্রোতা হয়ে শুনতুম। সাহিত্যের কথা নয় সে-সব। তিনি যে সাহিত্যরসিক, আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে এরকম কোনো মোহই ছিল না।

সেদিন আমাকে একলা ঘরে পেয়ে তিনি তাঁর হিন্দীতে জিগেস করলেন—কী গান ওটা?

আমি বললুম, গান নয়, টি, এস, এলিয়টের কয়েক ছত্র কবিতা আমি বাংলায় মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম।

—ওতে কি বলেছেন তিনি?

—অবসাদের কথা, দুঃখের কথা।

—দুঃখ তো থাকবেই, তবু তারই মধ্যে সব কিছুই করতে হবে।

—মানুষের মন কি তা বোঝে?

—কেন বুঝবে না, বাবুজী? এই যে, তামাম দুনিয়ায় এতো লোক মরছে, অসুখে ভুগছে, কষ্ট পাচ্ছে—দুনিয়া কি তাতে দাঁড়িয়ে গেছে, খতম হয়ে গেছে একদম?

এই বলে তিনি এই কাহিনীটি শোনালেন। বললেন মহাভারতের এক কিস্‌সা শুনুন, বাবুজী।

আমি সংক্ষেপে সে গল্পটি ভাষান্তরিত করে দিচ্ছি:

একে একে গান্ধারীর শতপুত্র নিধন হোলো। তাঁর মন তখন অতিশয় বিষণ্ণ। জীবনে অণুমাত্র রুচি নেই। অত্যন্ত গ্লানিভারাচ্ছন্না তিনি।

তখন স্বয়ং ভগবান এসে তাঁকে বললেন—ওঠো গান্ধারী, স্নানাহার করো, সুস্থ হও।

গান্ধারী বললেন—না, না, যে জননীর শতপুত্রের প্রাণান্ত ঘটেছে, তার আর স্নানাহারের প্রয়োজন কী?

ভগবান এই কথা শুনে অন্তর্হিত হলেন। অন্তরালে গিয়ে তিনি দেবী গান্ধারীর জঠরে ক্ষুধা উদ্দীপিত করলেন।

হঠাৎ ক্ষুধা বোধ করলেন গান্ধারী। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন মাটিতে শুধু মৃত পুত্রদের শবদেহ, আর কোথাও কেউ নেই; শুধু একটি গাছে সুপক্ব ফল ঝুলছে; ফলভারে ঈষদবনত সেই শাখা পর্যন্ত পৌঁছতে হলে শুধু মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। একটু উঁচু অবস্থান-ভূমি দরকার।

ক্ষুধার তীব্র তাড়নায় তখন গান্ধারী একটি শবের ওপর দাঁড়ালেন। কিন্তু তাতে কাজ হোলো না। মনে হোলো, আর একটি শব পূর্ব শবটির ওপরে স্থাপন করলেই গাছের ফল হাতে পাওয়া যাবে।

অদৃষ্টের এমনিই পরিহাস যে, ক্ষুধার তাড়নায় গান্ধারীকে তাই-ই করতে হোলো। এবং একটি-দুটি মাত্রই নয়,—একটির পর একটি মৃতদেহ টেনে টেনে, একটির ওপর আর একটি সাজিয়ে সাজিয়ে, নিজের একশ ছেলের মৃতদেহের স্তূপে উঠে, হাত বাড়িয়ে তবেই তিনি পাকা ফলটি গাছ থেকে ভাঙলেন। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভগবান তাঁর ক্ষুধা প্রত্যাহার করলেন, এবং গান্ধারীকে দেখা দিয়ে বললেন—'কী গান্ধারী, দেখলে তো, জীবন-মৃত্যুর স্রোত ঠিকই বয়ে যাচ্ছে, রক্ত-মাংসের মানুষের কি অনর্থক অবসন্ন হলে চলে? যে যার কাজ করে যাওয়াই ধর্মপালন।

—তাই বলছিলুম বাবুজী দুঃখ আছে তো আছে। থাক না, তবু তো মানুষকে বাঁচতে হবে।

আমি বললুম: ঠিক বলেছেন।

এ-কাহিনীতে আমি খুবই গৌণ-ভাবে ট্যান্টালাসের ছায়া অনুভব করলুম। মনে খুব একটা ধাক্কা লাগলো। গান্ধারীর এ-কাহিনী তিনি জয়পুরের প্রচলিত কোনো মহাভারতে পেয়েছেন কি না, জিগেস করি নি। যেখান থেকেই পান, গল্পটি চমৎকার বলে মনে হোলো। (ক্রমশঃ)

ভারত দর্শন

● কায়রো সফরান্তে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করলে শ্রীশাস্ত্রীকে তাঁর পৌত্র মালা পরিয়ে দিচ্ছে।

রাজধানী :

অন্যায়ের প্রতিমূর্তি রাক্ষসরাজ রাবণের কুশপুত্তলিকা দাহের পর্ব সাঙ্গ করে এবারেও রাজধানীতে যথারীতি দশহরা উৎসব বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই সম্পন্ন হয়েছে। ধূর্ত কালোবাজারীদের আক্রমণে রাক্ষসরাজ আগেই কাবু হয়ে পড়েছিলেন কিছুটা। দ্রব্য-মূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদকে ক্ষীণকলেবর ধারণ করতে হয়েছিল। অর্থের অবশ্যি অভাব ছিল না। আগে উৎসবের চাঁদা আদায় হতো ৭০ হাজারের কাছাকাছি। এবারে নাকি এক লাখের মত টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। তাতেও রাক্ষসরাজকে চাঙ্গা করে তোলা সম্ভব হয় নি। কাজেই এ বছরের উৎসবের কর্মকর্তাদের রাক্ষস নিধনের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে কালোবাজারের অসুরদের বিরুদ্ধে। তাতে উৎসবের আনন্দ ব্যাহত হয় নি; বরং নতুন উদ্যম, সাহস ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন রাজধানীর মানুষ।

মিঠাই-মণ্ডার দোকানে দোকানে চলেছিল প্রতিরোধ আন্দোলন। মিষ্টির পরিবর্তে ফল হয়েছিল উৎসবের প্রধান উপকরণ। সংগ্রামে তাঁরা জয়ী হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। মিঠাইওয়ালারা অনেকেই শেষ পর্যন্ত কম দামেই বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। ধুরন্ধর মিঠাইওয়ালারা আগেভাগেই বিপদের আঁচ পেয়ে সাবধান হয়েছিল। বেশিদিন ঘরে ধরে রাখা যায় এমনি ধরণের মিষ্টি তারা তৈরি করেছিল। কনট প্লেসের নামজাদা দোকানের জানালায় ঝুলানো ছিল কম করে মিঠাই কেনার অনুরোধপত্র। চিনির অভাবে তারা নাকি বেশি পরিমাণে মিষ্টি এ-বছর করতে পারে নি। দিল্লীর মহিলারা প্রমাণ করে দিয়েছেন—

'না জাগিলে ভারতললনা'
চোরাকারবার বন্ধ হবে না।

* * *

উৎসবের আনন্দ-কোলাহল শেষ হতে না-হতেই বিশ্বের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধাক্কায় নয়াদিল্লীকে চিন্তিত করে তুলেছে। ভারতের প্রধান শত্রু সম্প্রসারণবাদী নয়াচীন পারমাণবিক বোমা বিদারণ করে আস্ফালন শুরু করে দিয়েছে। চীনের চতুর সমরনায়কগণ মুখে এখনও শান্তির বুলি আওড়ালেও তাদের কথায় আস্থা স্থাপন করা সম্ভব নয়। কথা খেলাপের ব্যাপারে নয়াচীন সাম্প্রতিককালে বিশ্বে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। কাজেই চীনের নতুন সমরসজ্জা ভারতের দিক থেকে উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

'কাগজের বোমা' দিয়ে মার্কিন শক্তিকে প্রতিহত করা চীনের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব নয়। এ কথা মাও-সে-তুং জানেন। দেশের মানুষ যখন অনাহারক্লিষ্ট, ভোগ্যপণ্যের অভাবে যখন সারাদেশে উঠেছে হাহাকার, তখন চীনের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার এ বিলাসিতায় কেবল ভারত নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগ্রত দেশের প্রতিটি মানুষকে ভাবিত করে তুলেছে। চীন চায় তার নয়া সম্প্রসারণ নীতি ছলে-বলে-কৌশলে সফল করে তুলতে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তারই তার মূল লক্ষ্য। এতে কিছুটা মর্যাদা তার বৃদ্ধি পাবেও। সেক্ষেত্রে ভারতকেও তার কর্তব্য নির্ধারণ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গেই করা প্রয়োজন হবে। তা' ছাড়া আত্মরক্ষার দোহাই দিয়ে নতুন পটভূমিকা সুযোগ মতো সৃষ্টি করে চীন ভারতকে জব্দ করার জন্য পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ করবে না, এমন কথাও কেউ হলপ করে বলতে পারে না। মস্কো চুক্তিকে উপেক্ষা করে, কায়রো জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে যারা পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে শক্তি জাহির করতে দ্বিধা করে নি, তারা বেশিদিন ধৈর্যের পরিচয় দেবে এমন বিশ্বাস করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। সম্বলহীন দেশের সমরপ্রস্তুতি চিরকালই বিশ্বের শান্তির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থায় ভারতের পক্ষে পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে বেশিদিন থাকা

কতটা যুক্তিযুক্ত বা সমীচীন হবে সে প্রশ্নও আজ উঠেছে।

• • •

চীনের বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি বিস্ফোরক সংবাদ এসেছে মস্কো থেকে। ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু সোভিয়েট নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ নেতৃত্বে ইস্তফা দিয়েছেন। কাশ্মীরের প্রশ্নে ভারত বারবার সোভিয়েটের সাহায্য পেয়েছে। চীনের ভারত আক্রমণের নিন্দাও তাঁরা প্রথম থেকেই করে আসছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী কসিগিন, ব্রেজনেভ, মিকোয়ান প্রমুখ সোভিয়েট দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দও ভারতের বন্ধু। এঁরা সকলেই ভারত পরিদর্শন করেও গিয়েছেন।

কসিগিন

ক্রুশ্চেভগোষ্ঠীরই সদস্য এঁরা সকলে। স্ট্যালিনোত্তর পার্টি-কংগ্রেসের নীতি অনুসরণই এঁদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রাভদার সম্পাদকীয়তে সে ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজনীতির গতিপথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়াবে কেউ বলতে পারে না।

ক্রুশ্চেভের এই আকস্মিক বিদায়ে সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। চীন ভিন্ন অন্য কোন দেশই এ ঘটনাকে স্বাভাবিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ

● ক্রুশ্চেভ

করতে পারেন নি। সকলেই তাকিয়ে আছেন নাটকের পটপরিবর্তনের দিকে। চীন কিন্তু উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। অভিনন্দন পাঠিয়েছে সোভিয়েট দেশের নতুন রাষ্ট্রনায়কদের।

এতে অনেকের মনেই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে, রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী মরারের গতিবিধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চীন সফরের পর মস্কোতে নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তাঁর এ মিলনের পরই ক্রুশ্চেভকে বিদায় নিতে হয়েছে।

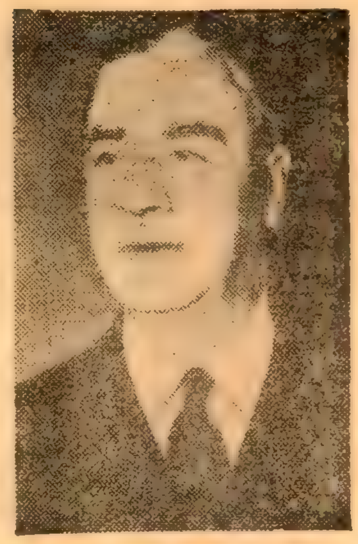

● মরার

চানই যে ক্রুশ্চেভের পতনের প্রধান কারণ, এ কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মস্কো-পিকিং মিলন ঘটলে চীনের ভারত আক্রমণকে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে সুরু করবেন এই মুহূর্তে বলা যায় না।

• • •

এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকায় এ পরিবর্তনের প্রভাব ভারতের ওপর পড়তে বাধ্য। ভারতের উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিও অনেকখানি এর ওপর নির্ভর করবে।

সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ করেছে।

● ব্রেজনেভ

পরিকল্পনার দু' বছরে আর্থিক গতি-প্রকৃতি বিচার করে যাতে যোজনাকে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, তার জন্য অতিরিক্ত এক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় নতুন করে বৃহৎ শিল্পে হাত না দিয়ে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, কৃষির উন্নতিবিধান এবং শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য ঘাটতি বাজেটের রেওয়াজ তুলে দেবার প্রস্তাবও এ পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। এই

পরিকল্পনাকালে প্রতি বছর মানুষের সম্পদ বাড়বে সাড়ে ছ' ভাগ। পরিকল্পনা রচনায় কমিশন এবারে কিছুটা বাস্তববুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু

● সুবহ্মণিয়ম

পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে নতুন করে কর বৃদ্ধি করা হয়ে পড়বে অবশ্যম্ভাবী। মানুষ সে-চাপ সহ্য করতে পারবে কি না, তা আগেই বিবেচনা করা উচিত হবে। সরকার দ্রব্য-মূল্যের একটা ন্যায়সঙ্গত মান বজায় রাখার ব্যবস্থা না করতে পারলে সমস্যা আরও জটিল হয়েই উঠবে। ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি—মানুষের সেই সঙ্গে সম্পদ বাড়লে কর দিতে কেউ কুণ্ঠিত হবে না। করবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরই মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক হারে। এ-সব রন্ধ্রপথ আগেই বন্ধ করার প্রয়োজন হবে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে চাই তার সুষ্ঠু বণ্টন-ব্যবস্থা। বণ্টনে ত্রুটি থাকলে লাভের গুড় চলে যায় কালোবাজারের পিঁপড়ের উদরে।

* * *

ভারত সরকার ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা প্রভৃতি খাদ্যশস্যের দাম বেঁধে দিয়েছেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম অতিরিক্ত আশাবাদী। তিনি আশা রাখেন, এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। গেল তিন বছরের এ সময়ের পণ্য-মূল্যের চাইতে অধিক মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে তিনি একেবারে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন। তাঁর মতে উৎপাদকেরা বেশি দাম পেয়ে শস্য আর ধরে রাখবে না—অধিক মূল্য পেয়ে গুদাম কাবার করে শস্য বেচে দেবে।

শুনেছিলাম, নেড়া একবারের বেশি বেলতলায় যায় না। কিন্তু আমাদের সরকারের কর্ণধারদের বারবার বেল-তলার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তারা ঘুরে-ফিরে সেই পথের মায়াটা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। ধান, গম, বাজরা, ভুট্টা যারা মজুত করে রাখে, তারা তো টাকার কুমীর বলেই আমরা জানি। তারা আগামী দিনের মুনাফার সুযোগটা কেন ছেড়ে দেবে—ভাল ছেলের মত রাতারাতি গুদাম খালি করে দেবে, একমাত্র খাদ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ বোধ হয় বুঝে উঠতে পারছেন না। উৎপাদকের জন্য নির্ধারিত দামের মধ্যে বেচা-কেনা না হলে সরকার শস্য কিনে নেবেন, কথা দিয়েছেন। এমনি ধারা প্রতিশ্রুতি অনেক আগেও আমরা পশ্চিম বাংলা সরকারের কাছে শুনেছি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কোনটাই ফলপ্রসূ হয় নি। শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম দেশ-বাসীকে নিরাশ করেছেন। তিনি মজুতদারী বন্ধের কোন সক্রিয় পন্থাই নির্ধারণ করতে পারেন নি। সে-পথ আগলাতে না পারলে অন্য কোন পথেই সমস্যার সমাধান হতে পারে না।

* * *

কায়রো থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী করাচীতে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছেন। মধ্যাহ্নভোজের আগে প্রায় ৯০ মিনিটকাল দুই নেতা আলাপ করেছেন নিরিবিলিতে, পরে প্রচারিত যুক্ত ইস্তাহারে দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি এবং সম্মান ও ন্যায়ের ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যের সমস্যাগুলোর মীমাংসার কথা বলা হয়েছে।

ভারত চিরকালই পাকিস্তানের কল্যাণকামী। ন্যায়ের ভিত্তিতে পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা আগেও ভারতের পক্ষ থেকে কম

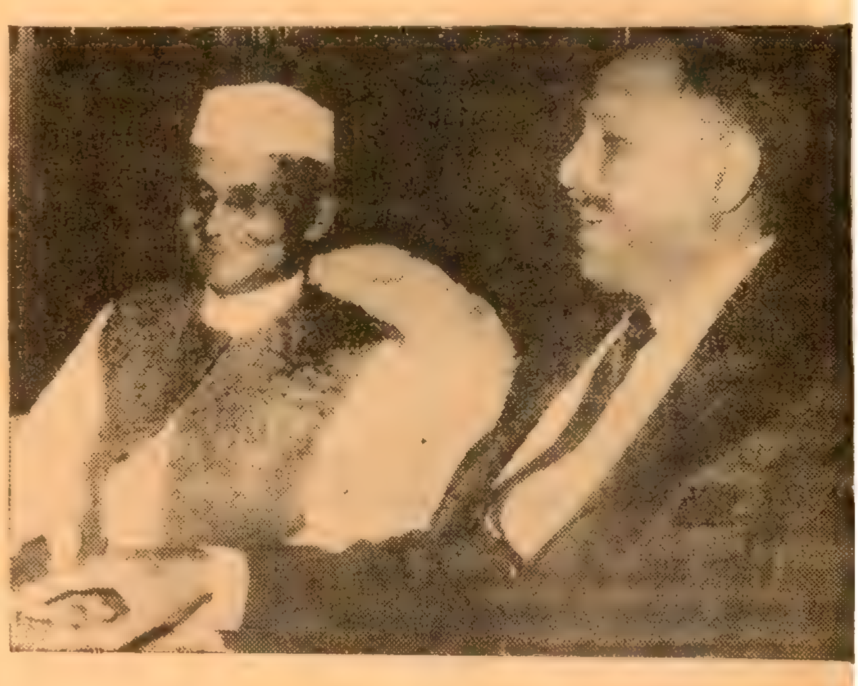

● করাচীতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী

হয় নি। আয়ুবের শুভবুদ্ধির উদ্রেক হলেই সম্মানজনক ভিত্তিতে যে-কোন সময় মীমাংসা হতে পারে।

উত্তর প্রদেশ :

জনসংঘ নয়া সংগ্রামে নেমে পড়েছে। এ সংগ্রাম তাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর বিরুদ্ধে। আইনসভার জনসংঘের নেতা শ্রীসারদা-চন্দ্র সিং মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র বস্তি জেলায় সম্প্রতি আন্দোলন সুরু করেছেন।

সুচেতা-বিরোধী এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুমুখো—শাঁখের করাতের মত

● সি বি গুপ্ত

দু'দিকে কেটে চলবে। রাজ্যের সর্বত্র অতিমুনাফা-বিরোধী আন্দোলন চলেছে সংযুক্ত সমাজবাদী দল ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। জনসংঘ এ আন্দোলনের সামিল হতে পারে নি। পৃষ্ঠপোষক, প্রিয়জনের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। জনসংঘ কার্যত মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ ও মুনাফানিরোধ আন্দোলনের বিরোধিতাই করে আসছে। বিরোধী দলের পক্ষে এ ধরণের বিরোধিতাও বর্তমানে মারাত্মক। কোণঠাসা হয়ে পড়ার চাইতে একটা কিছু সরকার-বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়াই বোধ হয় জনসংঘ শ্রেয় মনে করেছে। তাই তারা সুচেতাকে ঘায়েল করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে।

এতে একদিকে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যেমন সম্ভব হবে, অপরদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি বি গুপ্তের দলকেও খুশি করা যাবে। তাতে কংগ্রেসের বিবদমান দুটি দলকে লড়িয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টির পথটা সুগম হবে। সেই সঙ্কটকালে জনসংঘ নিজের মতলব কিছুটা হাসিল করে নিতে পারবে।

দুঃখের বিষয়, জনসংঘের এই ফাঁদে নাকি শ্রীগুপ্ত ধরা দিয়েছেন। শ্রীগুপ্ত ও তাঁর প্রধান সহকারী শ্রীবানারসী দাস জনসংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেই চলেছেন। ধুরন্ধর রাজনীতিকদের মতে জন-সংঘকে পেছন থেকে মদত দিচ্ছেন শ্রীগুপ্ত। তাঁদের দল মনে করে, এ কাজে সাফল্যলাভ করতে পারলে উত্তর প্রদেশে উড়িষ্যার মত পরিস্থিতির উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুপ্ত নাকি প্রকাশ্যেই বলে বেড়াচ্ছেন, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডকে সমুচিত শিক্ষা তিনি একবার দিতে কসুর করবেন না।

সামনেই আসছে পাঁচটি কেন্দ্রের উপনির্বাচন। উপনির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে এর মধ্যে মন কষাকষি সুরু হয়েছে। আইনসভার কংগ্রেসী দলের সদস্যদের ওপর শ্রীগুপ্তের প্রভাবটাই বেশি। ওদিকে কংগ্রেস সংগঠন রয়েছে শ্রীত্রিপাঠীর মুঠোর মধ্যে।

● ● ●

উত্তর প্রদেশে চরম খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে। নেতাদের সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। তাঁরা মেতে উঠেছেন ক্ষমতালাভের লড়াইতে। মজুতদার ও মুনাফাশিকারীর দল সংঘবদ্ধভাবে সরকারের সকল চেষ্টা বানচাল করে দেবার কৌশল অবলম্বন করেছে। মজুতদারদের গুদামে হানা দেবার পরই রাতারাতি খাদ্যশস্য বাজার থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে। সরকারের চেষ্টা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অবশ্য কিছুটা সন্দিহানও হয়ে পড়েছে। তারা সরকারের মজুতবিরোধী অভিযানকে লোক-দেখানো 'প্রহসন' আখ্যা দিচ্ছে। তাদের মতে বড় বড় জোতদার ও মজুতদারদের গুদামে সরকারের হাত পড়ে নি। পড়লে নিশ্চয়ই কিছু কাজ হতো।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী সম্প্রতি এক বক্তৃতায় মুনাফাবাজ মজুতদারদের সমাজে একঘরে করে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। এ আহ্বানে সাড়া দিতে

● বানারসী দাস

হলে আগে জানা দরকার কোন্ মানুষটি সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত। মুনাফাশিকারীদের প্রতি দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের দরদ রয়েছে। খাদ্যশস্য মজুত করে কৃত্রিম সঙ্কটসৃষ্টির দায়ে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের নাম প্রকাশ করতে পুলিশ ও জেলার কর্তারা নারাজ।

মাদ্রাজ :

শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ ও এনফোর্সমেণ্ট পুলিশের গোপন অভিযান চলেছে মাদ্রাজের ঘরে ঘরে।

মাদ্রাজ, মাদুরাই ও কোয়েম্বাটোরে একদফা তল্লাসীর কাজ হয়ে গেছে।

বোম্বাই শহরে চিত্রতারকাদের গোপন অর্থের খবর গোপন না রাখার নাকি কাজের ক্ষতি হয়েছিল। এতে পরবর্তী তদন্তকার্যের বিঘ্ন ঘটে বলেই মাদ্রাজের অভিযান সম্পর্কে গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছে।

বোম্বাই শহরের মত মাদ্রাজেও চিত্রতারকা, প্রযোজক ও অর্থের যোগানদারদের ঘরেই প্রথম অভিযান চলেছিল। কিছু সংখ্যক শিল্প-মালিককেও নতুন করে আয়কর দপ্তরে তাঁদের নথিপত্রসহ হিসেব দাখিল করতে বলা হয়েছে।

প্রথম দিকে শোনা গিয়েছিল চিত্র-শিল্পে মূলধন নিয়োগকারী তিনজনের কাছে দু' লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এখন বলা হচ্ছে, পরবর্তী নথিপত্র যা' পাওয়া গিয়েছে তাতে এঁরা আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন ৩৫ লক্ষ টাকার মত। চিত্রতারকাদের হিসেবের খাতার খুঁটিনাটি বিচার চলেছে।

মাদ্রাজের পুলিশ চিত্রতারকাদের ঘরে হানা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির আকাশের নক্ষত্রদের গৃহতল্লাসীতেও নেমে পড়েছে। দ্রাবিড় কাজাগাম দলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ই ভি রামস্বামী পারিয়ারের কাছে গিয়ে তাঁর আয় ও সম্পত্তির হিসেব দাবি করে বসেছে। শ্রীপারিয়ার নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি তাদের নাকি বলেও দিয়েছেন—তাঁর গোপন অথবা প্রকাশ্য কোন হিসেবই নেই।

কাজাগামের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ দানা বেঁধে উঠেছে। দু' কোটি টাকার সম্পত্তি পারিয়ার আত্মসাৎ করেছেন, এ অভিযোগও উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে।

কেরালা ঃ

একনাগাড়ে বারো দিন কেরালার ন'টি জেলা সফর করে গেছেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতাও করেছেন এবং শঙ্কর-মন্ত্রিসভার পতনের পর কেরালার রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার চেষ্টাও তিনি করে গেছেন।

সফরান্তে তিনি কংগ্রেসের একটা নিখুঁত চিত্রও দিয়ে গেছেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম বা অন্য কোন দলের সাথে গাঁটছড়া না বেঁধে কংগ্রেসকে একক প্রতিযোগিতায় নামতে বলেছেন। কংগ্রেসের নির্দেশ উপেক্ষা করে যাঁরা বিরোধী দলের সঙ্গে এক হয়ে মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছেন তাঁদের বিষয় পুনর্বিবেচনার প্রশ্নটি তিনি একেবারেই আমল দেন নি।

কংগ্রেস সভাপতির মতে কালো টাকা মন্ত্রিসভার পতনে অনেকখানি সাহায্য করেছে। কালো টাকার

● আর শঙ্কর

বিরুদ্ধে দুর্নিবার সংগ্রামের আহ্বানও তিনি জানিয়ে গেছেন। তা ছাড়া, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যাদের লক্ষ্য কালো টাকার শক্তিকে পর্যুদস্ত করা তাদের প্রধান্য কর্তব্য হওয়া উচিত।

শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কাদা ছিটানো বন্ধ করার অনুরোধও কংগ্রেস সভাপতি জানিয়ে গেছেন। শ্রীশঙ্করের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার একদফা পরলোক-গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু করে গেছেন। তারপর আর বিষয়টি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা উচিত হবে না।

প্রথম নির্বাচনী ভাষণও তিনি দিয়ে গেছেন। সে ভাষণে তিনি শঙ্কর-মন্ত্রিসভার কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেছেন। বলেছেন, শঙ্কর-মন্ত্রিসভা যে-কোন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার গৌরবের দাবি করতে পারে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে কেরালার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শিল্পায়নে অবদান কোন অংশেই কম নয়। কংগ্রেস নির্বাচনে নিজের কৃতিত্বের দাবিতেই জয়ের আশা করতে পারে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার ভিন্ন বিরোধী দল আর কোন কাজই আজ পর্যন্ত করে নি।

নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস সভাপতির এ মন্তব্যের গুরুত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে। তাঁর বক্তব্য কেরালার ক্ষেত্রে কতটা সফল হবে বলা খুবই কঠিন। স্বাধীনতার পর থেকে কেরালার কোন মন্ত্রিসভাই টিকতে পারে নি বেশিদিন। কেরালার রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী বরাবর প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রদেশ কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে পারে নি। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীই প্রদেশ কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। নায়ার গোষ্ঠী, ক্যাথলিক সম্প্রদায় এবং মুসলিম লীগ আজ মিলিতভাবে কংগ্রেসের ওপর আঘাত হানছে। এ কথা ভুললে চলবে না, এদের সমর্থনেই গেল চারটি বছর কংগ্রেস ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এদের সাহস ও শক্তি কংগ্রেসই বৃদ্ধি করেছেন। শ্রীশঙ্কর এখনও হাল ছাড়েন নি। তিনি এদের বিরুদ্ধপক্ষ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোকে দলে টানতে যথাশক্তি চেষ্টা করছেন।

আজ সকলেই শঙ্করের পাশে এসে দাঁড়াতে নারাজ। এ অবস্থায় তাঁকে একাই সংগ্রামে নামতে হতে পারে। গণদেবতার মনের কথা আগে-ভাগে আঁচ করা যায় না। কার গলায় তিনি জয়ের মাল্য পরাবেন কেউ বলতে পারেন না। তবু, মানুষের জল্পনা-কল্পনা বন্ধ থাকে না। সাধারণ নির্বাচনে কেবল কংগ্রেস

সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, এমন আশার সঞ্চার এখনও কোন মহলেই হয় নি।

কংগ্রেস সভাপতির মতে প্রতিক্রিয়াশীল দলের ফাঁদে পড়েছিলেন শঙ্কর বিরোধী কংগ্রেসের সদস্যগণ। এঁরাই একজোট হয়ে কালো টাকার জোরে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছেন। খুবই সত্যি কথা। কালো টাকার কবলে পড়ে দেশের মানুষের জীবনযাত্রাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কংগ্রেস সভাপতির মুখে তার স্বীকৃতিতে মানুষ কিছুটা আশ্বস্তও বোধ করবে। কালো টাকা যাদের অপ্রতিহত শক্তি দিয়েছে তাদের মোকাবিলা কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব। অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সে ক্ষমতা ও সংগঠন নেই। কাজেই এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। এ যুক্তি শঙ্কর-মন্ত্রিসভার সমর্থনে না হয়ে সাধারণভাবে কংগ্রেসের সমর্থনে উত্থাপন করলে যতটা কাজ হবে সে পরিমাণ সাফল্য এখানে সম্ভব নয়। কারণ যে-শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেস সভাপতি জেহাদ ঘোষণা করতে আহ্বান জানিয়েছেন তাদের সঙ্গেই শঙ্করের এতকাল ঘনিষ্ঠতাটা ছিল বেশি। মানুষ তা' এত সহজে ভুলতে পারে না।

শঙ্করের বিরুদ্ধে নতুন করে উত্থাপিত অভিযোগগুলো যেভাবে কংগ্রেস সভাপতি এড়াতে চেষ্টা করেছেন তাতেও কোন লাভ হবে না। বিরোধী দলগুলো এর মধ্যেই নির্বাচনী প্রচারে এ কথাগুলো সাধারণের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন।

বিদ্রোহী কংগ্রেস সদস্যগণ আলাদা সংগঠন গড়ে তুলছেন। তাঁদের সংগঠনের নাম হবে 'কেরালা কংগ্রেস'। কংগ্রেসের সংবিধানই নবগঠিত কেরালা কংগ্রেসের সংবিধান হবে। চরকাবিহীন তেরঙ্গা পতাকা তাঁরা গ্রহণ করছেন। সাড়ে তিনশ' কংগ্রেস সদস্য এ দলের প্রথম সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এ দলটি মুসলিম লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের চেষ্টায় আছেন। মুসলিম লীগ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্গে নবগঠিত কেরালা কংগ্রেসের মিলন হলে শঙ্করের অবস্থা আরও কাহিল হয়ে উঠবে।

কাশ্মীর ঃ

বক্সী গোলাম মহম্মদের অনুগামীরা নয়াদিল্লীতে ধর্না দিয়ে তাঁদের নেতার মুক্তির শেষ চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে এসেছেন। এখন আবার নতুন কথা প্রচার করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছেন। সাদিকের দলের সাথে একটা সমঝোতা শীগগিরই হবে, এইটিই তারা প্রচার করে চলেছেন। সেই সঙ্গে সাদিকের বিরুদ্ধে একটু বিষবাষ্প ছড়াতেও তাঁরা কসুর করছেন না।

● বক্সী গোলাম মহম্মদ

দিল্লীতে এসে তাঁরা প্রথম দাবি তুলেছিলেন কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের। এ দাবির সমর্থন তাঁরা পান নি---পেতেও পারেন না। জম্মু ও কাশ্মীরের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের কোন ব্যবস্থাই নেই। রাজ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সদর-ই-রিয়াসতের শাসন বলবৎ হতে পারে মাত্র ছ'মাসের জন্য। ছ'মাস পরে যে করেই হোক, সাধারণ নির্বাচন হতে হবে। তা' ছাড়া, সাদিক সরকার আইনসভার আস্থা যখন হারায় নি তখন কোন পরিবর্তনই সম্ভব নয়।

বক্সীপন্থীরা এ ব্যাপারে হালে পানি না পেয়ে তাদের প্রতি, বিশেষ করে, বক্সীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহানুভূতি রয়েছে বলে রটাতে সুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ঠিক এর বিপরীত। কাশ্মীরের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ডি পি ধর এবং কেন্দ্রের বিশেষ সেক্রেটারী শ্রীশঙ্করপ্রসাদের কাছ থেকে বিস্তৃত তথ্য পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ উভয়েই বক্সী গোলাম মহম্মদের বিরুদ্ধে কাশ্মীর মন্ত্রিসভার কাজের যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। বক্সীপন্থীদের শ্রীশাস্ত্রী কেবল বলেছেন যে, কায়রো থেকে-ফিরে এসে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন।

• • •

কাশ্মীরের সরকারী চাকরী যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের এখন থেকে লাদাক জেলার সীমান্তে যাওয়ার স্বীকৃতিপত্রে সই করতে হবে। এতে দুটো কাজ হবে বলে সরকার মনে করেন। সীমান্তে তরুণের দলকে পাঠানো সম্ভব হবে এবং সীমান্তে প্রেরণ আর কর্মচারীদের কাছে শাস্তির সামিল বলে গণ্য হবে না।

মহারাজার আমলে অবশ্যি এ ধরণের ব্যবস্থা চালু ছিল। কোন কর্মচারীকে শাস্তি দিতে হলে প্রথম তাকে পাঠানো হতো গিলগিট ও হুঞ্জা এলাকায়। কাশ্মীর সরকার বারবার চেষ্টা করেও কর্মচারীদের মন থেকে সে ধারণা আর দূর করতে পারেন নি। ফলে লাদাকের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যথাযথ রূপ দেবার জন্য উপযুক্ত কারিগর ও অফিসার পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। সরকার এখন বাধ্য হচ্ছেন নবাগতদের পক্ষে সীমান্ত এলাকায় যাওয়া বাধ্যতামূলক করতে।

• কায়রোয় এক হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সোয়েকার্নোর সঙ্গে শাস্ত্রী

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

কায়রোতে সাতদিনব্যাপী জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। ৪৭টি রাষ্ট্রের মুখ্য শাসক—রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী এই সম্মেলনে যোগ দেন; তা ছাড়া ১০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দর্শকরূপে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

১১ই অক্টোবর সম্মেলন শেষ হবার পূর্বে সম্মেলনের চূড়ান্ত ইস্তাহারটি গৃহীত হয়। 'শান্তি ও সহযোগিতার কর্মসূচী' নামে অভিহিত এই ইস্তাহারে জোটনিরপেক্ষতার নীতির প্রতি যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ সমর্থন ঘোষণা করা হয়। বেলগ্রেডের প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের সময় যে যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, বর্তমানে তা না-থাকলেও বিশ্ব-শান্তি রক্ষার জন্য জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে ঘোষণা করা হয়।

জোটনিরপেক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকেও স্বীকার করা হয়। এই নীতি গ্রহণ করার জন্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সোয়েকার্নো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির বিরোধিতা করা সত্ত্বেও সম্মেলনে এই নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছে। তবে, এই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদের অবসান ভিন্ন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি যথার্থভাবে কার্যকরী হতে পারে না।

ইস্তাহারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। বিশ্ব থেকে উপনিবেশবাদের নিঃসর্ত, পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত উচ্ছেদের জন্য ৪৭টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দাবি জানিয়েছেন। আরও উল্লেখযোগ্য, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের জন্য জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনে বাধা দিলে জনগণ সশস্ত্র আন্দোলনের পথ গ্রহণ করতে পারবে বলে ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণার গুরুত্ব খুব বেশি। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকা সহ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি চলছে, জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, কিন্তু কোন দেশে ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের জন্য প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র আন্দোলন এবং বাইরে থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণের অধিকার—জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগোষ্ঠী এই নীতিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষার নীতিও সম্মেলনে স্বীকার করা হয়েছে। কোনরূপ সীমান্তবিরোধ দেখা দিলে তা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা করতে হবে। তা ছাড়া কঙ্গো, সাইপ্রাস, প্যালেস্টাইন, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কেও প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

কায়রো জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও চূড়ান্ত পর্যায়ে ইস্তাহার রচনায় ভারতের বক্তব্য গৃহীত হয়েছে। শ্রীশাস্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, সীমান্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, বৈদেশিক প্রভুত্ব ও জাতিবৈষম্য লোপ, আন্ত-র্জাতিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রসংঘের প্রতি পূর্ণ সমর্থন বিষয়ে যে পাঁচদফা বক্তব্য রেখেছিলেন, চূড়ান্ত ইস্তাহারে তার প্রায় সবটাই গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের এ এক মস্ত বড় কূটনৈতিক জয়। শ্রীশাস্ত্রী তাঁর প্রথম আন্তর্জাতিক

* প্রেসিডেণ্ট টিটোর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী, স্বরণ সিং ও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যগণ।

সম্মেলনেই অন্য রাষ্ট্রনেতাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছেন।

চীনের পরমাণু বোমা তৈরির প্রতিবাদে আশঙ্কা প্রকাশ করে শ্রীশাস্ত্রী জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আবেদন করেছিলেন---চীনকে পরমাণু বোমা তৈরি থেকে নিবৃত্ত করুন। শ্রীশাস্ত্রীর এ দাবিও স্বীকৃত হয়েছে। চীনের নাম উল্লেখ না করে ঘোষণায় বলা হয়েছে, যে সব রাষ্ট্রের হাতে বর্তমানে পরমাণু বোমা নেই, তাদের কাছে নতুন করে পরমাণু বোমা তৈরি

* কায়রো সম্মেলনে যোগদানকারী কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে আলোচনারত শাস্ত্রীজী

না করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে।

সম্মেলনে যোগদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হলেও চীন ও পাকিস্তান তাদের কায়রোর রাষ্ট্রদূতদের সাহায্যে, এবং ইন্দোনেশিয়ার সোয়েকার্নোর সঙ্গে যোগসাজসে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, উপনিবেশবাদ, নিরস্ত্রীকরণ প্রত্যেকটি বিষয়ে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের এই অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ কায়রো সম্মেলনে একেবারেই ওঠে নি। শ্রীশাস্ত্রী চীন-ভারত সমস্যা নিয়ে নাসের, টিটো প্রভৃতি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাঁরা সবাই ভারতের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

কায়রো জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে বিশ্বশান্তি, নিরস্ত্রীকরণ, উপনিবেশবাদ অবসান, বৈষয়িক উন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে।

আর্জেণ্টিনা :

ফরাসী রাষ্ট্রপতি দ্য গলের ল্যাটিন আমেরিকা সফর সর্বত্র সুখকর হয় নি। আর্জেণ্টিনা সফরের সময় নানা জায়গায় তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

রাজধানী বুয়েনস এয়র্সে বহু লোক কালো পতাকা, প্ল্যাকার্ড প্রভৃতি নিয়ে দ্য গলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল। করবোজ শহরে দ্য গলের গাড়ি লক্ষ্য করে জনতা ইট-পাটকেল ছুড়েছে। দ্য গলের সঙ্গে আর্জেণ্টিনার রাষ্ট্রপতি ইলিয়াও ছিলেন।

দ্য গল বিরোধী এই বিক্ষোভ আর্জেণ্টিনার নির্বাসিত রাষ্ট্রপতি জুয়ান পেরনের সমর্থকদের দ্বারা পরিচালিত বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে ফ্রান্সের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপনের সামান্যতম চেষ্টাও যে দেশের একদল লোক পছন্দ করে না, দ্য গল বিরোধী এই সব বিক্ষোভ তারই প্রমাণ। তা না হলে সাধারণ শুভেচ্ছা সফরকে উপলক্ষ করে এরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন কোথাও হয় না। মতভেদ থাকলেও বিদেশী অতিথির প্রতি সম্মান জানানোই সাধারণ শিষ্টাচার।

• দ্য গল

ক্যানাডা :

ক্যানাডা সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও এখনও ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যানাডার রাষ্ট্রপ্রধান। ক্যানাডার রাণীরূপে দ্বিতীয় এলিজাবেথ আটদিনব্যাপী সফরে ক্যানাডায় এসেছেন। ক্যানাডায় ফেডারেশন চালু করার শতবর্ষপূর্তি উৎসবে (১৮৬৪-১৯৬৪) যোগদান অবশ্য রাণী এলিজাবেথের এবারের সফরের উদ্দেশ্য।

তবে উল্লেখযোগ্য, রাণীর সফরকে কেন্দ্র করে এবার কোথাও উৎসাহ দেখা যায় নি। ফরাসীপ্রধান কুইবেকে তো রীতিমত বিক্ষোভ ছিল, ইংরেজ-প্রধান ওণ্টেরিওতেও কোন উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় নি। ক্যানাডার সাধারণ মানুষ ইংলণ্ডের

• রাণী এলিজাবেথ

সঙ্গে বর্তমান রাজকীয় যোগ রাখতে চায় না, এই নিরুৎসাহ কি তারই প্রমাণ?

ফরাসীপ্রধান কুইবেকে এলিজাবেথের আগমনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে। কিছুদিন ধরেই ক্যানাডায় ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হচ্ছে। ইংরেজ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ফরাসীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছে। কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনে ফরাসীদের অধিকতর অংশ গ্রহণ এবং প্রাদেশিক [illegible] ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি ফরাসীদের মধ্যে ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে।

এমন সংবাদও বেরিয়েছিল এলিজাবেথ কুইবেক শহরে এলে তাঁকে হত্যা করা হবে---'ডালাস ঘটনা'র পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কুইবেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান সেণ্ট জন ব্যাপটিস্ট সোসাইটি এলিজাবেথের সকল সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বর্জন করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এ-সব সত্ত্বেও ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী লিস্টার পিয়ার্সন রাণীর কুইবেক সফরসূচী বজায় রেখেছেন। রাণীর পরামর্শ-দাতারাও এতে সম্মতি জানিয়েছেন। অটোয়া ও লণ্ডনের কর্তারা মনে করেছেন, ফরাসীদের এই ভীতিপ্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করলে ফরাসীদের বিচ্ছিন্নতার শক্তি জোরদার হবে।

যাই হোক, ডিউক অব এডিনবরাকে নিয়ে রাণী এলিজাবেথ কুইবেক সফর করেছেন। বিপুল জনসম্বর্ধনা লাভ না করলেও আনুষ্ঠানিক সব কিছুই হয়েছে এবং কোন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে নি। তবে ক্যানাডার রাজনীতিতে ইংরেজ-ফরাসী এই বিরোধ কতদূর অগ্রসর হবে, তাই ভাববার বিষয়।

দক্ষিণ রোডেশিয়া :

দক্ষিণ রোডেশিয়া ও নিয়াসাল্যাণ্ডকে নিয়ে গঠিত অধুনালুপ্ত মধ্য-আফ্রিকা ফেডারেশনের প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী স্যার রয় ওয়েলেনস্কী দক্ষিণ রোডেশিয়ার পার্লামেণ্ট নির্বাচনে

• আইয়ান স্মিথ

• রয় ওয়েলেনস্কী ও ক্লিফোর্ড ডুপোণ্ট

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। শ্বেতকায় নির্বাচনকেন্দ্র আরুনডেলে ওয়েলেনস্কী বর্তমান সহকারী প্রধান-মন্ত্রী ক্লিফোর্ড ডুপোণ্টের কাছে ১০৭৬--৬৩৩ ভোটে পরাজিত হয়েছেন।

মাত্র সেদিনের প্রবল প্রতাপান্বিত রয় ওয়েলেনস্কীর এরূপ বিপর্যয়ের কারণ কি? রয় ওয়েলেনস্কী শ্বেতকায় প্রাধান্যের সমর্থক হলেও তিনি কৃষ্ণকায় আফ্রিকীয়দের নিয়ে কাজ করতে চান এবং দক্ষিণ রোডেশিয়াকে একটি 'বহু জাতিক' রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আইয়ান স্মিথ ও তাঁর দলবল আফ্রিকীয়দের একেবারেই বাদ দিয়ে চলতে চান। আরুনডেল নির্বাচনে কিছুটা উদারনৈতিক রয় ওয়েলেনস্কী উগ্র বর্ণবিদ্বেষী আইয়ান স্মিথের সহকারী ক্লিফোর্ড ডুপোণ্টের কাছে এই পরাজয় এ-কথাই প্রমাণ করে, বর্ণবিদ্বেষ নীতি সম্পর্কে দক্ষিণ রোডেশিয়ার শ্বেতকায়দের আপোষহীন মনোভাবের কোন পরিবর্তন হবে না।

পাকিস্তান ঃ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে উপলক্ষ করে পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে পরস্পর কাদা ছোড়াছুড়ি চরমে উঠেছে। আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে পাঁচটি বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে মিস ফতেমা জিন্নাকে দাঁড় করাবার পর থেকেই আয়ুব খাঁ রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। একে মিস জিন্নার অসামান্য জনপ্রিয়তা, তারপর বিরোধী দল-গুলির ঐক্য। এ অবস্থায় কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করা ছাড়া আয়ুব আর কোন পথ খুঁজে পান নি।

মিস জিন্নাকে ছেড়ে এবার আয়ুব ধরেছেন বিরোধী পক্ষের দুই প্রধান স্তম্ভ খাজা নাজিমুদ্দিন ও চৌধুরী মহম্মদ আলিকে—দুজনেই পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

খাজা নাজিমুদ্দিন সম্পর্কে আয়ুব খাঁ বলেছেন, 'খাজা সাহেব অক্ষম ও ও অসমর্থ---তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। কাজের সময় টেবিলে বসে বসে তিনি ঘুমান। আয়ুব যখন পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি

ছিলেন, তখন খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। আয়ুব বলেছেন, ছ'মাস বা এক বছরেও তাঁর কাছ থেকে কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যেত না। অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কোন কাজের কথা সুরু করলেই তিনি হাই তুলতে তুলতে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। কাজ তো দূরের কথা, তাঁকে জাগানোই তখন এক মহা কষ্টকর ব্যাপার। নাজিমুদ্দিনকে অপসারিত করার পর তাঁর দপ্তর থেকে না-দেখা বহু ফাইল বেরিয়েছিল—আর একটি ফাইলের কোন হদিসই পাওয়া যায় নি।

চৌধুরী মহম্মদ আলি সম্পর্কে আয়ুব খাঁর বক্তব্য: এই ভদ্রলোক 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানে অক্ষম, সংকীর্ণমনা, পরশ্রীকাতর ও চক্রান্তকারী।'

সুতরাং এই দুই ব্যক্তি যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, তবে আয়ুব খাঁ নিশ্চয়ই তাঁদের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

অবশ্য খাজা নাজিমুদ্দিন ছেড়ে দেবার পাত্র নন। রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, তিনি যখন মন্ত্রিত্ব থেকে অপসারিত হন, তখন তাঁর কাছে সিদ্ধান্ত না-নেওয়া ফাইল ছিল মাত্র তিনটি। আর এই তিনটিই আয়ুব খাঁর নিজের সম্পর্কে। প্রথমটি, তাঁর বেতন বৃদ্ধির দাবি সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি তাঁর প্রধান সেনাপতিরূপে কার্যকাল বৃদ্ধির প্রস্তাব, আর তৃতীয়টি অবসরের পর তাঁর পেনসনের বিষয়ে। এ অভিযোগের জবাব এখনও আয়ুব খাঁ দেন নি।

যেভাবে পরস্পরের কেচ্ছা বেরিয়ে পড়ছে, তাতে কোথায় গিয়ে এর শেষ হবে, বলা শক্ত। তবে, দু'দিকের অভিযোগই সত্য বলে মনে হয়। বর্তমানে অবস্থাবিপাকে খাজা নাজিমুদ্দিন, চৌধুরী মহম্মদ আলি প্রভৃতি গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন করলেও এঁদের পূর্বপরিচয় কারও অজানা নেই। অপর দিকে আয়ুব খাঁও স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ক্ষমতার প্রভাব সৃষ্টি করে এই সব প্রতিক্রিয়াশীল ও দুর্বল স্বভাবের ব্যক্তির কাছ থেকে কাজ আদায়ের চেষ্টা করেছেন।

• • •

কেচ্ছা-কেলেঙ্কারীকে অতিক্রম করে নির্বাচনী অভিযান জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। মিস জিন্নার পশ্চিম পাকিস্তান সফর আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।

আটদিনব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফরের প্রথম পর্যায়ে মিস জিন্না পেশোয়ারে আসেন। পেশোয়ারের সর্বত্র তিনি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, এখানে মিস জিন্নার প্রতি খান আবদুল গফফর খানের লালকোর্তা দলের সমর্থন। প্রাক্তন লালকোর্তা দল বর্তমান জাতীয় আওয়ামী পার্টির অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা মিস জিন্নাকে সমর্থন করছেন। পেশোয়ারে মিস জিন্নার নির্বাচনী সভায় লাল পতাকার ছেয়ে গিয়েছিল। 'গফফর খাঁ জিন্দাবাদ', 'এক ইউনিট ব্যবস্থা মুর্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনির দ্বারা সভায় যোগদানকারী পেশোয়ারবাসী বাদশা খানের প্রতি তাঁদের আনুগত্য ও আয়ুব বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

লালকোর্তা দল কর্তৃক মিস জিন্নাকে এভাবে সমর্থন জানানোতে আয়ুব খাঁ ও তাঁর কনভেনশনপন্থী মুসলিম লীগ খুবই ক্ষুব্ধ। এদের মুখপত্র, লাহোরের 'পাকিস্তান টাইমস' মন্তব্য করেছে, 'কায়েদে আজম কখনও কল্পনা করতে পারেন নি যে, এভাবে লাল-কোর্তাদের নিয়ে সভা করবেন। অথচ আজ তাঁর ভগ্নী তাদের সঙ্গেই এক সঙ্গে কাজ করছেন।' 'পাকিস্তান টাইমস' পেশোয়ারে মিস জিন্নার সম্বর্ধনা ও জনসভা সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'এ যেন পেশোয়ারে এক কংগ্রেস সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব।'

কিন্তু এ-সব কথা বলে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকে রোধ করা যাবে না। গণতন্ত্র সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে জনসাধারণ আজ মত প্রকাশের পথ খুঁজছে, মিস জিন্না তারই উপলক্ষ মাত্র। মিস জিন্নাও সর্বত্র তাঁর বক্তৃতায় বলছেন, স্বশাসনের অধিকার ছাড়া জীবন বৃথা। পাকিস্তানের জনসাধারণকে গণতন্ত্র বিরোধী আয়ুব শাসনের অবসান ঘটিয়ে পূর্ণ গণতন্ত্র—প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন করতে হবে।

• • •

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত এক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়ন সফরে গিয়েছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ নাকি তাঁদের ভারতের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ক্রুশ্চেভ পাকিস্তানী প্রতিনিধিদের কাছে ভারতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং বলেন, ভারতের ন্যায় প্রতিবেশীর সঙ্গে পাকিস্তানের কলহ করার কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ থাকতে পারে না।

কাশ্মীর সম্পর্কেও ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট নীতি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন—কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

সিয়েটো, সেণ্টো প্রভৃতি জোটের সঙ্গে থাকা পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী, প্রতিনিধি দলের নিকট ক্রুশ্চেভ এ-অভিমতও প্রকাশ করেন।

পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত হয়ে, ভারতের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীরূপে থাকার জন্য ক্রুশ্চেভ যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা সৎ পরামর্শ হলেও পাকিস্তানীরা গ্রহণ করবে, এমন আশা করা অন্যায়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ আটাশ ॥

কিরণ এসেছিল রাত সাড়ে আটটায়।

দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা দেরি করে আসবার কোনো অর্থ হয় না, এমন ভাবে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রাখবার রেওয়াজ কোনো দেশে নেই। তা ছাড়া এ তো শুধু শর্মিলার সঙ্গে দেখা করাই নয়। আজকের এই সাক্ষাতের মূল ছিল রক্তের গভীরে, আজ এই সন্ধ্যাটা জীবনকে আর এক দিগন্তের দিকে এগিয়ে নিতে পারত। কিন্তু শুধু লগ্নই যে বয়ে গেল তা নয়, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার সঙ্গে কিরণ অনুভব করল, কোথায় যেন চিরদিনের মতো একটা পর্দা পড়ে গেল, সুরু না হতেই সারা হয়ে গেল এমন একটা অধ্যায়---যা হয়তো তাকে আর একটা নতুন জগতে পৌঁছে দিতে পারত।

শর্মিলা নেই।

শর্মিলার মামা বললেন, সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বাড়িতেই তো ছিল। তারপর এক ভদ্রলোক এলেন—তার সঙ্গে এই আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেল।

—কখন ফিরবেন?

—কিছু বলে যায় নি।

—ওঃ!---কিরণ ফেরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল, ভদ্রলোক আবার ডাকলেন।

—কিছু বলতে হবে? কোনো কথা আছে?

—না, কোনো দরকার নেই। আমি এমনিই এসেছিলুম। আচ্ছা—নমস্কার।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কিরণ ট্রাম ধরল। টার্মিনাস থেকে সবে ছেড়েছে, গাড়িটা এখনো ফাঁকা। একেবারে সামনের সীটে এসে বসে পড়ল কিরণ, দু হাতের ভেতর মাথা গুঁজল।

একবারের জন্যে মনে হল, ভদ্রলোকের টেলিফোন নম্বরটা নিয়ে এলে হত, কাল সকালে শর্মিলাকে বলা যেতে পারত, দেরি সে ইচ্ছে করে করে নি, যা ঘটেছে তার ওপরে তার নিজের কোনো হাত ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল, কী হবে? কী হবে?

আজ সন্ধ্যায় কোনো নিরিবিলি একটুখানি অবকাশে, কোনো গাছের ছায়ায়, একফালি জলের ধারে হয়তো শর্মিলাকে নিয়ে সে কিছুক্ষণ রোমাণ্টিক হয়ে উঠত। কৃষ্ণচূড়ার দেশে যে কথা তার বলা হয় নি, সেই কথাগুলো বলা যেতে পারত, হয়তো এক ঘণ্টা দু ঘণ্টা মগ্ন হয়ে বসে থাকা যেত, কিন্তু তারপর?

একদিন অরবিন্দের অনুরোধেও সে প্রতিমাকে ডিভোর্স করতে রাজী হয় নি। ভালোবাসার জন্যে? না—নিজের কাছে অতখানি মিথ্যাবাদী হতে রাজী নয় কিরণ। প্রতিমাকে ভালো সে বেসেছিল, কিন্তু তার কাচের ঘর প্রতিমাই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছে। অর্থহীন সন্দেহ, অকারণ বিদ্বেষ, মনোমন্থনের বিষ—সব মিলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা! তারপর প্রতিমা নিজেই একদিন

অন্ধকারের অতলে ডুবল। সেই থেকে কিরণ এক ধরণের আচ্ছন্নতার মধ্যে কাটিয়ে এসেছে। সে অনুভূতি মুক্তির নয়, বেদনারও নয়, যেন তীব্র জ্বরের ঘোরে স্নায়ুগুলো অভিভূত হয়ে থাকা।

আর কিরণ দিনের পর দিন কাটিয়ে গেছে। মনের একটা বঞ্চিত ক্ষুব্ধিত জগৎকে নির্বাসনে সরিয়ে রেখে, অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করেছে, বই লিখেছে, গল্প লিখেছে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে, সাহিত্য নিয়ে তর্ক করেছে। লেখার ভেতরে নিজের অজ্ঞাতেই কখনো কখনো বিষ জমে উঠেছে হয়তো, অকারণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে কুটিল হয়েছে সে, চিরদিনের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধকে নিষ্ঠুরভাবে অস্বীকার করেছে। এই কলকাতা, এই বেঁচে থাকা, মানুষে মানুষে প্রতিদিনের সম্পর্ক, চোখের কালো চশমার ভেতর দিয়ে আদিম অরণ্যের তমসায় মিশে গেছে, পায়ের নীচের মাটিকে মনে হয়েছে সরীসৃপের বিবর-ছিদ্রিত, মাথার ওপর কালো আকাশ একটা রোমশ ভালুকের মতো নক্ষত্রে নক্ষত্রে কতকগুলো ধারালো নখের নির্মমতা ছড়িয়ে দিয়েছে।

সব কিছুর মূলে একটি সত্য। নিজের যন্ত্রণায় পৃথিবী বিষাক্ত।

ঠিক কথা, রোমান্টিক সে কোনো-দিনই নয়। রাজহাঁসের পালক খুঁজে না পাওয়ার সেই ছেলেবেলা তাকে সেই যে সচেতন করে তুলেছিল সে শিক্ষাও তার ভোলার নয়। কিন্তু তবু সাধারণ মানুষের কতকগুলো সহজ সুখ, কয়েকটা স্বাভাবিক পাওয়ার ওপরে তার দাবি আছে। শুধু চিন্তাই তাকে মুক্তি দিতে পারে না, শুধু বুদ্ধিই মানুষের শেষ আশ্রয় নয়।

তা যদি হত, তা হলে 'ভেনুস নোয়ার'-কে কেন্দ্র করে অমনভাবে শর্ল বোদল্যারের জীবন বিষিয়ে উঠত না, জাঁ দ্যু ভাল তাঁকে অমনভাবে রাহুগ্রাসে নিঃশেষ করে নিত না; অমন করে নিজের কান কেটে গণিকার জন্যে অর্ঘ্য সাজাতে হত না ভ্যান গখ্‌কে। আমি যে রক্তেই ফুল ফোটাতে চাই, একটু মাটি যদি না থাকে, কোথায় আমি শিকড় মেলব, কোথা থেকে জীবনের রস পাব?

তবু শূন্যতাও অভ্যাস হয়ে যায়, যেমন কিরণের হয়ে গিয়েছিল। তারপরে সেই কৃষ্ণচূড়ার ক'টি দিন। হঠাৎ নিজের ভেতরের ফাঁকাটা হা হা করে উঠল, সেই পড়ন্ত বিকেলে কোথা থেকে ছবির মতন দেখা দিলেন শর্মিলা। দূরের পাহাড়, সেই নদীটি, মহাকালের চূড়োয় সেই উজ্জ্বল হলুদের উৎসব—কিছুক্ষণের স্বপ্ন। সে স্বপ্নের ঘোর এখনো কাটল না—কলকাতা তার সমস্ত কালো দিয়েও তার রংটুকু মুছে নিতে পারল না।

কিন্তু কী লাভ?

প্রতিমাকে সে ডিভোর্স করতে চায় নি। দুটো কারণ ছিল তার। একদিকে আত্মসম্মানের প্রশ্ন—তার জন্যে অরবিন্দ পর্যন্ত অনুকম্পা বোধ

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

হিন্দুধর্মের গৌরবজ্যোতিঃ। হিন্দুধর্মের এই অতীব দুর্দিনে—স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর বিরাট অভাব দূর করিবার জন্য—সাম, ঋক, যজু ত্রিবেদ—সর্ব্ব উপনিষদ—অষ্টাদশ পুরাণ—সর্ব্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত—শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্যের নিত্যসিদ্ধ মহাগ্রন্থ। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে লৌকিক, পারত্রিক অশেষ মঙ্গল বিধানের নিদান, বেদজ্ঞ ঋত্বিক—তান্ত্রিক সাধক—স্মৃতিশাস্ত্র-বিশারদ দ্বাদশজন ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাপণ্ডিতের পঞ্চদশবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক সাধনায় সঙ্কলিত, সুসংস্কৃত, সুসম্পাদিত।

১ম খণ্ড—নব প্রকাশিত মূল্য—৮৲।

২য় খণ্ডে—সাতটি প্রকরণে ৯০০ পৃষ্ঠায়—দশবিধ সংস্কার, শ্রাদ্ধ তীর্থকৃত্য, প্রতিষ্ঠা, নৈমিত্তিক ক্রিয়া। মূল্য—৫৲।

॥ একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ ॥

মানব জীবনে গুরুর স্থান অতি ঊর্ধ্বে। গুরু বিনা কেহ কোন মন্ত্র-তন্ত্রের অধিকারী হয় না। গুরু তাই আমাদের দেশে নমস্য ও প্রণম্য। সুযোগ্য ও যথার্থ গুরুর লক্ষণ, মাহাত্ম্য, সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। শিক্ষা ও দীক্ষায় গুরুগ্রহণ অপরিহার্য। জপ, দীক্ষা পুরশ্চরণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে গুরুর নির্দেশ অনস্বীকার্য। 'বসুমতী'র চির ঐতিহ্যময় সাহিত্যসেবায় এই মহাগ্রন্থের প্রকাশ। বাঙলা ও বাঙালীর ধর্মপথের পথ-নির্দেশক।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্র

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের ও কর্তব্যাকর্তব্যাদি দীক্ষাপ্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র ও পুরশ্চরণ প্রভৃতির সার সংগ্রহ।

মূল্য মাত্র দেড় টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

করছে, সেই গ্লানি; অন্যদিকে একটা করুণা—প্রতিমার সেই ধূসর উদাস নিঃসঙ্গতার দিকে তাকিয়ে একটা সীমাহীন মমতা। সেও যদি সুযোগ বুঝে প্রতিমাকে ত্যাগ করে, তা হলে শেষ পর্যন্ত কোথায় দাঁড়াবে সে, কার কাছে দাঁড়াবে?

তা সত্ত্বেও শর্মিলার জন্যে কোথায় একটা প্রত্যাশা ছিল, কোথায় যেন একটা জায়গা ছিল তাঁর জন্যে। কিন্তু এখন? প্রতিমার চেতনা একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে আসছে—এতদিনের অন্ধকার থেকে একটু একটু করে ফুটে উঠছে আলোর সীমারেখায়। হয়তো ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ভালোও হয়ে উঠবে। তখন?

তখন শর্মিলার সঙ্গে কিসের যোগ রাখবে সে? কোন্ সম্পর্ক থাকবে?

আজ চেতনার সীমান্তে ভেসে উঠে প্রতিমাই তো বাধা দিয়েছে সকলের আগে। কিরণ ভেবেছিল, আধঘণ্টা পরেই সে উঠে পড়বে হাসপাতাল থেকে, কিন্তু প্রতিমাই আসতে দেয় নি। সেই যে অরবিন্দ তাকে বসিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেল সিগারেট খেতে, তারপর প্রতিমা দুহাতে তার ডান হাতখানা শক্ত বাঁধনে জড়িয়ে রাখল।

—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

—আমি তো তোমার কাছেই ছিলুম, প্রতিমা।

—তা হলে আমি কেন তোমায় দেখতে পাই নি?

—দেখেছিলে, ভুলে গেছ। তোমার অসুখ করেছিল কিনা।

—এখন আমি ভালো হয়ে গেছি তো?

—নিশ্চয় নিশ্চয়।

—তুমি আমার কাছে থাকবে, কখনো ছেড়ে যাবে না?

—না—না।

একবার নয়, বারবার এই আশ্বাস দিতে হয়েছে প্রতিমাকে। চেতনা যখন একটু একটু করে জাগতে সুরু করেছে, মন যখন শিশুর মতো অবুঝ আর অসংলগ্ন—তখন বারবার করে বোঝাতে হয়েছে—আমি আছি, পাশে পাশেই আছি, এই ভাবেই থাকব অনন্তকাল ধরে। আর থেকে থেকে চোখ পড়েছে ঘড়ির দিকে, পাঁচটা—ছ'টা—সাড়ে ছ'টা—সাতটা।

নার্স এল, প্রতিমাকে খাইয়ে গেল, তারপর ঘুমিয়ে পড়তে আরো আধঘণ্টা। ছুটি। এইবারে যাওয়া যেতে পারে শর্মিলার কাছে। ছ'টার অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখা যেতে পারে রাত সাড়ে আটটার সময়।

কিন্তু শর্মিলা অপেক্ষা করেন নি।

ভালোই হয়েছে—এই সব চেয়ে ভালো হয়েছে—নিজেকে প্রাণপণে বোঝাতে চাইল কিরণ। যতক্ষণ প্রতিমা তার অন্ধকারে মগ্ন ছিল, যতক্ষণ ডিভোর্সের জন্যে অরবিন্দের প্রস্তাব ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের কাছে অপরাধ-বোধ তীক্ষ্ণ ছিল না—এমন কি, শর্মিলাকে নিয়ে একটা রোমাণ্টিক সন্ধ্যা কাটাবার সম্পূর্ণ অধিকারই ছিল তার। কিন্তু এখন কি আর সে দাবি করা চলে? আজ যদি দেখা হত, তা হলে প্রতিমার ওপর বিশ্বাস-ঘাতকতা করত সে, প্রতিটি তন্ময় মুহূর্তকে একটা চিন্তাই বিদ্ধ করত কাঁটার মতো: সে যেন একটি নিরীহ শিশুর অসহায় সরলতার সুযোগ নিয়ে চোরের মতো তার গলার হার আর হাতের বালা খুলে নিচ্ছে।

এই ভালো হল যে একটা অধ্যায়ের ওপর সম্পূর্ণ করে যবনিকা পড়ে গেল। কিরণ বাঁচল।

বাঁচল?

—টিকেট?

চমকে মাথা তুলল সে। পাশে এসে হাত বাড়িয়েছে ট্রামের কণ্ডাক্টার, গাড়িটা ভরে উঠেছে, পার হয়ে চলেছে ভবানীপুর। বাইরে কলকাতা। অনেক মানুষ আর অনেক মনের সেই আদিম অরণ্য।

মেসে ফিরে পেল বাণীব্রতর চিঠি। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলানো।

'দাদা, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আপনার জন্যে। বিকেলে ভবেশ-বাবু মারা গেছেন। কাকে কাকে খবর দিতে হবে জানি না, আমি আরো কয়েকজন সাহিত্যিকের কাছে যাচ্ছি। আপনি আসবেন নাকি একবার?

ভবেশদা মারা গেছে! একবারের জন্যে হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। মনে পড়ল তাঁর স্ত্রীর মুখ, মনে পড়ল বাচ্চাগুলোর কথা। দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল কিরণ।

যাওয়ার মুখে ম্যানেজারকে বলে গেল, রাতে বোধ হয় আজ আর ফিরতে পারব না। (ক্রমশঃ)

ধারাবাহিক রহস্য-গল্প

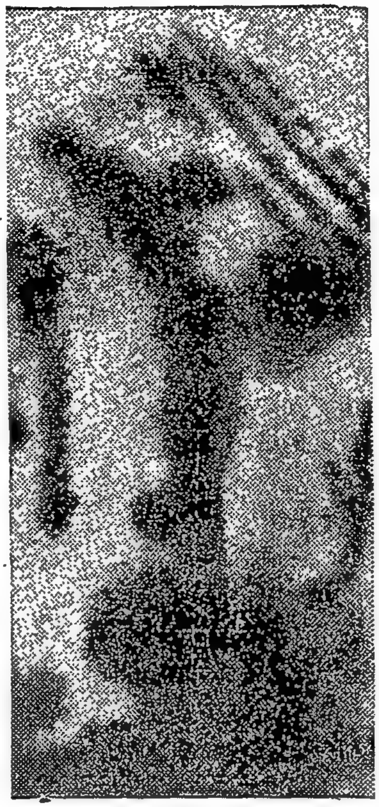

কুহেলী বিলীন

বিভা বসু

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'গল্পের শেষ নেই'—ডাঃ বসাক উপস্থিত সকলের মনের উত্তেজনা বুঝতে পেরেও প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন, 'আমরা যেখানে শেষ মনে করি, সেখানেই হয়তো নতুন আর একটা পরিচ্ছেদের আরম্ভ। তবু বলতে সুরু করেছি যখন, শেষ পর্যন্ত আমাকে বলে যেতেই হবে। আপনারা সকলেই জানেন সমরেশ সরকারের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। চক্রান্তকারী এই পরিস্থিতির সুযোগটুকু নিতে ছাড়ল না। মনোমালিন্যের সূচনায় বুঝিয়ে বললে অনেক ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্টোটাই করা হোল। অর্থাৎ ইন্ধন যুগিয়ে আগুনকে আরও দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলল। সিন থেকে ওদের দুজনকেই সরাতে হবে, এবং মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা বলে প্রমাণিত করতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই। চরম অসুখী দুটি মানুষ জীবনের যন্ত্রণা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করল—এই ভেবে পরিচিত আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের দল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে ও তারপর ভুলে যাবে। জীবনের আর পাঁচটা অতীতের কাহিনী যেমন লোকে ভুলে যায়। তারপর আড়ালে লুকিয়ে থাকা লোকটি তার হাতের মুঠোয় পাওয়া অফুরন্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রশ্ন হচ্ছে কি সে সুযোগ?'

'আপনি সমস্ত কিছুই বড় বেশি নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছেন।' কমলেশ বসু ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন—'আমাদের এতটা সাসপেন্স সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে।'

রামবিলাসের হাত থেকে দ্বিতীয় দফা কফির পেয়ালা টেনে নিয়ে ডাঃ বসাক মৃদু হেসে বললেন—'আগে বিশ্লেষণ ও পরে উদ্‌ঘাটন—নইলে উপসংহারে পৌঁছন যায় না। মাধবী সরকারকে হত্যা করা হোল, তারপরের লক্ষ্য ছিলো সমরেশ সরকার। কিন্তু অজান্তে ফাঁদে পা দিলেন সুনন্দ মিত্র। হয়তো উপর-ওয়ালা আর একজন কেউ আছে, যে এমনি করেই আমাদের সব পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়। কিন্তু একবার যে রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই নার্সিংহোমেও আর একটি ক্রাইম ঘটে গেলো। প্রথম দুবার পরিস্থিতি এমনই জটিল ছিলো যে, পুলিশের পক্ষে সমস্ত প্রমাণ খুঁজে বার করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু ভাগ্য প্রতিবারই সুপ্রসন্ন থাকে না। তৃতীয়বার মরীয়া হয়ে অনেকখানি ঝুঁকি নেওয়ার দরুণ এই উপন্যাসের নায়ক চালে বেশ কিছু ভুল করে ফেললেন। আমাদের মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠছিলো কিছুদিন ধরে, এবারে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না।'

'কাকে আপনারা সন্দেহ করছেন—?' সত্যজিৎ সামন্ত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

'যদি বলি আপনাকেই—' রামদুলাল দত্ত হঠাৎ গম্ভীর সুরে বলে উঠলেন।

'তা হলে বুঝব আপনারা মিছিমিছি নিজেদের ব্যর্থতা ঢেকে রাখার চেষ্টায় আমাদের সময় নষ্ট করছেন। ডাঃ বসাক, আই ওয়াণ্ট অ্যান এক্সপ্লানেশন—'

'সার্টেনলি'—কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন ডাঃ বসাক—'সব কিছু এক্সপ্লেন করব বলেই তো আজ আপনাদের ডেকেছি। মার্ডার কেসে মোটিভের কথাই সব চেয়ে আগে আমাদের দেখতে হয়। আপনার ক্ষেত্রে মোটিভের সম্পূর্ণ অভাব বলেই হয়তো আপনার উপর আমার নজর পড়ে। পুলিশেরও। নিজের গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা সকলেই করে মিঃ সামন্ত, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু একদিন না একদিন সত্যি কথাটা বেরিয়ে পড়বেই।

'আচ্ছা, আপনার কেসটা গোড়া থেকেই আলোচনা করা যাক। সমরেশ সরকার আপনাকে গার্জিয়ান হিসেবে দেখতো ও আপনার পরামর্শ না নিয়ে কোন কাজে হাত দিতো না। ব্যবসায়ে যত টাকা ঢেলেছে, সবই আপনার কথায়। যখন প্রথম ওকে আমার পেশেণ্ট হিসেবে দেখি, আমার স্পষ্ট ধারণা হয়েছিল, কেউ ওর মাথায় কতকগুলো উদ্ভট কল্পনা জাগিয়ে তুলেছে। এমন কেউ, যার কথার ওপরে ভদ্রলোকের অগাধ বিশ্বাস। স্লো-পয়জনিং করা হচ্ছে—এই কথাও সেদিন ও বার বার তুলেছিলো। মিঃ সামন্ত, আপনিই কি এসব গালগল্প

বানিয়ে বানিয়ে সেদিন সমরেশ সরকারকে বলেছিলেন?'

'কি বলছেন আপনি ডাঃ বসাক?' সত্যজিৎ সামন্তের মুখ লাল হয়ে উঠল—'আই অবজেক্ট টু ইট্।'

'আমার কিন্তু মনে হয় আপনিই এই অসুখী পরিবারের বিচ্ছেদের ব্যবধান এমনি করেই তিলে তিলে বাড়িয়ে চলেছিলেন। এর মধ্যে সুনন্দ মিত্রের আমদানী হওয়াতে খুব সুবিধা হোল। তবে ঘটনাচক্রে সে যখন সরে পড়ার প্ল্যান করছে, আর মাধবী সরকারও বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে তার টাকাকড়ি নিয়ে কনভেন্টে চলে যাবে ভেবেছে, আপনি আর দেরি না করে পার্টির দিন সুযোগ বুঝে বিষ মিশিয়ে দিলেন। আমরা সেদিন কেউ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি নি এতে আপনার কোনরকম হাত আছে। এরপর সমরেশবাবুর পালা। সমরেশবাবু পুরোন উইল বদলাতে চাইছেন দেখে আপনি আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'তারপর ওর গ্লাসেও বিষ দিলাম। সেটা খেলো সুনন্দ। কি সহজ সরল উত্তর। কিন্তু কেন?'

'কেনর উত্তর পরে দিচ্ছি—' ডাঃ বসাক হঠাৎ পরিহাস-চপল হাল্কা কণ্ঠস্বর পাল্টে গম্ভীর হয়ে গেলেন—'আগে বলি কি করে তৃতীয় হত্যাকাণ্ড ঘটল। দু'দুটো মানুষ প্রাণ হারিয়েছে—এবারে তৃতীয় আর একজন যাতে এভাবে আপনার বলি না হয়, তাই সমরেশবাবুকে আমি সরিয়ে ফেললাম, নার্সিংহোমে কড়া পাহারার নমুনা দেখে আপনি লতিকা দত্তকে লোভ দেখালেন। অভাবের তাড়নায় ছিন্ন ভিন্ন একটি পরিবারের ফুটো নৌকোর হাল ধরে বেচারী কোনগতিকে দিন কাটায়। পাঁচ হাজার টাকার লোভ সে সামলাতে পারে নি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিবেক দংশনের জ্বালা যে মেয়েটিকে এতটা বিচলিত করে তুলবে, একথা আপনি ভাবতে পারেন নি মিঃ সামন্ত। হয়তো তা উপলব্ধি করা আপনার পক্ষে সম্ভবও ছিলো না, কারণ স্বার্থ আর লোভ ছাড়া আপনার হৃদয়ে অন্য কোন অনুভূতিই বোধ হয় নেই—।'

'ডাঃ বসাক—!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন সত্যজিৎ সামন্ত—'ঠাট্টারও একটা সীমা আছে। আপনি সেই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন এবারে।'

'আমি এখন সম্পূর্ণ সিরিয়াস মিঃ সামন্ত। সেদিন আপনিই লতিকা দত্তকে ওভাবে নিষ্ঠুর উপায়ে মার্ডার করেছিলেন। লতিকার কাছে যাতে কোন প্রমাণ না থাকে, আপনি সে বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ সে সম্ভবতঃ আপনার কাছ থেকেই পায়। কিন্তু পোড়া কাগজের একটি অংশ ভাগ্যক্রমে আমার হাতে পড়ে। একটি বাক্যের ভগাংশ, মাত্র তিনটি শব্দ। —রাত বারটার পরে—। আমি আপনাকে সেদিন একটি বাংলা চিঠি জোর করে লিখিয়েছিলাম—মনে আছে? তাতে 'রাত' নয়, দুপুর বারটার পরে' এই শব্দ কটি ছিল। দুপুর বারটার পরে ডাঃ বসাকের চেম্বারে এলে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রাপ্য টাকাটা ভদ্রমহিলাকে দেওয়া হবে। তিনজন হ্যাণ্ডরাইটিং স্পেশালিস্টকে দেখানো হয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন দুটি হস্তাক্ষর একই লোকের লেখা।'

'কিন্তু কেন?' হাজারটা প্রশ্ন একসঙ্গে উচ্চারিত হোল সকলের চোখে মুখে।

'সত্যজিৎ সামন্ত, আমি আপনাকে এই তিনটি হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করে ওয়ারেণ্ট ইস্যু করেছি—' রামদুলাল দত্ত এবারে এগিয়ে এলেন সামনে।

'আমি কেন একাজ করব?' টেনে টেনে হাসলেন সত্যজিৎ সামন্ত—'বিনা কারণে এতখানি ঝুঁকি নিয়ে আমার লাভ কি?'

'লাভ-লোকসানের কথাটাও তলিয়ে দেখেছি মিঃ সামন্ত—ডাঃ বসাক সোজা চোখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন—'আপনিই সমরেশ সরকারের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র ট্রাস্টি। কতকগুলো মনগড়া কোম্পানীর নামে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আপনিই করেছেন। তা ছাড়া সমরেশবাবুর সম্পত্তির ওয়ারিশ যখন কেউ নেই, তখন দাবি জানাতে অথবা হিসেব-নিকেশ চাইতে কেউই কোনদিন আসবে না। আপনি ধীরে সুস্থে লোকের চোখে ধুলো দিয়ে একটু একটু করে সব কিছুই নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসবেন। সমরেশবাবু, এবারে আপনাকে কতকগুলো প্রশ্ন করব, ঠিক মতো জবাব দিন।'

সমরেশ সরকারের মুখ সাদা হয়ে গেছে, উত্তেজনায় সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

'আপনার স্ত্রী যে আপনাকে বিষ খাওয়াচ্ছেন—সেকথা কার কাছ থেকে শুনেছিলেন?'

'শুনি নি—আমি, মানে —আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তারপর কাকাবাবুও বললেন স্লো-পয়জনিং-এর কেস হলে যে ধরণের উপসর্গ দেখা দেয়—সবই আমার শরীরে দেখা দিয়েছে।'

'বুঝেছি—উইলে যে সব ছোটখাট কোম্পানীকে আপনি দশ-বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিগত জানাশুনো ছিলো—?'

'না থাকলেও কিছু এসে যায় না। আমি চিরকাল কাকাবাবুর কথা মতই কাজ করেছি। আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন ডাঃ বসাক। আমার মনে হয় না কাকাবাবুর এ ব্যাপারে কোন হাত আছে।'

'তুমিই বল সমরেশ—'হঠাৎ সত্যজিৎ সামন্ত উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে—'এখানে তামাসা দেখার জন্য আমরা আসি নি। আমাদের নিজেদের কাজকর্ম যথেষ্ট আছে।'

'এতক্ষণই যদি কষ্ট করলেন মিঃ সামন্ত—আর কয়েক মিনিট

অপেক্ষা করুন। মিস সুরমা বিশ্বাস সিঁড়িতে অন্ধকারে আপনি সেদিন যাকে দুবার দেখেছিলেন, এই কি সেই ভদ্রলোক? ভালো করে তাকিয়ে দেখুন।'

'এতো আলোয় বুঝতে পারছি না—' সুরমা বিশ্বাস জড়োসড়ো গলায় বলল।

বড় আলোটা সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিলেন ডাঃ বসাক। ছায়া ছায়া অন্ধকার, সকলের অস্বস্তিজনক নড়াচড়ার শব্দ।

মুখোমুখি তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে সুরমা বিশ্বাস বলল—'আমার মনে হচ্ছে,—হ্যাঁ, ইনিই—নিজেকে সেদিন ডাঃ বসাক বলেছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকার সময় সামনের দিকে একটু-খানি ঝুঁকে পড়ার ভঙ্গী আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

আলো জলে ওঠা মাত্র সত্যজিৎ সামন্ত হঠাৎ পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ে বিস্ময়ে হতচকিত মেয়েটির গলা দুহাত দিয়ে সজোরে টিপে ধরলেন। কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়ে গিয়েছিলো, তার মধ্যেই সুরমা বিশ্বাসের মুখ নীল হয়ে উঠল। রামদুলাল দত্ত ও ডাঃ বসাক সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে না পড়লে কি হোত বলা যায় না। দুদিক থেকে দুজন ইনস্পেক্টার যখন সত্যজিৎ সামন্তর হাত দুটো চেপে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল, ভদ্রলোক তখন পাগলের মত চিৎকার করছেন।

'আমি কিছু জানি না। সব মিথ্যা কথা। আসলে ঐ ডাক্তারটাই দায়ী। গোড়া থেকে ওই লোকটিই সব চক্রান্ত করছে।'

এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলে নি। ঘর নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পরও কেউ কিছু বলল না। অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটনার মোড় ঘুরে যাওয়ার ফলে ওরা সকলেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যা কিছু জানবার, সবই জানা হয়ে গেল, তবুও যেন অনেক কিছু অসমাপ্ত বলে মনে হচ্ছে। যেন আরও কিছু যোগ না দিলে অনেক অংশ ফাঁকি পড়ে যাবে।

'তারপর?' সুরমা বিশ্বাসকে ব্র্যাণ্ডি সহযোগে গরম দুধ খাইয়ে ড্রাইভারকে একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিয়ে ডাঃ বসাক প্রশ্ন করলেন।

'তারপর কি?' মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সকলে।

'আপনারা কে কি করবেন এর পরে?'

'অর্থাৎ' কমলেশ বসু ডাঃ বসাকের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দেখে অস্বস্তিভরা গলায় বললেন।

'জীবনকে উঁচু নীচু বলে মেনে নিয়েছি সকলে তবুও এগিয়ে যেতেই হবে। সময় কারো জন্যে অপেক্ষা করে না?'

হঠাৎ দার্শনিক তথ্য আলোচনা সুরু করলেন ডাঃ বসাক—'কমলেশবাবু, সময়কে অবহেলা করে বয়ে যেতে দিলে শেষ পর্যন্ত আপশোষ ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না।'

'সেকথাটা আপনি ঐ ভদ্রলোককে বুঝিয়ে বলুন'—বসন্ত মল্লিকের স্ত্রী আঙুল দিয়ে স্বামীকে দেখিয়ে দিলেন—'সারা জীবনই আমি জলে পুড়ে মরছি। তবু ভালো আপনি ছিলেন নয়তো ওকে তিন-তিনটে খুনের দায়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হোত।'

'আমি তো মানে—'থেমে থেমে কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করলেন বসন্ত মল্লিক।

'ঢের হয়েছে এবারে থামো।' জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মিসেস বসন্ত মল্লিক। তাঁর অপ্রসন্ন ভ্রূযুগল ধনুকের মতো বেঁকে উঠল।

'আপনার কথার তাৎপর্য বুঝেছি ডাঃ বসাক'—'অপর্ণা লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে হাসলেন কমলেশ বসু—'আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, কিন্তু মানুষ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বা স্রষ্টা নয়। কাজেই তারপরে কি হবে বলতে পারি না।'

অপর্ণা লাহিড়ীর চোখের দৃষ্টি তখনও যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বিভ্রান্তির কুয়াশায়। সমরেশকে কথা বলতে দেখে হঠাৎ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল সে।

'আমার এখন কি হবে ডাঃ বসাক?'

'আপনি তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন সমরেশবাবু। অতীতকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করুন।'

'কি করে ভুলব? ভোলা কি যায়।'

'ভুলতে না পারলে মানুষ বেঁচে থাকতো কি করে?'

'কিন্তু কাকাবাবু! আমি যে এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'সুরমা বিশ্বাস ব'লে ঐ নার্সটিকে আমি শিখিয়ে দিয়েছিলাম সমরেশবাবু, ঘর অন্ধকার হলেই ও বলবে উনিই সেই রাত্রিতে দেখা অজ্ঞাতনামা মানুষটি। যদি সত্যজিৎ সামন্তর মনে পাপবোধ লুকিয়ে না থাকতো তাহলে ঐ কথাটা শোনামাত্র উনি অত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন না। তা ছাড়া হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টের কথা আগেই বলেছি। আপনার সম্পত্তি কোনরকমে হস্তগত করাই ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য ছিল। সে জন্য দু' দুটো মার্ডার করার প্ল্যান উনি অনেকদিন ধরেই করছেন।'

'আমার নিজেকে ভয়ানক একা লাগছে ডাঃ বসাক'—অসহায় চোখ দুটো মেলে সমরেশ করুণ সুরে বলল।

ডাঃ বসাক অনিল বিশ্বাসকে ইসারায় কাছে ডেকে নিয়ে বললেন,—'এয়ার প্যাসেজ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। দুটো টিকেট। এই ছেলেটিকে সঙ্গে করে আপনি গোটা পৃথিবী ভ্রমণ করে আসুন। নতুন মানুষের সঙ্গে চেনা পরিচয় হলে এই নিঃসঙ্গতার মেঘ কেটে যাবেই। পৃথিবীটা প্রকাণ্ড জায়গা। জীবনকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা অর্থহীন। আর মানুষ এত সহজে সব কিছু ভুলে যেতে পারে বলেই আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি আপনার কোন ভয় নেই।'

কি যাদু ছিল ডাঃ বসাকের কথায় সমরেশ সরকারের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে আশ্বস্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা গেলো। ঘর ছেড়ে সবাই এসে দাঁড়ালো বাইরে।

নাটকের শেষ। যারা অংশ নিয়েছে, তাদেরও এবারে ঘরে ফেরার পালা। রাত্রির অন্ধকার ফিকে করে চারদিকের ঝাড়লণ্ঠনগুলো ঝলমল করে জলতে লাগলো।

(সমাপ্ত)

কান্নার ট্রেন

সব অন্ধ হয়ে গেছে - - -
সব অন্ধ হয়ে গেছে -

রক্তিত রায়চৌধুরী

'সে বেটা কোথায় ?'

'কে, মজিদ ?'

'হাঁ, বাবা হাঁ। বেটা এখনো বেঁচে আছে তো ?'

'বাঁচবে না কেন ?'

'জানিস না কিছু ?'

'কি ?'

'আরে এ হারামজাদা তো জ্বালালে দেখছি! দাঙ্গা হচ্ছে যে সে খবর র'খিস ?'

না তো।' খবর যে শুধু রাখেই ই নয়, খুব করে ভেবেও মদনা ার মানে বুঝে উঠতে পারলো না। তং বুড়োর শুধোবার রকম দেখে এ। বুঝলো সে, কোনো একটা খারাপ ব্যাপার আছে শব্দটার মধ্যে।

টাকা আর খুচরোগুলো বেশ তাড়াতাড়ি করে মদনার হাতে তুলে দিয়ে বুড়ো আড়ৎদার বললো, 'আগের পয়সাও মিটিয়ে দিলাম, বুঝলি ?'

হ নাসমত গুণতে যাচ্ছিল মদনা, বুড়ো ধমকে তাড়াতাড়ি সব পকেটে পুরে ফেললো।

'পরে গুণিস। আগে কাট বেটা।'

'মজিদের কথা শুধোচ্ছিলে যে।'

অন্যায় করেছি বোধ হয়। সে বেটা এদিক-ওদিক যেন একটু কম ঘোরাঘুরি করে। বলে দিস।'

'ঘুরবে কিগো, পায়ে জখম না ওর ?'

'জখম। বাঁচা গেল। তা হলে বেটার মরার ভয় নেই আপাতত। শোন, তুইও কদিন এ-মুখো হোস নে। কখন কি হয় বলা যায় না। 'যা গোলমাল।'

'কিসের গোলমাল ?'

খালি বস্তাটা ভাঁজ করে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার আগে কথাটা জানবার জন্যে সামান্য সময়ের জন্য ঘুরে দাঁড়ালো মদনা। ব্যাপারটা তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

'কি আবার, সব শালা অন্ধ হয়ে গেছে। কোনো শালার চোখ নেই। যা পালা। খুব সাবধানে থাকবি দুজনে।' বলতে বলতে আড়ৎ ছেড়ে একটু পথ এগিয়ে এলো বুড়ো, অনেকটা যেন মদনাকে এগিয়ে দিল।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে বেশ জোর পায় হাঁটতে সুরু করল মদনা। চলতে চলতে কিছুদূর গিয়ে ফিরে দেখলো একবারটির জন্য। বুড়ো হাত দিয়ে ইসারা করে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলছে ওকে।

এর আগে কোনোদিন এমন করে নি বুড়ো। তার জন্যেও সমস্ত ব্যাপারটা ওর কাছে আরো দুর্বোধ্য বলে মনে হলো যেন।

আজই প্রথম মাল নিয়ে কোন রকম দামদস্তর করে নি বুড়ো। হাড়গুলো বেছে পর্যন্ত দিতে বলে নি ওকে।

হাড় ওজন করা হলে চুপচাপ পয়সাও দিয়ে দিল।

অন্যদিন হলে কি খিচ্‌খিচ্‌ই না করতো।

টাকাগুলো অন্যদিন হলে হাতে পাওয়া মাত্রই মজিদের সাথে ঝগড়া করে হলেও পুরো এক প্যাকেট সিগ্রেট কিনে ফেলতো ঠিক।

আজ আর তা করলো না মদনা।

খালের পাড় ধরে হাঁটতে সুরু করলো ও বেশ জোর পায়ে।

মজিদটার পায়ে যে কি হয়েছে। কতদিন হয়ে গেল তবু সারছেই না। আজকের টাকা হাতে এলে ওরা ঠিক

করেছিল কাল-পরশু কাজে না বের হয়ে দুই দোস্ত মিলে হাসপাতালে যাবে। খাঁ'টা ভালো করে দেখাবে সেখানে।

কিন্তু এখন যে গোলমাল।

ক'দিন নিশ্চয় আর হাসপাতাল মুখো হওয়া ঠিক হবে না।

অন্তত বুড়ো তো তেমনিই বললো। অনেক খবর রাখে বুড়ো, খাস শহরের মানুষ। বার বার মজিদের কথাই শুধোলো। নিশ্চয় একটা কিছু গোলমাল আছে।

মজিদের কথাটা ভাবতে গিয়ে, মনটা একেবারে দমে গেল মদনার।

সেই কখন সে এসেছে।

ট্রেনে মাল নিয়ে আসবার উপায় নেই। ওদের ওখানকার রিক্সাওয়ালা জগুকে বলে কয়ে খানিকটা এনেছে, তারপর এতখানি পথ হাঁটা। মাঝখানে দু-দুটো রেল স্টেশন চলে গেছে। ফিরতে ফিরতে আরো কিছু সময় যাবে।

সন্ধ্যা হয়ে না এলে মদনা হেঁটেই চলে যেত। আজকাল ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন হয়েছে। দিনের বেলা যা-ও লাইন ধরে দেখে শুনে চলা যায়, রাতে ভরসা হয় না। হরদম তো কাটা পড়ছে লোক লাইন ধরে যেতে গিয়ে। তাই ট্রেনে ফিরবে সে।

মজিদ গাড়োলটা যা, হয়তো এর মধ্যে ডেরা ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে। শালা দু'মিনিট'ও চুপ থাকে না। যদি সত্যি সত্যি বের হয়ে থাকে। আর যদি ওর কোন বিপদ---।

না, যে ট্রেনটা আগে পাবে সেটাতেই যাবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে হবে। ওকে বিশ্বাস নেই।

হাঁটতে হাঁটতে রেলপুলটা পার হয় ও।

গোলমাল যে চলছে তা বোঝবার উপায় নেই। অন্তত মদনা তা বুঝতে পারবে না ঠিক। অন্যদিনের মতই সব কিছু।

এ কি ধরণের গোলমাল?

বুড়ো সব কথা খুলে বললো না।

শুধু বললো, 'সব শালা অন্ধ হয়ে গেছে।'

অন্ধ! তার মানে চোখ নেই!

চোখ নেই মনে হতেই মদনার হাড় কুড়োনোর ময়দানটার কথা মনে পড়ে গেল। ওখানেই সে জানে, কোন কিছুর চোখ থাকে না। থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত সব কিছুর চোখ নিয়ে যায় রাণী এসে।

রোদ উঠতে না উঠতেই সে আর মজিদ গিয়ে রেললাইনের উঁচু পাড়ে বসে বসে অপেক্ষা করে।

এক একটা করে শকুন নেমে আসতে থাকে ময়দানে।

কোথা থেকে যে আসে কে জানে। একটার পর একটা, আসছে তো আসছেই। শকুনে শকুনে ভিড় হয়ে যায় ময়দানের কোণটা। যে কোণে, একটা ফট্ ফট্ ফট্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসা গাড়ি প্রতিদিনই মরা গরু, ঘোড়া, গাধা বা অন্য কিছু ফেলে রেখে যায়।

ভোর না হতেই ময়দানের বাসিন্দা পাগলাটে কুকুরগুলো মড়াগুলোকে ছিঁড়তে সুরু করে। কিন্তু বেশিক্ষণ পারে না তা করতে।

কারণ শকুনগুলো আসতে সুরু করে রোদ উঠতে না উঠতে। শকুন নামতে সুরু করলে কুকুরগুলো লেজ গুটিয়ে, বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে, অপেক্ষা করতে থাকে মদনাদের মতই।

বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে মজিদ বলে হয়তো---'আমরাও কুকুর, না রে মদনা?'

নিজেকে কুকুর ভাবতে খারাপ লাগে ওর।

মদনা তাই খিস্তি কাটে।

ওর খিস্তি গায়ে না মেখে হয়তো বলে মজিদ---'কুকুর নয়তো কি বল?'

'মানুষ।'

নিজেকে মানুষ বলতে ভারি ভালো লাগে ওর।

'মানুষ কি হাড় কুড়োয়, হাড় বিক্রি করে?' চটে যায় মজিদ।

'বিক্রি করেই তো।'

'তোকে বলেছে।'

'না বিক্রি করলে, আড়ৎদার আড়ৎ খুলতো?'

শেষ পর্যন্ত মদনার যুক্তির কাছে হার মানতে হয় মজিদকে।

রেলপুলের ওপর দিয়ে একটা ট্রেন এইমাত্র ঝম্‌ঝম্ শব্দ করতে করতে চলে গেল।

অন্য সময় হলে ফিরে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা দেখতো সে। ঝম্‌ঝম্ শব্দটা শুনতো।

পুলের ওপর দিয়ে ট্রেন গেলে ওর খুব ভালো লাগে।

আজ তা বলে দাঁড়ালো না মদনা।

স্টেশনে যাওয়া দরকার। ট্রেনটা ধরতে হবে।

বসে বসে বসে বসে ওদের দুজনার পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে যায় রোজ।

মাথার ওপর রোদ উঠে পড়ে চড়চড় করে।

তবু বসে থাকে ওরা।

ঐ শকুনগুলোর মতই। ঐ কুকুরগুলোর মতই।

রাণী আসবার জন্য বসে থাকে।

সবার পরে আসে শকুনদের রাণী।

এলেই অন্যগুলো সব সরে যায় দূরে দূরে। রাণীকে সমস্ত মড়াটা খা মড়াগুলো দেখতে দেয়। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে চোখগুলো খাওয়া শেষ করে হঠাৎ উড়ে ফিরে যায় শকুনদের রাণী।

আর রাণী চলে যেতেই সুরু হয় অন্যগুলোর হুড়োহুড়ি।

সব কটা শকুন একেবারে ছেঁকে ধরে মড়াটা বা মড়াগুলোকে।

তখন দূর থেকে হাড়কুড়োনোর ময়দানে কেবল শকুন আর শকুন ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়ে না।

'সব শালা অন্ধ হয়ে গেছে।'

বুড়োর কথাটা আবারও ভাবলো মদনা।

তা হলে যাদের কথা বলছে বুড়ো তাদের চোখগুলোও কোন রাণীতে খেয়ে গেছে!

তা হলে ওদেরও রাণী আছে।

শকুনদের রাণী চেনে মদনা।

আর মানুষের রাণী সে ও মজিদ দুজনায় মিলে দেখেছে, একবার মাত্র, কয়েক মুহূর্তের জন্য।

খালপারে গিয়ে দেখে আড়ৎ বন্ধ।

আশপাশকার দোকানপাটেরও সেই অবস্থা। সবাই, অনেক সব লোক দূরের বড় রাস্তাটার দিকে চলেছে।

বস্তা দুটো আড়তের সামনে নামিয়ে রেখে মদনা আর মজিদও বড় রাস্তার দিকে গিয়েছিল।

কারণ যারাই যাচ্ছিল, তারাই বলছিল 'রাণী আসবে।'

তাই তারা দুজনে রাণী দেখতে গিয়েছিল।

রাণী যে শুধু শকুনেরই থাকে না, মানুষেরও থাকে, একথা আগে জানতো না ওরা।

অবাক তাই হয়েছিল ওরা।

বড় রাস্তায় পেঁাছে দেখে—ভিড় আর ভিড়।

রোদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকেই রাণী আসবার পথ দেখছিল সেখানে। হঠাৎ এক সময় চারদিক থেকে সুরু হলো হাততালি। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। মদনা আর মজিদও দিয়েছিল অন্যদের দেখাদেখি।

সেকি হল্লা মানুষগুলোর।

একটা ঢাকনা-ছাড়া গাড়িতে একখানা হাত দোলাতে দোলাতে তাদের সামনে দিয়ে যে চলে গিয়েছিল সেদিন, সে নাকি এক রাণী। রাণীর একখানা হাত ওভাবে দুলছিল কেন, মাথায় অমন একটা টুপিই বা ছিল কেন, আর কোথাকারই বা সে রাণী কিছুই তার না জানতো মদনা, না জানতো মজিদ।

বুড়ো আড়ৎদারের সাথে দেখা হতে শুধিয়েছিল ওরা দুজনে।

'কোথাকার রাণী গো?'

'সাহেবদের দেশের।'

'সাহেবদের দেশ কোথায়?'

'সগ্যে'। বেশ রাগ-মাখানো গলায় বলেছিল বুড়ো। সাহেবদের দেশ কোথায়, আর সেখানকার রাণীই বা কেন ওভাবে হাত দোলাতে দোলাতে যায়, এসবের কিছুই ওদের মাথায় ঢুকলো না বিশেষ।

বুড়োকে আর না ঘাঁটিয়ে পয়সা গুণে নিয়ে ওরা নিজেদের ডেরার দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

শকুনগুলোর মাংস ছেঁড়া শেষ হলে, পাগলাটে কুকুরের দলটা মড়াগুলোকে নিয়ে পড়ে। কুকুরগুলোর জন্যে ওদের মায়া হয় না বিশেষ। তা ছাড়া শকুনকে যেমন ভয়, কুকুরকে তেমন ভয় করে না ওরা। লাঠি নিয়ে ও আর মজিদ কুকুর তাড়ানো সুরু করে একসময়।

মাংস লেগে থাকা হাড়গুলো

ADSEN/KING--12

থেকে মাংস ছাড়িয়ে ভাত করে বস্তা। এমনি করে দু-তিনদিনের মাথায় ওদের বস্তা ভর্তি হয়ে যায়।

ভর্তি বস্তা নিয়ে খানিকটা রিক্সায়, খানিকটা হেঁটে যেতে হয় আড়ৎ পর্যন্ত।

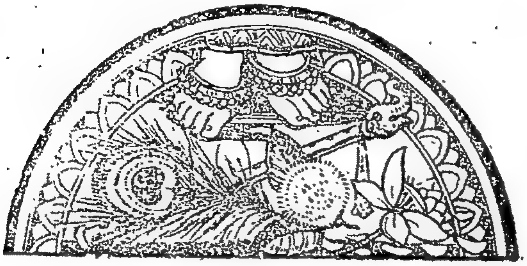

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী

প্রেমের অলকনন্দা

জ্ঞানের আকাশগঙ্গা

বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই

চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ

মূল্য পনর টাকা

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতার অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ

আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ

আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মাল বিক্রির পয়সা দিয়ে কেনা-কাটা সারে।

যেখানেই মানুষের ভিড়, সেখানেই ওদের যাওয়া-আসা কম। রেললাইন, হাড়কুড়োনোর ময়দান, আড়ৎ, খালপুল আর নিজেদের ডেরা—এরি মধ্যে ওদের চলাফেরা।

তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হলে ট্রেনে চেপে শহরেও যায় ওরা। রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করে।

বিস্তর খায়। তার চাইতে বেশি অবাক হয়ে চারদিক দেখে। আবার ফিরে আসে।

তা হলে কি ঐ সাহেবদের রাণীতেই লোকগুলোর চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। ঐ মেয়েটা? এবারে তা হলে অন্য শকুনেরা মাংস ছিঁড়তে সুরু করবে সবার।

তারপর জুটবে কুকুর।

তারপর হাড় কুড়োতে আসবে কেউ?

অন্তত মদনা এ সবই ভাবতে পারলো। কারণ বুড়ো আড়ৎদারের কথাটা তার মনে পড়ে গেল

'সব শালা অন্ধ হয়ে গেছে।'

চোখ না থাকলে অন্ধ হয়। রাণীতে চোখ নিয়ে যায়, সে এই সবই জানে।

মজিদের জন্য বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে। ওর কিছু হলে---।

কবে কি ভাবে যে দুজনে দুজনার দোস্ত হয়ে গেছে খেয়াল নেই মদনার। তবে অনেকদিন হলো তারা একসাথে আছে। অনেকদিনের তাদের দোস্তি।

শীতের রাতে যখন হাড়কাঁপানো বাতাসে ডেরার অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে কাঁপতে থাকে তখন দুজনে দুজনকে জড়িয়ে হাড়বোঝাই করবার কোনো বস্তায় সমস্ত শরীর ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোতে পারে। এর বোঝা বড় হলে ও বয়ে দেয়। মাল কুড়োতে না পারলেও সব পয়সায় দুজনার সমান ভাগ।

আড়ৎদার বুড়ো ডাকে ওদের 'রামলক্ষ্মণ' বলে।

রাম বা লক্ষ্মণ যে কে তার কিছুই

সুজন সমীপে

দুর্গাদাস সরকার

সুজন, তোমার লেখা বহুদিন পাইনিক চিঠি।
এদিকে হয়েছে পরশু ঝড়। ছিল কাল হরতাল।
চাল-ডাল-নুন-তেল-মাছ সবই দুর্লভ। আকাল
তবু যায় কি বলা একে? অন্তরালে চলেছে চ্যারিটি।
লণ্ডন ফেরৎ তুমি। আমি এম-এ; বৌ বি-এ, বি-টি।
চাকুরিদাতার কাছে দোঁহে যাচ্ছি সকাল-বিকাল।
তুমি কি বুঝবে দশা আমাদের? হা পোড়া কপাল!
ঘরে না জায়গা পেয়ে ছেলেগুলি রকে দিচ্ছে সিটি।

জানি না, তোমার চোখে এসব পড়লেও, দোষ-ত্রুটি
কা'র মনে হয়? ডাক্তার, তোমার ফি বাড়িয়েছ ত'
এই আক্রার বাজারে? বর্তমানে বত্রিশ না কত?
মনে পড়ছে—সেই দিন, এক সঙ্গে পড়া। মোটামুটি
ছিলাম ভালই। তুমি অঙ্কে ষাট, আমি একশত।
আজ পেটে বড় ব্যথা। ছোট্ট পত্রে আপাতত ছুটি।

আহত পাখির নামে

সামসুল হক

পাঁচটি যুবক স্নিগ্ধ স্বর্ণপ্রভা বৃক্ষের মতন:
সবুজ সুহৃদ-পুষ্প সম্মিলিতভাবে ক্রমাগত
অনুপম আন্দোলিত। পাঁচজনে একটি গগন
নিঃশঙ্ক রচনা ক'রে নাম দিলো চির প্রিয়ব্রত।

কোন দেবদত্ত এসে শ্বেতাচিত পাখিকে আহত
ক'রে দিলো, এখন পালক তার প'ড়ে ইতস্তত।

অথচ আবার ঠিক সেই বৃক্ষ, প্রশান্ত গগন:
পরস্পর মুখরিত অনিকেত পাঁচটি যুবক,
এখনো জানে না তারা শতাব্দীর বিষণ্ন কুহক—
চিতায় উঠবে কাল পাঁচজন যুবকের মন।।

তারা জানে না। তবে বুড়োর ডাক শুনে দুজনাই বেজায় খুশি হয়।

অনেকদিন পরে আজ আবার টিকিট কাটলো মদনা।

সেই সেদিন থেকে ওরা ট্রেনে যাওয়া-আসা করলেও টিকিট করে না, যেদিন দুজনে দু'খানা হাফ টিকিট চাইতে টিকিটবাবু কিছুতেই তা দেয় নি। বলেছে একটা পুরো টিকিটেই নাকি হবে। হবে কি হবে জানে না, তারা দু'খানা টিকিট না পাওয়ায় খিস্তি কেটেছিল মনে মনে। তারপর বহুদিন সেই রাগে টিকিটই করে নি।

আজ আবার করলো মদনা। একখানা হাফ।

না-হয় চেকার উঠে ধরলে, ডেরায় পৌঁছতে দেরি হবে। হয়তো ধরেই নিয়ে যাবে। না, দেরি করা চলবে না এখন। মজিদটা একা।

গাড়িটা দাঁড়িয়েই ছিল।

তাড়াতাড়ি তার একটা কামরায় উঠে পড়ে, কোণ দেখে বসে পড়ল মদনা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাশের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা খালি গাড়িটা দেখতে দেখতে বার বার মনে মনে বললো, মজিদের যেন কিছু না হয়। তার দোস্ত যেন ভালো থাকে।

একে একে লোক উঠতে সুরু করলো একটু বাদেই।

সবাই কি নিয়ে যেন বেশ গরম সুরে কথা বলছে।

'দাঙ্গা' শব্দটা এখানেও বহুবার শুনতে পেল মদনা।

শব্দটা শুনে পর্যন্ত তার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ঢিপ ঢিপ সুরু হলো।

গাড়িটা ছাড়লেই হয়।

একটামাত্র ভাবনা মদনার—কতক্ষণে পৌঁছবে সে।

বুড়ো আড়ৎদারের কথাটা মনে পড়ল:

'শালারা সব অন্ধ হয়ে গেছে।'

অন্ধ মানে তো চোখ নেই। চোখ তো রাণীতে নিয়ে যায়। কোন্ রাণীতে চোখ নিল? সেই-----?

জানে না সে।

গাড়িটা ছাড়লো এক সময়।

আর গাড়ি চলতে সুরু করতেই মদনার খেয়াল হলো গাড়িটা কোথায় যাবে তাই জানা হয় নি।

এখন আর জেনে আসার পর্যন্ত উপায় নেই।

স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে এসেছে গাড়িটা খানিকটা পথ। বেশ খানিকটা ব্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটা লোককে জিজ্ঞেসই করলো ও।

'এটা শান্তিপুর তো?'

'না না।'

'তবে?'

'শান্তিপুর ছিল-----'

আশপাশকার অনেকেই কেমন যেন মুখ কালো করে বলে উঠলো, 'বনগাঁ হয়েছে।'

শহুর কলকাতা ✻ শ্রীপাদাতিক

॥ শরতে মহানগরের মানস-চিত্র ॥

শহুর-কলকাতার অঞ্চল-বিশেষের নিয়মিত আলেখ্য আজ নয়, বিনিময়ে তার সার্বিক অন্তর্দেশে শরতের আবির্ভাব কী-বেশে, আজ কেবল তারই খানিকটা সম্ভাব্য চিত্রের নৈবেদ্যদান আমার লক্ষ্য। জানি না, আমার প্রতি প্রীতি ও অনুকম্পার অশেষ দাক্ষিণ্যে যাঁরা অকৃত্রিম—এ-নিবন্ধ সেই সমৃদ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের বিরক্তির ইন্ধন জোগাবে কতখানি। তবে দ্বিধাহীন প্রত্যয় আমার আছে: বিরক্তির মাত্রা তাঁদের সহন-শীলতার অন্তিম সোপান অতিক্রম করলেও, তাঁদের অকৃপণ ক্ষমার যৎকিঞ্চিৎ লাভের অযোগ্য আমি নই। অতএব আজ সেই সাহসেই বর্তমান অনিশ্চিতগতি নিবন্ধের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি—যদিও সে-মূর্তিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়তো অসম্ভব।

ভাদ্রের উষ্ণ সেতুপথেই শিথিল পদসঞ্চারে আবির্ভাব ঘটে আশ্বিনের। আকাশ তার ঘননীল। নীল দিগন্তে অব্যক্ত বার্তা ছুটির, মুক্তির এবং সবকিছু চাওয়ার উর্ধ্বেও কী-যেন এক চাওয়ার। এ-আকাশ সমগ্র মহানগরের খোলা চোখে আসন পাতে, মায়া বিছায় এবং একটু-একটু করে গান তুলে দেয় শহুরে হাওয়ার গলায়। সাড়া পড়ে শ্রমিক দলের শ্রমের কেন্দ্রে; কর্কশ কারখানার চুল্লিবাহী ধূম্রজাল এ-আকাশকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। নবীন উৎসাহের দোলা লাগে সর্বহারাদের বস্তি-অঞ্চলে; তার নিরন্ধ্র নোংরা পরিবেশের অবিচ্ছিন্ন খোলার চাল নীল দিগন্তকে আড়াল করতে পারে না। আলো-বাতাসের নির্মম বৈরাগ্যের যে-উপগলি—হঠাৎ প্রাণের চাঞ্চল্য জাগে সেখানেও; তার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অন্তহীন অভাবও শরতের এই ঘননীল দৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে পারে না। আর সৌধমালার শিখরে শিখরে যেমন চরণ রাখে, তেমনই তার অসংখ্য সৌখীন বাতায়নেও বার বার উঁকি মেরে যায় এই শাড়ি বদলানো আকাশ। তাই সমগ্র মহা-নগরের চির-চঞ্চল পাষাণ-মূর্তি হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এক নিঃসীম বিহ্বলতার উপান্তে।

তারপর? আগমনীর দূরাগত পদশব্দ শোনে তরুণের দল। দিকে দিকে তৎপর হয়ে ওঠে তারা; চাঁদার খাতা হাতে করাঘাত করে দ্বারে দ্বারে। দ্বার খুলে যায়। মোটা অঙ্কের সদম্ভ দানের বিনিময়ে তরুণদলকে আজ্ঞাবহ করার সুযোগ পান পাড়ার ধনকুবের। আর কেবল কর্তব্যবোধেই তাদের হাতে যৎসামান্য দান অর্পণ করেন অতি দরিদ্র প্রতিবেশী। মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন-মধ্যবিত্তদের অনটন-কণ্টকিত হাতও দরাজ হয়ে ওঠে সাধ্যানুসারে।

তবে নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন—যাঁরা আসন্ধ্যা-সকাল নির্বিরতি পরিশ্রমের বিনিময়েও নিয়মিত আহার জোটাতে পারেন না পরিবারের এবং দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেন দায়ে পড়ে। পাড়ার এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতদের শ্রবণেন্দ্রিয়েই কেবল আগমনীর বার্তা আসে নির্মম দুঃসংবাদের মতো। দুর্ধর্ষ তরুণদলের হাতে চাঁদার খাতা দেখলেই তাঁরা শঙ্কিত হয়ে ওঠেন যৎপরোনাস্তি। 'দেবো না' বলা বিপদের; 'দেবো' বলাও সাধ্যাতীত; আবার নাস্তির বিশাল শূন্যতায় তরুণদলের করুণার দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাও অত্যন্ত লজ্জার। তাই তখন বাধ্য হয়েই তাঁরা ফন্দী আঁটেন বিচিত্র। অর্থাৎ তরুণের দল চাঁদার খাতা হাতে তাঁদের সম্মুখবর্তী হলেই তাঁরা সাধারণত বলেন: এভাবে আর কতবার চাঁদা দেওয়া সম্ভব বলো! এখন পর্যন্ত প্রায় গোটা-সাতেক ক্লাব এসে আদায় করে নিয়ে গেছে অনেক। তা ছাড়া অফিস-ক্লাবেও দিতে হয়েছে বেশ মোটারকমের কিছু। এভাবে দিতে দিতেই তো এবার প্রায় ভিখিরী হওয়ার উপক্রম। এখন তো আর হাতে কিছু নেই। তবে দু' একদিন পরে একবার পারলে যেন আসা হয়, ভেবে দেখা যাবে। ইত্যাদি ইত্যাদি ----

পর পর চাঁদা প্রার্থীর যত দলই আসুক, সবার কাছে সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন তাঁরা। প্রতি দলকেই বলেন পরে একবার আসতে। কিন্তু এলেই যে চাঁদা পাবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁরা কেবল তখন ভেবে দেখবেন। সুতরাং এই ভেবে দেখার পরিণতি অনুধাবন করার অতো ধৈর্য নেই তরুণদলের। তারা আর ফিরে আসার প্রয়োজনবোধ করে না। তাই কারো খাতায় এক পয়সারও একটি সংখ্যা না বসিয়ে কেবল ফন্দীর জোরেই রেহাই পেয়ে যান এ-ধরণের কিছু হতভাগ্য।

অবশ্য জন-কয়েক এই মুষ্টিমেয় হতভাগ্যের কাছ থেকে চাঁদা না পেলেও, উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ অনায়াসেই সংগ্রহ করে তরুণের দল এবং তাদেরই সংঘবদ্ধ তৎপরতার ফলে এক পাড়ায় একাধিক পূজানুষ্ঠানের রোমাঞ্চকর দিনগুলিও ঘনিয়ে আসে বেশ সাড়ম্বর ছন্দেই।

আর সাড়ম্বর ছন্দেই রূপ বদলায় রাজপথের শ্রেণীবদ্ধ বিপণি এবং সমগ্র মহানগরের সংখ্যাতীত বাজার। প্রাচীন সাইনবোর্ডের সঙ্গেই সংযুক্তি ঘটে নতুন সাইনবোর্ডের—যেখানে দেহপণ্যা

টুলির নর্তকীচালে বিন্যাস ঘটে 'পূজা কনসেশন' শব্দের। এই কনসেশনের সুবিধে গ্রহণ করেও যে-বস্তুর যা মূল্য দিতে হয় ক্রেতাদের—তা পুজাপূর্ব সময়ের মূল্য অপেক্ষা প্রায় দেড়গুণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ। তবু সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর ক্রেতা অস্বাভাবিক মিছিলে দেহদান ক'রে ভেসে আসে উগ্র উত্তেজনায়। এ যেন এক হঠাৎ ইন্দ্রজালের মায়াস্পর্শে স্বরূপের রূপান্তর ঘটায় ভুখা-মিছিলের মহানগর। যে-ফুটপাথে অজস্র দিনের দুঃসহ অনাহারের যন্ত্রণায় নিঃশব্দেই মৃত্যুবরণ করেছে কোনো নরনারায়ণ—তারই উলঙ্গ এবং বিকৃত শব পাশে রেখে, ক্রেতার নির্বিকার মিছিল এসে থামে রকমারি বিপণির আলোকোজ্জ্বল দ্বারে। বিকৃত শব যেমন হঠাৎ কারো প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে অযথা আর বিকারগ্রস্ত হওয়ার প্রয়োজন-বোধ করে না, তেমনই অজস্র ক্রেতাও যেন এক-একজন সুপ্রসাধিত মৃত্যু—যারা বিকৃত শবদেহের মুখের দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ-আঁতকে ওঠার স্বাভাবিক হৃদয়-বৃত্তিকে নিধন করেছে অনেককাল আগেই। যান্ত্রিক মন তাদের পুণ্য-পসারিণী আগমনীর গজ-পদধ্বনি শুনে নেশাতুর। তাই বিকৃত শবের পাশেই তারা ক্রয়-ক্ষমতার বিস্তর প্রতিযোগিতার উদ্‌ভ্রান্ত নায়ক এবং নায়িকা।

অন্যদিকে, বিষম ব্যস্ততার বেড়াজালে আবদ্ধ কুমারটুলি। সেখানে অজস্র প্রতিমা-শিল্পীর চঞ্চল আঙুলে নেচে নেচেই এক-একটি মৃৎ-প্রতিমার আত্মপ্রকাশ ঘটে ললিত মাধুর্যে। কুমার-টুলির এই উপেক্ষিত স্রষ্টারাই মহা-নগরের সর্ব-মহল্লায় সরবরাহ করেন তাঁদের শিল্প—যে-শিল্পে আপনাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে সম্ভবত সবিশেষ ধন্যা হন দেবী সারদা। হয়তো এই শরৎ কালই একমাত্র কাল—যা সারা বৎসরের সংস্থান জয়ের খানিকটা সুযোগদান করে কুমারটুলির এই অতি দীন শিল্পী-সমাজকে।

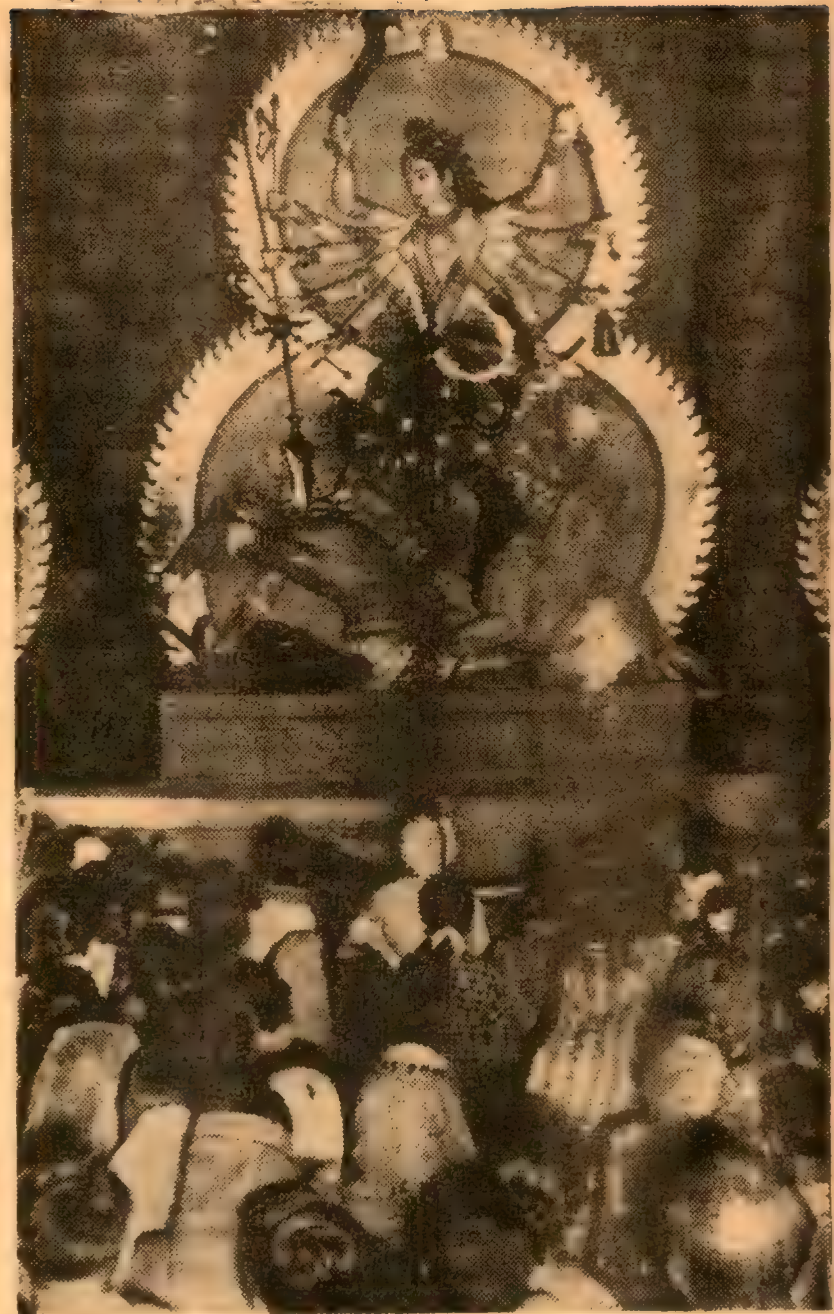

● পুণ্যাঙ্গণে পূতচিত্ত পূজার্থীদের ভিড়

আর অভূতপূর্ব ব্যগ্রতার অবিরাম দোলায় উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রতিটি পত্রিকা-সম্পাদকের দপ্তর। তাঁদের শারদ-সংকলনের আয়োজন চলে মহা-সমারোহে। প্রতি দপ্তরের বিরামহীন তাগিদে অতি দ্রুতচালে অগ্রসর হয় কবি-সাহিত্যিকদের কলম। কোনো কোনো রচনার আশ্চর্য উত্তরণ ঘটে সার্থক সৃষ্টির শৃঙ্গদেশে, আবার কোনো কোনো রচনা আশ্চর্যজনকভাবেই বিকলাঙ্গ হয়ে হামাগুড়ি দেওয়ার অপচেষ্টা করে অপাঠ্যের অধঃপাতে। তবু তারই সাহায্যে কলেবর স্ফীত ক'রে মহালয়ার পূর্বেই আত্মপ্রকাশ করে নানা রঙের বাহারে অসংখ্য শারদ-সংকলন। কিন্তু বাজার মাৎ

[illegible] একমাত্র সিনেমা-পত্রিকা। বিকৃত রুচির সেরা সিনেমা-পত্রিকাগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ক্রেতার কিউ বাড়ে স্টলে স্টলে। এ-সমস্ত ক্রেতার মধ্যে কুমারী এবং সদ্য-সধবাদের সংখ্যাই অধিকতর। তাঁরা কেউ স্বল্প-শিক্ষিতা নন। তাঁরা অনেকেই কলেজ-শিক্ষার্থিনী, আবার কেউ কেউ স্নাতকোত্তর ছাত্রীও বটে। অথচ রুচি তাঁদের গ'ড়ে ওঠে নি; নিজ জীবন-দর্শনের কোনো আদর্শ তাঁদের নেই। তাঁদের সম্পর্কে কোনো এক ঠোঁটকাটা অধ্যাপকের উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে বলা যায়: ওঁরা বেশ গর্বের সঙ্গেই নিজেদের ভেবে থাকেন প্রতিটি সুশিক্ষা বর্জিত সিনেমা-নায়কের বিকল্প মানসী। তাই সিনেমা-পত্রিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকাটা তাঁদের অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের মতো পাঠিকার ঘন-প্রাদুর্ভাব আছে বলেই এ-সমস্ত পত্রিকার প্রকাশকরা অকালে মরছেন না, বরং বাঁচার মতো বেঁচে শেভ্রোলেট গাড়ি কিনছেন এবং একাধিক বাড়ি তুলছেন সৌখীন অঞ্চলে। সুতরাং এমন জাতের একদল প্রকাশককে সার্থকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলেই উল্লেখিত পাঠিকারা তাঁদের বদান্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহেই অমর থাকবেন যুগে যুগে।

দেখতে দেখতেই মিলিয়ে যায় মহালয়ার পর আরও সাতটি দিন। সাতদিনের মাথায় ষষ্ঠীর অনুষ্ঠান অনাড়ম্বরেই সমাধা হয় প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তারপর আসে মহাসপ্তমীর লগ্ন। গুরুগম্ভীর ঢাকের বোলে জেগে ওঠে আপ্রান্তিক মহানগর। প্রতি অঞ্চলেই ধূপের সুগন্ধে শুদ্ধিলাভ করে প্রাণ এবং পবিত্র মন্ত্রধ্বনির অনুরণনে কী-এক অলৌকিক ভাবপ্রবণতা প্রভাব বিস্তার করে দিকে দিকে। কিন্তু পূজার লগ্ন কেটে যেতেই তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে মাইক। একসঙ্গে হাজার হাজার মাইকে হিন্দী সিনেমার অশ্লীল সুরের বেপরোয়া মত্ততা হঠাৎ লয়প্রাপ্তি ঘটায় গম্ভীর উপাসনার সমাহিত পরিবেশের। বিশাল মহানগর যেন মুহূর্তেই মাতাল হয়ে ওঠে, হারিয়ে যায় ধূপের সৌরভ। দ্বিধায় এবং দ্বন্দ্বে আত্মাবচেতনার অন্তরালে মুখ লুকায় দ্বিজোত্তম অনুভূতি।

দিনের শেষে রাত্রি আসে। সমগ্র মহানগর জুড়েই আবার ব্যাপ্তিলাভ করে পূজার লগ্ন। ঢাক আবার বেজে ওঠে পরমানন্দে এবং ধূপের ধোঁয়া তার সৌরভ বিতরণ করে গম্ভীর মন্ত্রধ্বনির সর্বজনীন ছন্দে। কিন্তু লগ্ন কেটে যেতেই আবার বেজে ওঠে মাইক। আবার সেই একই সুরের উচ্ছৃঙ্খল দাপটে বাতাস হয়ে ওঠে ভারী এবং মদমত্ততার বিরামহীন জোয়ারে আবার নিরঞ্জন ঘটে ভাব-গাম্ভীর্যের। তাই মনে হয়: সভ্যতা কেবল লাঞ্ছিত নয়, নির্বাসিত। তার এই অকাল নির্বাসনের মেয়াদ আর কতকাল—কে তা বলতে পারে।

রাত্রিকালেই আবার অভাবনীয় দর্শনার্থীর ভিড়ে বেসামাল এবং বিপর্যস্ত রূপ ধারণ করে মহানগর। তখন পদে-পদেই বাধাপ্রাপ্ত হয় যানবাহন, সুদীর্ঘ ঘতির জটিল বন্ধনে মুমূর্ষু হয়ে ওঠে শান্তিপ্রিয় পান্থের পদক্ষেপ। হঠাৎ অভিভাবকের দৃষ্টিচ্যুত হয়ে বেপথু ভিড়ে হারিয়ে যায় কিশোর-কিশোরী। অরণ্যে বৃথা রোদনের মতোই আর্ত-চিৎকার করে তারা। উৎকট-উন্মত্ততার জনতা তাদের ঠেলে নিয়ে যায় আরও দূরে—আরও গোলকধাঁধায়, অভিভাবকের হায়-হায় বিলাপ যেখানে পৌঁছয় না এবং পুলিশের সতর্ক চোখের তারাও যেখানে অন্ধতালাভ করে নিঃসন্দেহে।

এভাবেই মহাসপ্তমীর পর অতিক্রান্তি লাভ করে মহা-অষ্টমী। তারপর মহানবমীর অন্তিম উৎসবান্তে বিজয়া দশমীর সুপ্রভাত আসে মিলনের অনির্বেদ বাহু তুলে। প্রণাম, আলিঙ্গন এবং গাঢ় সম্ভাষণের মধুর আকূতিতে কী-এক দিব্যাতীত লোকে উত্তীর্ণ হয় মহানগরের মানস-প্রকৃতি।

কিন্তু তাল কেটে যায় দিনান্তেই—যখন দেবী-প্রতিমাকে ময়লাটানা এবং মালবাহী লরিতে তুলে গঙ্গাযাত্রা করে শিষ্টাচাররহিত দ্বিপদচারীর দল। সঙ্গে মাইক থাকে, ঢাকও বাজে। আবার ভাড়াকরা ব্যাণ্ডপার্টির সঙ্গে সঙসাজা তাসাপার্টিও সহযাত্রী হওয়ার সুযোগলাভ করে দেবী-প্রতিমার। গঙ্গার সমগ্র তীরপ্রান্তে এগিয়ে আসে মহানগর। সেখানে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের বিচিত্র অট্টরোলে বারবার চমকে ওঠে বৃদ্ধা ভাগীরথী। অক্লেশে মাথা খোঁড়ে ঢাক, মাইকও আর্তনাদ করে সঙ্গে সঙ্গে। অন্যদিকে ব্যাণ্ডপার্টি এবং তাসাপার্টিরও ধস্তাধস্তি চলে অবিরাম। সব মিলে যেন দুর্বিষহ এক অরাজক আদিম পরিবেশ। সম্ভবত এমন এক দুর্দান্ত পরিবেশ থেকে মুক্তিলাভের জন্যেই একে একে গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন হাজার হাজার দেবী-প্রতিমা। তাঁরা পতিতা গঙ্গার পঙ্কশীলা বক্ষেই দেহ ভাসান এবং ভাসতে ভাসতেই সাগরযাত্রা করেন না জানি কোন্ মুক্তির অন্বেষায়।

শেষরাত্রে গঙ্গার তটপ্রান্ত থেকে আবার যথাস্থানে ফিরে আসে মহানগর। কিন্তু আসতে আসতে এক সময় হঠাৎ-উত্তেজনার মুহূর্তে সে তার হিংস্র নখর বুলায় বিদায়ী রাত্রির তরুণীবক্ষে। ফলে রক্তাক্ত রাত্রি পরদিন মহা-ধর্মাধিকরণের শরণার্থিনী হয়েও ধরণীকে বলে দ্বিধা হতে।

এভাবেই নির্বাণলাভ করে শরতের ঘননীল সময়ের মহালগ্ন। আকাশ তখনো নিরুদ্বেগ নীল, কিন্তু সে-নীলে সেই প্রথম লিপিকার চিত্রার্পণ মুছে গেছে, আছে কেবল লগ্নশেষের এক পরিমার্জিত বেদনা। তাই পরিক্লান্ত আঁখি একবার উর্ধ্বপানে তুলে ধরে উদাসীন মহানগর। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। চিরকালের একঘেয়ে প্রয়োজনের আহ্বানে পরক্ষণেই আবার সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে পথে-উপপথে, হাটে-বাজারে, শ্রমিকের শ্রমের কেন্দ্রে এবং ফুটপাথের বে-আইনী বেসাতির সেই নিত্যকালের রঙ্গমঞ্চে।

ভদ্রলোক হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন, এই যে, একটু শুনবেন—

ভোরবেলা ব্রাশে পেস্ট মাখিয়ে সীতেশ সবে বাগানে এসেছে। পুকুরের প্রান্তে সরকারী জমিতে বেড়া দিয়ে সীতেশ এই বাগানটি করেছে গত বছর। ফুলের সখ ওর দারুণ। ইতিমধ্যে কিছু ফুলও ফুটেছে। বেল, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা ইত্যাদি। হাসপাতালের কেয়ার টেকারের কাজ করে সীতেশ। সুতরাং ভাল বীজ পেতে কোন অসুবিধাই হয় না। ভোরবেলায় ব্রাশ হাতে বাগানে আসা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অফিসের সময় পর্যন্ত এখানে বসেই কাগজ পড়ে, চা খায়। শীতকালে রোদ পোহায়, মাছের খেলা দেখে।

ভদ্রলোককে সীতেশ চেনে। শিশিরবাবু। হাসপাতালের কম্পাউণ্ডার অধীরবাবুর মামা হন। একদা সামান্য পরিচয় হয়েছিল। কিন্তু এই সকালবেলায় তার সঙ্গে কি এমন দরকারী কথা থাকতে পারে? ব্রাশটা ফুল গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে কাছে এল সীতেশ, ডাকছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে করবেন?

বিয়ে? সীতেশ অবাক হল। শিশিরবাবু কি রসিকতা করছেন?

—করুন না বিয়ে। আমার হাতে ভাল পাত্রী আছে।

সীতেশের হাসি পেল। ভদ্রলোক কি এই ভোরে ঘটকালী করতে এলেন? বলল, না।

—না কেন?—শিশিরবাবু লাফিয়ে উঠলেন: আজকালকার ছেলেদের ওই এক কথা। কেন আমরা বিয়ে করি নি?

—তখনকার দিনে এখনকার দিনে অনেক পার্থক্য মশাই।—সীতেশ বিরক্ত হল: তা ছাড়া ছয় ভাই আছে, বোন আছে, মা আছে। কটাই-বা মাইনে পাই বলুন। এ অবস্থায় বিয়ে করা কি সম্ভব?—সীতেশ যুক্তির পথে নেমে এল।

শিশিরবাবু কিন্তু একটুও বিচলিত হলেন না।

—ছয় ভাই আছে, তাতে কি

হয়েছে? ছয় ভাই মিলে যখন চাকরী করবেন তখন তো রাজার হালে থাকবেন।

—আপাতত প্রজার হালে থাকতে দিন—সীতেশ হাসল।

শিশিরবাবুও হাসলেন। যাকে বলে নাছোড়বান্দা।

—আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মেয়ে সুন্দরী। কলেজে পড়ে। উনিশ বছর বয়েস। আপনার সঙ্গে মানাবে ভাল।

—আচ্ছা আপনি যাকে বলে দেখুন।—সীতেশ বাগানে ফিরে এল।

ইতিমধ্যে বেলা বেড়ে গেছে। খবরের কাগজটা পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু অক্ষরগুলো এলোমেলো। অস্পষ্ট। পাঁচ মিনিট পড়ার পর বুঝতে পারল ও কিছু মানে বুঝতে পারছে না। শেষে নিড়ুনিটা নিয়ে ফুলগাছ পরিচর্যায় বসে গেল। কিন্তু প্রথম খোঁচাতেই চন্দ্রমল্লিকার শিকড় ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হল। হাত কাঁপছে। খোঁচাটা একটু জোর হয়ে গেছে। সূর্যের তাপ লাগছে গায়ে। পুকুরে হাত ধুতে গিয়ে দেখল মাছেরা চলে গেছে। বুঝল, আজ কেও

কাজে মন বসবে না। সাতাশ বছরের [illegible] উৎসাহও হয়েছে।

সোয়া দশটায় অফিসে এল। মাথার ওপর প্রকাণ্ড ঘড়ি। পনের মিনিট লেট। প্রচুর কাজ। হিসেবের পর হিসেব। একনাগাড়ে হিসেব করে করে বেলা তিনটেয় এসে একটু জিরোবার সময় পেল। বেয়ারা এই সময়ে চা নিয়ে এল জানালার বাইরে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠ রোদ পোহাচ্ছে। ওই দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ সকালের ঘটনাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শিকারী বিড়ালের মত একটা চতুর হাসি ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। কেউ লক্ষ্য করছে না তো? সীতেশ সভয়ে পার্শ্ববর্তী টেবিলগুলোর দিকে তাকাল।

কয়েকদিন পর রবিবার।

সীতেশ হাসপাতালের ক্যান্টিন রুমে চা ও খবরের কাগজ সহযোগে কয়েকজন বন্ধুর সামনে রাজনীতি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করছিল। এমন সময় অনন্ত এল। সীতেশের ছোট ভাই। মা ডাকছেন। রবিবারে ক্যান্টিন রুমে বসে বারোটা-একটা পর্যন্ত আড্ডা দেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু আজ ন'টাতেই রসভঙ্গ ঘটায় বিরক্ত হল। তবুও উঠি উঠি করেও মিনিট কুড়ি কেটে গেল। সীতেশ ঘরের সামনে এসে দেখল অপরিচিত এক জোড়া জুতো। দরজার কাছে মা দাঁড়িয়েছিলেন। কাছে আসতেই ফিস ফিস করে বললেন, মেয়ের ভাই। তোকে দেখতে এসেছে।—শুনেই বিরক্ত হল সীতেশ। মনে মনে শিশিরবাবুর মুণ্ডুপাত করল। তবে এ সময় ঘাবড়ালে চলবে না। স্পষ্ট করেই মেয়ের ভাইকে জানিয়ে দেবে, বিয়ে করা বিলাসিতা মাত্র। আশায় আশায় ওদের ঝুলিয়ে রেখে কি লাভ? বাংলা দেশে সুপাত্রের এখন অভাব নেই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বক্তব্যগুলি গুছিয়ে নিয়ে পাকা অভিনেতার মত সীতেশ ঘরে ঢুকল। পিছন ফিরে চুলটা একটু আঁচড়াতে গিয়ে আয়নায় ভদ্রলোকের ছবি দেখতে গেল। বেশ সুন্দর চেহারা। মুখে বুদ্ধির ছাপ। ফরসা রং। কালো চশমা। এর বোন যখন, তখন সুন্দরীই হবে। ভদ্রলোকের পাশে শিশিরবাবু বসে রয়েছেন। আশ্চর্য। এই সময় শিশিরবাবুকে খুব বিরক্তিজনক মনে হল না। সযত্নে চুল আঁচড়ান শেষ করে সীতেশ ঘুরে দাঁড়াল:

—নমস্কার। আপনি কি মেয়ের ভাই।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—ভদ্রলোক সপ্রতিভ।

শিশিরবাবু বলে উঠলেন, আপনাকে দেখতে এসেছেন।

—তা দেখুন।—সীতেশ যেন সুযোগ পেয়ে গেল। বেশ অভিনয়ের সুরে আরম্ভ করল: এই দেখুন দেওয়ালের আস্তর খসে পড়ছে, জামাকাপড়ের অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন, আসবাবপত্র বলতে ওই একটি খাট, তারও আবার পায়া ভাঙা, এই দেখুন তোষকের তুলো বেরিয়ে পড়েছে। আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন সাক্ষাৎ কার্তিক; এখানে বিয়ে দেওয়া মানে জেনে শুনে জলে ঝাঁপ দেওয়া।

—তাতে কি হয়েছে? সব মধ্যবিত্তের অবস্থাই এই রকম। জলে পড়লেও সাঁতার কেটে পারে পৌঁছান যায় বৈ কি।—ভদ্রলোক হেসে ওঠেন।

—উঁহু। এই জলে অনেক হাঙর কুমীর বাস করে।—সীতেশ আরো জোরে হেসে উঠল। উত্তরটি বেশ জুৎসই হয়েছে। হাসি থামলে বুঝল, এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিষ্প্রয়োজন। বক্তব্য যা ছিল বলা হয়ে গেছে, সুতরাং ছোট্ট একটা নমস্কার করে বেরিয়ে পড়ল। ক্যান্টিনঘরে একবার উঁকি দিয়ে দেখল কেউ নেই সেখানে। হাসপাতালের কম্পাউণ্ড ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। রিক্সা বাস মোটর গাড়ির হুড়োহুড়ি সেখানে। রিক্সা বাস মোটরের মুখ থেকে বাঁচাতে বাঁচাতে কেমন নেশাগ্রস্তের মত মনে হল নিজেকে। গত পূজোয় সিদ্ধি খেয়ে ঠিক এই রকম অবস্থা হয়েছিল। খানিকক্ষণ এলোমেলো ঘুরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বেলা বারোটা। ঘরে ফিরল। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে গিয়ে খাটটার দিকে চোখ পড়ল---সেই জায়গাটা যেখানে কিছুক্ষণ আগে মেয়ের ভাই বসেছিল।---

পরদিন সোমবার। সীতেশ আগে থেকেই বড়বাবুর কাছে ছুটি চেয়ে রেখেছে, টিফিনের সময় চলে যাবে। মা সীতেশকে নিয়ে বেহালায় মেয়ে দেখতে যাবেন আজ। কথা দিয়েছেন ওদের। সীতেশের হাসি পায়। হেসেও ফেলল। জানালা দিয়ে সবুজ জামা পরা মাঠটার দিকে তাকিয়ে গতকালের কথা মনে করল। সত্যি, উত্তরটা বেশ জুৎসই হয়েছে। নিশ্চয়ই মেয়ের ভাই বাড়ি গিয়ে হাঙর-কুমীরের গল্প করেছে। আর কপাটের আড়াল থেকে উনিশ বছরের একটি কলেজে পড়া মেয়ে তা শুনেছে। নিশ্চয়ই ঠোঁট কামড়ে একটু হেসেওছে। হাসিটা উপভোগ করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল টিফিন আসন্ন। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ল। ট্রেনে চেপে শিয়ালদহে এল। সেখান থেকে বাসে এসপ্লানেড। লাল আলো জ্বলছে রাস্তার মোড়ে। অনেক বাস-ট্রামের ভিতর একটা চোদ্দ নম্বর বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসটা বেহালায় যাবে।

এই বাসে উঠে পড়লে কেমন হয়? ওদিকে কি বই চলছে? একটা টিকিট কেটে ফেলল হঠাৎ। কিছুক্ষণ দেখার পর মনে হল ছবিটা অত্যন্ত বাজে। সুতরাং হল থেকে বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত এসপ্লানেড জুড়ে আলোর ফোয়ারা, মোটরের শোভাযাত্রা, সাহেব মেমের নির্লজ্জ গলাগলি। সে সব সন্তর্পণে এড়িয়ে কার্জন পার্কের সবুজে এসে বসল সীতেশ। ভীষণ ক্লান্তি লাগছে। মা'র কথা মনে পড়ল। নাতির মুখ দেখতে চান। অথচ বোঝেন না---কেন দেওয়ালের আস্তর খসে পড়ে, কেন তোষকের তুলো বেরিয়ে পড়ে, খাটের পায়াটা তিন বছর ধরে ভাঙা থাকে কেন?

অনেক উঁচুতে অসীম শান্তির মধ্যে তারাগুলি জ্বলছে। সেই দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুয়ে রইল সীতেশ। সীতেশের চারপাশে অফিস-ফেরৎ মানুষের স্রোত। তারা সীতেশকে দেখছে। সীতেশও ওদের দেখছে। হঠাৎ সীতেশের মনে হল আজ থেকে দশ-বারো অথবা পনের বছর পরেও এই সব শিশিরবাবুদের তাড়নায় এইরকম সম্বন্ধ আসবে। খুশি হবে সীতেশ। বড়বাবুর কাছ থেকে ছুটি চেয়ে টিফিনের সময় বেরিয়ে এইরকম একটা বাজে ছবি দেখতে যাবে। দশ-বারো অথবা পনের বছর পরেও পার্কের সবুজ মাঠে শুয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের তারা গুণবে সীতেশ।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ঝড় এলে উঁচা নীচ দু'গাছেই বাজে ॥

সেদিন রাতে আনন্দীরামের বাড়িতে বড় আচার্য এলেন। গ্রামে তিনি মানী পুরুষ। অর্থে প্রতিপত্তিতে সমাজের মাথা, দম্ভে মাথা উঁচু করে থাকেন।

এক সময়ে তাঁরাই ছিলেন এ-গ্রামের ভূ-স্বামী। রাজা টোডরমল্ল যখন বাংলায় আসেন, আচার্যদের পূর্বপুরুষ ছিলেন তাঁর ওয়াকনবীশ। খাতা লিখে হিসেব রেখে কানে কলম গুঁজে ছুটোছুটি করতেন। বলতেন 'এখনই ত' ভাই কাজের সময়। এখন আমি ফল কুড়োচ্ছি, এ সময়ে ঢিলেঢালা হলে চলে?'

মানুষ বলত বেঁটে বামুন বুদ্ধিতে খর। তাই ছুঁচ হয়ে সিঁধ কাটছে, ফাল হয়ে বেরুবে। টোডরমল্ল তাঁকে ফর্মান দিয়ে এ-গ্রাম পত্তনী দিয়েছিলেন।

খুব জাঁকজমক করে তিনি ইমারত তোলেন, বৃহৎ দেবদেউল গড়েন, উপযুক্ত দিনে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কোথায় যেন হিসেবে কি ভুল হয়েছিল, ব্রাহ্মণ হয়ে বাদশাকে 'জগদীশ্বর' বলে তদ্‌গত ভক্তিতে নমস্কার করে ঈশ্বরকে রুষ্ট করলেন এ-কথা কেউ কেউ বলে। আচার্যের বংশ থাকল না। অনেকবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেও বংশ রাখতে পারেন নি।

শেষ জীবনে আনন্দীরামের প্রপিতামহ বললেন 'আচার্যি মশায়, এবার একটি দত্তক নিন,, নইলে এমন বংশটার নাম থাকবে না। ভাবলে আমাদের কষ্ট হয়।'

আচার্য অর্জুনগাছের নীচে বসেছিলেন। উঁচু আসনে বসতেন, সঙ্গে চাকর থাকত, মাথায় ছাতা ধরত, রাজপুরুষদের সংসর্গে শেখা বিলাসিতা। যে অর্জুনগাছের নীচে দাঁড়িয়ে সুরকণ্ঠের দিব্যদর্শন হয় এ সেই অর্জুন-গাছ। সামনে খোঁড়ানো দেখছিলেন আচার্য। গ্রামের চৌহদ্দিতে বড় বড় আটটি দীঘি থাকবে এ তাঁর কল্পনায় ছিল।

এমন অনেক বড় বড় স্বপ্ন তিনি দেখতেন। এ-গ্রামের সুন্দর পরিকল্পনা, ইট বাঁধানো রাস্তা, মাঝে হাটতলা ও আটচালা বসানো, সবই তিনি করেন। টোডরমল্লের সঙ্গে দিল্লী গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় হয়। রাস্তাঘাট বানানো, সুছাঁদে বাড়িঘর তৈরি করা, বহু নতুন নতুন ধারণা তাঁর মনে সর্বদা টগবগ করত।

দাহাপাড়ার হাট ছিল বিখ্যাত। আচার্য ঢোলডগর বাজিয়ে নিষ্কর বেচাকেনা হবে, হাটমাশুল দিতে হবে না, এসব কথা প্রচার করে এ-হাটে বিক্রেতা ও ক্রেতা দু-দলকেই টেনে আনেন।

'বিনা শুল্কে হাটে বসবে, এমন কথা ত' কোনদিন শুনি নি', ব'লে বয়স্ক গ্রামবাসীরা আপত্তি তোলেন।

আচার্য শুকনো হেসে বলেন 'আপনারা ত' অনেক কিছুই শোনেন নি। বর্ধমান শহর অবধি দেখেন নি। গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যেতে জাত যায় আপনাদের। সে ধারণা নিয়ে বসে থাকলে চলে? দিন পালটাচ্ছে না? নতুন নতুন জিনিস শিখতে জানতে হবে বইকি! নইলে গ্রাম বড় হবে কেন?'

সায়রের দিকে চেয়ে আচার্যের সব কথা মনে হয়েছিল। মুখোটির কথা শুনে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, দত্তকই নিতে হবে হয়ত। কিন্তু কি জানেন, কেবল মনে হয় হেরে গেলাম।'

'হেরে গেলেন? আপনি বলছেন কি আচার্যি মশায়, এমন গ্রাম গড়ে তুললেন নতুন করে, কতবড় একটা কীর্তি আপনার।'

'মুখোটি মশায়, ইমারতে মন্দিরে দীঘিতে কীর্তি থাকে বটে, কিন্তু তাতে কি সংসারী লোকের মন ওঠে? আমার রক্তের রক্ত কেউ রইল না মানেই আমি কোথাও রইলাম না।'

'বড় আচার্যানীর ইচ্ছে, আমি বাড়ির মেয়েদের কাছে শুনলাম, আপনার জ্ঞাত ভাইপো কেশবকে পুষ্যি নেন। সেও ত' রক্তের রক্তই হল।'

'কেশব! টুলো পণ্ডিতের ছেলে। যা রেখে যাব সেটি হয়ত রক্ষা করবে, কিন্তু আমার মত এমন গ্রামের জন্যে ফলবাগান, ফুলবাগান, দীঘি, পথ, ইঁদারা করবে? আঁধারমাণিককে ক্রমে বর্ধমানের শোভা করে তুলবে? না মুখোটি মশায়, আমি ভীষণ হেরে গেছি। বিধাতা আমার দু'গালে চড় মেরে দেখিয়ে দিয়েছেন অধিক আশা করলেই গাছে ফল ধরে না।'

খুব মন ভেঙে যায় আচার্যের। শ্মশান সংলগ্ন সায়র আর তিনি শেষ করেন নি। দেশাচার অনুযায়ী সায়রে জল আনার জন্যে বলি-পূজোও করেন নি। বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন 'জল থাকলে জল উঠবে, সেজন্যে বাজে ক্রিয়াকর্মের দরকার দেখি না।'

সায়রের পাড়ের মাটি রাঢ়ের জলবাতাসের গুণে পাথর হয়। এখনো লোকে তাকে 'পাহাড়' বলে। অর্জুনগাছটি দেড়শো বছরে বুড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু আচার্যের সায়রে বারো মাস কাকচক্ষু জল টলমল করে। আচার্য বড় প্রাণবন্ত জিনিস, পুত্রের মুখ দেখার আকাঙ্ক্ষা, বলি দিয়েছিলেন ওখানে। দাম্ভিক, কর্মবীর একটি উদ্যোগী পুরুষের সে মর্মান্তিক দুঃখের কথা কম লোকই জানে।

আচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী কালে সঠিক বলে প্রমাণিত হল। কেশবকে আর কেউ 'রাজা' বলে নি, বলত 'ভূমিপতি কেশবানন্দ আচার্য।' ক্রমে আচার্যবংশ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। কাশিমবাজারে জগৎপতি ও সৈদাবাদে মহীপতি এই আচার্যদেরই জ্ঞাতি। সে সূত্রে বড় আচার্য এবং পাতানী পিসীরাও তাঁদের আত্মীয়। যদিও, এত কাছে থেকেও তাঁদের যোগাযোগ নেই, কেন না, জগৎপতির ঠাকুর্দাকে বড় আচার্যের জ্যাঠামশায় বালক পেয়ে নিঃস্ব অবস্থায় বের ক'রে দেন। সেইজন্যেই জগৎপতি মহীপতি কখনো গ্রামে এলেন না।

বড় আচার্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ-গ্রামে দাপটে শাসন চালান। এ-গ্রামের সমাজে তাঁর বিধান সবাই মাথা পেতে নেয়। সামান্য অপরাধে সেদিনও রামাই-এর শালাকে খড়ম পিটিয়ে ছোট জাতের চোখে বড় জাতের ইজ্জৎ রাখেন। গ্রামের বাইরে যে ক-ঘর মুসলমান আছে তাদের মুরগীর ডাক শুনলে কথায় কথায় জরিমানা করেন। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েদের বিষয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই কঠোর। মেয়েদের আচরণে এতটুকু এদিক-ওদিক দেখলেই 'গেল গেল' রব তোলেন। কথায় কথায় দম্ভ ক'রে বলেন 'আমার মেয়ে বা নাতনী হলে এখনি গিয়ে বিষ দিতাম, বিষ দিতে মায়া হ'লে নবদ্বীপে ফেলে দিয়ে আসতাম। মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষের ভাত খেত।'

পাতানী পিসী তাঁরই বোন। বোনের সাহায্যে বড় আচার্য গ্রামের সব সংবাদ ঘরে ব'সে পান। বড় আচার্যের শাসনে সবাই তটস্থ থাকে। আজ তিনিই আনন্দীরামের বাড়ি এসেছেন।

'বাবা আনন্দীরাম, আমি যে তোমার কাছে এসেছি তা বাড়িতে কেউ জানে না। তুমি যেন তোমার বাড়ির কাউকে ব'ল না।'

ব্রাহ্মণের গলা ভারী হল। চোখ মুছলেন। আনন্দীরাম বিস্মিত হলেন। আচার্য তাঁকে পছন্দ করেন না। 'ও ছোঁড়াই গাঁয়ে নতুন হাওয়া বওয়ালে' এ-কথা সর্বদা বলেন। এখন তাঁকে কাতর ও মিনতিপরায়ণ দেখে আনন্দীরাম যারপরনাই অবাক হলেন। ধীরে বললেন, 'চলুন বাইরে যাই।'

'সেই ভাল বাবা, চল বাইরে যাই।'

'কোথায় যাবেন?'

'এই বেড়াতে বেড়াতে সায়রের দিকে যাই চল। ওদিকটায় রাতেভিতে কেউ থাকে না।'

'সায়রের দিকে?'

'হ্যাঁ বাবা, কেন, তোমার ভয় করবে?'

'না, ভয় কিসের। তবে রাত বলে কথা, দাঁড়ান, চকমকি আর লাঠিটা নিই।'

লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে দুজনে এগোন। আনন্দীরামের মনে মনে নানা প্রশ্ন। তবু ঈষৎ হেসে বলেন 'নতার ভয় আর থাকবে না। যা প্রলয় হয়ে গেল, মাটির প্রাণী ভয়ে পাতালে সেঁদিয়েছে।'

আচার্য বিষণ্ণভাবে বললেন 'তা যা বলেছ আনন্দীরাম। যুদ্ধবিগ্রহেও বোধ হয় এমনটা হয় না। তোমার বলব কি, বাসুকি ফণা নাড়লেও বুঝি এমনটা হয় না। এগারো শ' সনে,

অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ বছর আগে মস্ত ভূমিকম্প হয়েছিল। তুমি তখন কোথায়। বাড়ি-ঘর ভেঙেছিল বটে, কিন্তু এ যেন….'

আনন্দীরাম বোঝেন এবার আরো বড় কোন বিপদ ঘটে গেছে, সম্ভবত ব্যক্তিগত আঘাত পেয়েছেন বড় আচার্য। নিজের ক্ষতি না হলে মানুষ তেমন সচেতন হয় না। কিন্তু কি হতে পারে? টাকাপয়সা গয়নার কড়ির কথা বলবেন বলে কি বড় আচার্য তাঁকে নিয়ে গ্রামের বাইরে যাচ্ছেন?

বড় আচার্য স্বগত বললেন, 'জান বাবা, বিল্বাসিনীর মন্দিরের ওপরে যে কাকটা থাকত, সেটা হঠাৎ পড়ে মারা গেল। ওটা দাঁড়কাক, অনেকদিন ওর আয়ু, দেবমন্দিরের প্রাণী মরাটা দুর্লক্ষণ নয়?'

'বুড়ো হয়েছিল হয়ত!' আনন্দীরাম ধীরে বলেন, 'জ্যাঠামশায়, দেখুন আমরা লোকালয়ের বাইরে এসেছি, আর দূরে যাবার দরকার কি?'

'দরকার আছে বইকি। বললেই বুঝবে এখন।'

বড় আচার্যের এ-কাতর ভাব অন্তরের, অবস্থান্তরে পড়েছেন বলে মনের রাগ চেপে রেখে ভাণ করছেন না। তাঁর বয়সী বহু লোকের মত বড় আচার্যও প্রেতযোনিতে বিশ্বাসী, তবু শ্মশানতলার মাঠে যেতে চাচ্ছেন। ব্যাপার বোধ হয় গুরুতর। আনন্দীরামের ত' মনে পড়ে না আচার্য-বাড়িতে কেউ মারা গেছেন বলে। শুনেছেন সুরকণ্ঠের পিসী মারা গেছেন, এবং আপৎকালে সুরকণ্ঠ তাঁকে বাড়ির সীমানায় দাহ করেছেন। এ-কাজটির প্রতিক্রিয়া হবে সমাজে, কথা উঠবে অনেক, কিন্তু সে কথা আগেভাগে গোপনে আলোচনা করবেন বলেই কি বড় আচার্য এত গোপনতা করছেন?

অর্জুনগাছের নীচে আসেন দুজনে। বড় আচার্য বলেন, 'দাঁড়াও।'

আনন্দীরাম দাঁড়াল।

'তোমায় বলতে আমার মাথা হেঁট হচ্ছে আনন্দীরাম, কিন্তু না বলে উপায় নেই, নির্মলি আমার একমাত্র সন্তান বললেই হয়, ছেলেটা জন্ম-হাবা, থেকেও নেই, জান নিশ্চয়।'

'জানি।' বড় আচার্য এতদিন অবধি আনন্দীরামের সঙ্গে সর্বতোভাবে শত্রুতা করেছেন, কিন্তু এখন কি কেউ সে কথা বলে?

'নির্মলার কথা, কি বলব আনন্দী ও মেয়ে আমার প্রাণ। আমার তিন স্ত্রী নির্মলি বলতে অজ্ঞান। নির্মলি জানে তিনজনই ওর মা, সৎ কেউ নন।'

'নির্মলার কি কিছু হয়েছে?'

'কিছু হতে আর বাকি নেই বাবা। নির্মলির মত মেয়ে হয় না বাবা, নিজের মেয়ে বলে বলছি না।'

আনন্দীরাম হাসেন। অন্ধকারে হাসি দেখা যায় না। নির্মলাকে তিনি প্রায় দেখেন। গোপনে স্বামীসাক্ষাৎ সেরে তাঁর বাড়ির পেছন দিয়ে চোরের মত ফিরে যায়।

'ডাকাতে আমার সর্বনাশ করেছে। হতভাগীর পেট কোঁচড়ে মায়েদের গয়না ছিল, ডাকাতেরা ওকে টেনে নিয়ে গয়না কেড়ে নিয়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! ডাকাতে ছুঁয়েছে, ও মেয়ের এখন গতি কি হবে, এই চিন্তায় আমরা মরি, এমন সময়ে নরপতি এসে উপস্থিত। সে ছিল অতিথশালে। নির্মলির লাঞ্ছনা স্বচক্ষে দেখে।'

'জ্যাঠামশায়, নির্মলির কাছ থেকে গয়না কেড়ে নিয়েছে শুধু, আর মারধোর করে নি ত'?'

'না বাবা, এই পইতে ছুঁয়ে বলছি, মাথার চুলগাছটি সরিয়ে ক্ষতি করে নি, কিন্তু আর ক্ষতির কি বাকি রইল বাবা?'

'কেন?'

'নরপতি বলে গেল সমাজে ঘুরে ঘুরে সে এ-কথা জাহির করবে। আমাকে আসামী দাঁড় করাবে, নির্মলিকে হাতে নারকেল মালা পরণে ছেঁড়া ট্যানা নবদ্বীপের পথে ভিক্ষে করাবে। এখন উপায় বল।'

আনন্দীরাম অভিভূত। এমনি করেই হয়ত পৃথিবীতে চাকা ঘোরে। নরপতির সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই তাঁর। এক সময়ে দুজনে একই সাথে পাঠশালে যেতেন। বন্ধুত্ব কিছু কম ছিল না। তারপর যা হয়, দুজনকে দুই ভিন্নজীবনের আবর্ত টেনে নিলে। আনন্দীরাম দেখেছেন শ্মশান সীমান্তে বিল্বাসিনীর খালে মাঝে মাঝে এ-রকম ছোট ছোট ঘূর্ণী ওঠে। এক এক ঘূর্ণীতে এক একটি পাতা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে থাকে, কেউ কারো কাছে যেতে পারে না। মানুষও অবস্থার হাতে অনেকটা তেমনি দাসানুদাস বইকি।

'আমি কি করব বলুন।'

'তুমি ওর মুখ বন্ধ কর আনন্দীরাম, তোমার কথা ও শুনবে।'

বৃদ্ধের গলায় অবুঝ মিনতি। আনন্দীরামের শুধু মনে হল নরপতি যে একদিন ফিরে আঘাত পাবে এ-কথা বড় আচার্য স্বপ্নেও ভাবেন নি। ভগবানের ধর্মচক্র এমনি করেই ঘোরে।

'চেষ্টা করব', তিনি ধীরে বললেন।'

(ক্রমশঃ)

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিল্যাক্স

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত

কোন বাড়তি খরচ নেই

মার্কনী ইলেকট্রিক করপো

(প্রাঃ) লিঃ

১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৩০৪৮

রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

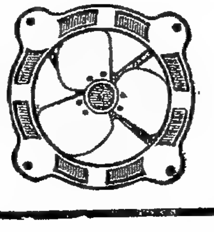

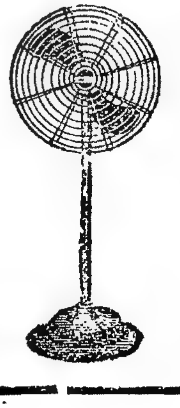

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"মুর্শিদাবাদ কাশিমবাজারের সিল্কের কাপড়ের খ্যাতি সারা পৃথিবীতে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল।"

মুর্শিদাবাদ।

ইতিহাসের অনেক রক্তস্বাক্ষরের সীমন্তিনী এই জেলা। এখানকার মাটিতে রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে বহু যুদ্ধ, বহু রক্তপাতের কাহিনী। বাংলার এককালের রাজধানী এই মুর্শিদাবাদ। তাই অনেক সিংহাসন বদল, অনেক রক্তপাত আর ইতিহাসের অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার ইতিবৃত্ত পরম মমতার মত জড়ানো রয়েছে শহর মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজারের পথে-ঘাটে।

রাজার রাজধানী যেখানে, রাজ-প্রাসাদ, সেখানে বাণিজ্য স্বভাবতই বিপুলভাবে বিস্তার লাভ করে। রাজকার্য উপলক্ষে আসে বহু লোক। শুধু আসে নয়, রাজধানীতে থাকতে হয়। গড়ে ওঠে অজস্র রকমের ব্যবসা।

এখানকার পুরানো কালের বাণিজ্যের ইতিহাস খুঁজতে হলে যেতে হবে কাশিমবাজারে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই শহরের প্রান্তে আজও দেখা যায় বনতুলসীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন এক একটা কুঠিবাড়ির ভগ্নস্তূপ। এখানকার মাটিতে পা দিলেই মনে হবে ইতিহাসের অবলুপ্ত কীর্তির মহাশ্মশান এই কাশিমবাজার। যেদিকে তাকাও দেখবে ভগ্ন, বিলুণ্ঠিত, জীর্ণ প্রাসাদের কঙ্কালচূর্ণ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

হ্যাঁ। এইখানে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। স্মৃতির সরণী বেয়ে চলে যেতে হবে কালের ব্যবধানকে এড়িয়ে, অতীতের কুয়াশা ভেদ করে একেবারে সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী পূর্বে যেতে হবে। আপনার চোখের সামনে ফুটে উঠবে, শত শত কর্মব্যস্ত মানুষের কোলাহলে মুখরিত এক বর্ধিষ্ণু জনপদের ছবি।

বড় বড় কুঠিবাড়ি। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সারি বেঁধে বসে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রগতিতে আর অদ্ভুত নিপুণতায় রেশমগুটি থেকে সিল্কের সূতো ছাড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে সোনার মত রোদ ঝরছে। সেই রোদে সূতো শুকোতে দিচ্ছে তারা। তাঁতঘরে শব্দ উঠছে খট-খট-খটা-খট্—সেই শব্দ বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে ভেসে চলে যায় সুদূর সেই তিনশত বর্ষ পূর্বে।

বানিয়ার বলেছেন, পর্তুগীজরা কাশিমবাজারের সিল্কের কারখানায় সাতশো কি আটশো কারিগর নিয়োগ করেছিলেন ইংরাজ, ফরাসী বণিকরা আরও বেশিসংখ্যক লোক নিয়ে রেশমকুঠি সুরু করেছিলেন। বাংলার এই এককালের বিখ্যাত শিল্প—রেশম ব্যবসার সঙ্গে আদি কলকাতার জনক জব চার্নকের নাম জড়িত রয়েছে।

ইংরেজী ১৬৮১ খৃস্টাব্দে বিলেত থেকে দুশো ত্রিশ হাজার

পাউণ্ড চার্নককে পাঠানো হয়েছিল শুধু বেঙ্গল সিল্কের উন্নতির জন্য। বেঙ্গল সিল্ক। একদিন সাগরপারে তার খ্যাতি পৌঁছেছিল। বেঙ্গল সিল্ক। ইউরোপের দেশে দেশে ধনী, বিলাসীদের ঘরে ঘরে শোভা পেত অপরূপ এই সুদৃশ্য সিল্ক। প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়েছিল ইটালীয়ান আর চীনা সিল্ক।

নবাব আলিবর্দী খান নেই। নবাবের রাজ্য নেই। সব বিস্মৃতির কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের কাস্টম হাউসের পুরানো নথিপত্র খুঁজলে হয়তো বেরিয়ে পড়বে বহুকালের পুরানো হিসাবের খাতা। দেখা যাবে—লেখা আছে বছরে সাড়ে সাতাশী লক্ষ টাকার সিল্কের সুতো বিক্রি হয়েছে।

সাড়ে সপ্তাশী লক্ষ টাকার সিল্ক। শুধু দেশী লোকদের দ্বারা পরিচালিত কারখানা থেকে উৎপন্ন সিল্ক। ইউরোপীয়ানদের তৈরি সিল্ক এই হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের ব্যবসায় শুল্ক মাপ করা হয়েছিল।

কাশিমবাজার। ইতিহাসের বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী এই শহরের ইতিহাস—রেশম সিল্কেরই ইতিহাস। তাই বিখ্যাত ভারত-প্রেমিক বেনেলের কথাটা মনে পড়ে, :

Cossimbazar is the general market of Bengal silk and a great quantity of silk and cotton stuffs are manufactured here.

এই সময় ইংরেজদের সিল্ক ফ্যাক্টরীতেই প্রায় বিশ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ছিল। জঙ্গীপুর ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র। এন জি মুখার্জীর 'মনোগ্রাফ অন দি সিল্ক ফেব্রিকস অফ বেঙ্গল' বইতে বলা হয়েছে আটাশ হাজার নয়শো পঞ্চাশ জন লোকের অন্ন আসতো এই রেশম কারখানা থেকে। রেশম শিল্পের যেমন বিপুল উৎকর্ষ আর স্ফীতির কথা আছে গ্রন্থে, তেমনি আছে অবক্ষয়ের করুণ ইতিহাস। রেশম-গুটিতে মহামারী সুরু হলো। বহু গাছের ক্ষতি হলো। তারপর গবেষণা সুরু হলো—কেমন করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করা যায়।

আজও বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজারে রেশম শিল্পের প্রচলন আছে। সেরিকালচারের স্কুল আছে। ফ্যাক্টরী আছে। এইসব কারখানা শত শত শতাব্দী পূর্বের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আরও একটা বিচিত্র শিল্প আছে এই জেলায়—হাতীর দাঁতের কাজ। ১৮৮৮ সালে সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছিল :

Murshidabad carvers were declared to be the best in India,

এই কাজে মুর্শিদাবাদ কারিগরের জুড়ি ভারতবর্ষে নেই—একথা প্রফেসার রয়্যালের লেখা, 'লেকচারস অন দি আর্টস এ্যাণ্ড ম্যানুফ্যাকচার্স অফ ইণ্ডিয়া' বইতেও বলেছেন। নবাবী আমল অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও প্রায় উঠে গিয়েছে। ত্রিশ বছর আগেও মাথরা দৌলতবাজার, রামনগরের গ্রামে গ্রামে বাঙালী কারিগররা বিস্ময়কর নিপুণতায় আর অদ্ভুত ছন্দে মতিতে নির্মাণ করতেন হাতীর দাঁতের কালী, দুর্গা, আরও ঠাকুর দেবতার মূর্তি।

দয়ানগর গ্রামে তেলের কারখানা ছিল। বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ভগবানগোলা, খাগড়া, বহরমপুরে, কাঁন্দীতে জঙ্গীপুরে পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি হতো। মাছের ব্যবসাও খুব জমজমাট ছিল। ভাগীরথী-জলঙ্গীর মত বিশাল নদী ছিল। ছিল বড় বড় বিল আর দীঘি। তাই মাছের অভাব ছিল না।

আজিমগঞ্জ, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, খাগড়া, ধুলিয়ান, কাঁদী ছিল এ-জেলার প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র।

আজ এ-জেলার রেশম শিল্প, হাতীর দাঁতের কাজের ইতিবৃত্ত লিখতে বসে মনে হয়, সেকালের মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুদৃশ্য শাড়ি, কি হাতীর দাঁতের তৈরি শ্বেতশুভ্র পাল্কী এবং জগদ্ধাত্রী মূর্তির ভেতরে কত লক্ষ লক্ষ বাঙালীর পেশী-সঞ্চালনের ইতিহাস নিঃশব্দ হয়ে রয়েছে। কত বাঙালী এই সিল্কের ব্যবসা করে কত ধনী হয়েছে—কত দূর দূর দেশে তাদের পণ্যসম্ভার রপ্তানী করেছে—সে সব নগণ্য মানুষের ইতিহাস আজ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গ্রন্থ মেলা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসন্ত ঋতুকে কেন্দ্র করে আনন্দোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু বাংলা দেশে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার। বাংলা দেশের মানস-প্রকৃতিতে ক্ষণিক আনন্দের স্থান বড়ই নগণ্য। তাই বসন্তের পরিবর্তে বাংলা দেশ সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে শরৎ ঋতুকে। কেন না, 'বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ঐখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল ঋতুতেই, কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই।' এইজন্য পূর্ণতার সন্ধানী বাঙালী-চিত্ত শরতের স্নিগ্ধতার মধ্যে যেমন নিজেকে বিস্তারিত করার সুযোগ পায়, তেমনি সৃষ্টির জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শরৎ ঋতুতে উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে যেন তার উভয় অভিব্যক্তি প্রকাশমান হয়ে ওঠে। যে আনন্দ সহজে বিলীন হয় না, সে আনন্দের বস্তুকে সে মনের নিভৃত প্রদেশ থেকে আহরণ করে নিয়ে আসে।

এই কারণে আমাদেরও জানতে ইচ্ছে হয়, বাইরের চাকচিক্যে যে শারদোৎসবের আয়োজন হয় না, আসলে তার সাড়ায় বাংলা দেশ কোন উপহার তুলে ধরে,—সারা বিশ্বে যার কদর হতে পারে। বহুর মধ্যে সাহিত্যই হয়তো প্রধানতম সেই বস্তু। এ যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি শারদোৎসবের যথাযোগ্য উপহার।

এখনো যদি কোনো বুকস্টলের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, তাহলে নানা বর্ণের পত্র-পত্রিকা আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে। কতো শিল্পীর অনেক যত্নে আঁকা আশ্চর্য রকম প্রচ্ছদচিত্র। কিন্তু সেখানে তু' ঐভাবে দু' চোখ বন্ধ থাকতে চায় না, মন চায় পত্রিকা হাতে তুলে একের পর এক পাতা উল্টোতে। হয়তো এইভাবে সূচীপত্র পড়ে পাতা উল্টিয়ে কিনতে হয় পত্রিকা। কিন্তু তার আগেই অনেক পত্রিকার 'মনমাতানো' খবর বিজ্ঞাপন মারফৎ সচেতন পাঠককে ধাক্কা মারে। নিরীহ পাঠকরা হয়তো অনেক সময় বঞ্চিত হন। তবু ভেতরের খবর কে-ই বা কতটা জানে। দৈনিক ও

জয়ন্তী সেন

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির যখন শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তখন পাঠকরা লাঞ্ছনার হাত থেকে অনেকটা রক্ষা পান এই কারণে যে, তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ভাল-মন্দের ধারণা একটা গড়ে ওঠে। তা ছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রকাশিত ঐ সব পত্রিকার বেতনভোগী সম্পাদকগণ পাঠকদের সম্পর্কে সততই সজাগ। তাই খুব ভালো যদি না-ই মেলে, ঐ সব পত্রিকায় আবর্জনা জাতীয় ছাইভস্ম প্রকাশিত হয় না। তা ছাড়া পত্রিকাগুলিতে মননধর্মী প্রবন্ধের সঙ্গে উৎকৃষ্ট কবিতা, গল্পও প্রকাশিত হয়। অনেক সময় সঙ্গে থাকে ছোটদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ।

অবশ্য বর্তমানে ঐ সব পত্রিকা সিনেমা পত্রিকাগুলির মতো যে বিরাট বিরাট উপন্যাস দিচ্ছেন, তা শরৎঋতুর মধ্যে ঐ বিরাট ফসল ফলানো কিভাবে সম্ভব হয়, খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকারা কি উপন্যাসের জন্য পত্রিকার দ্বারে মানৎ করেছেন—এ-প্রশ্ন আজ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই করতে হয়। তা ছাড়া লোভের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বই আকারে প্রকাশিতব্য বারো টাকা দামের উপন্যাসের বদলে ৩।৪ টাকা দামের পত্রিকা যিনি কেনেন, তার মাল-মশলা সম্পর্কে তিনি কোন খোঁজ রাখেন কি? আগেই বলেছি শারদোৎসবের প্রাক্কালে একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে দশ জায়গায় গড়ে ১০।১২ টাকা দামের ফসল ফলানো সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই লেখকদের নামের নেশায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে গোঁজামিলের সাহায্যে পাঠকদের ঠকানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এ-ঘটনা এ বছরেও ঘটেছে। কোনো একটি পত্রিকায় অব্যবহৃত পুঁথিশালার পত্রিকার পাতা কেটে ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। একমাত্র যা নতুন, তা শুধু নামকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নয়তো বামাল ধরা পড়ার ভয় আর কি। কেউ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, চার-চারটে উপন্যাসকে নতুন নাম দিয়ে ছাপিয়ে দিলেও কোনো কোনো পত্রিকা বিক্রি হয়। কারণ, বিজ্ঞাপনের জোর এবং অভব্য দেশী-বিদেশী ছবির সমাবেশ। অবশ্য এভাবে চিরকাল পাঠক ঠকানো সহজ নয়। পাশাপাশি ভালো পত্র-পত্রিকার কাছে দু' দিনের নকলপনা হার মানতে বাধ্য হবেই।

এই শারদোৎসবে অনেক ভালো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন পাঁচমিশেলী সংকলন, মেয়েদের উপযোগী ভালো পত্রিকা, তেমনি বের হয়েছে শুধু কবিতা, শুধু গল্প, শুধু রহস্য-রোমাঞ্চ বা কেবল প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধ পত্রিকাগুলিও বিভিন্ন

জাতের। কোনোটা মনস্তত্ত্বঘটিত, কোনোটা বিজ্ঞান, কোনোটা রাজনীতি সম্পর্কিত, কোনোটা বা সাহিত্য অথবা খেলাধূলা কিংবা অর্থনীতি বিষয়ক। দুঃখের কথা বাংলা দেশে ভৌগোলিক পত্রিকা নেই। বিভিন্ন দলের মুখপত্রগুলি তুচ্ছ করার নয়। আবার একদলের বিভিন্ন যে উপদল রয়েছে তারাও পত্রিকা প্রকাশ করেছেন এবং শারদোৎসবে অনেক শ্রুতিসুখকর সংবাদ বিতরণ করেছেন। ব্যঙ্গ বা কৌতুক জাতীয় পত্রিকাগুলিও নিস্তব্ধ থাকে নি। সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'বেতার জগৎ'ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের দিকে ঝুঁকেছেন। ছেলেদের উপযোগী পত্রিকাগুলি ত' শারদোৎসবে সবার আগে বাজার জয় করে। কিন্তু এই চিত্র সারা বাংলা দেশের হলেও প্রায় কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বিবর্তিত। তাই মফঃস্বলের কাগজগুলির দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। হয়তো গায়ে শ্রী নেই তেমন, তবে মনের দিকে কোনোরকম দুর্বলতা নেই। এই সব পত্রিকায় সবচেয়ে বড় জিনিস খুঁজে পাওয়া যায়, যা শহরের কোনো পত্রিকায় দুর্লভ। সে জিনিস হচ্ছে, আঞ্চলিক অনেক অজানিত বিষয়। এই সব বিষয় যেদিন উদ্‌ঘাটিত হবে, সেদিন সমস্ত বাংলা দেশের পরিচয় পূর্ণ রূপে সম্প্রকাশিত হবে।

শুধু বাংলা দেশেই শারদ পত্রিকার বিজয়-পতাকা উত্তোলিত হয় না। ত্রিপুরা না হয় বাংলা ভাষার অন্যতম পীঠস্থান। সেখান থেকে পুজোর আগে যেসব পত্র-পত্রিকা বর্ধিত আকারে মার্জিত রূপে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের কথা না-হয় নেই বললাম। কিন্তু আসামের প্রবাসী বাঙালীরাও শরতের আগমনে প্রকাশ করেছে যে বাংলা পত্রিকা, বাংলা দেশের ক'জন মানুষ তার খবর রাখে?

বারাণসী থেকে প্রকাশিত 'উত্তরা' আজো বাঙালীর গৌরব। হয়তো এমন দিন আসবে, যখন আমেরিকা, রাশিয়া, লণ্ডন বা জাপান থেকেও প্রকাশিত হবে বাংলা দেশের শরৎ ঋতুকে উপলক্ষ করে নানান রকম পত্র-পত্রিকা।

এই ত' দেয়ালী সামনেই। বুক-স্টলে গেলে আপনি দেখবেন অনেক পত্র-পত্রিকা। কিন্তু অধিকাংশই হিন্দী পত্রিকা। তবু আশ্চর্য হবার এখনো বাকি আছে। যে হিন্দী ভাষা নিয়ে আমাদের সরকার এতো বড়াই করেন, তাঁরা না দেখুন, কিন্তু যিনি দেখবার তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, বাংলা পত্রিকার হুবহু নকল করে কিভাবে হিন্দী পত্রিকার অনেকাংশ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার নামকরণে নকল, ছবিতেও নকল। শুধু এখানেই শেষ নয়। আসল নামে যা দেওয়া হয়েছে, তাও বাংলা কবিতা, গল্প বা উপন্যাসের প্রায়-নকল।

এই সব ব্যাপার থেকেই বোঝা যায়, বাংলা ভাষার, বাংলা সাহিত্যের গৌরব কতোখানি। শুধু দু' পয়সা লুট করার লোভে আমরা যদি স্বকীয়তা বিসর্জন দিই, মৌলিকত্বকে ত্যাগ করি—তাহলে কোন্ সম্পদ নি... আমরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দেব? শারদোৎসবের গ্রন্থ-মেলায় কী দিয়েছি এবং তা থেকে কী পেয়েছি—এই হিসেব মেলাবার আগে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে—আত্মজিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা থেকেই আমরা আবার গিয়ে পৌঁছবো চিরন্তন সাহিত্যের উৎসে।

একটি কবিতার জন্ম

সুধীর চৌধুরী

দরজার আড়ালে দাঁড়ালে।
ভাবলে: আমি দেখতে পেলুম না।
নিশ্চিত বিশ্বাসে তুমি আশ্বস্ত হ'লে—
ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দরজায় মাথা রাখলে।

তখন বিকেল।
দাঁড়িয়ে ছিলাম জানালায়। সামনে আকাশ।
বিবেকী বাতাসে ঢেউ তুলে
নীরব সংলাপে বলাকারা তখন ঘরে ফিরছিল
আমি দেখছিলাম। এমন সময়

তুমি এলে।
দরজার আড়ালে দাঁড়ালে।
ভাবলে: আমি দেখতে পেলুম না।

আজও তোমায় আমি ডাকতে পারলুম না।
তুমি এলে
ফিরে গেলে আড়াল থেকেই।
আমার বুকে তখন নিঃসঙ্গ কান্নার নদী।

এখানে বড় অন্ধকার। আমি একা।
এখানে অসহ্য স্তব্ধতা। স্তব্ধতা এখানে
মৃত্যু। মৃত্যুর দাঁতে দাঁতে আমি রক্তাক্ত।

অন্ধকার, আমি
স্তব্ধতা, আমি
মৃত্যু, আমি
কেননা
তুমি এখানে নেই।

● এ লাইন প্রতিমা দর্শনার্থীর নয়—রেশনের দোকানে চাল, আটা ও চিনির জন্য লাইন।

রাজধানী:

গেল সপ্তাহটা শহর কলকাতা ছিল আনন্দোচ্ছল। আনন্দময়ীর আগমনে কলকাতার বুকে খুশির বান ডেকেছিল। সে বন্যায় ভেসে গিয়েছিল সকল খণ্ডতা—ধনী-নির্ধন, উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ ছিল না পূজা প্রাঙ্গণে। মেতে উঠেছিল সকলে মহিষাসুরমর্দিনী মহাশক্তির পূজায়। পূজা সমাপনান্তে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ঘরে ফিরেছে বিষণ্ণ চিত্তে।

কোজাগরী পূর্ণিমায় সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর পূজাও আমরা করেছি যথারীতি। তবুও আমাদের চিত্তের বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। পারবার কথাও নয়। উৎসবের উপচে-পড়া আনন্দে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম সাময়িকভাবে আমাদের দৈন্যের কথা। আনন্দের রেশ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা আবার প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। হয়েছেও তাই।

গঙ্গার পুণ্যসলিলে আমরা প্রতিমাকেই শুধু বিসর্জন দিয়েছি—বিসর্জন দিতে পারি নি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্যকে। সে সঙ্কল্পের অভাব ছিল আগাগোড়া। তাই উৎসবে মাতামাতিটাই ছিল অধিক। শক্তিসাধনার উপযুক্ত উপচার আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা থাকলে পূজার উপচার চোরের ঘরে পাচার হতো না। মায়ের ভোগের অন্ন নিয়ে চোরা-বাজারের পিশাচের দল এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতো না। মহাষ্টমীতে আমরা সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করি নি, এমনও নয়। কিন্তু তাতে ছিল না গভীর আন্তরিকতা। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থাকলে সঙ্কল্পে দৃঢ়তা আসে না। সঙ্কল্পে দৃঢ়তা থাকলে পূজার প্রাক্কালে গম, আটা ও ময়দার অভাব হতো না। দেশের সরকার নীরব, নির্বিকার থাকতে পারতেন না। মাতৃপূজার ভোগের অন্নের অনটনও ঘটতো না। চৌর্য, শঠতা, মিথ্যাচার বিস্তারলাভ করতে পারতো না। পূজার প্রধান অংশ কাঙালী বিদায় বাদ পড়তো না।

* * *

শক্তিপূজার আনন্দোচ্ছল পরিবেশে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আরেকটি আনন্দের কথা ঘোষণা করেছেন। শহর কলকাতার মানুষকে আর হন্যে হয়ে দোকানে দোকানে চালের সন্ধানে ঘুরতে হবে না। কলকাতার মানুষকে খাওয়াবার পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছেন সরকার জানুয়ারী মাস থেকে। জেলাগুলিতেও রেশনের ব্যবস্থার আশ্বাস তিনি দিয়েছেন। তবে, সেখানে তাঁকে নির্ভর করতে হবে অনেকখানি কেন্দ্রের সাহায্যের ওপর।

পূর্ণাঙ্গ রেশনের অভিজ্ঞতা কলকাতাবাসীর কাছে নতুন নয়। আংশিক রেশন এখনও কলকাতায় চালু রয়েছে। পূজার সময় এই সব দোকান থেকে আটা, ময়দা ও সুজি দেবার কথা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী পূজার একমাস আগে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, পূজার সময় ময়দার অভাব হবে না। তা' ছাড়া, তিন সপ্তাহ অতিরিক্ত চাল সরবরাহের কথাও ছিল। গম, আটা, ময়দা ও সুজি তিনি দিতে পারেন নি। চালও সকলে পায় নি। ভাগ্যবান, বিত্তবানদের পল্লীতে অবশ্যি ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল। সেখানে কোনটারই অভাব ঘটে নি।

মুখ্যমন্ত্রী সিংহলের নারকেল তেল দিয়ে সরষের তেলের অভাব পূরণ করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সরষের তেলের বিকল্পের পরিকল্পনা নিয়েও সরকার মাতামাতি কম করেন নি। মাতামাতিই সার হয়েছে। বাঙালীর রান্নার প্রধান উপকরণ তেল বাজার থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তেল ও ডালের দাম আবার নতুন করে ঘোষিত হয়েছে। ৮০ পয়সার ডালের দাম গেল তিনমাসে বেড়ে যেখানে গিয়ে উঠেছিল সেটাই ঘোষিত হয়েছে ন্যায্যমূল্য হিসেবে। তাই বলছিলাম শক্তিসাধনায় আমরা সিদ্ধিলাভ করতে পারি নি। আমাদের সঙ্কল্পের অভাবে, আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আসুরিক শক্তি বিস্তার লাভ করছে।

কালোবাজারের অসুরদের দমন

করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে না নামতে পারলে সরকারের নয়া খাদ্যব্যবস্থাও বানচাল হতে পারে। খাদ্যশস্য রাষ্ট্রায়ত্ত করে মুনাফাখোরদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা সরকার করেন নি। শস্যের দাম বেঁধে দিলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সে অভিজ্ঞতা পশ্চিম বাংলা সরকারের কম নয়। ধান-চাল থেকে সুরু করে মাছের দাম বেঁধে দিয়ে কোন ফল হয় নি। সরকার যে দামই নির্ধারণ করুন না কেন, তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ীরা খুশিমত দাম দিয়ে শস্য গুদামজাত করতে একটুও দ্বিধাবোধ করবে না। অর্থাভাবে চাষীর মাথা পর্যন্ত বাঁধা পড়ে আছে মহাজনের ঘরে। দরিদ্র চাষীকে দাদন দিয়ে শস্য কাটার আগেই পাইকার ও মজুতদারের দল ক্ষেতের শস্য কিনে রাখে। এ সব কথা সরকারের অজানা নেই। কাজেই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন দাম নির্ধারণেই খাদ্যসমস্যার সমাধানের আশা করা সমীচীন হবে না।

কলকাতার মানুষ উচিত মূল্যের দোকান থেকে যে চাল এখন পাচ্ছে তাতে কাঁকরের ভাগ দিনের পর দিন বাড়তে সুরু করেছে। প্রতি কে-জি চালে প্রায় একশ' গ্রাম করে কাঁকর কিনতে হচ্ছে গাঁটের পয়সা খরচ করে। তাও পেতে হলে সকাল থেকে লাইনে ধর্ণা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এখনও যাঁরা কাঁকরবিহীন চাল কিনছেন বাজার থেকে, এড়িয়ে চলছেন রেশনের দোকানে ধর্ণা দেবার কষ্টকে—তাঁরাও বাধ্য হবেন ন্যায্য-মূল্যের দোকানের খাতায় নাম লেখাতে। দোকানের সংখ্যা সে ক্ষেত্রে যেমন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হবে তেমনি প্রয়োজন হবে সরবরাহের দিকটা শক্তিশালী করে গড়ে তোলা। আগামী দু'মাসে সরকারের আমলারা কতটা তৎপর হতে পারবেন তার ওপর নির্ভর করে নতুন রেশন ব্যবস্থার সাফল্য। তার প্রস্তুতি এখন থেকেই প্রয়োজন। আমরা বরাবর এ কথাই বলে এসেছি। আট-ঘাট না বেঁধে কোন কাজে নামতে নেই। তাতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পরিণত হয়ে যায়। হচ্ছেও তাই। খাদ্যশস্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার সংগঠনের অভাবের কথাটাও সরকারকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমরা বলেছিলাম, সে কাজে যে সংগঠনশক্তি ও অর্থবলের প্রয়োজন তা সরকারের নেই। অযথা গালভরা কথা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করে লাভ নেই।

এবারেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা না থাকলে সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ মিথ্যা আত্ম-প্রতারণার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ হতে পারে না। তবু, স্বীকার করতেই হবে সরকার আশার কথা শুনিয়েছেন। যারা ভোগের অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে কসুর করে নি তাদের কব্জা থেকে কলকাতার মানুষকে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা সরকার করছেন।

মেদিনীপুর:

দেশের মানুষ সহযোগিতার হাত প্রথম থেকেই প্রসারিত করে আছে। দীঘার সমুদ্র উপকূলে সরকার যেদিন স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলার কাজে হাত

● দশমীর অপরাহ্নে প্রতিমা বরণের দৃশ্য।

দিয়েছিলেন সেদিনই স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এসেছিল সরকারকে সাহায্য করতে। তারা জানিয়েছিল সমুদ্রের অনন্ত ক্ষুধা। সে গ্রাস করে চলেছে দীর্ঘকাল ধরে দীঘাকে। সমুদ্রকে ঠেকাতে না পারলে স্বাস্থ্যনিবাস নিরাপদ হতে পারে না। সরকার সমুদ্রের করাল গ্রাস থেকে দীঘাকে বাঁচাবার কোন ব্যবস্থা না করেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নির্মাণ করেছেন সুদৃশ্য স্বাস্থ্যনিবাস।

দীঘা এখন আকর্ষণ করছে বাংলার বাইরের পর্যটকদের পর্যন্ত। পূজার সময়েও দীঘাতে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছিল। ভরে গিয়েছিল স্বাস্থ্য-নিবাসের প্রতিটি ঘর। দীঘার ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। সাগর আবার যেভাবে মেতে উঠেছে তাতে সকল সম্ভাবনাই একদিন সে সাবাড় করে দিতে কসুর করবে না। সাগরের উথালি-পাথালি তরঙ্গাঘাতে দীঘার বালিয়াড়ী ও ঝাউবনে বিরাট ভাঙন সুরু হয়েছে। স্থানীয় মানুষের মনে আবার সৃষ্টি হয়েছে আশংকার।

পশ্চিম বাংলা সরকার নাকি এ ভাঙনে একটু ভীত হন নি। তাঁদের মতে এটা সমুদ্রের সাময়িক খেয়াল। তবে, সরকার একেবারে নিষ্ক্রিয় নন। তাঁরা সমুদ্রের ঢেউ গুণে দেখার যন্ত্র আনবেন বিদেশ থেকে। তার জন্য চাই বৈদেশিক মুদ্রা। এ মুদ্রা রাজ্য সরকার চেয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায় নি। নদী গবেষণা সংস্থাও নাকি উপকূলের ভাঙন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কিছু কিছু করেছেন। খুবই আশার কথা। সরকার আরও আগে এ কাজ করতে পারতেন। সাধারণ মানুষের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারলে দীঘার সুরম্য ঝাউবন রক্ষার ব্যবস্থার কথাটাই সরকারের আগে মনে পড়তো। আজ দীঘার সমুদ্রের প্রলয়নাচন দুশ্চিন্তার কারণ হতো না।

হুগলী:

ধনিয়াখালির সোমনপুর অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ ও সদস্যরা পড়েছেন বিপদে। বিপদটার সুরু এক দফাদারকে ছাঁটাই নিয়ে। এ ঘটনা চার বছর আগেকার। দফাদারের ছাঁটাই ও তার জায়গায় আরেকজনকে নিয়োগ নাকি যথাযথ হয় নি। এ নিয়ে চলেছে একটার পর একটা মামলা। সব ক'টা মামলাতেই হার হয়েছে অঞ্চল পঞ্চায়েতের। টাকাও খরচ হয়েছে এতে অনেক।

দফাদারকে মামলায় হারাতে না পেরে এখন যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা সত্য হলে, খুবই মারাত্মক। একজন সামান্য কর্মী দফাদার। তাকে ঘায়েল করতে এত নিম্নস্তরের কাজে কেউ নামতে পারেন বিশ্বাস করাও কঠিন। শোনা যাচ্ছে, তার বিরোধী দলের লোকেরা তাকে চীনাদের ও পাকিস্তানের চর বলে রটাতে সুরু করেছে। এর চাইতে ঘৃণ্য কোন কাজ কল্পনারও অতীত।

অঞ্চল পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে এমনি করে টাকা মামলার জন্য জলের মত খরচ করলে পঞ্চায়েতীরাজ গঠনের স্বপ্ন দুদিনেই ভেঙে যাবে।

* * *

দশঘরা অঞ্চলের দীঘিড়া কাগজ-কলের তিরিশজন শ্রমিক এখন অসহায়। হাতে তৈরি কাগজের কলটি প্রায় চার মাস অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

এ ঘটনা নতুন নয়। মাঝে মাঝেই কলটি বন্ধ থাকে। ১৯৬৩ সালের শেষে মাসপাঁচেক বন্ধ ছিল। মেসিন তখন ভেঙে গিয়েছিল এবং কর্তাব্যক্তিরা কাঁচা মাল সংগ্রহ করতেও অসমর্থ হয়েছিল। এবারেও একটি যন্ত্র বিকল হয়েছে। কর্তাদের কাছে কর্মীরা ছুটি মেরামতের আবেদন করে কোন সদুত্তর পায় নি। এ কলের কর্তৃস্থানীয় যাঁরা তাঁরা নামজাদা কংগ্রেসকর্মী।

কর্তৃত্ব যার হাতে থাক না কেন, সাধারণ শ্রমিকের জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলার অধিকার কারোরই নেই। কাগজের কলটি অলাভজনক হলে তা' বন্ধ করে দিলেই ঝামেলা চুকে যেতে পারে। এ পথ খুবই সহজ। শ্রমিকরাও আর আশায় আশায় দিন গুণবে না। একটু চেষ্টা করলে কলটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা অসম্ভব হবে না বলেই আমরা মনে করি। সে উৎসাহ স্থানীয় কংগ্রেস-সেবী কর্মকর্তাদের না থাকলে তাঁরা সরে দাঁড়াতে পারেন। উদ্যোগী মানুষের অভাব দেশে হবে না।

* * *

তারকেশ্বরের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের নলকূপটি বিকল হয়ে পড়ে আছে। জলের অভাবে চরম দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়েছে। দূর থেকে পরিমিত পরিমাণ জল টেনে আনার জন্য পর্যাপ্ত সংবাহক কর্মীও হাসপাতালে নেই।

হাসপাতালটির প্রধান চিকিৎসককে বদলী করা হয়েছে বছর দেড়েক পূর্বে। এখনও পর্যন্ত তাঁর জায়গায় নতুন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয় নি। হাসপাতালে রোগীর সংখ্যাও কম নয়। গড়ে প্রতিদিন তিনশ' রোগী আসে এখানে।

বীরভূম:

আমেদপুরের চিনির কলটি মাদ্রাজে চালান দেবার তোড়জোড় আবার নতুন করে সুরু হয়েছে। অজুহাতের অন্ত নেই। প্রধান অজুহাত চিনির কলকে চালু রাখার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ আখের যোগান হচ্ছে না। তিন হাজার একর জমিতে আখের চাষ হলেই কলটি চালু রাখাও নাকি সম্ভব।

চিনিকলটির আশেপাশেই রয়েছে ময়ূরাক্ষীর খাল। খাল থেকে জল সরবরাহ হয় বীরভূমের ২৫ হাজার একর জমিতে। কাগজে-পত্রে যে-কথা প্রচার হচ্ছে বাস্তবে তা' সত্য হলে কলটিকে তুলে মাদ্রাজে পাচারের যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বীরভূমে

আখের উৎপাদন নেহাৎ কম নয়। চাষীদের একটু উৎসাহিত করতে পারলেই তারা উৎপাদন বাড়াতে পারে। মুর্শিদাবাদেও আখের চাষ বৃদ্ধির প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। চাষী ন্যায্য মূল্য পেলে নতুন উদ্যমে মাঠে নেমে যাবে। চাষী চিনিকলের কর্তাব্যক্তিদের কাছে ন্যায়বিচার পায় নি। এ অভিযোগও নতুন নয়। চিনির কলে আখ বেচে সময়মত তারা দাম পায় নি। মূল্য আদায় করতে গিয়ে তাদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতেও হয়েছে।

সরকারী অর্থানুকূল্যেই গড়ে উঠেছিল এ কলটি। শিল্পে অনগ্রসর বীরভূমের মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধির দিক বিবেচনা করেই সরকারের কোষাগারের অর্থ নিয়োগ করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছেও শেয়ার বিক্রি করে টাকা তোলা হয়েছিল। পরিচালকদের অযোগ্যতার জন্য বীরভূমের মানুষকে অযথা বঞ্চিত করে মিলটি তুলে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অন্যায়।

মুর্শিদাবাদ:

বহরমপুর পৌরসভার হেল্থ অফিসারের পদ শূন্য হয়ে আছে। আড়াই বছর কেটে গেল কর্মকর্তারা এই শূন্যপদ পূরণ করতে পারেন নি। আড়াইটি বছর ধরে কাজ চালাচ্ছেন এক স্যানিটারী ইনসপেক্টর। বহরমপুর পৌর এলাকার বাসিন্দার সংখ্যা হবে প্রায় এক লক্ষ।

শোনা যাচ্ছে কর্তারা একেবারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এবং এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের শরণাপন্নও হয়েছিলেন। দুশ' ষাট থেকে চারশ' বিশ টাকা বেতনে কাজ করতে সম্মতি জানিয়ে কোন এম-বি, ডি-পি-এইচ ডিপ্লোমাধারী চিকিৎসক আবেদন করেন নি। মামুলি বাঁধাধরা পথ ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করতে পারলেই সমস্যার সমাধানটা সহজ হতো এবং নাগরিকগণ উপযুক্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো না। পৌরপিতারা তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হলে এমন দুরবস্থা হতে পারতো না। ১৯৬৩ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে বহরমপুর পৌরসভার মাথায় অবশ্য বসে আছেন একজন সরকার নিযুক্ত প্রশাসক। আমলার হাতে পৌরসভা আসার পর আমলাতন্ত্রের বাইরে কিছু আশা কেউ করেন না—করা সম্ভবও নয়।

পৌরসভার নির্বাচনের বৈধতার ফয়সালা হয়ে গেছে। এখন কর্মকর্তা নিয়োগের পালা। এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও তৎপরতা সুরু হয়েছে। নতুন পৌরসভা নির্দিষ্ট অর্থে হেল্থ অফিসার না পেলে, দুশ' ষাটের পরিবর্তে তিনশ' ষাট দিলেই লোকের অভাব হবে না। তাতেও অভাব হলে, নয়া পাশ করা একজন এম-বি, বি-এস চিকিৎসককে অনায়াসেই নিয়োগ করতে পারেন। স্যানিটারী ইনসপেক্টরের চাইতে এম-বি, বি-এস খারাপ হবে না।

* * *

সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। মফস্বলের 'ক' শ্রেণীর রেশন কার্ড সরকার যাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, তাদের কথা দিয়েছিলেন প্রতি সপ্তাহে চাল ও গম সরবরাহ করবেন। গম এখন দুষ্প্রাপ্য। রেশনের দোকানে নিয়মিত গম সরবরাহ হচ্ছে না। বাজারে আটা বিক্রি হচ্ছে প্রতি কে-জি ৭৫ পয়সা করে। চাল দেবার কথা ছিল মাথা-পিছু এক কে-জি। অধিকাংশ গ্রামের মানুষই রেশনের দোকানে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছে। সবদিন চাল পাওয়া যাচ্ছে না।

এ এক তাজ্জব ব্যাপার। সরকার যাদের দোকান মঞ্জুর করেছিলেন তারা নাকি এখন পিছিয়ে পড়ছে। পরিমিত পরিমাণ গম ও চাল তারা দোকানে তুলছে না। কেন এমন হল? একদিকে সরকার চাহিদা-মাফিক সরবরাহ দিয়ে উঠতে পারছেন না। আরেকদিকে সরবরাহ পেয়েও দোকানী হেলায় তা ছেড়ে দিচ্ছে। শোনা যাচ্ছে মুনাফায় পোষাচ্ছে না। পেছনের দরজা দিয়ে মাল পাচারের পথ যেখানেই বন্ধ হয়েছে সেখানেই এই অবস্থা ঘটেছে। তাই বলছিলাম, এ এক বিচিত্র

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

পরিস্থিতি। ন্যায্যমূল্যের দোকান যাঁরা চালাবে তারা কেউ দেশসেবার ব্রত গ্রহণ করে নি। তাদের ন্যায্য মুনাফার পথ না থাকলে ভিন্ন পথে তারা নামতে বাধ্য। সে পথ বন্ধ হলে আবার বাধ্য হয়েই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করবে। খাদ্য দপ্তরের এ কেরামতির কথা আমাদেরও জানা ছিল না। খাদ্য দপ্তরের দপ্তর চালাচ্ছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। আমরা এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্ধমান:

দুর্গাপুরের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বেকার সমস্যার একটা সুরাহা হবে, এমনি আশার সঞ্চার করেছিলেন আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। এখন দেখা যাচ্ছে প্রাদেশিক স্বার্থ সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওপর-ওয়ালারা যোগ্যতার বিচারের চাইতে নিজের নিজের এলাকার মানুষ নিযুক্ত করার দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন বেশি করে। এ ছাড়া, আবার প্রিয়জন হলে তো কথাই নেই। সেখানে যোগ্যতার মাপকাঠি হয়ে পড়ছে আত্মীয়তা। এর ফলে বিরাট অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে সর্বত্র।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার স্থানীয় কর্মচারীদের একে একে বিতাড়নের একটি চক্রান্ত চলে আসছে বহুদিন থেকে। এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নেই, তেমনও নয়। ডি-জি-এম (প্ল্যাণ্ট)-এর ১৬ই সেপ্টেম্বরের এক সার্কুলারে জনৈক অফিসারকে বিভাগীয় অন্যান্য যোগ্য অফিসারের দাবি অগ্রাহ্য করে নিয়োগের চেষ্টা চলেছে। যিনি আসছেন তিনি রুরকেল্লায় ছিলেন একজন সামান্য অফিসার। সেখানে কাজ করেছেন বছরখানেক। স্থানীয় কর্মচারীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বয়সের বাধানিষেধ আরোপ করে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

ন্যায়বিচার না পেলে মানুষ সন্তুষ্ট-চিত্তে কাজ করতে পারে না। অন্যায়, অবিচার চলতে থাকায় গেল ছ'মাসের ভেতর তিনজন স্থানীয় অফিসার চলে যেতে বাধ্যও হয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই ইঞ্জিনীয়ার এবং অভিজ্ঞ স্টোর্স অফিসার ছিলেন। এই অবিচারের প্রতিকার না হলে ধূমায়িত অসন্তোষ একদিন বিস্ফোরণের সৃষ্টি করতে পারে। এ নজীরের অভাব নেই। রাঁচীর ভারী শিল্পের অগ্নিকাণ্ডের কথাটা যেন কর্তারা না ভুলে যান।

* * *

হাসপাতালের পরিচালনা ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি, চিকিৎসক ও কর্মীদের ঔদাসীন্যে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ স্বভাবতই সেবাপরায়ণ। অপরের দুঃখ ও বেদনা তার চিত্তকে সহজেই বেদনার্ত করে তোলে।

শ্রীপ্রফুল্ল সেন

চিকিৎসাকার্যকে যাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেবার মনোভাব তাঁদের মধ্যে আরও বেশি করে বিকশিত হওয়ার কথা। বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই মিলছে তার বিপরীত সাক্ষ্য। এই ধরণের একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা করছি।

মন্তেশ্বরের পুলিশ কাদম্বিনী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শ্রীমতী স্বর্ণরাণী সাহাকে পাঠায় বিজয়চাঁদ হাসপাতালে। স্বর্ণরাণীর মাথায় ও পাঁজরে জখম গুরুতর ছিল। অবিলম্বে তার এক্স-রে প্রয়োজন। এ কথা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থেকেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরদিন তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও সপ্তাহকাল তার এক্স-রে করার কোন বন্দোবস্তই চিকিৎসকগণ করেন নি। সপ্তম দিনে বিষয়টি ডি-এম-ওর নজরে আনা হলে তিনি নিজে সরেজমিনে নেমে দেখতে পান স্বর্ণরাণীর কাগজপত্রে তখনও এক্স-রে করার কোন নির্দেশই কেউ দেন নি।

এর চাইতে নিষ্ঠুরতা কল্পনা করা যায় না। রুগিণী যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় সাত-সাতটা দিন হাসপাতালে পড়ে আছেন। চিকিৎসকদের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। আমরা আগেই হাসপাতালের অব্যবস্থা, চিকিৎসক ও নার্সদের হৃদয়হীনতার প্রতি স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। আশা হল এককালের সমাজসেবিকা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের হৃদয় ক্লিষ্টের কাতরতায় কেঁদে উঠবে। এখন দেখছি, তিনিও আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে সম্পূর্ণ আটকা পড়েছেন।

* * *

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৬৯তম অধিবেশনের প্রস্তুতির কাজ এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। দুর্গাপুরে আগামী জানুয়ারীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হচ্ছে।

আঞ্চলিক অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয় সেদিন উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। তিনি দুর্গাপুরে কংগ্রেস অধিবেশনকে সফল করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়েছেন। কংগ্রেসের আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনের কথাও বলেছেন।

কংগ্রেস সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত নয়। তার আদর্শের কথাও মানুষ অল্পবিস্তর অবহিত। সেই আদর্শ কংগ্রেসসেবীর হাতে কতটা রূপায়িত হয়েছে সেইটাই এখন বিচার্য বিষয়। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কংগ্রেসের আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলেই সাধারণ মানুষ সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবে। নতুন করে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারের আর প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি নে।

অথ থিয়েটার কথা

থিয়েটার, অপেরা, ব্যালে ইউরোপীয় সমাজে সভ্যতার অন্যতম অঙ্গ। সংস্কৃতির তৃষ্ণা মেটাতে সর্বদেশেই এই ললিতকলার চর্চা হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক বিবর্তন যেমন স্বাভাবিক ঘটনা, তেমনি নাট্যকলার বিবর্তনও স্বাভাবিক। সৎ, চিৎ, আনন্দম্।—আমি আছি, আমি জানি, আমি আনন্দে মিশে যেতে চাই—এই হ'ল জীবনের কথা। আর জীবনের গানই ত' সংস্কৃতি। তাই সাহিত্য, নাট্যধারার মধ্যে যে সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় লুক্কায়িত তাকেই আমরা সে সমাজের প্রগ্রতির পরিচয় বলে গ্রহণ করে থাকি। নীতিকথা বলে নাসিকা কুঞ্চন করলেও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না।

ইউরোপের অন্যান্য প্রধান দেশগুলোর জীবনপ্রবাহের আবর্ত থেকে জার্মানীর দূরে থাকা কোনভাবেই সম্ভব নয়। জার্মানীর ওপর দিয়ে রাজনীতির ঘূর্ণিপাক যেন একটু বেশি মাত্রায় বরাবরই চলে আসছে। বর্তমান শতকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রশাসনের ঘূর্ণিপাকে জার্মানীকে যেমনভাবে বিধ্বস্ত হতে হয়েছে, বোধ করি এতবড় ধাক্কা অন্য কোন ইউরোপীয় দেশকে পেতে হয় নি। জার্মানী আজ দ্বিধা-বিভক্ত। দ্বিখণ্ডিত জার্মানীতে দুটো স্রোতধারা প্রবাহিত। ফলে ঐতিহ্যময় জার্মান-সংস্কৃতিতেও এসেছে জটিলতা। এসেছে বিভিন্নতা। এসেছে বাধা-বিপত্তি।

যুদ্ধের হারজিত সংস্কৃতির মরণকাঠি জীয়নকাঠি নয়, জার্মানীতে যুদ্ধের ধাক্কা আগেও লেগেছে। ইতিহাস বলে, তাকে হারতেও হয়েছে এর আগে। কিন্তু সে হারার ফলে জার্মানদের হারাতে হয় নি তাদের সংস্কৃতিসত্তা, সঙ্গীত আর নাট্য-নৃত্যকলা। কিন্তু এবারের সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে জার্মানী যেমন তার মান হারিয়েছে, তেমনি হারিয়েছিল মানসলোকের সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ বিস্তার। হিটলারী নাৎসী-বাদের সর্বাত্মক শাসন

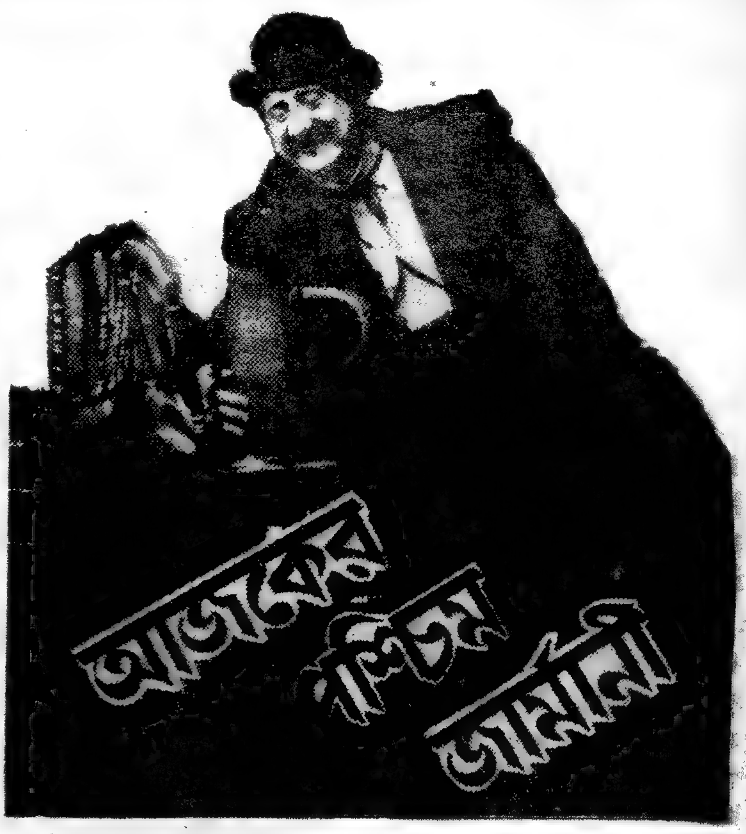

● পশ্চিম জার্মানীর অধুনা নাট্যান্দোলনে শক্তিশালী নাট্যাভিনেতা বার্ট ব্রেচ-এর জুড়ি পাওয়া দায়।

নিয়ন্ত্রণে জার্মানী বিচ্যুত, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য থেকে। হিটলারবাদের উদ্ভবে ও বিস্তারে জাতীয় সংস্কৃতির বিকার ও অপমৃত্যু ঘটে। সতেরো শতকের ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ যে নাট্য-কাব্যধারাকে নিঃশেষ করতে পারে নি। নেপোলিয়ানের পায়ের তলায় গোটা

মৈত্রের

জার্মান জাতির গৌরব ধুলিসাৎ হওয়া সত্ত্বেও যখন দেখা যায়—নাটক আর সঙ্গীতের তত্ত্ব অনুশীলনে জার্মান-নাট্য-সঙ্গীতের স্বর্ণযুগ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর দুর্বল ভাইমার রিপাব্লিকের আমলেও যখন দেখা গিয়েছিল মানবতন্ময়তার বিচিত্র সমারোহ। এর্নাস্ট-টলার, জর্জ কাইজারের গদ্য-নাট্য, সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্রের শিল্পকৌশল থেকে রসোপকরণ সংগ্রহ করেই যখন রচিত হয় দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে নাট্যকাব্যে নব নব প্রকল্প। সেই ঐতিহ্যময় গৌরবদীপ্ত জার্মান-সংস্কৃতিরও অন্ধকারের যুগ আসে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন কটা বছরে। উনিশশো তেত্রিশ থেকে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল পর্যন্ত যেন জার্মান-সংস্কৃতির অন্ধকারের রাজত্ব। গদাবাদীদের হুঙ্কারে তখন জার্মানীর সৃজনীশক্তি বিধ্বস্ত। সেই ভয়ঙ্করী হিটলারবাদের অবসান ঘটেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ে।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় জীবনে নতুন পরিচ্ছেদ সুরু হয়। যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হ'ল দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী। অতএব চিন্তার দুটো স্রোত বইছে দুটো জার্মানীতে। সংস্কৃতির দুটো গতিধারা।

যুদ্ধের দানও রয়েছে বইকি। হিটলার-বাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে উঠছে গণতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানী। অসাধারণ কর্মকুশলতায় জার্মানরা অন্য ক্ষয়ক্ষতি গত দু'দশকে প্রায় মুছে ফেলেছে। যুদ্ধোত্তর জার্মানীর প্রথম পর্বে জার্মান মানসলোকে যে এক মহাজাগতিক শূন্যতা দৃষ্ট হয়েছিল দুই জাতি, দুই প্রাণ, দুই রাষ্ট্র, দুই বিপরীতধর্মী রাষ্ট্র-নীতি দেখে, তার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আজকের পশ্চিম জার্মানীর সৃষ্টিধর্মী শিল্পীরা। আবার তারা যেমন ঘর বেঁধেছে, তেমনি বেঁধেছে রঙ্গমঞ্চ, নতুন পালা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর নতুন গড়ে ওঠা পশ্চিম জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবনে নব পরিকল্পিত নাট্যধারা অনেক নতুন আলোক-পাতের সন্ধান দিয়ে আসছে। গোটা জার্মান থিয়েটারের মোটামুটি চরিত্র—এর ইতিহাস আর বর্তমান অবস্থার কথা জানাতে প্রথমে বলে রাখি, জার্মান জাতির চরিত্রের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কর্মকুশলতা—তারই প্রতিচ্ছবি আজকের পশ্চিম জার্মানীর থিয়েটারের মর্মকথা। জার্মানীতে প্রচলিত প্রবাদ বাক্য 'মঞ্চটাই জগৎ'—এর যথার্থতা যেন লুকিয়ে রয়েছে থিয়েটারের স্টেজে। এটি শিল্পীদের চোখে যেমন তাদের জগৎরূপে পরিগণিত; তেমনি দর্শক-বৃন্দের কাছেও। যে জগতের সঙ্গে দিনের পর দিন তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপন করতে হয়ে থাকে সেই জগতের প্রতিচ্ছবি যেমন এই থিয়েটারের স্টেজে উপস্থাপিত হয়; তেমনি সাময়িক কালের জন্য, মাত্র দু'তিন ঘণ্টার জন্যে হলেও সম্পূর্ণভাবে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট, দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে এই রঙ্গমঞ্চ শিল্পী ও দর্শক উভয় গোষ্ঠীকেই অন্য এক আনন্দ ও চিন্তার রাজ্যে ঠেলে নিয়ে যায়।

নাট্যজগতের নিজস্ব পরিবেশ রয়েছে। সে পরিবেশে কত শত লেখক স্বপ্ন দেখে তাদের সৃষ্ট নায়ক-নায়িকা, বিভিন্ন চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠবে বলে। সে সুখস্বপ্নে তারা এক আনন্দ-জগতের স্পর্শ পায়। কত শত যুবক-প্রাণও নেচে ওঠে ঐ সব চরিত্রগুলিকে রূপদানের জন্য। আবার কেউ বা খুঁজে পায় নাটকের চরিত্রের মধ্যে নিজেকে। আমরা 'কালচার' বা সংস্কৃতি বলতে যা বুঝি এই থিয়েটার বা নাট্যকলা হ'ল তারই একটি অংশ বিশেষ। এই অর্থে সমাজের সংস্কৃতি যতভাবে জাতির বিভিন্ন সত্তাকে পরিস্ফুট করে থাকে, নাট্যধারাও তেমনি জাতির বিভিন্ন রূপকে প্রকাশের একটি বিশেষ সহায়ক। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পার্থক্য বা ঐক্য বোঝার পক্ষে এক দেশের নাট্যধারার সঙ্গে অন্য দেশের নাট্যধারার বিচারেই সম্ভব। প্রত্যেক জাতি ও তার সংস্কৃতির পরিবর্তন কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হওয়া স্বাভাবিক। জার্মান নাট্য-কলার পরিবর্তনও তাই স্বাভাবিক। সে পরিবর্তনের ঢেউয়ে পশ্চিম জার্মানীর নাট্যধারায় এসেছে নতুন জোয়ার।

ওদেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে আজ মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সুরু হয়েছে।

● মিউনিক ও বার্লিন মঞ্চের সুপ্রতিষ্ঠিতা সুন্দরী মঞ্চাভিনেত্রী হেইডলিণ্ডে ওইজ চলচ্চিত্রেও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

আধুনিকতম জার্মান-নাট্যমঞ্চস্থাপত্যে নতুন রীতিনীতির স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে পশ্চিম বার্লিনে অভিনীত 'রোসামুণ্ড ফ্লোরিশ' নাটকের দৃশ্যে।

বর্তমান পশ্চিম জার্মানীর নাট্যধারায় এই মধ্যবিত্ত সমাজের চরিত্র ও শ্রমিক-শ্রেণীর ছবি ফুটে উঠেছে, যেখানে পুরোন নাট্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল আদর্শবান কোন অভিজাত চিন্তা বা ব্যক্তি বিশেষ। গোটা জার্মান-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে এক নাট্যকলার মাধ্যমেই। এই নাট্যধারার বিকাশ ঘটেছে সামান্য কয়েক বছরের চর্চার ফলে।

গত মহাযুদ্ধে জার্মান-শক্তির আত্মসমর্পণের কিছু পূর্বেই ১৯৪৪ সালে ওদেশে সমস্ত রঙ্গমঞ্চের দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অভিনেতৃ দলগুলি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে যায়, এবং শিল্পীদের যুদ্ধে যোগদান করতে হয়। কেউ বা সৈন্যবাহিনীতে মেসিনগান বয়ে চলেছে, কেউ বা অস্ত্র তৈরির কারখানায় কাজ করে চলেছে মারণাস্ত্র তৈরির কাজে। শিল্পীরা তখন সাজঘরের চত্বর ছেড়ে আস্তানা গেড়েছে যুদ্ধসীমান্তে। গীটারের বদলে হাতে নিয়েছে রাইফেল। রাজবস্ত্র পাল্টে পরেছে সৈনিকের পোষাক। যুদ্ধশেষে অনেকেই ফিরতে পারে নি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। এমনিভাবেই গোটা জার্মান নাট্যজগতের সমাধি ঘটে। যুদ্ধশেষে দ্বিধাবিভক্ত জার্মানীতে নাট্যকলাতেও ঘটেছে দ্বিধাবিভক্তি। তাই আজকের এ নাট্যধারাকে আর 'জার্মান নাট্যকলা' বলে উল্লেখ করা চলে না। ফেডারেল রিপাব্লিকের এই নবনাট্যধারার সঙ্গে পূর্ব জার্মানীর নাট্যধারার পার্থক্য রয়েছে।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালেই ছোট-বড় শহরে, এমন কি গ্রামে গ্রামে আবার নাট্যমঞ্চ দেখা যেতে লাগলো। তখন কেবলমাত্র দু-একজন নাট্যশিল্পী বা অধিকারীর উৎসাহেই তা সম্ভব হয়েছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানীতে বড় বড় নাট্যমঞ্চগুলি সমস্তই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তবুও অত্যুৎসাহী এরকম দু-একজন নাট্যরসিকের প্রচেষ্টায় পশ্চিম জার্মানীর সমাজজীবনে আবার নাট্যধারার বারি সিঞ্চন সুরু হয়। তথাকথিত রঙ্গমঞ্চের ধ্বংসের ফলে পশ্চিম জার্মানীর নাট্যধারায় এলো নতুন আঙ্গিক। মুক্ত অঙ্গনের প্রচলন ঘটে কেবলমাত্র প্রেক্ষাগৃহের অভাবে। তারা সুরু করলো বাড়ির ছাদে। বাড়ির প্রাঙ্গণে নাট্যমঞ্চ তৈরি করে মুক্ত অঙ্গনে নাট্য প্রযোজনা, এমন কি দেখা গেল, যে ঘরে পঞ্চাশ-ষাটজন মানুষের বসবার ব্যবস্থা সম্ভব সেখানেই ছোট ছোট নাট্যদলগুলো নাট্যমঞ্চ তৈরি করতে এগিয়ে আসছে।

এত কষ্টের মধ্যে নাট্যসাধনাতেও তাদের সবচেয়ে বড় তৃপ্তির কথা হ'ল, ওরা আবার তাদের পুরোন বৃত্তিকে খুঁজে পেয়েছে। তারা আবার

নাট্য প্রযোজনায় এগিয়ে এলো সেই সব নাটক নিয়ে, যেগুলো সেই বারো বছর—হিটলারী রাজত্বে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যেগুলি লণ্ডনে, প্যারিসে, নিউইয়র্কে অভিনয় হতে থাকলো—অথচ জার্মানীর লোক ভুলে যেতে বসেছিল। যে নাট্য-ঐতিহ্য জার্মান নাট্যকার, শিল্পীরা সংগ্রহ করেছিল দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়। যার প্রভাব ইংরেজী, মার্কিনী, ফরাসী নাট্যধারাতেও দেখা গিয়েছিল, তা বারো বছরের অন্ধকারের রাজত্বে ধ্বংস হয়ে গেলেও নতুন পশ্চিম জার্মানীর সমাজচেতনায় এই বিশ বছরের নবনাট্য আন্দোলনে আবার নতুন আকারে ফিরে এসেছে বলা যেতে পারে।

বর্তমান পশ্চিম জার্মানীতে নব-গঠিত নাট্য প্রযোজনরীতিতে বড় নগর ও শহরে দেখা যায় নতুন ও আধুনিকতম নাট্যশালা গড়ে উঠেছে এক এক নাট্যদলের তত্ত্বাবধানে। এগারো মাসের বাৎসরিক মরশুমে তারা বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে। একটা বড় শহরে রয়েছে এমন একাধিক বড় বড় থিয়েটার যেখানে গোটা মরশুমে অভিনীত হয়ে থাকে বিভিন্ন ধরণের নাটক। কোন নাট্যশালায় কেউ দেখছে কোন মিলনান্তক বা হাল্কা হাস্য-রসাত্মক নাটক, কোথাও বা আবার বিয়োগান্ত নাটক। আবার অপেরা হাউসে ঐ একই সঙ্গে চলছে এমনি ধরণের নাট্য প্রযোজনা। ছোট ছোট শহরে যেখানে কেবলমাত্র একটি নাট্যশালা রয়েছে সেখানে একই মরশুমে একই মঞ্চে বিয়োগান্তক থেকে হাস্যরসাত্মক, মিলনান্তক নাটক, এমন কি অপেরা ব্যালে পর্যন্ত প্রযোজিত হয়ে থাকে।

ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনামূলক পার্থক্য হিসাবে প্রথমেই চোখে পড়ে, এই প্রাণচঞ্চল পশ্চিম জার্মানীর নাট্য প্রযোজনায় কোন জাতীয় নাট্যশালা অথবা সাধারণের জন্য বা সাধারণ অনুমোদিত নাট্যবিষয়ক কেন্দ্র বলে কোন কিছু নেই। পশ্চিম জার্মানীতে প্রত্যেকটি থিয়েটার গড়ে উঠেছে হাত ধরাধরি করে স্ব-বৈশিষ্ট্যে। প্রত্যেক থিয়েটার স্বাধীন ও পৃথক চিন্তা নিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক নাট্যপ্রযোজনায় সচেষ্ট। অন্যের মাহাত্ম্য বাড়ছে এবং কমছে পরিচালক-দের কৃতিত্বের ওপর। ইংলণ্ডের নাট্যশালার সঙ্গে এই জার্মানীর নাট্য-শালার অপর এক পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অনুষ্ঠানের লাভের ওপর নাট্যশালার পুঁজি গড়ে ওঠা বা অর্থ দাদনের যে প্রচলন রয়েছে ইংলণ্ডে তেমন অর্থসংগ্রহের ধরণ নেই জার্মানীতে।

সাধারণত পশ্চিম জার্মানীর নাট্য প্রযোজনার অর্থ যুগিয়ে থাকে শহর বা স্টেট। অর্থাৎ করদাতা নাগরিক-দের অর্থে টাউন অধিকর্তারা নাট্যশালার ব্যয় বহন করে থাকেন। সেই হেতু জার্মান-নাটকে দর্শকদের স্থূল রুচির কাছে আত্মবিক্রয়ের কোন ছোপ পড়ে না। নাট্য প্রযোগকর্তারা স্বচিন্তায় পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার সুযোগ পান। নাট্যরচনায় নতুনদের আগমন ঘটে। মুক্ত নাট্যচিন্তার অধিকারী তারা। প্রকৃতপক্ষে জার্মান নাট্যকলার ললিত রূপ চর্চার জন্য সর্ব সময় নির্দিষ্ট 'কালচারাল কমিশন' রয়েছে আর্থিক অভাব মোচন করবার জন্য। 'স্টেট বা টাউন' কর্তৃক দেয় অর্থকে এই কমিশন উপযুক্ত বণ্টন মাধ্যমে নাট্যশিল্পী, নাট্যকার ও প্রয়োগ-কর্তাদের শিল্পচর্চার সহায়তা করে থাকে।

প্রত্যেকটি থিয়েটারের নিজস্ব দল আছে। নতুন অভিনেতা অভিনয় শিক্ষার বিশেষ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে তার নাট্যজীবন সুরু করে কোন থিয়েটারে যোগ দিয়ে। আমাদের কলকাতার ফুটবল মরশুমে যেমন এক বৎসরের চুক্তিতে খেলোয়াড়দের দলভুক্ত হতে হয়, তেমনি পশ্চিম জার্মানীর প্রত্যেক বাৎসরিক মরশুম প্রারম্ভে প্রতিটি থিয়েটার দলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চুক্তিবদ্ধ হতে হয়। সে মরশুমের জন্য নির্দিষ্ট শিল্পী নির্দিষ্ট দলের বাইরে অভিনয় করতে পারবে না। অনেক সময় আধুনিকতম অনেক নাটক একটি থিয়েটার দলের পক্ষে মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। সে সব ক্ষেত্রে একাধিক দলের যৌথ প্রচেষ্টায় নাট্য প্রযোজনার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সাধারণত কোন শিল্পী সারা জীবন একই থিয়েটার দলে চুক্তিবদ্ধ থাকে না, নাট্যশিল্পীদের তখনই শিল্পকুশলতা বৃদ্ধি ঘটে যখন একাধিক নাট্য পরিচালকের হাতে বিভিন্ন রীতিতে অভিনয় শিক্ষা লাভ করে। তাই সাধারণ নাট্য অভিনেতাদের মধ্যে প্রতিটি মরশুমে দল পরিবর্তনের প্রবণতা লক্ষণীয়। দেশের নাট্য দর্শক, সমালোচক ও রসিকদের মধ্যে তাই মরশুমের প্রারম্ভে দল গঠনের সময় উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এ তো গেল পেশাদার নাট্যদলের কথা। যদিও উল্লেখযোগ্য যে, ওদেশে পেশাদার নাট্যমঞ্চগুলিই বিশেষ করে নবনাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ। অপেশাদার নাট্যদলও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নাট্য প্রযোজনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী। এরা ওদেশের অপেশাদার নাট্য প্রযোজনার অন্যতম অংশীদার। ছাত্রদল ছাড়াও সাধারণ জনসাধারণ—যাদের রয়েছে নাট্যানুকূল প্রবৃত্তি তারাও দল গঠন ক'রে নাট্যাভিনয় করে থাকে স্ব স্ব চিন্তায়। ১৯৪৯ সাল থেকে প্রতি বছর পশ্চিম জার্মানীর আর্লেঙ্গেন শহরে অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সম্মেলনে তারা নাট্য রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা করে, আন্তর্জাতিক নাট্যধারার বিশ্লেষণে সারগর্ভ সেমিনার বসে এবং বিভিন্ন দল তাদের নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে।

এ ছাড়া অনেক বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠান, যেমন পশ্চিম জার্মানীর উত্তরাঞ্চলে অনুষ্ঠিত 'সেক্সপীয়র ফেস্টিভ্যাল' এবং শ্রমিকজীবনের আলেখ্য সম্বলিত 'রুর ফেস্টিভ্যাল' জার্মান নাট্য আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে আছে। কোন কোন সময় দেখা যায় কোন দল তার চার দেয়ালের থিয়েটার ছেড়ে চলেছে গ্রীষ্মের ছুটিতে কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে বা প্রাঙ্গণে সে সব নির্দিষ্ট স্থানের ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ করতে।

নানাদিক দিয়ে, নানাভাবে জার্মান নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ স্বদেশের ও বিদেশের নাটক দেখবার বিভিন্ন সুযোগ পেয়ে বর্তমানে আনন্দিত। সারাদিন কাজের মধ্যেও নাট্যকলার আদর ওদেশে আজ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান শতকের চল্লিশোত্তর কালে বাংলা নাটকের দিগন্ত যে বিস্তৃত হয়েছে তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। সোচ্চারে তা ঘোষণা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে। কিন্তু তার মূল্যায়নের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। শিল্প-সাহিত্যের কোনো নব্যধারাকে বিচার করতে হলে তার তাত্ত্বিক দিকটিও স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করতে হয়। তত্ত্ব শিল্পও নয়, সাহিত্যও নয়। তত্ত্ব রসাশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেলেই তা শিল্প-সাহিত্যে পরিণত হয়। মেঘের আড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে; কিন্তু তারই কিরণে অন্তরাগের সৃষ্টি হয়, যার বর্ণচ্ছটা দেখে আমরা মুগ্ধ হই। আড়ালে থাকে বলেই সেখানে সূর্যের অস্তিত্ব মিথ্যে নয়। তত্ত্বও তেমনি নিজেকে আড়ালে রেখে শিল্প-সাহিত্যকে বর্ণাঢ্য করে তোলে। তত্ত্বকে বাদ দিলে শিল্প-সাহিত্য তার আপেক্ষিক গুরুত্ব হারায়।

এই কারণেই চল্লিশোত্তর বাংলার নব-নাট্যধারা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তার তাত্ত্বিক দিকটিও এসে যায়। নতুন বললেই নতুন হয় না। সেই নতুনের দাবি বিচারসহ কি না তাই হলো আসল বিচার্য বিষয়। প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় সাহিত্য-কলার বিকাশের একটি নিজস্ব ধারা ও পারম্পর্য থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিশ্বের চিন্তা ও ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দেশেরই সাহিত্য-কলা যথার্থ পরিপুষ্টি লাভ করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বার বার সেদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে গেছেন। অতএব জাগতিক পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দেশের নাট্যবিবর্তনের ধারা ও লক্ষণগুলি সম্পর্কে যদি সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা যায় তবে হয়তো আধুনিক বাংলা নাট্যধারার গতিপ্রকৃতি উপলব্ধি করতে খানিকটা সুবিধে হবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপে নাটকের মান অত্যন্ত নিম্নস্তরে চলে যায়। অতিনাটকীয়তা ও ভাবালুতাপূর্ণ নাটকগুলো তখন মঞ্চে স্থান পেতে থাকে। কিছু পুরনো ভালো নাটক অবশ্য মাঝে মাঝে অভিনীত হতো; কিন্তু ছাঁটকাট করে সেগুলোকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা হতো যে, সাহিত্যিক মহল ও নাট্য-রসিকরা তাতে দস্তুর মতো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। পুরনো নাটক তখন সংক্ষিপ্ত আকারে মঞ্চস্থ করার কারণও ছিল। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষের কর্মজীবন বেড়ে যাওয়ায় অবসর সময় কমে যায়। তাই নাট্যশালায় গিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে দর্শকরা প্রস্তুত ছিল না, আর সেই কারণেই নাটকের অঙ্গচ্ছেদ হতে লাগলো। তখন প্রয়োজন হয়েছিল নতুন নাটকের। পুরনো কাব্যনাট্য অনুসরণ করে নতুন নাটক লেখার চেষ্টা চললো; কিন্তু সে চেষ্টা এক রকম ব্যর্থই হলো বলা চলে। এমন কি ইংলণ্ডেও কোল্‌রিজ, ব্রাউনিং এবং টেনিসনের মতন শক্তিমান কবিরাও সে পথে গিয়ে ব্যর্থকাম হলেন। পুরাতনকে পুনরুজ্জীবিত করতে গিয়ে তাঁরা নাট্যশালাকে নতুন প্রাণশক্তি যোগাতে পারলেন না। এলিজাবেথীয় যুগের যে অবসান হয়েছে, মানুষের মনে যে নতুন চিন্তা ও ধারণা এসেছে, সেই নতুন চিন্তা ও ধারণা যে নাট্য-সাহিত্যেও প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তা উপলব্ধি করতে না পারাই তাঁদের ব্যর্থতার কারণ। নতুন যুগের কথা, নতুন যুগের চিন্তা ও ধারণা খুঁজতে লাগলো এমন নাট্যকারকে যিনি সেগুলোকে রূপ দেবেন নতুন শৈলীতে, নতুন আঙ্গিকে।

এখানে বলা দরকার, শিল্প-সাহিত্যের দুটি দিকই আছে—একটি আনন্দবোধ, অপরটি কল্যাণবোধ। শিল্পসৃষ্টির মূলে এই দুটি প্রেরণাই কাজ করে। নন্দনতাত্ত্বিকদের মধ্যে এ নিয়ে যত মতভেদই থাক, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা অনুধাবন করলেই একথা স্বীকার করবেন যে, শিল্প কোনো যুগেই একেবারে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্ট হয় নি। শিল্প-সাহিত্যের উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যায়, জীবন ও জীবিকা অনুযায়ী শিল্পের বিষয়বস্তু, ভাব, রূপ ও প্রকাশভঙ্গি বিবর্তিত হয়েছে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান, আইন, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি প্রভৃতিকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করে উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিকা শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, তেমনি শিল্প-সাহিত্যেরও মূল উৎস উৎপাদন শক্তি। মানুষের বহুমুখী কর্ম থাকে বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রতিটি কর্মবৃত্তই বুঝি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; কিন্তু কার্যত একই মূল শক্তি অর্থাৎ উৎপাদন প্রণালীর ওপর সেগুলো নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক বা বৈষয়িক অন্যান্য ক্রিয়ার মতোই শিল্প-সাহিত্যেরও ভিত্তি হলো উৎপাদন। সুতরাং সাহিত্যের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে নাট্যসাহিত্যও সাধারণ উৎপাদনেরই একটি ফলশ্রুতি। রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, নীতি এগুলোর কোনোটাই নাটক নয়, আবার মূল এক বলেই এগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক বাদ দিয়েও নাটকের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ, সমাজের প্রতিটি উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা লেখকের মনে যে উপলব্ধি আসবে তাই তিনি প্রকাশ করবেন তাঁর নাটকে। অতএব রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি এগুলোর কোনোটাই শিল্প বা নাটক সৃষ্টির

প্রতিকূল নয়। এ সমস্ত শক্তির জটিল অন্তঃক্রিয়া ও বহিঃক্রিয়ারই প্রতিভাস নাটক।

শিল্প যদিও উৎপাদনেরই একটি ফল, তবু অন্যান্য উৎপাদিত উপকরণের সঙ্গে শিল্পের একটা গুণগত পার্থক্য আছে। বৈষয়িক প্রয়োজনে বিষয়ই উৎপাদিত হয়ে থাকে। বিষয়ের অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব নেই, দ্বন্দ্ব বিষয়ের ব্যবহার নিয়ে। কিন্তু শিল্পের মধ্যে মানুষ অর্থ খোঁজে—জিজ্ঞাসা করে 'কী' ও 'কেন'? অন্যান্য সামগ্রী থেকে শিল্প এখানেই পৃথক। তার একটা ভাবগত অস্তিত্ব আছে। শিল্পী কল্পনার সাহায্যে বস্তুর actualityকে আর্টের realityতে রূপান্তরিত করেন। যেদিক থেকেই হোক, যেভাবেই হোক, জীবনকে জগৎকে তা ব্যাখ্যা করে। বস্তু তখন ভাবসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বৃহত্তর পরিধিতে চলে যায়। শিল্প বস্তুর অনুকৃতি নয় বলেই দু-এর মধ্যে যোগসূত্র মুখ্য না হয়ে গৌণত্ব লাভ করে। বস্তু বস্তুই। তা প্রয়োজনীয়ই হোক, কি অপ্রয়োজনীয়ই হোক, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যা ভাবের দ্বারা সৃষ্ট হয় তা সত্যও হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে, বাস্তবানুগও হতে পারে, আবার কল্পনাশ্রয়ীও হতে পারে। অবশ্য ভাবের সৃষ্টিও অকারণ বা আকস্মিক নয়; তারও মূলে রয়েছে বস্তুজগৎ ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব। তবে ভাবময় প্রকাশই শিল্প। বস্তু থেকে তার পার্থক্য আছে। বস্তু রূপান্তরিত হলে হয় প্রয়োজনের সামগ্রী। আর মন বা আত্মার বিকাশ ঘটে শিল্পে।

অন্তরোপলব্ধিকে প্রকাশ করা শিল্পীর ধর্ম—একথা মেনে নিলেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসলোকের কথাও আসে। যেহেতু অন্যান্য কর্মের মতোই শিল্পও একটি সামাজিক কর্ম, সেহেতু শিল্পীর মনের ওপর সামাজিক প্রভাবের কথাও স্বভাবতই ভাবতে হয়। সামাজিক ব্যবস্থা যখন মূলত শিল্পীর ধ্যানধারণার প্রতিকূল তখন তাঁর মন সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণ। এই বিতৃষ্ণা সময় সময় শিল্পীকে মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। সেই নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচার উপায় জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ রাখা। না রাখলেই উন্মার্গী হয়ে কল্পলোকে তথাকথিত সত্য শিব ও সুন্দরের সন্ধানী হবার সম্ভাবনা। জনজীবনে কোথায় রূপান্তরের তীব্র বাসনা ও আবেগ, তার সন্ধান শিল্পীকে করতে হয়। তখনই শিল্পীর সত্যোপলব্ধি জনমানসের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে ফেলে বিচার করলে এর বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায় বিভিন্ন যুগের শিল্প-সাহিত্য থেকে। দৃষ্টান্তের সোপান সাজিয়ে ক্লান্তির কারণ ঘটাবো না। শিল্প নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্প, এই ধারণার অবসান হয়ে শিল্প এই মৃত্তিকারই প্রজাত কুসুম, ধীরে ধীরে এই চিন্তা মানুষের মনে কীভাবে আশ্রয় নিলো, তারই খানিকটা সূত্র টেনে আমাদের আসল প্রসঙ্গে চলে আসবো।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের মনে একটা নতুন বোধ জন্মে। আগেকার দিনে বিশ্বাস ছিল, কতকগুলো উপাদান অধিক গুরুত্বপূর্ণ, আর কতকগুলো উপাদান কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বলে, কতকগুলো উপাদানকে অনাবশ্যক বোধে যদি বাদ দেওয়া হয় এবং সামগ্রিক সৃষ্টিকে যদি ভাবা না হয়, তবে বাস্তব খণ্ডিত ও বিকৃত হয়ে পড়ে। এ থেকে সামগ্রিকতার একটা চিন্তা আসে বুদ্ধিজীবী মহলে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ ও হাক্সলীর জীববিজ্ঞান মানুষের সংস্কার ও পুরনো প্রত্যয়ের মূল ধরে নাড়া দেয়। মানুষের মধ্যে জৈবপ্রবৃত্তিগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অধিকতর অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন এবং মানবসভ্যতার উৎস সন্ধান ও তার বিবর্তনের ধারা নিয়ে নতুন ভাবে গবেষণা চলতে থাকে। বিজ্ঞানের এই নতুন বোধের দ্বারা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যও প্রভাবিত হয়। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বস্তুজগতে যেমন পরিহার্য বলে কিছু নেই, শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি জীবনের পরিহার্য-অপরিহার্য সীমারেখা ক্রমশ ঘুচে যায়। যে-জীবন আগে উপেক্ষিত হতো, শিল্প-সাহিত্যের উপাদান হবার অযোগ্য বলে বিবেচিত হতো, শিল্প-সাহিত্যে সেই জীবনও আসতে লাগলো। শিল্প-সাহিত্য জগতে এলো একটি নব গণতান্ত্রিক যুগ। বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরাও দাবি করে বসলেন, তাঁদের দিকেও নজর দিতে হবে। গোড়ার দিকে অবশ্য তাঁরা এমন একটা ভাব দেখিয়েছিলেন যে, অভিজাত শ্রেণীর জীবন নিয়ে রচিত নাটকগুলো দেখে তাঁরা যথেষ্টই আনন্দ পান। কিন্তু সেটা ছিল তাঁদের ভাণ। মনের আসল কথাটা পরে ব্যক্ত হয়ে পড়লো। তাঁরা চাইলেন তাঁদের নিজেদের জীবন-চিত্র মঞ্চে দেখতে। ফলে সংঘাত ও সংকট দেখা দিল। ক্ল্যাসিক্যাল ও এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যবিধান অনুযায়ী ট্র্যাজেডি লিখতে হলে একজন অসাধারণ লোকের পতন দেখাতে হয়। কিন্তু বুর্জোয়া ট্র্যাজেডি লেখকরা তা স্বীকার করলেন না। তাঁরা বললেন, যে বংশেই জন্ম হোক বা যে শ্রেণীরই হোক, মানুষ হিসেবে মানুষের মর্যাদা সবারই সমান। সুতরাং নাটকের নায়ক হতে কারুরই বাধা নেই। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহী চিন্তাধারাই ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের নাট্যজগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করলো।

কঠোর নিয়মে বাঁধা, নিয়তির অনিবার্যতার ওপর নির্ভরশীল এবং [illegible]হীন সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ [illegible] দ্বারা পরিচালিত ক্ল্যাসিক্যাল

নাটকে যেদিন মানুষের অরুচি হলো, সেদিনই জন্ম নিল রোমাণ্টিক নাটক। ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের নিয়ম ও ধর্ম ভেঙে রোমাণ্টিক নাটক রচনা করলেন শেক্সপীয়র এবং স্পেনীয় নাট্যকার লোপ ডি ভেগা ও ক্যাল্‌ডিরন। কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে রাখা হয়েছিল, তাঁরা তা ভেঙে দিয়ে প্রয়োজনক্ষেত্রে কমেডি ও ট্র্যাজেডিকে এক সঙ্গে মেশালেন; 'ল-অব-দি-থ্রি-ইউনিটিজ'কে অস্বীকার করলেন এবং আকস্মিক সঙ্গীতোচ্ছ্বাস থেকে নাটককে মুক্তি দিলেন। জার্মানীতে ক্ল্যাসিক্যাল নাটকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রোমাণ্টিক নাটক রচনা করলেন লেসিং, গয়টে ও শীলার। প্রভাব গিয়ে পড়লো ফ্রান্সেও। ভিক্টর হুগো ও বড়ো ডুমার নেতৃত্বে সুরু হলো নব রোমাণ্টিক নাট্য আন্দোলন। গ্রীক ও ও ল্যাটিন ক্ল্যাসিক্যাল নাটকগুলোতে এই ভাব প্রকট যে, মানুষ নিয়তির দাস। ফরাসী বিপ্লবের পরে মানুষের মনে এক চিন্তা-বিপ্লব ঘটলো। মানুষ ভাবতে আরম্ভ করলো, মানুষই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। রোমাণ্টিক নাটক রচনার মূলে ছিল এই ভাবধারা।

কালক্রমে এই রোমাণ্টিক নাটক আবার বিপথগামী হয়ে অধঃপতনের পথে পা বাড়ালো। হাল্‌কা রস, মেলোড্রামা, অতিনাটকীয়তা পেয়ে বসলো তাকে। গভীরতার পরিবর্তে তরল আমোদ-প্রমোদ বিতরণের দিকে প্রবণতা দেখা দিল। সামাজিক ও নৈতিক তাৎপর্যহীন এই সমস্ত নাটকের সংলাপ, চরিত্র, পরিবেশ, সংঘাত, আবেগ—সবই হয়ে উঠলো কৃত্রিম। ফ্রান্সের স্ক্রাইব ও সার্দো এই দুজন নাট্যকার হয়ে উঠলেন এই প্রমোদসর্বস্ব অন্তঃসারহীন নাট্যধারার মুখপাত্র। তাঁরা দুজনই নাট্য-রচনায় ছিলেন কুশলী—কাজেই তাঁদের নাটকগুলো মঞ্চসাফল্য লাভ করলো। মঞ্চসাফল্য দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশের নাট্যকারগণও এই দুজনের লেখার অনুকরণ করতে লাগলেন এবং হাল্‌কা রসের ফরাসী নাটকগুলিকে অনূদিত করে সহজে অর্থোপার্জনের লালসায় ইউরোপ ও আমেরিকার পেশাদার মঞ্চমালিকগণ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সূচনা দেখা দিল। ফরাসী নাটকের রচনাশৈলীর প্রশংসা করলেও একদল লোক বলতে আরম্ভ করলেন, এগুলি অন্তঃসারহীন এবং সমাজচেতনারহিত। এর পরেই আরম্ভ হয় আইডিয়া-প্রধান নাটক রচনার পালা। ফ্রান্সেরই লেখক ছোট ডুমা এগিয়ে এলেন এই পথে।

● বার্নার্ড শ'

জার্মানীতে এ-নিয়ে আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকেই জার্মানীতে রোমাণ্টিক নাটকের ইতি ঘটে। হাইনে, গুৎস্‌কভ ও লোউবে সেখানে আইডিয়া-প্রধান নাটক রচনায় হাত দেন।

আইডিয়ার ওপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় এ-সমস্ত নাটকের অধিকাংশই প্রচারধর্মী হয়ে পড়ে এবং এগুলোর আবেদনও হয় সীমিত। তবে একটি সুফল ফলে। বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আবার থিয়েটারের দিকে আকৃষ্ট হন এবং লোকেও ভাবতে আরম্ভ করে যে, থিয়েটার নিছক আমোদ-প্রমোদেরই স্থান নয়। তা ছাড়া এসব নাটক মনস্তত্ত্বমূলক নাটকের পথও প্রস্তুত করে। এদিক দিয়ে জার্মান নাট্যকার লুডভিগ ও হেবেলকে ইবসেনের পূর্বসূরী বলা যায়। তাঁদের দুজনেরই নাটকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত দেখতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে ইংরেজ নাট্যকার টমাস রবার্টসনও সমসাময়িক জীবন অবলম্বনে বাস্তবধর্মী নাটক রচনার চেষ্টা করেন। তাঁর 'কাস্ট' নাটকটি নতুন আলোর সন্ধান দেয়।

সুতরাং দেখা যায়, ইবসেন এসে-ছিলেন যুগের দাবিতে। সে-যুগে তিনি যে-শক্তি নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে আর কারো সে-শক্তি ছিল না। 'হেনরী ইবসেন সম্পর্কে বার্নার্ড শ' বলেছেন:

'তিনটা বিপ্লব, ছ'টা ক্রুসেড, দুটো বৈদেশিক আক্রমণ ও একটা ভূমিকম্পের যা ফল হতে পারে, ইংলণ্ডের ওপর ইবসেনের প্রভাব তার সমতুল।'

ইবসেনের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর নাটকের উপাদান তিনি গ্রহণ করেছিলেন, সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবন থেকে। সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাগুলির দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। প্রচলিত প্রথা ও জীবনধারার সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত ও সংগ্রামের মধ্যেই তিনি কমেডি ও ট্র্যাজেডির উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলোকে বলা যায় প্রথম সার্থক সোস্যাল ট্র্যাজেডি।

ইবসেনের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী নাটকের প্রভাব ইউরোপ থেকে তিরোহিত হলো। মেলোড্রামা ও অতিনাটকীয়তা মঞ্চ থেকে বিদায় নিল। কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে মঞ্চ নেমে এলো স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের কাছে। সাধারণ পেল অসাধারণত্ব। (ক্রমশঃ)

পাঠক মন

'পাঠক-মন' বিভাগটি খুলে আপনারা উত্তম কাজ করেছেন। আমার মনে হয়, অন্যান্য বিভাগের মতো 'পাঠক-মন'কেও চিত্তাকর্ষক করে তোলা দরকার। পাঠকসাধারণের মতামত প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ রয়েছে পাঠক-মনে। তথাপি এই সব চিঠিতে বিশেষভাবে যা প্রয়োজন, তার অভাব অনেক সময় অনুভূত হয়।

যেমন ধরুন, কোনো পাঠক 'সম্পাদকীয়' বা অন্য কোনো রচনাকে খারাপ বা ভালো বলে মতামত জ্ঞাপন করলেন। দুঃখের বিষয় কোনো কারণ না দর্শিয়ে এভাবে ভাল-মন্দ বিচার করা অনুচিত। 'কারণ' সহ ভালো বা মন্দ বলে মতামত জ্ঞাপন করলে পাঠক-মন বিভাগটিতে পারস্পরিক মতামত জানানো সম্ভব হতে পারে। এর দ্বারা পাঠকমনও পাঠকদের ঔৎসুক্য নতুনভাবে বৃদ্ধি করবে এবং উক্ত বিভাগটি অভিনব ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে।

গৌতম সরকার
গ্রাম: তেলেণ্ডা পো: শ্রীপাট পুরুনীয়া
জেলা: বাঁকুড়া

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠক-মনে'র জন্য অশেষ ধন্যবাদ। এরূপ আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে আসল জিনিসটি সম্বন্ধে জানতে বা বুঝতে পারে। নতুন সংযোজিত 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল' আলোচনাটির জন্য সম্পাদিকা ও লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু গত ১১ই ভাদ্র, ১৩৭১ (৬৯ বর্ষ) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল' সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

লেখক লিখেছেন: খৃস্টের জন্মের প্রায় দু'শো বছর আগেকার কথা। তখন চীন দেশের সম্রাট ছিলেন সিন-চি-হোয়াংটি। দোর্দণ্ড তাঁর প্রতাপ। তখন নানা দেশের লোক ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো চীনের সঙ্গে। কিন্তু চীনের সম্রাট বাণিজ্যের অসুবিধার জন্য গোবি মরুভূমির ওপর দিয়েছিলেন প্রাচীর। যাতে মধ্য এশিয়া থেকে কেউ বাণিজ্যের জন্য চীনে না আসতে পারে। ইতিহাসও নাকি বলে—

'Tsin-chi-Hwangti (221-209 B.C.) the great Emperor of China began great wall across Gobi desert. He directed the trade route towards Bengal.....'

এই হল 'ধনপতি সওদাগরে'র লেখা।

কিন্তু আমরা আর এক ইতিহাসে পাই—মধ্য এশিয়ার বর্বর হুন জাতিদের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করা চীনাদের একটি গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে তাদের ঠেকিয়ে রাখার জন্য চীনারা তাদের পশ্চিম প্রান্ত বরাবর একটা দৃঢ় ও অত্যন্ত প্রশস্ত প্রাচীর নির্মাণ করল। এটাই বিখ্যাত 'চীনের প্রাচীর।'

আমি স্বীকার করছি 'ধনপতি সওদাগর' ইতিহাসের কথাই বলছেন। কিন্তু আমরা কোন্ ইতিহাসের কথা সত্য বলে জানব?

'সম্পাদিকা'র নিকট অনুরোধ করছি 'বাণিজ্যে সেকাল ও একাল' লেখাটি আরেকটু বাড়ালে ভাল হয়। এত অল্পে পিপাসা মেটে না। আর একটি অনুরোধ করব, নবীন লেখকদের আরেকটু সুযোগ দিতে।

শ্রীমাখনলাল ঘোষ
ছাত্র (কলাবিভাগ)
ক্যানিং ডেভিড সেসুন উচ্চতর-মাধ্যমিক
বহুমুখীন বিদ্যালয় (চব্বিশ পরগণা)

* * *

আমি একজন কলেজের তরুণ ছাত্র। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রতিটি সংখ্যা খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করে থাকি। 'আন্তর্জাতিক' বিভাগটি আমার খুব ভাল লাগে। 'গ্রন্থমেলা', 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর', 'ভারতদর্শন' বিভাগগুলিও বেশ আকর্ষণীয়।

কিন্তু আমার প্রিয় পত্রিকাটি সম্পর্কে কয়েকটি অভিযোগও রয়েছে—আশা করি এগুলি ভেবে দেখবেন।

প্রথমত 'খেলাধুলা' বিভাগটির কলেবর একটু বর্ধিত করলে ভাল হয়। দ্বিতীয়ত কাগজটির ছাপা উন্নত হওয়া উচিত। এ ছাড়া উদীয়মান লেখক-লেখিকাদের আরো লেখা প্রকাশের সুযোগ দিলে একদিকে উদীয়মান লেখক-লেখিকারা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে, অপরদিকে বাংলা সাহিত্যের বর্তমান সুসজ্জিত বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ উদ্যান ভবিষ্যতে আরো সুন্দর হয়ে উঠবে।

শ্রীঅসিতকুমার দত্ত
৩০, বাজেশিবপুর ২য় বাই লেন
শিবপুর, হাওড়া

* * *

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র আজকের মানুষ, বঙ্গদর্শন, আন্তর্জাতিক, লণ্ডনের চিঠি, ভারতদর্শন ইত্যাদি নিয়মিত বিভাগগুলির মত সুন্দর বিষয়বস্তু অন্য কোন পত্রিকায় পাওয়া সম্ভব নয়, এ বলতে আমার দ্বিধা নেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পত্রিকার রাজনৈতিক বিষয়বস্তুসমূহের সরল বিশ্লেষণ পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছি। বিশ্ব-রাজনীতির বিভিন্ন ঘটনার সচিত্র আলোচনা এবং ভাবী কোন ঘটনা সম্বন্ধে পূর্বাভাসগুলি সম্পর্কে আমি বলবো—আপনারা সার্থক হয়েছেন। কারণ, এরূপ বহু পূর্বাভাস সফল হয়েছে।

এখন এই পত্রিকার কিছু কিছু ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি। এই পত্রিকার মলাটের কাগজ ভাল নয়, ছাপা অনেক সময় এমন দুর্বোধ্য হয় যে, পাঠ করা একেবারে অসম্ভব হয়।

এই পত্রিকায় কিছু নতুন বিভাগ সংযোজনের জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি। যেমন—(১) প্রশ্নোত্তর বিভাগ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের প্রশ্নোত্তরমালার প্রকাশ, (২) কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রণ, (৩) হাল্কা চুটকি জাতীয় রচনা সন্নিবেশ করা, (৪) গ্রাম-বাংলার বিভিন্ন সংবাদের একটি বিভাগ, (৫) একটি বিজ্ঞান বিভাগ।

যদিও সবগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তবে যতগুলো সম্ভব প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন।

জহর বোস
ঈশানস্মৃতি রিজেণ্টপার্ক রহড়া,
২৪-পরগণা

রঙ্গজগৎ

যুক্ত উদ্যোগে চিত্র নির্মিত হোক

সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রে চলচ্চিত্র-শিল্প রাষ্ট্রীয়করণের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। চলচ্চিত্র-শিল্প জাতীয়করণের এক বৎসর কাল সময়ের মধ্যে সেখানে ২৪টি ছবি নির্মিত হচ্ছে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের যুক্ত উদ্যমে। যে হলিউড একবছর পূর্বেও একচেটিয়াভাবে ছবি দেখিয়ে আরব থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতো, সেই হলিউড চাপে পড়ে আরবের সাথে যুক্তভাবে ছবি নির্মাণের চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে। গত বছর পাকিস্তানের ফিল্ম ফেডারেশন মার্কিন ছবির প্রদর্শন বন্ধ রেখেছিল। তাদের দাবি ছিল পাকিস্তানে অর্জিত মার্কিন অর্থ পাকিস্তানে ছবি নির্মাণে ব্যয় করতে হবে। আমাদের দেশেও আরব বা পাকিস্তানের মত বছরে প্রায় তিনশ' মার্কিন ছবি প্রদর্শিত হয়। কিন্তু তার বিনিময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র কোন রকমেই লাভবান হয় না, বরঞ্চ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। এদেশ থেকে মার্কিন চিত্র পরিবেশকরা যে মুনাফা নিয়ে যায় সেই মুনাফার একাংশও ভারতে চিত্র নির্মাণে ব্যয় হয় না। আমেরিকানরা ভারত সরকার বা কোন ভারতীয় প্রযোজকের সঙ্গে চিত্র নির্মাণে উৎসাহী নয়। এদিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রশংসনীয়। যদিও ভারতে বছরে ৪।৫টির বেশি সোভিয়েট ছবি প্রদর্শিত হয় না, তথাপি সোভিয়েট ইউনিয়নই সর্বাগ্রে যুক্ত উদ্যোগে 'পরদেশী' ছবি করেছে, এবং বর্তমানে 'মদন কৌমুদী' নামক ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশকে ভারতে যুক্তভাবে চিত্র নির্মাণে উৎসাহী করার দায়িত্ব কেবলমাত্র সরকারের নয়। এ ব্যাপারে ফিল্ম ফেডারেশনের দায়িত্ব আরো বেশি। ফিল্ম ফেডারেশন যদি পাকিস্তানের মত চাপ সৃষ্টি করতে পারে তবে আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি দেশ ভারতীয় প্রযোজকদের সঙ্গে যুক্তভাবে এদেশে ছবি নির্মাণে বাধ্য হয়। এ ছাড়া আমেরিকা ও বৃটেনকে বিনিময় ব্যবস্থায় ছবি প্রদর্শনে ফেডারেশন বাধ্য করতে পারে। ফেডারেশনের কোন বলিষ্ঠ নীতি না থাকার জন্য এখনো ভারত হলিউডের 'কলোনী' পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে আজ যে সংকট বাংলার স্টুডিওতে দেখা দিয়েছে, সেই সংকট সারা ভারতে দেখা দেবে।

—সুজন।

● বীটা তাইসকিউইয্

পোলিশ অভিনেত্রী বীটা তাইস্‌কিউইয্

পোলিশ চলচ্চিত্র অভিনেত্রী বীটা তাইস্‌কিউইয্ একটি ভারতীয় ছবিতে অভিনয় করবেন জানা গেছে। ছবিটির নাম 'চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য'। এই ছবিতে বীটা হেলেনের ভূমিকায় অভিনয় করবে। ছবিটি বোম্বাই-তে নির্মিত হবে।

বীটা তাইস্‌কিউইয্ পোল্যাণ্ডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। গত দু-বছরে বীটা সিনেমা দর্শকদের মধ্যে সুপরিচিত হয়েছে। বীটার জন্ম ১৯৩৮ সালে। ওয়ার'শ হাইয়ার স্কুল অব ড্রামায় শিক্ষালাভ করেছে। ১৯৫৫ সালে প্রথম 'দি রিভেঞ্জ' নামক ছবিতে ক্লারার ভূমিকায় অভিনয় করে। তারপরে কিছুকাল কেটেছে পড়াশুনায়, বীটার দ্বিতীয় ছবি 'ওয়ানরুম টেনাণ্ট'। 'দি গ্লাশ মাউণ্টেন' ছবিতেও বীটাকে দেখা গেছে।

জ্যান বাটরির প্রশংসিত ছবি 'এ ভিজিট ফ্রম প্রেভিডেণ্ট'-এ বালক ইগার মায়ের ভূমিকায় বীটার

অভিনয় বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ছবিটি সানসাবেস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করে। এইটির পর তার অনবদ্য অভিনয় দেখা গেছে 'টু নাইট এ টাউন ডাইস' ছবিতে এবং আন্দ্রে ওয়াজদার 'সামসন' ছবিতে। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে দেশরক্ষার সংগ্রামে গেরিলা যোদ্ধৃ তরুণীর ভূমিকায় বীটা অভিনয় করেছে 'হলোউইন', 'ব্ল্যাক উইঙ্গস' প্রভৃতি ছবিতে। শেষোক্ত ছবিটি মস্কো উৎসবে রৌপ্যপদক পেয়েছে। 'ইয়েসটার ডে ইন ফ্যাক্ট' ছবিতে বীটা অভিনয় করেছে। 'ক্রিস্টেও বাই ফায়ার' ছবিতে অভিনয় করার জন্য বীটা নির্বাচিত হয়েছে। এই পোলিশ অভিনেত্রীকে একটি ভারতীয় ছবিতে দেখতে পেলে দর্শকরা খুশি হবে।

● 'নিশি-যাপন' চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী ও সুমিতা সান্যাল.

নাটকের কথা

লগ্ন

(বিশ্বরূপা থিয়েটার)

'লগ্ন' নাটকটি সম্প্রতি আমরা দেখলাম। নাটকটি রচনা করেছেন নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য। নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে এক নাট্যাচার্যের স্বপ্ন ও সাধনা অবলম্বন করে। সেই স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপ পাবার পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সন্দেহকাতর নাট্যাচার্যের স্ত্রীর ঈর্ষার আগুনে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য খ্যাত নাট্যকার। কিন্তু 'লগ্ন' নাটকে তাঁর খ্যাতি অস্তমিত-প্রায়। অধিকাংশ চরিত্র এখানে সুগঠিত হতে পারে নি। যে নাট্যাচার্যকে আমরা মঞ্চে দেখলাম, তাঁর মুখে চুরুট এবং আবৃত্তি ছাড়া এমন কোন বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে পাওয়া যায় না, যাতে তাঁকে মহৎ শিল্পিরূপে গ্রহণ করা যায়। বিশেষত তাঁর জীবন যাপন-পদ্ধতি, তাঁর বাড়িঘর ইত্যাদিতে চরিত্রটি বাস্তব অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাল্পনিক হয়ে উঠেছে। সমস্ত রকমের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নাট্যাচার্য (জহর গাঙ্গুলী) 'শঙখনাদ' নাটক নিয়ে এগিয়ে যাবার সংগ্রাম করছিলেন। সেই নাটকের নায়িকা নির্বাচিত হয়েছে বোম্বাইয়ের এক প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী উর্বশী। এ সম্পর্কে সংলাপে দর্শক মনে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে, কিন্তু যখনই নায়িকা উর্বশী (জয়শ্রী সেন) মঞ্চে প্রবেশ করে, বিশেষ করে ত্রিতলমঞ্চে বৈশিষ্ট্যহীন তার নাচটি দেখার পর কৌতূহল মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায়। পূর্বে উর্বশী সম্পর্কে বলা নাট্যাচার্যের সংলাপ অর্থহীন মনে হয়। আর একটি চরিত্র গোপেন্দ্র, নাট্যাচার্যের প্রিয় সুরকার। পত্নীর বিরহে কাতর শিল্পী (তরুণকুমার)। সংলাপের দিক থেকে চরিত্রটি আদর্শ-নিষ্ঠ, তবু চরিত্রটি বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নি। বিশেষ করে মুখে দগদগে পোড়া ঘা নিয়ে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে আসা কষ্টকল্পিত। চরিত্রগুলি

● 'মহালগ্ন' ছবির একটি দৃশ্যে কল্যাণী ঘোষ

● 'দিনান্তের আলো' ছবির একটি দৃশ্যে অনুপকুমার, সদানন্দ চক্রবর্তী, কালী ব্যানার্জী।

কল্পিত মনে হলেও অভিনয়ের দিক থেকে এঁরা কেউ ব্যর্থ নন, বরঞ্চ তাঁদের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যাচার্যের ছাত্রীদের চরিত্রগুলি হাস্যরসের প্রয়োজনে ফরমায়েসী সৃষ্টি মনে হয়েছে। আরতি দাসের আচরণবিধি বাস্তবিকই স্থূল।

নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে নাট্যাচার্যের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, নার্স দুস্তা, অপরাপর চরিত্রে যথাক্রমে সাধনা রায়চৌধুরী, মিতা চ্যাটার্জী ও অসিতবরণ যথাযথ অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে ডাক্তার ও ডাক্তারের স্ত্রী, পরিচালক মধুসূদনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য, দীপিকা ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ।

'লগ্ন' নাটকের মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চরীতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একসঙ্গে বিভিন্ন দৃশ্যাভিনয়ের সঙ্গে দূরদৃশ্য এবং আলোকসম্পাতের বৈচিত্র্য বিভিন্ন পরিবেশ রচনা করেছে এবং তা দৃষ্টিসুখকর। কিন্তু এমন অভিনব নয়, যার জন্য থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বিশ্বের এই প্রথম বলে দাবি করতে পারেন। থিয়েটারস্কোপ বা যে নামেই প্রচার করা হোক---এরূপ বহুস্তর বিশিষ্ট মঞ্চরীতি ইতিপূর্বে মিনার্ভা থিয়েটারে 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে দেখা গেছে। তারও আগে থেকে বাংলার মঞ্চ ও দর্শক এই রীতির সাথে পরিচিত। সারা বিশ্বের কথা কোনরকমেই আসে না, জার্মান ও অন্যান্য দেশে এই মঞ্চরীতি প্রায় পুরানো হয়ে উঠেছে।

সূর্যমুখী

গত ৬ই অক্টোবর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট থিয়েটার মঞ্চে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ড্রামাটিক ক্লাবের সদস্যগণ কর্তৃক প্রশান্ত চৌধুরীর 'সূর্যমুখী' নাটকটি শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় অভিনীত হয়। সভার প্রারম্ভে নাটকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রধান অতিথি ডাঃ এম এল পাল ও সভাপতি ডাঃ কনকচন্দ্র সর্বাধিকারী সারগর্ভ ভাষণ দেন।

উপস্থাপনার ক্ষেত্রে টিমওয়ার্ক যথাযথ। আলোকসম্পাতে ও আবহ-সঙ্গীতে কিছু কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও শিল্পীদের অভিনয়নৈপুণ্যে নাটকটি যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

অভিনয়ে বিশেষ করে মাণিক চক্রবর্তী (নেপাল রক্ষিত), ধরণী মণ্ডল (পঞ্চানন), নারায়ণ গোস্বামী (বৈরাগী) ও শিবশংকর ঘোষ (দর্পনারায়ণ) উল্লেখযোগ্য। অসিত গুহ (রক্ষিত মহাজন), শিবপ্রসাদ বোস (ঘটক), সুদিন খান (নিতাই) অন্যান্য সার্থক অভিনীত চরিত্র।

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

॥ পঞ্চাশ ॥

একটি শাস্তির নমুনা

অভিনেত্রীটির ঘরে সম্প্রতি এক বড়লোক বাবুর শুভাগমন হচ্ছে। অগাধ পয়সা, বিপুল ঐশ্বর্য। অল্প দিনের মধ্যেই অভিনেত্রীর ঘরের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন বাবুটি। দেওয়ালে বড় বড় আয়না; ফ্রেস্কো পেনটিং, সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা বড় বড় ছবি। ঘরের মেঝেতে দামী গালিচা বিছানো। পানদানী থেকে পিক্‌দানিটি পর্যন্ত রূপোর। ঘরের ভোলটাই শুধু পাল্টায় নি, সেই সঙ্গে সোনার আর জড়োয়ার গহনাও উঠেছে অভিনেত্রীটির অঙ্গে। বড়লোক বাবুটি কি অভিনেত্রীর রূপে মজে দরাজ হস্তে অর্থ ব্যয় করে চলেছেন? না—তা নয়। রূপ দেখে রূপো ঢালছেন না তিনি। রূপো ঢালছেন, মধুকণ্ঠির গান শোনার জন্যে।

শরীর ভাল নয়—এই অজুহাতে অভিনেত্রীটি এখন আর থিয়েটারের অভিনয়ে বা মহলায় হাজিরা দিচ্ছেন না। শুধু গান নয়, খুব ভাল নাচতেও পারেন অভিনেত্রীটি। কাজেই থিয়েটারের মঞ্চ ছেড়ে প্রতিটি সন্ধ্যা এখন মুখর হয়ে ওঠে তাঁর ঘরটি। রজনীগন্ধার ঝাড়, কবরীর বেল-যুঁইয়ের গন্ধে ভরপুর করে তোলে বাবুর মন। অভিনেত্রীর দৌলতে সারেঙ্গী-তবলচিরও কিছু আয় হচ্ছে আজকাল।

অভিনেত্রীটি তখন যে থিয়েটারে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যকার অপরেশচন্দ্র। বড় দূরদর্শী অধ্যক্ষ ছিলেন অপরেশচন্দ্র। চুক্তিভঙ্গ করছেন বলে, অভিনেত্রীটিকে কিন্তু তিনি কোন কড়া পত্র বা কড়া তলব করে থিয়েটারে ডেকে পাঠাচ্ছেন না। প্রথম দিকে নিয়মিত গাড়ি পাঠাচ্ছিলেন। এখন আর তাও পাঠান না।

সব কথাও ইতিমধ্যে অপরেশচন্দ্রের কানে গেছে। কেউ কেউ অপরেশচন্দ্রকে বলেছেন, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য। কিন্তু তাঁদের কথা এক কানে শুনেছেন, অপর কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন অপরেশচন্দ্র। নতুন নাটকের মহলা চলছিলো। তাতেও একটি নাচ-গানের বড় ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল অভিনেত্রীটির। অবস্থা বুঝে, ইতিমধ্যে সে ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অন্য এক অভিনেত্রীকে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এত অসুবিধা এবং ঝঞ্ঝাট নীরবে সহ্য করেও থিয়েটারের চাকরকে দিয়ে অপরেশচন্দ্র নিয়মিত মাস-মাইনেটা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। টাকা দিয়ে রসিদ সই করে নিয়ে আসছে চাকরটি।

ওদিকে বাবুটির মাস কয়েক পরেই নাচ-গানের মোহ কেটে গেল। নূপুরের আওয়াজ থেমে গেল। সেই সঙ্গে খসে পড়লো—কবরীর মালা।

একদিন সকালে অপরেশচন্দ্র থিয়েটারে নাটক রচনায় ব্যস্ত এমন সময় অভিনেত্রীটি এলেন।

—বাবা।

কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলেন অভিনেত্রীটির দিকে। তারপর সস্নেহে কাছের একটি আসন দেখিয়ে বলেন—এই যে। এস, এস। তারপর কেমন আছ এখন?

এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন কোন ক্ষোভই তাঁর মনে নেই। অভিনেত্রীটি অধ্যক্ষের কথায় আপ্লুত হয়ে বললেন—বসে বসে আর যে ভাল লাগছে না।

—শরীর যখন ভাল নয়, আরো কিছুদিন না হয় বিশ্রাম করো।

—না না। বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না? কেন বলত?

—সন্ধ্যে হলে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

—বুঝেছি। ঘরের সন্ধ্যেটা এখন খুবই অন্ধকার লাগছে। শোন, অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি দর্শকদের সামনে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে দর্শকেরাও তাদের ভুলে যায়। তোমার ব্যবহারে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তাই মনে করেছিলাম মাইনে দিয়ে তোমাকে বসিয়ে রাখবো এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মন থেকে তোমাকে সরিয়ে দেব। তা যাক্। এসেছ যখন কাজ করো। তবে মনে রেখো—ঘরের গান আর ঘরের ঘুঙুর ঘরেই আবদ্ধ থাকে। তার যশও নেই, খ্যাতিও নেই।

অপরেশচন্দ্রের কথায় অভিনেত্রীটি তখন শুধু লজ্জিতই নন, সেই সঙ্গে অনুতপ্ত। ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছলেন।

যে জ্ঞান-সূর্যের সর্বতোমুখী প্রতিভার কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা চির-ভাস্বর—সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ১৷৷•

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

গিরিশচন্দ্র ছিলেন একাধারে নট, নাট্যকার এবং নাট্যাচার্য। 'বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র' প্রবন্ধে শিশিরকুমার লিখেছেন :

'যে সকল গুণ থাকলে একটা নাট্যপ্রতিষ্ঠানকে নিজের পায় দাঁড় করানো যায় সে সকল গুণ গিরিশচন্দ্রের মধ্যে অতিমাত্রায় বর্তমান ছিল। নিজে খুব বড় অভিনেতা না হলে, অভিনয় সম্বন্ধে খানিকটা তত্ত্বজ্ঞান (theoretical knowledge) না থাকলে, কেহই একটা অভিনেতৃমণ্ডলীর নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারেন না। গিরিশচন্দ্র অভিনয়কলার theory ও practice দুই বিষয়েই তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দক্ষতম।

'অনেকের ধারণা উচ্চশ্রেণীর অভিনয়নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। লেখাপড়া ও পঠিত বিদ্যা নটের বিশেষ প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের বিদ্যার পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে বহু বিস্তৃত ইংরাজী সাহিত্য তার সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পরিচয় সামান্য ছিল না। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্যসমালোচনার প্রায় সকল বিভাগেই তিনি লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসও তাঁর অজানা ছিল না। বহু প্রবন্ধে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তাঁর অধিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তার লাভ করে। তবে জ্ঞানমার্গের থেকে ভক্তিমার্গে তাঁর ছিল আন্তরিক প্রবণতা।'

শিশিরবাবুর কথাগুলো যে শুধু কথার কথা নয়—তার প্রমাণ পাওয়া যায় গিরিশবাবুর লেখা এবং অন্যদের সঙ্গে কথোপকথন থেকে। যেমন—

'কুমুদবাবু—আপনার কথার ভাবে বুঝছি যে সমালোচনাও একটা আর্ট বিশেষ।

গিরিশচন্দ্র—তাতে আর সন্দেহ আছে? আর্টিষ্টের চোখ না থাকলে কি আর্ট বুঝতে পারে, না বোঝাতে পারে। প্রকৃতির hidden truth কবি গায়ক চিত্রকর ভাস্কর ও প্রফেট আবিষ্কার করেন। যে সত্যসাধক সাধনায় উপলব্ধি করেন, কবি কল্পনার রসে তাকে অপূর্ব করে দেখান, গায়ক সুরে সেই

● 'চাণক্যের' ভূমিকায় স্বর্গীয় দানীবাবু

সত্য প্রকাশ করেন। চিত্রকর বিভোর হয়ে তা আঁকেন, আর ভাস্কর ভাস্কর্যে তার মাধুর্য ফুটিয়ে তোলেন। সমালোচক বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে তা প্রচার করেন। দেখ, ভাস্কর একখণ্ড পাথর কুঁদে স্থূলরূপে ভাবের লীলাবৈচিত্র্য দেখান, চিত্রকর নানাবর্ণের সমাবেশে স্থূলে সূক্ষ্ম ভাবের প্রতিফলন করেন, গায়ক বাদক সুরে সেই কল্পনালোকের সৃজন করেন, কবি কথায় ছন্দে গেঁথে ভাবের বর্ণ-বৈচিত্র্যে সত্যকে নয়নগোচর করান, আর সাধক মহাপুরুষ তাঁর নিজ জীবনের লীলাগতির ঝঙ্কারে সেই সত্য মুখরিত করেন। চতুঃষষ্টি কলাসঙ্গিনী করে মহামায়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়ত খেলা কচ্চেন। নানা বর্ণে নানা ছন্দে তাঁরই মাধুরী লীলা।

কুমুদবাবু—ডায়ালগের ভিতর এত মারপ্যাঁচ আছে—তা আমার পূর্বে ধারণাই ছিল না।

গিরিশচন্দ্র—নাটকের প্রত্যেক কথাটির উপর ভাবী চরিত্রের বীজ ছড়ানো। এই ডায়ালগগুলি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে put করা—নাট্যকারের সবচেয়ে শক্ত কাজ। Dramatic dialogue মানে কথাগুলি এমনভাবে গাঁথা থাকবে যে, প্রত্যেক কথাই action indicate করবে—তাতে এক বা ততোধিক চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে—সঙ্গে সঙ্গে ভাব বা রসের ফোয়ারা খুলে দেবে অথচ স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছন্দগতিতে চলতে থাকবে—গঙ্গার অনাবিল স্বচ্ছ প্রবাহের মত। ভাল কবিতার একটি শব্দ বা অক্ষর যেমন এদিক-ওদিক হলে কবিতা খাপছাড়া ও যতিভঙ্গ দোষে দুষ্ট হয়, নাটকের ডায়ালগের গরমিল হলেও ঠিক তেমনি হয়।

কুমুদবাবু—কিন্তু dialogue কি নাটকের চরম আর্ট?

গিরিশচন্দ্র—সৃষ্টি বৈচিত্র্যই নাট্যকারের প্রধান আর্ট। শুধু নাট্যকার

'সরলা' নাটকে 'গডাচড়-টন্‌ডোড়েড়' (গদাধরচন্দ্রের) ভূমিকায় স্বর্গীয় দানীবাবু

কেন—কবি, ঔপন্যাসিক সকলের পক্ষেই এটা সত্য। বাস্তব জগতে যেমন আমরা সৃষ্টির লীলা-বৈচিত্র্যে আত্মহারা হই, কবির কাব্যে নাট্যকারের নাট্যে কল্পনার বিচিত্র সৃষ্টিতে তেমনিই মুগ্ধ হই। মানব-চরিত্রের সৃষ্টি—তার বিকাশ উন্মেষ দেখানোই নাট্যকারের আসল প্রতিভা। ঘটনার পারম্পর্যে, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, অন্তর সংগ্রামে মানুষের যে চরিত্র ফুটিয়া উঠে সেটি নিপুণভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত নাট্যকারের কলা-কৌশল। রঙ্গমঞ্চে সেই ভাবগুলি represent করা অভিনেতার বিশেষ আবশ্যক। অভিনেতার সঙ্গে নাট্যকারের এইখানে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।'

এমনি বহু বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের বিরাট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—যথা, সংস্কৃত নাটক, গ্রীক নাটক, এলিজাবেথীয় নাটক, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি—তাঁর লেখা প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথোপকথন থেকে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও গিরিশবাবুর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল—শুধু দেশী নয়, বিলাতী সঙ্গীত বিষয়েও।

আর একটা বিষয়েও গিরিশ-চন্দ্রের যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। থিয়েটারের ব্যবসাটা তিনি খুব ভালভাবেই বুঝতেন। তার মানে এ নয় যে, বিকৃতরুচির নাটক দেখিয়ে লোক ভুলিয়ে পয়সা রোজগার করবার প্রচেষ্টা করতেন—কিন্তু থিয়েটারেও যে একটা ব্যবসার দিক আছে এবং সে দিকটাকে অগ্রাহ্য করলে বিপদে পড়তে হয় এ তিনি খুব ভালভাবেই বুঝতেন। তাঁর এমারেল্ডে যোগ-দানের কারণও হচ্ছে এই।

ধনকুবের গোপাললাল শীল যখন স্টার থিয়েটার কিনতে চাইলেন তখন গিরিশচন্দ্র দেখলেন এতবড় ধনীকে বাধা দিতে গেলে পরিণামে তাঁদেরই হবে বিপদ। সুতরাং থিয়েটার বাড়ি গোপালবাবুকে বিক্রি করে স্টারের নামটা নিজেদের হাতে রাখলেন—হাতীবাগানে জমি কিনে স্টারের নতুন ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হোল।

পুরানো স্টার থিয়েটারের বাড়িতে গোপালবাবু নতুন থিয়েটার খুললেন এমারেল্ড। এখানকার অধ্যক্ষ হলেন কেদারনাথ চৌধুরী—তাঁরই রচিত 'পাণ্ডব নির্বাসন' নাটক দিয়ে এমারেল্ডের উদ্বোধন হোল। এখানে এসে যোগ দিলেন অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, মহেন্দ্র বসু, মতি সুর, রাধামাধব কর প্রভৃতি। কিন্তু তবু থিয়েটার জমে না। আর নতুন থিয়েটার জমতে দেবার মত ধৈর্য বা অধ্যবসায় তো কাপ্তেন ধনীদের মধ্যে থাকে না। গোপাল শীল উস্‌খুস্ করতে লাগলেন কি করে গিরিশচন্দ্রকে ভাঙিয়ে আনা যায়।

স্টার গিরিশচন্দ্রকে ছাড়তে চায় না—এদিকে আবার ভয়ানক টাকার টানাটানি। গোপাল শীল গিরিশবাবুকে কুড়ি হাজার টাকা বোনাস অফার করলেন এমারেল্ডে যোগ দেবার জন্য। গিরিশচন্দ্র দেখলেন এমারেল্ডে যোগ দিলে এই টাকাটা থেকে স্টারের যথেষ্ট সাহায্য হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্টারের নাটক লেখে কে। গিরিশ সে সমস্যারও সমাধান করলেন—নতুন স্টারে গিরিশবাবুর নতুন নাটক নসীরাম নিয়ে মঞ্চাবতরণ করলেন—লেখক? লেখকের জায়গায় বলা হল 'সেবক' প্রণীত। কুড়ি হাজার টাকা বোনাসের ষোল হাজার টাকাই গিরিশবাবু বিনা সর্তে স্টারকে

প্রখ্যাত কথাশিল্পী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের

রামপদ গ্রন্থাবলী

৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩৲ টাকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক রচিত কয়েকখানি ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী

৬ষ্ঠ ভাগ—৷৷৹

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী

মূল্য—বার আনা

মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে ৷৷৶৹

সরসীবালা বসুর—
শিবানী ৷৷৹

বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ৷৷৹

চারুবালা বসুর—
পাতিব্রতা ৷৷৹

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

দান করলেন। একবার ভেবে দেখুন থিয়েটারকে কতোটা ভালবাসলে এত টাকা এভাবে দান করা যায়।

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে যোগ দেবার পর কেদার চৌধুরী, অর্দ্ধেন্দুবাবু, রাধামাধব কর প্রভৃতি কয়েকজন থিয়েটার ত্যাগ করে যান। গিরিশবাবু প্রথম নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করেন। পরে কয়েকটি পুরানো বইতে—যথা, সীতার বনবাস, মৃণালিনী, মেঘনাদ বধ—নিজেও নামতে সুরু করলেন। এখানে দুটি নতুন নাটক করলেন, পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ। পূর্ণচন্দ্র সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক নাটক—এর কাহিনী হিন্দী নাটক 'পূরণ-ভকৎ' থেকে নেওয়া। এই এক নাটকের সাফল্যেই গিরিশবাবুকে দেওয়া বোনাসের কুড়ি হাজার টাকা উঠে আসে। গিরিশবাবু পাঁচ বছরের এগ্রিমেণ্টে এমারেল্ডে আসেন—কিন্তু কিছুদিন বাদেই গোপাল শীলের থিয়েটারের সখ মিটে যায়—হস্তান্তরিত হয়ে থিয়েটার চলে যায় অতুল মিত্র ও মহেন্দ্র বসুর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের এগ্রিমেণ্টও বাতিল হয়ে গেল। তিনি আবার স্টারে ফিরে এলেন।

স্টারের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ি বেচে যে টাকা হোল তাই দিয়ে অমৃত মিত্র, অমৃত বোস, দাসু নিয়োগী এবং হরিগোপাল বসু হাতীবাগানে স্টারের জন্য নতুন জমি কিনলেন—প্রেক্ষাগার মঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করবার জন্য বাইরে বাইরে মফস্বল টাউনে অভিনয় করে কিছু টাকা তুললেন। কিছু ধার করলেন এবং বেশির ভাগ টাকাটা পেলেন গিরিশচন্দ্রের থেকে—অর্থাৎ তাঁর বোনাসের সেই ষোল হাজার টাকা। থিয়েটার তো হোল—কিন্তু নাটক লেখে কে? গিরিশবাবুই নসীরাম লিখে দিলেন—লেখকের নাম না দিয়ে তা প্রকাশিত হল আগেই বলা হয়েছে। রাত্রে লুকিয়ে শাড়ি পরে মহিলার বেশে খাল ধারে একটি খোলার ঘরে বসে গিরিশচন্দ্র নাটকটি লিখতেন—

● 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

কারণ গোপাল শীল জানতে পারলে মহা বিপত্তি হবে। নসীরাম সাজতেন অমৃত বোস, অনাথনাথ অমৃত মিত্র, কাপালিক অঘোর পাঠক, শম্ভু বেলবাবু—মেয়েদের মধ্যে ছিলেন কাদম্বিনী, হরিমতী, গঙ্গামণি প্রভৃতি। উদ্বোধন রজনীর বর্ণনায় বিখ্যাত অমর দত্ত বলেছেন যে রঙ্গালয়ের ইন্দ্রপুরীতুল্য সাজসজ্জা ইত্যাদিতে তাঁর মনের উপর এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করল। অমরেন্দ্রনাথের বয়স তখন বার বছর। থিয়েটারের নেশা তাঁকে পেয়ে বসল—মনে মনে ঠিক করলেন তিনিও ভবিষ্যতে অভিনেতা হবেন। অভিনয় আরম্ভের আগে অমৃত বোস গিরিশচন্দ্রের এই কবিতাটি মঞ্চ থেকে আবৃত্তি করেন:

'হে সজ্জন! পদে নিবেদন
নির্বাসিত মনোদুঃখে
বঞ্চিলাম অধোমুখে,
বাঞ্ছিত বাঞ্ছিত, তব যুগলচরণ;
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ,
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন।
স্বাগত সুজন!
করে দাস—করুণা প্রয়াস।
রসবশে গুণাকর, ভুল দোষ, গুণ ধর'—
তব পূজা আশৈশব উচ্চ অভিলাষ।
পারি হারি না বুঝি আভাষ,
হর্ষ সনে দ্বন্দ্ব করে ত্রাস
পূরিবে কি আশ?
অভিনয় ইতিহাস কয়—
দেশ ভেদে নানামত, যে জাতি যে রসে রত
আদি, হাস্য, বীভৎস, শোণিত কোথা বয়,
হিন্দুপ্রাণ কোমলতাময়,
ধর্মপ্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—
ধর্ম-রঙ্গালয়!'

● পতৌদির নবাবের নেতৃত্বে ভারতীয় দল ফিল্ডিং করতে নামছেন

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন

শ্রীঅমিতাভ

গঙ্গার ধারে ময়দানের কোলে মাথা রেখে শান্তিতে শুয়ে আছে ক্রিকেটের নন্দনকানন ক্রীড়ামোদী-দের স্বর্গ---ইডেন উদ্যান। সারা বছর চার কাটে নিঃসঙ্গ নীরস জীবন, সে শুধু নীরবে প্রতীক্ষা করে যেন কার পদধ্বনির। মনে হয় যেন সুন্দরী ইডেন রূপকথার রাজকন্যার মত মরণকাঠির ছোঁয়ায় ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে, আর টেস্ট খেলা যেন তার জীয়নকাঠি। তারই মধুর স্পর্শে জেগে উঠে ইডেন নতুন রূপে নতুন বেশ ধারণ করবে; নববধূর সাজে সজ্জিতা ইডেন উদ্যান হয়ে উঠবে উৎসবমুখর, অগণিত ক্রীড়ামোদীর আগমনে ইডেনের প্রাণে জাগবে সাড়া, বুকে উঠবে আনন্দের হিল্লোল। এর পর ক'দিন চলবে একটানা হুল্লোড়, ব্যস! তার পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে ইডেন, সুউচ্চ ঝাউ আর দেবদারুর সারি তখন তার অতন্দ্র প্রহরী।

ইডেন উদ্যানের প্রথম দিকের ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট। তবে শোনা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বাগানের মালিক ছিলেন রাণী রাসমণি। সেই সময়ে লর্ড অকল্যাণ্ডের সহোদরা কুমারী ইডেন কলকাতায় ছিলেন। কুমারী ইডেনের সঙ্গে রাণী রাসমণির ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং সেই সূত্রে তিনি নাকি উদ্যানটি ইংরেজ-তনয়া ইডেনকে উপহার দেন। গঙ্গার কোলে অবস্থিত এই উদ্যানটি ইডেনকে আকর্ষণ করে। উদ্যানটিকে একটি মনোরম স্থান করে তোলার জন্য কুমারী ইডেন উঠে পড়ে লাগলেন। তখনকার নামকরা স্থপতি ফিটজেরাল্ড সাহেব ইডেনের স্বপ্নকে সার্থক রূপ দেবার ভার গ্রহণ করলেন। প্রয়োজনীয় অর্থাদি এল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাণ্ডার থেকে। এই সময়ে উদ্যানটি অকল্যাণ্ড গার্ডেন নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে অকল্যাণ্ড নামটি মুছে গেল। কুমারী ইডেনের নামানুসারে উদ্যানটির স্থায়ী নামকরণ হল ইডেন গার্ডেন।

ইডেন উদ্যানের দুটি অঙ্গ; একটি ভ্রমণবিলাসীদের স্বর্গ, অন্যটি ক্রিকেটের লীলাভূমি। বিলেতের লর্ডস মাঠের সঙ্গে নাকি ইডেন গার্ডেনের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বিশ্ব ক্রিকেটে প্রাচীন মাঠের তালিকায় ইডেনের স্থান দ্বিতীয়। সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো ইডেনের আঙ্গিনায় বহু ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হয়েছে; ক্রিকেটের বহু মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে পুণ্যতীর্থ ইডেনের শ্যামল বুকে। জার্ডিন, আর্থার গিলিগ্যান, মুস্তাক, লর্ড টেনিসন, ওরেল, উইক্স, কম্পটন, হার্ভে বেনোড, অমর সিং, অমরনাথ, নিসার, সোবার্স, কানহাই, রামাধীন এবং আরও অনেক বিশ্ব ক্রিকেটের রথী-মহারথী উইলোদণ্ড এবং বল হাতে এখানে ভেল্কী দেখিয়েছেন, আর তার নীরব সাক্ষী ইডেনের ঝাউ আর দেবদারুর সারি। এখনও ইডেনের বুকে কান পাতলে শোনা

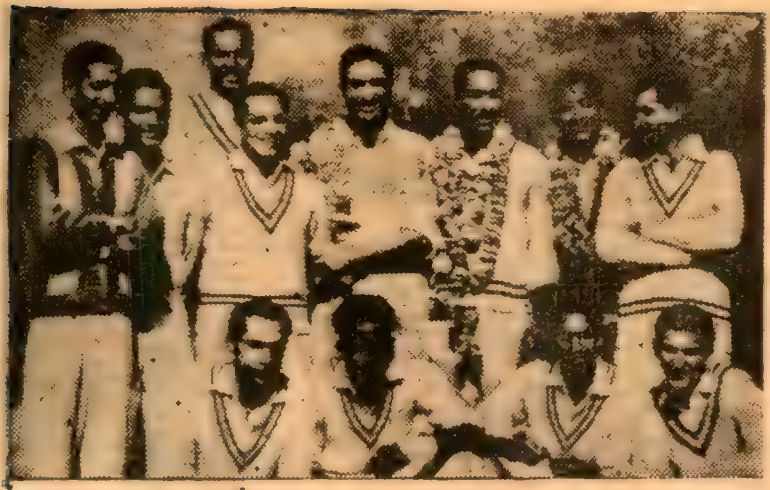

কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দল

ম্যানেরা ভারতের বোলিং আক্রমণকে চূর্ণ করে দিল। ৩৯৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। ৩২৩ রান সংগ্রহ করতে পারলেই জয় ভারতের মুঠোর মধ্যে, কিন্তু ১৯৩ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত আউট হয়ে ১৩৯ রানে পরাজিত হল।

দ্বিতীয় টেস্টে নাটকীয় পরিস্থিতিতে ভারত সিম্পসনের দলবলকে পরাজিত করল বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল উত্তেজনার ছোঁয়াচ। বোম্বাইয়ের ক্রীড়ামোদীদের যে অভূতপূর্ব খেলা দেখার সুযোগ হয়েছে তা তাদের সারা জীবন স্মরণ থাকবে।

যাবে বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী, বহু অজানা ইতিহাস।

১৮২৫ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইডেনের মালিকানা ভোগ করে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। তার পর এল ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব একটি স্টেডিয়াম গঠনের সঙ্কল্প নিয়ে। অসমাপ্ত স্টেডিয়ামের একাংশ এক অদ্ভুত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কবে যে ইডেনের বুকে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম উঠবে তা জানি না।

মাদ্রাজে পরাজয়ঃ বোম্বাইয়ে জয়

সংবাদপত্র আর আকাশবাণীর সাহায্যে মাদ্রাজের নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের খেলার রসাস্বাদ কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের গ্রহণ করতে হয়েছে। মাদ্রাজে ভারতীয় দলের হাতের মুঠো থেকে ফস্কে গেল জয়ের আশা; শেষ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা প্রচুর রান সংগ্রহ করে শেষ পর্যন্ত বাজীমাৎ করে দিল। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে মাত্র ২১১ রানে খেলা শেষ করে। প্রত্যুত্তরে ভারত প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করল ২৭৬ রান। অধিনায়ক পতৌদি ১২৮ রান করে অপরাজিত রইলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটস-

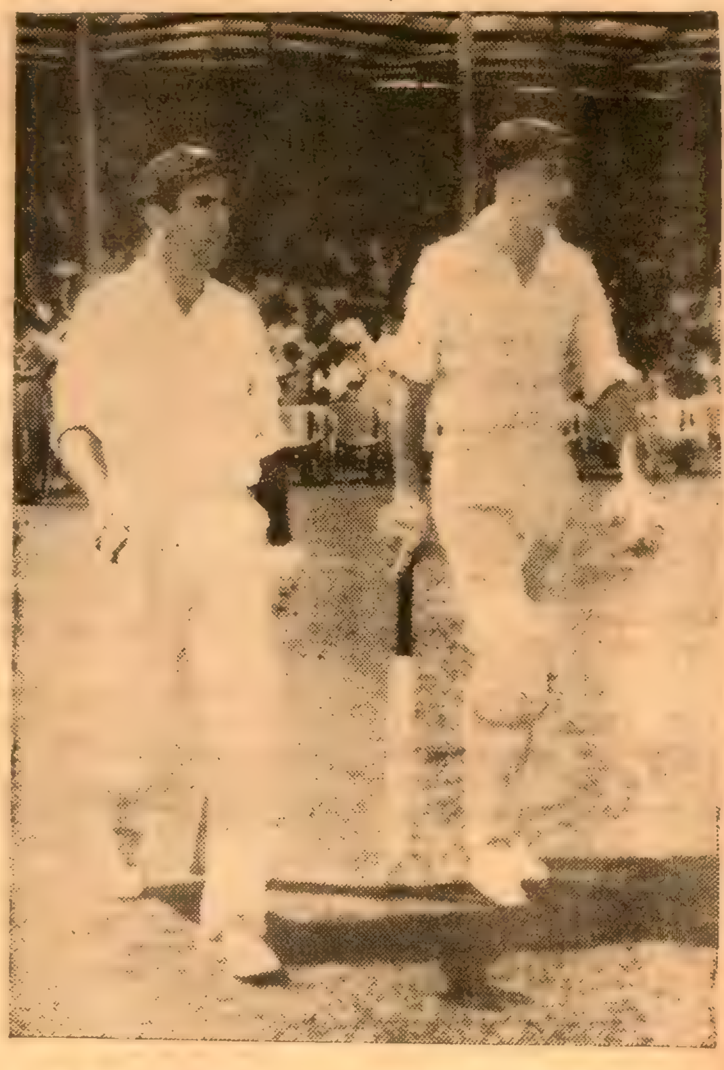

ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনে ববি সিম্পসন ও বিল লরি ব্যাটিং করতে যাচ্ছেন।

অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসের রান হয় ৩২৩ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৭৪ রান। ভারত প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৩৪১ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত খেলা সুরু করে। চলতে থাকে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। একবার খেলার গতি ভারতের অনুকূলে এল—আবার এক সময় অস্ট্রেলিয়া প্রাধান্য বিস্তার করল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে চলতি সিরিজে সমান সমান হল। কলকাতার ইডেন উদ্যানে খেলা সুরু হয়েছে। এখানে ভারত যদি অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে পারে তবেই রাবার আসবে ভারতের হাতে।

গ্রীন পার্কের মধুর স্মৃতি

কানপুরের গ্রীন পার্কে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট একাদশ ১৯৫৯ সালে। আজ পর্যন্ত ভারত আর অস্ট্রেলিয়া ১৪টি টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হয়েছে। ৯টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে পরাজিত করেছে, শুধুমাত্র গ্রীন পার্কের মাঠে ভারতের হাতে অস্ট্রেলিয়ানদের একবার পরাজয় ঘটেছে।

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড বিজয় সমাপ্ত করে অবিস্মরণীয় ক্রিকেট অধিনায়ক রিচি বেনোর নেতৃত্বে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বাহিনী ভারত সফরে এল। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলাতে প্রথম টেস্টেই ভারতকে ধরাশায়ী করল অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ১২৭ রানে জয়ী হয়ে।

দ্বিতীয় টেস্টের পূর্বে প্রবীণ স্পিন বোলার জেসু প্যাটেলকে হঠাৎ দলভুক্ত করা হল। ভারতীয় দলে শেষ মুহূর্তে প্যাটেলের আবির্ভাব অনেকটা যেন দেবদূতের মত হল। ১৯৫৯ সালের ১৯শে ডিসেম্বর কানপুরের গ্রীন পার্কে সেই স্মরণীয় টেস্ট খেলাটি সুরু হল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ভারত মাত্র ১৫২ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করল। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া তুলল ২১৯ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসের ভুলত্রুটি সংশোধন করে নতুন পদ্ধতিতে খেলা সুরু করল। কণ্ট্রাক্টার, কেনী, বোরদে এবং নাদকার্ণীর অনবদ্য ব্যাটিং ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসের রান সংখ্যাকে ২৯১-এর কোঠায় পৌঁছে দিল।

এদিকে অস্ট্রেলিয়া যখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা সুরু করেছে তখন পিচের অবস্থা শোচনীয়। গ্রীন পার্কের নরম পিচ ভেঙে গিয়েছে আর উইকেটে স্পিন ধরেছে মারাত্মক-ভাবে। জেসু প্যাটেলের কুটিল স্পিনে ভরা বল অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদেরও ভেল্কী দেখাতে লাগল; অন্য প্রান্তে উমরী-গড়ও ধারণ করেছেন সংহারমূর্তি। দুর্ধর্ষ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের প্যাভেলিয়ানের পথে ফেরার শোভাযাত্রা সুরু হয়ে গেল। ম্যাকডোনাল্ড আর হার্ভে দলের পতন রোধের জন্য বুক বেঁধে দাঁড়ালেন কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, মাত্র ১০৫ রানে তাদের ইনিংস শেষ। ১৯৫৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় দিনটিতে ভারত ১১৯ রানে অস্ট্রেলিয়ানদের পরাজিত করে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করল। কানপুরের স্মরণীয় বিজয় ভারতীয় ক্রিকেটের একটি মধুর স্মৃতি।

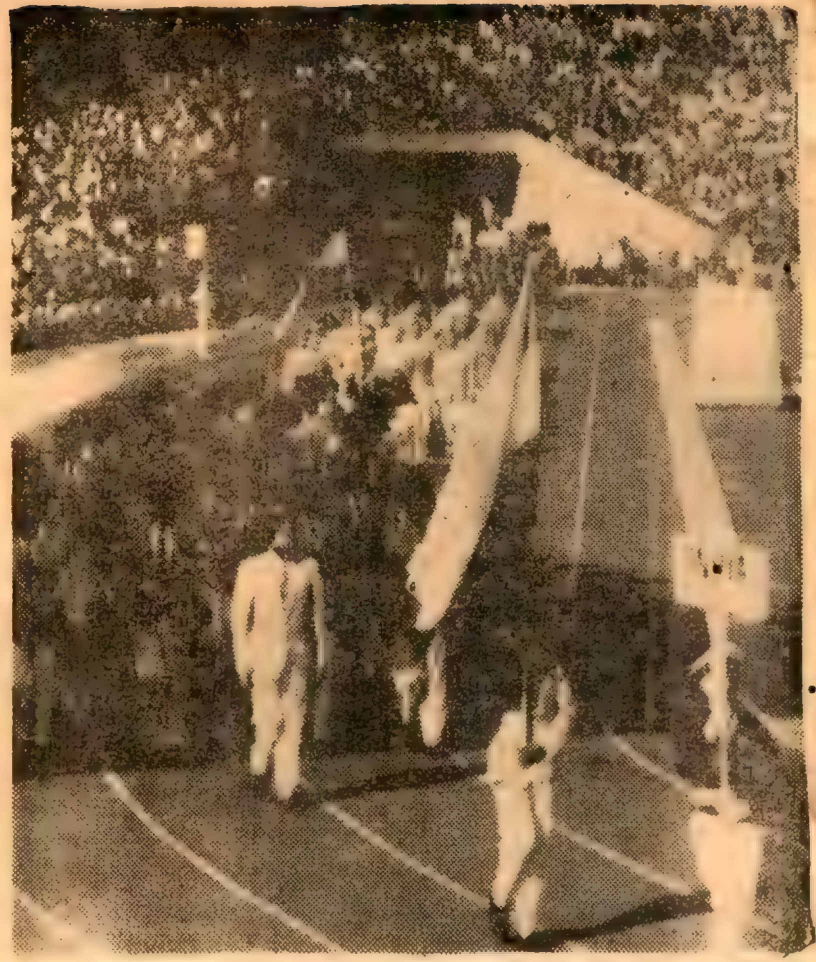

● টোকিওতে অষ্টাদশ অলিম্পিকের উদ্বোধন দিবসে ভারতীয় দল পতাকা অভিবাদন (মার্চ পাস্ট) করছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বাস্থ্য গঠনে একান্ত প্রয়োজন

আপনি কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করেন…কাজে উৎসাহ পান না
অথবা সর্দি কাশিতে ভুগছেন…হয়ত খিদে হয়না,
যা খান তা হজমও হয়না।

তা' হলে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খেলে
আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।

মৃতসঞ্জীবনী
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮

অধ্যক্ষ ডা: যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস,
(লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা),
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শা:-ের
ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডা: নরেশ চন্দ্র ঘোষ,
এম-বি, বি-এস, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য-এ

সাপ্তাহিক
বসুমতী

সোভিয়েট রাশিয়ার দুই নতুন কর্ণধার—কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী ব্রেজনেভ ও প্রধানমন্ত্রী কসিগিন।

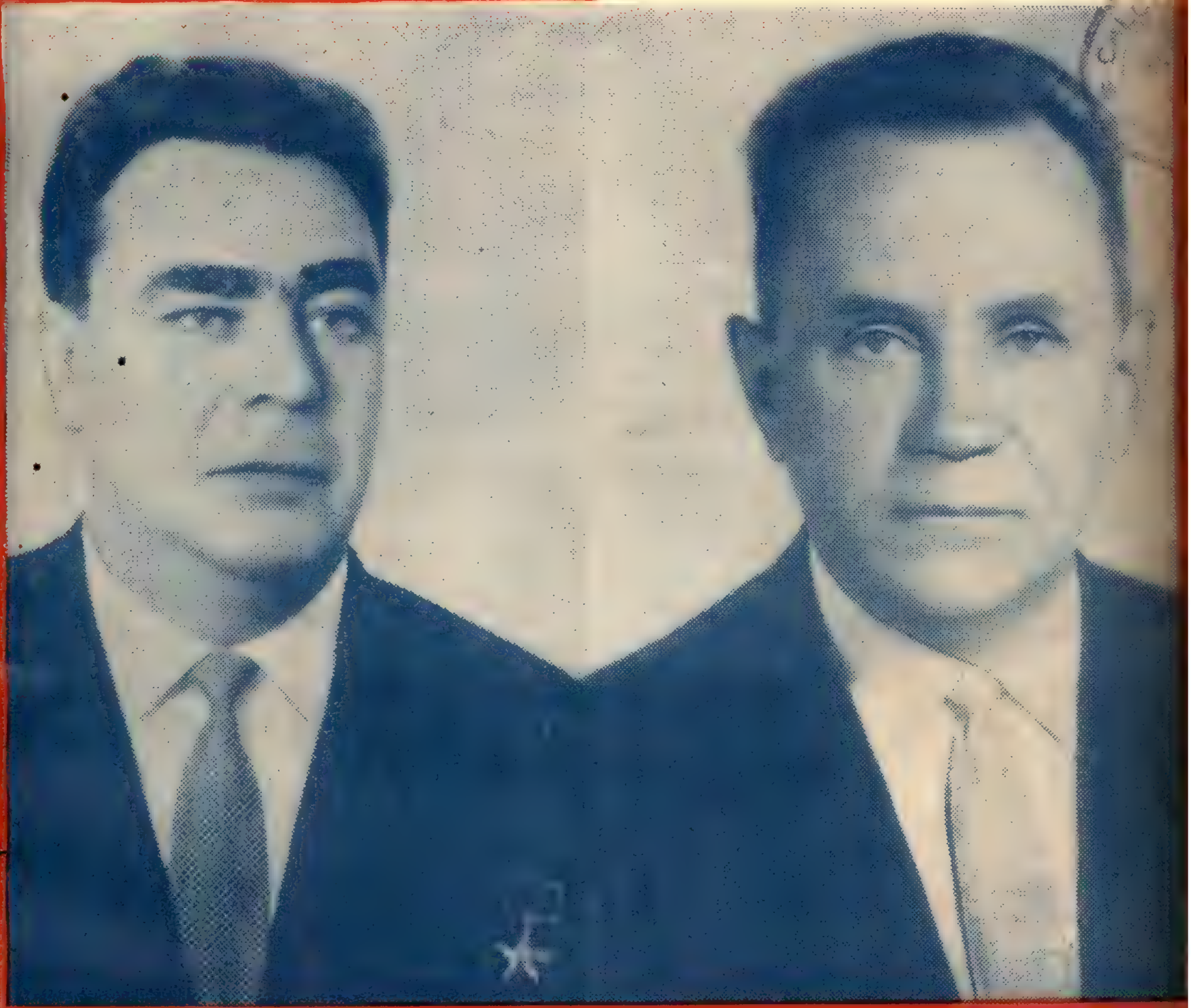

৬৯ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১২ই কার্তিক, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 29th October, 1964 • Vol. 69,

হিমানী
গ্লিসারিণ সাবান
হিমানী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-২

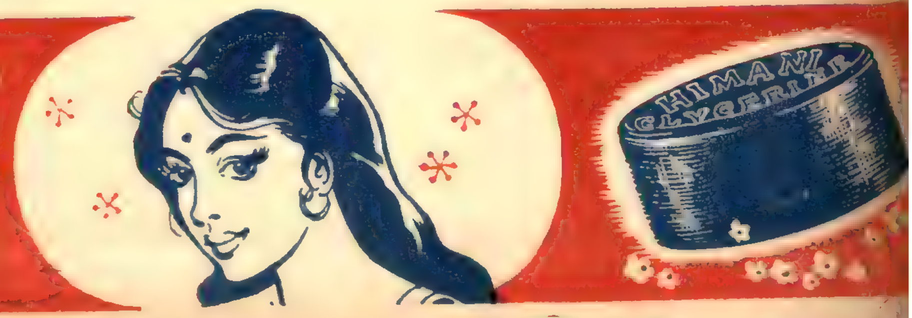

সূচীপত্র

756.3
.603/3
V.69
no.22

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৩৪৭
আজকের মানুষ	...	১৩৪৮
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৩৪৯
এষণা (কবিতা)	সুনন্দা দাশগুপ্ত	১৩৫১
ডঃ মার্টিন লুথার কিং (প্রবন্ধ)	মৃত্যুঞ্জয় মাইতি	১৩৫২
ভারতদর্শন	...	১৩৫৫
আন্তর্জাতিক		১৩৬১
কে ? (রহস্য-গল্প)	শ্যাম রায়	১৩৬৭
অনন্যতা (কবিতা)	বেণু দত্তরায়	১৩৭১
দু'টি চোখ (কবিতা)	সুধাংশু দে	১৩৭১
বঙ্গদর্শন	...	১৩৭২

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্ব্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ত্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, কয়েকে য্যা মরেছে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মিছিল (গল্প)	নারায়ণচন্দ্র ঘোষ	১৩৭৭
আধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৩৮১
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৩৮৪
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৩৮৬
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৩৯০
চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৯২
রঙ্গজগৎ	...	১৩৯৬
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদি	১৪০২
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৪০৪
পাঠকমন		১৪০৫
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৪০৬

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের
ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য একমাত্র গ্রন্থ
॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥
০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)
এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ
ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

মহাভারত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]
(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)
সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা
(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা?
মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।
মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—
দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০
৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise

বৃহস্পতিবার, ১২ই কার্তিক ১৩৭১ Thursday, 29th October 1964

জাঁ পল সার্ত্র ও নোবেল পুরস্কার

জাঁ পল সার্ত্র-এর সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অনাবশ্যক। এই ফরাসী ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও দার্শনিক-এর পরিচয় না রাখা অপরাধের সামিল। হয়তো অস্তিত্ববাদের দার্শনিক হিসেবে তাঁর যে প্রধান পরিচয়, সেই দর্শনের সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচয় রাখা আমাদের দেশের সামগ্রিক মানুষের সঙ্গে সম্ভব নয়। তবু তাঁর ঐ বিশেষ দর্শন সম্পর্কে আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীমহল যথাসম্ভব আলোচনা করেছেন।

সার্ত্র-এর মধ্যে অন্য যে গুণ বিদ্যমান তা হচ্ছে এই যে, সর্বাংশে তিনি মানবতাবাদী। সেই কারণে ঔপনিবেশিক মুক্তির জন্যে যেখানে সংগ্রাম হয়েছে সেখানেই তিনি অকপটে সমর্থন জানিয়েছেন। এমন কি, স্বদেশের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে ঔপনিবেশিক ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একদা সংগ্রাম করতে কোনোরকম দ্বিধাবোধ করেন নি। বিশ্বমানবতা ও সর্বমানুষের সমান স্বাধীনতার জন্য যে প্রাণ সর্বদাই উৎসর্গীকৃত,—সাহিত্যে, দর্শনে যে মানুষ বিশ্ববন্দিত—সেই সার্ত্র আলুব বস্তার মতো নোবেল পুরস্কার (যার মূল্য ১৯ হাজার পাউণ্ড) প্রত্যাখ্যান করেছেন।

৬৩ বছরের ইতিহাসে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের এটি তৃতীয় ঘটনা। বার্নার্ড শ' শেষ পর্যন্ত পুরস্কারের টাকাটা ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছিলেন। পাস্তারনাক অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে পুরস্কারের ঐ অর্থ নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

'গীতাঞ্জলি'র জন্য রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ প্রদানের মধ্যেও নাকি অনেক রাজনীতির খেলা ছিল, এরকম কথা আজো শোনা যায়। অবশ্য এই ধরণের রাজনীতির কোনো লিখিত ইতিহাস রচিত হয় না। আগামীকালে সাহিত্যকৃতিই শাশ্বত রূপ লাভ করে। তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্ব আজো অম্লানরূপে বিরাজ করছে। নোবেল পুরস্কার আন্তর্জাতিক খ্যাতির একটা মাপকাঠি হলেও রবীন্দ্র-সাহিত্য খ্যাতির কাছে ঐ পুরস্কার তুচ্ছ। আর এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে ঐ পুরস্কৃত অর্থ গ্রহণ করেন নি। সমস্তই তিনি বিশ্বভারতীর উন্নয়নকল্পে দান করেছিলেন। আবার, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, একাধিক রুশ সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁদের সাহিত্যও চিরভাস্বর।

জাঁ পল সার্ত্র-এর সাহিত্যিক খ্যাতির নিকট বর্তমানে যে কোনো পুরস্কারই তুচ্ছ। বরং বিশ্বের পাঠক-গোষ্ঠীর কাছে তিনি স্বতঃস্ফূর্ত যে সম্মান পেয়েছেন, তা অতুলনীয়। সার্ত্র নোবেল পুরস্কার গ্রহণের অসম্মতির কারণ স্বরূপ জানিয়েছেন যে, 'জাঁ পল সার্ত্র' এবং 'নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জাঁ পল সার্ত্র' এই দুটি স্বাক্ষর একই বস্তু নয়। আমাদের মনে হয়, সার্ত্র স্বাধীন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারকে প্রতিবন্ধক হিসেবেই বুঝেছেন।

বিগত কয়েক বছর পূতিগন্ধময় রাজনীতির জালে যেন নোবেল পুরস্কারকে জড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সার্ত্র-এর ভ্রূক্ষেপহীন মন্তব্যে সুইডিশ একাডেমী হয়তো সতর্ক হবেন। সেই সঙ্গে বাংলা দেশের পুরস্কারলোভী কোনো কোনো ইংরেজী শিক্ষিত সাহিত্যিকের সতর্ক হওয়ার কারণ অবশ্যই আছে। বাংলা দেশের সাহিত্যিকরা ফরাসী সাহিত্যিকদের সঙ্গে নাকি নৈকট্য অনুভব করেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার বাংলা ভাষার মধ্যে এমন সাহিত্যিকও আছেন যিনি আমেরিকার পাঠাগারগুলি থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, তারাশঙ্কর প্রমুখের গ্রন্থ বিদায় দিয়ে আন্তর্জাতিক পুরস্কারের স্বপ্ন দেখেন এবং নোবেল পুরস্কারের তালিকায় নিজের নামটা উল্লিখিত থাকা—দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। সার্ত্র-এর ত্যাগ দেখে ঐ সব সাহিত্যিকের ভোগ কিছুটা নিবৃত্ত হবে কি?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

এই বন্ধুর পথই গিয়ে মিশেছে দিগন্তে,—অথবা তারও ওপারে সাধনা-সিদ্ধির বৈকুণ্ঠে। এই পথ 'শ্রেয়' পথ। তাই এ পথেই চলেছেন প্রৌঢ়োত্তর দার্শনিক প্রলোভনভরা প্রশংসাকীর্ণ 'প্রেয়' পথকে সযত্ন সতর্কতায় পাশ কাটিয়ে। পার্থিব জীবনের এ যেন দুর্লভ সংকল্প।

বিদগ্ধ ফরাসী দার্শনিক-সাহিত্যিক জাঁ পল সার্তর এ বছর সাহিত্যের মহামূল্য নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সাহিত্যজগতের সবচেয়ে বড় সম্মানও সার্তরকে এতটুকুও মোহিত করতে পারে নি। হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যাঁরা এই বহুজন-বাঞ্ছিত সম্মানকে লোষ্ট্রখণ্ডের মত ছুঁড়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সার্তর তৃতীয় মানুষ। দীর্ঘ ৬৩ বছরের ইতিহাসে তাঁর আগে ছিলেন দুজন—জর্জ বার্নার্ড শ' এবং বরিস পাস্তারনাক। সার্তর আর শ'-এর বিবেক হয়ত একই অনুশাসন মেনেছে। পাস্তারনাকের ক্ষেত্রে তা আলাদা। তিনিও এ পুরস্কার নেন নি। তবে তা উগ্র রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্যই। বিবেকের কাছে কৈফিয়ৎ দেবার কারণে নয়।

অবশ্য সার্তরের নিজের মুখ থেকে এখনও আমরা তাঁর এ আচরণের স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা শুনি নি। তবে এ ঘটনার কিছুকাল আগে তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন—কোনও পুরস্কারই তাঁর চাই না, তা সে একবস্তা আলু কিংবা আড়াই লাখ টাকারও বেশি দামের নোবেল পুরস্কার—যাই হোক না কেন।

তখন তিনি 'মণ্টপারনাসে' রেস্তোরাঁয় বসে মধ্যাহ্ন-ভোজনে ব্যস্ত ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধু ও সমসাময়িক সাহিত্যিক সাইমন-দ্য-ব্যুভর। খবর এল: এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-লাভের জন্য নির্বাচিত হ'য়েছেন বরেণ্য পাশ্চাত্য দার্শনিক জাঁ-পল সার্তর। শুনে সার্তর একটুও বিচলিত হ'লেন না। শুধু বললেন: 'এ পুরস্কার আমি প্রত্যাখ্যান করছি এবং আমার বক্তব্য আমি সুইডিশ সাংবাদিকদের কাছে ঠিক সময়েই জানাব।' বন্ধুরা তাঁকে এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে অনেক অনুনয় করলেন। তাঁর প্রকাশক এম কুড গালিমার্ত বহু চেষ্টা করলেন (একটা গোটা বিকেল ধরে) তাঁর মত বদলাতে। কিন্তু কিছুই কাজে আসে নি। এবং এরপর সার্তর যে কোথায় লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত হ'লেন তাও সকলের অজানা রয়ে গেছে। অবশ্য তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের কেউ কেউ বলেছেন—তিনি আছেন আলজিরিয়ায়।

আজ নোবেল পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত বলে নয়, সার্তর বহুদিন থেকেই পৃথিবীর অগণিত সাহিত্যানুরাগীর কাছে সুপরিচিত। তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারা এবং দার্শনিক মতবাদ অনেক আগে থেকেই বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে চিহ্নিত করেছে তাঁকে। নোবেল পুরস্কার শুধু তার ফলশ্রুতি। তিনি অস্তিত্ববাদী প্রগাঢ় দার্শনিক। তিনি নাট্যকার, ঔপন্যাসিক। সর্বোপরি তিনি মানবিক জাগতিক দুঃখসুখের একান্ত সঙ্গী। তাঁর মুক্তির জন্য স্পৃহা এবং সত্যের প্রতি অনড় নিষ্ঠা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে দিয়েছে এক অম্লান বিশুদ্ধতা। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতার টানাপোড়েনেও একান্ত নিজের এই 'পবিত্র' জগতের অধীশ্বর জাঁ পল সার্তর এই উনষাট বছর বয়সেও যে-কোনও প্রলোভন বা পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে সংযত করবার শক্তি রাখেন। আমরা তাঁর এই শক্তির উৎসের সন্ধান এখনও পাই নি। যদি তাঁর মুখেই কখনও শুনি বা নিজেরাই খুঁজে পাই তবে তা আমাদের বাঁচবার অর্থকেই হয়ত অনেক সুনির্দিষ্ট ও সুসংবদ্ধ করতে সাহায্য করবে।

সাম্প্রতিককালে সাম্যবাদ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তিনি। কিন্তু রাজনীতিতে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা চাইলেও কমিউনিস্ট দর্শনের কার্যকারিতায় বিশেষ ভরসা পান নি। বিখ্যাত ফরাসী পত্রিকা লা মঁদ-এ তাঁর এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ বহু চিন্তাবিদ্‌কেই ভাবিয়ে তুলেছে। নিরন্ন ক্লিষ্ট মানুষের জন্য যে সাহিত্য নয় তাকে তিনি বিশ্বাস করেন না—ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে কমনীয় শিল্পের মাধুর্য থাকতে পারে না—সার্তরের বলিষ্ঠ লেখনীর আঁচড়ে এই কথাই বার বার বেজে উঠেছে। স্পষ্টতই তিনি ভিন্ন ধাতুর মানুষ।—তাই তিনি নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করায় এত চাঞ্চল্য—এই সপ্রশ্ন প্রতীক্ষা। সার্তর স্বয়ং যেদিন এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করবেন—জানি না সেদিন আমাদেরও চিরাচরিত ভাবনা-চিন্তার বা জীবনচেতনার নতুন দিকও নির্ণীত হ'বে কিনা।

জাঁ পল সার্তর

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

পৃথিবীতে ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা জ্বলছেই। জয়পুরের সেই ভদ্রলোকের মুখে গান্ধারী সম্বন্ধে আমার অশ্রুতপূর্ব এই গল্প শুনে সেই জ্বালার যন্ত্রণা যে কতো নিশ্চিত,—এবং আমাদের সহিষ্ণুতার সীমা যে কতো সুদূরপ্রসারিত, সেই কথাই মনে এলো।

মনে হোলো যেন আমাদের স্নায়ু শুকিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। যেন হাত-পা অবশ হয়ে পড়ছে। আবার খেয়ালী অদৃষ্টের খেয়ালে হঠাৎ নতুন উদ্দীপনা জাগছে,—নতুন ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে আমরা নতুন লক্ষ্যের দিকে হাত বাড়াচ্ছি, পা চালাচ্ছি।

এই চেতিয়ে-ওঠা আর মুষড়ে-পড়ার ধারাবাহিকতাই জীবন। এরই নাম জীবনের অভিজ্ঞতা।

খুবই নিকট-কালের একজন লেখকের কথা মনে এলো।

১৮৮৩তে প্রাগ্-শহরে ফ্রান্‌জ্ কাফ্‌কা জন্মগ্রহণ করেন। চেকো-স্লোভেকিয়ার এক ইহুদী বণিকের সন্তান তিনি। ১৯২৪এ কাফকার মৃত্যু হয়। মাত্র একচল্লিশ বছরের আয়ুর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে তাঁর জীবনে।

ছেলেবেলায় কিছুদিন সাহিত্য পড়েছিলেন তিনি, কিছুদিন চিকিৎসা-বিদ্যাও। তারপর আইন পড়া আরম্ভ করেন। প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডক্টরেট পান। কিছুদিন এক জীবন-বীমার আপিসে কাজ করেন, কিছুদিন অন্যত্র। তারপর চাকরি ভালো লাগেনি আর। বের্লিনের কাছাকাছি মফঃস্বলে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেছিলেন অতঃপর। ১৯১৪তে বিয়ে করবেন বলে মনস্থ করেন, কিন্তু বিয়ে করবার জোর ছিল না মনে। তাই, সেবার নিজের বিয়ের প্রস্তাব নিজেই ভেঙে দেন। আর-একবার পরিণয়ে উদ্যোগী হন বটে, কিন্তু সেবার ধরা পড়ে যে, তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে।

এইভাবে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে, গভীর সংবেদনশীল মনের যন্ত্রণায় জ্বলতে-জ্বলতে ১৯২৪এ মৃত্যুবরণ করেন ফ্রান্‌জ্ কাফ্‌কা।

শতপুত্রের শবাসনের ওপর গান্ধারীর ক্ষুধার উদ্দীপনা আমি যেন নিজের মনের মধ্যে পাথরের মূর্তির মতো সুস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম।

দেখলুম তাঁর লোল রসনা, বিস্ফারিত চক্ষু। তাঁর মণিবন্ধে, বাহুমূলে, জানু থেকে পদমূল অবধি পেশীর কুঞ্চন-প্রসারণ, শিরার স্ফীত-ভাব ইত্যাদি স্পষ্ট চোখে পড়লো যেন। জীবনের অবসাদ ভুলে গিয়ে জীবনধারণের উদ্দেশ্যে যেতে উঠেছেন তিনি। গাছের শাখা নুইয়ে নিচে নামিয়ে দৃঢ়মুষ্টিতে পাকা ফলটি বাগিয়ে ধরেছেন তিনি।

জীবনের এইসব দৃশ্য দেখবার সুযোগ বা দুর্যোগ হয়তো সকলেই কিছু কিছু পেয়ে থাকেন। সাহিত্যে তো বটেই, আমাদের নিজের নিজের জীবনেও এরকম দৃশ্য ঘটছেই।

কিন্তু স্মৃতি বড়ো চঞ্চলা! সংসারের নাম মায়া! হায় রে হায়, আমাদের মনে মনে কিছুই স্থায়ী স্থান হয়ে জেগে থাকে না বুঝি!

তাই ভুলে যাই। আমরা টাকার নেশায় সুখের লক্ষ্য ভুলে যাই, সুখের নেশায় দুঃখকে ঠাঁই দিতে বিমুখ হই। আমরা সুখের ভ্রমর অথচ দুঃখই তো জীবনবোধ। হায় রে হায়, সেই গান মনে আসছে,

'ভ্রমর যেমন হয় বিবাগী,
নিভৃত নীল পদ্ম লাগি।'

কেন এসেছি—কোথায় যেতে হবে,—এতো যন্ত্রণা কেন,—কেন বিচ্ছেদ,—কেন ব্যাধি—এই সবই তো মনের মধ্যে ঘুরছে ফিরছে। তবু আত্মবিভ্রান্ত ভ্রমরের দেখা নেই। সে কেন বিবাগী হোলো না?

হঠাৎ বুকের মধ্যে টন্ টন্ করে ওঠে। ভ্রমরের জন্যে ছটফট করতে করতে কাফ্‌কার একচল্লিশ বছরের পরমায়ু মনে পড়লো আবার।

ফ্রান্‌জ্ কাফ্‌কার 'দি ট্রায়াল' বেরিয়েছে ১৯২৫এ,—'দি কাস্‌ল্' ১৯২৬এ,—'অ্যামেরিকা' ১৯২৭এ, 'দি গ্রেট ওয়াল অব চায়না' ১৯৩১এ। এ সবই তাঁর মৃত্যুর পরের প্রকাশ।

নিজের অবচেতন মনের ধারা ধরে তিনি তাঁর 'বিচার' (দি ট্রায়াল) বইখানি লিখে গেছেন। জীবনের দুঃসহ ভারের বেদনা ফুটেছে সে-বইয়ে।

কী যেন এক অভিযোগ এসেছে জোসেফ কে-র বিরুদ্ধে। সকাল আটটায় তার ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে প্রাতরাশ এসে পৌঁছোয় প্রতিদিন। কিন্তু সেদিন প্রাতরাশের পাত্তাই নেই। তাই, কেমন যেন অদ্ভুত মনে হোলো সেদিনটা। আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে নিজের বালিশে মাথা রেখেই সামনের বুড়ীটির দিকে চেয়ে দেখতে হোলো। অদ্ভুত কৌতূহল তার চোখে। কী ব্যাপার। কী ঘটলো রে বাবা!

এদিকে খিদে পেয়েছে সাত্যাই। ঘণ্টার বোতাম টিপতে হোলো অগত্যা।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় করাঘাত। দোর খুলে যে লোকটা ভেতরে এলো, জীবনে এই তার সঙ্গে প্রথম দেখা। কালো পোষাক তার। তাতে আঁটসাঁট নিখুঁত মাপ-মাফিক ভাব,—বোতাম, পকেট, বেল্ট, বকলশের আড়ম্বর,—যেন কোনো ভ্রমণরত কাজের মানুষ।

কে তুমি? কী চাও?—বিছানায় একটু দেহ উঠিয়ে জিগেস করলে 'কে।'

সে-সব কথার জবাব দিলে না সে। শুধু বললে, 'তুমি ঘণ্টা বাজিয়েছিলে এখুনি?'

—হাঁ অ্যানা আমার প্রাতরাশ আনবে।

লোকটা দরজাটা সামান্য ফাঁক করে বাইরে কার উদ্দেশ্যে বললে—'ও বলছে, অ্যানা ওর প্রাতরাশ আনবে।'

পাশের ঘরে কে? একজনও হতে পারে, অনেকেও হতে পারে। সেখান থেকে কিছু-একটা জবাব এলো। লোকটা বললে—'সে-সব হবে না।'

বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে ট্রাউজার্স পরে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে 'কে' বললে—'আহা, খবর বটে।'

লোকটা বললে, 'ছটফট না করে তুমি বরং এইখানে বসে থাকলেই ভালো করতে।'

—আমি এখানে বসে থাকবো না, তোমাকে এভাবে কথা বলতেও দেবো না,—আগে বলো, তুমি কে?

লোকটা বললে, 'আমি যথা কথাই বলেছি।' এই বলে সে দরজাটা নিজেই খুলে দিল।

'কে' পাশের ঘরে আস্তে আস্তে ঢুকলো। যতো জোরে ঢুকবে মনে করেছিল, ততো জোরে নয়। আস্তে আস্তে।

ফ্র গ্রুবাকের ঘর সেটা। ঘরে নানা আসবাবের ভিড়। যেমন ছিল, তেমনিই আছে। শুধু খোলা জানলার পাশে একটা অচেনা লোক বই পড়ছিল বসে বসে।

চোখ তুলে সে বললে,—'তোমার নিজের ঘরেই তোমার থাকা উচিত ছিল, ফ্রান্‌জ্ তোমার বলেনি সে-কথা?'

—হাঁ, হাঁ, কিন্তু তোমরা কী করছো এখানে?

লোক দুটোর দিকে তাকিয়ে,—ঘরের অন্য দিকের জানলায় উঠে-দাঁড়ানো সেই বুড়ির দিকে চোখ পড়তেই 'কে' বললে,—'আমি বরং পাশের বাড়িতে গিয়ে ফ্র গ্রুবাকের কাছেই এ-ব্যাভারের কৈফিয়ৎ চাইবো।'

বইখানা টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলে লোকটা বললে—'তোমার বাইরে যাওয়া চলবে না, তোমাকে গ্রেপ্তার করা হোলো।'

এই আকস্মিক গ্রেপ্তারের ছবি দিয়েই কাফ্‌কার 'দি ট্রায়াল' শুরু হয়েছে। ইণ্টারোগেশন-কমিশনের লোকজন এসে হঠাৎ এইভাবে একদিন ঘর তচ্‌নচ্‌ করে। ওয়ার্ডার-দের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি চলে। প্রাতরাশ পৌঁছোয় না ঠিক সময়ে। বিছানায় শুয়ে পড়ে পাশের তাক থেকে গত রাত্রের আপেলটাতেই দাঁত বসাতে হয় অগত্যা। ব্যাঙ্কের চাকরিটা থাকবে না। তাহলে? আত্মহত্যা করবে 'কে'? এ-রকম অবস্থায় সে-কাজটা বড়োই বেমানান নয় কি?

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে চীৎকার শোনা যায়। ইন্‌স্‌পেক্‌টার ডাকছেন তোমাকে। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পাশের ঘরে যেতে উদ্যোগী হয় 'কে'। ওয়ার্ডাররা বলে, আহা হা, করো কি, করো কি,—ঐ শার্ট পরে ইন্‌স্‌পেকটারের সামনে যাওয়া চলে?

'কে'-র কালো কোট তারাই হাতে তুলে দেয়। তাদের অনুমোদনমাফিক তাই-ই পরতে হয়। ওয়ার্ডাররা বলে, হাঁ এ-কোট চলতে পারে।

পাশের ঘরে ইন্‌স্‌পেকটারের সঙ্গে দেখা হয়। বয়সে ভদ্রলোক বোধ হয় 'কে'-র চেয়ে কিছু ছোটোই হবেন। কিন্তু 'কে'-কে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হয়। কারণ, চেয়ার দেবার রীতি নেই।

কোনো অপরাধ করিনি আমি—'কে' বলতে চায়।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার তাকে বলেন, সে গ্রেপ্তার হয়েছে, এইটুকুই উপস্থিত কথা, তার বেশি কথা 'কে'-র ভাববার নেই। অতএব সাবধানে কথাবার্তা বলা দরকার। কী হবে অকারণ নিজের নিরপরাধ ভাবটা জাঁক করে?

—আমি কি আমার বন্ধু অ্যাডভোকেট হেস্টারারকে টেলিফোন করতে পারি?

—নিশ্চয়, কিন্তু যদি তোমার ব্যক্তিগত কোনো পরামর্শ থাকে তো করো, তবে, গ্রেপ্তারের বিষয়ে অ্যাডভোকেট কী করবেন?

গভীর ক্ষোভে, নৈরাশ্যে, ঘৃণায়, টেলিফোন করবার ইচ্ছে বাতিল করে 'কে' জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যে চোখ দেয়। সেখানে ক'টা লোক দাঁড়িয়ে আছে,—ভিড় জমে গেছে বাইরে।

ইন্‌স্‌পেকটার বলেন,—'না, না অনুগ্রহ করে আপনি টেলিফোন করুন'।

—না, আমি টেলিফোন করবো না।

ইন্‌স্‌পেক্‌টার করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন। ফ্রলিন বার্স্টনারের বিছানা থেকে শক্ত টুপিটা তুলে নিয়ে নিজের মাথায় বসিয়ে দিলেন দু হাত দিয়ে। বললেন, 'তুমি ভাবছো, ব্যাপারটা আমরাই সুন্দরভাবে মিটিয়ে দিতে পারি? আহা, কী সহজ ভাবনা তোমার?---আমরা তা পারি না।---তোমাকে আশা ছাড়তে বলবো না, আমি।---আশা থাক্, আশা রাখো। শুধু তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ, এইটুকুই বক্তব্য। আচ্ছা উঠি এখন----তোমাকে তো আবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে?'

—সে কি ? আমি তো গ্রেপ্তার হয়েছি। আমি আবার ব্যাঙ্কে যাবো কী করে ?

—আরে, তুমি দেখছি আমার কথা বুঝতেই পারো নি। তুমি গ্রেপ্তার হয়েছ,—এইটুকুই তোমাকে জানানো গেল। কিন্তু তাতে তোমার নিয়মিত কাজ চালিয়ে যেতে বাধা হবে কেন ?

'কে' বললে—তাহলে দেখছি গ্রেপ্তার হওয়াটা খুব একটা দুরবস্থা নয় !

—আহা, আমি তো কখনোই সে-রকম কিছু বলতে চাইনি। আর আমি একথাও বলি নি যে, ব্যাঙ্কে তোমাকে যেতেই হবে। তবে, এ-খুবই স্বাভাবিক যে, ব্যাঙ্কের কাজে তুমি ঠিক সময়ে পৌঁছোতে চাইবে। আর সেই জন্যেই, তোমার কাজের সুবিধের জন্যে তোমার এই তিনজন সহকর্মীকে আমি আটকে রেখেছি- - - -

ফোটোগ্রাফের পাশে, 'কে' যে তিনটে রক্তাল্পতাগ্রস্ত লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল,—সেই হাত-দোলানো র‍্যাবেনস্টিনার,—সুকান্তি কুলিনার,—আর চোখ-বসে-যাওয়া, মুখের পেশীর দোষে দেখনহাসি কুলিক-কে এতক্ষণ চিনতেই পারে নি 'কে'। তারা ছুটোছুটি করে 'কে'র টুপি এনে দিল পাশের ঘর থেকে। ট্যাক্সি ডাকা হোলো। পথে বেরিয়ে গেল সকলে।- - - -

ফ্রানৎস্ কাফ্কার এই অদ্ভুত আবহাওয়ার সঙ্গে আমার অশ্রুতপূর্ব সেই শবাসনা গান্ধারী-কাহিনীর আবহাওয়া জীবনে অনেক সময়ে যেন এক হয়ে যেতে দেখেছি বলে মনে হোলো। যেন আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত জীবনে—শোওয়া-বসা-হাঁটা-চলার চিরা-চরিত ধারায়, আমাদের নিয়মিত কাজের মধ্যে বাস করেও মাঝে মাঝে হঠাৎ দুর্বোধ্য কোনো ইন্‌স্‌পেক্‌টারের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে যাই।

ফ্রানৎস্ কাফ্কা কী ভেবে লিখেছিলেন, জানি না। একটি কবিতাই যেমন লক্ষ মনে লক্ষ দীপ হয়ে জ্বলে, তেমনি কাফ্কার ঐ 'বিচার'-কাহিনীর মধ্যে আমরাও হয়তো নিজেদের লক্ষ ঘটনার ছায়া দেখতে পাই।

যেন আমরা চলতে চলতে মাঝে মাঝে হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে যাচ্ছি ! যেন হঠাৎ কোনো কোনো লঙ্ঘনবোধ জেগে উঠছে। হয়তো ইন্‌স্‌পেক্‌টার সেই গভীর লঙ্ঘনবোধের প্রতীক। হয়তো অন্য কিছু।

ভাবতে ভাবতে এ-উপন্যাসের অদ্ভুত আবহাওয়ায় মন কী-রকম যেন আচ্ছন্ন বোধ করে। তীব্র অনুভূতি দেখা দেয়। তাতে আমাদের আচমকা গ্রেপ্তারের এই রকম দৃশ্যের ছায়াবাজি দেখায়।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে এরকম ছায়াবাজিও যুগে যুগে পোষাক বদলে দেখা দিয়েছে। শুধু কি একালের কাফ্কার মধ্যেই,—গভীর আবহাওয়া আর অদ্ভুত ঘাত-প্রতিঘাত শুধু কি এই-মাত্র ভূমিষ্ঠ হোলো ? মানুষের মনের ঢেউ একই ভাবে উঠছে পড়ছে। যুগে যুগে তাই, দেশে দেশে তাই।

আজ সেই কথাই মনে এলো।

(ক্রমশঃ)

এষণা

সুনন্দা দাশগুপ্ত

ক্লান্ত সন্ধ্যা। অবসন্ন আমি পথচারী।
তবুও বিবর্ণ মনে বেজে ওঠে পূরবীর রেশ।
দূরের আকাশে ঐ উড়ে যায় মেঘের বলাকা—
অকালবর্ষণ শেষে সন্ধ্যারাগে অজানা আবেশ

ময়দানের তৃষাদীর্ণ মহীরুহ শাখে
সুচিক্কণ শ্যামলিম পাতাগুলি আহা
ধারাস্নানে তৃপ্ত হয়ে পান করে বৃষ্টির মদিরা
মুখর দৃষ্টির আলো ছুঁয়ে যায় তাহা।

আমার পুরোনো মন উড়ে যায় দূরের আকাশে।
স্মৃতির সুরভিসিক্ত বেলা শেষে এ ঘনবর্ষণ
অসীম পাথার ঘেরা বিজন দ্বীপের মত মনে
বয়ে আনে সচকিত বনবীথিকার শিহরণ।

শহরের এ অরণ্যে আমাদের একক সত্তার
অনেক সমস্যা আছে। অনেক দীনতা আছে জানি
আমাদের ক্লান্ত জীর্ণ অকরুণ মনে বাসা বাঁধে
কর্মের মন্থনে জাত পুঞ্জীভূত বেদানার গ্লানি।

তবুও এমন ক্ষণ ডাক দিয়ে যায় বারেবার
মলিন বসুধা যেথা অমর্ত্যের বড় কাছাকাছি।
বৃষ্টি আছে, ফুল আছে, গান আছে, আর
শিশুর অম্লান মুখে অকারণ হাসির ঝলক
: তাই বেঁচে আছি।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

গত ১৫ই অক্টোবরের সংবাদপত্রে অনেক বড় বড় খবরের ভিড়ের মধ্যে এই ছোট খবরটি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে ১৯৬৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের কাছে একটি পরিচিত নাম। তবে সে নামের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ রাজনীতিবিদদের বর্ণের উজ্জ্বলতা নেই। তিনি যেন এক নিঃসঙ্গ পথিক—যে পথে সচরাচর লোক হাঁটে সে পথে তাঁর পদচিহ্ন পড়ে না। থোরো বা গান্ধী, এঁরা কেউই প্রচলিত পথের যাত্রী নন। তেমনি ডঃ মার্টিন লুথার কিং, যিনি লক্ষ লক্ষ উত্তেজিত নিগ্রো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলতে পারেন—'We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence'

তিনি বলেন, 'যে নবজাগ্রত শক্তি নিপীড়িত নিগ্রো জনতার মধ্যে আজ জেগে উঠছে, হিংসাত্মক ঘটনার পথ বেয়ে সে শক্তিকে বিধ্বস্ত হতে দিতে আমরা পারি না। অতএব, নতুন পথ ধরে আমাদের চলতে হবে। কারণ চলাটা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য, মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে থেমে যাবার জন্য নয়।'

তবে সে পথটা কি? নিপীড়িত এবং অপমানিত নিগ্রোসমাজকে কেবল সম্মানের সঙ্গে বাঁচবার অধিকার অর্জন করতে হলে কোন্ সংগ্রামের পথ ধরে তাকে হাঁটতে হবে?

মার্টিন লুথার বললেন—'I am still convinced that non-violence is the most potent weapon available to the Negro in his struggle for freedom and justice.'

একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার জনতার হাতে তুলে দিলেন তিনি।

অস্ত্রটি হল 'অহিংস সত্যাগ্রহ'। তাঁর মতে—'This is the method which must guide us through this tense period of transition. We are moving from the old order to the new order. We have the inevitable birth pains, the inevitable tensions that accompany the birth of a new age.'

নতুন যুগের, নতুন দিনের প্রসবলগ্ন যখন আসবে তখন পৃথিবীর আকাশ যন্ত্রণায় একটু আরক্ত হবেই। তবে সে যন্ত্রণাকে নিজের বুকে তুলে নেবার জন্য দু-একজন নীলকণ্ঠের দিকে মানবসমাজ তাকিয়ে থাকে। তাঁরাই গান্ধীজী, তাঁরাই ডঃ মার্টিন লুথার। তাঁদের মধ্যেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের কোলে বন্দরের নিরাপত্তা আসন বিছিয়ে থাকে।

পৃথিবীর কোন মহৎ আদর্শের কোন ভৌগোলিক সীমা থাকে না। মনীষী থোরোর অহিংস সত্যাগ্রহের আদর্শ একদিন গান্ধীজী ভারতের মাটিতে নিয়ে এসেছিলেন—ডঃ মার্টিন লুথার কিং আবার গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ পদ্ধতি আমেরিকার নিগ্রো-দের মধ্যে প্রয়োগ করে দেখলেন। থোরো, প্লেটো, এ্যারিস্টোটল, রুশো প্রভৃতি দার্শনিকদের রচনাবলী পাঠ করলেও, অহিংস সত্যাগ্রহ সম্পর্কে ডঃ লুথার কিং তখনও খুব বেশি আকৃষ্ট হন নি। এমন সময় একদিন তিনি হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Dr. Mordecar Johnson-এর গান্ধী-দর্শন বিষয়ে একটি বক্তৃতা শুনে গান্ধীজীর রচনা সম্পর্কে খুব আকৃষ্ট হন। হাতের কাছে গান্ধীজীর যত বই ছিল সব পড়লেন, বুঝতে পারলেন এই সত্যাগ্রহের মধ্যে অপরিসীম শক্তি পুঞ্জীভূত আছে, যাকে সমাজ-সংস্কারের কাজে লাগানো যেতে পারে।

দেখতে দেখতে একদিন আমেরিকার মাটিতে, সেই সত্যাগ্রহের শক্তি পরীক্ষার সময় নিকটতর হল।

ঘটনাটি এমন কিছু নয়। রোজা পার্ক নাম্নী এক নিগ্রো মহিলা যখন যাত্রীপূর্ণ 'বাস'-এ চড়ে যাচ্ছিলেন, তখন যাত্রীদের মধ্যে এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে তিনি তাঁর আসনটি ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেন। এই অঞ্চলের রীতি ও আইন হল, শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের জন্য নিগ্রোদের আসন ছেড়ে দিতে

হবে। রোজা পার্কের এই অবৈধ কাজের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল এবং বিচারে তাঁর কারাদণ্ড হল।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি স্থানীয় নিগ্রোসমাজে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে গেল। রোজা পার্কের এই প্রচলিত অমানবিক আইন ভাঙার সৎসাহসের মধ্যে, নিগ্রোসমাজের নির্বাক বেদনা ভাষা পেল। স্থির হল, যতদিন বৈষম্যমূলক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে—ততদিন এই অঞ্চলের নিগ্রোরা 'বাস'-এ চড়া ছেড়ে দেবেন। ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে প্রেসিডেণ্ট করে একটি 'বয়কট কমিটী'ও গঠন করা হল। ডঃ লুথার বললেন, রোজা পার্কের আচরণের মধ্যে মানবিক মর্যাদা এবং স্বাধীনতা অর্জনের যুগসঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা আজ ভাষা পেয়েছে।

দেখতে দেখতে অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। 'বয়কট' বিরোধী আইন ভাঙার অপরাধে ৯০জন নিগ্রোকে জেলে পুরে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ হুমকী, হয়রানি এবং নানান অত্যাচার চালাতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত অত্যাচারের সম্মুখে নিগ্রোরা অহিংস রইলেন, কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের পথ বেছে নিলেন না।

এমন কি একদিন ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর বাড়িতে কারা বোমা ছুড়ল। তিনি তখন একটি মিটিঙে ছিলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে আনা হল। তিনি এসে দেখলেন, তাঁর বাড়ির চারদিকে উত্তেজিত নিগ্রোরা ভিড় করে এসেছে। ভাঙা বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে ডঃ লুথার বলে উঠলেন—'বন্ধুগণ, আমরা আইন ও শৃঙখলায় বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি অহিংসায়। আমরা আমাদের শত্রুকেও ভালবাসতে চাই। আমরা যে অহিংস সত্যাগ্রহের পথ বেছে নিয়েছি, সেই পথই প্রকৃত ন্যায়ের পথ। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন্।'

উত্তেজিত জনতা শান্ত মনে ফিরে গেল।

'বাস বয়কট' তেমনি চলতে লাগল। ফলে দেখা গেল বাস কোম্পানী প্রায় লালবাতি জ্বালতে বসছে। এদিকে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিলেন—'বাস'-এ এইভাবে শ্বেতাঙ্গদের জন্য আসন সংরক্ষণ অবৈধ। প্রথম জয় হ'ল তরুণ গান্ধীবাদী নেতার।

তরুণ ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর মনে অহিংস নীতির সাফল্য সম্পর্কে সেই যে দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হল, সেই ধারণা থেকে আজও তিনি সরে আসেন নি। সেই সত্যবোধ তাঁকে নিগ্রোসমাজের শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের আসন দিয়েছে। বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার তাঁর সেই আদর্শ অনুসরণের এক স্মরণীয় স্বীকৃতি।

১৯৫৯ সালে ভারতে এসে তিনি শ্রীনেহরু ও বিনোবাজী প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভারত থেকে ফিরে গিয়ে প্রথমে তাঁকে কিছু কিছু গঠনমূলক কাজে হাত দিতে দেখা যায়। এরও কয়েক বছর পরে, ১৯৬৩ সালে তিনি নাগরিক অধিকার নিয়ে এক বিরাট গণ-সত্যাগ্রহে অবতীর্ণ হন। আমেরিকার অগ্রগতির ইতিহাসে এই সত্যাগ্রহ একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রচনা করে গেছে।

এই অগ্রগতি বৈষয়িক অগ্রগতি নয়, মানবতাবাদের অগ্রগতি। সেদিন ওয়াশিংটনে সমবেত মুক্তি-অভিযাত্রী, সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষ। তার আগে সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার হয়েছে, পুলিশ-কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, লাঠি-চালনা হয়েছে, পাইকারীভাবে দিনের পর দিন গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত' হয়েছে, এদের বাঁধন ততই টুটছে! সত্যাগ্রহীরা সমস্ত অত্যাচারের সম্মুখে অহিংস ছিলেন এবং সবসময় অদ্ভুত শৃঙখলা রক্ষা করেছিলেন।

ডঃ মার্টিন লুথার কিং-এর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গেও গান্ধীজীর জীবনের কিছু মিল আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সময় একদিন প্রকাশ্য রাজপথে গান্ধীজীর উপর আক্রমণ হয়। আক্রমণকারী শ্বেতাঙ্গটিকে গান্ধীজী চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু জ্ঞান ফিরে পাবার পর, তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে গান্ধীজী বলেছিলেন, আক্রমণকারীর উপর তাঁর কোন অভিযোগ নেই। তাকে যেন মুক্তি দেওয়া হয়।

ব্যক্তিজীবনে হিংসার উর্ধ্বে ওঠা একটি কঠিন অহিংস-সাধনা। মার্টিন লুথার এই সাধনায় সফল হয়েছেন, তবে তার অর্থ একটু স্বতন্ত্র। তাঁর উপর বহুবার আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু আক্রমণকারীকে তিনি কখনও প্রত্যাঘাত দেন নি। তাঁর মতে—অহিংসা হল আত্মসংযমের একটি স্তর এবং শত্রুকে ভালবাসা, আঘাত না দেওয়া তার শেষ পরীক্ষার অন্তিম সীমারেখা। তিনি বলছেন, ভালবাসা, অহিংসার প্রশান্ত বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু। কিন্তু এই ভালবাসার সংজ্ঞা হল, কাউকে প্রত্যাঘাত না দেওয়া।

আমার মনে হয়, ভালবাসার এই সংজ্ঞাটি লোকে ভুল করেন। তাঁরা মনে করেন, ভালবাসা একটি ভাবাবেগের বিষয়, স্নেহ ও প্রীতির এক প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমি বলতে চাই, এই ধারণাগুলি ভুল। যে মানুষ অত্যাচারিত, সে তার

পোকামাকড় মারুন
এরা অনেক রকম রোগ ছড়ায়
মারকিট
আরসোলা, ছারপোকা, মশা প্রভৃতির
নির্ঘাত প্রাণ-ঘাতক
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

অত্যাচারীকে ভাবাবেগ দিয়ে ভালবাসবে এ হয় না। হলেও অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

১৯৬৩ সালে হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ মার্টিন লুথার কিংকে গান্ধী-স্মারক বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানানো হয়। তাঁর এই ভাষণটি থেকে অহিংসা সম্পর্কে তাঁর মূল ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল:

'যখনই সমাজে কোন সঙ্কট দেখা দেয় বা যখন সমাজের একদল লোক বা শ্রেণী আর একদলের ওপর নিপীড়ন চালায়, তখন সাধারণত তিনটি উপায়ে নিপীড়িত দল তার সমাধানের পথ বেছে নেয়। প্রথম উপায় হল, নিপীড়নকে নীরবে মেনে নেওয়া। দ্বিতীয় উপায়, হিংসার পথে সমাধানের জন্য অগ্রসর হওয়া। তৃতীয় উপায়, অহিংসভাবে নিপীড়নের প্রতিরোধ করা। কিন্তু প্রথম উপায় প্রতিকার নয় বা প্রতিরোধও নয়, সে কেবল অত্যাচারকে ভাগ্য বলে মেনে নেওয়া। তার মধ্যে নৈতিকতা নেই বা সাহসিকতা নেই, আছে শুধু সেই নিপীড়নকে স্থায়ী করে তোলার অযোগ্যতা। বস্তুত, এই নিপীড়নের দায়ভাগে নিপীড়িত ব্যক্তিও একজন অংশীদার হয়ে ওঠে। কাজেই এই উপায় অন্যায় ও অসঙ্গত।

'দ্বিতীয় উপায়টি বরং আমাদের পরিচিত। এই হিংসাত্মক উপায়কে আমরা চিনি এবং এই উপায়ে কখনও কখনও কাজ হয় না—এ কথা আমি বলতে পারি না। ইতিহাস বলবে, হিংসার পথে বহু দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, কখনও কখনও সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জনও সম্ভব হয়েছে হিংসার পথে। কিন্তু আমি বলতে চাই, এ পথে স্থায়ী শান্তি আসে না বরং এ থেকে সমাজে বহু জটিল সমস্যার জন্ম হয়। তা ছাড়া এই পথ নীতি-সম্মতও নয়। খুনের বদলে খুন নেওয়ার রীতি অবাস্তব এবং দেখা যায় তার পরিণতিতে, বিবাদী দুই পক্ষের প্রতিটি মানুষের শুভবুদ্ধির মৃত্যু হয়েছে।

তৃতীয় উপায়টিকে অর্থাৎ অহিংস প্রতিরোধকে আমি শ্রেষ্ঠ উপায় বলতে চাই। পালা বদলের উত্তেজিত দিনগুলিতে এই অহিংস প্রতিরোধ আমাদের ঠিক পথে নিয়ে যেতে পারে।

এখন এই অহিংস প্রতিরোধ পথটি কি, কি দর্শন এর মধ্যে নিহিত, সে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই অহিংস দর্শনের প্রথম কথা হল, পথ ও লক্ষ্যের মধ্যে ঐক্য। লক্ষ্য যদি আমাদের পবিত্র হয়, তবে আমাদের পথকেও পবিত্র হতে হবে। আমরা যে আদর্শে পৌঁছতে চাই, আমাদের পথে যেন সেই আদর্শের প্রতিধ্বনি থাকে। আগামীকালের ইতিহাস প্রমাণ করবে। ধ্বংসাত্মক পথে গিয়ে, গঠনাত্মক পরিণতিতে আমরা পৌঁছতে পারি না; নীতিহীন পথে গিয়ে নৈতিকতার লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারি না; কাজেই অহিংসা হল, নৈতিকতার পথ বেয়ে সত্য লক্ষ্যে পৌঁছবার কঠিন প্রয়াস।

● নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার সংবাদ প্রাপ্তির মুহূর্তে সস্ত্রীক কিং

দ্বিতীয় কথা হল, প্রতিপক্ষকে আঘাত না দেওয়া। ভারতীয় দর্শনে অহিংসার অর্থ হল—হিংসা না-করা বা কাউকে আঘাত না-করা। অহিংস দর্শনের এইটিই হল মূল কথা। আঘাত না-দেওয়ার চরম প্রকাশকে বলা হয় প্রেম।

তৃতীয় কথা হল, নিপীড়ন সহ্য করার মধ্যে একপ্রকার শক্তি আছে এবং সেই শক্তি নিজেই নিপীড়নের অবসান ঘটায়, সেখানে নৈতিকশক্তি দৈহিকশক্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। সেখানে সত্যাগ্রহী বলে, 'তোমার হাতে যত শক্তি আমাদের সহ্য করার শক্তি দিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াব, তুমি যত আঘাত দাও না কেন, তোমাকে আমরা ভালবাসব। আমরা তোমার অন্যায় আইনকে মানি না, তার জন্য আমাদের জেলে দাও, ফাঁসি দাও, তবু তোমার প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকবে। একদিন আমাদের সহনশীলতার পথ বেয়ে আমাদের মুক্তির আলো এসে পৌঁছবে।'

একদিন মনীষী থোরো যে-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, একদিন মহাত্মা গান্ধী পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে-পথ বেছে নিয়েছিলেন, আজ সেই পথ ধরে আমেরিকার একটি বহুপ্রতিষ্ঠিত অমানবিক প্রথার অবসান হতে চলেছে। বস্তুত সে-পথের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই, বিশেষ কোন দেশ, কাল ও জাতির জন্য সে পথের কোন মাইলস্টোনও নির্দিষ্ট করা হয় নি, তাই অনেকে আশা করেন, সেই পথ ধরেই পৃথিবীতে একদিন স্থায়ী শান্তি এবং পবিত্র শান্তির আলো ছড়িয়ে পড়বে।

ডঃ মার্টিন লুথারকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ার মধ্যে, সেই পথের প্রতি আজ শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হল। ●

• 'Span' পত্রিকার প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রাজধানী :

পূজার পরই নয়াদিল্লীর হাওয়া বদলের পালা হয় সুরু। হিমেল হাওয়া বয়ে আনে নয়া আমেজ। সে আমেজে নয়াদিল্লীর রঙ যায় পাল্টে। সেই সঙ্গে রাজধানী হয়ে ওঠে অতিথিপরায়ণ—হাতছানি দিয়ে আহ্বান জানায় দেশ-বিদেশের মানুষকে। নতুন অতিথির সমাগমে ভরে ওঠে তার বুক।

এবারের হিমেল হাওয়া বারুদের উৎকট গন্ধে ভারাক্রান্ত, রণদামামার বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে হিমালয়ের ওপার থেকে। মানুষ তাতে আতঙ্কিত। রাষ্ট্রনেতারা স্বভাবতই উদ্বিগ্ন। শোনা যাচ্ছে ভারতের চতুর্থ পরিকল্পনার রদবদলের কথাও নতুন পরিবেশে তাঁদের ভাবতে হচ্ছে। ওপারের পটভূমিকায় প্রয়োজন হবে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার। চীনের পারমাণবিক বোমা বিদারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারত তার নীতি পরিহার করে পারমাণবিক অস্ত্রের দিকে না ঝুঁকলেও প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম তাকে বাড়াতেই হবে। প্রতিরক্ষার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে শিল্পকে উপেক্ষা করা চলে না। সাড়ে একুশ হাজার কোটি টাকার চতুর্থ পরিকল্পনায় এই ব্যয়-বৃদ্ধি খাপ খাওয়ানো কতদূর সম্ভব, সে চিন্তায় এখন আমাদের পরিকল্পনা-কারগণ ব্যস্ত।

চীনের 'কাগজের বোমা' বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করলেও বিষণ্ণতা আনতে পারে নি। ক্রুশ্চেভের বিদায় এবং চীনের বোমা বিস্ফোরণে নয়াদিল্লী বরং এবারে খুবই তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে। চীনের জঙ্গী নায়কদের ভয় দেখিয়ে প্রভাব বিস্তারের ফন্দীটা নয়াদিল্লী ফাঁস করে দিয়েছে। পারমাণবিক বোমা হাতে নিয়ে শান্তি-বৈঠকের প্রস্তাবও ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

নয়াদিল্লী এই উত্তেজনার মুহূর্তে, কর্মব্যস্ততার মধ্যে ভোলে নি তার

ভারত দর্শন

● পালাম বিমানঘাঁটিতে শ্রীমতী বন্দরনায়ক জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করছেন

অতিথিদের। ভারতের পরম সুহৃদ সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক জানিয়েছেন আন্তরিক অভিনন্দন।

ভারতের বিপদের দিনে যে-ক'টি রাষ্ট্র সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সিংহল তাদের অন্যতম। চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসায় বরাবরই সিংহল আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে। বিশ্ব-রাজনীতিতেও সিংহল স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়েই চলেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কও অত্যন্ত মধুর। অথচ ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিংহল-বাসীদের অধিকার নিয়ে দীর্ঘকাল দুই রাষ্ট্রের মধ্যে চলেছে অদ্ভুত পরিস্থিতি। এই ভারতীয় বংশোদ্ভব বলেই তারা সিংহলে অবাঞ্ছিত—রাষ্ট্রহীন নাগরিক। সিংহলের জাতীয় সংগ্রামে, তার বিকাশে ও সমৃদ্ধি সঞ্চয়ে এদের অবদান কম নয়।

ভারতের সঙ্গে সিংহলের দীর্ঘ-কালের ঐতিহ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং বর্তমান

অনিষ্ঠতার পরিবেশে বিচার-বিবেচনা করলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি। শ্রীমতী বন্দরনায়ক এবারে একটা মীমাংসার মনোভাব নিয়েই নাকি এসেছেন। তাঁর আগমনের পূর্বে এ নিয়ে কূটনৈতিক পর্যায়ে একদফা আলোচনা হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রের অফিসারগণ অনেকটা ক্ষেত্রও আগেই প্রস্তুত করেছেন। এখন তার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর। সে আলোচনাই এখন চলেছে। আশা করি, এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান একটা হবেই।

• • •

জাতীয় সংহতি দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কৃষি উৎপাদনের ওপর জোর দিতে বলেছেন। জলমগ্ন এলাকা উদ্ধার করে চাষের ব্যবস্থা এবং ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তা' ছাড়া, সরকারী খাদ্যভাণ্ডার খাতে সহজে খাদ্যশস্য আনতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে টাকার পরিবর্তে শস্য দিয়ে রাজস্ব মেটাবার আহ্বানও তিনি জানিয়েছেন।

খুবই সাধু প্রস্তাব সন্দেহ নেই। মুস্কিল হ'ল কোন প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। শস্য দিয়ে রাজস্ব শোধ করতে চাষীদের আপত্তি হবে না। মহাজনকে তারা শস্য দিয়েই

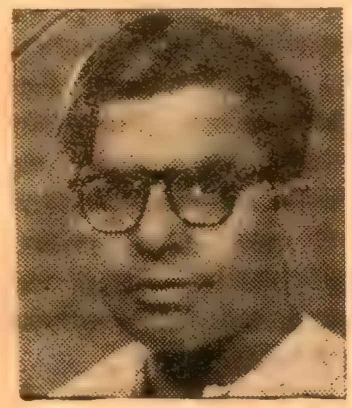

● শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম

সন্তুষ্ট রাখে। চাষীর ঘর থেকে এই শস্য সংগ্রহের জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন। সে সংগঠন না গড়ে তুলে চাষীকে শস্য দেবার আহ্বান জানালে কতটা লাভ হবে আমরা বুঝে উঠতে পারছি নে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণিয়ম এমনি ধারা অনেক কথাই বলেছেন। মুনাফাখোরদের সায়েস্তা করার হুঙ্কারও তিনি কম দেন নি। সে হুঙ্কার আর তাঁর মুখে শোনা যাচ্ছে না। এবারে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। সাধারণ মানুষ সর্বদাই প্রস্তুত। তাদের পরিচালনার প্রশ্নটাও রয়েছে। সেদিকে রাষ্ট্রকর্ণধারগণ একেবারে নীরব। শুধু নীরব নন, সাধারণ মানুষ এগিয়ে এলে তাঁরা নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করতেই অভ্যস্ত বেশি।

তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তায় নয়াদিল্লীর প্রতিরোধ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ছে। আন্দোলনকারীদের পেছনে পেছনে এর মধ্যেই ঘুরতে সুরু করেছে গুণ্ডার দল। মুনাফাশিকারীরা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। প্রতিরোধ আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করতে তারা সকল অস্ত্রই প্রয়োগ করবে। শক্তিনগর, কীর্তিনগর, প্যাটেলনগর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের ওপর মুনাফাবাজদের ভাড়াটে গুণ্ডার হামলা সুরু হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যমন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানের পর গুণ্ডাবাজী চলতে থাকলে, শান্তিপ্রিয় মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনে গুণ্ডারা এসে বিশৃঙখলা সৃষ্টির অবাধ অধিকার পেলে বুঝতে হবে নেতাদের কথায় ও কাজে ফারাক অনেক। তাঁরা যা বলেন, তাতে থাকে না আন্তরিকতা। সাময়িকভাবে সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে যতটুকু বলা দরকার তা' বলে কর্তব্য শেষ করেন।

কফির মূল্য অত্যধিক দাবি করাতেই নয়াদিল্লীতে সুরু হয়েছিল আন্দোলন। সে আন্দোলনে কিছুটা

● শ্রীমেহেরচাদ খান্না

সাফল্য অর্জনের পর দুধ, শাকসব্জী ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটি জনপথে সামিয়ানা খাটিয়ে কফির দোকান চালাতে দিতে নারাজ হয়েছেন এর মধ্যেই। মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা তো ক্ষেপেই উঠেছেন। তাঁরা বলতে সুরু করেছেন, পথের ওপর দোকান খুলতে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের আস্কারা দেওয়া হচ্ছে। কাজেই দোকান বন্ধ করতে হবে।

পথের ওপর দোকান কেউ সমর্থন করতে পারেন না। আমরাও করি নে। কিন্তু অসাধু ব্যবসায়ীদের দমন করতে হলে ন্যায্যমূল্যের দোকানের সংখ্যাবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। দিল্লীর পৌরপিতারা সে দায়িত্ব গ্রহণ করলে আন্দোলনকারীদের রাজধানীর পথের ওপর দোকান সাজিয়ে বসতে হতো না। সে দায়িত্ব দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা পালন করেন নি। অথচ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে-না-উঠতেই কায়েমী স্বার্থের পথ পরিষ্কারের জন্য তাঁরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

পূর্ত ও গৃহ দপ্তরের শ্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার মেহেরবাণীর কথা

সর্বজনবিদিত। তিনি নতুন চাল চেলেছেন। পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, সমবায় গড়ে তুলে সংস্থাকে রেজেস্ট্রি না করলে, তিনি গৃহ-সংস্থান করতে পারবেন না।

দেখা যাচ্ছে, দিল্লীর ললনারা দেশের নেতাদের ওপর আস্থা স্থাপনের বিড়ম্বনাটা আগে বুঝতে পারেন নি। পারলে এ বিপদের ঝুঁকি তাঁরা মাথায় তুলে নিতেন না।

সরকার ইচ্ছে করলে দিল্লীর মেয়েদের উৎসাহিত করে সুশৃঙখলভাবে, আইনানুগ পথেই মুনাফাশিকারী হাঙ্গরদের দিল্লী থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন। সমবায় গড়ে তুলতেও সরকারই এগিয়ে আসতে পারতেন।

নাগাভূমি :

আত্মগোপনকারী নাগা বাহিনীর একটি পল্টন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বিশ্বস্ত মহলের ধারণা, বর্তমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশের কোন পরিবর্তন না ঘটলে অচিরে আত্মগোপন-কারী নাগা সৈন্যরা বেরিয়ে আসবে এবং বিনা দ্বিধায় আত্মসমর্পণ করবে।

আত্মগোপনকারী নাগা বাহিনীর অধিনায়কের কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও সৈন্যদের এই আত্মসমর্পণ অত্যন্ত

১ শ্রীশিলু আও

তাৎপর্যপূর্ণ। নাগারা বিনা কারণে এবং প্রবল উস্কানী না থাকলে সহজে উত্তেজিত হয় না। স্বাভাবিক অবস্থায় তারা খুবই শান্তিপ্রিয়। দীর্ঘকাল অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে নিবিড় জঙ্গলে কাটাবার পর, তারা যেন আজ নতুন জীবনের আলো দেখতে পেয়েছে। তাই আজ তারা শান্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশিলু আও এই সুযোগটা গ্রহণ করছেন পুরোমাত্রায়। তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন সর্বস্তরের নাগাদের সঙ্গে। বিভিন্ন স্থানে বিপুল সংখ্যক নাগা নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্ত মনে এসে যোগ দিচ্ছে। তারা নাগা সরকার এবং ভারত সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কেও এখন যেন আস্থাবান হয়ে উঠছে।

নতুন পরিবেশে সাধারণ নাগারা আত্মগোপনকারী নাগাদের দাবি নিয়ে আর তেমন মাথা ঘামাচ্ছে না। স্বতন্ত্র স্বাধীন নাগা সরকারের কথাও আর তেমন কারো মুখে শোনা যাচ্ছে না।

শান্তির আলোচনা আবার সুরু হতেই নাগারা নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি তুলে ভারত সরকারকে বিব্রত করতে পারে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিষয়টি আলোচনার চুক্তিতে নেই। কাজেই কোন পক্ষ এ প্রশ্ন সেদিক দিয়ে তুলতে পারেন না। ভারত সরকারের প্রতিনিধিদলের [illegible] চুক্তি-সর্তের ওপরই জোর দিলেও নাগা নেতারা সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাঁদের মতে নাগাভূমির জটিল পরিস্থিতির জট ছাড়াতে হলে কোন বিষয় চুক্তির অঙ্গীভূত নয়, তা' ধরে বসে থাকলে চলবে না। এ পরিস্থিতিতে আলোচনার নেতৃত্ব সরকারী কর্মচারীর ওপর আর নির্ভর করা সমীচীন হবে কিনা তাও রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভেবে দেখা উচিত হবে। সরকারী কর্মচারীর পরিবর্তে সরকারী নেতৃস্থানীয় কোন প্রতিনিধি এসে আলোচনায় বসলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলেই অনেকের ধারণা।

আত্মগোপনকারী নাগাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখনও ক্ষমতার দর্প পরিহার করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা সাধারণ নাগাদের কিছুটা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের অনুগামীরা কিন্তু অনেকটা নরম হয়ে এসেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আতিথ্যও গ্রহণ করছে অকুণ্ঠচিত্তে। কাজেই বর্তমান শান্তির পরিবেশ যত দীর্ঘ হবে, ততই এরা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে সাধারণ গ্রামবাসীর সঙ্গে এবং ধীরে ধীরে তাদের মতেরও হবে পরিবর্তন। ভারত সরকারের ওপর তারা অধিক আস্থাশীল হবে। কাজেই বর্তমান পরিবেশ যাতে কোন কারণে পাল্টে না যায়, সেদিকে নাগাভূমির সরকার ও ভারত সরকারের নজর রাখা আবশ্যক হবে।

উত্তর প্রদেশ :

মন্ত্রিসভা আবার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং নতুন

২ শ্রীচরণ সিং

দাবি তুলেছেন। তাঁর দপ্তরের পুনর্গঠনের দাবি এর মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর কাছে জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি জানিয়েছেন, দপ্তরে পুনর্বিন্যাস না হলে পদত্যাগ করতে তিনি বাধ্য হবেন।

উত্তর প্রদেশের কৃষি স্তরের শাখা-প্রশাখার অভাব নেই। এবং এগুলো বিভিন্ন দপ্তরের ন্যাস্ত হয়ে আছে। শ্রীচরণ সিং চান, এই বিভিন্ন

● শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী

অংশগুলোর সমন্বয় সাধন করতে। তাঁর মতে, সমন্বয় না হলে কৃষি মন্ত্রণালয় কথাটাই অর্থহীন।

শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠীর পদত্যাগের পর আরেক ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীত্রিপাঠীর শূন্যস্থানে অধুনালুপ্ত প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীগেন্দা সিংকে নিয়োগের পক্ষপাতী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। শ্রীসিং কংগ্রেসে যোগদানের পর মন্ত্রিত্বের আশাও রাখেন। তা' ছাড়া, তিনি শ্রী সি বি গুপ্তের একজন পরম সুহৃদ।

প্রদেশ কংগ্রেস বেঁকে বসেছেন। তাঁরা এ নিয়ে দিল্লীর দরবার পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়েছেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড নাকি শ্রীমতী কৃপালনীকে একটু সমঝে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের এক মুখপাত্র শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দলীয় দ্বন্দ্ব জীইয়ে রেখে নিজেদের ক্ষমতা-রক্ষার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর মতে শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর থেকেই রাজনীতির জট পাকাতে সুরু করেছে কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে। শ্রী সি বি গুপ্ত কংগ্রেসকে তাঁর মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। এখন তাঁর অনুগামীরা পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন।

শ্রীমতী কৃপালনী বিবদমান দুটি দলের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টায় আছেন। তিনি কতকটা নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। গোণ্ডার নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীগুপ্তকে সমর্থন করায়, তাঁর নিরপেক্ষতা সম্পর্কে একটা দল বিরূপ মন্তব্য করতেও ছাড়েন নি। তাঁদের মতে, শ্রীমতী কৃপালনী নিরপেক্ষতার 'মুখোশ পরে' সমর্থন করে চলেছেন শ্রী সি বি গুপ্তকে।

দুটি দলের কোঁদলের মাঝখানে পড়ে শ্রীমতী কৃপালনী খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। তিনি নাকি এখন সসম্মানে বিদায় নেবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন। পারস্পরিক কাদা ছিটানো আর বরদাস্ত করে উঠতে তিনি পারছেন না।

পণ্ডিচেরী ঃ

দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীএডওয়ার্ড গুবার্ট একেবারে বে-সামাল হয়ে পড়েছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজকে সমুচিত শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নিজে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁর পার্শ্বচরগণ কংগ্রেস টিকেট না-পাওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুচরেরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে কসুর করেন নি। এঁদের নানাভাবে শ্রীগুবার্ট সমর্থন করেছেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত অনুচর নির্বাচনে জয়লাভও করেছেন।

● শ্রীএডওয়ার্ড গুবার্ট

● শ্রীকামরাজ নাদার

কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ২৩টি কেন্দ্রে। এই ২৩ জনের মধ্যেও নাকি ৪ জন গুবার্টপন্থী। তিনি নিজে এসেছেন কংগ্রেসের টিকেটে। আইন-সভার মোট সদস্যসংখ্যা তিরিশ। গুবার্ট আটটি আসনের মালিকানা পেয়ে কংগ্রেসকে আরেক দফা শিক্ষা দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

শ্রীগুবার্টের গোঁসার কারণ অনেক। তাঁকে ঘায়েল করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রীভেঙ্কটসুব্বা রেড্ডিয়ারের পথ সুগম করার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন বেছে বেছে করা হয়েছে—বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁর বিশ্বাসভাজন কংগ্রেসসেবীদের। নির্বাচন-পর্ব সমাপ্তির পর দলীয় নেতা নির্বাচনের কালে তাঁকে আহ্বান করা হয় নি। এ সব অভিযোগ এখন তুললেও নেতা নির্বাচনকালে গুবার্ট কোন আপত্তিই উত্থাপন করেন নি। সর্বসম্মতিক্রমেই শ্রীরেড্ডিয়ার নেতা নির্বাচিত হয়েছেন।

নেতা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই গুবার্ট রাজ্য রাজনীতিতে কংগ্রেস সভাপতির হস্তক্ষেপের কঠোর সমালোচনায় নেমে পড়েছেন। তিনি কংগ্রেস সভাপতির কাজে একনায়কত্বের ভূমিকা আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

কংগ্রেসের নামে যিনি এতদিন

ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে প্রভুত্ব করে এসেছেন, তাঁর এ আচরণের পর সর্বভারতীয় নেতৃত্বের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করার জন্য শ্রীগুবার্টের কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। নির্বাচনের সময় তাঁর কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রী আর ভেঙ্কট-রমণ এবং শ্রী জি রাজাগোপালন যে রিপোর্টটি হাই কমাণ্ডের কাছে পেশ করেছিলেন, তার ভিত্তিতেই অবশ্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়েছে। যিনি কোনদিন নিজের কাজের জবাবদিহি করেন নি, যাঁর দাপটে সারা রাজ্যে সর্বদা থরহরি কম্প উঠতো, তাঁর পক্ষে নতি স্বীকার করে কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দাখিল করার চিন্তাও যেন অসম্ভব। কৈফিয়ৎ দেওয়া তো দূরের কথা, শ্রীগুবার্ট তেলে বেগুনে জলে উঠেছেন। তিনি সরাসরি সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন শ্রীকাম-রাজের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা শ্রীগুবার্টের মতই বেসামাল হয়ে পড়ায় জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন এবং কংগ্রেসের সমালোচনায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের নিয়ে জোট পাকাবার চেষ্টা এখন চলছে। শ্রীগুবার্ট নাকি পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও কেরলের বিদ্রোহী কংগ্রেসকর্মীদের কাছে তাঁর প্রস্তাব পাঠিয়ে চিঠিও লিখেছেন।

পাঞ্জাব :

কংগ্রেস সংগঠন ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ক্ষমতার খেলাটা এমন করে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠবে, কেউ ভাবতেও পারে নি। কায়রোঁপন্থীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তাঁরা এখন নতুন কৌশল অবলম্বন করছেন।

শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির নির্বাচন পর্যন্ত কংগ্রেসকে ঠেলে সাজাবার কাজে বাধা সৃষ্টি করার পন্থা তাঁরা অবলম্বন করছেন। গুরুদ্বারের নির্বাচন হবে জানুয়ারীতে এবং এই নির্বাচনের ওপর তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন সব চাইতে বেশি। কায়রোঁপন্থীরা এ ব্যাপারে

● শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রো

শরণাপন্ন হয়েছেন হাই কমাণ্ডের মোরারজী ভাইয়ের অনুগামীদের। নিজের দলকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য শ্রীপ্রতাপ সিং কায়রোঁ নয়া পরি-কল্পনাও নিয়েছেন। তাঁর পরি-কল্পনা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েও দিয়েছেন অনুগামীদের। কয়েকজন এরপর নীরব থাকতে না পেরে প্রকাশ্যেই বলতে সুরু করেছেন, কায়রোঁকে বহিষ্কার করা হলে অথবা আইনসভা থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলে, তাঁরা একযোগে কংগ্রেস ত্যাগ করবেন।

কায়রোঁপন্থীরা হাত মিলিয়েছেন আকালীদের সাথে। মাস্টার তারা সিং গুরুদ্বার দখল করতে পারলে পাঞ্জাবের রাজনীতি পাল্টে যেতে বাধ্য। সেই আশায় কায়রোঁ নিজে আকালীদের সঙ্গে আঁতাতের আলো-চনা চালিয়ে যাচ্ছেন। আকালীরা ক্ষমতায় এলেই কায়রোঁপন্থীরা খাদ্য-

● মাস্টার তারা সিং

সমস্যা, গ্রামাঞ্চলের উন্নতির প্রশ্ন এবং সরকারের নীতির সমালোচনায় নেমে পড়বেন।

প্রদেশ কংগ্রেস এখনও কায়রোঁ-পন্থীদের কবলিত। প্রদেশ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সম্প্রতি গৃহীত একটি প্রস্তাবে বন্যাপীড়িত অঞ্চলে সরকারের সাহায্য-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনাও করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ :

তেণ্ডুপাতার ব্যবসা ও পরিবহন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করার কাজ নানা কারণে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রাইভেট বাসের ব্যবসা বরং দিনের পর দিন জমজমাট হয়ে উঠছে।

তের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার পরিবহন পরিকল্পনার কর্মসূচী অনুযায়ী বাস রাস্তায় নেমেছে গেল মার্চে। আট মাসের মধ্যে খুব কম বাসই সরকার চালু করতে পেরেছেন। প্রথম পর্যায়ে ২৭টি বাসরুট জাতীয়-করণের কথা ছিল। ব্যক্তিগত মালি-কানা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। তারা হাইকোর্টে মামলা রুজু করে দিব্যি নিজেদের বাস চালিয়ে যাচ্ছে। এ মামলার নিষ্পত্তি না হলে সরকারী বাস চলতে পারে না।

আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষও দরাজহাতে বাসের পারমিট বিতরণ করে চলেছেন। পারমিট বিতরণ, পুরোন পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগেরও অন্ত নেই। বাসের ভাড়া বাড়িয়ে দিয়ে সরকার ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসাকে মুনাফালাভের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

ব্যক্তিগত মালিকানার প্রভাব ছাড়াও টাকার প্রশ্ন রয়েছে। তের কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকার পরিকল্পনা নিলেও পরিবহন করপোরেশনকে চার কোটি টাকা দেওয়ার ক্ষমতাই সরকারের এখন নেই। কর্পোরেশন নিজে বড় জোর দু' কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারবে। ভারত সরকারের কাছে সাড়ে

সাত কোটি টাকা চেয়ে কোন জবাব আজ পর্যন্ত রাজ্য সরকার পান নি। রাজ্য সরকারের ঋণের বোঝাটাও কম ভারী নয়। এ অবস্থায় সরকারকে টাকা দিতে কোন ব্যাঙ্কও উৎসাহী হবে বলে মনে হচ্ছে না।

এ পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা প্রত্যাহার অথবা ধাপে ধাপে না এগিয়ে একসঙ্গে পুরা পরিবহন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা ভিন্ন সরকারের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। জায়গীরদারী ও জমিদারী বিলোপের সময় যে পদ্ধতিতে ক্ষতি-পূরণ দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, সে পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব তুলেছেন সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীচন্দ্রপ্রতাপ তেওয়ারী। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্র সে প্রস্তাব মেনেও নিয়েছেন এবং একটি বিলের খসড়ায় হাতও দেওয়া হয়েছে।

বিল প্রণয়নে বিলম্ব দেখে সমালোচকের দল সরব হয়ে উঠেছেন। আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে দলীয় স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী বিলটিকে ঠেকিয়ে রাখার কৌশল অবলম্বন করেছেন বলে তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন।

* * *

তেণ্ডুপাতার উৎপাদকদের অসাধু ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে গেল মাসে একটি বিলও পাশ হয়েছে। বিলটি নিশ্ছিদ্র নয়। সেই ছিদ্রপথে কায়েমী স্বার্থ আরও কায়েম হয়ে ওঠার সুযোগই পাবে।

উৎপাদকদের কাছ থেকে পাতার এজেন্ট কিভাবে নিয়োগ হবে, এজেন্টরাই বা পাতা কার কাছে বিক্রি করবে তার কোন নির্দেশই বিলে নেই। এ ব্যবসায় প্রয়োজন প্রায় বিশ কোটি টাকার। ব্যবস্থা হয়েছে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। টাকার প্রশ্ন ছাড়াও উৎপাদকদের পক্ষে ডিপোতে এনে পাতা পৌঁছে দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তারা এতদিন ঘরে বসেই পাইকারের কাছে বিক্রি করতে পারতো। ব্যাপারীদের কাছ থেকে তারা এতদিন দাদন পেয়ে এসেছো সরকারী এজেণ্ট নিশ্চয়ই অগ্রিম টাকা দিতে পারবে না।

এই ব্যাপারীদের কবল থেকে পাতা-উৎপাদকদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা বিলে নেই। বিড়ি তৈরি এবং বাইরে রপ্তানী ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে তেণ্ডুপাতা বিক্রি বিলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিড়ির ব্যারনদের বরং আরও সুবিধে হবে—তারা একচেটিয়া মালিকানা পেয়ে বসবে। এক্ষেত্রে বিড়ির ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার প্রশ্ন এসে যায়।

তেণ্ডুপাতার উৎপাদকদের সরকার এভাবে কোন সাহায্যই করতে

● শ্রী ডি পি মিশ্র

পারবেন না। প্রতিযোগিতার পথে এজেণ্ট নিয়োগ অথবা সবটা পাতা সরাসরি কিনে নেবার ব্যবস্থা না করতে পারলে ব্যবসায়ীদের খপ্পর থেকে তাদের মুক্ত করা যাবে না।

আসাম :

পাকিস্তানী নাগরিকদের স্বদেশে পাঠাবার কাজ দু'সপ্তাহ স্থগিত আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই নাকি রাজ্য সরকার এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। পাকিস্তানী বিতাড়নের নামে ভারতীয় নাগরিকদের ওপর পুলিশের জবরদস্তির অভিযোগ উপর্যুপরি কেন্দ্রে যাওয়ার পরই কেন্দ্রীয় সরকার তদন্ত-সাপেক্ষে দু'সপ্তাহের জন্য পাকিস্তানী বাছাই করার কাজ স্থগিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সংসদের কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য ইতিমধ্যেই সরেজমিনে ঘুরেও এসেছেন। সংখ্যালঘু নেতাদের বক্তব্যও তাঁরা শুনেছেন। শীগগিরই তাঁদের মতামত কেন্দ্রীয় সরকার পেয়ে যাবেন। তাঁদের কথা শোনার পর ভারত সরকার পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করবেন।

তাজ্জব এদেশ! একটা অছিলা পেলেই চারদিক থেকে সুরু হয় সুযোগ গ্রহণের কামড়াকামড়ি। দেশাত্ম-বোধ তখন শিকেয় ওঠে। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের কিনারার জন্য সকলেই একে-বারে দিশেহারা হয়ে পড়েন। আসামে পাকিস্তানী নাগরিক বেছে বের করা সহজসাধ্য নয় মোটেই। তারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে নিকট-আত্মীয়ের বাড়িতে। আত্মীয়-বিচ্ছেদের বেদনা পরিহার করতে গিয়ে অনেকেই চেষ্টা করছে মিথ্যার আশ্রয়ে আত্মীয়কে আড়াল করতে। সেক্ষেত্রে পুলিশকে একটু কঠোর হতেই হয়। পুলিশ নির্দোষ একথা আমরা বলবো না। সংখ্যালঘু-দলের নেতারা সোচ্চারে যতটা দোষী তাদের করছেন, ততটা অপরাধ তারা করে নি। এই সুযোগে কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যালঘুদের মধ্যে আস্তানা করে নিতে চাইছে। আসামের কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যালঘু নেতাদের পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় নাগরিকদের 'হয়রানি'র জন্য ব্যথিতচিত্তে পার্টি একটি প্রস্তাব পাশ করে বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণের মত সাক্ষ্য-প্রমাণ তাদের কাছে আছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহাকে এই চালে মাৎ করার জন্য কংগ্রেসের একাংশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অভি-যোগ পাকিস্তানীদের বিতাড়নে বিলম্ব করে শত্রুকে ঘরে পুষে রেখে আসামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলছেন শ্রীচালিহা। এঁরা সহজে নীরব হওয়ার পাত্র নন।

তাই বলছিলাম তাজ্জব এদেশ! কোন ক্ষেত্রে জুলুম-জবরদস্তি হয়ে থাকলে ভারতীয় নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু এ নিয়ে দলগত উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়াসী হওয়ার অর্থ পাকিস্তানের সরকারকে পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করা। এতে তাদের মিথ্যার বেসাতি আরও বেশি করে জমে উঠবে।

আন্তর্জাতিক

• ঈশ্বরদিতে বিরাট জনসমাবেশে ফতিমা জিন্নার আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা

পাকিস্তান :

এ যেন পাকিস্তানের নবরূপায়ণ। অগণিত 'মানুষের হৃদয়ের পরতে পরতে লেখা' নাম—মিস ফতিমা জিন্না। গণতন্ত্রের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ পাকিস্তানবাসীর বড় আশা, শ্রদ্ধা, আর ভালবাসার 'মাদার-ই-মিল্লাত'। সম্প্রতি তিনি আয়ুবের বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্বাচনী সফরে পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন। অভূতপূর্ব সম্বর্ধনায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত গণতন্ত্রকামী জনতা। পাকিস্তান ইস্যুর ওপর নির্বাচন অনুষ্ঠানেও এমন প্রাণবন্ত সাড়া জাগে নি। মিস জিন্নার এ সফরে দেশের সর্বত্র পথে পথে মাঠে ঘাটে যে কাহিনী রচিত হচ্ছে তা বস্তুতই পাকিস্তানের গণচেতনার ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়।

গত ১৫ই অক্টোবর মিস ফতিমা জিন্না ঢাকা সফরে এসেছিলেন। তাঁকে স্বাগত জানাতে উদ্বেলিত জনগণ পুলিশের বেষ্টনী ভেঙে বিমান বন্দরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। অপরাহ্নে তাঁর ভাষণ শুনতে বেশ কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ হয়েছিল ঢাকার পল্টন ময়দানে। জনসভায় আন্তরিক সম্বর্ধনা এবং আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমানের স্বাগতবাণীর প্রত্যুত্তরে মিস জিন্না বলেন, এই নির্বাচন দুজন ব্যক্তির মধ্যে নয়—দুটো পৃথক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে। একদিকে স্বৈরতন্ত্র অন্যদিকে স্বাধীনতা আর মর্যাদা। এ দুয়ের মধ্যেই আপনাদের বেছে নিতে হবে একটি।

গগনভেদী উল্লাসে সেদিন প্রতিটি লোক ধ্বনি তুলেছিল—'আমরা গণতন্ত্র চাই।'

মাত্র আশী হাজার ভোটদাতার তুলনায় এই জনসমর্থনের কোনও সীমা নেই। কিন্তু বেসিক গণতন্ত্রের নামে আয়ুবশাহ যে প্রহসন রচনা করেছেন তার প্রতিদানে এই জনসমর্থন শুধুমাত্র এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, দেশনায়ক হিসেবে আয়ুব-শাসনযন্ত্রের সমাধি রচিত হয়েছে বহু পূর্বেই। আয়ুবের স্বেচ্ছাচারী দণ্ডকে প্রতিহত করতে আরও চরম দণ্ড আছে।

মিস জিন্না বলেছেন—'সে দণ্ড পাকিস্তানের জনসাধারণ।' এই একই আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি উঠেছে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি অঞ্চলে। বিপুল জনস্রোত মাদার-ই-মিল্লাত-এর অনুগামী হয়েছে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে পদে পদে তাঁর স্পেশ্যাল ট্রেন 'গ্রীন অ্যারো'কে থামতে হয়েছে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত দাবিতে। লাইনের দুপাশে যতদূর চোখ যায়, গাড়ির ছাদে, পাদানিতে সর্বত্র লোক—লোকে

লোকারণ্য। তারই মধ্যে মন্থরগতিতে এগিয়ে গেছে 'গ্রীন অ্যারো'। হাতে হাতে পোস্টার নিয়ে অপেক্ষায় থেকেছে সকলে—'গাড়ি তুমি থাম, আমাদের মাকে একবার দেখি।'

পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিশেষ করে আইনজ্ঞ, শিক্ষক ও ছাত্র-মহল তাঁর সম্পর্কে খুবই আশা পোষণ করেন। তাঁদের এই আশার পেছনে অন্যতম প্রধান সমর্থক হলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খাঁ। এককালে তিনিই ছিলেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের দক্ষিণহস্ত। কিন্তু পরিশেষে তাঁর সঙ্গে মৌলিক নীতির দিক থেকে মতবৈষম্য হওয়ায় আজম খাঁ বিরোধী সদস্যদের সঙ্গেই পদে ইস্তফা দিয়েছেন এবং সক্রিয়ভাবে আয়ুবের গণতন্ত্র-বিরোধী শাসন সংস্থার বিরুদ্ধে বিরোধী দলের ব্যাপক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। মাদার-ই-মিল্লাতের পক্ষে জনগণের যে স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল আজম খাঁর সহযোগিতায় তা আরও দৃঢ় হয়েছে।

মিস জিন্না ক্রমে ক্রমে সফর করেছেন খুলনা, যশোর, পাবনা, রাজসাহী, ময়মনসিংহে। পাবনার ঈশ্বরদীতে ৮০ হাজার জনতার এক সভায় মিস জিন্না দৃঢ়কণ্ঠে তীক্ষ্ণ ভাষায় প্রদেশে শ্রমিক গোলযোগ ও শ্রমিক হত্যার তদন্ত দাবি করেন। মিস জিন্না যেখানেই গিয়েছেন সেখানে একটি কথাই বার বার উচ্চারিত হতে শুনেছেন—'আমরা গণতন্ত্র চাই।'

মাদার-ই-মিল্লাতের সঙ্গে আজম খাঁ, মৌলানা ভাসানী, মৌলানা তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবর রহমান, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব আবদুল রফি বালুচ এম-পি প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেছেন। নির্বাচনী সফরের শেষপর্বে ময়মনসিংহেও অনুরূপ হৃদ্যতা ও উল্লাসের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানানো হয় ফতিমা জিন্নাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই ময়মনসিংহ জেলা থেকেই ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খানকে দু' আনার টিকিটে কনভেনশন লীগের সদস্য করা হয়েছিল এবং এই ময়মনসিংহই প্রদেশ প্রধান জনাব আবদুল মোনেম খানের জন্মভূমি। আজ সেখানকার জনগণ করভারে জর্জরিত। আয়ুব শাসনের যুগে তারা জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতারিত। মাদার-ই-মিল্লাত এই শহর সফরে এসে যেন নতুন করে এখানকার জনগণের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে গেছেন। ময়মনসিংহ থেকে মাদার-ই-মিল্লাত মিস জিন্নার জয়দেবপুরে যাত্রার পথে তাঁর স্পেশ্যাল ট্রেনটির নাম ছিল 'মুক্তিযান'।

এরপর ২২শে অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম পর্যায়ে নির্বাচনী সফর শেষ করে মোহতারেমা ফতিমা জিন্না করাচীতে ফিরে গেছেন। সেখানেও অপেক্ষমাণ এক বিশাল জনতা তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিল। ফতিমা জিন্নার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে গুঞ্জন উঠেছে তা বস্তুতপক্ষে সারা পাকিস্তানেরই ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের সম্মিলিত শক্তি আজ আয়ুবের জঙ্গীবাদী শাসন ব্যবস্থার ইমারতে ফাটল ধরিয়েছে অব্যর্থভাবে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবও এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন এবং যত দূর সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে তাঁর নিজের অভিসন্ধি চালিয়ে যাচ্ছেন। মিস ফতিমাকে তিনি নির্বাচনী ব্যাপারে বেতার বা অন্যান্য সকল সরকারী মাধ্যম ব্যবহার থেকে বঞ্চিত করেছেন; সবচেয়ে আশ্চর্য হ'ল যে অসংযত ভাষায় পাকিস্তানের জনক কায়েদ-ই-আজমের বহুজন শ্রদ্ধেয়া ভগ্নী ফতিমা জিন্নার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

বৃটেন ঃ

দীর্ঘ ১৩ বছর একটানা শাসন চালাবার পর রক্ষণশীল দলকে গদী ছেড়ে দিতে হল, নির্বাচনে হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক দল জয়লাভ করেছে। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল যা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, ইংরেজ ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি—কারণ লেবার দল মাত্র ৪টি আসনের ব্যবধানে জিতেছে। অর্থাৎ যে অনিশ্চয়তা গোড়া থেকে ছিল তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল, সঠিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কেউই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে নি।

লেবার দল নির্বাচনে জয়লাভ করলেও কনজারভেটিভ (টোরী) দল এ সান্ত্বনা পেতে পারে যে, সাধারণ অর্থে যাকে পরাজয় বলে তা তাকে বরণ করতে হয় নি। কারণ মাত্র কয়েকটি আসনের ব্যবধানের দ্বারা একথা নিশ্চয় বোঝায় না ভোটাররা তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। বরং তাদের ওপর ভোটারদের আস্থা অসীম এজন্যে যে, শ্রমিক দলের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে সরকারের পতন ঘটাতে তারা রক্ষণশীল দলকে সহায়তা করেছে। এটাও [illegible]

• হ্যারল্ড উইলসন

অনুমান করা যায় যে, যদি একদিন আগে চীন অ্যাটম বোমা পরীক্ষা করতো বা আরো দুদিন আগে ক্রুশ্চেভের পতন ঘটতো, তা হলে রক্ষণশীল সরকারই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতো। কারণ সঙ্কটের সময় ভোটাররা দেশে কোনো সরকারের পরিবর্তনের ঝুঁকি নিতে চায় না।

তিনটি দল শেষ পর্যন্ত ৬৩০টি আসন এভাবে ভাগ করে নিয়েছে: শ্রমিক দল ৩১৭, রক্ষণশীল দল ৩০৪, উদারনৈতিক দল ৯। ভোটের শতকরা হিসেবে শ্রমিক দল পেয়েছে ৪৪·২% রক্ষণশীল ৪৩·৪% উদারনৈতিক ১১·২% কমিউনিস্ট ·২% এবং অন্যান্য ১·০%। এই ৪টি আসনের সামান্য

• জেমস কালাগান

• জর্জ ব্রাউন

সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্যেই আজ প্রশ্ন উঠেছে শ্রমিক সরকারের আয়ু কতদিন? কারণ, ১৯৫০ সালেও ক্লেমেণ্ট এ্যাটলীর শ্রমিক সরকার মাত্র ৬টি আসনের সংখ্যাধিক্য লাভ করলে দুর্ধর্ষ বিরোধী নেতা চার্চিলের পাল্লায় পড়ে পরের বছরেই তাঁকে আবার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয় এবং বলা বাহুল্য, সে নির্বাচনে শ্রমিক দল হেরে গিয়েছিল রক্ষণশীল দলের কাছে। এবারেও স্যার হিউম যে তার জন্যে সব সময়ই সচেষ্ট থাকবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ যদিও লিবারেল (উদারনৈতিক) দলনেতা জো গ্রিমণ্ড যতদূর সম্ভব শ্রমিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবুও শ্রমিক সরকারকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে, রক্ষণশীল দলের গতিবিধি সম্পর্কে। অর্থাৎ রক্ষণশীল দলও যে চেষ্টা করবে না শ্রমিক সরকারকে গদীচ্যুত করার জন্যে এবং উদারনৈতিক দলের সাহায্য নেবে না এমন কোনো গ্যারাণ্টি নেই। শ্রমিক দলকে তাই রোগ-শোক ভুলতে হবে, দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার প্রয়োজন ত্যাগ করতে হবে, হয়তো নাওয়া-খাওয়াও ছাড়তে হবে!

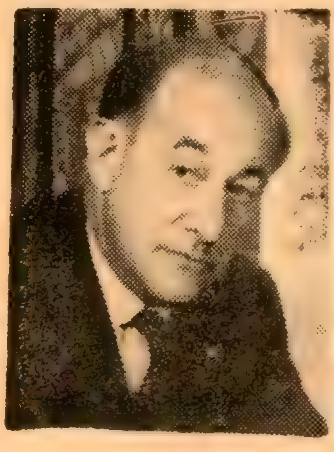

• প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার

পার্লামেণ্টে মাত্র ৫ জন শ্রমিক সদস্য যদি কোনক্রমে গরহাজির থাকেন তা হলেই কম্ম সারা! উপনির্বাচনগুলিতেও শ্রমিক দলকে জিততে হবে সংখ্যাধিক্য বাড়াবার জন্যে, সরকারের নিরাপত্তার জন্যে।

মিঃ হ্যারল্ড উইলসন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। রক্ষণশীল দলের মতোই তাঁর ক্যাবিনেটেও ২৩ জন সদস্য থাকবেন এবং এ ছাড়া প্রায় ১০৫ জন সেক্রেটারী, আণ্ডার সেক্রেটারী ইত্যাদি থাকবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উইলসন ক্যাবিনেটের সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রধানমন্ত্রীর পদে হ্যারল্ড উইলসন

• ডেনিস হিলে

(৪৮), ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ও অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী জর্জ ব্রাউন (৫০), চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার জেমস কালাগান (৫২), পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাট্রিক গর্ডন ওয়াকার (৫৭), প্রতিরক্ষা দপ্তরে ডেনিস হিলে (৪৭) এবং লর্ড চ্যান্সেলর পদে লর্ড গার্ডিনার (৬৪)। প্যাট্রিক ওয়াকার নির্বাচনে হেরে গিয়েছিলেন, উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করে তাঁকে জেতাতে হবে।

ক্ষমতা দখল করে শ্রমিক দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো ইস্পাত শিল্প আরো রাষ্ট্রীয়করণ

করবে, জমির ব্যাপারে ফাটকাবাজী রোধ করার চেষ্টা করবে, বার্ধক্য ভাতা ও পেন্সন বাড়াবে, রপ্তানী বাড়াতে চেষ্টা করবে এবং বৃটেনের যে প্রতিকূল লেনদেন ব্যবস্থা রয়েছে, তার পরিমাণও কমাবার চেষ্টা করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু জনগণের ওপর আরো ট্যাক্স চাপিয়ে এবং আমদানীর ওপর বিধিনিষেধ প্রয়োগ করে শ্রমিক সরকারকে খানিকটা ঝুঁকিও নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব কামনা করলেও কয়েকটি বিষয়ে বিরোধও দেখা দিতে পারে। শ্রমিক দল মিশ্র পারমাণবিক বাহিনী গঠনের বিরোধী, যা গঠনের জন্য আমেরিকা উদ্যোগী হয়েছে। বৃটেনের স্বতন্ত্র পারমাণবিক বাহিনী থাকুক এটাও শ্রমিক দল চায় না, চায় ন্যাটোর সম্মিলিত শক্তি। এ সব ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধ বাধতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব খোয়াতে শ্রমিক সরকার কিছুতেই রাজী হবে না বলে মনে হয়। চীনের সঙ্গে শ্রমিক সরকার বন্ধুত্ব সম্পর্ক বাড়িয়ে তুলবে, (যার প্রমাণ মিঃ জে'র পিকিং শিল্পমেলায় উপস্থিতির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে) এবং এ কারণেই রাষ্ট্রসংঘে চীনের আসনের জন্য শ্রমিক সরকার দাবি তুলবে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও শ্রমিক সরকার সৌহার্দ্য রেখে চলবে। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে বৃটেন বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করবে বলেই মনে হয়। ফলে ভারতবর্ষকেও শ্রমিক সরকার ঘনিষ্ঠতার সূত্রে আবদ্ধ করবে বলে আশা করা যায়।

সোভিয়েট ইউনিয়ন :

রাষ্ট্রনায়কদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা ভয়ানক শক্ত, সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের সম্বন্ধে তো প্রায় অসম্ভব বলতে গেলে। কে ভাবতে পেরেছিল যে, নিকিতা সার্গেভিচ ক্রুশ্চেভ যিনি ১৯৫৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে ক্ষমতার শীর্ষেই ওঠেন নি—স্বীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার মত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন—হঠাৎ তিনি প্রায় বিনা নোটিশে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবেন? অথচ প্রকৃত ঘটনা ঠিক তাই হয়েছে। গত ১৬ই অক্টোবর সারা পৃথিবীকে অবাক বিস্ময়ে জানতে হয়েছে মিঃ ক্রুশ্চেভ 'বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যের কারণে' সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারী ও প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় যথাক্রমে লিওনিড ইলিচ ব্রেজনেভ এবং আলেক্সি নিকোলায়েভিচ পার্টি সেক্রেটারী ও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

● সকন্যা কসিগিন

এ-আকস্মিকতার জন্যে স্বয়ং ক্রুশ্চেভও তৈরি ছিলেন না—যদিও তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি পেয়েছিলেন। ক্ষমতা হরণ করেই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ক্ষান্ত রইল না, সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যালিনোত্তর রুশ রীতি অনুযায়ী সমস্ত প্রকাশ্য জায়গা থেকে ক্রুশ্চেভের ছবি নামিয়ে ফেলা হল। ক্রুশ্চেভের লেখা সব বই ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করে বাজার থেকে সরিয়ে ফেলা হল এবং ইতিহাস থেকে ক্রুশ্চেভের নাম চিরতরে মুছে ফেলার ব্যবস্থা হল। (ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, ক্রুশ্চেভ নিজে স্ট্যালিন সম্পর্কে এ নীতি অবলম্বন করেছিলেন)। ক্রুশ্চেভের ভবিষ্যৎ কী কেউ বলতে পারেন না, তবে স্ট্যালিন যুগে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোতল করা হত এক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই হবে না, স্বয়ং ক্রুশ্চেভ যে রীতি প্রবর্তন করেছিলেন পর্দার অন্তরালে ঠেলে দেবার—তিনি নিজেও তারই শিকার হবেন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটীর পক্ষ থেকে প্রথমে "বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যের কারণে" পদত্যাগের অজুহাত দেখানো হলেও তা যে সত্যি নয়, তার প্রমাণ পেতে দেরি হয় নি। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল, শুধু ক্রুশ্চেভই নয় তাঁর সঙ্গে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়ার' সম্পাদক ক্রুশ্চেভ-জামাতা আদজুবেই, প্রাভদার সম্পাদক, সরকারী প্রচার দপ্তরের সেক্রেটারী সহ আরো ৬ জনকে পদচ্যুত করা হয়। ক্রুশ্চেভের বার্ধক্য ও স্বাস্থ্যহানির কারণে নিশ্চয়ই এ ভদ্রলোকদের চাকরি যেত না। সমস্ত ব্যাপারটি সুপরিকল্পিত সে-বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'য় বলা হয়েছে যে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টি কোনো ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে না। তা সে ভুল যত উচ্চক্ষমতাসীন ব্যক্তিই করে থাকুন না কেন। ক্রুশ্চেভের নামোল্লেখ না করে বলা হয়েছে যে, 'বাগাড়ম্বর, বুলি কপচানো, শশকসুলভ ভ্রান্ত পরিকল্পনা, সর্দারীপনা, বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে স্বীকারে অনিচ্ছা' ইত্যাদি পার্টি বিরোধী। তার সহজ অর্থ যে, ক্রুশ্চেভের এ দোষগুলি ছিল বলেই পার্টি মনে করে, সে কথা বলা বাহুল্য।

ক্রুশ্চেভের আকস্মিক পতনের ফলে ভারতসহ সারা বিশ্বে দারুণ

প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন পক্ষ থেকে অবশ্য ক্রুশ্চেভের পদ-চ্যুতির বিভিন্ন কারণও দাখিল করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভের কৃষিনীতি যে একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তারই জন্যে তিনি শাস্তিভোগ করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এ নীতি অবলম্বনের ফলেই রাশিয়ায় গম উৎপাদন নিম্নস্তরের হয়েছে, এখানকার শহরে শহরে রুটির জন্যে দীর্ঘ 'কিউ' দিতে হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গমের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাশিয়া বিভিন্ন প্রশ্নে হতমান হয়েছে। কিউবা থেকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নিয়ে এসে ক্রুশ্চেভ মার্কিন কূটনীতির কাছে পরাজয় বরণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

কিন্তু সবাইকে টেক্কা দিয়েছে ক্রুশ্চেভের চীন-বিরোধী মনোভাব। ক্রুশ্চেভের মারাত্মক ও বাস্তববুদ্ধিহীন মনোভাবই চীনকে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন। রুশ-চীন বিরোধের মূলেই ক্রুশ্চেভের ভ্রান্ত থিয়োরি এবং আজ সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যে ফাটল দেখা দিয়েছে, যার ফলে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টি-গুলোর মধ্যে রুশ প্রভাব ভয়ানকভাবে হ্রাস পেয়েছে তার মূলে রয়েছে ক্রুশ্চেভের চীন-বিরোধিতা। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর মস্কোতে বিশ্ব-কমিউনিস্ট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে সে ফাটল স্থায়ী হতো—এ আশংকাতেই তারই আগে ক্রুশ্চেভকে ক্ষমতার আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অনুমান করার আরো কারণ রয়েছে এজন্যে যে, 'প্রাভদার' যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাতে চীন ও আলবেনিয়াকে আবার বন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছে।

নতুন নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভকে বরবাদ করে দিলেও তাঁর অনুসৃত নীতিকে বাতিল করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এখানে এখন ক্রুশ্চেভ-হীন ক্রুশ্চেভ-নীতির প্রয়োগ চলবে। বাস্তবিক একথা কখনোই অস্বীকার করা যাবে না যে, স্ট্যালিনোত্তর যুগে ক্রুশ্চেভ একটা উদারনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে রাশিয়ার দরজা স্বাধীন বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এতদিন যা ছিল লৌহ-যবনিকার আড়ালে ক্রুশ্চেভ তার সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিলেন—ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল তার প্রশমন ঘটে। এ প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভের আরো অবিস্মরণীয় অবদান ছিল যা রুশ ইতিহাস স্বীকার না করলেও বিশ্ব-ইতিহাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। মস্কো পারমাণবিক চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভূমিকা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কিউবা সঙ্কটের অবসানে তাঁর বাস্তবমুখীনতা অনস্বীকার্য।

মিঃ ক্রুশ্চেভের কাছে ভারতও কম ঋণী নয়। কি তার শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, কি বৈষয়িক ক্ষেত্রে সাহায্যদানে ক্রুশ্চেভ কার্পণ্য করেন নি। চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েট রাশিয়াও ভারতকে সামরিক সাহায্য দিয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য, কাশ্মীর প্রসঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে যেভাবে সমর্থন জানিয়েছে তা পৃথিবীর অপর কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব হয় নি। ভারতের প্রতি এ মনোভাব রাশিয়ার নতুন নেতৃত্বের অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে বলা হয়েছে অবশ্য, কিন্তু চীনের সঙ্গে যদি তার নতুন দোস্তী সুরু হয়, তবে তার সামরিক সাহায্যের ওপর কি ভারত নির্ভর করতে পারবে? অবশ্য নতুন নেতা ব্রেজনেভ এবং কসিগিন দুজনেই ভারত ভ্রমণ করে গেছেন, ভারতের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। এ অবস্থায় বন্ধুর বিপদে সে আগের মতো এগিয়ে আসবে এ আশাই আমরা করব।

চীন ঃ

স্নায়ুযুদ্ধের প্রশমনে সারা বিশ্ব যখন শান্তির জন্য ব্যাকুল তখন চীন কর্তৃক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ মানবমনে নতুন করে আশংকার সৃষ্টি করেছে। সংবাদটিতে অবশ্য চমকের বিশেষ অবকাশ ছিল না, কারণ এর সপ্তাহ তিনেক আগে মার্কিন পররাষ্ট্র

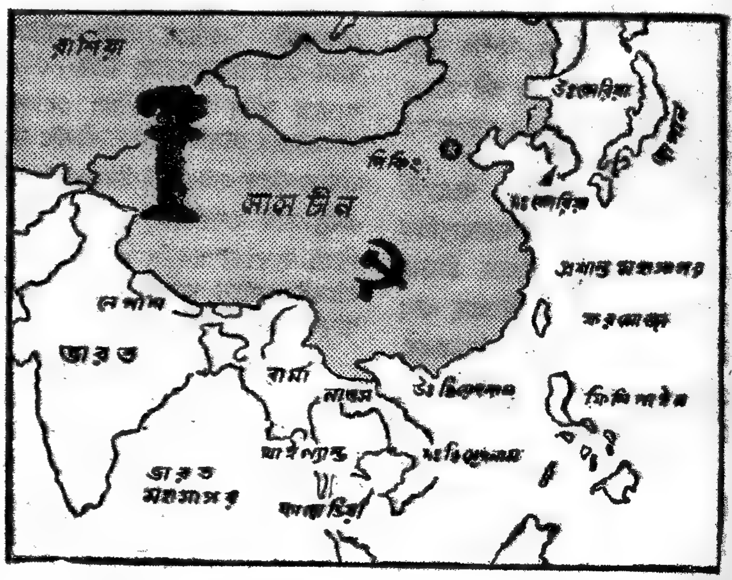

● এই বিশেষ মানচিত্রে (ইউ-পি-আই প্রেরিত) কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার আকারে চীনা আণবিক বিস্ফোরণের সম্ভাব্য স্থান দেখানো হয়েছে।

সচিব ডীন রাস্ক বলেছিলেন যে, চীন যে কোন মুহূর্তে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। সে সংবাদ পেয়েই বিশ্বের সব দায়িত্বশীল সরকারী পক্ষ থেকে চীনকে বিস্ফোরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার আবেদন জানানো হয়েছিল। সদ্য সমাপ্ত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনেও ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী একই উদ্দেশ্যে চীনে একটা শান্তি মিশন পাঠাবার প্রস্তাব করলে তা গৃহীত হয় না (সাপ্তাহিক বসুমতী ২২ অক্টোঃ)। অবশ্য চীন যে বিশ্ব-জনমত মেনে নেবে এমন কোন ভরসা ছিল না, কারণ মস্কো পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা বর্জনের চুক্তিতে সে স্বাক্ষর দেয় নি, বরং তাকে উপহাস করেছে।

পশ্চিম চীনের সিংকিয়াং-এর অন্তর্গত মরু অঞ্চলে পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষা করেই কিন্তু চীন ক্ষান্ত থাকে নি। বিশ্ববাসীকে একটা ভাঁওতা দেবার চেষ্টা করেছে বিশ্বের সমস্ত পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করার জন্য একটা বিশ্ব-সম্মেলন আহ্বান করার প্রস্তাব করে। চীন এ-কথাও বলেছে যে, চীন অন্তত প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না, অর্থাৎ আত্মরক্ষার খাতিরেই সে তার ওই আয়ুধ প্রয়োগ করবে। চীনের এ সব গল্পে কারুরই আর আস্থা নেই।

তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে, পৃথিবীর পঞ্চম পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হিসেবে চীনের প্রেস্টিজ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে এবং এ সম্মানের আরো কারণ এজন্যে যে, ১৯৬০ সালে রুশ সাহায্য ও সহযোগিতা প্রত্যাহারের পর থেকে চীন প্রায় এককভাবে এবং সকল বাধা-বিপত্তির সামনে এ অস্ত্র আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ অস্ত্র আবিষ্কারের ফলে সোভিয়েট রাশিয়া আর তার সঙ্গে বিরোধ করতে উৎসাহী হবে না, অবশ্য মাও-সে-তুঙয়ের চরম শত্রু প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ইতিপূর্বেই পদচ্যুত হবার ফলে রুশ-চীন মিতালি নতুন করে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের বাইরে চীনকে আর কতদিন রাখা যাবে তাও ভাববার বিষয়। কারণ, যে পারমাণবিক বোমা চীন আবিষ্কার করেছে তার শক্তি যদিও সামান্যই এবং আগামী কয়েক দশকের মধ্যেও তার সোভিয়েট রাশিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ হতে পারার কোন সম্ভাবনা নেই—তবু যেটুকু সে অর্জন করেছে তার গুরুত্বও একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

জাম্বিয়া ঃ

আফ্রিকার আর একটি পরাধীন দেশ মুক্তির স্বাদ পেল, বৃটেনের নবম আশ্রিত রাজ্য জাম্বিয়ার আকাশে স্বাধীনতার সূর্যোদয় হল।

জাম্বিয়া নামটি এক হিসেবে নতুন, জাম্বেসি নদীর তীরে অবস্থিত বলে এর নামকরণ করা হয়েছে জাম্বিয়া। স্বাধীনতা পাবার আগে এর নাম ছিল উত্তর রোডেশিয়া। প্রায় একশ' বছর আগে বৃটিশ পর্যটক ডেভিড লিভিংস্টোন প্রথম আপার জাম্বেসি এবং বারোতসে-ল্যাণ্ডে আসেন। সেই থেকে বৃটেনের সঙ্গে জাম্বিয়ার সম্পর্ক। এর পরে সেসিল রোডস-এর বৃটিশ সাউথ আফ্রিকান কোম্পানী এখানে এসে বাণিজ্যের নামে দেশ শাসন করতে থাকে—যেমনটি করেছে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বেলায়। মিশনারীরাও ক্রমশ আসতে থাকে এখানে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে এবং তার জন্য কিছু কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে। ১৯২৪ সালেই এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ শাসন স্থাপিত হয়।

জাম্বিয়া একটা ছোট্ট দেশ। আয়তন যার ২,৯০,৫৮৭ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা ৩৫ লক্ষের মত। এই অধিবাসীদের মধ্যে ৭২ হাজার ইউরোপীয় এবং এশীয় ও মিশ্রজাতি রয়েছে ১১ হাজার। বাকী সকলেই আফ্রিকান। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও তাম্র উৎপাদনে এক সময়ে উত্তর রোডেশিয়ার স্থান ছিল পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয়। বলা বাহুল্য, এই তামার খনির লোভেই ইংরেজরা এতদিন উত্তর রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হয় নি।

কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্যে এবং গোটা আফ্রিকায় যখন নবজাগরণের বন্যা বইছে, তখন স্বভাবতই উত্তর রোডেশিয়াও নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারে নি। অবশ্য উত্তর রোডেশিয়ার অভাবনীয় অর্থনৈতিক সম্পদ এবং দক্ষিণ রোডেশিয়া বা নিয়াসাল্যাণ্ডের আপেক্ষিক দারিদ্র্যের জন্যে নিয়াসাল্যাণ্ড ও উত্তর রোডেশিয়াকে নিয়ে একটা যুক্তরাজ্য গঠন করা হয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের পক্ষ থেকে—যার নাম হয়েছিল মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন। কিন্তু উত্তর রোডেশিয়ার জনবরেণ্য নেতা কেনেথ কৌণ্ডার দল ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি তাকে দীর্ঘদিন [illegible] নিতে

কেনেথ কৌণ্ডা

পারে নি। তাই ১৯৫৩ সালে যে ফেডারেশন গঠিত হয়েছিল দশ বছরের মধ্যেই তার নাভিশ্বাস উঠলো। জনমতের চাপে পড়ে বৃটিশ সরকার উত্তর রোডেশিয়াকে ফেডারেশন ছেড়ে বেরিয়ে যেতে (Secede) সম্মত হল। এর পরেই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে আফ্রিকানদের আন্দোলন আরো জোরদার হল—যার ফলে গত জুন-জুলাই মাসের ভিক্টোরিয়া ফলস-এর সম্মেলনে উত্তর রোডেশিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার কথা স্বীকৃত হয়েছে।

কেনেথ কৌণ্ডার দীর্ঘদিনের সাধনা ও স্বপ্ন আজ সফল হল, স্বাধীন জাম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

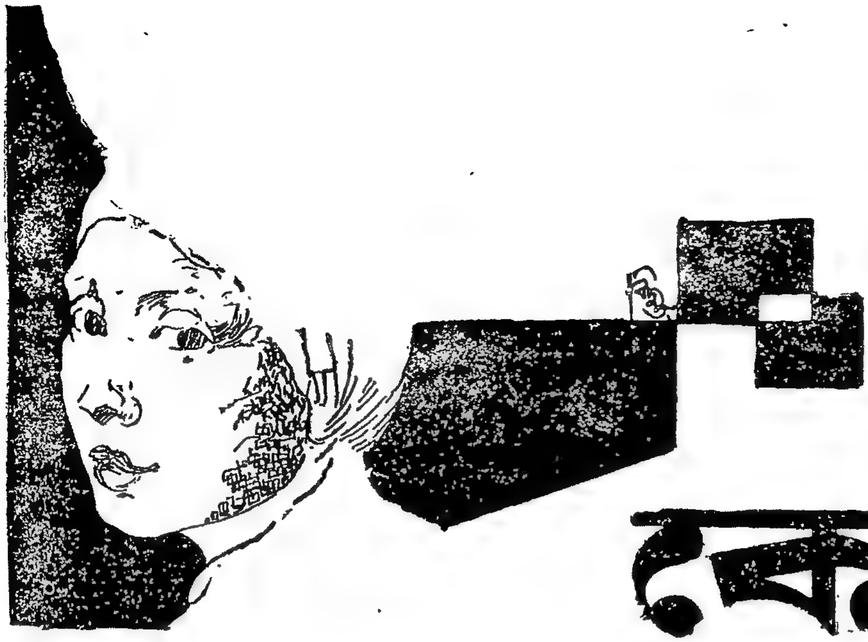

কে?

শ্যাম রায়

লোক জমেছে বিস্তর—বিচারালয়ের ছোট কোঠাটি ভরে গিয়েছে। রীতা চৌধুরী নামক মেয়েটিকে নিয়ে কত কথা শোনা যায় চারদিকে। অনেকগুলো সাক্ষী পুলিশের পক্ষ থেকে যোগাড় হয়েছিল—সবই পরীক্ষা করা হয়ে গিয়েছে। কাঠগড়ায় স্থির অচঞ্চল দৃষ্টিতে যে লোকটি দাঁড়িয়েছে ওকে নিয়েই বিচার। পুলিশ বলছে, 'সতীশচন্দ্র দাসই রীতার মৃত্যুর একমাত্র কারণ।'

এ্যাডভোকেট দত্ত এবারে প্রোসিকিউশানের জন্যে আরগুমেণ্ট করবেন, উঠে দাঁড়ালেন। কোর্ট নিস্তব্ধ হল। ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন :

মাননীয় বিচারপতি, এই কেসটি একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি অত্যন্ত সহজভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করছি। সবগুলো সাক্ষী ও প্রমাণ ভালভাবে বুঝে নিলে রীতা চৌধুরীর মৃত্যুর পেছনে যে রহস্য রয়েছে—তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে রীতা সুবিনয় নামক একটি লোককে ভালবাসত। সেই বুঝি মৃত্যুর কারণ, কিন্তু সুবিনয়ের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ জানে না কে সে? আমরা প্রমাণ করবো সুবিনয় কে?

সুবিনয়ের কথা আলোচনা করবার পর আসবে দ্বিতীয় অঙ্গ। অর্থাৎ রেস্তোরাঁর ম্যানেজার সতীশচন্দ্র এই মৃত্যুর সঙ্গে কিভাবে সংশ্লিষ্ট? যতগুলো সাক্ষী আমরা পেয়েছি তাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র দাসের ছোট চাকরটি হচ্ছে প্রধান। ওর কথাগুলো আপনারা শুনেছেন।

রীতা চৌধুরী কবি ছিল। ওর নিজ হাতের লেখা কবিতাগুলো প্রধান প্রমাণপত্র। সুবিনয় নামক একজন কবির সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা লেখার মধ্য দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সুবিনয়কে পাওয়া যাচ্ছে না। সুবিনয়ের প্রেম-নিবেদনমূলক কবিতাগুলো রীতার নিজের হাতে লেখা।

কলকাতার শহরতলীর এ রেস্তোরাঁটি সুবিনয় নামক ব্যক্তি-চরিত্রের লীলাক্ষেত্র। এখানে কেন এরূপ ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে সাক্ষীদের কথা শুনেছেন। সুবিনয়ের কোন অস্তিত্বই নেই।

সতীশচন্দ্র দাস এ মেয়েটিকে উনিশশো পঞ্চাশ সালে একটি বাড়িতে একটি কোঠায় রেখেছিল ভাড়াটে হিসেবে। ওকে চাকুরি জুটিয়ে দিয়েছিল। এ প্রমাণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট। রীতা চৌধুরী রেস্তোরাঁর সমৃদ্ধির প্রধান কারণ, এও আমরা বুঝেছি। কাজেই রীতা চৌধুরীর মৃত্যু সম্বন্ধে সতীশচন্দ্রের দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। ব্যাপারটি সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

আচ্ছা, সুবিনয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা সেরে নিচ্ছি। সুবিনয় কে, জানা নেই। পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে শুধু কবিতা থেকে। কিন্তু কবিতা থেকে কি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে?

সুবিনয় অত্যন্ত আধুনিক লোক। ওর জীবনের থিওরিগুলো আধুনিক এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছাপ্রসূত। সে 'প্রেমে' বিশ্বাসী নয়। সুবিনয়ের থিওরি হচ্ছে মানুষের মধ্যে এমন কোন আকর্ষণ থাকতে পারে না যাকে নিয়ে মানুষ একেবারে প্রমত্ত পাখির মতো এক-লগ্ন হয়ে জীবন কাটাতে পারে। প্রাণীজগৎ, সৌরমণ্ডল—সর্বত্রই একের সঙ্গে অন্যের লগ্ন থাকার প্রসঙ্গ আসে। এমন কি ইলেকট্রন ও প্রোটনের সম্পর্কটা সেইরূপ।

সুবিনয় বলছে, মানুষ এ ব্যাপার থেকে স্বতন্ত্র, কারণ সে বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধির জন্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সে

জন্যে তার আচরণ আলাদা। স্বাধীনতা মানুষের পরম সম্পদ। অতএব সে মেয়েদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে স্বাধীন।

সুবিনয়ের কাজ হচ্ছে কবিতা ও ব্যক্তিগত তত্ত্বকথার দ্বারা মেয়েদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা। এক-একটি মেয়েকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। চা ও কফির দোকানে নিভৃতে আড্ডা দেওয়া।

সুবিনয়ের আকৃতির বর্ণনাও কবিতায় পাওয়া যাচ্ছে। দীর্ঘ টানা চোখ, টিকোলো নাক ও মুখমণ্ডল দীর্ঘ ছাঁদের। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ভদ্রতায় শিষ্টতায় সে অনুপম। দেখেই মেয়েরা মুগ্ধ হয়।

সুবিনয় বুদ্ধিদীপ্ততার দাহনে মেয়েদের মন দগ্ধ করে দেয়। আহ্বান করবার রীতিটি অতুলনীয়, সে বিনয়ের প্রতিমূর্তি, অর্থাৎ কেউ ওকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

এ্যাডভোকেট দত্ত একটু থেমে বললেন, স্যার, রেস্তোরাঁতে মৃতদেহের সঙ্গে যে কবিতাগুলো পাওয়া গিয়েছে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লে সুবিনয়ের সম্বন্ধে এ সব কথা জানা যায়। কিন্তু সাক্ষীরা সুবিনয়ের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে পারছে না। সুবিনয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে কবিতা পড়ে শোনাব।

আমি যে কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি সেগুলো পাওয়া গেল রীতা চৌধুরীর ব্যাগের মধ্যে। কবিতাগুলো রীতা চৌধুরীর হাতে লেখা। সুবিনয় নামক ব্যক্তির কোন সই নেই। অর্থাৎ রীতা চৌধুরীই তাকে জানতো—পৃথিবীর আর কেউ নয়। এবারে শুনুন সুবিনয়ের উক্তি:

আমার কালো চুলে ঝরেছে
কালো কালো ইলশেগুঁড়ি
তোমার বাগানের ফুলের রঙে রূপে
নেইকো জুড়ি।
টোপর পরি শিরে তোমার দোরে
এসে তোমাকে চাই
সবুজ ঢেউ-ঢাকা তোমার দেহ-তীরে
পৌঁছে যাই
আমার মনে জাগে রূপোলী স্পন্দন,
বুঝেই দেখো
তুমিই প্রাণভরা র‍্যাফেলী নেশা নিয়ে
আমাকে এঁকো।
নিভৃত ভাগীরথী তীরের পটভূমি
ডাইনে রেখে
আঁধারে এসো তুমি একাকী
নিরজনে আমাকে দেখে।
প্রাণীরা যূথে বাঁধা অণু ও
পরমাণু একাকী নয়
প্রোটন ইলেক্‌ট্রন চলেছে যূথ বেঁধে
বিশ্বময়।
মানব মনপ্রাণে ক্ষণিক যৌবনে
একটি দোলে
সুখের সেরা সুখ পেয়েই
হয় ব্যথা সবই ভোলে।
সে সব ক্ষণগুলি গ্রন্থিবাঁধা হয়ে
রয়েছে, জানো
আজকে তুমি তাই রূপের স্রোতে
গলা দেহটি আনো।

কবিতাটিতে বিশেষ কয়েকটি ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। সুবিনয় নামক ব্যক্তিটি নিজের দেহের প্রতি নায়িকাকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে। নানা ভঙ্গিতে দেহের আকর্ষণ জাগিয়ে তুলছে। অবশেষে গঙ্গার ধারে কোন নিভৃত জায়গায় যেতে বলেছে। সেখানে সুখের চরম পরিণতি হবে। এর স্বপক্ষে যুক্তিও রয়েছে কবিতাতে।

এরপর আর একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছি। এই কবিতাতে সুবিনয় নামক ব্যক্তিটি যেন রীতা চৌধুরীকে মুক্ত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এ কবিতাটিও রীতা চৌধুরীর হাতে লেখা এবং সুবিনয়ের কোনও সই এতে নেই। কবিতাটি এই:

এসো এসো শিবিরে এসো
একটিমাত্র খাট একটি টেবিল
একগাছা ফুল, একক আলোতে
এককে নিঃসঙ্গ হয়ে একাকী দেখব।
হৃদয়ের একটি তারে তোমার তন্ত্রী
রবাবের আঙুল ছোঁয়ায় একটি
রাগ বাজে,
মন্দির হয় নি তৈরি, শিবির
সৃজন করেছি
এবার সুনয়নী, শিবিরে এসো।
যে আমাকে চায় আমি তাকে বঞ্চনায়
রেখেছি অনেক দূরে তোমার আশায়
আমার বক্ষের দুপাশে শোণিতের বিক্রম
বীরের দেহ শত্রুর তনুতে বন্দী হবে।
শিবিরজীবনে অগ্নি জলবে
আহুতি তার হতাশার অনন্ত পিপাসা,
তোমার দু'নয়নে মুক্তো ঝরবে
বৃথা বলবে 'না না আর নয়।'

প্রখ্যাত কথাশিল্পী
শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের
রামপদ গ্রন্থাবলী
৩৯২ পৃষ্ঠা—মূল্য ৩ টাকা

বাংলার শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহিত্যিক
রচিত কয়েকখানি
ভাল বই

স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থাবলী
৬ষ্ঠ ভাগ—৷৷০

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর গ্রন্থাবলী
মূল্য—বার আনা

মায়াদেবী বসুর—
আঁখির ভুলে ৬০

সরসীবালা বসুর—
শিবানী ৷৷০

বিজনপ্রভা দেবীর—
দাড়ী মাহাত্ম্য ৷৷০

চারুবালা বসুর—
পাতিব্রত্য ৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

স্পষ্টই দেখছেন সুবিনয় কবিতার মধ্য দিয়ে একটা মুক্ত দৈহিক সুখের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিন্তু সুবিনয় নামক কোন ব্যক্তির ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না; বোধ হয় রীতা চৌধুরী ছাড়া আর কেউ জানতো না।

এবারে আমার বক্তব্য বলছি শুনুন। রীতা চৌধুরী যাকে হাতে লিখে ওর হাতবাক্সে বা নিজ ব্যাগে সযত্নে রক্ষা করেছে, নিশ্চয়ই ওর মনেরই একটি ভাব। অর্থাৎ এরকমের জীবন যে রীতা ভালবাসত একথা প্রমাণ করে বলতে হয় না। স্বকীয় ভাবের প্রকাশ যেখানেই হয় তাকে মানুষ নিজের করে ধরে রাখতে চায়। বলা বাহুল্য যে, রীতা চৌধুরীর মনের আকাঙ্ক্ষার কথা আর প্রমাণ করতে হবে না। মানুষের চিঠি যদি ডকুমেণ্ট বা দলিল হতে পারে, এক্ষেত্রে কবিতা হচ্ছে তার চেয়েও বড় ডকুমেণ্ট বা দলিল---যা রীতার গভীর মনটিকে প্রকাশ করছে।

এবারে সংক্ষেপে আমি কেসটির মূল সিদ্ধান্তগুলোকে তুলে ধরছি :

রীতা চৌধুরী উচ্ছৃঙ্খল জীবন ভালবাসত এবং ওর আকাঙ্ক্ষা ওদিকেই ছিল।

সুবিনয় নামক কোন লোক ছিল না।

রীতা রেস্তোরাঁতে মারা যায়।

ডাক্তার বলছে হার্ট-ফেলিওর।

ম্যানেজার সতীশচন্দ্রের রেস্তোরাঁতে ঘটনা ঘটেছে বলে ওকে ধরা হয়েছিল। এখন জানা যাচ্ছে রীতা ম্যানেজারের সাহায্যেই কলকাতার জীবন যাপন করেছে---স্কুল, কলেজে পড়েছে। রীতার আত্মীয় বলতে কেউ নেই। এই রেস্তোরাঁতে সর্বদা ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে যাতায়াত করতো।

আপনারা শুনেছেন, রাম নামক ছোট ছেলেটির যে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, সে হচ্ছে ম্যানেজার সতীশচন্দ্রের শেল। সতীশচন্দ্র সবদিক 'ম্যানেজ' করেছে, আমার মতে ডাক্তারের রিপোর্ট, পোস্টমর্টেম---সব ব্যবস্থা পাকা করেছে, কিন্তু ছোট ছেলেটি, অর্থাৎ রামের কথাটি ভাবে নি। রামের সাক্ষীতে ওর মরণ ডেকে এনেছে।

সতীশচন্দ্র রেস্তোরাঁর ওই বন্ধ ঘরে বহু সময় নিভৃতে কাটাতো এবং সেখানে রীতা চৌধুরীকেও দেখা যেত---একথা আপনারা এই সাক্ষীর মুখে শুনেছেন। রীতা চৌধুরী ছেলেদের ধরে নিয়ে আসত একথাও শুনেছেন। রীতা চৌধুরী নিজে সাহিত্য করতো, কবিতা লিখতো এও প্রমাণ হয়েছে। ম্যানেজারের দায়িত্বেই যদি এ ঘটনা ঘটে থাকে তবে সুবিনয় কে? এ প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগবে।

'সুবিনয়' রীতা চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি। রীতা চৌধুরীর কবিকল্পনা। যেমন করে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা 'জীবন দেবতা' নামক কাল্পনিক সত্তাকে পাই, সুবিনয় রীতা চৌধুরীর সেইরূপ কল্পনা। রীতা চৌধুরীর যে আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত রয়েছে, কাল্পনিক সুবিনয়ের মধ্য দিয়ে তাই পরিতৃপ্ত হয়েছে। রীতা সতীশচন্দ্রের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পাত্রী। কিন্তু রীতার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির কোন পথ নেই। এজন্যেই কবিকল্পনা।

এতক্ষণে বিচারক একবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি বলতে চেয়েছেন যে সুবিনয় রীতা চৌধুরীর কাল্পনিক ভাব মাত্র?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই। রীতা চৌধুরীর যে আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত ছিল তাই ওর কবিতার মধ্যে একটা পুরুষের রূপ নিয়েছে। সুবিনয়কে রূপবান পুরুষরূপে দেখা যাচ্ছে। রীতা চৌধুরীর সঙ্গে যারা এসে এই রেস্তোরাঁতে চা পান করত, তাদের মধ্যে অনেকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না---আর তাদের এখানে নিয়ে আসবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কবিকল্পনায় তাদের কারো চেহারার সঙ্গে সাদৃশ্য থাক কি না থাক---তাতে আমাদের কিছুই ভাববার নেই। মোট কথা আপনারা যে কোন ভাল কবির কথা স্মরণ করে দেখুন, কবি নামক অদ্ভুত মানুষের মনে এই double personality-র উদ্ভব হয়ে থাকে। দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের এরকম একটি 'জীবন দেবতা' ছিল। রবীন্দ্রনাথ বড় কবি। ওঁর মধ্যে এ ব্যাপার সূক্ষ্ম হয়েছে। রীতা চৌধুরীর মধ্যে সেই রকমের একটা ব্যাপার স্থূল ভাবে হয়েছে।

এবার সাক্ষ্য প্রমাণ, পুলিশের রিপোর্ট ইত্যাদি দ্বারা রীতা চৌধুরী সম্বন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে

তাতে ওর পরিচয় এবং ম্যানেজার সতীশচন্দ্রের দায়িত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।

প্রথমে এই মেয়েটির কথা। ম্যানেজারের কাছে ওর একটা বাক্স পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আছে শাড়ি-কাপড়, কবিতা ও বই। যেখানে সে ছিল সে বাড়িতেও কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না—শুধু বই, কবিতা, শাড়ি-কাপড়, কিছু টাকা-পয়সা ও গহনা। এ সব আপনারা কোর্টেই দেখেছেন। পোস্টমর্টেম একজামিনেশানে আমি হতাশ হয়েছি। ডাক্তার বললেন রীতা চৌধুরী অত্যন্ত দুর্বল মেয়েমানুষ ছিল। মারা গেছে হার্ট-ফেলিওরে। ডাক্তার মনে করেন ওর কোন ড্রাগ খাবার অভ্যাস ছিল। স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল ছিল না, ছিল ওর মধ্যে পুষ্টিতার অভাব, ইল-নারিশমেণ্ট। রীতা একটি সংস্কৃতিবান পরিবারের মেয়ে। পঞ্চাশ সালে অল্প বয়সে কলকাতায় এসে ছিটকে পড়েছিল। এই ম্যানেজারের সহায়তায় পড়াশোনা সুরু করে—পরে কয়েকটি সহৃদয় লোকের সাহায্য পেয়েছিল। একটি কর্পোরেশন স্কুলে কাজ করতো। ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ওকে দেখাশোনা করত। মাস্টারী করতে করতে পড়াশোনা করতো—বি-এ, এম-এ পাশ করে।

রীতা চৌধুরীর এ সব ইতিহাস আপনারা সাক্ষীদের মুখে শুনে বুঝেছেন। এখন এর সঙ্গে মূল ঘটনার যোগাযোগ কি তাই বলছি। বাড়িওয়ালা সতীশচন্দ্রের কথা বলেছেন। সতীশচন্দ্র নিজের চেষ্টায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিল। ব্যস, বাড়িওয়ালা আর কিছু ওরা জানে না। ওরা নিয়মিত বাড়ি ভাড়া পেত। ওদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, না থাকাই সঙ্গত। এই কেসে সাক্ষী দিতে হবে, দুর্ভোগ ভুগতে হবে—কাজেই ওরা কিছুই জানে না।

যাক, সতীশচন্দ্র সম্বন্ধে আপনারা শুনেছেন। মেয়েটিকে একটি বাড়িতে রাখা, ওকে দিয়ে ভালো ভালো ছেলেদের রেস্তোরাঁতে ধরে নিয়ে আসা এবং ওর সঙ্গে অর্থাৎ রীতা চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধ ঘরে সর্বদা থাকা এ সব আলোচনা করলে দুর্ঘটনার মূল বোঝা যায়। সতীশচন্দ্র পাকা ব্যবসায়ী। কাজেই অত্যন্ত সাবধানে কাজ করেছেন। সহজ কথায় বে-আইনী রক্ষিতার পর্যায়ে এসে যাচ্ছে এই রীতা চৌধুরী। অন্যায় যখনই ধরা পড়বে তখনই অন্যায়। সতীশচন্দ্রের এ অন্যায়ের সঙ্গে আর একটি অন্যায় মিশেছে। সে হচ্ছে রীতার রেস্তোরাঁতে মৃত্যু। মৃত্যু যে জন্যেই হোক মৃত্যু ঘটানোর জন্যে সতীশচন্দ্র দায়ী—আমার পূর্ব আলোচনা দ্বারা এ প্রমাণ করেছি।

অবশেষে কাল্পনিক সুবিনয়ের ভাবটির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে রীতা চৌধুরীর আকাঙক্ষা ছিল কোনদিকে? সে আকাঙক্ষার চরিতার্থতাকে সে যেন মনে করত একটি sPort-এর মতই ব্যাপার। ম্যানেজার সতীশচন্দ্র এর সহযোগী। কবিতা থেকেই এ সব প্রমাণ হয়।

স্যার, মনস্তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখতে পাবেন মানুষ অভ্যাসের দ্বারা পরিচালিত হয়। রীতা চৌধুরী ম্যানেজারের সঙ্গে অত্যাসযোগে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রত্যক্ষে কবিতার মধ্যে রীতার রসবোধ ও রুচির অভিনব প্রকাশ। দুটো বিরোধী নয়। এখানে নীতি-দুর্নীতি, ভাল-মন্দের বিচার রীতা করে নি। সে সতীশচন্দ্রের অনুগতা। আর এদিকে সতীশচন্দ্রকে দেখুন। সতীশচন্দ্র স্ত্রীপুত্র-পরিবার একদিকে রেখেও এই সব করেছিল। ছোট চাকর ছেলেটি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছে যে, সতীশচন্দ্র সাংসারিক জীবনে খুব পরিচ্ছন্ন নয়। স্ত্রীর সঙ্গে রীতাকে নিয়ে নিত্য ঝগড়া ও স্বচক্ষে দেখেছে।

রীতা চৌধুরীর ঘরে নানা বিষাক্ত এবং এ্যালকোহল জাতীয় ওষুধ পাওয়া গেছে। সে সব নিয়মিত সে খেত। অবশেষে সতীশচন্দ্রের রেস্তোরাঁতে রীতা চৌধুরীর মৃত্যু হয়। সতীশচন্দ্র যে দায়ী একথা বোঝাতে পেরেছি। আমরা আরও বহুতর সাক্ষী উপস্থিত করতে পারতুম। সতীশচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জেনেছি, আরও জানতে পারতুম। কিন্তু প্রয়োজন নেই। রীতা চৌধুরীর মৃত্যুর জন্যে যে সতীশচন্দ্র দায়ী এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে।

এ্যাডভোকেট দত্ত ওঁর সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করে বসে পড়লেন। জুরীরা কথা বলতে লাগলেন।

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর ধারাবাহিক উপন্যাস 'কৃষ্ণচূড়া' প্রকাশিত হোল না। আগামী সপ্তাহ থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

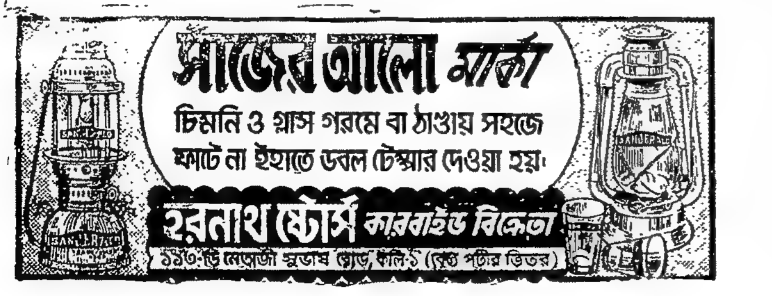

সতীশচন্দ্র কাঠগড়ায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে দাঁড়ালো। এ্যাডভোকেট সিংহের দিকে কাতর দৃষ্টি নিবদ্ধ। পেছনে বহু লোক জড় হয়েছে। মনে হয়, সতীশচন্দ্রের আত্মীয়েরা এসেছে আরগুমেণ্ট শুনতে।

বিচারক এবারে এ্যাডভোকেট সিংহকে সওয়াল-জবাব করতে বলা মাত্র এ্যাডভোকেট সিংহ দাঁড়িয়ে নিজের ডানদিকের পাটি ভাঁজ করে চেয়ারের ওপরে উঠিয়ে নিলেন। এবারে চশমা হাতে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন :

মান্যবর বিচারপতি, আমার বক্তব্য হবে খুবই সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট। বিষয়টি একটু জটিল এবং একটু সূক্ষ্ম ভাবেই ভাবতে হচ্ছে। এই কেসটিতে মনস্তত্ব বিচারের ব্যাপারও আছে। আর বিচারপতি নিজেও মনস্তত্ত্ববিদ বলেই আমি নিশ্চিন্ত।

সিংহ একটু চুপ করলেন। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টীকা-টিপ্পনীও শুনতে পাচ্ছিলেন। সিংহ বলতে লাগলেন :

– রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একে ভাল লোক বলে আমি প্রমাণ করতে চাই নে। ভাল লোক হলে এ ধরণের রেস্তোরাঁর ম্যানেজার হবে কেন? আর কতকগুলো অশিক্ষিত, অর্বাচীন, নিরক্ষর লোক নিয়ে ব্যবসাতে নামবে কেন? ভাল-মন্দ প্রমাণ করা আমার বিষয় নয়। ব্যবসা করতে গিয়ে ঠিক যেভাবে লোকে চোদ্দ ঘণ্টা দোকানে বসে উপার্জন করতে পারে, এ লোকটি তাই করে। বহু লোক এর ক্রেতা। দোকানদারী বা রেস্তোরাঁ চালানোর ব্যাপারে ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শোনা যায় নি।

রেস্তোরাঁটি আসলে খুব আদর্শ জায়গা নয়। কারণ ওখানে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা যাতায়াত করে না। ওখানে বেশি যাতায়াত করে যুবসমাজ। সেজন্যেই রেস্তোরাঁর মালিক ওদের কাছ থেকে আরও বেশি পয়সা পাবার জন্যে তৎপর হতে পারে। এবং সেজন্যই লোকটি এ ধরণের মেয়েদের বেশ বাধ্য রাখতে চেষ্টা করতে পারে। ম্যানেজার সতীশচন্দ্র দাসের রেস্তোরাঁ যুবসমাজে খ্যাতিলাভ করেছে। রীতা চৌধুরী মেয়েটি এখানে মারা যায় বলে দাসের ওপর একটা দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আচ্ছা, মৃত্যুর কারণ কি ম্যানেজার? পোস্টমর্টেমে যা পাওয়া গিয়েছে তাতে সন্দেহ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মহিলাটির হার্ট-ফেলিওর হয়েছিল। অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় বক্সরুমের মধ্যে এসে চা-এর আদেশ দেয়। ডাক্তার বলেছেন, ওঁর মনে হয়, কোন ড্রাগের ব্যবহার ও ইল-নারিশমেণ্ট হচ্ছে এর কারণ। পৃথিবীতে কোন যুক্তি-প্রমাণ এজন্যে অন্য একটি লোককে দায়ী করতে পারে কিনা বিচার করে দেখুন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অনন্যতা

বেণু দত্তরায়

রক্তে এত ফুল, নীল অপরাজিতা,
রক্তে এত ফুল কে ফোটালো ভালোবাসায়
কে ফোটালো রাঙারক্তের এই গোধূলিতে।

কাকে যেন বললাম,
উত্তাপের শিরার মত অ্যালকোহলে
আমি ক্লান্ত,
ক্লান্ত এই পারার মত উজ্জ্বল রৌদ্রের মধ্যাহ্নে।
ঠিক তখনই তোমাকে স্বপ্নে দেখলাম
হে আমার নীল অপরাজিতা
স্নিগ্ধতায় নির্জন গোধূলিতে
সন্ধ্যাকলির মতো অফুরন্ত বিস্ময়।

দু'টি চোখ

সুধাংশু দে

একটা ক্যানভাস, তা'তে রংবেরং আঁচড়
হয়ত অনেক, হয়ত কিছুই নয়
হয়ত স্পষ্ট, হয়ত একেবারেই অস্পষ্ট।

দূরে ভেসে-চলা অলক মেঘ,
মাঝখানে পত্রান্বিত দু'টি শাখা,
সামনে—আরো সামনে, শুধু দু'টি চোখ।

একটা ক্যানভাস, তাতে দু'টি চোখ—
একটি আমি, আরেকটি তুমি,
অলক-মেঘস্পর্শী চোখ দু'টি—

আমার জীবন, জীবনের পটভূমি,
দূর—বহু দূর।

● সীমান্তরক্ষায় এরাই সুদৃঢ় প্রহরী

রাজধানী ঃ

সারা ভারতের প্রতিটি জনপদের প্রতিটি শহরের মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার সঙ্কল্প নতুন করে কলকাতার মানুষ গ্রহণ করেছে ২০শে অক্টোবর। স্বাধীন ভারতের নাগরিকদের কাছে এ-দিনটি যেমন বেদনাদায়ক তেমনি অপরদিক দিয়ে জাতির গর্বের দিন। ১৯৬২ সালের ২০শে অক্টোবর বিনা প্ররোচনায় চীনা চমুর দল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভারতের বুকে। চীনের বিশ্বাসঘাতকতায় জাতি সেদিন হতচকিত, দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সম্বিৎ ফিরে পেতে জাগ্রত গণমানস সময় নেয় নি। চীনের সমরনায়কদের সাম্রাজ্যলালসার মোকাবিলা করতে সকল মতভেদ পরিহার করে, দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যাকে উপেক্ষা করে সমগ্রজাতি সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় এই সংহতি সেদিন সারা বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল।

চীনের জঙ্গীবাদী নেতারা ভেবেছিলেন, অতর্কিত আক্রমণে ভারত পড়বে দুর্বল হয়ে, সৃষ্টি হবে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার এবং সেই সুযোগে চীনাপন্থী ভারতীয় দালালদের কাঁধে ভর করে চীন প্রবেশ করবে ভারতের বুকে। দলগত রাজনৈতিক মতভেদ বিপদের সময় ভারতবাসী এত সহজে উপেক্ষা করে শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াবে, এ কল্পনা চীন করতেও পারে নি।

২০শে অক্টোবর বাইরের শত্রুর হিংস্র আক্রমণের দিন—বন্ধু প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভারতের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতার দিন। সে দিনে জাতীয় বিপদের কথা এবং তার গৌরবের কথা স্মরণ—আমাদের দায়িত্বের কথা উপলব্ধির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জাতীয় সংহতি দিবসে বেতার ভাষণে জাতির শক্তির মূল উৎসের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, জাতির শক্তি তার সামরিক বাহিনীর আয়তন ও রণসম্ভার দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। জাতির শক্তি নিহিত রয়েছে দেশবাসীর ইচ্ছাশক্তির মধ্যে, তাদের হাতে গড়ে ওঠা সম্পদের মধ্যে।

এ সব কথা ১৯৬২ সালেই জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে। ভারতবাসীর প্রচণ্ড মানসিক বলের পরিচয় পেয়েই আক্রমণকারী চীনা সৈন্য পিছু হঠতে সেদিন বাধ্য হয়েছিল। ভারতীয় সেনানীরাও সেদিন অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু ভারতবাসীর অভূতপূর্ব সংহতি ও দৃঢ় মনোবলের পরিচয় না পেলে আধুনিক রণসজ্জায় সজ্জিত বিপুল বাহিনীকে অত সহজে চীনের সমরনায়কগণ নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হতো না।

আজ জাতীয় সংহতি দিবস উদ্‌যাপনের দিনে দেশের নেতৃত্বকেও সেদিনের কথা আমরা সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে স্মরণ করতে, তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে অনুরোধ করি। সেদিনের সে সংহতিকে সঠিকপথে পরিচালনা করতে কি দেশের কর্ণধারগণ সমর্থ হয়েছেন? তাঁরা কি দেশের সম্পদ গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষকে সমুচিতভাবে উৎসাহিত করতে পেরেছেন? পেরেছেন কি সাধারণ মানুষের সাহায্যে দেশের অভ্যন্তরে বেসামরিক বাহিনীকে গড়ে তুলতে?

শ্রীসেন জাতীয় সংহতি দিবসে মহাজাতি সদনের একটি অনুষ্ঠানে যে খাঁটি সত্য কথাটি বলেছেন তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে, দেশনেতৃত্ব তার দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি। দেশের কোটি কোটি মেহনতি মানুষ অভাবের আবর্তে হাবুডুবু খেতে থাকলে, মুষ্টিমেয় ক'জনকে তাদেরই শ্রমার্জিত অর্থে বিলাসের মধ্যে জীবন যাপন করতে দেখলে জাতীয় সংহতির ভিত্তি দৃঢ় হতে পারে না। শ্রীসেন ঠিকই বলেছেন, বিরাট ধনবৈষম্যের অবসান জাতীয় সংহতির জন্য অপরিহার্য।

চীন আজ আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্র হাতে পেয়েছে। এখনও সে ভারতের বিরাট এলাকা দখল করে বসে আছে। ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রতিনিয়ত শোনা যাচ্ছে তার রণ-হুঙ্কার। দেশে এখনও জরুরী অবস্থা চালু। অথচ দেশব্যাপী উঠেছে আজ খাদ্যের হাহাকার। নিরন্ন মানুষ দিনের পর দিন নিষ্পেষিত হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীদের পাপচক্রের তলে। দেশ-নেতারা যেন দুর্বল—তাঁরা যেন বিভ্রান্ত। এ দুর্বলতা, এ বিভ্রান্তি বিপদের লক্ষণ। জাতীয় নেতৃত্বে বিভ্রান্তি এলে জাতীয় সংহতি বেশিদিন জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা যায় না। দেশবাসীর মনোবল এখনও অটুট রয়েছে। সে মনোবলকে বজায় রেখে, তাকে সক্রিয় করে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের যাঁরা জাতির কাণ্ডারী। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার না হলে, তাঁর পদক্ষেপ কুণ্ঠাজড়িত হবে যে-কোনদিন বিপদের ঘনঘটা দেখা দিতে পারে। জাতীয় সংহতি দিবসে দেশের চুয়াল্লিশ কোটি নরনারীর যেমন দায়িত্ব উপলব্ধির প্রয়োজন, তেমনি দেশের নেতাদের, রাষ্ট্রের কর্ণধারদের জাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার সঙ্কল্প গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি।

• • •

কেবল পশ্চিম বাংলা নয়, সারা উত্তর ভারতের আর্থিক স্বার্থে ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর বাঁধ নির্মাণ এবং হলদিয়ায় একটি পরিপূরক বন্দর পত্তন অত্যাবশ্যক। ফরাক্কার বাঁধ নির্মাণে যত বিলম্ব হবে হুগলী নদীর বুক তত বেশি ভরে উঠবে পলিমাটিতে—কলকাতার বন্দরকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। অথচ নানা টালবাহানায় দুটি কাজই দিনের পর দিন পিছিয়ে যাচ্ছে।

হলদিয়ার বন্দরের পরিকল্পনাকে দিল্লীর আমলারা ভিন্ন মুল্লুকের স্বার্থে নানা মারপ্যাঁচ কষে এক সময়ে বানচাল করে দেবার উপক্রম করে-ছিল। উড়িষ্যার সমুদ্র সৈকতে বন্দর নির্মাণের পর হলদিয়ায় অর্থব্যয় অপচয় হবে বলে সোরগোল পর্যন্ত উঠেছিল।

আমলাতন্ত্রের মহিমা অপার। তাদের কেরামতিতে গড়া জিনিস ভাঙে। কলকাতা বন্দরের মত এত বেশি মাল রপ্তানী ও আমদানী ভারতের অন্য কোন বন্দরেই হয় না। সম্প্রতি জাতীয় শিপিং পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীরঘুনাথ সিং কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথাই স্বীকার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, কলকাতা বন্দরের উন্নয়ন এবং তার পরিপূরক হিসেবে হলদিয়ায় নতুন বন্দর পত্তন জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। উত্তর ভারতের আটটি রাজ্যের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। কেন্দ্রীয় পরিবহন-মন্ত্রী শ্রীরাজবাহাদুরও অনুরূপ মন্তব্য করে গেছেন।

শ্রীরঘুনাথ সিং হলদিয়ায় বন্দর নির্মাণের কাজে পশ্চিম বাংলা সরকারের সহযোগিতার কথা বলেছেন। পশ্চিম বাংলা সরকার সহযোগিতা যতটা প্রয়োজন করে আসছেন। হলদিয়া পশ্চিম বাংলার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। হলদিয়া বন্দরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে তার আশে-পাশে নতুন নতুন শিল্প। সে বিরাট সম্ভাবনাকে পশ্চিম বাংলা নিশ্চয়ই হেলায় হারাতে পারে না। কেন্দ্রীয় আমলা-চক্রে রশি শক্ত করে বেঁধে জোরে টানতে না পারলে শ্রীরঘুনাথ সিংকে নিরাশ হতে হবে। ১৯৬৭ সালে হলদিয়া তাঁর প্রতিশ্রুতিমত কার্যকর হবে না।

কোচবিহার :

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন করাচীতে পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের সঙ্গে পাক-ভারত মিলনের বিষয় নিয়ে আলোচনারত ঠিক সেই সময়টিতেই দিনহাটা সীমান্তে দেখা গিয়েছে পাকিস্তানী সৈন্যদের তৎপরতা। পেশোয়ারী সৈন্যদের নতুন তাঁবু পড়েছে তখন মোগলহাট থেকে এক মাইল দূরে পাক-সীমানার অভ্যন্তরে। এই নিতান্ত গণ্ডগ্রামে পাকা পিচের রাস্তা তৈরি হচ্ছে বলে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে।

জলপাইগুড়ি :

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের ঔদাসীন্যের কথা পূর্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। প্রচুর সম্ভাবনাময় পূর্ণ এ-অঞ্চলের প্রতি সরকারের সজাগ দৃষ্টি পড়লে স্থানীয় মানুষের দারিদ্র্য-মোচনের পথ যেতো খুলে। সঙ্গে সঙ্গে সারা পশ্চিম বাংলার সম্পদও যেতো বেড়ে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুরের মানুষ নিজেদের অবহেলিত ভাবতে সুরু করেছে—সৃষ্টি হয়েছে গণমনে চাপা বিক্ষোভও।

সম্প্রতি মালে একটি হাসপাতাল সৃষ্টি হয়েছে। সরকার থানায় থানায় ৫০ বিছানার একটি করে হাসপাতাল গড়ে তুলছেন। খুবই কল্যাণের কথা। মাল থানাটির এলাকাও বেশ বড়। অথচ এখানে যে-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিছানার ব্যবস্থা করতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী অত্যন্ত কৃপণ হয়ে পড়েছেন। মাত্র দশটি বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে মালের হাসপাতালে।

স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত। জঙ্গল পরিষ্কার করে একে একটু স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলার প্রয়োজনও স্বাস্থ্য-দপ্তর

এ-পর্যন্ত বোধ করেন নি। এ-এলাকায় বিদ্যুতের অভাব নেই। হাসপাতালে এখনও বিদ্যুৎ প্রবেশ করে নি। আধুনিক যুগে বিনা বৈদ্যুতিক আলোতে একটা হাসপাতাল পরিচালনা কল্পনাতীত। সাধারণ মানুষের যা' কল্পনার বাইরে তাই আমাদের সরকারের পক্ষে সম্ভব। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোতে কোন অপারেশন তো দূরের কথা; সন্ধ্যার পর কোন জটিল রোগের পরীক্ষা সম্ভব কি না, স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টার বাহাদুরের মুখে শুনতে পেলে দেশবাসী নিজেদের কৃতার্থ মনে করবে।

• • •

পূজার সময় থেকে জলপাইগুড়ি শহর ও আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলে চোরের উপদ্রব বেড়ে গিয়েছে। চোরের দল এবার দেবীমূর্তিকেও রেহাই দেয় নি। শহরের সব চাইতে কর্মব্যস্ত অঞ্চল দিনবাজার। দিনবাজারের কালীমন্দিরে সম্প্রতি চুরি হয়েছে। মন্দিরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। চোর কোথা দিয়ে, কি কৌশলে মন্দিরে প্রবেশ করে দেবীমূর্তির অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণ করেছে, কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। মন্দিরের স্কাই-লাইটের কাঁচ অবশ্য ভাঙা ছিল।

চব্বিশ পরগণা :

জেলার কয়েকটি অঞ্চলে এ-বছর আউশ ধান উঠেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। গেল দশ বছরে নাকি আউশের ফলন এত ভাল হয় নি। শুধু আউশ নয়, আমনের অবস্থাও খুব সম্ভাবনাপূর্ণ। মথুরাপুর ও ক্যানিং অঞ্চলে মোটা চালের দামও তাতে কিছুটা কমেছে। পূজার আগে মোটা চালের দাম ছিল ৪৪৲ টাকা। এ ক'দিনে তা' ৪০৲ টাকায় নেমেছে। পাইকাররা অত্যন্ত উৎফুল্ল। বাজারে চাল আসতে না-আসতেই বস্তা বোঝাই করে চালান হচ্ছে কলকাতা শহরে; এদিকে স্থানীয় মানুষ খেতে পাচ্ছে না পয়সার অভাবে। ৪০৲ টাকা মণ দরে চাল কেনার সাধ্য অধিকাংশ মানুষেরই নেই।

রেশনের দোকান থেকে সপ্তাহ তিনেক আগেই আটা, ময়দা ও গম একেবারে লোপাট হয়েছে। মাথাপিছু সামান্য কিছু চালের আশায় শেষ রাতে রেশনের দরজায় এসে লাইনে যাঁরা দাঁড়াতে পারেন, তাঁদের ভাগ্যে মাঝে মাঝে শিকে ছেঁড়ে। চালের সঙ্গে সামান্য আটাও হয়তো কোন দোকানে মিলে যায়। ভোরের দিকে এসে লাইনের ল্যাজে স্থান নিলে, শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়েই ফিরতে হয়। দুপুর নাগাদ ঠেলাঠেলি করে দোকানের দরজায় এসে শুনতে হয়—দোকানীর ভাণ্ডার শূন্য—দেওয়ার মত খাদ্যশস্য কিছুই নেই।

সরকারের মূল্য নির্ধারণের নীতি সাধারণ মানুষের [illegible] বেদনা-

● বাংলা দেশের অসংখ্য ক্রেতার কতো না প্রহর এইভাবে ব্যয়িত হয় রেশনের দোকানের সামনে।

নায়ক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে, সরকার যে-জিনিষের উচিত মূল্য স্থির করে দেবেন, তা আর কোনদিন সোজাপথে খোলা বাজারে পাওয়া যাবে না। ডালের মূল্য নির্ধারিত হওয়ার পর ডালও এখন পাওয়া দুষ্কর হয়েছে। দেড় টাকা কে-জি'র কম কোন ডাল মফস্বলের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।

খাদ্যাভাব সব চাইতে তীব্র হয়ে উঠেছে কাকদ্বীপের গ্রামাঞ্চলে। শাকসব্জী সিদ্ধ খেয়ে খেয়ে মানুষের পেটের রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভুগছে রক্তশূন্যতাজনিত রোগে। দরিদ্র পরিবারগুলির দিন কাটছে প্রায়ই অনাহারে। শেষ সম্বল পর্যন্ত পেটের দায়ে তাদের হাতছাড়া করতে হয়েছে। জমি বিক্রির হিড়িক পড়ে গিয়েছে। জমি-জমা, তৈজসপত্র বিক্রি করে দু'মুঠো চাল জোগাড় হলেও নিরাপদে তা ঘরে রাখবার উপায় নেই। প্রতি রাত্রিতেই চুরি হচ্ছে। চোরের নজরটা খাদ্যশস্য ও ভাতের হাঁড়ির ওপরই বেশি। এ-চোর জাত চোর নয়। এরা সবাই অন্নক্লিষ্ট—অতি দরিদ্র মানুষ। দুর্ভিক্ষের সময় ভিন্ন এমন ব্যাপক ভাতের হাঁড়ি অপহরণ হয় না।

আমাদের ত্রাণমন্ত্রী শ্রীআভা মাইতি খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা যা করেছেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত নগণ্য। খাদ্যশস্য বিলি করলে তবু মানুষগুলোর পেটের যন্ত্রণা কিছুটা কমতো। পেটের রোগে ভুগে ভুগে এ জগৎ থেকে বিদায় নেবার ভয় থাকতো না। ত্রাণমন্ত্রী সে ব্যবস্থা না করে নগদ টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। পনের দিন পর পর মাথাপিছু দু'টাকা দেওয়া হচ্ছে। যেখানে চাল দুষ্প্রাপ্য—বাজারে চাল সামান্য আমদানী হতেই অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এক টাকা তিরিশ পয়সার কমে বিক্রি হয় না, সেখানে দু'টাকায় মানুষের কতটা সাহায্য হতে পারে—ত্রাণমন্ত্রীকে আমরা একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

● আভা মাইতি

নদীয়া:

মাজদিয়ায় সম্প্রতি কোন খাদ্যশস্যই পাওয়া যাচ্ছে না। আটা, সুজি, ময়দা ও সরষের তেল বাজার থেকে উধাও হয়েছে। বাদাম তেল এখনও বাজারে আসে নি। অনেকদিন পর রেশনের দোকান থেকে চিনি দেওয়া সুরু হয়েছে। কিন্তু তা সকলের ভাগ্যে জোটে না।

কিছুদিন আগেও রাস্তার ধারে এক টাকা থেকে পাঁচসিকে কে-জি করে চাল পাওয়া যাচ্ছিল। এখন তাও মিলছে না।

● পুরবী মুখোপাধ্যায়

আটা-ময়দার অভাবে রুটি ও বিস্কুটের কারখানাগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। বহু লোক তাতে বেকার হয়ে পড়েছে।

রাণাঘাটে আবার নয়া ব্যবস্থা হয়েছে। চাকীওয়ালাদের ওপর নির্দেশ হয়েছে—গম ভেঙে আটা রেশনের দোকানে সরবরাহ করার। আগে মানুষ চাকীওয়ালাদের কাছ থেকে সামান্য পরিমাণ আটা যাও পেতো, তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

* * *

দীর্ঘকাল পর কৃষ্ণনগরে আশার আলো দেখা দিয়েছে। স্টেশনের নিকটবর্তী নির্মীয়মাণ হাসপাতালের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়ে এসেছে। ১৩১ শয্যার নয়া হাসপাতালে এখন উঠে আসবে সদর হাসপাতাল। পূর্বের কথামত কয়েকটি বিভাগ, বিশেষ করে, বহির্বিভাগ থাকবে পুরনো হাসপাতালেই।

আমাদের মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমান আবার নতুন দাবি তুলেছেন। তিনি চাইছেন—হাসপাতালের বহির্বিভাগটিও নতুন হাসপাতালে তুলে আনতে। এ নিয়ে তিনি নাকি স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন। তাঁর দাবির পেছনে যুক্তি নেই, এমনও নয়। চিকিৎসক ও নার্সেরা নতুন হাসপাতালে আশ্রয় নিলে পুরনো হাসপাতালে এমার্জেন্সি বিভাগ ও বহিবিভাগ থাকতে পারে না। তাতে রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসাও সম্ভব নয়।

নতুন হাসপাতাল শহর থেকে অনেক দূরে। শহরের মানুষের পক্ষে এতদূরে আসাও কষ্টসাধ্য। পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে শহরবাসী দাবি তুলেছে—প্রসূতি বিভাগ, বহিবিভাগ ও এমার্জেন্সি বিভাগ পুরনো সদর হাসপাতালে বজায় রাখার। এ-দাবি না মেনে নিলে সত্যাগ্রহের হুমকীও দেওয়া হয়েছে।

আশা করি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে অচিরেই এর একটা ফয়সালা করে ফেলবেন। প্রসূতি বিভাগ, বহির্বিভাগ ও এমার্জেন্সির চিকিৎসকগণ নতুন হাসপাতালে না উঠে আগের জায়গায় বহাল তবিয়তে থেকেও নতুন হাসপাতালের কাজ চালাতে পারেন। তাঁদের যাতায়াত এমন কিছু ব্যয়সাধ্য হবে না। হাসপাতাল দরিদ্রের জন্য। তাদের পক্ষে শহর থেকে এতদূরে আসার দুর্ভোগের কথাটা বোধ হয় আমাদের মৎস্যমন্ত্রীর মাথায় আসে নি। দুষ্টজনে বলে, তিনি সবকিছু ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে সময় একটু বেশি নিয়ে থাকেন।

হুগলী :

হুগলীর গ্রামাঞ্চলে খাদ্যাভাবে হাহাকার উঠেছে। বহু পরিবারের এক বেলার বেশি খাদ্য জুটছে না। শহরাঞ্চলে রেশনের দোকানের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ চাল ও আটা সরবরাহ হলেও, গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাই নেই। অথচ এ-অঞ্চলের শতকরা ৬০ ভাগ পরিবারকেই কিনে খেতে হয়। পূজার সময় গ্রামাঞ্চলে আটা বিক্রি হয়েছে প্রতি কে-জি দু' টাকা হারে। চিনি এ-সব জায়গায় দুর্লভ। তিন টাকা দক্ষিণা দিতে পারলে কখনও সখনও এক কে-জি চিনি পাওয়া যায়।

খয়রাতি সাহায্য বন্ধ। দুঃস্থ মানুষ তাতে দারুণ দুরবস্থায় পড়েছে। শোনা যাচ্ছে, সরকার দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণের জন্য সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুরও করেছেন। সে টাকা আমলাচক্রের কোথায় আটকে আছে তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না।

বীরভূম :

সরকার মোটা ধানের দাম বেঁধে দিয়েছেন, প্রতি কুইণ্টাল ৪০৲ টাকা ৮৬ পয়সা। পাইকাররা এই মূল্য দিতে নারাজ হলে এবং ধানের দাম কমে গেলে সরকার নিজে বাজারে গিয়ে ধান কিনে নেবেন, এমন কথাও ছিল। সেই দিকে নজর রেখে ধান কেনার নির্দেশ জেলা-শাসকদের দেওয়াও হয়েছে।

আউশ ধান বাজারে উঠেছে। চাষী কিন্তু তার ন্যায্যমূল্য পাচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা প্রতি মণ ধানের দাম বারো থেকে তেরো টাকার বেশি দিতে চাইছে না। গরীব চাষী অনুপায়। বাধ্য হয়ে প্রতি কুইণ্টাল ধান তাকে বিক্রি করতে হচ্ছে ৩৪৲ থেকে ৩৫৲ টাকায়। জেলা-কর্তৃপক্ষ এখনও নীরব। ব্যবসায়ীরা নতুন অজুহাত তুলেছে। তাদের মতে নতুন ধান ওজনে কম উঠে। কাজেই তার মূল্য কমই হবে।

জেলা শাসক একটু তৎপর না হলে গরীব চাষীর গোলা উজাড় করে কম দামে ধান ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করে ফেলবে। সরকারও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায় থেকে রেহাই পাবেন না।

বর্ধমান :

শহরে আটা বাড়ন্ত বেশ কিছুদিন থেকে। আটা ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে বিতরণের নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন স্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা। নয়া ব্যবস্থায় প্রতি রেশন কার্ডে আটা দেওয়া হচ্ছে দু' কে-জি করে। তা' ছাড়া, একই দিনে সব মাল দোকান থেকে পাওয়ার উপায় নেই। চালের জন্য একদিন, আটার সন্ধানে আরেকদিন এবং চিনির জন্য একটি দিন, সাকুল্যে সপ্তাহে তিনটি দিন রেশনের জন্য দোকানে ধর্ণা দিতে হচ্ছে। দোকানীকে দোষ দেওয়া যায় না। দোকানদারের অপরাধ থাকলে এতদিনে হাঙ্গামা একটা সৃষ্টি হয়ে যেতো। যাদের গাফিলতিতে দোকানে একই সময়ে আটা, চাল ও চিনি আসে না, তারা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

• • •

বর্ধমান শহরের মানুষ খুবই উৎফুল্ল। ভারতে যে-কটা চালকল প্রতিষ্ঠিত হবে, তা' একটা বসবে বর্ধমান জেলায়। সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত প্রস্তাবিত কল আসবে জাপান থেকে। এ কলে অপচয় কম হবে। প্রতি মণ ধানে বর্তমানে চালু কলগুলো থেকে চাল পাওয়া যাবে অধিক পরিমাণে। সমবায় সমিতির হাতে এর পরিচালনাভার তুলে দেওয়া হবে।

সমবায় সমিতির কার্যকলাপের তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশবাসীর কম নয়। এক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি না হলে, বর্ধমানের মত জায়গায় নতুন কলে লাভই হবে। তা' ছাড়া, বর্তমানে চালু কলগুলোকে মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করার প্রয়োজনও রয়েছে। সেদিকে সরকার নজর দিলে লাভ ভিন্ন লোকসান হতো না।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

একেক সময় সনাতন মণ্ডল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে লক্ষ্মীর 'পর। লক্ষ্মীটা কি বুঝবে না কিছুই ?

সারাটা দিন কত মেহনত করে সনাতন। সেই কোন্ কাক-ডাকা ভোরের আলোয় লিলুয়ার রেল ওয়ার্কসপের বাঁশী বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে। কোনরকমে দুটো বাসি শুক্‌নো রুটি মুখে গুঁজে তাকে ছুটতে হয় লিলুয়া স্টেশনে। সেখানে রেললাইনের দিনমজুরের কাজ করতে হয় তাকে। কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে আসতে কোন কোন দিন দুপুর গড়িয়ে যায়। পা দুটো তখন আর চলতে চায় না। তৃষ্ণায় জিবের তালু পর্যন্ত যায় শুকিয়ে। পেটের ভেতরটা ক্ষুধায় জ্বলতে থাকে আগুনের মত। লক্ষ্মী ভাঙা টিনের বাসনে মোটা মোটা ভাত বেড়ে দেয়। একটা লঙ্কা, একটু কুমড়োর শাক, আর একটু ডাল দিয়েই গোগ্রাসে গিলতে থাকে সে। লক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে দেখে। শক্ত মানুষটা পুড়ে পুড়ে কেমন কালো, কাহিল হয়ে গেছে। গতরে এত খেটেও যদি একটু সুখের মুখ দেখতো মানুষটা। লক্ষ্মী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে দেখে স্বামীকে।

সনাতন তাকিয়ে বলে, 'হাঁ কইর‍্যা দ্যাখচ কি ? আমি রাইক্ষসের মত খাই ?'

'আ হা, কথার কি ছিরি। তোমার কি এট্টু বোদবাস্যও নাই ?' গোঁ মেরে উঠে গেল লক্ষ্মী।

'আ হা হা, রাগ করছ্ ক্যান ? আমি ত' তর লগে এট্টু তামাসা করছিলাম।'

'রাহ্, রাহ্, এহন আর বাইছ্‌লামি করতে হইব না।'

লক্ষ্মীর ওপর কোনদিন রাগ দেখাতে পারত না সনাতন। সারা জীবন সে ত' শুধু কষ্টই পেল তার কাছে। না পেল দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, না পেল পরনের ভাল একটা শাড়ি। শাড়ি পড়লে আজও কি সুন্দর মানায় লক্ষ্মীকে।

কদিন ধরেই লক্ষ্মী একটা নতুন বায়না ধরেছে স্বামীর কাছে। এতকাল পর মা হয়েছে সে। ছেলে হয় নি বলে প্রথমদিকে তার দুঃখই ছিল। এখন ভাল লাগছে মেয়েটাকে। সেই মেয়ের জন্য চাই একজোড়া হাঙর-মুখো বালা। এই নিয়ে এখন প্রায়ই হয়ে যায় এক পশলা বিতণ্ডা।

একদিন দুপুরের আহার শেষে ঘরের খাটিয়ায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল সনাতন। মেয়ে কোলে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী। সনাতন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

'আমার কথাডা বুঝি কানে যায় না তোমার ? বলি, ববস্থা-ঠেবস্থা করলা কিছু ? আমার নিজের লইগ্যা ত' কিছু চাই নাই।'

পিচ্ছিল

নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ

'দ্যাহো, আবার কইতাছি, আমারে জ্বালাইও না। আমি এহন ঐসব পারুম না, পারুম না। খাওনের পয়সা জোড়ে না, তা ওনার মাইয়া সাজানের সখ অইছে। তাজ্জব কাণ্ড।' বিরক্তিতে ভরে যায় সনাতনের মন।

'হেইলে বাপ হইছিলা ক্যান্? সরম অয় না তোমার? এই যদি মুরদ—' হাত নেড়ে নেড়ে ঝঙ্কার দিল লক্ষ্মী।

'দ্যাখ, দ্যাখ, ম্যাজাজ দেখাইচ্ না। ভাল অইব না কৈলাম।' চোখ লাল করে তাকায় সনাতন।

'কি? কি করবা তুমি? আমারে মারবা?' কঠিন হয়ে ওঠে লক্ষ্মী।

সনাতন নিশ্চুপ হয়ে গেল। শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল বিড়িটা। গলা খাঁকারি দিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুই কি কথাডা কইলি ক' দ্যাখি? ক', কোনদিন তরে মারছি? মাঝে মাঝে ম্যাজাজ ঠিক থাকে না।' লক্ষ্মীকে টেনে কাছে বাটিয়ায় বসায়। মেয়েটার গাল টিপে দিয়ে বলে, 'আ রে, আমারো কি সাদ-আহ্লাদ অয় না? রও, রও, আর কডা দিন কষ্ট কর। হগল ঠিক হইয়া যাইব। আমাগ ইঞ্জিনরবাবু কইছেন, এই জায়গার কাজ শ্যাষ অইলে আমারে বাণ্ডিলের লোকো শ্যাডে কাজ দিয়া দিব। র‍্যাকশ' টাহা পায়না, আর বেশি খাডলে বেশি টাহা। বোঝলা নি, কথাডা?' বিগলিত হাসি হেসে সনাতন তাকায় স্ত্রীর দিকে।

লক্ষ্মীর মনটা গলে যায়। মেয়েটাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরে, সশব্দে চুমু খায় ওর গালে। এক সময় মেয়েকে স্বামীর কোলে তুলে দিয়ে বলে, 'ধর দেহি সোনারে, আমি এট্টু বাতাসীর মায়ের কাছে যামু। দেহি, ডাইক্যা পাডাইল ক্যান্ আমারে।'

ক'দিন থেকেই খাটুনি বেড়ে গেছে সনাতনের। আর সাতদিন পরেই হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে নতুন বিজলী ট্রেন চলতে সুরু করবে। ইতিমধ্যে ট্রায়াল রান হয়ে গেছে। আকাশের নীচে দুই সমান্তরাল রেখার মত দূরবিস্তৃত রেলপথ বরাবর শূন্যে ঝুলছে অজস্র বিজলী তার। পথের দু'ধারে ইস্পাতের থামগুলো যেন হাত বাড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে তারের জাল।

রেলপথে পাথরের টুকরোগুলো দু'হাতে সরিয়ে দিতে দিতে উন্মনা হয়ে পড়ে সনাতন। ওপরের দিকে চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখে সে। বিস্ময়ের অবধি থাকে না তার। ক'দিন পরেই কর্ণবিদারী হর্ন বাজিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চলবে যাত্রীবোঝাই নতুন ট্রেন।

মধ্যাহ্নের আগুন-ঝরা রোদ মাথায় করে সনাতন সঙ্গীদের নিয়ে আরো এগিয়ে গেল। দরদর ধারায় ঘাম ঝরছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। নিদারুণ ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসছে দেহ-মন। মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুরছে। লোহার বিরাট হাতুড়ীটা নিয়ে এগিয়ে আসে সনাতন। কুলি সর্দারের নির্দেশে প্রাণপণ শক্তিতে হাতুড়ীর আঘাত হানে সে রেলের লোহার হুকের ওপর। কাজের আর শেষ নেই। আসছে ক'টা দিনের মধ্যেই শেষ করে নিতে হবে লাইনের সমস্ত কাজ। তাপদগ্ধ ক্লান্ত দুপুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদের তির্যক আলো এসে পড়েছে রেললাইনের ওপর। সনাতন তার সহকর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রেলের নীচে মাটির ওপরে পর পর সমান্তরালভাবে গেঁথে দিচ্ছে ভারী স্লিপারগুলো। হঠাৎ পাশ দিয়ে দ্রুত ধাবমান মটর-ট্রলি থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'সনাতন, ইসাক—।'

সনাতন, ইসাক মুখ ফিরিয়ে দেখে প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করে বলে, 'এই রামলাল।' ওরা দুজন হাত নেড়ে নেড়ে ইসারা করে রামলালকে।

দিনের শেষে বাড়ি ফেরার পথে সনাতনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মাস্টারবাবুর। ক্লান্ত শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল সনাতন, 'পন্নাম মাস্টারবাবু। ক্যামন আছেন?'

'বড় ব্যস্ত সনাতন। তোমরা সব ভাল ত'?' প্রসন্ন স্বর মাস্টারবাবুর।

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

একটু ইতস্তত করে সনাতন বলল, 'মাস্টারবাবু, আপনার টাকাডা আইজও দিলাম না। বড় লজ্জা অইতেছে।' সঙ্কুচিত হয় সনাতন।

'আ রে না, না, লজ্জার কি আছে? তুমি তোমার সময় সুযোগমত দিয়ে দিও। কেমন?' হাত ধরে কাছে টেনে নেয় সনাতনকে। একটু থেমে বলে তাকে, 'ওদিকের ব্যবস্থা সব ঠিক আছে ত'? মিছিলটা কিন্তু বেশ জোরদার করতে হবে।'

'ঐ কথাডা কি আর কইতে অইব? সব ঠিক কইর‍্যা রাখছি। কিছু ভাবব্যান না।' কথার সুরে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে—সনাতনের। সনাতনের কথায় আশ্বস্ত হয়ে অন্যদিকে পা বাড়ান মাস্টারবাবু।

মাস্টারবাবুর কাছে সনাতনের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। একালেও এমন মানুষ হয়। সোনার মানুষ। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মাস্টারবাবুর স্মৃতি আচ্ছন্ন করে তোলে সনাতনকে। প্রায় সাত-আট মাস আগের কথা। হাওড়া ব্রীজের কাছে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভিক্ষা করছিল সনাতন। অদূরে একটা ভাঙা লাইটপোস্টের আড়ালে ঘোমটা দিয়ে বসেছিল লক্ষ্মী। লক্ষ্মী তখন সন্তানসম্ভবা। তমলুকে দৈনিক ক্ষেত-মজুরের কাজ শেষে বেকার হতে নিরুপায় হয়ে সনাতন চলে এসেছিল কলকাতায়। প্রাণপণ চেষ্টায় কোথাও একটা কাজ জুটল না তার। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় ভিক্ষাবৃত্তি নিঃসম্বল সনাতনকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে কলকাতার গোলকধাঁধায়।

একদিন সন্ধ্যায় লিলুয়ার মাস্টার-বাবুর কাছে হাত পাততেই তিনি বলে উঠলেন, 'কাজ করবে তুমি?'

'করুম বাবু, করুম। ঈশ্বর আপনারে মঙ্গল করব্যান। ভগবানের নাম কইর‍্যা কই, ভিক্ষা আমার প্যাশা না।'

আকুল হয়ে ওঠে সনাতন। মাস্টারবাবু গভীর আগ্রহে শোনেন সনাতনের কথা। পূর্ব পাকিস্তানে সনাতন ছিল ক্ষেতমজুর। সেখানে কত দুঃখে কষ্টে জীবন কেটেছে তার। দেশ বিভাগে দুঃখ-যন্ত্রণার অকূল সমুদ্রে পড়ে গেল সে। দেশ ছেড়ে চলে এল সনাতন কলকাতায়। কলকাতা থেকে সুন্দরবন, সেখান থেকে হাওড়া, আবার হাওড়া থেকে তমলুক। এমনি করেই বাঁচার তাগিদে চাকার মত ঘুরতে হয়েছে সনাতনকে। এখান থেকে সেখানে। তার সব কথা শুনে মাস্টারবাবু ক'দিন বাদেই তার জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন এই রেললাইনের দৈনিক মজুরের কাজটা। তাকে আশ্রয় দিল লিলুয়ার শ্রমিক বস্তিতে। তারপর ঐ ক'মাসে কতভাবে মাস্টারবাবুকে জেনেছে সনাতন। যতই সে দেখেছে তাঁকে, ততই শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে তার সমস্ত মন। কত কথা বলেন মাস্টারবাবু। দেশ-বিদেশের কথা বলতে গিয়ে কেমন বিহ্বলতায় তাকিয়ে থাকেন শূন্যের দিকে।

রাত্রে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিজের বিছানায় শুয়ে সনাতন বলল লক্ষ্মীকে, 'জানচ্ লক্ষ্মী, আর কয়দিন পরই নতুন বিজলীর টেরেন চলব? সব ঠিক হইয়া গ্যাছে প্রায়।'

'হেয়া ত বোজলাম। আমাগ তুমি টেরেনে চড়াবা না?'

'হেই কথাডাই কইতাছি তোমারে। হেই দিন তোমারে, আমাগ চম্পারে তোমার সই বাতাসীর মা, হগ্গলেরে লইয়া যামু টেরেনে চড়তে—'

'হাচা কথা কইতাছ ত?' লক্ষ্মী কটাক্ষে তাকায় স্বামীর দিকে।

'এই তোমারে ছুইয়া কই, যামু, যামু, যামু—'

'আইচ্ছা, দেহা যাইব কামের সময়।'

লক্ষ্মী স্বামীর পাশে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। দুজনের মাঝখানে চম্পাকে রেখে একদৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের দিকে আর স্বামীর দিকে। ঘুমন্ত মেয়ে এক সময় পাশ ফিরে শুল বাবার দিকে।

মেয়ের মাথার নরম চুলে হাত বুলোতে বুলোতে সনাতন বলল, 'আরে ঘুমাইয়া পড়লা নাকি? হোনছ, এই—।'

লক্ষ্মী চমকে উঠে বলে, 'কী, কী অইছে?'

'আরে অইব কী। হোন।'

'হ্যাহন আবার কী কও?' বিরক্তি প্রকাশ করে লক্ষ্মী।

'কাইল কা আমি কৈলকাতায় যামু। কাজ আছে। বোজলা?'

'আবার কৈলকাতায় কাম কী?'

'এহানে ত আমাগ কাজ প্রায় শ্যাষ অইল। এহন কোম্পানী আর আমাগ রাগব না। এতগুলা মাইনসের আর কোন কাম থাকব না।'

গম্ভীর হয়ে ওঠে সনাতনের গলার স্বর। লক্ষ্মী একটু নড়ে চড়ে ওঠে।

'হেইলে এতগুলা মাইনসের কী উপায়ডা অইব।'

'হেইর লইগ্যাইত আমরা হগলে মিল্যা মিছিল কইর‍্যা যামু কৈলকাতার বড় আফিসে। গিয়া কমু—আমাগ আলাদা কাম দাও তোমাগ র‍্যালে—'

সনাতনের কথা শেষ হবার আগেই লক্ষ্মী বলে উঠল, 'তুমি আবার যাইবা ক্যান? তুমি ত বাণ্ডিলে কাম একটা পাইবাই। তোমারে না এঞ্জিনের বাবু—'

'দূর অ, কী যে কও। এইডা দশজনের কাম না? দশজনের কথাডাও ত বাবতে অয়। আর জান, আমাগ লগে মাস্টারবাবু থাকব।' নিশ্চিত সুর ফুটে ওঠে সনাতনের কণ্ঠে।

'মাস্টারবাবুও তোমাগ লগে যাইব? তাইলে আর তোমাগ পায় কে। আইচ্ছা, হে মাইন্সেরে এত ভালো-বাসে ক্যান্ কও দেহি?'

'লক্ষ্মী, এই মাইন্সের জাইতই আলাদা।'

'তুমি ঠিকই কইছ। হেয়া না অইলে গরীবের লইগ্যা এমন কইর‍্যা প্রাণডা কান্দে।'

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে মেয়ে কোলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছিল

লক্ষ্মী। সারা দুপুরটা কেটেছে অসহ্য গরমে। একটু হাওয়া দিচ্ছে না। ঘরের ভেতরে বসে থাকা দায়। ঘরের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিল লক্ষ্মী। ঝড়ের বেগে লক্ষ্মীর কাছে ছুটে এল বাতাসীর মা। 'শুনেছ লক্ষ্মী, কলকাতায় নাকি গোলমাল স্বরু হয়েছে? বাতাসীর বাপ লিলুয়া রেল স্টেশনে লোকের মুখে কথাটা শুনে এসেছে।' চিন্তিত হয়ে ওঠে বাতাসীর মা।

'গোলমাল? গোলমালডা আবার কিসের? কৈলকাতার কোন্ জায়গাডার কথা কও তুমি?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ লক্ষ্মীর।

'তা ত বলতে পাচ্ছি না ভাই। তবে শুনলাম, পুলিশ নাকি গুলী চালিয়েছে।'

'কও কী? গুলী? গুলী চালাইব ক্যান্?' একটু থেমে আবার বলল, 'দিদিগ, আমার কর্তা ত আউজগা কৈলকাতায় গ্যাছে।' উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে লক্ষ্মী।

'তাতে কী হল? তোর আবার যত সব বাজে ভাবনা।' লক্ষ্মীকে ধমক দিয়ে ওঠে বাতাসীর মা।

কখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। সনাতন এখনো বাড়ি ফিরে এল না। কলকাতায় সে চলে গেছে সেই সকালে। ঘরের কোণের স্তিমিত মোমের শিখায় চোখ পড়ে লক্ষ্মীর। মোমটা কেমন পুড়ে পুড়ে গলে যাচ্ছে। স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরটার ওপর অঘোরে ঘুমিয়ে আছে চম্পা। ঘরের ভেতরটা স্তব্ধ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী। মাথার ওপর খণ্ডিত আকাশে থমথমে অন্ধকার। বস্তীর রাস্তার অস্পষ্ট আলোয় পথের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকাল সে। অদূরে তীব্র হুইসিল বাজিয়ে মিলিয়ে গেল রাত্রির শেষ ট্রেন। বস্তীর ঘরে ঘরে আলো নিভে গেছে। রাস্তার কোলাহল থেমে গেছে তখন। লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত মেয়ের পাশে বসল। অন্ধকারের গভীর নিস্তব্ধতায় ক্লান্ত মনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাত্রি শেষে উষার আলো যখন সবে স্পর্শ করছে বস্তীর আকাশ, অদূরে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে বেজে উঠেছে কারখানার বাঁশী, তখন হন্তদন্ত হয়ে লক্ষ্মীর অর্গলমুক্ত ঘরে ঢুকল বাতাসীর মা। লক্ষ্মীর নাম ধরে ডেকে একটা ধাক্কা দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে। 'কে? বাতাসীর মা? কি অইছে?' হতচকিত ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকায় লক্ষ্মী।

'আমাদের মাস্টারবাবু—বাইরে—তোমার জন্য দাঁড়িয়ে'—থেমে থেমে বাতাসীর মা বলল কথাটা।

'আমাগ মাস্টারবাবু—আমার কাছে—ক্যান্ আইছে দিদি? কি অইছে? আমাগ চম্পার বাবায়ও কি আইছে?' এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলল সে।

'চল্ লক্ষ্মী, তাড়াতাড়ি চল্।' কথা বলতে বলতে ঘুমন্ত চম্পাকে বুকে তুলে নিল সে।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই লক্ষ্মীর রাতজাগা ক্লান্ত দৃষ্টি মুহূর্তে থমকে যায়। লোকে লোকারণ্য চারদিক। কেমন একটা স্তব্ধ গাম্ভীর্যে বিশুষ্ক নতমুখ বিরাট জনতা। প্রশান্ত সমুদ্রের মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত মাঝে মাঝে দুলে উঠছে জনতার বুক। লক্ষ্মী এগিয়ে আসতেই মাস্টারবাবু ভিড় ঠেলে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

লক্ষ্মী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায় তার দিকে। উস্কো খুস্কো চুল, অবিন্যস্ত চেহারা মাস্টারবাবুর।

'মাস্টারবাবু—'

'চম্পার মা।' আর্দ্র হয়ে ওঠে মাস্টারবাবুর গলার স্বর। 'আমাদের সকলের জন্য সনাতন পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিল। ওকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না—'

'হ্যাঁ। কি কইলা তুমি? পুলিশের গুলীতে-------'একটা প্রচণ্ড মর্মভেদী চীৎকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লক্ষ্মী।

বাতাসীর মা একবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল মাস্টারবাবুর দিকে। পরমুহূর্তেই নিবিড় করে বুকে জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীকে। নিজেকে আর সামলাতে পারল না সে। লক্ষ্মী অসহায় শিশুর মত বাতাসীর মা'র কোলে মাথা গুঁজে বারবার ভেঙে পড়ল আর্ত কান্নায়।

একসময় ধীরে ধীরে মাস্টারবাবু লক্ষ্মীর আরও কাছে এগিয়ে এল। শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'মুখ তোল চম্পার মা, শেষ দেখা দেখে নাও। আমরা যে এবার ওকে নিয়ে যাব—'

কঠিন পাথরের মূর্তির মত চোখ তুলে তাকাল সে। ধীরে ধীরে উঠে চলল। বাতাসীর মা'র হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে পথ করে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। খাটিয়ার ওপর খোলা চোখে নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়ে আছে সনাতন। কয়েক ছড়া সাদা ফুলের মালা জড়িয়ে আছে তার চওড়া বুকখানা। লক্ষ্মী চোখ তুলে চারদিকে তাকাল। চেয়ে দেখে সনাতনের নিথর নিষ্প্রাণ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্তব্ধ গম্ভীর বিরাট জনতা। সে ফিরে তাকাল স্বামীর মুখের দিকে, বুকের ভেতরটা জ্বলে পুড়ে গেল।

পথের মোড়ে ধীরে ধীরে সনাতনের শবদেহ নিয়ে মিলিয়ে গেল সহস্র মানুষের মিছিল। বাতাসীর মা'র কাঁধে কাঁধ রেখে অপলকদৃষ্টিতে লক্ষ্মী তাকিয়ে দেখছিল মৌন শোকযাত্রা। মাস্টারবাবু, ইসাক, হানিফ, রামলাল আরও কত শত জানা-অজানা লোক একসঙ্গে চলছে। সবাই নির্বাক, শান্ত। তাদের চোখের তারাগুলো শুধু জ্বলছে অগ্নিশিখার মত। অদূরে বিদ্যুদ্‌গতি ট্রেনের তীব্র হুইসেলে চমকে উঠল লক্ষ্মী। বাতাসীর মা'র কোল থেকে আচমকা সে টেনে নিল চম্পাকে। উদ্‌গত অশ্রুধারায় নীরবে সে ভিজিয়ে দিতে লাগল চম্পার কচি মুখ।

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নরপতি মিশ্রের নাম স্মরণ করলে আনন্দীরামের মন আজও অস্থির হয়। কোন কোন অভিজ্ঞতা হৃদয়কে বিদ্ধ করে, জীবনের মূল ধরে নাড়া দেয়। হঠাৎ, প্রত্যহের সকল অভ্যাসকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয় সে অভিজ্ঞতা। হঠাৎ, নগ্ন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় মানুষকে আর্ত চীৎকারে। তখনই মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। সুখনিদ্রার মাঝে জটিল কোন দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে কেউ এসে পড়লে যেমন হয়। ছুটে বেরিয়ে এলে হয়তো জীবন সংশয়, কিন্তু সেখানেই মানুষের পরীক্ষা। নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে হয়ত সে সময়ে মানুষ চুপ করে যায়, কাপুরুষতার পরিচয় দেয়। কিন্তু বিবেকী যে হয়, তার স্মরণে অভিজ্ঞতাটি লজ্জাদায়ক একটি কাঁটা হয়ে বিঁধে থাকে।

নরপতি একদিন আর্ত চীৎকারে আঁধারমাণিক গ্রামের সমাজপতিদের দরজায় মাথা খুঁড়েছিল। আনন্দীরামকে বলেছিল, 'বল, বল তুমি, তোমার বিবেক আছে, কি অপরাধে আমাকে এমন শাস্তি দিচ্ছ?'

আনন্দীরামের হৃদয় ফেটে গিয়েছিল। কিন্তু সমাজের শাসন, চোখ রাঙানির ভয়, তিনি চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন।

'তুমি বিবেকী পুরুষ, নয়?'

নরপতির চীৎকারে ঘৃণা ছিল, ছিল তীব্র তিরস্কার। আজও চৈত্রের প্রখর মধ্যাহ্নে চাঁপাফুলের গন্ধে আনন্দীরামের সে কথা মনে পড়ে। নরপতির মুখ। তার হাতে সেদিন একডালা কনকচাঁপা ফুল ছিল, গায়ে কোঁচার খুঁট, মাথায়। গামছা, শীর্ণ, জীর্ণ, আতুর ব্রাহ্মণের মুখে ছিল বিস্ময়। চাঁপাফুল আনন্দীরামের ভাল লাগে, ছোট এখনো মাঝে মাঝে পাথরবাটিতে জল ছিটিয়ে চাঁপাফুল রাখেন, সৃষ্টিছাড়া দেশছাড়া সৌখীনতা, কিন্তু কনকচাঁপার ঘন, উত্তেজক গন্ধের সঙ্গে তাঁর মনে নরপতির স্মৃতি নিয়ত জেগে থাকে।

তবু বড় আচার্যকে কথা দিয়েছেন, আনন্দীরাম সকালে নরপতির সন্ধানে গেলেন।

নরপতি মিশ্রের বাড়ি আঁধারমাণিক গ্রামের সীমান্তে। ভদ্রবসতির বাইরে, প্রাচীন ঈশানদীঘির কোণে নরপতির জীর্ণ কুটির। এ দীঘিতে ভরা চৈত্রমাসেও জল টলটল করে, প্রতিষ্ঠার সময়ে নরপতির পূর্বপুরুষ সতীপতি মিশ্র সকল দেবতার পূজো দিয়েছিলেন, দেবতুষ্টিকল্পে এ-পুকুরের পাড়ে হাঁড়িকাঠ পুঁতে মহিষবলি দিয়ে পূজো হয়, সতীপতি সামান্য মূল্যে একটি বাগ্‌দীসন্তানকে কিনেছিলেন। পূজোয় অধিকার নেই, কিন্তু উৎসর্গ উপলক্ষে অন্ত্যজ জাতের বলি উত্তম। ওরা লাঠি চালায়, সর্বদা পরিশ্রমে দেহ গরম রাখে, ওদের রক্ত ভাল ছিটকে বেরোয়, মৃত্তিকা তুষ্ট হন।

সতীপতি সে বাগ্‌দী সন্তানকে বলি দিতে পারেন নি, কেন না স্নানের সময়ে দেখা যায় তার কানের লতি ছেঁড়া, রক্তে ভেজা। প্রাণভয়ে বাগ্‌দী বালক কি করছে না-করছে জ্ঞান রাখে নি, কানের পেতলের মাকড়ি নিজেই ছিঁড়ে ফেলে। হাত বেঁধে রাখতে মনে ছিল না কারো, কিন্তু খুঁৎ পড়লে বলি হয় না।

তখন এমন ভরা কলি নয়। দেবতারা জাগ্রত থাকতেন, পূজোর ফল হাতে হাতে দিতেন।

এখনো এ পুকুরে জল টলটল করে। পুকুর সামান্য নয়, চড়কগাছ সম্বৎসর ঈশানদীঘিতে থাকত এই সেদিন অবধি। কিন্তু ধর্মঠাকুরের ষাঁড় ডুবে মরবার পর থেকে এর মাহাত্ম্য কিছু কমেছে। 'ঠাকুর সামান্য লয়, উনি দোষ লিছে লিশ্চয়' বলে বাগ্‌দী-কেওরা-কেওটরা কম হৈ চৈ তোলে নি।

'তো' বেটাদের ঠাকুর, তোরা বোজ গে' যা' বলে বড় আচার্য শুকনো হেসে বাগ্‌দীদের বিদায় করে দেন। বলেন, 'তোদের ঠাকুরের মন তোরা জানিস, আমরা কি জানব। বড় আচার্য বাগ্‌দীদের ছেলেভোলানো ভাবে সান্ত্বনা দেন।

'আমরা পূজব, আমরাই বুঝব' বাগ্‌দী যুবকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে। তারা রক্তের গরমে সহজে গরম হয়, চড়া কথা কখনো বলে। যদিও ধর্মঠাকুরের ষাঁড় ডুবে মরলে, পুকুরের মত জড়বস্তু পাতকী কেমন করে হয়—এ-প্রশ্নের সদুত্তর তাদের কাছে নেই। তবু 'দোষ লাগা', 'নষ্ট হাওয়া', 'নজর লাগা', এ-সব কিছুতে তাদের ঘোর বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস আঁধারমণিক গ্রামের বাতাসে ভাসে। ঈশানদীঘি দৈবে জাত হারিয়েছে, এ-রকমই আর কোন দৈব বা অলৌকিক ঘটনায় হয়তো জাত ফিরে পাবে। আবার চড়কগাছে অধিষ্ঠান হয়ে বৃদ্ধ দেবতা জলের নীচে শয়ান যাবেন, পরের বছর গাজনের ঢাক না-বাজা অবধি তিনি বিশ্রামে থাকেন। তখন হয়তো আবার ঢাকঢোল বাজিয়ে সবাই তাঁকে নিতে আসবে, যদি দৈবে ঈশানদীঘি পবিত্রতা ফিরে পায়।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর

৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের

গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস, মূল্য ৩৷৷০ টাকা

২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস মূল্য ৩৷৷০

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

এখন এ-দীঘির জল অন্ত্যজ-পল্লীর মেয়েরা ঘড়া ভ'রে নিয়ে যায়। বলে, 'আ গো, এ জলে ডাল ভাল সিজে (সেদ্ধ হয়) গো। বেন্নুনে রঙ হয় কি।' জেলেরা মাঝে মাঝে জাল ধোয়। বৎসরান্তে শীতের মুখে জলচর পাখী এসে পাড়ের কাশফুলের জঙ্গলে বাসা করে। অনতিদূরে একটি মস্ত বটগাছ। পৌষ মাসে ছেলেরা 'পোষল্লা' করতে আসে, চারদিক আনন্দ-কলরবে মুখর হয়। সম্বৎসর নির্জন দুপুরে, মাঠে গাই ছেড়ে দিয়ে আচার্যিদের রাখাল এখানে গামছা পেতে গড়াগড়ি যায় ও বিস্বর উদাস গলায় 'কবে বৃজে যাবে বৃজমণি ভেবে চিন্তায় হয়েছি কালি হে' গোষ্ঠ গান গায়।

আনন্দীরাম বটগাছ ও পাকুড়-ফাঁসতলা পেরিয়ে এলেন। ও পাকুড় গাছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সতীপতি মিশ্র শূলযন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন। দেন নি, তবু ও গাছের নাম পাকুড়-ফাঁসতলা। তারপরই স্বপ্নভরে ঈশানদীঘি খোঁড়বার আদেশ পান। পাকুড়গাছে সে সময়ে দেবতার ভর হয় ও শূন্য থেকে কে দৈববাণী করে। অথচ ঐ পাকুড়-গাছের কোন মাহাত্ম্য আছে বলে কেউই জানত না। এ-গাছের তলায় কোনদিন ধর্মপূজো অবধি হয় নি। 'হে গাছ, যদি তুমি সত্যযুগের গাছ হও, তবে যেন আমি পুত্র পাই, বিত্ত পাই' বলে কোন গ্রাম্যবধূ এ-গাছের গোড়া কলসীর জলে ধুয়ে চুল দিয়ে মুছে দেয় নি। কোন কারণেই এ-গাছ বিশিষ্ট নয়, তবু দৈববাণী হয়েছিল এবং সতীপতিকে আত্মহত্যা থেকে নিবৃত্ত করেই এ-গাছ চুপ করে যায়। কাশীশ্বর, বাচস্পতি মশায়ের ছেলে বড় বেয়াড়া, সহজে ঘাড় নোয়ায় না। সে বলে, 'হ্যাঁ, গাছ দৈববাণী করেছিল। আশী বছর কি এতটা সময়, যে তখন সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটত, এখন আর ঘটে না? আসলে তোমরা আজগুবী উদ্ভুটে কথা বিশ্বাস করবে বলে কাৎ হয়েই আছ।'

তার কথা কেউ নেয় না। এ-গ্রামে কাশীশ্বর বড় একরোখা গোঁয়ার বলে পরিচিত। আর সকলেই বিশ্বাস করে এ-গাছে দেবতা বাস করেন। আনন্দীরাম চিরদিন তাই শুনে আসছেন। এখন দেখেন গাছের নীচে ছোট ছোট গর্ত। এ-গর্তে মাটির গুলী রেখে রাখাল ছেলেরা আটুম-বাটুম খেলে।

নরপতির কুটিরের সামনে এলেন। বুকের নীচে গভীর অস্বস্তি, শরীরে ঘাম হচ্ছে। তবু কাজের ভার নিয়ে এসেছেন। দেখা করতেই হবে।

'নরপতি, বাড়ি আছ?'

এ-প্রশ্ন ঠোঁটের আগে এলেও থামিয়ে দিলেন। বেড়দেওয়া নটেশাক বেগুনের ক্ষেতে নরপতিকে দেখতে পেলেন। লম্বা একটি টেঁটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টেঁটার ফলা রক্তাক্ত। সামনে খড়ের দড়িতে বাঁধা ছোট একটি হরিণের মৃতদেহ। নরপতির বাঁশের মত সিড়িঙ্গে শরীরে, ঝাঁকড়া চুলে, দাঁড়াবার ভঙ্গীতে ঔদ্ধত্য ও অবিনয় যেন ঝকমক করছে। নরপতির চোখে কিন্তু হাসি ফুটে উঠল। এ হাসি দেখে আনন্দী-রামের বুকটা চমকে উঠল, সে দীনতা, ভীরুতা, বেদনা কোথায়

গেল ? এ নরপতি অপরিচিত, স্বাধীন, মদগর্বিত এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

'কি, নরপতির কুঁড়েয় তোমার পা পড়ল যে ?'

উত্তরের অপেক্ষা না করেই নরপতি ডাকল 'ঘরে নে', ছাল আমি ছাড়াব। আর শোন, বুনোপাড়া থেকে লশুন আন্। এ-মাংস লশুনে মজে ভাল।'

আনন্দীরাম কি বলে কথা সুরু করবেন ভেবে পেলেন না। নরপতিকে দেখে তাঁর ব্যাধ বলে মনে হচ্ছিল। একটা রাখাল ছেলে হরিণটার পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। নরপতি টেঁটা ফেলে দিল। বলল, 'কি দরকার ?'

'এতবড়টা ক'রে প্রাণীটাকে মারলে নরপতি ?' আনন্দীরাম আর কোন কথাই খুঁজে পান না। পশু-হত্যা দেখলে তাঁর শরীরের নাড়ী চমকায়, বিশেষত এই দু'দিন ধ'রে গ্রামে যে তাণ্ডব হয়ে গেল, তার প্রতিক্রিয়ায় মাথার উত্তেজনা, মনের অস্বাভাবিক অবস্থা এখনো স্বাভাবিক হয় নি। হরিণের রক্ত দেখে তাঁর নিজের রক্ত চমকাল। নিষ্ঠুরতা দেখতে চিরদিন তাঁর বড় ভয় ? কিন্তু নরপতি ত তাঁদের সকলের চেয়ে কোমল ছিল, মাছ ধরবার কেঁচো বঁড়শীতে বিঁধতে অবধি কষ্ট পেত।

নরপতি হাসল। বলল 'গায়ে দু'দিন রক্তে বান ডাকল, ঘরপোড়া ছাই-এ আকাশ আঁধার হ'ল, এত দেখে তবু মন থির হল না, এটুকু রক্ত দেখে ডর এল ?' তার হাসিতে অবোধ বিস্ময়।

'অবোলা জীব।'

'তা আর নয় ?' নরপতি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল। বলল, 'পুনিকে এনে দিয়েছিলাম, পুনির জান আশ্চর্য আব্দার ছিল, চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে দিতাম, এ ত' হরিণছানা, রামাই-এর শালা ধরেছিল।'

সে বেরিয়ে এল। বলল, 'ঘরে তোমায় বসাই এমন আসন নেই আমার হে, চল ঐ বৃক্ষছায়ে যাই। কাঁঠালগাছের ছায়ায় জেয়াদা ঠাণ্ডা, শরীর নিমেষে জুড়োয়।'

কাঁঠালগাছের ছায়ায় দুজনে বসলেন, বাঁশের মাচার উচ্চাসনে। আনন্দীরামের মনে হল, এ-জায়গায় আশ্চর্য শান্তি, শরীর এলিয়ে আলস্য আসে, গত দু'দিনের প্রলয়ের আঁচটিও লাগে নি কোথাও, নরপতিকে হিংসে হল তাঁর।

'ভালই আছ' মৃদুস্বরে বললেন।

'যা বল।' বাতাসে তুড়ি মেরে নরপতি অস্বস্তি তাড়াল। বলল, 'বড় একটেরে। তা এক পক্ষে ভালই আছি। এই দেখনা বর্গী বেটারা এলে পরে তোমরা কত কাতর হয়েছিলে। আমার তিলেকের ডর ছিল না, ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়, আমার আর কি নেবে বল না !'

সে আবার হাসে। কিন্তু হাসির আড়াল থেকে ধূর্ত, সন্ধানী চাহনী উঁকি মারে। নরপতি শুকনো গলায় বলে, 'এখানে তুমি আমার কুশলসংবাদ নিতে আস নি, তা আমি জানি।'

আনন্দীরাম ধীরে বললেন, 'তোমার কাছে ছুটে এসেছি, বড় আচার্যের হয়ে ভিক্ষে চাইতে এসেছি, তুমি তাঁর প্রাণ রাখতে পার, মারতে পার।'

'বটে। তা বড় আচার্যের মত মানী পুরুষ, কুলপতি তিনি, তাঁর জেয়নকাঠি মরণকাঠি আমার হাতে ? একথা শুনে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে গো। আমি তা'লে মানুষ সামান্য নই ?'

আনন্দীরাম বড় বিপন্নবোধ করেন। নরপতি গত পাঁচ-সাত বছরে একটি আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব অর্জন করেছে। তাকে কিছুতে স্পর্শ করতে পারছেন না তিনি, বর্মের আড়ালে আসন নরপতি বসে।

'তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, পাঠশালার থেকে' বলেই তিনি ঠোঁট কামড়ান। বন্ধুর কাজ করেন নি, ওর বিপদের দিনে চরম ভীরুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এখন দুর্বলের মত মিনতি জানাতে লজ্জা পান।

নরপতি আবার হাসে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সভ্যভব্যভাবে কথা বলছিল, এখন সহজ ভাষায় নেমে আসে। বলে, 'কেউ কারো সেথো লই, আমরা মুখোটির পো ; কেউ কারো বন্ধু লই। বড় আচার্যের প্রাণ দেই এমন জেয়নকাঠি আমার হাতে নাই।'

সে হাত উল্টোয়। তার মণিবন্ধ স্ফীত, পথচিহ্নের জন্যে রাজমহল থেকে আনানো পাথরফলকের মতন সুগঠিত। দৃঢ়।

'এ হাত ব্রাহ্মণের নয় আনন্দী', নরপতি ধীরে বলে, 'এখন আমি খরা মারি, বরা মারি, রক্ত দেখে সুখে হাসি, কিন্তু সে-কথা থাক। তুমি আমার হরিণের বেত্তান্ত শোন।'

(ক্রমশঃ)

কিষান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩,ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট,কলিকাতা-১

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"বাঙালীর বাণিজ্য, বাঙালীর শিল্প, একদিন ভাগীরথীর দুই পারের দুই বর্ধিষ্ণু জনপদকে কেন্দ্র করেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।"

হুগলী।

হাওড়া। আর—

বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া। জননী জাহ্নবীর দুই তীরবর্তী জেলা হুগলী-হাওড়া আর পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙালীর বাণিজ্যের ইতিহাস হুগলীর গঙ্গার পুরু শ্যাওলার আস্তরণ পড়া ঘাটে ঘাটে থরে থরে জমে রয়েছে। এই গঙ্গার স্রোত বেয়েই এসেছিল পর্তুগীজ, ওলন্দাজ আর ইংরেজ। এই অঞ্চলেই গড়ে তুলেছিল তারা উপনিবেশ। এখানেই তারা ব্যবসার প্রয়োজনে বসবাস করেছিল। বিদেশীর সংস্পর্শে এসে এখানকার বহু বাঙালী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এসেছিল ও বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

হুগলী শহরের গা ঘেঁষে বারো মাস নৌবহনযোগ্য নদী ভাগীরথী। কাজেই হুগলী-চুঁচুড়া প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান। চুঁচুড়া থেকে কিছু দূরে মগরা। এই মগরায় বহু জোতদার আর মধ্যবিত্ত লোক ধান, চাল, গোল আলু, খৈল, কলাই, পাট প্রভৃতির ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

মগরা থেকে আসুন হাওড়ার দিকে আরও দক্ষিণে। তারকেশ্বরে এসে আপনাকে থামতে হবে। এখানকার তারকেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত। বিখ্যাত শিবরাত্রির মেলা। লোক আসে উত্তর প্রদেশ থেকে, আসে পাঞ্জাব থেকে, আসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে। বাঙালী সওদাগরেরাও এই মেলায় আসে। হরেক রকম জিনিসের সওদা দিয়ে তারা পসরা সাজায়। এই সময় দু পয়সা তাদের ঘরে আসে। কিন্তু তারকেশ্বরের মেলায় বাঙালীর বাণিজ্যের কাহিনীও পুরনো। আজও পুরনো দিনের মত তারকেশ্বরে মেলা বসে। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত কিছু কিছু বাঙালী কৃষক শ্রেণীর লোক—কিছু মনোহারীর দোকানের মালিক আসে—আর বেশির ভাগই অবাঙালী ব্যবসাদার।

তারকেশ্বরের খ্যাতি আছে আজও তার মন্দিরের জন্য। তার শিবরাত্রির মেলার খ্যাতি আজ আর ততটা নেই। আজ তারকেশ্বরের চারিদিকে কলকারখানায় ভরে গেছে। যাকে বলে শিল্পাঞ্চল। আজ এখানকার বাঙালী মজুর খাটে কলে। ব্যবসা করে না। করে না বললে ভুল হবে—যা করে তা খুব উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

শ্রীরামপুর। গঙ্গাতীরের বহু প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত বর্ধিষ্ণু শহর। বাঙালীর সাহিত্য, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর সংস্কৃতি,

বাঙালীর বাণিজ্য একদিন এই সুপ্রাচীন জনপদ থেকেই দিকে দিকে প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। এখানেই বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল আর বঙ্গেশ্বরী কটন মিল দুটি কারখানা বাঙালীর বাণিজ্যপটুতার নিদর্শন স্বরূপ গড়ে উঠেছিল। খাঁটি বাঙালী প্রতিষ্ঠান।

শেওড়াফুলি আর একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানকার হাট খুব বিখ্যাত। এখনও ব্যবসায়ী শ্রেণীর মুখে শোনা যায়, শেওড়াফুলির হাটের কথা। এই শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর লাইন সুরু। তাই শেওড়াফুলি জংশন। এখানকার হাট শুধু প্রাচীন নয়, বড়ও—বেশ বড়। বড় বড় মহাজনরা জিনিস পাইকারী বিক্রি করে। তারপর এই জিনিস চলে আসে কলকাতায়। এই মহাজন ও পাইকারী ক্রেতারা অনেকেই বাঙালী।

বৈদ্যবাটী। কলকাতা থেকে ট্রেনে চুঁচুড়া যাওয়ার পথে দেখা যায় বহু বাগানে সতেজ পুষ্ট কলাগাছের অপরূপ শোভা। এই বাগানের মালিকরা অধিকাংশই বাঙালী। শুধু কলা নয়—এখানকার লাউ, কুমড়োও বিখ্যাত। বহু বাঙালী শুধু তরকারী বিক্রি করেও কিছু আয় করে।

চন্দননগর। বহুদূর অতীত থেকে এই শহর অদ্ভুত একটা বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। সুগঠিত ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভেতরে একটি পকেটের মত ফরাসী শহর। (এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত চন্দননগর ফরাসীদের অধীন ছিল।) ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল বলেই বাঙালীদের ব্যবসা বহুদূর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। এখানকার প্রাচীন-কালের বস্ত্রবয়নকারীদের নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। ফরাসডাঙ্গার ধুতি—এই নামটা আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। এই ফরাসডাঙ্গার ধুতির সৃষ্টিকারীরা ছিল চন্দননগরের বাঙালী অধিবাসী।

হাওড়া। এ জেলাও গঙ্গাতীরবর্তী বর্ধিষ্ণু জনপদ। বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল। যত বিখ্যাত কলকারখানা সব এই হাওড়ায়। কিন্তু ফ্যাক্টরীর চিমনীর ধোঁয়ায় আকাশ যখন কালো হয়ে ওঠে নি, যখন অজস্র কলকারখানার ময়লা জলে গঙ্গার গৈরিক জলরাশি মলিন হয়ে ওঠে নি, তখন উলুবেড়িয়া আর আন্দুলের বাঙালী বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা অভূতপূর্ব নৈপুণ্যে আর শান্ত মনে তাঁত বুনতো। ফাইন বা সুপারফাইন কাপড়ের জন্য বর্তমান আন্দুলবাসীদের মত কোন মিলের কাপড় খুঁজতে হতো না, তারা আন্দুলে বসেই স্বস্থানের তাঁতীদের তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্র পেয়ে যেত।

মইমন—হাওড়ার আর একটি বর্ধিষ্ণু স্থান। এখানকার অধিবাসীদের ভেতরে কেউ কেউ কাগজ তৈরি করতো। তাদের বলা হতো 'কাগজী'। মইমনের কাগজীরা প্রত্যেকে বাঙালী ছিল।

'উলুবেড়িয়ায় কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য অধিক ছিল'—পুরনো একটা পুঁথিতে লিখছে। এখানকার বাঙালী মৃৎশিল্পীরা একদিন অদ্ভুত সুদৃশ্য মাটির হাড়ি আর কলসী তৈরি করতো। গঙ্গায় বজরা ভাসিয়ে অনেক দূরদেশ থেকে ব্যাপারীরা কিনতে আসতো এই পণ্যদ্রব্য। সেদিন বাঙালী কুম্ভকারদের ঘরে ঘরে চাক ঘুরতো। চাকের অবিরাম ঘূর্ণনের ভেতরে একদলা মাটি থেকে মূর্তি ধরে উঠতো কলসী, হাঁড়ি, গ্লাস। মাঠে মাঠে সবুজ আশীর্বাদের মত দেখা যেত স্বাস্থ্যঘন হোগলা ঘাস। এই হোগলা ঘাস থেকে মাদুর তৈরি করতো সেকালের উলুবেড়িয়ার বাঙালী শিল্পীরা। নারীপুরুষ, শিশুবৃদ্ধ এই শিল্পে নিয়োজিত হতে পারতো। এখানকার হোগলার মাদুর কলকাতায় চালান করে বাঙালী ব্যবসায়ীরা দু-পয়সা লাভ করতো। সাঁত্রাগাছিও একটি সুবিখ্যাত শিল্পাঞ্চল। এখানকার অনেক বাঙালী কাচের কারখানায় কাজ করে। আরও—

আরও আছে—হাতীপাড়ার ওল। সুস্বাদু ওল। কলকাতায় রপ্তানী করে বাঙালী গৃহস্থরা কিছু পয়সা পায়। ব্যবসা ছাড়াও সুদূর অতীতকাল থেকে হাওড়া একটি বর্ধিষ্ণু শিল্পাঞ্চল। গেজেটিয়ার বলে:

Hand industries of village handicrafts employing 70,000 people.

এই 'হ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজে'র ভেতরে আছে বিখ্যাত তাঁতের কাপড়। আজও হাওড়ার বাঙালী তাঁতীরা তাদের ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হয় নি। তারা আজও তাঁতে কাপড় বোনে। আর হাওড়ার হাটে আসে। তাদের কাছ থেকে কলকাতার পাইকাররা কাপড় কিনে নিয়ে আসে কলকাতায়। যখন হাওড়ায় এত কলকারখানা হয় নি—তখন কিন্তু কুটিরশিল্পের ওপর নির্ভর করে বাঙালীরা স্বাধীনভাবে উপার্জন করতো।

বিখ্যাত পরিব্রাজক সিজার ফেডারিসি হাওড়া পরিদর্শন করে বলেছেন, বিভিন্ন রকমের কাপড় এখানে তৈরি হয়। একটা হাতে তৈরি কাপড়ের (শাড়ি ও ধুতি) দাম এক টাকা কি দেড় টাকা ছিল বড় জোর। কিন্তু মেশিনে তৈরি কাপড়ের যুগ নিয়ে এল সস্তায় সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার। একটা ভাল শাড়ি বড়জোর এক টাকা কি আট আনা। তাই তাঁতশিল্পের ওপর নেমে এল দুর্দিনের অন্ধকার। কিন্তু ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, কানা-নদীর ঘরে ঘরে একদিন তাঁতের খটাখট শব্দ শোনা যেত। শুধু কি তাঁত, ১৯০১ সালে শুধু মৃৎশিল্পই ১৬৫০ জন লোকের পেটের ভাত জোগাত এই হাওড়া জেলায়।

কিন্তু হাওড়ার আকাশ যখন কাপড়ের কল, পাটের কলের ধোঁয়ায় কালো হয়ে উঠল, তখন মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া বাঙালী ব্যবসা আর কুটিরশিল্পকে ভুলতে লাগল। অনিশ্চিত উপার্জনের আশঙ্কা, কঠোর পরিশ্রমের পথ ছেড়ে রুটিন বাঁধা নিয়মে কলে খেটে খাওয়া মজুর হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

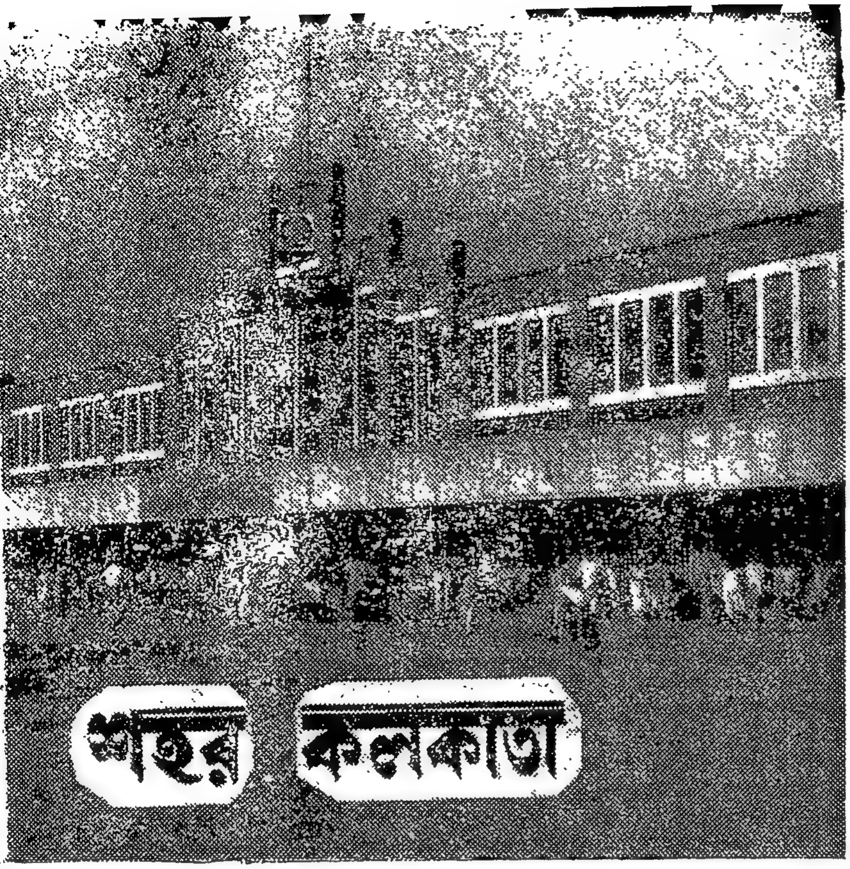

● শিয়ালদহ মেন স্টেশন

॥ শিয়ালদহ এবং তার পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন কালের রূপ-রেখা ॥

এ-কালে আর শিয়াল ডাকে না শিয়ালদহে। কিন্তু এককালে ডাকতো—যখন এক প্রাকৃতিক দহের পরিবেষ্টন ছিল আগাছাকীর্ণ অঞ্চলে। তখন কোনো লোকালয় ছিল না দহের আশেপাশে। তবে দহ থেকে খানিক দূর—পূর্বদিকেই ছিল সারপল্লী। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কৃষক এবং তন্তবায়-সমাজের নির্বিরোধ সমাবেশে সমগ্র গ্রাম বেশ বৈচিত্র্যময়। নানাবিধ পার্বণোৎসবের মধ্যে অঘ্রাণের নবান্নোৎসবই ছিল এখানে প্রধান। সেদিন ঘরে ঘরে শাঁখ বাজতো আর সারা গাঁয়ের বাতাস নেচে উঠতো ফুল্ল-উলুধ্বনির ছন্দে। ধানীরঙের কাপড় প'রে মেয়েরা আসতো ধানক্ষেতে। লক্ষ্মীর কোনো বিগ্রহ নেই। ক্ষেতের প্রতিটি ধানগাছই তাদের লক্ষ্মী। তাই গাছের গোড়ায় তাঁরা সিঁদুর পরাতো, চন্দন মাখাতো এবং শাঁখের সঙ্গে সমস্বর উলুধ্বনিতে বরণ ক'রে নিতো সংবৎসরের চপলা লক্ষ্মীকে। তারপর ফিরে আসতো ঘরে। এ-ঘরের পরিবার যেতো ও-ঘরে এবং ও-ঘরের পরিবার আসতো এ-ঘরে। এভাবেই নিমন্ত্রণ রক্ষার পালা চলতো প্রায় সমস্ত দিন এবং রাত। তা ছাড়া রাতেই ধানক্ষেতের পাশের ময়দানে আসর বসতো গানের। লক্ষ্মী-বরণের গান। নেচে নেচে গান গাইতো গাঁয়ের যুবক-সমাজ। সারারাত বিভোর হয়ে তা উপভোগ করতো আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। কত সুন্দর, কত নিখুঁত ছিল তাদের উৎসব। তেমন আড়ম্বর কিছু ছিল না, অথচ ছিল অনাবিল

শ্রীপদাতিক

আনন্দের অপরিসীম ব্যাপ্তি, মধুর সখ্যের অন্তহীন আকুতি এবং নিবিড় আত্মীয়তার গভীর আবেগ—যা একালের কৃত্রিম পরিবেশে দাঁড়িয়ে কল্পনা করলে সত্যিই অবাক লাগে।

সারপল্লী নামে যে-প্রাচীন গ্রামের কথা এখানে উল্লেখ করছি—তার অস্তিত্ব ছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসর আগে। শোনা যায়: তারও আগে, অর্থাৎ সারপল্লী গ্রামের পত্তন ঘটার পূর্ববর্তী সময়ে সমগ্র অঞ্চল ছিল গভীর অরণ্যে আকীর্ণ। অরণ্য তখন শ্বাপদ-সংকুল হলেও, তার গভীর দেশে আস্তানা ছিল একদল ডাকাতের। এবং এই ডাকাতরাই ছিল তখন অরণ্যের একমাত্র শাসক। তাদের দলপতির নাম ছিল রাঘব। অনেকের মতে, পরবর্তী কালে ডাকাত-দলপতি রাঘবই সারপল্লী গ্রামের পত্তন ঘটায়। রাঘব সম্পর্কে একটি চমৎকার কাহিনী প্রচলিত আছে একালেও। কাহিনীটি বর্তমান নিবন্ধকারের ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে এই:

রাঘব তার দলবল সহ একবার ডাকাতি করতে যায় গঙ্গার পশ্চিম পারের কোনো এক জমিদারবাড়িতে। ডাকাতি সে নির্বিঘ্নেই করে। কিন্তু ফিরে আসার সময় সে-অঞ্চলের সম্মিলিত অধিবাসীদের হাতে হঠাৎ ধরা পড়ে রাঘব। তার দলের সবাই পালিয়ে আসার সুযোগ পায়। কেবল রাঘবই একা ধরা প'ড়ে যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ সহ্য করে সমস্ত রাত। তারপর রাতের শেষে প্রত্যূষেই সে-অঞ্চলের অধিবাসীরা তাকে উপস্থিত করায় জমিদারের সামনে। সুদর্শন প্রৌঢ় জমিদার নীরবেই খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন বলিষ্ঠ রাঘবের চোখের দিকে। তারপর মনে কী যেন ভেবে রাঘবকে একা এক ঘরে আটক রাখার জন্য নির্দেশ দেন পাইকদের। পাইকরা জমিদারের আদেশ পালন করে যথারীতি। জমিদারবাড়ির এক নিভৃত কক্ষে একে একে তিনদিন অনাহারেই আটক থাকে রাঘব। এভাবে আটক থাকার পর, সে যখন সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়ে অতিমাত্রায়—তখন দরজা খুলে ধীর পদক্ষেপে তার সামনে আসেন জমিদার। তিনি এসেই জানতে চান: রাঘবের ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে কিনা।

পর পর তিনদিন অন্ন-জল স্পর্শ করার কোনো সুযোগ না পেয়ে রাঘব ভেবেছিল: জমিদার হয়তো এভাবেই তাকে হত্যা করবেন। কিন্তু পরে যখন জমিদার নিজেই এসে জিজ্ঞেস করেন: তার ক্ষুধা পেয়েছে কিনা—তখন সে অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে এবং অতি পরিক্লান্ত স্বরে কিছু খাদ্য-সামগ্রীর জন্য মিনতি পেশ করে জমিদারের কাছে। জমিদার

তাঁকে কক্ষের বাইরে এনে বলেন স্নান করতে। জমিদারের নির্দেশে মন্ত্রমুগ্ধের মতোই শীতল জলে স্নান করে রাঘব। তারপর জমিদার-প্রদত্ত নতুন কাপড় পরিধান করে, জমিদারের সঙ্গেই সে দেবালয়ে এসে উপস্থিত হয়। ধীরে ধীরে। দেবালয় তখন ধূপের গন্ধে আমোদিত এবং মুখরিত গম্ভীর শঙখধ্বনিতে। সিংহবাহিনীর বিশাল প্রতিমার দিকে চোখ রেখে রাঘবকে ধ্যানস্থ হওয়ার নির্দেশ দেন জমিদার। মন্ত্র-চালিতের মতোই ধ্যানস্থ হওয়ার চেষ্টা করে রাঘব। ধূপের গন্ধ, একটানা গম্ভীর শঙখধ্বনি এবং সেই সঙ্গে জমিদারের সুললিত কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে সত্যিই এক সমাহিত ভাব এসে আচ্ছন্ন করে রাঘবের সমগ্র সত্তাকে। অনেকক্ষণ পর, শঙখ-ধ্বনি থেমে যেতেই যখন আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে ওঠে রাঘব, তখন সে অনুভব করে এক অলৌকিক অনুভতি।

তারপর সেই অলৌকিক অনুভতি নিয়েই পূজান্তে জমিদারের সঙ্গে আহারে বসে রাঘব। আহার-পর্ব সমাধা হয় নীরবেই। তারপর জমিদারের নীরব ইঙ্গিতেই একজন পাইক রাঘবকে নিয়ে যায় ভিন্ন এক কক্ষে—যেখানে শয্যা পাতা দেখেই রাঘব বুঝতে পারে: জমিদার তাকে বিশ্রাম করার নির্দেশ দিয়েছেন।

নরম শয্যায় দেহ এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ক্লান্ত রাঘব। তারপর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই হঠাৎ সে স্বপ্নে দেখে: রোষান্বিতা সিংহ-বাহিনী ক্ষুরধার খড়্গে দ্বিখণ্ডিত করতে চান রাঘবকে। কিন্তু জমিদার দক্ষিণ হস্তে দেবীর তীক্ষ্ণধার খড়্গের গতি রোধ ক'রে বাম হস্তে সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছেন রাঘবকে।....এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের পরেই ঘুম ভেঙে যায় রাঘবের। ঘর্মাক্ত কলেবরে কাঁপতে-কাঁপতেই সে ছুটে আসে জমিদারের কাছে। তারপর জমিদারের যুগল চরণোপান্তে আছড়ে প'ড়েই বলে: হে মহাপ্রভু, তুমি আমায় রক্ষা করো!

জমিদার স্নিগ্ধ হেসে রাঘবকে টেনে নেন বুকে। তারপর ধীরে ধীরে বলেন: তুমি ফিরে যাও তোমার আস্তানায়। সেখানে যদি সবাই তোমরা পাপ কাজ থেকে নিবৃত্ত হয়ে নিষ্পাপ জীবন সুরু করো সৎ পথে, তা হলে দেবীর অপার কৃপা তোমরা পাবে। দেবী তোমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

সুতরাং আর কালবিলম্ব না ক'রে সেদিনেই তার আস্তানায় ফিরে আসে রাঘব। ফিরে এসেই সে তার দলের সামনে বর্ণনা করে জমিদারবাড়ির বিচিত্র ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত—যা শ্রবণান্তে দুর্ধর্ষদের বিস্ফারিত চোখে-চোখে সত্যই ঘনিয়ে আসে এক গভীর শংকার ছায়া। ফলে সহজেই তারা গ্রহণ করে রাঘবের প্রস্তাব। অর্থাৎ পরদিন থেকেই তারা তাদের দস্যুবৃত্তি পরিহার ক'রে সৎপথে নতুন জীবন সুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে একে একে।

রাঘবের নির্দেশেই দস্যুদল অরণ্য সংস্কার ক'রে উদ্ধার করে আবাদী জমি। তারপর চাষাবাদের মাধ্যমেই সূত্রপাত ঘটে তাদের নতুন জীবন-যাত্রার। আবাদী জমির পাশেই গ'ড়ে ওঠে নতুন বসতি। দিনে দিনে দস্যুদলের এই নতুন বসতির আকর্ষণেই দূর-দূরান্তের আরও অনেক কৃষক এবং সেই সঙ্গে কিছু তন্তুবায় পরিবার এসে বসবাস সুরু করে সেখানে। তারপর কালে কালে, সে-বসতি এভাবেই এক শ্রীবৃদ্ধির রূপ পরিগ্রহ ক'রে এক সময় নাম ধারণ করে সারপল্লী।

সারপল্লীর পত্তন সম্পর্কে উল্লেখিত যে-কিংবদন্তীর প্রচলন আছে—জানি না তার মধ্যে ইতিহাসের কোনো উপকরণ আছে কিনা। তদানীন্তন কোনো জমিদারের বদান্যতা অথবা মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যেও এমন এক কাহিনী গ'ড়ে ওঠা বিচিত্র নয়। তবে রাঘব নামে কোনো ডাকাতের দ্বারাই যে সারপল্লীর পত্তন ঘটেছিল—এমন কথা আজ দৃঢ়তার সঙ্গে অনেকেই ব'লে থাকেন।

কালের পর কাল কেটে যায় সারপল্লীর। দীর্ঘ কালের পর আরও অনেক সুদীর্ঘ কাল অতিক্রান্তির পর, সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

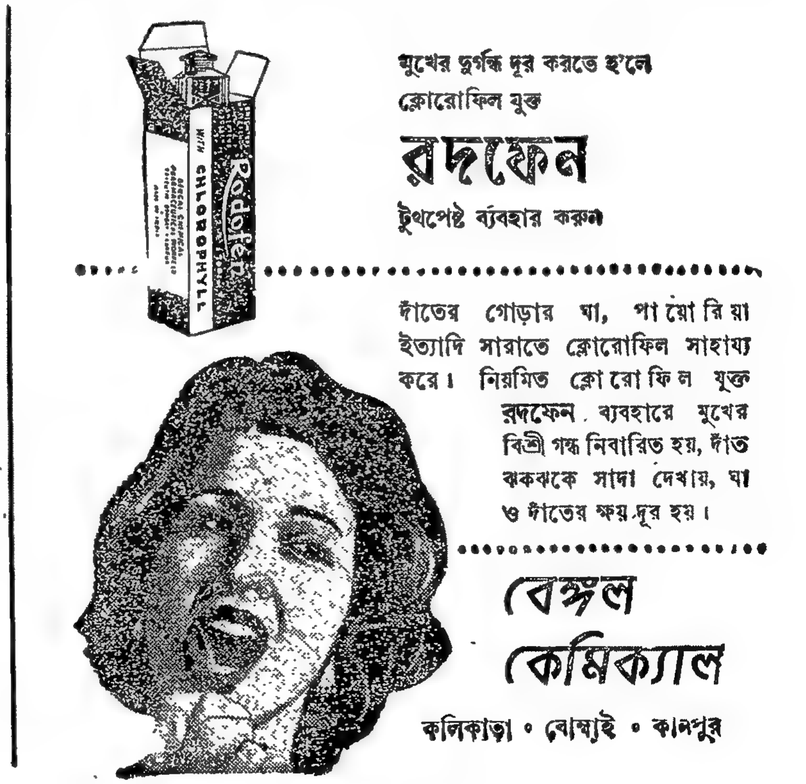

শিয়ালদহ আদালত ভবনের একাংশ

অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র এক সুদৃশ্য বাগানবাড়ির প্রতিষ্ঠা করেন সারপল্লীর একাংশে। রাজা পীতাম্বর মিত্রের আদি নিবাস মেছুয়াবাজার অঞ্চলে। পরে মেছুয়াবাজার অঞ্চলের বসতবাটী ত্যাগ ক'রে তিনি সারপল্লীর বাগানবাড়িতে এসেই বসবাস সুরু করেন সপরিবারে। তাঁরই প্রচেষ্টায় বসতিগত দিক থেকে সারপল্লীর রূপান্তর ঘটে প্রভূত। দিনে দিনে বিশেষ এক বর্ধিষ্ণু এবং সুদৃশ্য জনপদরূপে সারপল্লী তার আদি নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে হঠাৎ একদিন নাম ধারণ করে 'শুঁড়ো'। এই 'শুঁড়ো' নামের পশ্চাৎপটের প্রকৃত ইতিহাস ঠিক কী—আজ তা আবিষ্কার করা দুষ্কর। পরে শুঁড়ো পল্লীতেই ব্যাপক আকারে সাড়ম্বর রাস-উৎসবের প্রবর্তন করেন রাজা পীতাম্বর মিত্র। এ-সম্পর্কে হরিহর শেঠ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন:

'শিয়ালদহের পূর্বে যে-সারপল্লী নামক প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ আছে, তাহাই পরে শুঁড়ো বলিয়া পরিচিত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র তাঁহার মেছুয়াবাজারের বাটী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে উদ্যান-ভবন নির্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি তথায় সুপ্রসিদ্ধ রাসোৎসবের প্রবর্তক।'

রাজা পীতাম্বর মিত্রের প্রবর্তিত রাসোৎসব সেকালে যে সত্যই খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতো—তার উল্লেখ আছে আরও একাধিক পুরাতত্ত্ববিদের গ্রন্থে। এই রাসোৎসব উপলক্ষেই সেখানে মেলা বসতো—যা স্থায়ী হতো প্রায় মাসাধিককাল। মেলায় এসে আসর জমাতো দূর-দূরান্তরের কবিয়াল, বাউল এবং বৈরাগী। তাদের আকর্ষণেই সেখানে সমাবেশ ঘটতো হাজার হাজার লোকের—যাদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসে সমগ্র শুঁড়ো অঞ্চল যেন সত্যই প্রতিষ্ঠা পেতো এক প্রাণবন্ত মূর্তিতে।

শোনা যায়: একবার রাসোৎসবের সময়েই শুঁড়ো পল্লীতে হানা দেয় বর্বর বর্গীদল। তাদের আকস্মিক আক্রমণে বিপুল সন্ত্রাসে সোরগোল ওঠে সমগ্র মেলায়, ঘরে ঘরে হাহাকার জাগে বিপন্ন নরনারীর। তাই সেদিন সুরক্ষিত মহলে নীরবে আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব হয় নি রাজা পীতাম্বর মিত্রের পক্ষে। তিনি তাঁর সুশিক্ষিত পাইকদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং মুখোমুখি হন বর্গীদলের। বিক্ষিপ্তভাবে সংঘর্ষ চলে অনেকক্ষণ। শেষে সুশিক্ষিত পাইক এবং গ্রামের কিছুসংখ্যক লাঠিয়ালের সহায়তায় রাজা পীতাম্বর মিত্রই জয়ী হন। আংশিক লুঠ-তরাজ করেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় বর্গীকুল।

কিন্তু বর্গীরা পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, সেদিন বিশেষভাবেই ভাঁটা পড়ে রাসোৎসবের মেলায়। দূর-দূরান্তর থেকে মেলায় যোগ দিতে এসেছিল যে-সমস্ত নরনারী—তারা ভয় পেয়েই ফিরে যায় তাদের নিজ নিজ গ্রামে। এমন কি, শুঁড়োপল্লীতেও রাসোৎসবকে কেন্দ্র ক'রে আগের মতো আর উৎসাহ জাগলো না। কারণ পল্লীবাসীরা বর্গীদল কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে অনেকেই। তা ছাড়া লুণ্ঠিত হয়েছে অজস্র পরিবারের নানাবিধ সংরক্ষিত সম্পদ। তাই কোনো উৎসব বা মেলার প্রতি পল্লীবাসীদের যে কোনো উৎসাহ থাকা সম্ভব নয়—তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু রাজা পীতাম্বর মিত্র অত সহজেই দমবার পাত্র ন। তাঁর প্রবর্তিত রাসোৎসব এভাবেই বিনষ্ট হবে—তা তিনি মেনে নিতে পারলেন না। প্রথমেই তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ করলেন নিজ পল্লীবাসীদের। তারপর তিনি কয়েক সহস্র লোকের জন্য বিশেষ এক উপাদেয় ভোজনোৎসবের আয়োজন ক'রে পাইকদের মারফৎ আমন্ত্রণ পাঠালেন দূর-দূরান্তের গ্রামে। অতএব ভোজনের আকর্ষণেই হোক, অথবা রাজার সহৃদয় আহ্বানে সাড়া দেবার উদ্দেশ্যেই হোক, দূর-দূরান্তের হাজার হাজার

লোক এসে আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে মেলার। শুঁড়ো পল্লীর অধিবাসীরাও যথারীতি আবার নতুন উদ্দীপনায় আনন্দ বর্ধন করে উৎসবের।

শুঁড়ো পল্লীতে রাজা পীতাম্বর মিত্রের পরবর্তী বংশধরদেরও বসবাস অনেক কালের। আজ শুঁড়ো পল্লী নাম রূপান্তরের মাধ্যমে বেলেঘাটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃহত্তর কলকাতার অঙ্গ-স্বরূপ হলেও, মিত্র রাজবংশের স্মৃতি বহন করছে সে আজও। রাজা পীতাম্বর মিত্রের উত্তরপুরুষ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নামেই আজও নামাঙ্কিত রয়েছে বেলেঘাটার এক উল্লেখযোগ্য রাস্তা—যে-রাস্তার উভয়-দিকেই বিস্তার ঘটেছে সম্ভ্রান্ত বসতির। তবে অঞ্চলগত দিক থেকে সেকালের শুঁড়ো পল্লী বা একালের বেলেঘাটার সেই বিশেষ অংশ আজও তেমন পরিমার্জিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। তবে মহানগরের সঙ্গে যখন তার সংযুক্তি ঘটেছে, তখন আশা করা যায়, দিনে দিনে সে উন্নতির প্রসাদ পাবে যথোপযুক্তই। ইতিমধ্যেই তার অনেকটা মর্যাদা বাড়িয়েছে আই ডি হাসপাতাল, ডাঃ বিধান রায় পোলিও ক্লিনিক এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক নির্মিত সারিবন্দী ভবনসমূহ। তা ছাড়া বিশাল এলাকা জুড়ে সুবৃহৎ এক লেকেরও খননকার্য সুরু হয়েছে। হয়তো আর কিছুকাল পরেই তা ঢাকুরিয়া লেকের মতো সমগ্র অঞ্চল জুড়ে পত্তন ঘটাবে এক সুদৃশ্য পরিবেশের।

যে-কালে রাজা পীতাম্বর মিত্র বাগানবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন শুঁড়ো পল্লীতে, ঠিক সে-কালেই শিয়ালদহের সেই জঙ্গলাকীর্ণ দহ মজে যায় সম্পূর্ণ। তারপর মজা দহই দিনে দিনে ভরাট ক'রে সেখানে বিক্ষিপ্ত বসতির পত্তন ঘটায় তদানীন্তন মজুরশ্রেণী। অবশ্য মজুরশ্রেণীর পাশাপাশি কিছু বিত্তশালীরও আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু প্রভাব বজায় থাকে তাদেরই—বিত্তের সঙ্গে যাদের শত্রুতা চির-জনমের।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিয়ালদহের সার্বিক পরিবর্তন ঘটে রেলওয়ে স্টেশন স্থাপিত হওয়ায়। সম্ভবত শিয়ালদহের প্রধান আকর্ষণই হলো এই রেলওয়ে স্টেশন। প্রথম দিকে তা ছিল নেহাতই সঙ্কুচিত এবং তার লাইনের বিস্তৃতি ছিল কেবলমাত্র ক্যানিং পর্যন্ত। কিন্তু পরবর্তী-কালে প্রয়োজনবোধেই সে বৃদ্ধি করে তার কলেবর এবং তার সর্বতোমুখী লাইন ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায় এবং ভারতের বিশেষ বিশেষ অংশে। এখন এই বিশাল স্টেশন তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ মেন, দ্বিতীয় ভাগ নর্থ এবং তৃতীয় ভাগ সাউথ। দিনে দিনে এ-অঞ্চলে রেল-কর্মচারীদের প্রয়োজনেই মাথা তুলে দাঁড়ায় অজস্র লাল ইটের আবাস-গৃহ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-ভবন। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একদিকে ক্রেম ব্রাউন ইনস্টিটিউট, নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট এবং অন্যদিকে বি আর সিং হাসপাতাল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে শিয়ালদহ স্টেশন আরও অনেক মর্যাদা-সম্পন্ন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হওয়ায়।

শিয়ালদহের অন্যতম আকর্ষণ আদালত। এ-আদালতকে মফস্বলের কোনো মহকুমা আদালতের মতোই মনে হয়। শহরের এক বিশেষ অংশে তার অধিষ্ঠান ঘটলেও, তা যেন শহুরে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এলাকা তার সামান্য। অথচ এই সামান্য এলাকাতেই সমাহার ঘটেছে বৃক্ষ-শ্রেণীর। মফস্বলের মতোই বিভিন্ন বৃক্ষের ছায়াতলে এসে প্রতীক্ষা করে আসামী, ফরিয়াদী এবং সাক্ষ্যদানকারীর দল। মাটির ভাঁড়ে চা খায় সেখানেই। তারপর ডাক পড়লেই সেখান থেকে তারা প্রবেশ করে বিচার-কক্ষে।

আদালতের দক্ষিণ দিকেই শহর-কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত হাসপাতাল এবং কলেজ। প্রথম দিকে এই হাসপাতাল এবং কলেজ নামাঙ্কিত ছিল বিদেশী ক্যাম্বেলের নামে। কিন্তু বর্তমানে তা স্মৃতি বহন করছে এ-দেশের অবিস্মরণীয় সন্তান ডাঃ নীলরতন সরকারের। বর্তমানে প্রয়োজনবোধেই তার কলেবর বাড়ছে দিনে দিনে এবং অধুনা-নির্মিত একাধিক উদ্ধত গৃহের নবীন সন্নিবেশ যেন এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশে।

ডাঃ নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের বিপরীত দিকে আজকাল একটি ডেণ্টাল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সম্ভবত এটিই একমাত্র ডেণ্টাল কলেজ শহর-কলকাতার। আজ থেকে মাত্র কয়েক বৎসর আগেই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ডাঃ আর আহমেদের নেতৃত্বে। সম্ভবত ডাঃ আহমেদই ছিলেন এই ডেণ্টাল কলেজ-প্রতিষ্ঠার প্রধান পুরোধা। তাই কলেজের এক বিশেষ কক্ষে বর্তমানে সংস্থাপন ঘটেছে তাঁর একটি মর্মর-মূর্তির।

ডেণ্টাল কলেজের পাশেই আছে লরেটো স্কুল, প্রাচী প্রেক্ষাগৃহ এবং একাধিক বাজার। আরও উত্তরে টাওয়ার হোটেল এবং অসংখ্য বিপণির বিশৃঙ্খল বিস্তার ঘটেছে পাশাপাশি। সম্ভবত একাধিক বাজার, হকার-কর্নার এবং সর্বোপরি স্টেশনের সংস্থাপন ঘটায় শিয়ালদহের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকে না কোনোদিনও। বিপর্যস্ত ভিড়ের দরুণ হামেশাই এক ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ ক'রে নিদারুণ বিপদকে আমন্ত্রণ জানায় সমস্ত রাস্তাঘাট। এ-অবস্থা চ'লে আসছে অনেকদিন থেকেই। অথচ এ-অঞ্চলের সঙ্গে নাগরিক সমাজের এক বৃহৎ অংশের সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য। শোনা যাচ্ছে : নাগরিক সমাজের কল্যাণার্থেই এ-অঞ্চলের এই জটিল অবস্থার উচ্ছেদ-কল্পে রাজ্য সরকার নাকি এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন অনেককাল আগেই। কিন্তু আজও তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয় নি। কবে, কোন্-কালে এবং কোন্ সুদূরের ভবিষ্যতে সরকার তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে মূর্তিমান করার চেষ্টা করবেন---ভুক্তভোগী নাগরিক সমাজের পক্ষে তা অনুমান করাও দুঃসাধ্য।

গ্রন্থ মেলা

ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর ঃ সম্পাদক ঃ গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। জয়ধ্বনি প্রকাশনী, ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। মূল্য ঃ তিন টাকা।

ছেলেদের উপযোগী পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বাংলা দেশে অঙ্গুলিমেয়। আবার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ঐ ধরণের পত্রিকায় সম্পূর্ণাকারে উপন্যাস নেই বললেই চলে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে 'জয়ধ্বনি' ছেলেদের আনন্দের কারণ হবে। এতে আছে মোট চারটি উপন্যাস। তা ছাড়া রয়েছে বড় গল্প, গোয়েন্দা কাহিনী, ঘনাদার গল্প, উপকথা, জীবন-কথা, হাসির গল্প, গুপ্তচর কাহিনী, উদ্ভট কবিতা, বিশ্বমেলা, চলচ্চিত্র, কার্টুন প্রভৃতি। লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, শিবরাম চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, মনোজিৎ বসু, প্রাণতোষ ঘটক প্রভৃতি। রেবতী ভূষণ ও শৈল চক্রবর্তীর কার্টুনগুলি চমৎকার।

শ্রীচরণেষু ঃ সম্পাদক ঃ ননীগোপাল দত্ত। ৪বি, রাজা কালীকৃষ্ণ লেন, কলকাতা-৫। মূল্য ঃ পঁচাত্তর পয়সা।

শ্রীচরণেষু আশ্বিন সংখ্যাটিতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য উপযুক্ত রচনা লিখেছেন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকবৃন্দ। লেখকদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, স্বপনবুড়ো, গোপাল ভৌমিক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবজাতক ঃ সম্পাদিকা ঃ মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম এ্যাভেনিউ, কলকাতা-১৯। মূল্য ঃ দু টাকা।

নবজাতকের শারদীয় সংখ্যাটিও কোনরকম ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত হয় নি। সুস্থ জীবনবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিকতার স্ফুরণ ঘটানোই পত্রিকাটির মৌল উদ্দেশ্য। সেই কারণে এর সমস্ত রচনাই মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। নবজাতকের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান রচনা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প'।

জয়ন্তী সেন

এ-গল্পটি যেভাবেই হোক সকলের পাঠ করা উচিত। এর ভূমিকাটুকুও অবশ্যপাঠ্য। 'নবজাতক'-এ প্রবন্ধ লিখেছেন রেজাউল করিম, নারায়ণ চৌধুরী ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। অন্নদাশঙ্কর রায়, মনীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নচিকেতা ভরদ্বাজ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চক্রবর্তী, মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতা পড়লে যথার্থ আনন্দের উৎপত্তি ঘটে। আশাপূর্ণা দেবী, চিত্রিতা দেবী প্রভৃতির গল্প বলিষ্ঠ ও সমাজধর্মী।

জনমত ঃ সম্পাদক ঃ শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। জলপাইগুড়ি। মূল্য ঃ দুই টাকা।

বাংলার মফস্বল অঞ্চল থেকে যে-সব শারদীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে জনমত সর্বোৎকৃষ্ট পত্রিকা বললেও ভুল বলা হয় না। ঐতিহ্যানুস্মৃতিই এর গাঢ়তর বনিয়াদ, উত্তরবঙ্গের অনুদ্‌ঘাটিত বিষয়গুলিকে তুলে ধরাই এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেই কারণে সুরেন্দ্র ভট্টাচার্যের 'উত্তর-বঙ্গের প্রবাদ বচন' পত্রিকাটির একটি চিত্তাকর্ষক মননধর্মী রচনা। এ ছাড়া এতে প্রবন্ধ লিখেছেন চারুচন্দ্র সান্যাল রণজিৎকুমার সেন, নির্মলচন্দ্র চৌধুরী, (বিষয় ঃ উত্তরবঙ্গের ফিরিঙ্গী রাজা) অমল হালদার, ভবানীগোপাল সান্যাল ও নির্মলেন্দু ভৌমিক। কবিতা লিখেছেন হরপ্রসাদ মিত্র, গোপাল ভৌমিক, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্যাম রায়, আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অপরাজিতা গোপ্পী, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তনু দাস প্রভৃতি। গল্প লেখকদের মধ্যে হরেন ঘোষ ও মুকুলেশ সান্যালের নাম উল্লেখযোগ্য। পত্রিকাটির অঙ্গশোভন, শ্রীমণ্ডিত।

শারদীয় বার্তা ঃ সম্পাদক ঃ রবীন্দ্রনাথ সিকদার। জলপাইগুড়ি। মূল্য ঃ পঁচাত্তর পয়সা।

এতে রয়েছে দুটি প্রবন্ধ, দশটি গল্প ও সতেরটি কবিতা। লেখকদের মধ্যে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডঃ হরিসাধন গোস্বামী, হরেন ঘোষ, কুমারেশ ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, গোপাল ভৌমিক, রণজিৎকুমার সেন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সন্তবামি ঃ সম্পাদনা ঃ অমিয়-মোহন চক্রবর্তী, বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়। ২২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-১। মূল্য ঃ এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্বাণী সহ পত্রিকাটি প্রকাশিত। সুতরাং পত্রিকাটির সম্ভাবনা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ নিরুদ্বেগ হবার আশা রাখেন মনে হয়। যা হোক, এই পত্রিকায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য বিষয় হচ্ছে, অবনীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা। এ ছাড়া এতে নবীন লেখকবৃন্দ সহ লিখেছেন বীরেন্দ্র মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন বসু।

রাষ্ট্র ঃ সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি: ডঃ নরেশচন্দ্র রায়, সম্পাদক : নির্মল বসু। ১৫৬, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ব্লক—এন, রুম নং ৮, কলকাতা-৬ মূল্য: এক টাকা।

দীর্ঘ অপেক্ষিত 'রাষ্ট্রে'র আফ্রিকা সংখ্যাটি (শ্রাবণ-আশ্বিন '৭১) পেয়ে আমরা স্বভাবতই গৌরব বোধ করতে পারি এই কারণে যে, বাংলা দেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত এই ধরণের মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। কোনো সাধারণ পত্রিকার সঙ্গে এই পত্রিকার বিচার করা অকল্পনীয়। দেশ ও দশের কথা যাঁরা চিন্তা করেন এবং আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে যাঁদের সুস্থ চেতনা সদাজাগ্রত, তাঁরাই একমাত্র এতো স্বল্পমূল্যে এমন পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন। বর্তমান সংখ্যাটিতে আফ্রিকার বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। অতীত ও বর্তমান আফ্রিকাকে জানতে হলে এই পত্রিকা অপরিহার্য। রচনাকারদের অধিকাংশই আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। এতে লিখেছেন ডক্টর অংশু দত্ত, যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, বেলা দত্তগুপ্ত, রাধারমণ চক্রবর্তী, রঘুবীর চক্রবর্তী, নিরঞ্জন হালদার, বিজয়প্রকাশ গুপ্ত, সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। আফ্রিকা-বিশেষজ্ঞ ডঃ অংশু দত্তের দু'টি রচনার মধ্যে গ্রন্থপঞ্জী বিভাগটি যেমন সাধারণ পাঠকদের কাছে সম্পদস্বরূপ, তেমনি এটিতে সম্পূর্ণতার প্রয়োজন আছে।

জনকল্যাণ ঃ সম্পাদক : অজিত মুখোপাধ্যায়। ১১৬, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৬। মূল্য : সত্তর পয়সা।

রহড়া জনকল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে উপরোক্ত পত্রিকাটির শারদীয় সংখ্যা বাস্তবিকই কল্যাণমূলক। এতে রয়েছে খ্যাতিমান লেখকদের প্রবন্ধ, কবিতা, একাঙ্কিকা ও গল্প। লেখকদের মধ্যে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, কুমুদ দাশগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বসু, কনক বন্দোপাধ্যায়, স্বামী পুণ্যানন্দ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুধাংশু দে, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নারায়ণ চৌধুরী, হাসিরাশি দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইমন ঃ সম্পাদক : অমিতাভ বসু। বলাকা সংস্কৃতিচক্র, ১৩৩।২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৬। মূল্য: এক টাকা।

ত্রৈমাসিক কাব্য ও আলোচনার এই পত্রিকাটির প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় দুটি বিতর্কমূলক প্রবন্ধ লিখেছেন কৃষ্ণ ধর ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য। সাহিত্যের আত্মসমালোচনায় কৃষ্ণ ধরের মতামত অবশ্যই ভেবে দেখার মতো। 'ইমনে' যাঁরা কবিতা লিখেছেন সম্পাদকসহ তাঁদের সংখ্যা ৪৬। কবিতাগুলি পড়লে বর্তমান কাব্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে।

মোহনা ঃ সম্পাদক : অরুণ বসাক। পোঃ রহড়া, রহড়া বাজার, ২৪ পরগণা। মূল্য : এক টাকা।

নতুন প্রথার দাবি করা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মোহনা' সে ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়—যদিও এর শারদীয় সংখ্যায় গোপাল ভৌমিক, কৃষ্ণ ধর, মিহির আচার্য, প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রভৃতি লিখেছেন। ছন্দজ্ঞানহীন কবিতা ছাপানোটাও কি নতুন প্রথার অন্যতম দাবি?' 'মানস প্রিয়া' অন্তত সে কথারই প্রমাণ দেয়।

শুভায় : সম্পাদক : হরিদাস চক্রবর্তী, চিদানন্দ গোস্বামী। শুভায় কার্যালয়, 'শ্রীপাট' আগরতলা। মূল্য: এক টাকা।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছরের শারদীয় সংখ্যাটি আরো সমৃদ্ধ ও অনেক অজ্ঞাত কাহিনীর তথ্যবাহী। পত্রিকাটিতে রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্র, পিয়ার্সন ও বর্ধমানাধিপতি প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের দুটি পৃথক পত্র। 'শুভায়'-এর প্রবন্ধ-অংশ যে-কোনো পত্রিকার পক্ষে ঈর্ষার যোগ্য। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, পরলোকগত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অমল মিত্র, কুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধগুলি বিষয়-বিভূতিতে অভিনব, চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ। সন্তোষকুমার ঘোষ, করবী দেববর্মা, হরেন ঘোষ, কার্তিক লাহিড়ী, চিদানন্দ গোস্বামীর গল্পগুলি পড়ে আনন্দের রেশ সঞ্চারিত হয়। 'শুভায়'-এর কাব্যাংশ সবিশেষ ঋদ্ধ। এ ছাড়া ভ্রমণ-কাহিনী ও রসরচনা নগণ্য নয়।

বালুচর : সম্পাদক : সুবীরকুমার বোথরা, জিয়াগঞ্জ। সাহায্য: কুড়ি পয়সা।

জিয়াগঞ্জ বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির সঙ্কলিত মাসিক সাহিত্য মুখপত্র 'বালুচর'-এর শারদীয় সংখ্যা নিঃসন্দেহে উপভোগ্য। এই সংখ্যাটিতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও রসরচনা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী, অরুণ ভট্টাচার্য, ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী ও নবকুমার ঘোষাল প্রভৃতির রচনা পড়ে আনন্দ লাভ করা যায়। পত্রিকাটির 'সম্পাদকীয়' ও 'আমাদের কথা' বেশ বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী।

বালার্ক : সম্পদনায় বৈশ্বানর-গোষ্ঠী। পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। মূল্য : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

'বালার্ক'-এর পঞ্চম সংকলনটি শারদ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি প্রতিশ্রুতিময়। তবু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বৈশ্বানরগোষ্ঠী কলকাতার নামী লেখকদের ওপর এমনভাবে কেন নির্ভর করেন। নামী লেখকদের পাশে নতুন লেখকদের রচনাগুলি পড়ে আমরা খুশি হয়েছি। পত্রিকাটির আঞ্চলিক রচনা হিসেবে অনলকৃষ্ণ ভাদুড়ীর 'মুর্শিদাবাদের ধর্মীয় পটভূমি' মূল্যবান। এই ধরণের রচনা আরো বেশি থাকা উচিত ছিল বলে মনে হয়।

স্বাধীনোত্তর বাংলার নাট্যধারা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কিন্তু ইবসেনিয়ান রিয়ালিজম্— যাকে পরবর্তীকালে কেউ কেউ নাম দিয়েছেন ন্যাচারেলিজম্—প্রথম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ইবসেনেরই শিষ্য সুইডিশ নাট্যকার স্ট্রিনবার্গের কাছে। তিনি বলেন, জীবন যা আছে তা দেখানোই নাটক নয়—জীবন যা হতে চায় তা তুলে ধরাই নাটক। তাঁর মতে বাস্তবের চেয়ে মানুষের স্বপ্নই বেশি সত্য। আইরিশ কবি ইয়েটস্‌ও ইবসেনিয়ান রিয়ালিজম্‌কে বরবাদ করেন। ইতালীয় নাট্যকার লুইজী পিরানদেল্লোও বলেন, পরিদৃশ্যমান জগৎকে দেখানোই নাটক নয়—কল্পনার দ্বারা পরিদৃশ্যমানকে নতুন করে সৃষ্টি করাই নাটক। মার্কিন নাট্যকার ইউজিন ও'নীল স্ট্রিনবার্গের মত সমর্থন করে বলেন যে, জীবনচিত্র দেওয়া নয়, জীবনের গভীর রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করাই নাটকের লক্ষ্য। এঁদের মতামত নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। তবে দেখা যায়, উনবিংশ শতকের শেষ পাদে ও বিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকের মধ্যেই ইবসেনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

ইবসেনের আমলেই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার স্ববিরোধিতাগুলো প্রকট হয়ে উঠেছিল। ফরাসী বিপ্লবের সময় মানুষকে সমমর্যাদা দানের যে সনদ ঘোষিত হয়েছিল, দেখা গেল তার বহু বছর পরেও ইউরোপের অনেক দেশেই নারীসমাজ ভোটাধিকার বা সমান নাগরিক মর্যাদা পেল না। আর একদিকে শ্রেণীশোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষকে সমমর্যাদা দানের বুর্জোয়া মানবিক আদর্শ বানচাল হয়ে গেল। পুঁজিবাদী শোষণ যতই উগ্র হয়ে উঠতে লাগলো, বুর্জোয়া মানবতাবাদী মহলের চিন্তাজগতে ততই সংকট বেড়ে চললো। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে সমস্ত প্রকার সামাজিক বিধান ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে নৈরাজ্যবাদ প্রচার করলেন। তা থেকেই উৎপত্তি সংশয়বাদের। আসল সমস্যা ও তার সমাধানের দিকে তাঁরা নজর দিলেন না। উত্তরকালে এই ভাবসংকটে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পড়েছিলেন—তাঁর 'সভ্যতার সংকট'ই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে তিনি একান্তভাবেই মানবদরদী ছিলেন বলে শেষ পর্যন্ত মানুষের ভবিষ্যতে আস্থা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন।

বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বৈষয়িক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, তাতে সকল মানুষ সমান মর্যাদা লাভের সুযোগ পেতে পারে না। বুর্জোয়া চিন্তানায়ক ও শিল্পী-সাহিত্যিকগণ একদা যে মানসিক উদারতা নিয়ে মানুষের সমমর্যাদা, স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা ঘোষণা করেছিলেন, তাকেই দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবার জন্যে শ্রেণীশোষণমুক্ত একটি নতুন সমাজবিন্যাসের প্রয়োজন দেখা দিল। ঐতিহাসিক কারণে অনিবার্যভাবেই এই প্রয়োজন আসে। বলা বাহুল্য, মার্ক্সীয় দর্শনই নিয়ে এলো এই নতুন সমাজচিন্তা।

বাহ্যত বুর্জোয়া মানবতাবোধের সঙ্গে সাম্যবাদী মানবতাবোধের বিরোধ যদিও নেই—আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে পার্থক্য যথেষ্টই আছে। বুর্জোয়া চিন্তা শ্রেণীশোষণকে স্বীকার করেও মানবতা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী—আর সাম্যবাদী চিন্তা শ্রেণীশোষণের অবসানের মধ্যেই যথার্থ মানবতার প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী। সাম্যবাদীরা এও বিশ্বাস করেন, ইতিহাসের নির্দেশে এই শ্রেণীশোষণমুক্ত নতুন সমসমাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হবে নিচের তলার শোষিত মানুষ। এই কারণেই সাম্যবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিও প্রধানত নিচের তলার মানুষেরই দিকে। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার মধ্যে থেকেও কোন্ প্রাণসত্তা বলে টিকে আছে তারা, কোথায় তাদের জীবনের অবলম্বন, আপাতদৃষ্টিতে যারা নিঃসহায়, নিরালম্ব ও নির্জীব বলে মনে হয়, তাদের কোন্ ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠে এই মহাবিপ্লব সাধন করবে, সাম্যবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকগণ তাঁদের সন্ধানী আলোক ফেলে তাই দেখার ও দেখাবার চেষ্টা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই দেখার মূলে থাকে একটি জীবন-প্রত্যয় ও তার সঙ্গে সহানুভূতি। আর তা থাকে বলেই তাঁরা নিচের তলার মানুষের মধ্যে শিল্প-সাহিত্যের যথেষ্ট উপাদান খুঁজে পান। তাঁরা দেখতে পান, নিচের তলার মানুষের জীবন শুধু ক্লেদাক্তই নয়, তাদেরও মধ্যে এমন মহত্ত্ব থাকে যা নিয়ে মহানাটকের সৃষ্টি হতে পারে।

শোষিত শ্রেণীর প্রতি এই যে প্রত্যয় ও সহানুভূতি—বহু সমালোচক মনে করেন, কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকের তা থাকা উচিত নয়। এই ধরণের সাহিত্যকে বলা হয়—committed literature. এই শ্রেণীর সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, অতিলিপ্ততার দরুণ একদেশদর্শিতা আসে এবং তাতে সাহিত্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। যে দিকেই হোক আর যে ভাবেই হোক, প্রত্যয় ও সহানুভূতি ছাড়া কোনো মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে কি না তা তর্কের বিষয় এবং সে তর্কের মীমাংসা করা এখানে সম্ভব নয়। এখানে শুধু সাম্যবাদী মানবতাবোধের ইঙ্গিতটুকু দেওয়া হলো এই উদ্দেশ্যে যে, পরে আধুনিক বাংলা নাটকের চরিত্র অনুধাবনে এতে খানিকটা সুবিধে হবে।

ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পট পরিবর্তনের ফলে সেখানকার শিল্প-সাহিত্য-জগতে, বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে চিন্তার যে বিবর্তন ঘটেছে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দিকে তাকালে তেমন কোনো সুস্পষ্ট বিবর্তনের ধারা নজরে পড়ে কি ? মাঝে মাঝে কেউ কেউ রীতি ভাঙবার চেষ্টা করেছেন বটে ; কিন্তু সে চেষ্টা স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী হয় নি। পুনরাবৃত্তির ইতিহাসই দীর্ঘ। বলতে পারেন, ভারতে রাজনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তেমন কোনো বিরাট পট পরিবর্তনই বা হয়েছে কোথায় যে তার প্রতিফলন শিল্পে সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যাবে ? এ-যুক্তির উত্তরে বলা যায়, বিশ্বের কোনো বিরাট চিন্তা কেবল একটি দেশ বা মহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না---তার প্রভাব অল্পবিস্তর সমস্ত সভ্য দেশেরই ওপর পড়ে। ভারতের বুদ্ধিজীবীরাও বিশ্বের এ সমস্ত চিন্তা-বিপ্লব ও পট পরিবর্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা ইতিহাস বলে না।

রামমোহন রায়ের বিশ্বচেতনা সুবিদিত। বাংলা কাব্যে ও কথা-সাহিত্যে ইউরোপীয় চিন্তাবিপ্লবের প্রতিফলন কিন্তু অল্পবিস্তর ধারাবাহিক-ভাবেই হয়ে এসেছে। এই ভারতীয় সমাজে থেকেই তো রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-চিন্তাকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিতে পেরেছেন এবং বিশ্বের আধুনিক চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তাকেও যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্বসূরীদের কথা ছেড়ে দিলেও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কোনো নাট্যকারই কি তাঁর নাটকে এমন কোনো বক্তব্য বা নাট্যরীতি আনতে পেরেছেন, যার জন্যে সে নাটক বা নাট্যরীতিকে বিশ্বের আধুনিক নাট্যধারার সমগোত্রীয় বলা যায় ?

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'মুক্তধারা', 'রক্ত করবী' ও 'রথের রশি' লিখে সমকালীন বিশ্ব-সমস্যাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন। সমস্যাকে তিনি শুধু তাৎক্ষণিকতার মধ্যেই রাখেন নি ; চিরন্তনতার সঙ্গে যুক্ত করে নাটক-গুলোকে কালাতীত সাহিত্যে পরিণত করেছেন। যখন বাংলা দেশের সাধারণ নাট্যশালায় 'বঙ্গে বর্গী', 'মিশরকুমারী', 'দেবলাদেবী', 'কর্ণার্জুন' প্রভৃতি মেলোড্রামাগুলোর প্রাবল্য, তখনই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন এসব নাটক। সুতরাং এটা পারিপার্শ্বিকের প্রশ্ন নয়, চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কথা।

দুটি চিন্তাধারা, দুটি জীবন-দর্শন, দুটি উপলব্ধির যেমন তীব্র সংঘাত আমরা রবীন্দ্রনাট্যে প্রকট

রাজা রামমোহন রায়

দেখতে পাই---বলতে দ্বিধা নেই, রবীন্দ্র-পূর্ব সমগ্র বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তা বিরল। রবীন্দ্র-নাট্যে এমন ভাবসংঘাত আছে, যা কেবল জাতীয় জীবনের ওপরই আলোকপাত করে না, আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কেও মনকে ভাবিয়ে তোলে, সচেতন করে। রবীন্দ্র-মানসের অসীম বিস্তৃতি ছিল বলেই জাগতিক চিন্তাধারার একটা অখণ্ড রূপ তাঁর নাট্য-সাহিত্যে ধরা দিয়েছে। অথচ তাঁর নাটকগুলি রচনারীতিতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র হারায় নি।

রবীন্দ্র-নাট্যের তাৎপর্য তাঁর জীবন-দর্শনে। তিনি পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবনদর্শন ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদী জীবনদর্শনের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই নাট্য রচনায়ও একটা নতুন রীতি অবলম্বন করেছিলেন তিনি। পাশ্চাত্যের ট্র্যাজেডি বা সংস্কৃত নাটকের মিলনান্তক রীতি, কোনোটারই তিনি হুবহু অনুকরণ করেন নি। তাঁর সমন্বয়বাদী জীবনদর্শনই তাঁকে নাটক রচনায়ও একটা নতুন রীতি অবলম্বনে প্ররোচিত করেছিল। নাটকের মূল চরিত্রে ভাবসংঘাত সৃষ্টি করে ট্র্যাজেডির ধর্মানুযায়ী তিনি অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছেন, কিন্তু পরিণতি ভয়ঙ্কর করে তোলেন নি। নায়ক-চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের জন্যে তিনি বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণাও করেছেন, কিন্তু তা করেছেন তিনি নায়কের ভ্রান্তি নিরসন করে তাকে অন্ধ প্রবণতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। যে-চরিত্রের মাধ্যমে তিনি নাটকের মূল বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, আঘাতের দ্বারা মোহমুক্ত করে তাকে রূপান্তরিত করার দিকেই ছিল তাঁর দৃষ্টি।

এজন্যেই বিসর্জন নাটকে রঘুপতির মোহমুক্তির জন্য জয়সিংহকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে। তপতী নাটকে রাজা বিক্রমদেবকে মোহ থেকে মুক্তি দেবার জন্যে রাণী সুমিত্রাকে হুতাশনে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, 'মুক্তধারা' নাটকে রাজা রণজিৎ-এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে তাঁর পুত্রপ্রতিম প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অভিজিৎকে বাঁধ ভাঙতে গিয়ে মুক্তধারার স্রোতে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে। 'রক্ত-করবী' নাটকে মোহমুক্তির আগে রাজাকে রঞ্জনের শব আগলে থাকতে হয়েছে। 'রথের রশি'তে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এ ধরণের কোনো বিষাদপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেন নি। জনতাকে জলস্রোতের মতো মুক্ত করে দিয়েই কালের অনিবার্য গতির প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

একমাত্র গতির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে উপসংহারে কবিকে আমদানী করে মহাকালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও পাপের জন্যে পাপীকে শাস্তি দিয়েছেন, কিন্তু তা দিয়েছেন অন্তরে অনুশোচনার দ্বারা। অপরাধী করে তিনি দণ্ড দেন নি। শোচনীয় পরিণতিকে অতিক্রম করে মানসিক রূপান্তরের সাহায্যে জীবনকে আরো সামনের দিকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন তিনি। জীবনবৃত্তকে অধিকতর সম্প্রসারিত করার এই দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব সন্দেহ নেই। মনে হয়, পাশ্চাত্য দেশের নাট্য-সমালোচকগণ নিজেদের মানদণ্ডে ফেলে বিচার করতে চেয়েছেন বলেই রবীন্দ্র-নাট্যের যথার্থ মূল্যায়ন আজো পর্যন্ত করতে পারেন নি।

মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে

● মাইকেল মধুসূদন দত্ত

রোঁ', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী'তে যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত পাওয়া যায়, পরবর্তী বাংলা সামাজিক নাটকগুলো সেই পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ গার্হস্থ্য গণ্ডিতে এসে আশ্রয় নেয়। তার ফলে আমাদের অতিপরিচিত ও পুরনো সেণ্টিমেণ্টগুলোকে অবলম্বন করে পারিবারিক দ্বন্দ্ব, কলহ, মনোমালিন্য, হীনতা, শঠতা প্রভৃতি নাটকে প্রাধান্য পেতে থাকে। অধিকাংশ নাটকই পুরনো মূল্যবোধের ওপর নির্ভর। জীবনের ব্যাখ্যা বা গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা তো দূরের কথা; সে সব নাটকে জীবনের কোনো transition-ও অনুপস্থিত। করুণরস সৃষ্টির দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকায় নাটকগুলো যতখানি কাঁদায়, ততখানি ভাবায় না। এর ব্যতিক্রম শরৎ-সাহিত্যের নাট্যরূপে খানিকটা থাকলেও একমাত্র 'অভয়া' ছাড়া আর কারো মুখে বিদ্রোহের সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই। কিন্তু অভয়াকে কেন্দ্র করে বাংলায় কোনো নাটক রচিত হয় নি। 'কিরণময়ী' উন্মাদ হয়ে যাওয়ায় তার পরিণতি অনির্দিষ্ট। 'অভয়া' কোনো নাটকে মূল চরিত্র হয়ে এলেও 'নোরা'কে ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। সে তো উনবিংশ শতাব্দীর কথা।

শিল্প-সাহিত্যের কোনো একটি নব্যধারাকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে, তার প্রাক্কালীন অবস্থার চিত্রটি পরিষ্কার থাকা দরকার। চল্লিশের কাছাকাছি বাংলার নাট্যশালাগুলোর দিকে তাকালে আমরা কি দেখতে পাই? দেখি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। কি সামাজিক, কি পৌরাণিক, কি ঐতিহাসিক— সমস্ত নাটকই যেন একটা রীতির দাস হয়ে গেছে। চিন্তায়, আঙ্গিকে, রূপকর্মে কোনো নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য নেই। তবু তারও মধ্যে তখনকার দিনে যে নাটকগুলো জনমানসকে আলোড়িত করেছিল এবং খানিকটা বৈশিষ্ট্য এনেছিল, সেগুলো সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করলেই চল্লিশোত্তর কালের নব্যধারার নাটকগুলোর সঙ্গে সে সব নাটকের পার্থক্য কোথায়, তা সহজে বোঝা যাবে।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর,' 'মেঘমুক্তি', 'বিশ বছর আগে,' 'মালা রায়,' 'রক্তের ডাক' প্রভৃতি নাটক চল্লিশের অব্যবহিত পূর্বেও তারই কাছাকাছি সময়ে মঞ্চে অভিনীত হয়ে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মামুলী ধরণের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক দেখে দেখে তখনকার দর্শকগোষ্ঠীর মধ্যে যে ক্লান্তি ও বিরক্তি এসে গিয়েছিল, তা থেকে তাঁদের খানিকটা মুক্তি দিয়েছিল বিধায়কের এ সমস্ত পারিবারিক নাটক। তার আগে এসেছিল উপন্যাসের নাট্যরূপ দেবার ঝোঁক। মঞ্চের আদর্শ তখন অনুরূপা দেবীর উপন্যাস। বলা বাহুল্য, অনুরূপা দেবীর অধিকাংশ উপন্যাসেই রয়েছে রক্ষণশীল আদর্শের স্তুতি ও পুরনো মূল্যবোধের প্রতি আসক্তি। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে যে-পুরনো সমাজ ও আদর্শবোধ তখন ভেঙে যাচ্ছে, অনুরূপা দেবী সেই ক্ষয়িষ্ণুতারই মহিমা কীর্তন করলেন তাঁর উপন্যাসে।

● শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

সে-সব উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চে দেখে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন দর্শকরা খুশি হলেন বটে; কিন্তু অপেক্ষাকৃত সংবেদনশীল দর্শকগোষ্ঠী সে-সব নাটককে প্রাণ খুলে অভিনন্দন জানাতে পারলেন না।

বিধায়ক ভট্টাচার্য বুর্জোয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চিন্তা দিয়ে এই সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধকে আঘাত করলেন। ফলে তাঁর নাটকগুলো

খানিকটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। ঘুণধরা সামাজিক কাঠামোতে ব্যক্তিজীবন যে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বিধায়ক তাঁর তীক্ষ্ণ সংলাপের সাহায্যে তা ফুটিয়ে তুললেন সুনিপুণভাবে। তবে ভারসাম্য রক্ষিত হলো না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ওপর অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে বিধায়ক নাটকীয় চরিত্রের সামাজিক সত্তাটিকে সুপরিস্ফুট করে তুলতে পারলেন না। তাঁর নাটকে morbid character প্রাধান্য পেতে লাগলো। ফলে জীবনদর্শনের দিক থেকে নাটকগুলো খণ্ডিত সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে রইলো; নাটকের বক্তব্য কোনো ভবিষ্যতের ইংগিত দিতে পারলো না। সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে হারিয়ে নাটকগুলো হলো পারিবারিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দেশপ্রেমাত্মক নাটক 'সিরাজদ্দৌলা' এই সময় নাট্যনিকতনে অভিনীত হয়ে একটা রোমান্টিক উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বিচারের মানদণ্ডে ফেললে নাটকটিকে ঠিক র‍্যাশনাল বা ইতিহাসসম্মত বলা চলে না। সিরাজদ্দৌলা উচ্ছৃংখল বা প্রজাপীড়ক ছিলেন না, ইতিহাস এমন কথা বলে না। অথচ নাট্যকার সিরাজের মুখ দিয়ে এমন কথা বলিয়েছেন যাতে মনে হয়, সেগুলো শুধু তাঁর শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনা। 'গোলাম হোসেন' ও 'আলেয়া' চরিত্র সৃষ্টি করে নাট্যকার 'সিরাজ' চরিত্রের কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। শচীন্দ্রনাথের 'সিরজদ্দৌলা' দেখে মনে হয়, নবাব পরাধীন ভারতের মুক্তিকামী কোনো বিংশশতকীয় রাজনৈতিক নেতা। যেন তিনি জাতির কথা চিন্তা করেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন।

জাতীয় চিন্তাই যদি থাকবে, তবে, সিরাজের রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে এত বিশৃংখলার চিত্র ইতিহাসে পাওয়া যায় কেন? সিরাজের আমলকে বলা যায় সামন্ততন্ত্রের 'ক্ষয়িষ্ণু যুগ'। যন্ত্রবিপ্লবের ফলে ইউরোপে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল, ভারতের তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু সমান্ততান্ত্রিক কাঠামোতে তার অস্তিত্ব ছিল না। ভারত তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। ছোট ছোট জায়গীরদার ও ভূস্বামীদের প্রতি সাধারণ লোকের যতখানি আনুগত্য ছিল, বাদশাহ বা নবাবের প্রতি ততখানি আনুগত্য ছিল না। দেশের সাধারণ লোক যে সেদিন সিরাজের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় নি, এটিই ছিল তার মূল কারণ। এটি একটি ঐতিহাসিক সংকট। 'সিরাজদ্দৌলায়' ইতিহাসের এই বিশ্লেষণ নেই বলেই নাটকটি ভাবালুতাধর্মী—দাঁড়িয়ে আছে শুধু আবেগোচ্ছ্বাসের ওপর। এই ত্রুটির জন্যেই শচীন্দ্রনাথের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চে যতখানি আদৃত হয়েছে, সাহিত্যিক মহলে ততখানি সমাদর পায় নি।

নাট্যভারতীতে অভিনীত তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' এই সময় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু নাট্যরচনার আঙ্গিকে তারাশঙ্করের হাত অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে কোনো বক্তব্যকেই তিনি একটি ঋজু কাহিনীতে প্রকাশ করতে পারেন না। নাটক রচনার সময়েও তাঁর ঔপন্যাসিক মেজাজটি থেকে যায় এবং সেজন্যেই নাটকেও তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যান। একটি নাটকে একাধিক কাহিনী থাকা দোষের নয়; কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীকে মিশ না খাওয়াতে পারলেই নাটকের সংহতি নষ্ট হয়ে যায়।

'দুই পুরুষেও' এই অসংলগ্নতা আছে। নুটবিহারীর প্রথম জীবন ও শেষ জীবন দুটি কাহিনীতে বিন্যস্ত। এজন্যে নাটকীয় সংঘাত তীব্র হয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া নাটকের বক্তব্যেও কোনো নতুন যুগের ইঙ্গিত নেই। শুধু দেখানো হয়েছে, দরিদ্র অবস্থা থেকে নুটবিহারী ধনাঢ্য হয়ে ওঠার পর তার মধ্যে আভিজাত্যবোধ আসে। এটা ব্যক্তির কথা; এর মধ্যে কোনো শ্রেণী চরিত্রের সুস্পষ্ট প্রকাশ নেই। ধনাঢ্য হবার পরেও নুটবিহারীর মধ্যে যদি আভিজাত্যবোধ না আসতো তবে তার ধনিক হওয়ায় কোনো আপত্তি হয়তো থাকতো না নাট্যকারের। ধন আহরণ ও সঞ্চয়ের মধ্যেই যে শ্রেণীর চরিত্র গড়ে ওঠে এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধন আহরণ পদ্ধতির মধ্যেই যে অনেক পাপ লুকিয়ে থাকে, সেদিকে কোনো আলোকপাতই করেন নি নাট্যকার। ধনতান্ত্রিক বুনিয়াদের ওপর শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে বলেই যে আজ মানুষে মানুষে এত বিভেদ ও বৈষম্য, সেদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত নেই। এই কারণেই নাটকটি যুগোপযোগী কোনো বৃহত্তর ইঙ্গিত দিতে পারে নি।

১৯৪২ সালে শিশিরকুমারের নেতৃত্বে যখন 'শ্রীরঙ্গম'-এর উদ্বোধন হলো তখন বাংলার নাট্যরসিকবৃন্দের প্রাণে আশার সঞ্চার হয়েছিল এই ভেবে যে, এবার নাট্যাচার্য নিশ্চয়ই এমন কতকগুলো নাটক উপহার দেবেন যাতে থাকবে যুগের কথা। কিন্তু সেদিক দিয়ে তিনি সবাইকে প্রায় নিরাশই করলেন। অনন্যসাধারণ অভিনেতা শিশির ভাদুড়িকে আবার মঞ্চে ফিরে পেল লোক, কিন্তু যুগের দাবি মেটাবার মতো নাটক পেল না। 'জীবনরঙ্গ' দিয়ে শ্রীরঙ্গমে প্রথম পর্দা তুললেন শিশিরকুমার।

থিয়েটার—আর্টের কি আদর্শ হওয়া উচিত—এ নাটকের মাধ্যমে তাই বলার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু যে আর্টের কথা বলা হলো তা বহুচর্বিত pure art বা absolute art—জীবনধর্মী আর্ট নয়। আর্টের উৎস যদি হয় জীবন, তবে জীবনের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আর্টেরও রূপান্তর হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু 'জীবনরঙ্গ' নাটকে তেমন কোনো নতুন আর্টের জন্যে সংগ্রামের কথা পাওয়া গেল না। অথচ চেকভ-এর 'দি সী গাল' নাটক এই আর্টের সংগ্রামকে ভিত্তি করেই রচিত। নতুন আর্ট প্রকাশ হতে চাচ্ছে আর পুরাতনপন্থীরা তাতে বাধা দিচ্ছে। পিরানদেল্লোর Six Character in Search of an Author নাটকেও আমরা দেখতে পাই আর্টের নতুন interpretation দেবার চেষ্টা। 'জীবনরঙ্গে' তেমন কোনো নতুন আর্টের পক্ষে ঘোষণার একান্ত অভাব। কেবল আর্টের কতকগুলো পুরনো তাত্ত্বিক আলোচনা। তার ফলে নাটকটি কোনো আবেদনই সৃষ্টি করতে পারলো না। (ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

শারদীয় উৎসবে বাংলা ছবি

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে এবার মাত্র তিনটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। এই তিনটির মধ্যে দুটি মেলোড্রামা, একটি ভক্তিমূলক অলৌকিক কাহিনী-চিত্র। এত কম সংখ্যক ছবির মুক্তি ইতিপূর্বে আর ঘটে নি। এই ঘটনা বাংলা ছবির সঙ্কটের একটি দৃষ্টান্ত। শারদীয় উৎসবে কলকাতা ও মফস্বল শহরের বাঙালীদের মধ্যে সাজ-সাজ রব সুরু হয়। যাত্রা, থিয়েটার এবং সঙ্গীত-শিল্পীদের এ সময় মরশুম। কিন্তু চলচ্চিত্র এবার এই মরশুমে তাল রাখতে পারে নি। অন্যান্য বছরের তুলনায় অন্তত তিনটি বাংলা ছবি এবার কম মুক্তি লাভ করেছে। শারদীয় উৎসবের দিনে বাংলার প্রথম শ্রেণীর কোন পরিচালকের ছবি দর্শকরা দেখতে পান নি। প্রবাস থেকে যে বাঙালীরা এসেছিলেন, তাঁরা এদিক থেকে নিরাশ হয়েছেন। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, অসিত সেন, অজয় করের কোন ছবি এবার মুক্তিলাভ করে নি। একমাত্র তপন সিংহের ভাগ্য ভাল যে, তাঁর 'আরোহী' কলকাতার সিনেমায় এখনো চলছে; কিন্তু এতদিনে সেই ছবি মফস্বলে পৌঁচেছে, সুতরাং তার আকর্ষণ তেমন নেই।

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র শিল্পীদের মধ্যে উত্তমকুমার আর সুচিত্রা সেনকে দুটি ভিন্ন ছবিতে দেখা গেছে। এ দুজনকে একসঙ্গে একই ছবিতে অভিনয় করাবার মত আর্থিক সঙ্গতি এখন আর বাংলা ছবির প্রযোজকদের তেমন নেই। 'আরোহী'তে রয়েছেন কালী ব্যানার্জী। অন্যান্য জনপ্রিয় 'তারকা'রা শারদীয় উৎসবের রূপালী পর্দায় উপস্থিত হবার সুযোগ পান নি।

বাংলা ছবির মুক্তিলাভের সুযোগ কত কমে আসছে এই ঘটনা তার একটা প্রমাণ। বাস্তবিক, শারদীয় উৎসবে অনেক হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করেছে, কিন্তু বাংলা ছবি বাক্সবন্দী হয়ে রয়েছে। এই দুর্ভাগ্যের কারণ অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সময় একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই কমিটী যথাসময়ে সুপারিশসহ রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেছেন। কিন্তু সরকার সেই রিপোর্ট দীর্ঘ এক বছর কাল চেপে রেখেছেন। রিপোর্টটি অবিলম্বে প্রকাশ করার দাবি উঠেছে। এই রিপোর্ট সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা উচিত।

—সুজন।

'মহালগ্ন' ছবির অন্যতমা নায়িকা কল্যাণী ঘোষ।

চিত্র আলোচনা

মহাতীর্থ কালীঘাট

(আনন্দময়ী চিত্রপীঠ : ভূপেন রায়)

কালীঘাটের কালীমন্দির হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। ভক্তগণ এই তীর্থস্থানকে ৫১ পীঠের অন্যতম অথবা শ্রেষ্ঠতম বলে দাবি করে থাকেন। এই মন্দিরকে অবলম্বন করে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভক্তগণ এই কিংবদন্তী বিশ্বাস করে আসছেন। সারা ভারতের হিন্দুগণ এখানে এসে মাথা নত করেন। এই কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে 'মহাতীর্থ কালীঘাট' চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন ভূপেন রায়।

ভক্তগণ এরূপ ভক্তিমূলক চিত্রের কাহিনীকে যুক্তি দিয়ে দেখেন না, গ্রহণ করেন ভক্তি দিয়ে। ভক্ত-হৃদয় সিক্ত হয়ে ওঠে মধুর সঙ্গীত-রসে। এই ছবির ক্ষেত্রেও কাহিনী ভক্তহৃদয়ে পৌঁচেছে সঙ্গীতের মাধ্যমে। সঙ্গীত এই ছবিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সঙ্গীতের এই গুরুত্ব যথাযোগ্যভাবে সম্পাদন করেছেন সঙ্গীত পরিচালক রথীন ঘোষ। স্তোত্র ও শাক্তসঙ্গীতে ছবিটি ভক্তজনের নিকট উপভোগ্য। গানগুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখার্জী, পান্নালাল ভট্টাচার্য, রবীন মজুমদার প্রমুখ।

এই ছবিতে একটি তাণ্ডব নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছেন গোপীকৃষ্ণ। ছবিটিকে আকর্ষণীয় করার জন্য শক্তির বিভিন্ন মূর্তি দেখান হয়েছে বর্ণরঞ্জিত দৃশ্যে।

এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপদান করেছেন অসিতবরণ, নীতীশ মুখার্জী, অজিত ব্যানার্জী, রবীন মজুমদার, মিহির ভট্টাচার্য, অমরেশ দাস, শম্পা চক্রবর্তী, কৃষ্ণা বসু, বাণী গাঙ্গুলী, শিপ্রা মিত্র প্রমুখ।

● এঁকে চিনতে পারেন কি ?---এলিজাবেথ টেলর-এর শৈশবকাল কিভাবে কেটেছে এই ছবি দেখে ধারণা করুন

অ্যাটিলা দি হুণ
(বিদেশী চিত্র)

ফরাসী-ইতালীয় যুগ্ম প্রযোজনায় উপরি-উক্ত চিত্রটি গড়ে উঠেছে। চিত্র-কাহিনীর মূল ভিত্তি হচ্ছে রোমানদের সঙ্গে হূণদের সংঘর্ষ। হূণদের রাজা অ্যাটিলা ইতিহাসের বিভীষিকাময় নাম। ইতিহাস থেকেই জানা যায় যে, পঞ্চম শতকের মধ্যভাগে প্রবল হূণশক্তি দক্ষিণ রাশিয়া থেকে পশ্চিম য়ুরোপের রাইননদী পর্যন্ত সমগ্র দেশ জয় ক'রে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত করে। সেই সময় অ্যাটিলার নৃশংস অত্যাচার প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তিনি কন্সটান্টিনোপলের সম্রাটকে পরাজিত করে ইটালী ও রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করতে গেলে গলদেশে পরাজিত হন। এর দু'বছর পরে (৪৫৩ খৃঃ) অ্যাটিলা সসৈন্যে উত্তর ইটালীতে উপস্থিত হয়ে বহু হত্যা ও ধ্বংসলীলা সাধনের পর রোম নগরের অভিমুখে অগ্রসর হন।

কথিত আছে যে, রোমের বিশপ লিওর অনুরোধে তিনি রোম দখল না করে ফিরে যান।

চিত্র-কাহিনীতে ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ না করা হলেও পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। চিত্রে রূপায়িত অ্যাটিলার মধ্যে দেখা গেছে যেমন নৃশংসতা, তেমনি পিতৃহৃদয়, ধর্মভীরু মন ও হূণ প্রজাদের প্রতি প্রীতি।

কাহিনীর প্রধান বক্তব্য হচ্ছে—রোমের দিকে তাঁর অভিযান এবং পোপের অনুরোধে বিনাযুদ্ধে প্রত্যাবর্তন। যুদ্ধাভিযান তাঁর নেশা হলেও প্রবল যুক্তির সাহায্যে রোমের সভ্যতাকে ধিক্কার দিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। চিত্রে রোমের রাজ-পরিবারের কাহিনীটি ঐ কারণে অতি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। রোমের রাজা কত অসহায় এবং দুর্বল-চরিত্রসম্পন্ন। রাজার ইচ্ছায় সভ্যতার নগ্ন পরিবেশে যখন-তখন সংস্কৃতির বলি হয়! যেন সবই রাজার খেয়াল। তাই মানুষ মারা গেলে যার চোখ দিয়ে জল বের হয় না, পোষা জন্তুর মৃত্যুতে সেই রাজাও বিকট কণ্ঠ নিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। রাজদরবারে রোম-সভ্যতার তখন এটাই ছিল যেন আসল রূপ। রাজার ভগ্নীও তেমনি স্বার্থ-পরায়ণা নারী। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সে অ্যাটিলার কাছে আত্মসমর্পণ করতে লজ্জিত হয় নি। আনোরিয়া নামক চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন সোফিয়া লোরেন। অ্যাটিলার আক্রমণে ভীত ভ্যাটিকানে আশ্রয়েচ্ছু রোমের রাজার চরিত্র সে যুগের ইতিহাসকে যেন সমূলে টেনে তুলেছে। আক্রমণরত অ্যাটিলা, পুত্রের মৃত্যুতে অ্যাটিলা, পোপের সামনে মাথা নত অ্যাটিলার চরিত্রে অ্যান্টনি কুইনের অভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংবাদবহনা

আন্তর্জাতিক উৎসবের বিচারকমণ্ডলী

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতায় গুণাগুণ বিচার করবার জন্য ১১ জন সদস্য নিয়ে এক বিচারক কমিটী গঠিত হয়েছে। এই কমিটীর চেয়ারম্যান সত্যজিৎ রায়। সদস্যদের মধ্যে আছেন, অধ্যাপক এ এস রুসিল (চেকোশোভাকিয়া), শ্রীমতী মাগদা (মিশর), জর্জ সাদুল (ফ্রান্স), কে এ আব্বাস (ভারত), মাইকেল এঞ্জেল আণ্টনিওনি (ইতালী), শ্রীমতী চাওয়াকিতা (জাপান), আন্দ্রে ওয়াজদা (পোল্যাণ্ড), ডেভিড লীন (বৃটেন), স্ট্যানলি ক্র্যামার (আমেরিকা), গ্রিগরী চুখারাই (সোভিয়েট রাশিয়া)।

প্রামাণ্যচিত্রের জন্য আর একটি বিচারক কমিটী গঠিত হয়েছে। সেই কমিটীর চেয়ারম্যান জে এস ভবনগরী।

সিনে ক্লাবের মুখপত্র 'কিনো'

সিনেক্লাব অব ক্যালকাটার ইংরেজী মুখপত্র কিনো (Kino) আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। পত্রিকাটির প্রচ্ছদপট ও ছাপা, বাঁধাই, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি এত সুন্দর যে, বিদেশী পত্রিকা বলে ভুল হয়। পত্রিকাটিতে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে। এই চিন্তাশীল রচনাগুলি পাঠকদের চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করবে। এই পত্রিকাটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। পত্রিকাটি সিনেক্লাবের কার্যালয়ে পাওয়া যায়।

থিয়েটার সেণ্টারের ক্ষতি

গত ১৩ই অক্টোবর মধ্যরাত্রে দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার সেণ্টার হলটি আগুন লেগে সম্পূর্ণভাবে ভস্মে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে থিয়েটার সেণ্টারের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এদেশে সর্বপ্রথম থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল, প্লে-কম্পিটিশন্, নাট্য-বিদ্যালয় প্রভৃতি সুরু করেন এই থিয়েটার সেণ্টার প্রতিষ্ঠান। নাট্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা বেকার হয়ে বসে না থাকেন, সে ব্যবস্থাও এঁদের আছে। স্কুলের শিক্ষার ভেতর দিয়ে প্রস্তুত হয়ে এখানকার বহু ছাত্র-ছাত্রী থিয়েটার সেণ্টারের পেশাদারী মঞ্চসংস্থা 'মুখোসে' নিয়মিতভাবে অভিনয় করবার সুযোগ পান। বৃটিশ ড্রামালীগের আদর্শ অনুসরণ করেই থিয়েটার সেণ্টার প্রতিষ্ঠানটি পরিকল্পিত।

দেশের শিল্পকলা এবং কৃষ্টির বিবর্ধক ও সহায়ক হিসাবে থিয়েটার সেণ্টারের রঙ্গালয়টি অনতিবিলম্বেই চালু করা দরকার। দেশের শিল্প-কলা-নৃত্য-নাট্যের সম্প্রসারণের জন্য সরকার বহুভাবে বহুদিকে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। আশা আছে, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি অচিরেই এদিকে আকৃষ্ট হবে এবং থিয়েটার সেণ্টারের ন্যায় কর্মক্ষম প্রতিষ্ঠানটি সরকারের অর্থ-সাহায্যে নবজন্ম লাভ করে নাট্যশাস্ত্র, নাট্যকলা এবং নাট্যবিদ্যার প্রচার ও পরিপুষ্টির উদ্দেশ্যে পূর্ণভাবে কার্যকরী হয়ে উঠবে। কারণ আমাদের দেশে এ ধরণের Intimate Theatre যত গড়ে ওঠে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

● 'থাট্টন ডেজ' ছবিতে বুলগেরিয়ার অভিনেত্রী আনাস্তা সিয়া বাকুরজিয়েভা

● বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র উৎসবের রম্যস্থান ভার্নার দৃশ্য

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র নগরী

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্রের খবর আমাদের দেশে বিশেষ পৌঁছয় না। প্রজাতান্ত্রিক শাসনের ২০ বছরে বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র-শিল্প আশ্চর্যজনকভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

বুলগেরিয়ার জন-গণতান্ত্রিক সরকারের উদ্যোগে মাউণ্ট ভিটোশার উপত্যকায় এক চলচ্চিত্র নগরী গঠিত হয়েছে। সুন্দর পর্বতভূমির ১১০ হেক্টার ভূমির ওপর স্টুডিও, ল্যাবরেটরি, যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা, গুদাম, চলচ্চিত্র রক্ষা করার উপযোগী ঘর, অতিরিক্ত সুটিং সেট এবং সাজানো বাগান, নীচে নদী ও হ্রদ ইত্যাদি রয়েছে। এই চলচ্চিত্র নগরীতে তিনটি আধুনিক স্টুডিও আছে। এই তিনটির একটি ১২২০ স্কোয়ার মিটার এবং অপর দুটি ৭৫০ স্কোয়ার মিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে। আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণে যত রকমের যন্ত্রপাতি এবং সুবিধা দরকার, তার প্রত্যেকটি এখানে পাওয়া যাবে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সব রকমের সুবিধা লাভের জন্য এখানে ইলেকট্রিক সাবস্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এই সাব-স্টেশন থেকে ১৯৫০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ আমাদের ময়ূরাক্ষীতে উৎপাদিত বিদ্যুতের সমান।

ছবির কাজে বৃষ্টিপাত, হ্রদ, সুইমিংপুল, অথবা বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি ইত্যাদি দেখাবার জন্য এখানে ব্যবস্থা রয়েছে। পরিচালকরা চাইলেই টেকনিশিয়ানরা ওসব ব্যবস্থা করে দেয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, শব্দ গ্রহণের জন্য বৈজ্ঞানিক স্টুডিও। এরূপ স্টুডিও পরিচালকদের কাছে অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস। রেকর্ডিং এবং রি-রেকর্ডিং-এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা একই স্থানে একই সঙ্গে বড় পাওয়া যায় না। দৃশ্যসজ্জার জন্য প্লাস্টিক ব্যবহারের সুযোগও রয়েছে। প্লাস্টিকের বাড়ি-ঘর থেকে গৃহসজ্জা পর্যন্ত এমন নিখুঁতভাবে করে দেওয়া

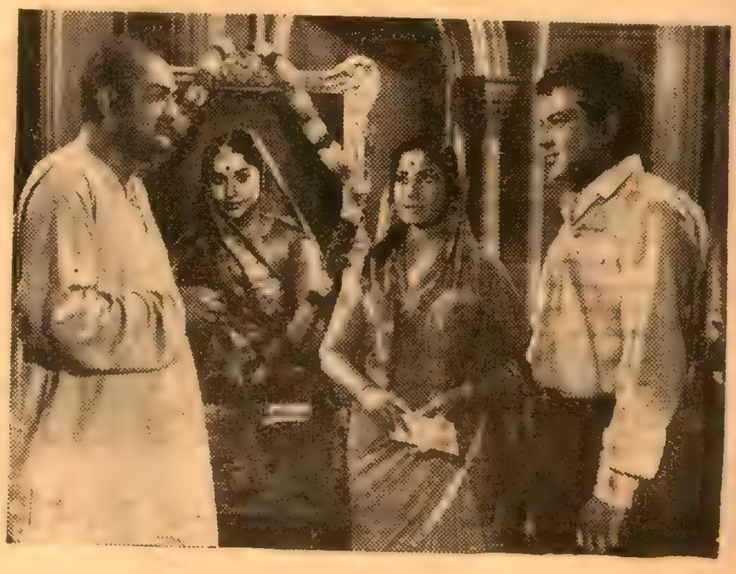

● এ ভি এম-এর 'ম্যায় ভি লেড়কী হুঁ' ছবির একটি দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র, মীনাকুমারী ও নবাগত রঙ্গরাও।

'ম্যয় ভী লেড়কী হুঁ' ছবিতে পুষ্পলতা

হয় যে, আসল আর নকলের প্রভেদ বোঝা যায় না।

এই চলচ্চিত্র নগরী তাই আজ আর কেবলমাত্র বুলগেরিয়ার চিত্র নির্মাতাদের কাছে নয়, বাইরের চিত্র নির্মাতাদেরও আকর্ষণের স্থান হয়েছে। পোলিশ পরিচালক আঁদ্রে ওয়াজদা এখানে ছবি করছেন। একটি অস্ট্রিয়ান সংস্থাও এখানে ছবি নির্মাণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে, আধুনিক ব্যবস্থাপূর্ণ হোটেল, রেস্তোরাঁ; বাসস্থানের সুবিধাযুক্ত স্থানে পরিচালকরা যে ছবি নির্মাণে আগ্রহী হবে এ তো স্বাভাবিক।

বুলগেরিয়ান ভার্না চলচ্চিত্র উৎসব ইতিমধ্যে বিশ্বের চলচ্চিত্র উৎসবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই উৎসবের 'স্বর্ণ গোলাপ' সহ বারটি পুরস্কার পরিচালকদের আহ্বান জানাচ্ছে।

শুভারম্ভ ৩০শে অক্টোবর

মুরুগন ব্রাদার্সের

ম্যঁায় ভি লেড়কি হুঁ

পরিচালনা
এ. সি. ত্রিলোকচন্দ্র
সংলাপ ও গীত
রাজেন্দ্রকৃষ্ণ
সঙ্গীত
চিত্রগুপ্ত
কাহিনী
শৈলেশ দে
(বধূ)

AVM PRODUCTIONS

হিন্দ — বসুশ্রী — বীণা
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে
।। দি ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স পরিবেশনা ।।

সংগীত কথা

সঙ্গীতাচার্য সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

বাংলা দেশের বিদগ্ধ ও সংগীত-রসিক মহলে শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নাম স্বতন্ত্র পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। শুধু বাংলা দেশেই নয়, সর্বভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বাংলা দেশে ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হিসাবে যে ক'জন আদর্শবাদী গুণী সংগীতশিল্পীর নাম করা চলে, সিদ্ধেশ্বরবাবুর আসন তার প্রথম সারিতেই নির্দিষ্ট। বর্তমান যুগের চটকদারী প্রচার ও সস্তা হাততালির মোহে তিনি আজো নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি, সংগীতশিল্পী হিসাবে এখানেই তাঁর বিশিষ্টতা। আজীবন সংগীতের একনিষ্ঠ সাধক সিদ্ধেশ্বরবাবু নিজের জীবনে বাংলা দেশের সংগীতের একটি যুগকে ধারণ করে আছেন। যে পরিবার থেকে তিনি এসেছেন, সেই মুখার্জি পরিবার বাংলা দেশের সংগীতের ক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল ধরে রসসঞ্চার করে এসেছে। আজো তার অব্যাহত ধারা চলেছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায়। সংগীতাচার্য সিদ্ধেশ্বরবাবুর ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই আজ সংগীতের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ছেলেবেলা থেকেই সংগীতে সিদ্ধেশ্বরবাবুর অপূর্ব প্রতিভা প্রকাশিত হয়। হয়ত পৈতৃক সূত্রেই তাঁর এ ক্ষমতা পাওয়া—কেন না পিতা গজেন্দ্রনাথ তৎকালে সুগায়ক বলে পরিচিত ছিলেন এবং সংগীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

বাল্যে পিতার কাছেই তাঁর সংগীতের হাতেখড়ি। পরবর্তীকালে তিনি তানরাজ বিপিন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট টপ্পা, নগেন দত্ত, বাদল খাঁ, রামপুরের খাদেম হোসেন, মুর্শিদাবাদের মঞ্জু সাহেব, পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রমুখের নিকট খেয়াল, সতীশ দত্ত (দানীবাবু)র নিকট ধ্রুপদ ও ধামার, কীর্তনাচার্য হরিদাস ব্রজবাসী ও ব্রজগোপাল অধিকারী মহাশয়ের নিকট কীর্তন, জনাব জসীমউদ্দিন সাহেবের নিকট লোকসংগীত এবং কাজী নজরুল ইসলামের নিকট জাতীয় সংগীত ও অন্যান্য বাংলা গান শিক্ষা করেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত সংগীতসম্রাট শ্রীভোলানাথ ভাটজীর নিকট এখনও তিনি নিয়মিত উচ্চাঙ্গ সংগীত শিক্ষা করে থাকেন। তিনি সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় একাধিকবার ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, খেয়াল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন। তাঁর মুখে টপ্পা গান শুনে স্বয়ং বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব তাঁকে বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ টপ্পা গায়ক বলে অভিনন্দিত করেছেন। ধ্রুপদ, ধামার ও কীর্তনগানেও বর্তমানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শুধু তাই নয়, লোক-সংগীত, শ্যামাসংগীত, প্রাচীন বাংলা গান ও আধুনিক বাংলা গানেও তিনি সমান দক্ষ। এক কথায় উচ্চাঙ্গ ও লঘু—সংগীতের সর্বক্ষেত্রেই তিনি সমান পারদর্শী।

বর্তমানে ইনি প্রয়াগ সংগীত সম্মিলনীর সর্বভারতীয় 'সংগীত প্রভাকর' পরীক্ষার পরীক্ষক। ১৯৫৭ সালে ইনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় 'সংগীত প্রভাকর' পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেন। এইচ-এম-ভি ও টুইনে ইনি বহু রেকর্ড করেছেন। এঁর 'বৃন্দাবন পথযাত্রী' গানটি না-শুনেছেন এমন লোক খুব কমই আছেন। চলচ্চিত্রের সংগেও ইনি বহুদিন জড়িত ছিলেন। নিউ থিয়েটার্স ও ফিল্ম কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার সহকারী সংগীত পরিচালক-রূপে দীর্ঘদিন তিনি কাজ করেছেন। তখন ছায়াছবিতে প্রায়ই এঁর কণ্ঠ শোনা যেত। স্বর্গত সায়গল ও সিদ্ধেশ্বর-বাবু একসংগে সমানভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন—যা হয় না, সিপাহীকা স্বপ্না, দুঃখীর ইমান (সর্বহারা), নীলাকক্ষ প্রভৃতি চিত্রে ইনি সংগীত পরিচালনা করেছেন।

● সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়

স্বদেশী আমলে ইনি শুধু বিপ্লবী দলের সংগেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, উপরন্তু নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও কাজী নজরুল ইসলামের সংগে বহু আন্দোলন ও সভা-সমিতিতে স্বদেশী সংগীতে নেতৃত্বও করেছেন। সেজন্য তৎকালে তাঁকে কম নির্যাতনও সহ্য করতে হয় নি। তা ছাড়া বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীতে ইনি কাজী নজরুল ইসলামের প্রধান সহকারীরূপেও বহুদিন কাজ করেছেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রের প্রায় জন্ম থেকেই ইনি এই প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত আছেন।

বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড় বড় শহরেই ইনি অগণিত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে শুধুমাত্র সর্বভারতীয় খ্যাতিই অর্জন করেন নি, উপরন্তু বাংলা এবং বাংলা দেশের বাইরে বহু সরকারী ও বেসরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক সংস্থার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-মিউজ ও বি-মিউজ পরীক্ষার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরি-চালিত সিনিয়র বেসিক ট্রেনিং কলেজের সংগীত বিষয়ের ইনি প্রশ্নপত্রকারক এবং পরীক্ষক। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়, নিখিল বঙ্গ, নিখিল ভারত প্রভৃতি বিভিন্ন সংগীত প্রতিযোগিতায় ইনি প্রতি বৎসরই বিচারকের আসন অলংকৃত করে থাকেন। সংগীতে এঁর অনন্য-সাধারণ প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯৫১ সালে ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ এঁকে 'সংগীত রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছেন।

শুধুমাত্র সংগীতশিল্পী ও সংগীতের আচার্য হিসাবেই ইনি খ্যাতিমান নন, সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসাবেও এঁর কৃতিত্ব বড় কম নয়। ভারতের, বিশেষ করে বাংলা দেশের নিজস্ব সংগীতের পুনরুজ্জীবন ও সম্প্রচারের কার্যে এঁর অনলস প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ১৯৫৮ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত লোকসংগীত ও সাংস্কৃতিক মহাসম্মেলনে ইনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় নিখিল বঙ্গ কীর্তন মহা-সম্মিলনীর অধিবেশন প্রধানত এঁরই উদ্যোগে এবং চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া 'নিখিল বঙ্গ ধ্রুপদ প্রচার পরিষদ', 'নিখিল বঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্য সম্মিলন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির মূলেও এঁর যথেষ্ট দান আছে। বর্তমানে সিদ্ধেশ্বরবাবু ভারতবর্ষের বহু গুণী, জ্ঞানী ও সংগীতশিল্পীর সমবায়ে গঠিত 'ভারতীয় সংস্কৃতি পরিষদে'র সম্পাদক-রূপে ভারতীয় সংগীত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনকল্পে নতুন আন্দোলন সৃষ্টির কার্যে নিযুক্ত আছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সিদ্ধেশ্বরবাবু অত্যন্ত ভদ্র, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কার।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

নসীরামের পর অমৃত বোসের নাট্যাকারে রূপান্তরিত স্বর্ণলতা উপন্যাস (লেখক : তারক গাঙ্গুলি) সরলা নামে মঞ্চস্থ হয় এবং প্রথম দিকটায় বেশ দর্শক সমাগম সুরু হয়—কিন্তু তারপরেই বিক্রি কমতে থাকে।

গিরিশচন্দ্র স্টারে ফিরে আসার পর তাঁর প্রথম সামাজিক নাটক প্রফুল্ল রচনা করেন এবং দু মাস রিহার্সাল দেবার পর ১৮৮৯এর ২৭শে এপ্রিল নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

প্রফুল্ল বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি সেরা নাটক। ইংলণ্ডের স্টেজে যেমন অভিনেতা, অভিনেত্রীরা যতদিন না শেক্সপীয়ারের নাটকের চরিত্রে অভিনয় করে সাফল্য লাভ করেন, ততদিন তাঁরা কৌলীন্যের পর্যায়ে উঠতে পারেন না। তেমনি বাংলা-স্টেজেও সত্যিকার বড় অভিনেতা হতে হলে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল এবং দ্বিজেন্দ্র-লালের সাজাহান ও চন্দ্রগুপ্তে অভিনয় করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

প্রফুল্লর যোগেশ চরিত্র সম্বন্ধেই চিন্তা করতে গিয়ে দেখা যায়—গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃত মিত্র থেকে সুরু করে দানীবাবু, শিশিরকুমার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি সেরা অভিনেতারাই এ-চরিত্রে মঞ্চাবতরণ করেছেন। তেমনি চাণক্য চরিত্রেও দানীবাবু, শিশির-বাবু, তিনকড়িবাবু, নরেশবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সবাই ভাগ্যপরীক্ষা করতে নেমেছেন। সাজাহান নাটকটিতেও দুটি প্রধান চরিত্র সাজাহান এবং আওরঙ্গজেব চরিত্রে দানীবাবু, শিশিরকুমার, নরেশচন্দ্র, রাধিকাবাবু, দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু সবাই অভিনয় করে নাম কিনেছেন।

শিশিরোত্তর যুগের নবনাট্যাচার্য এবং নটসূর্যদের কখনও কল্পনা করতে পারেন প্রফুল্ল, সাজাহান বা চন্দ্রগুপ্তের কোন ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে! সেই দম, সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, সেই কণ্ঠস্বরের উপর অদ্ভুত কণ্ট্রোল কোথায় চলে গেছে আজ অভিনেতাদের মাঝ থেকে।

অবশ্য শুধু নাট্যমঞ্চকেই বা দোষ দিই কেন—বাংলার সর্বক্ষেত্রেই আজ এই অবনতি।

স্টারের প্রফুল্লর বিভিন্ন নামজাদা ভূমিকায় নামেন :

যোগেশ—অমৃত মিত্র
রমেশ—অমৃত বোস
সুরেশ—কাশীনাথ চ্যাটার্জী
ভজহরি—বেলবাবু
মদন দাদা—নীলমাধব চক্রবর্তী
কাঙ্গালীচরণ—শ্যামাচরণ কুণ্ডু
প্রফুল্ল—ভূষণকুমারী।

প্রফুল্ল সামাজিক জীবনের ট্র্যাজিক দিকগুলির সঙ্গে বাংলার থিয়েটার রসিকদের নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দিল। এ-নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্র প্রায় সবই প্রাণবন্ত এবং স্বাভাবিক। যোগেশের মত মহান এবং উদার, রমেশের মত ভিলেন, প্রফুল্লর মত সহজ সরল বাঙালী বধূ এবং জ্ঞানদার মত স্বামীভক্তিপরায়ণা হিন্দুনারীর চরিত্র আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে কজন নাট্যকার আঁকতে পেরেছেন। কাঙ্গালীচরণের মত শয়তানও সমাজে দেখা যায়—তবে জগমণি চরিত্রটি একটু অস্বাভাবিক মনে হয়।

স্টেটস্‌ম্যানের মত বাঙালী-বিদ্বেষী পত্রিকাতেও তিনদিন—২১শে মে, ৮ই জুন এবং ৯ই জুন ১৮৮৯—প্রফুল্লের সমালোচনা বের হয়। কিছু কিছু এখানে তুলে দিচ্ছি :

Profulla (At the Star Theatre)

The new social play Profulla by the well known dramatist and manager of the above theatre Babu Girish Chandra Ghose was produced before a crowded house on saturday last. The drama is based upon the incidents not uncommon in real life in Hindoo Society and is intended not only to amuse but equally to impart instruction and moral lessons.

Although ruined by drink Jogesh has at times a sense of his degradation and his sentiments may be expressed in the words of Cassio :

'O thou invisible spirit of wine if thou hadst no name to be known by, let us call thee devil.'

He knows the value of a good name and expresses himself almost in the words of Iago :

● 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ

'Good name, in man or woman,
dear my lord,
Is the immediate jewel of their
souls;
Who steals my purse steals trash!
'tis something, nothing.
'T was mine 'tis his, and has
been slave to thousands
But he that filches from me
my good name
Robs me of that which not enriches
him, and make me poor indeed.'

Profulla has the reputation of being remarkably well enacted at the Star Theatre under the immediate supervision of the author. The character of Jogesh is strongly limned. The change from the noble minded generous man who voluntarily divided his property which he had taken thirty years to acquire among his brethern and to the poor, heartless, degraded and hopeless drunkard was depicted with great dramatic force that had an evident effect especially that part where he is represented as begging in the streets and even at the funeral of his wife craving for a glass of wine entirely oblivious of the solemnity of the situation.

গিরিশবাবু এরপর স্টারের জন্য হারানিধি, চণ্ড, মলিনাবিকাশ ও মহাপূজা লেখেন এবং মঞ্চস্থ করেন। এসব নাটকে থিয়েটারের প্রচুর লাভ হয়। চণ্ড নাটকেই দানীবাবুর প্রথম পেশাদারী মঞ্চে আবির্ভাব। এর আগে তিনি অমর দত্ত ও চুনীলাল দেবের সঙ্গে সখের থিয়েটারে জনায় প্রবীর, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ প্রভৃতি ভূমিকায় নেমে নাম করেছিলেন।

দানীবাবুর থিয়েটারে নামা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রথমটায় আপত্তি ছিল। এদিকে স্কুলে থাকতেই দানীবাবুর পড়াশুনায় একেবারেই মন ছিল না। কিছুটা আঁকার হাত থাকাতে শেষে গিরিশচন্দ্র ছেলেকে আর্ট স্কুলে ভর্তি করে দেন। কিন্তু এখানেও দানীবাবু বেশিদিন থাকেন নি। এরপর গিরিশচন্দ্র তাঁকে ব্ল্যাকউড অফিসে এ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু অমনোযোগিতা এবং অনিয়মানুবর্তিতার জন্য এখানেও দানীবাবু থাকতে পারলেন না। লেখাপড়া নেই, কাজকর্ম নেই—ক্রমশ দানীবাবু যেন অধঃপাতের পথে যেতে বসেছিলেন।

অমৃতলাল মিত্র ছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রধান শিষ্য এবং তাঁকে গুরু নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন। দানীবাবুর পিসীমা একদিন অমৃতলালকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—'অমৃত, তোরা দেনোর কোনো ব্যবস্থাই করবি নে, শেষে কি সে চোর-ডাকাত হয়ে জেল খাটবে?'

অমৃতলাল প্রথমটায় গুরুর আপত্তির কথা জানালেন—কিন্তু পিসীমা যখন বললেন যে, তিনিই একমাত্র গুরুকে

দুর্গাদাস বান্দ্যাপাধ্যায়

বুঝিয়ে মত বদলাতে পারেন, তখন 'দেখি কি করতে পারি' বলে চলে গেলেন।

অমৃত মিত্র ছিলেন গিরিশচন্দ্রের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। গিরিশ তাঁকে সন্তানবৎ স্নেহ করতেন। এই সময় অমৃতলাল প্রায় প্রতিদিনই গিরিশবাবুর বাড়িতে আসতেন। গিরিশচন্দ্র নাটক নিজের হাতে লিখতেন না—তিনি বলে যেতেন এবং অমৃতলাল লিখে নিতেন। একদিন কথায় কথায় অমৃতবাবু সুরেন্দ্রনাথকে (দানীবাবু) থিয়েটারে আনবার প্রস্তাব করলেন। গিরিশ বাধা দিয়ে বললেন, বাপ-ছেলের এক সঙ্গে অভিনয় করাটা শুধু লজ্জাজনক নয়, একটা কুৎসিত ব্যাপার।

অমৃতলাল বুঝিয়ে বললেন—অভিনয়ে দানীর একটা স্বাভাবিক অনুরাগ আছে, এইদিকেই মন দিলে তার প্রতিভা খুলবে—জীবনে সে বড় হতে পারবে—সুতরাং বাধা দিয়ে লাভ কি।

গিরিশচন্দ্র এ যুক্তি কাটিয়ে উঠতে পারলেন না—তবু মুখে সম্মতি দিলেন না—চুপ করে রইলেন।

এরপর অমৃতলাল গোপনে গোপনে দানীকে অভিনয় শিক্ষা দিতে সুরু করলেন। তখন চণ্ড নাটকের মহলা চলছে—সব ভূমিকাতেই লোক ঠিক হয়ে গেছে—গিরিশ রঘুদেবের ভূমিকায় কাউকে ঠিকমত পাচ্ছেন না। কিন্তু ওই ভূমিকার কথা উঠলেই অমৃতলাল বলেন, রঘুদেবের জন্য ভাবতে হবে না—আমি ওই ভূমিকার অভিনেতা ঠিক করে রেখেছি।

ড্রেস রিহার্সালে অমৃতলাল সুরেন্দ্রনাথকে এনে বললেন—এই রঘুদেব। রিহার্সালে দানীর অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্রও কম বিস্মিত হন নি। অমৃত মিত্তিরের সঙ্গে সমানে তাল রেখে অভিনয় করে যাওয়া—তাও আবার প্রথম পেশাদারী মঞ্চে নেমেই, এ তো আর সহজ কথা নয়। প্রথম রাত্রের অভিনয় দেখেই দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন—বাপকা বেটা বটে।

গিরিশচন্দ্র শুধু অমৃতলালকে বলেছিলেন—অমৃত, তুই দানীকে দেখিস।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। অমৃত মিত্তিরের শিক্ষায় দানীবাবুর প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল বটে—তবে তাঁর সংলাপ বলবার ঢংটা ছিল সুরেলা। পরে মিনার্ভায় যখন স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের কাছে শিক্ষাধীন থাকেন, তখনই অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয়—গলার সুরের ভাবটা কেটে যায়—চোখের কাজ, মুখের ভেতর দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি, অঙ্গভঙ্গী করবার কৌশল প্রভৃতি আয়ত্তাধীন হয়।

স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে কিন্তু গিরিশবাবুর বেশিদিন সদ্ভাব রইল

...। এ বিষয়ে সুন্দর বিবরণী দিয়েছেন অপরেশবাবু তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বইতে :

'ইতিপূর্বে স্টারের অধ্যক্ষ ছিলেন অমৃতলাল বসু; গিরিশচন্দ্র আসিয়া পুনরায় অধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্তু নানাবিষয়ে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। চাণক্যের নীতিশাস্ত্রে লেখে, পুত্র বড় হইলে তাহার সঙ্গেই তো মিত্রবৎ ব্যবহার করিতে হয়; সুতরাং শিষ্য বড় হইলে বা মনিব হইলে চাণক্য-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত, গিরিশচন্দ্র তাহা অত্যধিক শিষ্যস্নেহের মোহে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন; অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও তো বদলায়। পূর্বেকার মত গিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্ব স্টার সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না; যে গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়া একদিন স্টারের জন্য নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে গিরিশচন্দ্র পাঁচ বৎসরের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া ষোল হাজার টাকা স্টারকে দিয়াছিলেন, স্টার থিয়েটার সেই গিরিশচন্দ্রকেই বরখাস্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন। গিরিশচন্দ্র এই বরখাস্ত-পত্র পাইবার পূর্বে স্টারের জন্য 'আবুহোসেন' ও 'মুকুল মুঞ্জরা' এই দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন; কিন্তু স্টারের কর্তৃপক্ষগণ (গিরিশচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছি) এই দুইখানি বই পড়িয়া বলিয়াছিলেন 'গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।' অথচ অনেকেই জানেন, ওই আড়াই ঘণ্টার অপেরা 'আবুহোসেন' খুলিয়া মিনার্ভা এক সময় লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করিয়াছিল।

স্টারে গিরিশবাবুর চাকরি গেল, সঙ্গে সঙ্গে স্টারের দলও ভাঙ্গিল। নীলমাধববাবু, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া হঠাৎ স্টার থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন।

---নীলমাধববাবু যে দল লইয়া বাহির হইলেন, তাহার নাম হইল 'সিটি থিয়েটার'। ছোট স্টেজ বীণা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া লইয়া ইঁহারা থিয়েটার খুলিলেন; গিরিশবাবু নেপথ্যে থাকিয়াই ইঁহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।'

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

একাত্ম

তাতিয়ে দিয়ে মাতানো অভিনয়

অক্ষয় চক্রবর্তী মশাই সেকালের একজন নামকরা কৌতুক অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনয়ে দর্শকেরা প্রচুর হাসির খোরাক পেলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অভিনয় করা কালীন ভূমিকার সঙ্গে তিনি একাত্ম হ'য়ে যেতেন। অনেক সময় তিনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেন না। ভুলে যেতেন যে, তিনি অভিনয় করছেন। এইরকম আত্মভোলা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে অনেক সময়ে বিভ্রাটে পড়তে হয়। অক্ষয়বাবুকে নিয়েও মাঝে মাঝে বিভ্রাটে পড়তে হোত।

যে সময়ের কথা বলছি, অমর দত্ত মশাই সে-সময়ে স্টার থিয়েটারের প্রযোজক-পরিচালক। অক্ষয়বাবুও তখন স্টার থিয়েটারের শিল্পী-গোষ্ঠিভুক্ত।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের 'কাল-পরিণয়' নাটকে অক্ষয়বাবু শম্ভুর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। শম্ভুর চরিত্রটি একটু অদ্ভুত ধরণের। 'হরিবোল' শুনলেই শম্ভু চটে যায়। তখন আর তার দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে, তাই বলে গালাগালি দিতে সুরু করে। নাটকের এক জায়গায় আছে, বৃদ্ধ চাকর শম্ভুকে হুঁকাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে, ফিরে যাওয়ার সময় আপন মনে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে। আর কোথায় আছে? শম্ভু শুধু চটে ওঠে না, সেই সঙ্গে তেড়ে মারতে যায় চাকরকে। অক্ষয়বাবু ঐ জায়গায় এমন নিখুঁত অভিনয় করতেন যে, দর্শকেরাও প্রেক্ষাগৃহ থেকে হরিধ্বনি দিয়ে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবুরও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতো।

একদিন 'কাল-পরিণয়' হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। অক্ষয়বাবু চাকরের মুখে 'হরিবোল' শুনে যেই তেড়ে মারতে যাবেন, এমন সময় প্রেক্ষাগৃহ থেকে সেদিন একজন মাত্র দর্শক 'হরিবোল' বলে উঠলো। আর কোথায় আছে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর পাদ-প্রদীপের সম্মুখে এগিয়ে এসে, সেই দর্শকের প্রতি যথেচ্ছ কটূক্তি করে বললেন—সাহস থাকে ত সামনে এসে বলো! শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। সেই সঙ্গে গালাগালিমন্দও করে বসলেন। সেদিন অভিনয় করতে করতে অক্ষয়বাবু এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, খেয়ালই ছিল না তিনি অভিনয় করছেন।

যাই হোক, অক্ষয়বাবু মঞ্চ থেকে চলে এলে, সর্বাধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করলেন। এবং সেই সঙ্গে একথাও জানালেন যে, অক্ষয়বাবুর এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়। কেন না অভিনয় করতে করতে তিনি নিজেই ভুলে যান যে অভিনয় করছেন।

অমরেন্দ্রনাথের ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা একযোগে বলে উঠলেন যে, অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে তাঁরা মুগ্ধ। 'হরিবোল' বলে তাঁরা তাঁকে শুধু তাতিয়েই দেন নি, সেইসঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় দর্শনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন।

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতীতে পাঠকমনের যথার্থ মূল্যায়নে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সকল পাঠকদের পক্ষ থেকে। ঠিক কবে থেকে এই পত্রিকাটির সঙ্গে আমি গভীর সম্পর্কের যোগসূত্রে আবদ্ধ বলতে পারব না,—তবে এর প্রতি যে ঐকান্তিক টান আমি মনের দিক থেকে অনুভব করি, তা অস্বীকার করি কেমন করে। একটি সংখ্যা হাতে আসে—আর আগামী সংখ্যার জন্য মন আরও আগ্রহশীল হয়ে ওঠে।

সমস্ত বিভাগগুলির লেখাই যথেষ্ট রুচির পরিচায়ক। হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

পত্রিকাটি আমি স্থানীয় এজেন্ট মারফত সংগ্রহ করি। মাঝে মাঝে পেতে বেশ বিলম্ব ঘটে। এ ব্যাপারে আপনার ব্যক্তিগত দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

প্রতি সংখ্যায় একটি করে বিদেশী ছোট গল্পের অনুবাদ পেলে খুশি হব।

উমা বর্মন

ডিব্রুগড় (আসাম)

* * *

'পাঠকমন' অধ্যায়ে পাঠক-পাঠিকাদের আপনাদের পত্রিকা সম্পর্কে সমালোচনার সুযোগ দিয়েছেন। এর-জন্য সত্যই আনন্দিত।

বর্তমান যুগে পুঁথিগত বিদ্যেই সর্বস্ব, বহির্জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম 'আন্তর্জাতিক', 'ভারতদর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'শহর কলকাতা' আমাদের বহির্জগতের জ্ঞানের স্বল্পতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

বিখ্যাত লেখক-লেখিকার গল্প-উপন্যাস চিরকালই ভাল বলব আর তাদের সংখ্যাও অল্প। বাংলা দেশের বুকে এমন অনেক লেখক-লেখিকা আছেন যাঁরা তাঁদের প্রতিভাকে সারপূর্ণভাবে বিকাশ ঘটাতে পারেন না। ফলে বহু ভাবী প্রতিভাধরের অপমৃত্যু ঘটে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' এই সকল উদীয়মান লেখক-লেখিকাদের সুযোগ দিয়ে থাকে।

রঙ্গজগতের নির্ভীক সমালোচক 'সুজন'কে ধন্যবাদ জানাই। তবে ফটোগুলো এখনও অস্পষ্টভাবে ছাপা হচ্ছে। ভাঙা অক্ষরের ছাপা আর এখন চোখেই পড়ে না বলা যায়। পত্রিকাটিকে আরও উন্নত করার জন্য চেষ্টা করছেন, তা সহজেই অনুমান করতে পারি।

শ্রীগৌরশংকর দে

* * *

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক। অল্পমূল্যের সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকাখানি আমাদের ছাত্রসমাজের মধ্যে বিশেষ আকর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ হল, এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা অনেক অজানা বড় বড় মহাপুরুষদের জীবন-ইতিহাস ও নানা দেশ-দেশান্তরের বিচিত্র কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করতে পারছি। যেমন আমাদের ছাত্রসমাজের মাঝে পড়ার মত বিশেষ কতকগুলো আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য বিবরণ হল, সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর, ভারত-দর্শন, আন্তর্জাতিক, খেলাধুলা, বঙ্গদর্শন ইত্যাদি।

আমার বিশেষ অনুরোধ হল এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে মহাপুরুষদের জীবনী প্রকাশ ক'রে তাঁদের আদর্শ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের আরো আত্মসচেতন করে তুলবেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার মান বর্তমানে যা আছে, তা থেকে যেন আরো ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়—এইটিই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীদীপক দে

ছাত্র (প্রগতি বিদ্যা-ভবন)

আগরতলা, ত্রিপুরা

* * *

বিগত এক বছর ধ'রে আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত গ্রাহিকা। হয়তো বলবেন বাজারে এত সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা থাকতে আমার বসুমতীর ওপর ঝোঁক হ'ল কেন? প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ প্রশ্নের পরি-প্রেক্ষিতে আমার নিম্নলিখিত উত্তরগুলিও বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়?

(১) বহু অনামী লেখকের প্রতিভার স্বাক্ষর দেখতে পাই প্রতি সপ্তাহে, যার জন্য সাপ্তাহিক বসুমতীকে শিল্পের একমাত্র মুখপত্র বললেও অত্যুক্তি হবে না।

(২) নতুন ধরণের কতকগুলো বিভাগ আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর মাধ্যমে পাই। যেমন ধরুন, (ক) পদাতিকের শহর কলকাতা, (খ) দেবনারায়ন গুপ্তের নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী, (গ) বঙ্গদর্শন প্রভৃতি। এ সমস্ত বিভাগগুলো জ্ঞানপিপাসু পাঠকদের পক্ষে এক মূল্যবান সম্পদ।

(৩) এর 'মূল্য' অন্যান্য যে কোন পত্র-পত্রিকার তুলনায় অতি সামান্য। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে জ্ঞানপিপাসুদের কাছে এও একটা কম কথা নয়—কি বলুন?

কিন্তু এ ছাড়া, কিছু অভিযোগও আমার আছে, যা প্রকাশ না করলে নিজের বিবেকের কাছে ছোট হয়ে যেতে হবে। কাজেই সেগুলো এ প্রসঙ্গে না বলে পারছি না।

(১) ক্রীড়া-জগতের সংবাদ প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য—এর আশু উন্নতির প্রয়োজন।

(২) প্রায়ই 'ক্রমশঃ' গল্প বা উপন্যাস একঘেয়েমি এনে দেয় তো বটেই, এবং এটা পত্রিকার প্রগতির পক্ষে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক।

(৩) বর্তমানে 'কবিতাগুলো' কেমন যেন আবোল-তাবোল বকা গোছের মনে হয়। কতকগুলো দাঁতভাঙা শব্দ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভাব থাকলেই হ'ল। সাধারণের পক্ষে খুবই দুর্বোধ্য। আপনারা আরো বেশি বুঝবেন। অবশ্য সব কবিদের কথাই বলছি না। কবিতার সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন, যেটার দাম আছে সাহিত্য-প্রগতির পক্ষে এবং মান স্বচ্ছ ও সাবলীল হওয়া প্রয়োজন।

(৪) 'ছোট গল্প' বলতে যা বোঝায় সেটা একেবারেই নেই আপনাদের পত্রিকায়, এদিকে দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

(৫) প্রবন্ধ, ভাবানুবাদ, সংস্কৃতপূর্ণ গল্প সংযোজিত হলে সাপ্তাহিক বসুমতী আরও প্রাধান্য লাভ করবে সাহিত্য-পিপাসুদের কাছে।

(৬) এ ছাড়া যেটা অন্য কোন সাপ্তাহিকীতে নেই, যেমন 'ছোটদের জন্য' একটি বিভাগ খুললে মনে হয় খুবই ভাল হবে।

এম রায় (দাশগুপ্ত)

৪৫ সেন্ট্রাল রোড

কলিকাতা-৩২

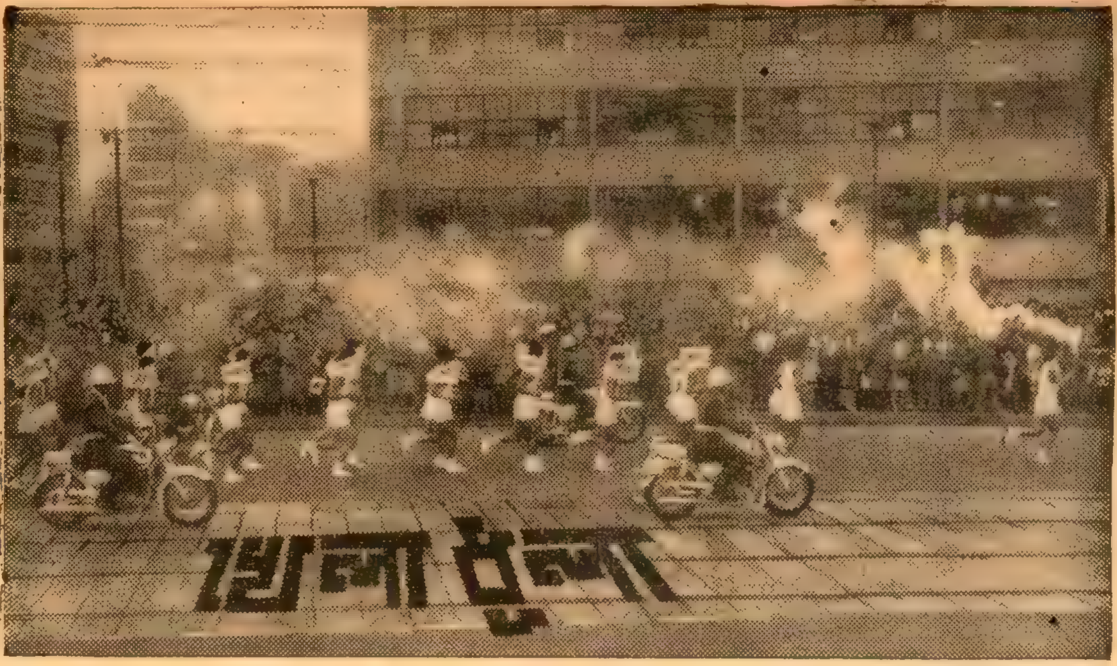

● টোকিওর রাজপথে অলিম্পিক মশালবাহিনী

ভাঙলো মিলন মেলা

শ্রীঅমিতাভ

'অলিম্পিক পদক অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা যায় না। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পদ আহরণ নয়। জাতি, বর্ণ, বংশমর্যাদা অর্থসম্পদ প্রভৃতির প্রভাবমুক্ত এই প্রতিযোগিতা। এখানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় প্রতিভার মানদণ্ডে।'

এই ক্ষুদ্র ভাষণ দ্বারা আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থার সভাপতি মাননীয় আভেরি ব্রাণ্ডেজ, জাপানের মহামান্য সম্রাটকে আহ্বান জানালেন অষ্টাদশ অলিম্পিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে। টোকিওর জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর এশিয়ার পুণ্য-ভূমিতে প্রথম অনুষ্ঠিত অলিম্পিক আসরের উদ্বোধন সূচিত হল।

এবছর বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনুমান আট সহস্র। এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আমেরিকার প্রাধান্য বিঘোষিত হচ্ছে। কি স্বর্ণপদক, কি রৌপ্যপদক, কি ব্রোঞ্জপদক, সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় সকলকে পেছিয়ে ফেলে আমেরিকার জয়যাত্রা। এবারের আসরে আমেরিকাকে পদক তালিকায় অতিক্রম করা অন্য কোন দেশের পক্ষে অসম্ভব। আমেরিকার এই অব্যাহত বিজয় অভিযানে শুধু পুরুষ নয়, নারীদের অবদানও কম নয়। প্রশংসা করতে হয় জাপানের। অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য একদিকে যেমন আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই, অন্যদিকে এই প্রতিযোগিতায় জাতীয় সম্মানকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, ঐকান্তিক সাধনারও কোন শিথিলতা নেই। এ পর্যন্ত দশটি স্বর্ণপদক লাভ তাদের বিরাট সাফল্যের সূচক।

বিজয়ী তালিকায় আমেরিকা, রাশিয়া, জাপান, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের পাশে ইরান, কোরিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী স্থান করে নিয়েছে।

● চরঞ্জিৎ সিং

এবারের অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেন রাশিয়ার ব্যান্টম ওয়েটের ভারোত্তোলনকারী আলেক্সি ভাকোনীন। তিনি ৩৫৭·৫ কিলোগ্রাম উত্তোলন করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন।

অষ্টাদশ অলিম্পিকের সবচেয়ে কৃতী প্রতিযোগী আমেরিকার মাত্র ১৭ বছর বয়স্ক সাঁতারু ডন স্কোলাণ্ডার। বর্তমানে সন্তরণ-জগতে স্বল্প পাল্লায় ডন স্কোলাণ্ডারের বিরাট সাফল্য অনির্বচনীয়। আমেরিকার পক্ষে এই সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ সাঁতারু চারটি স্বর্ণ-পদক লাভ করে এক অপূর্ব নজীর সৃষ্টি করেছেন। স্কোলাণ্ডারকে আমেরিকার অলিম্পিক দলের মধ্যে স্বর্ণখনি বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন।

টোকিওর আসরে এবার ভেঙেছে বহু অলিম্পিক রেকর্ড এবং বিশ্বরেকর্ড। প্রায় প্রতিটি বিষয়েই বিজয়ী প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠিত করেছেন নতুন রেকর্ড। রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলাও এবারের টোকিও অলিম্পিকের আসরকে প্রদান করেছে এক নতুন বৈশিষ্ট্য এবং অভিনবত্ব।

১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ইথিওপিয়ার আবে বিকিলে বহু বিশেষজ্ঞের

● চান্দু বোরদের বিরুদ্ধে ভিভার্সের এল বি ডবলিউর আবেদন।

ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ম্যারাথন বিজয়ী হন। ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলেসেলাসীর দেহরক্ষী বিকিলে এবারও টোকিওর আসরে ম্যারাথনে বিজয়ী হয়েছেন। ২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১১·২ সেকেণ্ডে তিনি ম্যারাথনের দূরত্ব অতিক্রম করে শুধু নতুন অলিম্পিক রেকর্ড নয়—নতুন বিশ্বরেকর্ডও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আজ পর্যন্ত অলিম্পিকের আসরে ম্যারাথনে কোন এ্যাথলেটই উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার বিজয়ী হবার সৌভাগ্য লাভ করে নি।

ভারতীয় এ্যাথলেটদের মধ্যে একমাত্র গুরবচন সিং এবং স্টিফি ডি-সুজার কথাই উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় এ্যাথলেট দলের অধিনায়ক গুরবচন ১১০ মিটার হার্ডলে পঞ্চম স্থান লাভ করেছেন এবং স্টিফি মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ে সেমিফ্যাইন্যালে পরাজিত হয়েছেন। কুস্তিতে বিশ্বম্ভরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে হবে। তিনি ব্যান্টমওয়েটে শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠস্থান লাভ করেন।

৪ × ৪০০ মিটার রিলেতে ভারত সেমি-ফাইন্যালেই বিদায় গ্রহণ করে। ৪ × ১০০ মিটার রিলেতেও ভারত ফাইন্যালে পৌঁছতে অসমর্থ হয়। মিলখা এবং মাখন সিং ৪০০ মিটারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলে হয়ত কোন স্থান পেতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা শেষ মুহূর্তে ঠিক করেন যে ৪০০ মিটারে যোগ দেবেন না।

অলিম্পিকে পদকের তালিকায় শীর্ষ-স্থানেই অবস্থান করছে আমেরিকা, দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া এবং তৃতীয় স্থানে জাপান। ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিক ভাবে ভাঙছে টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিকের মিলন-মেলা।

ইডেনে ক্রিকেটের অকালবোধন ও অকালমৃত্যু

ইডেন উদ্যানে ক্রিকেটের অকাল-বোধনের অকাল মৃত্যু ঘটল। পাঁচদিনের খেলা তিনদিনে এসেই থেমে গেল। চতুর্থ এবং পঞ্চমদিনে ইডেনে চলল বরুণ-দেবের খেলা, ক্রিকেট আত্মগোপন করল প্যাভেলিয়ানের অন্দর মহলে। ভারতীয় দলের এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়েরা বিলিয়ার্ড খেলে সময় কাটালেন। মাদ্রাজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিজয় এবং বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের বিজয়ের ফলে সিরিজ হল অমীমাংসিত। অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে পরাজিত করে এ্যাসেজ নিয়ে দেশে ফিরবে বটে, কিন্তু রাবার ভাগ হল দু'দলের মধ্যে।

ইডেনে তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় অধিনায়ক পতৌদির নবাব টসে পরাজিত করলেন অধিনায়ক সিম্পসনকে। ব্যাটের বদলে গ্রহণ করলেন ফিল্ডিং। পতৌদির পরিকল্পনা সফল হল। প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ১৬৬ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে প্যাভেলিয়ানে ফিরল—রেডপাথ এবং জারমান অপরাজিত রইলেন। ব্যক্তিগত রান সংখ্যার মানদণ্ডে ববি সিম্পসনের হল ৬৭ এবং বিল লরীর ৫০ রান। দ্বিতীয় দিন মাত্র ৭ রান যোগ করে ১৭৪ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ

● অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সিম্পসন ও ভারতের অধিনায়ক পতৌদি 'পিচ' পরিদর্শন করে ফিরে আসছেন।

● টোকিও অলিম্পিকে মহিলাদের ১০০ মিটার সন্তরণে বিজয়ী ডন ফ্রেজার, টগউডার এবং এলিস।

হয়। সে'লম দুরানীর কুটিল স্পিনে ভরা বক্রগাত বলের কাছে পরাভূত হলেন অস্ট্রেলিয়ার ইংলণ্ড জয়ী ব্যাটস্‌ম্যানেরা। ৭৩ রানে দুরানী সংগ্রহ করলেন ৬টি উইকেট এবং স্বর্তি ৩৮ রানে ৩টি উইকেট। রেডপাথ ৩২ রানে অপরাজিত রইলেন।

বিরাট আশা নিয়ে ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করল সম্পূর্ণ অনুকূল পরিস্থিতিতে। ১৩০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ভারত দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করল। ঝড়ের গতিতে সারদেশাই ৪২ রান করে বিদায় নিলেন, কিন্তু আউট হলেন একটা বাজে ফুলটস বলে। জয়সীমা প্রায় একই ভাবে বুথের হাতে ধরা দিয়ে ৫৭ রানে প্যাভেলিয়ানে ফিরলেন। খেলার মোড় ঘুরে গেল।

তৃতীয় দিনের সুরুতেই ভারত হারাল পাতৌদিকে। এক এক করে গেল নাদকার্নী স্বর্তি ও ইন্দ্রজিৎ শেষ ভরসা চন্দ্রশেখর এসে যোগ দিলেন বোরদের সঙ্গে, ভারত তখন ১৯৬-এর কোঠায়। বোরদে একদিকে চন্দ্রশেখরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন, অন্যদিকে মেটাতে লাগলেন রান ক্ষুধার। ২৩৫ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল, বোরদে ৬৮ রানে অপরাজিত রইলেন। সিম্পসন ৪৫ রানে নিলেন ৪টি উইকেট, ৮১ রান দিয়ে ভিভাসে'র ভাগে পড়ল ৩টি উইকেট। তৃতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার এক উইকেট হারিয়ে উঠল ১৪৩ রান দ্বিতীয় ইনিংসে। ৭১ রানে সিম্পসন ফিরলেন প্যাভেলিয়ানে। ভারতের ফিল্ডারেরা বহু ক্যাচ ফেলে দিলেন। শেষ দু'দিন বৃষ্টির জন্য তৃতীয় টেস্ট পরিত্যক্ত হ'ল শেষ পর্যন্ত।

চতুর্থ দিনে খেলা ন' হবার জন্য দায়ী সি-এ-বির দায়িত্বজ্ঞানহীন কয়েকজন কর্মকর্তা। মাঠের তত্ত্বাবধায়ককে মাঠের আশে-পাশে অযথা ঘুরে বেড়াতেই দেখা গিয়েছে, কাজের চাইতে অকাজেই তিনি আছেন একথাই প্রমাণিত হ'ল। ২৫ হাজার টাকার এ্যালুমিনিয়মের পিচ ঢাকার চাঁদোয়া সময়মত না ব্যবহার করার জন্য চতুর্থ দিন সকালে বৃষ্টি পিচের যথেষ্ট ক্ষতি করে। ক্রিকেট মাঠে দর্শকদের অযথা হায়রানি করা, চরম অব্যবস্থাই সি-এ-বির আপন বৈশিষ্ট্য। কুড়ি টাকার সিজন টিকিট সি-এ-বি যে কত ছাপেন তা একমাত্র ভগবানই জানেন এবং জানে কর্তৃপক্ষ।

এবার কষ্ট এবং হয়রানির হাত থেকে ৩২ টাকা, ৪৫ টাকা, এমন কি ১০০টাকার টিকিটধারীরাও বাদ যান নি। অর্থ-লোলুপ সি-এ-বির ক্ষুধা কোনদিনই মিটবে না; শান্তিতে, নির্বিঘ্নে এবং ভালভাবে দর্শকদেরও আর ক্রিকেট খেলা দেখা হবে না। এবার কার্যরত সাংবাদিক ছাড়া অন্য সাংবাদিকদের যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

এখন খেলার কথায় আসা যাক। পতৌদির নেতৃত্ব স্বীকৃত। আগামী বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ভারত শক্তি-পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গেই উত্তীর্ণ হবে বলে আশা করি।

হকির হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার

টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিকের আসরে ভারত হকিতে পাকিস্তানকে পরাজিত করে হকির স্বর্ণপদক পুনরুদ্ধার করেছে। ১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে ভারত হকির সম্মান ক্ষুণ্ণ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯২৮ সাল থেকে ভারত হকির একচ্ছত্র প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ১৯৫৮ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসে ভারত পাকিস্তানের কাছে গোল এ্যাভারেজে পরাজিত হয়। টোকিওতে ভারত-পাকিস্তানের ফাইন্যাল খেলায় ভারতের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি

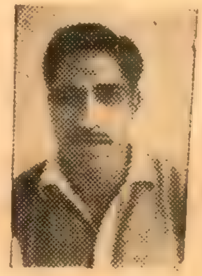

● এস লক্ষ্মণ মহিন্দারলাল

করেন মহিন্দারলাল পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে। গোলে শঙ্কর লক্ষ্মণ ছিলেন অনবদ্য, তিনি কয়েকটি নিশ্চিত গোল রক্ষা করে দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন ভারত এবারের অলিম্পিকে একটি মাত্র পদক লাভ করেছে এবং সেটি হল এই হকি দলের অর্জিত স্বর্ণপদক। আশা করছি ভবিষ্যতেও যাতে বিশ্ব-হকির দরবারে তাঁরা ভারতের বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখতে সক্ষম হন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

24 NOV 1964

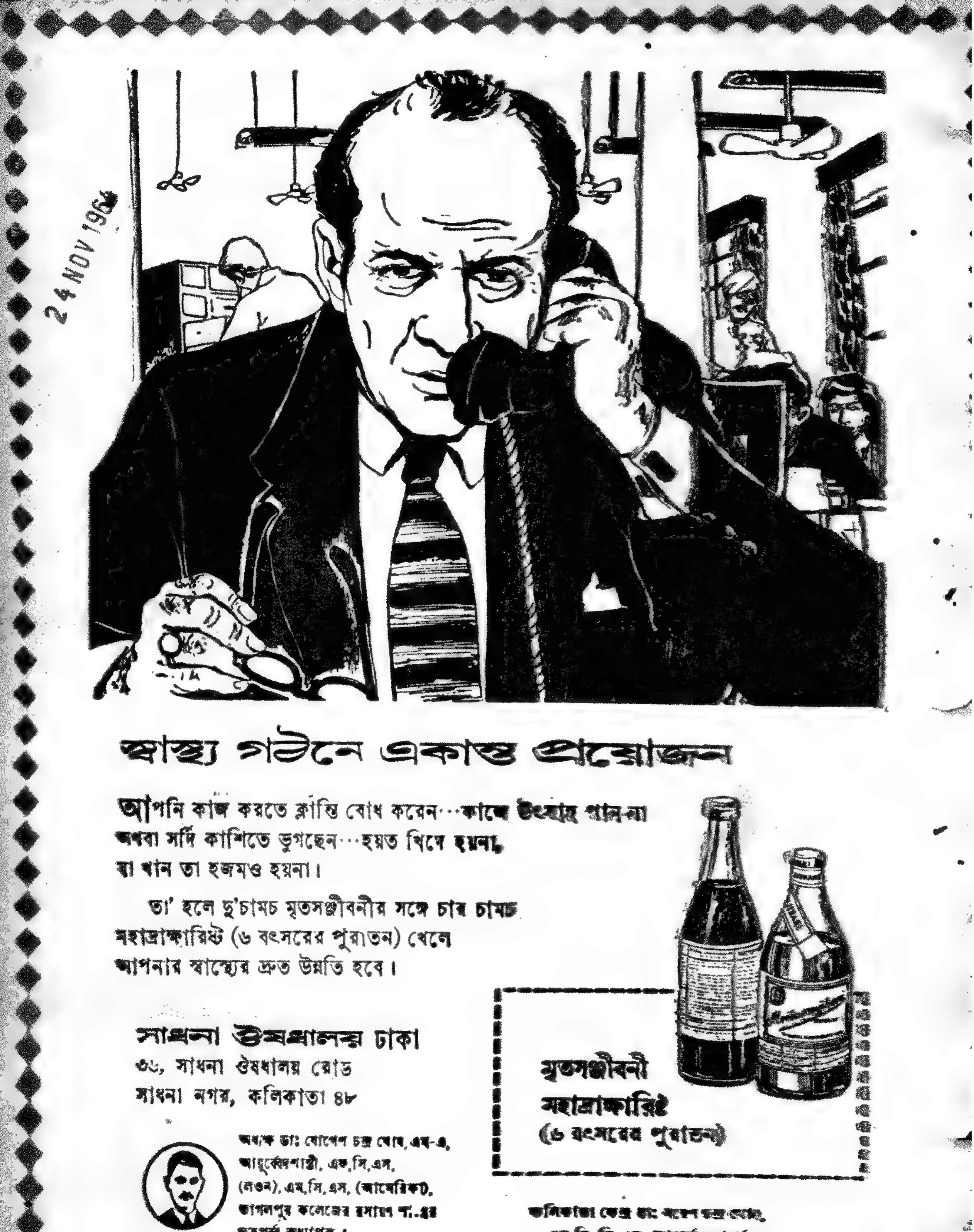
স্বাস্থ্য গঠনে একান্ত প্রয়োজন
আপনি কাজ করতে ক্লান্তি বোধ করেন···কাজে উৎসাহ পান না
অথবা সর্দি কাশিতে ভুগছেন···হয়ত খিদে হয়না,
যা খান তা হজমও হয়না।
তা' হলে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খেলে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে।
সাধনা ঔষধালয় ঢাকা
৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,সি,এস, (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
মৃতসঞ্জীবনী
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)

সাপ্তাহিক বসুমতী

ভারাতের নব মুল্যায়ণে
মুখর রাজধানী

২৩শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৯শে কার্তিক, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 5th November, 1964 • Vol. 69, No.

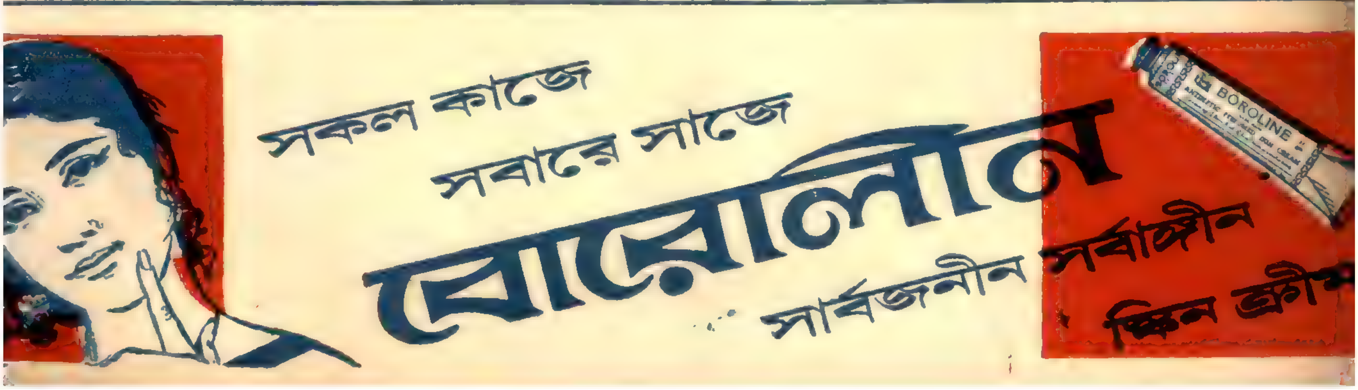

সূচীপত্র

756.3
.003/3
V.69
no.23

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৪১১
আজকের মানুষ,	...	১৪১২
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৪১৩
কোনো জীবন্মৃতের প্রতি (কবিতা)	শিপ্রা ঘোষ	১৪১৫
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৪১৬
জাঁ পল সার্ত্র, ও অস্তিতিবাদ (প্রবন্ধ)	জগন্নাথ চক্রবর্তী	১৪১৯
ভারতদর্শন	...	১৪২৩
আন্তর্জাতিক	...	১৪২৯
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৩৪
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৪৩০

শ্রী কৃ ষ্ণ

পরম ভাগবত দেবেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত

ভক্তির মন্দাকিনী
প্রেমের অলকনন্দা
জ্ঞানের আকাশগঙ্গা
বঙ্গসাহিত্যে এরূপ মহাগ্রন্থ আর নাই
চিত্রসমৃদ্ধ—সুশোভন—সম্মোহন সংস্করণ
মূল্য পনর টাকা

যে জ্ঞান-সূর্য্যের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কিরণচ্ছটায় ভারত-মহিমা, চির-ভাস্বর—সেই সাহিত্যজগজ্জ্যোতি—প্রতিভা ও মনীষার অবতার—সাহিত্য-তপস্যানিষ্ঠ—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী

কাঞ্চনমালা, বেণের মেয়ে, মেঘদূত, বাল্মীকির জয়, ভারত-মহিলা, বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা, ঐতিহাসিক নিবন্ধমালা, শিক্ষাসন্দর্ভ, সমাজসংস্কার নিবন্ধরাজি, মোহিনী।

এই জাতীয় সাহিত্য-জয়ন্তী মাত্র ১।।০

নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রফুল্ল
শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার বি-এল প্রণীত
।। দ্বিতীয় সংস্করণ ।।
মূল্য দুই টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ফুলের পরমায়ু (গল্প)	অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত	১৪৪১
কে? (রহস্য-গল্প)	শ্যাম রায়	১৪৪৩
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৪৪৮
গ্রন্থমেলা	জয়ন্তী সেন	১৪৫১
বঙ্গদর্শন	...	১৪৫৩
স্বাধীনোত্তর বাংলার নাট্যধারা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৫৮
রঙ্গজগৎ	...	১৪৬১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলোলি	১৪৬৭
নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	১৪৬৯
পাঠকমন	...	১৪৭০
খেলাধুলা	শ্রীঅমিতাভ	১৪৭১

অগ্নিযুগের বিপ্লবী গুরু

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা, উনপঞ্চাশী, সিনফিন, অনন্তানন্দের পত্র, বর্ত্তমান সমস্যা, জাতের বিড়ম্বনা, পথের সন্ধান, স্বাধীন মানুষ, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

মূল্য—আড়াই টাকা

বলিষ্ঠ কথাশিল্পী

জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী

৭ খানি বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ উপন্যাস এবং ৩ খানি বড় লেখা—সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী।

মূল্য তিন টাকা

আধুনিক কথা-সাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী

স্বেচ্ছাচারী, আশা, সহজিয়া, সপ্তপদী।

মূল্য—৩ টাকা

রসরাজ

অমৃতলাল বসুর গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—হরিশ্চন্দ্র, আদর্শ বন্ধু, যাদুকরী প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

২য় ভাগে—খাসদখল, চোরের উপর বাটপাড়ি, অবতার প্রভৃতি ১১ খানি নাটক।

৩য় ভাগে—বিবাহ বিভ্রাট, তরুবালা, ব্রজলীলা প্রভৃতি ১১ খানি নাটক

প্রতি ভাগ আড়াই টাকা

কাব্য-সাহিত্যিক

বিহারীলাল চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

জীবনী ও কাব্য সমালোচনা, বিহারীলালের সারদা, বিহারীলাল ও তাঁহার কাব্য, সারদামঙ্গল, বন্ধুবিয়োগ, প্রেম-প্রবাহিনী, স্বপ্ন-দর্শন, সঙ্গীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, নিসর্গ-সন্দর্শন, মায়াদেবী, ধূমকেতু, শরৎকাল, দেবরাণী, বাউল বিংশতি, সাধের আসন, কবিতা ও সঙ্গীত। মূল্য ৩ টাকা

নবরস কবির মূল্যবান সংস্কৃত ও বাংলা রচনার সমাবেশ। বঙ্গসাহিত্যে অভিনব আয়োজন।

বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী

মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা

যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—সীতা, বিষ্ণুপ্রিয়া, মহামায়ার চর ও পূর্ণিমামিলন

মূল্য দুই টাকা

উপন্যাস সাহিত্যের প্রদীপ্ত ভাস্কর

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

তৃতীয় ভাগ—বেলমতিয়া, বঙ্গসংসার, সনাতন গোস্বামী, পূজার মালা ও রাণী ব্রজসুন্দরী। মূল্য—এক টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৩১ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ১১শে কার্তিক ১৩৭১ Thursday, 5th November 1964

ধূমায়িত বহ্নি

উড়িষ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে আপাতত কোনো মন্তব্য করা ঠিক নয়। কিন্তু ঐ রিপোর্ট যে শ্রীমিত্রের স্বপক্ষে যায় নি, সে-কথা সংবাদপত্রে গোপন থাকে নি। একই দিনে চুম্বকাকারে ঐ তথ্য জ্ঞাপন এবং উড়িষ্যায় ছাত্র-বিক্ষোভের মতো সুবৃহৎ ঘটনার সংবাদের মধ্যে যেন একটা অলক্ষ্য যোগাযোগ ঘটে গেছে।

উড়িষ্যায় ছাত্র-বিক্ষোভ এই প্রথম নয়। এর সূচনা হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসেই। ছাত্রদের দাবি ছিল---পুলিশী দমন-নীতির বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমিত্র এই দাবি ত' মেনেই নেন নি, উপরন্তু তিনি নিজে পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগের কারণ হিসেবে জানান যে, তিনি পরবর্তী জীবনে ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করবেন।

অপরপক্ষে, শ্রীমিত্রের বিরোধী দল তাঁর বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনেন---তার সত্য-মিথ্যা প্রমাণের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ কার্যরত থাকলেও হঠাৎ এক পার্টি মিটিং-এর সিদ্ধান্তে শ্রীমিত্রের ওপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং শ্রীমিত্র পুনরায় স্বপদে বহাল হন। হয়তো এই অবস্থায় অতিরিক্ত শক্তি লাভের কথা ভেবে তিনি ছাত্রদের দাবি একেবারেই নস্যাৎ করেন। কিন্তু তারা ছাড়বার পাত্র নয়। স্বাধীন ভারতে ছাত্রদের এই নাছোড়বান্দাভাব নতুন নয়। তবে ছাত্রদের উপদেশ দেবার আগে আত্মসমালোচনাও প্রয়োজন।

ছাত্রদের জন্য যখন আচরণবিধি প্রস্তুতির কথা উঠেছিল---তখন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলাই বলেছিলেন যে, দেশের নেতাদের কাছেই তারা আচরণ শিক্ষা করবে। আমরা স্বীকার করি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা সত্যিকারের আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। তথাপি বহু সৎ নেতার মধ্যে যদি একজনও আদর্শহীন নেতা থাকেন, তা হলে দেশ ধ্বংসের পথে চলে যেতে পারে। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আদর্শভ্রষ্ট নেতাদেরই যে একজন---দাশ কমিশনে সেকথা অক্ষরে অক্ষরে স্বীকৃত হয়েছে।

অবশ্য উড়িষ্যার ঘটনা তদনুরূপ নয়। কিন্তু সেখানে ছাত্রদের পুরাতন বিক্ষোভের যে ধূমায়িত বহ্নি মন্ত্রীদের গৃহদাহে পর্যবসিত হয়েছে---তা অচিরে নির্বাপিত হওয়া প্রয়োজন। উড়িষ্যা সরকারের উচিত ছিল, অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা। অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার, ঐ কমিশন গঠনে সরকার অযথা বিলম্ব করেছেন। তাছাড়া কমিশন গঠন করা যে প্রয়োজন ছিল, তা সরকারের বিলম্বিত সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রমাণিত হল। অবশ্য স্নায়ু যখন দুর্বল হয় তখন শরীরটাও দুর্বল হয়ে পড়ে। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট শ্রীমিত্রের কাছে একটা প্রকাণ্ড আঘাত স্বরূপ। হয়তো সেই আঘাতেই তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তবু বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্তে সকলেই আশ্বস্ত হবেন। তারপর ভাগ্য নির্ধারিত হবে শ্রীমিত্রের মুখ্যমন্ত্রিত্বের। কেন না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের অব্যবহিত পরেই শ্রীকামরাজ তাঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ ক্রুদ্ধ ছাত্রের দল অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ না করলেই রক্ষে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিজ্ঞান বলছে : বিস্তীর্ণ জলরাশির বুকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এত দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ,---এ সবই কোনও এক অতীতে একত্র ছিল। ভূগর্ভস্থ 'ম্যাগমা'র নিরন্তর আলোড়ন সেই একক ভূখণ্ডের গায়ে-গায়ে ফাটল ধরিয়ে দিনে দিনে তাকে টুকরো টুকরো করে বিচ্ছিন্ন করেছে এলোমেলোভাবে। সেই থেকেই নানা মানুষের নানা মন বিভিন্ন জল-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। সভ্যতা আর সমাজের সঙ্গে এসেছে রাজনীতি। দেশে দেশে অদৃশ্য প্রাচীর তুলে এই রাজনীতিই নানা মনে নানা সন্দেহ আর স্বার্থপরতার শেকল পরিয়েছে। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে---এই বিশ্লিষ্ট পৃথিবী আবার একীভূত হবে সুদূর ভবিষ্যতে। আজকের মানুষরা তখন এক বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস। তা হোক। তবু সেই অখণ্ড পৃথিবীর অনেক আগেই আজকের মানুষই পারে মনের মিল গেঁথে দেশে দেশে সম্প্রীতির সেতু বাঁধতে।---এই বিশ্বাসেই সৌহার্দ্য-সূচক শিশু-বোধিদ্রুম নিয়ে ভারত সফরে এসেছিলেন সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক। আধুনিক বিশ্বের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রনায়ক। ১৯১৬'র এপ্রিলে অভিজাত-পরিবারে তাঁর জন্ম। সিংহলের রত্নপুর জেলায়। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় খুব মন। রত্নপুর কনভেন্ট আর কলম্বোর সেণ্ট ব্রিজেটস কনভেন্টে পড়তেন। যৌবনে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতির হাওয়ায় জীবনের রসদ খুঁজে পেতেন। এমনিভাবেই একদিন এই পথেই সিরিমাভো খুঁজে পেলেন তাঁর জীবনের সঙ্গীকেও।

নতুন প্রেরণা পেল তাঁর মনের রাজনৈতিক প্রবণতা। আর নতুন উদ্যম-উৎসাহ পেলেন শ্রী এস ডবল্যু আর ডি ডি বন্দরনায়ক। এরপর শ্রীবন্দরনায়ক প্রধানমন্ত্রী হলেন সিংহলের। ছায়ার মত তাঁর পাশে পাশে থাকলেন সিরিমাভো। যথার্থভাবে স্বামীর সহধর্মিণী। সে সময়ে শ্রীবন্দরনায়কের সঙ্গে সিরিমাভোর নামটাও অনিবার্যভাবে জেনেছে সকলে। অকস্মাৎ '৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে আততায়ীর হাতে রহস্যজনকভাবে শ্রীবন্দরনায়কের মৃত্যু হ'ল। সিংহলের রাজনীতিতে সে এক-নিদারুণ বিপর্যয়।

এই আকস্মিকতার হাত থেকে সশংকিত সিংহলবাসী সেদিন উদ্ধারের পথ চেয়েছিল---সিরিমাভোর কাছে স্বামী-বিয়োগের শোক সম্বরণের অবকাশটুকুও তিনি পান নি। জনতার আহ্বানে মৃত স্বামীর আদর্শের শিশুবৃক্ষকে রক্ষা করতে, তাকে মহীরুহে রূপায়ণের সাধনায় ব্রতী হ'তে হ'য়েছিল তাঁকে। 'লঙ্কা ফ্রিডম' পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হ'য়ে '৬০ সালের ২১শে জুলাই সিরিমাভো সিংহলের প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন। বসেছেন 'লঙ্কা ফ্রিডম পার্টির' সভানেত্রীর আসনে। এর আগে তিনি ছিলেন লঙ্কা মহিলা সমিতির সভানেত্রী ও কোষাধ্যক্ষ। দেশের পরিচালনার ভার তাঁর হাতে যাওয়ার পর থেকে নানা দিকেই সিংহলের অগ্রগতির নজীর সুস্পষ্টভাবেই পেয়েছি আমরা।

সিরিমাভো তাঁর দেশজনের অনেক আশা মিটিয়েছেন। জীবনবীমা সংস্থার জাতীয়করণ তাঁর কর্মক্ষমতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। বৈদেশিক সম্পর্করক্ষায় নিরপেক্ষ নীতির অনুসরণে তিনি তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকায় বহুজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধিতে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর 'কলম্বো প্রস্তাব' 'যুগান্তকারী' এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত সিংহলবাসী 'রাষ্ট্রহীনদের সমস্যা সমাধানকল্পে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও তাঁর যুক্ত ইস্তাহার এক কথায় 'ঐতিহাসিক। ভৌগোলিক দিক থেকে একদিন সিংহলদ্বীপ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সাংস্কৃতিক ভাবাদর্শে পৌরাণিক ও মহাকাব্যের যুগ থেকে সুরু করে আজও ভারতের সঙ্গে আত্মিক যোগ রয়েছে সিংহলের। রাজনৈতিক জটিলতায় যে প্রতিবন্ধক ছিল সিংহলবাসী ভারতীয়দের নিয়ে তাও সিরিমাভোরই আগ্রহে ও দায়িত্বে অনেকটাই সহজ

সিরিমাভো বন্দরনায়ক

গেছে। চীন-ভারত বিরোধের সময় সিংহলের যে ভারত-প্রীতি ও সহমর্মিতা আমাদের উৎসাহিত করেছিল তাই আজ অবিসংবাদিত হ'ল ভারত-সিংহল মৈত্রীবন্ধনের নতুন প্রতিজ্ঞায়।

সিংহল আর ভারতের মধ্যে যে উত্তাল সমুদ্র---শুনেছি তারই বুকে নাকি সেতুবন্ধন হ'য়েছিল কোনও এক যুগে। আজ আবার যেন নিজের চোখেই দেখলাম সেই সমুদ্র ডিঙিয়েই ভারতের শুভেচ্ছার সরণি সিংহলের মাটিতে গিয়ে পৌঁছুবে।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

ভার্জিনিয়া উল্ফ্, জেমস জয়েস, মার্সেল প্রুস্তের রীতি মনে এলো। কাফ্‌কার সঙ্গে তাঁদের মিল আছে তো বটেই। কিন্তু কাফ্‌কার ঐ বিচার-কাহিনীতে ইন্সপেক্টার চরিত্রটি আমার মতন হয়তো আরো কোনো কোনো পাঠকের মনে প্রথমে যে লঙ্ঘন-বোধের প্রতীক্ বলে মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সে-মানেটা টিকে থাকতে চায় না। সত্যিই সে-মানে ঠিক বিচারসহ নয়।

হয়তো, গল্পের ধারায় আরো কয়েক পাতা এগিয়ে গেলে অন্যান্য পাঠকদেরও মনে হবে যে, বাইরে একরকম বিন্যাসের ভঙ্গি থাকলেও ভেতরে ভেতরে মনঃস্রোতের অবিন্যস্ত ব্যাপারই ওখানকার দ্রষ্টব্য আয়োজন। যেমন, 'ফার্স্ট ইন্টারোগেশন' অধ্যায়ে লান্জ্ নামে কে-একজন মানুষ 'কে'র মনে দেখা দিয়ে যান,---আর সঙ্গে সঙ্গে সওয়াল-ঘরের সন্ধানে দালান-ঘর-বারান্দা ঘুরে ঘুরে সেই লান্জেরই সন্ধান চলতে থাকে।

তারপর, অসংখ্য লোকের ভিড়,—কারও শাদা দাড়ি, কারও কোলে শিশু,—পথে চলতে-চলতে চোখে-পড়া জানলায় তুলে-রাখা বিছানার গাদা,—মেয়েদের এক হাত রান্নার কাজে জোড়া,—রাস্তার এপার থেকে ওপারের বাড়িতে বাড়িতে নানা লোকের হাসি, আলাপ,---এইসব দৃশ্য পেরিয়ে সওয়াল-ঘরের সেই বিপুল জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো,---উঁচু মঞ্চের ওপর ম্যাজিস্ট্রেট,—তাঁর কথার অদ্ভুত অসংগতি---নোট-বুক দেখে নিয়ে তিনি বললেন---'ও, তুমি তো ঘরবাড়ি রঙ করবার মিস্তিরি ?'

'কে' বললে—'আজ্ঞে না মশাই. আমি এক বড়ো ব্যাঙ্কের জুনিয়র ম্যানেজার।'

তারপর ম্যাজিস্ট্রেট ক্রমশ যেন ক্ষীণ হয়ে যায়, 'কে' ক্রমশ স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে—এ কি তবে ব্যক্তিত্বের জোরের কথা ? এ কি শুধ মূঢ় জনমতের মূঢ়তানাশের আয়োজন ? 'কে' যেন প্রথমে আচ্ছন্ন, পরে জাগ্রত এক প্রতিবাদের প্রতীক। তাই কি ? সত্য কি তাই ? কাফ্‌কা কি এই ভাবটাই ফোটাতে চেয়েছিলনে ?

জনতার ভেতর থেকেই সেই সওয়াল-ঘরে একজন উঠে দাঁড়ায় বুঝি। বলে,—বা! বা! বাহবা! আবার বাহবা!

'কে' বলে—শুনুন আপনারা,—দিন-দশেক আগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়—সে এক হাস্যকর ব্যাপার,—বিছানায় শুয়ে আছি তখনো,—সেই অবস্থাতেই গ্রেপ্তার হয়ে যাই আমি। মনে হচ্ছে কোনো ঘড়-বাড়ি রঙের মিস্তিরিকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা ছিল তাঁদের হাতে,---ম্যাজিস্ট্রেট-হুজুরের কথা শুনে তাই তো মনে হয়,—মশাইরা শুনুন, যে ওয়ার্ডারগুলো আমাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিল, তারা লক্ষ্মীছাড়া গুণ্ডা,—আমার কাছ থেকে ঘুষ আদায় করবার চেষ্টা করেছিল তারা,—আমার জামার ওপরেও লোভের নজর পড়েছিল তাদের!—একটি মহিলাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি,—আর, তাঁরই ঘরে বসেছিল ইনস্পেক্টার। সে-ঘরে ওদের বসে থাকা মানেই তো ঘরটা কলুষিত করা। এরকম গ্রেপ্তার যে বজ্জাতের বজ্জাতির নমুনা ছাড়া আর কিছুই নয়, একথা আমার ল্যাণ্ডলেডি ফ্র [illegible]বাকও আমাকে বলেছেন। আমি তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করি। আর শুনুন আপনারা, এসব ব্যাপারে আমার অবশ্য খানিকটা বিরক্তিই হয়েছে কেবল,—কিন্তু আরো খারাপ কিছু তো হতে পারতো ?'

এসব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট কার দিকে কী যেন ইশারা করেন।

'কে' সে-ইশারাও দেখে ফেলে এবং তারই ফলে, আর একদফা বকুনি শুনতে হয় সেই ম্যাজিস্ট্রেটকে।

নিজের চেয়ারে বসে রাগে গর্গর্ করতে থাকেন তিনি।

'কে' বলে,—'এসব ব্যাপারে প্রায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত আমি। আমার কথা প্রায় শেষ হয়েছে—কিন্তু আমার এসব কথা শুনে আপনাদের কার কী কথা মনে হচ্ছে, সে-সব মন্তব্য এখন উহ্য থাক—বড়োই তাড়া আছে আমার,—আমার সময় নেই,—আমাকে এখুনি যেতে হবে।'

সওয়াল-ঘরে সকলেই ইতিমধ্যে যেন 'কে'র দলে ঝুঁকেছিল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু ঘরের এক কোণে একটা ধোপানীকে কে যেন আলিঙ্গন করেছে হঠাৎ, আর তার ফলে মেয়েটা,—না, না পুরুষটাই হঠাৎ উঠেছে, ককিয়ে—তারপর ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে—

এই অবস্থার মধ্যে ছুটে পালাতে গিয়েছিল 'কে'! কিন্তু অনেকে হঠাৎ কেন যে বাধা দিল! একজন তার কলার টেনে ফিরিয়ে আনে তাকে। আর, সেই মুহূর্তে তার চোখে পড়ে যে, ঘরের সমস্ত লোকগুলোরই জামায় 'ব্যাজ'-আঁটা,—সবাই—তারা প্রত্যেকেই সেই অদ্ভুত বিচারের রাজ-কর্মচারী!

যে অসার বিচার-প্রহসনের বিপুল

সংঘ-ষড়যন্ত্রের নিন্দে করে 'কে' অনেক বক্তৃতা দিয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সেই সংঘের সহযোগী সকলেই।

হতাশ হয়ে হাত ছুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে দাঁড়ায় 'কে'। নিজের টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায় সে।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট যেন তার চেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে তার আগেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন ইতিমধ্যে।

ভদ্রলোক বলেন, এক মিনিট, একটা কথা শোন তুমি—আসামীকে যে-সব সুযোগ দেওয়া হয়, আজ তুমি নিজের হাতে সে-সুযোগ নিজেই হেলায় হারালে।

—দূর হও, বজ্জাতের দল, আমি তোমাদের সকলকেই আর-এক সওয়ালের সুযোগ দেবো।

এই বলে 'কে' বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তারপর ঘরের মধ্যে আবার আলোচনা জমে ওঠে।

কাফ্‌কার বিচার-কাহিনী এগিয়েছে এইভাবে। এই হ য ব র ল বিচারের খেলা দেখে প্রথম দিকের গভীর ভাবটা আস্তে আস্তে কখন যে উবে যায়। জানি না, পণ্ডিত-রসিক পাঠক যারা তাঁদের কাছে এ-বইয়ের আবেদন, শেষ পর্যন্ত কী রকম,—কিন্তু আমি মনে মনে আমাদের চিরস্মরণীয় সুকুমার রায়চৌধুরীর অনাড়ম্বর কিন্তু বিস্ময়কর কায়দার সঙ্গে এ-রীতির তুলনা করি।

সুকুমার রায়চৌধুরীকে আমার অনেক বেশি সার্থক এবং সংশয়াতীত-ভাবে সার্থক বলে মনে হয়।

কিন্তু এও আমার ব্যক্তিগত কথা, আমার আত্মকথা। অন্তরঙ্গ সহযোগী পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে এ কেবল আদান-প্রদান,—ভাব-বিনিময়।

এ নিয়ে তর্ক করবো না। আরো অপেক্ষা করাই ভালো। আরো কিছুকাল যাক। যদি বেঁচে থাকি, তা হলে উনিশ শ চুয়াত্তরে আবার কাফ্‌কার এই কায়দায় আবেদন আর-একবার ভেবে দেখবেন।

হয়তো গভীর কোনো বক্তব্য ছিল কাফ্‌কার, যা আমার মতন পাঠকের ঠিক নজরে পড়লো না।

সব রূপ কি সবাই দেখতে পান? সব শব্দ কি সকলের কানে পৌঁছোয়?

'গান্ধারীর সম্বন্ধে সেই জয়পুরী গল্পের কোনো ব্যাখ্যা দরকার হয় নি। কিন্তু কাফ্‌কার এই বিচার-কাহিনীর ব্যাখ্যা দরকার।

ভাবতে ভাবতে মনের মধ্যে দেখলুম অনেক বিতর্ক মাথা তুলতে চায়।

নিজের মনের সওয়াল-ঘরে যেন শিল্পের বিচার-সভা বসে।

সেখানে আলো জ্বলুক। পণ্ডিতরা তর্ক করুন। বই লেখা হোক। ছাত্রদের পরীক্ষা বসুক।

আমি হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়াই। ও-সব কথা-কাটাকাটি আমার ধাতে সয় না। একটু খোলা বাতাস চাই। একটু প্রকৃতির আলো।

তাই একেবারে অন্য-মহলে এসে দাঁড়ালুম সেদিন। অন্য বইয়ে এসে আশ্রয় পেলুম।

১৭ই বৈশাখ ১৩৪৬-এ স্বর্গত মহেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর মায়াবতী ভ্রমণের কথা লিখিয়ে গেছেন। মায়াবতী, সুখীডাং, চম্পাবতী—এ সব হিমালয়ের কোলে। ১৩২১ সালে মহেন্দ্রনাথ হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছিলেন। কনখল সেবাশ্রমে কিছুদিন কাটিয়ে ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারের সঙ্গে তিনি মায়াবতী যাত্রা করেন।

হরিদ্বার থেকে বেরিলি,—সেখান থেকে ট্রেন বদলে পিলিভিৎ,—সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে টনকপুরের জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছেছিলেন তাঁরা। সেই পথে, জঙ্গলের মধ্যে একটি স্টেশনের নাম 'বন-বাসা'। সেও আশ্চর্য রূপক যেন।

সরযূ নদীর দক্ষিণে গ্রাম, উত্তরে পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল। ঘুরতে ঘুরতে, মহেন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু শুনেছেন, দেখেছেন,—অনেক শব্দ, অনেক গাছ, অনেক লতাপাতা। সেখানে বাঘের ভয় ছিল,—তারই মধ্যে নির্জন সন্ধ্যায় জীর্ণ শিব-মন্দিরে প্রদীপ জেলে পূজায় বসেছেন একলা পূজারী।

সেই মায়াবতীর পথে যেতে যেতেই তাঁর মনে হয়েছিল—'হিমালয় পর্বতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনেক শিখিবার আছে।

বঙ্গ-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

- আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্বাভাষ।
- আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।
- আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কুকুরের মতন 'কাঁকড়'-এর (Barking deer) ডাক শুনেছেন। দুপুরের প্রচণ্ড রোদে সারা বন ঝিঁ-ঝিঁর কিট্-কিট্ আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে। পথে নদীর এপারে-ওপারে খড়ের ঘরের মতন কুশঘাসের 'গোঠ' চোখে পড়েছে। তাই দেখে, জানিয়ে গেছেন—

'কৃষ্ণের গানেতে গোঠে মাঠে অনেক শোনা যায়, কিন্তু গোঠ কাহাকে বলে পূর্বে দেখি নাই। কুশঘাস দিয়া ও গাছের ডাল দিয়া এক প্রকার টানা 'ঝুবড়ী' করে; এক প্রকার কুশঘাসের খোড়ো ঘর। সংস্কৃতে এক শব্দ আছে, 'উটজ' অর্থাৎ খড়ের ঘর। পর্ণকুটীর হইল অন্য প্রকার।'

মহেন্দ্রনাথের এই রকম নজর ছিল। পথে বেরিয়ে তাঁর কৌতূহলের ক্ষুধা মিটেছিল। এই পথে চলতে চলতেই তিনি জেনেছিলেন—

'এই গোঠে 'গুর্জর' নামে এক শ্রেণীর লোক বাস করে। 'গুর্জর' গোচারকের অপভ্রংশ শব্দ। গুর্জররা অনেকেই মুসলমান এবং হিন্দুও অল্প সংখ্যক আছে। এই গুর্জর শ্রেণীর লোক কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত পাহাড় অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।'

তিনি বনবিড়াল দেখেছেন,—আবার পাহাড়ের উপত্যকায় সুপুরিগাছের মতন লম্বা কলাগাছও দেখেছেন। সেই কলাগাছ দেখে জানিয়েছেন—

'যাঁহারা উদ্ভিদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা এক বিশেষ উপকরণ—কেন বৃক্ষাদি অবয়ব পরিবর্তন করে, এবং এক শ্রেণীর বৃক্ষ হইতে অপর শ্রেণীর বৃক্ষে পরিণত হয়? এইজন্য এই কলাগাছের উল্লেখ করিলাম।'

সুখীডাঙে পৌঁছে তাঁর সর্দিগর্মি হয়েছিল। শ্যামলাতলে বিরজানন্দের আশ্রমে পৌঁছে তিনি চা খেয়েছিলেন। সেখানকার পুকুরে নাকি মাগুর মাছ,—বিরজানন্দের পাহাড়ী অনুচর-পরিচারকরা চমৎকার ডাল, ভাত, মোচার-ঘণ্ট রেঁধেছিল।

সুখীডাঙ থেকে দেউড়ির পথ চলে গেছে। কোথাও শাদা চূনের পাথর, কোথাও স্লেট—কোথাও বা বেলে পাথর।

পাহাড়ে বিস্বাদ আমের গাছ,—আবার দেবদারু, ওকগাছও। ওকগাছকে সে-অঞ্চলে 'বাজ' বলে, কাশ্মীরে বলে 'চানার'। সেই ওক-ফলের নাম 'বালুত' (Acorn)। দক্ষিণ পারস্য অঞ্চলে ভ্রমণের সময়ে মহেন্দ্রনাথ বালুত পিষে রুটি খেয়েছেন। হিমালয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেওদার থেকে ধুনো তৈরির প্রক্রিয়া দেখেছেন।

আমি কাফ্কার অদ্ভুত মনঃস্রোতে বেশিক্ষণ ভাসতে নারাজ। আমি ইশারার দাম আছে, মানি; কিন্তু সেই ইশারাকেই সাহিত্যে ধর্তব্য বলে মনে করি—যা আমার মনকে কোন এক তাৎপর্যের উপলব্ধিতে উৎসাহ দেয়। পণ্ডিত-পাঠকরা আমাকে অনেক কিছু বলবেন হয়তো। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমবেদনা আর পরিচিত কার্য-কারণ বোধ সম্বল করেই তো আমাকে পথ চলতে হয়। নতুনত্বের স্বাদ চাই বৈকি, কিন্তু যা উদ্ভট বলে মনে হয় তাকে সহজ, সরল, স্বাভাবিক বলবার জন্যে আরো সময় চাই।

সাহিত্যে ভ্রাম্যমাণ জীবন-যাত্রীকে দেখতে চাই। মনে মনে মানুষের নানা যাত্রা দেখছি কালে কালে। কাফ্কাও চলেছিলেন, মহেন্দ্রনাথও চলেছিলেন। দুজনের পথ আলাদা, মেজাজও এক ছিল না।

পাঠকদেরও মন সেই রকম। কেউ চান খোলা হাওয়া, রোদ-ছায়া,—কেউ চান বন্ধ ঘরের আজব সওয়াল।

(ক্রমশঃ)

কোনো জীবন্মৃতের প্রতি

শিপ্রা ঘোষ

কার্নিশে বেড়ালটা মরছে: হাসপাতালে শর্মিলার শব
পাশের টেবিলে রক্ত: ফুলদানিতে গোলাপের ঝাড়
যৌবন, শরীর ক্লান্তি। জীবনের শূন্য পেয়ালায়
উচ্ছল মাদক রস: আর্দ্র স্ফীত বিষাক্ত আঁধার।

তৃষ্ণার্ত চাতককণ্ঠ আজ রাত্রে থেমে যাবে জানি;
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চারতলার ফ্ল্যাটের উৎসব,
পঙ্কিল জীবনযাত্রা, কার্নিশে হাওয়ার কানাকানি
সমস্তই স্তব্ধ হবে: এমন কী শর্মিলারও শব।

মৃত্যুকে কে মনে রাখে? জীবনের হীন ছদ্মবেশে
করাল সঙ্কেত সার: গলিত দুর্গন্ধ শুদ্ধতায়,
শোকার্ত দরিদ্র যতো খ্যাতিহীন পণ্ডিতের দল;
মলিন শয্যায় শুয়ে বৈভবের স্বপ্ন দেখে যায়।

বেড়ালটা নিঃশব্দে মরছে: জুয়াড়ীর হীনানুকরণে
সুতীব্র মদের গন্ধ: ঈশ্বর সে কঠিন নিশ্চয়
নিরাকার নিরস্তিত্ব পাথরের সহাস্য উপমা;
বণিকের রৌপ্যবৃত্তি: সেখানে মৃত্যুও ম্লান হয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ সপ্তদশ প্রবাহ ॥

একদিন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের তিন সহস্র পরিবারের জীবন শুধু রেশম-শিল্পকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। আর হুগলীর বিদেশীদের বাণিজ্য-প্রতিভা এ জেলার বাঙালীদের মনেও ব্যবসার প্রেরণা জাগিয়ে দিয়েছিল। বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া।

শুধু বিষ্ণুপুরী ঘরানা সঙ্গীত ইতিহাসের বিচিত্র নায়িকা লালবাঈয়ের দেশ নয়—বাঁকুড়ার তসর ও সিল্কের কাপড়ের খ্যাতিও প্রায় রূপকথার মত মানুষের মনে মধুর একটা আচ্ছন্নতার আবেশ এনে দেয়।

তসরের কাপড় তৈরির প্রধান কেন্দ্র ছিল গোপীনাথপুর। আর বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, রাজারহাটের বাঙালীদের ঘরে ঘরে একদিন তসরের কাপড় তৈরি হতো। একটি দুটি নয়, প্রায় তিনহাজার বাঙালী পরিবার এই তসরের জীবিকার ওপর নির্ভর করেই অন্নসংস্থান করতো। আজও বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের গ্রামবৃদ্ধদের মুখে গল্প শোনা যায় সেকালের তসর তৈরির। হয়তো তাদের বাড়ির কোঠাঘরের অন্ধকার কোণে নিতান্ত অবহেলায় আবর্জনার মত পড়ে রয়েছে তসরের সুতো পাকানো লাটাই।

১৯১৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুঁথিতে বলছে, Silk weaving is still a fairly prosperous industry. সেদিন ছিল সমৃদ্ধিশালী কুটিরশিল্প। রেশম আর সিল্ক তৈরির সবরকম পদ্ধতি জানতো তাঁতের বস্ত্রবয়নকারীরা। গেজেটিয়ারে লিখছে—শুধু রেশমশিল্পের জন্য খ্যাত নয়, specially embroidered silk services হয় বিষ্ণুপুরে। সিল্কের শাড়ির ওপরে নানা ফুল আর রঙের সমারোহ অপরূপ করে সৃষ্টি করে বয়নকারীরা।

সেদিনের বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়ার বস্ত্র-শিল্পীদের অন্ন আসতো এই তাঁতের কাজ থেকেই। বিষ্ণুপুরের ফুলম শাড়ির খুব খ্যাতি ছিল। প্রত্যেকটা শাড়ির দাম ছিল দশ টাকা থেকে বিশ টাকার ভেতরে। আর ধুতির মূল্য ছিল দশ থেকে বারো। সেদিন জীবনসংগ্রাম এত কঠোর ছিল না, এত তিক্ত ছিল না। তাই এই নামমাত্র মূল্যে সিল্কের শাড়ি, ধুতি বিক্রি করলেও তাদের ঘরে দু'পয়সা আসতো।

সেদিন বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে এই রেশমশিল্প একটা বিচিত্র উদ্দীপনার ঝড় বইয়ে দিত। রেশমের গুটি নিয়ে এসে সাঁওতাল পরগণার সীমান্তের গভীর জঙ্গলের শাল-সেগুনের পাতায় পাতায় বসিয়ে দেওয়া হতো। এই রেশমগুটি এই সজীব পাতার আশ্রয় পেয়ে ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে উঠতো। ঠিক এই সময় যে সব গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে রেশমের গুটি বাসা বেঁধেছে, সেই সব ডাল কাটার ধুম পড়ে যেত।

তারপর রেশমগুটি এক কাহন অর্থাৎ ১২৮০টি গুটি পাঁচ টাকা থেকে নয় টাকা হিসেবে বিক্রি হতো। পাইকারী দরে কিনে নিত রেশমগুটির মহাজনেরা। এই মহাজনেরা আবার খুচরো দরে বিক্রি করে দিত তাঁতীদের। রেশমগুটি হাতে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন জীবনের একটা উল্লাস

ছাড়িয়ে পড়তো বস্ত্রব্যবসায়ীদের পাড়ায় পাড়ায়। তারা তাদের স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীর হাতে হাতে (এক একজনকে) পাঁচটি করে গুটি দিয়ে দিত।

এই মেয়েদের যুগপ্রবাহিত রক্ত-ধারায় আছে বহুদূর অতীতের নিপুণতার গৌরবময় ঐতিহ্য। তারা ক্ষিপ্রগতিতে নিপুণ হাতে এইসব রেশমগুটি ফুটিয়ে নিতো গরম জলে। গরম জলের সঙ্গে মেশানো থাকতো কাঠের ছাই। তারপর গুটিগুলোকে ঠাণ্ডা করে ধুয়ে মুছে সুরু করে লাটাইতে পাকিয়ে সিল্কের সুতো তুলতে। এই যে রেশমশিল্প যাদের জীবন একদিন সজীব আর আনন্দমুখর করে রাখতো, তারা ছিল বাঙালীদেরই অতীত বংশধর।

আজও বাঁকুড়ার, পথে-প্রান্তরে এইসব অবখ্যাত নগণ্য রেশমশিল্পীদের পড়ো বাড়ির জঙ্গলাকীর্ণ উঁচু ভিটা হিংস্র শ্বাপদের অবাধ বিচরণভূমি হয়ে পড়ে রয়েছে। আজ কে বিশ্বাস করবে—রাজগ্রাম; সোনামুখী, বিষ্ণুপুর আর রাজহাট-নৃসিংপুরের তিনসহস্র পরিবারের জীবন শুধুমাত্র রেশমশিল্পকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। তাদের অহঙ্কার, আশা, বিশ্বাস আর স্বপ্ন ছিল এই শিল্প।

আবার—আবার মিঃ এন জি মুখার্জীর Silk Fabrics of Bengal (1903) বইতে ইঙ্গিতও আছে, কেমন করে বাঙ্গালী রেশমব্যবসায়ীদের ওপরে দুর্যোগের মেঘ ঘন হয়ে নেমে এল, 'The Silk worm epidemics have been the principal cause of the great contraction of the industry with in a very few years both in Midnapur and Bankura'..রেশমগুটিতে মহামারী লাগল আর Report on the state of

প্রথম নিরাপত্তা প্রথম নিরাপত্তা

ট্রেনযাত্রীগণ—

আপনাদের সহযোগিতা

ট্রেনে

অগ্নি সংযোগ
বন্ধ করিতে পারে

ট্রেনে ভ্রমণ করিবার সময়
অগ্নিনিরোধক নিয়মাবলী পালন করুন

* গাড়ীর ভিতর ষ্টোভ জ্বালিবেন
** ট্রেনে সহজ দাহ্য পদার্থ লগেজ হিসাবে বহন করিবেন না
*** সিগারেটের টুকরা ফেলিবার পূর্ব্বে আগুন নিভাইয়া ফেলিবেন অথবা এ্যাসট্রে ব্যবহার করিবেন

মনে রাখিবেন ঃ

সামান্য ভুলের জন্য মারাত্মক রকমের আগুন লাগিতে পারে—
ফলে ধন, প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে কর্ত্তৃক প্রচারিত

No. D/5/8—1

Tussar Silk Industry in Bengal and Central Provinces তে মিঃ মুখার্জী দিয়েছেন এই জেলার দিকে দিকে এই শিল্পের প্রসারতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এক সোনামুখীতে একদিন সহস্র বাঙালী পরিবার শুধু তসর তৈরি করে জীবিকা-নির্বাহ করতো; বিষ্ণুপুরের সাতশো পরিবার তসর আর সিল্কের ব্যবসাকে নিজেদের ধ্যানজ্ঞান বলে মনে করতো।

একদিন বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর আর পাত্রসায়েরের কোন কোন জায়গায় পিতল-কাঁসার ব্যবসা ছিল। বাঁকুড়ার পিতলের কলসীর বাঙালী কারিগর ও ব্যবসায়ীরা পেটের ভাতের জন্য চিন্তা করতো না। ছুরি-কাঁচি তৈরি করতো কামাররা। বিষ্ণুপুরের অন্তর্ভুক্ত সাহসপুরের তৈরি বড় বড় ঘটি আর কাঁচির বাঙালী কারিগরের খুব সুখ্যাতি ছিল—খ্যাতি ছিল বাঁকুড়া জেলার লাক্ষা-ব্যবসায়ীদের।

আজ বিস্মৃতির স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে সেকালের তসরশিল্পীরা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে রেশম সুতোর কাটুনীরা। শুধু বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসের পাতায় সজীব হয়ে বেঁচে আছে তারা আর বেঁচে আছে তাদের বিস্ময়কর গৌরবের ইতিবৃত্ত।

সুদূর অতীতের বাঁকুড়া জেলার ইতিবৃত্ত বলতে বলতে মনে পড়ে গেল হুগলীর সপ্তগ্রাম আর ত্রিবেণীর সমৃদ্ধির গৌরবোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত। হুগলীর শেওড়াফুলি, চন্দননগরের কথা বলেছি। কিন্তু বলা হয় নি আদি সপ্তগ্রাম আর ত্রিবেণীর বন্দরের অতীত গৌরবের কথা। সেই মোগলযুগে সপ্তগ্রাম ছিল বাংলাদেশের বন্দরের ভেতরে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। হুগলীর গেজেটিয়ারের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে আদি সপ্তগ্রামের কথা In Moghul rule, Adi Satgaon were chief ports of Bengal.. শুধু সপ্তগ্রাম নয়; ত্রিবেণী সেই হিন্দু যুগ থেকেই বিখ্যাত তীর্থস্থান বলে খ্যাত ছিল। এই ত্রিবেণী তখন শুধু বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল না—ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার শাসন-কেন্দ্র।

অনেক—অনেক দিন পরে হয়তো ১৩২৮ খৃস্টাব্দে যখন রাজধানী সরস্বতী নদীর ওপারে সপ্তগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, সেই সময় থেকে ত্রিবেণীর গুরুত্ব কমে গেল। ওদিকে ঝলমল করে উঠল সপ্তগ্রাম। অনেক দূর দূর দেশ থেকে গো-যানে করে আসতো ধান, আসতো রবিশস্য, আসতো তাঁতের বস্ত্রসম্ভার। এই সব কথা আলোচনা করতে করতে চোখের সামনে ভেসে ওঠে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক আলোকোজ্জ্বল ছবি: সপ্তগ্রামের বন্দরে সারি সারি সমুদ্রগামী জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজ থেকে মাল নামছে। উঠছে। কুলীদের হাঁকে ডাকে, যাত্রীদের চীৎকারে মুখর ছিল আজকের জন-মানবহীন আর অভিশপ্ত স্তব্ধতায় ঘেরা আদি সপ্তগ্রাম। বর্তমানের নিথর নির্জনতার ভেতরে শতাব্দীপূর্বের বিপুল কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আছে। সেকালের সপ্তগ্রামের ছবি এঁকেছেন পুরাকালের এক পর্তুগীজ ব্যবসায়ী Cesare De Federici,—তিনি বলেছেন,—From the port 35 ships great and small with rice and cloth of bombast of diverse sorts..

শুধু বস্ত্র আর ধানচাল নয়, আরও বহুরকমের সম্ভার এই Porto Piquno অর্থাৎ গঙ্গার নদীর ওপরে ছোট বন্দর সপ্তগ্রাম থেকে দূরদেশে রপ্তানী হয়ে যেত।

আইন-ই-আকবরীতেও সপ্তগ্রাম বন্দরের উল্লেখ আছে। একদিনে ত্রিশ হাজার টাকা শুধু বন্দরশুল্ক হিসেবেই আদায় হতো।

কিন্তু পর্তুগীজেরা যেই হুগলীতে কুঠি স্থাপন করল, তাদের বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠল হুগলী, তখুনি ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে গেল আদি সপ্তগ্রাম। বড় বড় বজরা এককালের ধনে জনে উজ্জ্বল আদি সপ্তগ্রামের দিকে একবার অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তর তর করে চলে যেত হুগলীর দিকে। মিঃ ডবলিউ ক্র্যাভেলের লেখা Account of the trade of Hooghly তে আছে—Trade and industry of this district has been fostered and developed by the trade of the Europeans..Dutch at Chinsura.. French at Chandanagore, and Danes at Dinemardanga..

সত্যি, বহু বিদেশী ব্যবসায়ীর পদচিহ্ন হুগলীর মাটিতে। তাদের সান্নিধ্যে—তাদের তীব্র কর্মপ্রেরণা, তাদের বাণিজ্য-প্রতিভা বাঙালীদের মনেও ব্যবসার নেশা জাগিয়ে দিয়েছিল।

তা না হলে ধনিয়াখালিতে, কাউকালাতে, জয়নগরে হাজার হাজার বাঙালী নিশিদিন তাঁত চালাতো কি করে; কেমন করে তারা সুদৃশ্য বস্ত্রসম্ভার তৈরি করতো। কেমন করে পাণ্ডুয়া আর শ্রীরামপুরের বাঙালী বস্ত্রশিল্পীরা রঙীন ঝকমকে কাপড় বুনে খ্যাতি পেয়েছিল সাগরপারের বিলাসিনীদের কাছে। হুগলীর বাণিজ্যের ইতিহাসে স্পষ্ট লিখেছে, Sreerampur and Pandu was very famous for the manufacture of chintz. (colour printed glazed cotton cloth).

শুধু পাটের থেকে দাঁড় তৈরি করেই জীবিকার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল চন্দননগর, নবগ্রাম আর চাতরার কোন কোন বাঙালী পরিবারে। তসরের শাড়ি, ধুতি আর বিখ্যাত চৌষট্টি কাপড়ের জন্যও খ্যাতি ছিল এই জেলার। এই জেলারই বাঙালী একদিন আখ চাষ করেই ক্ষান্ত হয় নি—নিজেরাই গুড় থেকে চিনি তৈরি করে সপ্তগ্রামের বন্দরে চালান দিয়েছে।

চন্দননগর ছিল ধনী বিলাসীদের বাসস্থান। তাই কাঠের তৈরি সুদৃশ্য আসবাবের খুব চাহিদাও ছিল। কাজেই চন্দননগরেই ছিল কাঠের কাজের বাঙালী শিল্পী, যাদের খ্যাতি সুদূর প্যারিস পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

হুগলীর গ্রামে গ্রামে আজ সেই বাঙালী মুসলমান মহিলাদের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা একদিন 'চিকনি'র কাজ করে বিস্ময়ে হতবাক করে দিতে পারতো সমুদ্রপারের বিদেশিনীদের। কাপড়ের ওপর সরু সুঁই দিয়ে নিপুণ অঙ্গুলিবিন্যাসে তুলতো নক্সা, (এমব্রয়ডারী)। এই এমব্রয়ডারী কাপড়ের বিপুল চাহিদা ছিল বিলেতে। আজ কোথায় সেই সূচীশিল্পীরা—কোথায় চন্দননগরের কাঠের অপরূপ কারুকার্যের শিল্পীরা—একালের দাসত্বপ্রিয় (চাকুরী প্রিয়) বাঙালীরা তাদের ভুলে গেছে। ভুলে গেছে—তাদের স্বদেশের বাণিজ্যিক প্রসারতার সুমহান ঐতিহ্য

(ক্রমশঃ)

জঁা পল সার্ত্র ও অস্তিতিবাদ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

কয়েক বৎসর আগে আলবেয়র কামুকে যখন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তখন য়ুরোপ জুড়ে প্রশ্ন উঠেছিল, 'কেন সার্ত্রকে নয়?' এই প্রশ্নে কামুর প্রতি অনাদর ছিল না, কিন্তু নোবেল-পুরস্কর্তাদের মতিগতির প্রতি কটাক্ষ ছিল। কারণ, সার্ত্রকে বাদ দিয়ে কামুকে বোঝাই যায় না। সার্ত্র না হলে কামু হ'তেন না। সার্ত্রই কামুর জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলক, এবং সূক্ষ্ম পার্থক্য সত্ত্বেও আলবেয়র কামু সার্ত্র-পথেরই পথিক। শ্রেষ্ঠ শিল্পী দুজনেই, কিন্তু নোবেল কমিটীর নির্বাচনের ক্রম যেন প্রথমে সার্ত্র এবং পরে কামু হলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত। অবশ্য এক হিসাবে সুবিচারই হয়েছিল। কারণ ১৯৬৪ সালের শরৎকাল পর্যন্ত বিলম্ব করলে নোবেল কমিটী কামুকে জীবিত পেতেন না এবং লোকান্তরিত সাহিত্যিককে নোবেল পুরস্কার অর্পণের রীতি বা বিধান নেই।

সাহিত্যে অস্তিতিবাদের (Existentialism) নেতা জঁা পল সার্ত্র এবং অস্তিতিবাদী পরিমণ্ডলের অন্যতর শিল্পী আলবেয়র কামু; চল্লিশের দশকে এঁরাই মহারথী ও রথী। জার্মান-কবলিত ফ্রান্সের প্রতিরোধ আন্দোলনে এঁরা ছিলেন নব্য অভিমন্যু। তখন এমন কোন বৎসর যায় নি যখন এঁদের নাটক প্যারীতে নতুন সাড়া না জাগিয়েছে, নতুন বিতর্কের সূত্রপাত না করেছে। নিত্যনূতন নিন্দাপরিবাদের মধ্যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে এঁরা নব্য এষণার কথা বললেন। ১৯৪৩ ও ৪৪ সালে সার্ত্রের 'লে মুশ' ও 'উই ক্লু' মঞ্চস্থ হল, তারপর হল ১৯৪৫ ও ৪৬ সালে কামুর 'ল্য মালেঁতাঁদু' ও 'কালিগুলা'; ১৯৪৮ সালে সার্ত্রের 'লে মঁ্যা সাল' এবং ১৯৫০ সালে কামুর 'লে জুস্ত'। সার্ত্র ও কামু দুটি পৃথক আন্দোলন নন, একই আন্দোলনের, একই মঞ্চের দুই শক্তিমান কণ্ঠ। ফ্রান্সের রঙ্গমঞ্চে শিল্প-কৌশল ও জীবনভাবনাকে এঁরা এক অপরিজ্ঞাত-পূর্ব দুঃসাহসী দর্শনের পরিভাষা দিলেন; বিশ্বমানবের অন্তর্হিত আত্মা আবার এক ইন্দ্রজালে পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়াল। পারমাণবিক বোমার আগেই বিশ্বের ক্লিষ্ট বিবেক প্রশ্নখচিত অস্তিত্বকে নিপুণভাবে ওজন করতে চাইল। ফরাসী ও বিশ্বসাহিত্যের এই সন্ধিক্ষণের যুগ্মতারা হলেন সার্ত্র ও কামু।

ঐতিহ্য ও ঐতিহ্য-বিরোধিতা এই বিপরীতের এক আশ্চর্য সমন্বয় দেখি জঁা পল সার্ত্রের মধ্যে। সত্য-সন্ধিৎসার পথে দেকার্তের পরিচ্ছন্ন যুক্তি ও চিন্তারীতি যেমন ফরাসী মানসের এক ঐতিহ্য, তেমনি দ্বিতীয় ঐতিহ্য হল দেকার্তের সমকালীন পাসকালের সূচিভেদ্য অন্তরীণ-অনুভূতির অনুশীলন। নিজের আত্মার মধ্যে যে অন্ধকার গহ্বর মানুষকে সত্যলাভে বাধা দিচ্ছে, তারই উপলব্ধি শিল্পীকে নির্যাতন করছে অহরহ। আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে যদি কোন নিরবচ্ছিন্ন ধারা থাকে, তবে তা এই দেকার্তে-পাসকাল প্রবর্তিত সত্য ও আত্মসন্ধিৎসার ধারা, যুক্তি ও মুক্তিবোধের দ্বিমুখী অভিযান। দেকার্তের ধারা যেমন ফ্লবেয়র পর্যন্ত প্রসারিত, পাসকালের ধারা তেমনি সার্ত্র ও কামুতে এসে ঠেকেছে। মানুষ নিজেকে জানতে গিয়ে ভয়াবহ সত্যের মুখোমুখি হয়েছে, বিদীর্ণ আত্মার মধ্যে যুক্তির মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছে, দেখেছে স্পর্শকাতর স্নায়ু এক নিস্পৃহ আত্মা এক জটিল গ্রন্থিতে পরস্পর আবদ্ধ হয়ে আছে। এই অতল আগ্নেয়-মনোগহ্বরে নেমেছেন রাসিন, বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, মরিয়াক; মালরো এবং সাম্প্রতিক কালের অস্তিতিবাদী সাহিত্যরথীরা সকলেই। বলতে গেলে ফ্রান্স ও য়ুরোপের আধুনিককাব্য সাহিত্যের এই পাতাল-পথেই সত্যকার হয়েছে। আর এই যাত্রীদলের পুরোভাগে রয়েছেন জঁা পল সার্ত্র।

মনো-ব্যবচ্ছেদে ফরাসী শিল্প-সাহিত্য পৃথিবীতে অগ্রণী। দেকার্তের সত্যসন্ধিৎসার পথ এই মনো-ব্যবচ্ছেদের পথ। সার্ত্র প্রথমে এই পথেই অগ্রসর হয়েছেন। 'উই ক্লু' বা 'অবরুদ্ধ' নামক নাটকে সার্ত্র তিনটি চরিত্রকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের মনের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজের নিজের গোপন কথা ও ইচ্ছা অপর দুজনের কাছে ব্যক্ত করেছে। নাটকের প্রথম অংশে এই তিনটি চরিত্রেরই অহমিকা, ছলনা, চাতুরী ও কল্পনাকে নাট্যকার একেবারে শূন্য বলে প্রমাণিত করেছেন। একেবারে আদিম প্রাথমিক সূত্র থেকে তিনটি মনকে ঢেলে সাজবার, নতুন করে সৃষ্টি করবার এ এক অভিনব প্রয়াস। অভিনব সাহিত্যে, কিন্তু দর্শনে নয়। কারণ এটিই হচ্ছে যেকোন সমস্যা সমাধানের দেকার্তে প্রবর্তিত পদ্ধতি। এর মূল কথা হল, জটিলতার সমাধান করতে হলে একেবারে আদি থেকে সুরু করো। কিন্তু এই পদ্ধতি সার্ত্র নাটকের প্রারম্ভে প্রয়োগ করলেও, শেষ অংশে পরিত্যাগ করেছেন। নাটকের পরবর্তী অংশে দেখি, নাট্যকার যুক্তির 'ক্ষুরস্য ধারা' ত্যাগ করে স্বপ্নাদ্য ইঙ্গিতময়তার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। চরিত্র তিনটি নরকে এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, তারা মনে করছে ফ্রান্সেরই একটি ঘরের মধ্যে তারা আছে। আত্ম ও সত্য-অনুসন্ধান এখানে যুক্তির পথে না গিয়ে পাসকেলীয় উপলব্ধির পথে অগ্রসর হয়েছে। যে-ঘরে এই চরিত্র তিনটি রয়েছে সেটি নরক, তার কারণ এটি

রুদ্ধগৃহ, এখান থেকে বেরোবার স্বাধীনতা কোন চরিত্রের নেই।

একেই পাসকাল বলেছিলেন 'অন্ধকার গহ্বর' বা মানুষের স্বভাবের মধ্যেকার বাধা যা তাকে সুখী হতে দেয় না। এই নাটকের মধ্যে সার্ত্র ফরাসী মানস ও ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য দুটিকে মিলিয়েছেন। এক, সত্যসন্ধিৎসা, যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথে সব কিছু বিচার করে দেখার ও বোঝার চেষ্টা; দুই মুমুক্ষা, মানবাত্মার সুখ বা মুক্তির চিরন্তন সমস্যা অনুধাবনের চেষ্টা। এই দুয়ের পরস্পর-বৈরিতা সত্ত্বেও সহাবস্থান, জীবনের এক প্রহেলিকা। বোদলেয়র, র‍্যাঁবো ও সার্ত্রর সাহিত্য এই প্রহেলিকা বুকে করেই চিরঞ্জীব। যুক্তি এবং অ-যুক্তির এমন বিপরীত উপস্থিতি সত্যিই আশ্চর্য। দেকার্তের সরলরৈখিক পথই যেন এগোতে এগোতে পাসকালের গোলকধাঁধায় বৃত্তাকার হয়ে গেছে। সরল ও বক্ররেখা, সত্য ও স্বপ্ন, যুক্তি ও অ-যুক্তি, অস্তি ও নাস্তি পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে।

অগ্রণী ফরাসী শিল্পীরা—বিশেষ করে সার্ত্র—চন্দ্রসূর্যতারকাবিরহী-লোকেও এমন স্বচ্ছন্দগতি, যেন মনে হয়, সূর্যচন্দ্র ব্যতিরেকেই আলো সৃষ্টি করে অন্ধকারকে তাঁরা জাগ্রত করে রেখেছেন। জীবন জটিল, তমসাবৃত, কিন্তু তাই বলে সার্ত্র কেন দৃষ্টিহীন হবেন? পথ আঁকাবাঁকা, কিন্তু তাই বলে পদক্ষেপ কম্পিত হবে, একথা তিনি মানেন না। যখন ধ্যানমগ্ন তখনও তিনি আঁক কষছেন এমন যুক্তিবাদের পরিভাষা ব্যবহার করেন। সপ্তদশ শতকীয় দেকার্তের 'চিন্তাবলী' ও বিংশশতকীয় সার্ত্রর অস্তি ও নাস্তির চিন্তা যেন একই পদ্ধতির অনুসারী। দেকার্তে বলেছিলেন, 'আমি চিন্তা করি অতএব আমি আছি' —অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব অনুমিত হচ্ছে আমার চিন্তাক্রিয়তা থেকে। সার্ত্র এই সূত্রটি উল্টে দিয়ে বললেন, না, অস্তিত্বই আগে, সত্তা পরে। সত্তাই অস্তিত্ব থেকে প্রসূত হচ্ছে এবং হয়েছে। অস্তিত্বই সত্তার প্রণেতা; আমার সত্তা আমার চিন্তা-ভাবনা আমারই সৃষ্টি, এটি প্রদত্ত বা পড়ে-পাওয়া নয়। মানুষ 'অস্তিত্ব' থেকে তার যাত্রা সুরু করে এবং ক্রমশ নিজেকে সংজ্ঞিত করে, রূপায়িত করে। মানুষ তাই যা সে নিজেকে তৈরি করে; অর্থাৎ মানুষ নিজের সংজ্ঞা নিজেই সৃষ্টি করে; নিরূপিত করে। মানুষ নিজের মধ্যে নিজেই বিবৃত, বিধৃত; মানুষ নিজেই নিজের উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ; নিজেকে তার ভবিষ্যতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে করে সে অগ্রসর হয়। মানুষের স্বাধীনতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সার্ত্র এইভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রগুলি একে একে উপস্থিত করেছেন। অস্তিত্ববাদী সার্ত্র মানুষের সত্তা সম্বন্ধে যেসব কথা ব্যবহার করেছেন —যেমন হতাশা, যন্ত্রণা, বিবমিষা— তা পাসকাল-ব্যবহৃত শব্দগুলিরই প্রতিধ্বনি। পাসকাল বলেছিলেন, মানুষ দুনিয়াজয়ের পরিবর্তে নিজেকেই জয় করে। সার্ত্রও বিশ্বাস করেন যে মানুষ হচ্ছে তার কর্মের সমাহার।

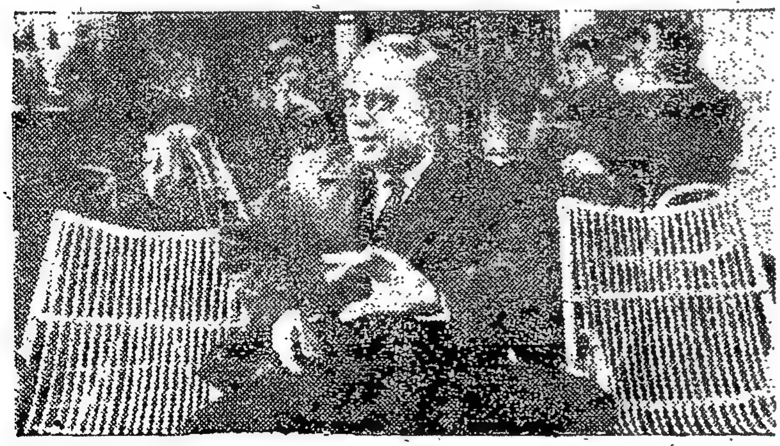

● ঝাঁ পল সার্ত্র।

আঁদ্রে জিদ বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই স্বতন্ত্র, এবং সেজন্য অপরের উপদেশ মানুষের কোন কাজেই আসে না। প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র বলে তার সমস্যাও অনন্য। জিদ যে-নীতির প্রবক্তা তার মূল কথা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক মানুষই সংসারে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করতে এসেছে, যে-ভূমিকা অন্যান্য সব ভূমিকা থেকে পৃথক। এই স্বধর্ম বা স্বভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষ যে প্রায়শই পূর্ব-প্রস্তুত বিভিন্ন ছক অনুযায়ী নিজেকে রূপায়িত করতে যায়, সেটিই হচ্ছে তার পক্ষে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা আত্ম-হনন। অথচ 'ভয়াবহ পরধর্ম'কেই সমাজ মানুষের স্বধর্ম বলে চাপিয়ে দেয়, কখনো এমন সুকৌশলে যে, ব্যক্তি-মানুষ তার এই আত্মঘাতের খবর নিজেও পায় না।

জিদ বলেছেন, মানুষের ভূমিকা বা ভাগ্য তার নিজের মধ্যে তার স্বধর্ম অনুযায়ী নির্ণীত হবার কথা। মানুষের এই অতি-স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে জিদের উক্তির খানিকটা অনুরূপ হচ্ছে সার্ত্রর উক্তি। 'যে জীবনকে পায় সে হারায়' বাইবেলের এই উক্তি উদ্ধৃত করে সার্ত্র তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বললেন যে, পড়ে-পাওয়া দর্জি-ছাঁটা নীতি দিয়ে জীবনকে চালিত করতে গেলে তাকে হারাতে হবে। সার্ত্র জিদের ভাববাদী ঈশ্বর-সমর্পিত দিকটি বর্জন করে মানুষের স্বকীয়তাকে স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করলেন। জিদের স্বকীয়তা ঈশ্বরাধীন, সার্ত্রর স্বকীয়তা স্বাধীন। ভাগ্য দ্বারা বা স্বর্গ দ্বারা বা অন্য কোন কিছু দ্বারা অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত নয়। অস্তিত্বই ক্রমশ ভাগ্যকে এবং ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করে। সার্ত্রর অস্তিত্ববাদের এইটিই বৈশিষ্ট্য।

সার্ত্রর উপন্যাসে মনে হয় ঔপন্যাসিক মানুষকে খুব দূর থেকে—যেন দূরবীণের মধ্য দিয়ে—প্রত্যক্ষ করছেন। বিশ্বাসী মানুষ তাঁর কাছে কৃপার পাত্র, কেন না যে বিশ্বাসের মধ্যে বন্দী সেও বন্দী। মন্দিরে অর্গলিত যে মানুষ তার চেয়ে বিচ্যুত মানুষ বেশি স্বাভাবিক, কারণ সে বিচ্যুতির মধ্যে স্বাধীন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত সংসারে বিশ্বাস, প্রগতিতে বিশ্বাস সার্ত্রর জগতে অনুপস্থিত। বিশ্বসংসার তাঁর কাছে শুধু ট্রাজিক নয়, মূক ও অর্থহীন। সর্বজন বা বহুজনগ্রাহ্য কোন অর্থ

থাকলে মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্নটিই তো অবান্তর হয়ে যায়। মানুষের একাকীত্ব, নিষ্ঠুর যৌনচেতনা, সংসারের শূন্যগর্ভ প্রতীতি আতঙ্ককর। উপন্যাসের নায়ক এই আতঙ্কের মুখোমুখি। কিন্তু ঔপন্যাসিক সত্য আতঙ্ককে মিথ্যা শুশ্রূষার উপশমে আবৃত করতে চান না। সার্ত্র্‌র উপন্যাস 'লাজ দ্য র‍্যাজঁ'-এর নায়ক মাথিউকে দেখি—সংসার চারিধার থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে, তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, তার স্বাধীনতার প্রশ্নটিকে ঘটনাপ্রবাহ যেন জরুরী করে তুলেছে। প্রথমেই দেখি মাথিউর সঙ্গে এক মাতালের সাক্ষাৎকার। এই মাতালকে সে কয়েক ফ্রাঁ দান করবে কিনা সে তার ইচ্ছা; তার স্বাধীন ইচ্ছা সে ফ্রাঁ দিয়ে বা না দিয়ে ব্যক্ত করতে পারে। ক্রমশ দেখি স্বাধীন ইচ্ছা অনুসরণ করতে করতে সে ক্রমশই অধীন হয়ে পড়ছে, নিরূপিত হয়ে পড়ছে, তার স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। মুক্তিই বন্ধনের হেতু হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত প্রহেলিকা।

অস্তিত্বের এই যন্ত্রণা সার্ত্র্‌র অনেক আগে পাসকাল ও র‍্যাঁবো বর্ণনা করে গেছেন। অস্তিত্ব ও মুক্তির সমস্যা সার্ত্র র মূল শিল্প-সমস্যা। এই দার্শনিক পরিমণ্ডলের মধ্যেই তাঁর ভুবনকে আমরা বুঝতে পারি। মাথিউ মনে করে অস্তিত্বই তার বন্ধনের কারণ, অস্তিত্বের দ্বারাই তার স্বাধীনতা বিড়ম্বিত। উপন্যাসের শেষে মার্সেলকে পরিত্যাগ করবার পর সে উপলব্ধি করে যে, এই মেয়েটিকে পরিত্যাগ করবার কোন সঙ্গত কারণই ছিল না। পারিপার্শ্বিক জীবনকে তার মনে হয় অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত, নিরর্থক। মাথিউ ছাড়া আরো একটি চরিত্র হচ্ছে দানিয়েল। বলা যায়, মাথিউ এবং দানিয়েল এই দুটি চরিত্রের মধ্যেই সার্ত্র নিজেকে প্রক্ষেপ করেছেন। দর্শনের অধ্যাপক মাথিউ সংসারের জটিল আবর্ত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনছে, আর দানিয়েল তার দেবদূত-সুলভ নির্লিপ্তি থেকে ক্রমশ অস্তিত্বের জটিলতার মধ্যে নেমে আসছে। সার্ত্র র দ্বান্দ্বিকতা এই দুটি চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট।

সার্ত্র বলেছেন, তিনি তাঁর যুগের সঙ্গে, শতাব্দীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান, তিনি হবেন 'অঁগাজি' বা 'যুক্ত'—যুগকে রক্ষা করবার জন্য নয়, যুগপরিবর্তন ও সমাজ-বিবর্তনের সহায়ক হিসাবে। অথচ এর ফলে কোন প্রগতি হবে এই বিশ্বাস তাঁর নেই। এ শুধু তাঁর আত্মআবিষ্কারের বা আত্মনিরূপণের পক্ষে দরকার বলে। ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক ক্যাথলিকবাদে বিশ্বাসী, কামু ধর্মাধর্ম কোনটিতেই বিশ্বাসী নন, কিন্তু সার্ত্র সমাজবাদ-সাম্যবাদের অনুরাগী। অথচ বিশু দর্শনের দিক থেকে মার্ক্সবাদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কোনই যোগ নেই।

তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন, কারণ ঈশ্বর-সমর্পিত মানুষ স্বাধীন নয়। অনুরূপভাবে তিনি মার্ক্সবাদী দর্শনেও বিশ্বাস করতে পারেন না, কারণ এই বিশেষ দর্শনে সমর্পিত মানুষও স্বাধীন নয়। সার্ত্রের কাছে বড়ো কথা হল 'স্বেচ্ছা'। অতএব তাঁর রাজনৈতিক উক্তি ও আচরণ দিয়ে সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নিরর্থক।

কামুর সঙ্গে সার্ত্রের প্রধান বিরোধ হচ্ছে মানুষের ভূমিকা নিয়ে। কামু মনে করেন---মানুষ থাকবে সমাজের বাইরে, সে হবে 'আউট সাইডার'; সার্ত্র মনে করেন, সে থাকবে ভিতরে, সে হবে 'ইনসাইডার'। অথচ কামু ও সার্ত্র দুজনেই অস্তিত্ববাদী। সার্ত্র মরিয়াককে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন, কারণ মরিয়াক ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং তাঁর জগৎ মুক্ত নয়, বদ্ধ, সমর্পিত; সেখানে নতুন স্বাধীন ঘটনা ঘটতে পারে না। পরন্তু দস্তয়েভস্কি, ফকনার, হেমিংওয়ের জগৎ এবং চরিত্রগুলি মুক্ত, স্বাধীন। মানুষ নিজের মধ্যে সীমিত, এই বিশ্বাস বা সত্য আধুনিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কাফকার উপন্যাসে, গ্রেহাম গ্রীনের গল্পে দেখি মানুষ 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমারের মতো এক পথিক---যে তার পথ হারিয়েছে; এমন এক জগতে সে পথ হারিয়েছে, যার সঙ্গে তার নিজের কোনই মিল নেই।

দার্শনিক কির্কেগার্ড এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, দার্শনিক আলোচনা নিরর্থক। কারণ অস্তিত্ব নিজেকেই নাস্তিত্ব বলে প্রমাণিত করে। তিনি বলতেন আমাকে যদি কোন নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখি তা হলে আমিই নাস্তি হয়ে যাবো। কারণ আমি গণিতের প্রতীক নই, আমি অস্তিত্ববান, আমি 'সৎ'। খৃস্টীয় গির্জাকে কির্কেগার্ড আক্রমণ করেছিলেন এই বলে যে, চার্চ ধর্মজীবন যাপনের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ধর্মকেই জীবনের মাপে ছাঁটাই করে নিয়েছে। নীৎশে, অপরপক্ষে, চার্চকে এই বলে আক্রমণ করেছিলেন যে, চার্চ জীবনকেই চার্চের মাপে ছাঁটাই করতে চায়। সার্ত্র কির্কেগার্ডের অস্তিত্ববাদী দর্শন গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কির্কেগার্ডের মতো কোন ধর্মভাব তাঁকে বিচলিত করে নি।

সার্ত্রের 'অঁতোয়ান রোকাঁতাঁর ডায়েরি'তে দেখি রোকাঁতাঁ হঠাৎক এদিন অবাক হয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করছেন--

'ছ' বৎসর পর যেন আমি ঘুম ভেঙে উঠলাম----আমি কেন ইন্দোচীনে রয়েছি কিছুতেই মাথায় ঢুকলো না। আমি সেখানে এতদিন কী করছিলাম?'

জনাকীর্ণ কাফেতে এক গ্লাস বীয়ারের দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হয়।

'আমি ব্যাখ্যা করতে পারি না, আমি কী দেখছি। কাউকেই না। ঐ তো। আমি নিঃশব্দে জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি, ভয়ের দিকে।'

অর্থ, উদ্দেশ্য, উপযোগিতা সহ তাঁর ব্যবহারিক জীবন পড়ে রইল; তিনি যেহেতু সত্যবান অতএব এই যে আরেক সত্য, অর্থ-উদ্দেশ্য-উপযোগিতাশূন্য সত্য, এই যে বিবমিষা তাঁকে আক্রমণ করছে, একে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। জয়েস বা দস্তয়েভস্কিও সার্ত্রের মতো অন্ধকার ও মলিনতার এত গভীর বর্ণনা দিতে পারেন নি। এই সব অনিচ্ছা, বিবমিষা রোকাঁতাঁর নিজের মধ্যে নেই; তাঁর বাইরে চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে এই মালিন্য, অস্বস্তি, বিবমিষা।

রোকাঁতাঁর সমস্ত পুরনো মূল্যবোধগুলি ভেঙে পড়ছে, ক্লান্তিতে স্মৃতি খসে পড়ছে, ঘটনার পরম্পরা ভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শুধু বর্তমান, দৃশ্যমান বর্তমান থেকেই তাঁকে অর্থ আহরণ করতে হচ্ছে। স্মৃতির সাহায্য থেকে বঞ্চিত দ্রষ্টা দেখছেন, স্পর্শ করছেন, কিন্তু চিনতে পারছেন না, বুঝতে পারছেন না। অদ্ভুত কোণ থেকে ফটো তুললে যেমন চেনা জিনিসকেও অচেনা ও কিম্ভুতকিমাকার মনে হয় এও তেমনি; বস্তুগুলি নাম থেকে বঞ্চিত, রূপের পরিবর্তে অরূপের মধ্যে হাস্যকরভাবে লম্বিত। এই নামশূন্য বস্তুপিণ্ডের মধ্যে নায়ক নিজেকে আবিষ্কার করেন। তা হলে কার্যকারণ সম্পর্ক কি নেই, কোন সম্ভাব্য অর্থ কি নেই? সার্ত্র সংক্ষেপে বলেছেন, মানুষের আবেগ অর্থহীন; তার কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা নির্বাচনের উপায় নেই।

কির্কেগার্ড বলেছিলেন, সত্য হচ্ছে আত্মগত, ব্যক্তিগত; কোন বিদেহী বা বিমূর্ত দার্শনিক আধারের মধ্যে সত্য নেই, কারণ তাতে স্বাধীনতা নেই। যেন স্বাধীনতাই সত্যের প্রকৃত রূপ। হেগেলকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি এক দর্শন-বিরোধী দার্শনিকতার অবতারণা করেছিলেন। নৈর্ব্যক্তিক বা বিমূর্ত চিন্তা, সর্বজনীন চিন্তা, যা দর্শন ও দার্শনিকদের প্রিয় বিচরণভূমি, তা নয়; বাঁচার প্রয়োজনেই চিন্তা, চিন্তার জন্য চিন্তা নয়; চরম নিগ্রহের মধ্যে যে-মানুষ বেঁচে রয়েছে, চরম অসহায় বন্ধনের মধ্যে যে-মানুষ ছটফট করছে---তার ব্যক্তিগত চিন্তাই ভাবনীয়। কির্কেগার্ড তাদের হয়ে বললেন যারা যন্ত্রণাবান, যারা অ-মুক্ত, বন্ধনে জড়িত; যাদের চিন্তা ও যন্ত্রণা বন্ধনের সঙ্গে লগ্ন। সার্ত্র ও হাইডেগার কির্কেগার্ডের দর্শন-বিরোধী দর্শনের সংগে 'অস্তিত্ব' ও 'কাল' বিষয়ক দার্শনিকতা যুক্ত করলেন। অধ্যাত্মবাদী কির্কেগার্ডের ঈশ্বর-ভূমি আরো সঙ্কুচিত হল; কারণ 'কাল' ও 'অস্তিত্বের' প্রশ্নে ঈশ্বরের প্রশ্ন গৌণ হয়ে গেল। তারপর এলেন সার্ত্র। অস্তিত্ববাদ কেবলমাত্র দর্শন রইল না, সার্ত্র তাকে সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিলেন; এবং সাহিত্য যেহেতু জীবনেরই প্রতিবিম্ব, অস্তিত্ববাদ সার্ত্রের রচনায় জীবন্ত সত্যের রূপ নিল। এই সত্যের মধ্যে সংসার নতুনভাবে অস্তিত্ববান হল। সার্ত্রের অপ্রিয় সত্যকেই জগৎ সুন্দর বলে মেনে নিল। এখানেই সার্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, সার্ত্রের সিদ্ধি।

ভারতীয় বংশোদ্ভব সিংহলীদের সম্পর্কে চুক্তিতে স্বাক্ষর করছেন শ্রীশাস্ত্রী ও শ্রীমতী বন্দরনায়ক।

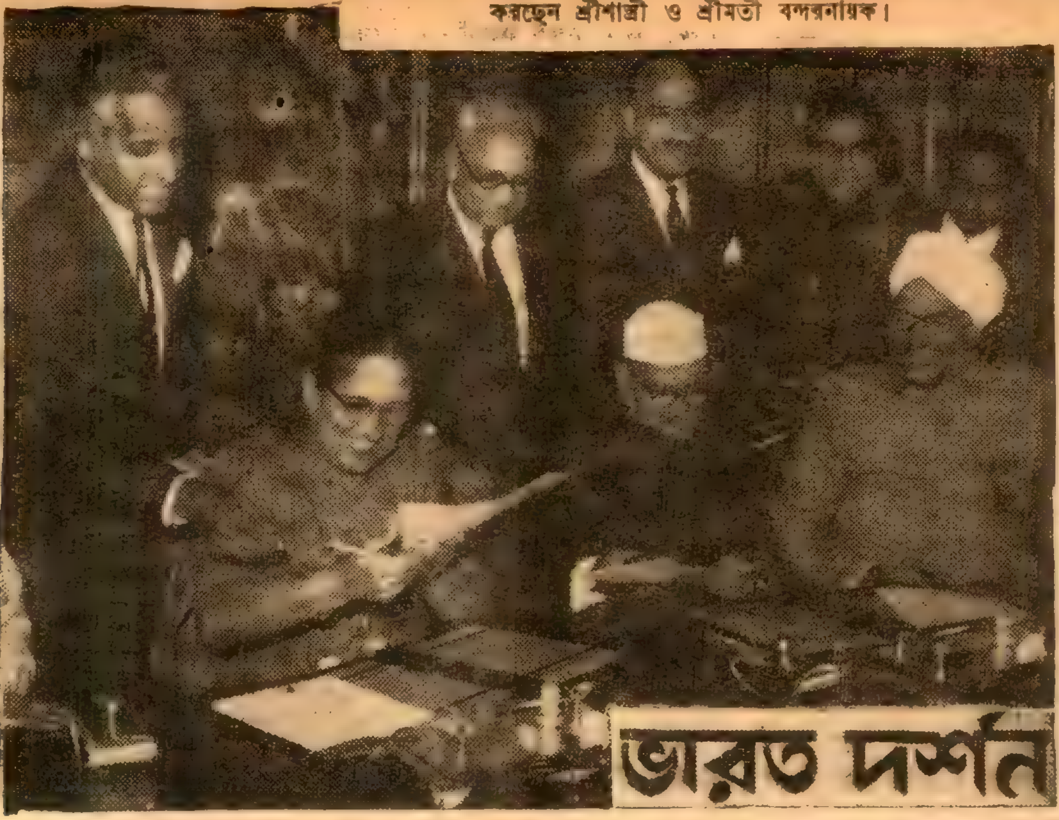

ভারত দর্শন

রাজধানী :

চীনা পারমাণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তা নয়াদিল্লীকে কাবু করতে পারে নি। এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ও উন্মাদনার অবসান ঘটেছে। বিশ্বের দরবারে ভারতের স্থান আলাদা। ভারত মস্কো চুক্তির একজন অংশীদার। মারণাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মারণযন্ত্র নিবারণের আদর্শে ভারত বিশ্বাসী নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে যে বাক্য কোথাও নেই। প্রাচীনকাল থেকে শান্তির বাণী দিয়েই ভারতবাসী বিশ্বের দরবারে নিজের একটা নির্দিষ্ট আসন দখল করে আছে। সে-পথ থেকে নব-ভারত বিচ্যুত হয় নি—হতেও পারে না। জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিহার করে কোন জাতি কোন কালেই নিজের আসনে অটল থাকতে পারে নি। চেঙ্গিস খাঁর উত্তরসাধকদের পক্ষে যে-কাজ সম্ভব, বুদ্ধশিষ্য ধর্মাশোকের উত্তরপুরুষদের পক্ষে তা কোন দিনই সমীচীন হতে পারে না। দুষমনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার আয়োজন ভারতের কাম্য নয়।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ বিতর্কের যবনিকাপাত হয়েছে। উত্তেজনার মুখে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা সম্ভব না হলেও মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হয়েছে। চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক শক্তি অর্জনের কাজে হাত দেবার কোন যৌক্তিকতা নেই বলেই কমিটি মনে করেন।

• • •

পারমাণবিক বোমা অপেক্ষা সিংহলের সঙ্গে ভারতের বিরোধের মীমাংসার ওপর রাজনৈতিক মহল গুরুত্ব আরোপ করছেন অধিক। ভারতীয় বংশোদ্ভব সিংহলীদের নাগরিক অধিকারের সমস্যা ভিন্ন সিংহলের সঙ্গে ভারতের কোন বিরোধই ছিল না।

এ সমস্যা দীর্ঘ দিনের। ১৯৫৪ সালে নেহরু-কোটেলওয়ালা চুক্তি একবার সম্পাদিত হয়েছিল। সে-চুক্তি শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয় নি—সিংহল সরকারই তা মেনে নেন নি। নেহরু-কোটেলওয়ালা চুক্তি অনুযায়ী নয় লক্ষ ভারতীয় বংশোদ্ভব সিংহলবাসীর মধ্যে চার লক্ষকে সিংহলের নাগরিক অধিকার দেওয়ার কথা ছিল। আড়াই লক্ষ থাকবে স্থায়িভাবে সিংহলেই এবং বাকি আড়াই লক্ষ নরনারী ভারতে আসবে।

নতুন চুক্তিতে বোঝাটা চেপেছে ভারতের ঘাড়েই বেশি করে। পৌনে-দশ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে তিন লক্ষ পাবে সিংহলে নাগরিক অধিকার, সোয়া পাঁচ লক্ষ আসবে ভারতে ফিরে। দেড় লক্ষ নরনারীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে পরবর্তী বৈঠকে। ধরে নেওয়া যেতে পারে, এদেরও একটা বিরাট অংশ ভারতকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

সিংহলের পৌনে দশ লক্ষ মানুষের কেউ ভারতের মাটি চোখে দেখে নি। ভারতের সঙ্গে তাদের কোন দিক দিয়ে কোন যোগই নেই। এদের পূর্বপুরুষরা

ছিলেন দক্ষিণ দেশের মানুষ। জীবিকার সন্ধানে তাঁরা সাগরপাড়ি দিয়েছিলেন। কর্মবিমুখ সিংহলীদের মধ্যে শ্রমিক না পেয়ে শ্বেতাঙ্গ মালিকরা ভারত থেকে সিংহলে শ্রমিক নিয়ে গিয়েছিল। এই শ্রমিদের হাতে গড়ে উঠেছে সিংহলের সম্পদ অনেকখানি। আজ সেই সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এ সব দিক বিচার করলে সিংহল থেকে তাদের নির্বাসনের চুক্তিতে ভারত সম্মত হতে পারে না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এ ক'বছরে সরকারের কম হয় নি। এখনও দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে। আর কত আসবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। দণ্ডকারণ্যে যাঁরা গিয়েছেন তাঁদের এখন অরণ্যে রোদনই সার হচ্ছে। বাঁচার যোগ্য ব্যবস্থার অভাবে দণ্ডকবাস পরিত্যাগ করে যাঁরা অনির্দিষ্ট, অজানার পথে পা বাড়িয়েছেন, তাঁদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়---তাঁরা এখন না ঘরকা, না ঘাটকা। স্থির হয়ে দাঁড়াবার মত মাটি খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। এর পরে সিংহল থেকে যাঁরা আসবেন---স্থির হল তাঁদের নিয়ে সৃষ্টি হবে নতুন করে উদ্বাস্তু সমস্যা।

ভরসার কথা, এঁরা একসঙ্গে এসে হুড়মুড় করে পড়বেন না। পনের বছরে ধাপে ধাপে এঁদের আনা হবে। তাঁরা সিংহলে জীবিকার্জনের পরিপূর্ণ সুযোগ পাবেন। আসবার সময় নিঃস্ব হয়ে এককাপড়ে ফিরে আসতে হবে না। সঞ্চয় কিছু হাতে নিয়ে এলেও পুনর্বাসনের কাজ সহজ হবে না। এঁদের জমি-জমা দিয়ে স্থিতিশীল করা এবং কর্মসংস্থান করে দেওয়া খুব সহজ-সাধ্য নয়।

এ বিরাট ঝুঁকি ভারতকে নিতে হয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখার তাগিদেই। সিংহল-ভারত চুক্তিতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই সন্তোষও প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের বিরোধ, যে-ভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মিটিয়েছেন, তাতে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে। মাঝপথে আলোচনা ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। শ্রীমতী বন্দরনায়ক তল্পী-তলপা গুটিয়ে দেশে ফিরতে চাই-ছিলেন। শ্রীশাস্ত্রী তাঁকে শান্ত করে আবার আলোচনায় বসিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত উভয়েই যে-পথ খুঁজে পেয়েছেন, তাতে ভারতের সঙ্গে সিংহলের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়েছে।

পড়শীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে গিয়ে ভারতকে কিছুটা খেসারত দিতে হলেও এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সঙ্গে আজ মধুর সম্পর্ক। নেপালের সঙ্গে মীমাংসায় শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সিংহলের সঙ্গে বিরোধ জট ছাড়িয়ে আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করার রাজনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতের তেমন কোন সংঘাত নেই। চীনের মমদের প্যাঁচ কাটিয়ে আসতে হলে ব্রহ্মদেশকে ভারতের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হতে হবেই। রাজনৈতিক চক্রই তাকে ঠেলে দেবে সে পথে। এরপর পাকিস্তানের রাষ্ট্রনেতাদেরও একটু সমঝে চলার দিন আসবে। সিংহলের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসার পর পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী প্রচারেরও সুর খাদে নেমে। ভারতের সঙ্গে সকল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুষমনীর অপপ্রচার চালানো আর তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

* * *

কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহমন্ত্রী শ্রী এইচ সি দাসাপ্পাকে হারিয়ে নয়া-দিল্লী শোকবিহ্বল হয়ে পড়েছিল। অক্লান্ত কর্মী, যোগ্য পার্লামেণ্টারিয়ান এবং অভিজ্ঞ শাসক শ্রীদাসাপ্পাকে অকস্মাৎ মৃত্যু ছিনিয়ে নেবে, কেউ ভাবতেও পারে নি। সেদিন রাত্রিতে কয়েকজন বন্ধুকে তিনি নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন। রাত তখন ন'টা। অতিথিরা একে একে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের আদর-আপ্যায়ন করেছেন তিনি নিজে।—হঠাৎ তাঁর বুকে বেদনা সুরু হয়। অতিথিদের আতঙ্কিত না করে ট্রাঙ্ককলে কথা বলবার অছিলায় তিনি ভেতরে চলে যান। চিকিৎসক ডেকে পাঠান টেলিফোনে। ওষুধ খেয়ে সামান্য একটু বিশ্রামের পরই ফিরে আসেন বন্ধুদের কাছে। তাঁদের বিদায় দিয়ে নিঃশব্দে নিজে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করেন এ-জগৎ থেকে।

* * *

ভারত সরকার মন্ত্রীদের আচরণ-বিধি প্রণয়ন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ জানিয়েছেন, আচরণবিধি অচিরেই কার্যকরী হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদিত আচরণবিধি অনুসারে প্রত্যেক মন্ত্রীকে তাঁর দায় ও দায়িত্বের হিসেব দাখিল করতে হবে। শুধু মন্ত্রীদের নয়, তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পরমাত্মীয়দের সম্পত্তির হিসেবও দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রশাসন-যন্ত্রকে কলুষমুক্ত করা। সামন্ততন্ত্রের যুগ শেষ হয়েছে। তার বাহ্যিক দিকটার বিলোপ হলেও সামন্ততান্ত্রিক মেজাজ রয়েছে সমাজের প্রতি পরতে

● শ্রীদাসাপ্পা

পারতে। সে মেজাজটা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বেশি করে। তার প্রভাব আজ উড়িষ্যা, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যের পরিবেশকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াইয়ে শাসন-ব্যবস্থায় সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট বিশৃঙ্খলা। সেই সুযোগে দুর্নীতি আরও বেশি করে দানা বাঁধছে। এই সামন্ততান্ত্রিক মেজাজের অবসান না-ঘটাতে পারলে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হতে পারে না।

ভারত সরকারকে আচরণবিধি কার্যকরী করার সঙ্গে এ-কথাও ভাবতে হবে, চারিত্রিক পরিবর্তন উপরের তলার মানুষের না-হলে কোন বিধিই, কোন বাধ্যবাধকতাই দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে পারবে না। আইনের ফাঁকে সকল বেড়াজাল একদিন ছিন্ন হয়ে যাবে। ওপরের তলা অপরিচ্ছন্ন হলে তার তলানী গড়িয়ে নীচের তলাকেও ক্লেদাক্ত করতে বাধ্য। আজ গোটা সমাজের প্রতি স্তরে এই জন্যই কলুষতা প্রবেশ করেছে। তাকে সাফ করতে হলে মন্ত্রীদের আচরণের পরিবর্তন করতেই হবে। মন্ত্রীরা পুঁজিপতি হলে, বিরাট বিত্তের মালিক হয়ে তাঁরা আরামে বিলাসের মধ্যে জীবন কাটাতে থাকলে, কালোবাজার শায়েস্তা হবে না,—কালো-টাকা সমাজের বুকে কাল হয়েই থাকবে।

* * *

মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক'দিন এক নাগাড়ে আলোচনা হয়ে গেল। খাদ্যনীতির প্রতিবাদ জোরালো ভাষায় করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীভক্তবৎসলমও সবটা মেনে নিতে পারেন নি। অন্যেরা কেউ তেমন আপত্তি তোলেন নি।

উড়িষ্যা ঃ

উড়িষ্যার অবস্থা এখন শান্ত। শান্তি ফিরিয়ে আনতে উড়িষ্যা সরকারকে তলব করতে হয়েছে সৈন্য-বাহিনীকে। উত্তেজিত ছাত্রদের কাঁদিয়ে শান্ত করার জন্যে কলকাতা থেকে আমদানী করতে হয়েছে কাঁদুনে গ্যাস। পুলিশের গুলীতে নিহত হয়েছে তিনজন। গুলীর আঘাতে ও লাঠির ঘায়ে ক'জন আহত হয়েছে তার সঠিক সংখ্যা কেউ বলতে পারবে না। পরিবেশ শান্ত হলেও বিপদ কাটে নি। ছাত্রসমাজের একাংশ এখনও উত্তেজিত।

উড়িষ্যার অবস্থা পর্যালোচনার জন্য কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীকামরাজ নাদার ডঃ রামসুভাগ সিংকে পাঠিয়েছেন। শ্রীসিং গুরুদায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছেন। তাঁকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করতে হবে—উড়িষ্যার ছাত্রসমাজের বিক্ষোভের মূল কোথায়। বাসের কণ্ডাক্টারের সঙ্গে বিরোধ, দোকানের মালিকের সঙ্গে ঝগড়া কলকাতার শহরে হামেশাই হয়ে থাকে। কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে যায়, কটু কথার বিনিময় থেকে হাতাহাতিও হয়ে থাকে। কিন্তু কোন দিনই তা নিয়ে দক্ষযজ্ঞের সৃষ্টি হয় না। উড়িষ্যার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটলো কেন? কেনই বা ছাত্রগণ এমন মারমুখী হয়ে ছাত্রসমাজের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করলো? এ-সব প্রশ্ন সামনে রেখেই অবস্থার পর্যালোচনা করতে হবে ডঃ সিংকে।

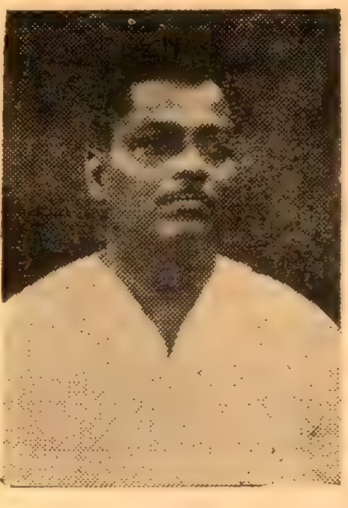

● শ্রীবীরেন মিত্র

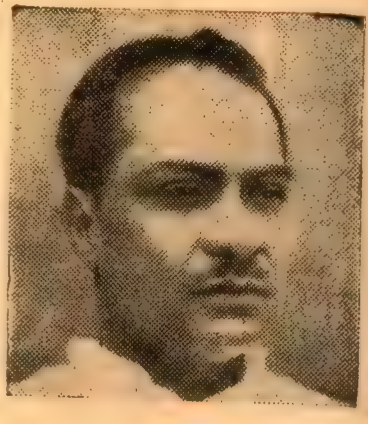

● শ্রীবিজু পটনায়ক

আমরা একাধিকবার বলে এসেছি, নেতাদের গায়ে কলঙ্কের দাগ যতদিন লেগে থাকবে, ততদিন যৌবনের উন্মাদনায় উদ্বেলিত হৃদয় ছাত্রসমাজের ওপর সকল অপকর্মের দোষ চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। আজ দেখা যাচ্ছে, উড়িষ্যার ছাত্রসমাজের পিছনে রয়েছে ক্ষমতাসীন নেতাদের বিপক্ষ দল। কংগ্রেসের একটি দলও উস্কানীদাতাদের মধ্যে থেকে তরুণসমাজকে এমনি করে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন।

আসলে দেখা যাচ্ছে, উড়িষ্যার ছাত্ররা উপলক্ষ মাত্র। তাদের সামনে রেখে চতুর যোদ্ধার মত লড়াই চালাচ্ছেন মন্ত্রীদের ওপর যাঁরা খাপ্পা তাঁরাই। শ্রীবীরেন মিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া গেছে। তাতে তাঁর এবং মুরুব্বী শ্রীবিজু পটনায়কের বিরুদ্ধেই গিয়েছে। এরপর পরিস্থিতি কতদূর গড়াবে কেউ বলতে পারেন না। তবে, এটা আজ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, শ্রীমিত্র ও শ্রীপটনায়কের বিরুদ্ধপক্ষ সহজে ছাড়বার পাত্র নন। শ্রীমিত্রকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড পদত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে সংবাদও প্রকাশিত। তিনি নিজেই একবার বৈরাগ্যের ভেক ধরেছিলেন। এক টাকায় তাঁর স্ত্রীর ও নিজের দায়-দায়িত্ব বেচে দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বনের হুমকীও দিয়েছিলেন। কোন কাজই তাতে

হয় নি, বরং ফ্যাসাদ আরও বেড়েছে। ফিরে আবার তাকে বসতে হয়েছে পরিত্যক্ত আসনে।

বৈরাগ্যের এই ভেকটি ধারণ না করে শক্ত হাতে হাল ধরলে পরিস্থিতি এত ঘোরালো হয়ে উঠতো না। অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছেন আজ তিনি ছাত্রদের হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন নিয়োগ করতে। এ দাবী ছাত্ররা গোড়াতেই তুলেছিল। দাবীটা সেদিন মেনে নিলে তাঁর মর্যাদা বাড়তো বই কমতো না। অবস্থাও চলে যেতো না আয়ত্তের বাইরে। শত্রু পক্ষ সুযোগ পেতো এমন করে তাঁর শরসজ্জা রচনার।

মহারাষ্ট্র ঃ

খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে রাজ্য সরকার আর অটল থাকতে পারলেন না। ব্যবসায়ীদের চাপেই নাকি সব তণ্ডুল বিতরণের সকল সঙ্কল্প ভণ্ডুল হয়ে গেল। সরকারকে একটা অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে যেতে হল। ব্যবসায়ীদের প্রভাবে কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যেও খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপার নিয়ে দেখা দিয়েছিল মতবিরোধের। সে বিরোধ এড়াতে গিয়ে সরকার বাধ্য হয়ে স্থির করেছেন, জোয়ারের মত চাল ও গমের ব্যবসায় সরকার নামবেন না।

● শ্রীনায়েক

সঙ্কল্প ত্যাগের একটা ব্যাখ্যাও সরকার পক্ষ থেকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের মতে,

● শ্রীচ্যবন

গম ও চালের জন্য রাজ্য সরকারকে নির্ভর করতে হয় অন্যান্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় খাদ্যভাণ্ডারের ওপর। পর্যাপ্ত সরবরাহ বাইরে থেকে পাওয়ার সঠিক কোন ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত শ্রীবসন্তরাও নায়েক চাল ও গমের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঝুঁকি নিতে পারেন না। এই জন্যই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়েক বাধ্য হয়েছেন নীতি পাল্টাতে। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে পুরাপুরি সহযোগিতা কেন্দ্রীয় সরকার, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কাছ থেকে পাচ্ছেন না। তাঁরা প্রতিশ্রুতিমত চাল ও গম সরবরাহ করে উঠতে পারছেন না।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে শ্রীচ্যবন এবং মধ্যপ্রদেশের খাদ্য মন্ত্রী শ্রীগৌতম রায় এ অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন। শ্রীচ্যবন বলেছেন মহারাষ্ট্র সরকারের অভিযোগ ভিত্তিহীন। কেন্দ্রীয় সরকার যথাসময়েই খাদ্যশস্য পাঠিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের খাদ্যমন্ত্রী রায়পুরে বলেছেন এক লক্ষ বিশ হাজার টনের মধ্যে ষাট হাজার টন ধান তারা জুন মাসেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। নভেম্বরের প্রথম দিকে বাকী পাঠানো হবে।

পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিষাণ নাকি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র পেলেই তিনি মহারাষ্ট্রে খাদ্যশস্য পাঠাতে পারেন।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ব্যবসায়ীদের চাপ ছাড়াও, কেন্দ্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার প্রয়াসে শ্রীনায়েক খাদ্যশস্য রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারে মত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শ্রীচ্যবন যে-মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাতে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা বিব্রত বোধ করছেন। শ্রীচ্যবনের কাছে মুখ্যমন্ত্রী অনেক আশাই করেছিলেন। দিল্লীর দরবারে শ্রীচ্যবনকে মহারাষ্ট্রের একজন বড় মুখপাত্র হিসেবে তিনি ধরে রেখেছিলেন। মহারাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অকুণ্ঠ সমর্থন আশা করা হয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক ও উপদলীয় সংঘাতের জন্য সে আশা ফলবতী হচ্ছে না।

* * *

মারাঠওয়াদার স্বার্থের প্রতি চরম উপেক্ষার কথা অকপটে স্বীকার করে শ্রীনায়েক বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়ে আলোড়ন সুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঔরঙ্গাবাদে শ্রীনায়েক বলেছেন, পাঁচসালা পরিকল্পনাকালে মারাঠওয়াদার জন্য বরাদ্দ টাকা খরচই করা হয় নি। এই অনগ্রসর এলাকার উন্নতির প্রশ্নটি সরকার তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে পারেন নি।

আসল কথা, এ অঞ্চলের কথাটা জোর দিয়ে মন্ত্রিসভায় কোনদিন উত্থাপিত হয় নি। এ অঞ্চলের কোন পরিকল্পনাকে এখনও পর্যন্ত রূপ দেওয়া হয় নি। শ্রীনায়েক চতুর নায়ক। তিনি এই অকপট স্বীকারোক্তি দ্বারা

নিজের আন্তরিকতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘায়েল করতে চাইছেন শ্রীওয়াই বি চ্যবনকে। প্রকারান্তরে তাঁর বিরুদ্ধে আঞ্চলিক স্বার্থের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। তাঁর আমলে এবং পরলোকগত শ্রীকান্নামওয়ারের আমলে নারাথওয়াদায় কোন কাজই হয় নি। শ্রীনায়েক মুখ্যমন্ত্রী হয়েই এ এলাকার প্রতি উচ্চ প্রশাসনিক মহলের দৃষ্টি

● শ্রীগৌতম রাম

আকর্ষণ করেছেন। বর্তমান পরিকল্পনা-কালের মধ্যেই বরাদ্দ সকল অর্থ ব্যয়ের আশ্বাসও শ্রীনায়েক দিয়েছেন।

ষাট কোটি টাকার গোদাবরী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রশ্নটিও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে এক কোটি একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হবে। নারাথওয়াদাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন।

* * *

কোন প্রকার আঞ্চলিক ক্ষমতা না আরোপ করে, চুক্তির ভিত্তিতে মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদ গোয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে নাকি সম্মত হয়েছেন।

মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পরিষদের সঙ্গে গোয়ার অন্তর্ভুক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের কাম্য নয়। শ্রীবন্দোদকার সরকারের মহারাষ্ট্রভুক্তির আন্দোলনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সমর্থন আছে, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। গোয়া মহারাষ্ট্র বিদ্যুৎ পরিষদে যোগদান করলে অনুরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্র ও মহীশূর সরকারকে গোয়ার বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্দেশ দেওয়াও হয়েছে।

উত্তর প্রদেশ :

স্বতন্ত্র দলের একটা বড় অংশকে কংগ্রেসে স্থান দেবার জোর চেষ্টা চলেছে। প্রকাশ, কৃষিমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এ ব্যাপারে অনেকদূর এগিয়েছেন। স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে আঁতাতের তিনি একজন বড় প্রবক্তা। এখন সে দলের বেশ কিছু সংখ্যক সদস্যকে কংগ্রেসে গ্রহণের জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছেন।

স্বতন্ত্র দলের নেতা, বিধানসভার সদস্য রাজা ভানুপ্রতাপ সিংকে এর মধ্যেই তিনি কৃষক সমাজের সম্পাদকের-পদ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। উত্তর প্রদেশে স্বতন্ত্র দলের প্রতিষ্ঠাতা

● শ্রীচরণ সিং

পরলোকগত রাজা রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং-এর ছেলে মাংকাপুরের রাজাকে গোণ্ডা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেবার কথাও চলেছে।

রাজস্থান :

হনুমানগড়ের উপ-নির্বাচনের পর রাজনীতির পটপরিবর্তন হয়েছে অনেকখানি—হাওয়া বইতে সুরু করেছে বিপরীত দিকে। সাধারণ মানুষের চোখে বামপন্থী কমিউনিস্টরা অত্যন্ত হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাড়ে তিন হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন। বিগত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীকে তেরো হাজার ভোটে হারিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট সদস্য। এবারেও আসনটি লাভের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি তার আদর্শকে পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছিল। এ এলাকায় ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটি। কাজেই কমিউনিস্ট সমর্থিত প্রার্থীর পরাজয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

হনুমানগড়ের নির্বাচন বামপন্থী কমিউনিস্টদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। সেই সঙ্গে খুলে দিয়েছে তাদের মুখোশ।

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আন্দোলন পরিচালনা 'সোল এজেন্সি'র দাবিদারগণ নির্বাচনী আঁতাত করেছিলেন সামন্ত রাজাদের, জোতদার-জমিদারদের প্রতিনিধি স্বতন্ত্র দল ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে। পরাজিত প্রার্থী কমিউনিস্ট না হলেও তাদেরই লোক—প্রাক্তন কমিউনিস্ট সদস্য শ্রীশিওপত সিং-এর পিতা শ্রীহরিরাম। সরাসরি কমিউনিস্ট কোন সদস্যকে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে না পাঠিয়ে শ্রীহরিরামকে সমর্থনের নীতিগত ব্যাখ্যা দলের পক্ষ থেকে দেবার কথাও একটা সময়ে উঠেছিল। শ্রীমতী গায়ত্রীদেবী হরিরামকে সমর্থনের অভিপ্রায় জানাতেই সুযোগ সন্ধানীকমরেডের দল রাতারাতি ডিগবাজী খেলেন। নীতিবিষয়ক মেনিফেস্টো শিকেয় তুলে রেখে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সমাজতন্ত্রীদের এক হয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলেন। এতে সুবিধা অনেক। হরিরাম জিতে গেলে জনসমক্ষে নিজেদের প্রতাপ ঘোষণা করতে অসুবিধা ছিল না। নির্দলীয় প্রার্থী হরিরামের পরাজয়ের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াও সহজ।

এ দায়িত্ব থেকে কামউনিস্ট পার্টি অব্যাহতি পায় নি। কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী রাজা ও রাণীদের ভোট পায় নি—দরিদ্র সাধারণের ভোটেই জয়লাভ করেছে। নির্বাচনী প্রচারেও এই কথাটাই তুলে ধরা হয়েছিল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। কংগ্রেস প্রমাণ করে দিয়েছে, সাধারণ মানুষের দরদীরা সুবিধাবাদী হতে পারে না—রাজাদের দলে গিয়ে কোন অবস্থাতেই তারা সামিল হতে পারে না। সাচ্চা বিপ্লবী কখনও সামান্য একটি আসনের জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের অর্থে 'জনযুদ্ধে' নামতে পারে না।

* * *

হনুমানগড়ের নির্বাচনের পরাজয় এবং স্থানীয় 'বল বেয়ারিং' কারখানার কর্মীদের ধর্মঘটের তাড়াহুড়ো করে মীমাংসা করায়, বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতাদের ওপর দলের কর্মীরা ক্ষেপে উঠেছে। প্রকাশ্যে নেতাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করা হচ্ছে। সাধারণ কর্মীদের মতে, নেতাদের অদূরদর্শিতায় রাজস্থানে বামপন্থীদের অদূর ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়ানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হবে।

পঞ্চাশ দিন পরে শ্রমমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে কারখানার কর্মীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে। সাম্প্রতিককালে এমন দীর্ঘদিন ধরে আর ধর্মঘট হয় নি। এই ধর্মঘটকে জাইয়ে রেখে বামপন্থী কমিউনিস্টরা ভেবেছিলেন—ঘাঁটি শক্ত করতে পারবেন। স্থানীয় নেতারা যখন আর হালে পানি পাচ্ছিলেন না, তখন এসে হাল ধরেছিলেন বামপন্থীদের সর্বভারতীয় নেতা শ্রীসুরজিৎ। তিনিই শেষ পর্যন্ত অবস্থা বুঝে রণে ভঙ্গ দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। দাবি আদায় তো দূরের কথা, পরাজয় স্বীকার করেই ধর্মঘটীদের কাজে ফিরে যেতে হয়েছে।

যাদের সাসপেণ্ড করা হয়েছিল তাদের মালিক পক্ষ কাজে পুনরায় বহাল করেন নি। বিভাগীয় তদন্ত চলেছে তাদের ক্ষেত্রে। লেবার অফিসারও বহাল তবিয়তেই আছেন। কর্মীদের দাবি মেনে কারখানার মালিক তাঁকে বরখাস্ত করেন নি। ধর্মঘটীদের একমাত্র সান্ত্বনা, তাদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন শ্রমমন্ত্রী। মালিকদের প্রতি এ ধরণের আবেদন শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে আগেও আদায় করা যেতো। তাতে কর্মীদের লাভ ছাড়া লোকশান কিছুই হতো না—গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতে পারতো তাদের জয় হয়েছে—সমর্থন তারা পেয়েছে স্বয়ং শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে। দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ক্লান্ত কর্মীদের পরাজয়ের গ্লানি নিয়েই নীরবে কাজে যোগ দিতে হয়েছে।

মাদ্রাজ :

দ্রাবিড় কাজাগাম দলের নেতারা হিন্দীবিরোধী আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করছেন। দেশের চরম খাদ্যসঙ্কটের সময় এ আন্দোলন আগের মত জোরদার করে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। অভাবের তাড়নায় মানুষ এখন ক্ষিপ্ত। এ অবস্থায় হিন্দী-বিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচী বাতিল করে দেওয়া অনেকেই সমীচীন মনে করছেন।

● শ্রীভক্তবৎসলম্

ডি-এম-কের কোষাধ্যক্ষ এবং বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শ্রী এম করুণানিধি 'সংবিধান পোড়ানো আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করেন নি। তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন বলে সংবাদ আগে প্রকাশিত হয়েছিল। দেশের খাদ্যসঙ্কটের সময় তিনি আন্দোলনের অংশীদার হতে চান নি। দলের অন্যান্য সদস্যরা বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে আন্দোলন প্রত্যাহারের দাবি তুলেছেন। তাঁদের মতে জবরদস্তি হিন্দী চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে জনতার রায় ঘোষিত হয়েছে। সকলেই একবাক্যে তার প্রতিবাদ জানিয়েছে। জনতার সর্বসম্মত অভিব্যক্তির পর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

* * *

মাদ্রাজে বিধিবদ্ধ পূর্ণাঙ্গ রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সম্ভাবনাই নেই। সরকার আংশিক রেশন সরবরাহের অধিক কিছু দায়িত্ব নিতে সম্মত হচ্ছেন না।

সরকারের মনোভাব পরিষ্কার করে খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম জানিয়ে দিয়েছেন। মাদ্রাজ শহরে আংশিক রেশন চালু করার পর সরকার মাদুরাই, কোয়েম্বাটোর ও অন্যান্য বড় শহরে তা সম্প্রসারণ করতে পারেন। শহরাঞ্চলে খাদ্যশস্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের কোন আপত্তি নেই। বিধিবদ্ধ রেশন ব্যবস্থায় চাল ও গমের বরাদ্দ হ্রাস পাবে। সাধারণ মানুষ তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বিক্ষুব্ধই হবে। সরকার স্বেচ্ছায় বিক্ষোভের সম্মুখীন হতে পারেন না। সরকারী মুখপাত্রদের মতে, বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা চালু করলে বেশিদিন তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

• মস্কোয় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও কোসিগিন-পত্নীর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আর মাত্র তিনটি দিন বাকী রয়েছে। (হায়, এ-লেখা ছাপার হরফে ফেরবার আগেই নির্বাচনের ফলাফল জানা হয়ে যাবে।) এ-পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচার এবং ভোটারদের মধ্যে যা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তাতে মনে হচ্ছে যে, ডেমোক্র্যাটিক দলের প্রার্থী বর্তমান প্রেসিডেণ্ট জনসনই পুনর্নির্বাচিত হবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও ওয়াকিবহাল লোকেরা , সংবাদপত্রগুলিও প্রেসিডেণ্ট জনসনের অনুকূলেই ভোটারদের রায় যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আমেরিকার সাধারণ লোকও আশা করে যে, পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির স্থলাভিষিক্ত যিনি হয়েছেন, তাঁকে ওই পদে পুরো মেয়াদে কাজ করতে দেওয়া হোক। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফল যদি উল্টো হয়, যদি রিপাবলিকান প্রার্থী ব্যারী গোল্ডওয়াটার বিজয়-লক্ষ্মীকে লাভ করেন তবে সমস্ত পৃথিবী আর একবার সচকিত হবে, যেমন সপ্তাহ দুই আগে দু'টো সংবাদে বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছিল—চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও নিকিতা ক্রুশ্চেভের অপসারণের সংবাদে।

যদিও গত এক বছর ধরে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়ে গেছে এবং মিঃ গোল্ডওয়াটারের রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন লাভের ফলে উত্তেজনা আরো বেড়েছে, তবুও শেষের ক'দিনের উত্তাপ সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গিয়েছে। দল হিসাবে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দল দু'টির মধ্যে নীতিগতভাবে পার্থক্য বিশেষ নেই। কিন্তু সেনেটর গোল্ডওয়াটার তাঁর নির্বাচনী প্রচারে এমন কয়েকটি কথা বলেছেন যে, যার ফলে দু'টো দলের মধ্যে না হলেও দুজন প্রার্থীর মধ্যে কয়েকটি মূলগত পার্থক্য ধরা পড়েছে। প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মতো প্রেসিডেণ্ট জনসনও বিশ্ব-শান্তিতে বিশ্বাসী, এবং বিশ্বের উত্তেজনা কমিয়ে তাকে শান্তির পথে আনতেই প্রেসিডেণ্ট জনসনের আগ্রহ। অপরপক্ষে বিশ্বের সমস্যা সমাধানে মিঃ গোল্ডওয়াটার প্রয়োজনবোধে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করতেও রাজী। মিঃ গোল্ডওয়াটার ভয়ানক নিগ্রো বিদ্বেষী, সাদা-কালোর মিলন তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর নির্বাচনী প্রচারে আরো দেখা গেছে যে, কৃষি-নীতির ক্ষেত্রেও তিনি সাবেকী ধারণা পোষণ করেন---যা চাষী ও খামার মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী। মিঃ গোল্ডওয়াটার তাঁর নির্বাচনী প্রচারের শেষ ধাপে যেন অনেকটা পরিমিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন, যার ফলে আগে যারা তাঁকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল তাদের অনেকেই মত পাল্টাতে বাধ্য হয়েছে। ডেমোক্র্যাটিক দলের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার সীমাবদ্ধ না রেখে মিঃ গোল্ড-ওয়াটার প্রেসিডেণ্ট জনসনকে

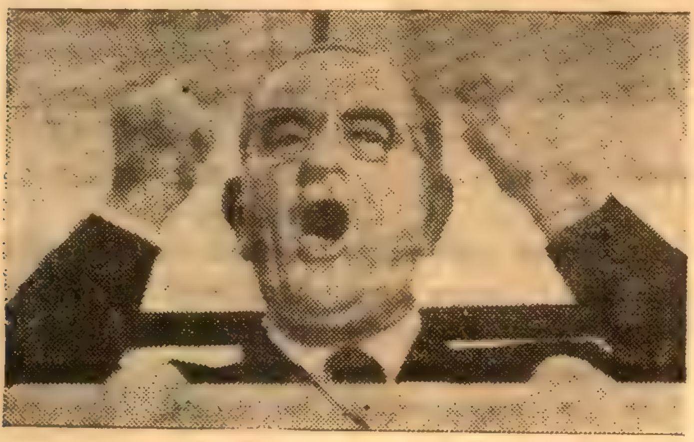

• লিণ্ডন জনসন

ব্যক্তিগতভাবেও আক্রমণ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য তাঁর (মিঃ জনসন) কোন যোগ্যতা নেই। তাঁর কাজ হাসিল করার জন্যে মিঃ গোল্ডওয়াটার এমন কোন অস্ত্র নেই যা প্রয়োগ করেন নি। ববি বেকার, বিলি সোল এস্টেস ঘটনা থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক জেঙ্কিন্সের ঘটনার উল্লেখ করে মিঃ গোল্ডওয়াটার আক্রমণ করেছেন মিঃ জনসনকে। টেলিভিশন প্রচার কেন্দ্রের মারফৎ টপলেস পোষাক পরিহিতা মেয়েকে যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি অশ্লীল বইও বাজারে ছেড়েছেন জনসনের প্রশাসনকে হেয় করার উদ্দেশ্যে। সাদা-কালো দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে একটা বর্ণ-বিদ্বেষী ফিল্মও দেখাবার উদ্যোগ করেছিল রিপাবলিকান দল।

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে মিঃ ক্রুশ্চেভের অপসারণ ও চীনের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিঃ গোল্ডওয়াটার নির্বাচনী উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: এ-দু'টো ঘটনা প্রমাণ করে যে, বিশ্বশান্তি এ-অবস্থায় অসম্ভব। চীনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া আবার মিতালী স্থাপন করতে চলেছে।

• ব্যারী গোল্ডওয়াটারের নির্বাচনী অভিযান

অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ব দুনিয়ার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আসলে এ-দু'টো ঘটনাই মিঃ জনসনের অনুকূলে গেছে। কারণ বিশ্বে উত্তেজনা যদি সত্যি বেড়ে যায়, যদি বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার আশঙ্কা থাকে, তবে মিঃ জনসনই আমেরিকার জনসাধারণকে তার আঁচ থেকে বাঁচাতে পারেন, কারণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ঝুঁকি তিনি কিছুতেই নেবেন না। মিঃ জনসন ও তাঁর অনুসৃত ও প্রচারিত নীতির ওপর মার্কিনী জনগণের অগাধ বিশ্বাস। মিঃ গোল্ডওয়াটারকে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত করে তারা অনিশ্চয়তার সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে রাজী হবে না।

সোভিয়েট রাশিয়া :

মস্কো : ক্রুশ্চেভের পতনের পর সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন নেতৃত্ব এখন ঘরে-বাইরে কয়েকটি গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। প্রথমত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে অবনতি ঘটেছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার উন্নতি এবং সাধারণভাবে জীবন-ধারণের মান উন্নয়নের জন্য নতুন সরকার সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু তারও আগে নতুন নেতাদের নিজেদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যেও সচেষ্ট হতে হবে। অন্যদিকে বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সঙ্গে কি করে সম্পর্কের উন্নতি করা যায়, সে-বিষয়ে নতুন করে চিন্তা সুরু করতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবশ্য 'ক্রুশ্চেভহীন ক্রুশ্চেভ-নীতি' অনুসরণের কথা ঘোষিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি থেকে যে সোভিয়েট রাশিয়া বিচ্যুত হবে না—এ-কথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার শক্ত বনিয়াদ রচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, পারসোনালিটি কাল্টকে আর একদফা কবর দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। কোন সরকারী কাজ দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেণ্ট বা পার্টি সেক্রেটারী এককভাবে করবেন না—সকলেই যৌথভাবে নীতি নির্ধারণ করবেন। তবে কমিউনিস্ট পার্টিই যে নীতি-নির্ধারণের চূড়ান্ত অধিকারী—সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ-প্রচেষ্টা কতখানি সফল হবে বলা শক্ত, তবে তাতে যে যথেষ্ট সময় লাগবে একথা জোর করে বলা যায়।

কিন্তু বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টি-গুলির সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ রাখতে গিয়ে অর্থাৎ আগে এসব দেশে সোভিয়েট রাশিয়ার যে মর্যাদা ছিল তা অক্ষুণ্ণ রাখা কতখানি সম্ভব হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ ক্রুশ্চেভের অপসারণকে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সহজভাবে নিতে পারে নি এবং ক্রুশ্চেভের অপসারণের পক্ষে যে যুক্তি নতুন সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ইত্যাদি দেশের নেতৃবৃন্দ ক্রুশ্চেভের নিন্দায় রুশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারেন নি। ক্রুশ্চেভের অপসারণে তাঁরা ব্যথিত হয়েছেন, যেমন আঘাত পেয়েছে পূর্ব জার্মানী, পোল্যাণ্ড

ইত্যাদি দেশ। পশ্চিম ইউরোপে ইতালির কমিউনিস্ট পার্টি ঘটনার আকস্মিকতায় এবং অপসারণের কায়দায় দুঃখ প্রকাশ না করে পারে নি। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি তো মস্কোর কাছে জবাবদিহি দাবি করেছে ক্রুশ্চেভের অপসারণের জন্য। ফ্রান্স ও ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি দল শীগ্‌গিরই ঘটনাটি সরেজমিনে পরীক্ষা ও যাচাই করার জন্যে মস্কো যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ক্রুশ্চেভের অপসারণে সবচেয়ে খুশি হয়েছে চীন, কারণ ক্রুশ্চেভই চীনকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছিলেন।

• • •

ক্রুশ্চেভ এখন কোথায়—এই প্রশ্ন নিয়ে দেশ-বিদেশে ইতিমধ্যে বিস্তর আলোচনা ও গুজব রটলেও, সঠিক সংবাদ পেতে দেরি হয়েছে। গুজব রটার অবশ্যি যথেষ্ট কারণ ছিল। ১৬ই অক্টোবর তারিখের পর থেকে ক্রুশ্চেভের নাম আর কোনো সংবাদপত্রে দেখা যায় নি, এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ না করেই। সম্প্রতি যে তিনজন সোভিয়েট শূন্যচারী মহাকাশ পরিক্রমা করে এলেন, তাঁদের সম্বর্ধনা জানানোর কথা ছিল ক্রুশ্চেভেরই। কিন্তু সম্বর্ধনা সভায় কোথাও ক্রুশ্চেভের দেখা পাওয়া যায় নি, পার্টি সেক্রেটারী ব্রেজনেভকেই ক্রুশ্চেভের স্থান নিতে দেখা গেল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সব সন্দেহের নিরসন করে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেমলিন প্রাসাদের অদূরে একটা ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে—যেখানে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভও রয়েছেন।

• •

মিঃ ক্রুশ্চেভকে আক্রমণ করে সোভিয়েট সরকার নাকি এক চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ দলিল প্রকাশ করেছে। দলিলে মিঃ ক্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে উনত্রিশ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। ব্যক্তি পূজা থেকে সুরু করে এখানে স্বজন-পোষণ ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক চ্ছেদের অবস্থা গড়ে তোলার অভিযোগ পর্যন্ত দলিলটিতে স্থান পেয়েছে। বলা হয়েছে যে, ১৯৬২ সালে ক্রুশ্চেভের ভ্রান্ত নীতির ফলেই কিউবা সঙ্কট হয়েছিল। মিঃ ক্রুশ্চেভ নাকি ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সঙ্কট থেকেই ক্রমাগত ভুল করে আসছেন। দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে আনার ফলেই ক্রুশ্চেভ বারবার ভুল করছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মিঃ ক্রুশ্চেভ যে টেবিলে জুতো তুলে দিয়েছিলেন দলিলে তারও নিন্দা করা হয়েছে। সংযুক্ত আরবকে যে বিশ কোটি ডলার ঋণ দেবার কথা মিঃ ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন, তাও তিনি ব্যক্তিগত দায়িত্বে করেছিলেন—পার্টি বা সরকারের সঙ্গে কোনরকম সলা-পরামর্শ না করেই। অন্য দেশের সোস্যালিস্ট পার্টির ওপরও ক্রুশ্চেভ নিজের মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করার ফলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। জামাতা আজুবেই ও স্ত্রী নিনার ব্যাপারে স্বজন-পোষণের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা ক্রুশ্চেভ দেখিয়েছেন বলে দলিলটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সর্বদা সঙ্গে রাখার মত

নবতর প্রয়োজন

ইংরেজি-বাঙলা অভিধান

SAMSAD
LITTLE ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY

সঙ্কলক : শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.

সংশোধক : ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ.ডি.

~ বৈশিষ্ট্য ~

● সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন ও অর্থবিন্যাস ● অধুনা প্রচলিত শব্দসঙ্কলন ● ইংরেজি ও বাঙলায় উচ্চারণ-সঙ্কেত ● ইংরেজিতে প্রয়োগের উদাহরণ ও বাঙলায় শব্দার্থ ● পাতলা অথচ অতিশয় শক্ত বাইবেল কাগজ ● সহজ বহনীয় আকার ৪¾ × ৬¾ × ১" ● ৩০,০০০ শব্দসংখ্যা ● ৮২০ + ১২ পৃষ্ঠা।

শক্তবোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। দাম : টা ৭.৫০ মাত্র

আমাদের অন্য দুইটি অভিধান

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY [12-50]

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান [8.50]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা-৯

• ক্রুশ্চেভ নিভৃতে বসে নিজেরই সমালোচনায় মুখর সংবাদপত্র পড়ছেন।

মিঃ ক্রুশ্চেভকে পার্টির সভায় আত্মরক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে জানানো হয়েছে। মিঃ ক্রুশ্চেভ তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কি করে খণ্ডন করেন, তাই বিশ্ববাসী উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করবে। ইতিমধ্যে অবশ্যি মিঃ ক্রুশ্চেভ তাঁর সুপ্রীম সোভিয়েটের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন।

• • •

ভারতের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী নেহরু-তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী চারদিনের সফরসূচী নিয়ে মস্কো এসেছেন। ভারতীয় মন্ত্রীদের মধ্যে তিনিই মস্কোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পর প্রথম মস্কো পরিদর্শনের সুযোগ পেলেন। তাঁর সম্মানে আয়োজিত ভারতীয় দূতাবাসের এক ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন শ্রীমতী গান্ধীকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, ভারতের প্রতি নতুন সোভিয়েট সরকারের পূর্ব-নীতি অপরিবর্তিত থাকবে। চীনের সঙ্গে নতুন করে সোভিয়েট মিতালী স্থাপিত হবার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ কোসিগিনের এ-আশ্বাসের মূল্য অপরিসীম।

বৃটেন ঃ

বৃটেনের শ্রমিক সরকার ক্ষমতা পেয়েই যে-দৃঢ়তা ও মনোবল দেখিয়েছেন দক্ষিণ রোডেশিয়া সম্পর্কে, তা একাধিক কারণে অভিনন্দনযোগ্য। এবং এ-দৃঢ়তার জন্যেই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাগর্বী প্রধানমন্ত্রী মিঃ আয়ান স্মিথকে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। যে-তীর তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন, তাকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ রোডেশিয়া, ও নিয়াসাল্যাণ্ডের সমবায়ে গঠিত মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের যখন পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলো, তখন এ-স্বায়ত্ত-শাসিত দেশগুলি স্বাধীনতা দাবি করে। মালুয়ি নাম নিয়ে নিয়াসাল্যাণ্ড এবং জাম্বিয়া নাম নিয়ে উত্তর রোডেশিয়া (সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৯শে অক্টোবর) স্বাধীনতা পেয়েছে, গণতান্ত্রিক পন্থায় সেখানে জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্বাধীনতার দাবি বৃটিশ সরকার মেনে নিতে পারেন নি। এর প্রধান কারণ হল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ভেরউর্ডের মত দক্ষিণ রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ আয়ান স্মিথ ঘোরতর বর্ণবিদ্বেষী।

এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকানদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার সরকার স্বীকার করেন নি। শুধু তাই নয়, জোসুয়া এনকোমোর মত আফ্রিকান জননেতাদের সরকার বন্দী বা অন্তরীণ করে রেখেছেন অথবা নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছেন। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক হিউম এ-প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, দক্ষিণ রোডেশিয়ায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার না করে তাকে স্বাধীনতা দান করা যায় না।

কিন্তু তার কোন তোয়াক্কা না করে মিঃ স্মিথ এক অদ্ভুত ফরমুলা আবিষ্কার করেছিলেন। দক্ষিণ রোডেশিয়ার আপামর জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্যে পাগল---একথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে মিঃ স্মিথ এক রেফারেণ্ডামের ব্যবস্থা করেছিলেন। স্থির করেছিলেন রেফারেণ্ডামের রায় তিনি মেনে নেবেন। অর্থাৎ বৃটেন যদি দক্ষিণ রোডেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে অসম্মত হয়; তবে সে যাতে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে তার পাকা ব্যবস্থাই মিঃ স্মিথ করেছিলেন। রেফারেণ্ডামের জন্যে

যে ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল তাতে মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ভোটারের নাম ছিল। আর এই ভোটারদের মধ্যে ৯০ হাজারই শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী, ১০ হাজার আফ্রিকান চীফ বা সর্দার। কিন্তু এই সর্দারেরা শুধু নামেই আফ্রিকান, আসলে তারা সব সরকারী কর্মচারী

• আয়ান স্মিথ

এবং সম্প্রতি মাইনে বাড়িয়ে মিঃ স্মিথ তাঁদের 'কিনে' ফেলেছিলেন। কাজেই এই ভোটাররা যে মিঃ স্মিথের নির্দেশ মত কাজ করতো সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। ভোটার তালিকার এমনি মহিমা ছিল যে, ৪৫ লক্ষ আফ্রিকানের স্থান তাতে হয় নি। কাজেই স্মিথ সাহেবের সংখ্যালঘু কর্তৃক সংখ্যাগুরুদের শাসন করার অগণতান্ত্রিক নীতিকে বৃটিশ সরকার সঙ্গত কারণেই মেনে নিতে পারেন নি। তাই ৫ই নভেম্বর তারিখ যখন রেফারেণ্ডামের দিন ধার্য হল, তখন বৃটিশ সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। শ্রমিক সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে, দক্ষিণ রোডেশিয়া সরকার যদি একতরফাভাবে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করে, তবে বৃটেন তাকে বিদ্রোহের সামিল বলে বিবেচনা করবেন এবং তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। মিঃ স্মিথ বৃটেনের এ-সতর্কবাণীকে প্রথমে দক্ষিণ রোডেশিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যায় হস্তক্ষেপ ও ব্ল্যাকমেল বলে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে, বৃটেনের সতর্কবাণী শূন্যকুম্ভ নয়, বরং প্রয়োজনবোধে বৃটেন দক্ষিণ রোডেশিয়ায় সেনাবাহিনী নিয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে তখন প্রমাদ গুণলেন। বৃটেনের এ-ঐতিহাসিক ঘোষণাকে ভারতসহ আফ্রো-এশিয়ার অনেক রাষ্ট্র থেকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। বৃটেনের পক্ষ থেকে একথাও বলা হয়েছিল যে, একতরফাভাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দক্ষিণ রোডেশিয়াকে বৃটেন স্বীকৃতি দেবে না বরং বিদেশে গঠিত আফ্রিকান নেতাদের সরকারকেই স্বীকৃতি দেওয়া হবে। বৃটেনের এ-সিদ্ধান্তও আফ্রোশীয় অনেক দেশ অনুসরণ করবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পিছু হটলেন মিঃ স্মিথ, দক্ষিণ রোডেশিয়ার পার্লামেণ্টে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, রেফারেণ্ডামের রায়কে তিনি একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণার সম্মতিসূচক নির্দেশ বলে মেনে নেবেন না।

মিঃ স্মিথের চৈতন্যোদয় দেরিতে হলেও অভিনন্দনযোগ্য। একতরফাভাবে স্বাধীন হলে দক্ষিণ রোডেশিয়াকে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া বাকি প্রায় পৃথিবীর সকলেই সর্বতোভাবে বর্জন করতো, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দক্ষিণ রোডেশিয়া একটা অত্যন্ত অনগ্রসর দেশ। তাম্র-সমৃদ্ধ উত্তর রোডেশিয়ার দাক্ষিণ্যেই সে এতকাল টিকে ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছ থেকে তার সাহায্য পাবার আশাও ক্ষীণ, কারণ শ্রমিক-সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করবেন বলে ধরে নেওয়া যায়। এতগুলি রাষ্ট্র বিশেষত বৃটেন, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের আপত্তির কারণে রাষ্ট্র-সঙ্ঘেও তার স্থান হতো না। এ-অবস্থায় দক্ষিণ রোডেশিয়া স্বাধীন হলেও যে তাকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হতো অনির্দিষ্ট কাল ধরে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মিঃ স্মিথ তাঁর উদ্ভট পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে সদ্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষণে সেখানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের জন্যে বৃটেনের শ্রমিক সরকার কি করেন তাই লক্ষণীয়।

• • •

স্যার আলেক ডগলাস হিউম বিরোধী রক্ষণশীল দলের নেতার পদ ত্যাগ করছেন না।

এক সক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি রক্ষণশীল দলের নেতৃত্ব করেছেন ও যতদিন এই পদে থাকা পার্টির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে, ততদিন তিনি এই পদে থাকবেন। তিনি অনির্দিষ্টকাল পার্টির নেতার পদে

• হিউম

আসীন থাকিবেন বলে মনে করেন কি না প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে 'হ্যাঁ' বলেন।

হিউম ভূতপূর্ব অর্থ-সচিব মিঃ রেজিন্যাল্ড মডলিং ও মিঃ এডওয়ার্ড হিথকে তাঁর প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেছেন।

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ উনত্রিশ ॥

অনেক বেশি শোকের উচ্ছ্বাস আশা করেছিল কিরণ, কিন্তু গিয়ে দেখল একটা শান্ত স্তব্ধতার ভেতরে সব একাকার হয়ে আছে। ছেলেমেয়েগুলো বারান্দায় চুপ করে বসে রয়েছে, ব্যাপারটাকে তারা যেন কিছু বুঝতেই পারে নি। ভবেশদার পায়ের কাছে বৌদি একটা পলকহীন পাথরের মূর্তি। চোখ শুকনো জলের রেখাটি পর্যন্ত নেই। কিরণের মনে হল, বৌদির কাছে ভবেশদার মৃত্যুটা অনেকদিন আগেই ঘটে গিয়েছিল, নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আজ তার উৎসটা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

চারদিকের কুৎসিত দারিদ্র্যের ভেতর ভবেশদার শীর্ণ জীর্ণ চেহারাটা অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়েছে। যে লেখক শুধু নিজের জন্যেই লিখে গেল, কোনোদিন যে জনপ্রিয় হতে চায় নি, শুধু সাহিত্যের ওপর নির্ভর করেই বাংলা দেশে যে বাঁচবার চেষ্টা করেছিল, এ ছাড়া কোন্ মৃত্যু আর তার পক্ষে শোভন হতে পারত।

বাণীব্রত খবর দিয়ে জনকয়েক লেখককে জোগাড় করে এনেছে, তাদের মধ্যে তরুণের সংখ্যাই বেশি। অনেকখানি জীবনীশক্তি আছে বলে তারুণ্যই মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারে, প্রবীণেরা ভয় পান—একজনের মৃত্যুর দর্পণে তাঁরা নিজেদেরই প্রতিফলন দেখতে পান। তাই বয়স্ক লেখকেরা বিশেষ আসেন নি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ভবেশদা কখনো মিশতেন না, অবজ্ঞাই করতেন বরাবর, কিন্তু মৃত্যু সব বিরোধ মুছে দিয়েছে—তারা হাজির হয়েছে দল বেঁধে। স্থানীয় বয়স্কেরাও এসেছেন—এরই মধ্যে শান্ত চেহারার একজন প্রৌঢ়ের সঙ্গে কিরণের পরিচয় করিয়ে দিলে বাণীব্রত: আমার বাবা।

বাণীব্রতর বাবা সত্যব্রত—নামটা কিরণের আগেই জানা ছিল—বললেন, আপনার কথা ছেলেমেয়ের কাছে অনেক শুনেছি, আলাপ করবারও খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় দেখা হল, যে—

বলতে বলতে থেমে গেলেন। চোখ ছলছল করে উঠল সত্যব্রতর। এই দারিদ্র্য আর মৃত্যুর ছবিটা তাঁকে নাড়া দিয়েছিল।

কিছু ফুল এসেছে, দুটি মেয়ে চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছিল ভবেশদাকে। কিরণ দেখল, তাদের একজন কৃষ্ণা। কৃষ্ণা একবার তাকালো কিরণের দিকে, তার কালো গভীর চোখদুটো যেন বেদনা আর মমতা দিয়ে কিরণকে মুহূর্তের জন্যে স্নিগ্ধ করে নিলে। কিরণ কেমন সংকোচ বোধ করল একটুখানি, ঘর থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

সাহিত্যিকদের মধ্যে টুকরো টুকরো আলোচনা। চাপা গলাতেই চলছে।

—খুব কষ্ট পেয়েছেন ভদ্রলোক।

—বলতে গেলে না খেয়েই মারা গেলেন।

—দোষ খানিকটা নিজেরও ছিল। অত একগুঁয়ে হলে—

কিরণ সরে এসে খানিকটা শীর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল। দোষ ভবেশদার অনেক ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চাইতেও বড়ো কথা—একটা চরিত্র ছিল। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর চরিত্র নিয়ে

একা সৈনিকের মতো লড়াই করে গেলেন, একবারের জন্যেও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবলেন না। সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ল —ভবেশদা বলেছিলেন।

'স্ত্রী ছেলেমেয়ে? বাড়ি তো আমার পাকিস্তানে, নয় পাকিস্তানী রিফিউজীরের মতো ভিক্ষে করেই খাবে।'

স্বার্থপর? অবিবেচক? না—সে অপবাদ ভবেশদাকে কেউ দেবে না। কাঁধ ছেঁড়া ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবী, মোটা ধুতি, পায়ে সস্তাদামের চটি; বিড়ি ছাড়া সিগারেট কখনো খান নি। নিজের জন্যে একটা পয়সা অপব্যয় করেন নি কোনোদিন, যা পেয়েছেন সংসারের জন্যেই খরচ করেছেন।

ভবেশদার অপরাধ, তিনি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। নিজের বিশ্বাসের বাইরে একটি কথা লিখতে চান নি কোনোদিন।

এই রকম একটা মৃত্যু কিরণ কামনা করতে পারে কোনোদিন? সে সাহস কি তার আছে? সেও তো সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জীবনের একটা নিষ্ঠুর বাস্তব ইতিহাসকে ফোটাতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কাজ সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে? তার সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণ নির্মমতার মধ্যেও কি একটা চোখ সব সময় মেলা থাকে নি পাঠকের দিকে? সেও কি নিজের বিশ্বাস আর পাঠকের প্রত্যাশার ভেতরে একটা চুক্তি করে নেয় নি? তা না হলে কৃষ্ণা-বাণীব্রতর কেন ভবেশদার লেখা ভালো লাগে নি, কেন শ্যামলা তার মুগ্ধ পাঠিকা হয়ে—

শর্মিলা। কিরণ চিন্তার গতিটাকে তৎক্ষণাৎ যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে থামিয়ে দিতে চাইল। আর তখন ব্যতিব্যস্ত বাণীব্রত এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

—কিরণদা।

কিরণ চমকে মুখ তুলল: কী বলছ?

—অনেক রাত হল, এবার তো নিয়ে যেতে হয়।

—বেশ, চলো।

ফুল দিয়ে খাট সাজানো হয়েছিল, এবার ভবেশদাকে তোলা হল তার ওপর। জীবনে কোনো সভায় ভবেশদা বোধহয় মালা পান নি, মৃত্যুর পরে আর কোনো ক্ষোভ হয়তো তাঁর রইল না। আর বৌদি তেমনিভাবে চেয়ে রইলেন নিষ্পলক চোখে—তাঁর শোক-দুঃখ-আবেগ যেন অনেক আগেই শূন্যতার ভেতরে হারিয়ে গেছে।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলল শবযাত্রা। ভবেশদার ধর্মে বিশ্বাস ছিল না —কোনো সাহিত্যিক হয়তো হরিধ্বনি দিতে বারণ করে থাকবেন। কিরণ সঙ্গে সঙ্গে চলল খানিকদূর। হঠাৎ কয়েকজন তরুণের চোখ পড়ল তার ওপর।

—দাদা, আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

শুধু ক্লান্তি নয়। শর্মিলার কাছে গিয়ে ফিরে আসা, মনের ভেতরে কতকগুলো ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটা, মাথায় একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা—সব মিলে পা আর যেন চলতে চাইছিল না। তবু কিরণ ম্লানভাবে হাসল।

—না, ওসব কিছু নয়।

—কিন্তু আপনাকে কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে। —আর একজন বললে, আমরা তো অনেকেই রয়েছি—সব ঠিক করে নেব। আপনাকে আর শ্মশান পর্যন্ত যেতে হবে না, আপনি ফিরেই যান।

সত্যব্রত সঙ্গে সঙ্গেই আসছিলেন। বললেন, সেই ভালো ফিরেই চলুন।

মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমশ বাড়ছে—কপাল ছাড়িয়ে ঘাড়ের দুধারের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে এখন। কিরণও আর ভদ্রতার জের টানতে চাইল না, দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তা হলে তোমরা—

—আমরা ঠিক আছি। কোনো অসুবিধা হবে না, আপনি গিয়ে বিশ্রাম করুন।

কিরণ ফিরল, তার সঙ্গে সত্যব্রতও ফিরলেন।

—চলুন কিরণবাবু, আমার ওখানে বরং একটু বসবেন।

কিরণ হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল।

—আজ থাক সত্যব্রতবাবু। রাত প্রায় সাড়ে দশটা বাজে।

সত্যব্রত বললেন, আপনি এখন মোড় পর্যন্ত গিয়ে লাস্ট বাসও পাবেন না। ফিরতে হবে ট্যাক্সি করেই। বরং একটু বসবেন চলুন।

পা আর চলতে চাইছে না, মাথার যন্ত্রণাটাও বাড়ছে। তখন কিরণের মনে পড়ল, আজ বিকেলে এক পেয়ালা চা পর্যন্ত তার খাওয়া হয় নি। স্বপ্ন ছিল, শর্মিলার সঙ্গে কোথাও গিয়ে—

কিরণ দাঁতে দাঁত চাপল একবার। তারপর বললে, একটুখানি চা খাওয়াবেন তা হলে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে, তখনো বোধহয় মৃত্যুর মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিল সে। বাবার সঙ্গে কিরণকে দেখে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

—কিরণদা? আসুন—আসুন—

কিরণ বিমর্ষভাবে হাসল: এক পেয়ালা চা খেতে এলুম।

—বসুন, করে আনছি এক্ষুণি।

আজ আর সেদিনের মতো বৃষ্টি নেই, জলের ছাট আসছে না; বারান্দায় খানতিনেক চেয়ার পাতা ছিল, সত্যব্রত কিরণকে সেখানেই বসালেন।

বাইরে শান্ত অন্ধকার, বাগানে লতা-পাতার শব্দ। হাওয়ায় কনক-চাঁপার গন্ধ আসছে। সামনে আকাশে তারার ভিড়। মাথার ভেতরে তীব্র যন্ত্রণার চমক ধীরে ধীরে কিরণকে কেমন আচ্ছন্ন করে আনছিল। সত্যব্রত ধীরে ধীরে কথা বলে চলেছেন, ভবেশদার মৃত্যু, সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য—এখন ভবেশদার স্ত্রী ছেলেমেয়ের কী হবে, তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা। অবশ্য ভবেশদার এক মামাতো ভাই খবর পেয়ে এসেছেন, তিনি অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু—

কিরণ কিছু শুনছিল, কিছু শুনতে পাচ্ছিল না। সেই আচ্ছন্নতার ভেতরে মাঝে মাঝে অল্প কথায় সত্যব্রতের আলোচনার সঙ্গে সায় দিয়ে চলেছিল। এমন সময় চায়ের পেয়ালা নিয়ে কৃষ্ণা এল।

সত্যব্রত নিজের মনে কথা করে চলেছিলেন, কিন্তু মেয়েদের চোখ এড়িয়ে গেল না। একমুঠো মমতা আর আশঙ্কা ঝরে পড়ল কৃষ্ণার গলায়।

—কিরণদা, শরীর খারাপ নাকি আপনার?

—ও কিছু নয়, মাথা ধরেছে একটু-খানি।

—মাথা ধরেছে!—সত্যব্রত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: একটা অ্যাসপিরিন জাতের কিছু—

—দরকার নেই, ওগুলো আমার ঠিক স্যুট করে না। চা খেলেই সেরে যাবে—কিরণ চায়ের পেয়ালা তুলে নিলে।

কিরণের দিকে দুটি আশ্চর্য সুন্দর চোখ মেলে কালো মেয়ে কৃষ্ণা চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার পর ডাকল, বাবা, শোনো?

—কী, মা?

—একটু উঠে এসো এদিকে।

সত্যব্রত চেয়ার ছেড়ে ঘরের দিকে চলে গেলেন। আর চায়ে চুমুক দিতে দিতে সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদে, কিরণের মাথাটা একটু একটু করে ঝুঁকে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর। কপালে ঘাড়ে সেই তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণাটা তাকে যেন একটা অচেতনার দিকে টানতে লাগল, বাইরে থেকে চাঁপার উগ্র সুগন্ধ যেন ক্লোরোফর্মের কাজ করতে লাগল।

ঠিক কতক্ষণ কাটল খেয়াল নেই, হঠাৎ সত্যব্রতর গলার আওয়াজে সে চমকে উঠল।

—একি, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে আপনার।

চমকে কিরণ সোজা হয়ে বসল। বললে, সত্যব্রতবাবু, এবার তবে উঠি।

সত্যব্রত বললেন, এত রাত্রে না খেয়ে আপনাকে যেতে দিচ্ছে কে?

—সে কি—খেয়ে যাব?

সত্যব্রত হাসলেন: কৃষ্ণার তাই হুকুম। আপনাকে আটকে রাখতে বলেছে।

—না—না, ওসবের দরকার নেই, আর একদিন হবে বরং।—কিরণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: অনেক রাত হয়ে গেছে, আমি যাই।

সত্যব্রত কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বারান্দায় বেরিয়ে এল কৃষ্ণা।

—রাত হয়েছে, তাতে কী! খেয়ে এখানেই থাকবেন আজ।

—এখানে?

কৃষ্ণার চোখ দুটি আবার স্নেহ মমতায় গভীর হয়ে এল: যাবেন তো সেই মেসে, খাওয়া জুটবে কিনা তাও সন্দেহ। একটা রাত আমাদের এখানে থাকলে মহাভারত আপনার অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

—কিন্তু তোমাদের অসুবিধে করে—

—অসুবিধে আমাদের কিছুই নেই, বাড়তি ঘর আছে বাড়িতে। কিন্তু আপনার যদি কষ্ট হয়, সে কথা আলাদা।

সত্যব্রত বললেন, আর কষ্ট হলেই বা কী! এত রাতে অতদূরে যাওয়ার চাইতে কোনোমতে একটা রাত এখানে কাটিয়ে দিন।

কিরণ প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু মাথার মধ্যে সেই যন্ত্রণা—সারা শরীরে সেই দুঃসহ অবসাদ। আবার ঝুপ করে সেই চেয়ারটার ওপর বসে পড়ে বললে, তবে তাই হোক—আজকে উপদ্রবই করা যাক আপনাদের ওপর।

(ক্রমশঃ)

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

হিন্দুধর্ম্মের গৌরবজ্যোতিঃ। হিন্দুধর্ম্মের এই অতীব দুর্দ্দিনে—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর বিরাট অভাব দূর করিবার জন্য—সাম, ঋক, যজু ত্রিবেদ—সর্ব্ব উপনিষদ—অষ্টাদশ পুরাণ—বেদতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত—শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্যের নিত্যসিদ্ধ মহাগ্রন্থ। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে লৌকিক, পারত্রিক অশেষ মঙ্গল বিধানের নিদান, বেদজ্ঞ ঋত্বিক—তান্ত্রিক সাধক—স্মৃতিশাস্ত্র-বিশারদ, দ্বাদশজন ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাপণ্ডিতের পঞ্চদশবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক সাধনায় সঙ্কলিত, সুসংস্কৃত, সুসম্পাদিত।

১ম খণ্ড—নব প্রকাশিত মূল্য—৮৲।

২য় খণ্ড—সাতটি প্রকরণে ৯০০ পৃষ্ঠায়—দশবিধ সংস্কার, শ্রাদ্ধ তীর্থকৃত্য, প্রতিষ্ঠা, নৈমিত্তিক ক্রিয়া। মূল্য—৫৲।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

॥ নিত্যকালের চিত্তহারী চৌরঙ্গী ॥

(আদি অধ্যায়)

● চৌরঙ্গী রোডের বর্তমান দৃশ্য

আজ যে-সুশোভন অংশে চিত্তহারী চৌরঙ্গীর অবস্থান—অতীতের পর আরও অনেক অতীতে, শহরের সেই অংশ-বিশেষের তদানীন্তন প্রকৃতি ছিল কোন্ স্বরূপে—আজ তা কল্পনা করার হয়তো তেমন কোনো কৌতূহল নেই কর্মব্যস্ত মানুষের। তবে বিগত পুরাতাত্ত্বিকদের ছায়ানুসরণ ক'রে, বর্তমানের কেউ যদি সেই দুস্তর দূরাতীতের কোনো বাতায়ন উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়—তা হলে, অন্তত কিছুসংখ্যক রসগ্রাহীর দৃষ্টি উদ্যস্ততার জটিল জটায় জড়িয়ে থেকেও যে সেদিকে একবার উঁকি মারার চেষ্টা করবে—সে-বিষয়ে হয়তো নিঃসন্দেহ হবেন অনেকেই; অতএব, আজ সেই সর্পিল সরণীর সুদূর প্রান্তে উল্লেখিত সোনাতীতের অন্তর্দেশ—যা গভীর কুয়াশায় সুরক্ষিত—সেখানে অনুপ্রবেশের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা আমি করবো। একমাত্র অনুসন্ধিৎসাই আমার পাথেয়। তার ঘাটতি যে যাত্রাপথের বিরাট প্রতিবন্ধক—তা বলা বাহুল্য।

আজ বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্তির অধ্যায় যেমন সুসংস্কৃত, তেমনই সুনিয়ন্ত্রিত এবং সভ্যতা তার কিছু অংশে বিপর্যস্ত হলেও, সার্বিক বিকাশ তার পরিমার্জিত যথেষ্টই। কিন্তু আজ থেকে বেশ কয়েকটি শতক পিছিয়ে এলেই পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে এতদঞ্চলের যে-পরিবেশ—তাকে কোনোক্রমেই এ-যুগের উপমান বা উপমেয়রূপে স্বীকার করা সম্ভব নয়। হয়তো তারও একাধিক শতাব্দী পূর্বে এখানে সভ্যতার উৎকর্ষ ছিল। কারণ অনেকের মতে তখন পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য ছিল এখানে। কিন্তু তারপর চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর যে-চিত্র উদ্ধার করেছেন একাধিক পুরাতত্ত্ববিদ—তাতে মনে হয়: যে-কোনো কারণেই হোক, সভ্যতা তখন সমাধিস্থ অথবা ক্ষয়িষ্ণু এবং পরিবেশেও তখন তার পক্ষ বিস্তার করেছে শ্বাপদ-সংরক্ষণকারী অরণ্য। বিশেষ ক'রে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডে অরণ্য তার অবয়ব স্ফীত করে আরও বেশি। তার কিছুকাল আগেই উত্তরভাগের ভূমিখণ্ডে, অর্থাৎ বর্তমান বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট অঞ্চলের তদানীন্তন শ্মশানভূমিতেই নাকি কালীক্ষেত্র নামে তান্ত্রিকসমাজের এক সাধনপীঠ

শ্রীপদাতিক

বিদ্যমান ছিল—যেখানে নরবলির মাধ্যমে শ্মশানেশ্বরী চামুণ্ডার ভয়ঙ্কর আরাধনার প্রচলন ছিল প্রকাশ্যে। সম্ভবত কিছু পরবর্তীকালে কোনো এক গৌড়াধিপতির তৎপরতায় তান্ত্রিকদের উচ্ছেদ ঘটে সে-অঞ্চল থেকে। কিন্তু দক্ষিণভাগ, অর্থাৎ বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের সেকালের সমগ্র এলাকা ছিল বসতিবিহীন। অবশ্য পরবর্তীকালে নাথ-সম্প্রদায়ের একটি ছোট গ্রাম প্রতিষ্ঠা পেলেও, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেও তা মুক্তিলাভ করতে পারে নি অরণ্যের রাহুগ্রাস থেকে। অবশ্য অরণ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত কোনোদিনই লোকালয়-বিহীন ছিল না। সেখানেই অবস্থিত ছিল বর্ধিষ্ণু গোবিন্দপুর। কিন্তু বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের তদানীন্তন মৃত্তিকার সঙ্গে তার কোনো সংযোগ ছিল না বললেই চলে।

ষোড়শ শতাব্দীর যে-পরিচ্ছেদে দক্ষিণাঞ্চলে পত্তন ঘটে কালীঘাটের—তার কিছুকাল পরেই নাকি বর্তমান চৌরঙ্গীর তদানীন্তন অরণ্যদেশে আবির্ভাব ঘটে জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীনাথের। তিনি নাথ সম্প্রদায়ের একজন প্রসিদ্ধ যোগীপুরুষ। অরণ্যের গভীরেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নির্লিপ্ত সাধনাশ্রম। যে-অরণ্য হিংস্র শ্বাপদকুলের অধিবাস-ক্ষেত্র, যার পার্শ্ববর্তী পথে দিবালোকেও কোনো দ্বিপদচারীর চলাচল সম্ভব ছিল না নরখাদক জন্তুর দৌরাত্ম্যে—ঠিক তারই গভীরদেশে এমন কোন্ শক্তির শরণ পেয়ে সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন চৌরঙ্গীনাথ এবং কোন্ মন্ত্রবলেই বা তিনি অনায়াসেই জয় করলেন হিংস্র শ্বাপদকুলকে—

আজ তার কোনো উত্তর নেই কোথাও।

শোনা যায় : হুগলীর সুপ্রাচীন জনপদ মহানাদে জন্মগ্রহণ করেন চৌরঙ্গীনাথ। তাঁর পিতা ছিলেন সে-অঞ্চলেরই নাথ-সম্প্রদায়ের গুরু। পিতার গুণে বাল্যকাল থেকেই ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ জন্মে চৌরঙ্গীনাথের। যৌবনকালে তিনি পিতাকেও ছাড়িয়ে যান। তাঁর পিতা ছিলেন সংসারধর্মে আস্থাশীল। কিন্তু চৌরঙ্গী ভাবলেন : সংসার অর্থই মায়া। সুতরাং এই মায়ার বন্ধন কাটিয়ে উঠতে না পারলে ইষ্টের প্রকৃত সান্নিধ্যলাভ অসম্ভব। তাই তিনি সংসারে অবস্থান করেও দিনে দিনে সংসার-বিবাগী হয়ে ওঠেন সম্পূর্ণ। তিনি বিচরণ সুরু করেন বনে বনে। দিনে দিনে পশু-পক্ষীর সঙ্গেই তাঁর গ'ড়ে ওঠে গভীর আত্মীয়তা। দিনান্তে একবার পিতার গৃহে ফিরে এলেও, ঘর তাকে আপন করতে পারে না সহজে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন এক মায়ার কাছেই আত্ম-সমর্পণ করেন চৌরঙ্গীনাথ। অবশ্য এ-মায়া কোন নারী-পুরুষ বা ভোগবিলাসের প্রতি নয়। এ-মায়ার নায়ক এক হরিণ-শিশু।

এই হরিণ-শিশুটি চৌরঙ্গীনাথের কুড়িয়ে পাওয়া। তাকে তিনি কুড়িয়ে পান দ্বারবাসিনীর বনে। এই অসহায় শাবকটিকে বুকে তুলে বন থেকে যেদিন গৃহে ফিরে আসেন চৌরঙ্গীনাথ—ঘর ছাড়ার কথা তিনি ভুলে যান সেদিন থেকেই। ঘরে বসেই তিনি লালন সুরু করেন শাবকটির। তার করুণ চোখ দুটিই তাঁকে বন্দী ক'রে রাখে সর্বক্ষণ। আহারে, বিহারে, এমন কি শয়নেও সে-শাবকটি তাঁর সঙ্গী। শাবকটির প্রতি মায়ের মতো গভীর মমত্ববোধে উদ্বেল চৌরঙ্গীনাথ। তাঁরই সস্নেহ ছায়ায় ধীরে ধীরে সতেজ-সুন্দর হয়ে, অস্থির মধুরতায় গৃহ-প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত ক'রে তোলে হরিণ-শিশু।

ঠিক এমনই দিনে, চৌরঙ্গীনাথের পিতা গাঁয়ের এক রূপবতী কন্যার সঙ্গে তাঁকে আবদ্ধ করেন বিবাহ-সূত্রে। পিতার আদেশে অতি শান্তভাবেই সে-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন চৌরঙ্গীনাথ। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রইলো না তাঁর। তিনি যথারীতি আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েন হরিণ-শিশুটিকে নিয়েই। দিনে দিনে যতই বয়স বাড়তে থাকে হরিণ-শিশুর, ততই চৌরঙ্গীনাথের বাৎসল্য প্রকাশ পায় আরও ব্যাপ্তি এবং আরও অনেক গভীরতা।

যিনি বিবাহিতা পত্নী—তিনি স্বাভাবিক কারণেই স্বামীকে পেতে চান গভীর সান্নিধ্যে। কিন্তু বেশ কিছুদিন অতিক্রান্তির পরেও তাঁর স্বামী যখন একদিনের তরেও একবার কাছে এলেন না, তখন তিনি বুঝতে পারেন : এ-ব্যাপারে একমাত্র হরিণটিই প্রতিবন্ধক। সুতরাং তিনি নিরীহ হরিণটির প্রতিই ঈর্ষান্বিতা হয়ে ওঠেন যৎপরোনাস্তি। তাঁর এই অস্বাভাবিক ঈর্ষাপরায়ণতা যখন নেমে আসে চরম পর্যায়ে—তখন একদিন গভীর রাত্রে তিনি তাঁর সহোদর ভ্রাতাকে দিয়েই অপহরণ করান উক্ত হরিণটিকে। ভ্রাতা তাঁর রাতারাতিই হরিণসহ নৌকো ভাসান ভাগীরথীর বুকে। তারপর ভাসতে ভাসতে অনেকদূর এসে, পূর্বোপকূলের এক গভীর অরণ্যের কাছে হরিণকে ছেড়ে দিয়ে, তিনি আবার যথাসময়ে ফিরে যান তাঁর স্বগ্রামে।

প্রভাতে ঘুম ভাঙতেই চৌরঙ্গীনাথ প্রতিদিনের মতো সস্নেহে ডাক দেন তাঁর প্রিয় হরিণকে। কিন্তু যে-হরিণ সামান্য এক মৃদু ডাকেই ছুটে আসতো ত্বরিৎ গতিতে—সে সেদিন পর পর একাধিক ব্যগ্র ডাকের পরেও যখন কোনো সাড়া দেয় না, তখন স্বাভাবিক কারণেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন চৌরঙ্গীনাথ। ঘর থেকে তিনি বাইরে আসেন, ছুটে যান মাঠে-ময়দানে, দূরে অরণ্যের ধারে-কাছে এবং ভাগীরথীর নদীপবর্তী তৃণাঞ্চলে। কিন্তু কোথাও তাঁর প্রিয় হরিণের সন্ধান পেলেন না তিনি। নানাজনকে শুধালেন বারে-বারে, কেউ দিতে পারলো না কোনো হদিস। তবু তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি বারবার ছুটোছুটি করলেন এ-পথ থেকে সে-পথে এবং লোকালয় থেকে নির্জন তেপান্তরে—কিন্তু বৃথাই।

চৌরঙ্গীনাথের পত্নী ভেবেছিলেন : কুহকী হরিণ অদৃশ্য হলেই তিনি সান্নিধ্য পাবেন তাঁর স্বামীর। কিন্তু হায়, তা তো পেলেনই না, বরং হরিণের অভাবে দিনে দিনে আরও বেশি বিবাগী, আরও অনেক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন চৌরঙ্গীনাথ। এভাবেই কেটে গেল বেশ কিছুদিন। তারপর একদিন, ছোট্ট একখানি ডিঙিকে অবলম্বন ক'রে হঠাৎ ভাগীরথীর বুক বেয়ে দক্ষিণের দিকে ভেসে চললেন তিনি।

ভাসতে ভাসতেই অনেক পথ, একাধিক জনপদ পেরিয়ে, সুদূর দক্ষিণের অরণ্যের কাছাকাছি আসেন চৌরঙ্গীনাথ। সেখানে আসতেই তিনি পূর্ব তীরবর্তী অরণ্যের পাশে একখণ্ড তৃণভূমিতে হঠাৎ দেখতে পান কয়েকটি হরিণ। এই কয়েকটির মধ্যে একটি যেন তাঁরই প্রতিপালিত—যাকে তিনি অন্বেষণ করছেন একাগ্রভাবে। তিনি তাই হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে ডিঙি ভেড়ান কূলে। কিন্তু তিনি কূলে আসতেই হরিণ কয়েকটি প্রবেশ করে অরণ্যে। তিনিও পিছু-পিছু ধাওয়া করেন তাদের। এভাবেই দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে তিনি যখন ছুটে আসেন অরণ্যের গভীরদেশে—তখন আকস্মিকভাবেই এক বিপুল নিস্তব্ধতা এসে আচ্ছন্ন করে তাঁর সমগ্র সত্তাকে। হরিণের দল অদৃশ্য। কোথাও কিছু নেই, কোনো শব্দ নেই। কেবল নিশ্ছিদ্র অরণ্যের অন্তহীন ছায়ার বিস্তার। হঠাৎ কী-এক মন্ত্রবলে যেন বন্য-জন্তুদের বিক্ষিপ্ত পদশব্দও থেমে গেছে। অরণ্যের পত্রগুচ্ছেও কোনো সাড়া নেই। এমন এক পরিবেশে নিঃশব্দ

মূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, চৌরঙ্গীনাথের হঠাৎ মনে হয় : তাঁর প্রতিপালিত হরিণ সত্যই হরিণ নয়। হরিণের বেশে তাঁর আরাধ্য ইষ্টদেবতাই এতদিন কাছে কাছে ছিলেন এবং তিনিই তাঁকে টেনে এনেছেন অরণ্যের গভীরদেশে। অতএব আজ অরণ্যের অন্তরালে নিভৃত সাধনার বেদী রচনা করতে হবে তাঁকে।

গাছের সরু শাখায় পাতার ছাউনি তুলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন চৌরঙ্গীনাথ। যোগী-জীবনের নবীন যাত্রা সুরু হয় তাঁর সেখানেই। আহার তাঁর অরণ্যের ফলমূল। বন্য জীব-জন্তুর — মিতালি পাতিয়ে, দিনে দিনে সেখানেই স্বাভাবিক, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেন সাধক চৌরঙ্গীনাথ।

কিছুকাল পর একদল দুর্ধর্ষ আদিবাসী একদিন অরণ্যে প্রবেশ করে শিকারের উদ্দেশ্যে। প্রবেশ করেই তারা গভীর অরণ্যে সাক্ষাৎ পায় চৌরঙ্গীনাথের। চৌরঙ্গীনাথকে তাঁর কুটিরে গভীর ধ্যানস্থ অবস্থায় দর্শন ক'রে একসঙ্গে চমকে ওঠে শিকারী আদিবাসীদের সবাই। তারা ভাবে : এ-অরণ্যে কোনো মানুষের অধিষ্ঠান অসম্ভব। তিনি নিশ্চয়ই অরণ্যের শিব—যিনি মাঝে মাঝে মানুষের মূর্তি ধারণ করেই ধ্যানস্থ হতে ভালোবাসেন।

এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই অরণ্য থেকে নিক্রান্ত হয় আদিবাসীর দল এবং তারাই চৌরঙ্গীনাথের বা তাদের ধারণা-প্রসূত শিবের নিভৃত সাধনার খবর ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন লোকালয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, এ-সমস্ত আদিবাসীই তখন বসবাস করতো অরণ্যের পূর্ববর্তী এক গ্রামে—যাদের সঙ্গে একবার ভীষণ সংঘর্ষ ঘটেছিল কোনো এক পর্তুগীজ দস্যু-দলের।

যাই হোক, আদিবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়েই গভীর অরণ্য-দেশে চৌরঙ্গীনাথের দর্শন পেতে আসেন আরও অনেকেই। তন্মধ্যে জন-কয়েক নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি চৌরঙ্গীনাথের সান্নিধ্যে এসে আলাপ-আলোচনাও করেন সরাসরি। তাঁরা বুঝতে পারেন : চৌরঙ্গীনাথ নাথ-যোগীই। সুতরাং তাঁর কাছেই তাঁরা দীক্ষা গ্রহণ করেন সাগ্রহে এবং আরও দূর-দূরান্তে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসকারী নাথসম্প্রদায়ভুক্ত জনসাধারণকে ডেকে এনে দীক্ষাগ্রহণ করতে বাধ্য করান। তারপর দেখতে দেখতে, সম্ভবত চৌরঙ্গীনাথের আকর্ষণেই অরণ্যের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ-সমাকীর্ণ ময়দানে বসতি স্থাপন করেন নাথসম্প্রদায়। গুরু চৌরঙ্গীনাথের নামেই তাঁদের নব-প্রতিষ্ঠিত গ্রামের নামকরণ হয় চৌরঙ্গী।

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেহান্তরিত হন চৌরঙ্গীনাথ। কিন্তু উক্ত শতাব্দীরই মধ্যাহ্নকাল পেরিয়েও নাকি অস্তিত্ব বজায় ছিল চৌরঙ্গী গ্রামের। কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন : চৌরঙ্গী গ্রাম থেকেই পরবর্তীকালে সমগ্র অঞ্চলের নামকরণ হয় চৌরঙ্গী। আবার কেউ কেউ বলেন : স্বয়ং চৌরঙ্গীনাথকে স্মরণ করেই পরবর্তীকালের সমগ্র অঞ্চল চৌরঙ্গী নামে বিভূষিত। শেষোক্ত অভিমতই পোষণ করেন বেশির ভাগ। এমন কি, Calcutta Past and Present—গ্রন্থের লেখিকা ব্লিচেণ্ডেনও তা বিশ্বাস করেন। তিনি নাকি চৌরঙ্গীনাথ সম্পর্কীয় উল্লেখিত কিংবদন্তী থেকেই আহরণ করতে সক্ষম হয়েছেন ইতিহাসের উপকরণ। চিৎপুর রোড থেকে কালীঘাট পর্যন্ত হিন্দু তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য যে-সুদীর্ঘ সরু পথের অস্তিত্ব ছিল আদিকালে—সে-সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে চৌরঙ্গীর কথাও উল্লেখ করেছেন ব্লিচেণ্ডেন। চৌরঙ্গী অঞ্চল যে জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর নামেই নামাঙ্কিত—তা তিনি সেখানেই ব্যক্ত

চৌরঙ্গীর ময়দানের দৃশ্য

● ময়দানের ক্রীড়া-সংঘের দৃশ্য

করেছেন বেশ স্পষ্ট ভাষায়। তিনি বলেছেন :

'The pilgrim route, which had passed through the jungle, is clearly traceable from the point at Chitpur, where it enters the boundary of modern Calcutta, along Chitpur Road, through Bentinck Street, and so by Chowringhee and Bhowanipore to Kalighat. In Bentinck Street, the road crossed 'The Creek', and from there, till it reached Bhowanipore it was called Chowringhee's Road, after Jungle Gir Chowringhee, a pious worshipper of Kali's great consort Shiva.'

এই অভিমতই সমর্থন করেন অধিকাংশ ঐতিহাসিক। কেবল এ কে রায় তা অস্বীকার ক'রে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভিন্ন অভিমত। তিনি বলেছেন : চৌরঙ্গীনাথ নয়, কালী-চিরাঙ্গী থেকেই চৌরঙ্গী নামের আত্মপ্রকাশ। কিংবদন্তীর সূত্রে বিষ্ণুর সুদর্শন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন সতীর যে-পদাঙ্গুলি পতিত হয়েছিল কালীঘাটে---তা-ই পরে কালীরূপে চিরাঙ্গী। অতএব সেই পবিত্র চিরাঙ্গীকে চিরকাল ভক্তি-সহকারে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই জন-সাধারণ এতদঞ্চলের নামকরণ করে চৌরঙ্গী। তিনি তাঁর Census of Calcutta গ্রন্থে এ-সম্পর্কে যা লিপিবদ্ধ করেছেন---তার কিয়দংশ এই :

'And finally it is to the Goddess Kali herself, called Cherangi from the legend of her origin by being cut up with Vishnu's disc, that they trace the name of Chowringhee.'

কিন্তু মিঃ এ কে রায়ের এই অভিমতের স্বপক্ষে যুক্তি তেমন জোরালো নয়। কিংবদন্তী-সূত্রে সুদর্শন কর্তৃক বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলি পতিত হয়েছিল কালীঘাটে এবং সেই সূত্রে কালী-চিরাঙ্গীরও আত্ম-প্রতিষ্ঠা সেখানেই। অথচ সে-অঞ্চল চিরাঙ্গী-সূত্রে চৌরঙ্গী না হয়ে হঠাৎ এতদূরের এক পরিমিত অঞ্চল চিরাঙ্গীর স্মরণোদ্দেশে চৌরঙ্গী নাম ধারণ করলো কেন---এ-প্রশ্ন স্বভাবতই জাগবে যুক্তিবাদীর মনে। সতীর বিচ্ছিন্ন পদাঙ্গুলির পবিত্র রূপায়ণে কোনো কালী-প্রতিমার অধিষ্ঠান ছিল বর্তমান চৌরঙ্গী অঞ্চলের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডে---এমন কোনো প্রমাণ বা ইতিহাস কোথাও নেই। মিঃ এ কে রায়-ও তাঁর গ্রন্থে এমন কোনো নজির স্থাপন করতে পারেন নি। তাই মনে হয় : কালী-চিরাঙ্গী কালীঘাটের, চৌরঙ্গীর নয়। চৌরঙ্গী অঞ্চল স্মরণ ক'রে চলেছে আদিকালের সেই সাধক চৌরঙ্গীনাথকেই। এর স্বপক্ষে আধুনিক কালেরও একটি উপ-ঘটনার সংযোজন চলতে পারে। সেটি হলো এই যে, একবার চৌরঙ্গী রোডকে রবীন্দ্র সরণীরূপে পরিবর্তিত করার প্রস্তাব ওঠে পৌরসভায়। অধিকাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে সে-সিদ্ধান্ত প্রায় গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু কার্যকরী হয় নি। কারণ এ-কালের কিছু নাথসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি এই মর্মে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন :

চৌরঙ্গী রোড তাঁদের আদিগুরু চৌরঙ্গী-নাথের পবিত্র স্মৃতির ধারক। আজ সে-নামের হঠাৎ পরিবর্তন ঘটালে সমগ্র নাথসম্প্রদায়ের অন্তরে আঘাত করা হবে চরমতম।

নাথসম্প্রদায় তাঁদের সেই প্রতিবাদ-লিপি সেদিন কেবল পৌরসভার দপ্তরেই প্রেরণ করেন নি, একে একে তা প্রকাশ করেছিলেন একাধিক পত্র-পত্রিকায়। তাই চৌরঙ্গী রোডকে সেদিন কবিগুরুর নামে নামাঙ্কিত করা সম্ভব হয় নি পৌরসভার পক্ষে। অবশ্য বর্তমানে জহরলাল নেহরু রোডে সেই চৌরঙ্গী রোডের একভাগের রূপায়ণ ঘটলেও, আরেক ভাগ আজও একইভাবে স্মরণ ক'রে চলেছে চৌরঙ্গীনাথের নাম।

সে-যাই হোক, অঞ্চলগত দিক থেকে চৌরঙ্গী আজও চৌরঙ্গীই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই সমগ্র চৌরঙ্গীর ক্রম-রূপান্তর সুরু হয়। তবে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেও চৌরঙ্গীর অরণ্য ছিল আদিকালের মতোই গভীর। এই গভীর অরণ্যেই সপারিষদে বাঘ-হরিণ শিকার করতেন হেস্টিংস স্বয়ং। সম্ভবত তাঁর শিকারে ব্যাঘাত ঘটবে বলেই একবার অরণ্যা-পসারণের সিদ্ধান্ত তিনি নাকচ করে-ছিলেন কাউন্সিল-সভায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরে ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে অরণ্যাপসারণ সুরু হয় ইংরেজদেরই প্রচেষ্টায়। তাই পালা বদলের দিন আসে চৌরঙ্গীর। বর্তমানের যে-চৌরঙ্গী লাবণ্যের অদ্বিতীয় আসনে সমাসীন---তা সে একটু-একটু ক'রে অধিকার ক'রে এসেছে অনেককাল থেকেই। আজ যে-দুরন্ত রমণীয়তা তার বিদেশীর চোখে নেশা ধরায় এবং স্বদেশবাসীর মনেও অহঙ্কারের রামধনু ফোটায়---তা সে তিলে তিলে অর্জন করেছে কী-ভাবে এবং কোন্ কাল থেকেই বা তার রূপের হাটের পসারিণী-রূপে পদযাত্রা সুরু হয়---তা অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ---যদি তাঁরা অধ্যয়ন করেন আগামী সংখ্যায় নিত্যকালের চিত্তহারী চৌরঙ্গী পর্যায়ের 'ইংরেজ আমল থেকে সর্বাধুনিক অধ্যায়'।

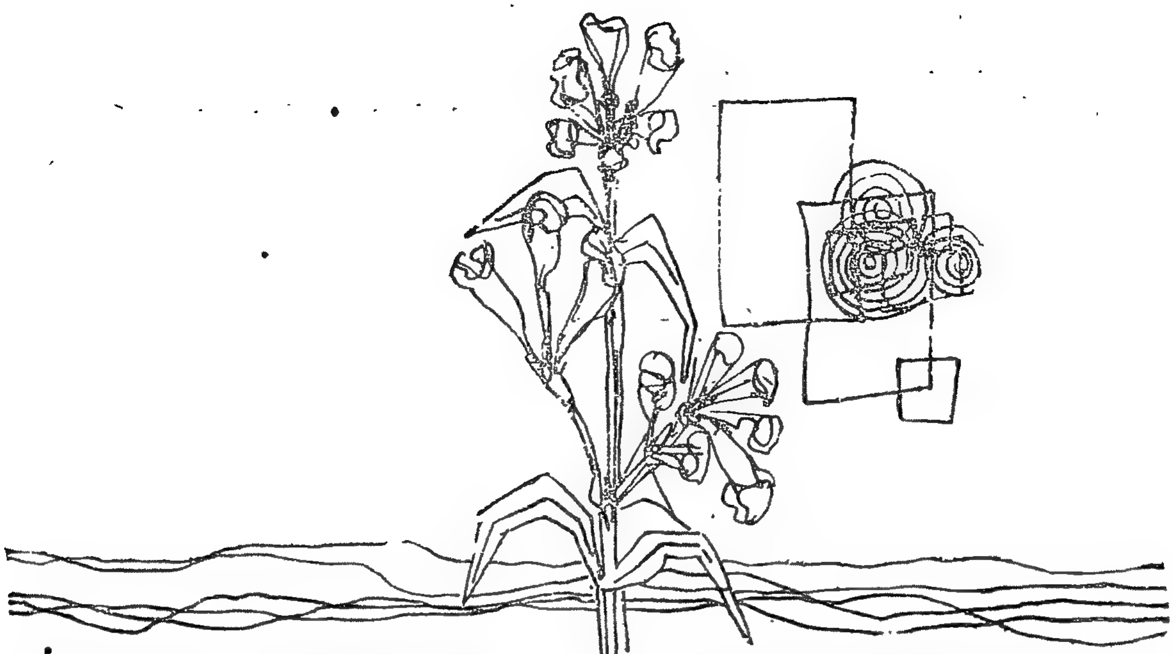

ফুলের পরমায়ু

অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত

কালো ধোঁয়ার মত আকাশ জুড়ে মেঘ। সারাদিন ধরে টিপটিপ বৃষ্টি আর বৃষ্টি। ঘ্যানঘ্যানে বিরক্তিকর একটানা কান্নার মতই অসহ্য। পেঁজা তুলোর মত আকাশের ছাদনার সব ছিদ্র-পথের আগল বুঝি খুলে গেছে।

গোপাল তার দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে তখনো জট-পাকানো দুঃসহ চিন্তার ভারে অসহায়ের মত বৃষ্টির দিকে তাকিয়েছিল। এমন করে কোনদিন নিজেকে নিঃসহায় মনে হয় নি।

গোপালের সামনে যেন এক নতুন দৃশ্যপট। তার নিত্যচেনা সব কিছু কেমন অকস্মাৎ পাল্টে গেছে যেন। গোপাল যেন কোন অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে কোন যুদ্ধক্ষেত্রের ছবি দেখছে। চেনা মানুষগুলোও যেন কেমন নতুন যোদ্ধার বেশে নিরাপদ আশ্রয় রক্ষার যুদ্ধে মেতেছে।

গোপালের অবাক লাগে মুহূর্তের দুর্ঘটনায় চেনা মানুষকেও কেমন যেন অচেনা মনে হয়। কালকের মানুষ আজকে কেমন আলাদা হয়ে যায়।

দোকানের বেঞ্চিতে বসে অগোছালো চিন্তার অস্থিরতা নিয়ে গোপালের দুপুর গড়াল।

মেঘলা আকাশে বিকেল বলতে আজ কিছু ছিল না। এখন আধোছায়া অন্ধকার বাড়িটার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। গোপাল গোটা বাড়িটাকে আরেকবার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত দেখল। অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে বীজাণুদের মন্থর নড়েচড়ে বেড়ানো দেখবার মতই।

সব ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। সমস্ত বাড়িটা ভিজে কেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে গেছে। দেওয়ালের গা বেয়ে জল চুয়ানোর বিচিত্র সব ছোপ ধরেছে। পায়খানার ফাটল ভেঙে গজিয়ে ওঠা বুনো অশ্বত্থটা ঠায় নিশ্চল হয়ে ভিজে এখন কেমন নুয়ে পড়া ভাব।

গোপাল ভাবল বাড়িটার বয়স কত মানুষের স্মৃতিকে আত্মসাৎ করে বোবা প্রহরীর মত সময়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু মুহূর্ত গুণেছে। নিরাপদের ভুয়ো দেওয়ালে মোড়া নিজের কোটরে মানুষগুলোর নড়েচড়ে বেড়ানো প্রত্যক্ষ করেছে প্রতিমুহূর্ত। কখনো দেখেছে অন্ধকার প্রাচীর ভেঙে শিকার-লোভে ঢুকে পড়েছে ভেতরে, নিজের কোটরেই যুদ্ধ দেখেছে। জয়-পরাজয় দেখেছে।

সকালেও কেউ বুঝতে পারে নি এমন অকস্মাৎ এ আক্রমণ সুরু হবে।

দুপুরেই খবরটা ছড়িয়েছিল। হেমেনের বৌয়ের কলেরা হয়েছে। আর তখন থেকেই ওর নিজের ভেতরের এক অসহনীয় অস্থিরতায় ছটফট করেছে। কেউ আসে নি আজ দোকানে।

অনেক কথা বুকের ভেতরে ছটফট করে গুমরেছে। কাউকে বলতে পারে নি। নিজের অনিশ্চিত পরিণতির নানান ছবি বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

চোখ বন্ধ করে দোকানের বেঞ্চিতে কখনো শুয়ে থেকেছে। প্রচণ্ড জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন থাকার মত স্নায়ুগুলো খুব দুর্বল ও অসাড় মনে হয়েছে।

নিজের ভেতরের অস্বস্তি পক্ষ

মুহূর্তেই গোপালকে আবার উঠে বসিয়েছে।

বিকেল উৎরে কখন সন্ধ্যে নামে। তবু সে অস্থিরতা কাটে না। গোপাল ঠায় বসে বাইরেটা দেখে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। অশ্বত্থের পাতা বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার টুপটাপ্ শব্দ। ডালে বসে একটা কাক গা ফুলিয়ে চুপচাপ্ ভিজছে। ছড়ছড়-নর্দমা থেকে জল পড়ার শব্দ। কানা-ভাঙা নর্দমার নলের তলায় আশ্রিত দুটো পায়রা গায়ে গা লাগিয়ে উত্তাপবোধে ঠোঁট গুঁজে ঝিমুচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ও দুটো বুঝি কুঁকড়ে মৃতপ্রায়।

রাস্তায় ভাঙা ইটের ফাঁকে ফাঁকে ঘোলাটে জল জমে উপচে রাস্তাটাকে জল-কাদায় মাখামাখি করে তুলেছে।

চটি জোড়া হাতে নিয়ে ছপ্ ছপ্ করে জল ডিঙিয়ে হেমেনের ছোট ভাই বেরিয়ে গেল কোথায়।

সামনের বড় নর্দমাটার ধারে ধারে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শালপাতার ঠোঙায় ব্লিচিং পাউডার লেগে অদ্ভুত পাথরের মত দেখায়। ব্লিচিং-এর গন্ধ গোপাল নিশ্বাসের সঙ্গে পাচ্ছিল। ভাবল ব্লিচিং-এর গন্ধটাও বোধহয় বীজাণু-নাশকের কাজ করে।

গোপাল ভাবে অস্তিত্বকে জীইয়ে রাখার কত রকম প্রচেষ্টাই না মানুষের। তবু আজ সকালেও কি হেমেনের বৌ ভেবেছিল—এমন করে মৃত্যুর টাগ অফ ওয়ারে তাকে মুহূর্ত গুণতে হবে। কাল রাতেও কি বোঝা গিয়েছিল এ সেই কালব্যাধি। যা কয়েক মুহূর্তে দেহকে নিস্পন্দ, রক্তকে জমাট বেঁধে মৃত্যুর অনিবার্যতার মুখে ঠেলে দিতে পারে।

দুপুর থেকেই যেন বাড়িটাকে কেমন নিঃশব্দ ভয়ের এক ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে। ভাবল নিয়ত সন্ধ্যায় যে বাড়িটা কলকল নানান কথায়, বিচিত্র শব্দে চঞ্চল থাকে—অকস্মাৎ কেমন থমথমে মূক হয়ে গেছে। আত্মসচেতনতা মানুষগুলোকে কেমন বোবা করে তুলেছে।

কোথায় একটা বেড়াল একনাগাড়ে ডাকছে। গোপাল লক্ষ্য করে দেখল, জলের ট্যাঙ্কের তলায় বসে সাদাতে কালোতে একটা বাচ্চা বেড়াল জলে ভিজে কুঁকড়ে বসে ডাকছে। গোপাল আনমনে দেখল কিছুক্ষণ। ভাবল অমঙ্গলে কিছু। তাড়িয়ে দেবে কিনা। আবার মনে হল ধ্যুৎ, সে তো কালো বেড়াল।

গোপাল তার ভাবনার ক্ষেত্র পাল্টাবার জন্য দৃষ্টিকে টেনে নেয় রাস্তার দিকে।

একটা ঠেলাগাড়ি ত্রিপল চাপা দিয়ে দুটো ভেজা মানুষে ঠেলে নিয়ে গেল। ছাতা মাথায় দুটো-একটা পথচারীর এদিক-ওদিক আনাগোনা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই—বৃষ্টির ধারা আবার কখন নামবে।

ভাবল হেমেনের বৌ যদি আজ রাতেই মারা যায়। মুস্কিলে পড়তে হবে—শ্মশানে নিয়ে যেতে। গোপালেরও হয়তো ডাক পড়বে। গোপাল তখন কি বলবে। মৃত্যুর পরেই তো বীজাণুরা ছড়ায় বেশি।

গোপাল তার ভাবনা নিয়ে কেমন দিশাহারা, বিভ্রান্তবোধ করে। অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত।

গোপাল কেমন বোবা অসহায় নেত্রে চারিদিক দেখে।

ঘাড় গুঁজে কোঁচার ঝোলানো অংশকে আলতো করে তুলে ঘরে ফিরছিলেন শিবশঙ্কর।

শিবশঙ্কর তিনতলার কোণার ফ্ল্যাটের ভাড়াটে। কোন এক প্রাইভেট কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। পাড়ার সম্মানিত ব্যক্তি বলতে প্রথমে শিবশঙ্করের কথা মনে আসে। কবিতা লেখেন দুটো-একটা মাসিক কাগজে। গোপালের কবিতা পড়ার নেশা দেখে দু-একদিন দুটো-একটা কবিতা গোপালকে শুনিয়েছেন। গোপাল বলতো—'কেন্ জানি রবীন্দ্রনাথের মত অমনটি আর লাগে না। কেন বলুন তো?'

তবু অধ্যাপক বলেই হয়তো গোপাল শিবশঙ্করকে একটু বেশি খাতির করে থাকে।

আজ এই মুহূর্তে শিবশঙ্করকে দেখে গোপাল কেমন যেন একটু ভরসা পাওয়ার মতই ডেকে বসাল।

পুরনো প্রায় জরাজীর্ণ এই ফ্ল্যাট-বাড়িটার প্রায় সকল ভাড়াটের সঙ্গেই গোপালের হৃদ্যতা। রসিকতা চলে। বাড়িটায় ঢুকতেই বাঁ দিকে গোপালের চায়ের দোকান।

সারাদিনে সব খুপরিতেই গোপালকে একবার না একবার যেতে হয়। ডিমের ওমলেট-চা পৌঁছে দিতে। ছেলে-ছোকরা, বুড়োদের কেউ কেউ গোপালের দোকানে বসেই আড্ডা জমায়।

গোপালের সঙ্গে সুখ-দুঃখ, সিনেমা বিবিধ বিষয়ে কথা চলে।

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে গল্প চলে যায়।

কিন্তু শিবশঙ্কর আসেন কম। তবু আজ গোপালের মনে হল—অগাধ জলে নিমজ্জমান সে, আর খড়কুটোর মত আঁকড়ে ধরার বস্তু হয়তো একমাত্র শিবশঙ্কর।

শিবশঙ্কর একটু বিস্মিত, বিব্রত বোধ করলেন।

গোপাল বলল: 'শুনেছেন স্যার, হেমেনের বৌয়ের সেই রোগ ধরেছে। একেবারে কলেরা।'

চোখ দুটো কেমন বিস্ফারিত দেখাল গোপালের।

কেমন বিমূঢ়ের মত শিবশঙ্কর চেয়ে রইলো গোপালের মুখাবয়বের দিকে।

গোপাল বলল: 'এবার এ পাড়া ধরল। আমাদের উপায় কি হবে স্যার?'

শিবশঙ্কর নীরব। গোপালও কেমন স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলো।

দুঃসহ এই নৈঃশব্দ। চেতনাশূন্য

নির্বাক হয়ে দুজনেই শুধু মুহূর্ত গোণে।

বেড়ালটা আবার ডাকছে। সদ্য-বিধবার কান্নার মত।

অকস্মাৎ নৈঃশব্দকে ভেঙে সাইকেলের শব্দ গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। দুজনেই সম্বিৎ ফিরে পায় যেন। ফিরে তাকায় গেটের দিকে।

ডাক্তারের সঙ্গে চাপা স্বরে কি সব কথা বলতে বলতে হেমেন ঢুকে গেল। হেমেনের ডান হাতে ধরা পুরনো ঝরঝরে সাইকেলটা।

এ পাড়ার সব চেয়ে বড় ডাক্তার শেখর চ্যাটার্জি। একটু আগে আরেকজন ডাক্তারকে ঢুকতে দেখেছে।

শিবশঙ্কর উঠে দাঁড়ায়। অনিশ্চিত এক ভয়ে কপালের শিরাগুলো তারও বুঝি ফুলে উঠতে চাইছে।

ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, হেমেনের চাপা স্বরে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা, বেড়ালটার একনাগাড়ে কান্না, ঠাণ্ডা জলো হাওয়া—সব মিলিয়ে পরিবেশটাই যেন আশু এক অনিবার্য কালরাত্রির ইঙ্গিতময় হয়ে উঠছে। গোপালের ফ্যাকাশে মুখ আরও রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে শিবশঙ্কর তার নাকে মুখে চেপে ধরেছেন।

গোপাল ভেবেছিল শিবশঙ্করের সঙ্গে দুটো কথা বললেই হয়তো অন্যমনস্ক, হাল্কা হতে পারবে।

শিবশঙ্কর ইতিমধ্যে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে নিয়েছেন কর্পূরের প্যাকেটটা ঠিক আছে কি না। একটু আগে মোড়ের দোকান থেকে প্যাকেটটা কিনেছেন।

আজ সকালেই যে কাগজে দেখেছেন এক সপ্তাহে পঞ্চাশ জনের মৃত্যু। শহরের বুকে মহামারী। মানুষ যেন কীটের মত মরছে। অথচ নিরাপত্তার তো কতই প্রচেষ্টা।

আরেকবার ইনজেকশন নেবেন কি না ভাবেন শিবশঙ্কর। ডাক্তারকে কালই জিজ্ঞেস করবেন।

রঞ্জু, অঞ্জু এখন কি করছে কে জানে। এ সময় বাইরের খাওয়া একদমই বন্ধ করা উচিত। ভাবলেন মায়াকে আজ গিয়ে বকবেন ছেলেমেয়ের প্রতি তার নজর অত্যন্ত কম। দেখছো না কিভাবে রোগ ছড়াচ্ছে। জল ফুটিয়ে ছাড়া এ সময় একদমই খাওয়া উচিত নয়।

এবম্বিধ ভাবনার সুতোটা শিবশঙ্করের নিজের আত্মচেতনায় পাক খেতে থাকে।

সচেতন হতেই দেখলেন—গোপাল তার মুখের দিকে আচমকা ভয় পাওয়া শিশুর মত চেয়ে আছে। মরা মাছের মত ফ্যাকাশে, বিবর্ণ মুখ। গোপালকে এই মুহূর্তে কিছু একটা বলা দরকার।

গোপালের জন্য কোন কষ্ট-বোধের চেয়ে আত্মসচেতনতায় শিবশঙ্কর যেন বেশি পীড়িত হচ্ছিলেন।

অত্যন্ত নির্লিপ্ত, নিস্পৃহভাবে শিবশঙ্কর বললেন: 'ওর জন্য কিছু ভেবো না গোপাল। তবে সংক্রামক ব্যাধি, হাসপাতালেই রিমুভ করা উচিত ছিল।

কথাগুলো মুখস্থ করা বুলির মত কোনরকমে উচ্চারণ করেই রাস্তায় নেমে দাঁড়ালেন।

গোপাল কয়েক মুহূর্ত তাকাল শিবশঙ্করের চলে যাওয়ার দিকে।

তারপর সরাপোকার মত কি যেন সমস্ত শরীর বেয়ে গোপালের ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ভাবনাকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলল। ভয়টাই বুঝি আরও সংক্রামক ব্যাধি।

গোপাল তার দোকানের দুটো পাটই বন্ধ করে, উনুনে চাপানো জলের বড় ড্রামটা নামিয়ে রাখল। তারপর লোহার একটা শিক দিয়ে খুঁচিয়ে খুচিয়ে উনুনটা নিভিয়ে দিল। ছাই ঘামের সঙ্গে গলায় ও মুখে লেগে রইলো।

তারপর গোপাল বাইরে এসে দাঁড়াল। বারবার এদিক-ওদিক, পেছনে তাকাল। যেন এক আসন্ন মৃত্যুর ছায়া গোপালের পিছু পিছু নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

কিশোর বয়সেই গোপাল এ ব্যাধিতে তার বাবা, মা ও এক বোনকে হারিয়ে এসেছে। তাই এ ভীতি গোপালের স্ব-অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত।

গোপাল সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল। বৃষ্টি নেই। আকাশ তবু গোমড়া মুখো। ছায়া ছায়া অন্ধকার চারিদিকে।

কোন কোন ঘরের আলো জ্বালা হয়ে গেছে। জানলা টপকে আলোর রেখা রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়েছে। দূরে কোথাও সেতারের রেওয়াজ করছে কেউ। কিম্বা রেডিওর শব্দ।

গোপাল সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে একবার হেমেনের জানলার দিকে তাকাল।

একটা পাট খোলা। পর্দাটা ভিজে মাংসের চর্বির মত লেপটে আছে শিকের সঙ্গে।

গোপাল ভাবল কাল সন্ধ্যেতে ও হেমেনের বৌকে দেখেছে জানলায় চুপচাপ বসে থাকতে। বিকেলে গা ধুয়ে পরিপাটি করে চুল বাঁধা। কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুরের টিপ। খোঁপায় রজনীগন্ধা গোঁজা ছিল বোধহয়। কি আশ্চর্য, সেই মানুষটিই এখন নিয়তির যুদ্ধে নিরস্ত্র দুর্বল সৈনিকের ভূমিকা নিয়েছে। নিয়তির করুণাপ্রার্থী। ভাবতে গেলে অবাক লাগে। সবকিছু কেমন অবিশ্বাস্য মিথ্যে মনে হয়।

গেটের মুখে ট্যাক্সি থামল। শব্দে গোপাল চমকে তাকাল। হেমেনের ছোট ভাই। হাতে কি সব ওষুধপত্তরের বাক্স নিয়ে হনহন করে উঠে গেল ওপরে। ট্যাক্সিটা আবার অদ্ভুত শব্দে ধোঁয়া ছেড়ে দৃশ্যের আড়ালে চলে গেল।

দুঃসহ আশঙ্কাবোধ গোপালের সমস্ত স্নায়ুকে কুরে কুরে যেন অসাড় করে তুলছে।

গোপালের আবার মনে হল—এ বাড়িটার সবকিছু যেন খুব অপরিচিত। সবকিছু অদ্ভুতভাবে পাল্টে যাচ্ছে যেন।

অত্যন্ত মন্থর, এক পা এক পা করে গোপাল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে।

সমস্ত শরীর ঘেমে উঠছে। কপাল থেকে ঘামের রেখা গাল বেয়ে নামে। গেঞ্জিটা ঘামে লেপ্টে গেছে শরীরে।

দোতলার ধাপে পা দিতেই আনমনে হেমেনের ঘরের দিকে ওর দৃষ্টি চলে যায়। গোপাল সিঁদকাটা চোরের মত উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করে।

ভেজান দরজা। হাওয়ায় একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে। কে যেন হেঁটে গেল এপাশ থেকে ওপাশে। ওষুধের উৎকট গন্ধ নাকে আসছে।

হেমেনের বৌকে বোধহয় এখন স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। যাতে রক্ত জমাট বাঁধতে না পারে।

কাল বিকেলেও যে মানুষ ঘুরে বেড়িয়েছে, স্নান করেছে, কাপড় শুকোতে দিতে ছাদে উঠেছে কয়েকবার অথচ আজ এই মুহূর্তে----।

আশ্চর্য লাগে এই মানুষই অস্তিত্বকে অনিশ্চিতের হাতে সঁপে দিয়ে স্বপ্ন দেখে, ভালবাসে, ঘর বেঁধে সুখ খোঁজে।

গোপাল একপলক তাকিয়েই তার দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

পেটের ভেতরটা যেন কেমন গুলিয়ে উঠতে চাইছে। বমি বমি ভাব। এক্ষুণি হয়তো খানিকটা বমি ক'রে ফেলতে পারে। যেন অনভ্যাসবশত খানিকটা মদ গিলে ফেলেছে।

গোপাল তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে এল।

তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে নীচের রাস্তাটা দেখল একবার।

একতলার ভাড়াটে পঞ্চাননবাবু তাঁর দুই ছেলেমেয়ে খোকন আর তপুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন কোথায়। দুপুরে বলছিলেন—'ছেলেমেয়ে দুটোকে পটলডাঙায় মাসীর বাসায় রেখে আসবো ভাবছি।'

হয়তো সেই পটলডাঙায়ই যাচ্ছেন। অথচ কাল এই পঞ্চাননবাবুই বলছিলেন—'আ রে, আমার আবার ভয় কিসের। আমার হোমিও-প্যাথিক ওষুধের বাক্স যতদিন আছে ও রোগ আমার ঘরের ত্রিসীমায় এগুবে না।'

নীচে থেকে দৃষ্টিকে টেনে আনতেই দেখল, সামনে শিবশঙ্করের স্ত্রী ঝাঁটা ও ফিনাইল গোলা জলের-বালতি হাতে।

ঘরের সামনেটা ফিনাইল জল ছিটিয়ে ঝেঁটিয়ে দিলেন।

কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে গোপালের কপালে বসল। গোপাল তাড়াতাড়ি উড়িয়ে দিল। কে জানে এই মাছিটাই হয়তো কিছুক্ষণ আগে হেমেনের ঘরে ছিল কিনা'।

শিবশঙ্করের স্ত্রী ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। শব্দটা গোপালের কানের কাছে পাক খেয়ে মিলিয়ে গেল।

চারিদিকের নৈঃশব্দ, আত্ম-সচেতনতা, মৃত্যুভয়, সব মিলিয়ে গোপালের বুকের ভেতরে এক অস্থির ব্যাকুলতার সৃষ্টি করছিল।

বাইরে ভেজা বাতাসে চাপা নিশ্বাসের শব্দ।

বেড়ালটা আবার ডাকছে কোথাও। নীচের তলা থেকে উনুনের ধোঁয়া উঠছে দলা পাকিয়ে।

ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ অনুভব করে কপালে, গালে। অস্থির উত্তেজনায় গোপালের তবু কপালে ও চোখের কোলে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল। গোপাল হাতের তালু দিয়ে মুছল দু'বার।

গোপাল যেন অনেকক্ষণ শারীরিক কোন যুদ্ধে মেতেছিল।

গোপাল স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত গুণলো। তারপর দেহটা বোঝার মত টেনে নিয়ে এসে দাঁড়াল ছাদে।

ছাদে কোণার দিকে একটিমাত্র ঘর। গোপালের নিঃসঙ্গ সময়ের একমাত্র ঠাঁই।

গোপাল ভাবল, ছাদে একটু পায়চারী করলে হয়তো এ অস্থিরতা কমতে পারে।

বিপর্যস্ত মন নিয়ে দেহটাকে বিছানায় এলিয়ে দিলেও হয়তো স্বস্তি নেই।

বৃষ্টির পর আবার আকাশ তারায় তারায় ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝলমল।

টবে রজনীগন্ধার ডাঁটিগুলো ভিজে নুয়ে পড়েছে। হেমেনের নিজের হাতে গাছগুলো লাগানো। দুটো-একটা বেলফুলও লাগিয়েছিল। হেমেনের বৌ সযত্নে রোজ জল ঢেলে খুঁচিয়ে দিত গোড়াগুলো। কেউ ছিঁড়লে হেমেনের বৌ রোজ গালাগালি দিত। গোপালকে বলতো—'গোপালদা, তুমি একটু নজর রাখতে পারো না।'

কাল সকালে হয়তো হেমেন নিজেই আসবে ফুল কটা ছিঁড়তে। তার বৌয়ের শবদেহে ছড়িয়ে দিতে হবে যে।

ভাবতে ভাবতে কেমন শিহরিত হয়ে ওঠে।

এদিক থেকে ওদিক দ্রুত হেঁটে বেড়ায়।

সিঁড়ি দিয়ে ছায়ার মত কে যেন ওপরে উঠে আসছে।

সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে গোপাল। সিঁড়িটা কি ভীষণ অন্ধকার। ভাড়াটে বাড়ি বলেই বাতিটা কবে ফিউজ হয়ে গেছে পাল্টানো হয় নি। কেমন ভয়াবহ। যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

গোপালের অবাক লাগে হেমেনকে দেখে। বুকের ভেতরটা আবার কেঁপে ওঠে। এই মুহূর্তে কোন দুঃসংবাদ হয়তো শোনাবে গোপালকে। গোপাল এক অস্থির জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকে হেমেনের দিকে।

হেমেন কথা বলে: 'এ্যাম্বুলেন্স আসছে। হাসপাতালেই রিমুভ করবো। এ যাত্রায় টিকেও যেতে পারে। কিছু টাকা দিতে পারো গোপালদা। দু-একদিনের ভেতরেই দিয়ে দেবো।'

হেমেন সিগারেট ধরায়। দুজনে কেউ বিশেষ কথা বলে না। গোপাল ভাবে মৃত্যুকে বুঝি বিলম্বিত করা যায়, প্রতিরোধ করা যায় না!

টাকা নিয়ে কেমন পিঁপড়ের মত অন্ধকারে গুটি গুটি হেমেন নেমে যায়।

পারম্পর্যহীন চিন্তা থেকে নিজেকে অনেকটা হাল্কা মনে হয়।

গোপাল আবার পায়চারী করে। আকাশ দেখে। সন্ধ্যাতারা সপ্তর্ষি। কালপুরুষ খোঁজে।

তারপর এক সময় বিছানায় দেহটাকে এলিয়ে দেয় ঘুমের চেষ্টায়।

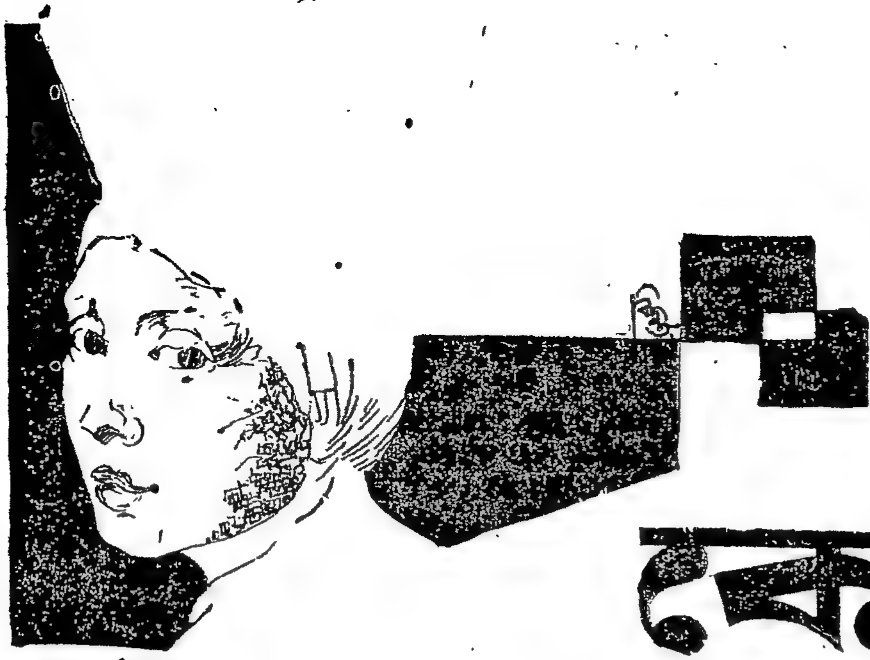

কে?

শ্যাম রায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সতীশচন্দ্রকে এ বিষয়ে দায়ী করা যাচ্ছে না একথা আমি দৃঢ়ভাবে বলছি। তা হলে দায়ী কে? সুবিনয়ের প্রসঙ্গটি এ সম্পর্কে সহজেই এসে পড়ে। সুবিনয়ের সুন্দর চেহারার বর্ণনা আপনারা কবিতায় পেয়েছেন। ওঁর কোঁকড়ানো চুলের সঙ্গে হয়ত সতীশচন্দ্রের সামঞ্জস্য আছে, আর কিছুর সঙ্গে নয়।

সুবিনয় কে? অমন সুন্দর একটি পুরুষ যার কবিতা ছাড়া তার আর কোন পেশা আছে কিনা পরিচয় পাচ্ছি না। সুবিনয় নামক কোন কবিকে বহু বই খুঁজেও বের করতে পারি নি। তবে, রীতা চৌধুরী নিজে কবিতা লিখত---পত্রিকায় ছাপাও হয়েছে। আচ্ছা রীতা চৌধুরীর কবিতা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্যার, কেউ কেউ বলেন কবিতা ব্যাপারটি হচ্ছে মানুষের মনের একটি গভীরতর আবেগপ্রবণ মুহূর্তের প্রকাশ। সেই ভাবমুহূর্তটি কাব্যের মধ্যে সত্য হয়ে ধরা পড়ে। কল্পনাশক্তি এর বাহন। সত্যিকার কবিতা সেই মুহূর্তের সত্যটি ধরে দেয়। সেজন্যে কবি একটি সত্যবাদী জীব কিনা এ বিবেচনার দরকার হয় না। কারণ—ওর হচ্ছে কাব্য-সত্য।

রীতা চৌধুরী যেসব কবিতা লিখেছে, তাতে মনে হয়---সে সুবিনয়ের মতো একটি সুন্দর চেহারার লোকের দর্শন পেয়েছে। ওর প্রতি গভীর আকর্ষণ এবং বন্ধুবর এ্যাডভোকেট মিস্টার দত্ত যে কথা বলেছেন, আংশিক-ভাবে সে কথা সত্য। কোন অংশে সত্যি? যেখানে বলেছেন, রীতা চৌধুরীর মনের যেসব আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হয় নি, সুবিনয়ের কবিতাতে সে সবের প্রকাশ। অতএব সেগুলো রীতা চৌধুরীর লেখা। ইনি সুবিনয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পান নি বলে ওঁকে মানসিক সৃষ্টি বা রবিঠাকুরের জীবন-দেবতার মতো একটি কাল্পনিক ব্যাপার বলে বুঝিয়েছেন। আমি রীতা চৌধুরীর একটি ছাপানো কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি, তাতে সুবিনয়ের সম্বন্ধে আরও একটু বেশি কথা জানা যাবে। আমিও স্বীকার করি যে, কবিতা হচ্ছে মনের ডকুমেণ্ট বা দলিল। এ দলিল অন্যান্য দলিলের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। আচ্ছা রীতা চৌধুরীর কবিতাটি শুনুন:

একটি অনুচ্ছেদ তোমার জন্যে
এই দেহের মধ্যে রচনা করেছি
আদি নেই তার, অন্ত নেই তার
মুহূর্তের কথা নিবেদন নিয়ে।
আমার ভাঙা আরশিতে জীবনের বিক্রম
অধ্যুষিত হয়েছে মন-প্রসাধনে,
দুর্বার ধনসম্পত্তি বিকিয়ে দিলাম
তোমার তীরে পৌঁছে যেতে।
দুঃস্বপ্নের এ জীবন দুর্বার স্রোতে
ভেসে যেতে চায়
সুখ, যে থেকে যায় বহু দূরে, অর্থ
পাহাড় চাপা
যারা পায় না সন্ধান, তারা হয় আলিবাবা
জীবনের সবগুলো ছবিতে একান্তে
পুঞ্জীভূত গরমিল পেলাম সঞ্চয়
সেখানে আমার শান্তি শুধু একের কল্পনায়
তুমি সুবিনয়, বিনীত-নিবেদন
তোমার কাছে।
মানুষ শুধু একের মধ্যেই নিজেকে পায়
তুমি থাকো গরমিল নিয়ে বহুতে
পরিবৃত।

স্যার, কবিতাটির এ পর্যন্ত পড়ে আমি এর অর্থ বোঝাতে চেষ্টা করছি। কবিতা কল্পনার ব্যাপার হলেও কবিরা আজকাল একেবারে প্রত্যক্ষ জীবনের মধ্যে নেমে আসেন। দৈনন্দিন

আশা-আকাঙক্ষার মধ্যে রীতা চৌধুরী সংযতভাবেই মনের কথা সুবিনয়ের কাছে প্রকাশ করেছে। রীতা চৌধুরী আর্থিক অসচ্ছলতা, মানসিক অশান্তি, শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে চারদিকে একটি পুরুষের সত্তায় এক হয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। সুবিনয়ের জন্যে একটু অশান্তিও বর্তমান ছিল। কারণ, সুবিনয় একের সঙ্গে যুক্ত নয়, বহুর মধ্যে সে রয়েছে। সে ছায়ার মতো প্রতিনিয়ত রীতার পাশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতএব ওর সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙক্ষা এইরূপ :—

আচ্ছা, আমি হয়ে যাই তোমার মতো ছায়া
আমি হই পর্দার আস্তরণে ঘেরা সুবিনয়
তারপর হাত বাড়িয়ে দিই লোকান্তর হতে
দুর্বিষহ জীবনের ক্লান্তি ফেলে দিতে।
জীবনটা ঝরে যাক, বয়ে যাক অনাবশ্যক
বৃষ্টির মতো
নৌকোতে দুজনা পাড়ি জমাই সমুদ্রে।
হে অশান্ত জীবন, মাংসটা সত্য হোক
মূর্খের কাছে
কিন্তু শান্তি তোমাতেই, তবু কক্ষচ্যুত হয়ে
যাই।

লক্ষ্য করুন, ছায়ার মতো সুবিনয়টি কে? লোকান্তরে তার বাস। সেখানেই শান্তি। কিন্তু কক্ষচ্যুত হয়ে সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনে শান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। লোকান্তরের একীভূত জীবনেই শান্তি। অতএব রীতা চৌধুরী সুবিনয় হয়ে সুবিনয়ের মতো আচরণ করতে চায়। সুবিনয় কে আমরা জানি নে। রীতা চৌধুরীর উদ্ভাবিত নাম হতে পারে। রীতা সুবিনয়কে মন নিবেদন করছে, আবার নিজেই সুবিনয় হয়ে কবিতা লিখছে—যেন সুবিনয়ই রীতা চৌধুরীকে প্রেম নিবেদন করছে। কামনা-বাসনা সব সুবিনয়ের কবিতায় মূর্ত। সুবিনয় নামে কোন কবি নেই। রীতা চৌধুরী বেশ ভাল কবি। স্বীকৃত কবি।

তা হলে দেখা যাচ্ছে রীতা চৌধুরীর মধ্যে একটি double personality বা দ্বৈত ব্যক্তিত্ব ছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হচ্ছে সুবিনয়। সে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। কয়েকটি তথ্য এবারে বিচার করে দেখুন। বুঝতে পারবেন দ্বিতীয় ব্যক্তি নিছক কল্পনা নয়।

বাড়িওয়ালা সাক্ষী দিয়েছে যে, রীতা চৌধুরী যে ঘরে ছিল—সে ঘরটিতে কেউ বাস করতে চাইতো না বলে সতীশচন্দ্রকে ভাড়া দেয়া হয়েছিল। বহুকাল আগে ওঘরে একটি লোক আত্মহত্যা করেছিল। রীতা চৌধুরী পঞ্চাশ সালে রিফিউজি হয়ে কলকাতায় আসবার পর ম্যানেজার ওকে কর্পোরেশনে চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। সেই থেকে রীতা চৌধুরী এঘরে বসবাস করে। চাকরি করে রীতা পরীক্ষায় পাশ করে যায়। নিজেই রান্না করে খেত। মাঝে মাঝে সতীশচন্দ্র দেখাশোনা করতে আসত।

বাড়িওয়ালা বলেছে, দেখা গেছে যে, মেয়েটি ঘরের মধ্যে অনেক সময়ে কারো সঙ্গে কথা বলতো। কিন্তু বাড়িওয়ালা খোঁজখবর করে দেখেছে ওখানে আর কারো সন্ধান পাওয়া যায় নি। ওরা ধরে নিয়েছিল মেয়েটি একটু আধপাগলা। কিন্তু, এমন একটি কবি, শিক্ষিকা বহুপরিচিতা মেয়েকে পাগল বলতে পারেন কি? কক্ষণো নয়। তা হলে মেয়েটি কার সঙ্গে এঘরে আলাপ আলোচনা করত? রীতা চৌধুরীর একটি কবিতা শুনুন—কবিতাটির নাম :

—প্রথম প্রেম—

সেদিন দেখা হল। জানালার পাশে দাঁড়ালে
অস্পষ্ট আলোকে নিজমনে হাসছ
আমার কণ্টকিত শরীরের খবর জেনেছ।
অকস্মাৎ ভয়ের মেঘ অস্ফুট চিৎকারে
উড়ে যায়
যেন তুমি সবিনয়ে করুণ ইঙ্গিতও জানালে
সেই ক্ষণেই তুমি সুন্দর। শাদা ভয়ের
মূর্তি নও
ছায়া নও, কায়া নও, নিভৃতে
একাকী জীবন
তোমার সকরুণ স্ফটিক শরীরে কত ক্লান্তি।
দুঃখের দিঠিতে কি যে আবেদন?
জিজ্ঞেস করছিলাম,—পালালে।
তারপর থেকে দেখা হয় রোমাঞ্চের স্বর্গে
স্নিগ্ধ ছায়ামূর্তি—কল্পান্তলোকে।
এ নিভৃতি সত্য হোক, তুমি শ্মশানের নও
তুমি জীবনের দূত, প্রতিদিন এসো
হে মৃত্যুময়।

জানালার পাশে দেখেই, শরীর কণ্টকিত হয়েছিল, মূর্ছা যাবার উপক্রম, ভয়ের মধ্যে সম্বিত হারাল না। স্ফটিকের মতো শ্বেত অস্পষ্ট দেহ দেখতে পেল। স্পষ্ট হল ছায়ামূর্তি। ওর মধ্যে করুণ আবেদন খুঁজে পেল, কণ্টকিত শরীর শান্ত হল। মনে হল ওর সঙ্গেই যেন রীতার জীবন-মৃত্যুর পরম প্রয়োজন। ছায়ামূর্তি তখন উধাও হয়ে গিয়েছে। এরপর সে প্রতিদিনই ওকে আশা করেছে। —হোলও তাই, এই ছায়া-প্রভাটি ওর প্রতিদিনকার সঙ্গী হল। দুর্বল মেয়েটিকে একটি ভূত আশ্রয় করে বসল। যাকে আমরা স্পিরিট বলে থাকি। সুবিনয় ঠিক তাই।

রেস্তোরাঁর সব সাক্ষীর কথা মনে করে দেখুন। রীতা চৌধুরীর সঙ্গে কে একজন চা খেতে যেত কেউ সঠিক বলতে পারছে না। রাম নামক রেস্তোরাঁর ছেলেটা সাক্ষ্যতে বলেছে, কে যেন একজন কেবিনে এসে ঢুকে যেত, কখন যে চলে যেত বোঝা যেত না। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ব্যাপার। দিনদুপুরে নয়। ভূত কথাটি বললে আমাদের মাথায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চাপ এসে যায়। কিন্তু ঘটনা এভাবেই ঘটেছে। সবার সাক্ষাতে ঘটেছে, কিন্তু কেউ বুঝতে পারে নি। এ হচ্ছে সুবিনয়।

বিচারক বললেন, সেকি কথা? আপনি ভূতকে দায়ী করতে পারেন কি করে? আইন মানবে কেন?

স্যার, আমার বক্তব্য শেষ হয় নি। আমি আমার যুক্তিগুলো বলছি। বিচার করে দেখন :

প্রথমে, সুবিনয়ের কোন জাগতিক অস্তিত্ব নেই—আমরা দু'পক্ষই মেনে নিয়েছি। মিস্টার দত্ত ভালভাবেই একথা প্রমাণ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, মেয়েটি একা-বাস করত একটি ঘরের মধ্যে। ঘরটি ভূতুড়ে ছিল বলেই বাড়িওয়ালাদের কেউ ওটাতে বাস করতে চাইতো না।

তৃতীয়ত, বাড়িওয়ালা স্বীকার করেছে, ওঘরে একটি লোক কিছুকাল আগে আত্মহত্যা করেছিল।

চতুর্থ, রীতা চৌধুরীকে সতীশচন্দ্র ওই বাড়িতে ভাড়াটে করে দেবার পর থেকে ওরা লক্ষ্য করে আসছিল যে, রীতা চৌধরী কারো সঙ্গে নিভৃতে

লাপ-আলোচনা করছে ? কে সে াত পুরুষ জানবার জন্যে বহুদিন ানরূপ ছুতোয় দরজা খুলিয়ে দেখেছে ওখানে কেউ নেই। শুধু রীতা একা ড়িয়ে হাসছে। কে সে অজ্ঞাত পুরুষ, তার চেহারা ? বুঝতে পারে নি। াশেষে ওরা ধরে নিয়েছিল মেয়েটি ধপাগলা। কারণ সদর দরজা বন্ধ রলে ওঘরে কারো আসবার পথ ই। রীতা চৌধুরী সিঁড়ি-কোঠার ওপর কটি বিচ্ছিন্ন ঘরে বাস করতো, াতে রান্না করতো। শোনা যেত ন্নার সময়েও ও কথা বলে চলেছে। না-রকম অদ্ভুত ব্যবহারও লক্ষ্য করা েত।

পঞ্চম, কিন্তু রীতা চৌধুরী সত্যি াগল ছিল না। সে ছিল টিচার, কবি, িক্ষিকা, আত্মকেন্দ্রিক বা মেলানকলি (melancholy) এবং জীবন সম্বন্ধে পরোয়া।

ষষ্ঠ প্রমাণ, রেস্তোরাঁতে রীতা চৌধুরী যেদিন কেবিনে মারা যায়, দিনও সে লোকটি সে ঘরে এসেছিল। কে কেউ ফিরে যেতে দেখে নি। নামক চাকরটি বলছে, লোকটি খতে দীর্ঘ, রং ফর্সা, বেশ সুন্দর। খন সে যে বেরিয়ে গেল কেউ বুঝতে রে নি। কখন সে কথা বলতো কউ দেখতে পায় নি। চা ও খাবার বিলের ওপর প্রায়ই পড়ে থাকতো। খনো আধখানা খাওয়া। চা ও খাবার বার পর ওঘরে আর কেউ যেতে রতো না। ওরা কেউ আর কোথাও খনো ওকে দেখে নি।

এ্যাডভোকেট সিংহ একটু থেমে বার বললেন, রীতা চৌধুরীর কনডাক্ট ব্যবহারিক চরিত্র সম্বন্ধে যা বুঝেছি কটু বলছি। রীতা জীবন সম্বন্ধে মোটেও রিয়াস ছিল না। কারণ আপনারা ানেন। একটি রিফিউজি মেয়ে তীশচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে কলকাতায় ঠে। সতীশচন্দ্র ওকে স্বতন্ত্র একটি ঘর দিয়ে নিজের অধিকারেই খে। কিন্তু রীতা চৌধুরীর মনে যত শা-আকাঙ্ক্ষা সবই ছিল সুবিনয়কে ঘরে। সুবিনয় মানে হচ্ছে সেই অজ্ঞাত রুষ---যাকে ভূত বলে বলা হয়েছে। িজের দেহটাকে রীতা বয়ে নিয়ে বেড়াত এবং সে সম্বন্ধে কোনো দায়িত্ববোধ ওর ছিল না। দেহের সংস্পর্শে ওকে দায়ী করবার মতো কোন সঙ্গত কারণ আমরা পাচ্ছি না। হতে পারে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে ওর একটা সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষী নেই। শুধু অনুমান।

এ্যাডভোকেট সিংহ যে কথা বলেছেন আমি স্বীকার করি। হয়ত সতীশচন্দ্র গোপনে রীতা চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত ছিল, কারণ রীতার কবিতা মনে করে দেখুন 'সংসটা সত্য হোক মূর্খের কাছে।' তবু সতীশচন্দ্রকে আমরা দায়ী করতে পারছি না। দায়ী রীতা এবং রীতার ভাগ্য।

রীতা চৌধুরী জীবন বা দেহ সম্বন্ধে সচেতন ছিল না বলে অত্যন্ত অসাবধান হয়ে পড়েছিল। ঠিক প্রয়োজন অনুসারে খাওয়া-দাওয়া করতো না। স্কুলে নিয়মিত চাকরিতেও যেত না। শরীরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভেতরে ভেতরে হয়ত হৃদরোগ ছিল। রক্তের চাপের হেরফেরও ছিল বা শরীরে আরো কমপ্লেন—যে সব জানা যায় নি বলে আমরা এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট ধারণা করতে পারছি না। রীতা নিজেই মৃত্যুর কবলে পড়েছিল। পুলিশ সতীশচন্দ্রের সঙ্গে রীতার কোন অবৈধ সম্পর্কের নজির দেখাতে পারে নি। অথচ দেখতে পাচ্ছি রীতার সদ্যমৃত্যুর প্রতীক হচ্ছে ভূত—সুবিনয়। রীতা মৃত্যু চেয়েছিল। সুবিনয় এর কারণ। পূর্বেই এর ব্যাখ্যা করেছি এবং এখন আরও সপ্রমাণ হচ্ছে।

মাননীয় বিচারপতি, আপনি অবাক হয়েছেন ? ভূতের কথা বলা আইনসঙ্গত কিনা—ভাবছেন ? আমি শেক্সপীয়রের মতো কবির কথায় বলছি---'স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না, জীবনে এমন সব অলৌকিক ঘটনা ঘটে।' রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কথা ভাবুন 'সব ঝুঠা হ্যায়।' কিন্তু সবই কি ঝুঠা ? ঝুঠা নয় বলেই সে প্রসঙ্গ এনে সত্য বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন মানুষের অপ্রাকৃত উপলব্ধিকে।

অবশেষে ভাবুন আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা। দেশগাঁয়ে ও শহরেও অনেক সময়ে ভূতের ওঝা ভূত ঝেড়ে মেয়েদের মুক্ত করে। আজকাল এসব চর্চা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমি আরও একটি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে, আমরা সত্যি ভূত বিশ্বাস করে থাকি।

পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্যে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় সেগুলো আলোচনা করে দেখুন। প্রেতের প্রীতির জন্যে খাদ্য-পাদ্য-অর্ঘ সব নিবেদন করা হয়। যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে এ সব পুণ্যকর্ম করেন কি করে ? এসব উড়িয়ে দিতে পারেন না কেন ? বে-আইনী বলে ঘোষণা করতে পারেন না কেন ? অতএব আমাদের অভিজ্ঞতা ও শাস্ত্র ভূত বিশ্বাসের বিরোধী নয়।

এই ক্ষেত্রে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। সুবিনয় নামক ভূতটিই রীতা চৌধুরীর মৃত্যুর জন্যে দায়ী এবং সতীশচন্দ্র সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ্যাডভোকেট সিংহ স্পষ্টভাবে শেষকথাগুলো বলেই বসে পড়লেন। কোর্ট যেন স্তম্ভিত হয়ে রইল। কিছুক্ষণ কোথাও বাক্যস্ফূর্তি হল না।

বিচারক জুরীদের মন্তব্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওদিকে তাকিয়ে বললেন, মাননীয় জুরিগণ, এবারে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। আপনারা শুধু বলবেন সতীশচন্দ্র দাস দোষী কি নির্দোষ। এ্যাডভোকেট মিস্টার সিংহ আপনাদের কিছুটা বিপথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ আইনের চোখে ভৌতিক ব্যাপার স্বীকৃত হতে পারে না।

জুরীদের সকলেই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ভূতের প্রসঙ্গ ওরা বাদ দিতে পারলেন না। বিচারককে জানিয়েও দিলেন যে, ভূতের প্রসঙ্গ বাদ দিতে পারা যাচ্ছে না।

বিচারক বললেন, আপনারা শুধু একটি কথা ভেবে বলুন---সতীশচন্দ্র দাস দোষী কি নির্দোষ।

পরদিন কলকাতার পত্রিকার খবর বেরুল—'ভূতের হাতে কবির মৃত্যু। জজসাহেব কর্তৃক জুরীর সিদ্ধান্ত বাতিল। বিচারকের মতে পুনর্বিচার একান্ত প্রয়োজন।'

(শেষ)

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'বল', আনন্দীরাম নিরুপায়। এখন ওর তালে তাল না দিয়ে উপায় নেই।

'এ হরিণ পুনির জেবন, পুনির প্রাণ। ও উয়াকে না দেখলে জেবন ধরতে লারত, এ হরিণ পুনি বিহনে দিনে আঁধার দেখত।'

আনন্দীরাম নীরব। নির্জন প্রান্তর, কাঁঠালগাছের ছায়া শীতল, ঈশান পুকুরের জলে রোদ চমকায়, নরপতির কথা মুখ থেকে খসে প'ড়ে এই বাতাসে আনন্দীরামের চোখের সামনে পুনির প্রতিমা গড়ে। পূর্ণশশী, লাবণ্য দেখে চোখ জুড়োত, সাদা থানের চেয়েও সাদা মুখ, এক মাথা ঝুমরো চুল, ধীরে এসে দাঁড়াত বিজয়াদশমীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মুখোটি বাড়ির উঠোনে, মনে হত চলমান জ্যোৎস্না এক টুকরো। এ গ্রামের লোক বাল্যবিধবার আচার-আচরণে ত্রুটি পেলে ফোঁস করে, তবু পূর্ণশশীকে সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

'তা দেখ, সে মরতে এ হরিণ রাখা দায় হয়। তাই বনে ছেড়ে দিয়ে আসি, সে আজ বছর ঘুরে গেল। নিত্যি আসে যব, জাঁকড়া, পাকা ধান খায়। আমি মনে বলি উটি পুনির পুষ্যজীব, উ খেলে খাক না কেন।'

'তবে আজ মারলে কেন?'

'আমার শাকের ক্ষেত, চৈতে বেগুন খেয়ে দিল কেন? এই ছাতি-ফাটা খরায় জল সেঁচে আমি ক্ষেত করেছিলাম। ক্ষুর চ'ষে ক্ষেতের আর বাকি রাখে নি কিছু। কলসী বাজাই, বাঁশ ফাটাই, কিছুতে ডরায় না উ। তাই আজ টেঁটা মারলাম। কেও অন্যায় করলে আমি সহজে ভুলি না আনন্দী।'

শেষের কথাটি সহাস্যে বলে নরপতি চাইলে।

আনন্দী ক্ষণেক ভাবলেন। তার-পর ধীরে বললেন, 'নিমলিকে যখন ওরা ধরে তখন তুমি কোথায় ছিলে নরপতি?'

'বাইরে।'

'কেন?'

'বড় আচাজ্জির সর্বনাশ হচ্ছিল দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।' কুণ্ঠাহীন স্বীকারোক্তি।

নরপতির সঙ্গে কথা বলা নিরর্থক, তবু আনন্দীরাম বলেন, 'নিমলি নাবালিকা, তার কি দোষ আছে বল?'

নরপতি তাঁর দিকে চেয়ে বললে, 'বটে। তা এই যে বলে রাঢ়দেশে বামুনসমাজ একজোট নয়, যারা বলে তারা এসে দেখুক কেনে। যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে তারা দেখি সময়মত সবাই একজোট, অঁা? নরপতি ক্যাঙালের ক্যাঙাল, তাকে গুঁড়োতে সবাই লড়ি নিয়ে দাঁড়ালে, মায় তুমি অবধি। বড় আচাজ্জির ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা, তাঁর ঘরে দোষ ঢোকে না, কি বল? বড় আচাজ্জির হয়ে ক্যাঙালের ক্যাঙাল নরপতির দোরে ভিখ মাগে কে? না গাঁয়ের সেরা ছেলে আনন্দীরাম।'

তার গলায় ক্রোধ প্রকাশ পেল।

আনন্দীরাম গোড়া থেকেই জানেন এ মামলা হাজির করবার আগেই তিনি হেরে বসে আছেন, কেন না বিবেকের হাত থেকে রেহাই নেই তাঁর। যার ওপর সবাই মিলে অবিচার করেছেন, তার কাছেই সুবিচারের প্রত্যাশী হলে হিতে বিপরীতই হয়। তবু আবার জোর করে মনে বল আনলেন। একটু উষ্ণ হয়ে বললেন, 'এটা তুমি কি বললে নরপতি? যাদের অবস্থা উঁচু, ধনে মানে বড়, তাদের দিকটাই দেখে সবাই? না না, এটা তুমি ঠিক বল নি।'

তাঁর মনে পড়ল এ দেশ কাঙাল-গরীবের, ব্রাহ্মণ আজও পরের দোরে প্রত্যাশী। তিনি বললেন, 'যতই কলিকাল হোক, যতই হাওয়া পাল্টাক, তবু ভিখিরীকে দু'মুঠো অন্ন সবাই দেয়। বামুন জাতের আর ধন কোথায় বল? তাদের চিরদিনই উনোন জ্বলে, ডোলে চাল থাকে না, তা বলে কি আর কেউ বামুনকে হেয় করে? না না, টাকা যেখানে, জোট সেখানে এ কথাটি তুমি ন্যায্য বল নি।'

'বটে! তা ক্যাঙাল-গরীবের কথা তুমি কি জানবে বল?'

'আহা, আমি বলছিলাম নিমলির কথা---'

'না!'

নরপতির চীৎকারে গাছের ছায়া কাঁপে, পাখি ডাল ছেড়ে আকাশে ওঠে। রাগে তার দু'চোখ টকটকে লাল হয়। সে বলে, 'নিমলির কথা আমার কাছে ব'ল না। কোথায় ছিল তোমার বিবেচনা, মায়া-মমতা, যখন পুনিকে আমার বড় আচাজ্জি শাস্তি দেয়?'

আনন্দীরাম মাথা নীচু করেন। এ অবস্থায় মাথা নীচু হওয়ারই কথা, কেন না পূর্ণশশীর দোষ ছিল সামান্যই। তখন চড়কের সময়। মাঠে বাদিয়ার বাজনা, ভানুমতীর খেলা, বাদিয়ারা তেরো বছরের বালিকাকে ধরে। দোষ যদি কারো থাকে সে বয়সের দোষ। কেন না এ গ্রামে বিধবা আশ্চর্য কঠোরতায় দিন কাটায়। তবু পূর্ণশশীর বয়স মাত্রই তেরো। তাই বাদিয়াদের ডুগ ডুগ বাজনা শুনে তার নাড়ী চঞ্চল হয়েছিল। লুকিয়ে দেখতে গিয়েছিল। তেরো বছরে অন্য মেয়েরা কোলের ছেলেকে চাঁদ দেখিয়ে ঘুম পাড়ায়। পূর্ণশশীর সে পিছটান ছিল না। তা ছাড়া নীচু জাতের পূজুরী বামুন দাদা নরপতি ছাড়া ঘরে এমন কেউ ছিল না যে, শেখায় পুনি, এমন ক'র না, পুনি ওদিকে যেও না।

'এ সব কথা আমি ভাবতে চাই না, এক পাশে পড়ে থাকি, কিন্তু আনন্দীরাম কথা যখন তুললে, তখন জবাব শুনে মাথা নীচু কর না। মাথা নীচু করবে কেন? তোমরা কোন দোষে দোষী নয়, ধনীর দোষ থাকে না, হ্যাঁ।'

নরপতি নিশ্বাস টানে। বলে 'এক দিন বাদে সে ফিরে এল, বড় আচাজ্জি বিধান দিলে ঘৃতপোড়া। এত পা ধরে কাঁদলাম, এত বললাম, প্রাচিত্তিরের বিধান দাও, বোনকে আমি ছাড়তে পারব না, বোন বলতে বোন, মেয়ে বলতে ওই, উ ছাড়া কিছু নাই আমার, শুনলে কেউ?'

আনন্দীরাম নীরব।

'যেমন আচাজ্জি, তেমনি তার বিধান। হা রে পুনি, জিবে তপ্ত ঘি ঢাললে বাঁচে কেও? এমনি করে বিচার হয় সে শুদ্ধ কি না? ভয়ে সে আমার জলে ঝাঁপ দিলে, গ্রামে কেও ছিল না বাপের বেটা, এক ঐ কালী, আর আমাদের সুরকণ্ঠ, কাঁধ দিতে লোক নাই, পুনির জেবনটা যেন বেথায় গেল।'

আনন্দীরামের হৃদয় সহসা সঙ্কুচিত হয়। সুরকণ্ঠ আর কালীশ্বরকে নরপতি তবু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে করে। তাঁর জন্যে শুধু ঘৃণা। 'নরপতি, তখন আমি কিছু বলতে পারি নি---বললে কেউ শুনত না ---বিশ্বাস কর, তারপর থেকে আমি মরমে মরে যাচ্ছি।'

'হা অদেষ্ট!' নরপতি কপাল চাপড়ায়, মহাদুঃখে হাসে। বলে---'বললে কেও শুনবে না, এ ধরে লিয়ে চুপ করে থাকে কেও? জল থেকে তুললেও মানুষ বাঁচবে না। বুঝেও কি কেও বসে বসে মানুষকে ডুবে মরতে দেখে? দোষ ঢাকতে যুক্তি আস্থা বের করেছ হে, তর্কনিধি ঠাকুর!'

আনন্দীরাম কিছু বলতে পারলেন না।

'বড় আচাজ্জি অন্যায় করে আমার বুকে বাঁশ ডলা দেয় নি? আমায় হাতীমাড়া করে নি? আমার বুকটা জ্বলে নি সেদিন? হা সমাজ, পায়ে রাখ বলে এই নরপতিই সেদিন মাথা কোটে নি? বড় আচাজ্জি একটা কথা

সুশীতল আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স
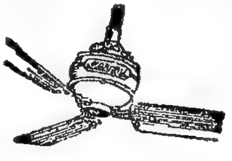
মার্কনী ফ্যান
১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে,
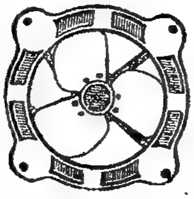
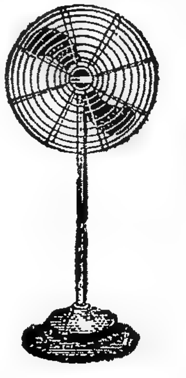

নিয়েছিল কানে? আজ আমি ছাড়ব কেনে? পুনিকে বাদিয়ারা ধরে, তাতে সে নষ্ট হয়, তবে নিমলিকে ধরে বর্গী গয়না কাড়ে, গলায় হাতে কানে হাত দেয়, গয়নার লোভে দৈ-মুড়কী করে, তাতে দোষ হয় না?'

আনন্দীরাম মাথা নাড়লেন। বিষণ্ণ হেসে বললেন 'বলবার কিছুই নেই আমার। তবে তুমি যদি একথা প্রচার কর---'

'বড় আচাজ্জি নিজের মেয়ের বিচারে বসবে!' নরপতি আবার হাসে বলে 'এ ত' ক্যাঙাল নরপতির বোনের বিচার নয়, এ কুলপতির মেয়ের বিচার। ঐ আটচালায় ঝাঁটা জল নেতা পড়বে, পান তামাক দেবে সনাতন, গাঁয়ে ঢোল-ডগর বাজবে।'

'নরপতি, তুমি রাগে উন্মত্ত হয়েছ, এমন করে কেউ প্রতিশোধ নেয় না।'

'আমি নিব। উন্মত্ত হয়েছি কে বললে আনন্দী? আমার মাথা খুব ঠাণ্ডা আছে। জান না, কবে বড় আচাজ্জির বুকে বাঁশডলা দেব সেই আশে আমি জেবন রাখি?'

'কিন্তু নরপতি, তুমি ত এমন ছিলে না?'

'এখন হয়েছি। পুনিকে প্রাচিত্তির করতে দেয় নি আমাকে এক বছর গাঁয়ে পতিত করে রেখেছিল'•••

'সে যে সমাজের বিধান নরপতি।'

'আমায় পতিত ক'রে রেখেছিল এক বছরের জন্যে, তা আমি চির দিনের মত চলে এসেছি আনন্দীরাম। জাতে ত উঠি নি, জাতে নেমেছি। ছিলাম মাহিষ্যদের পুজুরী, এখন বাগদীদের হয়ে শেতলা, ষাঁড়াষষ্টি পুজো করি। বামুন ছিলাম, ব্যাধ হয়েছি। দেখলে না হাসতে হাসতে পোষা জীবটা টেঁটায় ফুঁড়লাম? পরিবর্তন অনেকখানি হয়েছে, এটুখানি নয়।'

'বড় আচাজ্জি কি তোমার ওপর রিষ ক'রে শাস্তি দিয়েছিলেন নরপতি? সমাজের যা বিধান, সেই মত কাজ করেছিলেন।'

'আমিও ত' তাঁদের বিধানমত কাজ করতে যাচ্ছি হে, আমায় তুমি আটকাও কেনে? আমার বোনের যদি দোষ হয়ে থাকে, ত' আচাজ্জির মেয়ে আরো দোষে দোষী।'

'এই এত বড় বিপদ গাঁয়ের উপর দিয়ে গেল, এখন তুমি এ কথাটা তুলবে?'

'কেন, এখন সব ভুলে আমরা এক ঠাঁই হব নাকি? ভাল ভাল।' নরপতি উচ্চকণ্ঠে হাসে। তার হাসি ঝড়ের সঙ্কেতে ভীতপাখির ঝাঁকের মত দূরে দূরে যায়। সে বলে 'বিপদটা হল কেন? ভেবে দেখেছ?'

'কি বলতে চাও?'

'এ বিপদ তুমি আনলে, আমি আনলাম।'

'কি বল তার অর্থ হয় না!'

নরপতি উঠে দাঁড়ায়। উত্তেজনায় তার চোখ জল জল করে, গলার স্বর কাঁপে। সে আঙুল নাচিয়ে বলে 'পাপের ভরা পুণ্ণ হয়েছে আনন্দী-রাম, সুরকণ্ঠের এ কথাটি বেথা যাবার নয়। পাপ সবাই করেছে। বড় আচাজ্জি আমার মত নিদুষীকে মারে, আমি ঐ রাখাল ছোঁড়ার কোঁকে লাথ মারি। সে আমার বোনকে শাস্তি দেয়, আমি তার মেয়েকে কলঙ্ক দেব। তোমরা বসে বসে দেখ, শুধু বসে বসে দেখ, তা এত রকমে ভরা পুণ্ণ হলে দেশে অনর্থ হবে না? এখন আর কি দেখছ? ঐ ঘোড়সেপাইরা নাকে কানে আংটা পরিয়ে তোমাদের ধূলোয় টানবে, হঁ।!'

আনন্দীরাম হাল ছেড়ে দেন। নর-পতিকে যুক্তি দিয়ে বোঝান যাবে না, সে চেষ্টা বৃথা। তবু নরপতি তাঁর মনকে বিচিত্র চিন্তায় ব্যস্ত করে। ওর চোখের দৃষ্টি অস্থির, প্রতিহিংসার জন্যে উন্মাদ হয়েছে ও। কিন্তু এ কেমন করে হল? সমাজ বিধান দেয়, সবাই মাথা পেতে নেয়। এমন করে শোকে অধীর হয় কে? এ রকম প্রতিক্রিয়া আর কারো মধ্যে ত তিনি দেখেন নি। অন্যে পরে কী কথা, তিনি নিজেও কি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিচার মেনে নেন নি? সমাজ শাস্তি দেয়, মানু[illegible] শাস্তি নেয়, শাস্তি দেওয়া উচিত হ[illegible] না অনুচিত, সে কথা ভাবে কে?

নরপতি বললে, 'সমাজ মানুষকে নিয়ে আনন্দীরাম, মানুষে সমা[illegible] গড়ে।'

তার গলা গম্ভীর। আনন্দীরা[illegible] চমকে ওঠেন। তাঁর মনের কথা ও কেম[illegible] করে জানলে? কিন্তু এ ধরণের কথ[illegible] যে নরপতির মুখে নতুন।

'এ শিক্ষা তোমায় দিলে কে?'

'আমার শিক্ষা নাই। পাঠশা[illegible] গুরুমশায়ের বেত ভেঙে সেই [illegible] বেনাবনে পালালাম, আর শিক্ষার ধা[illegible] ধারি নি। এ কথা পাঠশালে কে পড়া[illegible] হে? এ আমাদের সুরকণ্ঠের কথা।'

'ও।' আনন্দীরাম নিমেষে কঠি[illegible] হ'ল। সুরকণ্ঠ তাহ'লে এই স[illegible] করছে, পাগল ক্ষ্যাপাতে ব্যস্ত সাধু-সন্ন্যাসীর পক্ষে এ আচরণ শোভ[illegible] পায় না।

নরপতি অস্থির হয়ে ঘুরতে থা[illegible] বলে, 'আমায় যখন হাতীমাড়া করলে, তখন মনে ছিল না? ওর বুকে আ[illegible] চিতা জেলে দেব, হাঁ। আমার না[illegible] নরপতি, আমি বামুন নই, ব্যাধ অন্যায় যেখানে দেখব, সেই আ[illegible] শাস্তি দেব, হাঁ। আমার কাছে ব[illegible] ছোট মানী ধনীর নিস্তার নাই। হাঁ।'

আনন্দীরামের দিকে চেয়ে [illegible] বলে 'ঘরে যাও তুমি। তোমায় আমা[illegible] কোন কথা বলার নাই, তবে সভা[illegible] যদি বড় আচাজ্জির ধামা ধর[illegible] যাও তুমি, তালে তোমায় আমি ছাড়[illegible] না।'

'অন্যায় যখন করব, তখন তোমা[illegible] ডরাব।' আনন্দীরাম ওঠেন।

নরপতি আবার হাসে। বলে '[illegible] ক'র না মুখোটি। অন্যায় সবাই কর[illegible] কেও পুণ্যশরীর নয়। বেশী গুমে[illegible] যাদের, তাদের শরীরে শনি আ[illegible] পশে। শাস্ত্রে লেখা আছে, হাঁ। যা[illegible] বাড়ি যাও, মাগের আঁচলের নী[illegible] ব'[illegible]

(ক্রমশঃ

গ্রন্থ মেলা

দর্শক ঃ সম্পাদক ঃ রবি মিত্র, দেবকুমার বসু। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ঃ ৩৫ পয়সা।

বাংলা দেশে আজো উৎকৃষ্ট পত্রিকার কদর আছে। তা নইলে 'দর্শকে'র মতো চিন্তাগর্ভ পত্রিকা কিভাবে পঞ্চম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় পদার্পণ করে। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ে আমরা সবিশেষ আনন্দিত। বর্তমান সংখ্যায় মূল্যবান রচনাসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের চিত্র সম্পর্কে অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি। দর্শকের নির্ভীক, বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত নিরপেক্ষ রচনা হচ্ছে—নাট্যসমীক্ষা, বাংলা ছবির দুর্বলতা, উর্ধ্বমুখী মূল্য, যামিনী রায়, গ্রন্থাগার আন্দোলন, ভাস্কর্যে মহাকাশ প্রভৃতি। পত্রিকাটির পাতায় পাতায় স্কেচ ও ছবি। শিল্পীরাও খ্যাতিমান। যেমন, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, এস ভি রামারাও, রমণভাই খাণ্ডুভাই প্যাটেল, ত্রিলোক কাউল, ললিতা লজমি, বাল চাবরা, সতীশ গুজরাল, সুশীল মজুমদার, পোস্তনিকভ, সুব্রহ্মণ্যম, গোপাল ঘোষ প্রমুখ।

ধ্রুপদী ঃ সম্পাদক ঃ সুশীল রায়। ১৩বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-১৯। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

কবিতার এই মাসিক পত্রিকাটির আলোচনায় আমরা প্রতিবারই গর্ব অনুভব করেছি এবং আমাদের আনন্দও জানিয়েছি। এই কার্তিক সংখ্যাটির আয়তন বৃদ্ধি করা হলেও মূল্য বৃদ্ধি পায় নি দেখে আমরা প্রকাশককে অভিনন্দন জানাই। মনে রাখা দরকার, বাংলা দেশে এখন একমাত্র কবিতার পত্রিকা হচ্ছে 'ধ্রুপদী'। এর প্রকাশ অত্যন্ত নিয়মিত, মূল্য অত্যন্ত কম এবং এই পত্রিকা পড়লে বিশ্বের আদি, অতীত ও বর্তমান কাব্যরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে। বর্তমান সংখ্যায় সুশীল রায়-এর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্পর্কিত আলোচনাটি পাঠ করলে অনেকেই নিজেদের ভুল সংশোধন করে নিতে পারবেন। ধ্রুপদীর কবিতাগুলি সর্বোতভাবে বাছাই করা ঃ এতে লিখেছেন—হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী থেকে সুরু করে একালের অনেকেই। অবশ্য শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'বরবাদে'র মতো বাজে কবিতাটি না ছাপাই উচিত ছিল।

বৈতানিক ঃ সম্পাদক ঃ ভবানী মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সনস্ প্রাইভেট লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ঃ দুই টাকা।

সপ্তম সংখ্যক 'বৈতানিকে'র শারদ সাহিত্য সংকলন সুধী পাঠকের

জয়ন্তী সেন

মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, মনোজিৎ বসু প্রমুখের প্রবন্ধে নতুন বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। গল্পে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, খগেন্দ্র দত্ত, মিহির আচার্য, সত্যপ্রিয় ঘোষ, রমাপতি বসু, তারাপদ গাঙ্গুলি উল্লেখ্য হলেও 'কাক' গল্পটি এ বছরের শারদ গল্পসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। গল্পটির গল্পরসই সব নয়, এর মধ্যে বিচ্ছুরিত রয়েছে আশ্চর্য মানবিক জীবনদর্শন। ভবানী মুখোপাধ্যায় অনূদিত গল্পটি চিত্তাকর্ষক। কবিতাগুলি সুলিখিত।

দিগন্ত ঃ সম্পাদিকা ঃ শান্তি দাশগুপ্ত। সহযোগিতায় সন্দীপ সেনগুপ্ত। ৩।১, নফর কোলে রোড, কলকাতা-১৫। মূল্য ঃ তিন টাকা।

শারদীয় 'দিগন্তে' রচনাসমূহের মধ্যে তিনটি সন্দর্ভ, একটি নাটক, তিনটি বড় উপন্যাস (আশাপূর্ণা, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কৃষণ চন্দর), দু'টি বড় গল্প, একটি বিজ্ঞানভিত্তিক বড় গল্প, দশটি ছোট গল্প (বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ) তিনটি সমসাময়িক বিদেশী গল্প, চারটি প্রতিবেশী উপন্যাস, এ ছাড়া হাসির গল্প ও কবিতাগুচ্ছ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুনীলমাধব সেন আধুনিক আর্টের রেখাচিত্রে পৌরাণিক দুর্গার অপূর্ব রূপমূর্ত অঙ্কন করেছেন। 'মিত্রেন'-এর বিংশ-শতকের বর্ণবিদ্বেষ তথ্যপূর্ণ রচনা। পুজোর পরও 'দিগন্ত' একটি সুন্দর সংগ্রহ হিসেবে স্বীকৃত হবে।

উত্তরণ ঃ সম্পাদক ঃ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ২।৮২, নাকতলা গভর্নমেণ্ট স্কীম, কলকাতা-৪৭। মূল্য ঃ এক টাকা।

মার্জিত রুচিসম্পন্ন এই পত্রিকাটির প্রবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের 'মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল' বড়ই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু চিন্তাগর্ভ রচনা। 'লজ্জা' কবিতাটি ছাড়া প্রায় সব কবিতাই সুপাঠ্য। সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীল বসু, দুর্গাদাস সরকার প্রমুখের কবিতা চমৎকার। প্রেমেন্দ্র মিত্র,

সুকুমার রায় প্রমুখের অনূদিত কবিতা পড়ে আনন্দ পেয়েছি।

চিত্রাঙ্গদা ঃ সম্পাদক ঃ অজিত-মোহন গুপ্ত। ৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ঃ তিন টাকা।

শারদীয় 'চিত্রাঙ্গদা' শুধু মূল্যবান রচনাতেই নয়, আয়তনেও আকর্ষণীয়। প্রতিটি লেখার সঙ্গে চিত্রাবলী চমৎকার, ছাপাও সুন্দর। এতে প্রবন্ধ লিখেছেন হরিদাস শাস্ত্রী, বিনয় ঘোষ, হীরেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সহ মোট আট-জন। মৃত্যুঞ্জয় মাইতির নির্বাসিত দিগন্ত উপন্যাসটি পড়ে আমরা খুশি হয়েছি। এ ছাড়া শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিলকুমার চট্টো-পাধ্যায়ের উপন্যাস ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন স্বাদের। চিত্রাঙ্গদায় গল্প লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সুশীল রায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও আশা দেবী প্রমুখ। কবিতায় দুর্গাদাস সরকার, প্রভাকর মাঝি, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনবদ্য।

সাহিত্যতীর্থ ঃ সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক। ৬৭, পাথুরিয়া ঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৬। মূল্য ঃ ১'২৫ পয়সা।

একটি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পূজোর প্রাক্কালে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও এর গৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। এতে প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে ৺শশিভূষণ দাশগুপ্ত, কালিদাস রায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, রণজিৎকুমার সেন প্রমুখের নাম রচনার গুণাবলীর দ্বারা বার বার উল্লিখিত হবে। কুমুদ-রঞ্জন, নরেন্দ্র দেব, বনফুল, হরপ্রসাদ মিত্র, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার, কৃষ্ণ ধর, রমেন্দ্র মল্লিকের কবিতা বিশেষ আকর্ষণীয়। ১১৩ পৃষ্ঠার সনেটটি ভাবহীন, ছন্দহীন। বাণী রায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, শ্যাম রায়, মানবেন্দ্র পাল প্রমুখের গল্প ভালো হয়েছে। মন্মথ রায়ের নাটিকাটি মঞ্চোপযোগী। প্রচ্ছদপট ও অন্যান্য চিত্র সযত্নগ্রথিত।

শর্মিষ্ঠা ঃ সম্পাদিকা ঃ সুচেতা মৈত্র। ৫২ সি, সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা-৫০। মূল্য ঃ এক টাকা।

পত্রিকাটির রচনাগুলি সুমার্জিত ও সুলিখিত। সৎসাহিত্যে সুচেতা মৈত্রের সদাজাগ্রত দৃষ্টি দেখে আমরা আনন্দিত। এতে লিখেছেন তারাশঙ্কর, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শৈলজানন্দ, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ প্রায় ৪০ জন স্বনামধন্য লেখক-লেখিকা।

কথা ও কলম ঃ প্রধান সম্পাদক ঃ হরেন ঘোষ। মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি। মূল্য ঃ ৫০ পয়সা।

সপ্তম বর্ষের 'কথা ও কলমে'র শারদীয় সংখ্যার গল্প লিখেছেন বিমলকুমার ঘোষ, খগেন্দ্র দত্ত, হরেন ঘোষ প্রমুখ। কবিতাগুলিও সুলিখিত। আমার ধারণা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এই পত্রিকাটির অন্যতম সম্পদ হওয়া উচিত ছিল। বহু কিম্বদন্তী ও আঞ্চলিক অলিখিত ইতিহাস যেন 'কথা ও কলমে'র উপাদান হয়।

মঞ্জরী ঃ সম্পাদিকা ঃ আরতি সেন। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। মূল্য ঃ ২'৫০ পয়সা।

পত্রিকাটি প্রতি বছর পূজোর আগে একবার বের হয়। কিন্তু কোনোবারই এর বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয় না। এবার এতে প্রবন্ধ লিখেছেন যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ('বই দিয়ে চিকিৎসা'), নচিকেতা ভরদ্বাজ ('গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রালের কবিতা') ও নকুল চট্টোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সর্বাধিক উল্লেখ্য।

উত্তরসংগি ঃ সম্পাদক ঃ কালিদাস চক্রবর্তী। 'মিলেমিশে' সংস্থার মুখপত্র। শিলিগুড়ি। মূল্য ঃ ১'৫০ পয়সা।

শারদীয় সংখ্যাটির বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। চারুচন্দ্র সান্যাল, নির্মল চৌধুরীর প্রবন্ধ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ছাড়াও নতুন লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ।

অধুনাতন ঃ সম্পাদক ঃ অমিত রায়। ২১৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট। মূল্য ঃ ১'২৫ পয়সা।

শোভন ও রুচিশিল্প প্রচ্ছদ এবং অঙ্গসজ্জার এই শারদীয় সংখ্যাটিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শিবরাম চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, দিনেশ দাস প্রমুখের রচনা রয়েছে।

ছায়ানট ঃ সম্পাদনায় গিরিজা-শঙ্কর মিশ্র, শঙ্কর চক্রবর্তী। ১৩।৩, মাইকেল দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-২৩।

শারদীয় ছায়ানটের অবয়ব বড়ই ক্ষীণ, কিন্তু এর অন্যান্য রচনার কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে, এতে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বুড়ি' কবিতাটি এ বছরের যাবতীয় কবিতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ এই কবিতা। অন্যান্য কবিতা ও প্রবন্ধ এবং গল্প লিখেছেন দুর্গাদাস সরকার, হরেন ঘোষ, মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বৃহংগনা ঃ সম্পাদনায় ঃ রামকুমার পাঠক, অমলকুমার লাহিড়ী। ৫৪, অধরচন্দ্র দাস লেন, কলকাতা-৪। মূল্য ঃ ৬০ পয়সা।

অধিকাংশই নবীন লেখকের রচনা থাকলেও পত্রিকাটিতে আন্তরিকতার ছাপ আছে। তবে অঙ্গসজ্জায় আরো একটু নজর দিলে ভাল হত।

।। প্রকাশকদের প্রতি নিবেদন ।।

পুস্তক প্রকাশকগণের প্রতি আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীতে সমালোচনার জন্যে যাঁরা পুস্তক প্রেরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহপূর্বক অতঃপর নিম্নলিখিত ঠিকানায় দু'খানি করে পুস্তক প্রেরণ করবেন।

সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী,
১, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা—২০।

রাজধানী :

ঋতু বদলের পালা এখন। উত্তর বাংলার চেহারা এর মধ্যেই বদলে গেছে অনেকখানি। শীতের শিহরণ লেগেছে সেখানকার প্রকৃতির বুকে। প্রমোদ ভ্রমণে যাঁরা দার্জিলিং গিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসেছেন শীতের কামড়ে থাকতে না পেরে। দিন ছোট হয়ে আসছে অতি দ্রুতগতিতে। শহর কলকাতাতে শীতের আনাগোনা সুরু হয়েছে। মেঘলা আকাশ ও মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি শীতকে যেন হাত ধরে টেনে আনতে চাইছে। ঋতু পরিবর্তনের মুখে নানা ধরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা ঘোষিত হচ্ছে চারদিক থেকে।

কলকাতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরে শহরবাসীর জন্য নিশ্ছিদ্র খাদ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন, দুধের চালাও ব্যবস্থার জন্য ভাল গরু আমদানী, শহরের বুক থেকে খাটাল তুলে দিয়ে দুধের কলোনীতে গরু নিয়ে যাওয়া, মেজে-ঘষে—প্রয়োজনমত মেরামত করে কলকাতাকে সুন্দরী নগরীতে পরিণত করা, সার্কুলার রেল বসিয়ে যাত্রী-সাধারণের যাতায়াতের কষ্ট লাঘব প্রভৃতি ঘোষণা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় প্রতিটি দিন।

বাজারের রূপ পাল্টে গেছে কিছুটা—নতুন মূলো, পালং, লাউশাক বাজার দখল করে বসেছে। ফুলকপির আমদানী নেহাৎ কম নয়। তবে—এখনও তারা কিশোর—জমাট বেঁধে পূর্ণাবয়ব রূপ পরিগ্রহ করে নি। কিন্তু দাম শুনলে আঁতকে উঠতে হয়। আট আনার কম কেউ বিকোয় না। পালং এসে ঠেকেছে পঞ্চাশ পয়সা কে-জিতে। সস্তায় মিলছে শুধু মূলো-শাক আর লাউ-ডগা। মূলো-শাক এক আনায় চার আঁটি, লাউ ডগা দুটো দু' আনায় পাওয়া যাচ্ছে। আর সব সব্জীই পূজোর আগের বাজার আঁকড়ে ধরে আছে।

চালের বাজার এখনও চড়া। আউশ ধান বাজারে এসে সামান্য কিছুটা পরিবর্তন আনতে-না-আনতে আবার

অন্ধ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করছেন শ্রীঅশোককুমার সেন

চাল ৪৫ টাকায় উঠেছে। ন্যায্য-মূল্যের দোকানের লাইন বড় হচ্ছে প্রতিদিনই। সুষম বণ্টন-ব্যবস্থার অভাবে চাল মিলছে তো গম মিলছে না। আটা, ময়দা, সুজির কোন পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না অধিকাংশ দোকানে। শহর কলকাতা ও গ্রামাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না ঋতু পরিবর্তনের মুখে।

অথচ পশ্চিম বাংলার খাদ্যনীতির জয়ঢাক আবার শোনা গিয়েছে দিল্লীর দরবারে। বাজিয়েছেন খোদ কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী। এর আগেও বারকয়েক পশ্চিম বাংলার গুণকীর্তন শোনা গেছে তাঁর মুখে। তিনি পঞ্চমুখে ঘোষণা করেছেন, কলকাতার সংশোধিত রেশন ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রিত বণ্টন চালু করে সাহস ও উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার সরকার। মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর ভাষণের পরই বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়েছিল শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে। এক দিক দিয়ে, পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতার সম্মান দিয়ে সম্মেলনে সমবেত মুখ্যমন্ত্রীরা উপযুক্ত কাজই করেছেন।

শ্রীসুব্রহ্মণিয়মও এবারে পশ্চিম বাংলার অভিজ্ঞতার কিছু কিছু পরিচয় পেয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন, পশ্চিম বাংলা সরকার নয়া বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যবসায়ীদের কোন সহযোগিতাই পান নি। সাহায্য না করে তারা সমগ্র ব্যবস্থাকে বানচাল করার চেষ্টার কসুর করে নি। তাঁর এ উক্তি সমর্থন করেছেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এখনও পান নি। সে চিত্র হতাশা ও নৈরাশ্যের চিত্র। ব্যবসায়ীরা পশ্চিম বাংলার বণ্টন-ব্যবস্থার সুরুতেই তাকে বানচাল করে দিয়েছে। সরকারের বাঁধা দামে চাল,

তেল, মাছ ও ডালের কোনটাই খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। আটা, ময়দা ও সুজি এখন ন্যায্য-মূল্যের সরকার-অনুমোদিত দোকান ভিন্ন পশ্চিম বাংলার কোথাও কোন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না।

ময়দার বাজার ঠিক রাখার জন্য সরকার জনকয়েক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারও করেছিল। বাকী ব্যবসায়ীদের মাথায় ঝুলছে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকজনের পরিবারে শোকাবহ ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও তারা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আত্মগোপন করে আছে। ময়দার অভাবে রুটির ব্যাপারীদের রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলা থেকে অন্য রাজ্য ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা এবং সেই ব্যর্থতার কালোবাজারীদের ও মজুতদারদের কারসাজির পূর্ণাঙ্গ একটা পরিচয় পেতে পারেন।

• • •

শহর কলকাতার জমাটবাঁধা সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কাছে পেশ করে তার প্রতিকারের জন্য চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রের কাছে বিশ কোটি টাকা দাবি করেছেন। শহর কলকাতার ব্যাধি দীর্ঘদিনের। তার নিরাময়ের প্রয়োজন কথাটাও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে আসছেন। এদিকে পরিকল্পনাও রচনা হচ্ছে একটার পর একটা। টাকার অভাবে, আমলাদের গাফিলতি, নেতাদের উদ্যমহীনতায় কলকাতাকে ব্যাধিমুক্ত করা আজও সম্ভব হয় নি। জলের কলে কেঁচোর সঙ্গে সাপের আবির্ভাব কমছে না, খাটা পায়খানা বহাল তবিয়তে রোগ সংক্রমণে সাহায্য করছে। হুগলী-নদীর বুক ভরে উঠছে পলি মাটিতে। কোন সমস্যারই সমাধান এখনও হয় নি। কলকাতা মেট্রোপলিটান সংস্থা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের খসড়া পরিকল্পনার কাজে হাত দিয়েছেন। পরিকল্পনার খসড়া যাই হোক না কেন, তার রূপায়ণের অর্থ আগে জোগাড় করা আবশ্যক। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেন তাই চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশ কোটি টাকা চেয়েছেন।

কলকাতা উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র। শিল্পাঞ্চলের গুরুত্বে কলকাতা বন্দরের গুরুত্ব সমধিক। ভারতের আর্থিক উন্নয়নের স্বার্থেই কলকাতার রোগমুক্তি, তার সুস্থ দেহ আবশ্যক। আশা করি, পরিকল্পনা কমিশন এ সব দিক বিবেচনা করে কলকাতাকে চাঙ্গা করে তুলতে প্রয়োজনমত অর্থ বরাদ্দে কুণ্ঠিত হবেন না।

• • •

পশ্চিম বাংলা সরকার চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রাজ্যের চাহিদার দিকে নজর রেখে ছয়শ' কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে তিনশ' সত্তর কোটি টাকা। টাকার দিক থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার আকার প্রায় দ্বিগুণ। টাকার অঙ্ক দিয়ে পশ্চিম বাংলার প্রয়োজনের পরিমাপ হতে পারে না—সে কাজ করলে পরিকল্পনাকারগণ অদূরদর্শিতার পরিচয়ই দেবেন। ছোট রাজ্য পশ্চিম বাংলার সমস্যা যে-কোন বড় রাজ্যের চাইতে কম তো নয়ই, বরং বেশি বলা যেতে পারে। বেকার-সমস্যা পশ্চিম বাংলার মত তীব্র আর কারও নয়। নতুন উদ্বাস্তু এসেছে গেল একবছরের মধ্যে পাঁচ লক্ষাধিক। বেকার-সংখ্যা তাতে বেড়ে গিয়েছে বিপুল পরিমাণে। এ সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রয়োজন নয়া শিল্পপত্তনের।

● জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈল মুখার্জী।

চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিকল্পনা কমিশন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন কৃষির উন্নয়নে। কৃষির উন্নয়নের অগ্রাধিকার দেবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলা নতুন শিল্প-সংস্থানের বিষয় উপেক্ষা করতে পারেন না। বেঁচে থাকার তাগিদেই শিল্পের প্রসার পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলেই আমরা মনে করি।

• • •

গত ৩০শে অক্টোবর কলিকাতায় এজরা স্ট্রীটে অন্ধ্র ব্যাঙ্কের শততম শাখার উদ্বোধন হয়। কেন্দ্রীয় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন এর উদ্বোধন করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক স্বর্গত ডঃ পট্টভি সীতারামিয়া এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীসেন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে স্বর্গত নেতার উদ্দেশ্যে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নদীয়া:

নবদ্বীপ শহরে ওলাইচণ্ডী দেবী সম্প্রতি আস্তানা গেড়ে বসেছেন। বারকয়েক ভেদবমি ও পায়খানার পরই অনেকে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। মৃত্যুর হার নেহাৎ কম নয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের তেমন কোন ব্যবস্থা কোন তরফ থেকেই এখনও করা হয় নি। অচিরে এর প্রতিকার না হলে ওলাইচণ্ডী দেবী মহামারী সৃষ্টি করে ছাড়বেন।

গেল ক'টা মাসই কেটেছে তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মধ্যে। সঙ্কট এখনও

হ্রাস পায় নি। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অখাদ্য খেয়ে খেয়ে সকলের যকৃৎ হয়ে পড়েছে দুর্বল। হজমের শক্তি হারাবার সঙ্গে সঙ্গে দেহে রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছে। রক্তহীন দেহে রোগ সংক্রমণ যেমন সহজ, তেমনি রোগে জীবননাশও ঘটে অধিক। তার ওপর আমাদের সরকারের দৌলতে পচা মাছ, অখাদ্য আটা এবং হাঁস-মুরগীর খাওয়ার অযোগ্য চাল মানুষের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষের খাদ্যের অযোগ্য খাদ্যশস্য বিক্রয় এখন আর কোথায়ও বে-আইনী নেই। খাস শহর কলকাতাতেই পুলিশের সামনে নদীয়ার সন্তান মৎস্যমন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের কৃপায় বিক্রি হচ্ছে পচা, দুর্গন্ধ মাছ। সরকারের অনুমোদিত ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে পোকায় খাওয়া, দলা-ধরা, দুর্গন্ধময় চাল সরবরাহ হচ্ছে নির্বিচারে। সে চাল আধাসিদ্ধ হতেই দুর্গন্ধে ঘরে থাকা দায় হয়ে ওঠে। প্রতিবাদ উঠছে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে। কাগজে চালের ছবিও বেরিয়েছে। সরষের তেলের নামে শিয়ালকাঁটার তেল থেকে সুরু করে হোয়াইট অয়েল চলছে বেমালুম। সরকারের পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহিই আজ পর্যন্ত হয় নি। নীরবতায় আমাদের সরকার অত্যন্ত বাহাদুর। সেই সুযোগে গুদাম পচা মাল ফাবার হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভুগছে উদরের পীড়ায়।

উদরের পীড়া এবার পশ্চিম বাংলায় ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। পেটের গোলযোগ বাড়লেই ওলাইচণ্ডী দেবীর পথ হয় প্রশস্ত—সহজেই তিনি প্রবেশ করতে পারেন মানুষের ঘরে। বর্ষা শেষ হতে-না-হতেই মেদিনীপুর, হুগলী, ২৪ পরগণা ও নদীয়ায় তার আবির্ভাব হয়েছে। এখন থেকে ব্যাপক কলেরার প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা সরকার ও স্থানীয় কর্তারা করতে না পারলে পশ্চিম বাংলার গ্রামে গ্রামে এ রোগ ছড়াতে খুব বেশিদিন লাগবে না। আশা করি, সময় থাকতেই আমাদের স্বাস্থ্য-দপ্তর সচেতন হবেন।

* * *

শরৎকাল শেষ হয়ে হেমন্ত এসে পড়েছে। বৃষ্টি কিন্তু যাই যাই করেও যাচ্ছে না। পূজার পরে প্রায় প্রতিদিনই একবার করে বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি না হলে আকাশ থাকছে মুখ ভারী করে। অকাল বর্ষণে বিলম্ব ঘটছে চৈতালী চাষের। ছোলা, গম, সরষের চাষে চাষী হাত দিতে পারছে না। মেঘলা আকাশ পেয়ে দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে চলেছে শস্যনাশক কীটের দল। বৃষ্টিতে কলাই, মুগ প্রভৃতি চাষের ক্ষতিও হচ্ছে প্রভূত পরিমাণে।

* * *

নদীয়ার সীমান্তে পাকিস্তানী দুর্বৃত্তরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

● শ্রীফজলুর রহমান

চাষের বলদ, ক্ষেতের ফসল চুরি যাচ্ছে দিনের পর দিন করিমগঞ্জ, তেহট্ট, চাপড়া প্রভৃতি এলাকার গৃহস্থেরা অসহায় বোধ করছে।

সীমান্ত পুলিশ নিষ্ক্রিয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। চুরির আর্জি পেশ করতে গেলে মানুষকে না কি ভোগ করতে হচ্ছে অশেষ লাঞ্ছনা। শুধু তাই নয়, মোটা অঙ্কের টাকা পেলে চোরাই বলদ ওপার থেকে এসে এপারে হাজির হয়, এরূপ অভিযোগও পাওয়া যাচ্ছে। এ অভিযোগ, সত্য হলে খুবই মারাত্মক। এদের হাতে যে-কোন অপকর্ম সম্ভব। এ-বিষয় অবিলম্বে তদন্ত হওয়া আবশ্যক। স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীঅর্ধেন্দু নস্কর সরেজমিনে এ-বিষয়ে তদন্তে নামলে ভাল করবেন।

অভিযোগের সবটা একেবারে মিথ্যা নয়। সীমান্তপ্রহরীরা সতর্ক হলে করিমগঞ্জ থানার কুলবাড়ি থেকে গেল তিন সপ্তাহের মধ্যে এগারটা মহিষ ও বলদ পাকিস্তানীরা অক্লেশে পাচার করতে পারতো না।

হুগলী :

চুঁচুড়া ও চন্দননগরে কলেরার সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। কলেরার প্রাদুর্ভাবে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। ভেজাল তেল ও পচা মাছ কলেরার বাহন বলে চিকিৎসকরা কেউ কেউ ঘোষণা করেছেন।

কলেরার বিস্তারে জেলা সমাহর্তাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। কলেরার বিরুদ্ধে সংগ্রামের একটি কর্মসূচীও তিনি নিয়েছেন। প্রতিষেধক ইঞ্জেকশনের সাথে সাথে পচা মাছ ও ভেজাল তেল বিক্রি বন্ধ করার কাজও চলেছে কিছু কিছু। এ-কাজটা আগে সুরু করলে বিপদ ঘরের দুয়ারে এসে এমনি করে অতর্কিতে হানা দিতে পারতো না—মানুষকেও দুর্ভোগ ভুগতে হতো না। রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগের প্রতিরোধের কাজটা সহজ জেনেও আমাদের কর্তাব্যক্তিরা সময় থাকতে কাজে নামতে চান না। বিপদ তাতেই বাড়ে বেশি করে।

পচা মাছ রাখার অভিযোগে একজন আড়তদার গ্রেপ্তার হয়েছে। কয়েক বালতি ভেজাল দুধও নষ্ট করা হয়েছে। সরষের তেলের নমুনা গ্রহণের কাজে লেগে পড়েছেন কর্মীরা। হুগলীর সমাহর্তার কাজে অন্যান্য জেলার শাসকদের চেতনার উদ্রেক হলে শীতের সময় কলেরার আক্রমণ থেকে পশ্চিম বাংলার পল্লী অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করা অসম্ভব হবে না।

চব্বিশ পরগণা :

চব্বিশ পরগণার উত্তরাঞ্চলে আউশ ধানের খবর আমরা গেল সপ্তাহেও দিয়েছি। এক দশকের মধ্যে এমন ফলন নাকি হয় নি। পঞ্চান্ন হাজার একর জমিতে এবার আউশ ফলেছে। সরকারী হিসেব এখনও পাওয়া যায় নি। সাধারণ মানুষ ও বিশেষজ্ঞদের ধারণা কম হলেও সাড়ে ছ' লক্ষ মণ আউশ ধান উৎপন্ন হয়েছে এ বছর।

বণ্টন ও সংগ্রহ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হলে, অতি মুনাফালোভী মজুতদার ও পাইকারদের বেপরোয়া গতিবিধি—প্রতিরোধের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকলে মা-লক্ষ্মী ভাণ্ডার উজাড় করে দিলেও কৃত্রিম অভাব হতে বাধা। হয়েছেও তাই। পর্যাপ্ত পরিমাণ আউশ হওয়া সত্ত্বেও বারাসতের মানুষ আজ অভুক্ত।

খোলা বাজারে চাল পাওয়া দুষ্কর। রাস্তার আশে-পাশে সামান্য পরিমাণ চাল মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। দাম তার অত্যন্ত চড়া। রেশনে চাল পেতে হলে মাঝরাত্রে নিদ্রাসুখ ত্যাগ করে এসে দাঁড়াতে হয় লাইনে। দোকানের মজুত মাল ফুরিয়ে গেলে ফিরতে হয় শূন্য থলি নিয়ে। ন্যায্য-মূল্যের দোকানের ক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তিরা আবার সাম্যের নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। দশজনের পরিবারের কার্ড এবং তিনজনের পরিবারের কার্ডের পার্থক্য গেছে ঘুচে। চাল সরবরাহ হচ্ছে কার্ড পিছু পাঁচ কে-জি। গমের বালাই নেই। আটা মিললে মিলতেও পারে। সে আটায় ভুষির ভাগই বেশি। বারাসতের মানুষ আজ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। তারা ভেবে পাচ্ছে না, আউশ ধান হওয়া সত্ত্বেও তাদের এত দুর্ভোগ কেন।

পশ্চিম দিনাজপুর :

বছর কয়েক হল লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে পশু-হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বালুরঘাটে। হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় গ্রামের মানুষ খুবই উৎফুল্ল হয়েছিল। হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় তারা এখন অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছে। সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে রোগগ্রস্ত গৃহ-পালিত পশু নিয়ে আসে হাসপাতালে। ওষুধের অভাবে হাসপাতালের কর্মীরা কোন সাহায্যই করতে পারে না। আবার দীর্ঘপথ টেনে নিয়ে যেতে হয় রোগাক্রান্ত দুর্বল পশুকে। অনেক সময় ফিরতি পথেই সেগুলো মরে যায়। হাসপাতালে নাকি অতি সাধারণ ওষুধও প্রায়ই থাকে না।

হাসপাতালে বছরে একবার করে নাকি ওষুধপত্র সরবরাহের নিয়ম। তাও নিয়মমাফিক আসে না। বারবার আবেদন-নিবেদনেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না পশ্চিম বাংলার পশু-দপ্তরের কর্তাদের কাছ থেকে। কর্মীরা জরুরী প্রয়োজনে পাশের জেলা থেকে সময় সময় কিছু পরিমাণ ওষুধ এনে কাজ চালাচ্ছেন। বেশ কিছুদিন হ'ল হাসপাতালে কোন ওষুধই নেই।

পশুপালন-দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীফজলুর রহমানের দৃষ্টি আমরা এই হাসপাতালটির প্রতি আকর্ষণ করছি। তিনি মাছ ও দুধের ব্যাপারে ব্যর্থতার প্রমাণ দিলেও সর্বক্ষেত্রে একই ফল হবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

পশ্চিম বাংলার গো-জাতির উন্নতি সরকারের দীর্ঘকালের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা রূপায়ণে এবং কলকাতার দুধের চাহিদা মেটাবার জন্যই হরিণঘাটার গোশালা ও দুগ্ধ কলোনী। কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের দ্বারা গো-সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনাও বহুকালের। মফস্বলের প্রতিটি হাসপাতালেই কৃত্রিম উপায়ে গো-প্রজননের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথাও রয়েছে। বালুরঘাটের মানুষ সেখানকার পশু-হাসপাতালে একটি অনুরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আবেদন পেশ করে আসছে দীর্ঘকাল থেকে। কেন্দ্র খোলার কোন বাধা থাকলে তাও সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দিতে পারতেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ সেই আশাই করে।

পুরুলিয়া :

বিহার থেকে বেরিয়ে এসে পশ্চিম বাংলার কোলে ঠাঁই পেলেও পুরুলিয়া এখনও সাবালক হয়ে উঠতে পারে নি। লাক্ষা পুরুলিয়ার বড় সম্পদ। বেশ কিছুদিন লাক্ষা-শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলে পুরুলিয়ার অভাব মোচনের জল্পনা-কল্পনা চলেছিল সরকারী পর্যায়ে। আজ পর্যন্ত তা' বাস্তবরূপ নেয় নি। পুরুলিয়ার সম্পদের একেবারে অভাব, এমনও নয়। কিন্তু সরকার পুরুলিয়া সম্পর্কে যেন কিছুটা উদাসীন। স্থানীয় লোক মনে করে, তারা অবহেলিত ও অনাদৃত। তাদের দুঃখ দূর করার কোন চেষ্টা সরকার করছেন না। পূজার সময়েও সরকারের কাছ থেকে ক্ষুধার অন্ন তারা পায় নি।

পুরুলিয়ার মানুষ তাই সুরু করেছে ক্ষুধামুক্তির আন্দোলন। পাঁচদিন লোকসেবক সঙ্ঘের আহ্বানে সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদে গণ-অনশন হয়ে গেল। মঙ্গলবারে শেষ হয়েছে অনশন সত্যাগ্রহ। সঙ্ঘের পরিচালিকা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের নেত্রীত্বে জনশক্তির জয় ঘোষণা করেছেন কাছারির প্রাঙ্গণে সত্যাগ্রহীরা। বিধানসভার সদস্য শ্রীগিরিশ মাহাতো, শ্রীঅদ্বৈত মণ্ডল, শ্রীকেন্দু মাঝি, শ্রীপদক মাহাতো, শ্রীভজহরি মাহাতো (এম-পি) এবং শ্রীঅরুণ ঘোষ প্রমুখ আট শ' সত্যাগ্রহী অনশনে যোগ দিয়েছিলেন। অপরাপর বামপন্থী দলও এ আন্দোলন সমর্থন করেছে।

মজুতদারী, চোরাকারবার, দুর্নীতি প্রভৃতি বন্ধ, পুরুলিয়ার প্রতি বিমাতৃ-সুলভ মনোভাব পরিহার, নতুন ফসল ন্যায়সঙ্গত মূল্যে চাষীর কাছ থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা, অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ ও আন্দোলন দমনে অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত প্রভৃতি নয় দফা দাবি সত্যাগ্রহীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ খাঁটি গান্ধীবাদী। প্রতিদিন ভোরে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতির সামনে প্রার্থনায়

পরেই সত্যাগ্রহীরা দিনের কাজ শুরু করতেন। সারাদিন ধরে চলতো ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও সূতাকাটা। সন্ধ্যায় মনমাতানো আওয়াজ উঠতো আদিবাসীদের মাদলে। পাঁচদিন পাঁচ রাত্রি হিম ও দুপুরের প্রখর তাপ উপেক্ষা করে তাঁরা যে কৃচ্ছ্র সাধন করলেন, তাতে সরকারের খাদ্য-দপ্তরের ঝিমুনি কাটলেই সত্যাগ্রহ সার্থক হবে। বর্তমানে যাঁরা গদীতে বসে জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের অনেকেই শ্রীমতী ঘোষের সহকর্মী। আজ তাঁর আবেদনে সহকর্মীরা সাড়া দিলেই পুরুলিয়ার চেহারা ফিরে যেতে পারে।

কোচবিহার :

চীনা গুপ্তচরের দল যারা উত্তর বাংলায় জাল বিস্তার করে চলেছে। সীমান্ত এলাকাতেই নাকি এরা অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা গোপনে সামরিক-ঘাঁটির সংবাদ সংগ্রহ করছে এবং সুযোগমত তার ছবিও তুলে নিচ্ছে।

সম্প্রতি কোচবিহার বিমানঘাঁটির সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে আলোকচিত্র গ্রহণের সময় একজন ধরাও পড়েছে। ধৃত ব্যক্তি নিজেকে চীনের চর বলে স্বীকারও নাকি করেছে। ঘটনার দিন সে কলকাতা থেকে বিমানে কোচবিহার পৌঁচেছিল। ভারতরক্ষা আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তার ক্যামেরাটিও আটক রাখা হয়েছে।

বর্ধমান :

জাহান্নগর অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধানদের জান নিয়ে সেদিন টান পড়েছিল। উত্তেজিত আফিস কক্ষের মধ্যে ঢুকে প্রহার করেছে সম্পাদক শ্রীগিরীন্দ্র নাথকে। অঞ্চল-প্রধান শ্রীসুজিৎ মুন্সিও নাকি কিঞ্চিৎ লাঞ্ছিত হয়েছেন।

অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আফিসে সরকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে তিন সপ্তাহ পর গেল ১০ই অক্টোবর বিলি হচ্ছিল খয়রাতি সাহায্য। তিন সপ্তাহ সাহায্য না পেয়ে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল। তার ওপর গম না দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল নগদ টাকা। সে টাকাটাও নিয়ম অনুযায়ী দিলে হয়তো এ অবস্থার সৃষ্টি হতো না। যারা দীর্ঘকাল সাহায্য পেয়ে আসছে, সাহায্য প্রাপ্তির আশায় অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আফিসে এসে শুনতে পেলো, তারা বাদ পড়েছে সাহায্যের তালিকা থেকে। অঞ্চল-প্রধানের কাছে গিয়ে এ অঘটনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনিও কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি। এর মধ্যে গুজব রটে যায়, নাম কাটার জন্য দায়ী পঞ্চায়েতের সম্পাদক। সাহায্যপ্রার্থীর মধ্যে মহিলার সংখ্যাই ছিল বেশি। প্রতিকারের কোন উপায় নেই দেখে দীর্ঘ সময় বাদানুবাদের পর এরা হয়ে ওঠে মারমুখী।

পঞ্চায়েতের কক্ষে তখন চলছিল অধিবেশন। উত্তেজিত জনতা কক্ষে প্রবেশ করে শ্রীগিরীন্দ্র নাথের ওপরই আক্রমণ চালায়। পুলিশ এসে পড়ে পঞ্চায়েতের একজন সদস্যসহ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে, অথচ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে উক্ত সদস্য উত্তেজিত জনতাকে না ঠেকালে অবস্থা আরও গুরুতর হ'ত।

পঞ্চায়েতী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামের মানুষ পাবে ন্যায় বিচার—গ্রামের সামগ্রিক কল্যাণ আসবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, ঘুচবে দরিদ্রের দুঃখ। —এ সব কথাই এতদিন প্রচার করা হয়েছে। জাহান্নগরের পঞ্চায়েতের কর্তাদের কাণ্ড দেখে মনে হয় পঞ্চায়েতের হাতে পড়ে গ্রামগুলি একদিন জাহান্নমেই যাবে। পঞ্চায়েতের শাসন দলগত স্বার্থে কারও খেয়াল-খুশিমত চললে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে আরও বেশি করে। এসব সম্ভাবনার প্রতি আমরা অনেক আগেই নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। দেখা যাচ্ছে, জাহান্নগরের পঞ্চায়েতের প্রধানেরা দলগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে পারেন নি। পারলে এ অঘটন ঘটতো না—কোন প্রকার কারণ না দেখিয়ে তালিকা থেকে বেছে বেছে কিছু লোকের নামও বাদ দেওয়া হতো না।

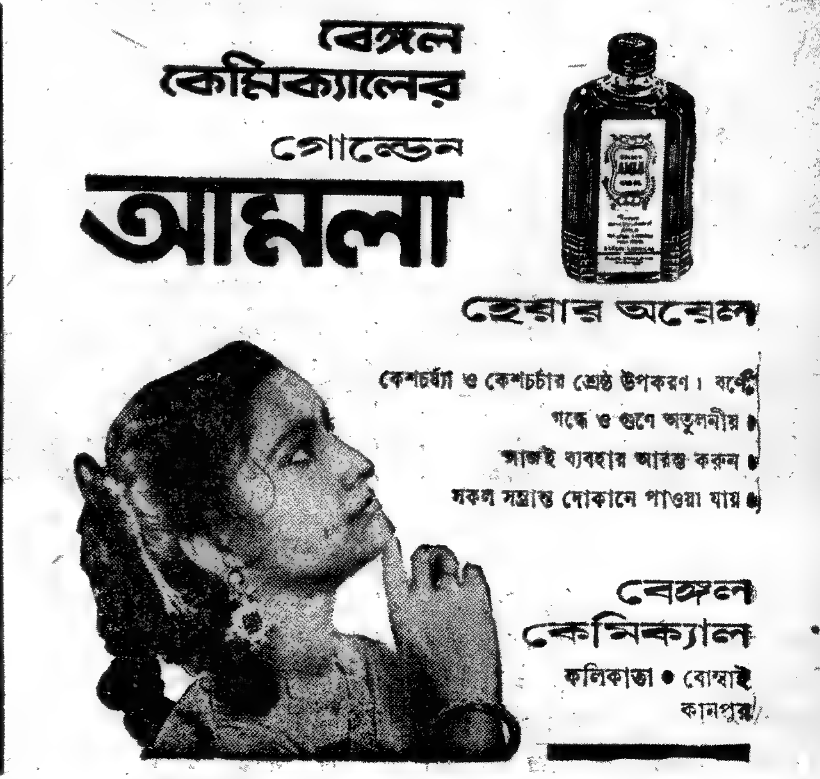

চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শিশিরকুমার প্রযোজিত 'পরিচয়' নাটকে অবৈধ সন্তানের যে সমস্যাকে আনা হলো, তারও সমাধান খোঁজা হলো পুরনো সমাজ কাঠামোরই মধ্যে। তার ফলে নাটকের পরিণতি ঘটলো এক করুণ অবস্থার মধ্যে, ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠলো না।

শ্রীরঙ্গমে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'মাইকেল'। কিন্তু 'মাইকেল' শিশির-কুমারের অভিনয়প্রসাদে মঞ্চ-সফল হলেও কোনো একটি যুগের সত্যকে স্পষ্ট করে মঞ্চে তুলে ধরতে পারে নি। এই নাটকে মাইকেলের ব্যক্তিসত্তা যতখানি প্রকাশ পেয়েছে, যুগসত্তা ততখানি প্রকাশ পায় নি। পাশ্চাত্য দেশের বৈভব ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মাইকেল। তাই তাঁর মন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল আমাদের দেশের সামন্ততান্ত্রিক জরাজীর্ণ জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। ঐশ্বর্যশালিনী ভারতভূমির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি, তারই রূপ দিয়েছিলেন তাঁর 'মেঘনাদবধ' কাব্যে স্বর্ণলঙ্কার বর্ণনায়। অথচ 'মাইকেল' নাটকে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে যতখানি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, বিপরীত ভাবধারার সংঘাতকে ততখানি প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। তার ফলে নাটক দেখা বা পড়ার পরে ব্যক্তি মাইকেলের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্যে মনে যতটা করুণার সঞ্চার হয়, তাঁর বিদ্রোহী সত্তার জন্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার মন ততখানি আপ্লুত হয় না। অথচ মাইকেলের জীবনে ট্র্যাজেডির সমস্ত উপকরণই রয়েছে।

সমসাময়িক ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা ছেড়ে দিলেও জালিনওয়ালাবাগের ঘটনার পর ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতের বুকে এমন কতকগুলো বিরাট ঘটনা ঘটে যেগুলোর প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষেরও ওপর পড়ে। জালিনওয়ালা-বাগ ঘটনার পর সারা ভারতব্যাপী যে সর্বাত্মক হরতাল হয় তা থেকেই জন্ম নেয় অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলন ভারতের নারীসমাজে এক বিপ্লব এনে দেয়। সাধারণ ঘরের নারীরাও গৃহকোণ ছেড়ে এসে যোগ দেয় রাজনৈতিক আন্দোলনে। পারিবারিক কর্তব্যের বাইরেও যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য পালনের দায়িত্ব রয়েছে নারীসমাজেরও, এই নতুন উপলব্ধি আসে তাদের জীবনে। নারীসমাজের এই নতুন জীবনোপলব্ধি এক বিরাট পরিবর্তন। তারপর দেখা যায়, এই সময়েই ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও বড় রকমের আলোড়ন আসে। জগদ্দল চটকলসমূহে ব্যাপক ধর্মঘট ; বোম্বাই, আমেদাবাদ ও কানপুরের সুতাকল ও কাপড়ের কলগুলোতে শ্রমিক ধর্মঘট ; দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনা। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনও এই সময়েই গড়ে ওঠে। কৃষক শ্রেণীর মধ্যেও এ সময় একটা নতুন চেতনা আসে। জমিদার, জোতদার ও মহাজন শ্রেণীর শোষণ থেকে মুক্তি পাবার আশায় তারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে এবং নানা স্থানে নানা রূপে সংগ্রাম চলে যার ফলে বিভিন্ন প্রদেশে বারকতক প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্তিত করতে হয়। ভারতের সামন্ত নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিতেও এই সময়েই প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত।

এ সমস্ত আন্দোলনের ফলে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন মানসের সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে থাকে। বাংলা দেশের পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটকগুলোতে সমকালীন এ সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার প্রভাব কই? অথচ উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্য অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যায়, এই ধরণের বৃহৎ কোনো সামাজিক পরিবর্তনের পূর্বাভাষ প্রথমে দিয়েছিলেন নাট্যকারগণই। পারিবারিক গণ্ডি থেকে বৃহত্তর সামাজিক কর্মক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেছিলেন ইবসেন 'দি ডল্‌স্ হাউস' নাটকের নোরা চরিত্র সৃষ্টি করে। রাশিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার অবসান ও শিল্পবিপ্লবের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছিলেন চেকভ 'দি চেরী অর্চার্ড' নাটক লিখে। ইংলণ্ডের শ্রমিক অশান্তিকে রূপ দিয়েছিলেন গল্‌স্‌ওয়ার্দি তাঁর 'দি স্ট্রাইক' নাটকে। সুইডেনের স্ট্রিনবার্গ 'মিস জুলী' নাটক লিখে অভিজাত শ্রেণীর মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। বাংলা দেশে তেমন যুগের বার্তাবহ নাটক কোথায়? আমাদের মঞ্চে দেশপ্রেম প্রচারের প্রধান সম্বল সেদিনও পর্যন্ত ছিল টডের রাজস্থান।

নাট্যক্ষেত্রে এই পৌনঃপুনিকতা, স্রোতরুদ্ধতা ও জীবনবিমুখতার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এলো চল্লিশোত্তর বাংলা নাটক। আলোচিত রবীন্দ্র-নাট্যে যুগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলেও সেগুলিকে ঠিক জীবনধর্মী নাটক বলা যায় না এই কারণে যে, সমসাময়িক জীবনকে উপজীব্য করে তিনি সে সব নাটক লেখেন নি। কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে কোথাও সঙ্কেতে, কোথাও প্রতীকে, কোথাও রূপকে তিনি এ-যুগের সমস্যা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন। নাট্যসাহিত্যরূপে সেগুলি দিঙ্‌নির্ণয়

মঞ্চের কাজ করলেও মঞ্চে সেগুলির সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠতে প্রবল অন্তরায় আছে। আধার ও আধেয় এক না হলে দৃশ্যকাব্য জনচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করে না। কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করাই নাটকের লক্ষ্য নয়; হৃদয়বৃত্তিকে আলোড়িত করাও তার ধর্ম। এই দু-এর ভারসাম্য থাকলেই উৎকৃষ্ট নাটক হয়। আধুনিক বাংলা নাটকের পথপ্রদর্শক রবীন্দ্রনাথ, একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেও বলবো, তাঁর নাটক আমাদের মস্তিষ্ককে যতখানি নাড়া দেয়, হৃদয়কে ততখানি মথিত করে না। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাট্যচিন্তায় যে পথের নিশানা দিয়ে গেছেন সেই পথ ধরেই যে চল্লিশের বাংলার নাটক এগিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন:

'যে আছে মাটির কাছাকাছি
তারই লাগি কান পেতে আছি।'

সেই মাটির কাছাকাছি যারা আছে, তারাই স্থান পেয়েছে এ যুগের নাটকে। বক্তব্য ও উপজীব্য এক হতে পেরেছে। চাষীর কথা চাষীই বলছে, মজুরের কথা মজুরই বলছে, ভিখিরির কথা ভিখিরিই বলছে। এবং তারা বলছে স্ব স্ব ভঙ্গিতে নিজ নিজ ভাষায়। মাঠের ভাষা নাগরিক সংস্পর্শে কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠে নি। এই যে বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের সৌসাদৃশ্য, একেই কেউ বলছেন রিয়ালিজম, কেউ বলছেন ন্যাচারেলিজম। আবার অতি-আধুনিকরা বলছেন নিও-রিয়ালিজম। যে নামই দেওয়া হোক, বিষয়বস্তু ও রূপকর্মের এই সৌসাদৃশ্য হবার ফলে আধুনিক বাংলা নাটকের চরিত্রগুলিকে যে দর্শকরা অনেক বেশি কাছের মানুষ হিসেবে পেয়েছেন, এ সম্বন্ধে বোধহয় দ্বিমত নেই। ফলে নাটকের চরিত্রের সঙ্গে দর্শকের প্রত্যক্ষ হৃদয়সেতু স্থাপিত হতে পেরেছে। তা যদি না হতো, তবে প্রায় মঞ্চহীন অবস্থায় অপেশাদার মহলের নাটকগুলো কুড়ি বছর ধরে নাট্যজগতে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারতো না। মোট কথা, মাইকেল 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এ যে রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, বহু বছর পরে এ যুগের বাংলা নাটকে এসে তা পরিপুষ্ট হয়েছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

এ গেল নাট্যরচনা-রীতির কথা। এবার দেখা যেতে পারে, যুগের কি কি সমস্যা ও লক্ষণ আধুনিক নাটকে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে যে ক'টি অধ্যায়ের দিকে আমাদের প্রথমেই নজর পড়ে—সেগুলো হচ্ছে: (১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; (২) পঞ্চাশের মন্বন্তর; (৩) ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম; (৪) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগ; (৫) ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও (৬) স্বাধীনতা লাভের পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসের সংগ্রাম।

অকপটে বলা যায়, জাতির এই সমস্ত সংকট, আঘাত ও সংগ্রামেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় চল্লিশোত্তর বাংলা নাটকে। সব নাটকের বিশ্লেষণ করা এখানে সম্ভব নয়। শুধু দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু নাটক সম্বন্ধে দু-চার কথা বললেই বোধহয় যথেষ্ট হবে।

বলা বাহুল্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই

প্রত্যক্ষ ফল মনুষ্যসৃষ্ট পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই মন্বন্তরে সর্বাপেক্ষা দুর্গত হয়েছিল অন্নদাতা কৃষকসমাজ। 'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কৃষকদের দুঃসহ দুর্গতির চিত্র নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। কেবল দুর্গতির চিত্র এঁকেই নাট্যকার ক্ষান্ত হন নি, নাটকের উপসংহারে তিনি কৃষকদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের সংকল্প জাগিয়েছেন।

কলকাতার পথে অসহায়তার অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামে ফিরে এসে কৃষকদের এই আত্মনির্ভরতার সংকল্প একটি গণচেতনাকেই প্রকাশ করেছে। অন্ধকারেও জীবনপ্রত্যয় এনে দেওয়া যদি হয় মহৎ শিল্পের লক্ষণ, তবে সেই লক্ষণ 'নবান্ন' নাটকে উপস্থিত। 'নবান্ন'র রচনা-সৌষ্ঠব নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু যত মতভেদই থাক, সমসাময়িক প্রচলিত মঞ্চনাটক থেকে তার গঠনপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, একথা স্বীকার করতেই হবে। দর্শকদের তরল আনন্দ দেবার জন্যে নাটকে বাহুল্য কিছু নেই— বিষয়বস্তুর প্রতি একাগ্রতা ও গভীর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে 'নবান্নে' একটিমাত্র ত্রুটি রয়েছে। সেই মন্বন্তর যে যুদ্ধেরই সৃষ্টি, একথাটি নাটকে কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'দীপশিখা' বোধহয় অধিকতর ইতিহাসসম্মত। তাতে দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রয়েছে যুদ্ধ।

'দুঃখীর ইমান' মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত হলেও তার চরিত্র আলাদা। নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে মূলত ব্যক্তির নীতিবোধ ও হৃদয়াবেগের ওপর। পুরনো মূল্যবোধকে নতুন পরিবেশে যাচাই করে নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নাটকটি একান্তভাবে বিষয়ানুগ না হওয়ার এবং কাহিনী-বিন্যাসে পেশাদার মঞ্চঘেঁষা নাটকের মতো বিষয়ান্তর ঘটায় 'দুঃখীর ইমান' দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্রের সামনে দর্শকদের নিয়ে দাঁড় করাতে পারে না। এদিক দিয়ে 'নবান্ন'র vividness ও intensity অনেক বেশি। তবে মানবিক আবেদনে 'দুঃখীর ইমান' অতুলনীয়।

সমসাময়িক ঘটনা ও জীবন নিয়ে রচিত হলেও আলোচ্যকালে কতকগুলি নাটক যে বৈশিষ্ট্য নিয়ে এসেছে, এবার সংক্ষেপে তারই পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। আপাতদৃষ্টিতে সেসব নাটক তাৎক্ষণিক মনে হলেও একটু বিশ্লেষণ করলেই সেগুলির মধ্যে ভবিষ্যতের ইংগিত পাওয়া যায়।

ভারতের মুক্তিযুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত প্রথম বাংলা নাটক 'তরঙ্গ' বিশ্লেষণ করলেই আপনারা দেখতে পাবেন, পরাধীন ভারতে সমাজের নীচের তলার শোষিত মানুষ স্বাধীন ভারতে শোষণমুক্ত জীবনের যে স্বপ্ন দেখত, তাই রয়েছে সংগ্রামী মানুষগুলোর মানসপটে। এই কারণে 'তরঙ্গ' শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের চিত্র হয়েই থেমে যায় নি, ভাবী ভারতের জাতীয় সমস্যার ওপরও অনেকখানি আলোকপাত করেছে।

'বাস্তুভিটা' নাটকে দেশ-বিভাগের দরুণ বাস্তুত্যাগের মর্মান্তিক বেদনা প্রকাশ পেলেও একটি চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্যই তাতে ধরা দিয়েছে। যুগে যুগে ধর্ম নিয়ে হানাহানি, রক্তারক্তি হলেও দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশী হয়ে পাশাপাশি বাস করে। ধর্মের উত্তেজনা সাময়িক; কিন্তু মানবজাতির পারস্পরিক সান্নিধ্য কামনা চিরন্তন।

'নতুন ইহুদী'র প্রারম্ভে এবং 'দিনান্তের আগুন'-এর পরিণতিতে ক্ষীণ হলেও এই সত্যের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে। বিংশ শতকেও প্রায় সামন্ত-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে কৃষকশোষণ কিভাবে কায়েম থাকতে পারে—তারই নগ্নচিত্র 'ছেঁড়া তার'। কিন্তু 'ছেঁড়া তার'-এ যদি শুধু এই শোষণের চিত্রই থাকতো, তবে আবেদনের দিক দিয়ে নাটকটি হয়তো সর্বজনীনতা হারিয়ে ফেলতো। নাটকের মূল্য বেড়েছে সেখানে যেখানে জীবনসত্য ও সংস্কার এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। রহিমদ্দি জীবনসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, আর ফুলজান সহজাত ধর্মবোধের কাছে অন্তরের সত্যকে বলি দেয়। তাই রহিমদ্দির আত্মহত্যা অনড় মুসলিম সমাজ-বিধানের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ আছে বলেই 'ছেঁড়া তার' গতিশীল নাটক।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে 'মশাল' নাটকে। কিন্তু শুধু দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্রই যদি থাকতো, তবে এ নাটক বীভৎসরসের আধার হতো এবং লোকের বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। দাঙ্গার শিকার হয়েও এ নাটকের ললিতা চরিত্র এক সর্বকালীন সর্বজনীন মা। দাঙ্গায় নিজের সন্তানকে হারিয়েও সে যখন তার আশ্রিত মুসলমান বালককে গুণ্ডার কবল থেকে রক্ষা করতে না পেরে—হৃদয়বিদারক আর্তনাদ করে ওঠে, তখন হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক চিরন্তনী মানবী মূর্তি। প্রচণ্ড শোকে বিহ্বল ললিতা যখন দাঙ্গা প্রতিরোধে ব্যর্থতার জন্যে তার ভাইকে তিরস্কার করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই সে 'রক্তকরবী'র নন্দিনীর আত্মজা হয়ে যায়। তফাৎ শুধু, নন্দিনী আমাদের ভাবজগতের প্রতিমা, আর ললিতা আমাদের কাছের চিরপরিচিত সাধারণ একটি রমণী।

'সৌ-চোর' নাটকে যখন আমরা দেখি, বংশী বাউলই কুসংস্কারের সমস্ত মাদুলি অঙ্গে ধারণ করেও বাঘে-ছোঁয়া রতনকে গহনারণ্যে ফেলে আসতে পারে না, তখন আমাদের মন এক অপূর্ব মানবিক উপলব্ধিতে পুলকিত হয়ে ওঠে, আর সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে হয় নাট্যকারকে জীবনের প্রচণ্ড গতির প্রতি তাঁর আস্থা দেখে।

(ক্রমশঃ)

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ করা হোক

বাংলা চলচ্চিত্রের সঙ্কট এবং সঙ্কটত্রাণের পথ নির্ণয়ের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। একবছর আগে সেই তদন্ত কমিটীর কাজ শেষ হয়েছে এবং কমিটীর চেয়ারম্যান শ্রীসেন সঙ্কটত্রাণের উপায় সম্পর্কে তাঁর সুপারিশসহ রিপোর্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারের নিকট পেশ করেছেন। সেই রিপোর্ট এখনো রাইটার্স বিল্ডিং-এ ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। ইতোপূর্বে সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমরা এই রিপোর্ট প্রকাশ ও সুপারিশসমূহ কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। সম্প্রতি দৈনিক বসুমতীতেও এ-সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। সিনেমা সংশ্লিষ্ট মহল এবং বাংলা ছবির অনুরাগীরা প্রত্যেকেই সেন-কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশ এবং তাঁর সুপারিশসমূহ জানার জন্য আগ্রহী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক সময় প্রবল জনমতের চাপে একটি তদন্ত কমিটী গঠন করে ফেলেন। কোন কোন রাষ্ট্রমন্ত্রী চলচ্চিত্র বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়োছলেন, কিন্তু এখন তাঁরা নীরব এবং রিপোর্ট প্রকাশে রাজ্য সরকারের অনিচ্ছা আরো বেশি রহস্যজনক।

তদন্ত কমিটী গঠনের সময় সিনেমা দর্শক ও কর্মীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায় বছরে ১২ সপ্তাহ বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হোক। তার একটি বিকল্প প্রস্তাব ছিল বাংলা ছবি ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে প্রদর্শিত প্রত্যেক ছবির উপর টাকায় এক পয়সা হিসাবে লেভী ধার্য করা হোক। লেভীর দ্বারা সংগৃহীত অর্থ বাংলা ছবির প্রযোজকদের পরিপূরক সাহায্য হিসাবে দেওয়া হবে। আমরা যতদূর জেনেছি সেন-কমিটি এই প্রস্তাবসমূহের ভিত্তিতে সুপারিশ করেছেন। সম্ভবত এখানেই রাজ্য সরকার প্রমাদ গণেছেন। এরূপ সুপারিশ কার্যকরী করলে হিন্দী ছবির প্রদর্শক ও পরিবেশকরা অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাদের ভয় করে বলেই তো আজ হিন্দী ছবির চাপে বাংলা ছবি কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। আমরা অবিলম্বে সেন-কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশের জন্য রাজ্য সরকারকে পুনর্বার অনুরোধ করছি।

—সুজন

● 'মেরী দত্তের ফ্ল্যাট' ছবিতে গীতা দে

চিত্র আলোচনা

ম্যাঁয় ভি লেড়কি হুঁ

(এ-ভি-এম প্রোডাকসন্স : এ সি ত্রিলোক চন্দর)

শৈলেশ দে রচিত কাহিনীর বাংলা চিত্ররূপ 'বধূ' একটি টিকিটঘর-সার্থক ছবি হয়েছিল। একই কাহিনীর হিন্দী চিত্ররূপ 'ম্যাঁয় ভি লেড়কি হুঁ' মাদ্রাজের এ-ভি-এম প্রোডাকসন্স কতৃক প্রযোজিত হয়েছে। ছবিটি সম্প্রতি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে।

ছবির কাহিনীর বক্তব্য : বধূকে হতে হবে সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল, নম্র ও সেবাপরায়ণা। সেবা দিয়েই তার সংসারকে জয় করতে হবে। সংসারে তাকে থাকতে হবে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হয়ে। কাহিনীর নায়িকা রজনীর গায়ের রঙ কালো বলে তার শ্বশুর প্রথমে বিরূপ ছিল; কিন্তু রজনী নিজের গুণে শ্বশুরের মন পরিবর্তন করে। রূপের চেয়ে গুণ বড়, একথা সে প্রমাণ করে।

স্বাভাবিকভাবে এরূপ কাহিনীর ব্যাপক আবেদন থাকে, বিশেষ করে মেয়ে মহলে। সুতরাং এই ছবিও টিকিটঘরের আনুকূল্য লাভ করবে। পরিচালক বাংলা ছবি 'বধূ' অপেক্ষাও অধিক দৃষ্টি রেখেছেন টিকিটঘরের প্রতি। তাই মেলোড্রামা এখানে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, বাস্তবতাকে পরিচালক গ্রাহ্য করেন নি। অনেকটা লোককথার ধরণে, যাত্রাগানের রীতিতে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। সাধারণত হিন্দী ছবি ১৪ রীলের কমে হয় না, মাদ্রাজের দর্শক

১৪ রীলেও সন্তুষ্ট নয়, তাই কাহিনী এখানে ১৭ রীলে আবদ্ধ। নানারূপ যৌনআবেদনমূলক অঙ্গভঙ্গী ও অবাস্তব নাচে কাহিনী পল্লবিত হয়েছে।

রজনী বা বধূর ভূমিকায় মীনাকুমারী এবং অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ধর্মেন্দর, বলরাজ সাহনী, রঙ্গরাও, রাজন, পুষ্পলতা, ওমপ্রকাশ, মনোরমা, ভগবান, মোহন চোটী।

● 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ছবিতে নবাগতা অঞ্জনা ভৌমিক

স্টুডিও খবর

● 'শ্যামলী' একদা বাঙালী দর্শকদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছিল। সেই 'শ্যামলী'কে এবার হিন্দী চিত্রে রূপ দেবেন প্রযোজক তারাচাঁদ বরজাতিয়া। রাজশ্রী পিকচার্সের পক্ষে তিনি কাহিনীর হিন্দী চিত্রস্বত্ব কিনেছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের বাংলার কাহিনীর ওপর নজর পড়েছে। হিন্দী ছবিতে কাহিনীর দুর্বলতাবিষয়ে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠছেন। আশাপূর্ণা দেবীর 'ছাড়পত্র'কে চিত্ররূপ দেবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন প্রভাত মুখোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অনিল চ্যাটার্জী ও মাধবী মুখার্জী। প্রভাত মুখার্জীর 'দেবতার দীপ' বর্তমানে মুক্তি-প্রতীক্ষায় রয়েছে। মনোজ বসুর 'বৃষ্টি-বৃষ্টি' উপন্যাস 'ডাক বাংলো' নামে স্টার থিয়েটারে দীর্ঘরজনী অভিনীত হয়েছিল। সেই ● 'ডাক বাংলো'কে এবার চিত্ররূপ দেবেন মঙ্গল চক্রবর্তী। জরাসন্ধের ● 'পাড়ি'র চিত্ররূপ দেবার কাজে উদ্যোগী হয়েছেন প্রণতি ভট্টাচার্য।

গত ২৭শে অক্টোবর ছবির কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই ছবিতে দু-টি চরিত্রে ধর্মিন্দর ও দিলীপকুমারকে দেখা যাবে। প্রণতি ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে আর একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছিলেন, ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। অভিনেত্রী নার্গিস এতদিন অভিনয়ে দর্শকদের চিত্তজয় করেছিলেন। সুনীল দত্তের সাথে বিয়ের পর, তিনি অভিনয় একরকম ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্র-জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক এখনো ঘনিষ্ঠ। সুনীল দত্তের অজন্তা আর্টসের প্রযোজনায় ● 'ইয়াদ আই' নামে একটি নতুন ধরণের ছবি নির্মিত হবে। এই ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী নার্গিস। একটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনী বিকাশ লাভ করেছে। এই প্রধান চরিত্রটিতে অভিনয় করবেন সুনীল দত্ত। পরিচালনার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন। রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত ● 'সূর্যতপা'র মহরৎ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে ক্ল্যাপস্টিক দেন পাহাড়ী সান্যাল। এই ছবিতে নায়কের চরিত্রে রূপ দেবেন উত্তমকুমার। ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূত গোষ্ঠী।

● 'ম্যাঁয় ভি লেডকি হুঁ' ছবিতে ধর্মিন্দর ও মীনাকুমারী

● এলিজাবেথ টেলর—এক ঘরোয়া পরিবেশে

নাটকের কথা

'সাজাহান'

এবারের নতুন দিল্লীর পূজামণ্ডপে আকর্ষণীয় নাটক হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের চিরনূতন নাটক 'সাজাহান'। বহুদিন বাদে দিল্লীতে এই নাটকের পুনরভিনয় হোলো। এবারের প্রযোজনার দায়িত্ব ছিল উৎপল মুখোপাধ্যায়ের হাতে। তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা এবং পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাতে তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা সকলের কাছ থেকেই পাবেন। যদিও বেশির ভাগ মুখই ছিল নতুন—পাদপ্রদীপের আলোয় দিল্লীর জনপ্রিয় প্রতিভাবান নট দুর্গা ভট্টাচার্যের অংশগ্রহণ রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার মিলন ঘটিয়েছিল। তাঁর ঔরঙ্গজেব এককথায় চমৎকার। কঠিন ভূমিকায় তিনি যে অনবদ্য অভিনয় করেছেন, তা ভোলবার নয়। এই টাইপের ভূমিকায় দুর্গাবাবুর এই প্রথম অভিনয়

প্রবীণ নট ধীরেন সরকার এবং ভানু ভাদুড়ী যথাক্রমে সাজাহান ও দারার ভূমিকায় অভিনয় করে নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিয়ারার ভূমিকায় যথাযথ রূপ ফুটিয়েছিলেন শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। কুমারী হাসি দাসের (জহরৎ) ভূমিকা বিশেষ প্রশংসনীয়। ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-পরিচালনা মনে রাখবার মতন।

'দুরন্ত দেহলি'

দিল্লীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিরেক্টর ও অভিনেতা শ্রীভানু ভাদুড়ী ও শ্রীদুর্গা ভট্টাচার্যের যুগ্ম প্রযোজনায় ও পরিচালনায় শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দুরন্ত দেহলি' অল ইণ্ডিয়া ফাইন এ্যাণ্ড ক্র্যাপ্টস সোসাইটি হলে আগামী ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অভিনীত হবে। দিল্লীর খ্যাতিমান শিল্পিবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় অভিনীত বিবেকরঞ্জনের কাহিনীকে নাট্যরূপ দিয়েছেন শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

● 'নামবিভ্রাট' নাটকে শিপ্রা ভট্টাচার্য

● 'অনুষ্টুপ ছন্দ' ছবিতে সুমিতা সান্যাল

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গে মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত সম্প্রতি ভাগলপুর, জামালপুর, মুঙ্গের ও পাটনা এবং অপরও বিশেষ কয়েকটি স্থানে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন এবং মূকাভিনয়ের প্রসারতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন।

সংবাদবন্যা

আইজেনস্টাইনের রচনা সংকলন

মস্কোর শিল্পকলা সম্পর্কিত প্রকাশনা ভবন ইসকুস্টভো বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। সংকলনটি ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এতে আইজেনস্টাইনের চলচ্চিত্রতত্ত্ব, জীবনী, প্রবন্ধ, তাঁর নিজের এবং বিশ্বের চলচ্চিত্র-সমালোচকদের নোট ইত্যাদি থাকবে। এ ছাড়া চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনা ইত্যাদিও থাকবে। বিখ্যাত রুশ কবি আলেকজান্দার পুশকিন সম্পর্কে একটি চিত্র নির্মাণে আইজেনস্টাইন চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। এই ছবিতে ইয়েকাতারিনা কারামঝিনার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত ব্যালেরিনা গালিনা উলানভাকে নির্বাচিত করেছিলেন। সঙ্গীত রচনার জন্য মনোনীত করেছিলেন সের্গেই প্রকোফিয়েভকে, যিনি 'আইভান দি টেরিবল'-এ সুর দিয়েছেন।

শ্রমশৈল্পিক চলচ্চিত্র উৎসব

আগামী ২রা নভেম্বর থেকে ৬ই নভেম্বর লণ্ডনে যে ৫ম আন্তর্জাতিক শ্রমশৈল্পিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে, তাতে ২২টি দেশের শ্রমশিল্পের উদ্যোগে নির্মিত ১৩০টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। এই সব চলচ্চিত্র এসেছে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড ফ্রান্স, জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিক, বৃটেন, নেদার্ল্যাণ্ডস, ইস্রাইল, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নরওয়ে, ফিলিপিনস, পর্তুগাল, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ আফ্রিকা, স্পেন, সুইডেন, সুইটজারল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একাত্তরটি সাধারণ দর্শকদের জন্য নির্মিত হয়েছে, বাকিগুলি বিশেষজ্ঞদের জন্য।

তিরানব্বইটির ভাষা ইংরাজী।

উৎসবের সময় আন্তর্জাতিক

● 'লালপাথর' ছবিতে উত্তমকুমার ও নির্মলকুমার।

উদ্যোক্তা, প্রযোজক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে কয়েকটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হবে। তাঁদের একটি আলোচ্য বিষয় হবে---বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চলচ্চিত্রের ব্যবহার—এই দিকের এই উন্নতি সম্পর্কে মোট ৫২টি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে।

সঙ্গীত কথা

লোকশিল্পী মঞ্জুরী বৈষ্ণবী

লোকশিল্পীরা চিরকালই আমাদের দেশে অনাদৃত ও অবহেলিত। কিন্তু তাদের বাঁধা গান ও গাঁথার মধ্যে খুবই উচ্চস্তরের ভাবের প্রকাশ লক্ষণীয়। সাহিত্যের অঙ্গ হিসেবে আজকাল জ্ঞানী-গুণী মহলে এই লোকসঙ্গীত বা গাঁথার কদর বেড়েছে। কিন্তু লোক-চক্ষুর অন্তরালে যাঁরা এসব গান ও গাঁথা বেঁধে গেয়ে থাকেন তাঁদেরকে কেউ মনে রাখে না বা মনে রাখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না।

যে শিল্পীর গান নিয়ে আলোচনা করছি, তিনি হলেন---পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুর অঞ্চলের আউটপাড়া গাঁয়ের লোক-শিল্পী মঞ্জুরী বৈষ্ণবী। সাধারণের কাছে ইনি ললিতা বৈষ্ণবী নামে পরিচিত।

আমাদের বাসার এই বৈষ্ণবী তাঁর ছেলেকে সাথে নিয়ে প্রতি রবিবার গান গেয়ে ভিক্ষা নিয়ে যেতেন। বৈষ্ণবী নিজে নেচে নেচে গাইতেন আর তারই সাথে তাঁর ছেলে দোতারা বাজাতেন। মঞ্জুরীর কণ্ঠস্বর খুবই মধুর ছিল। তিনি যে গানগুলি গাইতেন সেগুলি প্রায় সব কটিই দেহতত্ত্ব-মূলক ছিল। রাধাকৃষ্ণ এবং মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের কাহিনীর উল্লেখও এই বৈষ্ণবীর অনেক গানে পাওয়া যায়। গানগুলির রচনা-কৌশল ভারি সুন্দর। এত ভাব দিয়ে মঞ্জুরী এ গানগুলি গাইতেন যে, গান শোনবার জন্য ভিড় জমে যেত।

তাঁর একটি প্রিয় গানের কথা মনে পড়ছে। অতি সহজ ও সরল কথায় নিজের নিঃসঙ্গতা ও অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন খুবই হৃদয়গ্রাহী। যেমন:

কেলাগাছে বাদুর গো ঝোলে,
(দয়াল) তুই সেইরকম ঝুলাইলি আমারে
সমুদ্রেরে চ্যাপ্‌পোনা ভাসে,
(দয়াল) তুই সেইরকম ভাসাইলি আমারে
গনগনাগুন লাগল আমার অন্তরে ॥

—ইত্যাদি।

বরাবরই মঞ্জুরী সদর দিয়ে প্রবেশ করে গান সুরু করেন। কিন্তু এক রবিবার দেখি যে, বৈষ্ণবী নামাবলী গায়ে দিয়ে তিলক কেটে খঞ্জনী বাজাতে বাজাতে পথ দিয়ে গাইতে গাইতে আমাদের বাসার দিকে আসছেন। তাঁর দুচোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরে পড়ছে। বাস্তবিকই সেদিনের গানটি খুবই মনে রাখবার মত। কথা ও ভাবের সমন্বয়ে এক অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করেছিলেন সেদিন।

গানটিতে দীনদয়াল অর্থাৎ ভগবানের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আকুতি প্রকাশ পেয়েছে যেমন:

ত্রিতাপজ্বালার জলে মরি রে
বাতাসে প্রাণ জুড়ায় না,
গুরু কল্পতরুর শীতল ছায়া
আমার অঙ্গে কেন লাগে না,
সাধুজনে হরি বলে,
বক্ষ ভাসায় নয়ন জলে
আমার ভাগ্যে যে তাও হল না।...

—ইত্যাদি

মঞ্জুরী বৈষ্ণবীর আর একটি গানে শ্রীরাধিকার মনে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের

দেশ সেবায় নিয়োজিত,
এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড
কলিকাতা—৫০
নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী
—ব্রাঞ্চ সমূহ—
বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াড়া - শ্রীনগর - গৌহাটী

● মঞ্জুরী বৈষ্ণবী

বেদনা সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। গানটির রচনাকৌশল দেখলে মনে করা অসম্ভব যে, এটি একটি নিরক্ষর গ্রাম্য বৈষ্ণবীর রচনা। বড় বড় বৈষ্ণব পদকর্তারা যেভাবে পদাবলী রচনা করেছেন, এ গানটিও সেই ধরণের একটি রচনা। এর প্রকাশভঙ্গী কাব্যিক ও মনস্তত্ত্বমূলক। গানটি ললিতা সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি। যেমন :

একি হইল জ্বালা আমার
  একি হইল জ্বালা
কেমন করে ভুলব লো সই
  নিদয় চিকণ কালা।
আমি চাইনা ডরে ন্যাবের পানে
  পরব বইল্যা তারি মনে
আমি বাঁধিনা চুল কালোবরণ
  মন তবু উতলা ॥
আমি ছ্যাইড়্যাছি কাজলের স্বাদ
  কাজল কালা বইল্যা
নীলাম্বরী নীল দেইখ্যা সই
  পরাণ যায় গো অইল্যা রে
  কাজল কালা বইল্যা ॥

মঞ্জুরীর আরো একটি গানে শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের সুন্দর আর একটি ছবি ফুটে উঠেছে :

(ও প্রাণ) কৃষ্ণবিনে সখী আমি
  মইলাম প্রাণে গো,
ওকি সে ধৈরজিয়ে রব ঘরে গো,
কাইল বইল্যা গ্যাছেন হরি,
  অক্রুরের রথে চড়ি
আইজ কাইল হইতে দুই দিন গণি
আমারে ছাইড়্যা গ্যাছে মধুপুরী গো।

দেশ বিভাগের পর, হঠাৎ মঞ্জুরী বৈষ্ণবীর সাথে কলকাতার বেলিয়াঘাটার রাস্তায় দেখা হয়েছিল। তখন তাঁর ছেলে সঙ্গে ছিল না। তিনি নিজেই খঞ্জনী বাজিয়ে গাইছিলেন—একটি নিমাই সন্ন্যাসের গান। যেমন :—

শচীমাতা পদে গৌর জানায় প্রণতি
সন্ন্যাসে যাইব মাগো দেহ অনুমতি।
নিদ্রাবশে শচী তারে দিল যে বিদায়
জাগিয়া না পাইয়া তারে—
  করে হায় হায়। —ইত্যাদি

অপূর্ব আবেগ, অপূর্ব আতিশয্য দেখলাম এবারে মঞ্জুরী বৈষ্ণবীর চোখে মুখে। কিন্তু বার্ধক্যের জন্য কণ্ঠস্বরের সুমিষ্টতা অনেকাংশে কমেছে, দমও কমে গেছে।

এখন মঞ্জুরীর বয়স ৭০। বার্ধক্য ও জরা তাঁকে ক্রমশ পঙ্গু করে দেবে। আর গাইতে পারবেন না। মঞ্জুরীর কাছে যে সব গান শুনেছি তার কিছু কিছু সংগ্রহও করেছি।

এখনও মঞ্জুরীর মত বহু লোকশিল্পী বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছ থেকে এই ধরণের সব লোকসংগীত ও লোকগাথা সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আমরা এদের নিকট থেকে গান সংগ্রহ করে বাজারে নাম কিনি—কিন্তু এ-সব গ্রাম্যশিল্পীদের নাম, খ্যাতি বা স্বীকৃতি দেই না। তারা আঁধারেই ফোটে, আবার আঁধারেই ঝরে পড়ে।

—বুদ্ধদেব রায়

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

—ইহাতে আছে—

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী—, সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের, 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের
গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩৷৷৹ টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩৷৹

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলাদিত্য

গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার ছাড়তে বাধ্য হলেন। কারণ তিনি এমারেল্ডে থাকাকালীন স্টারের মালিকেরা ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছেন—মনে মনে ভেবে নিয়েছেন গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েও থিয়েটার চালানো যায়। 'সরলা' আর 'তাজ্জব ব্যাপার' তো বেশ পয়সা দিয়েছে—অমৃত বোসের 'বাঞ্ছারাম' ও 'তরুলতা'ও ভালই জমেছে। একটা কথা এখানে বলা দরকার অমৃত বোসের 'তরুবালা' নাটকটি কিন্তু গিরিশবাবু সম্পূর্ণ মেজে ঘষে দিয়েছিলেন—পঞ্চম অঙ্কটির সবটাই আবার গিরিশচন্দ্রের লেখা। কিন্তু হলে কি হবে—গিরিশচন্দ্রের অপরাধও তো কম নয়—পাঁচ বছরের জন্য গোপাল শীলের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে ষোল হাজার টাকা স্টারকে দিয়েছিলেন। আত্মগোপন করে স্টারের জন্য 'নসীরাম' লিখে দেন—এর যথাযথ প্রতিদান স্টারের কাছ থেকে পেতে হোল—অর্থাৎ বরখাস্তের চিঠি। এর আগে স্টারে মঞ্চস্থ করবার জন্য যে দুটি নাটক তিনি লিখে দেন—'আবুহোসেন' ও 'মুকুল মুঞ্জরা'—তা পড়ে স্টারের কর্তারা মন্তব্য করেছিলেন, 'গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' অথচ ঐ আড়াই ঘণ্টার অপেরা 'আবুহোসেন' খুলে মিনার্ভা পরে লক্ষাধিক টাকা আয় করেছিল।

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা। বিডন স্ট্রীটে, যেখানে আগে গ্রেট ন্যাশনাল ছিল সেখানেই মিনার্ভা খোলা হয়। ১৮৯৩ সালে ২৮শে জানুয়ারী গিরিশকৃত ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ দিয়ে মিনার্ভার উদ্বোধন হয়।

এই প্রসঙ্গে অনুবাদ-নাট্য সম্পর্কে কুমুদবন্ধু সেনের সঙ্গে গিরিশবাবুর আলোচনার কিছুটা তুলে দিলাম :

গিরিশচন্দ্র—শকুন্তলা অনুবাদ করে অভিনয় করবার আমার ইচ্ছে আছে, তবে ঠাকুর কি করেন বলতে পারি না। এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় অনুবাদ করা কঠিন। ম্যাকবেথের অনুবাদ ক'রে থিয়েটারে অভিনয় করতে আমার ১৬।১৭ বছর লেগেছিল।

কুমুদবন্ধু—সে কেমন?

গিরিশচন্দ্র—ম্যাকবেথ অভিনয় করবার বহু পূর্বে ম্যাকবেথ অনুবাদ করে ফেলেছিলাম। আমি থি... করবার বহুপূর্বে ইংরাজী কবিতার অনুবাদ ক'রে হাত মক্স করেছি। কত কবিতা ছিঁড়ে ফেলে নষ্ট করেছি। কি জান। কথার পরিবর্তে কথা বসানোই অনুবাদ নয়। যে ভাষায় অনূদিত হবে সেই ভাষায় স্বচ্ছগতিতে ভাবগুলি পরিস্ফুট করতে হবে। এটা যে বিদেশীয় ভাষায় রচিত কোন কিছুর তর্জমা পড়ছি তা মনে হবে না। আমাদের দেশে অনুবাদ-সাহিত্য নেই বললেই হয়। যারা ইংরাজী থেকে অনুবাদ করে—তারা এত অপরিপক্ব যে অনুবাদগুলি হয় ছেলেমানুষি নয় কটমট। বিশেষ পরিপক্ব হাতে যদি ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় সাহিত্য translated হয়, তবে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে অপূর্ব রত্নের আমদানী হয়। কিন্তু আমাদের দেশের সাহিত্যিকেরা সেদিকে বড় অগ্রসর হন না—সকলেই কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার হতে প্রয়াস করেন।

কুমুদবাবু—আমাদের দেশে বাস্তবিকই অনুবাদ-সাহিত্যের বিশেষ অভাব।

গিরিশচন্দ্র—অনুবাদে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ফরাসী জার্মান গ্রন্থগুলি ইংরেজীতে এমন সুন্দর তর্জমা হয়েছে যে, মনে হয় না সেগুলি অনুবাদ পড়ছি। আর সব দেশের জ্ঞানভাণ্ডার করায়ত্ত থাকে।

কুমুদবন্ধু—আচ্ছা, আপনি শুধু ম্যাকবেথ অনুবাদ করে ক্ষান্ত হলেন কেন? সেক্সপীরের অন্য বইগুলি অনুবাদ করলে বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ নাট্য সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হোত।

গিরিশচন্দ্র—মনে তো করেছিলাম যে ম্যাকবেথের পর ওথেলো, হ্যামলেট, কিং লিয়ার প্রভৃতি বই অনুবাদ করে অভিনয় করবো। কিন্তু যদিও সকলে ম্যাকবেথ নাটকের অনুবাদের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু দর্শকের অভাবে রঙ্গালয়ে অভিনয় সত্বর বন্ধ হোল। অথচ অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল। কাজে কাজেই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী প্রভৃতির অনিচ্ছা দেখে আর অনুবাদ করলাম না। ব্যবসায়ে কৃতকার্য না হলে আমার হাত পা বাঁধা।।

কুমুদবন্ধু—ম্যাকবেথ অভিনয় জমলো না?

গিরিশচন্দ্র—না। কি জান—বেশির ভাগ লোক যায় নাচ দেখতে আর গান শুনতে। থিয়েটারে নাটক দেখতে খুব কম লোকই যায়। বিশেষ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই নাটক সাধারণের উপযোগী হয় নি। শিক্ষিত সম্প্রদায় একবার দেখে আর বড় বেশি দেখে না।

কুমুদবন্ধু—শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের বাংলা থিয়েটারকে ভাল চোখে দেখে না।

গিরিশচন্দ্র—কি করে জানলে?

কুমুদবন্ধু—শুনতে পাই।

গিরিশচন্দ্র—কি শুনতে পাও?

কুমুদবন্ধু—অনেকের মতে বিলেতের বর্তমান থিয়েটারের সঙ্গে আমাদের থিয়েটারের তুলনা হতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র—থিয়েটারের তো হতে পারে না, কিন্তু আর কিসে হতে পারে

শুনি? সাহিত্যে, রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, শিল্প-বাণিজ্যে, খেলায়, যুদ্ধে, শৌর্যে বীর্যে—কিসে তুলনা হতে পারে শুনি? শুধু থিয়েটারের ঘাড়ে দোষ দিলে হবে না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, গিরিশবাবুর মতামতগুলি আজকের দিনেও কত সত্যি।

ম্যাকবেথের চরিত্ররূপায়ণ হয় এইভাবে:

ম্যাকবেথ—গিরিশচন্দ্র
ডান্‌ক্যান—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য
ম্যালকম—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)
ডোনালবেন—নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব
ব্যাঙ্কো—কুমুদনাথ সরকার
ম্যাকডাফ ও হেকেট—অঘোর পাঠক
লেনক্স—বিনোদ সোম
রস—কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী
এঙ্গাস—অনুকূল বটব্যাল
কেইথনেস—চুণীলাল দেব
ব্লিডিং সোলজার } ঐ
সেকেণ্ড মার্ডারার
ফ্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী
সিওয়ার্ড—ঠাকুরদাস চ্যাটার্জী
লেডী ম্যাকবেথ—তিনকড়ি দাসী
লেডী ম্যাকডাফ—প্রমোদা সুন্দরী

স্টেজ ম্যানেজমেণ্টের ভার ছিল ধর্মদাস সুরের উপর। মিউজিক মাস্টার ছিলেন দেবকান্ত বাগচী। সাজ-সজ্জা এবং মেকআপের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে য়ুরোপীয় মিস্টার জে পিন্‌ এবং মিস্টার উইলার্ডের (চিত্রকর) উপর।

অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেবার আগে শ্রীমতী তিনকড়ি দাসীর কিছুটা পরিচয় দিই—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর পরই বোধহয় তিনকড়ির নাম—

● তিনকড়ি

তিনকড়ি রূপায়িত বিখ্যাত চরিত্র-গুলিকে আজও পর্যন্ত কোন অভিনেত্রী অভিনয়-প্রতিভায় তিনকড়িকে নিষ্প্রভ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন নি।

অল্প বয়স থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে যোগাযোগ তিনকড়ির। স্টারে বসে বসে বহু নাটকের মহলা দেখেছে—বিল্বমঙ্গলে নির্বাক সখীর ভূমিকা করেছে—'বিবাহ-বিভ্রাটে'ও তার ভূমিকা নির্বাক, একটি বাসরসঙ্গিনী। 'চোরের উপর বাটপাড়িতে'ও তাকে কথা বলতে হয় নি—পরিচারিকারূপে জলখাবারের রেকাবি নিয়ে স্টেজে ঢুকেছে এবং ফিরে গেছে। প্রথম কথা বলেছে 'রূপসনাতনে' একটি সখীর ভূমিকায় —গানও গেয়েছে—'দেখ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল ভুজঙ্গিনী।' দর্শকেরা গান শুনে মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিয়েছিল—কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে সন্দেশ খাবার জন্য এক টাকা পুরস্কার দেন তিনকড়িকে। সেই টাকাটি সযত্নে রেখে দিয়েছিল তিনকড়ি জীবনের শেষ দিন অবধি—কখনও খরচ করে নি।

স্টারের পর আর কিছুকাল ছিল অন্য থিয়েটারে—তারপরেই তিনকড়ি যোগ

● বিনোদিনী

ের বীণা থিয়েটারে। মাইনে কুড়ি টাকা—তখন তিনকড়ির বয়স বোধহয় ষোল কি সতেরো। এই সময় বীণা থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনকড়ি।

বীণার পর তিনকড়ি আসে এমারেল্ডে। সেখানে বনিবনা না হওয়াতে থিয়েটার ছেড়ে তিনকড়ি কিছুকাল বাড়িতে বসে রইল। এই সময় সিটি থিয়েটার থেকে নীলমাধব চক্রবর্তী একদিন এসে হাজির হলেন তিনকড়ির বাড়িতে—নিয়ে গেলেন সিটিতে অভিনয় করতে।

এখানে বিবাহ-বিভ্রাটে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতো জগত্তারিণী। তিনকড়ির কিন্তু এ অভিনয় পছন্দ হোত না—একদিন বললে নীলমাধববাবুকে—'ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় ঠিকমত হচ্ছে না, আমাকে একদিন করতে দিন।'

প্রথমটায় রাজী হন নি নীলমাধব—শক্ত পার্ট। অনুরোধ এড়াতে না পেরে শেষে একদিন ওর 'পার্ট বলা' শুনতে রাজী হলেন—ওর মুখের সংলাপ শুনে নীলমাধববাবু মুগ্ধ—সেদিন থেকেই ঐ ঝিয়ের ভূমিকায় তিনকড়ি নিয়মিতভাবে অভিনয় করতে লাগল।

পূজোর সময় সিটি থিয়েটারের দল অভিনয় করতে গেল কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পাশে বসে স্বয়ং গিরিশচন্দ্রও থিয়েটার দেখছিলেন। অভিনয় শেষে গিরিশ এলেন ভেতরে। সবার সঙ্গে তিনকড়িও এসে পায়ের ধুলো নিল গিরিশচন্দ্রের।

যাবার সময় নীলমাধববাবুকে বলে গেলেন গিরিশ তিনকড়ি সম্বন্ধে—'ওর চেহারা মন্দ নয়, গলাতেও সব পর্দা খেলে—ভাল করে শিক্ষা পেলে ভবিষ্যতে বড় অভিনেত্রী হবে—ওর ওপর নজর রেখ।'

এর কিছুকাল পর একদিন গিরিশবাবুর কাছ থেকে আহ্বান এল তিনকড়ির কাছে মিনার্ভায় যোগ দেবার জন্য। স্বয়ং গিরিশবাবুর কাছ থেকে ডাক এসেছে—উল্লাসে প্রাণটা ভরে উঠল তিনকড়ির। সন্ধ্যায় থিয়েটারের গাড়ি এলে তিনকড়ি গিয়ে হাজির হল থিয়েটারে। পেছন দিকের একটি ঘরে গিরিশবাবু বসে আছেন—তিনকড়ি গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। নানাকথা বললেন গিরিশচন্দ্র—শুনে তিনকড়ির মনে হল গুরুর আশীর্বাদ থাকলে তার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। এরপর গিরিশবাবু একজনকে বললেন—এই মেয়েটির এক বছরের এগ্রিমেণ্ট করে নাও, আর ব্যবস্থা করে দেও যাতে কাল থেকে এর বাড়িতে ঠিকমত গাড়ি যায়। এক বছরের মত চুক্তিপত্রে সই করে সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরে এল তিনকড়ি।

(ক্রমশঃ)

নট-নটীদের বিচিত্র কাহিনী

দেবনারায়ণ গুপ্ত

বাহান্ন

দিকপাল অভিনেতার দুই যুক্তি

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্য-মন্দিরে (কর্নওয়ালিশ থিয়েটার) 'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয় হচ্ছে। যোগেশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। রমেশ—শিশিরকুমার। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। সেদিনকার সে অভিনয়ে দানীবাবু যেন একাই দর্শকদের হৃদয় জয় করে বসে আছেন। সম্মিলিত অভিনয়ে সেদিন যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই রঙ্গজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযোগ্য রূপদান করলেও, সেদিনের সে অভিনয়ে সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করলেন দানীবাবু। প্রতিটি দৃশ্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করতে লাগলেন। শিশিরকুমারের যাঁরা অতি প্রিয়জন সেদিন দানীবাবুর অভিনয় দেখে তাঁদের মধ্যে অনেকেই যেন একটু মুষড়ে পড়লেন। পুরাতন শ্বেতহস্তীর (দানীবাবুকে সে সময় একজন শ্বেত-হস্তী বলে অভিহিত করতেন) এত প্রশংসা তাঁদের কাছে যেন একটু অসহনীয়ই হয়ে উঠলো। তাঁরা শিশির-কুমারকে গিয়ে ধরে বসলেন কিছু প্যাঁচপোঁচ কষার জন্যে।

শিশিরকুমার একটু হাসলেন। তারপর বেশ রূঢ়ভাবেই তাঁদের জানালেন—'রমেশের প্যাঁচের পাকে পাকেতেই তো যোগেশের সংসারটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তার বেশি প্যাঁচ তো আমার জানা নেই।'

ভক্তেরা অমন উত্তর পেয়েও সন্তুষ্ট নন। তবুও বলে বসেন—শরীরটা বোধ হয় তার আজ আপনার ভাল নেই। তাই—

—না না, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন—

—মনে হতে পারে। অনেক কিছুই মনে হতে পারে তোমাদের। কিন্তু ভুলে যেও না 'ক্ষীণ শিশু সিংহ মনে করে বধ'। যাও।

ভাবকের দল সরে পড়লেন।

পরের দিন সকালে দানীবাবু বসে আছেন তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়ির বৈঠকখানায়। দানীবাবুর জনৈক ভক্ত এসে হাজির হলেন। আগের দিন রাত্রে সম্মিলিত অভিনয়ে দানীবাবু যে দর্শকের অভিনন্দন কুড়িয়েছেন সে কথা বেশ ফলাও করে রংচং দিয়ে বলতে সুরু করলেন। এ আতিশয্য কিন্তু দানীবাবুর কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। দানীবাবু শিশিরকুমারকে ঠাকুর বলতেন।

শেষে ভক্তটিকে থামিয়ে বলেন—ঠাকুর অমন অভিনয় না করলে, আমার একার কি ক্ষমতা ছিল হাততালি কুড়োবার? অভিনয়টা কি জান, ওটা কতকটা তোমাদের ব্যাটমিন্‌টন্ খেলার মত। একপক্ষ যদি অপর পক্ষকে টুংটাং করে বল পাঠাতে পারে, তবেই না খেলাটা জমে? অভিনয় কথাটাও কতকটা সেই রকম। ঠাকুর কাল রমেশের পার্ট অত ভাল না করলে কি আর আমার যোগেশ ভাল হোত?

পাঠক মন

নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রথম সংখ্যা থেকে আজ পর্যন্ত এর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। অনেকদিন থেকে যে কথা বলবার ইচ্ছা মনে পোষণ করছিলাম, 'পাঠকমন' সে সুযোগ করে দেওয়াতে আপনাকে ধন্যবাদ।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' যে তার নতুন ঐতিহ্য ও আদর্শ নিয়ে সাহিত্যের দরবারে হাজির হয়েছে, তার প্রমাণ পত্রিকার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একটা সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকা থেকে সাধারণ পাঠক যা আশা করেন আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত বর্তমান পত্রিকা আমার মনে হয়—তা তো মেটাতে সক্ষম হয়েছেই, উপরন্তু যা আশা করা যায় না—এত অল্প দামের পত্রিকার কাছে (যা অন্যান্য দামী পত্রিকায় পাওয়া যায় না) তাও মেটাতে পেরেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর এমন একটা বিভাগ নেই যাকে বাদ দেওয়া যায়।

'আজকের মানুষে'র নতুন নতুন লোক-পরিচিতির যে প্রয়াস তা সার্থক। পাঠক খুব তৃপ্তিসহকারে তা পাঠ করে।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্রের লেখা ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর' সাহিত্যের দরবারে এক বিরাট আলোড়ন তুলতে সাহায্য করছে।

'ভারতদর্শন', 'আন্তর্জাতিক', 'বঙ্গ দর্শনে'র আবেদন এত হৃদয়স্পর্শী যে তাকে বাদ দেওয়া যায় না। এ ছাড়া আপনার সম্পাদনায়—'গ্রন্থমেলা' বিভাগের আকর্ষণ বিরাট। অনেক পাঠকের সাথে এ-বিষয়ে আমিও একমত এর বিকাশের পরিধির বৃদ্ধি-করণে।

আপনার সম্পাদনার প্রশংসা করছি এইজন্য যে, প্রবীণ ও নামী সাহিত্যিকদের সঙ্গে সমানতালে—নবীনদের রচনা প্রকাশ করছেন আপনি। এ-ব্যাপারে অনেক পাঠকের বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। কারণ সব পত্রিকাই যদি নামকরা সাহিত্যিকদের লেখায় ভরে ওঠে, তবে কি আর নতুন সাহিত্যিক সৃষ্টি হবে না? সিনেমা, খেলা, রাজনীতি প্রভৃতি বিভাগ সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। বাংলা দেশে এ সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা রয়েছে, কাজেই বিরাট আকারে এসব বিষয়ে এই পত্রিকাতে রচনা প্রকাশ করে পত্রিকার অমূল্য পৃষ্ঠা না ভরিয়ে—রুচিবান আকর্ষণীয় রচনা প্রকাশ করেই এর ঐতিহ্যকে বজায় রাখুন।

অনেক কথার শেষে শেষ কথা হলো পত্রিকার ছাপার দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন—বিশেষ করে ব্লক ছাপার ব্যাপারে। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' গত এক বছরের মধ্যে যে আসন সংগ্রহ করতে পেরেছে সেটা শুধু তার বৈশিষ্ট্যের জোরে—সেই বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্বের পরম নির্ভরশীল খুঁটি হলো এর printing এবং binding-এর দিক। আশা করি আপনার সজাগদৃষ্টি এদিকে পড়বে।

শ্রীনীহারকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
বুড়াশিবতলা, পোঃ নবদ্বীপ, জেঃ নদীয়া

* * *

আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক, প্রথম সংখ্যাটি থেকেই আমার আগ্রহ। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' তার নির্দিষ্ট পথেই চলেছে, কোন প্রকার ব্যতিক্রম আগে ও পরে চোখে পড়ে নি, সেজন্য আপনার কৃতিত্ব পূর্বাপর। 'পাঠকমন' এখন প্রস্তুত, আমরা চাই একটি সর্বগুণান্বিত সাপ্তাহিক, যা অন্যত্র অভাব। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' সে-পথের অন্তরায় হয় নি—এটাই প্রশংসার। আশা, অচিরে ক্রমানুয়ে আরো মনের মত হবে।

কিন্তু আমার কথা 'পাঠকমন' নিয়ে। বিভাগটি নিশ্চয়ই ফলপ্রদ। বিস্তর লেখা ছাপা হ'ল, কালিও খরচ হ'ল অনেক, উৎসাহও কম এল না। প্রতিটি সংখ্যা পড়ার পরই মনে হয়, পরের কিস্তিতে সাপ্তাহিকটি কিছু পরিমাণে সংশোধিত এবং সুন্দর হবে। কিন্তু কোথায়? চিঠি ছাপান হচ্ছে, প্রায় একই ধারায় সমালোচনা পাঠকদের কাছ থেকে এসেছে। (আমার পাঠকমনেরও সে আলোচনাই হতে পারতো); কিন্তু সপ্তাহ যায়, সপ্তাহ আসে—বৃথাই আশা। 'সাপ্তাহিক বসুমতী' একই রূপ নিয়ে হাতে আসে, হাজিরা দিচ্ছে। দুঃখ পাই তখনি। আমার 'পাঠকমন' নিছক প্রশংসা নিয়ে আপনার দরবারে গেল না—তার মানে এ নয় যে—'সাপ্তাহিক বসুমতী' আমার অন্তরঙ্গ নয়। আমার পাঠকচিত্ত আন্তরিক বলেই সব বলে ভারমুক্ত হওয়া। কম ব্যয়ে, নতুন নিশানা নিয়ে এমন একটি সাপ্তাহিক আরো সুন্দর, আরো ত্রুটি-শূন্য হোক—এ কামনা নিয়েই এ আলোচনা।

শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায়
পোঃ খাগড়া, জেঃ মুর্শিদাবাদ

* * *

১৮ই ভাদ্র (১৩৭১) তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতী (১৫শ সংখ্যা) শহর-কলকাতা শিরোনামায় প্রবন্ধ 'ওয়েলেসলি প্লেস এবং রাজভবন' প্রসঙ্গে ৯২৮—৯২৯ পৃষ্ঠাতে লেখা আছে 'এককালে ওয়েলেসলি প্লেসের যে অংশে ছিল সেই Little Tank আজ সেখানে উদ্ধত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস,-----গৃহের নির্মাণকার্য সুরু হয় ১৮৬৩ খৃঃ ইত্যাদি।

৮নং ওয়েলেসলি প্লেসের এই বিশাল গৃহের এক জায়গায় কোণে লেখা আছে, "Telegraph office opened on 26th oct 1913" তা হলে দেখা যাচ্ছে, সুরু হয় ১৮৭৩ খৃঃ, আর শেষ হতে লাগল ৪০।৪১ বৎসর, এ বিষয়ে আর একটু খবর জানতে পারলে ভাল হয়।

তা ছাড়া কিছুদিন আগে কলকাতার পৌরসভায় ওয়েলেসলি প্লেসের নাম 'ভারতীয় রেডক্রস সরণী' রাখার প্রস্তাব পাশ হয়েছে, এ বিষয়ে প্রবন্ধে কোন উল্লেখ নেই।

ভবেশচন্দ্র মাইতি
৮, ওয়েলেসলি প্লেস, কলকাতা-১

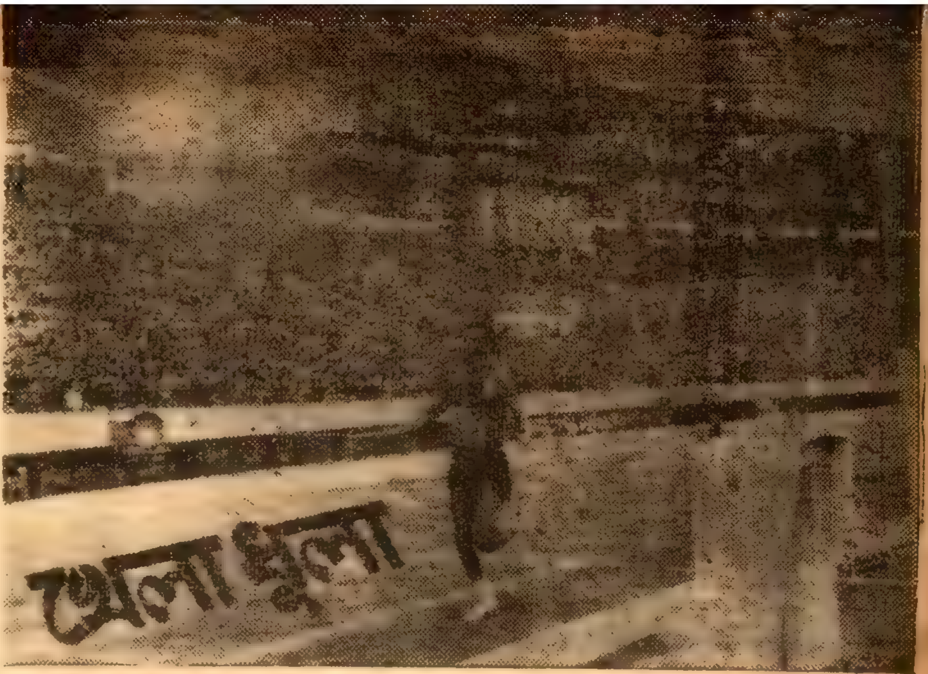

● টোকিও অলিম্পিক ম্যারাথন বিজয়ী ইথিওপিয়ার আবে বিকিলে দৌড় শেষ করছেন।

অলিম্পিকের আলো-ছায়া

আরব্য উপন্যাসের স্বপনপুরী। কোন অজানা দৈত্যের যাদুদণ্ড স্পর্শে গড়ে উঠল অলিম্পিক নগরী টোকিওর বুকে। এশিয়ার বুকে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠান। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কয়েক সহস্র প্রতিযোগীর পদক্ষেপে টোকিও ন্যাশনাল স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে উঠল। ১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর জাপানের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। চতুর্দশ দিবসব্যাপী এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কত তরুণ-তরুণীর স্বপ্ন সফল হল, গলায় দুলল স্বর্ণ, রোপ্য অথবা ব্রোঞ্জপদক, কত তরুণ-তরুণীর আশা-ভঙ্গের মৌন দীর্ঘশ্বাস জনতার জয়ধ্বনিতে বিলীন হল। কত দেশের ভাগ্যে স্বর্ণপদকের ছড়াছড়ি, কত দেশের ভাগ্যে হা-হুতাশের শূন্য ঝুলি।

এই চোখ-ঝলসানো পটভূমিকায় ভেসে ওঠে ছোট ছোট ঘটনা। উত্তর কোরিয়ার মিস্ কিউম ডান সিন আশা করে টোকিওয় গিয়েছিলেন ২টি স্বর্ণপদক জিতবেন। ৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় বেসরকারী বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারিণী হলেন মিস্ ডান সিন। কিন্তু হায়, কুমারী সিন নিরাশায় ভেঙে পড়লেন যখন শুনলেন উত্তর কোরিয়াকে অলিম্পিকে যোগ দিতে দেওয়া হবে না, কারণ গানেফো প্রতিযোগিতায় তারা অংশগ্রহণ করেছিল। আবার ফিরে চল দেশে। কুমারী সিন ভাবলেন এ-জীবনে আর তাঁর অলিম্পিক স্বর্ণপদক লাভ সম্ভব হবে না। আরও চারটে বছর অপেক্ষা করতে হবে—তখন কি আর শক্তি অটুট থাকবে। বেচারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। হঠাৎ কার স্নেহময় স্পর্শ তাঁকে সচকিত করল—'বাবা বাবা' বলে চীৎকার করে উঠলেন কুমারী সিন। কোরিয়া যুদ্ধের ১৪ বছর পর পিতার সঙ্গে পুনর্মিলন হল কন্যার টোকিও অলিম্পিকের অঙ্গনে। কুমারী সিন স্বর্ণপদকের পরিবর্তে পেলেন পিতার স্নেহচুম্বন।

আর একটি দৃশ্য ১০,০০০ হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা। এক তরুণ যুবক তার শেষ শক্তি দিয়ে দৌড়চ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়স্থান লাভের জন্য এ মর্মান্তিক প্রচেষ্টা নয়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যেই এই প্রয়াস। বেচারী আর পারছে না, কোনক্রমে সে সবচেয়ে শেষে দূরত্বটি অতিক্রম করল। জাপানী তরুণীদের সহানুভূতি উথলে উঠল এই অখ্যাত অজ্ঞাত তরুণ এ্যাথলেটের জন্যে। তারা দলে দলে এই যুবককে উৎসাহিত করল, কেউ কেউ পত্রে প্রেম নিবেদন করল, কেউ পাঠাল উপহারের ডালি। সিংহলের এ্যাথলেট করুণানন্দ পদক জয় করতে পারেন নি বটে, কিন্তু জয় করেছেন অনেক জাপানী তরুণীর হৃদয়। এও কম লাভ নয়।

অলিম্পিকের শেষ দৃশ্য। কবিগুরুর ভাষায় বলতে গেলে মিলনের পাত্রটি পূর্ণ

শ্রীঅমিতাভ

যে বিচ্ছেদ বেদনায়। ২৪শে অক্টোবর ধীরে ধীর নিভে যাচ্ছে অলিম্পিকের পূতাগ্নি—সাথে সাথে ম্লান হয়ে আসছে ক্রীড়াঙ্গনের দীপশিখা। আকাশে বাতাসে সকরুণ বিদায়ের সুর, ক্ষণিকের অতিথিদের প্রত্যেকের হৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় অশ্রুসজল। রঙ্গমঞ্চে নাটকের পাত্র-পাত্রী ও কুশীলবগণ একে একে দেখা দিয়ে বিদায় নিচ্ছে, জাতীয় সঙ্গীতের সুর টোকিওর জাতীয় স্টেডিয়ামে ধীরে ধীরে বেজে উঠল। অলিম্পিকের জন্মভূমি গ্রীসের পতাকা, অলিম্পিকের অনুষ্ঠাতা জাপানের পতাকা, আগামী অলিম্পিকের ভারপ্রাপ্ত মেক্সিকোর পতাকা উত্তোলিত হল তূর্য-ধ্বনির সাথে সাথে। নিভে গেল সমস্ত আলো, শুধু জ্বলতে লাগল অলিম্পিকের পূতাগ্নি। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে আভেরী ব্রাণ্ডেজ অষ্টাদশ অলিম্পিকের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করলেন। ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ডে ফুটে উঠল লেখা—'১৯৬৮ সালে মেক্সিকোয় আবার প্রজ্বলিত হবে অলিম্পিক পূতাগ্নি।' আস্তে আস্তে জ্বলে উঠল স্টেডিয়ামের আলো, কিন্তু টোকিওর অষ্টাদশ অলিম্পিক তখন অতীত; তখন ইতিহাস।

সন্তোষ-ট্রফি

ফুটবলের সমস্ত আকর্ষণ বর্তমানে কেন্দ্রীভূত গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা সন্তোষ-ট্রফিতে। এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১৯টি রাজ্য দল ফুটবলের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। গোয়া দলকে এবার গৌহাটিতে খেলতে দেখা যাবে।

গতবার সন্তোষ-ট্রফির আসর বসে মাদ্রাজে। ফাইন্যালে মহারাষ্ট্র দল অন্ধ্রকে নূন্যতম গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করে। মাদ্রাজের হাতে পরাজয় স্বীকার করে কোয়ার্টার ফাইন্যাল থেকেই বাংলা দল বিদায় গ্রহণ করে।

● টোকিওতে মস ভান সিন ও তাঁর পিতা

গোহাটির নেহরু স্টেডিয়ামে ২৪শে অক্টোবর একবিংশতিতম জাতীয় ফুটবলের আসরের উদ্বোধন করেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহা। উদ্বোধনী খেলায় বিহার ৪—৩ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে। বিহারের রমজান এবারের প্রথম হ্যাট্‌ট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ৩—২ গোলের ব্যবধানে উড়িষ্যাকে পরাজিত করে উত্তর প্রদেশ দ্বিতীয় রাউণ্ডে মিলিত হয় ভারতীয় রেল দলের সঙ্গে। রেল দলের কাছে ৫—০ গোলে পরাজিত হয়ে উত্তর প্রদেশ এবারের প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়। আসাম দল ৮—০ গোলের ব্যবধানে গুজরাট দলকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউণ্ডে উন্নীত হয়েছে। আসামের অজয় দাস প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হ্যাট্‌ট্রিক লাভ করেন। অধিকাংশ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে বাংলা দল গঠিত হয়েছে, অধিনায়কত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সুকুমার সমাজপতির ওপর। এখন দেখা যাক বাংলা দল শেষ পর্যন্ত কি ফলাফল প্রদর্শন করে।

ক্রিকেট সমাচার

এক আকর্ষণীয় এবং চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের আবির্ভাব ঘটেছিল দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলাতে; মধ্যাঞ্চল এবং উত্তরাঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত দলীপ ট্রফির খেলায় উত্তরাঞ্চল প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সংগ্রহ করে ২৪৬ রান। মধ্যাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করে সাধারণ গতিতে। মঞ্জরেকার শতরান লাভ করেন। মঞ্জরেকার ব্যক্তিগত ১১৩ রানে বিদায় নিলেন। জয়লাভের জন্য মধ্যাঞ্চলের প্রয়োজন মাত্র ১১ রান হাতে মাত্র ২টি উইকেট। এক নাটকীয় পরিস্থিতিতে সেই ১১ রান সংগ্রহ করে মধ্যাঞ্চল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করে দলীপ ট্রফির সেমিফাইন্যালে উন্নীত হল।

* * *

ইডেন উদ্যানে বর্ষণধৌত পরিত্যক্ত তৃতীয় টেস্টকে পেছনে ফেলে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল পাকিস্তানের সঙ্গে টেস্ট যুদ্ধে অবতীর্ণ হল করাচীতে। পাকিস্তানের অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব বহন করছেন প্রবীণ টেস্ট খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ। পাকিস্তান দলের ছ'জন খেলোয়াড় এবার নবাগত।

টসে জয়ী হয়ে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করে ৪১৪ রানে। ইবাদুল্লা এবং কারদার প্রথম উইকেট জুটিতে ২৪৯ রান সংগ্রহ করে। কারদার মাত্র ৫ রানের জন্য শতরানে বঞ্চিত হন, ইবাদুল্লার ব্যক্তিগত রান হয় ১৬৬। ম্যাকেঞ্জি ৬টি উইকেট দখল করেন।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৩৫২ রান। সিম্পসন অধিনায়কোচিত দৃঢ়তা প্রদর্শন করে সংগ্রহ করেন ১৫৩ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২৭৯ রান সংগ্রহ করে হানিফ পাকিস্তানের ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বাকি সময়ে ২ উইকেটের বিনিময়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ করে ২২৭ এবং শেষে সময় উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসেও সিম্পসন শতরান করেন। পাকিস্তানে এবার অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তান একমাত্র টেস্টটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হল।

সমাচার দর্পণ

কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব 'হায়দ্রাবাদের অন্ধ্র পুলিশকে ১—০ গোলে পরাজিত করে দিল্লীর ডি সি এম ট্রফি লাভ করেছে। মহামেডান এবং অন্ধ্র পুলিশের মধ্যে ফাইন্যাল খেলাটি প্রথমদিন অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনে পেনাল্টি থেকে দলের পক্ষে বিজয়সূচক গোলটি দেন আমেদ হোসেন।

* * *

টোকিও প্রত্যাগত জার্মান এ্যাথলেট দল আগামী ৫ই নভেম্বর কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারতীয় দলের সঙ্গে প্রথম এ্যাথলেটিক্স টেস্টে মিলিত হবে।

* * *

আগামী ১৬ই নভেম্বর সনি লিস্টন বোস্টনে বর্তমান বিশ্ব হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ান ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

24 NOV 1964

Tiny Tots.. Teen-agers...Grown-ups...
THE WHOLE FAMILY LOVES ELPHINSTONE FABRICS
Because Elphinstone fabrics are designed to suit every age-group, every taste, every need. Hard-wearing, easy-washing, colour-fast...Elphinstone fabrics come to you in a fascinating array of patterns and shades ... for dainty children's frocks, pretty dresses, gorgeous cholis. And to beautify your home ...there's a brilliant spectrum of Elphinstone furnishing fabrics...in attractive designs and eye catching colours. ELPHINSTONE-luxury fabrics at economy prices!
Also manufacturers of the famous fastest selling CHEETA Leather Cloth
The Elphinstone Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd.
32, NICOL ROAD, BALLARD ESTATE, BOMBAY 1.

সাপ্তাহিক বসুমতী

মার্কিন দেশের বিজয়ী অধিনায়ক—
প্রেসিডেণ্ট লিণ্ডন জনসন ও ভাইস
প্রেসিডেণ্ট হুবার্ট হামফ্রে।

২৪শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৬শে কার্তিক, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ • 12th November, 1964 • Vol. 69, No.

সূচীপত্র

7563
.003/3
V.69
24

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	১৪৭৫
আজকের মানুষ	...	১৪৭৬
সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর	হরপ্রসাদ মিত্র	১৪৭৭
জরিমানা (কবিতা)	বৈশম্পায়ন	১৪৭৯
শুব্ধ হৃদয় (কবিতা)	অপরাজিতা গোপ্পী	১৪৭৯
জওহর-সান্নিধ্য	অনু বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৮০
ভারতদর্শন	...	১৪৮১
আন্তর্জাতিক	...	১৪৮৭
ক্যালো সরকার (গোয়েন্দা-গল্প)	অদ্রীশ বর্ধন	১৪৯২
বঙ্গদর্শন	...	১৪৯৫
শহর কলকাতা	শ্রীপদাতিক	১৪৯৯

কবিকঙ্কণ চণ্ডী

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পাঠ্যপুস্তক)

মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার চণ্ডীর কাহিনী বাঙ্গালার বিশিষ্ট জাতীয় জীবনের কাহিনী। তাঁহার কাব্যে পাই মধ্যযুগের বাঙ্গালার নিখুঁত সমাজের সুস্পষ্ট আলেখ্য। শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্য্যাতিত বাস্তুচ্যুত মুকুন্দরাম দুঃখ ও বেদনাক্লিষ্ট বাঙ্গালার প্রতিনিধি কবি—ব্যক্তির দুঃখ কি করিয়া সর্বজনের দুঃখ হইতে পারে বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা মুকুন্দরামই সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়াছেন। এই হিসাবে তিনি আধুনিক বাঙ্গালার রোমান্টিক সাহিত্যসাধনার অগ্রদূত।

—বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে—

১। মূল কাব্য, ২। সুবিস্তৃত ভূমিকা, ৩। কবির জীবনী, ৪। কাব্য-পরিচিতি, ৫। কবিকঙ্কণ যুগের বঙ্গভাষা (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত), ৬। বিস্তৃত কাব্য সমালোচনা এবং ৭। অপ্রচলিত শব্দের অর্থ।

মূল্য সাড়ে চার টাকা

নীহাররঞ্জন গুপ্তের গ্রন্থাবলী

মূল্য সাড়ে তিন টাকা

কালো ভ্রমরের চমকপ্রদ বিস্ময়কর কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিদেশী গোয়েন্দা-সাহিত্যের শার্লক হোমসের মত বুদ্ধিদীপ্ত কিরীটি রায়ের আবির্ভাব।

বাংলার মিস্ট্রী সাহিত্যে

ডাঃ নীহাররঞ্জনের দান অপূর্ব্ব

—তেরখানি নির্ব্বাচিত রচনা—

কালো ভ্রমর, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে, রক্তহীরা রক্তমুখী নীলা, পদ্মদহের পিশাচ, পঞ্চমুখী হীরা, রক্তগেরুয়া, ঘুম, কালচক্র, কবর, পাথরের চোখ, সর্প, অঙ্গুরীয়, প্রণাম জানাই

প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকার ও প্রবীণ সাহিত্যিক
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মণিলাল গ্রন্থাবলী

২য় ভাগে—৬খানি রচনা ৩৩০ পৃঃ—৩

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
এ মাসের বৃটেনে	জি এ জনসন	১৫০৬
বোহেমিয়ার মাছের পুকুর (কবিতা)	মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়	১৫০৭
একটি বৃক্ষের অপমৃত্যুতে (কবিতা)	ধন্বন্তরি	১৫০৭
কৃষ্ণচূড়া (ধারাবাহিক উপন্যাস)	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০৮
বাণিজ্যে সেকাল ও একাল	ধনপতি সওদাগর	১৫১২
চোর (অনুবাদ-গল্প)	হরেন ঘোষ	১৫১৫
আঁধারমাণিক (ধারাবাহিক উপন্যাস)	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	১৫১৯
পাঠকমন	...	১৫২৩
চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা	দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫২৪
রঙ্গজগৎ	...	১৫২৭
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	শিলালি	১৫৩৩
খেলাধূলা	শ্রীঅমিতাভ	১৫৩৫

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বেকার, চাকুরীপ্রার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের ভাষা শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য্য একমাত্র গ্রন্থ

॥ বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সহায়ক ॥

০০০ স্বল্পশ্রমে পর্য্যাপ্ত ফল অবশ্যম্ভাবী ০০০

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

রা জ ভা ষা

(ইংরাজী ভাষা সহজে শিক্ষার অদ্বিতীয় সাহায্যগ্রন্থ)

এক আধারে : ভাষা - ব্যাকরণ - শব্দার্থ

ইংরাজী হইতে বাঙলা—৩·৫০ ॥ ইংরাজী হইতে উর্দ্দু—১·০০

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের

ম হা ভা র ত

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড]

(প্রতি খণ্ড মূল্য আট টাকা)

সদ্য-প্রকাশিত চতুর্থ খণ্ড : মূল্য—ছয় টাকা

(ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মাইকেল গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে :—মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, পদ্মাবতী-নাটক, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা ?

মূল্য—তিন টাকা

দ্বিতীয় ভাগে :—কৃষ্ণকুমারী নাটক, শর্মিষ্ঠা নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী, বিবিধ - কাব্য, মায়া কানন, হেক্টর বধ।

মূল্য—দুই টাকা

—ঔপন্যাসিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান—

দামোদর মুখোপাধ্যায়ের

দামোদর-গ্রন্থাবলী

১ম খণ্ড ১·৫০ ২য় খণ্ড ২·৫০

৩য় খণ্ড ১·০০ ৪র্থ খণ্ড ২·৫০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৬১ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা—মূল্য ২৫ পঃ 25 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৬শে কার্তিক ১৩৭১ Thursday, 12th November 1964

চোদ্দই নভেম্বর

আগামী চোদ্দই নভেম্বর শ্রীনেহরুর জন্মদিন।

শ্রীনেহরু এই জগতের কর্মকাণ্ড থেকে চিরকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুদিনের শোক-বিহ্বল স্মৃতি আমাদের মুহ্যমান করে তুলবে, তবু এই বিশাল ভারতে নেহরু নেই—একথা বিশ্বাস করা যায় না। যে নেহরু এখন ভারতের পাহাড়-পর্বতে, তৃণে, মাটিতে বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছেন—একদা তিনিই তাঁর স্বপ্নের ভারতে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু সেই পুনর্জীবনের পূর্ণ দায়িত্ব চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর। ভারত গঠনের যে মহান প্রকল্পে নেহরু-চিন্তা সর্বদাই নিয়োজিত থাকতো—সমৃদ্ধ সেই ভারতেই ফিরে পাবো আমরা আমাদের প্রাণের নেহরুকে। এতদিন তিনি ছিলেন আমাদের চোখের সম্মুখে, আজ তিনি প্রাণের গভীরে। সেখান থেকেই আমরা তুলে ধরছি স্বতোৎসারিত প্রাণাঞ্জলি—

'হে নেহরু, তোমার ৭৫তম জন্মদিনে আমরা শপথ গ্রহণ করছি—তোমার প্রকল্পিত শান্তি-বিরাজিত মানব-সৌধ সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য স্থাপন করবো। তোমার কামনা হোক আমাদের প্রেরণা।'

পরাধীন ভারতের অমিততেজা বীর, স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ গণনায়ক শ্রীজওহরলালের জন্মদিন হোক আমাদের বিচারের দিন,—সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ থেকেও আমরা দেশ ও দশের স্বার্থে কতখানি আত্মনিয়োগ করতে পেরেছি—তার বিচার যেন করতে পারি চোদ্দই নভেম্বর। জাতীয় সংহতি-সাধনে যে প্রবল প্রচেষ্টা শ্রীনেহরু আমাদের দেখিয়ে গেছেন আমরা কি পরিপূর্ণভাবে তা সার্থক করে তুলতে পেরেছি? কোনো রূঢ় কটাক্ষে বশীভূত হয়ে এ প্রশ্নের মুখোমুখি হলে সত্য লাভ করা যায় না, যথার্থ উত্তরের জন্য চাই নিজের ব্যক্তিসত্তার কাছে নির্মম প্রশ্ন। চাণক্য নামের অন্তরালে নেহরুই ত' সেই প্রশ্ন করতে আমাদের শিখিয়েছেন। চোদ্দই নভেম্বর সেই প্রশ্নের একটি অনাড়ম্বর দিন হলে ক্ষতি কি?

আমাদের নেতৃবর্গের মধ্যে নেহরুর প্রতি শ্রদ্ধা অসীম। প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী কিছুদিন পূর্বে নেহরু-নীতি অনুসরণের নিমিত্ত অকুণ্ঠ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই নীতি অনুসরণ ও তার প্রতি আস্থা প্রকাশ করা সহজ হলেও দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে সেই নীতি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করার মধ্যেই রয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শ্রীশাস্ত্রীর কঠিন পরীক্ষা।

শ্রীনেহরুর পরলোকগমনের পর নীতি-বিপর্যস্তকারী একদল জিঘাংসু মুনাফাবাজ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথে আজ বিরাট বাধা। শিশুরাও আজ ক্ষুধা-কবলিত। নেহরু-জন্মদিনে শিশু-দিবসের আয়োজন দুষ্কৃতকারীদের ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়েছে।

মনে রাখা দরকার, সারা দেশের আনন্দিত শিশুদের চোখে চাচা-নেহরুর অমরতা ফুটে উঠলে সার্থক হবে শ্রীনেহরুর জন্মদিন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

পিতার অন্তিম শয্যাপাশে দু-ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাঁরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যাবেন না। একে অপরকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন না।

পিতা এই প্রতিজ্ঞা শুনে হয়তো শান্তিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

ইতিহাসে এটা নতুন ঘটনা নয়। এরূপ নাটকীয় ঘটনা আমাদের দেশে মোগল রাজত্বের ইতিহাসে অনেক আছে,—যা ঘটতো দিল্লীর মসনদকে ঘিরে। মধ্য-প্রাচ্যের ইতিহাসেও অসংখ্য ঘটেছে। আবার সেই নাটকীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো,—দু-ভাইয়ের মধ্যে। এক ভাই রাজা সৌদ, যিনি সৌদি আরবের সিংহাসনাসীন ছিলেন; আর একজন তাঁরই ছোট ভাই যুবরাজ ফয়জল।

এই ঘটনা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। কারণ, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজার পরিবর্তন ঘটলেও, বাস্তবিকপক্ষে ১৯৫৮ সাল থেকে রাজ্য শাসন করছিলেন যুবরাজ ফয়জল ইবন সৌদ আবদেল আজিজ। রাজা সৌদ রাজপ্রাসাদে বিলাসে দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজ্যের আয়ের মোটা টাকা জনসাধারণের উন্নতির জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে সেই টাকা ব্যয়িত হয়েছে রাজার ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করার জন্য। ফলে বেড়েছে দেশবাসীর দারিদ্র্য ও দুর্গতি। অথচ সৌদি আরবের সম্পদ কম নয়। তেল উৎপাদনের দিক থেকে এদেশের স্থান বিশ্বে পঞ্চম। ঘাওয়ার (Ghawar) তেলের খনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ।

বিরোধ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যে যখন রাজা সৌদের চক্রান্তে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়েছিল। সেদিনের সর্বনাশা চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন যুবরাজ ফয়জল এবং তার পরেই আস্তে আস্তে তিনি শাসনক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে। তিনি বড়ভাইয়ের মত রাজ্যের অর্থ ব্যক্তিগত বিলাসে ব্যয় করার পক্ষপাতী নন এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের পক্ষপাতিরূপে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি সংস্কারমূলক ব্যবস্থায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু যুবরাজের এই সংস্কারমূলক কাজ রাজা সৌদের পছন্দ হয় নি। তাই ভেতরে ভেতরে চক্রান্ত চলছিল উপজাতি নেতাদের যুবরাজ ফয়জলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার, তাঁর অর্থনৈতিক সংস্কারকে বানচাল করে দেবার। ১৯৬০ সালে ফয়জলের বাজেট গ্রহণ করতে রাজা অস্বীকার করেন। ফলে ফয়জল প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দেন। রাজা তড়িৎগতিতে এই পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেন এবং নিজেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তারপরে তিনটি বছর কেটেছে নিঃশব্দে। কিন্তু অন্তঃসলিলা ক্রোধ বয়ে গেছে সিংহাসনের নীচে দিয়ে। ফয়জল প্রতীক্ষা করেছেন সময়ের জন্য। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দেওয়ালের লিখন, জনমনের কথা। আস্তে আস্তে সরকার পরিচালনায় শিথিলতা দেখা দিল, রাজা সৌদ ব্যক্তিগত বিলাসে ডুবে থাকলেন, সামন্ত-পতিদের ওপর কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে এলো।

যুবরাজ ফয়জল পিতার নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে যান নি। তাই এতদিন তিনি জ্যেষ্ঠের প্রতি চরম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নি। কিন্তু অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে। বড়ভাই যদি নিজের মর্যাদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন তা হলে ছোট ভাই ত' নিরুপায়। যুবরাজ ফয়জল দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল অংশেরও সমর্থন লাভ করলেন। সুযোগও উপস্থিত হলো। তিনি উপযুক্ত সময়ে আঘাত হানলেন এবং জয়ী হলেন। যুবরাজ ফয়জল ইবন আবদেল আজিজ হলেন নতুন রাজা।

যুবরাজ ফয়জল

নতুন রাজা ঘোষণা করেছেন দেশের তৈল-সম্পদ থেকে প্রাপ্য অর্থ ব্যয়িত হবে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য। সাধারণের মঙ্গলজনক আইন ও অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন তিনি। সৌদি আরবের এই বিপ্লব রাজ-অন্তঃপুরে ঘটলেও দেশের পক্ষে সত্যিই এটি একটি পরিবর্তন।

সাহিত্যের দেশ-দেশান্তর

হরপ্রসাদ মিত্র

'বন্ধ ঘরের আজব সওয়াল' কথাটা মনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

অনেকে একথা শুনে আহত হতে পারেন বলে আশঙ্কা তো হতেই পারে। আমি কাউকে আহত করবার জন্যে এ লেখা লিখতে বসি নি। সাহিত্যের কোনো কোনো প্রয়াস এবং কোনো কোনো কৃতিত্বের নমুনা ধরে ধরে শুধু আমার নিজের প্রতিক্রিয়া লিখে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

কাফ্কার অন্যান্য রচনা আছে। সে সব লেখার কথাও বিবেচ্য। আমি ঐ বন্ধ ঘরের 'আজব সওয়াল' কথাটার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে তার এই বিশেষ একখানি বইয়ের কথাই এখানে জানাতে চেয়েছি।

সাহিত্যে বিস্ময়ের অন্ত নেই। বিস্মিত হবার এবং ভাষায় সেই বিস্ময়-বোধ প্রকাশের অসাধারণ সামর্থ্যের নামই সাহিত্যিকের ক্ষমতা। কাফ্কার বিচার-কাহিনীতে আমি এই ক্ষমতা একেবারেই যে না-দেখেছি, তা নয়। কিন্তু সুখ-দুঃখের অকৃত্রিম অনুভূতি জাগিয়ে তোলা আর কায়দা-কসরতের পরীক্ষা,—সংসারে এ দুই-ই তো আছে!

সাহিত্যে এই অবাক হবার অভিজ্ঞতা যে কী ব্যাপার, সে কথা অনেকেই বোঝাতে চেয়েছেন; কিন্তু ঠিক নিখুঁত ভাবে কেউ কি তা বোঝাতে পারেন?

আর্নল্ড বেনেটের লেখাতেও সেই চেষ্টাই দেখা দিয়েছিল। সাহিত্যিক রুচি সম্বন্ধে তাঁর বইখানির প্রথম অধ্যায়েই তিনি লিখে গেছেন যে, সাহিত্য না-বোঝা আর আদব-কায়দা না-জানা ঠিক এক ব্যাপার নয়। তিনি তাঁর পরিচিত এক তরুণ গণিতজ্ঞের উল্লেখ করেছিলেন, যিনি অঙ্কের অ্যাকাডেমিতে অধ্যাপক, দাবা খেলায় যিনি প্রচণ্ড, চমৎকার বেহালাবাদকও,—সাহিত্যের দু'চার কথা শুনে তিনি বলেন—আচ্ছা, এইবার আমি সাহিত্যটা ধরছি।

বেনেটের এই মজার অধ্যাপক ভদ্রলোক যে-চোখে সাহিত্য দেখতে চেয়েছিলেন, সে দৃষ্টি সত্যিই এ-রাজ্যের বাঞ্ছিত দৃষ্টি নয়। বেনেট বলেছেন, সাহিত্যজ্ঞান তো কেবল অলঙ্কার নয়, কেবল আভরণ নয়। সম্পূর্ণ জীবন-সাধনা বলতে যা বোঝায়, সাহিত্যবোধ তারই উদ্দীপনা জোগায়।

তিনি বলেন, সাহিত্যের স্বাধীনতার স্বাদ যে পায় নি, সে তার মাতৃগর্ভের ঘুম থেকেই জাগে নি। তার জন্মই হয় নি। সে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না,—পুরোপুরি অনুভব করতেও পারে না। সে কেবল খেতে পারে।

আমি হলে বলতুম—আহা, মশাই পুরোপুরি খেতেও কি পারে? রবীন্দ্রনাথ মানুষের খাবার রুচির কথাও বুঝিয়ে গেছেন। শুধু আপেলের শাঁসটাই কি খাদ্য? তার বর্ণ গন্ধও কি স্বাদ নয়?

বেনেট বলেছেন—তোমাদের নিজের ভাব দিয়েই সাহিত্যের অবাক ভাবটা বোঝানো যেতে পারে। তোমার নিজের ভেতরকার ইতিহাসে নজর দাও। সেদিন বিকেলে বিশ্বস্ত যে বন্ধুটির সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলে, যাকে তুমি নিজের সব কথাই জানিয়ে থাকো, তার কাছ থেকেও তোমার মনের সেদিনকার সব চেয়ে বড় কথাটা তুমি প্রথমটা লুকোতে চেয়েছিলে। এদিকে তোমার নিজের মনে সেই বিশেষ ভাবের চাপ তো ছিলই, তার ওপর বন্ধুটি খুবই সহানুভূতিশীল, তার কৌতূহলও ছিল, যথাযথ সম্মানবোধও ছিল, তাই তুমি শেষ পর্যন্ত তার কাছে বলে ফেললে কথাটা—'আরে ভায়া, মেয়েটি পরমা'।

বেনেট এ অবস্থা নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন।

লিখেছেন—একথা ঠিকই যে জগতের সাধারণ মানুষের স্বীকার্য নজরে দেখলে সে মেয়েটিকে কেউই 'পরমা' বলবে না। তোমার সেই বিশ্বস্ত বন্ধুটিও কখনো তাকে সেরকম কিছু ভাবে নি। আরো চল্লিশ হাজার নজরওয়ালা নির্ভরযোগ্য চক্ষুষ্মানও তা ভাবে নি। সে মেয়ের জন্যে ট্রয় পোড়ে নি। কোনো মেয়েকেই 'পরমা' বলা চলে না। কোনো মেয়েকে যদি পরমাশ্চর্য বলতে হয়, তাহলে জগতের প্রায় সব-কিছুকেই তুমি পরমাশ্চর্য বলতে পারো। আসল কথা জগতের লক্ষ-কোটি আশ্চর্যের মধ্যে একটি বিস্ময়ের সম্বন্ধে তুমি সজাগ হয়ে উঠেছিলে। বিশেষ একটি বিষয়ই তোমার মনে ঢেউ তুলেছিল, আর সেই ভাবের ঢেউটা তুমি আর-একজনকে জানাবার জন্যে স্বর্গীয় আলোড়ন অনুভব করেছিলে। তোমার সেই বন্ধুটি জানতো যে, সে মেয়েটি মোটেই পরমাশ্চর্য কিছু নয়। আর কেউ সেকথা বললে সে তা বিশ্বাসও করতো না। কিন্তু তুমি তোমার নিজের ধারণার সততায়, দৃষ্টির ঐকান্তিকতায় এবং সেই বন্ধুটিকে তোমার ধারণার অংশীদার করবার ব্যাকুলতায় সত্যিই তাকে ভাবিয়েছিলে। বন্ধুটি অনেকক্ষণ ভেবেছিল। ভেবেছিল যে, সেই মেয়েটির সেই পরমাশ্চর্য রূপ দেখবার চোখই ছিল না তার!

বেনেট বলেছেন—শোনো, শোনো,—সাহিত্য সৃষ্টি করছিলে তুমি। তোমার চোখের পাতা খুলে গিয়েছিল, তোমার কান জেগে উঠেছিল,—জগতের একটা অংশের সৌন্দর্য আর রহস্য সম্বন্ধে তুমি সজাগ হয়েছিলে, আর তোমার ভেতরকার প্রবল এক বোধ আর এক জনের কাছে তোমার আত্মপ্রকাশের পথ খুলে দিয়েছিল।

কাফ্‌কার কায়দার কথা ভাবতে-ভাবতে আমি মহেন্দ্রনাথের ভ্রমণকথা ধরে সুখীডাঙে গিয়ে হাঁপ ছাড়তে চেয়েছিলুম বটে, কিন্তু সেখানেও কাফ্‌কাকে সম্পূর্ণ ভুলতে পারি নি। কারণ, কাফ্‌কাও মানুষের মন যে কী আশ্চর্য, তারই কিছু কিছু উদাহরণ রেখে গেছেন।

জগৎ ভারি এক চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। জীবনের কৌতূহল ভোলবার নয়। বেনেটের ব্যাখ্যার সেই বিশ্বস্ত বন্ধুর মতন পাঠককে লেখকের সঙ্গে চলতে হবে,—তাঁর কথা শুনতে হবে।

সাহিত্য আমাদের অবসর কাটাবার একটা উপায় মাত্র নয়। সাহিত্য আমাদের সুখ-দুঃখ-সমবেদনা-বোধের পথ, আমাদের জীবনবোধের জানলা।

জীবন মানুষের চেতনায় এক ভাবে ধরা দেয়, অন্য জীবজন্তুর চেতনায় অন্য নানা ভাবে। আমরা কার্য-কারণ-প্রবাহের সম্পর্ক দেখতে দেখতে পথ চলছি। সারাজীবনই তাই। আমরা অবশ্য এলোমেলো, উদ্ভট, অদ্ভুত ব্যাপারও দেখতে পাই। সে-সব ক্ষেত্রে, আমরা জানি আমাদের দৃষ্টি আমাদের প্রত্যাশিত পুরো দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে না। তাই ভূতও আছে, অদ্ভুতও আছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধি ভূত-প্রেতকেও ইহলোক-পরলোকের সেতুবন্ধনে বাঁধতে চায়। মন আমাদের যুক্তিবিশ্বাসী, শৃঙ্খলা-প্রিয়।

তাই কতো পরমের পরমাচ্ছন্ন ভাব যে আমাদের কাটিয়ে উঠতে হয়। জগতের কৌতূহল ভোলবার নয়, ফেলবারও নয়। ইশারার দাম দিতে কোনো সুস্থ পাঠকই আপত্তি করবেন না। আসল কথা, জীবনের সমস্ত আন্তরিক বিস্ময়বোধই নিজেদের বোধ-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে দেখা মানুষের স্বভাব। ষ্টাইলের কথা বলতে গিয়ে বেনেট জানিয়ে গেছেন—জগতের আর পাঁচটা বিষয়ের যেমন, সাহিত্যের বিচারেও তেমনি সাধারণ-বোধ দিয়ে ভেবে দেখতে হবে। সেই আমাদের সাধারণ-বোধের গুণেই বোঝা যায় যে, কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তির পক্ষেও একই সঙ্গে সুন্দর এবং কুৎসিত হওয়া সম্ভব নয়,—যথাযথ এবং ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা ভাব এক সঙ্গে থাকতে পারে না।

কাফ্‌কার বিচার-কাহিনী যে অনেকটাই ঝাপ্‌সা ধরনের, সে-বিষয়ে মতান্তর হবে না।

আমি সব ক্ষেত্রে ঝাপ্‌সা-ভাবের সৌন্দর্য অস্বীকার করবো কেন? শীতের প্রথম কুয়াশা, সমুদ্রের দিগ্‌বলয়,—না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর অন্ধকার কি তুচ্ছ?

বোধ হয়, উচ্চ আর তুচ্ছ—আস্বাদনের এই দুটি ভূমির মাঝামাঝি জায়গার সীমারেখা টেনে দেওয়া দুঃসাধ্য কাজ। অনেক সাহিত্য পড়তে পড়তে পাঠক সেই সীমানাটা নিজেই বুঝতে পারেন।

বেনেট ডি-কুইন্সির প্রসিদ্ধ রচনাটি স্মরণ করেছিলেন—শক্তির সাহিত্য, আর জ্ঞানের সাহিত্য। অবিমিশ্র শক্তির সাহিত্যের নমুনা হিসেবে বেনেট নাম করেছিলেন কোলরিজের 'কুবলা খান'-এর; অনেকটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাহিত্য হিসেবে উদাহরণ দিয়েছিলেন স্পেনসারের 'ফার্স্ট প্রিন্সিপলস।' কিন্তু এ-বিভাগও অটুট নয়। কিছু কিছু মেলা-মেশা ঘটেই থাকে। বেনেট লিখে গেছেন—'আইভ্যান হো'তে, প্রেরণা বা শক্তি-লক্ষণ বেশি, আবার শেক্সপীয়র সম্বন্ধে হ্যাজলিটের প্রবন্ধগুলিতে জ্ঞান-লক্ষণের আধিক্য।

এইসব শ্রেণীভেদের পরিচিত নিরিখ মনে রেখে কাফ্‌কার বিচার-কাহিনী ঠিক কোন্ শ্রেণীতে ধর্তব্য, সেটা ভাবা যায় কি?

এসব প্রশ্ন মনে জাগবেই। জাগুক। জবাব আসুক আর না-আসুক, তবু পড়তে-পড়তে পথ চলাই তো আনন্দ। অনেক হাওয়ার ঢেউ লাগুক মনে মনে। অনেক লেখকের অনেক মনোভঙ্গি দেখা দরকার।

জগতের এই সাহিত্য-সমুদ্রের সামনে না দাঁড়ালে কোনো দেশের কোনো সাহিত্যিকও নিজের সামর্থ্যের ঠিক হদিস পান না, কোনো পাঠকও নিজের আনন্দ-বেদনার এলাকা ঠিক অনুভব করতে পারেন না।

আমার মনে হয়, আমরা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠকরা কেমন যেন বঞ্চিত হয়ে আছি। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আছেন বটে, কিন্তু আরো কতো লেখকের কতো মনের কতো ঢেউ সত্যিকার সুস্থ আন্তরিকতার সঙ্গে ইতিমধ্যে সাহিত্যের সাতসমুদ্রে উঠেছে পড়েছে ভেঙেছে হারিয়েছে। বাংলায় তাঁদের সম্বন্ধে আরো আলোচনা বেরুলে ভালো হোতো। ফ্যাশানের চটক হিসেবে নয়,—সত্যার্থীর কৌতূহলবশে। সত্যিকার পাঠক যাঁরা, তাঁরাই লিখতে পারেন সে-সব। লেখকরা মার্জনা করবেন, আমি তাঁদের সম্বন্ধে কোনো কটাক্ষ করছি না, আমি শুধু আমাদের পাঠক-সমাজকে তাঁদের সহযোগী আর একজন পাঠকের অভিপ্রায় জানাচ্ছি।

আমি জানি না আমার মনের কথা তাঁদের জানাতে পারলুম কী না। কথাটা আরো খুলে বলি। মন সৎ-পাঠকের প্রতীক্ষারত। সৎ-পাঠক কে?—এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাওয়া আমার পক্ষে মূঢ়তা। আমি বার বার

অনুভব করি যে, সাহিত্যের বিশাল সমুদ্রের না আছে কূল, না আছে তল। যিনি সৎ-পাঠক, তিনি এ-সমুদ্রে আত্মস্থ থাকতে পারেন। তাঁর প্রকৃতি ভাবতে গেলে আমার একটি জাতক-কাহিনী মনে পড়ে। সে জাতকের নাম 'ভেরীবাদ জাতক'।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ছিলেন এক ভেরীবাদক। বারাণসী নগরে এক উৎসব উপলক্ষে ভেরী বাজিয়ে তিনি কিছু পারিশ্রমিক পান। তারপর নিজের সে-জন্মের ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দস্যু-অধ্যুষিত এক অরণ্য। ছেলেটি একটানা ভেরী বাজিয়ে বাপের সঙ্গে সেই জঙ্গল পেরিয়ে চলেছে,—বাপ বললেন, 'বাবা, একটানা ভেরী বাজিও না, বুড়ো বড়ো লোক যখন পথ চলেন, তখন তাঁদের অনুচররা যেমন থেমে থেমে ভেরী বাজায়, তেমনি বাজাও।' কিন্তু ছোটো ছেলেটি তখন বাজনার মজা পেয়ে গেছে। বাপের কথা সে কানে তুললো না।

দস্যুরা প্রথমে ভেবেছিল অনেক লোকজন নিয়ে কোনো রাজা-মহারাজা চলেছেন। তাই তারা ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে ছিল। তারপর একটানা বাজনা শুনে আড়াল থেকে আসল দৃশ্যটি দেখে তারা বেরিয়ে এসে বাপ-ছেলেকে খুব মারপিট করে টাকাকড়ি কেড়ে নিল।

বোধিসত্ত্ব তাঁর পূর্বজন্মের এই কাহিনী স্মরণ করে যে গাথা পাঠ করেন, স্বর্গত ঈশানচন্দ্র ঘোষের বাংলায় তার প্রথম দু'ছত্র এই—

কিছুতেই বাড়াবাড়ি কোরো না কখন
শিখিবে 'অত্যন্ত সর্ব' করিতে বর্জন।

এ-কাহিনী আমার এই আলোচনায় আমার অভিপ্রেত ইশারা মাত্র। আমার মনে হয়, সাহিত্যের সৎ-পাঠক তিনিই—যিনি সাহিত্যের পথে যথার্থ বড়ো মনের চাল-চলন, হাবভাব চিনতে পারেন। অপোগণ্ড বালকই কেবল যে-কোনো হুজুকে অথবা যে-কোনো চটকে মেতে ওঠে, ক্ষণে ক্ষণে ভেরী বাজায়। আমি আবার বলছি, এ সব আমার পাঠকমনের কথা। আমি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে নিজেরই সামর্থ্যের কথা জানাচ্ছি। আমি কি অবিনয় প্রকাশ করতে পারি? ক্ষুদ্রতা, ঔদ্ধত্য—না অন্য কিছুই নয় এ-সব। লেখকরা আমার মনের কথাটা বুঝলে সুখী হবো।

(ক্রমশ:)

জরিমানা

বৈশম্পায়ন

এই ত সেদিন মাত্র হোল নন্দকুমারের ফাঁসি,
ঠিক সেই বধ্যমঞ্চে যেতে আজ প্রস্তুত কে হয়?
কেন না সে-ঠাঁই ভুলে হচ্ছি ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী
আমরা সবাই। আর, মুখ টিপে হাসছে সময়।
মাণিকতলার সেই পোড়ো ঘরে ছিল ইতিহাস,
সেখানে বাদুড় আজ প্রাসাদে করে কি স্তন্যদান?
কাটা মুণ্ড জোড়া দেখে হাড়ে কা'র লেগেছে বাতাস?
জানি না তা মায়াবীর ছল কিংবা চতুর সম্মান।

জমিতে জরিপ হচ্ছে। নক্সা তৈরি। লোহার কাঠামো
দেখে ভারি ভয় করে। ওই গৃহ রক্ত চুষে খায়।
গাড়িটা কী জোরে যাচ্ছে! সরে এসো। এক পাশে থামো।
চাকায় ছুঁড়ছে কাদা, দ্যাখো, নন্দকুমারের গায়।
আমরা খাঁচায় বন্ধ? কথা বলা চিরকাল মানা?
দাঁড় থেকে পথে গেলে দিতে হবে রক্ত জরিমানা।

স্তব্ধ হৃদয়

অপরাজিতা গোস্বামী

স্তব্ধ হৃদয়ে দিয়েছে বিছায়ে
একক মন, একান্ত আপন;
সবুজ প্রান্তে,
প্রতিদিন সেখানে জমে ওঠে
শিশির সজল,—সেখানে
এ মুগ্ধ নয়ন রেখে যায়
প্রাণের ছোঁয়া একান্ত গোপন।
দূর দূরান্ত হ'তে
সে আহ্বান ফেলে যায়
দীর্ঘশ্বাস অনুক্ত দ্বিধায়,
সেখানে এ মুগ্ধ নয়ন
বার বার নিয়েছে ছিনিয়ে
পলাশের সবটুকু রঙ।
সেখানে সোনালী ধানের শিষে
মাছরাঙা পাখি আর ফড়িঙের
পায়ের শব্দ—বাতাসের বুকে
তোলে শব্দ তরঙ্গ,
সেখানে নিস্তব্ধ দুপুরের
নিঃসঙ্গ হাহাকার
বৈশাখের তাপদগ্ধে
নিজেরে দিয়েছে বিছিয়ে
সীমাহীন আকাশের বুকে।

জওহর সান্নিধ্য

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

সে-রাতে জওহরলালের ভস্মাধার দেখে এলুম ময়দানে। পটভূমিতে টাঙিয়ে রাখা বড় ছবিটির দিকে চেয়ে ভাবছিলুম: 'তোমাকে ঘিরে আমাদের কত আশা, কত কল্পনা, কত লাভের লোভ, সব এখন ব্যর্থ মিথ্যা হয়ে গেল। আমরা কি আলেয়ার আলোয় ভুলেছিলুম? তুমি যে চিরন্তন ভুবন-মোহন, তুমি সুন্দর, আমরা ভালবাসি।'

জওহরলালের সাহচর্য বেশি পাই নি, তবু এত নিশ্চিত ছিল ওঁর কাছে যাওয়া-পাওয়ার সুযোগ যে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রেখেছিলুম নানা সৌখিন আবদার। উনি যে স্বাক্ষর করা ছবি পাঠিয়েছিলেন তার ভঙ্গিমা পছন্দ হয় নি বলে সঞ্চয় করি নি, অন্য একটা চেয়ে নেব ইচ্ছা ছিল। আর মনে রঙ-রস জোগাবে এমন গণনায়ক কে রইল? মনের দিগন্তে কোথাও কারো ছবি জাগছে না তেমন প্রিয় পুরুষশ্রেষ্ঠের। ওঁর চলনবলন হাসি ভ্রূকুটি অসহিষ্ণুতা সহজাত নাটকীয় ভঙ্গী সবই ছিল মধুর, চিত্তজয়ী।

গত তেইশ বছরের পরিচয়কালে ক'বারই বা ওঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি, ক'বারই বা কথা কয়েছি? তবু মন বিকিয়ে দিতে হয়েছে। ঐ—

'রাজার দুলাল গেল চলি
মোর ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কি মতে'

গোছের অবস্থা।

জ্ঞানবান, বিশ্লেবুদ্ধি, রূপধন, প্রতিষ্ঠা-বয়সের বিষম পার্থক্য সত্ত্বেও যখনই ওঁর সঙ্গে কথায় ঠোকাঠুকি বাধত তখন নিজদাক্ষিণ্যে আমার হঠকারিতা তিনি উপেক্ষা করেছেন।

১৯৪১ সালে কয়েদখানা থেকে মুক্ত হলেন জওহরলাল। পরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন আমি স্নাতকোত্তর ছাত্রী। এখনকার মতোই রাজনীতিজ্ঞানে কাঁচা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষের প্রতি অবিচারের পর থেকে বাংলার একটি বড় দল, বিশেষ যুবসম্প্রদায় গান্ধী-জওহরের ওপর মহাখাপ্পা হয়েছিল, সে অতৃপ্ত উষ্মা পূর্বপাকিস্তানের স্বীকৃতির পর বাংলার নিষ্ফল বেদনার মতোই। ছাত্রদের একটি দল সভায় জওহরলালকে জেরা করার জন্য তৈরি ছিল।

প্রায় অচেনা এক ছাত্র জওহরলালকে মালা পরাবার প্রস্তাব আমার কাছে করেছিল। আমি খাদি পরি এ ছাড়া কোনও যুক্তি ছিল না তার পিছনে। আমি ভাল ছাত্রীও নই, মজলিসি-রূপসীও নই। সে অনুরোধ প্রত্যাখান ক'রে আমি সভায় গিয়ে দু'পাশের ঘনজনতার মাঝে যে সরণী থাকে তার একপ্রান্তে ঠাঁই নিয়েছিলুম।

সভা সুরু হবার কিছুকাল পরে মতামতের কচকচির নিরাবরণ প্রকাশ ঘটতে থাকল বেশ উচ্চরোলে। পঞ্চাশোর্ধ্বের জওহরলাল তখনও নিতান্ত অসহিষ্ণু যুবক ও নেতা, বেশ বকে ধমকে কথা কইতে লাগলেন। মানুষকে ডেকে এনে অবমাননা করার মধ্যে আমি কিছু মৌলিক বুদ্ধিমত্তা খুঁজে পাই না, আমার রুচিবোধে ঘা দিয়েছিল এ চপল অসংযম। অথচ তখন আমি মোটেই জওহর-ভক্ত নই, ওঁর 'চাণক্য' ছদ্মনামে লেখাটা ছাড়া কিছু পড়ি নি, ওঁর দেশসেবা, নির্বাচন সফরের কেরামতি, বক্তৃতার যাদু, ব্যক্তিগত চুম্বকশক্তি, সব কিছুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল নগণ্য, নৈর্ব্যক্তিক। একটা সাদর শ্রদ্ধার ভাব ছিল মনে।

সভায় বাদানুবাদের বেগ একটু নিস্তেজ হবার ক্ষণে আমার এক সহপাঠিনী মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলল স্বাক্ষর গ্রহণের পুস্তিকা নিয়ে। আমি রইলুম তার পিছনে। সে আমাদের মধ্যে সেরা ছাত্রী, ইংরেজী আদবকায়দা ঘেঁষা শিক্ষায়তনে মার্জিতভাবে শিক্ষিত, ওদের নিয়মনিষ্ঠাবোধের সম্বন্ধে অবচেতন সমীহ ছিল আমার মনে তাই শুধালুম: 'তুমি অটোগ্রাফ চাইবে?' অতশত যুবক-যুবতীর মেলায় জওহরলাল পূর্বেই জানিয়েছিলেন যে, স্বাক্ষর দেবেন না। লম্বাচওড়া বান্ধবী এগিয়ে চলল স্থির সঙ্কল্প নিয়ে, কৃষ্ণ-কৃশতনু আমি সসঙ্কোচে হাতের মোড়কটি চেপে তাকে অনুসরণ করলুম। বই মেলে ধরামাত্র জওহরলাল ধমকে বলে উঠলেন: 'আমি বলেছি তো সই আমি দেব না। তবু কেন এসেছ, মেয়ে ব'লে?' নিতান্ত বান্ধবী সই নিয়ে ছাড়ল। আমি এগোবামাত্র বকুনির সুর চড়ল উঁচুমাত্রায়: 'আবার তুমি?' উত্তেজিত আমি নীচু গলায় বললুম: 'মোটেই না, আমি বলে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের সই নিই নি, ও সখ আমার নেই। আপনি না জেনে বকছেন কেন? আমি আমার হাতে-কাটা সুতোর খাদি এনেছি। এ কিন্তু আপনাকে পরতে হবে।' মুহূর্তে কোমল স্নিগ্ধতায় জওহরলালের মুখ ছেয়ে গেল, আমার হাত থেকে মোড়কটা তুলে নিলেন, ধন্যবাদ জানালেন। আমি ছুটে আপন আসনে ফিরে এলুম।

দুদশ কথার পর বিতর্কের মাঝে সভা ভঙ্গ। জওহরলাল চলেছেন নিষ্ক্রমণের পথে, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। জোর কদমে কয়েক পা এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন আমার পাশে, মৃদু হেসে যে মালা ও ফুলের গুচ্ছ হাতে ছিল তার থেকে কিছু ফুল আমার হাতে গুঁজে দিয়ে আবার ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি দেখলুম মোড়কটাও তাঁর হাতে রয়েছে। যে বরমাল্য আমি পরাতে চাই নি তার ক'টা প্রসাদী ফুল নিয়ে সে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলুম। কানে বাজতে লাগল:

'তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার,
কত রঙে রঙ-করা
মোর হাতে ছিল দুখের ফলের ভার,
অশ্রুরসে-ভরা...'

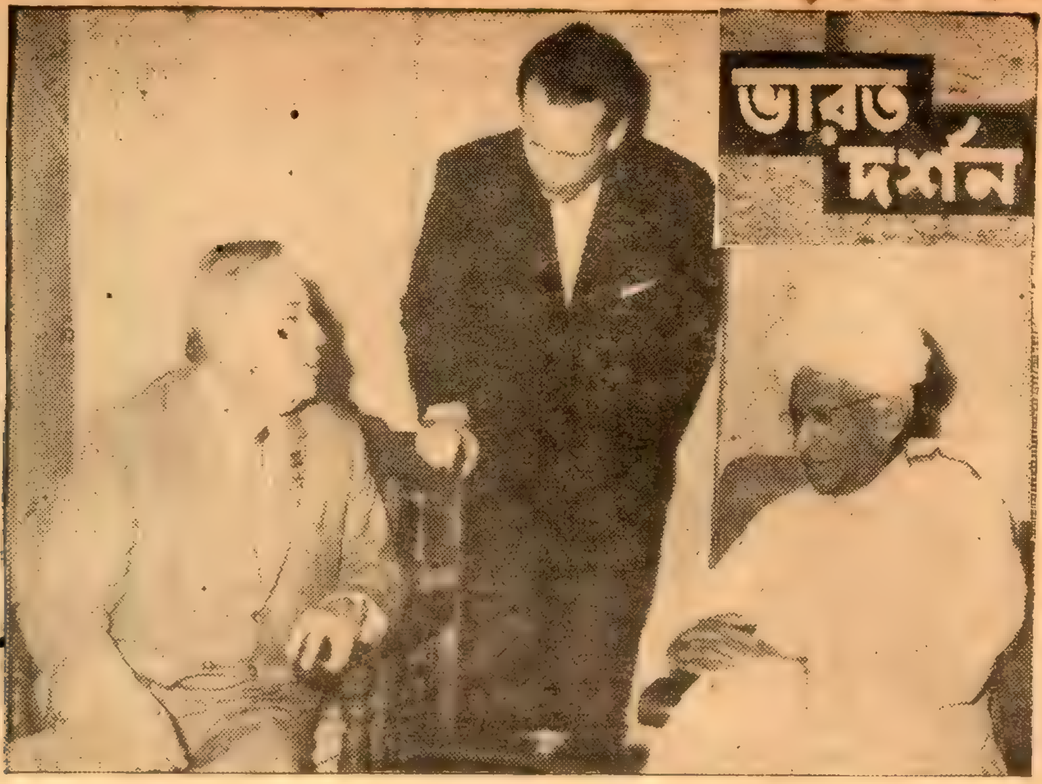

● রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আলোচনারত সুপ্রীম সোভিয়েটের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীইগনাটভ

রাজধানী ঃ

নয়াদিল্লী এখন একদম ফাঁকা। নেতারা সব চলে গেছেন গুণ্টুরে। রাজধানীর মানুষও আকুল আগ্রহে তাকিয়ে আছে গুণ্টুরের দিকেই। সেখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে দেশের আগামী দিনের কাঠামো কতকটা ঠিক হয়ে যাবে। পারমাণবিক শক্তিতে বলীয়ান চীনের মোকাবিলা করার জন্য প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি, মুনাফাশিকারী হাঙরদের শায়েস্তা করে পণ্যের মূল্যমান বজায় রাখা, খাদ্য সমস্যার ফয়সালা থেকে সুরু করে পররাষ্ট্র-বিষয় প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছে সেখানে। রাজধানীর দৃষ্টি তাই নিবদ্ধ গুণ্টুরের দিকে।

• • •

কাম্বোডিয়ার পথে সোভিয়েট উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী এন জি ইগনাটভ নয়াদিল্লীতে নেমেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহরুর সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন কিছুক্ষণ।

সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গেছেন, ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক আগের চাইতেও ঘনিষ্ঠ হবে।

গুণ্টুর (নেহরু নগর):

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে সুরু হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর তিনদিনব্যাপী অধিবেশন। উঁচু-নীচু তামাক ক্ষেতকে চষে নির্মিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের ক্ষেত্র। গড়ে উঠেছিল সুদৃশ্য একটি উপনগরী। নেতাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিলাস-ব্যসনের কোন ত্রুটিই করা হয় নি। মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের চিত্র-তারকারা নেপথ্যে থেকে সাহায্য করেন মনোরম মঞ্চ রচনার কাজে।

অধিবেশন শেষ হয়েছে ন' তারিখে। প্রথম দিনের অধিবেশনেই নেতারা চোখা চোখা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন তূণ প্রায় শূন্য করে। দাবি উঠে চীনের রণহুঙ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতির। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনা হয়েছে একই প্রশ্নে। কেউ কেউ প্রতিবেশী তোষণের চিরাচরিত অভিযোগ উত্থাপন করে আসর গরম করে তুলতে চেষ্টা করেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদ। সমর্থন করেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডী।

চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারমাণবিক বোমা তৈরির যাঁরা পক্ষপাতী তাঁরা মনে করেন—পারমাণবিক বোমা হাতে থাকলেই ভারতের মূলনীতি বদলে যাবে না। সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা পারমাণবিক অস্ত্র অস্ত্রাগারে মজুত রেখেই বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় নেমেছে। কাজেই ভারতের প্রতিশ্রুতি-

ভঙ্গের প্রশ্নে কুণ্ঠিত হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের সচিব শ্রীবিভূতি মিশ্র সর্বাপেক্ষা ধারালো যুক্তির অবতারণা করেছিল। তিনি মনে করেন, যেখানে জাতির প্রতিরক্ষা সমস্যা জড়িত, সেখানে অপরের ছাতার নীচে মাথা গুঁজে থাকা চলে না। আত্মরক্ষার জন্য ভারত পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভাবনাটা দেশবাসীর ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। এ ব্যাপারে তাদের অবাধ ভোটের অধিকার থাকা উচিত।

দেখা যাচ্ছে, গুণ্টুরের তামাকের তীব্র গন্ধে অনেকেই বেসামাল হয়ে পড়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে এ-নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর যে সিদ্ধান্ত মোটামুটি গৃহীত হয়েছে তারপর এ-উত্তেজনা ও উগ্রতা প্রকাশের তেমন অবকাশ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর

● শ্রীফকরুদ্দিন আহমেদ

শাস্ত্রী এ বিষয়ে আগেই তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। চীনের ভয়ে ভারতের কণ্টকিত হওয়ার তেমন কোন কারণও নেই। ভারত তার নৈতিক চরিত্রে চিরকাল বিশ্বাসী। সরকার তাঁর মূল নীতি থেকে এই মুহূর্তে সরে যেতে পারেন না।

সরকারী প্রস্তাবই হয়তো শেষ পর্যন্ত ভাষার সামঞ্জস্য পরিবর্তন করে পাশ হবে। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকদের এবারে তা' পরিবেশন করতে পারলুম না। তবে, পারমাণবিক না হলেও নকল 'এ্যাটম বোমা' এখানে ফেটেছে প্রচুর।

● ● ●

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে খাদ্যসঙ্কটের সমাধানে কংগ্রেসকর্মীদের এগিয়ে গিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। খাদ্যশস্যের মজুতদারী বন্ধ, অতি মুনাফাশিকারীদের দমন ও তাদের সরাসরি বিচারের কথা এতদিন জোরালো প্রচার ও ভারত সরকার নয়া অর্ডিন্যান্সের বিধান দেখার পর শ্রীনাদারের আহ্বান তেমন কোন চটক সৃষ্টি করতে পারে নি। নতুন অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ছিল চোরাকারবারীদের সমুচিত শিক্ষা দান। এক মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার হরণ করা ব্যতীত আর কোন পরিবর্তন নেই। বরং আগের আইনের ধারাগুলো আরও নরম হয়েছে।

আসলে যারা মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কোন কড়া ব্যবস্থাই করা হয় নি। এতে মারা পড়বে ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও মুদিখানার মালিকরা। কাজেই সরকারের ও দেশের নেতাদের আহ্বানে কেউ আন্তরিকতা খুঁজে পাচ্ছে না। অধিবেশনে খাদ্যনীতিরও বিশদ আলোচনা হবে এবং সরকারের নীতির সমর্থনও করা হবে। তার আগে, কেউ কেউ শাণিত বাক্যবাণ প্রয়োগ করতেও ছাড়বেন না। দর্শক ও কর্মীরা তাই কংগ্রেস সভাপতির আহ্বানে নতুনত্বের আভাস পায় নি।

আসাম ঃ

অস্ত্রসম্বরণ করে বিদ্রোহী নাগারা ছেদিমার বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর থেকে নাগাভূমির অবস্থা পাল্টাতে সুরু করেছিল। নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে নাগারা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বিদ্রোহীদের নেতার হুঙ্কার উপেক্ষা করে তাদের অনুগামীরা আত্মসমর্পণ করতেও দ্বিধা করে নি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে নির্ভয়ে তারা গ্রামে প্রবেশ করেছে—গৃহস্থের কুটিরে বসে একসঙ্গে ধূমপান করেছে। সুখ-দুঃখের আলোচনার মধ্যে হৃদয়ের বিনিময় হয়েছে। শান্তির পরিবেশ যতদিন বজায় থাকবে, ততই অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটবে বলে আশা করা যাচ্ছে। গার্হস্থ্য-জীবনের মধুর পরিবেশ থেকে সহজে আর জঙ্গলের অনিশ্চিত জীবনে ফিরে যেতে নিশ্চয় চাইবে না।

এই শান্ত পরিবেশকে আবার অশান্ত করে তুলেছে সরকারের পেনশনভোগী তথাকথিত 'রাণী গুইদালো। গুইদালোর দ মুক্তিফৌজ গড়ে

● শ্রীকামরাজ নাদার

তুলছে। পনের থেকে পঁচিশ বছর বয়সের তরুণদের সংগ্রহ করা হচ্ছে মুক্তিফৌজে। কিছু স্টেনগান ও অন্যান্য অস্ত্রও তারা এর মধ্যে সংগ্রহ করেছে। কাবুই নাগারা গুইদালোর

বিরোধিতা করার তাদের ক'জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। কাবুই জেমে, জিলিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নাগাদের মধ্যে প্রচার চলেছে ভগবান প্রেরিত পুরুষ এসে তাদের শাসন করবেন। তাঁর শাসনে নাগাভূমি হবে সম্পদশালী। শিক্ষার আলো যারা পায় নি তাদের মধ্যে এ-ধরণের প্রচার স্বভাবতই প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

রাণী গুইদালো যদুনাংয়ের শিষ্যা। যদুনাং নিজেকে রাজা বলে দাবি করতো। স্বাধীন নাগারাজ্য গঠনই ছিল তার স্বপ্ন। নরহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে, গুইদালো রাণী সেজে বসে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতা গুইদালোকে কংগ্রেস সরকার মুক্তি দেন ১৯৪৬ সালে। এখনও সে রাজনৈতিক পেনশন পাচ্ছে।

রাণী গুইদালোকে গোড়াতেই শায়েস্তা করার চেষ্টা না হলে নাগা-ভূমিতে আবার নতুন করে উঠবে তুফান। নাগাভূমির শান্তি হবে বিঘ্নিত। তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে আসামের পার্বত্যভূমিতে চিড় ধরাবে।

মিজোরা এখনও তাদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবি ছাড়ে নি। সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলনের মধ্যেও মতবিরোধের অভাব নেই। আসন্ন উপনির্বাচনের ফলাফলের ওপর অবশ্য মিজোদের মতিগতি সঠিক বোঝা যাবে। মিজো জেলার তিনটি বিধানসভার আসনের দুটি গেল বছরের উপনির্বাচনে মিজো জাতীয় ফ্রণ্ট দখল করার পর থেকেই স্বতন্ত্র মিজো রাজ্য গঠনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

ভারতের ও ভারতের বাইরের মিজোদের নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতেই মিজো জাতীয় ফ্রণ্ট রাজ-নৈতিক আসরে প্রথম নামে। এর আগে দরিদ্র, দুস্থ, মিজোদের সেবাই ছিল সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য। বিগত সাধারণ নির্বাচনে তারা একটি আসনও পায় নি। ১৯৬৩ সালের উপনির্বাচনে দু'টি আসন দখল করে মিজো জেলার রাজনৈতিক আসরে জাঁকিয়ে বসেছে।

ষাট সালের ভাষা-আন্দোলনের পর পূর্ব ভারতে উপজাতি ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে গঠন করে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন। মিজো ইউনিয়ন নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিলেও যুক্ত হয় গিয়ে নেতৃ-সম্মেলনে। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে মিজো ইউনিয়ন ও সংযুক্ত মিজো স্বাধীন সংস্থা নেতৃ-সম্মেলনের অপর দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামে এবং তিনটি কেন্দ্রেই তাদের প্রার্থী জয়লাভ করে। এরপর মিজো ইউনিয়নের একাংশ দল থেকে বেরিয়ে এসে জেলা-কংগ্রেস কমিটি গঠন করে।

পার্বত্য রাজ্য গঠনের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য সর্ব-দলীয় নেতৃ-সম্মেলন বিধানসভার সদস্যপদে ইস্তফা দেবার আদেশ জারী করলে মিজো ইউনিয়ন পদত্যাগে অসম্মত হয়। উপনির্বাচনে বাকি দুটি আসন মিজো জাতীয় ফ্রণ্ট দখল করে।

মিজো জাতীয় ফ্রণ্ট কিন্তু দু'দিকই সামলে চলেছে। নেতারা একদিকে যেমন আসাম থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবিতে অটল, অপর দিকে তারা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহার প্রতি অনুরক্ত। চালিহা-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উঠলে তারা মন্ত্রিসভাকেই সমর্থন করেছে। তাদের মুখপাত্রের মতে উপজাতিদের কাছে চালিহা-সরকার অনাদৃত নয়।

সর্বদলীয় নেতৃ-সম্মেলনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যিনি বিধানসভার সদস্যপদে এতদিন বহাল-তবিয়তে ছিলেন, তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হওয়ার পর বিধানসভা থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর পরিত্যক্ত আসনের জন্য জেলা-কংগ্রেস, মিজো ইউনিয়ন এবং সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন সংগ্রামে নেমে পড়েছে। মিজো জাতীয় ফ্রণ্ট কোন প্রার্থী মনোনয়ন করে নি।

বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে শান্তির আলোচনার পর থেকে জাতীয় ফ্রণ্টের মন নরম হয়ে উঠেছিল। নৈশকালে গুলী চালনার অভিযোগে তাদের একজন বিধানসভার সদস্য গ্রেপ্তার হওয়ার পরই সুরু হয় হাওয়া বদলের পালা। গুজব রটে যায়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জনাই তাদের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাতীয় ফ্রণ্টের সভায় গ্রেপ্তারের নিন্দাও করা হয়েছে। এতে মিজো-সমাজ কিছুটা উত্তেজিতই ছিল। রাণী গুইদালোর দলের অভ্যুত্থানের সংবাদ সে উত্তেজনায় নতুন ইন্ধন জুগিয়েছে। আসামের পার্বত্যভূমি ও নাগা অঞ্চলের স্বার্থেই রাণী গুইদালোর অনুচরদের শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন।

উত্তর প্রদেশঃ

ফুলপুরের উপনির্বাচন আর সব সমস্যাকে ছাপিয়ে উঠেছে। ফুলপুরে হবে মর্যাদার লড়াই। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নির্বাচিত হয়েছিলেন এখান থেকে। কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন মহা-রাষ্ট্রের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। তাঁর প্রধান প্রতি-

● শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

দ্বন্দ্বী অধুনালুপ্ত প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের নেতা শ্রীশালিগ্রাম জয়সোয়াল। উভয় পক্ষই একে মর্যাদার লড়াই হিসেবেই গণ্য করছেন। কাজেই সংগ্রাম তীব্রতর হওয়ারই কথা।

পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ফুলপুর নির্বাচনের কেন্দ্রের জন্য মনোনয়নের কথা উঠেছিল। তিনি নানা কারণে সম্মত হন নি। খাদ্যসঙ্কট, উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের দলাদলি এবং সর্বোপরি শ্রীমতী পণ্ডিতের মনোনয়নের সম্ভাবনা দেখেই শ্রীমতী গান্ধী ফুলপুরের প্রতিযোগিতায় নামতে চান নি।

এই নির্বাচনী-যুদ্ধ পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এন বহুগুণার ওপর। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠি নির্বাচনী সভার উদ্বোধন করে গেছেন। জনমত কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নির্বাচনে কাজ করতে সম্মতি জানিয়েছে হাজার-তিনেক যুবক। জেলা কংগ্রেসের সভায় যোগ দিয়েছিলেন এলাহাবাদ হাই-কোর্টের তিন শ' আইনজীবী। তাঁরা শ্রীমতী পণ্ডিতের সমর্থনে আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর দিতে সম্মত হয়েছেন।

তথাপি এ লড়াই খুব সহজ হবে, মনে হচ্ছে না। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খাদ্যসঙ্কট সমাধানে সরকারের ব্যর্থতার জবাব দিতে হবে। সরকারের খাদ্যনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কংগ্রেসকর্মীরা হিমসিম খাচ্ছেন। এ ছাড়া, ক্ষমতাসীন দল ও প্রদেশ কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বিরোধ। উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম অধিনায়ক পরিবহন-মন্ত্রী শ্রীমুজফ্ফর হাসানের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনী দ্বন্দ্বে কংগ্রেসকে এ সকল বিষয়ের মোকাবিলা করতেই হবে।

এ সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও উপ-নির্বাচনের সাফল্য সম্পর্কে কংগ্রেস সুনিশ্চিত। পঞ্চাশটি ঘাঁটিতে ভাষণ দেবেন শ্রীমতী পণ্ডিত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এখন এলাহাবাদে। তিনিও প্রচারকার্যে সাহায্য করবেন। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আসবেন এলাহাবাদে। তিনিও কয়েকটি জন-সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

কংগ্রেসের দিকে গণমানস প্রসন্ন দেখে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের নেতারা নিরাশ হন নি। তাঁরা জয়ের আশাই করেন। শ্রীশালিগ্রাম জয়সোয়াল জনপ্রিয় নেতা। রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। তিনি এক সময়ে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। জেলার সাধারণ মানুষের কাছে তিনি 'মন্ত্রীজী'। সকল স্তরের মানুষেরই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন। তা' ছাড়া এ জেলার বিধানসভার সাতটি আসনের পাঁচটি দখল করে আছে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল।

৩ শ্রীমোরারজী দেশাই

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের মতে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। সাত বছর তিনি ছিলেন বাইরে। জেলার কোন সমস্যাই তাঁর জানবার কথা নয়। অন্যভাবে দেশে যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার কোন খবরই তিনি রাখেন না। সুচেতা-মন্ত্রিসভার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুনাফা শিকারীরা দেশকে ঠেলে নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষের অবস্থায়। কংগ্রেস-প্রার্থীকে কাবু করতে এ অস্ত্রই যথেষ্ট।

উপনির্বাচনের তৃতীয় প্রার্থী জনসঙ্ঘের প্রতিনিধি। জনসঙ্ঘের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাতের চেষ্টাও সমাজতন্ত্রী দল থেকে করা হয়েছিল; তা' ফলপ্রসূ হয় নি। জনসঙ্ঘ যাদবদের ভোট বেশ কিছুটা পাবে। তাদের প্রার্থী যাদব-সম্প্রদায়েরই একজন।

• • •

শ্রীমোরারজী দেশাই এসেছিলেন লক্ষ্ণৌতে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পর এই প্রথম মোরারজী পদার্পণ করলেন লক্ষ্ণৌ শহরে। শোনা যাচ্ছে, গুপ্ত-গোষ্ঠীর আমন্ত্রণ পেয়েই তিনি এসে কংগ্রেস-কর্মীদের সভায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করে গেছেন। ছাত্রদের সভায় তাঁকে কিছুটা অপদস্থ হতে হয়েছে—শুনতে হয়েছে অসন্তুষ্ট কণ্ঠের অস্বাভাবিক আওয়াজ।

• • •

ফুলপুরের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যখন চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে কটু-কষায় বাক্য তখন সরস সংবাদ বুকে নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। তার প্রধান খবরটি খুবই চমকপ্রদ। ফুলপুর নাকি ভারতের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পাঠাবে। সংবাদপত্রটির মতে শ্রীমতী পণ্ডিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না নেত্রী। সিংহলের পরই বিশ্বের দ্বিতীয়া নারী প্রধানমন্ত্রী হবেন ভারতে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ

প্রাক্তন কেন্দ্রীয়-মন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডী বর্তমান রাজ্যপাল হয়ে আসছেন। রাজ্যপাল শ্রী এইচ ভি পটাশকর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে বিদায় নেবেন। তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচী এখনও জানা যায় নি।

• • •

খাদ্যশস্য অপর রাজ্যে প্রেরণের ব্যাপারে রাজ্য সরকার পূর্ব সিদ্ধান্তে

● শ্রীপটাশকর

এখনও অটল। সরকারী পর্যায়ে ভিন্ন অপর কোন পথে মধ্যপ্রদেশের খাদ্যশস্য বাইরে পাঠানো হবে না।

গম ও চাল সংগ্রহের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন গিয়েছে কেন্দ্রের দরবারে। এক লক্ষ টন খাদ্যশস্য সরকারী গুদামে মজুত রাখার পরিকল্পনাও রাজ্য সরকারের রয়েছে।

সরকারী পর্যায়ে লেন-দেনের সুবিধা অনেক। এতে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে কোন বিঘ্ন ঘটবে না। মজুতদারী এবং চোরাই চালান বন্ধ হয়ে যাবে।

খাদ্যমন্ত্রী শ্রীগৌতম শর্মা, পরিকল্পনা ও উন্নয়নমন্ত্রী শ্রী এন এন শুক্লা, কৃষি-দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী এবং শ্রীঅর্জুন সিং জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এবং মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় মধ্যপ্রদেশের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে এসেছেন। পতিত জমিতে আবাদের ব্যবস্থার জন্য ভারী ট্রাক্টর সরবরাহের আবেদনও তাঁরা জানিয়ে এসেছেন।

● শ্রী শুক্লা

• • •

সরগুজা জেলার ঝাগরখণ্ড কয়লাখনির শ্রমিকরা সত্যাগ্রহের হুমকী দিয়েছে। তাদের দাবি সপ্তাহকালের মধ্যে মেনে না-নিলে তারা সদলবলে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে এসে বসে পড়বে।

পুলিশের গুলীতে তিনজন শ্রমিক নিহত হওয়ার পরের দিন ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে তারা ধর্মঘট চালাচ্ছে। পুলিশের আচরণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, জেল থেকে ৬৭ জন শ্রমিককে মুক্তিদান, নিহত ও আহতদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণ

● শ্রী কে সি রেড্ডী

এবং ট্রাইব্যুনালের রোয়েদাদ অনুযায়ী সকল বিষয়ের মীমাংসার দাবিতে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করছে।

কেরল ঃ

সাধারণ নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলো তত বেশি আবহাওয়া গরম করে তুলছে। একমাত্র কংগ্রেস ছাড়া অপর সকলেই দেশবাসীকে স্বর্গরাজ্য গড়ে দেবার আশ্বাসবাক্য নিয়ে প্রচার-কার্যে নেমে পড়েছেন। কংগ্রেসের কাজ ঢিলে তালেই চলেছে। তাঁরা সম্ভবত দলত্যাগীদের মতিগতি দেখে নিয়ে কর্মপন্থা বেছে নেবেন।

দলত্যাগীদের নবগঠিত কেরল কংগ্রেস পার্টি এর মধ্যেই মুসলিম লীগের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। এন-এন-এস নেতা শ্রীমন্নথ পদ্মনাভন এসে ভিড়েছেন তাদের সঙ্গে। গীর্জা-মার্কা রাজনৈতিকরা নির্বাচনে এঁদের সামিল হতে সম্মত হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে এমন নির্বাচনী জোট আর কেউ এখনও করে উঠতে পারে নি।

এঁদের অভিযান সকলের বিরুদ্ধে। যেদল ত্যাগ করে এসেছে তার সঙ্গে এক হাত লড়াই এঁদের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস বিরোধী যুক্ত ফ্রন্টের বিরুদ্ধেও এঁদের সংগ্রাম চলবে।

কংগ্রেসকে এই নতুন দল কিছুটা বে-কায়দায় ফেলবে সন্দেহ নেই। নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের বড় সহায় ছিল গীর্জা, মুসলিম লীগ ও এন-এস-এন। তাঁদের একটা অংশ এখন চলে যাচ্ছে বিরুদ্ধে। তবে, মুসলমানদের এবং গীর্জার সমর্থন কংগ্রেসও একেবারে কম পাবে না। জাতীয়তাবাদী মুসলমান সম্প্রদায় কোনদিন কংগ্রেসকে ত্যাগ করবে না। গীর্জার প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও অনিশ্চয়তার মধ্যে সহজে পা বাড়াবেন না।

কমিউনিস্টদের অতিবাম ও দক্ষিণ, আর-এস-পি, কে-এল-পি ও স্বতন্ত্র সাথীদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বামপন্থী যুক্ত সমঝোতা। এঁরাও কিন্তু সাম্প্রদায়িক দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নন। স্বতন্ত্র সাথীদের মধ্যে থাকছেন প্রগতিশীলরা। এই প্রগতির নামে পবিত্র হয়ে ঢুকেছেন মুসলমান ও অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ।

বামপন্থী যুক্তফ্রণ্ট নির্বাচনী প্রচার-পত্রে কলুষমুক্ত, স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাদের নির্বাচন করা হলে দুর্নীতিমুক্ত সরকার প্রতিষ্ঠা করে সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচিয়ে

কেরলকে সমৃদ্ধিশালী করা হবে বলে প্রচার কার্য চালানো হচ্ছে।

উড়িষ্যা ঃ

পঁয়ত্রিশ দিন সংগ্রামের পর উড়িষ্যার সংগ্রামী ছাত্রদল শাসক দলের নেতারা মীমাংসায় এসেছেন। অভিভাবক কমিটীর মধ্যস্থতায় সরকার ও ছাত্রদের চার দফা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিটি সম্পূর্ণ 'ভদ্রলোকের'। সরকার পক্ষ থেকে লিখিতভাবে কোন ঘোষণা পাওয়া যায় নি। ছাত্রদের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের বিবৃতি অনুযায়ী ছাবিবশে সেপ্টেম্বর যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে। বাইরের একজন বিচারপতির ওপর তদন্তের ভার ন্যস্ত হবে। তদন্তের রায় মেনে নিতে হবে উভয় পক্ষকেই। জীবন ও সম্পত্তিহানির ক্ষতিপূরণ দেওয়াও নির্ভর করবে তদন্তের রায়ের ওপরই। আন্দোলনের অংশীদার ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে না।

আলোচনা চলেছিল বারো ঘণ্টা। এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমোহান্তি, এডভোকেট জেনারেল শ্রীদীনবন্ধু সাহু, কটকের কয়েকজন ব্যবহারজীবী, অভিভাবকদের প্রতিনিধি ও ছাত্র-পরিষদের প্রায় চল্লিশ জন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপাণি, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীবনমালী পট্টনায়ক ও সর্বোদয় নেত্রী শ্রীমতী রমা দেবী আলোচনাকালে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র-প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সরকারের গাড়িতেই কটক থেকে তারা ভুবনেশ্বরে এসেছিল। আলোচনার পর তারা মুখ্যমন্ত্রী ও নেতাদের সঙ্গে কোলাকুলি করে সন্তুষ্টচিত্তেই ঘরে ফিরে গেছে। ছাত্রদের দলে দলে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে। বহরমপুর ও অন্যান্য শহর থেকে এক শ' চুয়াল্লিশ ধারা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

উড়িষ্যার প্রচ্ছন্ন শাসক শ্রীবিজু পট্টনায়ক অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার দায়টা সম্পূর্ণ সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল,

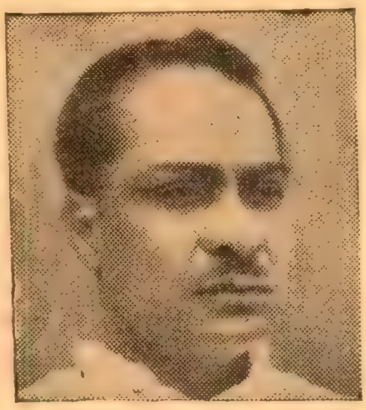

● শ্রীবিজু পট্টনায়ক

স্বতন্ত্র দল এবং কিছু সংখ্যক কংগ্রেস সেবীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে ছাত্রদের অব্যাহতি দিয়েছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, হিংসামূলক কাজ, অগ্নিসংযোগ ও লুঠতরাজের সঙ্গে ছাত্র-সমাজ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন না।

মাদ্রাজ ঃ

মাদ্রাজ পোতাশ্রয়ের নতুন ডক—'জওহর ডকের' উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ভাষণদান প্রসঙ্গে পক প্রণালী ও মান্না উপসাগরের সংযোগকারী সেতু সমুদ্রম প্রকল্পের কাজ চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই সুরু হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেছেন, কারিগরী ও আর্থিক কারণে এ-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে আট থেকে দশ বছর লাগলেও তার কাজ চতুর্থ পরিকল্পনাকালেই আরম্ভ হওয়া উচিত। পরিকল্পনার নক্সার কাজে এখন থেকেই হাত দেওয়া প্রয়োজন। এ-প্রকল্পের কাজ শেষ হলে জাহাজগুলোকে আর সিংহল ঘুরে আসতে হবে না।

বন্দরগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনের উল্লেখ করে শ্রীশাস্ত্রী বলেছেন, শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা থাকলেই সরকার আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে দ্বিধা করে থাকেন। শ্রমিকদের মুখ চেয়েই সরকার গম-বোঝাই জাহাজ বন্দরে পড়ে থাকা সত্ত্বেও মাল খালাসের কাজে যন্ত্র ব্যবহার করেন নি। যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। কর্মীরা যাতে ছাঁটাই না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। কাজেই শ্রমিকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।

* * *

তামিলভূমি ও কেরলে ব্যাপক প্রচারকার্য চালাচ্ছে নয়াচীন অভিনব পদ্ধতিতে। বিদেশী ডাকযোগে আসছে অজস্র চীনের প্রচারপত্র।

ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাই এর প্রধান লক্ষ্য। ভারত সরকারের বিরূপ সমালোচনা রয়েছে প্রতিটি পুস্তিকায়। এ-পুস্তিকা লিখিত হয়েছে তামিল ভাষাতে। আসছে সিংহলের ডাকঘর মারফৎ। মাদ্রাজের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থাগারে নিয়মিত পুস্তিকাগুলো আসছে। এর প্রকাশকের নাম নেই। কোথায়, কোন্ মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছে তাও দেওয়া হয় নি।

কেরলে যে-সব পুস্তিকা আসছে তা প্রকাশিত হয়েছে মালয়ালম ভাষায়। পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টদের গৃহের ঠিকানায় এগুলো এসে পৌঁছুচ্ছে। সিংহলে বসে কেরলের গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতদের গৃহের ঠিকানা যারা জোগাড় করেছে তাদের ক্ষমতা অপরিসীম। তারা নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত দোসর পেয়েছে ভারতের মাটিতে। প্রতিটি গ্রামের আনাচ-কানাচের প্রতিটি সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। কেরলের আসন্ন নির্বাচনে চীনের এ-ভূমিকা আকস্মিক কিছু নয়। এ-সম্ভাবনার কথা ভারত সরকারের আগেই চিন্তা করা উচিত ছিল। চীনের ভারতীয় চেলাদের সম্পর্কে সরকারী নীতি খুবই মোলায়েম। আশা করি, এই পুস্তিকা চীনের সুপরিকল্পিত ভারতবিরোধী প্রচারের চিত্রটা সরকারকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে সাহায্য করবে।

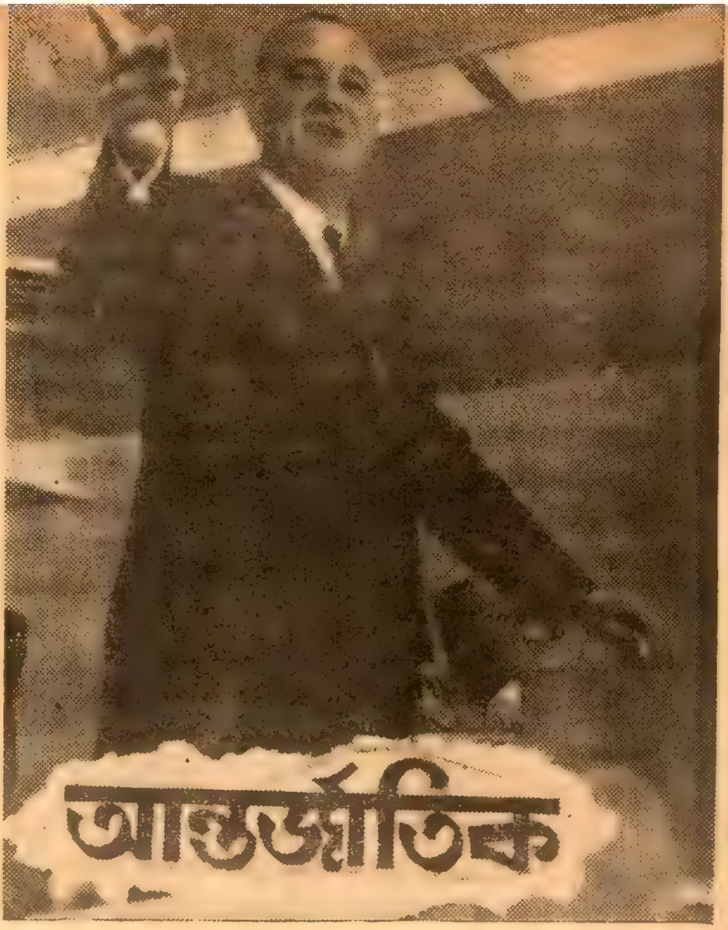

• বিজয়ার হাসি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ

• যা প্রত্যাশিত, যা বাঞ্ছিত—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাই হয়েছে। মিঃ লিণ্ডন জনসন বিপুল ভোটাধিক্যে মিঃ ব্যারী গোল্ডওয়াটারকে পরাজিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন্। মিঃ জনসনই যে জয়লাভ করবেন সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না, কিন্তু দুজন প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান যে এত বিরাট হবে এটা কেউ প্রায় কল্পনাই করতে পারেন নি। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে যে, মিঃ জনসন শতকরা ৬১'৪ ভাগ বা ৪ কোটি ১৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৮শ' ৪৬ ভোট পেয়েছেন আর পরাজিত প্রার্থী মিঃ গোল্ডওয়াটার পেয়েছেন ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২ শ' ৬০টি ভোট। অর্থাৎ বিজয়ী ও বিজিতের মধ্যে ভোটের ব্যবধান ছিল দেড় কোটিরও বেশি। রাজ্য হিসেবে মিঃ গোল্ডওয়াটার জিতেছিলেন তাঁর জন্মভূমি আরিজোনা ছাড়া আর পাঁচটি রাজ্যে—আলাবামা, জর্জিয়া, লুই-সিনিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এবং মিসিসিপিতে। অন্যদিকে মিঃ জনসন বাকি ৪৪টি রাজ্যে জয়লাভ করেছেন।

মিঃ জনসন ছাড়াও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে ভারত-সুহৃদ মিঃ হুবার্ট হামফ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মিলারকে পরাজিত করেছেন। আর একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাই মিঃ রবার্ট কেনেডি জয়লাভ করেছেন প্রবীণ রিপাবলিকান নেতা কেনেথ কীটিংকে হারিয়ে দিয়ে। তা ছাড়া মিঃ জনসনের বিপুল ভোটপ্রাপ্তির ফলে তাঁর দল কংগ্রেসের দুটো কক্ষেই শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। হাউস অফ রিপ্রেজেণ্টেটিভ-এ যেখানে ডেমোক্র্যাট সদস্যের সংখ্যা ছিল ২৫৭ সেখানে এখন হয়েছে ২৯৩, সেনেটেও একটি সংখ্যা বেড়ে ৬৬টির জায়গায় ৬৭ হয়েছে। এর ফলে মিঃ জনসনকে যে আগামী চার বছর তাঁর শান্তি ও সহাবস্থান নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ বেগ পেতে হবে না সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

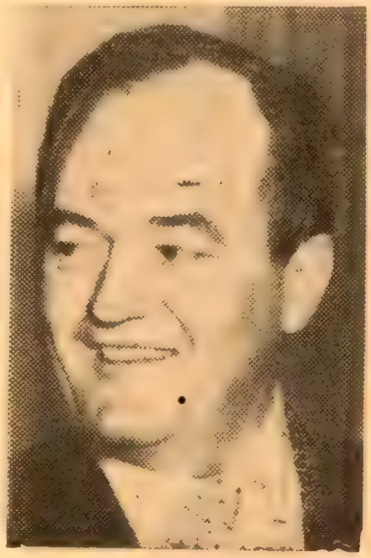

• হুবার্ট হামফ্রে

মিঃ জনসনের এ-জয়লাভ একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত যে-বিরাট ভোটাধিক্য তিনি লাভ করেছেন তা একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শতকরা ৬১ ভাগের কিছু কম ভোট পেয়ে যে-রেকর্ড করেছিলেন মিঃ জনসন তাকে ম্লান করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এবারকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীর মধ্যে নীতিগত প্রশ্নে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গিয়েছে এমনটি আর আগে বিশেষ হয় নি। মিঃ গোল্ডওয়াটার নির্বাচনে জেতার জন্যে প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন, মিঃ জনসনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করতেও ছাড়েন নি। তা ছাড়া নৈতিক চরিত্রের প্রশ্ন তুলে মিঃ গোল্ডওয়াটার নির্বাচনী আবহাওয়া এমনই গুলিয়ে তুলেছিলেন যে, সাধারণ ভোটারদের প্রায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু মার্কিন ভোটাররা মিঃ গোল্ডওয়াটারের ফাঁদে পা দিতে রাজী

হয় নি। কারণ মিঃ গোল্ডওয়াটার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে যে গোঁড়ামী ও উগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন তাকে মেনে নিতে আমেরিকার ভোটাররা রাজী হয় নি। তাঁর নিগ্রোবিদ্বেষ, পূর্ব-পশ্চিম স্নায়ুর লড়াইকে গরম লড়াইয়ে পরিণত করার হুমকী, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের দাবি ইত্যাদি শ্লোগান তুলে মিঃ গোল্ডওয়াটার হঠকারিতা ও রক্ষণশীলতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে মিঃ জনসন দাঁড়িয়েছিলেন বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির পক্ষে। মার্কিন নির্বাচকমণ্ডলী স্বভাবতই শান্তির স্বপক্ষে রায় দিয়েছে।

জয়লাভের সংবাদ পেয়ে মিঃ জনসন যে-কথা বলেছেন তা সত্যি মূল্যবান। তিনি বলেছেন যে তাঁর বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ের অর্থ হল শান্তি, ঐক্য ও সমৃদ্ধতর জীবনের পক্ষে জনসাধারণের রায়। মিঃ জনসনের জয়লাভ তাঁর ব্যক্তিগতই শুধু নয়, এ-জয় সেই পক্ষেরই যাঁরা শান্তি চান, সমৃদ্ধি চান, দারিদ্র্যের অবসান চান। প্রতিক্রিয়াশীলতা, উগ্রতা, জাতি-বিদ্বেষ, রক্ষণশীলতা ও চরম পন্থার যাঁরা বিরোধী প্রেসিডেণ্ট জনসনের জয়লাভে তাঁরাই জয়ী হলেন। এ-জয়লাভ কোন ব্যক্তিবিশেষের যেমন নয়, তেমনি কোন দলবিশেষেরও নয়, এ-জয়লাভ একটা নীতির জয়লাভ ---যে-নীতি পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট কেনেডি সূচনা করেছিলেন সেই শান্তি ও সহাবস্থান নীতি। ভোটের হারে এ-কথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মিঃ জনসন কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি নন, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তাঁকে ভোট দিয়েছে---সমগ্র আমেরিকা তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃসন্দেহে মিঃ জনসনের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলা যায়---

'The people have elected a Government of all the people'.

মিঃ গোল্ডওয়াটারের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে রিপাবলিকান পার্টিতে আজ প্রশ্ন উঠেছে নেতৃত্ব বদলের। দলের মধ্যে যাঁরা লিবারেল বা উদারমতাবলম্বী তাঁরা প্রকাশ্যেই বলতে সুরু করেছেন যে, গোল্ডওয়াটারিজম বা রক্ষণশীল, উগ্র ও চরমপন্থী নীতির জন্যেই জাতির জনক আব্রাহাম লিঙ্কনের ঐতিহ্যমণ্ডিত পার্টির এ-দৈন্যদশা হয়েছে। তাই এবার নেতৃত্বের পদ থেকে গোল্ডওয়াটারিজমে বিশ্বাসী নেতাদের অপসারণের জন্যে উদারপন্থীরা ক্ষেত্র রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন। মিঃ গোল্ডওয়াটার অবশ্য নিজে বলেছেন যে, তাঁর পরাজয়ের দ্বারা রক্ষণশীল নীতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় নি। এ-কথাও তিনি বলেছেন যে, আড়াই কোটি ভোট পাবার পর রক্ষণশীলতা বা উগ্রপন্থাকে বিসর্জন দেবার কোন মানে হয় না। কিন্তু উদারপন্থীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন উগ্রতা ও চরমপন্থার মর্ম। তাই যে-নীতি তাঁদের ১৯৬৪ সালের সর্বনাশের মূল তাকে উপড়ে ফেলে ১৯৬৮ সালের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে তাঁরা নামতে চান।

মিঃ জনসনের জয়লাভে সমস্ত বিশ্বের নেতৃবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের পক্ষেও এ-জয়লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্যে যে, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির আমলে ভারতের সঙ্গে আমেরিকার যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ জনসনের জয়লাভে তা আরো সুদৃঢ় হবে বলে ভারতবাসী বিশ্বাস করে। ভারতের প্রতিরক্ষায় ও তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে-সাহায্য দিয়ে আসছে মিঃ জনসনের নেতৃত্বে তা অক্ষুণ্ণই শুধু থাকবে না উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে—এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্দ্বিধায় করা যেতে পারে।

বৃটেন ঃ

প্রধানমন্ত্রী উইলসন তাঁর কথা রেখেছেন—নির্বাচনের আগে বৃটিশ ভোটারদের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন তা পালন করতে অগ্রসর হয়েছেন। পার্লামেণ্টের উদ্বোধন করতে গিয়ে রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ যে-ভাষণ দিয়েছেন তাতে শ্রমিক সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা বিবৃত হয়েছে।

সরকার ইস্পাত-শিল্পকে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন। শহরে জমির দর হ্রাস করার জন্যেও সরকারী মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে প্রকাশিত হয়েছে।

• ব্যারী গোল্ডওয়াটার ও মিলার

মার্কিন নৌবাহিনীর সেদিনের লেঃ কমাণ্ডার আজকের প্রেসিডেণ্ট জনসন

বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ, দুঃস্থ, অবসৃত ও বিধবাদের ভাতাবৃদ্ধি, ডাক্তারী প্রেসক্রিপসনের দরুণ চার্জ নেওয়া নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি শ্রমিক সরকারের বলিষ্ঠতার পরিচায়ক। মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্যেও সরকার চিন্তা করছেন। একচেটে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তিকে নিষিদ্ধ করার জন্যেও সরকার অগ্রসর হচ্ছেন। রাজনৈতিক পার্টি ফাণ্ডে কোন কোম্পানী কত টাকা চাঁদা দিয়েছে তার হিসেব দাখিল করার নির্দেশ দিয়েও শ্রমিক সরকার একটা অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্টার্লিংয়ের যে দুর্দশা আজ হয়েছে তার প্রতিকারকল্পে শ্রমিক সরকার লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করে স্টার্লিংয়ের মূল্য বজায় রাখার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন। রক্ষণশীল আমলে বৃটিশ অর্থনীতির যে-দৈন্যদশা উপস্থিত হয়েছিল, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে সরকার নতুন আমদানী-রপ্তানী নীতিও ঘোষণা করেছেন। আমদানীর ওপর শতকরা ১৫ শতাংশ কর চাপানো হবে যাতে বৃটেনের শিল্প-কারখানাগুলি লাভবান হতে পারে এবং সরকারী তহবিলও কিছুটা স্ফীত হতে পারে, আবার রপ্তানী ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্যে সরকারী সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরকার পূর্ব-পশ্চিম উত্তেজনা প্রশমনে সচেষ্ট থাকবেন। পারমাণবিক অস্ত্র বা অন্যান্য মারণাস্ত্রের প্রসার রোধেও সরকার গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করবেন বলে জানিয়েছেন। একই কারণে সরকার বহুজাতিক পারমাণবিক বাহিনী গঠনের বিরোধিতা করবেন---সঙ্গে সঙ্গে ন্যাটো-সংস্থাকে শক্তিশালী করার দিকে তার নজর থাকবে। নিরস্ত্রীকরণের জন্যেও সরকার আরো ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন বলে জানিয়েছেন।

রাণী এলিজাবেথ

কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার জন্যে সরকার সুষ্ঠু কর্মসূচী গ্রহণ করবেন এবং অনুন্নত ও পরাধীন দেশগুলোর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি রচনায় সাহায্য করবেন বলে রাণীর ভাষণে উল্লেখ করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে কর্মসূচী শ্রমিক সরকারের বলিষ্ঠতা, সাহস ও সদিচ্ছার পরিচায়ক। কারণ মাত্র ৪টি আসনের মেজরিটি নিয়ে শ্রমিক সরকার যে এতবড় ঝুঁকি নেবে, তা অনেকে ধারণা করতে পারেন নি। রক্ষণশীল দল সব সময়েই সরকারের পতনের জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকবে এবং সামান্য সুযোগ পেলেই তার সদ্ব্যবহার করে সরকার উল্টে দেবে---এ-আশঙ্কা বরাবরই রয়েছে। সেজন্যে মূলনীতিতে এমন কোন পরিবর্তন শ্রমিক সরকার আনতে চাইবেন না যাতে বিরোধী দল তাকে আক্রমণ করার সুযোগ পাবে এবং সরকারের পতন-আশঙ্কা ঘটাবে---এ-ধারণাই অনেকে করেছিলেন। কিন্তু শ্রমিক সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি-মত বৃটেনকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছেন। ক্ষমতা পেয়েই মিঃ উইলসন বলেছিলেন: রক্ষণশীল দল ১৩ বছর দেশ শাসন করে দেশে বিরাট জঞ্জাল-স্তূপ গড়ে তুলেছে, তাকে অপসারণ করতে ১০০ দিন সময় লাগবে। মিঃ উইলসন এখন জঞ্জাল সাফ করার পথেই পা বাড়িয়েছেন। মনে রাখতে হবে যে, শ্রমিক দল সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, কাজেই সমাজতান্ত্রিক আদর্শসম্মত পন্থা ও নীতি তো তিনি গ্রহণ করবেনই। তা ছাড়া মাত্র ৪টি আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার জন্যে যদি সরকারের [illegible]া হাত-পা গুটিয়ে বসে

থাকেন, তা হলে রক্ষণশীল দলের আগেই ভোটাররা শ্রমিক সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলবে। এখন নতুন, প্রগতিশীল কর্মপন্থা ঘোষিত হবার ফলে নির্বাচকমণ্ডলীরও শ্রমিক দলের ওপর আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, ফলে যদি নতুন নির্বাচনের প্রয়োজনও হয়, তবে সে-নির্বাচনে শ্রমিক দল বিরাট সংখ্যাধিক্য অর্জন করবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সোভিয়েট রাশিয়া ঃ

বলশেভিক বিপ্লবের ৪৭তম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল প্রচুর ধুমধাম করে। এবারকার অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব ছিল কয়েকটা। প্রথমত সপ্তাহ-তিনেক আগে ক্রুশ্চেভের পতনের পর এত বড় সম্মেলন আর এখানে হয় নি। নতুন সরকারের নীতি কি হবে সে-সম্পর্কে কিছু আভাষ এখানে পাওয়া যাবে বলে বিশ্ববাসী উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়েছিল উৎসবটির দিকে। দ্বিতীয়ত, চীনের যোগদানে উৎসবের গুরুত্ব আরো বেড়ে গিয়েছিল, কারণ গত বছর রুশ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আলোচনা ভেঙে যাবার পর মস্কোতে চীন এই প্রথম সরকারী প্রতিনিধিদল পাঠালো। প্রতিনিধি-দলটিও আবার যেমন-তেমন নয়, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই এদের নেতৃত্ব করেছেন। ক্রুশ্চেভের পতনের পর রুশ-চীন সম্পর্কে কোন পরিবর্তন সূচিত হয় কি না তারই পরিষ্কার নিদর্শন এ-উৎসবে পাওয়া যাবে—এ-ধারণা পর্যবেক্ষক মহলে হয়েছিল। তা ছাড়া প্রস্তাবিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পর্কেও আলোকপাত করা হবে বলে বোঝা গিয়েছিল।

আলবেনিয়া ছাড়া প্রায় সমস্ত সোস্যালিস্ট দেশ থেকে উৎসবে প্রতিনিধি এসেছেন। পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ইত্যাদি দেশ থেকে শক্তিশালী প্রতিনিধিদল এখানে এসেছিলেন। কিন্তু উৎসবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সেক্রেটারী ব্রেজনেভ এবং চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই।

ক্রুশ্চেভ লেনিনবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং রুশ-চীন সম্পর্কের অবনতির মূলে তিনিই—এই অভিমত চীনারা পোষণ করে। সেইজন্যে তাঁর পতনের ফলে রুশ-চীন সম্পর্কের উন্নতি ঘটবে এবং আবার তারা বিরোধ ভুলে 'রুশী-চীনী ভাই ভাই' হতে পারবে এ-বিশ্বাস করেছিল। অর্থাৎ চীন মনে করেছিল যে, রাশিয়ার নতুন নেতৃত্বের আমলে মতাদর্শের দিক দিয়ে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার যে-বিরোধ রয়েছে তার অবসান হবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, নতুন রুশ নেতৃত্ব ক্রুশ্চেভকে অপসারণ করলেও ক্রুশ্চেভের নীতিকে বর্জন করে নি। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ-প্রবর্তিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিকে রাশিয়া বর্জন করবে না বলেই উৎসবে মিঃ ব্রেজনেভ পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন। মস্কো পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ করে যে-চুক্তি গত বছর স্বাক্ষরিত হয়েছে তার সমর্থনও মিঃ ব্রেজনেভের বক্তৃতায় পাওয়া গেছে।

এতেও চীন খুশি হতে পারে নি। চীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-নীতি অচল বলে মনে করে—সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে কোনরকম সহাবস্থান সম্ভব নয় বলে চীন মনে করে। মস্কো পারমাণবিক চুক্তিতে চীন স্বাক্ষর দেয় নি, প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছে তার। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি সে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর পঞ্চম পারমাণবিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাই মিঃ চৌ-এন-লাই ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া চীনের কাজের সমর্থন করবে, মস্কো চুক্তির অসারতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করবে। কিন্তু মিঃ ব্রেজনেভ তা তো করলেনই না, উপরন্তু পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার রোধ করার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন।

• কোসিগিনের সঙ্গে চৌ-এন-লাই

স্বভাবতই চৌ তাতে গোঁসা করেছেন এবং অন্য প্রতিনিধিরা ব্রেজনেভকে তাঁর ভাষণের জন্যে বার বার করতালি-ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত করলেও মিঃ চৌ-এন-লাই তাতে যোগ দেন, নি—সারাক্ষণ তিনি গুম হয়ে বসেছিলেন।

মিঃ ব্রেজনেভের বক্তৃতায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের কোন নামোল্লেখ ছিল না। কিন্তু তাঁর নীতির সমালোচনা ছিল আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে। মিঃ ব্রেজনেভ ঘোষণা করেছেন যে, দেশের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে ধীরে-সুস্থে। ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে এবং তার উৎকর্ষ সাধনের জন্যেও সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে বলে সেক্রেটারী জানিয়েছেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের পুনর্মিলন, চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাইওয়ানের সংযুক্তি, কিউবায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ইত্যাদির কথাও মিঃ ব্রেজনেভ তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছেন। কোন দিন নির্দিষ্ট না করে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথাও মিঃ ব্রেজনেভ বলতে ভোলেন নি। এটা চীনের পক্ষে আর একটা আঘাত। কারণ চীন বরাবরই এ-সম্মেলনের বিরোধিতা করে এসেছে এবং রাশিয়ার সরকারের পরিবর্তনের ফলে আশা করেছিল যে, রাশিয়া এ-সম্মেলন সম্পর্কে অন্তত চীনের মুখ চেয়ে আর আগ্রহ প্রকাশ করবে না। কিন্তু চীনের সে-আশাতেও ছাই পড়ল।

প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম না করে এবারেও উৎসব উপলক্ষে রুশ প্রতিরক্ষা-শক্তির একটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দর্শক-প্রতিনিধিদের সামনে দিয়ে রুশ ট্যাঙ্ক থেকে সুরু করে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের শোভাযাত্রা পরিচালনা করা হয়েছে। দুটো ৮২ ফিট দীর্ঘ বিরাট রকেট সবায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রকেট দুটো নাকি গত মাসে উৎক্ষিপ্ত ভোস্কদের 'ছোট বোন'। তা ছাড়া পরমাণুবাহী সাবমেরিন ও রকেটবাহী সাবমেরিনও দেখানো হয়েছে।

রুশ প্রতিরক্ষা-শক্তির পরিচয় দেবার পর প্রতিরক্ষামন্ত্রী মিঃ ম্যালিনোভস্কি তাঁর ভাষণে বলেছেন

• ব্রেজনেভ

যে, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই সোভিয়েট সরকারের নীতি। সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে একমাত্র সোভিয়েট য়ুনিয়নই এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সেনাবাহিনীই দাঁড়াতে পারে এবং প্রতিরোধ করতে পারে বলে মিঃ ম্যালিনোভস্কি মন্তব্য করেছেন।

উৎসব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চৌ-এন-লাই চীনে ফিরছেন না, আরো কয়েকদিন তিনি এখানে থাকবেন। মনে হয় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় তিনি আসতে চান। কিন্তু তার শর্ত হবে কী? বিশ্ব কমিউনিজমের নেতৃত্ব করবে চীন এবং সোভিয়েট এলাকা চীনকে উপঢৌকন দিতে হবে এ-শর্তে কী? সোভিয়েট রাশিয়া নিশ্চয়ই চীনের এ-আবদার রাখবে না।

পাকিস্তান ঃ

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাধারণ লোক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে যে নির্বাচন হয়ে গেল তাতে সম্মিলিত বিরোধী দলেরই জয়-জয়কার হয়েছে।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস গরম। আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষোভ গোড়া থেকেই। ফ্রি ট্রাক, বাস ও নগদ টাকা দিয়েও আয়ুব খাঁর সভায় শ্রোতার অভাব। এর কারণ অবশ্য পরিষ্কার। সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী মিস ফতিমা জিন্নাকে উদ্দেশ্য করে আয়ুব খাঁ যে-ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তা শালীনতা ও সাধারণ রুচিবিরুদ্ধ।

অন্যদিকে লাহোর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন গভর্নর আজম খাঁ সম্মিলিত বিরোধী দলের হয়ে প্রচার সফরে এলে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে বিধ্বংসী সাইক্লোন হলে গভর্নর আজম খাঁ নিজের জীবন বিপন্ন করে দুর্গত নর-নারীর পাশে এসে দাঁড়ান সাহায্যের ডালি নিয়ে। সেই থেকে পূর্ব পাকিস্তানীদের কাছে তিনি 'আজম ভাই'। আরো পাঁচ বছর যদি আয়ুব খাঁকে ক্ষমতায় থাকতে দেওয়া হয় তবে পাক-জনসাধারণ গোলামে পরিণত হবে বলে আজম খাঁ হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে, আয়ুবশাহীকে গ্রাস না করা পর্যন্ত তার যেন শান্তি নেই।

• আজম খাঁ

গোয়েন্দা-গল্প

কালো সরকার

অদ্রীশ বর্ধন

লাল বৃত্ত

মশার কামড়ের সামান্য একটা দাগ বইতো নয়।

কিন্তু তাই থেকেই প্রাক্তন বিচারপতি সত্যেন মল্লিকের যে শেষ পর্যন্ত এমন পরিণতি হবে, তা ভাবি নি।

শুধু অভাবনীয় নয়, ভয়ংকরও বটে।

চোখ বুঁজলে এখনও দেখতে পাই বুকের ওপর ঝুলে পড়া তাঁর মাথাটা। বুদ্ধিদীপ্ত চওড়া কপাল দেখে তখনও বোঝার উপায় ছিল না যে, মারা গিয়েছেন উনি। আনন্দময় কক্ষে অজ্ঞাত কারণে সে এক রহস্যময় মৃত্যু।

ডাক্তার বলেছিলেন, করোনারী অ্যাটাক।

শেষ পর্যন্ত তাই সাব্যস্ত হতো, যদি না মশার কামড়ের সেই দাগটা দেখে ইন্দ্রনাথ----

কিন্তু না, মাঝপথ থেকে নয়, সে-কাহিনী যখন লিখতেই বসেছি, তখন গোড়া থেকেই সুরু করা যাক।---

হগ সাহেবের মার্কেটে গিয়েছিলাম আমি আর কবিতা পূজোর বাজার সারতে। ভেতরে ঢোকার আগেই লিণ্ডসে স্ট্রীটের ওপর দেখা হয়ে গেল জয়ন্তর সাথে।

মুখখানাকে রামগড়ুরের ছানার মত করে সাদা পোশাকে ঘুর-ঘুর করতে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। পুলিশের চাকরি তো। নেহাত দায় না পড়লে খোলস ছাড়তে চায় না কেউ।

বলেই ফেললাম—'শিকার আছে মনে হচ্ছে ?'

দুই ভুরুর মাঝে কিলবিলে বিছুটির মত বিরক্তিটাকে সরল করে জয়ন্ত বললে—'আরে না, না, এমনি হাওয়া খাচ্ছি।'

আর যায় কোথা ! সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা সুরে ফোড়ন কাটলে কবিতা—'তা তো খাবেই। মেয়েদের ঘরে আনতে যারা ভয় পায়, তারাই তো প্ল্যাস্টিক সার্জারী করা পরীদের হাঁ করে দেখার জন্যে হাওয়া খেতে আসে এখানে।'

অবাক হয়ে জয়ন্ত শুধোলে—'প্লাস্টিক সার্জারী করা কেন ?'

'সবে ডানা কাটা গেছে তো।'

বিরক্তির বিছুটিটাকে এক তুড়িতে উড়িয়ে দিয়ে অট্টহাস্য করে উঠলো জয়ন্ত।

'বুঝলে বৌদি, অনেকটা এই কারণেই মেয়ে জাতটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারি না আমি।'

'বটে, বটে।'

'মুখ দেখিয়ে মন ভুলোনোর জন্যে এরা মস্তিষ্কের চেয়ে মুখের কদরটাই বেশি করে। ফলে, মাথার চর্চা

কমতে কমতে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে—'

'আজকাল বুদ্ধিমতী মেয়েরা বিয়ে করছে, আর বুদ্ধিমান ছেলেরা করছে না, এই তো?' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে কবিতা।

আমি বললাম—'কি গো, তোমরা এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থিয়েটার করবে, না এগোবে?'

'এগোবো? কোনদিকে?' শুধোয় জয়ন্ত।

'বাজারের মধ্যে।'

'পাগল। ঐ হুরীদের মাঝে গিয়ে পড়লে আমার কেবলই পা হড়কে যায়। তার চাইতে বরং গ্লোবের ঐ বিলিতি লাভ-পিকচারটা দেখলে কেমন হয়?'

মুখ বেঁকিয়ে কবিতা বললে—'থাক, থাক, আর লভ-পিকচার দেখে কাজ নেই। চলো, কোথাও বসে কফি গেলা যাক।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। অনেকদিন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দেওয়া হয় নি। তাই বললাম—'জাহানারা'তে গেলে কেমন হয়?'

জাহানারা শহর কলকাতার আধুনিকতম সৌখীন রেস্তোরাঁ। সুতরাং কবিতা তক্ষুনি সায় দিয়ে বললে—'ঠিক বলেছো, আড্ডা দেওয়ার উপযুক্ত জায়গাই বাতলেছো।'

জয়ন্ত কিন্তু-কিন্তু করছিলো। তবে কবিতার ভ্রূকুটির সামনে সে আপত্তি ধোপে টিকলো না। গল্প করতে করতে পৌঁছোলাম 'জাহানারা'র সামনে।

বাদশাহী কারুকাজ করা অতীব সুন্দর তোরণের ঠিক ওপরে রঙীন নিওন সাইনে আঁকা একজন নর্তকী ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছিল বিরামবিহীন-ভাবে। একই ছন্দ, একই মুদ্রা আর একই চমকের ঘুরে ফিরে আসা দেখার জন্যে পথচারীরাও মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁ করে তাকাচ্ছিল ওপর পানে।

তোরণ পেরিয়ে ছোট্ট একটা কক্ষ। সে ঘরের দেওয়াল আর ছাদ বিলিতি আয়নায় মোড়া। আমীরী পোশাক পরা একজন পুরুষ আদাব করে রূপোর আতরদানী তুলে ধরে সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে অংগে। ভুর-ভুর খোশবাইয়ে মেজাজটা শরীফ হয়ে যেতেই কাচের জাফরীকাটা দরজা খুলে গেল—চোখের সামনে ভেসে উঠলো যে দৃশ্য, তার সঙ্গে কল্পনার বেহেস্তেরই খানিকটা তুলনা চলে।

সে এক ইলাহী কাণ্ড। মস্ত ঘর। অনেক উঁচু ছাদ। ছাদ থেকে ঝুলছে বিচিত্র ঝাড়—কিন্তু তা শুধু শোভার জন্যে। গোপন উৎস থেকে আসা আলোর স্রোতে ঝলমল করছে গোটা ঘরটা। চারপাশের দেওয়ালে বিরাট বিরাট তসবির। কোথাও জাজিমের ওপর বসেছে গুলজার আমদরবার। কোথাও জাঁহাপনার সামনে বান্দীরা নেচে নেচে বিতরণ করছে সিরাজির পেয়ালা? ছড়িয়ে দিচ্ছে গুলাবজল।

প্রায় প্রতিটি টেবিলেই দেখলাম গুলতানি চলেছে। সামনেই ঘাড়ের ওপর চবির ভাঁজ-ওলা একটি মাড়োয়ারী একজন সুবেশা সুকেশী সুনয়না তন্বীর সঙ্গে হেসে হেসে সোনার দাঁত বার করে খোশগল্প জুড়েছে। অদূরে, সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে, একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ফিস্ ফিস্ করছে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুগল। ঘরের এক প্রান্তে একটু নীচু মঞ্চে জাজিমের ওপর বসেছে বাজনদারদের সভা। এস্রাজ, সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, বাঁশি থেকে সুরু করে প্রায় সবই আছে। ঐক্যতানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশেই একটু বড় মঞ্চের ওপর নেচে চলেছে ঘাগরাপরা একটি সুন্দরী মেয়ে। আইভরির মত গালে আকাশের তারার মত অজস্র চুমকি চমকে চমকে উঠছে মোমের মত মোহময় নরম আলোয়। সাপের মত বেণীটি দুলে দুলে উঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে পীনোন্নত তন্বীদেহকে। অপরূপ সুন্দর মুখটি মায়াময় হয়ে উঠেছে কালো রঙের একটা ফিনফিনে দোপাট্টার বেষ্টনে।

বাজনদারদের প্রায় সামনে বসেও যৌবনোচ্ছল নাচের দিকে মনোযোগ ছিল না যাঁর, তাঁর দিকে চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলাম আমি। মানুষটি মাথায় খুবই খাটো। বাজনদারদের দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন উনি। পরনে অত্যন্ত সাদাসিধা ধুতি আর পাঞ্জাবী। চোখে মোটা শেল ফ্রেমের চশমা। দু'চোখের প্রখর ব্যক্তিত্ব তাতে ঢাকা পড়ে নি—তীব্র সে চাহনি যার ওপর গিয়ে পড়ে, চকিতে সে বুঝে নেয়—কি পরিমাণ কঠোর এই তাপসিক পুরুষটির চরিত্র।

ইনিই ভারতবিখ্যাত বিচারপতি সত্যেন মল্লিক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। আগে থেকেই এই বিরাট পুরুষটি সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর রাখতাম বলেই অত অবাক হয়ে গেছলাম আমি।

স্টুয়ার্ড নির্দেশিত টেবিলের দিকে যেতে যেতে জয়ন্তকে বললাম—'কি ব্যাপার বলো তো, সত্যেন মল্লিক এখানে আড্ডা মারছেন কেন?'

'সত্যেন মল্লিক! তাই তো, এ সময়ে ইনি এখানে?'

সবুজ মখমলমোড়া গদীতে বসতে বসতে বিরক্তস্বরে কবিতা বললে—'কি মুস্কিল, তোমরা ছাড়া কি আর কেউ আসতে পারে না এখানে?'

'তা নয় কবি, সত্যেন মল্লিকের মত মানুষকে এখানে দেখেই আশ্চর্য হচ্ছি আমরা। ওঁর সময়ের দাম তো বড় কম নয়। প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এলে যাঁর সঙ্গে দেখা না করে যান না, তিনি এখানে আসবেন কেন?'

জয়ন্ত বললে—'তা ছাড়া জানো তো, বিচারপতিদের থাকতে হয়

উনবিংশ শতাব্দীর বিধবাদের মত। সংসার থেকে দূরে নিরাসক্ত জীবন-যাপন করতে হয় তাঁদের। তাই—'

সঙ্গে সঙ্গে কবিতা জবাব দিলে—'ভুলে যেও না, উনি এখন অবসরপ্রাপ্ত। যাক গে ও সব ছাইয়ের কথা, কি গিলবে বলো।'

উদ্ভট নামওলা কতকগুলো খাদ্য-বস্তুর অর্ডার দেওয়ার পর আবার চোখ তুললাম।

সত্যেন মল্লিক একা নন। আর একজন ভদ্রলোক ওঁর সামনে বসে। আমাদের দিকে পেছন ফিরে থাকলেও সাজপোশাক দেখে বোঝা যায়, ভদ্রলোক এদেশী নন। সম্ভবত বোম্বাইওলা পার্শি। ঘাড়ের আর গালের রঙ হাতীর দাঁতের মত ধবধবে সাদা। চুলে পাক ধরেছে। বসার ভঙ্গিমাটা অনেকটা অষ্টাবক্র মুনির মত।

নিশ্চয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল দুজনের মধ্যে। কাউকেই ক্ষণেকের জন্যেও মুখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাতে দেখলাম না।

জয়ন্ত বললে—'বৌদি, ঈদের চাঁদ দেখেছো?'

'সে আবার কি?'

'বাঞ্ছিত হলেও সহজে যা দেখা যায় না, তাই হলো ঈদের চাঁদ। এক কথায়, সত্যেন মল্লিককেও ঈদের চাঁদ বলা চলে।'

ভ্রূকুটি করে কবিতা বললে—'পরচর্চা না করে দয়া করে বলবে কি, নিউ মার্কেটের সামনে ওরকম সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিলে কেন?'

গম্ভীর মুখে জয়ন্ত বললে—'সেটা একান্ত গোপনীয়—বিশেষ করে মেয়েদের কাছে।'

রুখে উঠলো কবিতা—'রাখো তোমার গোপনীয়তা। আসলে কোথাও মজেছো।'

'আরে, আরে, তা নয়, তা নয়—'

'তা নয়তো এত লুকোচাপা কিসের শুনি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত বললে—'বৌদি, কালো টাকা বাড়তে বাড়তে আজ এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সরকার শুদ্ধ ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে দেখছে—হু-হু করে জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, কিন্তু কালো টাকার মালিক কালোবাজারীদের শায়েস্তা করার কোনো পথই খুঁজে পাচ্ছে না। সম্প্রতি দিল্লী থেকে কড়া হুকুম এসেছে, অভিযান সুরু হয়েছে এদের বিরুদ্ধে—ঠগী দমনের মতই গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযান।'

কবিতা বাঙালী ললনা হলেও শিক্ষাদীক্ষা তার বোম্বাইতে। সিনেমা-পত্রিকাই তার একমাত্র পাঠ্যবস্তু নয়। রাজনীতি এবং অর্থনীতি সে বোঝে—তা নিয়ে আলোচনাও করে। কাজেই জয়ন্তর কথায় সায় দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ও বললে—'তা যা বলেছো ঠাকুরপো। গলায় ফাঁস দিয়ে নিরীহ পথিকদের অতর্কিতে খুন করতো ঠগীরা। আর, এই মানুষ-পিশাচগুলো পরম বন্ধু সেজে অক্টোপাশের মত হাজার হাজার sucker দিয়ে শোষণ করে চলেছে আমাদের। কিন্তু তোমাদের পুলিশ বিভাগেও তো দুর্নীতি ঢুকেছে।'

আর যায় কোথা। উরুর ওপর প্রচণ্ড চাপড় মেরে স্থানকাল ভুলে জয়ন্ত চেঁচিয়ে উঠলো—'কে বলেছে একথা!'

ব্যস, সুরু হয়ে গেল গরম বিতর্ক। কথা কাটাকাটির তোড়ে বিচিত্র নামের খাবারগুলো কখন যে গলাধঃকরণ করে ফেলেছি, সে খেয়ালই ছিল না। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মুখ তুলতেই কবিতার কাঁধের ওপর দিয়ে নজর পড়লো ওদিকে।

একা বসেছিলেন সত্যেন মল্লিক। অষ্টাবক্র মুনি কোন্ ফাঁকে উধাও হয়েছেন। চেয়ারের পেছনে পিঠ ঠেকে দিয়ে অলস ভঙ্গিমায় বসেছিলেন সত্যেনবাবু। দাঁতের ফাঁকে একটা পাইপ, খুব সম্ভব ওক-কাঠের। চিমনির মত ধোঁয়া উঠছিল পাইপের সুড়ঙ্গ থেকে।

অষ্টাবক্র মূর্তি বাথরুমে গেছেন নিশ্চয়।

কয়েক মিনিট বাদে আবার সেদিকে চোখ পড়তেই দেখি তখনও একা বসে সত্যেন মল্লিক। অষ্টাবক্র-মূর্তি কি তা হলে ওঁকে ফেলে রেখেই চলে গেলেন? না, আর কারও প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন সত্যেনবাবু?

ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হলো। প্রথমত, কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁর মত খ্যাতিমান পুরুষ নিজের চেম্বার ছেড়ে এসেছেন পাঁচ-জনের এই হট্টগোলের হাটে। দ্বিতীয়ত, পার্শি ভদ্রলোকের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনার পরেও নিশ্চয় বসে রয়েছেন কারো প্রতীক্ষায়।

জয়ন্তরও চোখ এড়ায় নি সত্যেন মল্লিকের একলা বসে থাকাটা। হাজার হোক, পুলিশের মন তো; সরল চোখে কোনো কিছুই ভাবে না।

ঘটনাটা ঘটলো ঠিক তখনি।

আচমকা ঘাড়ে চাপড় মারলেন সত্যেন মল্লিক।

নিশ্চয় মশার কামড়।

সেকেণ্ড কয়েক ঘাড়টা চুলকোলেন। তারপর আবার আড় হয়ে বসে ধূমপানে মন দিলেন।

কবিতা বললে—'পুলিশের পরিবারে কেন এত অশান্তি, আর কেনই বা তুমি এখনও আইবুড়ো, তা এতক্ষণে বুঝলাম ঠাকুরপো।'

'কেন?'

'দুনিয়ার সব রঙ-রূপ-রসের মধ্যে তোমরা ক্রাইমের গন্ধ পাও—তাই আনন্দ নেই, শান্তি নেই তোমাদের ঘরে।'

'বড্ড পার্সোন্যাল অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে না?'

'মোটেই না। এসেছো কফি খেতে, তা নয় তখন থেকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছো ভদ্রলোকের দিকে।'

(ক্রমশঃ)

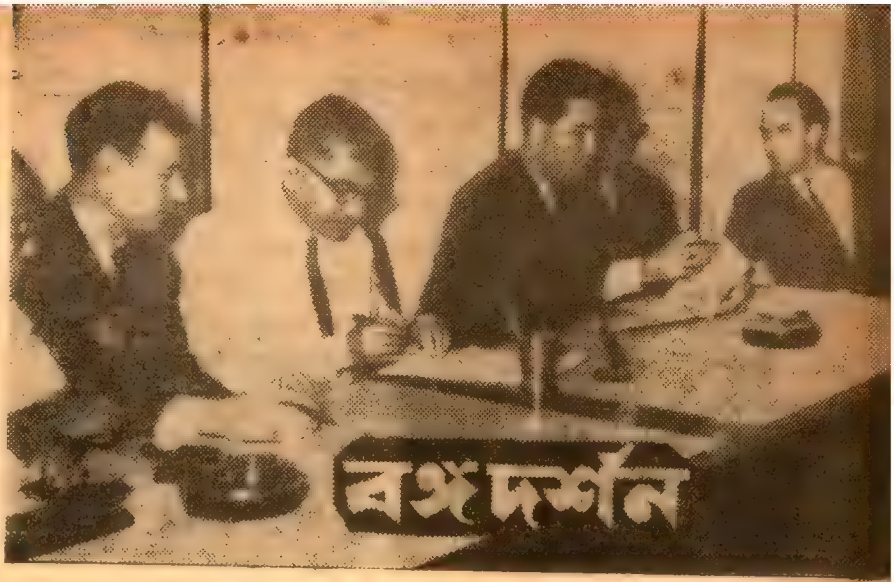

ফরাক্কা বাঁধের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী সম্পর্কে ভারত-সোভিয়েট চুক্তি স্বাক্ষর

রাজধানী।

শহর কলকাতার মানুষের মুখের অন্ন সরবরাহের পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকার জানুয়ারী মাসের আগেই নিচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, ডিসেম্বরেই খাদ্য-বণ্টনের নয়া প্রথা চালু হয়ে যাবে—শহরবাসীদের আর চালের ধান্দায় সকাল-সন্ধ্যা হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে গভীর মতভেদের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম বাংলা সরকার পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন মনে করেছেন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যশস্য সরকারের ঘরে মজুত থাকার ভরসা না-পাওয়া পর্যন্ত অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা প্রবর্তনে সম্মত হতে পারেন নি। এই মতভেদের জন্যই কেরল ভিন্ন অপর কোন রাজ্যের শহরগুলোতে রেশন প্রথা চালু করার বিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় নি। পশ্চিম বাংলা সরকার এই মতভেদ সত্ত্বেও নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন। ডিসেম্বরেই যাতে কলকাতায় নয়া প্রথা চালু হতে পারে তার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্মচারীরা এখন ব্যস্ত।

এই সাহসিকতার জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সকলের অভিনন্দন পেতে পারেন। তিনি শেষ পর্যন্ত সাহস করে পথের কাঁটাকে দলে-পিষে এগিয়ে যাবেন, এই আশাই আমরা করি। আজকের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে এ-ছাড়া ভিন্ন রাস্তাও নেই। পশ্চিম বাংলার বাজার এখন অসাধু ব্যবসায়ীদের মুঠোর মধ্যে। তারাই আসলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের অঙ্গুলিহেলনে ভোগ্যপণ্যের মূল্য বিচিত্রগতিতে উঠছে ওপরের দিকে। মাঝে মাঝে সামান্য একটু থেমে থাকছে, কোথাও দু-এক পয়সা দর নামছে, তারপরই আবার তরতর করে উঠছে। সরকারী যন্ত্র তাদের কব্জা করতে পারছে না। আইনকে এড়িয়ে চতুর ব্যবসায়ীরা সৃষ্টি করেছে কৃত্রিম অভাব। খাদ্যশস্যের ব্যবসা এদের হাত থেকে কেড়ে নিতে না পারলে আইনের বেড়াজাল সৃষ্টি করে এদের জব্দ করা যাবে না। তা করতে হলে, খাদ্যশস্যের ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হয়।

উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে এবং আর্থিক অনটনের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষে সরাসরি ব্যবসায় নামা যতদিন সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন বড় শহরের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব সরকার নিজে গ্রহণ করলে চোরা-বাজারের গলিপথ কিছুটা সরু হয়ে আসবে। মানুষের ক্ষুধার অন্ন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগটা আসবে অনেক কমে।

সেদিন হরিণঘাটায় অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশনে স্থির হয়েছে, নতুন ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সরকার লেভির পরিমাণ দ্বিগুণ করবেন। ধানকলগুলোর কাছ থেকে অর্ধেকটা চাল আদায় করা হবে। এতদিন আদায় করা হতো এক-চতুর্থাংশ। সরকারের এ-সিদ্ধান্তও অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এ-সব সিদ্ধান্তকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের যেরূপ কর্মসূচী সরকার নেবেন—তার ওপরই নির্ভর করবে এর সাফল্য। সরকারের বজ্র আঁটুনি আমরা আগেও দেখেছি। শেষরক্ষা তাতে হয় নি—সবই পরিণত হয়েছে ফস্কা গেরোতে। সে-নীতি, আমলাদের ফিতার বাঁধন ছিঁড়তে হবে। লেভির চাল, তা না হলে, চালান হবে যথারীতি কালোবাজারে। বর্ধমানের চোরা-কারবারীরা হাস্কিং মেশিনের আশ্রয় নিয়ে ফাঁকতালে কাজ হাসিল করছে—লেভি প্রথাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে কেটে পড়ছে।

এ-বছর চাষের অবস্থা খুবই আশাপ্রদ। মুর্শিদাবাদের কিছুটা অংশের চাষের ক্ষতি হয়েছে জল-ঝড়ে। কাটোয়া অঞ্চলের সামান্য ক্ষতি হয়েছে পোকার আক্রমণে। আর সব জায়গাতেই ভাল ধান হয়েছে। রেকর্ড করার মত ফলন হবে বলে চাষীরা আশা করছে। চাষীদের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। সরকার যথাসময়ে এদের প্রবঞ্চনার নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা না করতে পারলে এ-হাসি মিলিয়ে যাবে ধান কাটার মাস দেড়েকের মধ্যেই।

অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর সম্ভবত রাজ্য সরকার এবার একটু

সতর্ক হচ্ছেন। জেলা-শাসকদের এর মধ্যে ডেকে আনা হয়েছিল রাইটার্স বিল্ডিংসে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নতুন ফসল সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন। সংগ্রহের পদ্ধতি কি হবে তা' এখনও ঠিক হয় নি। এ-বিষয়ে জেলা-শাসকদের অভিমত চীফ সেক্রেটারীর কাছে অবিলম্বে পাঠাতে বলা হয়েছে। আগামী পনের দিনের মধ্যেই নতুন ধান সংগ্রহের পাকাপাকি ব্যবস্থা না-করতে পারলে জোতদার ও পাইকারের দল দাদন দিয়ে চাষীদের উদ্বৃত্ত সবটাই আদায় করে নেবে।

সরকারের সংগ্রহ-নীতি যাই হোক না কেন, শহর কলকাতার তাতে বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হবে না। কলকাতার খাদ্য সরবরাহের দায়িত্বটা কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব পালন করবেন, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবেন, এই আশাই করবো। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের নজীর নেই, এমন নয়। কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহে অসমর্থ হওয়াতেই পশ্চিম বাংলায় গম, আটা ও ময়দার অভাব হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরবরাহের ওপর আস্থা স্থাপন করেই পূজার সময় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কথা রক্ষা করতে পারেন নি। বিনা লুচিতেই এবার পূজার ভোগ সারতে হয়েছে। গ্রামের দরিদ্র মানুষ আটা সিদ্ধ খেয়ে উদর পূরণের সুযোগ এখনও পাচ্ছে না। অর্থাভাবে যারা চাল চোখে দেখতে পায় না, আটাই ছিল তাদের সম্বল।

● শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারীতে শহর কলকাতাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ফেলে বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা প্রবর্তিত হবে। এ-রেশন পরিবেশনের দায়িত্ব পশ্চিম বাংলা সরকারের। কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে না-পারলে, সব ব্যবস্থাই বানচাল হয়ে যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রে ভয়াবহ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হবে। জোতদার-আড়তদারের দল তখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি করে তুলতে একটুও কসুর করবে না। শহর কলকাতার বিধিবদ্ধ রেশন প্রথা সফল না হলে কলকাতাকে চোরাবাজারমুক্ত করা যাবে না। মাঠে যত ফসলই ফলুক, কৃত্রিম অভাব ঘুচবে না।

• • •

কমিউনিস্ট পার্টির অতিবাম-গোষ্ঠীর সপ্তম কংগ্রেসের অধিবেশন বেশ ঢক্কানিনাদেই হল। অধিবেশনের প্রাক্কালে পশ্চিম বাংলার তেইশজন নেতাকে ভারত রক্ষা আইনের তিরিশ ধারা বলে গ্রেপ্তার করায় গলাবাজির জোরে ভাঙা হাট আবার জমিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা শ্রীমুজফফর আমেদ, পশ্চিম বাংলা কমিটির (বাম) সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীনিরঞ্জন সেন, শ্রীবিনয় চৌধুরী, শ্রীনীরেন ঘোষ প্রমুখ—তেইশ জন বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এঁদের গ্রেপ্তারের পর শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চেয়েছিলেন।

● শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত

শ্রীবসু কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম স্তম্ভ। স্বপ্নের ঘোর তাঁর নিশ্চয়ই কাটে নি। ভবিষ্যতে তাঁদের সুদিন আসবে—সরকার গঠন করে শাসনদণ্ড হাতে নেবেন, এ-আশা এখনও করেন। সেদিনে তাঁর হাতে যাদের গ্রেপ্তার বরণ করতে হবে, তাদের গ্রেপ্তারের কারণ বিশ্লেষণের কথা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে কি? সাম্যবাদের ইতিহাসে সেরূপ কোন সাক্ষ্য কোথাও নেই। তা ছাড়া, গ্রেপ্তারের কারণ কমিউনিস্ট দলের নেতারা অবহিত নন, এ-কথাই কি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করবে?

কমিউনিস্ট পার্টির বাম পথের পথিকরা এখনও চীনের চেলাগিরি করে যাচ্ছেন। চীনের কর্তাদের চটাবার ভয়ে ভারতের মানুষ একবাক্যে চীনকে বিশ্বাসঘাতক ও আক্রমণকারী বলে ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁরা সিদ্ধান্ত পাল্টান নি। চীনকে তাঁরা আক্রমণকারী বলে স্বীকার করেন না। এইখানেই তাঁদের সঙ্গে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীডাঙ্গের বিরোধ। ১৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভারত আক্রমণ করে লাডাকে এবং নেফায় প্রবেশ করার পর, চীনকে আক্রমণকারী বলে স্বীকার করলে কমিউনিস্টদের

● শ্রীজ্যোতি বসু

চাঁদের হাট রাতারাতি ভেঙে যেতো না—তাঁরা ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়তেন না।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়েছেন, কিছু কারণ আছে বলেই সরকার গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন।

দেশের বর্তমান দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা উত্তর বাংলায় যে-পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাকে মানুষ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। তাঁদের আচরণের প্রতিবাদও হয়েছিল। তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বহু রিপোর্টই নাকি কিছুদিন থেকে সরকারের হাতে এসেছে। দু'মাস আগেই তাঁদের গ্রেপ্তারের কথা একবার উঠেছিল। নানা কারণে সরকার তখন গ্রেপ্তার করেন নি।

* * *

পাকিস্তানের জেল থেকে লেঃ কর্নেল গুণীন্দ্রলাল ভট্টাচার্য মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যার বেসাতি পরিচালনাই পাকিস্তান সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ভারতের মাটি থেকে কৌশলে তাঁকে অপহরণ করে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছিল। মামলায় তাঁকে আট বছর দণ্ডও দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন পর চার বছর মকুব করেন প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ। বাকি চার বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার ক'মাস আগেই আয়ুব নির্বাচনের প্রাক্কালে তাঁকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি পাক-ভারত সম্পর্কের উন্নতিতে কতটা আগ্রহশীল, তার প্রমাণ দিতে চেয়েছেন পাকিস্তানের মানুষের কাছে।

মুখে শান্তির বুলি আওড়ালেও আয়ুব খাঁর নীতির পরিবর্তন হয় নি। পাক-ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে দিনের পর দিন পাকিস্তানী নাগরিক প্রবেশ করছে পশ্চিম বাংলার বুকে। এরা সীমান্তের মেহবানদের গৃহে বসে নির্বিবাদে চালাচ্ছে চোরা-কারবার। গরু-মহিষ চুরি করে পাচার করছে পাকিস্তানে এবং সেই সঙ্গে সংগ্রহ করছে এখানকার গোপন তথ্য। পাকিস্তানের গুপ্তচরদের বলি হয়েছিলেন লেঃ কর্নেল ভট্টাচার্য।

পশ্চিম বাংলার বিরাট সীমান্ত এলাকার যথাযথ প্রহরার ব্যবস্থা করা রাজ্য সরকারের সাধ্যাতীত। ভারত সরকার আসামের সীমান্তকে নিরুপদ্রব করার দায়িত্ব নিচ্ছেন। পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা না-করলে, ভারত সরকার ভুলই করবেন।

* * *

ফরাক্কা বাঁধের অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি শীগ্‌গিরই সোভিয়েট দেশ থেকে এসে পড়বে। প্রায় ন' লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ফরাক্কার জন্য সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছেন সোভিয়েট সরকার। কলকাতার সোভিয়েট দূতাবাসে এই যন্ত্রপাতি সরবরাহের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিতে ফরাক্কা প্রকল্পের প্রধান ইঞ্জিনীয়ার শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায় এবং ভারতে সোভিয়েট সরকারের বাণিজ্য প্রতিনিধি শ্রী ভি পি মলোটকভ ও শ্রী এম পি এলিস্ট্রাটভ স্বাক্ষর করেছেন। এই যন্ত্রপাতি এসে পড়লেই ফরাক্কা আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে।

মুর্শিদাবাদ ঃ

কলেরা রোগের বিস্তারের সম্ভাবনার কথা গেল সপ্তাহেই আমরা নদীয়া জেলার পরিস্থিতি আলোচনাকালে বলেছি। সেখানে রোগ বিস্তারের কারণ এবং তাকে ঠেকিয়ে রাখার বিধানের উল্লেখও করেছি। পরিণামের কথা চিন্তা করে সরকার ও স্থানীয় কর্মকর্তারা কাজে লাগলে মুর্শিদাবাদের এ-দুরবস্থা আজ হতো না। কয়েকটি থানায় কলেরা ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়েছে—মহামারী সুরু হয়ে গেছে কলেরার দাপটে। যে-পরিবারে একবার ঢুকতে পেরেছে, তাদের কাউকেই অব্যাহতি দিচ্ছে না। বংশের বাতি নিবিয়ে দেবার উপক্রম করে তুলছেন—দেবী ওলাইচণ্ডী। তাঁর ভয়াল, বীভৎস রূপ দেখে গ্রামের মানুষ অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। সুতি থানার এক বাড়িতে একই দিনে কলেরায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে চারজন। মেরুপুর গ্রামের একটি পরিবারের এগারজনের মধ্যে দশজনই মারা গিয়েছে কলেরায়। এখন থেকে

● লেঃ কর্নেল ভট্টাচার্য

জেলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে কলেরার টীকা দেবার ব্যবস্থা না করতে পারলে রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করবে।

* * *

অর্থাভাব ও অন্নাভাবের ফলে সমাজ-জীবনে সৃষ্টি হয় বিশৃঙখলা। বেড়ে যায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ও রাহাজানি। বাঁচার দায়ে মানুষের অপরাধবোধও লোপ পায়। বহরমপুর থানা এলাকায় দিনের বেলার প্রকাশ্যে দুর্বৃত্তরা পথচারীকে আক্রমণ করছে। ছিনিয়ে নিচ্ছে তাদের টাকা-পয়সা, ধান-চাল, যখন যা পাচ্ছে। বাগানের ফল, মাঠের ফসল, পুকুরের মাছ নিয়ে যাচ্ছে জোর-জবরদস্তি করে।

সম্প্রতি জনৈক চিকিৎসকের গৃহের জানলা ভেঙে গহনাপত্র নিয়ে গেছে। গভীর রাত্রিতে লাঠিসোটা নিয়ে দলবদ্ধভাবে চড়াও করে তার গৃহের দরজা ভেঙে সর্বস্ব অপহরণ করেছে। স্থানীয় পুলিশ কোনটারই কুলকিনারা করতে পারে নি—কোন অপরাধীকেই তারা আজও খুঁজে বের করতে পারে নি। আইন ও শৃঙখলার এ-অবনতিতে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

* * *

এদিকে সীমান্ত এলাকা হয়ে উঠেছে আন্তঃরাষ্ট্র চোরাকারবারের প্রধান ঘাঁটি। জলঙ্গী সীমান্তের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। পদ্মাপারের মেহবানরা প্রায়ই আসছে এপারে। ওপার থেকে নিয়ে আসছে পাট, লবঙ্গ ও মনিহারী সামগ্রী। এপার থেকে যাচ্ছে বিড়ির পাতা, তামাক ও সূতিবস্ত্র। পাট ও লবঙ্গ বোঝাই নৌকো ধরাও পড়েছে। নৌকোর পেছনে ছুটে ছুটে হাসমপুরে গিয়ে পুলিশ নৌকো আটক করেছে। ব্যাপারীরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল। এখন তারা জেল-হাজতে আছে বিচারাধীন আসামী হয়ে।

মেহবানরা এপারে এসে গুপ্তচরের ভূমিকা গ্রহণ করতেও কসুর করছে না। যারা উত্তর তীরের ফসল কুড়োচ্ছে, সয়তানের সংখ্যা তাদের মধ্যে সর্বাধিক। ঘরবাড়ি পড়ে রয়েছে এখানে, আত্মীয়-পরিজনদের হেফাজতে। পাকিস্তানের নাগরিক সেজে সেখানে চাকরি করছে। ছুটি নিয়ে এখানে এসে পরিচয় দিচ্ছে ভারতীয় নাগরিক বলে। এখানকার টাকা-পয়সা খাটাচ্ছে চোরাকারবারে। যারা অতটা নামতে পারে নি তারা টাকা নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে যাচ্ছে পাকিস্তানে। এদের দল শুধু সীমান্ত এলাকা নয়, ছড়িয়ে আছে পশ্চিম বাংলার সর্বত্র।

বাঁকুড়া :

কংসাবতীর বাঁধ উদ্বোধন করে গেছেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। উদ্বোধন হল মাঠের প্রধান ক্যানেলের জল ছেড়ে। সে জলধারা সেদিন মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল কত আশা। এক মাসের মধ্যেই প্রধান ক্যানেলের পাড় ভেঙে প্রায় একশ' পরিবারের সর্বনাশ করেছে। পাঁচ শ' বিঘার মত প্রথম শ্রেণীর আবাদী জমিকে সে অনাবাদী জমিতে পরিণত করেছে।

ক্যানেলের গেট থেকে কয়েক গজ দূরে পেড়ীপাথর মৌজার এই জমিগুলোতে কংসাবতীর বাঁধ-ভাঙা জলের সঙ্গে পাথর ও বালি এসে জমেছে প্রচুর পরিমাণে। এ-জমি উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। যাদের উপর কংসাবতী প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে তাদের অনেকেরই বেশির ভাগ জমি বাঁধের জলাধারের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। এগুলো সরকার দখল করে নিয়েছেন। বাকি যা হাতে ছিল তাও এখন পরিণত হল অজন্মা জমিতে।

চব্বিশ পরগণা :

হুগলী নদীর মোহনা পাকিস্তানী চোরাকারবারীদের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মেদিনীপুরের সমুদ্রকূলবর্তী এলাকা এবং কাকদ্বীপেই এদের প্রধান আড্ডা। স্থানীয় মুসলমান ও পাকিস্তানী লস্করদের সাহায্যে দীর্ঘকাল বিদেশ থেকে আগত মূল্যবান সামগ্রী পাকিস্তানে পাচার করছে। সম্প্রতি কারবারটা ফেঁপে ওঠায় কিছু কিছু মাল সস্তায় সুন্দরবনের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করতে আরম্ভ করেছে।

চোরাকারবারীরা নৌকো নিয়ে সাগরদ্বীপে এবং মেদিনীপুরের কাছাকাছি নদীর মোহনায় ওৎ পেতে থাকে বড় বড় জাহাজের প্রতীক্ষায়। জাহাজ এলেই নৌকো নিয়ে যায় জাহাজের পাশে। জাহাজের কর্মীদের সঙ্গে এদের দীর্ঘকালের যোগ। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র তারা ঘড়ি, আংটি, রেডিও, গ্রামোফোন, ক্যামেরা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্যাদি নামিয়ে দেয় নৌকোর খোলে।

গ্রামরক্ষীদের তৎপরতায় সম্প্রতি একদল চোরাকারবারী নৌকোসহ ধরা পড়েছে। গ্রামরক্ষীদের কাছে সংবাদ পেয়ে সাগর থানার পুলিশ নৌকোটি ঘেরাও করে ফেলে। শেষ পর্যন্ত তাদের কয়েক রাউণ্ড গুলীও চালাতে হয়। প্রাণের ভয়ে তাদের আটজন আত্মসমর্পণ করে।

* * *

সবাই যখন কোজাগরী পূর্ণিমায় বিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর কাছে কায়মনে প্রার্থনা জানাচ্ছে, তাঁর কাছে ঝাঁপি উজাড় করে সম্পদ বিতরণের—ঠিক সেই সময়টিতে আমাদের সরকারের অবহেলায় সাগরের লোনাজলে সর্বনাশ হয়েছে সাগর থানা, পাথরপ্রতিমা, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি এলাকার বিরাট অঞ্চলের চাষের। বাঁধের উপযুক্ত মেরামতের অভাবে এ-অঞ্চলের এখনও হাজার দুই বিঘে জমি পতিত পড়ে আছে।

॥ নিত্যকালের চিত্তহারী চৌরঙ্গী ॥

(ইংরেজ আমল থেকে সর্বাধুনিক অধ্যায়)

শ্রীপদাতিক

সারা ভারতের দুর্লক্ষণ-লিপির রচয়িতা অষ্টাদশ শতক। এই শতকই এ-দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পথে প্রতুল পাথেয় দান করে সাগর পারের বণিকদের। পণ্ড-প্রতাপেই তারা দিনে দিনে আধিপত্য কায়েম করে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় এবং পরিশেষে হিন্দুস্থানের সমগ্র ভূ-ভাগে। সিরাজের স্বাধীনতার শমশের অপহরণ ক'রে, প্রথম বাংলার আকাশেই তারা ধ্বজা বিস্তার করে স্বৈরাচারের। অবশ্য সিরাজের পর কখনো মীরজাফর এবং কখনো মীরকাসেম কর্তৃক কিছুকাল বাংলা-মসনদের অলংকরণ বজায় থাকলেও, শাসন-দণ্ডের ওপর সার্বিক কর্তৃত্ব ছিল বণিকদেরই। তারাই একবার অহিফেন-বিলাসী জাফর আলীকে সরিয়ে মীরকাসেমকে অভিষিক্ত করে নবাবীয়ানায়, আবার মীরকাসেমকে সিরাজের অনুগমন করিয়ে জাফর আলীর যান্ত্রিক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মসনদে। দেখতে দেখতে এভাবেই তারা বাংলার এবং বাংলা থেকে ভারতের নিষ্কলঙ্ক মৃত্তিকায় শীতংগ সংস্থাপন করে স্বাধীনতা হরণের।

একদা ভাগীরথীর উপকূলবর্তী যে-লালদীঘি অঞ্চলে ছিল ইংরেজ বণিক-দের পান্থশালা—পরে সেখানেই সদম্ভ প্রকাশ ঘটে ফোর্ট উইলিয়ামের। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে দুর্ধর্ষ সিরাজবাহিনী কর্তৃক তা বিধ্বস্ত হলেও, ক্লাইভ কর্তৃক আবার তা সংস্কার সাধিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও হেস্টিংসের আমলে ফোর্ট উইলিয়াম স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে মূর্তিমান করার পথেই একদিকে উচ্ছেদ ঘটে ব্যাঘ্রগ্রাম গোবিন্দপুরের, অন্যদিকে অপসারণ সুরু হয় সারা চৌরঙ্গীর

● কলিকাতার যাদুঘর

আদিমতম অরণ্যের। হেস্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও, কাউন্সিল-সভার দৃঢ় নির্দেশে হাজার হাজার কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে চৌরঙ্গী-অঞ্চল। লক্ষ লক্ষ ধরাশায়ী বৃক্ষের কাণ্ড থেকেই কড়ি-বরগার সৃষ্টি হয়—যা চৌরঙ্গীর একদিকে সুরম্য গৃহ নির্মাণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে দিনে দিনে অন্যদিকে বিস্তৃত এলাকায় বৃহদায়তন ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠারও সহায়ক হয়ে দাঁড়ায় বিশেষভাবে। দেখতে দেখতে এভাবেই অতীত হয়ে যায় ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী অরণ্যের কাল। চির হরিৎ প্রকৃতির অকৃত্রিম প্রাণ-প্রাচুর্য স্বল্পকালের মধ্যেই সংহার করে অষ্টাদশ শতকের আততায়ী পরিচ্ছেদ। ফলে সত্যই পালা বদলের দিন আসে চৌরঙ্গীর। রমণীয় পরিখার পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিশাল ভূ-খণ্ডে আত্মপ্রকাশ করে ফোর্ট উইলিয়াম। পূর্বদিকে শুভ্রকান্তি বসতবাটির অজস্র মিনার স্বাগত জানায় আকাশকে। মধ্যে চিত্তহারী দৃশ্যে বিকাশ প্রাপ্তি ঘটে ময়দানের। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর যাত্রারম্ভ পর্যন্ত নব-রোপিত তরুশ্রেণীর সমারোহ জাগে সারা ময়দানে। উত্তরে-দক্ষিণে এবং ভাগীরথীর প্রান্তিক রেখা থেকে পশ্চিমের সুনিয়ন্ত্রিত বসতি অঞ্চল পর্যন্ত তৃণঘন ময়দানে যে-লাবণ্যের বিচ্ছুরণ ঘটে—সেকালে তা সত্যই ছিল বিরল দৃষ্টান্ত। পরি-বেশের অনুকূলে সমৃদ্ধ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য একাধিক তড়াগের প্রতিষ্ঠা ঘটে এদিকে ওদিকে —যার স্বচ্ছ নীল জলে বিচিত্র মরালের নিত্যোচ্ছ্বাসের

অলংকরণ যেমন রমণীয়, তেমনই কাব্যের প্রতীক রূপেও তা ছন্দের আধার। তাই সব মিলিয়ে সারা ময়দানের আপ্রান্তিক চিত্র ছিল তখন দৃষ্টি-বিনোদনের পক্ষে অদ্বিতীয়। এ-সম্বন্ধে হেনরী কটন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'The cool green foilage with which her tanks are fringed refreshes the eye under the fiercest sun : there are few sights which can challenge comparison with the 'maidan' when it is ablaze with the scarlet splendour of the blossoming gold mohur trees.'

যখন সত্যই আর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না ইংরেজ আধিপত্যের স্থায়িত্বে, তখন প্রভূত হারে স্বাভাবিক কারণেই সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে শ্বেত-বর্ণাশ্রয়ী-দের। তারা অধিকাংশই নিজেদের অধিবাসক্ষেত্র নির্বাচন করে চৌরঙ্গী অঞ্চলে। ফলে গৃহের পাশে আরও অনেক গৃহ, উদ্যানের পাশে আরও অনেক উদ্যান রচনার পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং তা কার্যকরীও হয়ে ওঠে যথাসময়ে। এতকাল যে-সংকীর্ণ সরণী Road to Kalighat নামেই পরিচিত ছিল, এবার তা তথাকথিত ইংরেজ-রাজপুরুষদের চাহিদার স্ব-পক্ষেই প্রস্থে প্রায় চতুর্দশগুণ বিস্তৃতি লাভ করে আগের তুলনায়, তারপর তার সেই পরিমার্জিত সুদৃশ্য তনু প্রাচীন অধ্যায়ের সঙ্গে নিজের আদি নামটিকেও বিসর্জন দিয়ে, নামধারণ করে চৌরঙ্গী রোড।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই যে-নবীন অধ্যায়ের যাত্রারম্ভ—উনবিংশ শতাব্দীতে যৌবনভারে বিলসিত সেই অধ্যায়—চৌরঙ্গীর সৌখীন অঙ্গে বৈচিত্র্য ফোটায় অপরিমেয়। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীর আদি অঙ্ক থেকেই চৌরঙ্গীর সুনিয়ন্ত্রিত এবং নিদর্শনতুল্য নিবাসশ্রেণীর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা পেতে সুরু করে অভিজাত হোটেল, রেস্তোরাঁ, ক্লাবঘর, সংরক্ষণশালা, গীর্জা এবং আরও নানাবিধ প্রতিষ্ঠান—ইতিহাস যাদের উপেক্ষা করতে পারে নি একালেও।

চৌরঙ্গী অঞ্চলেই অবস্থিত 'সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল।' উদ্যান পরিবেষ্টিত এই নয়নাভিরাম গীর্জা সারা কলকাতার এক অদ্বিতীয় নিদর্শনরূপে গণ্য। সম্ভবত বাংলা দেশের আর কোথাও নেই এমন রাজকীয় মর্যাদা-সম্পন্ন কোনো গীর্জার অবস্থিতি। জন-কয়েক ধর্মযাজক একদিন এক বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে 'সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ১৮১৯ খৃস্টাব্দে। তাঁদের মধ্যে একালেও খৃস্টান সমাজের প্রায় সর্বজন-পরিচিত মিড্‌লটন, টার্নার, হেবার এবং জেমস। এই সম্মিলিত ধর্মযাজক-বৃন্দের পরিকল্পনা অনুসারে গীর্জার নক্সা এবং তা নির্মাণ বাবদ খরচের একটা বিশেষ অঙ্কও স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-কোনো কারণেই হোক, তখন কার্যকরী হওয়ার সুযোগ পায় নি তাঁদের সেই পরিকল্পনা। তবে প্রায় পনেরো বৎসর পর যখন ধর্মযাজক উইলসন এসে রেভারেণ্ড টার্নারের পদাভিষিক্ত হন, তখন তিনিই 'সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল' প্রতিষ্ঠার পূর্ব-পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন বিশেষ-ভাবে। উক্ত গীর্জা-গৃহের প্রয়োজনে, তিনি চৌরঙ্গী অঞ্চলেই একখণ্ড প্রশস্ত ভূমি দানরূপে গ্রহণ করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে। তারপর নির্মাণ বাবদ ব্যয়ের এক বৃহৎ অঙ্ক পরিপূরণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের কাজে আত্মনিবেশ করেন বিভিন্ন উপায়ে। তিনি স্বয়ং প্রদান করেন দু' লক্ষ টাকা এবং দেড় লক্ষ টাকা দান করেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তারপর সম্ভবত তাঁরই আবেদনক্রমে ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণ প্রেরণ করেন তেরো হাজার পাউণ্ড এবং ইংলণ্ডেরই 'সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব গশপেল' ও 'সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অব ক্রিস্চান্ নলেজ' একযোগে প্রেরণ করেন দশ হাজার পাউণ্ড। আর চার হাজার পাউণ্ড দান করেন লণ্ডনের এক বিত্তবান ব্যক্তি মিঃ টমাস নাট। তা ছাড়া ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছ থেকেও সংগৃহীত হয় প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। এভাবেই চাঁদা সংগ্রহের কাজ বেশ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করার পর, স্বয়ং উইলসন সাহেবই বিশেষ এক সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রালের' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন• ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের ৮ই অক্টোবর।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবার পরেই কলকাতা টাঁকশালের আদিস্রষ্টা মেজর জেনারেল ডবলিউ এন ফোর্বেশের পরিচালনাধীনে নির্মাণকার্য সুরু হয় গীর্জা-গৃহের। তারপর দেখতে দেখতে ইণ্ডো-গথিক ভঙ্গীতে • স্বল্পকালের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়ায় যে 'সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল'—তা দৈর্ঘ্যে ২৪৭ ফুট, প্রস্থে ৮১ ফুট এবং তার দর্শনীয় চূড়ার উচ্চতা ২০১ ফুট। তা ছাড়া তার বিশাল গম্বুজে যে-সুশোভন লণ্ঠন স্থাপিত হয়—প্রায় ২৭ ফুট তার ব্যাস। Vulliamy নামে জনৈক কারিগর-নির্মিত একটি বিস্ময়কর ঘড়িরও সংস্থাপন ঘটে গীর্জায়। এই ঘড়িটি তার বিচিত্র ধ্বনির জন্যেই বিশ্ববিখ্যাত একালেও। ঘড়ির ঘণ্টায় উৎকীর্ণ রয়েছে : "Its sound is gone out into all lands". এতদ্ব্যতীত The Communion Plate—যা গীর্জার জন্য দান করেন স্বয়ং মহারাণী ভিক্টোরিয়া—তা সর্বকালের এক অতুলনীয় সম্ভার বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

আজও নিত্যকালের এক অক্ষয় কীর্তিরূপে দাঁড়িয়ে আছে 'সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল।' উদ্যানখচিত প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে তার অবস্থিতি। পরিবেশ তার শান্ত, ছায়াঘন এবং জন-বসতির উদ্ভ্রান্ত পদসঞ্চার থেকে মুক্ত।

অভ্যন্তরে তার সংরক্ষিত অসংখ্য স্মৃতিফলক, বিশিষ্ট ইংরেজ-রাজপুরুষ ও বিগত ধর্মযাজকগণের মর্মর-মূর্তি এবং নানাবিধ চিত্র-সম্ভার। আর বহির্দেশে সমাহার ঘটেছে পরিমার্জিত কাননবীথির, একটি পুকুরের এবং এক প্রসিদ্ধ সমাধিভূমির। এখানেই সমাধিস্থ বিগত ধর্মযাজকগণের অনেকেই। অবশ্য জন-কয়েক বিত্তবান ইংরেজও তাঁদের ভাগ্যগুণে সমাধি লাভ করেছেন এখানে। তা ছাড়া আছে বিশপ উইলসনের সমাধি—যিনি কেবল 'সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল' প্রতিষ্ঠা করেই অবিস্মরণীয় নন, সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সিংহল-মালয় ও ব্রহ্মদেশের অসংখ্য নরনারীকে নানা প্রলোভনের মাধ্যমে নিজ খৃস্টধর্মে দীক্ষিত ক'রে, ইংরেজ-মহলের এক শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপে আখ্যা লাভ করেন। তাঁকে তখন বলা হতো 'Champion of Evangelicilism'. লর্ড ডালহৌসী একবার উইলসন সম্পর্কে লর্ড ক্যানিং-এর কাছে বর্ণনা করেছিলেন: The best man of business he had to do with in India.

এ-দেশে অধিবাসকারী ইংরেজ-সমাজ কেবল যে ধর্মের প্রতিই অনুরক্ত ছিল তা নয়, একাধারে তারা যেমন শোষণে এবং শাসনে অশেষ চাতুর্যের অধিকারী, তেমনই আমোদ-প্রমোদেও তাদের রুচির বিহার ছিল বিভিন্ন মার্গে। মদ-মাংসের সঙ্গে উভয়-লিঙ্গগত সংসক্ত নৃত্যের আসরে যেমন আসক্তি ছিল তাদের, তেমনই সঙ্গীত এবং অভিনয়-শিল্পের প্রতিও তাদের অনুরাগ ছিল গভীর। তাই উনবিংশ শতাব্দীর আদিপর্বেই একটি থিয়েটার-গৃহ স্থাপিত হয় চৌরঙ্গী অঞ্চলে।

বর্তমান চৌরঙ্গী রোড এবং থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলের তদানীন্তন ভূমিখণ্ডে ছিল সেই আদি প্রেক্ষাগৃহ। ১৮১৩ খৃস্টাব্দ থেকে

● সেণ্ট পল্স্ ক্যাথিড্রাল

প্রায় ১৮৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে প্রতি রজনীতেই সাড়ম্বর অভিনয়ের অনুষ্ঠান চলেছে সার্থকভাবে। এই প্রেক্ষাগৃহেই অজস্র রজনীর বিস্ময়কর অভিনয়-শিল্প প্রদর্শন ক'রে, ইংরেজ-জনচিত্তে অক্ষয় আসন লাভ করেন মিস এসথার লিচ। এখানে অভিনয়-কালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র সতেরো বৎসর। তিনি এ-বয়সেই তখন যে-কৃতিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন, তা তদানীন্তন পৃথিবীর অন্য কোনো অভিনেত্রী পরিণত বয়সেও অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৩৯ খৃস্টাব্দেরই যে মাসের এক প্রাতঃকালে হঠাৎ অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত হয় চৌরঙ্গীর থিয়েটার-গৃহ। ফলে বেশ কিছুকাল অভিনয়-শিল্প থেকে বিরত থাকেন মিস এসথার লিচ। তারপর পার্ক স্ট্রীটে সাঁ-সুশী প্রেক্ষাগৃহের পত্তন ঘটলে, তিনি আবার সেখানেই নিজেকে সংযুক্ত করেন অভিনেত্রীরূপে। কিন্তু প্রথম রজনীতে সাঁ-সুশীর মঞ্চেই তিনি ভয়ঙ্করভাবে অগ্নিদগ্ধা হন তাঁর জমকালো পোষাকে হঠাৎ অগ্নিসংযোগ ঘটায়। ফলে দিন-কয়েকের মধ্যেই এমন এক অসামান্যা অভিনেত্রীর মহাপ্রস্থান ঘটে পৃথিবী থেকে। তবে তাঁর এই মৃত্যু যে খানিকটা রহস্যজনক—তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে পার্ক স্ট্রীট সম্পর্কীয় নিবন্ধে। তাই বর্তমান নিবন্ধে তার পুনরুল্লেখ আর অপরিহার্য নয় বলেই মনে করি।

অগ্নিসংযোগের ফলে চৌরঙ্গীর সেই আদি থিয়েটার-গৃহ ভস্মীভূত হলেও, তারই স্মরণার্থে একটি বিশিষ্ট সরণীর নামকরণ হয় থিয়েটার রোড—যে নামের প্রচলন ছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নকাল অতিক্রান্তির পরেও। আজ থেকে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে পৌরসভা থিয়েটার রোডের নতুন নামকরণ করেছেন 'শেক্সপীয়ার সরণী'।

চৌরঙ্গী অঞ্চলের সবিশেষ দ্রষ্টব্য এবং ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান মিউজিয়াম বা যাদুঘর। প্রথম দিকে এখানে বসবাস করতেন কাউন্সিল-সদস্য মিঃ

পীটার স্পীক এবং এককালে যাদুঘর সংলগ্ন আর্ট কলেজ-গৃহেরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনিই। পরবর্তীকালে যাদুঘরের প্রয়োজনেই স্পীক-নির্মিত গৃহের রূপান্তর ঘটে বিশাল আকারে। এই বিশালাকার যাদুঘর প্রতিষ্ঠার আশু উদ্দেশ্যে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে এক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেল। ফলে অচিরেই মিঃ ওয়াল্টার বি গ্রানভিলের নক্সা অনুসারে রূপান্তর ঘটে মিঃ স্পীক-নির্মিত গৃহের। তাতে সর্বসাকুল্যে যা ব্যয় হয়—তার অঙ্ক ১৪০,০০০ পাউণ্ড। এই বিশাল গৃহের আয়তন দৈর্ঘ্যে তিন শ' এবং প্রস্থে দু' শ' সত্তর ফুট। গৃহ সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন যুগের নিদর্শনযোগ্য এবং গবেষণাসাপেক্ষ বস্তুসমূহের সমাহার সুরু হয় তার অন্তর্দেশে। দেখতে দেখতে এভাবেই যখন তা উদ্দেশ্যের স্বপক্ষে পূর্ণতা লাভ করে, তখন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের এক শুভলগ্নে তার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় সাধারণের জন্যে।

যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত। যেমন, সম্রাট অশোকের যুগ, ইণ্ডো-স্কাইথিয়ান যুগ, গুপ্তযুগ এবং শিলালিপির যুগ। অথচ এখানে সংগৃহীত রয়েছে মিশরের মমি থেকে অরণ্যযুগের মৃত কীট-পতঙ্গ এবং ফসিলপ্রাপ্ত বৃহদাকার পক্ষী ও সরীসৃপের দেহাবশেষ। আর আছে নানাযুগের দুর্লভ খনিজদ্রব্য, ভূ-বিদ্যার নানাবিধ উপকরণ এবং কিছু মণি-মাণিক্যও। তবে বৌদ্ধ, গুপ্ত এবং কণিষ্কযুগের ভাস্কর্য-সম্ভার ও স্থাপত্য-শিল্পের আধিক্যই এখানে বেশি। সম্রাট অশোকের সেই সমৃদ্ধ কালের শিলালিপির প্রাচুর্যও এখানে লক্ষণীয়।

যাই হোক, সব মিলিয়ে বাংলার এই অদ্বিতীয় যাদুঘর এক চিরস্থায়ী গৌরবের প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রবেশ করলেই নিঃশব্দ অতীতের মুখোমুখি দাঁড়াবার সুযোগ পায় আমাদের কৌতূহল-কাতর অনুভূতি; পশ্চাৎ-পিয়াসী মন তার বিস্মিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারে গভীর থেকে আরও অনেক গভীরতায়—যেখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে মিশরের মমির যুগ, অশোকের শিলালিপির কাল এবং বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী-সভার অধ্যায়।

এই যাদুঘর কিছু অংশে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সংগ্রহশালারূপেও গণ্য। তাই এককালে যাদুঘর পরিচালনার জন্য একুশ জনের বে-ট্রাস্টবোর্ড গঠিত হতো—তন্মধ্যে পাঁচজন থাকতেন এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য, পাঁচজন সরকার পক্ষের মনোনীত এবং পাঁচজন নির্বাচিত হয়ে আসতেন শিক্ষিত বিত্তবানদের মধ্য থেকে। তা ছাড়া সংরক্ষিত আসন লাভ করতেন হিন্দু-মুসলমানের মধ্য থেকে চারজন। আর বাকি দুজনের মধ্যে একজন যাদুঘরেরই উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং একজন সরকার পক্ষের একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেল। বর্তমানে অবশ্য আর সে-নীতির প্রচলন নেই। এখন যাদুঘরের সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন রাজ্য সরকার স্বয়ং।

যাদুঘরের সঙ্গেই সংলগ্ন 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' এবং 'গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস'। এই আর্ট কলেজ পূর্বে 'The Calcutta School of Art and Government Art Gallery'—এই নামে অভিহিত ছিল। পরে স্কুলের রূপায়ণ ঘটে কলেজে। তাই স্বাভাবিক কারণে নামেরও পরিবর্তন হয়। তার সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন Mons Rigaud নামে একজন ফরাসী শিল্পী। তারপর ১৮৬০ খৃস্টাব্দে অধ্যক্ষপদে নিয়োগ লাভ করেন মিঃ গ্যারিক। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে আর্ট কলেজ পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তদানীন্তন বাংলা সরকার এবং বাংলা সরকারের আহ্বানেই ইংলণ্ড থেকে এসে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন মিঃ এইচ এইচ লক্। তিনি এক-দিকে যেমন সুদক্ষ ছিলেন অঙ্কন-শিল্পে, তেমনই কলেজ পরিচালনার কাজেও ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। কলেজে অভিনব শিক্ষণ-রীতি প্রচলন করেন তিনিই। তাঁর আমলে কলেজের ছাত্রসংখ্যাও আগের তুলনায় বৃদ্ধি পায় অনেকগুণ।

মিঃ লকের পর ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে অধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত হন মিঃ ডুবলিউ এইচ জবিন্স এবং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মিঃ আই বি হ্যাভেল। তারপর বিংশ শতাব্দীতে এ-দেশীয়দের মধ্যে একে একে অধ্যক্ষপদে বহাল থেকে কলেজকে সমৃদ্ধির শিখরে আসন দান করেন: আচার্য অবনীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জয়নাল আবেদীন প্রমুখ। আর বর্তমানে যাঁরা কলেজের ঐকান্তিক সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছেন গভীরভাবে, তাঁদের মধ্যে শ্রীচিন্তামণি কর, শ্রীবসন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য, শ্রীগোপাল ঘোষ, শ্রীরথীন মৈত্র, শ্রীমাখন দত্তগুপ্ত প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আজও কলেজের অভ্যন্তরে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে মুঘল, রাজপুত, দক্ষিণ ভারতীয়, পাশ্চাত্য এবং প্রাচীন ও নবীন বাংলার উৎকৃষ্ট চিত্ররাজি—যা বিশ্বের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তিরূপে আসন লাভের দাবি পেশ করতে পারে অনায়াসেই।

চৌরঙ্গী অঞ্চলেই অবস্থিত অক্টারলোনী মনুমেণ্ট। অটল, উদ্ধত ভঙ্গীতে সে দাঁড়িয়ে আছে আকাশ বিদীর্ণ ক'রে। আত্মপ্রকাশ তার মুসলিম শিল্প-রীতির অনুকরণে। নিম্নভাগ তার মিশরীয়, মধ্যভাগ সিরীয় এবং শিখর তার তুর্কীয় শিল্পধারায় বিরচিত। চৌরঙ্গীর সম্মুখভাগের প্রশস্ত ময়দানে এমন এক শুভ্র স্তম্ভের গগন-বিজয়ী অধিষ্ঠান—পরিবেশগত দিক থেকে চৌরঙ্গী অঞ্চলের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে নিঃসন্দেহেই। তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নাগরিক-বৃন্দের অনেকে হয়তো গর্বও অনুভব

করেন। তা ছাড়া মনুমেণ্টের অন্তিম চূড়ায় আরোহণ ক'রে দৃষ্টি প্রসারিত করার সঙ্গে সঙ্গেই বাস্তিক মহানগরীর মেঘ-বলিত নিসর্গ হঠাৎ বুকের আঁচল খুলে ধরা দেয়—তাতে অনেকের বৈষয়িক মনও কাব্যের দিকে ধাবিত হতে বাধ্য। কিন্তু যখন মনে হয়: এই উন্নত স্তম্ভ আদিকাল থেকে সর্বাধুনিক কালেও বহন ক'রে চলেছে এক কুখ্যাত যুদ্ধবাজের স্মৃতি—তখন সেই শুভ্রকান্তি স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে সত্যই কি কোনো বিকার জাগে না আমাদের মনে?

এই কুখ্যাত যুদ্ধবাজটির নাম স্যার ডেভিড অক্টারলোনী। এ-দেশে বৃটিশরাজকে কণ্টকশূন্য করার জন্যেই তিনি সারা ভারতবর্ষব্যাপী অবিরাম যুদ্ধে মেতে থাকেন জীবনের পঞ্চাশটি বছর। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেই তিনি জয় করেন নেপাল। নিজ হস্তেই রাইফেল চালিয়ে হত্যা করেন তদানীন্তন বাংলার জন-কয়েক ইংরেজ-বিরোধী অজানা যুবককে। পশুশক্তির উপর নির্ভর করেই দমন করেন দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ এবং উত্তর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তাই বৃটিশ সরকার সেদিন কৃতজ্ঞচিত্তেই তাঁকে যথাক্রমে রাজপুতানা এবং দিল্লীর রেসিডেণ্ট পদে অভিষিক্ত করেন। তারপর পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটলে, আবার বৃটিশ সরকারই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন চৌরঙ্গী অঞ্চলে। যে-দিন মনুমেণ্টের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হয়, সে-দিন তার পাদদেশেই মদ-মাংসের সঙ্গে অশালীন নাচ-গানের আসর জমায় ইংরেজ সমাজ। এই আসরে এ-দেশীয় নির্লজ্জ জমিদার-শ্রেণীর অনেকেই সেদিন যোগদান করেছিলেন সপারিষদ।

আর আশ্চর্য, সেই আদিকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, মনুমেণ্টের নিম্নভাগের এক শ্বেতপ্রস্তরে একইভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে:

'Sir David Ochterlony, Baronet, Grand Cross of the Military Order of the Bath, Major-General in the army of Bengal, died at Meerut on the 15th July, 1825. The People of Bengal, natives and European, to commemorate his services as a statesman and a soldier, have in grateful admiration raised this column.'

জানি না, স্বাধীন রাষ্ট্রের সচেতন নাগরিক হয়েও, আর কতকাল এই মনুমেণ্টের উৎকীর্ণ লিপি পাঠ ক'রে আমাদের স্মরণ করতে হবে সাম্রাজ্যবাদের সেই কুখ্যাত সহচর অক্টারলোনীকে।

চৌরঙ্গীর ময়দান-অঞ্চলে যেমন অজস্র ক্রীড়া-সংঘের সমাবেশ ঘটেছে ইতস্তত, তেমনই চৌরঙ্গী রোডের পশ্চিম প্রান্তের সারিবন্দী ভবনসমূহের পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে একাধিক সুরম্য ক্লাব-গৃহ—সত্যই যা অভিজাত এবং অনন্য। এই ক্লাবসমূহের মধ্যে বেঙ্গল ক্লাব, ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব, টার্ফ ক্লাব, ইয়ং মেনস খৃস্টান এসোসিয়েশন এবং ধর্ম প্রতিষ্ঠান 'বাইবেল সোসাইটি' দূর থেকেও পরিদৃশ্যমান।

তবে এতদঞ্চলে সর্বাধিক খ্যাতি-সমৃদ্ধ বেঙ্গল ক্লাব। এ-ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৮২৭ খৃস্টাব্দে। কেবল উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারী এবং সেই সঙ্গে ভাইসরয়, গভর্নর ও তৎ-সমপর্যায়ের শ্বেত-বর্ণাশ্রয়ী নরনারীদের জন্যেই বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা ঘটে প্রথম দিকে। এই ক্লাব-গৃহেই প্রথম দিকে বসবাস করতেন আইনজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক লর্ড মেকলে। প্রথম History of England রচনা করেন তিনিই। একদা ক্লাইভ এবং হেস্টিংসের দুর্নীতি সম্বন্ধীয় তাঁর বহু তথ্যপূর্ণ রচনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে ইংলণ্ডে।

যাই হোক, পরবর্তীকালে বেঙ্গল ক্লাবে সভ্য গ্রহণের রীতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ শ্বেত-বর্ণাশ্রয়ী ইংরেজ হলেই বেঙ্গল ক্লাবে তার সভ্য পদাধিকার থাকবে—এমন নিয়ম প্রবর্তন করা হয় কিছুকাল পরে। কিন্তু এ-দেশীয় কৃষ্ণ-শ্যামল বা গৌর বর্ণাশ্রয়ীদের প্রবেশাধিকার সেখানে অস্পৃশ্য তুল্যই নিষিদ্ধ থাকে স্থায়িভাবে। অথচ তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর এ-দেশীয় এক সৌখীন ধনপতির নন্দন একদিন বেঙ্গল ক্লাবের সভ্যপদ লাভের জন্য নানাভাবে খরচ করে প্রায় লক্ষ টাকা। কিন্তু তাতেও সে যখন সভ্যপদ লাভে সক্ষম হলো না, তখন সে আরও লক্ষ টাকা খরচ ক'রে গেল ইংলণ্ডে এবং সেখানেই নীতিগত দিক থেকে সে ইংরেজ-রাজ-পুরুষদের কাছে অভিযোগ পেশ করলো বেঙ্গল ক্লাবের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কারণ কলকাতার এক বেসরকারী ক্লাবের বিপক্ষে কোনো আদেশ জারী করার ক্ষমতা নেই ইংলণ্ডের। তাই হতাশ হয়ে ইংলণ্ড থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এলো এ-দেশীয় সেই বিলাসী যুবক। কিন্তু এই অবমাননার জ্বালা অন্তরে নীরবে লালন করা বেশিদিন সম্ভব হলো না তার পক্ষে। একদিন ব্যর্থ আক্রোশে বেঙ্গল ক্লাবের

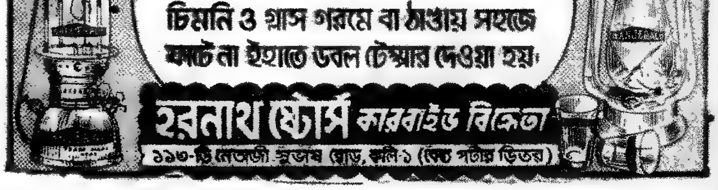

এক নাচ-গানের আসরে সে বোমা নিক্ষেপ করলো হঠাৎ। ফলে আহত হলো আসরের অধিকাংশ ইংরেজ নরনারী।

পরদিন থেকেই অনুসন্ধান চললো আততায়ীর। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে ধরতে পারলো না সেই ধনপতির নন্দনকে। সুতরাং সে-যাত্রা সে বেঁচে গেল এবং বর্ণ-বিদ্বেষ নীতিও আগের মতোই স্থায়িভাবে বজায় থাকলো বেঙ্গল ক্লাবে।

কিন্তু কেন এই বাদ-বিচার? এ-দেশেই অবস্থিত কোনো ক্লাবে এ-দেশীয়দের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধই বা থাকবে কেন? এভাবে বর্ণ-বিদ্বেষ বা বিজাতীয় অবজ্ঞা জীইয়ে রাখা কি ইংরেজ সভ্যতারই প্রকৃত পরিচয়? তা হলে কি আমাদের এ-কথাই মনে করতে হবে যে, শ্বেত-বর্ণাশ্রয়ীদের স্বভাব আদিম অরণ্যযুগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে না কোনোদিনও?

ছাত্রদের অপরিহার্য্য গ্রন্থ
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পালামৌ

---ইহাতে আছে---

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনী--সঞ্জীবনী-সুধা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'পালামৌ সমালোচনা' এবং সমালোচক-শ্রেষ্ঠ চন্দ্রনাথ বসুর সঞ্জীব-সাহিত্য সমালোচনা। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্ত্তৃক দ্রুতপঠন গ্রন্থরূপে নির্ব্বাচিত।

মূল্য এক টাকা।

রোমাঞ্চ উপন্যাসের যাদুকর
৺দীনেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—৫খানি সুবৃহৎ ডিটেকটিভ উপন্যাস। মূল্য ৩॥• টাকা
২য় ভাগে—৫খানি রহস্য উপন্যাস। মূল্য ৩॥•

বসুমতী প্রাইভেট লিঃ
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

● বেঙ্গল ক্লাব

শোনা যায়: বেঙ্গল ক্লাবের সেই পূর্ব-নীতির কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নি আজও। আমরা আশা করবো: ব্যাপারটা তেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, আমাদের স্বাধীন সরকার সে-বিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

অত্যন্ত আনন্দের কথা: আজ বর্বর আউটরামের অশ্বারূঢ় মূর্তির অপসারণ ঘটেছে চৌরঙ্গী অঞ্চল থেকে। আজ আউটরামের স্থলাভিষিক্ত হয়েই সত্যাগ্রহী যুগের প্রতীকরূপে দাঁড়িয়ে আছে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর ব্রোঞ্জ মূর্তি। নিত্য-সন্ন্যাসী মহাত্মাজীর এই প্রাণবন্ত মূর্তিটি বর্তমানে আরও অনেক মর্যাদা এবং গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছে চৌরঙ্গী অঞ্চলের।

চৌরঙ্গীর অজস্র হোটেল-রেস্তোরাঁর মধ্যে ফারপো, গ্র্যাণ্ড, প্রিন্সেস, মীরা, সেরাজেড, চাইনীজ ক্যাথে, কণ্টিনেণ্টাল এবং ব্রিস্টল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বিপণির বিচিত্র মেলাও বিস্তৃতি লাভ করেছে এ-পথেই। পাশাপাশি সমাহার ঘটেছে একাধিক প্রেক্ষাগৃহেরও। সুতরাং সর্বাধুনিক অধ্যায়ের চৌরঙ্গী আরও অনেক চিত্তহারী বলেই মনে হয়। আকর্ষণ তার দিবসে দুর্বার, নিশীথে প্রচণ্ড। তাই এক সূর্যোদয় থেকে আরেক সূর্যোদয় পর্যন্ত দ্বিপদচারীদের পদক্ষেপে কোনো যতি পড়ে না এখানে। তবে পদক্ষেপ প্রয়োজনবোধেই কখনো চপলগতি, কখনো শ্লথগতি এবং কখনো সতর্ক গতিতে পাথর অতিক্রম করে চৌরঙ্গীর।

চৌরঙ্গী অনন্য, চৌরঙ্গী অসাধারণ। অতএব যুগে যুগে তার এই প্রচণ্ড আকর্ষণ নিয়েই সে জেগে থাক মহানগরের মূল কেন্দ্রে। কোনোদিন দুর্যোগ-দুর্বিপাকেও তার যেন রূপান্তর না আসে, দারুণ দুর্দিনেও সে যেন দুঃস্থ না হয়। নিত্যকালের চিত্তহারী হয়েই সে চিত্তহরণ করুক এ-দেশের, বিদেশের এবং বিশ্বের বিশ্রুত জন-সমাজের—যাঁরা ভারতদর্শনে এসে শহর-কলকাতার প্রতিও একবার নিক্ষেপ করতে চাইবেন উদাস দৃষ্টি।

এমাসের বৃটেনে

ডি. এ. জনসন

('বর্তমান রচনাটি যখন প্রকাশিত হবে তখন সেই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে যা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এখানকার সাধারণ মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রথমত, সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল; দ্বিতীয়টি রাণীর কানাডা সফরের সঙ্গে জড়িত জীবনাশঙ্কার প্রশ্ন ('দি টাইমস' পত্রিকার ভাষায় 'একটি নির্দোষ জীবনের আশঙ্কা।')

বৃটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনে এই প্রথমবার ভোটদানের সুযোগ পেলাম আমি। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে আমার একটি ভোট ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পৌঁছোবার আগেই ভোটদানের নির্দিষ্ট সময় উৎরে যেত। এবং স্পীকারের নির্বাচনী এলাকায় থাকার জন্য এবারও ভোটদানের সুযোগ প্রায় হারাতে বসেছিলাম।

কিন্তু প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে। তা না হলে যদিও কার্যত আমি ভোটদানে বঞ্চিত হতাম, তবু সেটাই যেন ভালো ছিল। এই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চনার নিয়মটা নেহাৎ খারাপ নয়।

সম্ভবত আমার মতো অনেকেই নির্বাচনী হৈ-হুজ্জুতিতে ক্লান্তি বোধ করেন। তবে নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটে। অনেক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে। সন্ধান পাওয়া যায় নানারকম দলিল দস্তাবেজের। তা ছাড়া ধর্মঘট এবং উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা তো আছেই। এবার তেমনি এক ঘটনাই ঘটে গেছে বেলফাস্টে, সঙ্গে কলকাতার অনেক অনুরূপ ঘটনায় স্মৃতির স্পর্শ রেখে গেছে আমার মনে। এক টেলিভিশনকে কেন্দ্র ক'রেই একরাশ বাক-বিতণ্ডা হ'য়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য টি-ভি'-র সময়বণ্টন-রীতিতে শুধু কমিউনিস্টরাই নন, অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে অবশ্য ওয়েলশ ন্যাশনালিস্টদের কথা আমার জানা আছে। ওঁদের ধুয়ো আলাদা,—'নিজের কাজ নিজে কর।' আর সেজন্য নিজস্ব একটি প্রচারকেন্দ্রও আছে তাঁদের। এঁদের জন্য আমার শুভেচ্ছা রইল।

ওয়েলশ ভাষায় অবশ্য আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি নেই। এজন্য দ্বিপ্রাহরিক সংবাদ-সমীক্ষার আগে ওয়েলশ ভাষায় বি-বি-সি যখন একটি নিয়মিত আলোচনী প্রকাশ করতেন, চাবি ঘুরিয়ে আমাকে তখন আওয়াজটা বন্ধ ক'রে দিতে হ'ত। বরং খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও, টেলিভিশনের পর্দায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বক্তাদের মুখগুলি লক্ষ্য করতে বেশ লাগত আমার। বাস্তবিক আমার এই নবাবিষ্কৃত উপায়টি খুব কাজ দিয়েছিল বলতেই হয়। অবশ্য জনসাধারণের পক্ষ থেকে বি-বি-সি'র প্রশ্নকর্তারা যখন ওঁদের প্রশ্ন করতেন, তখন স্যার আলেক ডগলাস হিউম, মিঃ উইলসন ও মিঃ গ্রিমণ্ডের বক্তব্য আমি ধৈর্য ধ'রেই শুনতাম। সব থেকে কম সুযোগ দেওয়া হ'লেও, কিম্বা হয়ত ঐ কম সুযোগের জন্যই মিঃ গ্রিমণ্ডকেই আমার সব থেকে ভালো লেগেছে।

উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে কমনওয়েলথ অভিবাসন (Commonwealth immigration) সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি ছিল অন্যতম। কিন্তু এ বিষয় টোরি এবং সোস্যালিস্টদের বক্তব্যে আমি খুব একটা পার্থক্য দেখতে পাই নি। শ্রোতাবিশেষে হয়ত এঁদের বক্তব্যের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলি ধরা পড়ে থাকতে পারে। আলোচনা শুনে আমার তো মনে হয়েছে দু' তরফই অভিবাসনের (immigratioo) ওপর বিধিনিষেধ আরোপে ইচ্ছুক। যদিও এ-সম্পর্কে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন মিঃ উইলসন।

ওদিকে ব্র্যাডফোর্ডে সেই সময় নতুন সমস্যা দেখা দিল। স্থানীয় জেলা শাসকরা একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, দুজন পাকিস্তানী অধিবাসীকে (immigrants) অন্যায়ভাবে জেল দেওয়া হয়েছে। কেন না লোক দুটির পাশপোর্টের ওপর ভুলবশত তিনমাসের অবস্থান-মেয়াদের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয় (সাধারণত বিদেশীদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ছাপ দেওয়ার রীতি আছে)। অবশ্য রাণীর ক্ষমা-করার অধিকার প্রয়োগ করলে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারে।

স্মিথ উইকের জনৈক কনজারভেটিভ প্রার্থীর মন্তব্যকে কেন্দ্র ক'রেও বেশ কিছুটা নির্বাচনী বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। ভদ্রলোক পরে জবাবদিহির ছলে আর একটি বিষয় উত্থাপন করেছিলেন: তাঁর মতে, 'নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে গুটিয়ে থাকার নীতিই শিখ-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবমাননা করছে।' মনে হয়, ইতিমধ্যে হয়ত যানবাহনে নিযুক্ত শিখরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সুবিধা-সুযোগ সম্পর্কে সমর্থন পেয়ে যাবে (অবশ্য কিছুসংখ্যক 'পপ' ও 'বিটনিক' তরুণ শিখেদের যে বিলাসবহুল চুল-দাড়ি-গোঁফের সমর্থন করে তা এ-পর্যন্ত সরকারী সমর্থন লাভ করে নি। সময় বিশেষে সরকারী চিন্তাধারায়ও যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় মেলে)।

উল্লিখিত পাশপোর্ট সমস্যার সঙ্গে আরও একটি মজার ঘটনা প্রসঙ্গত

হ্যারল্ড উইলসন

উল্লেখ করছি: লণ্ডনস্থ এক সলিসিটর জনৈক বিদেশীর কাছ থেকে ইংলণ্ডের চেক গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর টাকাটা তিনি স্পেনে সদ্ব্যবহার করেন। শেষে উক্ত টাকার গ্রহীতা জনৈক স্প্যানিশ ভদ্রলোক বৃটেনে এলে বৃটেনের এক্সচেঞ্জ কণ্ট্রোল এ্যাক্ট অনুসারে তাঁর ওপর শাস্তির বিধান দেওয়া হ'ল। জরিমানা হ'ল দু'হাজার চারশ' পঞ্চাশ পাউণ্ড। পরে ভদ্রলোকের কৌঁসিলীর ওকালতিতে জরিমানার অঙ্ক কমিয়ে সাতশ পাউণ্ডে আনা হয়। কৌঁসিলীর বক্তব্য ছিল, তাঁর মক্কেল এই 'অত্যন্ত জটিল' আইন হৃদয়ঙ্গম ক'রে উঠতে পারেন নি। সম্ভবত কৌঁসিলী মহোদয়ের বক্তব্য বহু লোকেরই সমর্থন লাভ করবে।

অভিবাসন সমস্যার (immigration question) আর একটি লক্ষণীয় ফলশ্রুতি হ'ল বেকার সমস্যার ক্রমাবনতি যদিও কতিপয় দরিদ্র ফরাসীর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত জনৈক ধর্ম-প্রচারকের গণনানুসারে প্রত্যেক পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশেই তিন থেকে পাঁচ শতাংশ লোক নিদারুণ হতভাগ্যের জীবনযাপন করে। বৃটেনেও যে কিছুসংখ্যক বৃদ্ধের জীবনে দারিদ্র্যের বসতি আছে তা অনস্বীকার্য। এই সঙ্গে একথাও মনে রাখা উচিত যে, যদি নির্বাচনের পর ব্যালেন্স অব পেমেণ্টের অসুবিধাগুলি নতুন নতুন (সরকারী) নিষেধাজ্ঞা সৃষ্টি করে তা হলে কর্ম-সংস্থানের ব্যাপারটি আবারও অধোগামী হবে ব'লে আশঙ্কা করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে শ্রমিক সংঘ এবং (অপেক্ষাকৃত হাল্কাভাবে) নিয়োগকর্তারা বিতর্কটি বে-সরকারী কার্যক্রমের প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত ক'রে আনছেন। আর যতই জটিল হোক, মনে হচ্ছে, নতুন সরকার নিশ্চয়ই মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তে এনে ফেলবেন। যাই হোক, একটি সরকারী হিসাবে তবু একটুকরো আরামপ্রদ সংবাদ জানা গেছে যে, অবচয়ের বা মূল্য হ্রাসের (depreciation) আগে বৃটেনের স্থাবর সম্পত্তির দাম ছিল ৯৭,০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

বির্মিংহ্যামের হার্ডি স্পাইসার মোটর কম্পোনেন্টস ওয়ার্কসের ধর্মঘটও নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তারের হুমকি দেখিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এই নাটকে কতকগুলি সংবাদপত্র নাটের গুরুর দোসর হ'তে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা ঘণ্টাপিছু ছ' পেন্সের ওপর একটা অসম্ভব দাবি তুলে ধরেছেন। আসলে কিন্তু পুরো ছ' পেন্সই হ'ল শ্রমিকদের দাবির দুই-তৃতীয়াংশ। ভয়ের প্রকৃত কারণও ছিল, তিনশ' শ্রমিকের (এক সময় এই সংখ্যা ছিল, মাত্র চোদ্দ) এই বিক্ষোভ ক্রমে গোটা মোটর শিল্পেরই সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারত। তত্রাচ, আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু অন্তত বোঝা গেছে যে, খুব অল্পসংখ্যক লোকই সম-শিল্প-সমবায় (Horizontal Industry) প্রসারের সমর্থক। কিন্তু মিঃ উইলসনের কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগের ইঙ্গিত ও হার্ডি স্পাইসার-সভাপতির শ্রমিক সম্পর্কে পৃষ্টপোষকতামূলক মন্তব্যগুলি বিস্মৃত হ'লে পুনরায় ব্যাপারটা দানা বেঁধে উঠতে পারে।

আরও একটি ধর্মঘটের হুমকিতে দাবি উঠেছিল, চা-শ্রমিকদের (Tea boys) রীতিমত কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং যথার্থ অধ্যবসায়ী শ্রমিকদের সমপরিমাণ, সাপ্তাহিক ৪২ পাউণ্ড মজুরী দিতে হবে। এতে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে, লণ্ডন সি-আই-ডি বিভাগের সার্জাণ্ট চ্যালেনারের মতো এক সপ্তাহে একশ' দু'ঘণ্টা কাজ করতে হ'লে এরা কত পারিশ্রমিক চেয়ে বসবে। গত বছর গ্রীসের বহু বিতর্কিত রাণী ফ্রেডারিকার সফরকালে ও তার আগেকার চ্যালেনার কার্যপদ্ধতি নিয়ে আজও অনুসন্ধান চলছে। এক সময় চ্যালেনারকে কালো দুনিয়ার underworld আতঙ্ক বলা হ'ত। তাঁকে গেঁথে ফেলার পুরস্কার স্বরূপ কালো-মুল্লুক হাজার পাউণ্ড পারিতোষিক ঘোষণা করেছিল ব'লে জানা যায়। কিন্তু যে সমস্ত ডাকসাইটে হামলাবাজদের

হিউম

তিনি রুখেছেন, এই অঙ্ক সে তুলনায় নগণ্য।

পুলিশের হাতে শুধু কতকগুলি বাড়তি ক্ষমতা কিম্বা পুরোপুরি অবাধ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার তুলে দেওয়া উচিত কি না এ-বিষয়ে বর্তমানে চিন্তার অবকাশ আছে। জেলা-শাসকদের হাতে অনেক এবং অপর্যাপ্ত ক্ষমতা আছে ব'লে মনে করা হয়। তাঁদের এক-একজনের উক্তিতে এক-এক সময় বিমূঢ় হ'তে হয়। বি-বি-সি'ও এ-ব্যাপারটা ব্যঙ্গচ্ছলে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইদানীং সাধারণের সঙ্গে বিচারকরাও 'শাস্তি বিধানের সমস্যা' নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমার মনে হয়, চিন্তার আসল কারণ, একই অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তির বিস্তর তারতম্যের সমস্যা।

কোনো না কোনোভাবে আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার আলোচ্য বিষয় হয়েছে। শুধু আর এক জাতীয় বিধি-নিষেধ বর্তমান আছে। যেমন ব্যারিস্টারদের ক্ষেত্রে নিজস্ব এলাকার বাইরে ভিন্ন জেলায় উপস্থিত হওয়ার অসুবিধা—যার ফলে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে মক্কেলদের খরচও বেড়ে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থার অবসান হওয়া দরকার। এঁদের অতিদীর্ঘ ছুটিছাটা সম্পর্কেও সমালোচনা হয়েছে। তা ছাড়া ল' অব এভিডেন্সেরও পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। 'দি টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে জনৈক আইন-শাস্ত্রের অধ্যাপক এই মর্মে এক প্রস্তাব রেখেছেন যে, যেহেতু 'সংবাদপত্র রেডিও ও টেলিভিশনের কল্যাণে বেশির ভাগ জুরিই জানেন, কোনোও অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের সদাচারের পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে না পারলে দোষী সাব্যস্ত হ'ন, অতএব এ সমস্ত ক্ষেত্রে স্বয়ং বিচারকের কর্তব্য জুরিদের প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই রকম অভিযোগ আগে কখনো আনা হয়েছে কি না। কিন্তু আলোচনাটির অধিকতর প্রাসঙ্গিক অংশে টেপরেকর্ড ব্যবহারের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কিছুদিন হ'ল পেশাদার ফুটবল খেলোয়াড়দের ওপর একটি ডাকাতি হামলার বিচারের সময় এই রকম টেপরেকর্ডার ব্যবহার করা হয়।

কেবলমাত্র বিচারালয়ের ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও পরিবর্তনের হাওয়া বইছে।

একটি ধোলাই-যন্ত্রের কারখানা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে যে, প্রত্যক্ষ বিক্রয়, অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ সাধনের জন্য যে আঘাত হানা হয়েছে এসব তারই ফল। লণ্ডনস্থ উইণ্ডমিল থিয়েটার বন্ধ হওয়ার সংবাদও আর একটি চরম আঘাত। উইণ্ডমিল থিয়েটার অনেক নামজাদা হাস্যরস-শিল্পীর প্রথম শিক্ষালয়। অবশ্য এর খ্যাতির প্রধান কারণ, পোষাক-পরিচ্ছদের স্বল্পতা, এবং তার কারণ, আত্যন্তিক প্রতিযোগিতা।

বোহেমিয়ার মাছের পুকুর

মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

কী শান্ত রূপালী এর ঢেউ,
উদার আকাশের ছায়া এসে পড়েছে,
বোহেমিয়ার এইসব মাছের পুকুরে
যেন স্বর্গের ছায়া পড়ে।
সবুজ অরণ্যের মাঝে এইসব অঞ্চল
ঘুমের মত মনে হয়,
শান্ত সৌন্দর্যের মাঝে ঘুঘু ডাকে,
বন্য রাজহাঁস উজ্জ্বল ডানা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়

সূর্যাস্তের রঙীন আলোকে রামধনু রং
দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়,
ঘাসের সবুজ গন্ধ হৃদয়কে উদ্বেল করে,
এই সৌন্দর্য, এই রূপ, এই স্রোত
শান্ত বিস্তৃত মনোরাজ্যে এক অনাদি অনন্ত
দুঃখের ঢেউ তোলে। *

চেক কবি Antonin Sova-এর কবিতার অনুবাদ

একটি বৃক্ষের অপমৃত্যুতে

ধন্বন্তরি

তেরো বছরের অজ্ঞাত তারা সাক্ষী ছিল সে শাখা;
অনেক ঊর্ধ্বে অনেক আকাশে লুকিয়ে রেখেছে ভয়;
দুর্যোধনেরা দুর্জন এরা উঁচুতে তাকাতে পারে না,
বিশ্বাস ফিরে পেলো দুর্যোগে বৃহন্নলার পাখা।

শাখানির্ভর মহাভারতের দূরায়ত সান্ত্বনা,
কঠিন শেকড়ে বেঁধে দিয়েছিল দ্বাপর ত্রেতা ও কলি।
বাকী এক যুগ বিবর্তনের সম্ভাবিতও ছিল—

ক্ষুদ্রবোধের দুর্যোধনেরা নিঃশেষে গেল ছলি॥

কৃষ্ণচূড়া

ধারাবাহিক উপন্যাস

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ত্রিশ ॥

যত্ন করে কী কী খাইয়েছিল কৃষ্ণা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ঘোমটা-দেওয়া বাণীব্রতের মা চাপা গলায় সস্নেহে মাঝে মাঝে কি বলেছিলেন, খাওয়ার কিছু নেই বলে বারবার করে কী ক্ষোভ জানাচ্ছিলেন সত্যব্রত—কিরণ ভালো করে সেগুলো অনুভব করে নি, শুনতেও পায় নি। শুধু মাথার যন্ত্রণা আর মনে একটা বিস্বাদ ক্লান্ত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

তারপর শোবার পালা। বাণীব্রতর সেই ঘরটিতেই—যেখানে প্রথম দিন এসে সে বসেছিল। সেই কৃষ্ণার আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবি, শেল্‌ফে টেবিলে বইপত্র, সেই ডোম-শেপের টাইমপিস্ ঘড়িটা। কিরণের সম্মানে বিছানায় দুগ্ধশুভ্র একটি চাদর, বালিসে নতুন তোয়ালে।

কৃষ্ণা ঘরে এসেছিল কিরণের সঙ্গে। কিরণ শুধু একবার বলেছিল, আমি তো বাণীব্রতর ঘর দখল করলুম, ও এসে কোথায় শোবে?

—অনেক জায়গা আছে—কৃষ্ণা হেসেছিল: আপনাকে ভাবতে হবে না। রাতে আপনার জল লাগে কিরণদা? দিয়ে যাব?

—না।

—ঘরে আলো থাকবে?

—না। আলো থাকলে আমি শুতে পারি না।

—তা হলে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ুন। কোনো দরকার হলে আমায় ডাকবেন।

—দরকার হলে ডাকব। কিন্তু দরকার হবে না।

কৃষ্ণা মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বললে, জোর করে আটকে রেখে আপনাকে খুব কষ্ট দিলুম, না কিরণদা?

—হ্যাঁ, খুব কষ্ট দিয়েছ। কিন্তু এখন আর সেজন্যে তোমায় দুঃখ করতে হবে না। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ো গে—যাও।

কৃষ্ণা একটু হাসল। বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, দরজা বন্ধ করে আলোটা নিবিয়ে দিন। —নিজেই কপাট দুটো টেনে দিয়ে চলে গেল।

আড়ষ্ট পায়ে এগিয়ে কিরণ আলোটা নিবিয়ে দিলে, দরজার খিল তুলে দেবার উৎসাহও সারা শরীরে সে আর খুঁজে পেল না। তারপর টলতে টলতে এসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়। তলিয়ে গেল একটা ঘোরের মধ্যে।

কিন্তু আচ্ছন্নতার ভাবটা বেশিক্ষণ থাকল না। অচেনা জায়গা, অচেনা বিছানা—একটু একটু করে কিরণ সজাগ হয়ে উঠতে লাগল। মাথার যন্ত্রণাটা খানিক কমেছে—আধো-ঘুম, আধো-জাগার মাঝখানে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইল সে।

চোখের পাতাটা মধ্যে মধ্যে খুলে যাচ্ছিল, অন্ধকার ঘরে টাইমপিস্‌টার জলন্ত নীলচে ডায়াল আর কাঁটা দুটো ঝকঝক করে উঠছিল একমুঠো জোনাকির মতো। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দের মতো মনে হচ্ছিল তার। ওপরে পুরোদমে ঘুমন্ত পাখাটা একটানা শোঁ শোঁ শব্দ করছিল—কিরণ থেকে থেকে অনুভব করছিল যেন সে অন্ধকার একটা সমুদ্রের

তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে তার নিরবচ্ছিন্ন ঢেউয়ের গজরানি।

সেই সমুদ্রের ওপর ফুটে উঠল ভবেশদার মুখ, তাঁর মৃত্যুর ছবি। একবারের জন্যে কিরণ নিজেকে প্রশ্ন করল, এরপর ভবেশদার স্ত্রী ছেলে-মেয়ের কী হবে, কে খেতে দেবে তাদের ? সারাটা জীবন ধরে ভবেশদা নিজের সাহিত্যের সত্যে অবিচল ছিলেন বলে দেশের মানুষ কৃতজ্ঞ হয়ে একটা ফাণ্ড তৈরি করবে তাঁর জন্যে ? কিরণের মনে হল, সে যেন উদ্যোগী হয়ে চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। কার কার কাছে যাওয়া যায় . প্রথম ? তারাশঙ্কর ? প্রেমেন্দ্র মিত্র ? বনফুল ? গোপাল হালদার ? বিষ্ণু দে ?

ছবিটা বদলে গেল। অন্যমনস্ক জীবনানন্দ ট্রাম লাইনের পাশে পাশে ঘাসের ওপর পা ফেলে চলেছেন। তাঁর মগ্ন চোখের তারায় আশ্চর্য আলো জ্বলছে একটা।

'জয় অস্ত সূর্য, জয়, অলখ
অরুণোদয়, জয়।'

একটা ট্রাম ছুটে আসছে পেছন থেকে—জীবনানন্দ দেখতে পাচ্ছেন না—ধাক্কা লাগল, ছিটকে পড়ে গেলেন। কিরণ চিৎকার করে উঠল—দেখা গেল, আর একদিক থেকে হাহাকার করে ছুটে আসছেন শর্মিলা।

একটা তীব্র আঘাত যেন তারও মাথায় এসে লেগেছে, এমনিভাবে চমকে, সম্পূর্ণ জেগে উঠল কিরণ। জীবনানন্দের মৃত্যু, ভবেশদার মৃত্যু। ভবেশদা জীবনানন্দের মতো বড়ো নন—কিন্তু সব নিষ্ঠাবান শিল্পী-সাহিত্যিকের মৃত্যুই কি একই অপঘাতের ধারায় ? দুটো চোখকে সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে, একমুঠো জ্বলন্ত জোনাকির মতো ঘড়িটার নীলচে ডায়ালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বোবা যন্ত্রণায় কিরণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

এর মধ্যে শর্মিলা এল কোথা থেকে ?—জীবনানন্দের সঙ্গে সঙ্গে কি বাংলা রোমাণ্টিক কবিতারও সমাপ্তি ? কৃষ্ণচূড়ার দিনগুলোর সঙ্গে 'শঙখমালা'র কোথাও কি কোনো মিল আছে ?

'এ পৃথিবী একবার পায় তারে,
পায় নাকো আর ?'

'শঙখমালা' শুধু একবারের জন্যেই আসে, তারপর চিরদিনের মতো হারিয়ে যায় নীল সমুদ্রের অতলে। ভালোই হল, শর্মিলার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি।

এতক্ষণে আর একটা উপলব্ধি স্পষ্ট হয়ে উঠল কিরণের। মাথার সামনে খোলা জানলা দিয়ে দুটো জিনিস একসঙ্গে এসেছে ঘরের ভেতরে। খানিকটা শীর্ণ জ্যোৎস্না আর উগ্রমধুর চাঁপার গন্ধ। পাখার হাওয়ায় জ্যোৎস্নাটা যেন একটু একটু করে কাঁপছে, আর চাঁপার গন্ধের উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মতো তার চারদিকে এসে ভেঙে পড়ছে।

আরো কিছুক্ষণ জীবনানন্দ, ভবেশদার মৃত্যু, চাঁপার গন্ধ আর শঙখমালা তার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। যেন একটা স্বচ্ছ জল পাহাড়ী নদীর তলায় বালির ওপর সে শবের মতো শুয়ে আছে—আর তার ওপর দিয়ে অতিক্রম করছে একটা স্রোত—তাতে তারার ছায়া, আকাশের ছায়া, রাত্রিচর পাখির ডানার ছায়া, ডাঙা থেকে ঝুঁকে পড়া একটা ফুলন্ত গাছের আধফোটা অশরীরী ছায়া। তারপর চেতনাটা আরো তীক্ষ্ণ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, শরীরে মনে সেই বিস্বাদ অনুভূতিটা আবার ফিরে এল, বোবা-যন্ত্রণায় কপালের রগ দুটো দপদপ করতে লাগল, কিরণ উঠে বসল।

না—ঘুম তার আর আসবে না।

টাইমপিস্ ঘড়িটায় রাত আড়াইটে। গলা শুকিয়ে কাঠ। কৃষ্ণা জল রেখে যেতে চেয়েছিল, এক গ্লাস থাকলে ভালোই হত। কিরণ বিছানা ছেড়ে নেমে এল। তারপর নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

এখানে জ্যোৎস্না উদার, চাঁপার গন্ধ আরো উতরোল। বাইরে রাত্রি নিঃশব্দ, সামনের ছাড়া-ছাড়া নোংরা মাঠ আর দূরের তালগাছগুলো এখন মায়াময়। দরজার বাইরে পা দিয়ে কিরণ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওই দিকটাতেই ভবেশদার বাসা। বড়ো ছেলেটি তো শ্মশানে গেছে—বাকী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভবেশদার স্ত্রী কী করছে এখন ?

—আপনি ঘুমোন নি কিরণদা ?

কিরণ চমকে উঠল। বারান্দার ওদিকে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে। পরনে সেই ডুরে শাড়িটি—দুটি কানে, হাতে ঝিকমিক করছে সোনার বিন্দু, এই রাত্রে, এই জ্যোৎস্নায়, তার ক্ষীণ শরীরটি বাইরের পৃথিবীর চাইতেও মায়াময়, আরো অনেক বেশি অবাস্তব।

কিরণ নিজেকে সামলে নিলে

কিম্যান
লণ্ঠন
সর্বোৎকৃষ্ট
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১

তৎক্ষণাৎ। বললে, তুমিও তো জেগে আছো দেখছি।

—একেবারে জেগে নেই। ঘুমিয়ে নিয়েছি একটু। তারপরে মনে হল, বাণী এখনো শ্মশান থেকে ফেরে নি, এসে ডাকাডাকি করবে, তাই বারান্দায় এসে বসেছি। কিন্তু আপনার কী হয়েছে বলুন তো?—কৃষ্ণা কাছে এগিয়ে এল, মমতা ঝরে পড়ল স্বরে: সেই মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে এখনো? ঘরে গিয়ে শোবেন চলুন, আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।

কিরণ আশ্চর্য হয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকালো। বাড়ি ঘুমে নিঃসাড়, কোথাও একটি মানুষ জেগে নেই, অথচ কত সহজে—কত বিশ্বাসে কৃষ্ণা কথাটা বলতে পারল। মনে পড়ল কৃষ্ণার দেওয়া সেই রাইটিং কেসটি; তার সেই স্কেচ, তলায় ছোট করে লেখা: 'লহো প্রণাম।' এমনভাবে প্রণাম করতে পেরেছে বলেই তো এত সহজে এই সেবাটুকু সে দিতে চাইল।

কৃষ্ণা আবার বললে, খুব কষ্ট হচ্ছে, না কিরণদা?

—না, কোনো কষ্ট হচ্ছে না।—কিরণ হাসল: আমি বেশ আছি। বোসো, বাণীব্রত না আসা পর্যন্ত দুজনে মিলে গল্প করা যাক।

—কিন্তু রাত জেগে আপনার শরীর খারাপ করবে না?

—লেখককে বহু রাতই জাগতে হয়। ফ্লোব্যারের কথা জানো?

কিরণ একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েছিল। কৃষ্ণা চামড়া বাঁধানো একটা বেতের মোড়া নিয়ে বসল তার পাশে। জ্যোৎস্নায় তার সরল-উজ্জ্বল চোখ দুটো আরো গভীর হয়ে উঠল: ফ্লোব্যারের নাম শুনেছি, কিছু পড়ি নি। আপনি বলুন আমাকে।

বাইরের কুশ্রী ন্যাড়া মাঠ, শকুন-বসা দিনের বীভৎস তালগাছগুলো, এই জ্যোৎস্নায় আর চাঁপার গন্ধে এখন আর এক পৃথিবীতে চলে গেছে। এই রাত্রির সঙ্গে কৃষ্ণচূড়ার সেই স্বপ্ন-জাগরের কিছু মিল আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ মিল নেই। এই রাতে কিরণ আর এক নারীর স্পর্শ পেল। শ্রদ্ধা যাকে অপরূপ করে তোলে, যার চোখের সামনে নিজের সমস্ত তুচ্ছতাকে বিসর্জন দিয়ে মহতো মহীয়ান হয়ে ওঠবার আকুলতা জাগে। শর্মিলার ক্ষেত্রে কি ভুল করেছিল কিরণ? আকাঙ্ক্ষার রঙ দিয়ে কৃষ্ণচূড়াকে আরো বেশি রাঙাতে গিয়েই কি সে তাকে হারালো? শর্মিলার শ্রদ্ধা থেকে সরে গিয়ে নেমে এল এক প্রবঞ্চকের ভূমিকায়? নইলে কৃষ্ণা আর শর্মিলার চোখ একাকার হয়ে যেত?

কৃষ্ণা আবার বললে, কী ভাবছেন কিরণদা?

মাথার একগোছা চুলকে একবার সজোরে আকর্ষণ করল কিরণ, যেন সমস্ত অসংলগ্ন চিন্তা আর বিকারকে সে সংযত করতে চাইল। তারপর বললে, ফ্লোব্যারের সব চাইতে বিখ্যাত উপন্যাসের কথা জানো? মাদাম বোভারী।

—নাম শুনেছি, পড়ি নি।

—ফ্লোব্যার ছিলেন স্টাইলের মাস্টার। লেখায় কোথাও একতিলও খুঁত থাকে, সে তিনি সইতে পারতেন না। উপন্যাসটা লিখতে লিখতে হয়তো একটি মনোমত শব্দ তিনি খুঁজে পেলেন না। ব্যস, রইল রাত্রের বিশ্রাম, রইল ঘুম—সারাটা রাত জেগে একটি শব্দের জন্যে ঘরময় পায়চারী করতে লাগলেন।

কৃষ্ণা বললে, একেই তো বলে সাধনা!

সর্বদা সঙ্গে রাখার মত

নবতম প্রযোজন

ইংরেজি-বাঙলা অভিধান

SAMSAD
LITTLE ENGLISH-BENGALI
DICTIONARY

সঙ্কলক: শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম. এ.

সংশোধক: ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এম.এ., পি-এইচ.ডি.

~ বৈশিষ্ট্য ~

● সর্বসাধারণের বিশেষ করিয়া ছাত্র ও অফিস কর্মচারীদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শব্দচয়ন ও অর্থবিন্যাস ● অধুনা প্রচলিত শব্দসঙ্কলন ● ইংরেজি ও বাঙলায় উচ্চারণ-সঙ্কেত ● ইংরেজিতে প্রয়োগের উদাহরণ ও বাঙলায় শব্দার্থ ● পাতলা অথচ অতিশয় শক্ত বাইবেল কাগজ ● সহজ বহনীয় আকার ৪¼ × ৬¾ × ১″ ● ৩০,০০০ শব্দসংখ্যা ● ৮২০+১২ পৃষ্ঠা।

শক্তবোর্ড ও কাপড়ের মজবুত বাঁধাই। দাম: টা ৭.৫০ মাত্র

আমাদের অন্য দুইটি অভিধান

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY [12-50]

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান [8.50]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড:: কলিকাতা

—হাঁ, এই হল সাহিত্যের তপস্যা। আর আমরা বাংলা দেশে—

কথার পরে কথা, আলোচনার পরে আলোচনা। একটি মুগ্ধা শ্রোত্রীর কাছে স্বগতোক্তির মতো নিজের চিন্তা, উপলব্ধি, সাহিত্যিক সত্যের কথাগুলো বলে যাওয়া। শর্মিলার কাছে এমন করে বলা যেত না—সেখানে শর্মিলাই বাধা হয়ে উঠত, তার উপস্থিতি ছড়িয়ে যেত রক্তের ভেতর, আকাঙ্ক্ষা এসে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ধরত, এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যক্তি-মানুষ শর্মিলাকে ভোলা যেত না। কিন্তু কিরণের কাছে কৃষ্ণার কোনো ব্যক্তি-পরিচয় নেই—শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের সে যেন একটি একান্ত প্রতীক; আর সেই প্রতীকের সামনে কিরণের শরীর-ব্যক্তিত্বও সম্পূর্ণ মুছে গেছে, চিন্তায়, কল্পনায়, সৃষ্টিতে সাহিত্যিক কিরণের সম্পূর্ণ সত্তা বাইরের জ্যোৎস্নার মতোই অবারিত ঔদার্যে মুক্তি পেয়েছে।

এ এক নতুন নারী—নতুন অনুভব—নতুন মুক্তি। যেন বহুকাল পরে অনেক অন্ধকার, অনেক গোলক-ধাঁধা, অনেক জটিল বিশৃঙ্খলার চোরা গলি পার হয়ে সে এক সূর্য-ওঠা সমুদ্রের পারে এসে দাঁড়ালো।

তারপর জ্যোৎস্নার রঙ আরো পাণ্ডুর হয়ে এল। চাঁপার গন্ধ যেন ক্লান্ত শ্বাস ফেলতে লাগল। তখন শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে মুগ্ধতায় কৃষ্ণার চোখ-জোড়া দুটি নক্ষত্রের মতো কিরণের মুখের ওপর এসে স্থির হল।

কৃষ্ণা বললে, ইচ্ছে করে সমস্ত জীবন আপনার পায়ের কাছে বসে এ-সব কথা শুনি।

একটা মুক্ত প্রসন্নতা নিয়ে কৃষ্ণার দিকে তাকালো কিরণ।

—আমি আর কতটুকু জানি। আশীর্বাদ করছি একজন দিকপাল অধ্যাপকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক, যে তোমাকে বুঝবে, তোমাকে সত্যি-কারের সম্মান দেবে, তোমাকে—

কথাটা শেষ হল না। সেই বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় কিরণ দেখল, এক-বারের জন্যে থর থর করে কেঁপে উঠল কৃষ্ণা, তারপর দু'হাতে মুখ ঢাকল। একটা রুদ্ধ চাপা স্বর শোনা গেল, আপনার ও আশীর্বাদটা কোনো কাজে লাগবে না কিরণদা, আমার—আমার কোনোদিন বিয়ে হবে না।

কিরণ চমকে উঠল। জ্যোৎস্নার সমস্ত মায়া যেন ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

—কেন কৃষ্ণা, কেন? তুমি কি বিয়ে করতে চাও না?

দু'হাতের ভেতরে মুখ গুঁজে তেমনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কৃষ্ণা। তারপর ধীরে ধীরে আবার মাথা তুলে তাকালো। চোখের নক্ষত্রের ওপর তখন মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—আপনাকে সব বলতে পারি কিরণদা, আপনাকে বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই।—একবার থেমে প্রায় নিঃশব্দ স্বরে কৃষ্ণা বললে, ডাক্তার বলেছে, আমি—আমি কোনো-দিন মা হতে পারব না। হতে গেলে আমি আর বাঁচব না।

কৃষ্ণা আর মুখ ঢাকল না। মাথাটা ধীরে ধীরে নুয়ে এল মাটির দিকে। আবার বাতাসের সঙ্গে মিশে গেল তার চাপা গলার স্বর: না হলে অলক—

কথাটা আর শেষ হল না।

কে অলক, এ-কথা কিরণ আর জিজ্ঞেস করল না, জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকারও ছিল না। শুধু বিবর্ণ জ্যোৎস্নায় এই কালো মেয়েটির ক্ষীণ শরীরের দিকে তাকিয়ে অপরিসীম স্নেহে আর বেদনায় তার সমস্ত মন উদ্বেল হয়ে উঠল।

শুধু অস্পষ্ট স্বরে কিরণ বললে, তুমি সুখী হও কৃষ্ণা, তুমি সুখী হও। আমি তোমাকে চিরদিন মনে রাখব।

দূরে অনেকগুলো মানুষের ছায়া পড়ল, কানে এল কথার শব্দ। বাণীব্রতরা শ্মশান থেকে ফিরে আসছে। কিরণ ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

(ক্রমশঃ)

দেশ সেবায় নিয়োজিত,

এ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

কলিকাতা—৫০

নীতি ও বিজ্ঞানানুযায়ী ঔষধ
প্রস্তুতকরণের অগ্রণী

—ব্রাঞ্চ সমূহ—

বোম্বে - মাদ্রাজ - দিল্লী - নাগপুর
বেজওয়াডা - শ্রীনগর - গৌহাটী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ অষ্টাদশ প্রবাহ ॥

"প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পুষ্ট এ-জেলার মাটি। বর্ধমানের বাঙালীরা ছিলেন পরিশ্রমী ব্যবসায়ী।"—

বর্ধমান।

পশ্চিম বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধিশালী আর প্রাকৃতিক বদান্যতায় পরিপুষ্ট এই জেলার মাটি। 'বর্ধমান' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে : কয়লার খনির কালো ধোঁয়ায় আকাশ ধূমাচ্ছন্ন। যতদূর চোখ যায়, লোহার মত শক্ত লাল মাটির উঁচু-নীচু জমি। বাতাসে দূর থেকে কোন রাখাল ছেলের বাঁশির উদাস সুর ভেসে আসে। আর একদিকে রুক্ষ, অনুর্বর মাটিতে সবুজ আর সজল আশীর্বাদের মত দামোদর-ভ্যালীর বাঁধ। সেখানে পথ চলতে গেলে পায়ে পায়ে ঠেকে লোহা আর কয়লার টুকরো। লোহা আর কয়লার টুকরো নিয়েই বর্ধমান। তাই—

তাই এ-জেলার বাঙালীরা খুব বেশি নির্ভর করে না কৃষিকাজের ওপরে। কৃষি-ব্যবসা পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসা—অন্যান্য জেলায় বর্ধমানের মত কল-কারখানা-খনি নেই, তাই তারা আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের আনাগোনা দেখে। বৃষ্টির দেখা না পেলে আশঙ্কায় দুরু দুরু কাঁপে বুক। ভাগ্যকে মর্মান্তিক অভিশাপ দেয়। কিন্তু—

কিন্তু সেই সুদূর পুরাকাল থেকে বর্ধমানের বাঙালীরা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত। প্রায় একশো বছর আগে বেঙ্গল আয়রন কোম্পানী রাণীগঞ্জে লোহার কারখানা স্থাপিত করেছিল। তখুনি প্রায় এক হাজার চুয়াত্তর জন বাঙালী শ্রমিক এই কারখানায় কাজ করতো। তবুও—

তবুও এখানকার এই সুবিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের বাঙালীরা ছিল পরিশ্রমী। তাদের পেশীতে পেশীতে ছিল অটুট শক্তি। তারা বাঁকুড়ার, মুর্শিদাবাদের বস্ত্রশিল্পীর মতই তাঁত চালাতে পারতো অহরহ। স্বাধীন ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করবে বলেই তারা মহাজনের দুয়ারে দাঁড়াতো ঋণের জন্য। মহাজনও এই ব্যবসার আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবে মুক্তহস্তে দাদন দিত। এই টাকা দিয়ে বর্ধমানের সিল্কের কাপড়ের কারিগররা কিনতো রেশমগুটি। সিল্কের কাপড় বোনা হয়ে গেলে আবার মহাজনকেই বিক্রি করে নামমাত্র পারিশ্রমিক নিজে রেখে ঋণমুক্ত হতো।

কাটোয়ার বস্ত্রশিল্পী প্রদীপের ছায়া-কাঁপা আলোয় নিপুণ হাতে ক্ষিপ্রগতিতে যে সুদৃশ্য কাপড় বুনতো—তাই চলে যেত বহু পাহাড়—বহু নদী অতিক্রম করে সেই সুদূর দাক্ষিণাত্যে। মাদ্রাজের মুসলমানেরা মাথায় যে দীর্ঘ পাগড়ি পরে—সেটা কাটোয়া সিল্ক। কাটোয়া সিল্ক ছাড়া তারা আর কিছু ব্যবহার করতো না। কাটোয়া মহকুমার

সাতনী, সিঙবাগ, হেমদপুর আর গাছিয়ায় তিন হাজার বাঙালী একদিন রেশমগুটি থেকে সিল্কের সুতো তুলেই অন্ন-সংস্থান করতো।

হুগলীর ব্যবসার ওপরে লিখিত একটি প্রাচীন পুঁথিতে লিখছে:

Weavers are comparatively rich---

সেদিন কবিকঙ্কন চণ্ডীখ্যাত সপ্তগ্রাম আর ত্রিবেণীর গৌরবান্বিত হুগলী জেলার বস্ত্রব্যবসায়ীদের আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল। শুধু হুগলীতে নয়, গোটা বাংলা দেশেই বস্ত্রব্যবসায়ীদের ঘরের লক্ষ্মী ছিলেন অচলা। বর্ধমানের বস্ত্রশিল্পীদেরও গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ ছিল। দূর থেকে দেখা যেত তাদের টিনের বাড়ি ঝকমক করছে। পূর্বস্থলী, কালনা, মন্তেশ্বর, ইছাগ্রাম মেমারী, বাহাদুরপুর বাজেইট্টা আর শ্রীকৃষ্ণপুরে একদিন বাঙালীদের ঘরে ঘরে কর্মমুখর জীবনের ঢেউ আছড়ে পড়তো। সেদিনের গ্রাম-বাংলার বাঙালী আজকের মত অলস আর কর্মবিমুখ ছিল না। সেকালের সমাজ স্বপ্নালু আর অসার কথার ভাণ্ডারী কোন লোককে সহ্য করতো না। আর---

সেকালে এই রুক্ষ রাঢ় দেশের পথে-প্রান্তরে দেখা যেত এক-একটা ছোট ছোট চালাঘর। সেখানে চলতো হাপর। লোহার হাতুড়ি-ছেনীতে ঠক ঠক শব্দ উঠতো। বর্ধমানে বাঙালী কামারের অভাব ছিল না।

জি আর ওয়াটশনের লেখা Monograph on the Iron and Steel Works in Bengal গ্রন্থে বলেছেন, দেশবিখ্যাত ছুরি, কাঁচি তৈরি করতো বর্ধমানের বাঙালী কারিগররা। শুধু বর্ধমান গেজেটিয়ারের পাতায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁদের স্মৃতি। সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে:

Best cutlers are residing in this district.

কাটোয়া মহকুমার বেগনকোঠায় কিছু পিতল-কাঁসার কাজও হতো। বেশিদিন আগের কথা নয়। ১৯০৯ সালেও শুধু এই জেলাতেই ৬৪০১ মণ পিতল-কাঁসার বাসন তৈরি হয়েছিল। অনেক বাঙালী শুধু এই ব্যবসা করেই অন্ন-সংস্থান করতো। বর্ধমানের সদর মহকুমার বানপা আর দিনহাটার বাঙালীরা বিশেষ করে এই ব্যবসায় বিপুল সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। বিড়ির পাতা আর তামাকের ব্যবসা করে আসানসোলের বহু বাঙালী পরিবার আনন্দে হেসে-খেলে জীবন কাটিয়েছে।

গোড়াতেই বলা হয়েছে, প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পুষ্ট এ জেলার মাটি। এখানকার মাতৃজঠরে বহুযুগ-সঞ্চিত সম্পদ থরে থরে জমে রয়েছে। হয়তো আবছায়া কুয়াশাময় কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ভূখণ্ডের মাটি ছিল উর্বর, মাঠে মাঠে প্রচুর শস্যের সম্ভার সেকালের মানুষকে লোভের হাতছানি দিত। তারপর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই শস্যসমৃদ্ধ আর অজস্র প্রাচীন বট-অশ্বত্থের স্নেহচ্ছায়ায় সবুজ সরস মাটির দেশ পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তারপর যুগের পর যুগ কেটে গেল। সেই সুপ্রাচীন কালের বৃক্ষরা আরও ছোট-বড়-মাঝারি উদ্ভিদরা কয়লায় পরিণত হলো।

এই সম্পদ খুঁজে নিতে বেশি দেরি হলো না। এখানে মাটিতে লোহার ভাগ অত্যন্ত বেশি ছিল। বহু দূর-অতীতে যখন ইংরাজদের সংস্পর্শে বাঙালী আসে নি, তখনও বর্ধমানের বাঙালী জমিদারদের যৌথ ব্যবসা ছিল লোহার। যে কেন্দ্র থেকে এই ব্যবসা পরিচালনা করা হতো, তার নাম লোহাসহল বলে খ্যাত হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

শুধু কি লোহা আর কয়লা---কালনার কাছে এক ধরণের মাটি পাওয়া যায়, তাকে বলে বেহুটি মাটি। এই মাটি দিয়ে মৃৎশিল্পীরা সুদৃশ্য মূর্তি তৈরি করে। আর দূর দূর দেশে রপ্তানী হয়ে যায় সেইসব মাটির মূর্তি।

মেমারী আর রাধাকান্তপুরে ঘরে ঘরে রেশম বয়ন আর গুটিপোকা নিয়ে কাজ হতো। তসর তৈরিতে এ জেলার মানুষের নিপুণতা বিস্ময়কর। মানকড় অঞ্চলের পল্লীবাসী একদিন তসর তৈরি করেই অন্নসংস্থান করতো।

বর্ধমানে একদিন ঢেঁকিতে চাল ছেঁটে অনেক বাঙালী দু' পয়সা আয় করতো। এখানে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' ছিল—দূর গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে ছিল শ্রীময় গৃহাঙ্গন— ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর পদাঙ্কলেখা জ্বলজ্বল করতো।

আড়ত আর আড়তদার ধান, চাল, ঝোলাগুড়, তামাক, নানা রকমের কাপড় ও শস্য নিয়ে একদিন এখানকার বাঙালী কারবার করতো।

একদিন দামোদরের তীরে বিস্তীর্ণ শালের জংগল ছিল। বাঙালীরা কাঠের ব্যবসা করেও বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। রাণীগঞ্জের মাটির হাঁড়ি, কলসী আর সরা তৈরির কারিগরদের আর খুঁজে পাওয়া যাবে না আজ। কিন্তু একদিন বাঙালী কুম্ভকারের বৃত্তি অবলম্বন করেই পয়সা রোজগার করতো। আসানসোলে সুদূর অতীতে বাঙালীর জুতোর কারখানা ছিল।

কালনা। রাণীগঞ্জের তুলনায় কালনায় কারখানা কম। এখানে হাটে-হাটে, গঞ্জে-গঞ্জে দেখা যেত বড় বড় আড়ত। আড়তে বোঝাই হয়ে থাকতো ছোলা-গম, মটর-মুগ, খেসারীর ডাল। বাঙালী ব্যবসা করতো। তারা কেউ ছিল আড়তদার, কেউ ক্রেতা, কেউ বিক্রেতা। ব্যবসা ছাড়া তারা আর কেউ কিছু জানতো না। আজ---

আজ রাণীগঞ্জে, কুলটিতে, বরাকরের কারখানা ও কয়লা-খনির বেতনভুক কর্মচারীর ভেতরে আর অতীত দিনের বর্ধমান বাসী ব্যবসাজীবী স্বাধীন বাঙালীর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে

বীরভূম।

পশ্চিমবঙ্গের সুপ্রাচীনকালের বর্ধিষ্ণু জেলা। রাঢ় দেশ। যতদূর তাকানো যায় শুধু আদিগন্ত প্রান্তর গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। দূরে দূরে খেজুরগাছ বাতাসে ডাইনীর মত মাথা নাড়ে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার পীঠস্থান। মহর্ষির আদর্শের দেশ—স্বপ্নের দেশ। এখানকার মাটি রুক্ষ, অনুর্বর। মাটিতে কোদালের ঘা দিলে টং করে শব্দ হয়। কোদালের মুখ বেঁকে যায়। বন্ধ্য মাটিতে লাঙলের আঁচড় পড়ে না, তবুও চাষ হয়। চাষ করতে অনেক মেহনত করে পুকুর থেকে নালা কেটে জল নিয়ে যাওয়া হয় শস্যক্ষেত্রে। রামপুরহাটের বাঙালী জোতদাররা একদিন ধানের চাষ করেই জীবিকা নির্বাহ করতো। এখানকার বাঙালী ধান-চালের ব্যবসাই করতো। ধান-চাল ছাড়া এখানে ঝোলাগুড় আর কেরাসিন তেলের কারবার করেই বাঙালী দু' পয়সা পেত। এখানে একদিন চাল, শস্য, কলাই, আটা, কেরাসিন তেল আর জঙ্গলে উৎপন্ন বিভিন্ন জিনিস নিয়েই বাঙালীরা ব্যবসা করতো। সেদিনের সমাজের মেয়েরাও বসে থাকতো না। তারা (রামপুরহাটের মেয়েরা) যে মোরব্বা তৈরি করতো—সেই মোরব্বাই কলকাতায় রপ্তানী হয়ে যেত।

দুবরাজপুরের তামাকেরও খুব খ্যাতি ছিল। দুবরাজপুরের ঝোলাগুড়, তালের গুড়, শস্য, বীজ, খৈল একদিন দূর দূর দেশে চালান হয়ে চলে যেত।

শুধু কৃষি উৎপাদন দ্রব্যই নয়; প্রাকৃতিক নিয়মেই এখানকার মাটিতে খনিজ উপাদান অত্যন্ত বেশি। সেকালে বীরভূমের জমিদাররা এক-একটা লৌহমিশ্রিত এলাকা ইজারা নিয়ে লোহা তুলতো। বর্ধমানের মত বীরভূমেও 'লোহামহল' ছিল। সুদূর অতীতে সদর শহর শিউড়ীর আটাশ মাইল দূরে আড়ং-এ কয়লা আবিষ্কার করা হয়েছিল। এই কয়লার ব্যবসা করেই বাঙালী কিছু রোজগার করতো।

বীরভূমের পশ্চিম সীমান্ত শহর রামপুরহাট আর নলহাটির মাটিতে বাঙালীরা একদিন সুদৃশ্য পাথরের ভাণ্ডারও আবিষ্কার করেছিল। এই পাথর ভারে ভারে চালান দিত দূর দূর দেশে। এই পাথর দালান তৈরি করতে খুব প্রয়োজন হতো। বক্রেশ্বরে চুণের কারখানা ছিল।

পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার মত এখানেও বাঙালীরা রেশমশিল্পের ব্যবসা করে প্রচুর রোজগার করতো। বীরভূমের পূর্ব সীমান্তে 'মোর' থেকে সুরু করে সমস্ত পূর্বাঞ্চলে রেশমগুটির চাষ হতো। গেজেটিয়ারে লিখছে: Mulbery silk-worms are reared. বহুরকমের Cocoon ব্যবহার হতো এখানে। যেমন নিস্তারী, ছোটপলু, বড় পলু—

রেশমের ব্যবসার কথা বলতে গেলে পায়ে পায়ে চলে যেতে হবে অনেক দূর—সুদূর অতীতে। দু'শো বছর আগে মিঃ ফ্রসাড মোর নদীর উত্তর পাড়ে গাউণ্টিয়াতে রেশমের কুঠি স্থাপিত করেছিল। আজকের নিস্তব্ধ গাউণ্টিয়াতে দাঁড়িয়ে ধ্বংসজীর্ণ রেশমকুঠির দিকে তাকিয়ে কর্মপ্রবণ রেশম-শিল্পনিপুণ বাঙালীর কথা ভেবে মন ভারী হয়ে উঠবে—মনে হবে একদিন কত বাঙালী লাটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো কেটেছে; নিপুণ হাতে রেশমের শাড়ি-ধুতি তৈরি করেছে। তারা মজুরী পেত। মজুরীর ওপরেও কিছু পেত। ফ্রসাড সাহেব তারপরে সব কাপড় কিনে নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবদের সরবরাহ করতেন।

একদিন রামপুরহাট থানায়, পালসায়, মুরারিতে ঘরে ঘরে কর্মপ্রবাহের স্রোত বিপুলভাবে আবর্তিত হতো। এইসব অঞ্চলের ব্যবসা সম্বন্ধে বলছে, Numerous hand-spindle in Mulbery tract—এখানে একদিন দশ গজ কাপড় পাওয়া যেত বারো আনায়।

ইলামবাজারে লাক্ষার ব্যবসা করতো বাঙালীরা। পশ্চিম অঞ্চলের অরণ্য থেকে আদিবাসীরা লাক্ষার গাছ নিয়ে আসতো। তারপর নানা প্রক্রিয়ায় লাক্ষা তৈরি করে দূর দেশে রপ্তানী করতো বাঙালীরা। খাঁটি তাঁতের কাপড়ের ব্যবসাও ছিল। কিন্তু সে ম্লান নিষ্প্রভ। স্বদেশী আন্দোলনের পরে তাঁতের ব্যবসার কিছু প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে কোনদিন পাল্লা দিয়ে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। পরিবর্তমান যুগ সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের প্রভুত্বই সারা পৃথিবীর দেশে দেশে প্রসারিত হয়ে গিয়েছে।

উনিশ শো সাত-আট সালের হিসাবে দেখা যাচ্ছে—কুকুটিয়া থেকে আড়াই হাজার মণ গুড় তৈরি করেছিল বাঙালীরা। পিতল-কাঁসার বাসন হতো নলহাটিতে। দুবরাজপুর, লোকপুর, খারুণ, রায়গঞ্জ, রামপুরহাটে পোনা মাছের ব্যবসা করে বাঙালীরা কিছু রোজগার করতো।

একদিন বাঙালীরা কাঁধে বাঁক নিয়ে ঘড়ার ভেতরে পোনা মাছের চারা নিয়ে দুলতে দুলতে চলে যেত দূরে দূরে। সেই কর্মপ্রবণ, পরিশ্রমী বাঙালীর চিহ্ন উত্তরসূরীর ভেতরে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। (ক্রমশঃ)

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

মূল্য: এক টাকা

কিশোর-কিশোরীদের উপযুক্ত রোমাঞ্চকর উপন্যাস। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

উপহার দিবার মত বই

দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চোর

হরেন ঘোষ

আরো নানা দরকারি কথা চিন্তা করে সময় কাটাবেন ভাবা সত্ত্বেও বারবার ঘুরে ফিরে সেই একই চিন্তা তাঁকে বিব্রত করে তুলছে। ঝি নিশ্চয় চুরি করেছে। অনেকদিন থেকেই এ বাড়িতে রয়েছে সে, তাই তিনি নিজের জিনিসপত্রের হিসেব রাখতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

এককোণে তাঁর কাঠের আলমারি, সেটা থেকে তিনি প্রতিদিন একটি করে সার্ট বার করে নেন। কিন্তু কিছুদিন পরপরই ঝি একটি করে ছেঁড়া সার্ট এনে দেখায় আর বলে, এবার কিছু নতুন সার্ট কেনা দরকার। অগত্যা তিনি বাইরে বেরিয়ে আধ-ডজন নতুন সার্ট কিনে আনেন। এ রকম ইদানীং প্রায়ই হচ্ছে। শুধু সার্টই নয়, সাবান থেকে আরম্ভ করে জুতো পর্যন্ত সব ব্যাপারেই এক অবস্থা। তিনি বিপত্নীক, তাই সব ব্যাপারেই ঝির ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু যখনই আলমারি খোলেন ছেঁড়া জামাকাপড় চোখে পড়ে। স্বভাবতই তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

অবশেষে এতদিন পর তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জিনিসপত্র নিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন ধরে চুরি যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন, জন্মদিনের উৎসব। অনেকদিন কোথাও যান নি তিনি, বিশেষ কারো সঙ্গে মেলামেশাও করেন নি। নেমন্তন্ন পেয়ে তিনি ঘাবড়িয়ে গেলেন। মনে মনে কিছুটা খুশি হলেন ঠিকই। প্রথমে ভাল সার্টের খোঁজে আলমারি খুললেন। একে একে অনেকগুলি বার করলেন। একটিও নিখুঁৎ নয়। কোনটার হাতা, কোনটার কলার ছেঁড়া, এবার ঝিকে ডেকে জানতে চাইলেন---সভ্যসমাজে পরে যাবার মত ভাল সার্ট আছে কিনা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীরভাবে বলল সে---নতুন কয়েকটি কেনা দরকার। সে আর পুরোন ছেঁড়াগুলো জোড়াতালি দিয়ে পারে না।

মনে পড়ল অস্পষ্টভাবে, অল্প-কিছুদিন আগেই নতুন কয়েকটি কিনেছেন, এর মধ্যে সেগুলো নষ্ট হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সঠিক মনে না-পড়ায় চুপ করে রইলেন। নতুন সার্ট কিনবেন মনস্থ করে গায়ে কোট চাপালেন। কোটের পকেটে হাত দিতেই কয়েকটি কাগজ পেলেন। দরকারি কোন কাগজ কিনা দেখবার জন্যে খুলতেই দেখলেন মাত্র সাত সপ্তাহ আগে কেনা সার্টের বিল। মাত্র সাত সপ্তাহ আগে কেনা! ছটি নতুন সার্ট। তিনি যেন নতুন তথ্য আবিষ্কার করলেন।

তিনি আর বাইরে.. গেলেন না। চিন্তিতভাবে পায়চারি সুরু করলেন। দীর্ঘদিনের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা মনে পড়ল তাঁর। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে এই ঝি বাড়ির সব কিছু দেখাশুনো করছে। এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি একে অবিশ্বাস করেন নি। এখন তাঁর মনে হল এতদিন ধরে তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তিনি সঠিক বলতে পারেন না---কি চুরি গিয়েছে, তবে একথা সত্যি, অনেক কিছুই চুরি গিয়েছে। আলমারির তাক ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ড্রয়ারে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্নগুলি ছিল, সেটি খুললেন। মাত্র কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস পড়ে রয়েছে, বাকি জিনিসের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু অনেক কিছুই তো ছিল ওখানে। হা ভগবান।

তিনি ড্রয়ার বন্ধ করে অন্য-মনস্ক হবার চেষ্টা করলেন, সেদিনকার উৎসবের কথা ভাবলেন কিন্তু ঘুরে ফিরে একই চিন্তা আসছে মাথায়। নিজেকে ভয়ানক অসহায় মনে হচ্ছে তাঁর---আমি একা, কেউ নেই আমার, প্রতিমুহূর্তে ঠকছি, এমন কি আমার মাথার নীচেকার বালিসও চুরি যাবার যোগাড়। স্ত্রীর সমাধি থেকে ফেরার সময় যতটা দুঃখিত হয়েছিলেন, তার চেয়েও বেশি ব্যথিত হয়ে পড়লেন তিনি। তিনি অনুভব করলেন---তাঁর বয়েস অনেক বেড়ে গিয়েছে, ভাগ্যও তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।

একটা কথা তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না, ও কেন তাঁর জিনিস চুরি করবে। ওসব নিয়ে ও কি করবে? হঠাৎ একটি সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। ঠিকই তো, ওর এক ভাইপো আছে, তাকে ও খুব ভালবাসে। কিছু দিন আগেই তো আমাকে তার ফটো দেখিয়েছে। কোঁকড়ান চুল, তীক্ষ্ণ নাক, ছুঁচলো গোঁফ। নিজের মনেই বললেন তিনি, তা হলে আমার সবকিছু ওখানেই যাচ্ছে! মনে মনে ভয়ঙ্কর রেগে উঠলেন তিনি। ভাবলেন একছুটে রান্নাঘরে গিয়ে ওকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করে আসবেন। সারাদিন ওর সঙ্গে কথা বললেন না। সেও আপনমনে কাজকর্ম করে গেল, যেন কিছুই হয় নি। বিকেলে তিনি তার আলমারির সবকিছু বার করে স্তূপ করলেন। দেখে আঁতকে উঠলেন। একে একে তাঁর মনে পড়ল, কি কি ছিল তাঁর। অনেক মূল্যবান পারিবারিক সামগ্রী ছিল তাঁর। কিন্তু এখন তার কিছুই নেই, একটিও অবশিষ্ট নেই। যেন সব আগুনে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। গভীর দুঃখে ভেঙে পড়লেন তিনি। মনে মনে রাগে ফুঁসতে থাকলেন।

খোলা ড্রয়ারের সামনে তিনি চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর বাবার মানিব্যাগটা নিয়ে দেখলেন সেটি ফুটো হয়ে গিয়েছে। তা হলে কতদিন ধরে এ কাজ করছে ও? এবার রাগে জ্ঞান হারালেন তিনি। এখন যদি কাছে পান, তা হলে এক চড়ে মাথা ঘুরিয়ে দেন। ওকে নিয়ে কি করি আমি। এই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেব? নাকি পুলিশে দেব? কিন্তু কাল থেকে কে আমায় রেঁধে দেবে? ঠিক আছে, হোটেলে খাব আমি। কিন্তু জল গরম করে দেবে কে? আগুনই বা জ্বালাবে কে? অনেক কষ্টে এসব চিন্তা তাড়াতে চেষ্টা করলেন। এবার মনস্থির করলেন. ঠিক আছে কাল যা হয় করা যাবে। কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণভাবে ওর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু তবু শাস্তি ওকে পেতেই হবে।

সন্ধ্যার একটু আগে রান্নাঘরে গেলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে একটা লম্বা ফর্দ ওকে দিয়ে বললেন এখুনি যেন বাইরে গিয়ে এইসব জিনিস কিনে আনে। হতভম্বের মত ওঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ও বেরিয়ে গেল।

তিনি অনুভব করলেন ঘরে তিনি একা। তাঁর বুক ঢিবঢিব করছে। ভাবলেন আলমারিটা খোলা যাক। কিন্তু এতো প্রায় চুরি করা হচ্ছে।

পরিষ্কার রান্নাঘর। পাশেই কাঠের আলমারি। কিন্তু ওটা তো বন্ধ। চাবির চিহ্নমাত্র নেই। এবার একটা ছুরি দিয়ে খোলবার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তাঁর নিজের চাবি লাগালেন। খুলল না। আধঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর একটান দিতেই খুলে গেল। আদপে চাবিই লাগান ছিল না।

প্রতিটি তাকে সুন্দর করে সাজান রয়েছে জামাকাপড়। একেবারে ওপরেই রয়েছে রঙিন ফিতে জড়ান নতুন দুটি সার্ট। ছোট ড্রয়ারে তাঁর স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন, পাশেরটিতে বাবার জিনিসপত্র, হাতীর দাঁতে বাঁধান মা'র ছবি। আশ্চর্য। এ সবই ওর দরকার। এবার তিনি আলমারি থেকে সব টেনে নামালেন, তাঁর মোজা, কলার, এক-বাক্স সাবান, ব্রাস, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি অনেককিছু পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই এসব সামান্য অংশমাত্র। এতদিন ধরে ও যা নিয়েছে বেশির ভাগই চালান হয়ে গিয়েছে সেই চুলওলা ভাইপোর কাছে। আশ্চর্য! তা হলে এই ঘটেছে এতদিন ধরে। তোমার কাছে এই আমি আশা করেছিলাম? এই ছিল তোমার মনে?

এক এক করে তিনি নিজের সব জিনিস নিজের ঘরে এনে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলেন। ছোটখাট প্রদর্শনী একটি। ওর নিজস্ব জিনিসগুলি তার আলমারিতেই রেখে এলেন। সেগুলো সাজিয়ে রাখতেই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারলেন না। অবশেষে আলমারি অগোছালো আধখোলা রেখেই চলে এলেন।

এবার তিনি রীতিমত ভয় পেলেন, বিচলিত হলেন। হয়ত ও এখুনি ফিরে আসবে—তখন বেশ কড়া কড়া কথাও শোনাতে হবে ওকে। তিনি এত বিব্রত বোধ করলেন যে, তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিলেন। কাল ওকে দেখে নেব। মনে মনে বললেন। আমি যে ধরতে পেরেছি এটুকু জানতে পারলেই আজকের মত ওর যথেষ্ট সাজা হবে। তিনি একটি নতুন সার্ট তুলে নিলেন। কিন্তু সেটি কাগজের মত শক্ত। অনেক চেষ্টাতেও কলার আঁটা গেল না। এদিকে যে কোন মুহূর্তে ও ফিরে আসতে পারে।

তাড়াতাড়ি পুরোন সার্টই পরে নিলেন। ছেঁড়া সার্ট পরেই চোরের মত বাড়ি থেকে বেরুলেন একঘণ্টা ধরে তিনি বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন। তারপর সময়মত উৎসবে পৌঁছলেন। ওখানে গিয়েও নিজেকে ভীষণ একা মনে হল তাঁর। পুরোন-পরিচিতদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। অনেক বছরের ব্যবধানে বিরাট একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছে যেন। তবু কারো প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ নেই।

একটু দূরে সরে গেলেন, হাসি হাসি মুখ করলেন। এত আলো, কোলাহল, চলাফেরা—অনভ্যস্ত তিনি, বিব্রত বোধ করলেন। তাঁর মনে হল—আমি দলছাড়া। আমায় নিয়ে সবাই হাসিঠাট্টা করবে। আমার সার্ট থেকে সুতো ঝুলছে, কোটের এক জায়গা ছেঁড়া আর জুতো-জোড়ার কথা তো কহতব্য নয়। ভাবলেন, যদি মাটির তলায় লুকোতে পারতাম।

লুকোবার জায়গা খুঁজলেন তিনি, কিন্তু যেদিকেই তাকান, চকচকে

প্যান্ট-পরা লোক নজরে পড়ে। কারো চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ার উপায় নেই। দরজার দিকে যাবারও সাহস নেই তাঁর। তা হলে নিশ্চয় সব ক'জোড়া চোখ তাঁর দিকে পড়বে। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। দাঁড়িয়ে থাকার ভাণ করলেও তিনি পায়ে পায়ে দরজার দিকে যাবার চেষ্টা করলেন, যাতে কারো নজরে না পড়ে যান।

নিতান্ত দুর্ভাগ্য, হঠাৎ একেবারে তাঁর স্কুলের সঙ্গীর মুখোমুখি পড়ে গিয়ে আরো বিহ্বল হয়ে পড়লেন। তিনি ভালোভাবে কথাই বলতে পারলেন না। আমতা আমতা করে কাটিয়ে দিলেন। আবার একা হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বাইরের দরজা থেকে দূরত্বটাও মনে মনে মেপে নিলেন। অবশেষে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে বাঁচলেন। তখন রাত খুব বেশি হয় নি।

পথে নামতেই ওর কথা মনে পড়ে গেল। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মাথা গরম হয়ে গেল। ভাবলেন, কি বলবেন ওকে। মনে মনে ভাষা ঠিক করে নিলেন। হ্যাঁ, গালাগালি দেবার পর ওকে ক্ষমা করে দেব! রাস্তায় বার করে দেব না। ও নিশ্চয় খুব কাঁদবে, তারপর প্রতিজ্ঞা করবে স্বভাব ভাল করার। আমি চুপচাপ শুনব, তারপর বলব—তুমি অকৃতজ্ঞ, আমি জানি, তবু ভাল হবার সুযোগ দেব। এবার থেকে নিশ্চয়ই সৎ হবে। আর কিছুই চাই না তোমার কাছে। আমি বৃদ্ধ হয় পড়েছি, আর নিষ্ঠুর হতে চাই না।

তিনি এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, কখন এসে বাড়ি পেঁাছে তালা খুললেন, টেরই পেলেন না। রান্নাঘরে আলো জ্বলছিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন। এ কি ব্যাপার। কান্নায় ওর চোখমুখ ফুলোফুলো। একটা ট্রাঙ্কে সব জিনিসপত্র রাখছে ও। তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ট্রাঙ্কে রাখছে কেন? তিনি সন্তর্পণে নিজের ঘরে এলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। ও কি তবে চলে যাবে?

ও যা চুরি করেছিল সব টেবিলের ওপর রয়েছে। তিনি হাত দিয়ে অনুভব করলেন, কিন্তু কোন আনন্দ পেলেন না। ও তা হলে বুঝতে পেরেছে যে, ওর চুরির ব্যাপার আমি ধরতে পেরেছি। ভেবেছে এখুনি ওকে তাড়িয়ে দেব, তাই সব গুছিয়ে নিচ্ছে। ঠিক আছে, কাল পর্যন্ত ওকে কিছু বলব না। সেটাই ওর পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হবে। কাল সকালে ওর সঙ্গে কথা বলব। মনে হচ্ছে এখুনি ও এসে ক্ষমা চাইবে। নিশ্চয় এসে কান্নায় আকুল হবে, পা জড়িয়ে ধরবে। তা হলেই হবে, আমি ক্ষমা করে দেব। বলব, ঠিক আছে, তোমায় ক্ষমা করে দিলাম, তাড়াব না।

জামাকাপড় না বদলিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, রান্নাঘরে ওর প্রতিটি পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। বাক্সের ঢাকনা পড়ার শব্দ শোনা গেল। আবার সব শান্ত। হঠাৎ চমকে উঠলেন। ওটা কি! করুণ কান্নার শব্দ, ফোঁসফোঁসানি, আছড়ে পড়ার শব্দ, গোঙানি। ও কাঁদছে? এতটা তো ভাবি নি। নিশ্চয় ও এখুনি এসে ক্ষমা চাইবে।

তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। ও তবু এল না। শুধু মাঝে মাঝে ওর করুণ কান্নার স্বর কানে আসছে। না, এ ভারি বিশ্রী। তিনি ব্যথিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন মনে মনে—আমি এখুনি যাব ওর কাছে। বলব—তোমার একটা শিক্ষা হলো, আর কেঁদ না। আমি এসব ভুলে যাব, তবে এরপর থেকে তুমি সৎ হবে আশা করি। হঠাৎ দড়াম করে দরজা খুলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে ও। কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়েছে। চেহারা দেখলে ভয় করে।

—কি ব্যাপার।

—এই আমার কপালে ছিল। কান্নাভেজা গলায় বলল ও। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।' ছিঃ ছিঃ কি লজ্জার কথা। আমি যেন চোর। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ও।

—না, না, মানে—তিনি বিব্রত বোধ করলেন, কিন্তু তুমি তো আমার সব জিনিস নিয়েছিলে। এই দেখো, এইগুলো নিয়েছিলে কি-না বল।

একথা ও কানেই নিল না। আপনমনে বকে যেতে থাকল—ছিঃ ছিঃ আমি মুখ দেখাব কোন লজ্জায়? আমার আলমারি খুলে দেখলেন, যেন আমি ভবঘুরে যাযাবর। আমাকে লজ্জা দেবার জন্যে এতটা আপনার করা উচিত ছিল না। এই বয়সে আমায় এভাবে অপমানিত করলেন। এই আমার কপালে ছিল। আমি কি চোর? সত্যিই আমি চোর? কত বড় বংশের মেয়ে আমি, তা যদি জানতেন! আপনার কাছে কখনই এমন ব্যবহার আশা করি নি।

—কিন্তু শোন, বাধা দিয়ে বললেন উনি, এসব জিনিস কিভাবে তোমার আলমারিতে গেল? একটু ভেবে দেখ! এ সব তোমার জিনিস, না আমার সেটা বল তো!

—আমি কোন কথা শুনতে চাই না। ফুঁপিয়ে উঠল ও—হা ঈশ্বর! এ কি লজ্জার কথা! আমার আলমারি খুলে দেখলেন! হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠল—আর এক মুহূর্তও নয়, আমি এখুনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি! কাল সকাল পর্যন্তও অপেক্ষা করতে পারব না—কোনমতেই না।

—কিন্তু, দেখ, কাতরস্বরে বললেন তিনি—তোমায় আমি তাড়িয়ে দিতে চাই না। তুমি এখানেই যেমন আছ, থাকবে। যা ঘটেছে তার জন্যে তোমায় আমি একটি কথাও বলি নি। অতএব কান্নাকাটি বন্ধ কর।

—আর কাউকে রাখুন আপনি, ভাঙা গলায় বলল ও—কাল সকাল পর্যন্তও থাকব না। আমি! আমি যেন একটা কুকুর। হাজার টাকা দিলেও থাকব

না আমি। রাস্তায় শুয়ে রাত কাটাব আমি, সেও অনেক ভাল।

—কিন্তু কেন বল তো। আমি কি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি। কিন্তু তুমি তো অস্বীকার করতে পারবে না—

—না, তা কেন, আঘাত দেবেন কেন, আরো জোরে কেঁদে উঠল ও—আমার আলমারি খুলে দেখলেন, আমি যেন চোর। কেউ কোনদিন আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে নি, কোনদিন এভাবে লজ্জা দেয় নি। আমি একটা বাজে মেয়েলোক নই। দু'হাতে মুখ ঢেকে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ও।

হতচকিত হয়ে পড়লেন তিনি, আশ্চর্য। অনুতাপের বদলে এ কি ব্যবহার। এ সবের মানে কি। কোন সন্দেহ নেই ও চুরি করেছে, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি বলেই অপমান-বোধ করল। চুরি করেছে বলে কোন লজ্জা নেই ওর অথচ চোর বলায় অপমানিত বোধ করেছে, রাগ করেছে। ওর কি মাথা খারাপ হল? বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেল?

ক্রমশ তিনি ওর জন্যে আরো দুঃখ অনুভব করলেন। আপনমনেই বললেন তিনি, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে, সেই দুর্বলতা নিয়ে কিছু বললেই তারা আহত হয়, ব্যথা পায়। আশ্চর্য! মানুষ তার নিজের ভুল নিয়েও নীতিজ্ঞানের বড়াই করে। তার পাপের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলে, সে সহ্য করতে পারে না। তার বদলে রাগে, লজ্জায় কেঁদে ওঠে। দোষীর দোষ দেখানোটাই যেন অপরাধ।

রান্নাঘর থেকে মৃদু কান্নার শব্দ আসছে। তিনি রান্নাঘরে ঢোকার চেষ্টা করলেন: কিন্তু দরজা বন্ধ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর একটু যুক্তিসঙ্গত আলোচনা করা যায় কি-না। না হয়, ওকে সান্ত্বনা দেওয়া যাক। তিনি শব্দ করে তাঁর উপস্থিতি জানালেন। ফোঁসফোঁসানি আরো বেড়ে গেল। তিনি অসহায়ভাবে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। টেবিলের ওপর সেই সব জিনিস পড়ে রয়েছে—নতুন সার্ট, কাপড়, কত কিছু। হাত দিয়ে আলতোভাবে ছুঁলেন সেইসব, কিন্তু কোন আনন্দ পেলেন না। উপরন্তু আরো ব্যথিত হয়ে উঠলেন, আরো নিঃসঙ্গ বোধ করলেন। *

* Karel Capek-এর 'The shirts'-এর অনুবাদ।

W. H. Harton & Co. Ltd.

Rope Manufacturers

Since 1780

Head Office **: 8, Dalhousie Sq. East, CALCUTTA.**

Telegrams : "HARTONCO." CALCUTTA. Telephone : Office : 22-2878 ; Works : 66-2011

We specialize in 'Ropes' and 'lines' of all descriptions, viz :—

Manila Ropes	Loglines	Heald Cords
Sisal Ropes	Pilot Lead Lines	Whip Cords
Hemp Ropes	Marlines	Temperband Cords
Coir Ropes	Seizing Lines	Dobby Twines
Jute Ropes	Spun Yarns	Coir Fenders
Cotton Ropes	Oakums	Bore Springs

Cordage Hawsers of any size up to 48" circumference.

Registered contractors and regular suppliers to Government, Port Trusts, Railways, Mills, Mercantile Firms, Shipping and Engineering Workshops, Harbour and Dock Yards, etc.

আঁধার মানিক

ধারাবাহিক উপন্যাস

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এ কাল পঞ্চাশ সন বর্গীর হাঙ্গামায় আঁধারমাণিক গ্রাম থেকে দুটি বলি আদায় করলে। দুটিই মূল্যবান, আদরের বস্তু ছিল, যাদের বুকে বাজবার ঠিকই বাজল। বড় আচার্যের মেয়ে নির্মলার আশ্রয় ঘুচল, তাকে গ্রাম ছাড়তে হবে, এমন সিদ্ধান্ত হল। নির্মলা গ্রামের মেয়ে, সবাইয়ের প্রিয়, প্রতাপশালী বাপের আদরের মেয়ে। সে বয়সে কিশোরী, বালিকাদের যমপুকুর ব্রতের পুষ্করিণী-পাড়ের নতুন যবাঙ্কুরের নিষ্পাপ কোমলতা এখনো তার চাহনিতে মাখা থাকে। আঁচল গায়ে থাকে না বলে এখনো খুড়ীমা তার আঁচল টেনে বগলের নীচে গেরো দিয়ে দেন ও এখনো নির্মলা ছোটদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি ক'রে হরির লুটের বাতাসা তোলে। যে কাপড়টি পরলে বাবা বলেন 'ও মা, আর মা, বেশ দেখাচ্ছে মা', সে-কাপড়টি দিনান্তে ধুলো-মাখা হলেও নির্মলা খুলতে চায় না।

এমন নির্মলার ঘর-বর ঘুচল। এ দুঃখ মরলে যায় না। মরলে সব দুঃখ ঘোচে। সে-শোকের পর মানুষ ক্রমে বুক বাঁধে, কেন না মৃত্যুশোক মানুষকে নানাবিষয়ে জ্ঞানী ক'রে রেখে যায়। 'কেঁদে লাভ নাই, যারা রয়েছে তাদের মুখ চেয়ে বুক বাঁধ গা, কি করবে মা এক হাতে চোখ মুছবে আর হাতে ভাত চড়াতে হবে---যমের 'দরবারে আর্জি চলে না' এর প্রতিটি অক্ষরের অন্য মানে আছে। এ-সব সামান্য কথার মধ্যে মহাশিক্ষা, সমুদ্র-গম্ভীর জ্ঞান। পাতা পড়লে গাছ কাঁদে না, যিনি জীবন দেন, তিনিই নেন। ফিরিয়ে দেবার জন্যে নেন না এই কথাটি বুকে রেখে আপন কাজ ক'রে চল। সংসারের কীটাণুকীট যে মানুষ, সে-ও সময়কালে শ্মশানের ভাঙা কলসী ও ছেঁড়া মাদুরের মধ্যে এ মহাজ্ঞানের প্রকাশ দেখে।

তাই নির্মলার মা কাঁদলেন 'এর চেয়ে মরণ না কেন? জেয়ন্তে ছেড়ে রইব কোন্ প্রাণে? এখন যে ওর হেসেখেলে থাকবার বয়স।'

বড় আচার্যের বুক আগেই ভেঙেছিল, তিনি 'চুপ কর বড় বউ, তুমি কি পাষাণী?' ব'লে মাথা নুইয়ে দাওয়ায় বসে রইলেন। মহাদুঃখ মহা আক্ষেপ তাঁর অহঙ্কারে স্ফীত অন্তরটিকে এখন সর্বদা মথিত করে। দর্পী মহিষের উদ্ধত ঘাড় বলির প্রাক্কালে নির্মমভাবে ড'লে যেমন নরম করা হয়, আচার্যের দর্পী অন্তরকে এখন ভগবান তেমনি মোচড় দিয়ে দিয়ে নম্র করেন, তাঁর আশ্চর্য বিধানে উঁচুমাথা নীচু করবার প্রক্রিয়া বড় বিচিত্র। এক একজনের জন্যে তাঁর এক এক শাস্তি। এ ভব সংসারে এসে ধর্মের নামে, সমাজের নামে বড় আচার্য অনেক নিষ্ঠুর কাজ করেছেন। কর্তব্যজ্ঞানে করেছেন, অন্যায় করছেন বলে জানেন নি। ঐ মেয়ের টান তাঁর চরিত্রে একমাত্র দুর্বলতা।

সাঁতালী পর্বতে লোহার বাসরের একমাত্র ছিদ্র, ঐ-পথে সর্বনাশ এসে তাঁকে জ্যান্ত মেরে রেখে গেল। এখন নির্মলার ছায়ামাত্র দর্শনে বড় আচার্যের মনে কে যেন গরল ঢালে, মহা দুঃখে মনে রাগ আসে, 'হতভাগী, তুই আমায় এত পাকে ফেললি, জেয়ন্তে নরক দেখালি' বড় আচার্যের চিৎকার শুনে গোহালে গাভী অবধি মনোদুঃখে দড়ি ছিঁড়তে চায়। এখন মাহিন্দার তাদের খৈল-খড় দিতে নিত্য ভোলে, ঘাট হ'তে দাসী বাসন চুরি করে, রাজার অদেখায় রাজ্য এ-ভাবেই নষ্ট হয়।

নির্মলার দুর্ভাগ্য আঁধারমাণিক গ্রামের একটি মনে রাখবার মত ঘটনা। কুলীনকন্যার জন্ম থেকে মৃত্যু একটানা অশ্রুজলে লেখা থাকে। কুলীনকন্যার দুঃখে বনের পশুপাখি কাঁদে, নদীর জল কাঁদে। বড় মন্দিরের চুড়ো ভাঙলে যারা আগে হাততালি দেয়, তারা অবধি আচার্যবাড়ির এ লাঞ্ছনায় বললে 'আহা! নরপতির মনে এত বিষ ছিল!'

পঞ্চায়েতে কিছুতে যাচ্ছেন না, এই সংকল্প নিয়ে আনন্দীরাম বেড়া বাঁধতে বসেছিলেন। কাশীশ্বর তাঁকে স্থির থাকতে দিলে না। শৈশব থেকে তাঁকে গুরুজ্ঞানে পূজা করেছে, তাঁর কাছে প্রথম অক্ষর শিক্ষা, পরে পুঁথিপাঠ। মানুষ বলতে গাঁয়ে একজন আছেন, একথা সে অন্তরে বিশ্বাস করে। তা ছাড়া কাশীশ্বর বয়সে নবীন, স্বভাবে সংশয়ী, যে-বয়সে বালক 'একানোড়া' ও 'শাখচুন্নী'র ভয়ে তেতো পাঁচন নিমেষে খায়, সে-বয়সে কাশীশ্বর রাখালের পাচনবাড়ি হাতে তালগাছে 'একানোড়া' খুঁজতে গিয়েছিল। অন্ধকারে ঘাস নে ভূতে ধরবে বললে সে 'ও মা, ভূত এনে দে, দেখব' বলে কান্না ধরত। উপনয়নের পর পায়েসের পাথরবাটি নিয়ে খিড়কীর দুয়োরে দাঁড়িয়ে 'ও মা, আমি নদের নিমাই, আস্তাকুঁড়ে খাচ্ছি দেখ', বলে সত্যিই পরমান্ন খেয়েছিল। একে সে স্বভাবে জেদী, তাতে নবীন বয়স, কোমল প্রাণ, এ বয়সে তৃণলতার জন্যও প্রাণ দিতে সাধ যায়, নির্মলার কথা ভেবে কাশীশ্বর বড় আশা ক'রে মুখোটি বাড়ি গিয়ে দেখল তার ভক্তি-ভরসার মানুষ বেড়া বাঁধতে ব্যস্ত। দেখেই তার মাথায় রক্ত চড়ল, এবং দা'খানা দূরে ছুঁড়ে ফেলে সে তাচ্ছিল্যভরে বললে 'হ্যাঁ'!

এটি গুরুজনের প্রতি প্রয়োগ করবার মত শব্দ নয়। এ গ্রামে আর কেউ করে না। এ গ্রামে ঘোরকলিতে আর কিছু না থাক শিষ্টাচার আছে। কিন্তু কাশীশ্বর আনন্দীরামের সঙ্গে গোপনে সমানে-সমান ব্যবহার করে, তা ছাড়া এখন কাশী নির্মলির বিপদের চিন্তায় অস্থির। পরের বিপদ দেখলে কাশীশ্বর আগে প্রাণ দিতে যায়, নিজের কথা কখনো ভাবে না। এ তার স্বভাব।

আনন্দীরামের মুখ ক্রমে রক্তবর্ণ হল। কান, ঘাড়, কপাল, গলা, বুক, সর্বত্র কে যেন সিঁদুর ছড়াল। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, 'কাশী কাটারী দে।'

কাশীশ্বরের কথায় ভূমিকা নেই 'চলুন, চাদর নিন।'

'কাশী, কাটারী দে।'

'চলুন।'

'কাশী, তুই বড় বেয়াড়া।'

'কেন?'

'কথা শুনিস না বলে। আমি নরপতির কাছে নিজে গিয়ে অপমান হয়ে এসেছি। ও ছাড়বে না।'

'না ছাড়ুক। তবু আপনি যাবেন।'

'গিয়ে কি করব?'

নরপতিকে মধুমোড়া দেবেন। কাশী এ সময়ে পরিহাস করে, কেন না 'মাথায় পুঁটুলী 'ধ' কানে আঁকুশী 'ক' লিখতে গিয়ে আনন্দীরামের হাতে সে কম 'মধুমোড়া' খায় নি। কানের লতি ধরে আস্তে আস্তে প্যাঁচ দেবার ও কায়দাটিতে আনন্দীরামের বিশেষ হাতযশ ছিল।

কাশীশ্বরের কথা শুনে আনন্দীরাম মৃদু হাসলেন। বললেন, 'সে-কাজে তুই-ই দড় আছিস।' কাশীর উদ্বিগ্ন চঞ্চল চাহনি দেখে তাঁর ঈর্ষা হয়। ওর বয়সটা যদি ফিরে পেতেন।

'আমায় দিয়ে হবে না, আমি কি শাস্ত্র জানি?' কাশীশ্বর অবহেলে আনন্দীরামের যত্নে বাঁধা বাঁশবেড়ার ওপর চেপে বসল। আনন্দীরাম স্বাগত হয়ে বললেন, 'তোর কাঁচা বয়স, ছেলেবুদ্ধিতে মনে করিস মানুষ বোঝালেই বুঝবে।'

'নিশ্চয়। নরপতি কি-শাস্ত্র জানে? কিসের জোরে সে বলে বর্গীরা গয়না কাড়লে নির্মলির দোষ লাগে? বর্গীরা হিঁদু নয়? তাদের শিবপূজোর ঘটা বেশি, আপনার ঐ নেড়া বৈরেগীকে জিগ্যেস করুন গে'।

আনন্দীরাম মলিন হেসে বললেন, 'শাস্ত্র! একবার যা করা হয় তাই ক্রমে দেশাচারে দাঁড়ায়। পুন্নির কি দোষ ছিল বল? বেদেরা যদি তাকে চুরি করে নেয়, সে অবলা অসহায়। নরপতি এক ধাঁচের মানুষ, না-সংসারী না-সন্ন্যেসী, বোনের দিপদে আগলায় এমন বুদ্ধি ওর কোনদিনও ছিল না। তবু বড় আচার্য পুন্নিকে শাপ করেছিলেন?'

'আপনি সেদিন কোথায় ছিলেন?'

আনন্দীরাম হাতের তালু উল্টোল। অসহায়তা জানিয়ে বলেন 'গ্রামেই ছিলাম'।

'ধ্যুৎ!' কাশী সংসারের জটিল চেহারা দেখে বিরক্ত, 'ছিলেন তবু কিছু বলেন নি?'

'না।' আনন্দীরাম গম্ভীর, 'নরপতি এখন ক্ষ্যাপ্ত ক্ষ্যাপ্ত হয়ে আছে বললেই হয়। পুন্নির শোকে ও পাগল। তবু চল, যাই। ছোটকে একবার বলে আসি।'

বিশালাক্ষী শুনে কাতর হলেন। বললেন 'যাও গোপাল, ভাল কাজে যাচ্ছ 'না' বলব না।'

নরপতি বললে 'আমি পাগল নই মুখোটি, জ্ঞান আমার টনটনা। আমার সমাজের কাছে এককথা, ডাকাতরা পাছুড়ে ধরল, টেনে নেয় বাইরে, গয়না খোলে, সে মেয়েকে বড় আচাজ্জি ঘরে তোলে কি করে?'

'নরপতি, বিপদকালে এমন কত হয়। তা ছাড়া তারা হিন্দু---'

'হলে বা হিঁদু, তাদের সঙ্গে আমাদের মিল্যে কোথাও ? তুমি গাঁয়ে বসে গল্প ফাঁদ নি। যে কনৌজ-অযোধ্যার হিঁদু-বামুনের অনেক রীত-ব্যাভার মোছলমানদের সঙ্গে মেলে? আমরা অন্ন ছুঁলে তারা মাছ খেগো বলে হাঁড়ি ফেলে, তুমি বল তাদের ছোঁয়া মেয়েকে আচাজ্জি ঘরে তুলবে ?'

'বিপদকালে যা ঘটে যায় নরপতি, তাকে ধরতে নেই।'

'ধরতে নেই ! তুমি বল মুখোটি, আমি হা-ঘরে কাঙাল, হতমূর্খ, তোমার দেহে লক্ষ্মী-সরস্বতী দু'বোনের বাস, তুমি যা বল আমি শুনব, মানব তোমার কথা।'

এ-কথায় সভায় চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। সকলে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন। এতক্ষণ সবাই উদ্বেগে দম ধ'রে ছিল, এখন যেন একটু একটু সু-বাতাস বয়। উদ্বেগের শান্তি, উদ্বেগের শান্তি, আনন্দীরাম একটু আশ্বস্ত, যাক, তাঁকে দিয়ে তবু ভগবান নিজের কাজ করিয়ে নিতে চান।

'তুমি বলছ মুখোটি, বিপদকালে এমন হলে দোষ নাই ; তোমার বুদ্ধি বেশি। পাঠশালে আমি তোমার খেজুর চেটাই, জলপানের পোঁটলা বইতাম। তোমায় চিরদিন বড় বলে মেনেছি।'

'সত্যিই বলছি আমি নরপতি,' আনন্দীরাম সহজ সততায় বলেন।

'সত্যি !' নরপতি মুখ তোলে। আনন্দীরাম দেখতে পান নরপতির চোখের ভাষা ভয়ঙ্কর, সকল যুক্তি, মিনতি, অনুনয় বিফল হয়েছে, নরপতি হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে হাসে। এ হাসি কান্নার সোদর। শুনতে অপ্রীতিকর, অসোয়াস্তিতে সভার পাঁচজন গা মোচড় দেন, এমন হাসি হঠাৎ শুনলে নিজেকে দোষী মনে হয়।

'তাই যদি সত্যি হবে, তবে আনন্দীরাম, সেদিন তোমার বিবেক ছিল কোথা ?' নরপতির চিৎকার শুনে সবাই সচকিত, আটচালার খিলান থেকে পায়রা ঝটপট করে, প্রাচীন আটচালার দেওয়ালের চিত্রের দেবদেবীরা যেন কাতর হন।

'সেদিন আমি তোমাদের হাতে পায়ে ধরি নি ? আমার পুনি নিদুষী ছিল না ? না, গরীবের বোন বলে সে-আমার আদরের নয়। তার মুখ মনে পড়লে এখনো আমার বুকে যেন শূওর-খোঁচা লাগে।

নরপতি ক্ষণেক থামে, চোখমুখ রগড়ে নেয়। সভাস্থ সকলে অভিভূত, বিবৃত, সয়ারাম রুষ্টস্বরে বলেন, 'তা কি কত্তে হবে ? এ হাঙ্গামা রাঢ়ে গৌড়ে সর্বত্র। যার যার বাড়িতে ডাকাত পড়েছে তারা কি সবাই---এঁ্যা' কথাটি সবটুকু বলেন না তিনি এবং উরুর ওপর কাল্পনিক মশা মারেন।

'রাঢ়ে গৌড়ে যার যার বাড়িতে বিপদ হয়েছে তারা তাদের কথা ভাবুক গা। আমার এক কথা, আমার বেলা যেটি অন্যায়, বড় আচাজ্জির বেলা সেটি ন্যায় হবে কেন ?'

'নরপতি ! তোমার বোনের মত নিদুষী আরেকটা মেয়ে----'

নরপতি আনন্দীরামের কথা শেষ অবধি শোনে না। বলে 'এ-কথা জানলে ওর শ্বশুরঘরে ওকে নেবে ? তাদের সমাজের ভয় নাই ?'

'সমাজের কথা ছাড় নরপতি, তোমার দয়া হয় না ?

'এখন আবার দয়ার কথা শোনায় !' নরপতি সন্দেহে ভয়াল হয়ে ওঠে। চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'কথার প্যাঁচ জান তুমি মুখোটি, কিন্তু আমি ও মন্তরে বশ নই। এ গাঁয়ে বড় মানুষের দয়া থাকে না, ক্যাঙাল আবার দয়া করবে কাকে ? বড় যা করে ছোট যে তাই শিখে গো।'

মেজ আচার্য এতক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন 'তো বেটার টাঁক জেয়াদা। তার চেয়ে বল না কেন কিছু ট্যাঁকে গুঁজতে চাস ? সামান্যতে রামায়ণ ফাঁদিস কেন ?'

বড় আচার্য হায় হায় করেন। মেজ আচার্য ধনমদে গর্বী, কারো কথা স'ন্ না। কিন্তু এখন স্বভাবকে শাসনে রাখবার সময়। হাতী খানায় পড়লে ব্যাঙকে 'বাবা' বলে, শাস্ত্রের কথা।

নরপতি নতুন ক'রে ক্ষেপে ওঠে। বলে, 'দিন পালটে গেছে আচাজ্জি

সুশী— আরামদায়ক হাওয়া পরিবেশনে সুপার ডিলাক্স

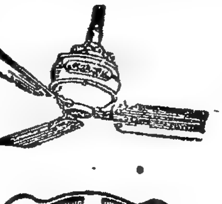

মার্কনী ফ্যান

১৩টি কিস্তি পর্যন্ত
কোন বাড়তি খরচ নেই
মার্কনী ইলেকট্রিক করপো
(প্রাঃ) লিঃ
১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৩০৪৮
রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে

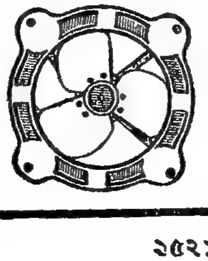

খুড়ো, সেদিন আর নেই। আমি ক্যাওট-বাগদী লই, যে কথায় কথায় জাত মারবে আর কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে অগতির গতি মোল্লার দোর ধরে মোছলমান হব। আমার মুখ বড় খারাপ, টাকা দিলেই বন্ধ হবে না।'

'তুই কি বলিস, ছোটজেত খেয়ে মোছলমান হয় আমাদের জন্যে, অ্যাঁ।'

মেজ আচার্য আপাত আলোচ্য বিষয় ভুলে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।

'আরে নরপতি দেখি সত্যিই ক্ষ্যাপা।'

'বামুন নামের অযুগ্যি তুই----।'

'কথা একটা বলবার বলে দিল। কি বলল, তার মানেটা শেষ অবধি কি দাঁড়ায় তা বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।'

নানাবিধ বিপদের ভয়ে বড় আচার্য ধহুক্ষণ ধৈর্য রেখেছেন, এখন আর পারেন না। গম্ভীর রাগতকণ্ঠে বলেন, 'এ কথার মানে কি? কি বলতে চাস তুই?'

'আপনার মনকে শুধান যেয়ে। কথা যা বলেছি তা সিধা।'

'আমরা সমাজের মাথা হয়ে তো বেটাদের ঠেলে দিচ্ছি কলমা পড়বার জন্যে?'

নরপতি মাথা তুলে আনন্দীরামের দিকে চায়। তারপর কাঁধের গামছা কোমরে জড়িয়ে বলে 'লাথ খেলে কুকুর গর্তে সাঁধায় না? তোমাদের টেঁকটেঁকানির চোটে বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায় খুড়ো, সুস্থ ছেলে পাগল হয়। নীচু জেতের ছেলে-বুড়োরা 'ধুরো' বলে জাত ছাড়ে কি না বল তুমি, আমি মিছে বলছি?'

'নরপতি, বড় আচার্য তোমার গুরুঠাঁইয়ের মানুষ, কথায় বার্তায় ওকে মান্য দাও।' আনন্দীরাম ধীরে বলেন। নরপতির কথায় তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। বুকের নীচে যেন নদীর পাড় ধ্বসে, চিড় খায়, চরাচর কাঁপে। এ-সব কি সাঙ্ঘাতিক কথা। এমন কথা হতে মনে বেয়াড়া চিন্তা আসে, মানুষ উদ্ধত হয়, এমন কথা খড়ের চালে আগুন দেয়, সমাজের পাঁচিল ভাঙে।

'মান্য তুমি দাও গা মুখোটি, নরপতি কারো অন্যায় সহ্য করে না, হ্যাঁ, চুপ করে থাকলে তোমরা ভাল মানুষের গলায় খড়ম দাও, সব জানি।' ক্রোধে তার কথাবার্তা অসংলগ্ন হয়।

'নরপতি।'

'মান্য তুমি দেবে। তোমার কথা হাটে ভাঙি নি, কিন্তু এখন মাথায় আগুন জলে। শোন মুখোটি, ট্যাঁ ফোঁ করা তোমার সাজে না, জানলে?'

'এ কথার মানে?'

'মারে সন্না দত্ত, আমাকে চোখ রাঙালে পোড়া, কিন্তু এবার কি করবে? মুখোটির পরিবার, বড় আচাজ্জির জ্ঞাত নাতনী, জগৎ আচাজ্জির মেয়ে আজ ক'রাত্তির সুরকণ্ঠ রায়ের ঘরে রাত্রিবাস করে তাঁ জান। হাটে হাঁড়ি ভাঙলাম, হ্যাঁঃ, এখন সাপ সামলাবে, মারবে, না ফের হাঁড়িতে পুরবে সে তোমরা ভাব গা।'

নরপতি সকলের মুখের বাক্য হ'রে নিয়ে সভা ছেড়ে গেল।

এক নরপতি হতে নির্মলার জীবন নষ্ট হ'ল, আনন্দীরামের মনের শান্তি বনে গেল।

(ক্রমশঃ)

ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি

হিন্দুধর্মের গৌরবজ্যোতিঃ। হিন্দুধর্মের এই অতীব দুর্দিনে—স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর বিরাট অভাব দূর করিবার জন্য—সাম, ঋক, যজু ত্রিবেদ—সর্ব্ব উপনিষদ—অষ্টাদশ পুরাণ—সর্ব্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত—শাক্ত শৈব বৈষ্ণব সৌর গাণপত্যের নিত্যসিদ্ধ মহাগ্রন্থ। স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর গৃহে গৃহে লৌকিক, পারত্রিক অশেষ মঙ্গল বিধানের নিদান, বেদজ্ঞ ঋত্বিক—তান্ত্রিক সাধক—সমৃথিতশাস্ত্র-বিশারদ দ্বাদশজন ক্রিয়ানিষ্ঠ মহাপণ্ডিতের পঞ্চদশবর্ষব্যাপী ঐকান্তিক সাধনায় সঙ্কলিত, সুসংস্কৃত, সুসম্পাদিত।

১ম খণ্ড—নব প্রকাশিত মূল্য—৮১।

২য় খণ্ড—সাতটি প্রকরণে ৯০০ পৃষ্ঠায়—দশবিধ সংস্কার, শ্রাদ্ধ তীর্থকৃত্য, প্রতিষ্ঠা, নৈমিত্তিক ক্রিয়া। মূল্য—৫১।

মহর্ষি কণাদ প্রণীত

বৈশেষিক-দর্শনম্

শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে মহর্ষি কণাদ তাঁহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে শিষ্যগণ। এই সূত্রে তোমাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব।" মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য। ধর্ম্মের বিভিন্ন দিক, কার্য্যকারণ, দ্রব্য ও সত্তার পার্থক্য ও গুণত্বের এবং জাতির পার্থক্য, পৃথিবীর লক্ষণ, জল, বায়ু, দ্রব্য ও আকাশানুমান, পরমাণুতত্ত্ব, মনঃস্থৈর্য্য, মুক্তি, জন্মান্তর, ভ্রম ও প্রমাদ—মহর্ষি কণাদ ধর্ম্মকথার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বাণী ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

মূল্য দুই টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতীর 'পাঠকমন' বিভাগটি বাস্তবিকই একটি অনন্য-সাধারণ সার্থক সংযোজন। অনন্য-সাধারণ এই জন্য যে, অনেক পত্র-পত্রিকাই পাঠক সাধারণের এতটা অধিকার সাধারণত মেনে নেন নি। আমি প্রায় গত এক বছর যাবৎ এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। প্রতিটি সংখ্যার প্রত্যেকটি রচনাই বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়ে আসছি। এবং আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, পত্রিকাটি দিনে দিনে সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠছে। 'পাঠকমন' বিভাগটিকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন যে জন্য—তা হল পাঠক-পাঠিকারা পত্রিকা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারছেন এই বিভাগের মাধ্যমে। আমি কিন্তু কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদিকাকে সাধুবাদ জানাই এই জন্য যে, তাঁরা শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা 'কিছু' পত্রিকা প্রকাশ ক'রেই দায়-দায়িত্ব সারছেন না,—পাঠকদের মন সম্পর্কেও তাঁরা সচেতন। পাঠক-পাঠিকাদেরও রুচি-অরুচি, ভাল-মন্দ বোধ, দাবি-দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। সে সম্পর্কে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' বিশেষ মনোযোগের পরিচয় দিতে পেরেছে।

'পাঠকমন' বিভাগটি সংযোজিত হয়েছে বেশ কিছুদিন হ'ল। ইতোমধ্যে অনেকেই ভাল-মন্দ মত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ Suggestion দিয়েছেন। অনেকের মতের সঙ্গেই আমার মতের মিল আছে দেখে নূতন ক'রে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিন্তু ইদানীং দেখছি—পত্রিকার ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে গেলে একের অনুকরণে অন্যজন, তাঁর অনুকরণে আর একজন—অর্থাৎ প্রায় সর্বজনই লিখছেন—'এই পত্রিকার মলাটের কাগজ ভাল নয়, ছাপা অনেক সময় এমন দুর্বোধ্য হয় যে, পাঠ করা একেবারে অসম্ভব হয়।' সর্বজনের এটা স্বাধীন মতামত হ'লে বলার কিছু ছিল না, কিন্তু দেখে শুনে মনে হচ্ছে এটা যেন অনুকৃতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সত্যের দিক থেকে বিচার করলে এই সংক্রামক অভিযোগটি একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হবে।

মলাটের কাগজটা একটু 'নিরেস' অর্থাৎ খুব 'সরেস' নয় সত্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই পত্রিকাটি কোনও বিত্তবান দেশের রাজনৈতিক প্রচার-পত্রিকা নয় অথবা সরকারী গৌরী সেনের টাকা জলে ঢেলে প্রকাশ করা পত্রিকা নয়। আরো ভালো মলাট দিতে গেলে যে বাড়তি খরচ পড়বে তার ভার তো পাঠকদেরই বহন করতে হ'বে—কিন্তু চার আনার স্থলে ছ'আনা মূল্য ধার্য করতে গেলে আপত্তি উঠবে অনেক পাঠকের দিক থেকে। অবশ্য অন্যভাবেও সেই বাড়তি খরচটা উসুল করা যায়—তা হল অধিক সংখ্যক বিজ্ঞাপন প্রচার। কিন্তু বেশি বিজ্ঞাপনের স্থান দিতে গেলে অন্যান্য মাসিক পত্রের মত এটিও ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় পরিণত হবে—সাহিত্য মার খাবে, তা ছাড়া সম্ভবত অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে, ২১শ সংখ্যা (৫ই কার্তিক) থেকে মলাটের কাগজের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। আর ছাপার কথা বলতে গেলে—'পাঠ করা একেবারে অসম্ভব' একথা বলা যায় না। টাইপগুলি অবশ্য পুরাতন, ছাপা হয়ত সব সময় খুব ঝরঝরে হয় না, কিন্তু তাই বলে 'পাঠ করা একেবারে অসম্ভব' এটা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। লেখার চেয়ে ছবির সম্পর্কে বরং একথা বলা চলে যে, ছবিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত নয়।

জনৈক পাঠক (শ্রীজহর বোস) কতকগুলি নূতন বিভাগ সন্নিবেশের সুপারিশ ক'রেছেন—যার মধ্যে 'প্রশ্নোত্তর বিভাগ' অন্যতম। দেখা গেছে—প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা যাঁরাই রেখেছেন তাঁদেরকেই শেষ পর্যন্ত রেডিওর মত 'অনুরোধের আসর' বসাতে হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরের বিভাগ থাকলেই অবাঞ্ছিত প্রশ্ন আসবে—উত্তরও দিতে হবে অবাঞ্ছিতভাবে। প্রশ্নগুলি যদি রাজনীতি, অর্থনীতির মধ্যেই সীমিত রাখা যায়, তাহলেও এমন অনেক প্রশ্ন আসবে, যার সদুত্তর দিতে গেলে কেউ খুশি হবেন, কেউ বা অপ্রিয় বোধ করবেন। আর নির্দিষ্ট কোনও গণ্ডীর মধ্যে যদি প্রশ্নের সীমা নির্ধারিত না হয় তা হলে তো কথাই নাই;—উত্তমকুমার কোনও সেলুনে চুল ছাঁটেন কিনা, সুচিত্রা রবারের চটি পরেন কিনা, এসব প্রশ্ন আসতে একদণ্ডও বিলম্ব হবে না। আমার মতে প্রশ্নোত্তরের ঝামেলা না রাখাই ভাল—তার চেয়ে এই অভিনব সংযোজন 'পাঠকমন' অনেক শ্রেয়।

এই 'পাঠকমন'-এর পরিসর আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। এ সম্পর্কে আর একজন পাঠক—শ্রীগৌতম সরকারের প্রস্তাবটি সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। কোনও 'কারণ' না দেখিয়ে কোনও রচনাকে ভাল-মন্দ বলে মত প্রকাশ না ক'রে বিচার-বিশ্লেষণ-সহ রচনার ভাল-মন্দ আলোচনা যদি পাঠকরা করতে থাকেন, তাতে লেখক ও পাঠক উভয়পক্ষই প্রেরণা লাভ করবেন ও উপকৃত হবেন।

পাঠকরা এবার এগিয়ে আসুন নূতন মন নিয়ে নূতন আলোচনায়। কাগজ আর ছাপা যদি সত্যি অসহনীয় হ'য়ে পড়ে তা হলে অবশ্য অভিযোগ না-করে উপায় নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন উদাসীন নন, কিছুটা উন্নতি যদি দেখা গিয়ে থাকে, তা হলে আসুন আমরা, পাঠকরা কাগজ আর ছাপা ছেড়ে লেখার দিকে 'মন' দিই। অনেক গল্প, কবিতা, রহস্য-গল্প, ধারাবাহিক উপন্যাস ও বিভাগীয় নিবন্ধ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়েছে, হচ্ছে—এগুলো সম্পর্কে আমাদের কার মনে কী জাগে? কোন প্রশ্ন, কোনও মতামত, কোনও আলোচনা কি আমরা করতে পারি না ঐ বিভিন্ন লেখাগুলি সম্পর্কে? আমার মনে হয়, মামুলী প্রশস্তি অথবা মামুলী অভিযোগ জ্ঞাপনই 'পাঠকমন' বিভাগটির আসল উদ্দেশ্য নয়—যা ওঁরা আমাদের পড়তে দিয়েছেন তার প্রতিক্রিয়ার হদিস পাওয়ার জন্যই 'পাঠক মন'-এর এই আয়োজন। তাই, সাপ্তাহিক বসুমতীর শ্রীবৃদ্ধি কামনার সঙ্গে সঙ্গে এর পাঠকমনের বিস্তৃতি কামনা করি।

এস রায়হানউদ্দিন
আমতা (হাওড়া)

চল্লিশোত্তর বাংলার নাট্যধারা

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

'মৌ-চোরে'র বঞ্চিত মানুষগুলো শুধু অরণ্যের শ্বাপদকুলের সঙ্গেই লড়াই করে না, লোকালয়ের হিংস্র দ্বিপদকুলের শোষণনখরেও ক্ষত-বিক্ষত হয়। তারই বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের ইংগিত দিয়ে নাট্যকার সামনের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছেন।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে স্বাধীন ভারত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে কতকগুলো প্রত্যাশা ও স্বপ্ন ছিল। যেমন সাম্যের আদর্শে অর্থনৈতিক পুনর্বণ্টন, শ্রেণিশোষণের অবসান, সকলের সমমর্যাদা, পূর্ণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, সকলের জীবিকার্জনের সুযোগ প্রভৃতি।

নীতিগতভাবে সংবিধানে এই ধরণের অনেকগুলি অধিকার স্বীকৃত হলেও, প্রশাসনিক ও সামাজিক কাঠামোতে এমন কতকগুলি স্ববিরোধী ব্যবস্থা আছে---যার ফলে, সাধারণ মানুষের অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হচ্ছে না। এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা অসন্তোষের সৃষ্টি করে এবং তাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানারূপ সংঘাত দেখা দেয়। সংঘাতের বাহ্যিক কারণ পৃথক পৃথক হলেও, মূল কারণ এক---দুটি মনোভাবের সংঘাত। একদল চাচ্ছে শোষণব্যবস্থা কায়েম রাখতে---আর একদল চাচ্ছে শোষণব্যবস্থার অবসান ঘটাতে। জমিদারী প্রথা লোপ পাওয়ায় জমিদার-প্রজার অর্থনৈতিক সংগ্রাম এখন মূল চেতনায় নেই---যদিও চাষীরা এখনো জোতদার-মহাজনের শোষণ থেকে মুক্তি পায় নি। যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ একটা অংশ ক্রমশ শ্রমজীবীতে পরিণত হচ্ছে। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক সচেতন। তার ফলে এদের নেতৃত্বে শ্রমিক-মালিক বিরোধের তীব্রতা স্বাধীন ভারতে বৃদ্ধি পায়। অর্থনৈতিক বৈষম্য এত বেশি যে, সংঘাত সর্বত্র তীব্র না হলেও অসন্তোষ সর্বস্তরেই বিদ্যমান।

এই সামাজিক অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে সাম্প্রতিক অনেকগুলো নাটকে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ যদি সাম্প্রতিক নাটকে বেশি এসে থাকে তার জন্যে নাট্যকারগণ দায়ী নন, দায়ী বর্তমান সমাজব্যবস্থা। নাটকের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের কারণ ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যের বিবর্তন-আলোচনায় পূর্বেই সংক্ষেপে বলা হয়েছে। অতএব আশা করি, এ সম্বন্ধে এখানে বিশদ আলোচনা না করলেও চলবে।

শ্রমিকরা শিল্পোৎপাদনের যন্ত্র মাত্র---এ চিন্তার যুগ অতীত হয়েছে। শ্রমিকরাও উৎপাদনের অংশীদার এবং উপযুক্ত লভ্যাংশ পাবার অধিকারী---এটাই যুগের চেতনা ও দাবি। কিন্তু ভারতে এখনো কোনো কোনো শ্রেণীর মালিক মনে করেন, শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে শুধু নির্দিষ্ট মজুরী পাবারই অধিকারী এবং মুনাফাটা কেবল মালিকেরই প্রাপ্য। এই দুই মনোভাবের প্রথম মোকাবিলা হয়েছে 'মোকাবিলা' নাটকে। শ্রমিক-মালিক বিরোধ নিয়ে লেখা 'ইস্পাত' নাটকে দেখা যায়---ভারতীয় মালিক প্রতিটি নির্দেশেরই জন্যে তাঁর বিদেশী অংশীদারের মুখাপেক্ষী।

নাটকের মধ্যে এই বক্তব্যটি সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টায় দেখা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিকদের শোষণের জন্যে দেশী-বিদেশী মালিক যোগসাজস হয়েছে। 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকেও এই শ্রমিক-মালিক বিরোধই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে সেখানে একটি প্রতীক চরিত্র সৃষ্টি করে দেখানো হয়েছে যে, এককালের বিপ্লবী আজ অন্যায়কে দেখেও দেখছেন না, বুঝেও বুঝতে চাচ্ছেন না---ধৃতরাষ্ট্রের মতো পুত্রস্নেহে অন্ধ হয়ে আছেন। 'আর হবে না দেরী'তেও প্রায় একই বক্তব্য রয়েছে। তবে সেটা শ্রমিক-মালিক বিরোধ নয়---এক কল্পিত বিপ্লবের কাহিনী। 'অঙ্গার' নাটকে কয়লার খনির শ্রমিকদের জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে অভিনব---তবে নাটকে মালিক শ্রেণীর নৃশংসতা যতখানি চিত্রিত হয়েছে, শ্রমিক শ্রেণীর নতুন জীবনবোধ ততখানি প্রকাশ পায় নি। তার ফলে নাটকটি ভারসাম্য হারিয়েছে। তবু সমকালীন পেশাদার নাট্যশালায় এ নাটক একটি ব্যতিক্রম।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সমান্তরাল নাটক 'জীবনরঙ্গে' যা আসে নি, 'শুধু ছায়া' নাটকে তা এসেছে। শেষোক্ত নাটকটিতে আর্টের 'রোমান্টিসিজম' ও 'রিয়ালিজম'-এর দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। 'পরিচয়' নাটকে সমস্যাকে যেখানে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, 'অন্তরাল' নাটকে সেখানে বলিষ্ঠভাবে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুর্জোয়া নীতিবোধ ও সমাজতান্ত্রিক নীতিবোধের সংঘাত সৃষ্টির দ্বারা ইংগিত দেওয়া হয়েছে যে, একমাত্র শোষণমুক্ত শ্রেণিহীন সমাজেই অবৈধ সন্তান-সমস্যার যথার্থ সমাধান হতে পারে।

এ যুগের নাটকে আন্তর্জাতিক সমস্যাও স্থান পেয়েছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' নাটকটি সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে লেখা। যুদ্ধের মনস্তত্ত্ব ও যুদ্ধবিরোধী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে 'মরুবাঞ্ছা' নাটকে। 'জীবনস্রোত' নাটকে আধ্যাত্ম-বাদী জীবনবোধ ও বস্তুবাদী জীবন-বোধের সংঘাতও আজ আন্তর্জাতিক সমস্যা। পুরাণের কাহিনীকে এ-যুগের চিন্তা দিয়ে নবমূল্যায়নে চেষ্টা করা হয়েছে 'নচিকেতা' নাটকে। ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা কাল্পনিক নাটক

'অমৃত অতীত' এ-যুগের সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর অনেকখানি আলোকপাত করে।

আলোচ্য কালের আর একটি বিশেষ ফসল একাঙ্ক নাটক। নাটকের এই শাখাটি সম্প্রতি বিশেষ পুষ্ট হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের যে অসংখ্য চিন্তা উদিত হচ্ছে, মানুষের মনে, দ্রুত পট পরিবর্তনের ফলে যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, পুরনো প্রত্যয় ও নতুন বাস্তবের যে সংঘাত উপস্থিত ব্যক্তির জীবনে, একাঙ্ক নাটকে তা প্রকাশ পাচ্ছে। চিন্তানির্ভর বলেই অনেক একাঙ্ক নাটকে কাব্যলক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং কাব্যনাট্য রচনার দিকেও একটা ঝোঁক এসেছে।

নাট্যরচনার আঙ্গিক এবং রূপ-রীতিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে এ-যুগে। সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা রাখা হয় নি নাটকে। বক্তব্য উপস্থিত করতে যেটুকু সময়ের দরকার তারই মধ্যে নাটক সমাপ্ত করা হয়েছে। ঘটনাস্থল কমিয়ে নাটককে সংহত করার দিকেও নাট্যকারগণ যত্নবান। আরও একটি প্রধান লক্ষণ, কাহিনীর চেয়ে বক্তব্যের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দান। বলা বাহুল্য, এদিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথকেই বলা যায় পথপ্রদর্শক। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের আর একটি সম্পদ তার আঞ্চলিক ভাষা। আরান দ্বীপপুঞ্জের ও নিউইংলণ্ডের আঞ্চলিক ভাষায় যেমন সিঙ্গ ও ও'নীলের নাটকের কৃষকচরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রত্যন্তবাসীদের আঞ্চলিক ভাষা বাংলা নাটককে নতুন প্রাণশক্তি যুগিয়েছে। মাইকেল, দীনবন্ধুর নাটকে যে ধারাটি ক্ষীণ ছিল, এ-যুগের নাটকে তাই বেগবতী হয়ে স্রোতস্বতীর রূপ ধরেছে।

যুগের লক্ষণযুক্ত যেসব নাটক এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলে ধরা হলো, তার মধ্যে একমাত্র 'দু:খীর ইমান' ও 'অঙ্গার' ছাড়া আর কোনো নাটকই বনেদি পেশাদার মঞ্চে স্থান পায় নি। নাটকগুলিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করার সবখানি কৃতিত্ব অপেশাদার নাট্য-গোষ্ঠীর। এসব নাটক মঞ্চে উপস্থিত করাতে গিয়ে অপেশাদার মহলকে মঞ্চকলায় ও অভিনয়ে নানারূপ নতুন আঙ্গিকের আশ্রয় নিতে হয়েছে। পাশাপাশি বনেদি নাট্যশালাগুলোর দিকে তাকালে খানিকটা নিরাশই হতে হয়। সাম্প্রতিককালে সেখানে যেসব নাটক বহু অভিনীত হয়েছে, সেগুলির চরিত্র কি? সেই হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুর-নির্ভর 'শ্যামলী' ও 'শ্রেয়সী'; প্রায় অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বিকলাঙ্গ নায়ককেন্দ্রিক 'উল্কা'; আয়ুর্বেদের নিদানতত্ত্বাশ্রয়ী 'আরোগ্য নিকেতন,' উদরাগ্নির রোমাণ্টিক চিত্র 'ক্ষুধা' ও বন্ধ্যা নারীর হিস্টেরিয়া 'সেতু'। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নে।

এ-যুগের বাংলা নাটকের প্রধান লক্ষণ তার সমাজচেতনা। এই সমাজ-চেতনা থেকেই এসেছে দু:খের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা। ইউরোপে শিল্প-চিন্তা যেদিন বিজ্ঞানাশ্রয়ী হলো—সেদিন থেকেই নাটকে Rationalism বা যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেতে লাগলো। যুক্তিবাদের দৃষ্টিই থাকে Cause and effect-এর দিকে। রিয়ালিস্টরা Cause-এর দিকে যতখানি যেতে চান রোমাণ্টিসিস্টরা ততখানি যাবার প্রয়োজন বোধ করেন না। রোমাণ্টি-সিজমের ধর্মই হলো ভাবরাজ্যে বেশি বিচরণ করা। রিয়ালিজম করে Social content-এর analysis. বাংলা নাটকে যে রোমাণ্টিকতার প্রাধান্য ছিল, চল্লিশোত্তর কালে তা অতিক্রম করে নাটক Rationalism-এর পথ ধরেছে বলেই এ যুগের নাটকে সমাজ-বিন্যাস ও শ্রেণিচরিত্র বেশি স্থান পেয়েছে।

সমাজচিন্তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ঝোঁকও স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন, বাংলার এই নব-নাট্যধারার চিন্তা যাঁদের মাথায় প্রথম এসেছিল, সমাজ-চিন্তার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী। পরে আন্দোলনের

ভারতের শ্রেষ্ঠ
বেঙ্গল কেমিক্যালের
স্বচ্ছ
গ্লিসারিন সাবান
এই সাবান আপনার কোমল গাত্রত্বককে শীত ও গ্রীষ্মের রুক্ষতা থেকে রক্ষা করে। সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহারোপযোগী সাবান

টিনের বাক্সে পাওয়া যায়
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

প্রসারের ফলে নাটকের চরিত্রের বদল হয় এবং বৈচিত্র্যও আসতে থাকে। উত্তরকালে নবনাট্য আন্দোলনের জন্য যাঁরা নাটক লিখেছেন, তাঁদের সবাই যে মার্ক্সীয় রাজনৈতিক মত ও পথে বিশ্বাসী, এমন নন। নিছক মানবতাবোধ থেকে যুগের প্রভাবেও কেউ কেউ নাট্য-সাহিত্যের এই নতুন পথে পদক্ষেপ করেছেন।

গোড়ার দিকে উপজীব্যের এই ক্ষেত্রান্তর ছিল অভিনব। এখন অভিনবত্বের পর্ব শেষ হয়ে এটা একটা Method বা রীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলা দেশের অধিকাংশ নাট্যকারই আজ নাটক লেখার সময় এই রীতিতে চিন্তা করে থাকেন এবং পেশাদার মঞ্চেও ধীরে ধীরে এই রীতি অনুপ্রবেশ করছে।

Terrible suffering বা unmerited misfortune যদি ট্র্যাজেডির লক্ষণ হয়, তবে দেখতে হবে এ যুগের সেই suffering বা misfortune কোথায়। জীবনযন্ত্রণা বা দুর্ভাগ্যের কারণ যেখানে সমষ্টিগত, সেখানে যন্ত্রণা বা দুর্ভাগ্যও আসে সমষ্টিরই জীবনে। শোষণের যন্ত্র আজ highly mechanized শ্রেণী-শোষণের সংহত আক্রমণে যখন মানব-গোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ বিপর্যস্ত, তখন সেই বিপর্যয় শুধু একটি মানুষের নয়, একটা গোষ্ঠীর। গোষ্ঠীর terrible suffering বা unmerited misfortune এ যুগের একটা বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের সংজ্ঞা বদলে গেছে যুগের দাবিতেই। একটি মানুষের ট্র্যাজেডি যদি লক্ষ লক্ষ মানুষের ট্র্যাজেডির প্রতিভূ না হয়ে ওঠে---তবে সে ট্র্যাজেডি আজ মূল্য পাবে বলে মনে হয় না; অন্তত তেমন ট্র্যাজেডি আজকের গণমানসকে প্রভাবিত করতে পারবে না। আজ সাধারণ মানুষের যে terrible suffering বা unmerited misfortune তাকে রূপ দেওয়াই বোধহয় আজকের দিনের নাট্যকারদের প্রধান দায়িত্ব। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে এই দায়িত্ববোধের স্বাক্ষর আছে; কারণ সাধারণ মানুষই নাটকের নায়ক হয়ে এসেছে।

সম্প্রতি ইউরোপের নাট্যজগতে Rationalism বা যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব দেখা যাচ্ছে; তার মুখপাত্র ফরাসী নাট্যকার ইওনেস্কো। বাংলা দেশে তেমন কোনো নতুন মৌল নাট্যচিন্তার বিকাশ আজও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায় নি; তবে অদূর ভবিষ্যতে যে আসবে না, তাও জোর করে বলা যায় না। যদি আসে, তবে দেখা যাবে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের মোড় ঘোরার পালা আবার সুরু হলো। সেদিন হয়তো 'গেল গেল' রবে চিৎকার উঠবে কিন্তু কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে জীবনের অখণ্ড প্রাণপ্রবাহের মতোই নাট্যধারা তার আপন পথে সামনের দিকে ধাবিত হবে।

বলতে পারেন, সবই শুনলাম, সবই বুঝলাম, কিন্তু চল্লিশোত্তর কালে বাংলা দেশে সত্যি কি কোনো মহৎ নাটকের সৃষ্টি হয়েছে? এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ আমি নিজেও একজন নাট্যকার---an involved person. এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন চক্ষুষ্মান নিরপেক্ষ বিচারক। তবে শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, পক্ষপাত বিচার-দোষে এককালে যা ম্লান বলে প্রতীয়মান হয়, ভাবীকালের নিরপেক্ষ বিচারে তাই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একালে কোনো মহৎ নাটকের সৃষ্টি হয়েছে কি না, তার আসল বিচারক বোধহয় ভাবীকাল।

বদ্ধ অবস্থা থেকে যখন নাট্য-স্রোত বেরিয়ে আসতে পেরেছে, তখন সে নতুন ফসল ফলাবেই। মহৎ নাটকের যদি সৃষ্টি না-ই হয়ে থাকে, একদিন হবে, কারণ তার ক্ষেত্র প্রস্তুত। ভবিষ্যতে আমার বিশ্বাস আছে---যেহেতু আমি আশাবাদী। *

* ১৯৬৩ সালের ২০শে জুলাই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং লেকচারাররূপে প্রদত্ত বক্তৃতা।

বিশ্ব-সাহিত্যে বসুমতীর অমর অবদান

শ্রীঅরবিন্দের

ANANDAMATH

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর আনন্দমঠের অমর ইংরাজী অনুবাদ

● আনন্দমঠে—স্বাধীনতার সক্রিয় সংগ্রামের পূর্ব্বাভাষ।

আনন্দমঠে—'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের পূত-প্রকাশ।

● আনন্দমঠে—ঋষি বঙ্কিম ও ঋষি অরবিন্দের আদর্শ সমন্বয়।

আনন্দমঠের এই মহামন্ত্রের অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জিত

ভারতের প্রতি গৃহে এই পবিত্র গ্রন্থ শোভা পাউক।

দাম—তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

রঙ্গজগৎ

● শ্রাবণী বসু---লালপাথর ছবির বিশিষ্ট চরিত্রে।

ভারতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আদর্শবাণী কি ?

ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক উৎসবের প্রস্তুতি সুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ৩২টি দেশ এই প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে যোগদানে সম্মতি জানিয়েছে। সাধারণত প্রথম শ্রেণীর উৎসবে ৩৫টি হতে ৪০টি পর্যন্ত দেশ যোগদান করে। সেক্ষেত্রে এ যাবৎ ৩২টি দেশের যোগদানে সম্মতিদান যথেষ্ট আশার কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া এবং সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র ছবির নাম ও ছবি সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকা পাঠিয়েছে। উৎসব উপলক্ষে পাঁচটি অধিবেশনে আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা হয়েছে। আলোচনার বিষয় নির্দিষ্ট হয়েছে---(১) জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির প্রতিফলন হিসাবে চলচ্চিত্র, (২) প্রচার ও শিক্ষার জন্য স্বল্পদৈর্ঘ্যের চিত্রের কার্যকারিতা, (৩) বিদেশে ভারতীয় চিত্র এবং ভারতে বিদেশী চিত্র ; (৪) চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ভূমিকা এবং স্টার প্রথা ও (৫) শিশু চলচ্চিত্র।

এই আন্তর্জাতিক উৎসবের সাফল্যের জন্য আমরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে আগ্রহী। কিন্তু এ কথা না বলে উপায় নেই যে, উৎসবটি একেবারে আমলাতান্ত্রিক ও সরকারী কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণে প্রথমেই উৎসব কমিটী চিন্তাশীলতার পরিচয় দেন নি। আলোচ্য বিষয়বস্তু নিতান্তই মামুলী। এতে সাধারণের জ্ঞাতব্য থাকতে পারে, কিন্তু চলচ্চিত্রের বিকাশের সহায়ক কিছু নেই। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে কলাকৌশলের ও পরিচালনা-রীতির যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেরূপ কোন আলোচনা বিষয়সূচীতে স্থান পায় নি। অথবা বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক কোন বিষয় গ্রহণ করা হয় নি। প্রত্যেক উৎসবের একটা আদর্শবাণী থাকে ; যেমন মানবতার জন্য চলচ্চিত্র, বিশ্বশান্তির জন্য চলচ্চিত্র, দেশে দেশে জানা-শোনার জন্য চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের উৎকর্ষের জন্য উৎসব ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের চলচ্চিত্র উৎসবের আদর্শবাণী কি ? কোন্ আদর্শে এবং লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আমাদের এই উৎসব সে কথা এখনো ঘোষিত হয় নি। তবে কি কেবলমাত্র উৎসবের জন্যই এই উৎসব ?---

—সুজন।

চিত্র আলোচনা

লালপাথর

(এসারবি প্রোডাকসন্স)

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাজা-জমিদারের কাহিনীকে আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের নাটকে রাজা-জমিদাররাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রেম-বিরহ কাহিনী আমাদের হাসি-কান্নার বিষয় হতো। কিন্তু এখন মানুষ অনেক বেশি বাস্তববাদী; যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নাটক ও চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করতে চায়। রাজা-রাজড়ার কাহিনীকে তারা জীবনবোধ দিয়ে গ্রহণ বা বর্জন করে।

'লালপাথর' ছবির নায়ক এক রাজাবাহাদুর। নিজের মুখেই সে তার পূর্বপুরুষদের পরিচয় দিয়েছে---দস্যু, মদ্যপ, কামাসক্ত ইত্যাদি রূপে। নিজেকে সে মায়ের আদর্শে ভাল রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু অতি সাধারণ এক নারী তার জীবনের পরিবর্তন ঘটালো। এই নারীকে সে দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার করেছিল, শিকার থেকে ফেরবার পথে। সেই নারী---মাধবী, হয়ে উঠলো তার শয্যাসঙ্গিনী, বিয়ে না করেও তাকে সে স্ত্রীর অধিকার দিল। কিন্তু দশ বছর পরে সে বুঝতে পারলো তার অতৃপ্তি। প্রায় প্রবীণ বয়সে মাধবীর বিরোধিতার মধ্যে সে আবার বিয়ে করলো শিক্ষিতা ও গায়িকা শহরের

'দোস্তি' হিন্দী ছবিতে উমা ও সঞ্জয়

...নয়ে সুস্মিতাকে। সুস্মিতা ছিল তার প্রতিবেশী অমলেশের বাগদত্তা। ঈর্ষায় মাধবী রাজাবাহাদুরের মনে সন্দেহের আগুন জ্বালিয়ে তুললো। সেই আগুনে রাজাবাহাদুরের মন হিংস্র হয়ে উঠলো। চক্রান্তের শিকার হয়ে সুস্মিতা ও অমলেশ প্রাণ হারালো। নিজের ভুলের ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ রাজাবাহাদুর পড়ে রইল ফকিরের মত ফতেপুর সিক্রিতে।

ফতেপুর সিক্রিতে একদল বাঙালী পরিভ্রমণকারীর কাছে এই বৃদ্ধ ফকির নিজের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা করছিল, ফ্ল্যাশ-ব্যাকে তা প্রদর্শিত হয়েছে। আগ্রার বিভিন্ন ঐতিহাসিক দর্শনীয় চিত্রে চিমেতালে ছবির শুরু। পরিচালক সুশীল মজুমদার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে যেমন প্রবীণ, তাঁর পরিচালনা-রীতিও পুরানো। পুরানো রীতিতে কেবল দৃশ্যের পর দৃশ্য গল্প বলে গেছেন। এই গল্প সাজানোর মধ্যে বিশেষ কোন বুদ্ধির বিকাশ বা বক্তব্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কোন নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় নি। পরিচালক মনোরঞ্জনী ছবির ফরমূলা এবং সাধারণ দর্শকদের সন্তুষ্ট করার ধরণ জানেন। তাই মাঝে মাঝে যৌন-চেতনায় সুড়সুড়ি দেবার মত দৃশ্য তিনি সযত্নে রচনা করেছেন। পরিচালকের বাস্তববাদে আস্থা নেই, তাই তিনি নির্বিচারে কৃষ্ণকান্তের উইল এবং ক্ষুধিত পাষাণের পাশ ঘেঁষে অগ্রসর হয়েছেন, যথেচ্ছভাবে গান ও নাচ সংযোজন করেছেন।

রাজাবাহাদুর হয়েছেন উত্তমকুমার, তিনি প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। মাধবী ও সুস্মিতা হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও শ্রাবণী বসু, তাঁদের দু-জনার অভিনয় যথাযথ। একটি টাইপ চরিত্রে রবি ঘোষ প্রশংসনীয়। নির্মলকুমার অভিনীত চরিত্রটিকে বোকা ধরণের মনে হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বাণী গাঙ্গুলী ও সুনীল মজুমদার প্রমুখ।

ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন প্রশান্ত চৌধুরী লিখিত কাহিনী।

নাট্যবেশ্মর কথা

প্রফেসর

লিটল থিয়েটার গ্রুপের অভিনন্দনীয় উদ্যোগ

সম্প্রতি লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ দর্শক-সদস্যসূচী গ্রহণ করেছেন। এই সূচী অনুযায়ী নতুন নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে মিনার্ভা মঞ্চে, এবং তাঁরা বছরে আটটি নাটক দর্শক-সদস্যদের দেখাবেন। এরূপ নাট্য-প্রচেষ্টা বাংলা দেশে কেবল নয়, সম্ভবত ভারতে এই প্রথম। গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে এই উদ্যোগের প্রথম নাটক 'প্রফেসর মামলক' অভিনীত হলো। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন গণতান্ত্রিক জার্মানীর কলিকাতাস্থ বাণিজ্য প্রতিনিধি।

'দিনান্তের আলো' ছবিতে দু-টি চরিত্রে কালী ব্যানার্জী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

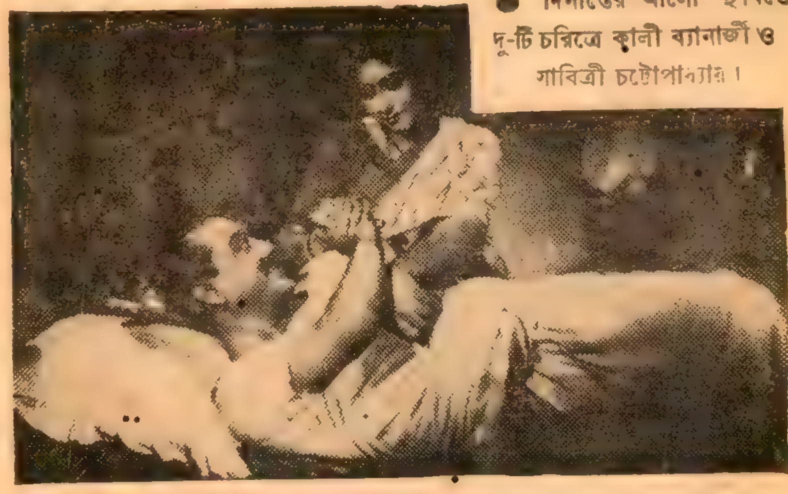

"প্রফেসর মামলক"-এর রূপ ও জার্মান চলচ্চিত্ররূপ আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এই নাটকের দুটি চিত্ররূপই বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছে। ফ্রিডরিশ ভোলভ্ রচিত নাটকটি হিটলারের পতনের পূর্ব পর্যন্ত জার্মানীতে অভিনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। গণতান্ত্রিক জার্মানীতে নাটকটি অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি বিশেষ একটি দেশ ও একটি কালের পটভূমিতে রচিত হলেও তার আবেদন সার্বজনীন এবং আন্তর্জাতিক। জার্মানীর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই নাটক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট এবং তার চরম পরিণতির বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে জাগ্রত করেছে।

১৯৩২ সালে জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচনের সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি; প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়ায় অর্থনৈতিক সংকট ও অস্থিরতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে জনগণ যখন কমিউনিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে; ১৯৩২ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্টরা যখন ৪২২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সেই সময় আতঙ্কিত ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে ফ্যাসিবাদ জন্মলাভ করে। কমিউনিস্ট বিদ্বেষ প্রচার, জাত্যাভিমান জাগিয়ে তুলে এবং অঞ্চল পুনরুদ্ধারের ও সমৃদ্ধির ধোঁকা দিয়ে ফ্যাসিস্টরা জনগণকে বিভ্রান্ত করে। উগ্র জাতীয়তাবাদ ও জাতিবিদ্বেষে যুব-সম্প্রদায় ও জনমনকে কলুষিত করে।

এই পটভূমিকায় প্রফেসর মামলক,—যারা জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সার্জন, বিজ্ঞানী এবং বলিষ্ঠ মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক কি ভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাসিবাদের নগ্নমূর্তি দেখতে পেয়েছেন, এবং এত গুণ থাকা সত্ত্বেও এতবড় একজন বিজ্ঞানীকে একমাত্র ইহুদী হবার জন্য অপমানিত হতে হয়েছে, এবং শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিস্টদের কাছে মাথা নত করা অপেক্ষা আত্মনিধনের পথ গ্রহণ করতে হয়েছে, সেই কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

ফ্রিডরিশ ভোলভের এই নাটকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—সমাজের গঠন ও শ্রেণী প্রতীকমূলক চরিত্রসৃষ্টি। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংলাপে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকার গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে লোকচরিত্র প্রকাশ করেছেন। যা কেবল তৎকালীন জার্মানীর নয়, চিরন্তন সত্য। প্রফেসর মামলকের পাশে, ডাঃ ইভে কুমড, সিমন,

শুভমুক্তি ৬ই নভেম্বর শুক্রবার!
সারাভারতের শতাধিক চিত্রগৃহে।
সারাভারতে চিত্রসমালোচকগণ একবাক্যে বলেছেন
মহান মানবতার এক উদ্বুদ্ধকারী মহত্তম চিত্র
রাজশ্রী প্রোডাকসন্স (প্রাঃ) লিমিটেড
দোস্তী

প্রযোজনা
তারাচাঁদ বারজাত্যা
পরিচালনা
সত্যেন বোস
গীত
মজরুহ
সঙ্গীত
লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
রূপায়ণে
সুধীর কুমার
সুশীল কুমার
অভি ভট্টাচার্য
লীলা চিৎনীস
লীলা মিশ্র
বেবী ফরিদা
বানা পালসিকর
জ্যোতি - কৃষ্ণা - রূপালী - ভবানী
চিত্রপুরী (খিদিরপুর) - পুষ্পশ্রী (বড়িশা) - সন্তোষ (বেলেঘাটা) - কল্পনা (হাওড়া) - শ্রীদুর্গা (চন্দননগর) - সন্ধ্যা (খড়দহ) - বীণা (বজবজ)
বিচিত্রা (বর্দ্ধমান) - নিউ সিনেমা (আসানসোল) - বম্বে সিনেমা (খড়গপুর) - শ্রীলক্ষ্মী (কাচরাপাড়া) - অশোক (পাটনা)

● বিশ্বের মনোমোহিনী অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের আর একটি মূর্তি।

ভের্নের জাইভেল, ডাঃ হার্স, রুথ মামলক ও রলফ মামলক এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মানসিক গঠন ও চিন্তার প্রকাশ। এদের দর্পণে আমরা সত্যের প্রতিবিম্ব দেখলাম। ধনতন্ত্রের সুকৌশল বিভ্রান্তি স্বষ্টির মুখোস উদ্‌ঘাটনকারী এই নাটক জাতিবিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে মানুষকে সংগ্রামের জন্য প্রেরণা দেয়।

উৎপল দত্তের পরিচালনায় দলগত অভিনয়-বৈশিষ্ট্যে নাটকটি সার্থক। নাটক শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও আরো দেখার ইচ্ছা নিয়ে হল থেকে বাইরে আসার পর ডাঃ মামলক এবং বিভিন্ন চরিত্রের মখে উচ্চারিত সংলাপ কানে বাজতে থাকে। অভিনয়ে প্রতিটি চরিত্র নিখুঁত। বিদেশী সাজসজ্জা, সুচিন্তিত দৃশ্যসজ্জা এবং উপযুক্ত পরিবেশ ফুটিয়ে তুলে এই সার্থকতার জন্য প্রতিটি শিল্পী, মঞ্চকর্মী অভিনন্দনীয়। তার মধ্যেও আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করবো ডাঃ মামলকের চরিত্রে উৎপল দত্ত, ডাঃ ইংগে রুয়ফ রূপে গীতা সেন এবং রুথ মামলক রূপে অপর্ণা দাশগুপ্ত। অপর্ণাকে আমাদের 'সমাপ্তি' ছবিতে ভাল লেগেছিল, তার পরে মঞ্চে তার এই প্রথম অভিনয় আমাদের আরো ভাল লেগেছে।

এই নাটকে অন্যতম আকর্ষণ সঙ্গীত, যা আমরা আশার অধিক উপরি পাওনার মত পেয়েছি। পরিচালক এখানে অন্তর্বর্তীকালীন ও সমাপ্তিতে যে সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন সেই দুর্লভ ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পন্ন সঙ্গীত অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। নাৎসি অত্যাচারে নিহতদের স্মরণে স্ত্রাভিনস্কির প্রথম সিম্ফনি, বেঠোফেনের নবম সিম্ফনী এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং পল রবসনের কণ্ঠে ইহুদী প্রতিরোধের গানে নাটক শেষ হয়েছে। এই মহান সঙ্গীত সুসঙ্গত ব্যবহারের জন্য আমরা পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ফ্রিডরিশ ভোলভ রচিত এই নাটকটি অনুবাদ করেছেন খ্যাত নট ও

● বিশ্বের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা ব্যালেরিনা মায়া পিসেৎস্কায়া

...ভ্যাকার উৎপল দত্ত। সুনীল ও নাট্যশৈলী এত সুন্দর যে কোথাও কষ্টকল্পিত মনে হয় নি। যেন আমাদের কত পরিচিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি। এই নাটকটির বহুল অভিনয়ের জন্য আমরা লিটল থিয়েটার গ্রুপকে অনুরোধ করছি; এবং দেশের ছাত্র সম্প্রদায় যাতে নাটকটি দেখার সুযোগ পায় সেরূপ বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

মায়া পিসেৎস্কায়া

সোভিয়েট ব্যালেরিনার জীবনীচিত্র ইতালীর বার্গামোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'মায়া পিসেৎস্কায়া' চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছে। এক ঘণ্টা সময়ের এই ছবির একটি দৃশ্যও স্টুডিওতে তোলা হয় নি। দীর্ঘকালব্যাপী ক্যামেরাম্যান এ খাবচিন 'মায়া পিসেৎস্কায়ার' নাচ, তাঁর অনুশীলন, বলশয় থিয়েটারে অনুষ্ঠান, সৌখীন নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে ক্যামেরা ও দৃষ্টি সজাগ রেখেছিলেন। যখনই সুবিধা পেয়েছেন ছবি তুলে রেখেছেন। এভাবে দীর্ঘদিনের তোলা ছবিগুলি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'মায়া পিসেৎস্কায়া' প্রামাণিক চিত্র—যে ছবি এবার শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হলো।

দর্শকরা বলশয় থিয়েটারে এবং অন্যত্র তাঁর নাচ দেখে বিস্ময়মুগ্ধ। রাশিয়ার ব্যালেরিনাদের মধ্যে তিনি প্রথম সারিতে রয়েছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। তাঁকে স্টেজে দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন, কিন্তু স্টেজের ভেতরে কি করছেন, কিভাবে নাচের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এবং ঘরোয়া জীবনের কথা যখন ছবিতে দেখতে পান তখন সে বিস্ময় শ্রদ্ধামিশ্রিত হয়ে ওঠে।

বিস্মিত হবারই কথা। এই বিস্ময় সৃষ্টির জন্য মায়া পিসেৎস্কায়ার সঙ্গে ছবির নির্মাতাদেরও বাহাদুরী আছে। তাঁরা দর্শকদের স্টেজের ভেতরে নিয়ে এসেছেন। দেখিয়েছেন যে নাচ দেখে তাঁরা হাততালি দিয়েছেন সেই নাচটা তৈরি করার জন্য, স্টেজে যাবার মুহূর্তেও পিসেৎস্কায়া কত গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন, প্রত্যেকটি ভঙ্গী, প্রত্যেকটি মুহূর্তকে লালিত্যপূর্ণ করার জন্য কত তাঁর আয়াস। ছবিটি যেন মায়া পিসেৎস্কায়ার সাথে একটি চলচ্চিত্র সাক্ষাৎকার। যে সাক্ষাৎকারে তাঁকে বিশ্বের এক মহান শিল্পীরূপে প্রকাশ করেছে। প্রতিটি মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলার অসীম ক্ষমতা তাঁর, যা বিশ্বে খুব কম শিল্পীরই আছে। এবং সে অভিব্যক্তি এত যে লালিত্যপূর্ণ—তা যারা চোখে দেখেছে তারা সারা জীবনের জন্য মনে রেখেছে। প্রত্যেক ভূমিকাতেই এক নতুনতর রূপের মধ্যে মায়ার নিজস্বতা দর্শকরা অনুভব করবেন। তিনি কাকেও অনুকরণ করেন না এবং গতানুগতিক ধারায় নেচে যান না। দর্শকরা এখানেই আনন্দ পায় বেশি।

বলশয় থিয়েটার থেকে যে চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে, তা কেবলমাত্র কয়েকটি নাচই নয়। কাটিং এবং ক্লোজ-আপের সাহায্যে তাঁকে একেবারে দর্শকদের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। এই চিত্রগ্রহণেও গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করা হয় নি, সম্পাদনা কৃতিত্বে এখানে পিসেৎস্কায়া দর্শকদের খুব কাছে চলে এসেছেন। ছবিতে ব্যালেরিনা হিসাবে যেমন, তেমনি একজন মহৎ শিল্পী হিসাবে তাঁকে দেখা যায় আরও বেশি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয়ও এখানে দেখা যায়, যে সম্পর্কে দর্শকরা খুব কমই জানতেন।

শুভমুক্তি ৬ই নভেম্বর শুক্রবার!
নির্মম নিয়তির রক্তরাঙা পাথরে ঘেরা
ভাগ্য বৈচিত্র্যের এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস

॥ প্রত্যহ ২, ৫-৩০, ৮-৪৫ মিনিট ॥
উত্তরা • উজ্জ্বলা • পূরবী • পদ্মশ্রী
পার্বতী - মায়াপুরী - শ্রীকৃষ্ণ - শ্রীরামপুর টকীজ - রূপালী - জ্যোতি
(হাওড়া) (শিবপুর) (বালী) (শ্রীরামপুর) (চুঁচুড়া) (চন্দননগর)
ডিলুক্স ফিল্ম পরিবেশিত

...ধের
... । গিরিশবাবু
... নটনটীদের অভিনয় শিক্ষা
...—এত সুন্দরভাবে শেখান যে,
...নকড়ির মনে হয় এরপর কারোর
...ন পার্ট তৈরি করতে এতটুকু অসুবিধা
...তে পারে না । মাঝে মাঝে একটু
...শা আসে—তাকে তো কেউ কিছু
...তে বলছে না । শুধু শুধু বসিয়ে
...খে মাইনে দেবার জন্যই কি তাকে
...নে এনেছে। তবু ধৈর্য ধরে থাকতে
...বে —দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি
...।

...একদিন সন্ধ্যে থেকে রিহার্সাল
... হয়েছে । এই সময় মিনার্ভার সব
...কে নামকরা অভিনেত্রী প্রমদা—
...ডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় তাকেই
...তরি করছিলেন গিরিশচন্দ্র । বার বার
...খাচ্ছিলেন—বার বার ভুল করছিল
...মদা । বহুবার ভুল সংশোধন করে
...বার পরও যখন কিছুতেই ভুলগুলো
...রাতে পারল না, তখন গিরিশচন্দ্র
...ক্ত হয়ে বলে উঠলেন—এর দ্বারা
...র্ট হবে না ।

...এর পর কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে
... রইলেন গিরিশবাবু । সবাই ভয়ে
...ত—চারদিকে একটা থমথমে ভাব
...ও গুম হয়ে রয়েছে । তার ভাবটা
...শ তো অন্য কেউ করুক না
...।

...গিরিশবাবু কিছুক্ষণ বাদে বললেন
... দ্বারা যখন হল না , ডাক নতুন
...নেত্রীটিকে—একবার চেষ্টা করে
... কি দাঁড়ায় ।

...ভয় পেয়ে যায় তিনকড়ি । প্রমদার
...নামকরা অভিনেত্রী যা পারল না
... সেই ভূমিকায় পরীক্ষা দিতে
... কিন্তু গিরিশচন্দ্রের আদেশ তো
... চলে না—ভয়ে ভয়ে

...দিকে চেয়ে বললেন,
...টা শেখাচ্ছিলাম সেটা
... চাই—রিহার্সাল দে
...া :

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

—[illegible]—

তিনকড়ি যেদিন থেকে থিয়েটারে যখনই যে পার্ট পেয়েছে আনন্দের সঙ্গে তা নিয়েছে—কখনও কোন পার্ট নিতে অসম্মতি জানায় নি। গিরিশের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

গিরিশচন্দ্র তখনই তাকে দিয়ে খানিকটা বলিয়ে দেখতে চান। তিনকড়ি

● গিরিশচন্দ্র

জানায় সে রাত্রে পার্টটা ভাল করে পড়ে পরের দিন এসে রিহার্সাল দেবে। ফেরবার পথে প্রমদা তাকে টিটকিরী করতে ছাড়ে নি। এতে তিনকড়ির জেদ আরও বেড়ে যায়—যে করে হোক ওকে হারিয়ে দিয়ে ওর গর্ব খর্ব করতে হবে।

সমস্ত রাত্রি তিনকড়ি ঘুমোয় নি। আট-দশবার করে পড়ে পার্টটি প্রায় মুখস্থ করে ফেলে। গিরিশবাবুর বলানোর ঢং তো বারবার রিহার্সাল দেখে তার প্রায় স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে রয়েছে। পরের দিন গিরিশবাবুর সামনে পরীক্ষা দিতে হাজির হল তিনকড়ি। থিয়েটারের সব লোক সেখানে জড় হয়েছে—দেখতে হবে প্রমদার মত নামকরা অভিনেত্রী যে পার্ট করতে পারল না তা এই নতুন অভিনেত্রী কিভাবে করে। গিরিশবাবুর সামনে আগাগোড়া পার্টটি তিনকড়ি বলে গেল। গিরিশচন্দ্র থেকে সুরু করে সমবেত সবাই মহা খুশি—হ্যাঁ, এই অভিনেত্রী তৈরি হলে প্রমদার থেকে অনেক ভাল-ভাবে এ ভূমিকা অভিনয় করবে। এরপর তিনকড়ির নিজের কথা তুলে দিচ্ছি :

'আমার লেখাপড়া জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। কিন্তু সেই অল্প বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই গিরিশবাবুর শিক্ষায় ও কৃপায় আমি লেডী ম্যাকবেথের জটিল ভূমিকা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই লেডী ম্যাকবেথের অভিনয় করিয়াই আমার অভিনেত্রী জীবনের পথ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেই দিন হইতে আমি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা রীতিমতভাবে রিহার্সাল দিতে লাগিলাম। গিরিশবাবুও দিনরাত্র প্রভূত পরিশ্রমে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অঙ্গ-ভঙ্গী, চাল-চলন, সমস্তই আমি তাঁহার কৃপায় শিখিতে পারিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর ন্যায় শিক্ষক পাইয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি অভিনেত্রী । বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আমি বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত অভিনয় করিয়াছি ও করিতেছি। কিন্তু যথার্থ গুরু বলিবার উপযুক্ত লোক আমি গিরিশবাবু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। মিষ্টকথায় অতি সরলভাবে এমন শিক্ষাপ্রণালী

● অর্দ্ধেন্দু শেখর

কেবল গিরিশবাবুতেই সম্ভব। কেবল তাহারই কৃপায় নিরক্ষর নির্বোধ কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা আমিও অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছি।

১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে ম্যাকবেথের প্রথম অভিনয় হইল। সেদিন রঙ্গালয়ে তিল ধরিবার স্থান ছিল না, রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য। আমি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলাম। গিরিশবাবু স্বয়ং ম্যাকবেথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নটনাথের কৃপায় ও নটগুরুর আশীর্বাদে আমি রিহার্সেলে যাহা করিয়াছিলাম অভিনয়কালে তাহা আমার আরো উৎরাইয়া গেল। দর্শকগণের ঘন ঘন করতালি বর্ষণে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আমি সামান্যা অভিনেত্রী তিনকড়ি। আমি একেবারে লেডী ম্যাকবেথে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম।

অভিনয় ভাঙিবার পর গিরিশবাবু আমায় আদরে পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার বই লেখা সার্থক হয়েছে। বাঙালী দেখুক যে, বাংলা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে। এত সুন্দর, এত নিখুঁত অভিনয় যে তুমি করতে পারবে, একথা আমি একবারও ধারণা করতে পারি নি।

গিরিশবাবুর এই প্রশংসাবাদে আনন্দে আমার দু'চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, আমি একেবারে নটগুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া

কি আশীর্বাদ করি যে, ... অভিনেত্রী হও—এমন অভিনয় কর ... যতদিন থিয়েটার থাকবে ততদি... বাঙালী তোমার কথা ভুলতে ... পারে।----'

অপরেশচন্দ্র বলেছেন ... ম্যাকবেথের অভিনয় বাংলা থিয়েটা... ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘট... কারণ এই ম্যাকবেথকে অব... করেই গিরিশচন্দ্র এদেশে অভিন... ধারা বদলে দিয়েছিলেন ... এই ধারা পরিবর্তনে তাঁর এক... সহযোগী ছিলেন অর্দ্ধেন্দু... কিন্তু কিভাবে এই অভিনয়ের ... বদলে ছিলেন—অর্থাৎ অভিন... ধারা ম্যাকবেথের আগে কি ... এবং পরে কি হোল, সে বিষ... অপরেশচন্দ্র নির্বাক, সুতরাং ব্যাপা... বোঝা মুস্কিল।

একটা কথা বলা হয় ... অর্দ্ধেন্দুশেখর ম্যাকবেথে ডা... প্রভৃতি পাঁচটি ছোট ভূমিক... নেমেছিলেন এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন ... বজায় রেখে অভিনয় করেছি... বিভিন্ন রোলে। এ ধরণের অ... ক্ষমতা বাংলা নাট্যমঞ্চে বোধ ... এক মুস্তাফি সাহেবেরই ছিল।

কারো কারো ধারণা আছে ... গিরিশচন্দ্র এবং মুস্তাফি সাহে... ভেতর মনের মিল ছিল না। এ... সম্পূর্ণ ভুল। অনেক সময়ে হয়... দুজনকে দুই থিয়েটারে কাজ কর... হয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁ... বন্ধুত্বের হানি হয় নি। অর্দ্ধেন্দু... প্রায়ই বলতেন—গিরিশ ... আগে মরে তো আমি... কাঁদবার লোক নেই। ... যদি আগে মরি, ... ছাড়া আর কাঁদবার ...

● ওপরে : পুরাতন পদ্ধতিতে ক্রিকেট খেলার দৃশ্য। নীচে : বিচিত্র সাজসজ্জায় সজ্জিত উভয় দলের খেলোয়াড়গণ।

এরপর সমানে পাঁচ-ছ দিন তিনকাড় ...মটারে যায়—কেউ তার সঙ্গে কথা ...ল না, সেও চুপচাপ বসে মনো... ধরে ...য় রিহার্সাল দেখে ...মান হয়েছে ...দের। এ খেলার অভিনয়ে ...জিত তুচ্ছ, জয় পরাজয় এখানে ...বান্তর। কালের ঘড়িতে কাঁটা ...টাকে একশ বছর পিছিয়ে দিয়ে ...লগঞ্জ মাঠে ফিরিয়ে আনা হল ...তীতের সেই দৃশ্য। গত শনিবার ...াং ৩১শে অক্টোবর, ১৯৬৪ সালের ...পঞ্জী যেন মন্ত্রবলে ১০০ বছর ...র হয়ে গিয়ে বালিগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাবের ...-বার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করল।

এখানে খেলার চেয়ে উৎসবটাই ...। ব্যাটিং-এর চেয়ে পোষাকটাই ...খ পড়ে। দু'কাঠির উইকেট ও ...হ্যাণ্ড বোলিং আর খেলোয়াড়দের ...র পোষাক দর্শক আর খেলোয়াড়দের ... ক্ষণিকের জন্যে ফিরিয়ে আনছিল ...তীতের হারানো সুর।

...ঝানু গোষ্ঠীর লেসলী সাহেব নেতৃত্ব ...লেন, আর মেলর সাহেব ...পতিত্ব করলেন কচি সংসদের। ...ায় হ্যাট্রিকও হল, হ্যাট কালেকশনও ...। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই, টসও ...রানের সংখ্যাও মোটামুটি মন্দ নয়। ...নু গোষ্ঠী করল ৭৫ রান, কচি সংসদ ...র ৫৯ রান। ২ ঘণ্টায় খেলা সাঙ্গ ...সুরু হল খানা পিনা হৈ হুল্লোড়ের।

এই প্রসঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে-...র একটি মজার ক্রিকেট খেলার গল্প ...ব। একটি মফস্বল শহরে খাস বিলিতি ...হব ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছেন। ...র সখ হল ক্রিকেট খেলবার। ...নি শহরের গণ্যমান্য সব লোকেরা ...পড়ে লাগলেন। জমিদার, উকিল, ...ার, ডাক্তার, প্রফেসর সবাই হৈ ...করে মেতে উঠলেন। কানাঘুষা ...ানা গেল এই খেলার ফলাফলের উপর ...য়বাহাদুর, খান বাহাদুর উপাধিও ...র্ভর করছে। খেলার দিন মাঠে লোক ...ও পড়ল। শহরে দুটি সাহেব—...জিস্ট্রেট সাহেব ও পুলিশ সাহেব। ...'দলের অধিনায়ক হলেন। ...্য কর... আগে থেকে শুনেছিল ...এল সামনে ...ক্রিকেট খেলা চলবে না। ...গিরিশ তার ...র এত চলন ছিল না। ...কে যে পা...গ্রহ করতে পারলেন তাই ...ক দিতেছিলেন। সে এক অপূর্ব ...দৃশ্য—পারবে দে...

দৃশ্য—লাল, কাল, সাদা, ফুলপ্যান্ট, হাফপ্যান্ট, পাজামা। তাও সব নিজেদের নয় কিছু কিছু ধার করা।

চাঁদু ডাক্তার ব্যাট করতে নামলেন ষ্টেথোস্কোপ কানে দিয়েই, কারণ স্টেথোস্কোপ ছাড়া তাঁর কনসেনট্রেশন আসে না। তবে খেলার প্রধান আকর্ষণ নাকি ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটার লাহিড়ী মশাই আর গভর্নমেন্ট উকিল হক সাহেব। দু'জনেই

শ্রীঅমিতাভ

মাঠে নামলেন উকিলী পোষাক পরে, দু'জনেই ম্যাজিস্ট্রেটের অনুগ্রহ লাভের জন্য লালায়িত। খেলায় শেষ পর্যন্ত হক সাহেব বোল্ড আউট করলেন লাহিড়ী মশাইকে। নববর্ষের খেতাব তালিকায় হক সাহেব সেরার খান বাহাদুর খেতাব পেলেন। পরে অবশ্য আরও অনেককে বোল্ড আউট করে মন্ত্রিত্ব পর্যন্ত লাভ করেছিলেন হক সাহেব।

জাতীয় ফুটবল

গৌহাটির জাতীয় ফুটবলের আসর এখন জমজমাট। প্রতিযোগিতা এখন প্রায় মধ্যপথে, চলছে বাছাইয়ের আর বিদায়ের পালা। গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্র দল বিহারকে পাঁচ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উন্নীত হয়। কোয়ার্টার ফাইন্যালে মহারাষ্ট্র অনায়াসেই আসামকে ৩—০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সেমি-ফাইন্যালে পৌঁচেছে। মহারাষ্ট্রের ডি সুজা একাই তিন গোল দিয়ে হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় জম্মু-কাশ্মীর দলকে ২—০ গোলে পরাজিত করে কেরালা দ্বিতীয় রাউণ্ডে বাংলা দলের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করে। প্রায় তরুণ বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে

[illegible]ত বাংলা দল কেরালাকে ২—০ গোলে পরাজিত করে পরবর্তী রাউণ্ডে মাদ্রাজ অথবা রাজস্থানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলায় গোয়া দলকে ৪—০ গোলে পরাজিত করে, কোয়ার্টার ফাইন্যালে সার্ভিসেস সম্মুখীন হবে গতবারের বিজিত অন্ধ্র প্রদেশ দলের সঙ্গে।

এবারে গৌহাটির আসরে কোন দল যে বিজয়ীর গৌরব অর্জন করবে তা বলা শক্ত। কারণ শক্তির মানদণ্ডে বাংলা, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, সার্ভিসেস কেউই কম নয়। গতবারের বিজয়ী মহারাষ্ট্রের খেলার ধারা দেখে মনে হচ্ছে, তারা গতবারের অর্জিত সন্তোষ ট্রফি এবারও জয় করতে বদ্ধপরিকর। বাংলা দল যদি দলগত ঐক্য বজায় রাখতে পারে, তবে তাদের পক্ষে বিজয়ীর সম্মান লাভ করা এমন কোন কঠিন কাজ হবে না।

লিটল ডুরাণ্ড

সর্বভারতীয় বাছাই স্কুল দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা লিটল ডুরাণ্ড বা সুব্রত মুখার্জী কাপের খেলা সুরু হয়েছে দিল্লীতে। এবারের প্রতিযোগী স্কুলের সংখ্যা ২০টি। বাংলা থেকে এবার লিটল ডুরাণ্ডে অংশ গ্রহণ করবে দুটি স্কুল। গতবারের বিজয়ী বাটানগর স্কুল এবং এবারের বাংলা স্কুল চ্যাম্পিয়ান নদীয়ার বড় জাগুলিয়া স্কুল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬১ সালে প্রতিযোগিতা [illegible] ৬৪ সাল[illegible] দুবার এই প্রতিযোগিতা [illegible] হয়েছে। এবং দুবারই লিটল [illegible] জয় করে এনেছে বাংলার স্কুল[illegible] প্রথমবার বিজয়ী হয় কলকাতার রাসমণি স্কুল এবং দ্বিতীয়বার [illegible] হয় বাটানগর স্কুল দল।

এবারের প্রতিযোগিতার উ[illegible] করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডঃ [illegible] হোসেন। উদ্বোধনী খেলায় বোম্ব[illegible] আঞ্জুমান স্কুল উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য [illegible] করে দিল্লীর ডি এ ভি স্কুল [illegible] ৭—০ গোলে পরাজিত করে।

শ্রীনগরের শ্রীপ্রতাপ স্কুলের [illegible] কারণ জব্বলপুরের এ পি এন স্কুল [illegible] ৬—১ গোলে শোচনীয়ভাবে প[illegible] করেও শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা[illegible] বিদায় নিতে হল। জব্বলপুরের [illegible] শ্রীনগরের স্কুল দলের ক[illegible] খেলোয়াড়ের বয়স সম্বন্ধে প্র[illegible] জ্ঞাপন করেন প্রতিযোগিতা [illegible] কাছে। লিটল ডুরাণ্ডের সর্বোচ্চ ব[illegible] হল ১৭ বৎসর। শ্রীনগরের [illegible] তাঁদের কয়েকজন খেলোয়াড়ের [illegible] সম্বন্ধে যথাযোগ্য প্রমাণপত্র [illegible] করতে না পারার ফলে তারা [illegible] হয়ে যায়। স্কুল ফুটবলের ক্ষে[illegible] ধরণের ঘটনা ঘটা খুবই খারাপ। [illegible] জেতার লোভে স্কুলের খে[illegible] সাজিয়ে, বয়স কমিয়ে খেলতে [illegible] একটা গর্হিত অপরাধ। ভ[illegible] যাতে এই ধরণের ঘটনার পুনরা[illegible] হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

● মোহনবাগান ক্লাবের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবে ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের একমাত্র জীবিত খেলোয়াড় রাইট রেভাঃ সুধীর চ্যাটার্জী ও মশাল হস্তে বর্তমান ফুটবল অধিনায়ক চুণী গোস্বামী।

সমাচার দর্পণ

টোকিওর অলিম্পিক প্রত্য[illegible] জার্মানী অলিম্পিক হকি দল [illegible] সফর সুরু করেছে। সফরের [illegible] খেলায় দক্ষিণ পূর্ব রেল দলকে [illegible] গোলে পরাজিত করেছে। [illegible] খেলায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ দল [illegible] গোলে পরাজিত হয় জার্মানী[illegible] কাছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দিন এবং রাত্রির
জন্য সৌন্দর্য্য
চর্চ্চা - -
আফগান
কোল্ড ক্রীম
পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর
পরিষ্কার ও ঔজ্জ্বল্য আনিয়া
গাত্রবর্ণ সুন্দর করে।
ভাল কাজ পাইতে হইলে
আফগান
কোল্ড ক্রীম
বেশ ভাল করিয়া মুখে,
হাতে এবং ঘাড়ে লাগাইয়া
সারা রাত্রি রাখিয়া দিন।
AFGHAN COLD CREAM
AFGHAN SNOW
দিনের বেলায় লাগান
আফগান স্নো
ইহাতে সূর্য্যতাপ ও ধূলার হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। এই
প্রসাধনীতে সারাদিন আপনার ত্বক নরম ও মোলায়েম থাকিবে।
E. S. PATANWALA, BOMBAY-77.

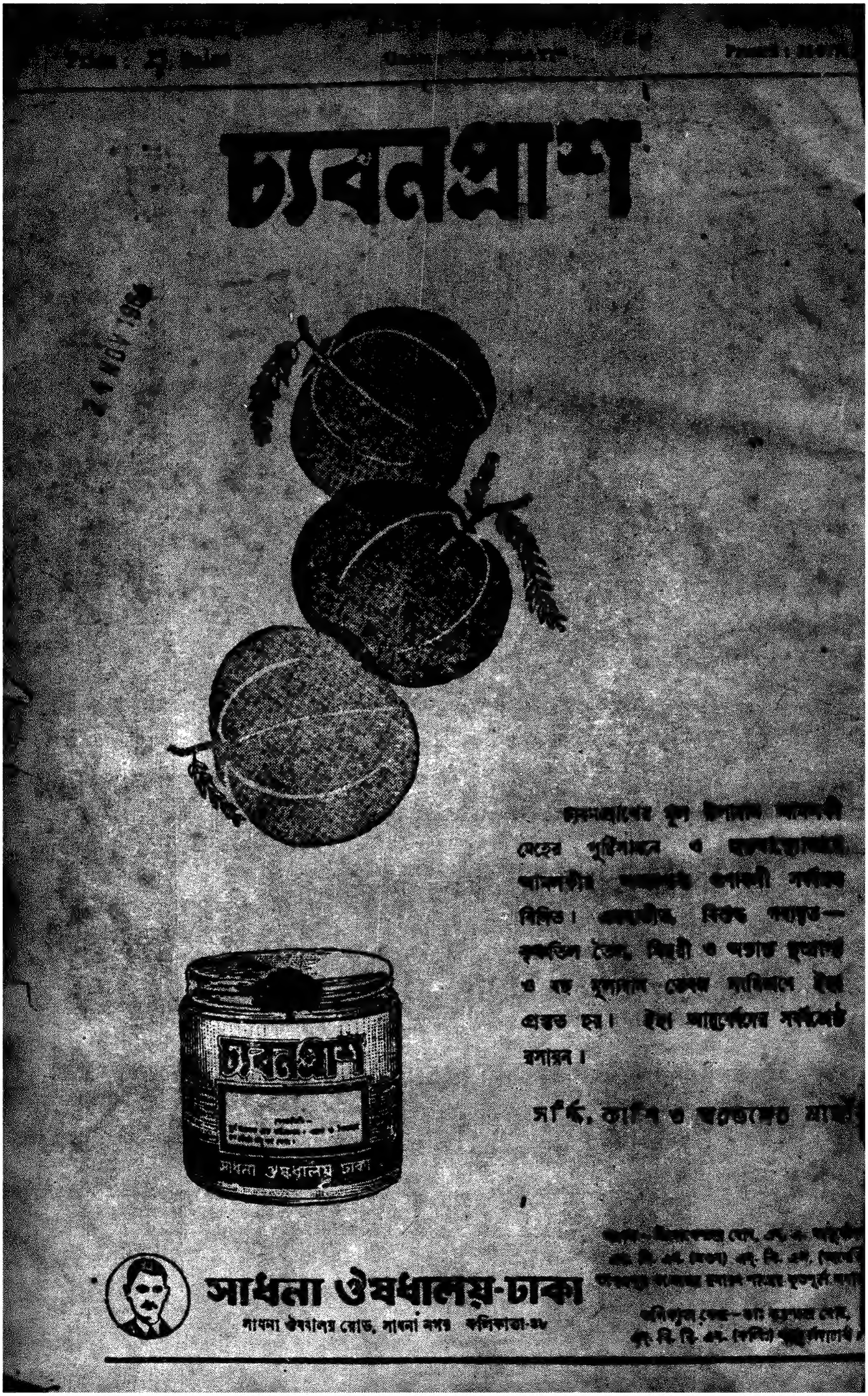

চ্যবনপ্রাশ
রসায়ন।
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর